আহছানুল হক আবির

2020/

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

Scanned with CamScanner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক অনুমোদিত সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ।
পুনঃঅনুমোদিত বইয়ের স্মারক নং- শি.স./৯১/২০১৬/৪১০, তারিখ : ১৮/০৪/২০১৭

জীববিজ্ঞান

দ্বিতীয় পত্র ॥ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

মাজেদা বেগম
বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (১ম শ্রেণি)
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, জীববিজ্ঞান বিভাগ
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
মাস্টার ট্রেইনার, সৃজনশীল পদ্ধতি

রাশিদা বেগম
বিএসসি (সম্মান), এমএসসি
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, জীববিজ্ঞান বিভাগ
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা
মাস্টার ট্রেইনার, সৃজনশীল পদ্ধতি

সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
বিএসসি (সম্মান) (১ম শ্রেণি), এমএসসি (১ম শ্রেণি)
সহযোগী অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান বিভাগ
সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, টিকাটুলী, ঢাকা
খণ্ডকালীন শিক্ষক, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
ভূতপূর্ব খণ্ডকালীন শিক্ষক, নটরডেম কলেজ, ঢাকা

মোহাম্মদ নাদির হোসেন
বিএসসি (সম্মান, ১ম শ্রেণি), ঢাবি
এমএস (থিসিস, ১ম শ্রেণি-২য়), ঢাবি
সহকারী অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ, ঢাকা
ভূতপূর্ব প্রভাষক, ঢাকা সিটি কলেজ (খণ্ডকালীন)
শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
সৃজনশীল ট্রেনিং প্রাপ্ত ও বোর্ড পরীক্ষক
Research Assistant and Contributor
Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh
[Mollusca (Vol .17), Arthropoda (Vol.18) & Freshwater Fishes (Vol.23)]
Asiatic Society of Bangladesh.

কানিজ ফাতেমা আনোয়ার
বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (প্রাণিবিদ্যা), ঢাবি
ডিপ-ইন-এড এবং এমএড (আই.ই.আর), ঢাবি
সহযোগী অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ, ঢাকা।
মাস্টার ট্রেইনার, সৃজনশীল পদ্ধতি ও বোর্ড পরীক্ষক

সম্পাদনায়

ড. জি এম শাহিকুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি এমএম কলেজ, যশোর
বিএসসি (সম্মান)-৪র্থ, এমএসসি প্রথম (গোল্ড মেডেলিস্ট)
বিএড-৬ষ্ঠ, পিএইচডি প্রথম, বিসিএস-৫ম (১৭তম ব্যাচ)

ঐতিহ্যে ৫১ বছর
কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড

2020/8/4 12:37

Scanned with CamScanner

প্রতিষ্ঠাতা
মরহুম মির্জা আলী মোহাম্মদ

প্রকাশনায়
মির্জা আলী আশরাফ কাশেম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড

কর্পোরেট অফিস
ডা. নওয়াব আলী টাওয়ার
২৪ পুরানা পল্টন (৭ম তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫১৫৩০১, ৯৫১৫৩০২
ফ্যাক্স : ৯৫১৫৩০৩
web : www.anupameducation.com

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

বিক্রয়কেন্দ্র
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭১৯৪

প্রকাশকাল
চতুর্থ প্রকাশ : মে, ২০১৯
তৃতীয় প্রকাশ : মে, ২০১৮
দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১৭
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১৬

তত্ত্বাবধানে
মিশন কুমার দাস
গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ
মোবা : ০১৯৯১ ১৪৪৫৪৭

সহযোগিতায়
মোঃ মাজেদ হোসেন
মাহমুদা লতা, রাজেশ চন্দ্র আচার্য্য
মোঃ জিহাদুল কবীর রাজু

প্রচ্ছদ চিত্রণ
অনুপম ক্রিয়েটিভ সেকশন

বর্ণবিন্যাস
অনুপম লেটার অ্যান্ড কম্পোজিশন সেকশন

মুদ্রণে
কাজল প্রিন্টিং প্রেস, মোগল নগর, কদমতলী
কালভার্ট রোড, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬২

অভিমত ও পরামর্শ জানাতে -

মোহাম্মদ নাদির হোসেন : ০১৭১০ ৮২৩৫৪০
মাজেদা বেগম : ০১৮১৭ ০২০০৬৩
রাশিদা বেগম : ০১৭২৩ ৭৫০৫৫৬
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার : ০১৮১৯ ৮২৬৫৫৭

সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য (MRP) : ৩২০.০০ টাকা
(বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক গৃহীত)

2020/8/4 12:38

Scanned with CamScanner

প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস
ANIMAL DIVERSITY AND CLASSIFICATION

অধ্যায় ১

পৃথিবীর সকল জীবের ভিন্নতাকেই সংক্ষেপে **জীববৈচিত্র্য** (biodiversity) বলে। 1980 সালের আগের দিকে এই শব্দটি আমাদের কাছে পরিচিত ছিল না। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ফেলো ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বাস্তুতত্ত্ববিদ প্রফেসর **থমাস লাভজয়** (Thomas Lovejoy, 1980) সর্বপ্রথম কোনো একটি বনের সমগ্র জীবপ্রজাতির সংখ্যা বোঝাতে জৈবিক বৈচিত্র্য শব্দটি প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানী ওয়ালটার রসেন (Walter G. Rosen, 1986) জৈবিক বৈচিত্র্যের পরিবর্তে জীববৈচিত্র্য (biodiversity) শব্দটি ব্যবহার করেন। পৃথিবীতে নানা ধরনের অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। এই পর্যন্ত ২,৭০,০০০ ভাস্কুলার উদ্ভিদ এবং প্রায় ১৫ লাখ প্রাণী প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উদ্ভিদ ও প্রাণী আবিষ্কারের ফলে এর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। পৃথিবীর সব প্রাণীকে নিয়ে গঠিত হয়েছে প্রাণিজগৎ বা প্রাণিরাজ্য। এ অধ্যায়ে প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।



এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা-৭)
১. প্রাণিজগতের ভিন্নতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রাণীকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করার ভিত্তি ও নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বিভিন্ন ধরনের প্রাণীতে বিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. নন-কর্ডাটা প্রাণীকে প্রধান পর্ব পর্যন্ত বিন্যাস্ত করতে পারবে। ৫. কর্ডাটা প্রাণীকে শ্রেণি পর্যন্ত বিন্যস্ত করতে পারবে। ৬. **ব্যবহারিক** বিভিন্ন প্রাণী শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	• **প্রাণিজগতের** ○ ভিন্নতা ○ শ্রেণিকরণের ভিত্তি ও নীতি • নন-কর্ডাটা (প্রধান পর্ব পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাস) • কর্ডাটা (শ্রেণি পর্যন্ত বিন্যাস) • **ব্যবহারিক** ○ নন-কর্ডাটার বিভিন্ন পর্বের (যেকোনো পাঁচটি) এবং ভার্টিব্রাটার বিভিন্ন শ্রেণির (যেকোনো পাঁচটি) নমুনা পর্যবেক্ষণ।

প্রাণিবিজ্ঞানের পরিচিতি (Introduction of Zoology)

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণীর দৈহিক গঠন, আচরণ, উৎপত্তি, জৈবনিক কার্যাবলি, বিবর্তন, বংশগতি, অভিযোজন, শ্রেণিবিন্যাস, অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে **প্রাণিবিজ্ঞান** (zoology) বলে। প্রাণিবিজ্ঞানের জনক **গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল** (Aristotle, 384-322 B.C.E.) সর্বপ্রথম প্রাণীদের বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ উপস্থাপন করেন। জীববিজ্ঞানীগণ এ পর্যন্ত ২,৭০,০০০ ভাস্কুলার উদ্ভিদ এবং ১৫ লাখেরও বেশি প্রাণী প্রজাতি শনাক্ত করেছেন। এসব প্রজাতির মধ্যে নানা কারণে ভিন্নতা দেখা যায়।

যেসব ইউক্যারিওটিক বহুকোষী জীব নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না বরং অন্য জীব বা জৈব পদার্থ আহার করে, সেসব জীবকে প্রাণী (animals) **বলা হয়।**

প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

(১) এরা বহুকোষী জীব। (২) এরা পরভোজী এবং খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। (৩) প্রাণীর কোষে কোষপ্রাচীর ও প্লাস্টিড নেই। (৩) প্রাণী সাধারণত চলাচলে সক্ষম। (৫) প্রাণী পরিবেশের উদ্দীপনায় তাৎক্ষণিক সাড়া দেয়। (৫) প্রাণীর দেহে সংবেদনশীল অঙ্গ বিদ্যমান। (৭) এরা **হলোজোয়িক** (holozoic) পদ্ধতিতে পুষ্টি সম্পন্ন করে। (৮) এরা ভিন্নভোজী স্বভাবের। (৯) যৌনজনন প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি ঘটায়।

2020/8/4 12:38

Scanned with CamScanner

১.১ প্রাণিজগতের ভিন্নতা বা প্রাণিবৈচিত্র্য (Animal Diversity)

পৃথিবীতে বহু প্রজাতির ও বিভিন্ন ধরনের প্রাণী রয়েছে। বিভিন্ন পরিবেশে বাস করার জন্য এসব প্রাণী ভিন্ন ভিন্নভাবে অভিযোজিত হয়েছে। এসব প্রাণীর কারও কারও মধ্যে বৈশিষ্ট্যের প্রচুর মিল রয়েছে। আবার কারও কারও মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার পার্থক্য দেখা যায়। **পৃথিবীর মাটি, বায়ু ও পানিতে বসবাসকারী সকল প্রাণীর মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত, আন্তঃপ্রজাতিগত বা বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকে প্রাণিবৈচিত্র্য** (animal diversity) **বলে।**

❐ **প্রাণিবৈচিত্র্যের প্রকারভেদ :** প্রকৃতিতে তিন ধরনের প্রাণিবৈচিত্র্য দেখা যায়, যথা–

(ক) জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity) **:** জিনগত ভিন্নতার কারণে যখন একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় তখন তাকে **জিনগত বৈচিত্র্য** বলে। একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে এ ধরনের বৈচিত্র্য ঘটে বলে একে **অন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্যও** (intraspecific diversity) বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রজাতিতে রেস (race), জাত (variety) ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। যেমন– বিশ্বের সকল মানুষ *Homo sapiens* প্রজাতিভুক্ত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এর Negroid, Mongoloid, Coucasoid ইত্যাদি রেস দেখা যায়। ধান, গম, ভুট্টা, রেশম পোকা প্রভৃতি জীবের একই প্রজাতিতে একাধিক জাত (varieties) দেখা যায়।

(খ) প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity) **:** কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান বৈচিত্র্যকে **প্রজাতিগত বৈচিত্র্য** বলে। কখনোই দুটি প্রজাতির প্রাণী এক রকম হয় না। একই গণভুক্ত প্রজাতির মধ্যেও ক্রোমোজোম সংখ্যা ও আঙ্গিক গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন– বাঘ (*Panthera tigris*) ও সিংহ (*Panthera leo*) একই গণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

(গ) বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity) **:** পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুর সঙ্গে জীবজগতের মিথস্ক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশীয় একক বা **বায়োম** (biome) সৃষ্টি হয়। যেমন– তুন্দ্রা বায়োম, মরু বায়োম, বনভূমি বায়োম, তৃণভূমি বায়োম ইত্যাদি। প্রতিটি বায়োমে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বৈচিত্র্যময় প্রাণী রয়েছে। এরূপ বিভিন্ন বায়োমে বিদ্যমান প্রাণীর বৈচিত্র্যকে **বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য** বলে। তুন্দ্রা বায়োমের শ্বেত ভল্লুক এবং বনভূমি বায়োমের ভল্লুকের মধ্যে এ বৈচিত্র্য বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

[বি.দ্র. : জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র বইয়ের অধ্যায়-১২ তে জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তির কারণ এবং সংরক্ষণের গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।]

১.২ শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি ও নীতি (Basis and Principles of Animal Classification)

পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী প্রাণীদের রাজ্য, পর্ব, শ্রেণি, বর্গ, গোত্র, গণ, প্রজাতি ইত্যাদি গ্রুপ বা স্তরে বিন্যাস করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস (Classification) বলা হয়। Simpson (1961)-এর মতে, Classification is the ordering of animals into groups or sets of their relation. প্রাণিজগতে বিদ্যমান প্রাণীদের পারস্পরিক মিল ও অমিলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে শ্রেণিবিন্যাস। **সুইডিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস** (Carolus Linnaeus, 1707–1778) শ্রেণিবিন্যাসের বিজ্ঞানভিত্তিক ও সুসংবদ্ধ উপায়ে প্রাণীদের প্রথম শ্রেণিবিন্যাস করেন। তাঁর **Systema Nature** নামক পুস্তকের দশম সংস্করণে (1758) দ্বিপদ নামকরণ (Binomial Nomenclature) পদ্ধতি সর্বপ্রথম প্রবর্তন ও সঙ্গতভাবে ব্যবহার করেন। এ নিয়মাবলি এতই যুক্তিপূর্ণ যে, প্রাণিজগতের দিগন্ত বহুবিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও এর খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। তাই তাঁকে **আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার জনক** (Father of Taxonomy) বলা হয়।

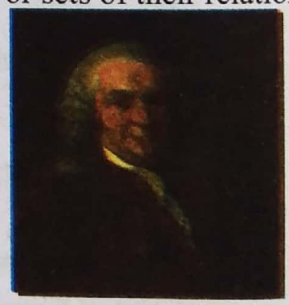
ক্যারোলাস লিনিয়াস

❐ **শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা বা ট্যাক্সোনমি** (Taxonomy) **:** প্রাণিবিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি, উদ্দেশ্য ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে **ট্যাক্সোনমি** বা **শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা** বা **শ্রেণিবিন্যাসতত্ত্ব** বলে। ট্যাক্সোনমি হলো শ্রেণিবিন্যাসের বিজ্ঞান (science of classification)। এ শাখাটিতে শ্রেণিবিন্যাসের মূলনীতি (principles), প্রথা (procedures) এবং নামকরণের নিয়মাবলি (rules of nomenclature) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। **Earnest Mayr** (1969)-এর মতে "Taxonomy is the theory and practice of classification" অর্থাৎ শ্রেণিবিন্যাসের তত্ত্ব ও চর্চাই হলো ট্যাক্সোনমি। ট্যাক্সোনমি (Gr. *taxis* = arrangement + *nomos* = law) শব্দটি ফরাসি উদ্ভিদবিদ **A. P. de Candolle** তাঁর রচিত Theory of elementary botany নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ট্যাক্সোনমিতে আলোচিত প্রধান বিষয় হলো– **ক. শনাক্তকরণ, খ. নামকরণ এবং গ. শ্রেণিকরণ।**

2020/8/4 12:39

Scanned with CamScanner

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি (Basis of Animal Classification)

প্রত্যেক প্রাণীরই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ থাকে। এসব বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমেই প্রতিটি প্রাণিগোষ্ঠীকে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায়। শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনে প্রাণিদেহের এসব বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয় অর্থাৎ শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেসব বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করা হয় সেসব বৈশিষ্ট্যকেই **শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি** বলে। প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিত্তিসমূহ হলো-

(১) দেহের আকার, (২) সংগঠন মাত্রা, (৩) ক্লিভেজ, (৪) ভ্রূণস্তর, (৫) প্রান্তিকতা, (৬) প্রতিসাম্য, (৭) খণ্ডাকায়ন, (৮) সিলোম, (৯) অঞ্চলায়ন, (১০) তল, (১১) উপাঙ্গ, (১২) নটোকর্ড, (১৩) মেরুদণ্ড, (১৪) পৌষ্টিকনালি, (১৫) জীবন পদ্ধতি, (১৬) পুষ্টি পদ্ধতি প্রভৃতি।

নিচে প্রাণীদের এমন কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো যেগুলো শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি রচনায় অবদান রাখতে সক্ষম।

১। **দেহের আকার** (Body shape) : আকারের ভিত্তিতে প্রাণীদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা–

(ক) মাইক্রো বা আণুবীক্ষণিক প্রাণী (Micro-animal) : এসব প্রাণী আণুবীক্ষণিক ও অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার। এদের খালি চোখে দেখা যায় না। যেমন– *Plasmodium vivax* (ম্যালেরিয়া জীবাণু), *Entamoeba histolytica* (আমাশয় জীবাণু), *Loa loa* (চোখ কৃমি) ইত্যাদি।

(খ) ম্যাক্রো বা বৃহত্তম প্রাণী (Macro-animal) : এসব প্রাণী সাধারণত আকারে বড় এবং এদেরকে খালি চোখেই দেখা যায়। যেমন– *Duttaphrynus melanostictus* (কুনো ব্যাঙ), *Homo sapiens* (মানুষ) ইত্যাদি।

২। **সংগঠন মাত্রা** (Levels of organization) : উৎপত্তি ও বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণীদের দেহ সরল থেকে জটিলতরভাবে সংগঠিত হয়েছে। এটি মূলত এককোষী বা অকোষীয় প্রাণীর সংগঠন থেকে কাজের ভিত্তিতে শ্রমবণ্টনের উদ্দেশ্যে কোষসমূহ একত্রিত হয়ে কলা, অঙ্গ, অঙ্গতন্ত্র প্রভৃতি গঠন করেছে। ফলে ধীরে ধীরে জটিল প্রাণীর দেহ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রাণীর কোষীয় ক্রমজটিলতার প্রতিটি স্তরকে **সংগঠন মাত্রা** (level of organization) বলে।

প্রাণীর কোষীয় সংগঠন মাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগৎকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) কোষীয় পর্যায়ের সংগঠন মাত্রা (Cellular grade or level of organization) : যেসব প্রাণী অনেকগুলো শিথিল যোগাযোগসম্পন্ন কোষ দ্বারা গঠিত তারা এই মাত্রার অন্তর্ভুক্ত। এখানে কিছুটা শ্রম বিভাজন দেখা যায়। কিন্তু এ ধরনের মাত্রা কোষ সমৃদ্ধ কলায় পরিণত হয় না। উদাহরণ– Porifera পর্বভুক্ত সকল প্রাণী।

(খ) কোষ-কলা পর্যায়ের সংগঠন মাত্রা (Cell-tissue grade or level of organization) : এ ক্ষেত্রে প্রাণীর দেহে বিদ্যমান একই কাজে নিয়োজিত কোষগুলো দলবদ্ধ হয়ে কলা গঠন করে। উদাহরণ– Cnidaria ও Ctenophora পর্বভুক্ত সকল প্রাণী।

(গ) কলা-অঙ্গ পর্যায়ের সংগঠন মাত্রা (Tissue-organ grade or level of organization) : যেসব প্রাণীর অনেক প্রকারের কলা আছে এবং কলাসমূহ একত্রিত হয়ে একটি অঙ্গের সৃষ্টি করে তারা এই মাত্রার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ– Platyhelminthes পর্বভুক্ত সকল প্রাণী।

(ঘ) অঙ্গতন্ত্র পর্যায়ের সংগঠন মাত্রা (Organ-system grade or level of organization) : উচ্চতর প্রাণীর অঙ্গসমূহ একত্রিত হয়ে কার্যক্ষম তন্ত্রে পরিণত হয়। প্রতিটি অঙ্গতন্ত্র নিজস্ব ও ভিন্ন কাজের জন্য নিয়োজিত। সকল উন্নত প্রাণীই এই মাত্রার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ– Nematoda থেকে Chordata পর্বভুক্ত সকল প্রাণী।

৩। **ক্লিভেজ বা সম্ভেদ** (Cleavage) : **যে পদ্ধতিতে জাইগোট ক্রমাগত মাইটোটিক পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য অপত্য কোষ তথা ভ্রূণ** (embryo) **সৃষ্টি হয় তাকে ক্লিভেজ বা সম্ভেদ বলে।** ক্লিভেজের ফলে সৃষ্ট অপত্য কোষকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) বলে। জাইগোট থেকে প্রথমত কোষ বিভাজনের ফলে বলের ন্যায় বহুকোষবিশিষ্ট গোলক সৃষ্টি হয়। এই গোলককে **মরুলা** (morula) বলে। এরপর মরুলা পর্যায়ের কোষগুলো একটি স্তরে সজ্জিত হয়ে ভিতরে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) নামক একটি ফাঁকা স্থান গঠনপূর্বক **ব্লাস্টুলা** (blastula) নামক ভ্রূণ সৃষ্টি করে। ব্লাস্টুলায় রূপান্তরিত হওয়া শেষ হলে ক্লিভেজ পদ্ধতিরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

2020/8/4 12:39

Scanned with CamScanner

প্রাণিজগতের বিভিন্ন প্রাণী ও প্রাণিদলে বিভিন্ন ধরনের ক্লিভেজ দেখা যায়। সে কারণে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসে ক্লিভেজের গুরুত্ব আছে। যথা–

(ক) অরীয় ক্লিভেজ (Radial cleavage) : এক্ষেত্রে ক্লিভেজ তল জাইগোটকে সর্বদা অরীয় ও সুষমভাবে বিভক্ত করে। উৎপন্ন সব ব্লাস্টোমিয়ার দেখতে একই প্রকারের হয় এবং অরীয় প্রতিসমভাবে সজ্জিত থাকে। যেমন– Arthropoda পর্বের প্রাণীদের ক্লিভেজ।

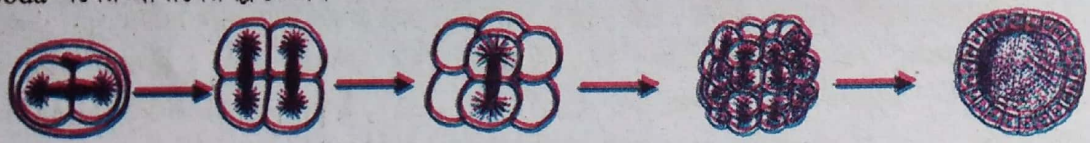

চিত্র ১.১ ক. প্রাণীর অরীয় ক্লিভেজ

(খ) দ্বিপার্শ্বীয় ক্লিভেজ (Bilateral cleavage) : এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভাজন পর্যন্ত অরীয় ক্লিভেজের ন্যায় কিন্তু পরবর্তী বিভাজন মধ্যরেখা বরাবর অনুপ্রস্থভাবে ঘটে বলে চারটি করে দুই সারি কোষের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্যতা দেখা যায়। যেমন– Chordata পর্বের প্রাণীদের ক্লিভেজ।

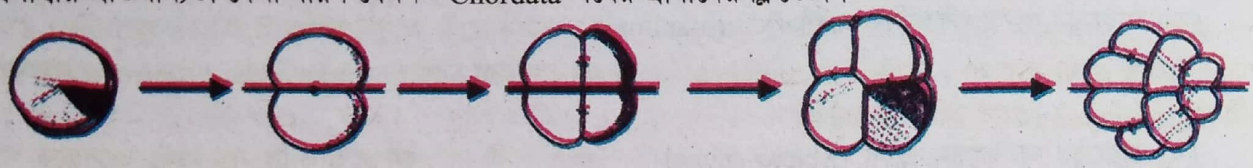

চিত্র ১.১ খ. প্রাণীর দ্বিপার্শ্বীয় ক্লিভেজ

(গ) সর্পিল ক্লিভেজ (Spiral cleavage) : প্রথম ও দ্বিতীয় ক্লিভেজের পর তৃতীয় ক্লিভেজের সময় **অ্যানিমেল মেরু** (animal pole = জাইগোটের যে প্রান্তে নিউক্লিয়াস থাকে)-এর ব্লাস্টোমিয়ারসমূহ **ভেজিটাল মেরু** (vegetal pole = জাইগোটের যে প্রান্তে সাইটোপ্লাজম থাকে)-এর ব্লাস্টোমিয়ারগুলোর সাথে চক্রাকারে সামান্য স্থান পরিবর্তন করে। তখন এরূপ ক্লিভেজকে ঘূর্ণন বা সর্পিল ক্লিভেজ বলে। যেমন– Annelida ও Mollusca পর্বের প্রাণীদের ক্লিভেজ।

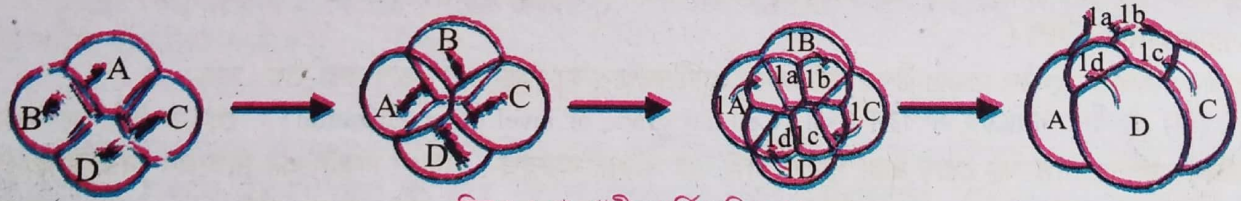

চিত্র ১.১ গ. প্রাণীর সর্পিল ক্লিভেজ

৪। ভ্রূণস্তর (Germ layers) : যৌন প্রজননকারী বহুকোষী প্রাণীর জাইগোট বিভাজিত হয়ে মরুলা ও ব্লাস্টুলা দশা অতিক্রম করে দ্বিস্তরী বা ত্রিস্তরী গ্যাস্ট্রুলাতে পরিণত হয়। ভ্রূণের গ্যাস্ট্রুলা দশায় বিদ্যমান এসব কোষীয় স্তরকে ভ্রূণস্তর বা জার্ম লেয়ার বলে।

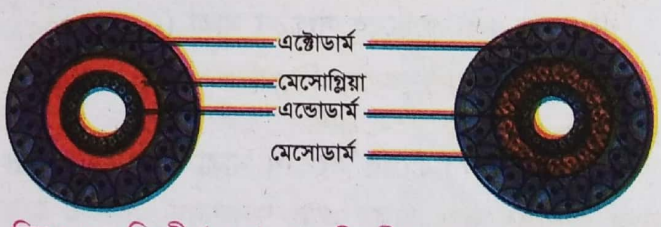

চিত্র ১.২ : দ্বিস্তরী (বায়ে) এবং ত্রিস্তরী (ডানে) কোষ বিন্যাস

অন্যভাবে বলা যায়,ভ্রূণের যেসব কোষস্তর থেকে ভবিষ্যতে (পরিণত প্রাণীর) বিবিধ কলা ও বিভিন্ন অঙ্গ প্রস্ফুটিত হয়, তাদের **ভ্রূণস্তর** (germ layer) বলে। ভ্রূণের কোষগুলো দুটি বা তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে।

(ক) দ্বিস্তরী প্রাণী (Diploblastic animal) : যেসব প্রাণীর ভ্রূণে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি ভ্রূণীয় স্তর থাকে সেসব প্রাণীকে **দ্বিস্তরী প্রাণী** বলে। স্তরদুটির মাঝে আঠালো জেলির মতো অকোষীয় **মেসোগ্লিয়া** (mesoglea) থাকে। যেমন– Cnidaria পর্বের প্রাণী।

(খ) ত্রিস্তরী প্রাণী (Triploblastic animal) : যেসব প্রাণীর ভ্রূণে এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক তিনটি ভ্রূণীয় স্তর থাকে সেসব প্রাণীকে **ত্রিস্তরী প্রাণী** বলে। যেমন– Platyhelminthes, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata ও Chordata পর্বের প্রাণীরা। ভ্রূণস্তর থেকেই প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী **H. C. Pander** (1817) মুরগীর ভ্রূণ পর্যবেক্ষণের সময় প্রাণীর তিনটি ভ্রূণীয় স্তর আবিষ্কার করেন।

2020/8/4 12:39

Scanned with CamScanner

পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি

ভ্রূণীয় স্তর	পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে উদ্ভূত অঙ্গাদি
এক্টোডার্ম (Ectoderm)	ত্বকের এপিডার্মিস; মুখ, পায়ু ও নাসাছিদ্রের আবরণ; ঘর্ম ও শ্বেদগ্রন্থি; চোখের লেন্স; চুল, নখ, পালক, শিং, দাঁতের এনামেল; কান, নাক, স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক।
মেসোডার্ম (Mesoderm)	পেশি ও কঙ্কাল; ত্বকের ডার্মিস; ডার্মাল আঁইশ ও ডেন্টিন; রেচনতন্ত্র, জননতন্ত্র; যোজক কলা; রক্ত ও রক্তবাহ; মেসেন্টারি; সিলোম আবরণ।
এন্ডোডার্ম (Endoderm)	পৌষ্টিকনালি, শ্বাসনালি ও ফুসফুস; যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণকারী অংশ; থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস; মূত্রথলি; মূত্রনালির আবরণ।

৫। প্রতিসাম্য (Symmetry) : অক্ষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সুষম বণ্টনকে প্রতিসাম্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রাণিদেহকে কোনো অক্ষ বা তল বরাবর সদৃশ্য সমান অংশে বিভাজন করার নিয়মকে **প্রতিসাম্য** বলে। অধিকাংশ প্রাণিদেহ প্রতিসাম্য প্রদর্শন করে। প্রাণিজগতে প্রধানত নিম্নবর্ণিত ৫ ধরনের প্রতিসাম্য পরিলক্ষিত হয়, যথা–

(ক) গোলীয় প্রতিসাম্য (Spherical symmetry) : যখন গোলাকার কোনো প্রাণী দেহকে উহার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যেকোনো সমান অংশে ভাগ করা যায়, তাকে গোলীয় বা সার্বিক প্রতিসাম্য বলে। যেমন– *Volvox*, Radiolaria, Heliozoa ইত্যাদি এককোষী প্রোটিস্টান প্রাণী।

(খ) দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য (Bilateral symmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে তার কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর অনুদৈর্ঘ্যভাবে কেবল একবার মাত্র দুটি সমানভাগে (ডান ও বাম অংশ অর্থাৎ স্যাজিটাল তল) ভাগ করা যায়, তখন তাকে **দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য** বলে। এদের শ্রেণিতাত্ত্বিক ধাপ **বাইলেটেরিয়ায়** (Bilateria) স্থাপন করা হয়। এরা অঙ্গ সংগঠন মাত্রার ত্রিস্তরী প্রাণী।

উদাহরণ : Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda (*Periplaneta americana*), Echinodermata ও Chordata (*Homo sapiens*) পর্বের প্রাণী।



চিত্র ১.৩ : বিভিন্ন ধরনের প্রতিসাম্যতা

(গ) অরীয় প্রতিসাম্য (Radial symmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে কেন্দ্রীয় লম্ব অক্ষ বরাবর যেকোনো তলে কেটে দুইয়ের বেশি সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করা যায় তখন সেই ধরনের প্রতিসাম্যকে অরীয় প্রতিসাম্য বলে। এদের শ্রেণিতাত্ত্বিক ধাপ **রেডিয়াটায়** (Radiata) স্থাপন করা হয়। যেমন– Cnidaria (হাইড্রা, জেলিফিশ, সি অ্যানিমন ইত্যাদি) ও Echinodermata পর্বের অধিকাংশ প্রাণী। তবে জেলিফিশে **চতুরীয় প্রাতসাম্যতা** (tetramerism) এবং সমুদ্র তারা (sea stars), সমুদ্র আর্চিন (sea urchins), সমুদ্র লিলি (sea lilies) ইত্যাদি প্রাণীতে বিশেষ ধরনের **পঞ্চঅরীয় প্রতিসাম্যতা** (pentamerism) দেখা যায়।

(ঘ) দ্বি-অরীয় প্রতিসাম্য (Biradial symmetry) : যখন কোনো প্রাণিদেহকে উহার মৌখিক-পরাঙমৌখিক (oral-aboral) অক্ষ বরাবর দুটি তলে সমানভাবে বিভক্ত করা যায় তখন তাকে **দ্বি-অরীয় প্রতিসাম্য** বলে। যেমন– Ctenophora ও Anthozoa জাতীয় প্রাণীতে এ ধরনের প্রতিসাম্য দেখা যায়।

(ঙ) অপ্রতিসাম্য (Asymmetry) : যখন কোনো প্রাণিদেহকে অক্ষ বা দেহতল বরাবর কেটে সদৃশ্য সমান অংশে ভাগ করা যায় না তখন তাকে **অপ্রতিসাম্য** বলে। যেমন– *Pila globosa* (আপেল শামুক, Mollusca-Gastropod), *Cliona celata* (স্পঞ্জ, Porifera) ইত্যাদি।

2020/8/4 12:39

Scanned with CamScanner

৬। প্রান্তিকতা (Polarity) : **মস্তক ও মুখের অবস্থানের উপরে ভিত্তি করে প্রাণীর দেহের যে মেরুকরণ করা হয় তাকে প্রান্তিকতা বলে।** দেহের বিভিন্ন অঞ্চল বা দিকের নাম ও তল এই প্রান্তিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রাণীদের যে প্রান্তে মস্তক থাকে তাকে **সম্মুখ প্রান্ত** বা **অগ্রপ্রান্ত** (anterior end), মস্তকের বিপরীতে অবস্থিত প্রান্তকে **পশ্চাৎ প্রান্ত** (posterior end) বলে। আবার প্রাণীর যে প্রান্তে মুখছিদ্র থাকে তাকে **মৌখিক প্রান্ত** (oral end) এবং মুখের বিপরীত প্রান্তকে **পরাঙমুখ প্রান্ত** (aboral end) বলা হয়। প্রাণিদেহের উপরিভাগকে **পৃষ্ঠদেশ** (dorsal part) এবং তলদেশকে **অঙ্কদেশ** (ventral part) বলে এবং দেহের দুই পাশকে **পার্শ্বদেশ** (lateral part) বলে।

৭। দেহ অক্ষ ও তল (Body axes and plane) : প্রতিসম প্রাণীতে দেহ অক্ষ ও তল শ্রেণিকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। প্রতিসম প্রাণীতে দেহের কেন্দ্র বরাবর একটি সরলরেখা কল্পনা করা যায়, একে **দেহ অক্ষ** (body axis) বলে। দেহের যে অক্ষ মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে **অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ** (longitudinal axis) এবং দেহের যে অক্ষ আড়াআড়িভাবে অবস্থিত তাকে **অনুপ্রস্থ অক্ষ** (transverse axis) বলে। আবার দেহ অক্ষের সাথে সম্পর্ক রেখে প্রাণিদেহকে অঙ্গসংস্থানিকভাবে ছেদ করা যায়। একে **তল** (plane) বলে। অন্যভাবে, **যে অঞ্চল বরাবর প্রাণিদেহকে ডান ও বাম বা অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ বা সম্মুখ ও পশ্চাৎ অঞ্চল বরাবর দুভাগে ভাগ করা যায় তাকে তল বলা হয়।** প্রতিসম প্রাণীর দেহকে সাধারণত তিনটি তলে ভাগ করা যায়। যথা– মধ্যরেখীয় তল, সম্মুখ তল এবং অনুপ্রস্থ তল।



চিত্র ১.৪ : একটি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণিদেহের বিভিন্ন তল ও অক্ষ

(ক) মধ্যরেখীয় বা স্যাজিটাল তল (Median or Sagittal plane) : এই তল দেহকে সদৃশ ডান বা বাম অর্ধাংশে ভাগ করে। এতে অনুলম্ব ও পৃষ্ঠঅঙ্কীয় অক্ষ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(খ) সম্মুখ তল বা ফ্রন্টাল তল (Frontal plane) : একটি অনুলম্ব ও একটি অনুপ্রস্থ অক্ষসহ যেকোনো তল। এই কারণে এটি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণীর অঙ্কীয়দেশের সমান্তরাল।

(গ) অনুপ্রস্থ তল (Transverse plane) : এটি অনুলম্ব অক্ষের সমকোণে যেকোনো তল, এটি ফ্রন্টাল ও স্যাজিটাল তলের সমকোণে থাকে।

৮। খণ্ডকায়ন (Metamerism or Segmentation) : **সদৃশ দেহখণ্ডের রৈখিক বা অনুদৈর্ঘ্যিক পুনরাবৃত্তিকে খণ্ডকায়ন বা মেটামেরিজম বলে।** প্রতিটি খণ্ডককে **মেটামিয়ার** (metamere) বা **সোমাইট** (somite) বলে। প্রাণীরা বিভিন্ন ধরনের খণ্ডকায়ন বিশিষ্ট হতে পারে, যেমন–

(ক) সমখণ্ডকায়ন বিশিষ্ট বা হোমোনোমাস (Homonomous metamere) : যেসব প্রাণীর দেহখণ্ডকগুলো সদৃশ্য বা একই ধরনের হয়, তাদের সমখণ্ডকায়ন বিশিষ্ট বা হোমোনোমাস বলে। যেমন– কেঁচো, জোঁক ইত্যাদির খণ্ডকায়ন।

(খ) অসমখণ্ডকায়ন বিশিষ্ট বা হেটেরোনোমাস (Heteronomous metamere) : যেসব প্রাণীর দেহখণ্ডকগুলো অসদৃশ্য বা ভিন্ন ধরনের হয়, তাদের অসমখণ্ডকায়ন বিশিষ্ট বা হেটেরোনোমাস বলে। যেমন– পতঙ্গ শ্রেণির খণ্ডকায়ন (আরশোলা)।

(গ) খণ্ডকায়নবিহীন (Asegmental) : এ জাতীয় প্রাণীদের কোনো খণ্ডকায়ন থাকে না। যেমন– ঝিনুক, সমুদ্রতারা ইত্যাদি।

প্রকৃত খণ্ডকায়িত প্রাণী বলতে Annelida পর্বের (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন খণ্ডকায়ন দেখা যায়) অন্তর্গত প্রাণীদের বুঝালেও Arthropoda (বাহ্যিক খণ্ডকায়ন দেখা যায়) এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীরা (অভ্যন্তরীন খণ্ডকায়ন দেখা যায়) খণ্ডকায়িত প্রাণীর আওতায় পড়ে। কিন্তু Cestod (ফিতাকৃমি) জাতীয় প্রাণিদেহে **অপ্রকৃত মেটামেরিজম বা অপ্রকৃত খণ্ডয়ান** দেখা যায়। সরল থেকে জটিল সংগঠনযুক্ত প্রাণীর বিবর্তনে খণ্ডকায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

2020/8/4 12:39

Scanned with CamScanner

৯। সিলোম (Coelom) : প্রাণিদেহের পৌষ্টিকনালি ও দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে দেহগহ্বর বলে। ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা আবৃত দেহগহ্বরকে সিলোম বলে। Mollusca থেকে শুরু করে Chordata পর্বভুক্ত প্রাণী পর্যন্ত সিলোম ধারণ করে। সিলোমের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি ও প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে প্রাণীদের নিম্নোক্ত গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়।

(ক) অ্যাসিলোমেট (Acoelomate) : যেসব প্রাণীর দেহে কোনো সিলোম থাকে না তাদের **অ্যাসিলোমেট** বলে। ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় অন্তঃস্থ ফাঁকা স্থানটি অর্থাৎ ব্লাস্টোসিল মেসোডার্মাল স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা (spongy parenchyma) কোষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। পরিণত প্রাণীতে দেহগহ্বর মেসেনকাইম ও পেশি দ্বারা পূর্ণ থাকে। যেমন : Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemertea প্রভৃতি পর্বভুক্ত প্রাণী।

(খ) অপ্রকৃত সিলোমেট বা স্যুডোসিলোমেট (Pseudocoelomate) : যেসব প্রাণীর দেহে দেহগহ্বর মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত নয় তাদের **অপ্রকৃত সিলোমেট** বা **ভুয়া** বা **ছদ্মভ্রান্ত** সিলোমেট বলে। ভ্রূণীয় অবস্থায় এসব প্রাণীর ব্লাস্টোসিলের বহির্ভাগ মেসোডার্মাল কোষ দ্বারা আবৃত থাকে কিন্তু পরিণত প্রাণীতে দেহগহ্বর মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে না। দেহগহ্বরের চারদিকে পেশিস্তর বিদ্যমান থাকে। যেমন– Nematoda, Acanthocephala, Rotifera, Entoprocta, Kinorhyncha পর্বভুক্ত প্রাণী।



চিত্র ১.৫ : বিভিন্ন ধরনের সিলোম

(গ) প্রকৃত সিলোমেট বা ইউসিলোমেট (Eucoelomate) : যেসব প্রাণীর দেহগহ্বর মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত, পেরিটোনিয়াম স্তরে আবৃত থাকে তাকে **প্রকৃত সিলোমেট** বলে। এক্ষেত্রে দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিকনালি সংলগ্ন আবরণীকে যথাক্রমে প্যারাইটাল ও ভিসেরাল আবরণী বলে। প্রকৃত সিলোমেটদের অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণী মনে করা হয়। যেমন– Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata, Chordata পর্বভুক্ত প্রাণী। যখন প্রাণীদের প্রকৃত দেহগহ্বরটি রক্তপূর্ণ থাকে তখন তাকে **হিমোসিল** (haemocoel) বলে এবং প্রাণীদের **হিমোসিলোমেট** (haemocoelomate) বলে। যেমন– Mollusca ও Arthropoda পর্বভুক্ত প্রাণী।

সিলোমের গুরুত্ব : বিভিন্ন প্রাণিদেহে সিলোমের গুরুত্বও বিভিন্ন– (১) ইহা দেহপ্রাচীরকে পৌষ্টিকনালি থেকে পৃথক করে; (২) দেহের অভ্যন্তরের অঙ্গগুলোকে ধারণ করে; (৩) অঙ্গ বা অঙ্গাংশ বর্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সরবরাহ করে; (৪) সংবহন, বর্জ্য পদার্থ ধারণ ও নিষ্কাশনে সাহায্য করে; (৫) সিলোম রক্ত সংবহনতন্ত্রের পরিস্ফুটন ঘটায়; (৬) কেঁচোতে এটি হাইড্রোস্ট্যাটিক কঙ্কাল হিসেবে কাজ করে।

❑ **কাজ :** (i) অ্যাসিলোমেট, সিউডোসিলোমেট এবং ইউসিলোমেট প্রাণিদের মধ্যে কোনটি অপেক্ষকৃত উন্নত প্রাণী? তোমার মতামত দাও। (ii) সিলোমের বিভিন্নতার ভিত্তিতে রুই মাছ, গোলকৃমি ও ফিতাকৃমি প্রাণীদের কারণসহ গোষ্ঠীভুক্ত কর। (iii) ফিতাকৃমি, গোলকৃমি এবং কেঁচো–প্রাণীদের বিশেষ ধরনের গহ্বরের উপস্থিতি ও গঠনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। (iv) সিলোমবিহীন এবং সিলোমযুক্ত প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য লিখ। (v) সিউডোসিলোমেট প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য লিখ।

১০। অঞ্চলায়ন (Tagmatization) : কিছু প্রাণিদেহ বাহ্যিকভাবে খণ্ডায়িত হলেও অনেকক্ষেত্রে খণ্ডগুলো স্পষ্ট নয়; বরং খণ্ডকগুলো একত্রে মিলিত হয়ে দেহে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল বা ট্যাগমা (tagma; pl. tagmata)**-য় বিভক্ত হয়। এ ধরনের বিভাজনকে অঞ্চলায়ন বা ট্যাগমাটাইজেশন বলে।** Arthropoda প্রাণীদের দেহে এরূপ বিভাজন দেখা যায় এবং এদের শ্রেণিবিন্যাসে অঞ্চলায়নের গুরুত্ব রয়েছে। যেমন– Insecta শ্রেণির প্রাণীদের(ঘাসফড়িং, আরশোলা, মৌমাছি ইত্যাদি) দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর এই তিনটি ট্যাগমায় এবং Crustacea শ্রেণির প্রাণীদের (চিংড়ি) মস্তক ও বক্ষ মিলে **শিরোবক্ষ** (cephalothorax) ও **উদর** (abdomen) এই দুটি ট্যাগমায় বিভক্ত। অ্যারাকনিড (মাকড়শা) জাতীয় প্রাণিদেহের খণ্ডগুলো মিলিত হয়ে **প্রোসোমা** (prosoma) ও **অপিসথোসোমা** (opisthosoma) নামক দুটি ট্যাগমা গঠন করে। যে বিবর্তনিক প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে অঞ্চলায়ন সম্পন্ন হয় তাকে **ট্যাগমোসিস** (tagmosis) বলা হয়।

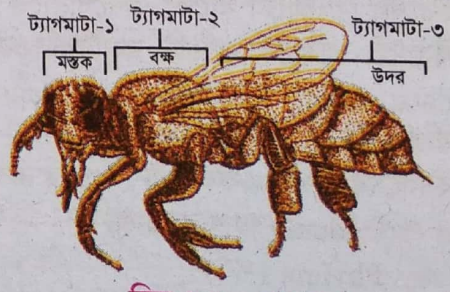

চিত্র ১.৬ : খণ্ডায়ন

2020/8/4 12:39
Scanned with CamScanner

১১। নটোকর্ড (Notochord) : **ভ্রূণাবস্থায় বা আজীবন দেহের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত কিছুটা নমনীয়, স্থিতিস্থাপক ও ছিদ্রযুক্ত টিস্যুর দণ্ডকে নটোকর্ড বলে।** যেসব প্রাণীতে নটোকর্ড থাকে তাকে **কর্ডেট প্রাণী** বলে। নটোকর্ডের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগৎকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

(ক) নন-কর্ডেট (Nonchordate) : যেসব প্রাণীর দেহে নটোকর্ড অনুপস্থিত থাকে তাদের নন-কর্ডেট বলে। যেমন– Porifera থেকে Echinodermata পর্বের সকল প্রাণী এর অন্তর্ভুক্ত।

(খ) কর্ডেট (Chordate) : যেসব প্রাণীর দেহে নটোকর্ড উপস্থিত থাকে তাদের কর্ডেট বলে। যেমন– Chordata পর্বের সকল প্রাণী।

১২। জীবন পদ্ধতি (Way of living) : জীবন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রাণীদের প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

(ক) স্বাধীনজীবী বা মুক্তজীবী (Free living) : এরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বা সাহচার্য ছাড়াই বাস করে। যেমন– *Copsychus saularis* (দোয়েল), *Columba livia* (কবুতর)।

(খ) পরজীবী (Parasite) : এরা অন্য প্রাণিদেহে আশ্রয় গ্রহণ করে খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে। যেমন–*Ascaris lumbricoides* (গোলকৃমি), *Fasciola hepatica* (চ্যাপ্টা কৃমি)।

১৩। পৌষ্টিকনালি (Alimentary canal)

পরিপাকনালি বা পৌষ্টিকনালির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণীদের ২ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

(ক) প্যারাজোয়া (Parazoa) : যেসব প্রাণীতে পরিপাকনালি নেই তাদের প্যারাজোয়া বলে। যেমন– Porifera পর্বভুক্ত প্রাণী।

(খ) এন্টেরোজোয়া (Enterozoa) : যেসব প্রাণীতে পরিপাকনালি আছে তাদের এন্টেরোজোয়া বলে। যেমন– Cnidaria থেকে Chordata পর্ব পর্যন্ত সকল প্রাণী।

১৪। পুষ্টি পদ্ধতি (Nutrition) : পুষ্টি পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রাণীদের দুটি শ্রেণিভুক্ত করা হয়, যেমন–

(ক) অটোট্রফ (Autotroph) : যেসব প্রাণী নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে তাদের অটোট্রফ বলে।

(খ) হিটারোট্রফ (Heterotroph): যেসব প্রাণী নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে না অর্থাৎ পুষ্টির জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় তাদের হিটারোট্রফ বলা হয়।

১৫। উপাঙ্গ (Appendages) : উপাঙ্গ বলতে প্রাণিদেহের এমন উদগত বাহ্যিক ও নড়নক্ষম অংশ (protruding parts) বুঝায় যা দেহের সাথে সংযুক্ত থেকে চলন, খাদ্যগ্রহণ ও অন্যান্য কাজে সহায়তা করে। প্রাণিদেহে বিভিন্ন ধরনের উপাঙ্গ থাকে যেগুলো শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রাণিদেহের (অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণী) বিভিন্ন ধরনের উপাঙ্গসমূহ: ক্ষণপদ, ফ্ল্যাজেলা ও সিলিয়া- Protozoan প্রাণীদের; কর্ষিকা- Cnidaria পর্বের প্রাণীদের; মাংসল পদ ও কর্ষিকা - Mollusca পর্বের প্রাণীদের; সিটিসহ প্যারাপোডিয়া- Annelida পর্বের প্রাণীদের; অ্যান্টেনা, ম্যাক্সিলিপেড, সন্ধিযুক্ত পদ, ডানা, স্টাইল, সিরি, টেলসন ইত্যাদি- Arthropoda পর্বের প্রাণীদের; নালিপদ- Echinodermata পর্বের প্রাণীদের এবং হাত, পা, পাখনা, ডানা ইত্যাদি- Chordata পর্বের প্রাণীদের। শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে এসব উপাঙ্গের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের নীতি (Principles of Animal Classification)

১। শ্রেণিবিন্যাসের স্তর বা ধাপসমূহ (Taxonomic Categories) : শ্রেণিবদ্ধ করার সময় প্রাণীদের বিভিন্ন স্তরে বা ধাপে স্থাপন করা হয়। এসব স্তর বা ধাপকে **শ্রেণিবিন্যাস স্তর** বা **ধাপ** বা **ক্যাটাগরি** বলে। যেসব প্রাণীকে শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধাপে বা স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেসব প্রাণীকে **ট্যাক্সন** বলে (বহুবচনে– taxa)। অর্থাৎ শ্রেণিকরণের যেকোনো ধাপের জনগোষ্ঠীকে ট্যাক্সন বলা হয়। ট্যাক্সন হলো শ্রেণিবদ্ধগত একক (taxonomic unit)। **শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত প্রতিটি ক্যাটাগরিভুক্ত জনগোষ্ঠীকে একেকটি ট্যাক্সন** (taxon) **বলে**। যেমন– Animalia, Chordata, Mammalia, Primates, Hominidae, *Homo* একেকটি ট্যাক্সন। প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য কিছুটা পরিবর্তনসহ লিনিয়াস কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন ধাপ ব্যবহৃত হয়।

শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান একক ৭টি। এদের ক্রমবিন্যাস নিম্নরূপ :

১. Kingdom (জগৎ বা রাজ্য) ---------- K
২. Phylum (পর্ব) ---------- P
৩. Class (শ্রেণি) ---------- C
৪. Order (বর্গ) ---------- O
৫. Family (গোত্র) ---------- F
৬. Genus (গণ) ---------- G
৭. Species (প্রজাতি) ---------- Sp.

2020/8/4 12:40

Scanned with CamScanner

১। প্রজাতি (Species) : জীবের শ্রেণিবিন্যাসের সর্বনিম্ন এবং কার্যকরী একক হলো প্রজাতি। প্রজাতি বলতে এমন একটি জীবগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা ভৌগোলিক ও পরিবেশগত কারণে পৃথক থাকলেও পরস্পর যৌন মিলন দ্বারা প্রজননক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। যেমন– কবুতরের একটি প্রজাতি হলো *Columba livia*।

২। গণ (Genus) : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি প্রজাতি নিয়ে গঠিত হয় গণ। গণ নির্ধারণে ক্রোমোজোমের সংখ্যা, আকার, আকৃতি, প্রকার ইত্যাদি ভূমিকা রাখে। এর বৈশিষ্ট্যগুলো অভিযোজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। জীবের গণের বিস্তার এক বা একাধিক অঞ্চলে হতে পারে। যেমন– কবুতরের গণ হলো *Columba*।

৩। গোত্র (Family) : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি গণ নিয়ে গঠিত হয় গোত্র। এর বিস্তার বিশ্বব্যাপী। যেমন– মানুষ Hominidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

৪। বর্গ (Order) : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি গোত্র নিয়ে গঠিত হয় বর্গ। এর বিস্তার বিশ্বব্যাপী। যেমন– গিনিপিগ Rodentia বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

৫। শ্রেণি (Class) : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি বর্গ নিয়ে গঠিত হয় শ্রেণি। প্রাণীর শ্রেণিকরণ নির্ভর করে দেহের অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য, অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য, অভিব্যক্তিক ধারা ইত্যাদির উপর। যেমন– মানুষ Mammalia শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

৬। পর্ব (Phylum) : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি শ্রেণি নিয়ে গঠিত হয় পর্ব। এটি শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে বড় একক। প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসে একটি পর্ব থেকে অন্য পর্ব সুস্পষ্ট পার্থক্য দ্বারা পৃথক থাকে। যেমন– গিনিপিগ Chordata পর্বের অন্তর্ভুক্ত।

৭। রাজ্য (Kingdom) : জীবের শ্রেণিবিন্যাসের সর্বোচ্চ একক হলো রাজ্য। প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের এ ধাপটিতে পৃথিবীর সকল প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মানুষের ৭ ক্যাটাগরি বিশিষ্ট ট্যাক্সোনোমিক হায়ারার্কি ও ট্যাক্সনগুলো নিম্নরূপ :

ক্যাটাগরি	ট্যাক্সন
1. Kingdom (জগৎ বা রাজ্য)	Animalia
2. Phylum (পর্ব)	Chordata
3. Class (শ্রেণি)	Mammalia
4. Order (বর্গ)	Primates
5. Family (গোত্র)	Hominidae
6. Genus (গণ)	*Homo*
7. Species (প্রজাতি)	*Homo sapiens*

ক্যারোলাস লিনিয়াস প্রবর্তিত এই সাত স্তরবিশিষ্ট অনুক্রমিক শ্রেণিবিভাগ স্তর কাঠামোকে শ্রেণিবিভাগ নিয়ামক বা লিনিয়ান হায়ারার্কি (Linnaean Hierarchy) **বলে**। নামকরণের নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান একক বা স্তর সাতটি। প্রয়োজন হলে একক বৃদ্ধি করা যেতে পারে। কোনো প্রধান এককের উপর-নিচে নতুন এককের প্রয়োজন হলে প্রধান এককের আগে **অধি** (super) এবং পরে **উপ** (sub) যোগ করতে হবে। যেমন– **অধিশ্রেণি** (superclass) ও **উপশ্রেণি** (subclass)।

Simpson (1961) ২১টি ক্যাটাগরি বা স্তর নিয়ে হায়ারার্কি প্রবর্তন করেন। বিজ্ঞানী **Simpson** প্রদত্ত আধুনিক হায়ারার্কি নিম্নরূপ–

1. Kingdom (জগৎ বা রাজ্য)	12. Infra Order (অন্তঃবর্গ)
2. Phylum (পর্ব)	13. Super Family (অধিগোত্র)
3. Sub-Phylum (উপপর্ব)	14. Family (গোত্র)
4. Super Class (অধিশ্রেণি)	15. Sub-Family (উপগোত্র)
5. Class (শ্রেণি)	16. Tribe (জাতি)
6. Sub-Class (উপ-শ্রেণি)	17. Sub-Tribe (উপজাতি)
7. Infra Class (অন্তঃশ্রেণি)	18. Genus (গণ)
8. Cohort (কোহর্ট)	19. Sub- Genus (উপগণ)
9. Super Order (অধিবর্গ)	20. Species (প্রজাতি)
10. Order (বর্গ)	21.Sub-Species (উপপ্রজাতি)
11. Sub-Order (উপবর্গ)	

2020/8/4 12:40

Scanned with CamScanner

২। প্রাণীর প্রজাতি ও উপপ্রজাতি (Species and Sub-species) :

❐ **প্রজাতি :** প্রাণী শ্রেণিবিন্যাস স্তরের সর্বনিম্ন ধাপ ও মৌলিক একক হলো **প্রজাতি**। John Ray (১৬৮৬) সর্বপ্রথম প্রজাতি বা Species শব্দটি ব্যবহার করেন। এখানে প্রজাতির দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো–

(ক) প্রজাতি হলো সর্বাধিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিলসম্পন্ন একদল প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী, যারা নিজেদের মধ্যে যৌন প্রজননের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপন্ন করে।

(খ) প্রজাতি হলো প্রাকৃতিক পরিবেশে অন্তঃপ্রজননক্ষম জীবকুল, যারা অন্যান্য জীব থেকে জননঘটিত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

❐ **উপপ্রজাতি :** বৈসাদৃশ্যযুক্ত যেসব জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশন আন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে জিনের আদান-প্রদান ঘটাতে সক্ষম তাদের একই প্রজাতির উপপ্রজাতি বলা হয়। পূর্বে উপপ্রজাতি ভ্যারাইটি নামে গণ্য হতো। বহিরাকৃতির দিক দিয়ে উপপ্রজাতিগুলো পৃথক হওয়ায় তাদের শনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না। সাধারণত উপপ্রজাতিভুক্ত জীবগোষ্ঠীগুলো আলাদা ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে ও সেক্ষেত্রে ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোকে একত্রে প্রজাতির বিস্তার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩। প্রাণীদের নামকরণ (Nomenclature) : পৃথিবীতে হাজার হাজার প্রাণী রয়েছে। একটি প্রাণীকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়। এতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে জটিলতা দেখা দেয়। এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য প্রাণীর নামকরণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। **কোনো বিশেষ প্রাণীকে শনাক্তকরণের জন্য শ্রেণিবিন্যাসের কিছু নিয়মকানুন ও পদ্ধতি অনুসারে (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি) প্রাণীর প্রতিটি প্রজাতির যে বিশেষ নাম প্রদান করা হয় তাকে নামকরণ** (nomenclature) **বলে**। প্রাণীর নামকরণ দুই প্রকার, যেমন–

(ক) দ্বিপদ নামকরণ (Binomial Nomenclature) : জীবের নামকরণের আন্তর্জাতিক প্রথা অনুসারে প্রথমে গণের নাম এবং পরে প্রজাতির নাম ব্যবহার করে প্রাণীদের যে নামকরণ করা হয় তাকে দ্বিপদ নামকরণ বলা হয়। দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি অনুসারে প্রদত্ত নামকে **বৈজ্ঞানিক নাম** (scientific name) বলা হয়। সুইডিশ শ্রেণিতত্ত্ববিদ **Carolus Linnaeus**, 1758 খ্রিষ্টাব্দে দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। দ্বিপদ নামকরণের নিয়মানুযায়ী মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *Homo sapiens* L.। এখানে *Homo* গণ, *sapiens* প্রজাতি নামের নির্দেশক এবং L. লিনিয়াসের নামের আদ্যাক্ষর।

(খ) ত্রিপদ নামকরণ (Tri-nomial Nomenclature) : জীবের নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী গণ, প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি নামের তিনটি পদ ব্যবহার করে জীবের যে নামকরণ করা হয় তাকে ত্রিপদ নামকরণ বলা হয়। প্রাণীর উপপ্রজাতির নামকরণ করা হয় ত্রিপদ নামকরণের নিয়মানুযায়ী। উদাহরণস্বরূপ : যেমন– গোখরা সাপের বৈজ্ঞানিক নাম *Naja naja*; এর দুটি উপপ্রজাতি হলো– *Naja naja naja* (গোখরা) ও *Naja naja hannah* (জাতি সাপ)। জার্মান অর্নিথোলজিস্ট **Hermann Schlegel** (1844) সর্বপ্রথম প্রাণীর ত্রিপদ নামকরণ প্রবর্তন করেন। ত্রিপদ নামকরণ ICZN কর্তৃক স্বীকৃত।

❐ **প্রাণীর নামকরণের নিয়মাবলি (Rules of Nomenclature) :** বিজ্ঞানী Carolus Linnaeus (1753) সর্বপ্রথম তাঁর গ্রন্থ Species Plantarum -এ দ্বিপদ নামকরণের ধারণা প্রদান করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর Systema Naturae নামক পুস্তকের দশম সংস্করণে (1758) প্রাণীর দ্বিপদ নামকরণের নীতিমালা প্রণয়ন করেন। প্রাণীর নামকরণের নিয়মগুলো ICZN (International Commission on Zoological Nomenclature) প্রণয়ন করে থাকে এবং এ নিয়মগুলো ICZN (International Code of Zoological Nomenclature)-এ লিপিবদ্ধ করে থাকে। ICZN (International Commission on Zoological Nomenclature) কর্তৃক প্রাণীর নামকরণের কয়েকটি নিয়মাবলি হলো:

১। প্রতিটি প্রাণীর একটি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নাম থাকবে, কখনোই একই নাম দুটি প্রাণীর ক্ষেত্রে কিংবা দুটি নাম একটি প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

২। প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম দুটি অংশ নিয়ে (দ্বিপদ নামকরণের ক্ষেত্রে) বা ক্ষেত্রবিশেষে তিনটি অংশ নিয়ে (ত্রিপদ নামকরণের ক্ষেত্রে) গঠিত হবে। এই অংশগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম অংশটি **গণ**, দ্বিতীয় অংশটি **প্রজাতি** এবং তৃতীয় অংশটি **উপপ্রজাতি** নির্দেশক।

৩। প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামকরণ অবশ্যই **ল্যাটিন** বা **ল্যাটিনকৃত** হতে হবে।

৪। দ্বিপদ নামের গণ অংশটি **বিশেষ্য** (noun) যার প্রথম অক্ষরটি ইংরেজি **বড় হরফে** (capital letter) এবং প্রজাতি অংশটি **বিশেষণ** (adjective) যার প্রথম অক্ষরসহ সবটুকু অংশ ইংরেজি **ছোট হরফে** (small letter) লিখতে হবে। যেমন– *Homo sapiens*.

2020/8/4 12:40

Scanned with CamScanner

৫। বৈজ্ঞানিক নাম ছাপা অক্ষরে সর্বদা **ইটালিক** (italic type) হরফে (ডান দিকে বাঁকা) লিখতে হবে। যেমন– *Homo sapiens*.

৬। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রপত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নামই স্বীকৃতি পাবে।

৭। হাতে লেখার সময় গণ ও প্রজাতিক নামের নিচে আলাদা আলাদা দাগ দিতে হবে। যেমন– Homo sapiens (উল্লেখ্য, শুধু গণের নাম লিখলেও নিচে **দাগ** দিতে হবে। যেমন– Homo)।

৮। যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম কোনো জীবের বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা দেবেন, তাঁর নাম এবং প্রকাশনার সাল উক্ত জীবের বৈজ্ঞানিক নামের শেষে সংযোজিত হবে। যেমন– *Homo sapiens* Linnaeus, 1758।

৯। যদি কোনো জীবের একাধিক নাম থেকে থাকে বা একাধিক জীবের নাম একই হয়ে থাকে তবে সর্বপ্রথম দেওয়া সিদ্ধ নামটি গৃহীত হবে। একে **অগ্রাধিকার আইন** (Law of priority) বলে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াসের 'Systema Naturae' নামক বইয়ের দশম সংস্করণের (1753) পূর্বের কোনো নাম গ্রহণযোগ্য হবে না।

১০। কোনো প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নামের পরিবর্তন বা সংশোধন করা হলে প্রথম নাম প্রদানকারীর নাম ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে হবে এবং নতুন নাম প্রদানকারীর নাম ব্র্যাকেটের পর থাকবে। যেমন– *Albizzia lebbeck* (Linn.) Benth.

১১। কোনো প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামের গণ ও প্রজাতি অংশের নাম একই হতে পারে। যেমন– *Loa loa*। এ অবস্থাকে tautonym বলে।

১২। নামকরণের সময় যে প্রাণীকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হবে তাকে **টাইপ স্পেসিমেন** (type specimen) হিসেবে গবেষণাগারে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। অগ্রাধিকার আইন-হোমোনিম ও সিনোনিম (Law of Priority- Homonym and Synonym) : জীবের নামকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি অতি বিতর্কমূলক অংশ। কিন্তু এটি আন্তর্জাতিক নামকরণবিধির (ICBN ও ICZN) প্রাথমিক সূত্র (priority law) যা এই বিধির স্থায়িত্ব বজায় রাখে। যখন একই ট্যাক্সনের অন্তর্গত দুটি জীবের একই নামের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তখন কোনো একটি নামের বৈধতাসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হয় **'অগ্রাধিকার সূত্র'** (Priority law) দ্বারা।

কোনো একটি জীবের অনেকগুলো নাম গবেষণাপত্রে বা জার্নালে প্রকাশিত হতে পারে, কারণ একাধিক বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে নানা রকম নাম প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকটি প্রজাতির একটি মাত্র বৈজ্ঞানিক বৈধ নাম থাকে। একটি প্রজাতির একাধিক নামের মধ্যে কোনটি বৈধ নাম তা ঠিক করা হয় অগ্রাধিকার আইন অনুযায়ী অগ্রাধিকার আইন অনুসারে গোত্র বা গোত্রের নিচের ট্যাক্সনের বৈধ নাম নির্বাচন করা হয়। এই ক্ষেত্রে একটি জীবের একাধিক নামের মধ্যে ICBN ও ICZN-এর নিয়ম মেনে যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম নাম প্রকাশ করেন সেই নামটি বৈধ বলে গণ্য হয়। অবশিষ্ট নামগুলো বাতিল করা হয়।

❐ **হোমোনিম** (Homonym) : একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দুটি পৃথক জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণী) যদি একই নামকরণ করা হয় এবং নামের বানান ও উচ্চারণ যদি একই হয়, তবে তাদের **হোমোনিম** বা সমনাম বলে। প্রথম দেওয়া নামটি (সিনিয়র হোমোনিম) বৈধ বলে গণ্য হবে এবং পরে দেওয়া নামটিকে (জুনিয়র হোমোনিম) পরিবর্তন করা হয়। যেমন- *Noctua variegata* নামে পাখি ও পতঙ্গ বর্তমান। এই দুটি হলো হোমোনিম এবং আন্তর্জাতিক নিয়মে স্বীকৃত নয়।

❐ **সিনোনিম** (Synonym) : একই প্রজাতির জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণী) অনেকগুলো নাম থাকলে বৈধ বা স্বীকৃত নাম ছাড়া অন্যসব নামকে **সিনোনিম** বা প্রতিনাম বলে। আগে প্রকাশিত সিনোনিমকে **সিনিয়র সিনোনিম** এবং পরে প্রকাশিত সিনোনিমকে **জুনিয়র সিনোনিম** বলা হয়। যেমন- *Tenualosa ilisha* হলো ইলিশ মাছের বৈধ নাম এবং সিনোনিম হলো- *Clupanodon ilisha*/*Clupea ilisha*/*Hilsa ilisha* প্রভৃতি।
অগ্রাধিকার আইন অনুযায়ী কেবল সিনিয়র হোমোনিম এবং সিনিয়র সিনোনিম বৈধ নাম হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫। প্রামাণ্য দলিল সংরক্ষণ (Documentation) : কোনো জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণীর) নমুনা সংগ্রহ করে সেটিকে নির্দিষ্ট শ্রেণিবিন্যাস করার পর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের শনাক্তকরণ, নামকরণ ও গবেষণার সুবিধার জন্য সংরক্ষণশালায় সংরক্ষিত করে রাখার প্রয়োজন।

❐ **সংক্ষেপে শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান নীতিগুলো হলো :**
(১) শ্রেণিবিন্যাস করতে হলে ট্যাক্সনকে ক্রমান্বয়ে **ক্যাটাগরি** বা র‍্যাংকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (২) প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত ট্যাক্সনের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যাবলির উল্লেখ করতে হবে। (৩) প্রতিটি ট্যাক্সনের বৈজ্ঞানিক নাম থাকতে হবে। ICZN-এর নিয়মাবলি অনুসরণ করে সুষ্ঠুভাবে নামকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। (৪) শ্রেণিবিন্যস্ত নমুনা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। (৫) বিভিন্ন প্রাণিগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য প্রাণীর সাথে তুলনামূলক বর্ণনা থাকতে হবে।

2020/8/4 12:40

Scanned with CamScanner

১.৩ প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Animal Classification)

তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয় জীববিজ্ঞানেই শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিচে শ্রেণিবিন্যাসের কয়েকটি প্রধান প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হলো।

❑ তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা

(১) শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে কোনো প্রাণিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলে ঐ গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। (২) কম পরিশ্রম ও অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণিজগতের অনেক সদস্য সম্পর্কে জানা ও শেখা যায়। (৩) প্রাণিকুলের পারস্পরিক সম্পর্ক বা জাতিজনির বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। (৪) প্রাণিকুলের বিবর্তনিক ধারা নির্ণয়ে সাহায্য করে। (৫) নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতে শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য। (৬) প্রাণীর বাস্তুজগতের খুঁটিনাটি জানা যায়।

❑ ফলিত প্রয়োজনীয়তা

(১) জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও বনের ক্ষতিকর প্রজাতি দমনের উদ্দেশ্যে শ্রেণিবিন্যাস নির্দিষ্ট প্রজাতির সঠিক পরিচয় দান করে। (২) অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রাণী বাছাই করা যায়। (৩) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাহায্য করে। (৪) ভূতত্ত্বীয় ঘটনাবলির নিখুঁত চিত্র তুলে ধরতে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্য প্রয়োজন। (৫) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের পশুপাখি উদ্ভাবন সহজতর হয়।

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Animal Kingdom)

বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে বাস করে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় প্রাণী। পৃথিবীতে সব প্রাণীকে নিয়ে গঠিত হয়েছে **প্রাণিজগৎ** (Animal Kingdom)। এসব প্রাণীদের আকার, প্রকৃতি, বর্ণ, স্বভাব, বাসস্থান, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অভ্যন্তরীণ গঠন, খাদ্যাভ্যাস, জনন প্রক্রিয়া ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

বিজ্ঞানী **হেকেল** (Haeckel, 1873) সমগ্র প্রাণিজগৎকে **প্রোটোজোয়া** (Protozoa) ও **মেটাজোয়া** (Metazoa) এই দুই ভাগে ভাগ করেন। বহু বছর ধরে **Protozoa**-কে পর্বের মর্যাদা দেওয়া হতো, 1969 সালে **আর.এইচ. হুইটটেকার** (R.H. Whittaker) জীবের **৫ রাজ্য শ্রেণিবিন্যাস** করেন। রাজ্যগুলো হলো–

(১) **Monera**, (২) **Protista**, (৩) **Fungi**, ৪. **Plantae** ও (৫) **Animalia**.

এই শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল মনেরা **(Monera)** রাজ্যের, **Protozoan**-দের প্রোটিস্টা রাজ্যের সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়। নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার পর্দাবিহীন সকল এককোষী, ফিলামেন্টাস জীব মনেরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। নিউক্লিয়ার আবরণীযুক্ত কলাবিহীন সকল এককোষী বা বহুকোষী জীব **প্রোটিস্টা** (Protista) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– শৈবাল, স্লাইমমোল্ড, প্রোটোজোয়ান জীব। সকল ছত্রাক **ফানজাই** (Fungi) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সকল উদ্ভিদ **প্ল্যান্টি** (Plantae) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সকল **বহুকোষী প্রাণী** (Metazoa) যারা খাদ্য গলাধঃকরণ করে ও অভ্যন্তরীণভাবে পরিপাক করে এবং কিছু পরজীবী যারা শোষণের মাধ্যমে পুষ্টি সংগ্রহ করে তাদের রাজ্য **অ্যানিম্যালিয়া** (Kingdom-Animalia)-তে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রাণিজগতের সদস্যদের বর্তমানে প্রায় ৩৩টি পর্বের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই পর্বগুলোকে সাধারণভাবে **Major phyla** ও **Minor phyla** এই দুটি দলে বিভক্ত করা হয়।

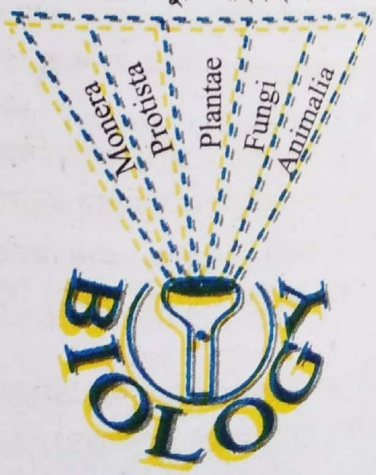

জীবজগতের পাঁচ রাজ্য

যেসব পর্বের প্রজাতি সংখ্যা বেশি, প্রজাতির সদস্যরা বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সুস্পষ্টভাবে পর্ব হিসেবে পৃথক সত্তার অধিকারী সেসব পর্বকে **Major phyla** বা **মুখ্য পর্ব** বা **প্রধান পর্ব** বলে।

আবার সেসব পর্বে প্রজাতি সংখ্যা নগণ্য, প্রজাতির সদস্যদের বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব নেই বললেই চলে এবং শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান অস্পষ্ট অথবা জাতিজনিক সম্পর্ক বিতর্কিত, সেসব পর্বকে **Minor phyla** বা **গৌণ পর্ব** বা **মিসেলেনিয়াস পর্ব** বলা হয়।

Hickman *et al.* (2017) অনুসারে প্রাণিজগতে সর্বমোট ৩৩টি পর্ব রয়েছে। প্রায় ১৩,৪৮০০০ প্রজাতির জীবিত প্রাণী এ পর্বগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ প্রজাতি মাত্র ৯টি পর্বের অন্তর্ভুক্ত। যেসব পর্বে প্রজাতির সংখ্যা বেশি সেসব পর্বকে **মেজর পর্ব** (major phyla) এবং যেসব পর্বে প্রজাতির সংখ্যা কম সেগুলোকে **মাইনর পর্ব** (minor phyla) বলে।

2020/8/4 12:40

Scanned with CamScanner

Hickman *et al.* (2017) রচিত INTEGRATED PRINCIPLES OF ZOOLOGY পুস্তকের বর্ণনা অনুযায়ী বহুকোষী প্রাণীদের পর্বসমূহ নিম্নরূপ–

রাজ্য ও উপরাজ্য	শাখা	পর্ব
Kingdom-ANIMALIA Subkingdom-**Metazoa**	Branch A : Mesozoa	কিছু কোষবিশিষ্ট বহুকোষী প্রাণী। এদের দেহে কোনো কলা বা অঙ্গ গঠিত হয় না। 1. Mesozoa
	Branch B : Parazoa	অসংখ্য কোষবিশিষ্ট বহুকোষী প্রাণী। এদের দেহে কোনো কলা বা অঙ্গ গঠিত হয় না। ***2. Porifera** 3. Placozoa
	Branch C : Eumetazoa	প্রকৃত বহুকোষী প্রাণী। এদের দেহে কলা অঙ্গ ও তন্ত্র গঠিত হয়।
	Grade-I : Radiata :	দ্বিস্তরী অরীয় প্রতিসম প্রাণী। এদের দেহে কলা গঠিত হয় কিন্তু এদের দেহে কোনো অঙ্গ ও তন্ত্র গঠিত হয় না। ***4. Cnidaria** 5. Ctenophora.
	Grade-II : Bilateria : Group-I : Acoelomata **(সিলোমবিহীন প্রাণী)**	ত্রিস্তরী দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণী। এদের দেহে কলা এবং অঙ্গ ও তন্ত্র গঠিত হয়। ***6. Platyhelminthes**,7. Gnathostomulida, 8. Nemertea.
	Group-2 : Pseudocoelomata **(অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী)**	9. Rotifera, 10. Gastrotricha, 11. Kinorhyncha, ***12. Nematoda,** 13. Nematomorpha, 14. Acanthocephala, 15. Entoprocta, 16. Priapulida, 17. Loricifera.
	Group-3 : Eucoelomata **(প্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী)**	***18. Mollusca**, ***19. Annelida**, ***20. Arthropoda**, 21. Echiurida, 22. Sipunculida, 23. Tardigrada, 24. Pentastomida, 25. Onychophora, 26. Pogonophora, 27. Phoronida, 28. Ectoprocta/Bryozoa, 29. Chaetognatha, 30. Brachiopoda, *31. **Echinodermata,** 32. Hemichordata, ***33. Chordata**.

[N.B. Kingdom : Protista (Protoctista) : Sub-kingdom- Protozoa: Phylum: 1. Labyrinthomorpha, 2. Myxozoa, 3. Ascetospora, 4. Microspora, 5. Apicomplexa, 6. Ciliophora and 7. Sarcomastigophora].

[* চিহ্নিত পর্বগুলো প্রাণিজগতের মেজর পর্ব বা প্রধান পর্ব (৯টি)।]

প্রাণিজগতের প্রধান বা মেজর (major) পর্বগুলোর নাম এবং এদের প্রজাতি সংখ্যা (Zhang 2013 অনুসরণে)

ক্রঃ নং	প্রধান পর্বের নাম		আবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা Zhang (2013)	বাংলাদেশে বর্ণিত প্রজাতির সংখ্যা Ahmed (2008-2009)
1.	Phylum **Porifera**	NON-CHORDATA	8,659	29
2.	Phylum **Cnidaria**		10,203	102
3.	Phylum **Platyhelminthes**		29,487	125
4.	Phylum **Nematoda**		25,033	178
5.	Phylum **Mollusca**		84,977	477
6.	Phylum **Annelida**		17,388	98
7.	Phylum **Arthropoda**		1,257,040	2,483
8.	Phylum **Echinodermata**		7,550	49
9.	Phylum **Chordata**		68,625	1,611
	মোট		1,508,963	5,152

Ahmed, Z.A. (Chief editor) 2008-2009, Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh. Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, Vol. 14-28

2020/8/4 12:40

Scanned with CamScanner

১.৪ Non Chordata (নন-কর্ডাটা) প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাস (পর্ব পর্যন্ত)

নটোকর্ডের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগৎকে দুটি দলে বা গ্রুপে বিভক্ত করা হয়, যথা– (ক) **নন-কর্ডাটা** এবং (খ) **কর্ডাটা**। যেসব প্রাণীর দেহে নটোকর্ড নেই তাদের Non-chordata (নন-কর্ডাটা) প্রাণী বলে। যেমন– Porifera থেকে শুরু করে Echinodermata পর্যন্ত পর্বগুলো হচ্ছে Non-chordata প্রাণীদের পর্ব। পৃথিবীতে Non-chordata প্রাণীর সংখ্যাই সর্বাধিক। মোট প্রাণীর মধ্যে এদের সংখ্যা প্রায় ৯৫-৯৭%।

নন-কর্ডেট প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

(১) জীবনের কোনো পর্যায়ে নটোকর্ড থাকে না। (২) ফুলকারন্ধ্র থাকে না। (৩) স্নায়ুরজ্জু নিরেট, গ্রন্থিযুক্ত ও অঙ্কীয় দিকে অবস্থান করে। (৪) প্রকৃত লেজ অনুপস্থিত। (৫) রক্তরসে হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে। (৬) পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠদেশে হৃদযন্ত্র থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। (৭) এদের হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র থাকে না। (৮) চক্ষু ত্বক থেকে সৃষ্টি হয়। (৯) অন্তঃকঙ্কাল অনুপস্থিত। (১০) উপাঙ্গ থাকলে দুই জোড়ার বেশি থাকে। **উদাহরণ :** সাইকন, হাইড্রা, ফিতাকৃমি, কেঁচো, তেলাপোকা ইত্যাদি।

নন-কর্ডাটা প্রাণীদের প্রধান পর্ব ৮টি। এগুলোর বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ আলোচনা করা হলো–

পর্ব-১ : PORIFERA (পরিফেরা বা ছিদ্রাল প্রাণী; Lt. *porus* = pore বা ছিদ্র + *ferre* =to bear বা বহন করা।)

বিশেষ তথ্যাবলি : বিজ্ঞানী Robert Grant (1836) সর্বপ্রথম Porifera পর্বটির নামকরণ করেন। এ পর্বের প্রাণীগুলো সাধারণত **স্পঞ্জ** (sponge) নামে পরিচিত। তবে দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকায় এদের **ছিদ্রাল প্রাণীও** বলা হয়। এদের দেহ বহু কোষ দ্বারা গঠিত হলেও দেহে কোনো **কলাতন্ত্র** গঠিত হয়নি। গঠনগতভাবে এরা সরলতম প্রকৃতির। দেহকে কেবল কতগুলো কোষের সমষ্টি বলা যায়। এজন্যই এদের বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে প্রাচীনতম ও সরল প্রকৃতির প্রাণী বলা হয়। এরা নিশ্চল প্রকৃতির। দেখতে বিভিন্ন আকৃতি (গাছের মতো শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, ছাতা, ঘণ্টা, ফুলদানি প্রভৃতি) ও বর্ণের (বেগুনি, নীল, কমলা, লাল প্রভৃতি) হয়ে থাকে। এদের অধিকাংশই সামুদ্রিক; কিছু প্রজাতি মিঠা পানির (কেবলমাত্র Spogilidae গোত্রের)। এ পর্বের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৮,৬৫৯।

বৈশিষ্ট্য :

১। দেহপ্রাচীর **অস্টিয়া** (ostia) নামক অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত।

২। $CaCO_3$ দিয়ে তৈরি **স্পিকিউল** (spicule) বা **স্পঞ্জিন তন্তু** (spongin fibre) বা উভয় পদার্থ দ্বারা গঠিত অন্তঃকঙ্কাল বিদ্যমান।

৩। দেহে বিশেষ **নালিতন্ত্র** (canal system) আছে, যা **অসক্যুলাম** (osculum) নামক ছিদ্রপথে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।

৪। দেহে **কোয়ানোসাইট** (choanocyte) নামক বিশেষ ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষে পরিবেষ্টিত এক বা একাধিক প্রকোষ্ঠ রয়েছে।

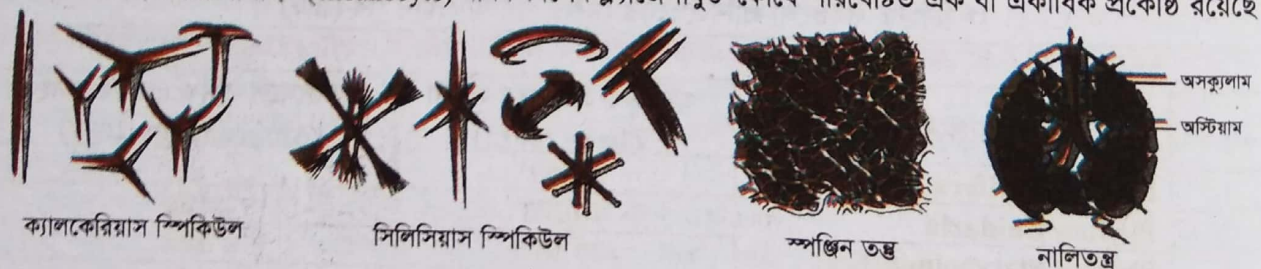

চিত্র ১.৭ক : Porifera পর্বের বৈশিষ্ট্য

৫। এদের দেহ বহুকোষী একক হলেও সুগঠিত কলা, অঙ্গ বা তন্ত্র অনুপস্থিত, অর্থাৎ **এরা কোষীয় মাত্রার** (cellular grade) **গঠন সংবলিত প্রাণী**।

৬। দেহে **পরিপাকতন্ত্র** থাকে না। মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্র থাকে না।

৭। এরা উভলিঙ্গ। যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই প্রজনন ঘটে।

৮। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরা **নিশ্চল** (sessile); অর্থাৎ কোনো বস্তুর সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত থাকে।

৯। এরা এককভাবে (solitary) বা কলোনি (ঔপনিবেশিক) গঠন করে অবস্থান করে। এ পর্বের প্রাণীদের **পুনরুৎপাদী** (regenerative) ক্ষমতা আছে।

2020/8/4 12:40

Scanned with CamScanner

১০। পরিস্ফুটন পরোক্ষ; জীবনচক্রে সন্তরণশীল **অ্যাম্ফিব্লাস্টুলা লার্ভা** (amphiblastula larva) অথবা **প্যারেনকাইমুলা লার্ভা** (parenchymula larva) দেখা যায়।

উদাহরণ : *Scypha (= Sycon) gelatinosum* (মটকা স্পঞ্জ), *Spongilla lacustris* (মিঠাপানির স্পঞ্জ), *Clathyrina* sp. (ক্ল্যাথিরিনা), *Cholina* sp., *Euspongila officinalis* (গোসল স্পঞ্জ)।



Euplectella aspergillum (ইউপ্লেক্টেলা)



Hyalonema (হায়ালোনেমা)



Leucosolenia (লিউকোসোলেনিয়া)



Scypha gelatinosum (সাইকন)

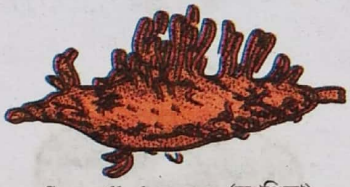

Spongilla lacustris (স্পঞ্জিলা)



Clathyrina sp. (ক্ল্যাথিরিনা)

চিত্র ১.৭খ : Porifera পর্বের কয়েকটি প্রাণী

পর্ব-২ : CNIDARIA (নিডেরিয়া; Gr. *knide* = nettle (রোম বা কাঁটা) + Lt. *aria* = like or connected with (সংযুক্ত)]

বিশেষ তথ্যাবলি : Hatschek (1888) সালে Cnidaria পর্বটির নামকরণ করেন। Cnidaria পর্বের প্রাণীরা বহুকোষী, কিন্তু দেহে কোনো **অঙ্গ** বা **তন্ত্র** গঠিত হয় না; তবে কোষীয় ও অঙ্গীয় পর্যায়ে সকল ধরনের শ্রমবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। এদের অধিকাংশই নিশ্চল, কিছু প্রজাতি মুক্ত সাঁতারু এবং অধিকাংশই মাংসাসী। এ পর্বের প্রাণীরা প্রবাল ও প্রবাল প্রাচীর গঠন করে। Cnidaria পর্বের প্রাণীদের **সমুদ্রের ফুল** (flower of the sea) বা **সমুদ্রের Rain Forest** বলা হয়। সামুদ্রিক প্রজাতির ২৫% জীব পৃথিবীর প্রবাল প্রাচীরগুলোতে বাস করে। এ পর্বের গর্গনিয়া (*Gorgonia* sp.) নামক প্রাণীটি **সাগর-পাখা** (sea-fan) নামে পরিচিত। এ পর্বের **সামুদ্রিক বল্লা** (*Chironex fleckeri*) পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত জেলিফিশ যা ৬৭ জন মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এ পর্বের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১০,২০৩। অধিকাংশই সামুদ্রিক, কেবল ২০টি প্রজাতি মিঠা পানিতে বাস করে।

বৈশিষ্ট্য :

১। দ্বিস্তরী বা **ডিপ্লোব্লাস্টিক** (diploblastic) প্রাণী; এসব প্রাণীর ভ্রূণদেহে **এক্টোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম** নামক দুটি কোষস্তর থাকে। স্তর দুটির মধ্যবর্তী স্থানে জেলির ন্যায় অকোষীয় **মেসোগ্লিয়া** উপস্থিত।

২। দেহ **অরীয় প্রতিসাম্য**। নির্দিষ্ট কোনো মস্তক নেই।

৩। দেহের অভ্যন্তরে **সিলেন্টেরন** (coelenteron) বা **গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার** গহ্বর (gastrovascular cavity) রয়েছে, যা একটিমাত্র ছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত; ছিদ্রটি একই সাথে মুখ ও পায়ু হিসেবে কাজ করে।

৪। মুখছিদ্রটি অনেক **কর্ষিকা** (tentacles) দ্বারা পরিবৃত থাকে।

৫। অনেক প্রজাতি বহুরূপিতা প্রদর্শন করে; দেহে স্থির **পলিপ** (polyp) ও মুক্তজীবী **মেডুসা** (medusa) নামক দুই ধরনের আঙ্গিক গঠন দেখা যায়। এদের জীবনচক্রে **জনুক্রম, মেটাজেনেসিস** (metagenesis) ও **পলিমরফিজম** (polymorphism) দেখা যায়।



চিত্র : ১.৮ক : Cnidaria পর্বের বৈশিষ্ট্য

৬। এপিডার্মিসে **নিডোব্লাস্ট** (cnidoblast) নামক বিশেষ ধরনের কোষ থাকে, যা **নেমাটোসিস্ট** (nematocyst) বহন করে।

৭। খাদ্যবস্তু বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় উভয়ভাবেই পরিপাক হয়।

2020/8/4 12:41

Scanned with CamScanner

৮। এরা বহুকোষী, **কিন্তু দেহে কোনো অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত হয় না;** এরা **কোষ-কলা পর্যায়ের সংগঠন মাত্রার** (cell-tissue grade) প্রাণী।

৯। শ্বসনকালে গ্যাসীয় বিনিময় এবং রেচন দেহত্বকের মাধ্যমে ঘটে।

১০। এরা **একলিঙ্গ** বা **উভলিঙ্গ** হতে পারে। জীবনচক্রে সিলিয়াযুক্ত **প্লানুলা লার্ভা** (planula larva) দেখা যায়।

উদাহরণ : *Hydra vulgaris* (হাইড্রা), *Aurelia aurita* (জেলিফিশ)।



Hydra vulgaris (হাইড্রা)



Aurelia aurita (জেলিফিশ)



Obelia geniculata (ওবেলিয়া)



Physalia sp. (ফাইসেলিয়া/পর্তুগীজ যুদ্ধ মানব)



Metridium senile (সাগর কুসুম)



Meandrina meandrites (ব্রেইন কোরাল)



Pennatula sulcata (সমুদ্রের কলম)



Porpita sp. (পরপিটা/নীল বোতাম জেলিফিস)



Adamsia palliata (অ্যাডামশিয়া)

চিত্র ১.৮খ : Cnidaria পর্বের কয়েকটি প্রাণী

পর্ব-৩ : PLATYHELMINTHES (প্ল্যাটিহেলমিনথেস বা চ্যাপ্টা কৃমি; Gr. *platys* = flat বা চ্যাপ্টা + *helminth* = worm বা কৃমি)

বিশেষ তথ্যাবলি : বিজ্ঞানী Karl Gegenbaur (1859) সর্বপ্রথম Platyhelminthes পর্বের নামকরণ করেন। সৃষ্টির প্রথম ধাপে প্রাণীদের মধ্যে এরাই **প্রকৃত ত্রিস্তরীয়** দেহগঠন নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং এরাই প্রথম **টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার** (tissue-organ grade) প্রাণী। সকল রকম চ্যাপ্টা কৃমি এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত, এজন্য এ পর্বের প্রাণীগুলো **চ্যাপ্টাকৃমি** (flat worm) বা **ফিতাকৃমি** (ribbon worm) নামে পরিচিত। এদের জীবনচক্রে অনেক ধরনের **লার্ভা** দশা দেখা যায়। এ পর্বের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২৯,৪৮৭। এরা অধিকাংশ **পরজীবী,** কিছুসংখ্যক মুক্তজীবী। এই পর্বের কিছু প্রজাতির (*Schistosoma* গণের কয়েকটি প্রজাতি) চ্যাপ্টাকৃমি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহের মানুষে **সিস্টোসোমাসিস** (schistosomiasis) বা **শামুক জ্বর** (snail fever) সৃষ্টি করে। যা ম্যালেরিয়ার পরেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ রোগ হিসেবে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য : ১। দেহ **দ্বিপার্শ্বীয়** প্রতিসম, **ত্রিস্তরী** (triploblastic) ও পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চ্যাপ্টা অথবা **পাতা** বা **ফিতার** ন্যায়।

২। দেহত্বক নরম, সিলিয়াযুক্ত **এপিডার্মিস** অথবা **কিউটিকল** (cuticle) -এ আবৃত।

৩। দেহ **সিলোমবিহীন** বা **অ্যাসিলোমেট** (acoelomate)।

৪। নির্দিষ্ট রক্ত সংবহনতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র ও কঙ্কালতন্ত্র অনুপস্থিত।

৫। **পৌষ্টিকনালি অসম্পূর্ণ** বা **অনুপস্থিত** (ফিতাকৃমি)।

৬। রেচনতন্ত্র **শিখাকোষ** (flame cell) বা **প্রোটোনেফ্রিডিয়া** (protonephridia) বা **সোলেনোসাইট** (solenocyte) নিয়ে গঠিত।

৭। বিভিন্ন অঙ্গের মাঝে ফাঁকা স্থানগুলো **প্যারেনকাইমা** (parencyhma) নামক যোজক টিস্যু বা **মেসেনকাইমা** (mesencyhma) এ পূর্ণ থাকে।

৮। দেহে বাহ্যিক **চোষক** অথবা **হুক** অথবা উভয়ই থাকে; পৌষ্টিকতন্ত্র পায়ুছিদ্র বিহীন এবং শাখান্বিত।

৯। দেহের অগ্রভাগে সুস্পষ্ট **মস্তক** ও **চোষক** থাকে।



চিত্র : ১.৯ক : Platyhelminthes পর্বের বৈশিষ্ট্য

2020/8/4 12:41
Scanned with CamScanner

১০। উভলিঙ্গ, স্বনিষেক ও পরনিষেক সম্পন্ন হয়; নিষেক অভ্যন্তরীণভাবে ঘটে এবং পরিস্ফুটন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধরনের।
১১। জীবনচক্রে একাধিক লার্ভা দশা (মিরাসিডিয়াম, রেডিয়া, সারকারিয়া ইত্যাদি) দেখা যায়।

উদাহরণ : *Fasciola hepatica* (ভেড়ার যকৃৎ কৃমি), *Taenia solium* (ফিতাকৃমি)



চিত্র ১.৯খ : Platyhelminthes পর্বের কয়েকটি প্রাণী

পর্ব-৪ : NEMATODA/NEMATHELMINTHES (নেমাটোডা/নেমাথেলমিনথেস বা গোলকৃমি; Gr. *nematos* = thread বা সুতা + *eidos* = shape বা আকৃতি + *helminth* = worm বা কৃমি।)

বিশেষ তথ্যাবলি : Gegenbaur (1851) সর্বপ্রথম Nematoda পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের প্রাণীগুলো সাধারণত **নেমাটোডা** বা **সুতাকৃমি** (thread worm) বা **গোলকৃমি** (round worm) নামে পরিচিত। নেমাটোডরা অভিব্যক্তির স্তরে প্রথম প্রাণী যাদের সম্পূর্ণ অন্ত্রনালি দেখা যায়। এ পর্বের বিভিন্ন পরজীবীর কারণে অ্যাসকেরিয়েসিস, এলিফ্যানটিয়াসিস, কনজাংটিভাইটিসসহ পেটে ব্যথা, অনিদ্রা, উদরাময়, রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। এদের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২৫,০৩৩ এবং অধিকাংশই বিভিন্ন জীবদেহে **পরজীবী** হিসেবে বাস করে। এরা মুক্তজীবী, স্থলচর বা জলচর হতে পারে। মুক্তজীবীরা জীবন ধারণের জন্য ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, ছত্রাক ও শৈবালের উপর নির্ভরশীল।

বৈশিষ্ট্য :

১। দেহ লম্বা, নলাকার, সুতার ন্যায়, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, **অখণ্ডায়িত** (unsegmented), দু'দিক ক্রমশ সরু ও মধ্যভাগ চওড়া। এরা আণুবীক্ষণিক থেকে এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

২। দেহ নমনীয় ও **ইলাস্টিন** (elastin) নির্মিত অকোষীয় **কিউটিকল** (cuticle) দ্বারা আবৃত।

৩। পৌষ্টিকনালি সোজা ও শাখাহীন এবং মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। এ কারণে এদের দেহকে 'নলের ভিতর নল' ('tube within a tube') ধরনের গঠনের ন্যায় দেখায়।

৪। দেহে **অপ্রকৃত সিলোম** বা **সিউডোসিলোম** (pseudocoelom) উপস্থিত এবং **পৌষ্টিক গ্রন্থি** (digestive gland) অনুপস্থিত।

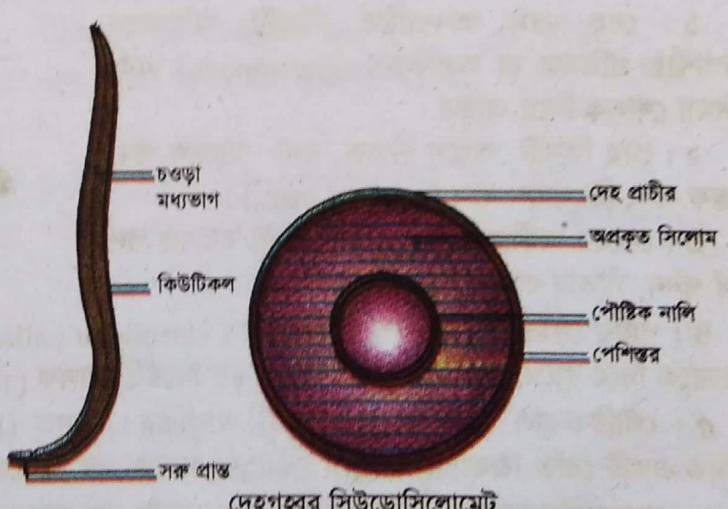

চিত্র ১.১০ক : Nematoda পর্বের বৈশিষ্ট্য

৫। মুখছিদ্র সাধারণত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ **ওষ্ঠ** দ্বারা পরিবেষ্টিত।
৬। এরা **ত্রিস্তরী** প্রাণী; দেহে অঙ্গ-তন্ত্র গঠিত হয়।
৭। শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।
৮। রেচনতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র উপস্থিত।
৯। অধিকাংশ প্রাণী একলিঙ্গ, **যৌন দ্বিরূপতা** (sexual dimorphism, পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণী বাহ্যিকভাবে ভিন্নরকম) দেখা যায়।

2020/8/4 12:41
Scanned with CamScanner

১০। অ্যাসকারিসে **র‍্যাবডিটিফর্ম** এবং উচেরেরিয়ার **মাইক্রোফাইলেরিয়া** লার্ভা দেখা যায়।

উদাহরণ : *Ascaris lumbricoides* (গোলকৃমি), *Loa loa* (চোখ কৃমি)।



Ascaris lumbricoides (গোলকৃমি) (A-পুরুষ; B-স্ত্রীকৃমি) | *Loa loa* (চোখ কৃমি) | *Ancylostoma duodenale* (হুকওয়ার্ম) | *Microfilaria* sp. (মাইক্রোফাইলেরিয়া)

চিত্র ১.১০খ : Nematoda পর্বের কয়েকটি প্রাণী

পর্ব-৫ : MOLLUSCA (মোলাস্কা বা কম্বোজ প্রাণী; Lt. *molluscus* = soft বা নরম)

বিশেষ তথ্যাবলি : বিজ্ঞানী Jonston (1650) Mollusca পর্বের নামকরণ করেন। পর্বটির প্রাণীগুলো molluscus বা mollusks বা **নরম দেহ** বা **কম্বোজ প্রাণী** নামে পরিচিত। Mollusca প্রাণিজগতের **দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব**। শুধু মোলাস্কা জাতীয় প্রাণীদের নিয়ে আলোচনার বিষয়কে **ম্যালাকোলজি** (Malacology/Concology) বলে। শামুক, ঝিনুক, অক্টোপাস, ওয়েস্টার, স্ল্যাগ (খোলকবিহীন শামুক), স্কুইড বা ললিগো, সেপিয়া ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় প্রাণী এ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এ পর্বের প্রাণীদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ মুক্তা সংগ্রহে, খাদ্য হিসেবে, চুন তৈরিতে এদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এছাড়াও শাঁখ থেকে শাঁখা তৈরি হওয়া ছাড়াও এটি মাঙ্গলিক কাজের সময় ধ্বনি সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা হয়। স্থলবাসী শামুক (*Achatina fulica*) ফসলের পেস্ট হিসেবে বিবেচিত হয়। মোট প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৮৪,৯৭৭; যারা স্বাদু বা লোনা পানি এবং স্থলভাগে ব্যাপক বিস্তৃত।

বৈশিষ্ট্য :

১। দেহ নরম, **অখণ্ডায়িত**, **ত্রিস্তরী**, অধিকাংশ **দ্বিপার্শ্বীয়** প্রতিসম বা অপ্রতিসম (Gastropoda) এবং **চুনময় খোলক** দিয়ে আবৃত।

২। দেহ তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা– **মাংসল পদ**, **মস্তক** এবং **ভিসেরাল মাস** (visceral mass)।

৩। দেহের অঙ্কীয় দিকের **পেশিযুক্ত** বা **মাংসল পদ** গর্ত খনন, সাঁতার বা চলনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

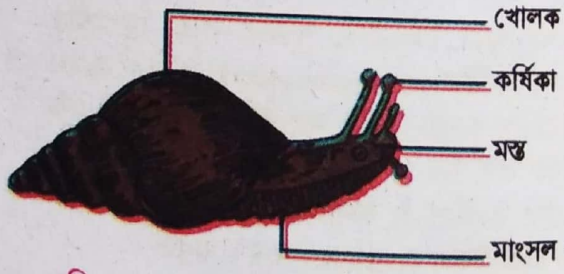

চিত্র ১.১১ক : Mollusca পর্বের বৈশিষ্ট্য

৪। পৃষ্ঠীয় দেহপ্রাচীর **ম্যান্টল** বা **পেলিয়াম** (mantle or pallium) নামক একজোড়া ভাঁজের সৃষ্টি করে, যা ম্যান্টল গহ্বরকে ঘিরে রাখে, ম্যান্টল থেকে নিঃসৃত রস দিয়েই **খোলক** (shell) তৈরি হয়।

৫। পৌষ্টিকনালি পেঁচানো; কখনও U আকৃতির। ঝিনুক (Bivalvia) ব্যতীত সকলের পরিপাকতন্ত্রে কাইটিন নির্মিত একটি রেতি-জিহ্বা বা **র‍্যাডুলা** (radula) নামক অঙ্গ রয়েছে।

৬। **প্রকৃত সিলোম** আছে কিন্তু তা সংকুচিত, অর্থাৎ শুধু হৃদযন্ত্রের চারপাশে, জননাঙ্গের গহ্বরে এবং বৃক্কে সীমাবদ্ধ থাকে। সিলোম রক্তপূর্ণ হয়ে **হিমোসিল** (haemocoel) গঠন করে।

৭। রক্ত **সংবহনতন্ত্র অর্ধমুক্ত** ধরনের অর্থাৎ রক্তনালি ও হিমোসিল উভয়ই থাকে।

৮। রক্তে **হিমোসায়ানিন** (haemocyanin) রঞ্জক ও **অ্যামিবোসাইট** (amoebocyte) কণিকা থাকে। হিমোসায়ানিনের কারণে রক্ত নীলাভ বর্ণের হয়।

৯। ফুলকা (টিনিডিয়াম) অথবা ফুসফুস অথবা উভয় অংশ, অথবা ম্যান্টল পর্দা দ্বারা শ্বসন সম্পন্ন হয়; স্থলচরদের ক্ষেত্রে **পালমোনারি থলির** বিকাশ ঘটে।

2020/8/4 12:41
Scanned with CamScanner

১০। এরা একলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ, ডিম পাড়ে; এদের যৌন জনন ঘটে এবং পরিস্ফুটন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ **ট্রোকোফোর** (trochophore) বা **ভেলিজার** (veliger) বা **গ্লচিডিয়াম** (glochidium) লার্ভা দশার মাধ্যমে ঘটে। **উদাহরণ :** *Pila globosa* (আপেল শামুক), *Octopus macropus* (অক্টোপাস)

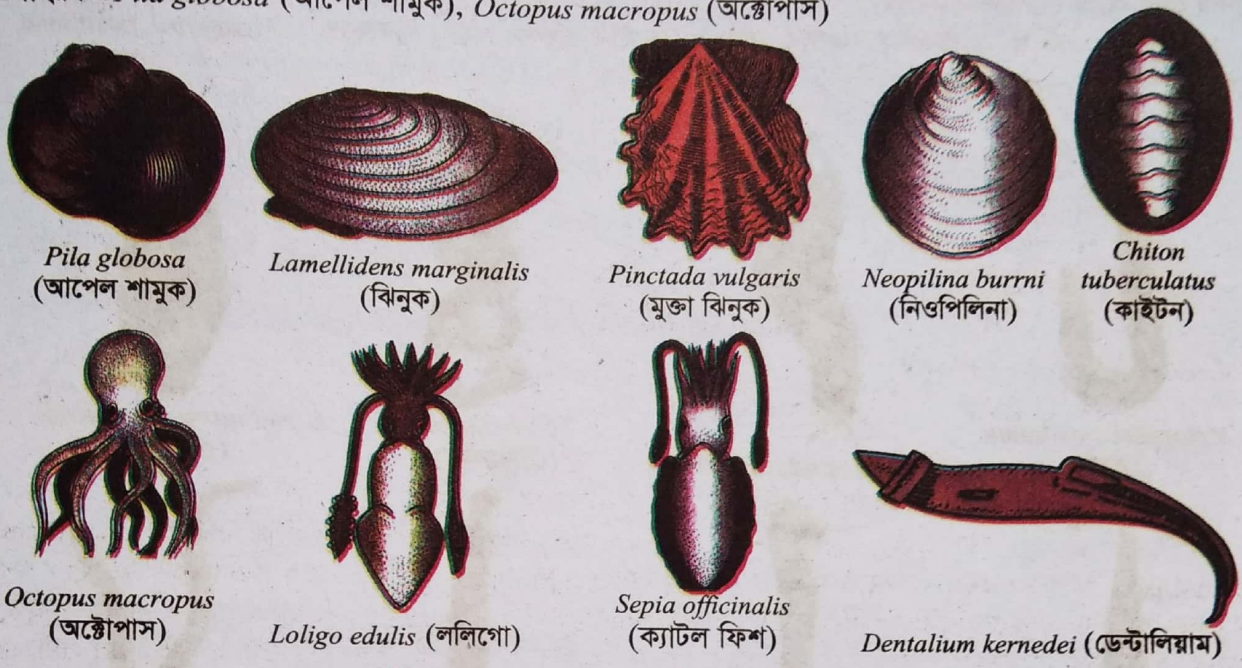

চিত্র ১.১১খ : Mollusca পর্বের কয়েকটি প্রাণী

পর্ব-৬ : ANNELIDA (অ্যানিলিডা বা অঙ্গুরিমাল; Lt. *anellus* = small ring বা ছোট আংটি)

বিশেষ তথ্যাবলি : বিজ্ঞানী Lamark (1890) সর্বপ্রথম Annelida পর্বের নামকরণ করেন। পর্বটির প্রাণীগুলো **আংটি কীট** (ringed worms) বা **খণ্ডায়িত কীট** (segmented worms) বা **অঙ্গুরিমাল** নামে পরিচিত। এরা প্রকৃত সিলোমেট প্রাণী ও অভিব্যক্তির স্তরে প্রথম এদের মধ্যে সিলোমের আবির্ভাব ঘটে। এ পর্বের প্রাণীরা সিলোমের তরলকে হাইড্রোলিক পাম্প হিসেবে কাজে লাগিয়ে শরীরকে দৃঢ়তা প্রদান করে। এ পর্বের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১৭,৩৮৮। এরা স্বাদু বা লোনা পানি এবং স্থলভাগে বাস করে। অধিকাংশ স্বাধীনজীবী, কিছু সংখ্যক পরজীবী।

বৈশিষ্ট্য :

১। দেহ লম্বা, নলাকার, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম; বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আংটির ন্যায় সমরূপ একাধিক **খণ্ড** (segment) নিয়ে গঠিত এবং পাতলা **কিউটিকল** দ্বারা আবৃত থাকে।

২। চলনাঙ্গ **সিটি** (setae-কেঁচো) বা **প্যারাপোডিয়া** (parapodia-নেরিস) বা **চোষক** (জোঁক)।

৩। প্রধান রেচন অঙ্গ **নেফ্রিডিয়া** (nephridia) যা দেহের প্রতি খণ্ডকে বিদ্যমান।

৪। এরা ত্রিস্তরী; **প্রকৃত সিলোম** উপস্থিত।

৫। জীবনচক্রে সাঁতারু **ট্রোকোফোর লার্ভা** (trochophore larva) দেখা যায়।

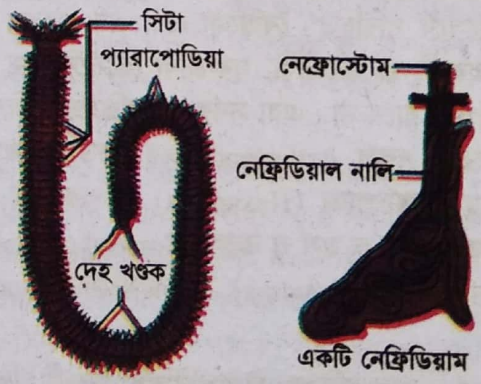

চিত্র ১.১২ক : Annelida পর্বের বৈশিষ্ট্য

৬। সাধারণত **সিক্ত দেহত্বক** দ্বারা শ্বসন সম্পন্ন হয়, কিছু সংখ্যক প্রাণী **ফুলকার** সাহায্যে শ্বসন সম্পন্ন করে।

৭। এদের পৌষ্টিকনালি সম্পূর্ণ ও রক্ত সংবহনতন্ত্র **বদ্ধ** প্রকৃতির (ব্যতিক্রম-জোঁক); রক্তরসে **হিমোগ্লোবিন, হিমোএরিথ্রিন** বা **এরিথ্রোক্রুওরিন** থাকে। **লোহিত রক্তকণিকা** থাকে না।

2020/8/4 12:41

Scanned with CamScanner

৮। অধিকাংশ প্রাণীদের **ক্লাইটেলাম** উপস্থিত (ব্যতিক্রম-পলিকিটা শ্রেণির প্রাণী)।

৯। এদের বহিঃত্বকে বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় (যেমন– **স্ট্যাটোসিস্ট, কর্ষিকা, কেমোরিসেপ্টর** প্রভৃতি) দেখা যায়। কিছু প্রাণীর **চোখ** আছে (পলিকিটা শ্রেণির)।

১০। এরা একলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ; এদের যৌন ও অযৌন প্রজনন ঘটে। **উদাহরণ :** *Metaphire posthuma* (কেঁচো), *Nereis caudata* (নেরিস)

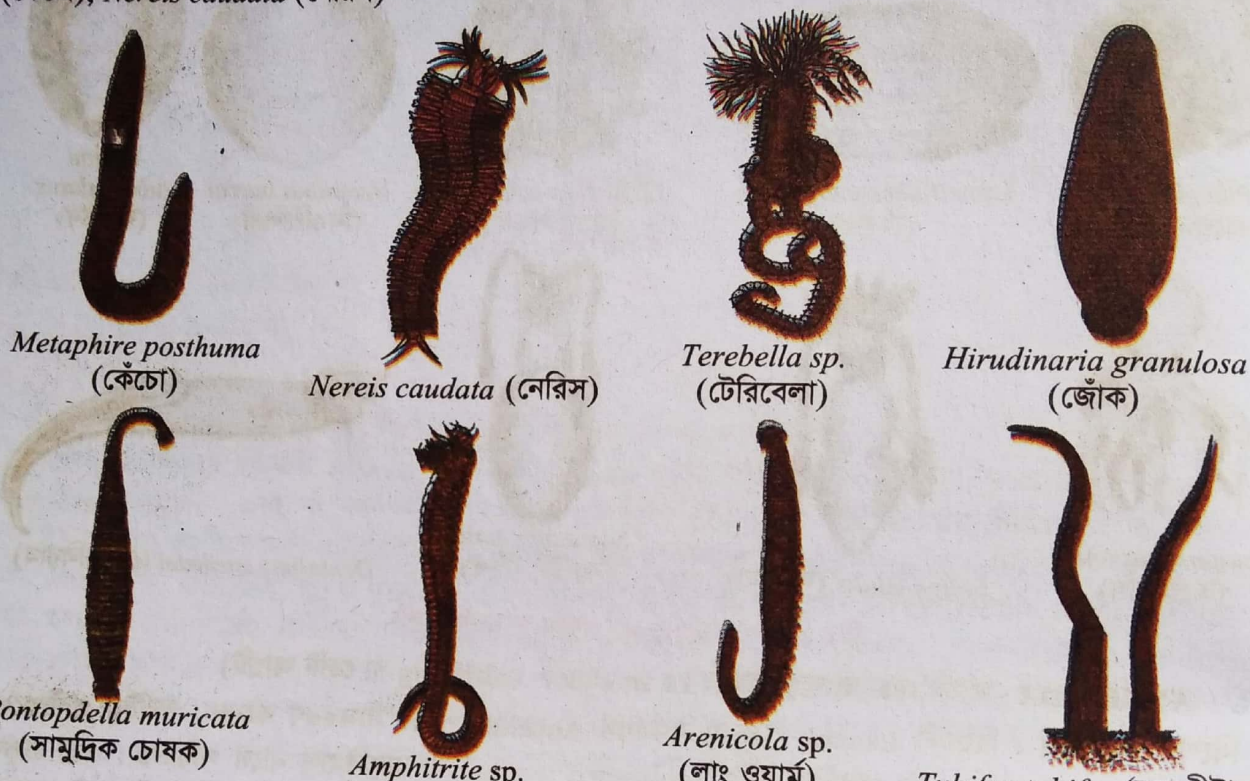

চিত্র ১.১২খ : Annelida পর্বের কয়েকটি প্রাণী

পর্ব-৭ : ARTHROPODA (আর্থ্রোপোডা বা সন্ধিপদী প্রাণী; Gr. *arthron* = joint, সন্ধি + *podos* = foot, পা)

বিশেষ তথ্যাবলি : Von Siebold (1845) Arthropoda পর্বের নামকরণ করেন। Arthropoda হচ্ছে প্রাণিজগতের **সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব** (প্রায় ৮০%)। এ পর্বের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১,২৫৭,০৪০। এরা **সন্ধিপদী প্রাণী** হিসেবে পরিচিত। বৈচিত্র্যে এরা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এ পর্বের প্রাণীরা স্থলচর, জলচর, নিশ্চল, সহবাসী বা পরজীবী, মুক্তজীবী হিসেবে বাস করে। পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আর্থ্রোপোড সদস্য পাওয়া যাবে না। এরা সর্বভুক। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে এই পর্বের প্রাণীরা একমাত্র মেরুদণ্ডী প্রাণী ছাড়া সকলের চেয়ে সেরা। সকল Arthropoda-এর ভেতর পতঙ্গ বা Insecta শ্রেণিভুক্ত প্রাণীরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্রেণির অন্য নাম **হেক্সাপোডা** (Hexapoda) ও সবচেয়ে বেশি প্রাণী এই শ্রেণিতে আছে। এদের মধ্যে **লিমুলাস** (*Limulus*) **রাজকাঁকড়া বা হর্স সু ক্রাব** (Horse shoe crab) বা **জীবন্ত জীবাশ্ম** (living fossil) নামে পরিচিত। এদের অধিকাংশ তৃণভোজী (herbivours), কতক মাংসাসী (carnivours) অথবা সর্বভুক (omnivours) প্রকৃতির।

বৈশিষ্ট্য :

১। দেহ **সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গবিশিষ্ট;** ত্রিস্তরী, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, বাহ্যিকভাবে খণ্ডায়িত এবং **ট্যাগমায়** (tagma, বহুবচনে, tagmata) বিভক্ত (যেমন– শির, বক্ষ ও উদর)।

২। মস্তকে একজোড়া **অ্যান্টেনা** (antenna) ও একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** (compound eye) থাকে।

৩। দেহে **কাইটিন** নির্মিত শক্ত বহিঃকঙ্কাল রয়েছে, যা নিয়মিত **মোচিত** (moulting) হয়।

৪। সিলোম সংক্ষিপ্ত, রক্তপূর্ণ **হিমোসিল** (haemocoel) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

৫। পৌষ্টিকতন্ত্র সম্পূর্ণ। উপাঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে **মুখোপাঙ্গ** (mouth parts) গঠিত হয় যা বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণে অভিযোজিত।

2020/8/4 12:41

Scanned with CamScanner

৬। **মালপিজিয়ান নালিকা** (malpighian tubule) প্রধান রেচন অঙ্গ, এ ছাড়াও রয়েছে কক্সাল গ্রন্থি (coxal gland), অ্যান্টেনাল (antennal) বা ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি (maxillary), সবুজ গ্রন্থি প্রভৃতি।

৭। **মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র** উপস্থিত। শ্বসন অঙ্গ **ট্রাকিয়া** (পতঙ্গ), **বুকগিল** (book gill- চিংড়ি, রাজকাঁকড়া), **বুকলাং** (book lung- কাঁকড়াবিছে, মাকড়সা) এবং **দেহত্বক**।

৮। দেহে **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** উপস্থিত। সাধারণত **একলিঙ্গ** প্রাণী। যৌন দ্বিরূপতা দেখা যায়।

৯। একলিঙ্গ, প্রধানত **অন্তঃনিষেক** দেখা যায়, তবে কিছু ক্ষেত্রে **বহিঃনিষেক** ঘটে (চিংড়ি)।

১০। জীবনচক্রে **লার্ভা, পিউপা** বা **নিম্ফ** দশা দেখা যায়। অধিকাংশদের **রূপান্তর** (metamorphosis) ঘটে।



চিত্র ১.১৩ক : Arthropoda-র বৈশিষ্ট্য

উদাহরণ : *Periplaneta americana* (তেলাপোকা), *Lycosa lenta* (মাকড়সা)



Periplaneta americana (তেলাপোকা)



Lycosa lenta (মাকড়সা)



Macrobrachium rosenbergii (গলদা চিংড়ি)



Scylla olivacea (কাঁকড়া)



Musca domestica (মাছি)



Pieris brassicae (প্রজাপতি)



Culex pipiens (মশা)



Poecilocerus pictus (ঘাসফড়িং)



Scolopendra amazonica (তেঁতুলবিছে)



Julus terrestris (সহস্রপদী কীড়া)

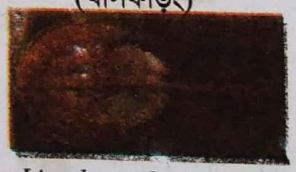

Limulus polyphemus (রাজকাঁকড়া)

চিত্র ১.১৩খ : Arthropoda পর্বের কয়েকটি প্রাণী

পর্ব-৮ : ECHINODERMATA (একাইনোডার্মাটা বা কন্টকত্বক প্রাণী; Gr. *echinos* = spine, কাঁটা + *derma* = skin, ত্বক)

বিশেষ তথ্যাবলি : বিজ্ঞানী Jacob Klein (1734) Echinodermata পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৭,৫৫০। এ পর্বভুক্ত প্রায় সব প্রাণীর দেহত্বক কর্কশ, কন্টক দ্বারা আচ্ছাদিত এবং দেহত্বকের নিচে অবস্থিত চুনময় অন্তঃকঙ্কালিক প্লেট বা পাত (calcareous endoskeletal plate) থেকে অসংখ্য কন্টকাকার অভিক্ষেপ সৃষ্টি হয়। কাঁটাগুলো বহিঃকঙ্কাল আর প্লেটগুলো অন্তঃকঙ্কাল।

বহিঃকন্টকসমূহ সঞ্চারণশীল অথবা অসঞ্চারণশীল; দেহত্বক ত্রিস্তরী, মস্তক ও মস্তকবিহীন। দেহত্বক কাঁটাযুক্ত বলে এরা **কন্টকত্বক প্রাণী** হিসেবে পরিচিত। এ পর্বের প্রায় সকল প্রাণীই **সামুদ্রিক**। এ পর্বের প্রাণীদের কিছু অঙ্গ বা অঙ্গাংশ দেখা যায় যেগুলো তাদের বিশেষত্ব রচনা করে। যেমন– তারামাছের গায়ে থাকা **পেডিসিলারি**, যেগুলো ওদের গায়ে কোনো নোংরা ও ময়লা জমতে দেয় না। এ ছাড়া আছে তারামাছের পানি সংবহনতন্ত্রে ৯টি গ্ল্যান্ডসদৃশ **টাইড ম্যানস বডি** (tied mans bodies)। এরা মুক্তজীবী ও সহজীবী হিসেবে বসবাস করে।

2020/8/4 12:41

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্য :

১। দেহ অখণ্ডায়িত; গোলাকার, নলাকার বা তারকাকার।

২। পূর্ণাঙ্গ প্রাণী **পঞ্চঅরীয় প্রতিসম** (pentaradial symmetry), কিন্তু **লার্ভা দ্বিপার্শ্বীয়** প্রতিসম। ত্রিস্তরী, দেহে **প্রকৃত সিলোম** উপস্থিত।

৩। এদের বহিঃকঙ্কাল **কণ্টকময়,** স্পাইন (spine) ও পেডিসিলারিযুক্ত (pedicellariae)। অন্তঃকঙ্কাল ক্যালসিয়াম কার্বনেট নির্মিত অসংখ্য **অসিকল** (ossicles) দ্বারা গঠিত।

৪। বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত **পানিসংবহনতন্ত্র** (water vascular system) বিদ্যমান। **নালিকাপদ** (নালিপদ) বা **টিউব ফিট** (tube feet) বা **পোডিয়া** (podia) চলন অঙ্গ।

৫। এরা ত্বকীয় ফুলকা, নালিকাপদ বা শ্বসন বৃক্ষ ইত্যাদি দ্বারা শ্বসন সম্পন্ন করে।

৬। প্রকৃত মস্তক ও মস্তিষ্ক নেই; নির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ অনুপস্থিত।

৭। দেহ সুস্পষ্ট **মৌখিকতল** (oral) ও **বিমৌখিকতলে** (aboral) বিন্যস্ত; মৌখিকতলে পাঁচটি **অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাঁজ** বা **খাদ** (ambulacral grooves) বিদ্যমান।

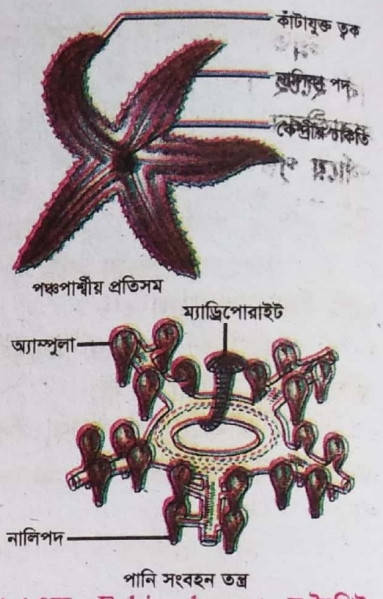

চিত্র : ১.১৪ক : Echinodermata-র বৈশিষ্ট্য

৮। রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত, তবে **হিমালতন্ত্র** (haemal system) ও **পেরিহিমালতন্ত্র** সংবহনতন্ত্রের কাজ করে। হৃৎপিণ্ড নেই। রক্ত বর্ণহীন।

৯। **সকল সদস্যই সামুদ্রিক**। স্নায়ুতন্ত্র অনুন্নত।

১০। একলিঙ্গ প্রাণী, নিষেক বাহ্যিক, জীবনচক্রে মুক্ত **সন্তরণশীল লার্ভা** (বাইপিনারিয়া, অরিক্যুলারিয়া, অফিউকিটাস বা একাইনোকিটাস) বিদ্যমান।

উদাহরণ : *Astropecten euryacanthus* (সমুদ্র তারা), *Echinus esculentus* (সাগর আর্চিন)



Astropecten euryacanthus (সমুদ্র তারা)

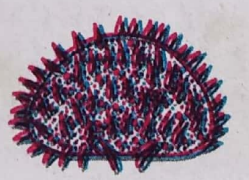

Echinus esculentus (সাগর আর্চিন)



Ophiura ciliaris (ব্রিটল স্টার)



Holothuria impatiens (সমুদ্র শসা)



Ophiothrix fragilis (কাঁটাযুক্ত ব্রিটল স্টার)



Antedon bifida (সিলিলি/পালক স্টার)

চিত্র ১.১৪খ : Echinodermata পর্বের কয়েকটি প্রাণী

❑ **কাজ :** (i) নন-কর্ডেট প্রাণিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (ii) Arthropoda এবং Annelida পর্বের (বা কেঁচো যে পর্বের তার নাম) তিনটি করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসহ একটি করে উদাহরণ দাও। (iii) তারা মাছ এবং চিংড়ি মাছ দুটি ভিন্ন পর্বে অন্তর্ভুক্তির কারণ বিশ্লেষণ কর। (iv) Annelida পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

পর্ব- ৯ : CHORDATA (কর্ডাটা; Lt. *chorda* = cord, রজ্জু + Gr. *ata* = to bear, বহন করা)

বিশেষ তথ্যাবলি : Bateson (1885) সর্বপ্রথম পর্বটির নামকরণ করেন। এ পর্বের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৬৮,৬২৬। **যেসব প্রাণীর ভ্রূণ অবস্থায় বা সারাজীবন অর্থাৎ জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড থাকে, তাদের কর্ডাটা প্রাণী বলে।** প্রাণিজগতে Chordata পর্বের প্রাণীরাই সবচেয়ে

2020/8/4 12:42
Scanned with CamScanner

উন্নত। অভিব্যক্তির ইতিহাসে ওর্ডোভিসিয়ান (Ordovician) পিরিয়ডে এদের জন্ম। এ পর্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত পর্ব হচ্ছে Echinodermata এবং Hemichordata। Chordata পর্বের প্রাণীর জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অথবা সারাজীবন চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে, যথা– **ভ্রূণ অবস্থায় অথবা সারাজীবন অর্থাৎ জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড, পৃষ্ঠদেশীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু, গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র ও পায়ু পরবর্তী লেজ থাকে।**

সব কর্ডেট প্রাণীকে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রথমে তিনটি উপপর্বে ভাগ করা হয়। এই উপপর্বগুলো হলো– Urochordata, Cephalochordata ও Vertebrata। এদের মধ্যে প্রথম দুটিকে **অ্যাক্রোনিয়াও** বলে। কারণ এদের কোনো মস্তিষ্ক ধারক **ব্রেন বক্স** (Brain box) বা **ক্রেনিয়াম** (cranium) তৈরি হয়নি। অন্যদিকে যাদের ক্রেনিয়াম থাকে তাদের বলে **ক্রেনিয়েটা** (craniata)। আবার Urochordata ও Cephalochordata-কে **প্রোটোকর্ডাটাও** (Protochordata) বলা হয়। Protochordata-এর যুগ্ম উপাঙ্গ, মেরুদণ্ড, চোয়াল ও মস্তিষ্ক থাকে না। Vertebrata-কে আবার দুটি অধিশ্রেণিতে (super-class) ভাগ করা হয়, যথা– **অ্যাগনাথা** (Agnatha) ও **ন্যাথোস্টোমাটা** (Gnathostomata)। এদের মধ্যে Gnathostomata-এর চোয়াল থাকে আর Agnatha-এর চোয়াল নেই। এ ছাড়া Agnatha-র ক্রেনিয়ামের উপরের দিকটা পর্দাসদৃশ ও একটিমাত্র মধ্যস্থানীয় বহিঃনাসারন্ধ্র থাকে। অন্যদিকে Gnathostomata-র একজোড়া নাসারন্ধ্র ও শ্বাসকার্যের জন্য ফুলকা বা ফুসফুস থাকে।

বৈশিষ্ট্য :

১। নটোকর্ড (Notochord) : ভ্রূণ অবস্থায় অথবা আজীবন পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর নিরেট ও স্থিতিস্থাপক **নটোকর্ড** (notochord; Gr. *noton* = back, পিঠ + Lt. *chorda* = cord, রজ্জু) থাকে। উন্নত কর্ডাটায় তা **মেরুদণ্ড** (vertebral column) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এসব প্রাণীকে তখন **মেরুদণ্ডী প্রাণী** (vertebrates) বলা হয়।



চিত্র ১.১৫ক : Chordata পর্বের বৈশিষ্ট্যের চিত্ররূপ

২। স্নায়ুরজ্জু (Nerve cord) : নটোকর্ডের উপরে লম্ব অক্ষ বরাবর একটি ফাঁপা, নলাকার **স্নায়ুরজ্জু** বা **নার্ভকর্ড** থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে নার্ভকর্ডটি পরিবর্তিত হয়ে সম্মুখ প্রান্তে **মস্তিষ্ক** (brain) ও পশ্চাতে **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) গঠন করে।

৩। গলবিলীয় ফুলকারন্ধ্র (Pharyngeal gill slits) : জীবনের যেকোনো দশায় বা আজীবন গলবিলের দু'পাশে কয়েক জোড়া **ফুলকারন্ধ্র** বা ফুলকা ছিদ্র থাকে। উন্নত কর্ডেটে ফুলকারন্ধ্রের

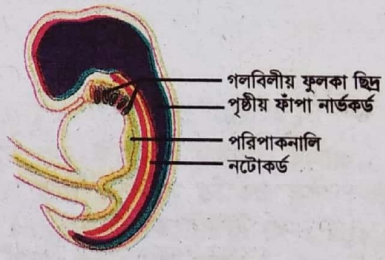

চিত্র ১.১৫খ : মানব ভ্রূণ

বিলোপ ঘটে এবং **ফুলকা** বা **ফুসফুসে** রূপান্তরিত হয়। **৪। লেজ** (Tail) : কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে পায়ুর পশ্চাতে **লেজ** (post anal tail) বিস্তৃত থাকে। পরবর্তীতে এটিও অনেক ক্ষেত্রে বিলীন হয়ে যায়। **৫। হৃৎপিণ্ড** (Heart) : **হৃৎপিণ্ড** দেহের অঙ্কীয়দেশে অবস্থান করে। **৬। পদ** (Leg) : মেরুদণ্ডীদের দু'জোড়া পার্শ্বপদ থাকে যা অন্তঃকঙ্কালে অবলম্বিত। **৭। সংবহনতন্ত্র ও পোর্টালতন্ত্র** (Circulatory system & Portal system) : রক্ত সংবহনতন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির; দেহে রক্ত জালক উপস্থিত; **হিমোগ্লোবিন** লোহিত কণিকায় অবস্থান করে। হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র বিদ্যমান। **৮। ভ্রূণস্তর ও প্রতিসাম্য** (Germ layer and Symmetry) : ত্রিস্তরী; দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। **৯। সিলোম ও খণ্ডায়ন** (Coelom and Segmentation) : প্রকৃত সিলোমযুক্ত। দেহে অন্তঃখণ্ডায়ন দেখা যায়।**১০। পরিপাকতন্ত্র** (Digestive system) : পরিপাকতন্ত্র সম্পূর্ণ, পরিপাকতন্ত্রে অন্তঃপরিপাক গ্রন্থি এবং দুটি বহিঃপরিপাক গ্রন্থি (যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়) বিদ্যমান। **১১। এন্ডোস্টাইল** (Endostyle) : এন্ডোস্টাইল অথবা থাইরয়েড গ্রন্থি (thyroid gland) বিদ্যমান।

❑ **কাজ :** (i) কর্ডেট প্রাণীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ কর।/Chordata পর্বটির বৈশিষ্ট্য লিখ। (ii) কেঁচো ও জোঁক কোন পর্বের তা ব্যাখ্যা কর। (iii) সাপ ও সিংহ, ঘাসফড়িং ও তেলাপোকা থেকে উন্নত – বিশ্লেষণ কর। (iv) সিলেন্টেরন, সন্ধিপদ অথবা ফুসফুস আছে এমন প্রাণীদের পর্বের নাম ও উদাহরণ দাও। (v) রুই মাছ অপর দুই প্রাণী গোলকৃমি ও ফিতাকৃমি হতে উন্নত– তোমার মতামত ব্যক্ত কর। (vi) কেঁচো এবং রুই মাছের মধ্যে কোনটি উন্নত এবং কেন? (vii) দোয়েল এবং কাক, প্রজাপতি ও জোঁক অপেক্ষা উন্নত ধরনের– ব্যাখ্যা কর। (viii) Chordata এবং Cnidaria পর্বগুলোর দুটি করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লিখ। (ix) কর্ডাটা পর্বের প্রাণীগুলো নন-কর্ডাটা পর্বের প্রাণী থেকে উন্নত বিশ্লেষণ কর।

2020/8/4 12:42
Scanned with CamScanner

১.৫ Chordata (কর্ডাটা) পর্বের শ্রেণিবিন্যাস (শ্রেণি পর্যন্ত)

Hickman *et al.* (2017) অনুসৃত প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী Chordata পর্বের শ্রেণিবিন্যাসটি নিম্নে ছক আকারে দেখানো হলো। প্রাণিগোষ্ঠীগুলোর প্রজাতি সংখ্যাও Hickman *et al.* (2017) অনুসৃত।

PHYLUM-CHORDATA

- Sub Phylum-1 UROCHORDATA
  - Class 1: ASCIDIACEA– *Ascidia mentula*
  - Class 2: THALIACEA– *Salpa maxima*
  - Class 3: LARVACEA– *Oikopleura albicans*
- Sub Phylum-2 CEPHALOCHORDATA (*Branchiostoma lanceolatum*)
- Sub Phylum-3 VERTEBRATA
  - Super class-1 AGNATHA
    - Class-1 : MYXINI– *Myxine glutinosa*
    - Class-2 : CEPHALASPIDOMORPHI– *Petromyzon marinus*
  - Super class-2 GNATHOSTOMATA
    - Class-1 : CHONDRICHTHYES – *Scoliodon laticaudus*
    - Class-2 : ACTINOPTERYGII – *Catla catla*
    - Class-3 : SARCOPTERYGII – *Latimeria chalumnae*
    - Class-4 : AMPHIBIA – *Hoplobatrachus tigerinus*
    - Class-5 : REPTILIA – *Naja naja*
    - Class-6 : AVES – *Bubo bubo*
    - Class-7 : MAMMALIA – *Homo sapiens*

■ উপপর্ব বা Sub Phylum-1 : UROCHORDATA (ইউরোকর্ডাটা; গ্রিক, *oura* = লেজ + Lt. *chorda* = রজ্জু)

এদের সকলেই সামুদ্রিক এবং সমুদ্রের তলদেশে এককভাবে (solitary) বা কলোনি গঠন (colonial) করে বাস করে। কিছু প্রজাতি সাইফন দিয়ে সজোরে পানি উৎসারিত করে বলে।) এরা **সামুদ্রিক ফোয়ারা** (sea squirt, tail chordate বা **টিউনিকেট** (tunicate) নামে পরিচিত। এরা **সাসপেনশন ফিডার** এবং এদের দেহে প্রাপ্ত **ডাইডেমনিন** (didemnins) নামক রাসায়নিক পদার্থ ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এ উপপর্বের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৩,০০০।

বৈশিষ্ট্য : (১) এরা **সামুদ্রিক** প্রাণী, সমুদ্রের তলদেশে এককভাবে বা কলোনি গঠন করে বসবাস করে। (২) লার্ভা দশা মুক্তজীবী, পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিশ্চল। (৩) লার্ভার **লেজে** কেবল **নটোকর্ড** (notochord) উপস্থিত, পরিণত প্রাণীর নটোকর্ড থাকে না। (৪) লার্ভা দশায় কেবল **নার্ভকর্ড** (nerve cord) উপস্থিত থাকে। (৫) দেহ সেলুলোজ নির্মিত **টেস্ট** (test) বা **টিউনিক** (tunic) নামক অর্ধস্বচ্ছ আবরণ দিয়ে ঢাকা। তাই এদের **টিউনিকেটা** (tunicata) বলে। এর আবরণের রাসায়নিক উপাদান **টিউনিসিন**। (৬) গলবিলে অসংখ্য ফুলকাছিদ্র বা **স্টিগমাটা** (stigmata) দেখা যায়। (৭) এরা উভলিঙ্গ এবং পরিস্ফুটন **অ্যাসিডিয়ান ট্যাডপোল** (ascidian tadepole) লার্ভার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। (৮) এদের **প্রতীপ রূপান্তর** বা **রেট্রোগ্রেসিভ রূপান্তর** (retrogressive metamorphosis) দেখা যায় অর্থাৎ লার্ভা দশা উন্নত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অনুন্নত বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। (৯) মুক্ত প্রকৃতির রক্ত সংবহনতন্ত্র বিদ্যমান; হৃৎচক্রে **'রিভার্স পেরিস্ট্যালসিস'** দেখা যায় অর্থাৎ রক্তপ্রবাহ প্রতিবার গতিপথ উল্টাদিকে পরিবর্তন করে।

উদাহরণ : *Ascidia, Salpa, Doliolum, Molgula, Pyrosoma, Herdmania* ইত্যাদি।

Urochordata উপপর্বের শ্রেণিসমূহের নাম, বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ উল্লেখ করা হলো–

শ্রেণি- ১ : Ascidiacea (অ্যাসিডিয়াসিয়া)

বৈশিষ্ট্য : (১) দেহ স্ফীতকায় বা নলাকার এবং **টিউনিক** নামক স্থায়ী, পুরু ও অর্ধস্বচ্ছ আবরণ দ্বারা আবৃত। (২) পূর্ণাঙ্গ প্রাণী নিশ্চল ও লেজ অনুপস্থিত। (৩) এদের **নটোকর্ড** লার্ভা দশায় সুগঠিত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ দশায় বিলুপ্ত। গলবিলে অসংখ্য ফুলকাছিদ্র থাকে; পৌষ্টিকনালি U আকৃতির। (৪) এরা একক বা কলোনি হিসেবে সমুদ্রের তলদেশে বসবাস করে। (৫) দেহের মুক্ত প্রান্তে বহির্বাহী ও অন্তর্বাহী সাইফন থাকে।

উদাহরণ : *Ascidia mentula, Molgula tubifera* প্রভৃতি।

2020/8/4 12:42

Scanned with CamScanner

শ্রেণি-২ : Thaliacea (থ্যালিয়েসিয়া)

বৈশিষ্ট্য : (১) এদের আকৃতি লেবু (lemon) বা পিপের (barrel) ন্যায়। পরিণত প্রাণীতে লেজ অনুপস্থিত। (২) এরা সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় থাকে। টিউনিক আবরণী স্বচ্ছ ও পাতলা। (৩) দেহের পেশিগুলো বলয়াকারে বিন্যস্ত। গলবিলীয় **ফুলকা ছিদ্র** সংখ্যায় কম। (৪) দেহের এক প্রান্তে বহির্বাহী ও অন্য প্রান্তে অন্তর্বাহী সাইফন থাকে। (৫) কিছু প্রজাতির দেহে আলোক বিচ্ছুরণকারী **লুমিনাস অঙ্গ** (luminous organs) থাকায় রাতের উজ্জ্বল আলোর ছড়াতে দেখা যায়।

উদাহরণ : *Salpa maxima, Doliolum rarum* প্রভৃতি।

শ্রেণি-৩ : Larvacea (লার্ভেসিয়া)

বৈশিষ্ট্য : (১) এদের আকৃতি বাঁকা ব্যাঙাচির ন্যায়। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর **নটোকর্ড** ও **নার্ভকর্ড** উন্নত ধরনের। (২) টিউনিক আবরণী সাময়িক, জিলেটিনের মতো স্বচ্ছ ও পাতলা। পরিণত প্রাণীতে লেজ উপস্থিত। (৩) এরা ভাসমান ও সন্তরণশীল। **ফুলকা ছিদ্র** দুটি। উন্নত খাদ্য সংগ্রহ যন্ত্র বর্তমান।

উদাহরণ : *Oikopleura albicans, Appendicularia* প্রভৃতি।

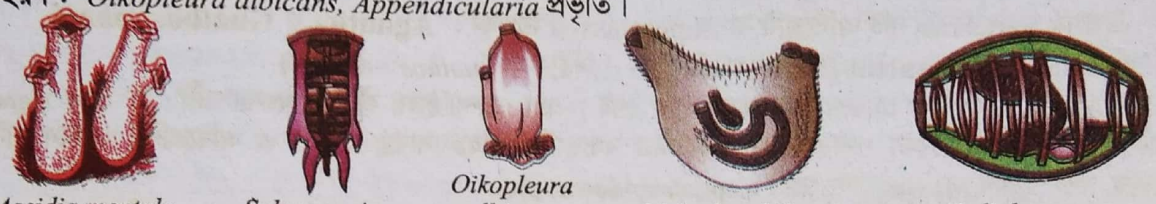

Ascidia mentula (Ascidiacea) · *Salpa maxima* (Thaliacea) · *Oikopleura albicans* (Larvacea) · *Molgula tubifera* (Ascidiacea) · *Doliolum rarum* (Thaliacea)

চিত্র ১.১৬ : Urochordata উপপর্বের কয়েকটি প্রাণী

■ **উপপর্ব বা Sub-phylum 2: CEPHALOCHORDATA** (সেফালোকর্ডাটা; গ্রিক, *kephale* = মাথা + *chorda* = রজ্জু)

এ উপপর্বের শনাক্তকৃত প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৩৩। এদেরকে ইংরেজিতে **Lancelet** (বর্শাফলক প্রাণী) বলে। এরা উপকূলীয় পানির বালুময় তলদেশে বাস করে। এদের মাঝে কর্ডেট প্রাণীর সকল আদি ও সরল রূপ বিদ্যমান। বর্তমানে Amphioxus নামটি এদের সাধারণ নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বৈশিষ্ট্য : (১) দেহ লম্বা, নৌকাকৃতি, দু'প্রান্ত সরু। এরা সামুদ্রিক প্রাণী। (২) সুস্পষ্ট মস্তক নেই। মুখছিদ্র **ওরাল হুড** (oral hood) পরিবেষ্টিত। ওরাল হুডে **সিরি** (cirri) অবস্থিত। (৩) আজীবন লার্ভা ও পরিণত প্রাণীর দেহে দৈর্ঘ্য বরাবর নটোকর্ড ও স্নায়ুরজ্জু বিস্তৃত থাকে। (৪) গলবিলে অসংখ্য ফুলকা ছিদ্র বিদ্যমান, ফুলকাগুলো অ্যাট্রিয়ামে উন্মুক্ত। **করোটিকা** ও **চোয়াল** অনুপস্থিত। (৫) দেহের দু'পাশে '>' আকৃতির **মায়োটোম পেশি** (myotome muscles) পরস্পর সজ্জিত থাকে। এদের সংখ্যা প্রায় ৬০ জোড়া। (৬) সংবহনতন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির ও উন্নত। হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসরঞ্জক নেই; হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র উপস্থিত। রেচন অঙ্গ **সোলেনোসাইটযুক্ত** (solenocytes) নেফ্রিডিয়া। (৭) এদের বহিঃনিষেক ঘটে; পরিস্ফুটন পরোক্ষ। স্বাধীনজীবী সিলিয়েটেড লার্ভা থাকে।

উদাহরণ : *Branchiostoma lanceolatum* (অ্যাম্ফিঅক্সাস), *Asymmetron* sp. (অ্যাসিমেট্রন) প্রভৃতি।

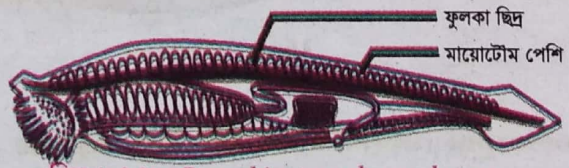

চিত্র ১.১৭ : *Branchiostoma lanceolatum*

■ **উপপর্ব বা Sub-phylum 3 : VERTEBRATA** (ভার্টিব্রাটা; ল্যাটিন, *vertebratus* = মেরুদণ্ড বিশিষ্ট)

Chordata পর্বের Vertebrata উপপর্বের প্রাণীরা সবচেয়ে উন্নত প্রাণী, কারণ এদের মাঝে কর্ডেটের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও আরও কিছু অন্যন্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এদের অস্থিময় বা তরুণাস্থিময় **ক্রেনিয়াম** (cranium) থাকায় এদের **ক্রেনিয়েটা** (craniata) বলা হয়। এ উপপর্বের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৬৫,৭৮৯।

বৈশিষ্ট্য : (১) ভ্রূণ অবস্থায় **নটোকর্ড** উপস্থিত। কিন্তু পরিণত অবস্থায় **মেরুদণ্ডে** (vertebral column) রূপান্তরিত হয়। তাই এদের মেরুদণ্ডী বা ভার্টিব্রাটা বলে। (২) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র উপস্থিত। নার্ভকর্ড** বা **স্নায়ুরজ্জু** রূপান্তরিত হয়ে **মস্তিষ্ক** (brain) ও **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) গঠন করে। (৩) গলবিলীয় **ফুলকারন্ধ্র** (৫-১৫ জোড়া) থাকে, উন্নত মেরুদণ্ডীদের গলবিলীয় ফুলকারন্ধ্র প্রাথমিক পর্যায়ে (ভ্রূণদশায়) থাকে। (৪) মস্তিষ্ক **করোটিকা** (cranium) দ্বারা সুরক্ষিত। তাই এদের **ক্রেনিয়াটা** (craniata) বলে। করোটিয় স্নায়ুর সংখ্যা ৮ বা ১০ বা ১২ জোড়া। (৫) সংবহনতন্ত্র

2020/8/4 12:42

Scanned with CamScanner

বদ্ধ প্রকৃতির। **হিমোগ্লোবিন** লোহিত কণিকায় বিদ্যমান। হৃৎপিণ্ড **দুই বা তিন বা চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট**। (৬) শ্বসন অঙ্গ **ফুলকা** (জলজ প্রাণী) বা **ত্বক** বা **ফুসফুস**। (৭) দেহে **অন্তঃকঙ্কাল উপস্থিত**, যা অস্থি বা তরুণাস্থি বা উভয় দ্বারা গঠিত। (৮) সাধারণত দেহের দু'পাশে **যুগ্ম গমন অঙ্গ** (পাখনা বা পদ) উপস্থিত। (৯) বৃক্ক (kidney) প্রধান রেচন অঙ্গ, এটি অসমোরেগুলেশনও নিয়ন্ত্রণ করে। (১০) **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (endocrine gland) বিদ্যমান।

❑ **কাজ :** (i) Vertebrata উপপর্বের প্রাণী Urochordata এবং Cephalochordata উপপর্বের প্রাণীর চেয়ে উন্নত– বিশ্লেষণ কর। (ii) নটোকর্ডের উপর ভিত্তি করে Chordata পর্বটির বিভিন্ন উপপর্বের বিভক্তি ব্যাখ্যা কর। (iii) *Ascidia* যে উপপর্বের প্রাণী তার বৈশিষ্ট্য লিখ/ Urochordata উপপর্বের বৈশিষ্ট্য লিখ। (iv) *Ascidia* এবং *Lamellidens* এর মধ্যে কোনটি উন্নততর– ব্যাখ্যা কর। (v) অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে *Lamellidens* এবং *Entamoeba* প্রাণী দুটির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরো।

Vertebrata বা মেরুদণ্ডী প্রাণিদের শ্রেণিবিন্যাস

উপপর্ব Vertebrata দুটি অধিশ্রেণি বা Superclass-এ বিভক্ত : **Agnatha** ও **Gnathostomata.**

■ **অধিশ্রেণি- ১ : Agnatha (অ্যাগনাথা; গ্রিক,** *a* = বিহীন + *gnathos* = চোয়াল)

Agnatha-এর প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গ নেই। এরা তরুণাস্থিময় জীবিত মৎস্যগোষ্ঠী। এ ছাড়া Agnatha-র ক্রেনিয়ামের উপরের দিকটা পর্দাসদৃশ ও একটিমাত্র মধ্যস্থানীয় বহিঃনাসারন্ধ্র থাকে। এ অধিশ্রেণির অধীনে দুটি শ্রেণি রয়েছে, যথা– **শ্রেণি Myxini** এবং **শ্রেণি Cephalaspidomorphi.**

শ্রেণি-১ : Myxini (মিক্সিনি, গ্রিক, *myxa* = পিচ্ছিল আবরণ)

এদের সকলেই সামুদ্রিক এবং স্বাধীনজীবী; দেখতে বাইন মাছের (eel-fish) ন্যায়, এদেরকে **স্লাইম ইলও** (slime eels) বলা হয়। এরা সাধারণত **হ্যাগফিশ** (hagfish) বা কুৎসিত মাছ নামে পরিচিত। এ শ্রেণির প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৭০।

বৈশিষ্ট্য : (১) আদি প্রকৃতির মেরুদণ্ডী, দেহ সরু, লম্বাটে, পিচ্ছিল ও দুর্বল প্রকৃতির। (২) চোয়াল, বহিঃকঙ্কাল, পৃষ্ঠ পাখনা ও আঁইশ অনুপস্থিত। (৩) মুখছিদ্র প্রান্তীয় ও ৪ জোড়া কর্ষিকাযুক্ত। (৪) নাসিকাথলি মুখ গহ্বরে উন্মুক্ত; মাথার দু'পাশে ফুলকাছিদ্র ৫-১৫ জোড়া। হৃৎপিণ্ড দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট (অলিন্দ ও নিলয়)। (৫) মেরুদণ্ডে নটোকর্ড এবং তন্তুময় নিউরাল টিউব (neural tube) বিদ্যমান। (৬) একলিঙ্গ প্রাণী, নিষেক বাহ্যিক, প্রজনন অঙ্গে নালি অনুপস্থিত, লার্ভা দশা অনুপস্থিত। (৭) পরিপাকতন্ত্র পাকস্থলী বিহীন; অন্ত্রে সিলিয়া কিংবা সর্পিল কপাটিকা থাকে না।

উদাহরণ : *Myxine glutinosa* (আটলান্টিক হ্যাগফিশ), *Paramyxine moki* (হ্যাগফিশ), *Eptatretus stoutii* (প্রশান্ত মহাসাগরীয় হ্যাগফিশ) প্রভৃতি।



Myxine glutinosa

চিত্র ১.১৮ : Myxini শ্রেণির একটি প্রাণী

শ্রেণি-২ : Cephalaspidomorphi (সেফালাসপিডোমর্ফি; গ্রিক, *kephale* = head + *aspidos* = shield + *morphe* = form)

এদের সাধারণ নাম **ল্যামপ্রে** (lamprey)। সবাই সামুদ্রিক হলেও ডিম পাড়ার জন্য মিঠাপানিতে অভিপ্রয়াণ করে। ডিম পাড়ার পর কয়েকদিনের মধ্যেই এরা মারা যায়। ডিম ফুটে **অ্যামোসিট লার্ভা** (amoecete larva) বেরিয়ে রূপান্তর শেষে নদী থেকে সমুদ্রে যাত্রা করে। এদের অনেকেই পরজীবী। এ শ্রেণির প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৪৬।

বৈশিষ্ট্য : (১) আদি প্রকৃতির মেরুদণ্ডী, দেহ সরু, লম্বাটে, পিচ্ছিল ও সবল প্রকৃতির। (২) চোয়াল, বহিঃকঙ্কাল ও আঁইশ অনুপস্থিত, কিন্তু একটি বা দুটি **পৃষ্ঠ পাখনা** উপস্থিত। (৩) **কেরাটিনময় হর্নি দাঁতযুক্ত ও চোষণক্ষমতা** সম্পন্ন মুখছিদ্র বিদ্যমান অর্থাৎ পরিণত প্রাণীর মুখে চোষক সদৃশ **মুখ চুঙ্গি** (buccal funel) বিদ্যমান। (৪) নাসিকা থলি গলবিলে উন্মুক্ত নয়; ফুলকাছিদ্র ৭ জোড়া। হৃৎপিণ্ড দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট (অলিন্দ ও নিলয়)। (৫) মেরুদণ্ডে নটোকর্ড এবং তন্তুময় নিউরাল টিউব (neural tube) বিদ্যমান। (৬) প্রজনন অঙ্গে নালি অনুপস্থিত; অ্যামোসিটিস (amoecetes) লার্ভা দশার গলবিলে এন্ডোস্টাইল উপস্থিত।

2020/8/4 12:42

Scanned with CamScanner

উদাহরণ : *Petromyzon marinus* (ল্যামপ্রে), *Lampetra tridentatus* (ল্যামপ্রে), *Geotria australis* প্রভৃতি।



Petromyzon marinus

চিত্র ১.১৯ : Cephalaspidomorphi শ্রেণির একটি প্রাণী

■ **অধিশ্রেণি- ২ : Gnathostomata (ন্যাথোস্টোমাটা;** গ্রিক, *gnathos* = jaw, চোয়াল + *stoma* = mouth, মুখ)

Gnathostomata অধিশ্রেণির প্রাণীদের একজোড়া নাসারন্ধ্র ও শ্বাসকার্যের জন্য ফুলকা বা ফুসফুস থাকে। এরা প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গবিশিষ্ট এবং তরুণাস্থি ও অস্থিময় প্রাণিগোষ্ঠী। এ অধিশ্রেণিতে বিভিন্ন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর সমাবেশ ঘটেছে। এ অধিশ্রেণিকে ৭টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

শ্রেণি-১ : Chondrichthyes (কন্ড্রিকথিস; তরুণাস্থিময় মাছ– গ্রিক, *chondros* = cartilage, তরুণাস্থি + *ichthyes* = fish, মাছ)

তরুণাস্থিময় অন্তঃকঙ্কালযুক্ত মাছদের এ শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এটি প্রাচীন হলেও বেশ উন্নত গোষ্ঠী, সুগঠিত সংবেদ অঙ্গ, শক্তিশালী লেজ ও সাঁতার পেশি এবং শিকারি স্বভাব সব মিলিয়ে জলজ পরিবেশের এক দাপুটে গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। এদের সকলেই সামুদ্রিক ও শিকারি। এ শ্রেণির জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১০০০।

বৈশিষ্ট্য : ১। দেহ পৃষ্ঠীয়-অঙ্কীয় চ্যাপ্টা অথবা মাকু আকৃতির; অন্তঃকঙ্কাল **তরুণাস্থিময়** (cartilagenous)। এরা সামুদ্রিক, মাংসাশী ও **এক্টোথার্মিক** বা **শীতল রক্তবিশিষ্ট** (poikilothermal or ectothermic or cold blooded)।

২। দেহ অসংখ্য **ক্ষুদ্র প্ল্যাকয়েড** (placoid; সূক্ষ্ম কাঁটার মতো) আঁইশ দ্বারা আবৃত অথবা নগ্ন।

৩। মুখছিদ্র অর্ধচন্দ্রাকার, **অঙ্কীয়দেশে** অবস্থিত। পুচ্ছ পাখনা **হেটারোসার্কাল** (heterocercal; দুটি অংশ অসমান) ধরনের।

৪। শ্বসন অঙ্গ ফুলকা (gill), ৫-৭ জোড়া ফুলকারন্ধ্র থাকে। **কানকো** (operculum; ব্যতিক্রম-*Chimaera*) ও **পটকা** বা **বায়ুথলি** (swim bladder) থাকে না। পৌষ্টিকনালি **অবসারণী ছিদ্র** (cloacal aperture) দিয়ে উন্মুক্ত।

৫। হৃৎপিণ্ড ২ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (অলিন্দ ও নিলয়)। **সাইনাস ভেনোসাস** (sinus venosus) এবং **কোনাস আর্টেরিওসাস** (conus arteriosus) উপস্থিত।



পুচ্ছ পাখনা হেটারোসার্কাল প্ল্যাকয়েড আঁইশ

চিত্র ১.২০ক : Chondrichthyes শ্রেণির বৈশিষ্ট্য

৬। **নাসারন্ধ্র** মুখ গহ্বরে উন্মুক্ত; চোয়ালে অসংখ্য সারিবদ্ধ দাঁত থাকে। করোটিক স্নায়ু ১০ জোড়া।

৭। এরা একলিঙ্গ, অন্তঃনিষেক ঘটে, পরিস্ফুটন প্রত্যক্ষ; পুরুষের শ্রোণিপাখনাদ্বয়ের মাঝে **ক্লাসপার** (clasper) নামক সংগম অঙ্গ থাকে।

৮। এরা ডিম্বজ (oviparous), ডিম্বজরায়ুজ (ovoviviparous) বা জরায়ুজ (viviparous) প্রাণী।

উদাহরণ : *Scoliodon laticaudus* (থুট্টি হাঙর বা ডগফিশ), *Pristis pectinata* (করাত মাছ), *Torpedo torpedo* (ইলেকট্রিক মাছ), *Eusphyra blochii* (হাতুড়ি হাঙর), *Trygon bleekeri* (শংকর মাছ) প্রভৃতি।



Scoliodon laticaudus (থুট্টি হাঙর বা ডগফিশ)
Pristis pectinata (করাত মাছ)
Eusphyra blochii (হাতুড়ি হাঙর)
Trygon bleekeri (শংকর মাছ)
Torpedo torpedo (ইলেকট্রিক মাছ)

চিত্র ১.২০খ : Chondrichthyes শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

2020/8/4 12:42

Scanned with CamScanner

শ্রেণি-২ : Actinopterygii (অ্যাকটিনোপটেরিজি; অস্থিযুক্ত মাছ-গ্রিক, *actis* = rays, রশ্মি + *pteryx* = fin, পাখনা)

অস্থিময় অন্তঃকঙ্কালযুক্ত মাছদের এ শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এরা **রশ্মিময় পাখনাবিশিষ্ট মাছ** (ray-fined fishes) নামে পরিচিত। সকল প্রকার জলীয় পরিবেশে এরা বাস করে। এ শ্রেণির জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৩১,০৪৫। জীবিত মাছের প্রায় ৯৬% এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। **বাংলাদেশের মিঠা পানিতে ১২টি বর্গ ও ৪৮টি গোত্রের ২৫৩ প্রজাতির মাছ শনাক্ত করা হয়েছে** (IUCN Red List of Bangladesh, 2015)।

বৈশিষ্ট্য : ১। অন্তঃকঙ্কাল **অস্থিময়**। এরা সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ, **এক্টোথার্মিক** বা শীতল রক্তবিশিষ্ট।

২। ত্বক গ্রন্থিময় এবং সাধারণত **সাইক্লয়েড** (cycloid, গোলাকার) অথবা **টিনয়েড** (ctenoid, কাঁটাযুক্ত) ধরনের আঁইশ দ্বারা আবৃত। কিছু ক্ষেত্রে আঁইশ নেই অর্থাৎ নগ্ন (যেমন : সকল ক্যাটফিশ- শিং, মাগুর ইত্যাদি)।



সাইক্লয়েড টিনয়েড পুচ্ছ-পাখনা হোমোসার্কাল

চিত্র ১.২১ক : Actinopterygii শ্রেণির বৈশিষ্ট্য

৩। মুখছিদ্র অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত, পুচ্ছ পাখনা **হোমোসার্কাল** (homocercal; দুটি অংশ সমান)।

৪। শ্বসন অঙ্গ ৪ জোড়া ফুলকা, মাথার দু'পাশে একটি করে ফুলকারন্ধ্র থাকে, যা **কানকো** (operculum) দিয়ে আবৃত। **পটকা** বা **বায়ুথলি** (swim bladder) বিদ্যমান, যা দেহকে পানিতে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

৫। হৃৎপিণ্ড ২ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট; লোহিত কণিকা নিউক্লিয়াসযুক্ত।

৬। **নাসারন্ধ্র** মুখ গহ্বরে উন্মুক্ত নয়, করোটিক স্নায়ু ১০ জোড়া।

৭। এরা একলিঙ্গ প্রাণী, বহিঃনিষেক ঘটে।

উদাহরণ– *Labeo rohita* (রুই), *Catla catla* (কাতল), *Tenualosa ilisha* (ইলিশ), *Channa punctata* (টাকি), *Notopterus chitala* (চিতল), *Tor tor* (মহাশোল), *Rita rita* (রিটা) প্রভৃতি।

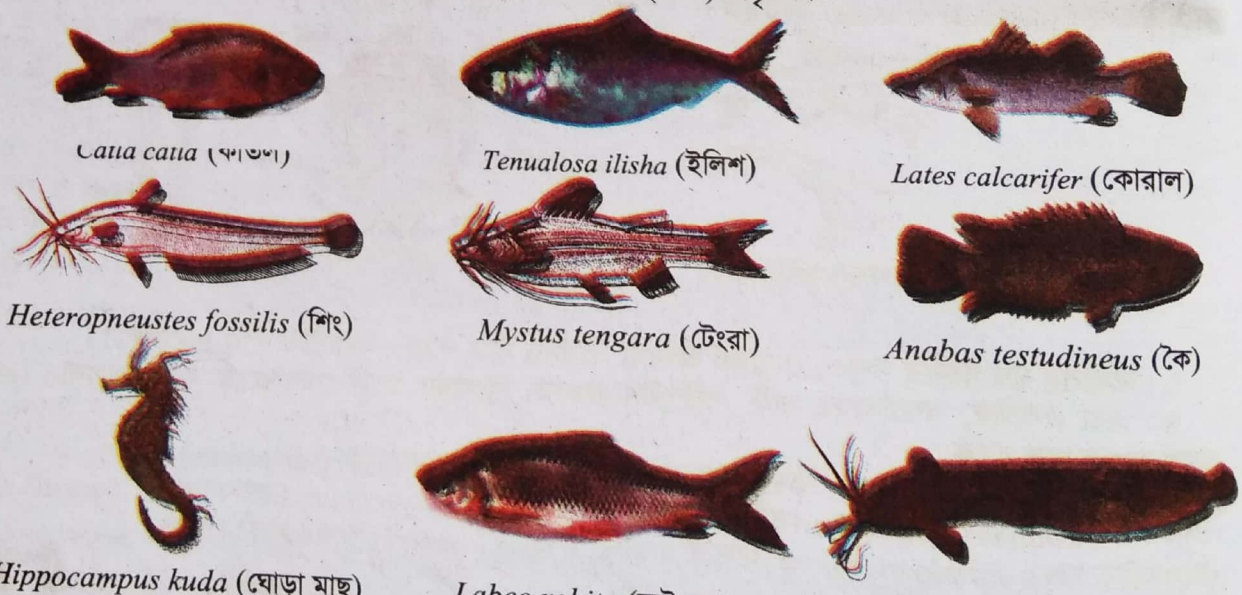

Catla catla (কাতল) *Tenualosa ilisha* (ইলিশ) *Lates calcarifer* (কোরাল)

Heteropneustes fossilis (শিং) *Mystus tengara* (টেংরা) *Anabas testudineus* (কৈ)

Hippocampus kuda (ঘোড়া মাছ) *Labeo rohita* (রুই মাছ) *Clarias batrachus* (মাগুর মাছ)

চিত্র ১.২১খ : Actinopterygii শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

শ্রেণি-৩ : Sarcopterygii (সার্কোপটেরিজি; অস্থিযুক্ত মাছ- গ্রিক, *sarkas* = মাংসল + *pteryx* = পাখনা)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছও অস্থিময় অন্তঃকঙ্কালযুক্ত। এরা **পিণ্ডময় পাখনাবিশিষ্ট মাছ** (lobed-fined fishes) এবং অত্যন্ত আদি প্রকৃতির। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ শ্রেণিরই কোনো মাছ থেকে চতুষ্পদী ও স্থলচর প্রাণী হিসেবে উভচর গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। এদের অধিকাংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ৮ প্রজাতির মাছ বর্তমানে জীবিত আছে, এরা বিবর্তনিক গুরুত্ব বহন করে। **লাংফিশ** (lungfish- আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত) ও **সিলাকান্থ** (silacanth-ভারত মহাসাগর ও ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে বিস্তৃত) মাছ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

2020/8/4 12:42

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্য :

১। অন্তঃকঙ্কাল **অস্থিময়**; শীতল রক্তবিশিষ্ট।

২। দেহ **গ্যানয়েড** (ganoid, বহিঃস্তর গ্যানয়েনে গঠিত) বা **কসময়েড** (cosmoid, কসমিনে গঠিত) ধরনের আঁইশে আবৃত।

৩। পুচ্ছ পাখনা **ডাইফিসার্কাল** (diphycercal; পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় পাখনা একীভূত হয়ে গঠিত হয় অর্থাৎ সূঁচালো লেজের প্রান্ত পর্যন্ত মেরুদণ্ড বিস্তৃত থাকে)।

৪। উদর গহ্বরে রক্তজালিকা-সমৃদ্ধ **পটকা** (swim bladder) উপস্থিত, যা শ্বসন ও পানিতে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।



চিত্র ১.২২ক : Sarcopterygii শ্রেণির বৈশিষ্ট্য

৫। শ্বসন অঙ্গ ফুলকা (ল্যাংফিশের ফুলকা ও ফুসফুস), মাথার দু'পাশে একটি করে ফুলকারন্ধ্র থাকে, যা **কানকো** দিয়ে আবৃত।

৬। হৃৎপিণ্ড ২ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট; লোহিত কণিকা নিউক্লিয়াসযুক্ত। করোটিক স্নায়ু ১০ জোড়া।

৭। এরা একলিঙ্গ প্রাণী, বহিঃনিষেক বা অন্তঃনিষেক (ল্যাংফিস) ঘটে।

উদাহরণ : *Latimeria chalumnae* (সিলাকান্থ), *Lepidosiren paradoxa* (দক্ষিণ আমেরিকান লাংফিশ), *Neoceratodus forsteri* (অস্ট্রেলিয়ান লাংফিশ), *Protopterus annectens* (আফ্রিকান লাংফিশ) প্রভৃতি।



চিত্র ১.২২ খ : Sarcopterygii শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

শ্রেণি-৪ : Amphibia (অ্যাম্ফিবিয়া; গ্রিক, *amphi* = both, উভয় + *bios* = life, জীবন)

এ শ্রেণির সদস্যরা প্রথম স্থলবাসী চতুষ্পদী বা **টেট্রাপোড** (tetrapod) জাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা মূলত স্থলচর হলেও জননকালে এরা ডিম পাড়তে পানিতে আসে এবং পানিতেই ডিমের পরিস্ফুটন ঘটে। এ কারণে এ গোষ্ঠীর সদস্যরা উভচর নামে পরিচিত। এদের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এ শ্রেণির জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৭,৭০০টি। এর মধ্যে লেজবিশিষ্ট প্রজাতি ৭১৫টি, পাবিহীন প্রজাতি ২০০টি এবং অবশিষ্ট ৬,৮৩৬টি প্রজাতি চার পা-বিশিষ্ট উভচর (ব্যাঙ)। **বাংলাদেশে ২টি বর্গ ও ৮টি গোত্রের ৪৯ প্রজাতির (৪৭টি ব্যাঙ ও ২টি সিসিলিয়ান) উভচর প্রাণী শনাক্ত করা হয়েছে** (IUCN Red List of Bangladesh, 2015)।

বৈশিষ্ট্য :

১। দেহত্বক **নগ্ন, আঁচিলযুক্ত, ভেজা** ও **গ্রন্থিময়**। শীতল রক্তবিশিষ্ট বা **এক্টোথার্মিক** (ectothermic)।

২। লার্ভা দশায় **ফুলকা** এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় **ফুসফুস, ত্বক** ও **মুখবিবরীয় মিউকাস ঝিল্লি** দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়।

৩। অগ্রপদে চারটি ও পশ্চাৎপদে পাঁচটি নখরবিহীন আঙুল থাকে; কিছু প্রাণীতে পদ থাকে না।



চিত্র ১.২৩ক : Amphibia শ্রেণির বৈশিষ্ট্য

৪। হৃৎপিণ্ড তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (দুটি অলিন্দ বা অ্যাট্রিয়া ও একটি নিলয় বা ভেন্ট্রিকল), এতে সাইনাস ভেনোসাস ও কোনাস আর্টেরিওসাস নামক উপপ্রকোষ্ঠ থাকে। রেনাল ও হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র উন্নত ধরনের।

৫। লোহিত কণিকা নিউক্লিয়াসযুক্ত; করোটিক স্নায়ু ১০ জোড়া; নিষেক বাহ্যিক।

2020/8/4 12:42

Scanned with CamScanner

৬। এরা একলিঙ্গ, পুরুষে সঙ্গম অঙ্গ নেই; জীবনচক্রে সাধারণত **ট্যাডপোল** (tadepole) লার্ভা দশা দেখা যায়।
৭। ভ্রূণীয় অবস্থায় জলচর, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জলচর বা স্থলচর। এদের **শীতনিদ্রা** (hibernation) দেখা যায়।

উদাহরণ : *Duttaphrynus melanostictus* (কুনোব্যাঙ), *Pipa pipa* (জলজ টোড), *Salamandra maculosa* (স্যালামান্ডার), *Siren lacertina* (সাইরেন) প্রভৃতি।



Duttaphrynus melanostictus
(কুনোব্যাঙ)

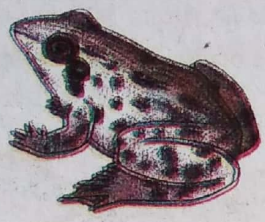

Hoplobatrachus tigerinus
(সোনাব্যাঙ)

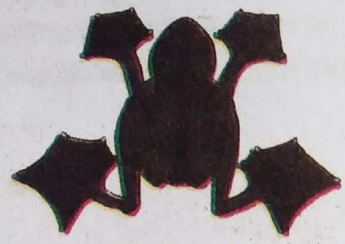

Rhacophorus maculatus
(গেছোব্যাঙ)



Salamandra maculosa
(স্যালামান্ডার)



Hyla arborea (হাইলা)

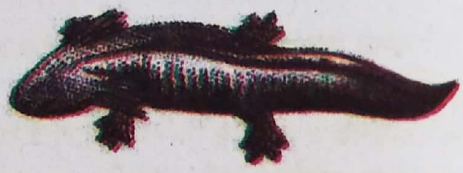

Necturus maculosus (পানির কুকুর)

চিত্র ১.২৩খ : Amphibia শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

শ্রেণি-৫ : Reptilia (রেপ্টিলিয়া বা সরীসৃপ; ল্যাটিন, *repto* = creep, হামাগুড়ি দিয়ে চলন)

বহু প্রাচীন যুগে রেপ্টিলিয়াদের আবির্ভাব ঘটলেও Mesozoic Era-কে **সরীসৃপদের সুবর্ণ** যুগ বলে। এ শ্রেণির সদস্যরাই মেরুদণ্ডীদের মধ্যে প্রথম পূর্ণ বিকশিত স্থলবাসী চতুষ্পদী প্রাণী। অতিকায় ও ভয়ঙ্কর বিলুপ্ত ডাইনোসরসহ (Dinosaur) কচ্ছপ, সাপ, কুমীর, টিকটিকি, গুইসাপ, টুয়াটারা প্রভৃতি এ শ্রেণিভুক্ত। এ শ্রেণির জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১০,৪৫০। **বাংলাদেশে ৩টি বর্গ ও ২৫টি গোত্রের মোট ১৬৭ প্রজাতির সরীসৃপ প্রাণী শনাক্ত করা হয়েছে** (IUCN Red List of Bangladesh, 2015)।

বৈশিষ্ট্য :

১। ত্বক শুষ্ক এবং গ্রন্থিবিহীন, এপিডার্মাল আঁইশে (সাপ) বা শক্ত **প্লেট** বা **স্কুটসে** (কুমির) বা **ক্যারাপেসে** (কচ্ছপ) আবৃত।
২। দুই জোড়া পদ (সাপ পা-বিহীন), উভয় পদে পাঁচটি করে নখরযুক্ত আঙুলবিশিষ্ট। **বুকে ভর** দিয়ে চলে।
৩। হৃৎপিণ্ড অসম্পূর্ণভাবে ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (দুটি অলিন্দ এবং একটি অর্ধবিভক্ত নিলয়; ব্যতিক্রম: কুমির– ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট), এতে সাইনাস ভেনোসাস থাকে কিন্তু কোনাস আর্টেরিওসাস থাকে না।



বুকে ভর দিয়ে চলাচল



হৃৎপিণ্ডের নিলয় অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত

চিত্র ১.২৪ক : Reptilia শ্রেণির বৈশিষ্ট্য

৪। লোহিত কণিকা নিউক্লিয়াসযুক্ত। শীতল রক্তবিশিষ্ট বা **এক্টোথার্মিক**। শীতনিদ্রা দেখা যায়।
৫। মাথার করোটি একটি একটি **অক্সিপিটাল কন্ডাইল** (occipital condyle) দ্বারা মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। শ্বসন অঙ্গ ফুসফুস। করোটিক স্নায়ু ১২ জোড়া।

2020/8/4 12:43

Scanned with CamScanner

৬। এরা একলিঙ্গ, পুরুষ প্রাণীদের পেশিময় সংগম অঙ্গ (muscular coupulatory organs) থাকে। নিষেক অভ্যন্তরীণ, অধিকাংশই ডিম পাড়ে, অর্থাৎ **ওভিপেরাস** (oviparous)। ডিম চুনময় (ক্যালসিয়ামযুক্ত) বা চামড়ার ন্যায় খোলসে আবৃত।

৭। লার্ভা দশা নেই, ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লি সৃষ্টি হয়। অপত্য লালন দেখা যায় না।

উদাহরণ : *Trionyx gangeticus* (কচ্ছপ), *Naja naja* (গোখরা সাপ), *Varanus bengalensis* (গুইসাপ), *Gavialis gangeticus* (ঘড়িয়াল) প্রভৃতি।



Trionyx gangeticus (কচ্ছপ) *Naja naja* (গোখরা সাপ) *Calotes versicolor* (ক্যামেলিয়ান) *Crocodylus palustris* (স্বাদুপানির কুমির)

Hemidactylus brookii (টিকটিকি) *Calotes versicolor* (গিরগিটি) *Draco maculatus* (উড়ন্ত টিকটিকি)

চিত্র ১.২৪খ : Reptilia শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

শ্রেণি-৬ : Aves (অ্যাভিস; ল্যাটিন, *avis* = bird, পাখি)

এ শ্রেণিভুক্ত প্রাণীরা পাখি নামে পরিচিত। পাখিদের উদ্ভব ঘটেছে ১৫০ মিলিয়ন বছর আগে জুরাসিক পিরিয়ডে। তবে আধুনিক পাখিরা ক্রিটেসিয়াস পিরিয়ডে উদ্ভূত। প্রাণিবিদ Huxley সরীসৃপ থেকে পাখিদের উদ্ভব হয়েছে বলে, **'birds are glorified reptile'** বলে অভিহিত করেছেন। মেরু অঞ্চলসহ পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে পাখি বিস্তৃত। অনেক প্রজাতির পাখি আবার এতটাই সুযোগসন্ধানী যে, বছরের নির্দিষ্ট সময়কাল ভিন্ন দেশে কাটিয়ে স্বদেশে ফেরত আসে। এদের দেহ উড্ডয়নের জন্য অভিযোজিত তাই এরা **উড্ডয়ন যন্ত্র** (flying machine) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পৃথিবীতে এ শ্রেণির প্রজাতির সংখ্যা ১,০০০০ এর অধিক। **বাংলাদেশে ২১টি বর্গের অধিনে মোট ৭০৬ প্রজাতির পাখি শনাক্ত করা হয়েছে** (IUCN Red List of Bangladesh, 2015)।

বৈশিষ্ট্য :

১। দেহ মাকু আকৃতিবিশিষ্ট; অস্থি **হালকা** ও **বায়ুগহ্বরপূর্ণ** (pneumatic)।

২। দেহ **পালক** (feather) দ্বারা আবৃত; গ্রীবা প্রলম্বিত এবং 'S' আকৃতির। পদ দুই জোড়া, **অগ্রপদ** ডানায় (wing) রূপান্তরিত হয়।

৩। স্টার্নাম কিল অস্থিতে (keel bone) রূপান্তরিত।

৪। চোয়াল দন্তহীন **চঞ্চুতে** পরিণত হয়। ফুসফুসে অতিরিক্ত **বায়ুথলি** (air sac) বিদ্যমান। শ্বসনযন্ত্রে শব্দ সৃষ্টিকারী অঙ্গ **সিরিংক্স** (syrinx) বিদ্যমান। ল্যারিংক্সে ভোকাল কর্ড অনুপস্থিত।

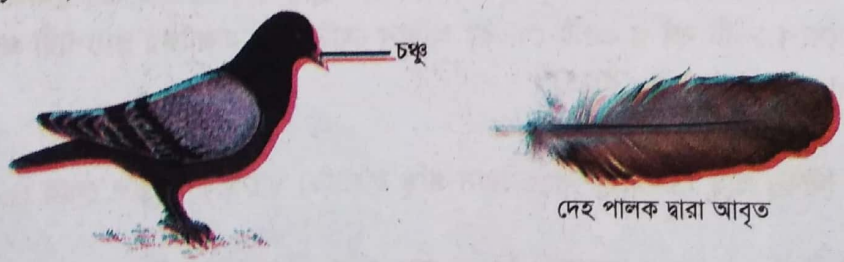

চিত্র ১.২৫ক : Aves শ্রেণির বৈশিষ্ট্য

৫। হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়), এতে সাইনাস ভেনোসাস থাকে ও কোনাস আর্টেরিওসাস থাকে না। লোহিত কণিকা নিউক্লিয়াসযুক্ত।

2020/8/4 12:43

Scanned with CamScanner

৬। পরিপাকতন্ত্রে থলিরন্যায় **ক্রপ** (crop) এবং পেশিময় পেষণ যন্ত্র **গিজার্ড** (gizzard) বিদ্যমান। ক্রপ থেকে **ক্রপ মিল্ক** (crop milk) নির্গত হয়।

৭। এরা **সমোষ্ণশোণিত** বা **হোমিওথার্মাল** বা **এন্ডোথার্মিক** (warm blooded or homeothermal or endothermic); এরা একলিঙ্গ, নিষেক অভ্যন্তরীণ, **ওভিপেরাস** (oviparous) প্রাণী। স্ত্রীদের কেবল কার্যকরি বাম ডিম্বাশয় থাকে।

উদাহরণ : *Gallus gallus* (মোরগ), *Bubo buba* (প্যাঁচা), *Passer domesticus* (চড়ুই), *Anser anser* (রাজহাঁস) প্রভৃতি।



Copsychus saularis (দোয়েল)



Gallus gallus (মোরগ)



Gallus domesticus (মুরগি)



Bubo bubo (প্যাঁচা)



Corvus splendens (কাক)



Anas clypeata (হাঁস)



Haliaeetus leucocephalus (ঈগল)



Struthio camelus (উট)



Psittacula eupatria (টিয়া)



Columba livia (কবুতর)



Pavo cristatus (ময়ূর)

চিত্র ১.২৫খ : Aves শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

শ্রেণি-৭ : Mammalia (ম্যামালিয়া বা স্তন্যপায়ী; ল্যাটিন, *mamma* = breast, স্তন)

এ শ্রেণিভুক্ত প্রাণীরা বিবর্তনের দিক থেকে সর্বাধুনিক প্রাণী। এরা আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চলে সব ধরনের পরিবেশে বিস্তৃত। ছোট স্তন্যপায়ী (কিট্টি হকনোজড থাই বাদুর, ১.৫ গ্রাম) থেকে শুরু করে অতিকায় স্থলবাসী হাতি কিংবা জলবাসী নীল তিমিসহ (১৩০ মেট্রিক টন) বিচিত্র আকার, আকৃতি ও গড়নের স্তন্যপায়ী এ শ্রেণিভুক্ত। এদের একটি উপগোষ্ঠী আবার উড্ডয়নেও সক্ষম (বাদুর)। পৃথিবীতে প্রায় ৬,০০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী রয়েছে। মানুষও এ শ্রেণিভুক্ত। **বাংলাদেশে ১০টি বর্গ ও ৩৫টি গোত্রের অধিনে মোট ১৩৮ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী শনাক্ত করা হয়েছে** (IUCN Red List of Bangladesh, 2015)।

বৈশিষ্ট্য :

১। দেহত্বকে **বিভিন্ন গ্রন্থি** (ঘর্মগ্রন্থি, সিবেসিয়াস গ্রন্থি ইত্যাদি) থাকে এবং ত্বক **লোম** (hair) দ্বারা আবৃত (তিমি ব্যতীত)।

২। বহিঃকর্ণে **পিনা** (pinna) ও মধ্যকর্ণে তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি (মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস) থাকে; নড়নক্ষম চোখের পাতা বিদ্যমান।

৩। বক্ষ ও উদর গহ্বরে মাঝখানে **মধ্যচ্ছদা** বা **ডায়াফ্রাম** (diaphragm) নামক মাংসল পর্দা থাকে। এরাও **সমোষ্ণশোণিত** বা **হোমিওথার্মাল** বা **এন্ডোথার্মিক**।

2020/8/4 12:43

Scanned with CamScanner

৪। পরিণত স্ত্রী-প্রাণীতে সক্রিয় **স্তনগ্রন্থি** (mammary glands) থাকে। হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়)।



চিত্র ১.২৬ক : Mammalia শ্রেণির বৈশিষ্ট্য

৫। লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার, দ্বি-অবতল এবং পরিণত প্রাণীতে নিউক্লিয়াসবিহীন (ব্যতিক্রম– উট)।

৬। চোয়াল বিভিন্ন ধরনের দাঁতযুক্ত (হেটারোডন্ট, থেকোডন্ট, ডাইফিওডন্ট); নিম্নচোয়াল **একটি ডেন্টারি হাড়** (dentary bone) দ্বারা গঠিত। করোটিক স্নায়ু ১২ জোড়া।

৭। এরা একলিঙ্গ, নিষেক অভ্যন্তরীণ; প্রায় সকলেই **জরায়ুজ** (viviparous) অর্থাৎ বাচ্চা প্রসব করে। অপত্য লালন দীর্ঘ।

উদাহরণ : *Homo sapiens* (মানুষ), *Panthera tigris* (বাঘ), *Axis axis* (হরিণ), *Cavia porcellus* (গিনিপিগ) প্রভৃতি।


Homo sapiens (মানুষ)


Panthera tigris (বাঘ)


Axis axis (হরিণ)


Cavia porcellus (গিনিপিগ)


Panthera leo (সিংহ)


Macropus major (ক্যাঙ্গারু)


Herpestes javanicus (বেজি)

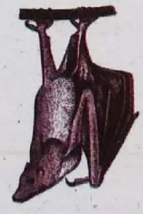
Pteropus giganteus (বাদুড়)


Manis crassicaudata (বনরুই)


Rhinoceros unicornis (গণ্ডার)


Ornithorhynchus anatinus (হংসচঞ্চু)


Funambulus palmarum (কাঠবিড়ালি)


Hippopotamus amphibius (জলহস্তী)

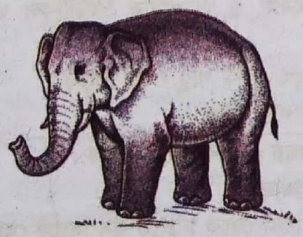
Elephas indicus (হাতি)

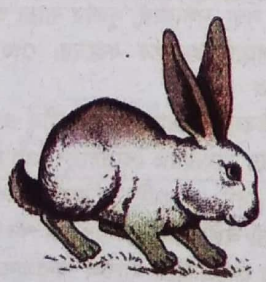
Lepus nigricollis (খরগোশ)


Bos indicus (গরু)

চিত্র ১.২৬খ : Mammalia শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

2020/8/4 12:43

Scanned with CamScanner

[প্রাসঙ্গিক তথ্য : **স্তন্যপায়ীর প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাস :** স্তন্যপায়ী প্রাণিদের প্রজনন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত তিনটি উপশ্রেণিতে (Subclass) ভাগ করা হয়:

উপশ্রেণি ১. **Prototheria** (Gr. *protos* = প্রথম + ther = স্তন্যপায়ী) : এরা আদি প্রকৃতির স্তন্যপায়ী এবং স্ত্রী প্রাণীরা ডিম পাড়ে, বাচ্চা প্রসব করে না। এদের **মনোট্রিম** (monotreme) বলা হয়। উদাহরণ- অস্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত হংসচঞ্চু বা প্লাটিপাস (Duck-billed/Platypus), একাইডনা (*Echidna*)।

উপশ্রেণি ২. **Metatheria** (Gr. *meta* = মধ্যম + ther = স্তন্যপায়ী) : এদের বাচ্চা অপরিণত অবস্থায় জন্মায় এবং স্ত্রী প্রাণীর **মারসুপিয়াম** (marsupium) নামক থলির মধ্যে পরিণত হয়। এদের **মার্সুপিয়াল** (marsupials) বলা হয়। উদাহরণ- অস্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা, অপোসোম।

উপশ্রেণি ৩. **Eutheria** (Gr. *eu* = প্রকৃত + ther = স্তন্যপায়ী) : এরা বাচ্চা প্রসব করা প্রকৃত ধরনের স্তন্যপায়ী। স্ত্রী প্রাণীরা পূর্ণাঙ্গ ও পরিপুষ্ট বাচ্চা প্রসব করে। উদাহরণ- মানুষ, বাঘ, তিমি, হাতি, গিনিপিগ, বাদুড় ইত্যাদি।

স্তন্যপায়ীরা কিভাবে অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণী থেকে উন্নত বা আলাদা - কিছু অন্যন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এরা অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণী থেকে উন্নত বা আলাদা, যেমন- এদের দেহ লোমাবৃত থাকে; কার্যকরি স্তনগ্রন্থি উপস্থিত; এক অস্থি বিশিষ্ট অর্থাৎ একটি ডেন্টারি হাড় দ্বারা নিম্ন চোয়াল গঠিত; দাঁতের একবার প্রতিস্থাপন অর্থাৎ শিশুদের দুধ দাঁত পরিণত বয়সে ক্রমান্বয়ে স্থায়ী দাঁত দ্বারা মাত্র একবার প্রতিস্থাপিত হয়; কর্ণাস্থি (মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস) বিদ্যমান; মাংসল ডায়াফ্রাম এবং চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড উপস্থিত।]

❑ **কাজ :** (i) তরুণাস্থিময় মাছ এবং অস্থিময় মাছের বৈশিষ্ট্যের আলোকে এদের শ্রেণিতাত্ত্বিক ভিন্নতা বিশ্লেষণ কর। (ii) Aves এবং Actinopterygii শ্রেণি দুটির বৈশিষ্ট্য তুলনা কর। (iii) বাঘ, জলহস্তী, ঘড়িয়াল, পাখি এরা এক হলেও শ্রেণি আলাদা– বিশ্লেষণ কর। (iv) ম্যামালিয়া শ্রেণির প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (v) Mammalia এবং Aves শ্রেণির প্রাণীদের ভিন্নতা বিশ্লেষণ কর।

প্রাণিজগতের প্রধান পর্বগুলোর নাম, প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ

পর্বের নাম	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
1. Porifera	১. দেহপ্রাচীর অস্টিয়া নামক অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত ও নালিতন্ত্র বিদ্যমান। ২. $CaCO_3$ তৈরি স্পিকিউল বা স্পঞ্জিন তন্তু বা উভয় পদার্থ দ্বারা গঠিত অন্তঃকঙ্কাল বিদ্যমান। ৩. দেহে নালিতন্ত্র ও কোয়ানোসাইট বা কলার কোষ উপস্থিত। ৪. দেহে সুগঠিত কলা, অঙ্গ বা তন্ত্র অনুপস্থিত।	*Scypha gelatinosum* *Spongilla lacustris*
2. Cnidaria	১. দ্বিস্তরী বা ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী; এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম স্তর দুটির মাঝে জেলির ন্যায় অকোষীয় মেসোগ্লিয়া উপস্থিত। ২. দেহ অরীয় প্রতিসাম্য; নির্দিষ্ট কোনো মস্তক নেই। ৩. দেহের অভ্যন্তরে সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর এবং এপিডার্মিসে নিডোব্লাস্ট কোষ উপস্থিত। ৪. দেহে পলিপ ও মেডুসা বিদ্যমান। অনেক প্রজাতি প্রবাল ও প্রবাল প্রাচীর গঠন করে।	*Hydra vulgaris* *Aurelia aurita*
3. Platyhelminthes	১. দেহ ত্রিস্তরী, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় পাতা বা ফিতার ন্যায় চ্যাপ্টা। ২. দেহ সিলোমবিহীন; রেচনতন্ত্র শিখাকোষ নিয়ে গঠিত। ৩. পৌষ্টিকতন্ত্র পায়ুছিদ্র বিহীন এবং শাখান্বিত। ৪. দেহ নরম, সিলিয়া অথবা কিউটিকলযুক্ত।	*Fasciola hepatica* *Taenia solium*
4. Nematoda	১. দেহ লম্বা, নলাকার, সুতার ন্যায়; অখণ্ডায়িত ও দু'দিক ক্রমশ সরু। ২. দেহগহ্বর অপ্রকৃত ধরনের; দেহ নমনীয় ও অকোষীয় কিউটিকল দ্বারা আবৃত। ৩. পৌষ্টিকনালি সোজা ও শাখাহীন এবং মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। ৪. মুখছিদ্র সাধারণত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত।	*Ascaris lumbricoides* *Loa loa*
5. Mollusca	১. দেহ নরম, অখণ্ডায়িত, ত্রিস্তরী এবং চুনময় খোলক দিয়ে আবৃত। ২. দেহের অঙ্কীয় দিকে পেশিযুক্ত পদ বিদ্যমান। ৩. পৃষ্ঠীয় দেহপ্রাচীরে ম্যান্টল বিদ্যমান; ম্যান্টল থেকে নিঃসৃত রস দিয়েই খোলক তৈরি হয়। ৪. পরিপাকতন্ত্রে র‍্যাডুলা নামক অঙ্গ রয়েছে (ব্যতিক্রম-ঝিনুক)।	*Pila globosa* *Octopus macropus*

2020/8/4 12:43

Scanned with CamScanner

পর্বের নাম	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
6. Annelida	১. দেহ লম্বা, নলাকার, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ও সিলোম প্রকৃত ধরনের। ২. দেহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আংটির ন্যায় খণ্ডক নিয়ে গঠিত এবং কিউটিকল দ্বারা আবৃত থাকে। ৩. চলনাঙ্গ সিটি বা প্যারাপোডিয়া; নেফ্রিডিয়া প্রধান রেচন অঙ্গ। ৪. জীবনচক্রে ট্রকোফোর লার্ভা দেখা যায়।	*Hirudinaria granulosa* *Metaphire posthuma* *Nereis caudata*
7. Arthropoda	১. দেহ সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিশিষ্ট; দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, খণ্ডায়িত এবং বিভিন্ন ট্যাগমায় বিভক্ত (যেমন– শির, বক্ষ ও উদর)। ২. মস্তকে একজোড়া অ্যান্টেনা ও একজোড়া পুঞ্জাক্ষি থাকে। ৩. মালপিজিয়ান নালিকা প্রধান রেচন অঙ্গ; সিলোম রক্তপূর্ণ হিমোসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ৪. কিউটিকল নির্মিত বহিঃকঙ্কাল রয়েছে যা নিয়মিত মোচিত হয়।	*Periplaneta americana* *Apis indica* *Bombyx mori* *Penaeus monodon*
8. Echinodermata	১. দেহ কণ্টকময়, অখণ্ডায়িত; গোলাকার, নলাকার বা তারকাকার। ২. পূর্ণাঙ্গ প্রাণী অরীয়, পঞ্চপার্শ্বীয় প্রতিসম, লার্ভা দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। ৩. পানিসংবহনতন্ত্র বিদ্যমান; প্রকৃত মস্তক, মস্তিষ্ক ও রেচনাঙ্গ অনুপস্থিত। ৪. ত্বকীয় ফুলকা, নালিকাপদ ইত্যাদি দ্বারা শ্বসন সম্পন্ন হয়।	*Astropecten euryacanthus* *Echinus esculentus*
9. Chordata	১. ভ্রূণ অবস্থায় অথবা সারাজীবন পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর নিরেট ও স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড (notochord) বিদ্যমান। উন্নত কর্ডাটায় ইহা মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ২. নটোকর্ডের উপরে একটি ফাঁপা, নলাকার স্নায়ুরজ্জু বা নার্ভকর্ড (nerve cord) থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে নার্ভকর্ডটি পরিবর্তিত হয়ে সম্মুখ প্রান্তে মস্তিষ্ক ও পশ্চাতে সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) গঠন করে। ৩. জীবনের যেকোনো দশায় বা আজীবন গলবিলের দু'পাশে ফুলকারন্ধ্র (pharyngeal gill slits) থাকে। উন্নত কর্ডেটে ফুলকারন্ধ্রের বিলোপ ঘটে এবং ফুলকা বা ফুসফুসে রূপান্তরিত হয়। ৪. হৃৎপিণ্ড দেহের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত; কিছু প্রাণীর পায়ুর পশ্চাৎ পর্যন্ত একটি লেজ বিস্তৃত থাকে।	*Homo sapiens* *Catla catla* *Bubo bubo* *Columba livia* *Copsychus saularis* *Naja naja* *Labeo rohita*

Vertebrata উপপর্বের শ্রেণিগুলোর নাম, প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ

শ্রেণির নাম	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
1. Myxini	১. দেহ সরু, লম্বাটে, পিচ্ছিল ও দুর্বল প্রকৃতির। ২. মুখছিদ্র প্রান্তীয় ও ৪ জোড়া কর্ষিকাযুক্ত। জোড় পাখনা নেই। ৩. নাসিকা থলি মুখগহ্বরে উন্মুক্ত; ফুলকাছিদ্র ৫-১৫ জোড়া। ৪. চোয়াল, বহিঃকঙ্কাল, পৃষ্ঠ পাখনা ও আঁইশ অনুপস্থিত।	*Myxine glutinasa* *Paramyxine moki*
2. Cephalaspidomorphi	১. দেহ সরু, লম্বাটে, পিচ্ছিল ও সবল প্রকৃতির। ২. হর্নি দাঁতযুক্ত ও চোষকক্ষমতা সম্পন্ন মুখছিদ্র বিদ্যমান। ৩. নাসিকা থলি মুখগহ্বরে উন্মুক্ত নয়; ফুলকাছিদ্র ৭ জোড়া। ৪. চোয়াল, বহিঃকঙ্কাল ও আঁইশ অনুপস্থিত, কিন্তু একটি বা দুটি পৃষ্ঠ পাখনা উপস্থিত।	*Petromyzon marinus* *Lampetra tridentata*
3. Chondrichthyes	১. অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থিময়। ২. দেহ প্ল্যাকয়েড আঁইশ দ্বারা আবৃত। ৩. মুখছিদ্র অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত; কানকো ও পটকা অনুপস্থিত। ৪. পুচ্ছ পাখনা হেটারোসার্কাল; ফুলকারন্ধ্র ৫-৭ জোড়া।	*Scoliodon laticaudus* *Eusphyrna blochii*
4. Actinopterygii	১. অন্তঃকঙ্কাল অস্থি নির্মিত। ২. দেহ সাইক্লয়েড অথবা টিনয়েড ধরনের আঁইশ দ্বারা আবৃত। কোনো কোনো মাছ আঁইশবিহীন। ৩. মুখছিদ্র অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত; পটকা ও কানকো বিদ্যমান। ৪. মাথার দু'পাশে ১ জোড়া ফুলকারন্ধ্র থাকে; পুচ্ছ পাখনা হোমোসার্কাল।	*Catla catla* *Tenualosa ilisha*

2020/8/4 12:43

Scanned with CamScanner

শ্রেণির নাম	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
5. Sarcopterygii	১. অন্তঃকঙ্কাল অস্থিনির্মিত। ২. দেহ গ্যানয়েড বা কসময়েড আঁইশে আবৃত। ৩. মাথার দু'পাশে ১ জোড়া ফুলকারন্ধ্র থাকে। ৪. কানকো ও পটকা উপস্থিত; পুচ্ছ পাখনা ডাইফিসার্কাল।	*Latimeria chalumnae* *Protopterus annectens*
6. Amphibia	১. দেহত্বক নগ্ন, ভেজা ও গ্রন্থিময়। শীতল রক্তবিশিষ্ট বা এক্টোথার্মিক। ২. লার্ভাদশায় ফুলকা এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ফুসফুস, ত্বক ও মুখবিবরের প্রাচীর দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। ৩. অগ্রপদে চারটি ও পশ্চাৎপদে পাঁচটি নখরবিহীন আঙুল থাকে; কিছু প্রাণীতে পদ থাকে না। ৪. হৃৎপিণ্ড তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (দুটি অলিন্দ ও একটি নিলয়); করোটিক স্নায়ু ১০ জোড়া।	*Duttaphrynus melanostictus* *Hoplobatrachus tigerinus* *Pipa pipa*
7. Reptilia	১. ত্বক শুষ্ক এবং গ্রন্থিবিহীন, এপিডার্মাল আঁইশ বা শক্ত প্লেট বা স্কুটস বা ক্যারাপেসে আবৃত। ২. হৃৎপিণ্ড অসম্পূর্ণভাবে ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (দুটি অলিন্দ এবং একটি অর্ধবিভক্ত নিলয়; ব্যতিক্রম– কুমির)। ৩. পদ দুই জোড়া (সাপ পা-বিহীন), উভয় পদে পাঁচটি করে নখরযুক্ত আঙুলবিশিষ্ট। বুকে ভর দিয়ে চলে। ৪. শীতল রক্তবিশিষ্ট; করোটিক স্নায়ু ১২ জোড়া।	*Naja naja* *Hemidactylus brookii* *Gavialis gangeticus*
8. Aves	১. দেহ মাকু আকৃতিবিশিষ্ট, পালক দ্বারা আবৃত; অস্থি হালকা ও বায়ুপূর্ণ। ২. পদ দুই জোড়া, অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত হয়। ৩. চোয়াল দন্তহীন চঞ্চুতে পরিণত হয়। ৪. হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়); এরা হোমিওথার্মাল।	*Copsychus saularis* *Columba livia* *Bubo bubo*
9. Mammalia	১. দেহত্বকে বিভিন্ন গ্রন্থি থাকে এবং ত্বক লোম দ্বারা আবৃত (তিমি ব্যতীত)। ২. বহিঃকর্ণে পিনা উপস্থিত। পরিণত স্ত্রী-প্রাণীতে সক্রিয় স্তনগ্রন্থি থাকে। ৩. হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়)। ৪. বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝখানে ডায়াফ্রাম নামক পর্দা থাকে।	*Homo sapiens* *Panthera tigris* *Axis axis*

কর্ডাটা (Chordata) এবং নন-কর্ডাটা (Nonchordata)-র মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	কর্ডাটা	নন-কর্ডাটা বা অকর্ডাটা
১। নটোকর্ড	ভ্রূণ অবস্থায় অথবা সারাজীবন থাকে।	কখনোই থাকে না।
২। স্নায়ুরজ্জু বা নার্ভকর্ড	দেহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।	দেহের অঙ্কদেশে অবস্থিত।
৩। ফুলকারন্ধ্র	জীবনের যেকোনো দশায় বা আজীবন গলবিলের দু'পাশে অবস্থান করে।	ফুলকা থাকলেও সাধারণত ফুলকারন্ধ্র থাকে না।
৪। হৃৎপিণ্ডের অবস্থান	পরিপাকনালির অঙ্কদেশে অবস্থিত।	যদি থাকে, তাহলে পরিপাকনালির পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।
৫। হিমোগ্লোবিন	লোহিত কণিকায় থাকে।	থাকলে রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।
৬। লেজ	জীবনের প্রারম্ভে কিংবা আজীবন থাকে।	প্রকৃত লেজ থাকে না।
৭। অন্তঃকঙ্কাল	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৮। উপাঙ্গ	দু'জোড়ার বেশি উপাঙ্গ থাকে না (ব্যতিক্রম– সাপ, এদের উপাঙ্গ থাকে না)।	থাকলে দু'জোড়ার বেশি থাকে।
৯। প্রতিসাম্য	দ্বিপার্শ্বীয়।	অরীয়, দ্বি-অরীয় বা দ্বিপার্শ্বীয় বা অপ্রতিসাম্য।
১০। সিলোম	প্রকৃত সিলোম থাকে।	সিলোম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।
১১। করোটি	থাকে।	থাকে না।
১২। হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।

2020/8/4 12:43

Scanned with CamScanner

মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	মেরুদণ্ডী প্রাণী	অমেরুদণ্ডী প্রাণী
১। মেরুদণ্ড	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
২। নটোকর্ড	ভ্রূণ অবস্থায় থাকে। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় মেরুদণ্ডে পরিণত হয়।	প্রোটোকর্ডাটা ছাড়া এদের নটোকর্ড থাকে না।
৩। নার্ভকর্ড	এদের নার্ভকর্ড ফাঁপা এবং দেহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।	নার্ভকর্ড নিরেট, দেহের অঙ্কদেশে অবস্থিত।
৪। প্রতিসাম্য	দ্বিপার্শ্বীয়।	অপ্রতিসম, অরীয় বা দ্বিপার্শ্বীয়।
৫। হৃৎপিণ্ড	দেহের অঙ্কদেশে অবস্থিত।	যদি থাকে তবে পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।
৬। হিমোগ্লোবিন	লোহিত কণিকায় থাকে।	থাকলে রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।
৭। মস্তিষ্ক	সবসময়ই থাকে এবং করোটির অভ্যন্তরে সুরক্ষিত।	যদি থাকে, তবে তা করোটি দিয়ে আবৃত নয়।
৮। অন্তঃকঙ্কাল	অস্থি ও তরুণাস্থি নিয়ে গঠিত।	থাকে না; থাকলেও অস্থি ও তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি নয়।

Agnatha ও Gnathostomata-র মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	Agnatha	Gnathostomata
১। চোয়াল	মুখ চোয়ালবিহীন এবং চোষক ও কর্ষিকা যুক্ত।	প্রকৃত চোয়াল উপস্থিত।
২। উপাঙ্গ	জোড় উপাঙ্গ অনুপস্থিত।	সাধারণত জোড় উপাঙ্গ (পাখনা বা পদ) বিশিষ্ট।
৩। আঁইশ	দেহত্বক আঁইশবিহীন।	দেহত্বক আঁইশবিহীন বা আঁইশ, লোম, পালক থাকতে পারে।
৪। অন্তঃকঙ্কাল	অন্তঃকঙ্কাল সম্পূর্ণ তরুণাস্থি নির্মিত।	অন্তঃকঙ্কাল অস্থি বা তরুণাস্থি বা উভয় দ্বারা নির্মিত।
৫। ফুলকা	৫-১৫ জোড়া ফুলকারন্ধ্র থাকে।	কিছু সদস্যের ৫-৭ জোড়া ফুলকারন্ধ্র থাকে। শ্বাসকার্যের জন্য ফুলকা বা ফুসফুস থাকে।
৬। নাসারন্ধ্র	নাসারন্ধ্রের সংখ্যা একটি।	নাসারন্ধ্রের সংখ্যা দুটি।
৭। অন্তঃকর্ণ	অন্তঃকর্ণে একটি বা দুটি অর্ধবৃত্তাকার নালি থাকে।	অন্তঃকর্ণে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি থাকে।
৮। করোটিক স্নায়ু	৮ জোড়া বা ১০ জোড়া।	১০ জোড়া বা ১২ জোড়া।
৯। উদাহরণ	*Myxine glutinosa, Petromyzon marinus*	*Scoliodon laticaudus, Sphyrna blochii*

Chondrichthyes, Actinopterygii ও Sarcopterygii-র মধ্যে তুলনা

তুলনীয় বিষয়	Chondrichthyes	Actinopterygii	Sarcopterygii
১। অন্তঃকঙ্কাল	তরুণাস্থিময়।	অস্থিময়।	অস্থিময়।
২। আঁইশ	প্ল্যাকয়েড ।	সাইক্লয়েড ও টিনয়েড।	গ্যানয়েড।
৩। কানকো বা অপারকুলাম	থাকে না।	থাকে।	থাকে।
৪। ফুলকা ছিদ্র	উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে।	অপারকুলাম দ্বারা ঢাকা থাকে।	অপারকুলাম দ্বারা ঢাকা থাকে।
৫। পুচ্ছ পাখনা	হেটারোসার্কাল।	হোমোসার্কাল।	ডাইফিসার্কাল ।
৬। পটকা	নেই।	আছে এবং ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।	আছে এবং শ্বসন ও ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।
৭। ক্লোয়েকা ছিদ্র	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৮। উদাহরণ	*Scoliodon laticaudus*	*Catla catla*	*Protopterus annectens*

2020/8/4 12:43

Scanned with CamScanner

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	মৎস্য	উভচর	সরীসৃপ	পাখি	স্তন্যপায়ী
১। ত্বক	ভেজা, গ্রন্থিময় ও সাধারণত ডার্মাল আঁইশযুক্ত; কয়েক প্রকার মাছ আঁইশবিহীন।	ভেজা, গ্রন্থিময় ও নগ্ন।	শুষ্ক ও এপিডার্মাল আঁইশ দিয়ে গঠিত।	শুষ্ক ও পালক দিয়ে আবৃত।	শুষ্ক, গ্রন্থিময় ও লোম দ্বারা আবৃত।
২। চলন অঙ্গ	পাখনা।	দু'জোড়া পা।	দু'জোড়া পা (ব্যতিক্রম সাপ)।	একজোড়া ডানা ও একজোড়া পা।	দু'জোড়া পা (অর্থাৎ একজোড়া অগ্রবাহু ও একজোড়া পশ্চাৎ বাহু)।
৩। শ্বসন অঙ্গ	ফুলকা।	ফুসফুস।	ফুসফুস।	ফুসফুস।	ফুসফুস।
৪। হৃৎপিণ্ড	দুই প্রকোষ্ঠী।	তিন প্রকোষ্ঠী।	অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত চার প্রকোষ্ঠী।	চার প্রকোষ্ঠী।	চার প্রকোষ্ঠী।
৫। রক্ত	শীতল ।	শীতল ।	শীতল।	উষ্ণ।	উষ্ণ।
৬। করোটিক স্নায়ু	১০ জোড়া।	১০ জোড়া।	১২ জোড়া।	১২ জোড়া।	১২ জোড়া।
৭। অক্ষিপল্লব	থাকে না।	তিনটি।	তিনটি।	তিনটি।	দুটি।
৮। অবসারণী ছিদ্র	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।	উপস্থিত।	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৯। নিষেক	বহিঃনিষেক।	বহিঃনিষেক।	অন্তঃনিষেক।	অন্তঃনিষেক।	অন্তঃনিষেক।
১০। প্রসব	অনিষিক্ত ডিম।	অনিষিক্ত ডিম।	নিষিক্ত ডিম; কতিপয় বাচ্চা।	নিষিক্ত ডিম।	বাচ্চা (হংসচঞ্চুতে নিষিক্ত ডিম)।

সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কর্ডেট, কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয়

কর্ডেট প্রাণীর তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু এবং গলবিলীয় ফুলকারন্ধ্র। এসব বৈশিষ্ট্য সব ধরনের কর্ডেট প্রাণীর জীবনের যেকোনো দশায় কিংবা আজীবন পাওয়া যায়। Chordata পর্বকে তিনটি উপপর্বে ভাগ করা হয়। যেমন– (i) Urochordata, (ii) Cephalochordata ও (iii) Vertebrata

এদের মধ্যে Urochordata ও Cephalochordata (অর্থাৎ Protochordata) উপপর্বভুক্ত কর্ডেট প্রাণীদের সারাজীবন ধরে কর্ডেট প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থিত থাকে এবং কোনো সময়ই এদের নটোকর্ড মেরুদণ্ডে রূপান্তরিত হয় না। কিন্তু Vertebrata উপপর্বের প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভ্রূণাবস্থায় নটোকর্ড থাকলেও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীদের নটোকর্ড মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। সেজন্য এদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। তা ছাড়া স্নায়ুরজ্জুটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়; ফুলকারন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্বসনের জন্য ফুলকা বা ফুসফুসের আবির্ভাব ঘটে।

পর্ব- Chordata → উপপর্ব → Urochordata, Cephalochordata → অমেরুদণ্ডী কর্ডেট; Vertebrata → মেরুদণ্ডী কর্ডেট

তাই পরিশেষে বলা যায়, সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কর্ডেট; কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয়।

❑ **কাজ :** (i) Chondrichthyes এবং Actinopterygii এর শ্রেণিভিত্তিক পার্থক্য লিখ। (ii) *Ascidia* এবং মাছ কর্ডেট কিন্তু উভয়ই মেরুদণ্ডী নয়–বিশ্লেষণ কর। (iii) কলেজ ছুটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ১০টি প্রাণী সংগ্রহ করে শিক্ষকের সহায়তায় সেগুলো শনাক্ত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : নন-কর্ডাটার বিভিন্ন পর্বের নমুনা প্রাণী পর্যবেক্ষণ।

বি.দ্র. : ব্যবহারিক অংশ ৫৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষণের নাম : Vertebrata উপপর্বের বিভিন্ন শ্রেণির নমুনা প্রাণী পর্যবেক্ষণ।

বি.দ্র. : ব্যবহারিক অংশ ৫৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2020/8/4 12
Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

- **প্রাণী :** যেসব বহুকোষী ইউক্যারিওটিক জীব সুনির্দিষ্ট আকার-আকৃতি বিশিষ্ট, সুগঠিত অঙ্গতন্ত্র নিয়ে গঠিত, চলনক্ষম, পরভোজী, হলোজোয়িক পদ্ধতিতে পুষ্টি সম্পন্ন করে এবং উদ্দীপনায় সাড়া দিতে সক্ষম তাদের প্রাণী বলে।
- **হলোজোয়িক :** ইহা প্রাণীদের এক প্রকার পুষ্টি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না। তাই খাদ্যের জন্য ইহা উদ্ভিদ ও অন্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল থাকে। এ ধরনের পুষ্টি পদ্ধতিকে হলোজোয়িক পুষ্টি বলে। অধিকাংশ প্রাণীদের পুষ্টি এ ধরনের।
- **প্রাণিবৈচিত্র্য :** পৃথিবীর মাটি, বায়ু ও পানিতে বসবাসকারী সকল প্রাণীর মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত, আন্তঃপ্রজাতিগত বা বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকে প্রাণিবৈচিত্র্য বলে।
- **জিনগত বৈচিত্র্য :** জিনগত ভিন্নতার কারণে যখন একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় তখন তাকে জিনগত বৈচিত্র্য বলে।
- **প্রজাতিগত বৈচিত্র্য :** কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান বৈচিত্র্যকে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলে।
- **বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য :** পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুর সঙ্গে জীবজগতের মিথস্ক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশীয় একক বা বায়োম সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বায়োমে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বৈচিত্র্যময় প্রাণী রয়েছে। এরূপ বিভিন্ন বায়োমে বিদ্যমান প্রাণীর বৈচিত্র্যকে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলে।
- **বায়োম :** একই ধরনের জলবায়ু, একই ধরনের ভূমি, একই জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত পৃথকযোগ্য ও বৃহৎ ইকোসিস্টেমকে বায়োম (biome) বলে। যেমন– তুন্দ্রা বায়োম, তৃণভূমি বায়োম ইত্যাদি।
- **শ্রেণিবিন্যাস :** পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রাণীদের একটি নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন স্তরে পর্যায়ক্রমে বিন্যাস করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলা হয়।
- **ট্যাক্সোনমি :** প্রাণিবিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি, উদ্দেশ্য ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে ট্যাক্সোনমি বা শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা বা শ্রেণিবিন্যাসতত্ত্ব বলে।
- **ট্যাক্সোনমিক হায়ারার্কি :** শ্রেণিবিন্যাসের সময় প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ ধাপে সাজানোকে ট্যাক্সোনমিক হায়ারার্কি বা শ্রেণিবিভাগ পদসোপান বলে।
- **লিনিয়ান হায়ারার্কি :** ক্যারোলাস লিনিয়াস প্রবর্তিত বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট অনুক্রমিক শ্রেণিবিভাগ স্তর কাঠামোকে শ্রেণিবিভাগ নিয়ামক বা লিনিয়ান হায়ারার্কি (Linnaean Hierarchy) বলে।
- **শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি :** যেসব বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করা হয় সেসব বৈশিষ্ট্যকেই শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি বলা হয়।
- **ক্লিভেজ :** যে পদ্ধতিতে জাইগোট ক্রমাগত মাইটোটিক পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য অপত্য কোষ তথা ভ্রূণ সৃষ্টি হয় তাকে ক্লিভেজ বা সম্ভেদ বলে।
- **ভ্রূণস্তর :** যৌন প্রজননে অংশগ্রহণকারী প্রাণীদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জাইগোট সৃষ্টি হয়। জাইগোট বার বার বিভাজনের মাধ্যমে সৃষ্ট কোষগুলো স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে গ্যাস্ট্রুলা দশায় যে কোষীয় স্তরসমূহ সৃষ্টি করে তাদের ভ্রূণস্তর বলে।
- **দ্বিস্তরী প্রাণী :** যেসব প্রাণীর ভ্রূণে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি ভ্রূণীয় স্তর থাকে সেসব প্রাণীকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলে। যেমন– Cnidaria পর্বের প্রাণী।
- **ত্রিস্তরী প্রাণী :** যেসব প্রাণীর ভ্রূণে এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক তিনটি ভ্রূণীয় স্তর থাকে সেসব প্রাণীকে ত্রিস্তরী প্রাণী বলে। যেমন– Platyhelminthes থেকে শুরু করে Chordata পর্ব পর্যন্ত সকল প্রাণীরা ত্রিস্তরী।
- **প্রতিসাম্য :** অক্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সুষম বণ্টনকে প্রতিসাম্য বলে।
- **অরীয় প্রতিসাম্য :** যখন কোনো প্রাণীর দেহকে কেন্দ্রীয় লম্ব অক্ষ বরাবর যেকোনো তলে কেটে দুইয়ের বেশি সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করা যায় তখন সেই ধরনের প্রতিসাম্যকে অরীয় প্রতিসাম্য বলে। যেমন– Cnidaria ও Echinodermata পর্বের অধিকাংশ প্রাণী।
- **প্রান্তিকতা :** মস্তক ও মুখের অবস্থানের উপরে ভিত্তি করে প্রাণীর দেহের যে মেরুকরণ করা হয় তাকে প্রান্তিকতা বলে।
- **দেহ অক্ষ :** প্রতিসম প্রাণীতে দেহ অক্ষ ও তল শ্রেণিকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। প্রতিসম প্রাণীতে দেহের কেন্দ্র বরাবর একটি সরলরেখা কল্পনা করা যায়, একে দেহ অক্ষ বলে।
- **তল :** যে অঞ্চল বরাবর প্রাণিদেহকে ডান ও বাম বা অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ বা সম্মুখ ও পশ্চাৎ অঞ্চল বরাবর দু'ভাগে ভাগ করা যায় তাকে তল বলে।
- **খণ্ডকায়ন :** সদৃশ দেহখণ্ডের রৈখিক বা অনুদৈর্ঘ্যিক পুনরাবৃত্তিকে খণ্ডকায়ন বা মেটামেরিজম বলে।

2020/8/4 12:44

Scanned with CamScanner

☑ **সিলোম :** পৌষ্টিকনালি ও দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান, যা মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে তাকে সিলোম বলে।

☑ **অঞ্চলায়ন :** কিছু প্রাণিদেহ বাহ্যিকভাবে খণ্ডায়িত হলেও অনেকক্ষেত্রে খণ্ডগুলো স্পষ্ট নয়। বরং খণ্ডকগুলো একত্রে মিলিত হয়ে দেহে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল বা ট্যাগমায় বিভক্ত হয়। এই ধরনের বিভাজনকে অঞ্চলায়ন বা ট্যাগমাটাইজশন বলে। Arthropoda প্রাণীদের দেহে এরূপ বিভাজন দেখা যায়।

☑ **নটোকর্ড :** ভ্রূণাবস্থায় বা আজীবন দেহের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত কিছুটা নমনীয়, স্থিতিস্থাপক ও ছিদ্রযুক্ত টিস্যুর দণ্ডকে নটোকর্ড বলে।

☑ **ট্যাক্সন :** শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত প্রতিটি ক্যাটাগরিভুক্ত জনগোষ্ঠীকে একেকটি ট্যাক্সন বলে। অথবা, ট্যাক্সন হলো শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট একক যা বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের নিয়ে গঠিত। যেমন– Animalia, Chordata, Mammalia, Primates, Hominidae, *Homo* একেকটি ট্যাক্সন।

☑ **ক্যাটাগরি :** ক্যাটাগরি হলো শ্রেণিবিন্যাসের ধাপ, যে নির্দিষ্ট ধাপে বিভিন্ন গোষ্ঠীয় প্রাণী বা ট্যাক্সন অবস্থান করে। যেমন– Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus ইত্যাদি একেকটি ক্যাটাগরি।

☑ **প্রজাতি :** প্রজাতি হলো সর্বাধিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিলসম্পন্ন একদল প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী, যারা নিজেদের মধ্যে যৌন প্রজননের মাধ্যমে সন্তান উৎপন্ন করে। শ্রেণিবিন্যাস স্তরের সর্বনিম্ন ধাপ ও মৌলিক একক হলো প্রজাতি।

☑ **উপপ্রজাতি :** বৈসাদৃশ্যযুক্ত যেসব জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশন আন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে জিনের আদান-প্রদান ঘটাতে সক্ষম তাদের একই প্রজাতির উপপ্রজাতি বলা হয়।

☑ **ICZN :** International Commission on Zoological Nomenclature. এটি বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণকারী একটি আন্তর্জাতিক অরাজনৈতিক সংগঠন।

☑ **দ্বিপদ নামকরণ :** জীবের নামকরণের আন্তর্জাতিক প্রথা অনুসারে প্রথমে গণের নাম এবং পরে প্রজাতির নাম ব্যবহার করে জীবদের যে নামকরণ করা হয় তাকে দ্বিপদ নামকরণ বলা হয়।

☑ **ত্রিপদ নামকরণ :** জীবের নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী গণ, প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি নামের তিনটি পদ ব্যবহার করে জীবের যে নামকরণ করা হয় তাকে ত্রিপদ নামকরণ বলা হয়।

☑ **অগ্রাধিকার সূত্র :** জীবের নামকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি অতি বিতর্কমূলক অংশ। কিন্তু এটি আন্তর্জাতিক নামকরণবিধির (ICBN ও ICZN) প্রাথমিক সূত্র (priority law) যা এই বিধির স্থায়িত্ব বজায় রাখে। যখন একই ট্যাক্সনের অন্তর্গত দুটিতে একই নামের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তখন কোনো একটি নামের বৈধতাসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হয় 'অগ্রাধিকার সূত্র' (Priority law) দ্বারা।

☑ **টটোনিম :** কোনো জীবের বিজ্ঞানসম্মত নামের গণ এবং প্রজাতির নাম যদি একই পদ দিয়ে তৈরি হয়, তখন তাকে টটোনিম বলে। যেমন- *Catla catla* (রুই মাছ)।

☑ **হোমোনিম :** একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দুটি পৃথক জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণী) যদি একই নামকরণ করা হয় এবং নামের বানান ও উচ্চারণ যদি একই হয়, তবে তাদের **হোমোনিম** বা সমনাম বলে। প্রথম দেওয়া নামটি বৈধ বলে গণ্য হবে এবং পরে দেওয়া নামটিকে পরিবর্তন করা হয়।

☑ **সিনোনিম :** একই প্রজাতির জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণী) অনেকগুলো নাম থাকলে বৈধ বা স্বীকৃত নাম ছাড়া অন্যসব নামকে সিনোনিম বা প্রতিনাম বলে। আগে প্রকাশিত সিনোনিমকে সিনিয়র সিনোনিম এবং পরে প্রকাশিত সিনোনিমকে জুনিয়র সিনোনিম বলা হয়।

☑ **অস্টিয়া :** Porifera পর্বের প্রাণীর (যেমন– *Scypha*) দেহপ্রাচীরে অবস্থিত ক্ষুদ্র ছিদ্র।

☑ **স্পঞ্জোসিল :** Porifera পর্বের প্রাণীদের দেহের অভ্যন্তরে একক প্রশস্ত গহ্বর।

☑ **সমুদ্রের ফুল :** বিচিত্র বর্ণময়তার কারণে Cnidaria পর্বের সদস্যরা সমুদ্রকে বর্ণিল রূপদানে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। এ পর্বের সদস্যরাই প্রবাল ও প্রবাল প্রাচীর গঠন করে। এজন্য নিডেরিয়ান প্রাণীদের সমুদ্রের ফুল (flower of the sea) বলা হয়। সামুদ্রিক প্রজাতির ২৫% জীব পৃথিবীর প্রবাল প্রাচীরগুলোতে বাস করে। তাই প্রবাল প্রাচীর পৃথিবীর অন্যতম রত্নভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত এবং সমুদ্রের Rain Forest নামে অভিহিত।

☑ **পলিপ :** Cnidaria-র জীবনচক্রের নিশ্চল দশাকে পলিপ বা অযৌন দশা বলে। এর দণ্ডাকার দেহের একপ্রান্ত ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং অন্যপ্রান্ত কর্ষিকায় ঘেরা মুখছিদ্র বহন করে।

☑ **মেডুসা :** Cnidaria-র জীবনচক্রের সাঁতারু দশাকে মেডুসা বা যৌন দশা বলে।

☑ **পলিমরফিজম :** জীবনচক্রে একই জীবের একাধিক রূপ উপস্থিত থাকার ঘটনাকে পলিমরফিজম (polymorphism) বলে।

☑ **মেটাজেনেসিস :** অযৌন ও যৌন দশার মধ্যে আন্তঃরূপান্তর হওয়ার ঘটনাকে মেটাজেনেসিস বলা হয়।

☑ **জনুক্রম :** কোনো জীবের জীবনচক্রে যৌন ও অযৌন জনু বা দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে জনুক্রম বলে।

☑ **সিলেন্টেরন :** Cnidaria পর্বের প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরের যে লম্বাকার একটি গহ্বর বিদ্যমান থাকে তাকে সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বলে।

2020/8/4 12:44

Scanned with CamScanner

- ☑ **নিডোসাইট :** Cnidaria পর্বের প্রাণীর এপিডার্মিসে অবস্থিত নেমাটোসিস্ট বহনকারী; শিকার ধরা ও আত্মরক্ষায় সাহায্যকারী বিশেষ ধরনের কোষই হলো নিডোসাইট।
- ☑ **মেসোগ্লিয়া :** Cnidaria পর্বের প্রাণীর এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস কোষস্তরের মাঝখানে জেলির মতো আঠালো, স্থিতিস্থাপক, অকোষীয় স্তরটিকে মেসোগ্লিয়া বলে।
- ☑ **শিখা কোষ :** Platyhelminthes পর্বের প্রাণীদের (যেমন– ফিতাকৃমি) শাখান্বিত রেচন অঙ্গকে শিখা কোষ বলে।
- ☑ **প্রোগ্লোটিড :** ফিতাকৃমির দেহ খণ্ডককে প্রোগ্লোটিড (proglottid) বলা হয়।
- ☑ **স্কোলেক্স :** ফিতাকৃমির দেহের অগ্রভাগে পিনের মস্তকের মতো আসঞ্জন অঙ্গকে স্কোলেক্স (scolex) বলা হয়।
- ☑ **যৌন দ্বিরূপতা :** একই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ সদস্য বর্ণ, আকার, আকৃতি ও গাঠনিকভাবে পৃথক হলে তাকে যৌন দ্বিরূপতা বলে।
- ☑ **র‍্যাডুলা :** Mollusca পর্বের প্রাণীর (যেমন– শামুক, আপেল শামুক ইত্যাদি) মুখবিবরের অঙ্কীয়তলে কাইটিন নির্মিত অসংখ্য দাঁতের সারিবদ্ধ যে অঙ্গ খাদ্য চর্বণে সহায়তা করে তাকে র‍্যাডুলা বলে।
- ☑ **নেফ্রিডিয়া :** অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচন অঙ্গকে নেফ্রিডিয়া বলে। এ রেচন অঙ্গ Annelida পর্বের ও Cephalochordata উপপর্বের প্রাণীদের দেখা যায়।
- ☑ **সিটি :** Annelida পর্বের প্রাণীদের (যেমন– কেঁচো) সুঁচের মতো চলন অঙ্গকে সিটি (setae) বলে।
- ☑ **প্যারাপোডিয়া :** Annelida পর্বের প্রাণীদের (যেমন– নেরিস) পার্শ্বীয় চ্যাপ্টা ও প্রসারিত চলন অঙ্গকে প্যারাপোডিয়া (parapodia) বলে।
- ☑ **পুঞ্জাক্ষি :** Arthropoda পর্বের প্রাণীদের মস্তকের এক জোড়া উত্তল, কালো অংশকে পুঞ্জাক্ষি বলে।
- ☑ **পানিসংবহনতন্ত্র :** Echinodermata পর্বের প্রাণীদের একটি বৈচিত্র্যময় অরীয় নালি যা চলনে, রেচনে ও সংবহনে অংশগ্রহণ করে তাকে পানিসংবহনতন্ত্র (water vascular system) বলে।
- ☑ **হিমালতন্ত্র :** Echinodermata পর্বের প্রাণীদের দেহে রক্ত সংবহনতন্ত্রের পরিবর্তে বিশেষ যে সংবহনতন্ত্র থাকে, তাকে হিমালতন্ত্র বলা হয়। এর মধ্যে একপ্রকার সিলোমিক তরল উপস্থিত থাকে। সেই তরল হিমাল চ্যানেল নামক সরু নালিসমূহের মাধ্যমে সারা দেহে প্রবাহিত হয়।
- ☑ **কর্ডাটা :** যেসব প্রাণীর ভ্রূণ অবস্থায় বা সারাজীবন অর্থাৎ জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড থাকে, তাদের কর্ডাটা বলে।
- ☑ **প্রোটোকর্ডাটা :** কর্ডাটা প্রাণীদের মধ্যে যাদের আজীবন নটোকর্ড থাকে; কিন্তু নটোকর্ডের স্থলে মেরুদণ্ড গঠিত হয় না, তাদের প্রোটোকর্ডাটা (protochordata) বলে। যেমন- Urochordata ও Cephalochordata-র অন্তর্গত প্রাণিসমূহ।
- ☑ **সাগর ফোয়ারা :** Urochordata উপপর্বের সকল প্রজাতিকে পৃথিবীর প্রায় সব উপকূলে অগভীর পানিতে পাওয়া যায়। এ উপপর্বের কিছু প্রজাতি সাইফন (siphon) দিয়ে সজোরে পানি উৎসারিত করে বলে এদের সাগর ফোয়ারা (sea squirt) বলা হয়।
- ☑ **সাসপেনশন ফিডার :** যে সকল প্রাণী সমুদ্রের পানি থেকে বিশেষ ধরনের ছাঁকন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্য গ্রহণ করে তাদের সাসপেনশন ফিডার বলে। যেমন- টিউনিকেটরা (Urochordata উপপর্বের প্রাণীরা)।
- ☑ **মায়োটোম :** মেরুদণ্ডীদের ভ্রূণের এবং পূর্ণাঙ্গ সেফালোকর্ডাটাদের পেশি খণ্ডক বা সোমাইটকে মায়োটোম (myotome) বলে।
- ☑ **মেরুদণ্ডী প্রাণী :** যেসব প্রাণীর ভ্রূণ দশায় নটোকর্ড থাকে কিন্তু নটোকর্ড পূর্ণাঙ্গ দশায় মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে।
- ☑ **সাইক্লয়েড আঁইশ :** এ ধরনের আঁইশ চাকতির ন্যায়, প্রায় গোলাকার এবং কিনারা মসৃণ হয়। যেমন– রুই, কাতল, মৃগেল, ইলিশ ইত্যাদি মাছের আঁইশ।
- ☑ **টিনয়েড আঁইশ :** এ ধরনের আঁইশ চাকতির ন্যায়, কিন্তু এদের পশ্চাৎভাগ সূক্ষ্ম কণ্টকময়। যেমন– কৈ, ভেটকি প্রভৃতি মাছের আঁইশ।
- ☑ **প্ল্যাকয়েড আঁইশ :** আঁইশগুলো আণুবীক্ষণিক। প্রতিটি আঁইশে একটি করে ত্রিকোণাকার বেসাল প্লেট থাকে এবং প্লেট থেকে তিনটি সূক্ষ্ম কাঁটা সৃষ্টি হয়। তরুণাস্থিবিশিষ্ট মাছের (যেমন– হাঙর, ইলেকট্রিক মাছ, করাত মাছ ইত্যাদি) দেহে এই প্রকার আঁইশ থাকে।
- ☑ **গ্যানয়েড আঁইশ :** এ ধরনের আঁইশ রম্বস আকারের বা পাত আকারের গঠন দ্বারা গঠিত এবং তাদের প্রান্তগুলো ঘনিষ্ঠভাবে লাগানো থাকে। আঁইশ গ্যানয়েন নামক পুরু এনামেল জাতীয় বস্তুর আস্তরণযুক্ত। যেমন– সিলাকান্থ ও লাংফিশদের (পলিপটেরাস) আঁইশ।
- ☑ **হোমোসার্কাল লেজ :** এক্ষেত্রে পুচ্ছ পাখনার শেষ ভাগের ফর্ক (fork) বা খণ্ডকদ্বয় সমান মাপের হয়। যেমন– রুই, কাতলা, ইলিশ, ল্যাটা প্রভৃতি মাছের লেজ।

2020/8/4 12:44

Scanned with CamScanner

☑ **ডাইফিসার্কাল লেজ :** এক্ষেত্রে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় পাখনা একীভূত হয়ে পুচ্ছপাখনা গঠিত হয় অর্থাৎ পুচ্ছপাখনা একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। যেমন– সিলাকান্থ ও লাংফিশদের লেজ।

☑ **মাছের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :** মাছ এক্টোথার্মিক বা শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী; দেহ আঁইশ দ্বারা আবৃত; রশ্মিবিশিষ্ট জোড় ও বিজোড় পাখনা এবং ভেনাস হার্ট উপস্থিত। শ্বসন অঙ্গ ফুলকা (ব্যতিক্রম– লাংফিশ)। এদের চোখে চক্ষুপত্র থাকে না।

☑ **এক্টোথার্মিক :** যেসব প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করে তাদের এক্টোথার্মিক বা শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী বলে। যেমন– মাছ, ব্যাঙ ও সাপ।

☑ **সমোষ্ণশোণিত বা হোমিওথার্মিক :** যেসব প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করে না অর্থাৎ যেসব প্রাণী দেহে তাপ উৎপাদন করতে পারে ও দেহের একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে তাদের সমোষ্ণশোণিত বা হোমিওথার্মিক বা এন্ডোথার্মিক বলে। যেমন– পাখি ও স্তন্যপায়ী।

☑ **ডায়াফ্রাম :** স্তন্যপায়ী প্রাণীর বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝখানে যে পেশিবহুল পর্দা থাকে তাকে ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা বলে। এটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর শ্বসনে সাহায্য করে।

☑ **জরায়ুজ বা ভিভিপেরাস :** অপত্য যখন ডিম থেকে বৃদ্ধি লাভ করে এবং মাতৃদেহের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন তাকে জরায়ুজ বা ভিভিপেরাস (viviparous) বলে।

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নেফ্রিডিয়া পাওয়া যায় কোন পর্বের প্রাণীতে? *[ঢাকা বোর্ড-২০১৮]*
ক Cnidaria খ Platyhelminthes
গ Annelida ঘ Mollusca

২. Echinodermata পর্বের বৈশিষ্ট্য কোনটি? *[ঢাকা বোর্ড-২০১৮]*
ক পানি সংবহনতন্ত্র খ পুঞ্জাক্ষি
গ শিখা কোষ ঘ রক্ত সংবহনতন্ত্র

৩. নিচের কোন প্রাণী অ্যাসিলোমেট? *[ব. বো.-২০১৭]*
ক *Ascaris lumbricoides* খ *Taenia solium*
গ *Metaphire posthuma* ঘ *Julus terrestri*

৪. Myxini শ্রেণির প্রাণীর ফুলকারন্ধ্রের সংখ্যা কয়টি? *[ব. বো.২০১৭]*
ক ১ জোড় খ ৭ জোড়া গ ৫-৭ জোড়া ঘ ৫-১৫ জোড়া

৫. নিচের কোন প্রাণীটি অরীয়ভাবে প্রতিসম? *[চ. বো.-২০১৭]*
ক বিড়াল খ কেঁচো গ শামুক ঘ হাইড্রা

৬. Arthropoda পর্বের প্রাণীতে পাওয়া যায় কোনটি? *[চ. বো.-২০১৭]*
ক প্যারাপোডিয়া খ র‍্যাডুলা গ হিমোসিল ঘ নালিকা পদ

৭. অরীয় প্রতিসাম্যতার উদাহরণ কোনটি? *[ঢা. বো.-২০১৭]*
ক *Volvox* খ *Julus* গ *Pila* ঘ *Hydra*

৮. কলা সংগঠন মাত্রার পর্ব হলো– *[য. বো.-২০১৭]*
ক Porifera খ Cnidaria গ Nematoda ঘ Chordata

৯. কোন প্রাণীর জীবনচক্র ফুলকা শ্বসন বিদ্যমান? *[সি.বো.-২০১৭]*
ক ব্যাঙ খ সাপ গ কচ্ছপ ঘ ডলফিন

১০. অপ্রতিসাম্যতার উদাহরণ কোনটি? *[দি. বো.-২০১৭]*
ক *Volvox* খ *Pila* গ *Hydra* ঘ *Julus*

১১. সমুদ্র তারার প্রতিসাম্যতা কোন ধরনের? *[রা. বো.-২০১৭]*
ক দ্বিপার্শ্বীয় খ গোলীয় গ পঞ্চ-অরীয় ঘ দ্বি-অরীয়

১২. নিচের কোনটি মোলাস্কা পর্বের প্রাণীতে পাওয়া যায়? *[ঢা. বো.-২০১৬]*
ক রেডুলা খ নেফ্রিডিয়া গ ট্রকোফোর লার্ভা ঘ ট্যাগমাটা

১৩. *Scoliodon laticaudus* এর আঁইশ কোন ধরনের? *[ঢা. বো.-২০১৬]*
ক সাইক্লয়েড খ প্ল্যাকয়েড গ টিনয়েড ঘ গ্যানয়েড

১৪. নিচের কোনটি শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী? *[ঢা. বো.-২০১৬]*
ক *Cavia porcellus* খ *Naja naja*
গ *Copsychus saularis* ঘ *Panthera tigeris*

১৫. নিচের কোন পর্বের প্রাণীদের স্যুডোসিলোমেট বলা হয়? *[রা. বো.-২০১৬]*
ক পরিফেরা খ নিডারিয়া গ নেমাটোডা ঘ মোলাস্কা

১৬. Echinodermata পর্বের বৈশিষ্ট্য কোনটি? *[রা. বো.-২০১৬]*
ক দেহ অপ্রতিসম খ দেহ কিউটিকল দ্বারা আবৃত
গ দেহ খোলক দ্বারা আবৃত ঘ বহিঃকঙ্কাল কন্টকময়

১৭. Sarcopterygii শ্রেণির বৈশিষ্ট্য হলো– *[য. বো.-২০১৬]*
ক গ্যানয়েড আঁইশ খ সাইক্লয়েড আঁইশ
গ হমোসার্কাল লেজ ঘ হেটেরোসার্কাল লেজ

১৮. কোন পর্বের সকল প্রাণীই সামুদ্রিক? *[য. বো.-২০১৬]*
ক পরিফেরা খ ইকাইনোডার্মাটা
গ অ্যানেলিডা ঘ আর্থ্রোপোডা

১৯. শ্রেণিকরণের যে কোনো ধাপের জনগোষ্ঠীকে বলে– *[য. বো.-২০১৬]*
ক প্রজাতি খ গণ গ ট্যাক্সন ঘ পর্ব

২০. কোরালস এবং জেলিফিশ কোন পর্বের প্রাণী? *[য.বো.-২০১৬]*
ক নিডারিয়া খ ইকাইনোডার্মাটা গ পরিফেরা ঘ মোলাস্কা

২১. কোনটি মোলাস্কার বৈশিষ্ট্য– *[য. বো.-২০১৬]*
ক অস্টিয়া খ র‍্যাডুলা গ প্যারাপোডিয়া ঘ স্পিকিউল

২২. 'রশ্মিময় পাখনাবিশিষ্ট মাছ' (Ray finned fishes) নামে পরিচিত কোন শ্রেণি? *[কু. বো.-২০১৬]*
ক Myxini খ Chondrichthyes
গ Actinopteryes ঘ Sarcopterygii

২৩. কোনটি Echinodermata পর্বের বৈশিষ্ট্য? *[কু. বো.-২০১৬]*
ক রেচন অঙ্গ নেফ্রিডিয়া খ কাঁটাযুক্ত ত্বক
গ হিমোসিল বিদ্যমান ঘ বেগানোসাইট কোষ বিদ্যমান

২৪. কোনটি অপ্রতিসম প্রাণী? *[চ. বো.-২০১৬]*
ক ইলিশ খ তারামাছ গ হাইড্রা ঘ অ্যামিবা

২৫. নিচের কোন প্রাণীটি গঠনগতভাবে সরলতম? *[দি. বো.-২০১৬]*
ক *Hydra* খ *Taenia* গ *Pila* ঘ *Spongilla*

2020 / 8 / 4 12:44

Scanned with CamScanner

২৬. কোন পর্বের প্রাণীর ত্বক কাঁটাযুক্ত? [দি. বো.-২০১৬]
ক Mollusca খ Annelida
গ Echinodermata ঘ Cnidaria

২৭. প্রতিসাম্যতা হলো– [দি. বো.-২০১৬]
ক তিনটি ভ্রূণস্তরবিশিষ্ট দশা
খ যেকোনো তলের ভিত্তিতে প্রাণীর আঙ্গিক অবস্থান
গ একই ধরনের খণ্ডাংশবিশিষ্ট অবস্থা
ঘ প্রাণীকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভাজনের পদ্ধতি

২৮. ICZN কোনটির সংক্ষিপ্ত রূপ? [দি. বো.-২০১৬]
ক International Commission on Zoological Nomenclature
খ International Code of Zoological Nomenclature
গ International Code on Zoological Nomenclature
ঘ International Commission of Zoological Nomenclature

২৯. শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে বড় একক কোনটি? [ব. বো.-২০১৬]
ক Phylum খ Class গ Order ঘ Family

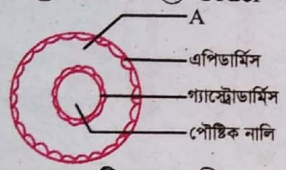

৩০. চিত্রে চিহ্নিত 'A' অংশটির নাম কী? [ব. বো.-২০১৬]
ক প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম খ প্যারেনকাইমা
গ ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম ঘ হিমোসিল

৩১. Annelida পর্বের প্রাণীর লার্ভার নাম কী? [সি. বো.-২০১৬]
ক অ্যামোসিট খ ট্রোকোফোর
গ প্যারেনকাইমুলা ঘ মিরাসিডিয়াম

৩২. কোন পর্বের প্রাণীতে শিখা কোষ দেখা যায়? [কু. দি. বো.-২০১৫]
ক Platyhelminthes খ Cnidaria
গ Nematoda ঘ Mollusca

৩৩. প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয় কোথা থেকে? [কু. বো.-২০১৫]
ক সিলোম খ ভ্রূণস্তর গ খণ্ডক ঘ নটোকর্ড

৩৪. সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড কোন সরীসৃপে দেখতে পাওয়া যায়? [কু. বো.-২০১৫]
ক কুমির খ টিকটিকি গ কচ্ছপ ঘ সাপ

৩৫. কোনটি ভার্টিব্রেট? [রা. বো.-২০১৫]
ক চিংড়ি মাছ খ তারা মাছ গ জেলি ফিশ ঘ কাতলা মা

৩৬. সিলোমহীন পর্ব কোনটি? [রা. বো.-২০১৫]
ক Nematoda খ Annelida
গ Platyhelminthes ঘ Chordata

৩৭. নিচের কোনটি সঠিক নয়? [য. বো.-২০১৫]
ক কেঁচো–নেফ্রিডিয়া খ তারা মাছ–পানি সংবহনতন্ত্র
গ চিংড়ি–হিমোসিল ঘ গোলকৃমি–ফ্লেমকোষ

৩৮. প্রাণিজগতের ভিন্নতার কারণ কী? [চ. বো.-২০১৫]
ক প্রজাতিগত বৈচিত্র্য খ আচরণগত বৈচিত্র্য
গ খাদ্যাভ্যাসগত বৈচিত্র্য ঘ চলাচলগত বৈচিত্র্য

৩৯. অপ্রতিসম বলতে কী বুঝায়? [চ. বো.-২০১৫]
ক যেকোনো তলে সমানভাবে ভাগ করা যায়
খ কোনো তলেই সমানভাবে ভাগ করা যায় না
গ একবার মাত্র দুটি সমানভাবে ভাগ করা যায়
ঘ উল্লম্বভাবে যেকোনো তলে দুটি সমানভাবে ভাগ করা যায়

৪০. কোন পর্বে পানি সংবহনতন্ত্র দেখা যায়? [চ. বো.-২০১৫]
ক Cnidaria খ Nematoda
গ Mollusca ঘ Echinodermata

৪১. কোন পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক? [ব. বো.-২০১৫]
ক Porifera খ Cnidaria
গ Mollusca ঘ Echinodermata

৪২. হেটারোসার্কাল লেজ পাওয়া যায় কোন শ্রেণিতে? [সি. বো.-২০১৫]
ক Chondrichthyes খ Amphibia
গ Osteichthyes ঘ Reptilia

৪৩. Arthropoda পর্বের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [সি. বো.-২০১৫]
ক অস্টিয়া খ শিখা কোষ
গ হিমোসিল ঘ নালিকা পদ

৪৪. জীবাশ্ম নিয়ে আলোচনা করা হয় যে শাখায়– [সি. বো.-২০১৫]
ক Ecology খ Evolution
গ Limmology ঘ Palaeontology

৪৫. কোনটির পুঞ্জ পাখনা হেটারোসার্কল ধরনের? [ঢা. বো.-২০১৯]
ক রুই খ লাংফিশ গ টাকি ঘ হাঙ্গর

৪৬. প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গবিহীন এবং তরুণাস্থিময় মৎস্যগোষ্ঠী কোন শ্রেণির অন্তর্গত? [দি. বো.-২০১৫]
ক Cephalaspidomorphi খ Chondrichthyes
গ Actinopterygii ঘ Sarcopterygii

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৭. Aves-এর বৈশিষ্ট্য হলো– [য. বো.-২০১৭]
i. উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট ii. দেহ লোমে আবৃত
iii. অস্থি বায়ুপূর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৮. যে পর্বের প্রাণীতে রক্ত সংবহনতন্ত্র ও শ্বসনতন্ত্র অনুপস্থিত তা হলো– [কুমিল্লা বো.-২০১৭]
i. Platyhelminthes ii. Nematoda iii. Mollusca
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৯. Aves-এর বৈশিষ্ট্য হলো– [ব. বো.-২০১৫]
i দেহ পালকযুক্ত ii. শীতল রক্তবিশিষ্ট iii. অস্থি বায়ুপূর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫০ ও ৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
অমিত সমুদ্রসৈকত থেকে স্টারফিস ও একটি হাঙর সংগ্রহ করল। রনি তাকে বলল– তার সংগৃহীত শেষোক্ত প্রাণীটি মাছ হলেও প্রথমটি কিন্তু মাছ নয়।
[সি. বো., কু. বো., ব. বো., চ. বো., য. বো., দি. ও রা. বো.-২০১৮]

৫০. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম প্রাণীটি কোন পর্বভুক্ত?
ক Cnidaria খ Arthropoda
গ Echinodermata ঘ Chordata

৫১. উদ্দীপকের প্রথম প্রাণীটি শেষোক্ত প্রাণী থেকে পৃথক করার ভিত্তি হলো–
i. শ্বসন কৌশল ii. অন্তঃকঙ্কাল iii. আবাসস্থল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

2020/8/4 12:44
Scanned with CamScanner

▶▶ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৫২. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটি কোন পর্বের? [ঢা. বো.-২০১৭]
ক Cnidaria খ Nematoda
গ Annnelida ঘ Platyhelminthes

৫৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটি– [ঢা. বো.-২০১৭]
i. অ্যাসিলোমেট ii. রেচন অঙ্গ শিখা কোষ iii. মুক্তজীবী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

▶▶ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: শ্রেণিকক্ষে তানিয়া দুটি প্রাণী নিয়ে পড়াশুনা করছে। যাদের অন্তঃকঙ্কাল অস্থিনির্মিত এবং এদের পাখনা রশ্মি বিদ্যমান। সে আরও জানল উক্ত প্রাণীর ন্যায় সকল প্রাণীরই বৈজ্ঞানিক নাম আছে।

৫৪. উদ্দীপক অনুসারে প্রাণীর বিশেষ নামের প্রবর্তক কে? [রা. বো.-২০১৭]
ক অগাস্ট হেকেল খ ক্যারোলাস লিনিয়াস
গ জোহান মেন্ডেল ঘ জ্যাকব ক্লেইন

৫৫. উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো– [রা. বো.-২০১৭]
i. *Scoliodon laticaudus* ii. *Tenualosa ilisha*
iii. *Labeo rohita*
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii



▶▶ উপরের চিত্র থেকে ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫৬. Q চিত্রে কোন ধরনের প্রতিসাম্যতা দেখায়? [য. বো.-২০১৬]
ক অরীয় খ গোলীয় গ অপ্রতিসম ঘ দ্বিপার্শ্বীয়

৫৭. উদ্দীপকের R চিত্রের প্রাণীটির পর্বের বৈশিষ্ট্য হলো– [য. বো.-২০১৬]
i. সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ ii. শিখা কোষ iii. পুঞ্জাক্ষি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

▶▶ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : রফিক মিউজিয়ামে রক্ষিত বিশাল আকৃতির হাঙর মাছ দেখে আনন্দিত হলো।

৫৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীর বৈশিষ্ট্য হলো– [সি. বো.-২০১৬]
i. দেহ প্ল্যাকয়েড আঁইশে আবৃত
ii. পুচ্ছ পাখনা হোমোসার্কাল
iii. ৫-৭ জোড়া ফুলকারন্ধ্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৯. উদ্দীপকের প্রাণীটি কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত? [সি. বো.-২০১৬]
ক Sarcopterygii খ Actinopterygii
গ Chondrichthyes ঘ Cephalaspidomorphi

▶▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

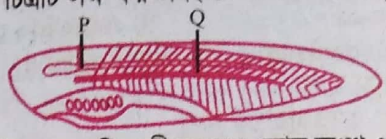

৬০. 'Q' চিহ্নিত অংশটি ভ্রূণীয়স্তরের কোন অংশ থেকে সৃষ্টি হয়? [ঢা. বো.-২০১৫]
ক এপিমিয়ার খ মেসোমিয়ার
গ হাইপোমিয়ার ঘ এন্ডোমিয়ার

৬১. 'P' চিহ্নিত অংশটি থেকে Verterbrata উপ-পর্বের পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিবর্তিত হয়– [ঢা. বো.-২০১৫]
i. মেরুদণ্ড ii. মস্তিষ্ক iii. সুষুমাকাণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

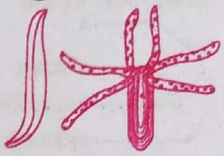

▶▶ উদ্দীপকের ভিত্তিতে ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৬২. উদ্দীপকের M চিহ্নিত প্রাণীতে কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়? [য. বো.-২০১৫]
ক পৌষ্টিকনালি সাধারণত পেঁচানো, কখনো U আকারের
খ শ্বসনতন্ত্র ও রক্ত সংবহনতন্ত্র উপস্থিত
গ এদের দেহ উভলিঙ্গিক
ঘ দেহগহ্বরের ফাঁকে ফাঁকে বায়ুযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষ বিদ্যমান

৬৩. উদ্দীপকের 'N' কোন পর্বভুক্ত প্রাণী? [য. বো.-২০১৫]
ক Cnidaria খ Nematoda
গ Platyhelminthes ঘ Annelida

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৪. নিচের কোনটি দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য প্রাণীর উদাহরণ? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক হাইড্রা খ জেলী ফিস
গ টিনোফেরা ঘ সী অ্যানিমন

৬৫. ভ্রান্ত সিলোমযুক্ত প্রাণীর পর্ব কোনটি? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক Platyhelminthes খ Nematoda
গ Arthropoda ঘ Cnidaria

৬৬. যখন কোন প্রাণীর দেহকে অক্ষ বরাবর ছেদ করলে একবারও সমান দুটি অংশে ভাগ করা যায় না তখন তাকে অপ্রতিসাম্য বলে। নিম্নে কোন প্রাণিটি অপ্রতিসাম্য? [মেডিকেল : ১৩-১৪]
ক হাইড্রা খ তেলাপোকা গ শামুক ঘ ব্যাঙ

৬৭. কোন প্রাণীটি দ্বিস্তরী? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক ম্যালেরিয়া জীবাণু খ হাইড্রা
গ জোঁক ঘ ফিতাকৃমি

৬৮. নিম্নের কোনটি বহুকোষী নয়? [ডেন্টাল : ০৪-০৫]
ক হাইড্রা ভালগারিস খ এনটামিবা হিস্টোলাইটিকা
গ হোমো সেপিয়ানস ঘ টিউনিলোএ্যা ইলিশ

2020/3/4 12:44

Scanned with CamScanner

৬৯. মুখবিবরে 'র‍্যাডুলা' নামক অংশ থাকে কোন পর্বের প্রাণীতে? [মেডিকেল ১৮-১৯]
ক Chordata খ Mollusca
গ Arthropoda ঘ Nematoda

৭০. জেলিফিশ কোন পর্বের প্রাণী? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক নিডারিয়া খ আর্থ্রোপোডা
গ মলাস্কা ঘ প্লাটিহেলমিনথেস

৭১. কোনটি আর্থ্রোপোডার বৈশিষ্ট্য নয়? [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক অধিকাংশ দেহগহ্বর হিমোসিলে পূর্ণ হয়
খ কিউটিকল নির্মিত বাহিঃকঙ্কাল রয়েছে
গ রক্ত সংবহনতন্ত্র বদ্ধ ধরনের
ঘ দেহ দ্বিপার্শীয় প্রতিসম, খণ্ডকায়িত এবং ট্যাগমাটায় বিভক্ত

৭২. পৃথিবীর আদিপ্রাণী যে পর্বের অন্তর্ভুক্ত তা হলো– [মেডিকেল: ১২-১৩]
ক সিলেনটারেটা খ পরিফেরা গ প্রোটোজোয়া ঘ কর্ডাটা

৭৩. গুড়াকৃমি নিম্নে উল্লিখিত কোন পর্বের অন্তর্ভুক্ত? [ডেন্টাল : ০৮-০৯]
ক প্রোটোজোয়া খ নেমাটোডা
গ প্লাটিহেলমিনথিস ঘ অ্যানিলিডা

৭৪. ত্রিস্তরী প্রাণীর বৈশিষ্ট্যে পড়ে না কোনটি? [ডেন্টাল : ০৫-০৬]
ক দেহ গহ্বরকে সিলোম বলা হয়
খ দেহাভ্যন্তরে একটি মাত্র নালি দেখা যায়
গ দেহের কোষগুলো এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক তিনটি কোষ স্তরে বিন্যস্ত থাকে
ঘ ভ্রূণস্তরের কোষগুলো বিভিন্ন কলা, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র গঠন করে

৭৫. নিচের কোনটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য? [ডেন্টাল : ০৪-০৫]
ক স্নায়ুরজ্জু নিরেট, দেহের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত
খ স্নায়ুরজ্জু অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত, নিরেট কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র
গ স্নায়ুরজ্জু পৃষ্ঠদেশে ফাঁপা, নলাকার, সূত্রবিশেষ
ঘ স্নায়ুরজ্জু ফাঁপা, দেহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত

৭৬. Annelida-র বৈশিষ্ট্য কোনটি? [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক দেহ দ্বিস্তরী
খ পরিপাকতন্ত্রে র‍্যাডুলা নামক অংশে রয়েছে
গ এরা এককোষী
ঘ রেচন অঙ্গ নেফ্রিডিয়া

৭৭. কোনটি প্লাটিহেলমিনথিস এর বৈশিষ্ট্য নয়? [ডেন্টাল : ০৩-০৪]
ক এরা ত্রিস্তরী
খ দেহ কিউটিকল এ আবৃত
গ রেচনতন্ত্র শিখা কোষ দিয়ে গঠিত
ঘ এদের দেহ উপর-নিচে চাপা

৭৮. কোনটি আর্থ্রোপোডা পর্বের ক্ষেত্রে সঠিক? [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক দেহ সুস্পষ্ট মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত
খ এক জোড়া অ্যান্টেনা থাকে
গ মস্তক ৬টি একীভূত খণ্ডে বিভক্ত
ঘ সন্ধিপদ যুক্ত উপাঙ্গ বিশিষ্ট

৭৯. পর্বের-বৈশিষ্ট্যের বেলায় কোনটি সঠিক নয়? [মেডিকেল: ০১-০২]
ক প্লাটিহেলমিনথেস : দেহ গহ্বর বা সিলোম নেই
খ নেমাটোডা : মুখচ্ছিদ্র সাধারণত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওষ্ঠ দিয়ে পরিবেষ্টিত
গ অ্যানিলিডা : শিখা কোষ বা ফ্লেম সেল এর মাধ্যমে রেচন কাজ পরিচালনা করে
ঘ আর্থ্রোপোডা : দেহ কাইটিন নির্মিত বহিঃকঙ্কাল দিয়ে আবৃত

৮০. মধ্যচ্ছদার উপস্থিতি বা Presence of diaphragm কোন পর্বের প্রাণীর বৈশিষ্ট্য? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক Reptilia খ Aves গ Amphibia ঘ Mammalia

৮১. ইলিশ মাছ নিম্নের কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত? [মেডিকেল : ০৫-০৬]
ক Condrichthyes খ Osteichthyes
গ Myxini ঘ Amphibia

৮২. 'নীল তিমি' মেরুদণ্ডী প্রাণীর কোন শ্রেণিভুক্ত? [মেডিকেল: ০৩-০৪]
ক সাইক্লোস্টোমাটা বা অ্যাগনাথা
খ কনড্রিকথিস বা কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছ
গ অস্টিকথিস বা অস্থিবিশিষ্ট মাছ
ঘ ম্যামালিয়া

৮৩. সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণী কোনটি? [ডেন্টাল : ০৪-০৫]
ক হাতি খ কচ্ছপ গ তিমি ঘ হাঙ্গর

৮৪. নিচের কোনটি উভচর শ্রেণির? [ডেন্টাল : ০৩-০৪]
ক টিকটিকি খ প্লাটিপাস
গ স্যালামান্ডার ঘ কাছিম

৮৫. নিম্নের কোনটি সরীসৃপ শ্রেণির প্রাণী নয়? [ডেন্টাল : ০২-০৩]
ক গোখরা খ টিকটিকি গ কচ্ছপ ঘ সোনাব্যাঙ

৮৬. কেঁচোর বায়োলজিক্যাল নাম কোনটি? [মেডিকেল : ১৩-১৪]
ক *Hirudu medicinalis* খ *Metaphire posthuma*
গ *Enterobius vermicularis* ঘ *Aurelia aurita*

উত্তরমালা

১. (গ); ২. (ক); ৩. (খ); ৪. (ঘ); ৫. (ঘ); ৬. (গ); ৭. (ঘ); ৮. (খ); ৯. (ক); ১০. (খ); ১১. (গ); ১২. (ক); ১৩. (খ); ১৪. (খ); ১৫. (গ); ১৬. (ঘ); ১৭. (ক); ১৮. (খ); ১৯. (গ); ২০. (ক); ২১. (খ); ২২. (গ); ২৩. (খ); ২৪. (ঘ); ২৫. (ঘ); ২৬. (গ); ২৭. (খ); ২৮. (ক); ২৯. (ক); ৩০. (খ); ৩১. (খ); ৩২. (ক); ৩৩. (খ); ৩৪. (ক); ৩৫. (ঘ); ৩৬. (গ); ৩৭. (ঘ); ৩৮. (ক); ৩৯. (খ); ৪০. (ঘ); ৪১. (ঘ); ৪২. (ক); ৪৩. (গ); ৪৪. (ঘ); ৪৫. (ঘ); ৪৬. (খ); ৪৭. (খ); ৪৮. (ক); ৪৯. (খ); ৫০. (গ); ৫১. (ক); ৫২. (ঘ); ৫৩. (ক); ৫৪. (খ); ৫৫. (গ); ৫৬. (ক); ৫৭. (গ); ৫৮. (খ); ৫৯. (গ); ৬০. (ক); ৬১. (খ); ৬২. (গ); ৬৩. (ক); ৬৪. (গ); ৬৫. (খ); ৬৬. (গ); ৬৭. (খ); ৬৮. (খ); ৬৯. (খ); ৭০. (ক); ৭১. (গ); ৭২. (গ); ৭৩. (খ); ৭৪. (খ); ৭৫. (ঘ); ৭৬. (ঘ); ৭৭. (ঘ); ৭৮. (ঘ); ৭৯. (গ); ৮০. (ঘ); ৮১. (খ); ৮২. (ঘ); ৮৩. (খ); ৮৪. (গ); ৮৫. (ঘ); ৮৬. (খ)।

2020/8/4 12:44
Scanned with CamScanner

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. প্রাণী কী?
২. প্রাণিবৈচিত্র্য কী?
৩. জীববৈচিত্র্য কী? [ঢা. বো. ২০১৫]
৪. শ্রেণিবিন্যাস কী?
৫. শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা বা ট্যাক্সোনমি কী?
৬. প্রান্তিকতা কী?
৭. ক্লিভেজ বা সম্ভেদ কী?
৮. ভ্রূণস্তর কী?
৯. প্রতিসাম্য বা প্রতিসাম্যতা কী? [কু. বো.-১৭, ১৫; ব. বো.-১৬, সি. বো.-১৬]
১০. সিলোম কী? [য. বো. কু. বো.-১৯; য. বো.-১৭, ঢা. রা.বো.-১৬; সি. বো.-১৫]
১১. খণ্ডায়ন বা মেটামেরিজম কী? [সি. বো.-১৯]
১২. যৌন দ্বিরূপতা কী?
১৩. প্রজাতি কী? [ঢা. বো.-১৯, ১৭, কু. বো.-১৫]
১৪. উপপ্রজাতি কী?
১৫. নামকরণ কাকে বলে?
১৬. ক্যাটাগরি কী?
১৭. ট্যাক্সন কী? [য. বো.-১৬, রা. বো.-১৭]
১৮. দ্বিপদ নামকরণ কী?
১৯. ত্রিপদ নামকরণ কী?
২০. পলিপ কী?
২১. মেডুসা কী?
২২. মেটাজেনেসিস কী?
২৩. র‍্যাডুলা কী?
২৪. নেফ্রিডিয়া কী?
২৫. সাইক্লয়েড আঁইশ কী?
২৬. টিনয়েড আঁইশ কী?
২৭. প্ল্যাকয়েড আঁইশ কী?
২৮. গ্যানয়েড আঁইশ কী?
২৯. হোমোসার্কাল লেজ কী?
৩০. হেটারোর্সাকাল লেজ কী?
৩১. ডাইফিসার্কাল লেজ কী?
৩২. এক্টোথার্মিক বা শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী কাকে বলে?
৩৩. হোমোথার্মিক কাকে বলে?
৩৪. ডায়াফ্রাম কী?
৩৫. মায়োটোম কী?
৩৬. ক্যাটল ফিশ কাদের বলে?
৩৭. কর্ডাটা প্রাণী কাকে বলে?
৩৮. প্রোটোকর্ডাটা কী?
৩৯. নটোকর্ড কী? [সকল বো.-১৮]
৪০. সন্ধিপদী প্রাণী কাকে বলে?
৪১. ম্যান্টল কী?
৪২. গলদা চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। [চ. বো.-১৫]
৪৩. হিমোসিল কী? [ব. বো.-১৬]
৪৪. হিমোসিলোমেট কী?
৪৫. শিখা কোষ কী? [কু. বো.-১৬]
৪৬. Chordata পর্বের উপ-পর্বগুলোর নাম লিখ।
৪৭. ইলিশ, দোয়েল ও বাঘের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
৪৮. Myxini শ্রেণিভুক্ত মাছেরা কী নামে পরিচিত?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. প্রাণীর বৈশিষ্ট্য লিখ।
২. হলোজয়িক পুষ্টি বলতে কী বোঝ?
৩. শ্রেণিবিন্যাস বলতে কী বুঝ? [রা. বো. ২০১৬]
৪. শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ধাপসমূহ লিখ।
৫. শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি ও নীতি বলতে কী বুঝ?
৬. দ্বিস্তরী প্রাণী ও ত্রিস্তরী প্রাণী বলতে কী বুঝ? [দি. বো. '১৬]
৭. বিভিন্ন প্রকার প্রতিসাম্যের নাম উদাহরণসহ লিখ।
৮. অরীয় প্রতিসম প্রাণী বলতে কী বুঝায়? [ঢা. সি. বো. '১৯]
৯. অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী বলতে কী বুঝ?
১০. অঞ্চলায়ন বা ট্যাগমাটাইজশন বলতে কী বুঝ? [চ. বো. '১৭]
১১. লিনিয়ান হায়ারার্কি বলতে কী বুঝ?
১২. অগ্রাধিকার সূত্র বলতে কী বুঝ? [য. বো. ২০১৬]
১৩. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বুঝ?
১৪. হোমোনিম ও সিনোনিম বলতে কী বুঝ?
১৫. প্রাণিজগতের সিলোমেট পর্বগুলোর নাম লিখ।
১৬. দ্বিপদ নামকরণের নিয়মাবলি লিখ।
১৭. নিডারিয়ানদের দ্বিস্তরী প্রাণী বলা হয় কেন? [কু. বো.'১৭]
১৮. ICZN বলতে কী বোঝ? [য. বো. ২০১৬, ২০১৭]
১৯. প্রতিসাম্য বলতে কী বোঝায়? [ঢা. বো. ২০১৫]
২০. সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কর্ডেট, কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয় কেন? [কু. বো. ২০১৭]
২১. ইউরোকর্ডাটাকে মেরুদণ্ডী বলা যায় না কেন?
২২. অ্যাক্রোনিয়া ও ক্রেনিয়েটা বলতে কী বুঝ?
২৩. Chordata পর্বের অনন্য বৈশিষ্ট্য বলতে কী বুঝ?
২৪. দ্বিপদী নামকরণ বলতে কী বোঝায়? [রা. ব. বো. ২০১৭]
২৫. প্লাটিপাসকে সংযোগকারী প্রাণী বলা হয় কেন? [কু. বো.-১৫]
২৬. Chordata পর্বের উপপর্বগুলোর নাম ও ২টি করে বৈশিষ্ট্য লিখ।
২৭. Urochordata উপপর্বের প্রাণীদের সাগর ফোয়ারা বলা হয় কেন? [সকল বো. ২০১৮]
২৮. Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda ও Echinodermata পর্বের ২টি করে বৈশিষ্ট্য ও ১টি করে বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
২৯. সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয়–ব্যাখ্যা কর। [সকল বো. ২০১৯]
৩০. Amphibia, Reptilia, Aves ও Mammalia শ্রেণির ২টি করে বৈশিষ্ট্য ও ১টি করে বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
৩১. Mollusca ও Arthropoda পর্বে প্রাণীদের কীভাবে পৃথক করবে?
৩২. Raptilia ও Aves শ্রেণির প্রাণীদের কীভাবে পৃথক করবে?
৩৩. Aves ও Mammalia শ্রেণির প্রাণীদের কীভাবে পৃথক করবে?
৩৪. সরীসৃপের আঁইশের সঙ্গে মাছের আঁশের কী পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা উল্লেখ কর।
৩৫. চিংড়ি, তারামাছ, তিমি মাছ নয় কেন?
৩৬. বাদুড় ও প্রজাপতি পাখি নয় কেন?
৩৭. কুমির, কচ্ছপ উভচর প্রাণী হলেও তাদের সরীসৃপ বলা হয় কেন?
৩৮. Sarcopterygii-ভুক্ত মাছকে বিবর্তনিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছ বলা হয় কেন?

পার্থক্য লিখ/তুলনা কর :

৩৯. কর্ডাটা ও নন-কর্ডাটা [সি. বো.-১৭]
৪০. মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী
৪১. Chondrichthyes, Actinopterygii ও Sarcopterygii
৪২. Agnatha ও Gnathostomata

2020/8/4 12:45
Scanned with CamScanner

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। বিশেষ এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী আছে যারা লার্ভা অবস্থায় সাঁতার কাটে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় কিছু উন্নত বৈশিষ্ট হারিয়ে উদ্ভিদের মত স্থায়ীভাবে বাস করে। এরা এবং হাঙ্গর একই পর্বের হলেও একই উপপর্বের নয়। *[ঢাকা, বোর্ড-২০১৯]*

ক. প্রজাতি কী?
খ. অরীয় প্রতিসম প্রাণী বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় প্রাণীটির শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
ঘ. উদ্দীপকের শেষের বাক্যটি বিশ্লেষণ কর।

২। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

A B C
কেঁচো, জোঁক ঘাসফড়িং, তেলাপোকা সাপ, সিংহ

[সকল বোর্ড-২০১৮]

ক. নটোকর্ড কী?
খ. Urochordata উপপর্বের প্রাণীদের সাগর ফোয়ারা বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে A-তে বর্ণিত প্রাণীগুলো কোন পর্বের তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে C-তে বর্ণিত প্রাণীগুলো B-তে বর্ণিত প্রাণীগুলো থেকে উন্নত– বিশ্লেষণ কর।

৩। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছক-১	ছক-২
প্রাণী : রুইমাছ, গোলকৃমি ও ফিতাকৃমি।	ছক-১ এ বিদ্যমান প্রাণীদের দেহগহ্বরের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়।

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]

ক. প্রতিসাম্যতা কী?
খ. নিডারিয়ানদের দ্বিস্তরী প্রাণী বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকের ছক-১ এর প্রাণীগুলোকে ছক-২ মোতাবেক কারণসহ গোষ্ঠীভুক্ত কর।
ঘ. উদ্দীপকের ছক-১-এ বর্ণিত "১ম প্রাণীটি অপর দুটি প্রাণী হতে উন্নত"– তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৪। শিক্ষক ক্লাসে এমন কিছু প্রাণীর কথা বললেন, যাদের সিলেন্টেরন, সন্ধিপদ অথবা ফুসফুস আছে।

[রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]

ক. ট্যাক্সন কী?
খ. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো যে সকল পর্বে পাওয়া যায় সে সকল পর্বের নাম ও উদাহরণ দাও।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পর্বগুলোর মধ্যে উন্নত ও অনুন্নত প্রাণীদের দুটি পর্বের নাম ও দুইটি করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লিখ।

৫। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

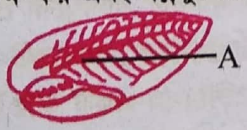

[যশোর বোর্ড-২০১৭]

ক. সিলোমের সংজ্ঞা দাও।
খ. ICZN বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের সাথে সম্পর্কযুক্ত পর্বটির বৈশিষ্ট্য লিখ।
ঘ. উদ্দীপকের A চিহ্নিত অঙ্গটির উপর ভিত্তি করে পর্বটির বিভিন্ন উপপর্বের বিভক্তি ব্যাখ্যা কর।

৬। নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র : A চিত্র : B চিত্র : C *[ঢাকা বোর্ড-২০১৭]*

ক. প্রজাতি কী?
খ. ট্যাক্সন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত প্রাণীটি যে উপপর্বের তার বৈশিষ্ট্য লিখ।
ঘ. উদ্দীপকে 'C' চিহ্নিত প্রাণীটি 'A' ও 'B' চিহ্নিত প্রাণীর চেয়ে উন্নত– বিশ্লেষণ কর।

৭। মাহবুব একটি দুর্গম এলাকায় বেড়াতে দুটি ভিন্ন ধরনের প্রাণী দেখল। প্রথমে সে যে প্রাণীটি দেখল তার গায়ে লোম রয়েছে। পরবর্তীতে দেখা প্রাণীটির গা পালকযুক্ত।

ক. নেফ্রিডিয়া কী?
খ. চিংড়ি, তারামাছ, তিমি মাছ নয় কেন?
গ. মাহবুবের দেখা প্রথম প্রাণীটির শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]
ঘ. মাহবুবের দেখা প্রাণী দুটি ভিন্ন পর্বের অন্তর্গত– বিশ্লেষণ কর।
[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]

৮। নিচের উদ্দীপকের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

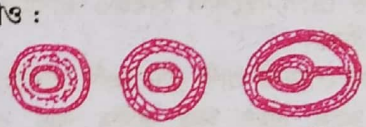

A B C

ক. র‍্যাডুলা কী?
খ. ইউরোকর্ডাটাকে মেরুদণ্ডী বলা যায় না কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' অনুপ্রস্থচ্ছেদ যে প্রাণিগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে তাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত A, B ও C বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণী? তোমার মতামত দাও।
[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]

৯। নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

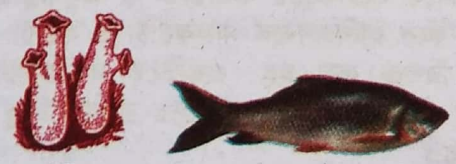

ক. খ. *[রা. বো. ২০১৬]*

ক. সিলোম কী?
খ. শ্রেণিবিন্যাস বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে 'ক' চিত্র যে উপপর্বের প্রাণী ঐ উপপর্বটির বৈশিষ্ট্য লিখ।
ঘ. উদ্দীপকের চিত্র 'ক' ও 'খ' কর্ডেট কিন্তু উভয়ই মেরুদণ্ডী নয়– বিশ্লেষণ কর।

2020/8/4 12:45

Scanned with CamScanner

১০। হালিম ও তার বাবা চিড়িয়াখানায় বাঘ, জলহস্তী, ঘড়িয়াল, পাখিসহ অসংখ্য প্রাণী দেখলেন। হালিম এসব বিচিত্র প্রাণী দেখে মুগ্ধ হলো। [ঢা. বো. ২০১৫]

ক. প্রাণিবৈচিত্র্য কী?
খ. প্রতিসাম্য বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে প্রাণীগুলোর মধ্যে কী ধরনের ভিন্নতা দেখা যায়– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. প্রাণীগুলোর পর্ব এক হলেও শ্রেণি আলাদা– বিশ্লেষণ কর।

১১। রাফিয়ার মা নেকটার পানি ও রেণু ইত্যাদি দ্বারা তৈরি এক ধরনের প্রাকৃতিক মিষ্টিজাতীয় বস্তুর সাথে ডিম ও পাউরুটি সহকারে সকলবেলার নাস্তা তৈরি করেন।

ক. জীববৈচিত্র্য কী?
খ. সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কর্ডেট, কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয় কেন?
গ. উদ্দীপকের মিষ্টিজাতীয় এবং প্রাণিজ খাদ্য সৃষ্টিকারী প্রাণীদ্বয়ের নটোকর্ডভিত্তিক পার্থক্য আলোচনা কর। [সিলেট বোর্ড-২০১৭]
ঘ. উদ্দীপকের মিষ্টিজাতীয় বস্তু সৃষ্টিকারী প্রাণীরা চরমভাবে অ্যালট্রুইস্টিক– বিশ্লেষণ কর। [সিলেট বোর্ড-২০১৭]

১২। আশরাফ পুকুর থেকে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার টোপ হিসেবে কেঁচো ব্যবহার করছিল। হঠাৎ সে দেখল একটি মাছরাঙা ঠোঁট দিয়ে মাছ ধরছে। [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]

ক. কার্প মাছ কী?
খ. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে টোপ হিসেবে ব্যবহৃত প্রাণীটির শ্রেণিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লিখ।
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত প্রাণী দুটির শ্রেণি বৈশিষ্ট্যের তুলনা কর।

১৩। শিক্ষক ক্লাসে এমন কিছু প্রাণীর কথা বললেন, যাদের সিলেন্টেরন, সন্ধিপদ অথবা ফুসফুস আছে। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]

ক. ট্যাক্সন কী?
খ. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো যে সকল পর্বে পাওয়া যায় সে সকল পর্বের নাম ও উদাহরণ দাও।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পর্বগুলোর মধ্যে উন্নত ও অনুন্নত প্রাণীদের দুটি পর্বের নাম ও দুটি করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লিখ।

১৪। প্রাণিদেহে নটোকর্ডের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগৎকে নন-কর্ডাটা ও কর্ডাটা– এ দুটি দলে বিভক্ত করা হয়। প্রকৃতিতে নন-কর্ডাটা প্রাণীর সংখ্যা সর্বাধিক এবং কর্ডেটদের রয়েছে কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য। [যশোর বোর্ড-২০১৬]

ক. ট্যাক্সন কী?
খ. অগ্রাধিকার আইন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সর্বাধিক সংখ্যক প্রাণিদলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ কর।

১৫। হালিম ও তার বাবা চিড়িয়াখানায় বাঘ, জলহস্তী, ঘড়িয়াল, পাখিসহ অসংখ্য প্রাণী দেখলেন। হালিম এসব বিচিত্র প্রাণী দেখে মুগ্ধ হল। [ঢাকা বোর্ড-২০১৫]

ক. প্রাণিবৈচিত্র্য কী?
খ. প্রতিসাম্য বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে প্রাণীগুলোর মধ্যে কী ধরনের ভিন্নতা দেখা যায়– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. প্রাণীগুলোর পর্ব এক হলেও শ্রেণি আলাদা– বিশ্লেষণ কর।

১৬। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

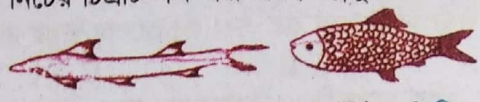

'A' 'B' [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৫]

ক. প্রজাতি কী?
খ. প্লাটিপাসকে সংযোগকারী প্রাণী বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকের আলোকে 'A' ও 'B' এর শ্রেণিভিত্তিক পার্থক্য লেখ।
ঘ. 'B' এর প্রাকৃতিক সংরক্ষণে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? যুক্তিসহ মতামত দাও।

১৭। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র : P চিত্র : Q চিত্র : R [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]

ক. গলদা চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
খ. ট্যাগমাটাইজেশন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের চিত্র 'R' এবং রুই মাছের মধ্যে কোনটি উন্নত এবং কেন?
ঘ. উদ্দীপকের P, Q ও R চিত্রের প্রাণীদের বিশেষ ধরনের গহবরের উপস্থিতি ও গঠনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১৮। একদা সজল শিক্ষাসফরে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে গেল। সেখানে সে নানা রঙের প্রজাপতি ও জোঁক দেখতে পেল। তাছাড়া সে কয়েক ধরনের পাখি যেমন দোয়েল ও কাক দেখতে পেল। [সিলেট বোর্ড-২০১৫]

ক. সিলোম কী?
খ. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকের অমেরুদণ্ডী প্রাণীগুলো যে যে পর্বের অন্তর্ভুক্ত তার নাম উল্লেখপূর্বক প্রত্যেকটি পর্বের তিনটি করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসহ একটি করে উদাহরণ দাও।
ঘ. সজলের দেখা শেষোক্ত প্রাণী দুটো প্রথমোক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী দুটো থেকে উন্নত ধরনের– ব্যাখ্যা কর।

2020/8/4 12:45

Scanned with CamScanner

আহছানুল হক আবির

2020/

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

Scanned with CamScanner

প্রাণীর পরিচিতি
INTRODUCTION OF ANIMAL

অধ্যায় ২

প্রাণিজগতের বিস্তৃতি ব্যাপক। প্রাণিজগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে প্রাণীর দৈহিক গঠন, জীবতত্ত্ব ও জীবনচক্র সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগতের সকল সদস্যের জীবন ইতিহাস আলাদাভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। (কারণ এদের বসতি, গঠন, চলন, খাদ্য গ্রহণ, আচার-ব্যবহার, প্রজনন ইত্যাদিতে রয়েছে বৈচিত্র্য।) কিন্তু বিভিন্ন পর্বের একটি প্রাণী সম্পর্কে অধ্যয়ন করে ঐ পর্বের সকল প্রাণী সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। এ অধ্যায়ে হাইড্রা, ঘাসফড়িং এবং রুই মাছের জীবন ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট পর্বের সকল প্রাণী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

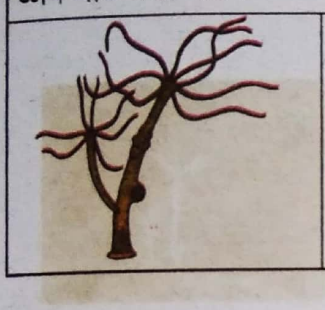
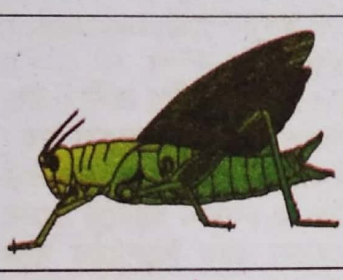


এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ২৫)
১. হাইড্রার গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ২. হাইড্রার খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৩. হাইড্রার চলন ও জনন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. হাইড্রার মিথোজীবিতা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. **ব্যবহারিক** হাইড্রা পর্যবেক্ষণ করে চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ৬. ঘাসফড়িং-এর গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ৭. ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র ও পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৮. **ব্যবহারিক** ঘাসফড়িং এর উপাঙ্গ শনাক্ত ও চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ঘাসফড়িং এর পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ শনাক্ত করতে পারবে। ৯. ঘাসফড়িং-এর সংবহন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১০. ঘাসফড়িং এর শ্বসন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১১. ঘাসফড়িং এর রেচন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১২. ঘাসফড়িং এর প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৩. ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষীর গঠন ও দর্শন কৌশল বর্ণনা করতে পারবে। ১৪. রুই মাছের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ১৫. রুই মাছের রক্ত সংবহন তন্ত্রের বর্ণনা করতে পারবে। ১৬. **ব্যবহারিক** ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের রক্ত সংবহন তন্ত্র পর্যবেক্ষণ এবং চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ১৭. রুই মাছের শ্বসন ও বায়ুথলির গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ১৮. ব্যবহারিক ○ রুই মাছের ফুলকা ও বায়ুথলি শনাক্ত করতে পারবে। ১৯. প্রকৃতিতে রুই মাছের প্রজনন ও নিষেক বর্ণনা করতে পারবে। ২০. রুই জাতীয় মাছের সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● **হাইড্রা** (*Hydra*) ○ গঠন (দেহপ্রাচীরের কোষের বৈশিষ্ট্যসহ) ○ খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া ○ চলন ও জনন ○ মিথোজীবিতা ● **ব্যবহারিক** ○ হাইড্রার স্থায়ী স্লাইড/মডেল পর্যবেক্ষণ ● **ঘাসফড়িং** (*Poecilocerux pictus*) ○ গঠন (বাহ্যিক) ○ পরিপাকতন্ত্র-মুখ উপাঙ্গ, পরিপাক গ্রন্থি ● **ব্যবহারিক** ○ ঘাসফড়িং/আরশোলা এর মুখ উপাঙ্গ ○ ঘাসফড়িং/আরশোলার পরিপাকতন্ত্র ও গ্রন্থি পর্যবেক্ষণ ● **ঘাসফড়িং** ○ সংবহন পদ্ধতি ○ শ্বসন পদ্ধতি ○ রেচন পদ্ধতি ○ প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর ● **ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষী** ○ গঠন ○ দর্শন কৌশল ● **রুই মাছ** (*Labeo*) ○ দেহ গঠন (বাহ্যিক) ○ রক্ত সংবহনতন্ত্র ● **ব্যবহারিক** ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের রক্ত সংবহন তন্ত্র পর্যবেক্ষণ। ○ শ্বসন ও বায়ুথলির গঠন ● **ব্যবহারিক** ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের ফুলকা ও বায়ুথলির পর্যবেক্ষণ ● জীবন চক্র ● সংরক্ষণ (প্রাকৃতিক)

2020/8/4 12:47

Scanned with CamScanner

২.১ হাইড্রা (*Hydra*)

Hydra নিডেরিয়া (Cnidaria) পর্বের জলজ প্রাণী। **সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানী আব্রাহাম ট্রেম্বলে** (Abraham Trembley, 1700-1784) 1774 সালে সর্বপ্রথম *Hydra* আবিষ্কার করেন। **ক্যারোলাস লিনিয়াস** (Carolus Linnaeus, 1707-1778) এর নামকরণ করেন হাইড্রা বা *Hydra*। *Hydra*-র বিনষ্ট দেহাংশ থেকে দ্রুত নতুন প্রাণী উৎপাদনের ক্ষমতা থাকায় গ্রিক পুরাণের বহুমস্তক বিশিষ্ট কাল্পনিক ড্রাগন বা দৈত্যের নাম অনুসারে *Hydra*-র এরূপ নামকরণ করা হয়। এ দানবকে অবশেষে মহাবীর **হারকিউলিস** বধ করেন।

❐ শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান (Systematic Position)

Kingdom — Animalia (প্রাণী)
Phylum — Cnidaria (নিডোসাইট ও সিলেন্টেরন উপস্থিত)
Class — Hydrozoa (অবিভক্ত সিলেন্টেরন)
Order — Hydroida (পলিপ দশা প্রধান)
Family — Hydridae (এককভাবে বসবাস করে)
Genus — *Hydra* (পুনরুৎপত্তি ক্ষমতাসম্পন্ন) Linnaeus, 1758
Species — *Hydra vulgaris* Pallas, 1766



চিত্র ২.১.১ : নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ সংলগ্ন ২টি *Hydra*

❐ **স্বভাব ও বাসস্থান (Habit and habitat) :** *Hydra* স্বাদু পানির প্রাণী। এরা বহুকোষী, সরল ও **মুক্তজীবী**। এদের স্বাদু পানির জলাশয়ের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। বিশেষ করে পুকুর, ডোবা, বিল, ঝিল, হ্রদ, খাল, ঝর্ণা ইত্যাদিতে বাস করে। পরিষ্কার ও স্রোতহীন পানিতে এদের বেশি দেখা যায়। ঘোলা, উষ্ণ ও চলমান পানিতে এদের পাওয়া যায় না। এদের জলজ উদ্ভিদ বা নিমজ্জিত কোনো বস্তুর নিম্নপৃষ্ঠের সঙ্গে পাদচাকতির সাহায্যে আটকে নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় এরা দেহ ও কর্ষিকাকে সর্বোচ্চ প্রসারিত করে পানিতে দুলতে থাকে। কোনো কিছুর সংস্পর্শে এরা দেহকে সংকুচিত করে ফেলে। *Hydra* **মাংসাশী** (carnivorous) অর্থাৎ অন্য কোনো প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে। এরা কর্ষিকার সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে। কর্ষিকা ও দেহের সংকোচন-প্রসারণ দ্বারা চলন সম্পাদন করে। দেহপ্রাচীরের মাধ্যমে **ব্যাপন** (diffusion) প্রক্রিয়ায় গ্যাসের আদান-প্রদান ও রেচন সম্পন্ন করে। অযৌন ও যৌন উভয় প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার করে। এদের **পুনরুৎপত্তি** (regeneration) ক্ষমতা প্রচণ্ড। বাংলাদেশে পাওয়া যায় এরূপ কয়েকটি প্রজাতি :

হাইড্রার প্রজাতি	কর্ষিকার সংখ্যা	বর্ণ
Hydra viridissima (= *Hydra viridis, Chlorohydra viridissima*)	৪-৮টি	সবুজ বর্ণের
Hydra gangetica	৬টি	সাদা বা হালকা গোলাপি বর্ণের
Hydra oligactis (=*Hydra fusca*)	৬টি	বাদামি বর্ণের (এক লিঙ্গিক)
Hydra vulgaris (বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়)	৬-১০টি	প্রায় বর্ণহীন বা স্বচ্ছ বা হালকা হলুদ-বাদামি বর্ণের (উভয়লিঙ্গিক)

Hydra-র গঠন (Structure of *Hydra*)

বাহ্যিক গঠন (External Morphology)

আকার ও আকৃতি : *Hydra* একটি নলাকার বা চোঙ্গাকার, নরম ও **অরীয় প্রতিসম** ক্ষুদ্র প্রাণী। এদের দেহের মধ্যভাগে স্ফীত ও উভয় প্রান্ত একটু সরু। এদের দেহের এক প্রান্ত খোলা (ওরাল বা মৌখিক প্রান্ত) এবং অপর প্রান্ত বন্ধ (অ্যাবওরাল বা বিমৌখিক প্রান্ত)। বন্ধ প্রান্তটি কোনো বস্তুর সাথে দেহকে সংযুক্ত রাখতে সাহায্য করে। এরা **দৈর্ঘ্যে ১-৩ সেন্টিমিটার** (বা ১০-৩০ মিলিমিটার) এবং **প্রস্থে ১ মিলিমিটার** হয়ে থাকে। প্রজাতিভেদে *Hydra*-র বর্ণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। তবে গৃহীত খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ণবৈষম্য দেখা যায়।

একটি পরিণত *Hydra*-র দেহকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা–

১। **হাইপোস্টোম;** (২) **দেহকাণ্ড** ও (৩) **পাদচাকতি** বা **পদতল**।

১। হাইপোস্টোম (Hypostome) : *Hydra*-র দেহের মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত মোচাকৃতির সংকোচন ও প্রসারণশীল অঙ্গকে **হাইপোস্টোম** বলে। এর কেন্দ্রভাগে মুখছিদ্র বিদ্যমান, এটি সিলেন্টেরনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। হাইপোস্টোমের গোড়ার চতুর্দিকে ৬-১০টি সরু, সংকোচন-প্রসারণশীল লম্বা ও ফাঁপা সুতার ন্যায় **কর্ষিকা** (tentacles) থাকে। কর্ষিকার বহিঃপ্রাচীরে ছোট ছোট টিউমারের মতো **নেমাটোসিস্ট ব্যাটারি** (nematocyst battery-নিডোসাইট কোষগুচ্ছ) থাকে। ব্যাটারিতে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট থাকে।

কাজ : মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্য গৃহীত ও অপাচ্য অংশ বহিষ্কৃত হয়। কাজেই মুখছিদ্র একসঙ্গে মুখ ও পায়ুর কাজ করে। কর্ষিকা শিকার ধরা, আত্মরক্ষা, চলন ও খাদ্যবস্তু মুখে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

2020/8/4 12:47

Scanned with CamScanner

২। দেহকাণ্ড (Trunk) : হাইপোস্টোমের নিচ থেকে পাদচাকতির উপর পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে দেহকাণ্ড বা মূলদেহ বলে। এর মধ্যভাগ কিছুটা স্ফীত। অনুকূল পরিবেশে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য পাওয়া যায় তখন দেহকাণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বা গোড়ার দিকে এক বা একাধিক **কুঁড়ি** বা **মুকুল** (bud) দেখা যায়। অযৌন পদ্ধতিতে মুকুল সৃষ্টি হয়। পরিণত মুকুলে মুখছিদ্র ও কর্ষিকাসহ হাইপোস্টোম দেখা যায়। প্রত্যেক মুকুল পরিপক্ব হয়ে নতুন সদস্যের জন্ম দেয়। প্রজনন ঋতুতে (হেমন্ত ও শীতকালে) এদের দেহকাণ্ডে অস্থায়ী **জননাঙ্গ** (genital organ) গঠিত হয়। *Hydra*-র দেহের উপরের অর্ধাংশে এক বা একাধিক কোণাকার **শুক্রাশয়** (testes) এবং নিচে পাদচাকতির কাছাকাছি এক বা একাধিক গোলাকৃতির **ডিম্বাশয়** (ovaries) অবস্থান করে। এগুলো দেহে অস্থায়ী অঙ্গ। এরা জননাঙ্গে জননকোষ (gametes) তৈরি করে যৌন জননে অংশ নেয়।

কাজ : দেহকাণ্ড জননাঙ্গ ও মুকুল ধারণ করে। দেহ বাঁকিয়ে চলনে সহায়তা করে। *Hydra*-র পুনরুৎপত্তিতে অংশগ্রহণ করে।

৩। পাদচাকতি বা পদতল (Pedal or basal disc) : *Hydra*-র দেহের গোড়ার চ্যাপ্টা থালার মতো অংশকে **পাদচাকতি** বা পদতল বা ব্যাসাল ডিস্ক বলে। এখানে আঠালো পদার্থ ক্ষরণকারী অসংখ্য গ্রন্থিকোষ বিদ্যমান। এটি দেহকাণ্ডের নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত।

কাজ : এটি আঠালো পদার্থ নিঃসৃত করে প্রাণীকে কোনো বস্তুর সঙ্গে আটকে রাখতে সাহায্য করে। এটি **বুদবুদ** (bubble) সৃষ্টি করে প্রাণীকে পানিতে ভাসতে সাহায্য করে। এর ক্ষণপদ সৃষ্টিকারী কোষ ক্ষণপদ সৃষ্টি করে **গ্লাইডিং** পদ্ধতিতে চলন সম্পন্ন করে।

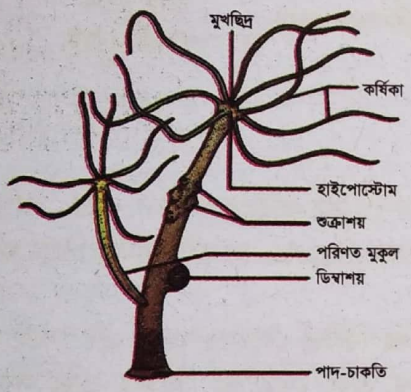

চিত্র ২.১.২ : *Hydra*-র বহির্গঠন

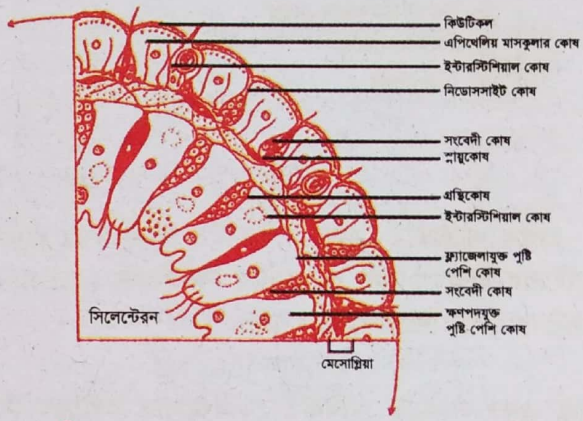

চিত্র ২.১.৩ : *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদ (এক-চতুর্থাংশ)

অভ্যন্তরীণ গঠন (Internal Morphology)

Hydra-র দেহ মূলত **দেহপ্রাচীর** (body wall) ও একটি কেন্দ্রীয় **গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর** বা **সিলেন্টেরন** (gastrovascular cavity or coelenteron) নিয়ে গঠিত। দেহপ্রাচীর এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মে বিন্যস্ত। যেসব প্রাণীর ভ্রূণীয় দশায় কোষগুলো এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি কোষীয় স্তরে বিন্যস্ত থাকে তাদের **দ্বিভ্রূণস্তরী** বা **দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাণী** (diploblastic animal) বলা হয়। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে স্তর দুটি যথাক্রমে **এপিডার্মিস** (epidermis) ও **গ্যাস্ট্রোডার্মিসে** (gastrodermis) পরিণত হয়। এ স্তর দুটি যথাক্রমে ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম থেকে সৃষ্ট হয়। এই দুই স্তরের মাঝখানে অকোষীয় জেলির মতো (কখনও কিছু কোষ ও তন্তুযুক্ত) **মেসোগ্লিয়া** (mesoglea) স্তর উপস্থিত থাকে। মেসোগ্লিয়া এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসকে ধরে রাখে। এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস বিভিন্ন ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত।

দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী ও ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী	ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণী
১। ভ্রূণীয় কোষস্তর	দেহে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি ভ্রূণীয় কোষস্তর থাকে।	দেহে এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক তিনটি ভ্রূণীয় কোষস্তর থাকে।
২। মেসোগ্লিয়া	এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মাঝে জেলির ন্যায় অকোষীয় মেসোগ্লিয়া নামক স্তর থাকে।	মেসোগ্লিয়া নেই।
৩। ভ্রূণস্তরের পরিণতি	ভ্রূণস্তরের কোষগুলো কোনো অঙ্গ বা অঙ্গতন্ত্র গঠন করে না।	ভ্রূণস্তরের কোষগুলো বিভিন্ন কলা, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র গঠন করে।
৪। নেমাটোসিস্ট	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৫। পলিপ ও মেডুসা দশা	উভয় দশা বা একটি দশা উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৬। দেহ গহ্বর	সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর।	সিলোম।
৭। উদাহরণ	Cnidaria পর্বভুক্ত সকল প্রাণী।	Mollusca থেকে Chordata পর্বভুক্ত সকল প্রাণী।

2020/8/4 12:47
Scanned with CamScanner

Hydra-র দেহপ্রাচীরের কোষসমূহ

এপিডার্মিস
১. পেশি-আবরণী কোষ ২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ ৩. সংবেদী কোষ ৪. স্নায়ু কোষ ৫. গ্রন্থি কোষ ৬. জনন কোষ এবং ৭. নিডোসাইট
মেসোগ্লিয়া
কোন কোষস্তর নয়, একে সংযোগকারী স্তর বলা হয়।
গ্যাস্ট্রোডার্মিস
১. পুষ্টি কোষ ২. গ্রন্থি কোষ ৩. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ ৪. সংবেদী কোষ ৫. স্নায়ু কোষ



চিত্র ২.১.৪ : *Hydra*-র দেহপ্রাচীরের অংশবিশেষ (বিবর্ধিত)

এপিডার্মিস বা বহিঃত্বকের কোষসমূহ (Cells of Epidermis)

ভ্রূণীয় **এক্টোডার্ম** থেকে এপিডার্মিস গঠিত হয়। *Hydra*-র এপিডার্মিস দেহের বহিঃত্বক গঠন করে। এপিডার্মিসের বাইরের দিক পাতলা ও নমনীয় **কিউটিকল** (cuticle) দ্বারা আবৃত থাকে। *Hydra*-র এপিডার্মিস নিচে বর্ণিত সাত ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত। যথা–

১। পেশি-আবরণী কোষ (Masculo-epithelial cell) : বহিঃত্বকের বিভিন্ন কোষের মধ্যে এই কোষ সর্বাপেক্ষা বড় এবং সংখ্যায় অধিক। কোষগুলোর বাইরের দিকের প্রান্ত প্রশস্ত এবং ভেতরের দিকের প্রান্ত সরু। অর্থাৎ কোষগুলো অনিয়ত কোণাকৃতির বা নাসপাতি আকৃতির। প্রতিটি কোষের মধ্যে বড় একটি নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম, **মিউকাস বস্তু** ও কিছু গহ্বর বিদ্যমান। বাইরের প্রশস্ত প্রান্ত পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি অবিচ্ছেদ্য আবরণ সৃষ্টি করে। ভেতরের সরু প্রান্তের শেষে **মায়োনিম** (এক ধরনের নমনীয় ও সংকোচন-প্রসারণশীল তন্তু) নির্মিত দুটি **পেশি প্রবর্ধন** বা **পেশি লেজ** দেহ অক্ষের সমান্তরালে অবস্থান করে। কর্ষিকায় কোষগুলো বেশ বড় ও চাপা এবং কয়েকটি করে নিডোব্লাস্ট ধারণ করে। এসব কোষ একদিকে দেহাবরণ, অন্যদিকে পেশির মতো কাজ করে বলে এদেরকে "পেশি-আবরণী কোষ" বলা হয়।

কাজ : এসব কোষ দেহের আবরণ তৈরি করে দেহকে রক্ষা করে। মিউকাস দানা নিঃসৃত রস কিউটিকল তৈরি করে ও দেহকে পিচ্ছিল রাখে এবং দেহের সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে চলে ও কোনো বস্তুর সঙ্গে আবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে। কর্ষিকাতে এরা নেমাটোসিস্ট ধারণ করে। এদের মিউকাস দানা সমৃদ্ধ অংশ শ্বসনে সহায়তা করে।



চিত্র ২.১.৫ : *Hydra*-র বহিঃত্বকের কোষসমূহ

2020/8/4 12:47
Scanned with CamScanner

২। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial cell) : এরা দুটি পেশি আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে। এরা গোলাকার বা ত্রিকোণাকার ও ক্ষুদ্রাকৃতির (৫ মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট)। প্রতিটি কোষে নিউক্লিয়াস বড় ও স্পষ্ট। এরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোজোম ও অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া বহন করে। এ কোষগুলো একত্রিত হয়ে হাইপোস্টোমের নিচের দিকে একটি বৃদ্ধি এলাকা গঠন করে।

কাজ : এরা প্রয়োজনবোধে অন্য যেকোনো ধরনের বহিঃত্বকীয় কোষে পরিণত হতে পারে এবং দেহের **বৃদ্ধি, পুনরুৎপত্তি, মুকুল ও জননাঙ্গ** সৃষ্টিতে অংশ নেয়। অর্থাৎ এরা **টটিপটেন্ট** (totipotent) ক্ষমতাসম্পন্ন। **Brein** (1955)-এর মতে, প্রতি 45 দিন অন্তর অন্তর *Hydra*-র দেহের সকল কোষ ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। কোষের এ বৈশিষ্ট্যকে **টটিপটেন্ট** বলে।

৩। সংবেদী কোষ (Sensory cell) : এরা পেশি আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে, সমকোণে ও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। কর্ষিকা, হাইপোস্টোম ও পাদচাকতিতে এদের সংখ্যা অনেক বেশি। কোষগুলো আকৃতিতে লম্বা, নিউক্লিয়াস বড় ও স্পষ্ট এবং মুক্তপ্রান্তে একটি সূক্ষ্ম **সংবেদী রোম** (sensory hair) বা অ্যাপিকাল সিলিয়া থাকে। কোষের নিম্নপ্রান্তে গুটিকাময় বা নডিউলযুক্ত (nodulated) সংবেদনশীল তন্তুগুলো স্নায়ুকোষের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

কাজ : সংবেদী রোমের সাহায্যে পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা (যেমন– **স্পর্শ, তাপ, আলোক** ইত্যাদি) গ্রহণ করে স্নায়ুকোষে পৌঁছায়।

৪। স্নায়ু কোষ (Nerve cell) : এরা মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত। এসব কোষ ক্ষুদ্রাকার ও অনিয়ত আকার বিশিষ্ট। এরা একটি কোষদেহ এবং দুই বা ততোধিক সূক্ষ্ম শাখান্বিত **স্নায়ুতন্তু** বা নিউরাইট নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে **স্নায়ুজালক** (nerve net) সৃষ্টি করে। কোষগুলো স্পষ্ট নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট।

কাজ : সংবেদী কোষে **সংগৃহীত উদ্দীপনা** দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করা এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় করা।

৫। গ্রন্থি কোষ (Gland cell) : এটি মুখছিদ্রের চারদিকে কর্ষিকা ও পদতলে অবস্থান করে। পেশি আবরণী কোষ রূপান্তরিত হয়ে বিশেষ ধরনের নিঃস্রাবী কোষে পরিণত হয়। এদের গ্রন্থিকোষ বলে।

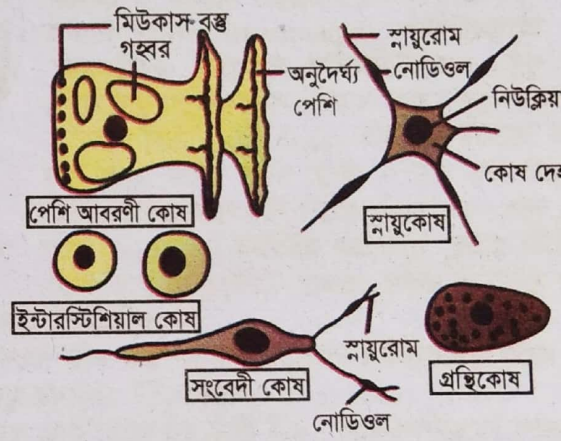

চিত্র ২.১.৬ : *Hydra*-র বিভিন্ন ধরনের কোষ

এই কোষগুলো আকৃতিতে লম্বা ও কনিক্যাল আকৃতির হয়ে থাকে এবং ভেতরের প্রান্ত পেশি প্রবর্ধনযুক্ত। প্রবর্ধনগুলো পদতলের কেন্দ্র থেকে অরীয়ভাবে বিন্যস্ত থাকে। এদের সাইটোপ্লাজমের অধিকাংশই অসংখ্য মিউকাস বস্তু দ্বারা পূর্ণ।

কাজ : এই কোষ থেকে নিঃসৃত আঠালো রস *Hydra*-কে কোনো বস্তুর সঙ্গে **আটকে রাখতে** সাহায্য করে। এরা **বুদবুদ সৃষ্টি** করে পানিতে ভাসতে ও **ক্ষণপদ** সৃষ্টি করে **চলনে** সাহায্য করে। মুখছিদ্রের গ্রন্থিকোষের ক্ষরণ খাদ্য **গলাধঃকরণে** সাহায্য করে।

৬। জনন কোষ (Germ cell) : *Hydra*-র ইন্টারস্টিশিয়াল কোষগুলো প্রজনন ঋতুতে পুনঃপুনঃ বিভাজিত হয়ে দেহের নির্দিষ্ট স্থানে জনন অঙ্গের সৃষ্টি করে। জনন অঙ্গ শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ে পরিণত হয়। শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু ও ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। শুক্রাণু নিউক্লিয়াসযুক্ত স্ফীত মস্তক, সেন্ট্রিওলযুক্ত মধ্যখণ্ড ও লম্বা বিচলনক্ষম লেজ নিয়ে গঠিত এবং পরিণত ডিম্বাণুটি বড় ও গোলাকার; এর সাথে তিনটি পোলার বডি যুক্ত থাকে।

কাজ : *Hydra*-র যৌন জননে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে জনন কাজে সাহায্য করে।

৭। নিডোসাইট কোষ (Cnidocyte cell) : *Hydra*-র **পদতল ছাড়া বহিঃত্বকের সর্বত্র বিশেষ করে কর্ষিকায় এদের বেশি পাওয়া যায়**। এরা গোলাকার, ডিম্বাকার, পেয়ালাকার এবং নিচের দিকে নিউক্লিয়াসযুক্ত। প্রতিটি কোষ দুটি আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। কোষের মুক্ত প্রান্তে ক্ষুদ্র, দৃঢ় ও সংবেদনশীল **নিডোসিল** এবং অভ্যন্তরের গহ্বর পেঁচানো সুতাযুক্ত নেমোটোসিস্ট বহন করে। গহ্বরটি অপারকুলাম দ্বারা ঢাকা থাকে। আদর্শ নেমোটোসিস্টের সুতার গোড়ায় বড় বড় ৩টি কাঁটার মতো **বার্ব** থাকে এবং গহ্বরটি **হিপনোটক্সিন** (hypnotoxin) নামক বিষাক্ত রসে পূর্ণ থাকে। **পরিস্ফুটনরত নিডোসাইটকে নিডোব্লাস্ট কোষ** (cnidoblast cell) **বলে**।

কাজ : নিডোসাইটের নেমাটোসিস্ট প্রাণীর **খাদ্য গ্রহণ, চলন** ও **আত্মরক্ষায়** এবং কোনো বস্তুর সঙ্গে **আটকে** থাকতে সাহায্য করে। এ কোষের **শ্রেণিতাত্ত্বিক** গুরুত্ব রয়েছে।

2020/8/4 12:47

Scanned with CamScanner

আদর্শ নিডোসাইট বা নেমাটোসাইটের গঠন (Structure of a typical Cnidocyte or Nematocyte)

Hydra সহ Cnidaria পর্বের সকল প্রাণীতে বহিঃত্বকের দুটি পেশি আবরণী কোষের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ দেখা যায়। এই কোষগুলোকে **নিডোসাইট** বা **নেমাটোসাইট কোষ** বলে।

Hydra-র একটি আদর্শ নিডোসাইট কোষ দেখতে গোলাকার, ডিম্বাকার, নাশপাতি আকার, পেয়ালাকার বা লাটিম আকৃতির। প্রতিটি কোষের যে প্রান্ত মেসোগ্লিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে তা কিছুটা সরু, মধ্যাংশ স্ফীত এবং বাইরের দিক ক্রমশ সরু। এটি নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত–

১। আবরণ (Cell membrane) : প্রতিটি কোষ **প্রোটিন** ও **লিপিড** নির্মিত একটি দ্বিস্তরী আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। একটি বহিঃআবরণী ও অপরটি অন্তঃআবরণী। স্তর দুটির মাঝখানে দানাদার সাইটোপ্লাজম এবং কোষের গোড়ার দিকে একটি নিউক্লিয়াসসহ অন্যান্য সকল কোষীয় অঙ্গাণু বিদ্যমান থাকে।

২। নেমাটোসিস্ট (Nematocyst) : নিডোসাইট কোষের স্ফীত, মধ্যাংশে তরলে পূর্ণ এবং পেঁচানো সূত্রক সমন্বিত ক্ষুদ্র থলিকে **নেমাটোসিস্ট** (Nematocyst; গ্রিক, *nema* = সুতা + *kystis* = থলি) বা **নিডা** (cnida) বলে। এর প্রাচীর আজীবন কাইটিন নির্মিত। নেমাটোসিস্টের কেন্দ্রস্থল **আমিষ** ও **ফেনলে** গঠিত **হিপনোটক্সিন** (hipnotoxin) নামক বিষাক্ত তরলে পূর্ণ। নেমাটোসিস্টের অগ্রপ্রান্তে একটি লম্বা, ফাঁপা, সরু সূত্রক যুক্ত থাকে। সূত্রকের গোড়ার প্রশস্ত অংশকে **শ্যাফট** বা **বাট** (shaft/butt) বলে। বাটের উপর ৩টি বড় বড় ও তীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে একে **বার্ব** (barb) বলে। এছাড়া এ অংশে কিছু সর্পিলাকারে ছোট ছোট কাঁটা থাকে, এদেরকে **বার্বিউল** (barbules) বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি অনিক্ষেপিত নেমাটোসিস্টের বাট, কাঁটা ও সূত্রকসহ থলির ভেতরে উল্টোভাবে ঢুকে থাকে।



চিত্র ২.১.৭ : *Hydra*-র আদর্শ নিডোসাইট কোষ

৩। অপারকুলাম (Operculum) : স্বাভাবিক অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও থলি একটি ঢাকনা দ্বারা ঢাকা থাকে। একে অপারকুলাম বলে। উন্মুক্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়।

৪। নিডোসিল (Cnidocil) : নিডোসাইট কোষের মুক্তপ্রান্তে দৃঢ়, অতি সংবেদনশীল একটি কাঁটার মতো অংশ থাকে, একে নিডোসিল বলে। এটি ট্রিগারের মতো কাজ করে, ফলে পেঁচানো সূত্রকটি বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

৫। পেশিসূত্র ও ল্যাসো (Muscle fibre and lasso) : নিডোসাইটের ক্যাপসুলের পৃষ্ঠদেশ থেকে কতগুলো ক্ষুদ্রাকৃতি পেশিতন্তু সৃষ্টি হয়ে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। পরে সবগুলো তন্তু একত্রিত হয়ে নিডোসাইটের বৃন্তের ভেতর দিয়ে মেসোগ্লিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়। এছাড়া নেমাটোসিস্টের নিম্নপ্রান্তে মোটা ও পেঁচানো সূত্রক বিদ্যমান, একে **ল্যাসো** বলে।

উৎপত্তি ও পরিণতি

নেমাটোসিস্ট ব্যবহারের পর নিডোসাইট কোষ সিলেন্টেরনে গমন করে এবং সেখানে এটি খাদ্যের সঙ্গে পরিপাক হয়। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ রূপান্তরিত হয়ে নতুন নিডোসাইট কোষ উৎপন্ন করে।

নেমাটোসিস্টের প্রকারভেদ (Types of Nematocyst)

নিডোসাইটের অভ্যন্তরে পেঁচানো নালিযুক্ত ও বিষাক্ত তরলে পূর্ণ গহ্বরকে **নেমাটোসিস্ট** বলে। গঠনের বৈসাদৃশ্যতার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী **ভার্নার** (Werner, 1965) Cnidaria পর্বের প্রাণীদের দেহে ২৩ ধরনের নেমাটোসিস্ট শনাক্ত করেছেন। *Hydra*-র দেহে মাত্র চার ধরনের নেমাটোসিস্ট পাওয়া যায়। এগুলো হলো–

১। পেনিট্র্যান্ট বা স্টিনোটিল (Penetrant or stenotele) : *Hydra*-র চার ধরনের নেমাটোসিস্টের মধ্যে এটি বৃহত্তম এবং জটিল ধরনের নেমাটোসিস্ট। এদেরকে আদর্শ নেমাটোসিস্ট হিসেবে ধরা হয়। এদের থলিটি নাশপাতি আকৃতির। এর অভ্যন্তরে আমিষ ও **ফেনলে সমৃদ্ধ হিপনোটক্সিন** নামক বিষাক্ত তরল থাকে। এদের সূত্রক লম্বা, ফাঁপা, শীর্ষ উন্মুক্ত। সূত্রকের গোড়ার স্ফীত অংশকে বাট বলে। প্রশস্ত বাটে ৩টি বড় তীক্ষ্ণ বার্ব ও তিন সারি সর্পিলাকারে সজ্জিত অতি ক্ষুদ্র বার্বিউল উপস্থিত।

কাজ : এ ধরনের নেমাটোসিস্ট শিকারের দেহে বিদ্ধ হয়ে হিপনোটক্সিনের সাহায্যে শিকারকে অজ্ঞান ও অবশ করে।

২। ভলভেন্ট বা ডেসমোনিম (Volvent or desmoneme) : এ জাতীয় নেমাটোসিস্ট অপেক্ষাকৃত ছোট ও নাসপাতি আকৃতির। এদের বাটে বার্ব ও বার্বিউল থাকে না। সূত্রকটি খাটো, মোটা, স্থিতিস্থাপক, কাঁটাবিহীন এবং শীর্ষদেশ বন্ধ। থলের ভেতরে সূত্রকের একটি মাত্র প্যাঁচ থাকে কিন্তু নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কর্ক-স্ক্রুর মতো অনেকগুলো প্যাঁচের সৃষ্টি করে।

কাজ : এরা শিকার বা কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

2020/8/4 12:48

Scanned with CamScanner

৩। **স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট বা হলোট্রাইকাস আইসোরাইজা** (Streptoline glutinant or holotrichous isorhiza) : এগুলো ছোট, ডিম্বাকৃতির বা চোঙ্গাকৃতির নেমাটোসিস্ট। বাট সুগঠিত নয়; সূত্রক লম্বা, সর্পিলাকারে সজ্জিত ছোট ছোট কাঁটাযুক্ত এবং সূত্রকের শীর্ষদেশ উন্মুক্ত।

কাজ : আঠালো রস ক্ষরণ করে চলনে ও শিকার আটকাতে সাহায্য করে।

৪। **স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট বা অ্যাট্রিকাস আইসোরাইজা** (Stereoline glutinant or atrichous isorhiza) : এরা ক্ষুদ্রতম নেমাটোসিস্ট। এরা সাধারণত ডিম্বাকৃতির বা লম্বাকৃতির হয়। সূত্রক লম্বা, সোজা এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত। এদের বাট সুগঠিত নয়; বার্ব এবং বার্বিউল অনুপস্থিত।

কাজ : এরাও আঠালো রস ক্ষরণ করে চলনে ও শিকার আটকাতে সাহায্য করে।

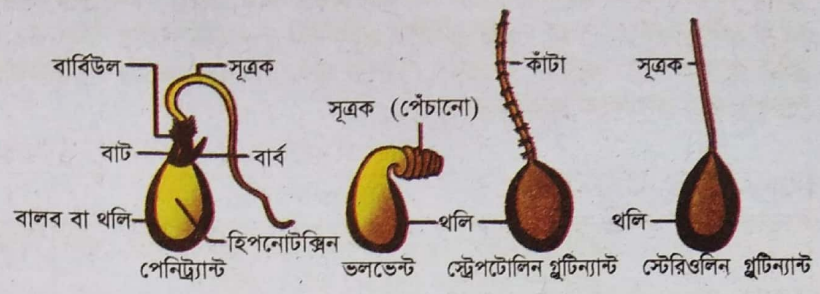

চিত্র ২.১.৮ : *Hydra*-র বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট

নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপের কৌশল (Mechanism of discharge of nematocyst thread)

খাদ্য শিকার বা শত্রু বা অন্য কোনো কারণে নিডোসিল উদ্দীপিত হলে নেমাটোসিস্ট দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। কেবল খাদ্য বা স্পর্শ বা শিকারের উপস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে নয়, উভয়ের যৌথ প্রভাবেই এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। নিডোসাইট কোষ থেকে নেমাটোসিস্ট নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উভয় প্রকারের কারণ হতে পারে। তবে এর প্রকৃত কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। অনুমান করা হয়, কোনো শিকার *Hydra*-র কর্ষিকার নিকটবর্তী হলে শিকার দেহের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে নেমাটোসিস্ট প্রাচীরের পানি ভেদ্যতা বেড়ে যায়। এতে থলির ভেতর দ্রুত পানি প্রবেশ করায় ভেতরের অভিস্রবণিক চাপ বেড়ে যায়। এ সময় শিকার নিডোসাইটের নিডোসিল স্পর্শ করামাত্র এর অপারকুলাম খুলে যায় এবং তখন দ্রুত পানি ভেতরে প্রবেশ করায় হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ বেড়ে গেলে নেমাটোসিস্ট সূত্রক দ্রুতগতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। **নেমাটোসিস্টের সূত্রক একবার নিক্ষিপ্ত হলে তাকে আর নিডোসাইটে ফিরিয়ে আনা যায় না** বা আবার ব্যবহার করা যায় না, কিংবা ঐ একই নিডোসাইট আর কোনো নেমাটোসিস্ট সৃষ্টি করতে পারে না। এ প্রকারের নিডোসাইট মেসোগ্লিয়া হয়ে আস্তে আস্তে সিলেন্টেরনে পরিযাত্রা করে এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সাথে হজম হয়ে যায়। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ থেকে নতুন নিডোসাইট কোষ সৃষ্টি হয়।

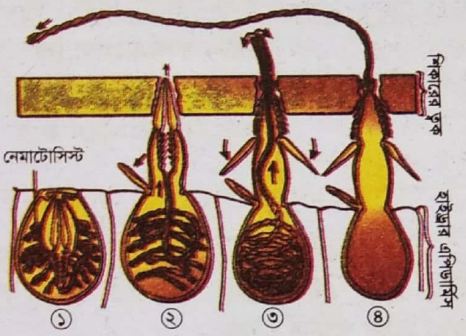

চিত্র ২.১.৯ : *Hydra*-র নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ প্রক্রিয়া

Hydra-র বিভিন্ন প্রকার নেমাটোসিস্টের মধ্যে তুলনা

পার্থক্যের বিষয়	পেনিট্র্যান্ট	ভলভেন্ট	স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট	স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট
১। অপর নাম	স্টিনোটিল/আদর্শ নেমাটোসিস্ট।	ডেসমোনিম।	হলোট্রিকাস আইসোরাইজা/ কণ্টকময় গ্লুটিন্যান্ট।	অ্যাট্রিকাস আইসোরাইজা/ কণ্টকবিহীন গ্লুটিন্যান্ট।
২। সূত্রক	লম্বা ও ফাঁপা।	খাটো ও মোটা।	লম্বা।	লম্বা।
৩। শীর্ষদেশ	উন্মুক্ত।	বদ্ধ।	উন্মুক্ত।	উন্মুক্ত।
৪। বাঁট	প্রশস্থ বাঁটে ৩টি বার্ব ও ৩ সারি বার্বিউল উপস্থিত।	এদের বাঁটে বার্ব ও বার্বিউল থাকে না।	বাঁট সুগঠিত নয়। সূত্রকে সর্পিলকারে সজ্জিত ছোট ছোট কাঁটা থাকে।	বাঁট সুগঠিত নয়। বাঁটে বার্ব ও বার্বিউল থাকে না।
৫। রস	হিপনোটক্সিন।	কোষ রস।	আঠালো রস।	আঠালো রস।
৬। কাজ	নেমাটোসিস্ট শিকারের দেহে বিদ্ধ হয়ে বিষাক্ত হিপনোটক্সিনের সাহায্যে শিকারকে অবশ করে।	শিকার কিংবা অন্য কোনো বস্তু আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে।	চলনে ও শিকার আটকাতে সাহায্য করে।	চলনে ও শিকার আটকাতে সাহায্য করে।

2020/8/4 12:48

Scanned with CamScanner

[**তথ্য :** শিকার ধরতে বিভিন্ন নেমটোসিস্টের ভূমিকা– **পেনিট্র্যান্ট** নেমাটোসিস্টের সূত্রকটি খাদ্য প্রাণীকে পেঁচিয়ে ধরে বার্ব ও বার্বিউল দ্বারা আঘাত করে দুর্বল করে ফেলে এবং সিরিঞ্জের মতো সূত্রকের শীর্ষভাগ শিকার দেহে বিদ্ধ করে **হিপনোটক্সিন** নামক বিষাক্ত তরল প্রবেশ করিয়ে খাদ্যকে অবশ করে ফেলে। **ভলভেন্ট** নেমাটোসিস্টের সূত্রকটি শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে রাখে যাতে ছুটে যেতে না পারে। **স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট** নেমাটোসিস্টের কণ্টকময় সূত্রকটি খাদ্য প্রাণীকে চাবুকের মতো আঘাত করে দুর্বল করে ফেলে। এছাড়া শিকারকে আটকে রাখতেও ব্যবহৃত হয়। **স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট** নেমাটোসিস্টের সূত্রক আঠালো রস নিঃসৃত করে শিকারকে আটকে রাখে।]

নিডোসাইট ও নেমাটোসিস্টের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিডোসাইট	নেমাটোসিস্ট
১। অবস্থান	হাইড্রার দেহকাণ্ড ও কর্ষিকার এপিডার্মিসে দুটি পেশি আবরণী কোষের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।	নিডোসাইটের স্ফীত মধ্যাংশে অবস্থিত।
২। প্রকৃতি	এপিডার্মিসের একপ্রকার বিশেষ ধরনের কোষ।	নিডোসাইট কোষের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।
৩। গঠন	গোলাকার, ডিম্বাকার, নাশপাতি আকার, লাটিমাকার বা পেয়ালাকার। দ্বিস্তরী আবরণী, অপারকুলাম, নিডোসিল, নেমাটোসিস্ট, সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াসসহ অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণু এবং নেমাটোসিস্ট সমন্বয়ে গঠিত।	গোলাকার থলি ও লম্বা সূত্রক নিয়ে গঠিত। থলিটি হিপনোটক্সিনপূর্ণ এবং সূত্রকটির গোড়ায় বাঁট, বার্ব ও বার্বিউল থাকে।
৪। আবরণী	সজীব প্লাজমালেমা দিয়ে গঠিত।	নির্জীব কাইটিন নির্মিত।
৫। কাজ	সরাসরি চলনে বা আত্মরক্ষায় অংশ নেয় না, শুধু নেমাটোসিস্ট ধারণ করে।	বিষাক্ত হিপনোটক্সিনের সাহায্যে অবশ করে সূত্রকের সাহায্যে শিকার ধরে, আত্মরক্ষা, চলন ও আঁকড়ে ধরতে সহায়তা করে।

গ্যাস্ট্রোডার্মিস বা অন্তঃত্বকের কোষসমূহ (Cells of Gastrodermis)

গ্যাস্ট্রোডার্মিসের কোষসমূহ ভ্রূণীয় **এন্ডোডার্ম** থেকে তৈরি হয়। গ্যাস্ট্রোডার্মিস দেহপ্রাচীরের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত এবং এটি ক্ষরণ, পরিপাক, পেশি সৃষ্টি ও সংবেদী কাজে অংশগ্রহণ করে। গ্যাস্ট্রোডার্মিস নিম্নবর্ণিত ৫ ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত। যথা–

১। পুষ্টি কোষ বা পুষ্টি-পেশি কোষ বা পেশি-আবরণী কোষ (Nutritive/Musculo-Epithelial/Nutritive-muscular cell) **:** গ্যাস্ট্রোডার্মিসের অধিকাংশই এ ধরনের কোষ দিয়ে গঠিত। এ কোষগুলো লম্বা, স্তম্ভাকার, একটি বৃহৎ নিউক্লিয়াস ও গহ্বরযুক্ত। এটি মোসোগ্লিয়ার সঙ্গে সমকোণে অবস্থান করে। এদের এক প্রান্ত মেসোগ্লিয়ার সাথে সংযুক্ত এবং অন্য প্রান্ত সিলেন্টেরনে মুক্ত থাকে। মেসোগ্লিয়া সংযুক্ত স্থান হতে পেশিলেজ বের হয়। এরা সকলেই পুষ্টির কাজের সঙ্গে জড়িত বলে এদের পুষ্টি কোষ বলা হয়। গঠন ও কার্যভেদে পুষ্টি কোষ দুই প্রকার। যথা–

(ক) ক্ষণপদীয় পুষ্টি কোষ (Pseudopodial nutritive cell) **:** এ কোষগুলোর মুক্তপ্রান্ত **ক্ষণপদযুক্ত**। এসব কোষে খাদ্যগহ্বর থাকে।

(খ) ফ্ল্যাজেলাযুক্ত পুষ্টি কোষ (Flagellated nutritive cell) **:** এদের মুক্ত প্রান্তে ১-৪টি সুতার মতো **ফ্ল্যাজেলা** থাকে।

কাজ : দেহের অন্তঃত্বক গঠন করে এবং পেশির মতো সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে চলনে সহায়তা করে। এরা মুখছিদ্র খোলা ও বন্ধ করতে **স্ফিংটারের** ন্যায় কাজ করে। ক্ষণপদযুক্ত পুষ্টি কোষ খাদ্যবস্তু সিলেন্টেরনে প্রবেশ করলে অ্যামিবার ন্যায় ক্ষণপদের সাহায্যে খাদ্য গলাধঃকরণ করে। এরা খাদ্য গ্রহণ, অন্তঃকোষীয় পরিপাক এবং খাদ্যসার পরিশোষণ ও আত্তীকরণে সহায়তা করে। আর ফ্ল্যাজেলাযুক্ত পুষ্টি কোষ ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে সিলেন্টেরনে পানিপ্রবাহের সৃষ্টি করে খাদ্যগ্রহণ, বহিঃকোষীয় পরিপাক ও বর্জ্য নিষ্কাশনে এবং শ্বসন ও রেচন কাজে অংশ নেয়।



চিত্র ২.১.১০ : *Hydra*-র অন্তঃত্বকের কোষসমূহ

২। গ্রন্থি কোষ (Gland cell) **:** এরা পুষ্টি কোষের ফাঁকে ফাঁকে এককভাবে অবস্থান করে। কোষগুলোর মুক্ত প্রান্ত মোটা ও মেসোগ্লিয়া সংলগ্ন প্রান্ত সরু; এদের সাইটোপ্লাজম দানাদার। **মূল দেহ এবং হাইপোস্টোমে গ্রন্থিকোষের সংখ্যা সর্বাধিক, পদতলে স্বল্প এবং কর্ষিকায় অনুপস্থিত**। এরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পেশি-প্রবর্ধনবিহীন। গ্রন্থিকোষ দুই প্রকার। যথা–

(ক) মিউকাস নিঃসরণকারী গ্রন্থিকোষ (Mucous secreting gland cells) **:** এসব কোষ মুখ ও হাইপোস্টোম অঞ্চলে থাকে। এরা পিচ্ছিল **মিউকাস রস** ক্ষরণ করে।

2020/8/4 12:48

Scanned with CamScanner

(খ) এনজাইম নিঃসরণকারী গ্রন্থিকোষ (Enzyme secreting gland cells) : দেহের অন্যান্য স্থানের কোষগুলো এ ধরনের। এরা পরিপাক **এনজাইম** ক্ষরণ করে।

কাজ : মিউকাস ক্ষরণ করে খাদ্যদ্রব্যকে পিচ্ছিল করে **গলাধঃকরণে** সাহায্য করে। এছাড়াও এনজাইম ক্ষরণ করে **খাদ্য পরিপাকে** সাহায্য করে।

৩। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial cell) : এরা পুষ্টি কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থান করে। এখানে এদের সংখ্যা এপিডার্মিস অপেক্ষা অনেক কম। প্রকৃতপক্ষে এসব কোষ এপিডার্মিস হতে আগত কোষ। এরা গোলাকার বা ত্রিকোণাকার ও সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াসহ অন্যান্য কোষ অঙ্গাণু (যেমন– মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, মুক্ত রাইবোজোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া) বহন করে।

কাজ : প্রয়োজনে এরা দেহের অন্যান্য কোষ সৃষ্টি করে।

৪। সংবেদী কোষ (Sensory cell) : এরা পুষ্টি কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থান করে। প্রতিটি কোষ লম্বা ও সরু। এদের মুক্ত প্রান্তে সূক্ষ্ম সংবেদী রোম থাকে যা সিলেন্টেরনে উদগত। মেসোগ্লিয়া সংলগ্ন প্রান্তে সংবেদনশীল তন্তু স্নায়ুকোষের স্নায়ুতন্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

কাজ : এরা সিলেন্টেরনে প্রবেশকৃত খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু কর্তৃক সৃষ্ট **উদ্দীপনা** গ্রহণ করে স্নায়ুকোষে প্রেরণ করে।

৫। স্নায়ু কোষ (Nerve cell) : এরা মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত এবং সংখ্যায় খুব কম। এরা অনিয়তাকার এবং একটি ক্ষুদ্র কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক সূক্ষ্ম শাখান্বিত তন্তু নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে **স্নায়ুজালিকা** গঠন করে।

কাজ : এরা সংবেদী কোষের সংগৃহীত **উদ্দীপনা** স্থানান্তর করে এবং দেহের বিভিন্ন কোষের কাজের মধ্যে **সমন্বয় সাধন** করে।

এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	এপিডার্মিস	গ্যাস্ট্রোডার্মিস
১। উৎপত্তি ও অবস্থান	ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উৎপন্ন এবং দেহের বাইরের দিকে অবস্থিত।	ভ্রূণীয় এন্ডোডার্ম থেকে উৎপন্ন এবং দেহের ভেতরের দিকে অর্থাৎ সিলেন্টেরনকে ঘিরে অবস্থান করে।
২। কিউটিকল	পাতলা ও নমনীয় কিউটিকল দ্বারা আবৃত থাকে।	অনুপস্থিত।
৩। নিডোসাইট	উপস্থিত এবং প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।	অনুপস্থিত।
৪। পুষ্টি কোষ	ক্ষণপদযুক্ত ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত পুষ্টি কোষ দেখা যায় না।	ক্ষণপদযুক্ত ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত পুষ্টি কোষ দেখা যায় এবং এরা পুষ্টির কাজে নিয়োজিত।
৫। জনন অঙ্গ ও মুকুল	এতে দেখতে পাওয়া যায়।	এতে অনুপস্থিত।
৬। কাজ	দেহ আবরণ তৈরি, রক্ষণ, চলাচল, প্রজনন ইত্যাদি।	খাদ্যবস্তু পরিপাক এবং বর্জ্য নিষ্কাশন।

❑ **কাজ :** (i) *Hydra* এর স্তর দুটির কোষসমূহের কাজ বর্ণনা কর। (ii) নিডোসাইট কোষটি নানামুখী কাজে সাহায্য করে– যুক্তি দেখাও। (iii) নিডোসাইট কোষটি হাইড্রাকে আত্মরক্ষা ও চলনে সহায়তা করে– উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দাও। (iv) *Hydra* এর খাদ্য গ্রহণ ও আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত কোষটি সম্পর্কে লেখ। (v) *Hydra* এর শিকার ধরার কাজে জড়িত কোষের গঠন বর্ণনা কর। (vi) দ্বিস্তরী প্রাণী (হাইড্রার) গঠনটির চিহ্নিত চিত্র দাও।

মেসোগ্লিয়া (Mesogloea)

Cnidaria জাতীয় প্রাণীদের (যেমন– *Hydra*) এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জেলির ন্যায় আঠালো, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক স্তরকে **মেসোগ্লিয়া** বা **মেসোল্যামিলা** (mesogloea or mesolamella) বলে। উভয় স্তরের কোষ এ স্তর গঠনে অংশগ্রহণ করে। মেসোগ্লিয়া প্রোটিন নির্মিত ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স (matrix) পদার্থ। *Hydra*-র মেসোগ্লিয়া প্রায় ০.১ মাইক্রোমিটার পুরু। এ স্তরটি দেহ এবং কর্ষিকা উভয় স্থানে বিস্তৃত। *Hydra*-র পাদচাকতি অঞ্চলে মেসোগ্লিয়ার পুরুত্ব সর্বাধিক এবং কর্ষিকায় সবচেয়ে কম। এতে স্নায়ুতন্তু আড়াআড়িভাবে অবস্থান করে।

কাজ : মেসোগ্লিয়া এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের কোষগুলোর **ভিত্তিতল** হিসেবে কাজ করে; এর স্থিতিস্থাপকতা প্রাণীর কর্ষিকা ও দেহের **সংকোচন ও প্রসারণে** সহায়তা করে; এটি প্রাণীর **দৈহিক কাঠামো** গঠন করে।

সিলেন্টেরন (Coelenteron)

Cnidaria পর্বের প্রাণীদের (যেমন– *Hydra*) দেহের কেন্দ্রস্থলে এন্ডোডার্মিস বা গ্যাস্ট্রোডার্মিস দ্বারা পরিবেষ্টিত একমাত্র দেহগহ্বরকে **সিলেন্টেরন** বলে। সংক্ষেপে, *Hydra*-র দেহের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত ফাঁকা গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। এতে খাদ্যের বহিঃকোষীয় পরিপাক ঘটে। দেহের উপরিভাগে অবস্থিত একটি মাত্র ছিদ্র, **মুখছিদ্র** দ্বারা সিলেন্টেরন বাইরে উন্মুক্ত হয়ে পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে।

2020/8/4 12:48

Scanned with CamScanner

সিলেন্টেরনকে পরিপাক-সংবহন গহ্বর বলার কারণ : Cnidaria জাতীয় প্রাণীদের পৌষ্টিকনালি এবং দেহগহ্বর উভয়ের কাজই সিলেন্টেরনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এই গহ্বর খাদ্য পরিপাকসহ শ্বসন, রেচন, খাদ্যসার পরিবহন, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে। সিলেন্টেরনে গৃহীত খাদ্যবস্তু ফ্ল্যাজেলাযুক্ত ও ক্ষণপদযুক্ত পুষ্টি কোষগুলোর সহায়তায় বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক সম্পন্ন হয়। এই কোষগুলোর ফ্ল্যাজেলা সঞ্চালনের ফলে পানির আবর্তনের সঙ্গে অপাচ্য খাদ্যাংশ এবং বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থসমূহ মুখছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয়। এ কারণে সিলেন্টেরনকে **পরিপাক-সংবহন গহ্বর** বা **গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর** (gastro-vascular cavity) বলে।

সিলেন্টেরন ও সিলোমের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সিলেন্টেরন	সিলোম
১। সংজ্ঞা	দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণীদের দেহাভ্যন্তরের প্রশস্ত গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলা হয়।	ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণীদের দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিক নালির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে সিলোম বলা হয়।
২। আবরণ	সিলেন্টেরনের চতুর্দিক গ্যাস্ট্রোডার্মাল কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত।	সিলোমের বাইরের ও ভেতরের দিক মেসোডার্ম থেকে সৃষ্ট পেরিটোনিয়াম দ্বারা পরিবেষ্টিত।
৩। অন্তঃস্থ পদার্থ	খাদ্য, পানি ও বর্জ্য পদার্থ।	সিলোম রস।
৪। অন্তঃস্থ অঙ্গ	কোনো অঙ্গ দেখা যায় না।	বিভিন্ন অঙ্গ দেখা যায়।
৫। কাজ	দেহগহ্বর ও পৌষ্টিকনালির কাজ করে।	দেহগহ্বরের কাজ করে, কখনোই পৌষ্টিকনালির কাজ করে না।
৬। উৎপত্তি	এটি আর্কেন্টেরনের রূপান্তর।	এটি সিলোমিক পাউচ থেকে উৎপত্তি লাভ করে।
৭। ছিদ্রপথ	একটি মাত্র ছিদ্রপথে দেহের বাইরে উন্মুক্ত থাকে।	এ ধরনের কোনো ছিদ্রপথ থাকে না।
৮। প্রাপ্তিস্থান	Cnidaria পর্বের প্রাণীতে।	ত্রিস্তরী পর্বসমূহের অধিকাংশ প্রাণীতে।

Hydra-র খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া (Ingestion of Hydra)

প্রাণিদেহে যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক, খাদ্যসার পরিশোষণ ও আত্তীকরণ এবং অপাচ্য খাদ্যাংশ দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয় তাকে পুষ্টি বা নিউট্রিশন (nutrition) **বলে**। অপরদিকে দেহ সুস্থ ও সবল রাখার প্রক্রিয়াকে পুষ্টি বলে। এটি প্রাণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়া। প্রাণীর দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, প্রজনন ইত্যাদি সকল শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি পুষ্টির উপর নির্ভরশীল।

■ ***Hydra*-র খাদ্য :** *Hydra* **মাংসাশী** প্রাণী। যেসব প্রাণীর দেহে **গ্লুটাথিওন** (glutathione) বিদ্যমান হাইড্রা সেসব প্রাণীকে শিকার করে। ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী, **সাইক্লপস** (*Cyclops*), **ড্যাফনিয়া** (*Daphnia*) ইত্যাদি Crustacea জাতীয় ক্ষুদ্রাকার আর্থ্রোপোডা প্রাণী, মাছের ডিম, ছোট ছোট কৃমি, ছোট অ্যানিলিড, ক্ষুদ্র পতঙ্গ, কীটপতঙ্গের লার্ভা, রটিফার ইত্যাদি *Hydra*-র প্রধান খাদ্য। অনেক সময় নিজ দেহ অপেক্ষা বড় প্রাণী, যেমন– ব্যাঙাচিকে এরা গলাধঃকরণ করে।

■ ***Hydra*-র খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি/শিকার ধরার কৌশল :** *Hydra*-র খাদ্য গ্রহণে কর্ষিকা ও কর্ষিকাস্থিত নেমাটোসিস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *Hydra* জীবন্ত প্রাণীকে শিকার করে খায়। ক্ষুধার্ত হলে *Hydra* পাদচাকতির সাহায্যে কোনো তলের বা ভিত্তির সঙ্গে আটকে কর্ষিকাগুলো পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এ অবস্থায় কোনো শিকার কর্ষিকার কাছে এলে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট শিকারের প্রতি নিক্ষেপ করে।



Daphina cuculata *Cyclops viridis*

চিত্র ২.১.১১ : *Hydra*-র প্রধান খাদ্য

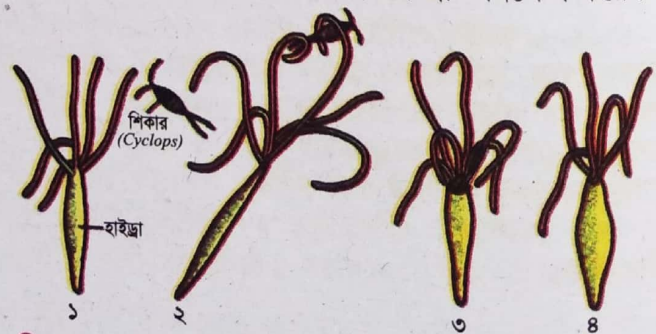

চিত্র ২.১.১২ : *Hydra*-র খাদ্য ধরা ও গলাধঃকরণ কৌশল

পেনিট্র্যান্ট নেমাটোসিস্ট শিকারের দেহে বিদ্ধ হয়ে **হিপনোটক্সিন নামক স্নায়ু অবসকারী বিষ** (neurotoxin) প্রবেশ করিয়ে শিকারকে অবশ করে ফেলে। এ সময় **ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট** শিকারকে পেঁচিয়ে ফেলে এবং **গ্লুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্ট** আঠালো রস ক্ষরণ করে শিকারকে আটকে ফেলে। এ সময় মুখছিদ্রের চারদিকে অবস্থিত গ্রন্থিকোষ

2020/8/4 12:48

Scanned with CamScanner

থেকে মিউকাস নিঃসৃত হয়ে মুখছিদ্রকে পিচ্ছিল করে। অতঃপর কর্ষিকা খাটো ও বাঁকা হয়ে শিকারকে মুখের কাছে নিয়ে আসে এবং মুখছিদ্র স্ফীত হয়ে তা গ্রহণ করে। মুখের চারপাশে পিচ্ছিল মিউকাস খাদ্য গলাধঃকরণে সহায়তা করে। হাইপোস্টোম এবং দেহপ্রাচীরের কোষগুলোর সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য সিলেন্টেরনে প্রবেশ করে।

❑ **কাজ :** (i) *Hydra* এর বিশেষ কোষ কর্তৃক শিকার ধরার কৌশল ব্যাখ্যা কর। (ii) *Hydra* এর শীর্ষদেশের গঠনটি চলন ছাড়াও খাদ্য গ্রহণের জন্য অপরিহার্য– বিশ্লেষণ কর।

Hydra-র খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া (Process of Digestion of *Hydra*)

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল ও শোষণের অনুপযোগী জৈব খাদ্যবস্তু দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন এনজাইম ও পানির সাহায্যে ভেঙে সরল, তরল ও কোষের শোষণ উপযোগী হয় তাকে পরিপাক (digestion) **বলে**। *Hydra*-র পরিপাক প্রক্রিয়া দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। যথা– ১. **বহিঃকোষীয় পরিপাক**, ও ২. **অন্তঃকোষীয় পরিপাক**।

১। বহিঃকোষীয় পরিপাক (Extracellular digestion) : কোষের বাইরে সিলেন্টরনের ভেতরে খাদ্যবস্তুর পরিপাককে বহিঃকোষীয় বা আন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে। খাদ্যবস্তু সিলেন্টেরনে প্রবেশ করলে মুখছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্তঃত্বকীয় গ্রন্থিকোষগুলো এনজাইম ক্ষরণ করে। প্রথমে এনজাইমের প্রভাবে শিকারের মৃত্যু ঘটে। এরপর দেহপ্রাচীরের সংকোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। এ সময় অন্তঃত্বকীয় কোষের ফ্ল্যাজেলার সঞ্চালনের ফলে খাদ্যকণা পানি ও এনজাইমের সঙ্গে মিশে খাদ্যের পরিপাক শুরু হয়। এখানে **ট্রিপসিনসদৃশ** (বা পেপসিন) এক ধরনের এনজাইম **প্রোটিন** জাতীয় খাদ্যকে **পলিপেপটাইডে** পরিণত করে।

এ অবস্থায় খাদ্য ঘন স্যুপে পরিণত হয়। সিলেন্টেরনে এরূপ খাদ্য পরিপাক পদ্ধতিকে বহিঃকোষীয় পরিপাক বলে। লিপিড ও শর্করা খাদ্যাংশের কোনো পরিবর্তন হয় না।

২। অন্তঃকোষীয় পরিপাক (Intracellular digestion) : কোষের অভ্যন্তরে খাদ্য গহ্বরে খাদ্যবস্তুর পরিপাককে অন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে। অন্তঃত্বকের ক্ষণপদযুক্ত কোষগুলো সিলেন্টেরনের ছোট ছোট খাদ্যকণাগুলোকে **ফ্যাগোসাইটোসিস** প্রক্রিয়ায় গলাধঃকরণ করে। ফলে কোষের ভেতর খাদ্যগহ্বর গঠিত হয়। খাদ্যগহ্বর প্রথমে অম্লিক ও পরে ক্ষারীয় মাধ্যম ধারণ করে। সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান বিভিন্ন এনজাইম খাদ্যগহ্বরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যকে পরিপাক করে। যেমন– ট্রিপসিন পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে, লাইপেজ স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে এবং অ্যামাইলেজ সরল শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।



চিত্র ২.১.১৩ : *Hydra*-র বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক

Hydra প্রোটিন, স্নেহ ও কিছু সরল শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে। এরা স্টার্চ (জটিল শর্করা) জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে না।

■ **খাদ্যসার পরিশোষণ ও আত্তীকরণ** (Absorption and assimilation) : পরিপাককৃত খাদ্যসার ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কোষে পরিবাহিত হয়। খাদ্যসার থেকে সৃষ্ট শক্তি দেহের বৃদ্ধি ও বিভিন্ন জৈবিক কাজে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যের অপরিপাককৃত অংশ মুখছিদ্র দিয়ে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাকের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অন্তঃকোষীয় পরিপাক	বহিঃকোষীয় পরিপাক
১। সংজ্ঞা	কোষ অভ্যন্তরে খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়াকে অন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে।	কোষের বাইরে সিলেন্টেরনে অথবা পৌষ্টিকনালির লুমেনে খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়াকে বহিঃকোষীয় পরিপাক বলে।
২। সংঘটন স্থান	এ ধরনের পরিপাক কোষের অভ্যন্তরে ঘটে।	কোষের বাইরে সিলেন্টেরন, পাকস্থলী বা অন্ত্রের লুমেনে ঘটে।
৩। খাদ্যগহ্বর	এ ধরনের পরিপাকের ক্ষেত্রে খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি হয়।	খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি হয় না।
৪। এনজাইম	এ ধরনের পরিপাকে অন্তঃকোষীয় এনজাইম ব্যবহৃত হয়।	এ পরিপাকে বিভিন্ন উৎসের এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
৫। খাদ্যসার পরিশোষণ	ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সরাসরি সাইটোপ্লাজম কর্তৃক শোষিত হয়।	খাদ্যসার সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেহে পরিবাহিত হওয়ার পর বিভিন্ন কোষ কর্তৃক শোষিত হয়।
৬। অপাচ্য অংশ নিষ্কাশন	খাদ্যের অপাচ্য অংশ দেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে নিষ্কাশিত হয় না।	খাদ্যের অপাচ্য অংশ নির্দিষ্ট পথে নিষ্কাশিত হয়।

2020/8/4 12:48

Scanned with CamScanner

Hydra-র চলন (Locomotion)

যে প্রক্রিয়ায় জীব জৈবিক প্রয়োজনে নিজ প্রচেষ্টায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় তাকে চলন বলে। চলন প্রাণীর একটি সহজাত আচরণ। খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা, প্রজনন, পরিবেশীয় বিভিন্ন উদ্দীপনা প্রভৃতি কারণে প্রাণী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে।

অধিকাংশ সময় *Hydra* পানিতে নিমজ্জিত বা বস্তুর সঙ্গে লেগে থাকলেও বিভিন্ন উদ্দীপনা, যেমন– খাদ্য গ্রহণ, আলো, উত্তাপ, স্পর্শ প্রভৃতি উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়াতে স্থানান্তরিত হয়। চলনের জন্য *Hydra*-র পৃথক কোনো অঙ্গ নেই। তন্তুসমূহের সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে এপিডার্মিসের পেশি আবরণী কোষ *Hydra*-র চলনে প্রধান ভূমিকা রাখলেও কর্ষিকা, নিডোব্লাস্ট কোষ, গ্রন্থিকোষ ও পাদচাকতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। *Hydra*-তে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন প্রকার চলন দেখতে পাওয়া যায়।

১। লুপিং (Looping) বা হামাগুড়ি : লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের জন্য *Hydra* সাধারণত হামাগুড়ির সাহায্যে চলে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে *Hydra* দেহকে গতিপথের দিকে প্রসারিত করে এবং বাঁকিয়ে মৌখিক তলকে চলনতলের কাছাকাছি নিয়ে আসে। মৌখিক তল চলনতলের কাছাকাছি আসামাত্র কর্ষিকাস্থিত **গ্লুটিন্যান্ট** জাতীয় নেমাটোসিস্টের সাহায্যে চলনতলকে আঁকড়ে ধরে এবং গতিপথের দিকে বাঁকিয়ে **লুপ** তৈরি করে। এ অবস্থায় পাদচাকতিকে চলনতল থেকে মুক্ত করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে মুখের কাছাকাছি এনে স্থাপন করে। অতঃপর কর্ষিকাসমূহকে চলনতল থেকে মুক্ত করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবং এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে *Hydra* ধীর গতিতে স্থান ত্যাগ করে। এ চলন কিছুটা শুঁয়োপোকার গমনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

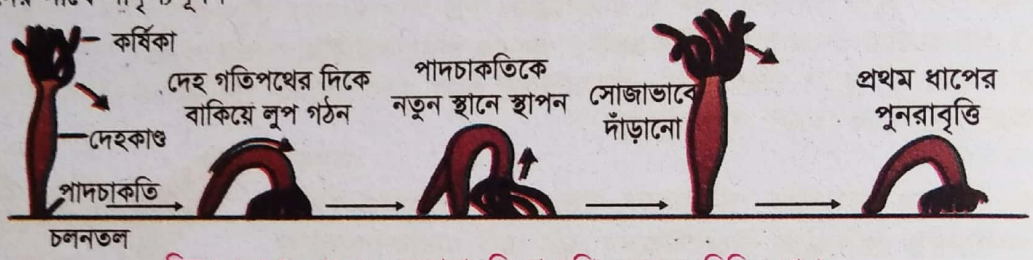

চিত্র ২.১.১৪ : *Hydra*-র হামাগুড়ি বা লুপিং চলনের বিভিন্ন ধাপ

২। সমারসল্টিং (Somersaulting) বা ডিগবাজি : *Hydra*-র এই চলন প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত ও সাধারণ চলন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে *Hydra* গতিপথের দিকে দেহকে প্রসারিত করে এবং বাঁকিয়ে মৌখিক তলকে চলনতলের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং লুপ গঠন করে। এই পর্যায়ে মৌখিক তলের কর্ষিকার সাহয্যে গতিপথ স্পর্শ করে এবং কর্ষিকার **গ্লুটিন্যান্ট** জাতীয় নেমাটোসিস্টের সাহায্যে চলনতলকে আঁকড়ে ধরে। এ অবস্থায় এরা কর্ষিকার ওপর ভর করে পদতলকে মুক্ত করে এবং দেহের ভর পদতলের ওপর না রেখে কর্ষিকার ওপর ভর করে উল্টাভাবে দাঁড়ায়। চলনের এ অবস্থায় *Hydra* পুনরায় পাদচাকতি অংশ গতিপথের দিকে বাঁকিয়ে আবার লুপ গঠন করে এবং পাদচাকতির সাহায্যে চলনতলকে আঁকড়ে ধরে। এ পর্যায়ে কর্ষিকাসমূহ চলনতল থেকে মুক্ত করে পাদচাকতির উপর ভর দিয়ে সোজাভাবে দাঁড়ায়। এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে *Hydra* দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। এ প্রকার চলন দ্বারা অ্যাক্রোব্যাটদের মতো *Hydra* দ্রুত চলাচল করতে পারে।

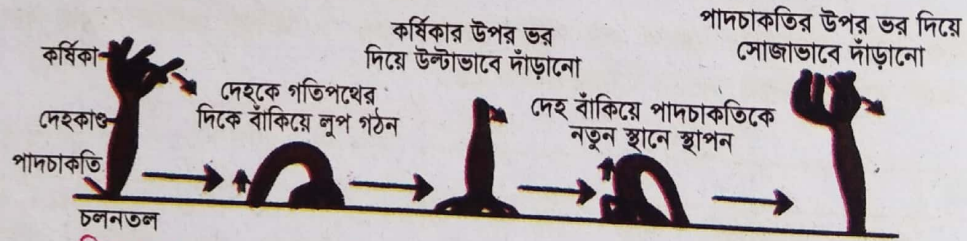

চিত্র ২.১.১৫ : *Hydra*-র ডিগবাজি বা সমারসল্টিং চলনের বিভিন্ন ধাপ

৩। গ্লাইডিং (Gliding) বা অ্যামিবয়েড চলন : এ প্রক্রিয়ার শুরুতে *Hydra* পাদচাকতির গ্রন্থিকোষ থেকে আঠালো ও পিচ্ছিল রস ক্ষরণ করে। পরে ওই স্থানে এপিডার্মিসের কোষগুলোর ক্ষণপদের অ্যামিবয়েড চলনের মাধ্যমে ধীর গতিতে *Hydra* স্থানান্তরিত হয়।

৪। সাঁতার (Swimming) : অনেক সময় *Hydra* দেহকে মুক্ত করে পানিতে আনুভূমিকভাবে স্থাপন করে এবং দেহ ও কর্ষিকাতে তরঙ্গায়িত আন্দোলন সৃষ্টি করে সাঁতার কেটে চলাচল করে।

৫। ভাসা (Floating) : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* পদতলকে মুক্ত করে পানিতে উল্টোভাবে অবস্থান করে। পরে পাদচাকতির গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত গ্যাসের সাহায্যে বুদবুদ তৈরি করে। এ বুদবুদ পদতলে আটকায় এবং *Hydra* পানিতে নিষ্ক্রিয়ভাবে ভেসে স্রোতের সাহায্যে স্থানান্তরিত হয়।

Scanned with CamScanner

৬। হাঁটা বা নতমুখী চলন (Walking or Tentacular) : এ ক্ষেত্রে *Hydra* তার দেহের ভর পদতলের উপর না রেখে কর্ষিকার উপর স্থাপন করে এবং কর্ষিকাকে পায়ের মতো ব্যবহার করে উল্টোভাবে ধীরে ধীরে চলতে পারে।

৭। আরোহণ (Climbing) : অনেক সময় *Hydra* কোনো জলজ উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে কর্ষিকাগুলোকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে পাদচাকতি মুক্ত করে দেহের সংকোচনের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করে।

৮। দেহের সংকোচন-প্রসারণ (Body contraction-expansion) : অনেক সময় দেহকে মুক্ত করে এবং উহাকে দ্রুত সংকোচিত ও প্রসারিত করে। এতে এক ধরনের চলন সম্পন্ন হয়।



চিত্র ২.১.১৬ : *Hydra*-র বিভিন্ন ধরনের চলন

লুপিং ও সমারসল্টিং চলনের মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	লুপিং বা হামাগুড়ি	সমারসল্টিং বা ডিগবাজি
১। কর্ষিকার দিকমুখিতা	এ প্রকার চলনে কর্ষিকাগুলো সবসময় গতিপথের দিকে থাকে।	একবার কর্ষিকা এবং আরেকবার পাদচাকতি গতিপথের দিকে থাকে।
২। পাদচাকতি	সবসময় নিচের দিকে থাকে।	চলনের এক পর্যায়ে হাইড্রা কর্ষিকার উপর ভর দিয়ে উল্টোভাবে দাঁড়ায়। ফলে পাদচাকতি উপরের দিকে আসে।
৩। লুপ গঠন	একবার চলন সম্পন্ন হতে একবার লুপ গঠিত হয়। অর্থাৎ একটি লুপিং-এ একটি লুপ গঠিত হয়।	একবার চলন সম্পন্ন হতে দু'বার লুপ গঠিত হয়। অর্থাৎ একটি সমারসল্টিং-এ দুটি লুপ গঠিত হয়।
৪। অতিক্রান্ত দূরত্ব	একবার লুপ গঠন করে বলে কম দূরত্ব অতিক্রম করে। অর্থাৎ একটি হামাগুড়িতে দেহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম দূরত্ব অতিক্রম করে।	দু'বার লুপ গঠন করে বলে অপেক্ষাকৃত বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে। অর্থাৎ একটি ডিগবাজিতে দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করে।
৫। চলনের গতি	অপেক্ষাকৃত মন্থর।	অপেক্ষাকৃত দ্রুত।

❑ **কাজ :** (i) *Hydra* এর স্থানান্তরের জন্য লম্বা দূরত্ব ও দ্রুত অতিক্রমের প্রক্রিয়া দুটির তুলনামূলক আলোচনা কর। (ii) দ্রুত স্থানান্তরের জন্য হামাগুড়ি চলনের থেকে ডিগবাজি চলন শ্রেয়তর– বিশ্লেষণ কর। (iii) *Hydra* এর চলন সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ আলোচনা কর। (iv) *Hydra* এর ডিগবাজি প্রক্রিয়ায় চলন বর্ণনা কর। (v) *Hydra* কীভাবে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে– ব্যাখ্যা কর।

Hydra-র জনন (Reproduction of *Hydra*)

যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজ বংশ রক্ষার জন্য প্রজননক্ষম অনুরূপ জীব সৃষ্টি করে তাকে জনন বলে। জনন প্রতিটি জীবের স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া। *Hydra*-র জনন দুই ধরনের, যথা– **১. অযৌন জনন** ও **২. যৌন জনন।**

অযৌন জনন (Asexual reproduction)

যে প্রজনন জননকোষ গঠন ছাড়া দেহের প্রত্যক্ষ বিভাজনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে অযৌন জনন বলে। এ প্রকারের জনন পদ্ধতিতে একটি মাত্র জনিতা থেকেই নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। *Hydra*-র অযৌন প্রজনন দু'ভাবে ঘটে, যথা– **মুকুলোদ্‌গম** ও **বিভাজন।**

(ক) মুকুলোদ্‌গম বা কুঁড়ি সৃষ্টি (Budding) : এটি অযৌন জননের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অনুকূল পরিবেশে ও খাদ্যের প্রাচুর্যতা থাকলে *Hydra* মুকুলোদ্‌গম বা বাডিং পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে থাকে। সাধারণত গ্রীষ্মকালে এ পদ্ধতিতে *Hydra* বংশবৃদ্ধি করে। মুকুলোদ্‌গম প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত ধাপে সংঘটিত হয়।

১। এই প্রক্রিয়ার শুরুতে *Hydra*-র দেহের নিম্নাংশ বা মাঝ বরাবর স্থানে এপিডার্মিসের কিছু **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে একটি **স্ফীত** অংশের সৃষ্টি করে।

2020/8/4 12:48

Scanned with CamScanner

২। এটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ফাঁপা নলাকার **মুকুলে** বা **কুঁড়িতে** পরিণত হয়। এর দেহপ্রাচীর এপিডার্মিস, মেসোগ্লিয়া ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস নিয়ে গঠিত এবং কেন্দ্রস্থলে মাতৃদেহের সিলেন্টেরন প্রবিষ্ট থাকে।

৩। মাতৃ *Hydra* হতে খাদ্য গ্রহণ করে মুকুল বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর বৃদ্ধির ফলে মুকুলের শেষ প্রান্তে কর্ষিকা, হাইপোস্টোম ও মুখছিদ্রের আবির্ভাব ঘটে।

৪। বর্ধনশীল মুকুলের সিলেন্টেরন মাতৃ *Hydra*-র সিলেন্টেরনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মুকুলের মাধ্যমে মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে ধীরে ধীরে অপত্য *Hydra*-য় পরিণত হয়।

৫। মুকুলটি পরিপক্ব হলে মুকুল ও মাতৃ হাইড্রার সংযোগস্থলে খাঁজের সৃষ্টি হয় এবং এ খাঁজ ক্রমশ উভয় দিক থেকে অনুপ্রবেশের ফলে অপত্য *Hydra* মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন শুরু করে।

৬। মাতৃ *Hydra*-র সঙ্গে মুকুলের যে অংশ সংযুক্ত থাকে সেই প্রান্তে শিশু *Hydra*-র পাদচাকতি গঠিত হয়। একটি *Hydra*-র দেহে একই সময় একাধিক মুকুল গঠিত হতে পারে। অপত্য হাইড্রা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** মাতৃ *Hydra*-র ক্ষতস্থান পূরণ করে। *Hydra*-র একটি মুকুলোদ্‌গম সম্পন্ন হতে সময় লাগে ২-৩ দিন।

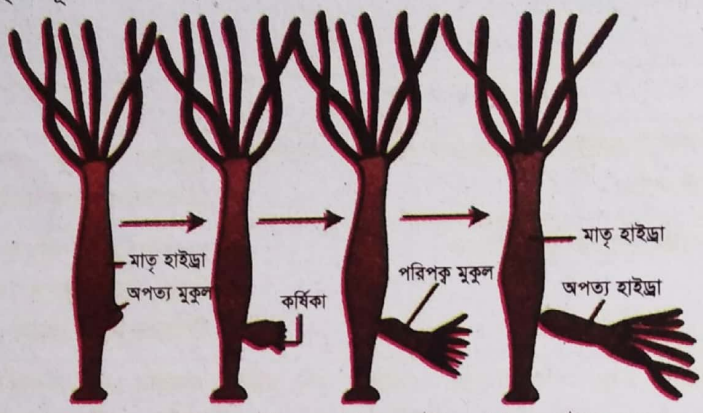

চিত্র ২.১.১৭ : *Hydra*-র মুকুলোদ্‌গমের ধাপসমূহ

(খ) বিভাজন (Fission) : বিভাজন কোনো স্বাভাবিক জনন পদ্ধতি নয়। কোনো বাহ্যিক কারণে *Hydra*-র দেহ দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রতিটি খণ্ডক থেকে নতুন *Hydra* জন্মায়। একে পুনরুৎপত্তি (regeneration) বলে। (ট্রেম্বলে (Trembley) 1744 সালে সর্বপ্রথম *Hydra*-র পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন।)

এ ক্ষেত্রে **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** ত্বরিতগতিতে বিভাজিত হয়ে অপত্য *Hydra*-র বিকাশ ঘটায়। সুতরাং *Hydra*-র স্বাভাবিক মৃত্যু নেই। বিভাজন দুইভাবে হতে পারে, যথা– অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন ও অনুপ্রস্থ বিভাজন।

❐ **অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন :** *Hydra*-র দেহ কোনো কারণে লম্বালম্বিভাবে দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে পৃথক *Hydra*-র উৎপত্তি হয়।

❐ **অনুপ্রস্থ বিভাজন :** কোনো কারণে *Hydra*-র দেহ অনুপ্রস্থভাবে একাধিক খণ্ডে খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ড থেকে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন *Hydra* জন্মলাভ করে।

যৌন জনন (Sexual reproduction)

জনন কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে জনন সম্পন্ন করার পদ্ধতিকে যৌন জনন বলে। *Hydra*-র যৌন জনন সাধারণত **শীতকালে** বা **শরৎকালে** অর্থাৎ প্রতিকূল পরিবেশে সংঘটিত হয়। *Hydra*-র দেহে কোনো স্থায়ী জননাঙ্গ থাকে না। অধিকাংশ *Hydra* **একলিঙ্গ** (dioecious)। কিছু সংখ্যক *Hydra* **উভলিঙ্গ** (monoecious)। উভলিঙ্গ হলেও এদের স্বনিষেক ঘটে না। কারণ **উভয় জননাঙ্গ একই সময়ে পরিপক্বতা লাভ করে না।** *Hydra*-র যৌন জনন তিনটি ধাপে ঘটে। যথা– (ক) **জননকোষ সৃষ্টি** বা **গ্যামিটোজেনেসিস,** (খ) **নিষেক** ও (গ) **পরিস্ফুটন।**

(ক) গ্যামিটোজেনেসিস (Gametogenesis) : যে প্রক্রিয়ায় ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ বিভাজিত হয়ে জনন কোষ গঠন করে তাকে গ্যামিটোজেনেসিস বলে। গ্যামিটোজেনেসিস দুই ভাগে বিভক্ত– ১. **স্পার্মাটোজেনেসিস** (শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু সৃষ্টি) ও ২. **উওজেনেসিস** (ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু সৃষ্টি)।

2020/8/4 12:49

Scanned with CamScanner

১। স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis) : শুক্রাশয়ে শুক্রাণুর গঠন প্রক্রিয়াকে **স্পার্মাটোজেনেসিস** বা **শুক্রাণু জনন** বলে। স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

প্রজনন ঋতুতে সাধারণত দেহের উপরের অংশে হাইপোস্টোমের কাছাকাছি স্থানের বহিঃত্বকীয় **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** দ্রুত বিভাজিত হয়ে এক বা একাধিক মোচাকৃতি বা ত্রিকোণাকার শুক্রাশয় গঠন করে। শুক্রাশয়ের শীর্ষভাগে অবস্থিত স্ফীত অংশকে **নিপল** (nipple) বা বোঁটা বলে। শুক্রাশয়ে বিদ্যমান কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ শুক্রাণু মাতৃকোষ হিসেবে কাজ করে। শুক্রাণু মাতৃকোষ বারবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে অসংখ্য ডিপ্লয়েড **স্পার্মাটোগোনিয়া** (spermatogonia; একবচনে- spermatogonium) গঠন করে। পরে এগুলো বৃদ্ধি লাভ করে **ডিপ্লয়েড স্পার্মাটোসাইটে** (spermatocyte) পরিণত হয়। প্রতিটি স্পার্মাটোসাইট মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজনের ফলে ৪টি **হ্যাপ্লয়েড স্পার্মাটিড** (spermatid) উৎপন্ন করে। প্রতিটি স্পার্মাটিড **মস্তক, মধ্যখণ্ড** ও বিচলনক্ষম **লেজবিশিষ্ট** সক্রিয় **শুক্রাণুতে** (sperm) পরিণত হয়। পরিপক্ব হওয়ার পর শুক্রাণুগুলো শুক্রাশয়ের শীর্ষদেশ বিদীর্ণ করে পানিতে বের হয়ে আসে ও সাঁতার কাটতে থাকে। ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ডিম্বাণুর সাক্ষাৎ না পেলে এরা মারা যায়।

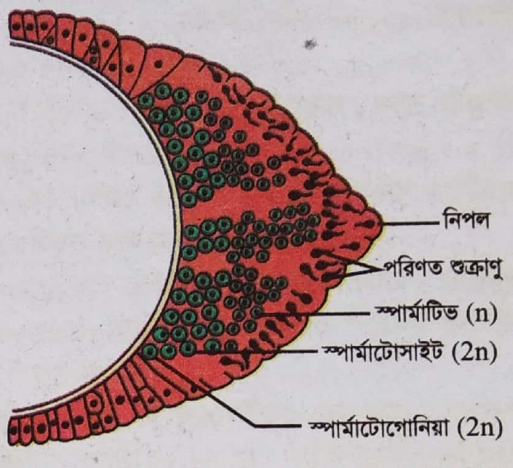

চিত্র ২.১.১৮ : *Hydra*-র শুক্রাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

❐ **শুক্রাণু গঠনের প্রবাহচিত্র :**

ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (2n) —রূপান্তর→ শুক্রাণু মাতৃকোষ (2n) —মাইটোসিস→ স্পার্মাটোগোনিয়া (2n) —বৃদ্ধিলাভ↓ স্পার্মাটোসাইট (2n) —মিয়োসিস→ স্পার্মাটিড (n) —রূপান্তর→ শুক্রাণু (n)

২। উওজেনেসিস (Oogenesis) : যে পদ্ধতিতে ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় তাকে **উওজেনেসিস** বা **ডিম্বাণু জনন** বলে।

প্রজনন ঋতুতে *Hydra*-র পাদচাকতির কিছুটা উপরের বহিঃত্বকীয় **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** বিভাজিত হয়ে এক বা একাধিক গোলাকার ডিম্বাশয় (ovary) গঠন করে। ডিম্বাশয়ের ভেতরে কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ বারবার বিভাজিত হয়ে ডিম্বাণু মাতৃকোষে পরিণত হয়।

ডিম্বাণু মাতৃকোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে **উওগোনিয়া** (oogonia; একবচনে- oogonium) গঠন করে। ডিম্বাশয়ের কেন্দ্রে অবস্থিত উওগোনিয়ামটি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অন্যান্য কোষকে অ্যামিবার মতো ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে গলাধঃকরণ করে, যা পরে কুসুম হিসেবে অবস্থান করে। এটি আকারে বড় হয়ে **উওসাইটে** (oocyte) পরিণত হয়। উওসাইট মিয়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে তিনটি নিষ্ক্রিয় **পোলার বডি** (polar bodies) ও একটি বড় **উওটিডে** (ootid) পরিণত হয়। এর মধ্যে পোলার বডি বিলুপ্ত হয় এবং উওটিডটি রূপান্তরিত হয়ে **ডিম্বাণুতে** (ovum) পরিণত হয়। ডিম্বাণুটি পরিপক্ব হলে ডিম্বাশয়ের প্রাচীরটি একসময় ফেটে যায় এবং ডিম্বাণুকে উন্মুক্ত করে দেয়। এ সময় এর চারদিকে **জিলেটিনের** পিচ্ছিল আবরণী গঠিত হয়।

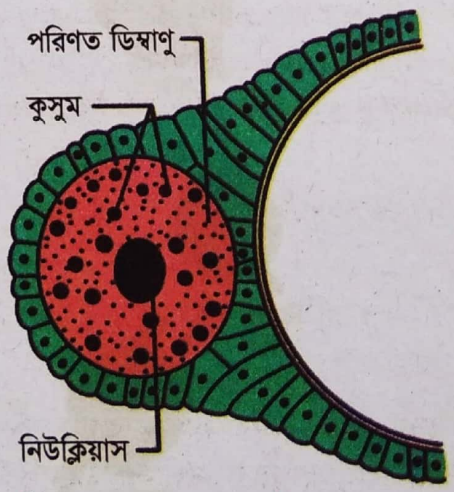

চিত্র ২.১.১৯ : *Hydra*-র ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

❐ **ডিম্বাণু গঠনের প্রবাহচিত্র :**

ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (2n) —রূপান্তর→ ডিম্বাণু মাতৃকোষ (2n) —মাইটোসিস→ উওগোনিয়া (2n) —বৃদ্ধিলাভ↓ উওসাইট (2n) —মিয়োসিস→ উওটিড (n) —রূপান্তর→ ডিম্বাণু (n)

2020/8/4 12:49
Scanned with CamScanner

(খ) নিষেক (Fertilization) : শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন প্রক্রিয়াকে নিষেক বলে। পরিপক্ব শুক্রাণু শুক্রাশয় থেকে বের হয়ে লেজের সাহায্যে সাঁতরিয়ে যেকোনো একটি ডিম্বাশয়ের চারদিক ঘিরে ফেলে। এক-দুই দিনের মধ্যে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে না পারলে শুক্রাণুগুলো মারা যায়। একাধিক শুক্রাণু ডিম্বাণুর আবরণ ভেদ করলেও মাত্র একটি শুক্রাণু অবশেষে ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে এবং একটি ডিপ্লয়েড **জাইগোট** (zygote) গঠন করে।

(গ) পরিস্ফুটন (Development) : যেসব ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে জাইগোট থেকে শিশু প্রাণীর উৎপত্তি হয় তাকে **পরিস্ফুটন** বলে। পরিস্ফুটন প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত ধাপ সম্পন্ন হয়।

১। মরুলা (Morula) : জাইগোট পুনঃপুনঃ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে বহুকোষী, নিরেট ও গোলাকার কোষপিণ্ডে পরিণত হয়। এ পিণ্ডকে **মরুলা** বলা হয়।

২। ব্লাস্টুলা (Blastula) : মরুলার কোষগুলো পরে এক স্তরে সজ্জিত হয়ে গোলাকার ফাঁপা ব্লাস্টুলা গঠন করে। ব্লাস্টুলার কোষগুলোকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomeres) এবং কেন্দ্রের ফাঁকা স্থানকে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) বলে। ব্লাস্টুলার একস্তরী প্রাচীরকে **ব্লাস্টোডার্ম** (blastoderm) বলা হয়।

৩। গ্যাস্ট্রুলা (Gastrula) : ব্লাস্টোমিয়ারের বিভাজন অব্যাহত থাকে। অবশেষে ব্লাস্টোসিল কোষে ভরে ফেলে, পরে ভেতরের কোষগুলো একটি স্তরে বিন্যস্ত হয়ে **দ্বিস্তরী গ্যাস্ট্রুলা** দশার সৃষ্টি করে। এটি এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও আদি সিলেন্টেরন নিয়ে গঠিত। *Hydra*-র নিরেট গ্যাস্ট্রুলাটি সিলিয়াযুক্ত কিংবা মুক্তজীবী নয়। কেননা এটি মাতৃদেহের সাথে যুক্ত থাকে। এ ধরনের গ্যাস্ট্রুলাকে **স্টেরিওগ্যাস্ট্রুলা** (stereogastrula) বলা হয়। গ্যাস্ট্রুলার বাইরের দিকের কোষস্তরকে **এক্টোডার্ম** এবং ভেতরের দিকের কোষস্তরকে **এন্ডোডার্ম** বলে। উভয় স্তর থেকে অকোষীয় জেলির ন্যায় মেসোগ্লিয়া গঠিত হয়। গ্যাস্ট্রুলার অভ্যন্তরস্থ গহ্বরটিকে **আর্কেনটেরন** (archenteron) বলে। এটিই পরবর্তীতে **সিলেন্টেরনে** রূপ নেয়।

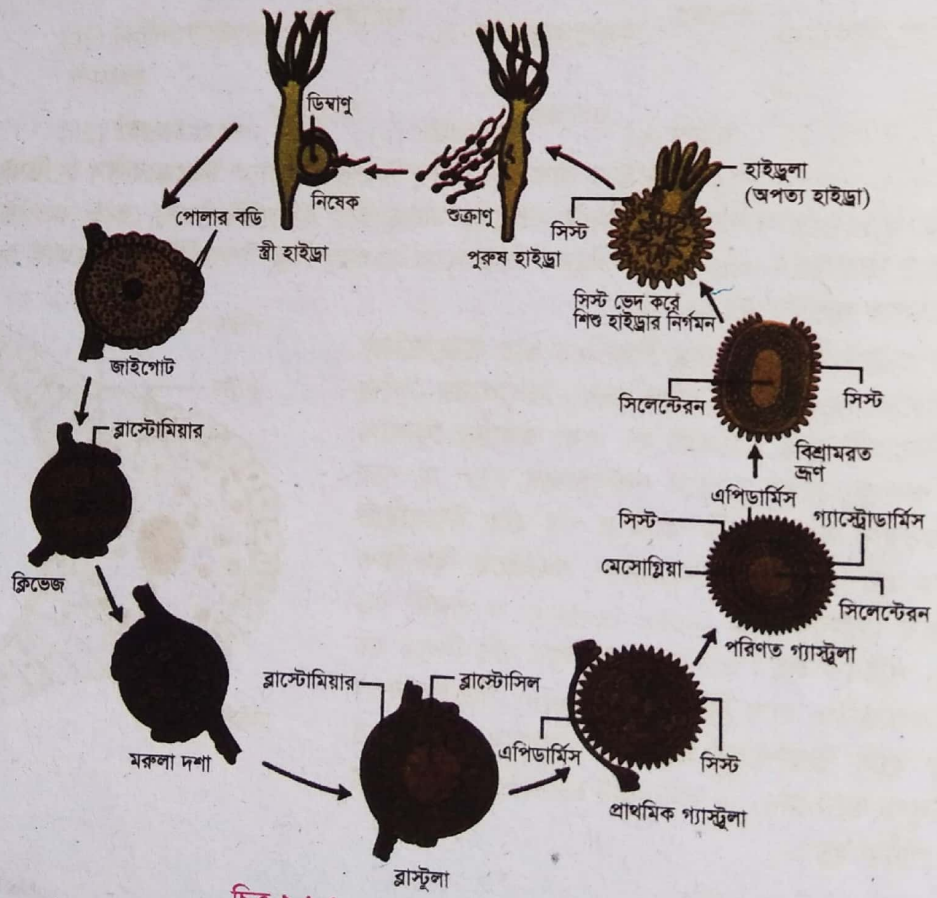

চিত্র ২.১.২০ : *Hydra*-র পরিস্ফুটনের ধাপসমূহ

৪। হাইড্রুলা (Hydrula) : এক্টোডার্মাল কোষগুলো থেকে এক ধরনের রস নিঃসৃত হয়ে গ্যাস্ট্রুলার চারদিকে কাইটিন নির্মিত কন্টকময় **সিস্ট** (cyst) আবরণী গঠন করে। এ অবস্থায় ভ্রূণটি মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পানির তলদেশে নিমজ্জিত কোনো বস্তুতে অবস্থান করে। শীতকালে নিম্ন তাপমাত্রায় ভ্রূণের কোনোরূপ বিকাশ ঘটে না।

2020/8/4 12:49
Scanned with CamScanner

বসন্তের শুরুতে অনুকূল তাপমাত্রায় সিস্টে আবদ্ধ অবস্থায় ভ্রূণটির পরিস্ফুটনের বাকি পর্যায়গুলো সম্পন্ন হয়। ভ্রূণটি ক্রমশ লম্বা হতে থাকে। এর শীর্ষভাগে মুখছিদ্র, হাইপোস্টোম, কর্ষিকা ও পাদচাকতি সৃষ্টি হয়। ভ্রূণের এই দশাকে **হাইড্রুলা** বলে। অবশেষে অনুকূল পরিবেশে সিস্ট আবরণী ভেদ করে পানিতে বের হয়ে আসে এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ *Hydra*-য় পরিণত হয়।

❐ ***Hydra*-র যৌন জনন ও পরিস্ফুটনের প্রবাহচিত্র :**

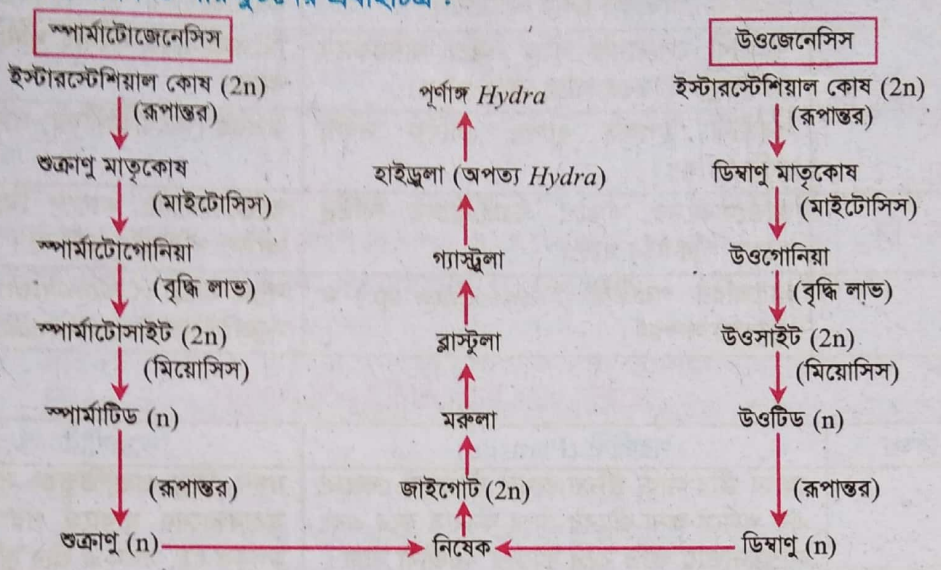

❐ **কাজ :** *Hydra* এর শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় দ্বারা সৃষ্ট কোষের পরিস্ফুটনই প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় একমাত্র উপায় নয়– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

Hydra-র মিথোজীবিতা (Symbiosis of *Hydra*)

দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীবের মধ্যে যখন এমন সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে তাদের ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে একে অন্যের নিকট থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সম্পর্ককে মিথোজীবিতা (Symbiosis, Gr. *Sym* = together + *bios* = living) **বলে**। এ অবস্থায় দুটি জীবের প্রতিটিকে **মিথোজীবী** (symbiont) বলে। জীবজগতে অনেক জীবের মধ্যে মিথোজীবিতা বিদ্যমান। যেমন– লিগিউম জাতীয় উদ্ভিদের মূলে বসবাসকারী মিথোজীবী রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া, তপসী কাঁকড়া (hermit crab) ও সি অ্যানিমোনের (sea anemone) মধ্যে মিথোজীবিতা ইত্যাদি।

***Hydra*-র মিথোজীবিতা :** সবুজ হাইড্রা, *Hydra viridissima* (*Chlorohydra viridissima*) এবং এককোষী সবুজ শৈবাল (*Zoochlorella*) সিমবায়োসিস প্রক্রিয়ায় জীবনযাপন করে। নিম্নোক্তভাবে এরা পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়।

❐ **শৈবাল যেভাবে উপকৃত হয়–**

আশ্রয় : শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মাল পেশি-আবরণী কোষে নিরাপদ আশ্রয় ও সুরক্ষা লাভ করে।

সালোকসংশ্লেষণ : হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট H_2O ও CO_2 কে শৈবাল সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে।

খাদ্যোৎপাদন : হাইড্রার বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থকে শৈবাল আমিষ তৈরির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে।

❐ ***Hydra* যেভাবে উপকৃত হয়–**

খাদ্য : সালোকসংশ্লেষণে শৈবাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শর্করা জাতীয় খাদ্যের উদ্বৃত্ত অংশ হাইড্রা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। হাইড্রা মৃত শৈবালকেও ভক্ষণ করে।

শ্বসন : শৈবালের সালোকসংশ্লেষণে সৃষ্ট O_2 হাইড্রার শ্বসনে ব্যবহৃত হয়।

CO_2 শোষণ : হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2 শৈবাল গ্রহণ করে প্রাণীকে ঝামেলামুক্ত করে।

বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন : হাইড্রার বিপাকে সৃষ্ট N_2 ঘটিত বর্জ্য শৈবাল গ্রহণ করে হাইড্রাকে বর্জ্যমুক্ত রাখে।

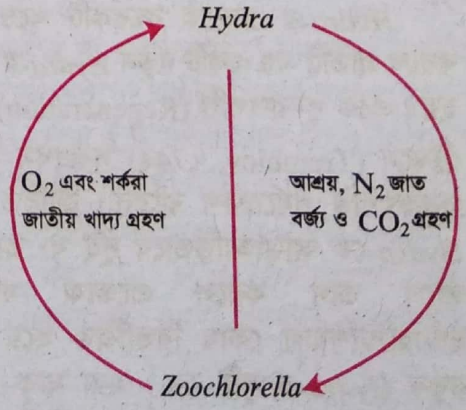

চিত্র ২.১.২১ : মিথোজীবিতা

2020/8/4 12:49
Scanned with CamScanner

পরজীবিতা এবং মিথোজীবিতার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পরজীবিতা (Parasitism)	মিথোজীবিতা (Symbiosis)
১। দুই জীবের মধ্যে সম্পর্ক	একটি প্রজাতি পোষক, অন্যটি পরজীবী।	উভয় প্রজাতিই পরস্পরের মিথোজীবী।
২। নির্ভরশীলতা	পরজীবী পোষকের উপর নির্ভরশীল।	মিথোজীবীদ্বয় পরস্পর নির্ভরশীল।
৩। ঘনিষ্ঠতা	পরজীবী পোষকের সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে, নাও পারে।	মিথোজীবীদ্বয় সর্বদাই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে।
৪। সহাবস্থানের উপকারিতা	পরজীবী উপকৃত হলেও পোষক সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	উভয়ই (মিথোজীবীদ্বয়) নানাভাবে উপকৃত হয়।
৫। অঙ্গের পরিবর্তন	অভিযোজনের কারণে পরজীবীদের বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে।	অভিযোজনের কারণে মিথোজীবীদের কোনো অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে না।
৬। উদাহরণ	ম্যালেরিয়া পরজীবী (*Plasmodium* sp.) ও মানুষের সম্পর্ক।	সবুজ হাইড্রা (*Chlorohydra viridissima*) এবং সবুজ শৈবাল (*Zoochlorella*)-এর সম্পর্ক।

পরজীবী এবং মিথোজীবীর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পরজীবী (Parasite)	মিথোজীবী (Symbiont)
১। সংজ্ঞা	যেসব জীব সারা জীবন অথবা জীবনের কোনো এক পর্যায়ে অন্য জীবের দেহে বসবাস করে এবং আশ্রয়দাতার ক্ষতি করে তাদের পরজীবী বলে।	যখন ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত দুটি জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের মাধ্যমে পরস্পরের নিকট থেকে উপকৃত হয়, তখন ঐ জীব দুটিকে মিথোজীবী বলে।
২। ঘনিষ্ঠতা	পরজীবী পোষকের সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে, নাও পারে।	মিথোজীবীদ্বয় সর্বদাই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে।
৩। নির্ভরশীলতা	পরজীবী পোষকের উপর নির্ভরশীল।	মিথোজীবীরা পরস্পর নির্ভরশীল।
৪। সহাবস্থানের উপকারিতা	পরজীবী উপকৃত হলেও পোষক সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	উভয়ই (মিথোজীবীদ্বয়) উপকৃত হয়।
৫। অঙ্গের পরিবর্তন	অভিযোজনের কারণে পরজীবীদের বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে।	অভিযোজনের কারণে মিথোজীবীদের কোনো অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে না।
৬। জীবনচক্র	জীবনচক্রের অংশবিশেষ অথবা সম্পূর্ণ অংশ পোষকের দেহে সমাপ্ত হয়।	জীবনচক্রের জন্য কেউ কারও উপর নির্ভর করে না।
৭। উদাহরণ	ম্যালেরিয়ার পরজীবী (*Plasmodium* sp.)।	সবুজ হাইড্রা (*Chlorohydra viridissima*) এবং সবুজ শৈবাল (*Zoochlorella*)।

Hydra-র পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা (Regeneration of *Hydra*)

Hydra-র দেহকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করলে প্রতিটি খণ্ড একটি নতুন *Hydra*-য় পরিণত হয়। একে পুনরুৎপত্তি (Regeneration) বলে। **ট্রেম্বলে** (Trembley, 1744) সর্বপ্রথম হাইড্রার পুনরুৎপত্তি পর্যবেক্ষণ করেন। জীবিত একটি *Hydra*-কে আড়াআড়িভাবে দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক খণ্ডাংশের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ বিভাজিত হয়ে একটি নতুন *Hydra*-র সৃষ্টি হয়। এরা মাতৃ *Hydra* অপেক্ষা আকারে ছোট হয়। প্রতিটি অংশই তার মূল মেরুতা বজায় রাখে অর্থাৎ মৌখিক প্রান্ত থেকে কর্ষিকা ও হাইপোস্টোম এবং বিমৌখিক প্রান্ত থেকে পাদচাকতি গঠিত হয়।

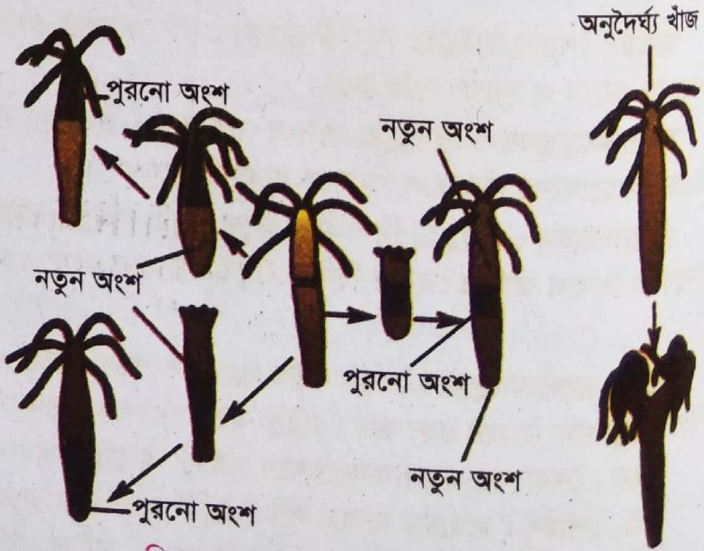

চিত্র ২.১.২২ : *Hydra*-র পুনরুৎপত্তি

2020/8/4 12:49

Scanned with CamScanner

Hydra-র শারীরবৃত্তীয় শ্রমবণ্টন

বহুকোষী জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যাবলি যখন দেহের বিভিন্ন কোষ, কলা বা তন্ত্রের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টিত হয় তখন তাকে **শ্রমবণ্টন** (division of labour) বলে। অর্থাৎ বহুকোষী প্রাণিদেহের নির্দিষ্ট কোষ, কলা বা অঙ্গ নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকাকে শ্রমবণ্টন বলে। ফরাসি বিজ্ঞানী H. M. Edward-এর মতে, আদি প্রকৃতির নিম্নশ্রেণির বহুকোষী প্রাণীতেও উচ্চতর শ্রেণির প্রাণীদের মতো শারীরবৃত্তীয় শ্রমবণ্টন দেখা যায়। *Hydra* বহুকোষী প্রাণী হলেও এদের দেহে কোনো অঙ্গ বা তন্ত্রের বিকাশ হয়নি; কিন্তু এর বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ও যান্ত্রিক কার্য সম্পাদনের জন্য দেহে সুস্পষ্ট শ্রমবণ্টন পরিলক্ষিত হয়। প্রাণিজগতের মধ্যে *Hydra* তথা Cnidarian প্রাণীতেই সর্বপ্রথম শ্রমবণ্টন দেখা যায়। *Hydra*-র শারীরবৃত্তীয় শ্রমবণ্টনের আঙ্গিক ভিন্নতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এদের শ্রমবণ্টনকে নিচের দুটি শিরোনামে বর্ণনা করা যায়–

(ক) আঙ্গিক শ্রমবণ্টন : *Hydra*-র দেহের বিভিন্ন অংশ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে, যেমন–

১। মুখছিদ্র : খাদ্য গলাধঃকরণ, অপাচ্য অংশ নিষ্কাশন ও দেহাভ্যন্তরে পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

২। কর্ষিকা : শিকার ধরা, চলন, আত্মরক্ষা ও আরোহণে ব্যবহৃত হয়।

৩। সিলেন্টেরন : খাদ্য পরিপাক ও সংবহন করে।

৪। এপিডার্মিস : প্রতিরক্ষাকারী, পেশিময় ও সংবেদী দেহাবরণ এবং আসঞ্জন পাদচাকতি গঠন করে।

৫। মেসোগ্লিয়া : বিভিন্ন কোষের ভিত্তিতল হিসেবে কাজ করে, প্রাণীর দৈহিক কাঠামো নির্মাণ করে এবং দেহের সংকোচন-প্রসারণে সহায়তা করে।

৬। দেহকাণ্ড : চলনে সহায়তা করে এবং মুকুল ও জননাঙ্গ ধারণ করে।

৭। পাদচাকতি : চলনে ও কোনো বস্তুর সঙ্গে প্রাণীকে আবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে।

(খ) কোষীয় শ্রমবণ্টন : *Hydra*-র এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসে বিদ্যমান বিভিন্ন কোষ স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে, যেমন–

১। পেশি-আবরণী কোষ : দেহের সাধারণ আবরণ তৈরি করে এবং সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে চলন, শিকার ধরা ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে।

২। নিডোব্লাস্ট কোষ : শিকার ধরা, চলন ও আত্মরক্ষার কাজ সম্পাদন করে।

৩। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ : মুকুল ও জননাঙ্গ সৃষ্টি এবং দেহের প্রয়োজনে সব ধরনের কোষ সৃষ্টি করে।

৪। সংবেদী ও স্নায়ুকোষ : পরিবেশ থেকে সংবেদ গ্রহণ এবং উদ্দীপনা দ্বারা প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।

৫। পুষ্টিকোষ : বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক সম্পন্ন করে।

৬। গ্রন্থিকোষ : পরিপাক এনজাইম ও আঠালো পদার্থ ক্ষরণ করে।

Hydra কেন Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণী

Hydra নিঃসন্দেহে Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণী। কারণ এর দেহে নিম্নলিখিত Cnidarian বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান–

(১) দেহের কেন্দ্রভাগে সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বিদ্যমান, যা কেবল মুখছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়। (২) এদের ভ্রূণে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তর থাকে যেগুলো পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস গঠন করে। (৩) এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মাঝে জেলির ন্যায় মেসোগ্লিয়া নামক অকোষীয় স্তর বিদ্যমান। (৪) এপিডার্মিসে নিডোব্লাস্ট নামক বিশেষ ধরনের কোষ বিদ্যমান যেগুলো প্রাণীর শিকার ধরা ও চলনে ব্যবহৃত হয়। (৫) মুখছিদ্রকে ঘিরে কর্ষিকা নামক কতগুলো গঠন থাকে। (৬) দেহে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ বিদ্যমান যেগুলো থেকে প্রায় সকল ধরনের কোষ সৃষ্টি হতে পারে। (৭) এদের কোষীয় শ্রমবণ্টন দেখা যায়।

❑ **কাজ :** (i) মানুষ ও পোষা প্রাণীর মধ্যে সহযোগিতা একটি দ্বিস্তরী প্রাণীর জীবনধারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। (ii) *Chlorohydra* এবং *Zoochlorella* এর একত্রে বসবাস ব্যাখ্যা কর। (iii) *Hydra* কে বহুমাথাবিশিষ্ট দানব বলা হয়– বিশ্লেষণ কর। (iv) *Hydra* এর শিকার ধরার কাজে জড়িত কোষসমূহের মধ্যে শ্রমবণ্টন পরিলক্ষিত হয়– বিশ্লেষণ কর।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : *Hydra*-র স্থায়ী স্লাইড/মডেল পর্যবেক্ষণ।

(ক) *Hydra*-র বহির্গঠন পর্যবেক্ষণ, (খ) *Hydra*-র লম্বচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ ও (গ) *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

2020/8/4 12:49

Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

- **দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী :** ভ্রূণাবস্থায় যেসব প্রাণীর দেহপ্রাচীরের কোষগুলো কেবল এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি নির্দিষ্ট স্তরে বিন্যস্ত থাকে, তাদের দ্বিভ্রূণস্তরী বা দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাণী বলে। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে স্তরদুটি যথাক্রমে এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস-এ পরিণত হয়। এই দুই স্তরের মাঝখানে মেসোগ্লিয়া নামক অকোষীয় ও জেলির ন্যায় (কখনও কিছু কোষ ও তন্তুযুক্ত) একটি স্তর থাকে।
- **হাইপোস্টোম :** *Hydra*-র দেহের মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত মোচাকৃতির সংকোচন ও প্রসারণশীল অংশকে হাইপোস্টোম বলে। এর চূড়ার কেন্দ্রভাগে বৃত্তাকার মুখছিদ্র এবং মুখছিদ্রকে ঘিরে কর্ষিকা থাকে।
- **মেসোগ্লিয়া :** Cnidaria জাতীয় প্রাণীদের (যেমন– *Hydra*) এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জেলির ন্যায় আঠালো, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক স্তরকে মেসোগ্লিয়া বা মেসোল্যামিলা বলে। উভয় স্তরের কোষ এ স্তর গঠনে অংশ গ্রহণ করে।
- **সিলেন্টেরন :** *Hydra*-র দেহের কেন্দ্রস্থলে যে লম্বাকার একটি গহ্বর থাকে তাকে সিলেন্টেরন বলে। এতে খাদ্যের বহিঃকোষীয় পরিপাক এবং খাদ্যসার, শ্বসন ও রেচন পদার্থ পরিবাহিত হয় বলে একে **গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর** বা পরিপাক-সংবহন গহ্বর বলা হয়। এটি গ্যাস্ট্রোডার্মিস দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে। কর্ষিকাতে সিলেন্টেরন প্রসারিত থাকে বলে এগুলো ফাঁপা হয়।
- **ব্লাইন্ড গাট :** ব্লাইন্ড গাট (blind gut) বা ব্লাইন্ড স্যাক (blind sac) বলতে সিলেন্টেরনকে বুঝায়। কারণ দেহের উপরিভাগে অবস্থিত একটি মাত্র ছিদ্র, মুখছিদ্র দ্বারা এটি খাদ্যগ্রহণ ও বর্জ্য পরিত্যাগ করে।
- **টটিপটেন্ট :** Cnidaria পর্বের প্রাণীদের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের প্রয়োজনে যেকোনো কোষ বা অঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতাকে টটিপটেন্ট বলে।
- **নিডোসাইট :** *Hydra* সহ Cnidaria পর্বের সকল প্রাণীতে বহিঃত্বকের দুটি পেশি আবরণী কোষের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ দেখা যায়। এই কোষগুলোকে নিডোসাইট বা নেমাটোসাইট বা নিডোব্লাস্ট কোষ বলে। *Hydra*-র নিডোসাইটের বিভিন্ন নেমাটোসিস্ট খাদ্য ধরা, আত্মরক্ষা, খাদ্যগ্রহণ, চলনে ব্যবহৃত হয়।
- **নেমাটোসিস্ট :** নিডোসাইট কোষের স্ফীত মধ্যাংশের অভ্যন্তরে তরল পদার্থ পূর্ণ এবং লম্বা, সরু, ফাঁপা ও পেঁচানো সূত্রক সংবলিত ক্ষুদ্র থলিকে নেমাটোসিস্ট বা নিডা বলে। এটি আত্মরক্ষা, চলাচল ও খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করে।
- **নেমাটোসিস্ট ব্যাটারি :** *Hydra*-র কর্ষিকার স্থানে স্থানে ১০-১২টি নিডোসাইট কোষ একত্রে থেকে যে স্ফীত অংশ তৈরি করে তাকে নেমাটোসিস্ট ব্যাটারি বলে।
- **হিপনোটক্সিন :** নেমাটোসিস্টের ভিতরের বিষাক্ত তরল পদার্থকে হিপনোটক্সিন বলে। এটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত।
- **পরিপাক :** যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল ও শোষণের অনুপযোগী জৈব খাদ্যবস্তু দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন এনজাইম ও পানির সাহায্যে ভেঙে সরল, তরল ও কোষের শোষণ উপযোগী হয় তাকে পরিপাক বলে।
- **বহিঃকোষীয় পরিপাক :** কোষের বাইরে সিলেন্টেরনের ভেতরে গ্রন্থিকোষের এনজাইমের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর পরিপাককে বহিঃকোষীয় বা আন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে।
- **অন্তঃকোষীয় পরিপাক :** কোষের অভ্যন্তরে খাদ্যগহ্বরে খাদ্যবস্তুর পরিপাককে অন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে।
- **পুষ্টি :** প্রাণিদেহে যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক, খাদ্যসার পরিশোষণ ও আত্তীকরণ এবং অপাচ্য খাদ্যাংশ দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় সামগ্রিকভাবে তাকে পুষ্টি বলে। অপরদিকে দেহ সুস্থ ও সবল রাখার প্রক্রিয়াকে পুষ্টি বলে। প্রাণীর দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, প্রজনন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি পুষ্টির উপর নির্ভরশীল।
- **চলন :** যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহ জৈবিক প্রয়োজনে নিজ প্রচেষ্টায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় তাকে চলন বলে। চলন প্রাণীর একটি সহজাত আচরণ। খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা, প্রজনন, পরিবেশীয় বিভিন্ন উদ্দীপনা প্রভৃতি কারণে প্রাণী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে।
- **লুপিং :** *Hydra*-র লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের জন্য মন্থর চলন প্রক্রিয়া হলো লুপিং বা হামাগুড়ি।
- **সমারসল্টিং :** *Hydra*-র সাধারণ ও দ্রুত চলন প্রক্রিয়া হলো সমারসল্টিং বা ডিগবাজি।
- **জনন :** যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজ বংশ রক্ষার জন্য প্রজননক্ষম অনুরূপ জীব সৃষ্টি করে তাকে জনন বলে। *Hydra*-র জনন দুই ধরনের, যথা– অযৌন প্রজনন ও যৌন প্রজনন।
- **অযৌন জনন :** যে প্রজনন জননকোষ গঠন ছাড়া দেহের প্রত্যক্ষ বিভাজনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে অযৌন জনন বলে। *Hydra*-র অযৌন প্রজনন দু'ভাবে ঘটে, যথা– মুকুলোদ্গম ও বিভাজন।
- **যৌন জনন :** জনন কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে জনন সম্পন্ন করার পদ্ধতিকে যৌন জনন বলে। *Hydra*-র দেহে শরৎকালে (শীতকাল) অর্থাৎ প্রতিকূল পরিবেশে অস্থায়ী জননাঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং যৌন জনন ঘটে।
- **গ্যামিটোজেনেসিস :** যে প্রক্রিয়ায় জনন কোষ (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) সৃষ্টি হয় তাকে গ্যামিটোজেনেসিস বলে।
- **স্পার্মাটোজেনেসিস :** যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাশয়ে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তাকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে।

2020/8/4 12:49

Scanned with CamScanner

☑ **উওজেনেসিস :** যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় তাকে উওজেনেসিস বলে।
☑ **পরিস্ফুটন :** যেসব ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে জাইগোট থেকে শিশু প্রাণীর উৎপত্তি হয় তাকে পরিস্ফুটন বলে।
☑ **স্টেরিওগ্যাস্ট্রুলা :** *Hydra*-র নিরেট গ্যাস্ট্রুলাটি সিলিয়াযুক্ত কিংবা মুক্তজীবী নয়। কেননা এটি মাতৃদেহের সাথে যুক্ত থাকে। এ ধরনের গ্যাস্ট্রুলাকে স্টেরিওগ্যাস্ট্রুলা বলা হয়।
☑ **মিথোজীবিতা :** যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সহচার্যকে মিথোজীবিতা বলে।
☑ **শ্রমবণ্টন :** বহুকোষী জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যাবলি যখন দেহের বিভিন্ন কোষ, কলা বা তন্ত্রের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টিত হয় তখন তাকে শ্রমবণ্টন (division of labour) বলে।

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভলভেন্টের বৈশিষ্ট্য কোনটি? *[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*
ক কোনো শ্যাফট থাকে না
খ বার্ব ও বার্বিউল উপস্থিত
গ সূত্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা বিদ্যমান
ঘ সূত্রকের অগ্রভাগ বন্ধ

২. একবার ব্যবহৃত নেমাটোসিস্টের পরিণতি কী হয়? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*
ক দেহে পরিপাক হয় খ দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়
গ পুনরায় কর্মক্ষম হয় ঘ অন্য কোষে পরিবর্তিত হয়

⏭ নিচের চিত্র থেকে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩. উপরের চিত্রের প্রাণীটির খাদ্যাভ্যাস কোন ধরনের? *[ঢাকা বোর্ড-২০১৮]*
ক তৃণভোজী খ মাংসাশী গ মৃতজীবী ঘ সর্বভুক

৪. কোন ধরনের নেমাটোসিস্টের সূত্রক চাবুকের ন্যায় কাঁটাযুক্ত? *[ঢাকা বোর্ড-২০১৬]*
ক পেনিট্যান্ট খ ভলভেন্ট
গ স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট ঘ স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট

৫. *Hydra*-র কোন কোষ বুদবুদ তৈরি করে? *[যশোর বোর্ড-২০১৬]*
ক ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ খ এপিডার্মিসের গ্রন্থিকোষ
গ সংবেদী কোষ ঘ এন্ডোডার্মিসের গ্রন্থিকোষ

৬. *Hydra*-য় কিউটিকল সৃষ্টি হয় কোন কোষের নিঃসৃত রসে? *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]*
ক পেশি আবরণী কোষ খ অ্যামিবয়েড কোষ
গ গ্রন্থি কোষ ঘ ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ

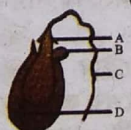

৭. চিত্রে চিহ্নিত অংশগুলোর মধ্যে কোনটি শিকারের দেহে বিদ্ধ হয়? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৬]*
ক A খ B গ C ঘ D

৮. কোনটি *Hydra*-র গ্যাস্ট্রোডার্মিসে থাকে না? *[সিলেট বোর্ড-২০১৬]*
ক নিডোসাইট খ স্নায়ু কোষ
গ সংবেদী কোষ ঘ গ্রন্থি কোষ

৯. কোন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম *Hydra*-র পুনরুৎপত্তির ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন? *[সিলেট বোর্ড-২০১৬]*
ক ল্যামার্ক খ হেকেল গ ট্রেম্বলে ঘ ভাইজম্যান

১০. কোনটি হাইড্রার দেহে দেখা যায়? *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬]*
ক মেসোগ্লিয়া খ হিমোসিল গ স্ক্লেরাইট ঘ মায়োফাইব্রিল

১১. নিডোসাইট কোষ কোথায় পাওয়া যায়? *[রাজশাহী বোর্ড-১৭]*
ক *Hydra* খ *Tacria* গ *Copsychus* ঘ *arthera*

১২. হাইড্রার নিডোসাইট সবচেয়ে বেশি থাকে কোথায়? *[ঢাকা বোর্ড-২০১৫]*
ক দেহকাণ্ডে খ কর্ষিকায় গ হাইপোস্টোমে ঘ পাদচাকতিতে

১৩. হাইড্রার পরিস্ফুটনের সঠিক ধাপ কোনটি? *[ঢাকা বোর্ড-২০১৫]*
ক জাইগোট → ব্লাস্টুলা → মরুলা → গ্যাস্ট্রুলা
খ জাইগোট → গ্যাস্ট্রুলা → মরুলা → হাইড্রুলা → ব্লাস্টুলা → পূর্ণাঙ্গ
গ জাইগোট → মরুলা → ব্লাস্টুলা → গ্যাস্ট্রুলা → হাইড্রুলা → পূর্ণাঙ্গ
ঘ জাইগোট → গ্যাস্ট্রুলা → মরুলা → হাইড্রুলা → ব্লাস্টুলা → পূর্ণাঙ্গ

১৪. কোন নিমাটোসিস্টে হিপনোটক্সিন থাকে? *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৫]*
ক পেনিট্র্যান্ট খ ভলভেন্ট
গ স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট ঘ স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট

১৫. বার্ব এবং বার্বিউল যুক্ত নেমাটোসিস্ট কোনটি? *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৫]*
ক পেনিট্র্যান্ট খ ভলভেন্ট
গ স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট ঘ স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট

১৬. কোনটি মিথোজীবী প্রজাতি? *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৫]*
ক *Hydra vulgaris* খ *Hydra oligactis*
গ *Hydra gangetica* ঘ *Chlorohydra viridissima*

১৭. হাইড্রার বহিঃকোষীয় পরিপাক কোথায় সংঘটিত হয়? *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]*
ক হাইপোস্টোমে খ কর্ষিকায়
গ সিলেন্টেরনে ঘ গ্যাস্ট্রোডার্মিসে

১৮. কোন প্রাণী অযৌন ও যৌন দু'ভাবেই প্রজনন সম্পন্ন করে? *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]*
ক হাইড্রা খ রুইমাছ গ ঘাসফড়িং ঘ মৌমাছি

১৯. কোন প্রক্রিয়ায় হাইড্রা দ্রুত চলে? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৫]*
ক গ্লাইডিং খ সুইং গ লুপিং ঘ সমারসল্টিং

২০. হাইড্রায় মুকুল তৈরি করে কোন কোষটি? *[সিলেট বোর্ড-২০১৫]*
ক পুষ্টি কোষ খ নিডোসাইট কোষ
গ জনন কোষ ঘ ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ

২১. কোন কোষের কারণে *Hydra* কে অমর প্রাণী বলা হয়? *[ঢাকা বোর্ড-২০১৯]*
ক নিডোসাইড খ পেশি আবরণী
গ জনন কোষ ঘ ইন্টারস্টিশিয়াল

২২. হাইড্রার কোন নেমাটোসিস্টে ফেনল থাকে? *[ঢা. বো.-২০১৯]*
ক ভলভেন্ট খ স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট
গ পেনিট্রান্ট ঘ স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট

2020/8/4 12:50
Scanned with CamScanner

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩. হাইড্রার বহিঃত্বকের গ্রন্থি কোষ সাহায্য করে– [রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]
i. ভাসতে ii. খাদ্য গলাধঃকরণে
iii. বস্তুর সঙ্গে আটকে রাখতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. হাইড্রার গ্রন্থিকোষ পাওয়া যায়– [রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]
i. বহিঃত্বকে ii. মেসোগ্লিয়ায় iii. অন্তঃত্বকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. লুপিং–
i. একবার চলন সম্পন্ন হতে দু'বার লুপ গঠিত হয়
ii. পাদচাকতি সর্বদা নিচের দিকে থাকে
iii. চলনের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. হিপনোটক্সিনে উপস্থিত থাকে– [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৫]
i. ফেনল ii. লিপিড iii. আমিষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. নিডোসাইট কোষ অনুপস্থিত– [যশোর বোর্ড-২০১৫]
i. এপিডার্মিসে ii. পদতলে iii. এন্ডোডার্মিসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]

২৮. উদ্দীপকের অঙ্গটির নাম কী?
ক Volvent খ Stenotile
গ Streptoline glutinant ঘ Stereoline glutinant

২৯. উদ্দীপকের চিত্রটির বৈশিষ্ট্য–
i. বার্বিউল উপস্থিত ii. হিপ্লোটক্সিন ক্ষরণ করে
iii. বাট প্রশস্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩০. উদ্দীপকের কোষস্তরের কাজ হলো– [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
i. আঘাত হতে দেহকে রক্ষা করা
ii. দেহের ক্ষতস্থান পূরণ করা
iii. বহিঃকোষীয় পরিপাকে অংশ নেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. চিত্রে কোন ধরনের কোষ অনুপস্থিত? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
ক সংবেদী কোষ খ নিডোসাইট
গ জনন কোষ ঘ স্নায়ুকোষ

⏭ নিচের চিত্র (P-S) থেকে ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

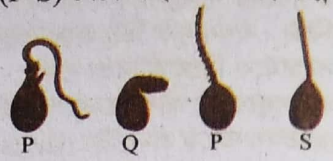

৩২. চিত্রে Q অংশটির নাম কী? [যশোর বোর্ড-২০১৬]
ক পেনিট্র্যান্ট খ স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট
গ স্ট্রেপ্টোলিন গ্লুটিন্যান্ট ঘ ভলভেন্ট

৩৩. হাইড্রা শিকারকে পেঁচিয়ে ধরা এবং অবশ করতে সাহায্য করে– [যশোর বোর্ড-২০১৬]
i. P ii. Q iii. R
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং ৩৪ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩৪. উদ্দীপকের চলন প্রক্রিয়াটিতে ভূমিকা রাখে– [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]
i. পেশি আবরণী কোষ ii. গ্লুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্ট
iii. ক্ষণপদীয় কোষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫. উক্ত চলন প্রক্রিয়ায় প্রাণীটি– [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]
i. লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে ii. দ্রুত গতিতে চলতে পারে
iii. প্রতিবারে দেহের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

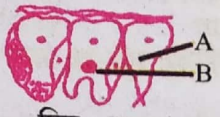

চিত্র : K [যশোর বোর্ড-২০১৬]

৩৬. উদ্দীপকে A চিহ্নিত অংশের নাম হলো–
ক সংবেদী কোষ খ ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষ
গ ক্ষণপদযুক্ত পুষ্টি কোষ ঘ গ্রন্থি কোষ

৩৭. উদ্দীক 'A' ও 'B' অংশের কাজ হলো–
i. দেহ সংকোচন পুষ্টি প্রসারণে অংশ নেওয়া
ii. খাদ্যকণা গ্রহণ ও পরিপাক করা
iii. শ্বসন ও রেচনে অংশগ্রহণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি থেকে ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩৮. উদ্দীপকটি কোন ধরনের নেমাটোসিস্ট? [বরিশাল বোর্ড-২০১৫]
ক পেনিট্র্যান্ট খ ভলভেন্ট
গ স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট ঘ স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট

2020/8/4 12:50

Scanned with CamScanner

৩৯. উদ্দীপকটির কাজ হলো–
i. আত্মরক্ষা ii. পরিপাক iii. শিকার ধরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪০. হাইড্রার বহিঃত্বকে সমগ্র অংশ জুড়ে অবস্থান করে কোনটি? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক সংবেদী কোষ খ নিডোব্লাস্ট কোষ
গ স্নায়ু কোষ ঘ পেশি-আবরণী কোষ

৪১. হাইড্রার এন্ডোডার্মিসের যেকোনো কোষ তৈরি করতে পারে কোনটি? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক পুষ্টি কোষ খ ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ
গ গ্রন্থি কোষ ঘ সংবেদী কোষ

৪২. হাইড্রার দেহের ক্ষুদ্রতম নেমাটোসিস্ট কোনটি? [ডেন্টল : ১৭-১৮]
ক স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট খ স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট
গ ভলভেন্ট ঘ স্টিনোটিল

৪৩. কোনটি হাইড্রার জন্য সঠিক নয়? [ডেন্টল : ০৬-০৭]
ক সুঁচ দিয়ে হাইড্রাকে খোঁচা দিলে এর দেহের অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ দেহ প্রসারিত হয়
খ হাইড্রা বিশ্বজনীন মিঠাপানির, মুক্তজীবী ও মাংসাশী প্রাণী
গ লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের জন্য হাইড্রা সাধারণত হামাগুড়ির সাহায্যেই চলে
ঘ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শৈবাল যে O_2 নির্গত করে, হাইড্রা তা শ্বসনে ব্যবহার করে

৪৪. হাইড্রার-কর্ষিকাও নেমাটোসিস্ট পারস্পরিক সহযোগিতায় যে কাজটিতে অংশগ্রহণ করে– [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক চলন খ খাদ্য সংগ্রহ গ আত্মরক্ষা ঘ সবগুলোই

৪৫. সিলেন্টের‍্যাটা জাতীয় প্রাণীদের দেহে নানান ধরনের নিমাটোসিস্ট শনাক্ত করা হয়েছে। হাইড্রোতে যেটি পাওয়া যায় না সেটি হচ্ছে– [মেডিকেল : ০০-০১]
ক স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট খ স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট
গ ভলভেন্ট ঘ স্টেরিওগ্র্যাস্ট্রুলা

৪৬. হাইড্রার খাদ্য নয় কোনটি? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক সাইক্লপস খ ড্যাফনিয়া
গ খণ্ডকায়িত প্রাণী ঘ ছোট ঘাস

৪৭. পরিপাক ও সংবেদনের কাজ দুটি সম্পাদন করে– [মেডিকেল : ০৬-০৭]
ক হিমোসিল খ লসিকা গ সিলেন্টেরন ঘ রক্তরস

৪৮. দ্রুত চলাচলের জন্য Hydra কোন চলন পদ্ধতি ব্যবহার করে? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক Somersaulting খ Looping
গ Crawling ঘ Gliding

৪৯. কোনটি হাইড্রার চলন নয়– [মেডিকেল : ১৩-১৪]
ক লুপিং খ গ্লাইডিং গ ড্রপিং ঘ ক্রলিং

৫০. হাইড্রা যখন তার দেহের ভর পদতলের উপর না রেখে কর্ষিকার উপর স্থাপন করে এবং কর্ষিকাকে পায়ের মতো ব্যবহার করে উল্টাভাবে ধীরে ধীরে চলে, তখন সেটি কী ধরনের চলন? [মেডিকেল : ০৬-০৭]
ক গ্লাইডিং খ হেঁচড়ান গ ভাসা ঘ নতমুখী

৫১. কোন প্রাণী অযৌন ও যৌন দু'ভাবেই প্রজনন সম্পন্ন করে? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক মৌমাছি খ রুই মাছ গ হাইড্রা ঘ ঘাসফড়িং

৫২. হাইড্রার মুকুল কী কাজে ব্যবহৃত হয়? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক চলন খ অযৌন প্রজনন গ যৌন প্রজনন ঘ পুনরুৎপত্তি

৫৩. হাইড্রার যৌন জননের বেলায় যেটি সত্য নয়? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক হাইপোস্টোমের কাছাকাছি এক বা একাধিক শুক্রাশয় সৃষ্টি হয়
খ উভলিঙ্গ হলেও এদের স্বনিষেক ঘটে না
গ ডিম্বাণুর ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে উওগোনিয়াম গঠন করে
ঘ প্রতিটি পরিণত শুক্রাণু একটি মস্তক, একটি মধ্যখণ্ড এবং একটি লেজ নিয়ে গঠিত

উত্তরমালা

১. (ঘ); ২. (ক); ৩. (খ); ৪. (গ); ৫. (খ); ৬. (ক); ৭. (গ); ৮. (ক); ৯. (গ); ১০. (ক); ১১. (ক); ১২. (খ); ১৩. (গ); ১৪. (ক); ১৫. (ক); ১৬. (ঘ); ১৭. (গ); ১৮. (ক); ১৯. (ঘ); ২০. (ঘ); ২১. (ঘ); ২২. (গ); ২৩. (ঘ); ২৪. (খ); ২৫. (খ); ২৬. (খ); ২৭. (খ); ২৮. (খ); ২৯. (ঘ); ৩০. (ক); ৩১. (গ); ৩২. (ঘ); ৩৩. (ক); ৩৪. (ক); ৩৫. (খ); ৩৬. (খ); ৩৭. (ঘ); ৩৮. (ক); ৩৯. (খ) ; ৪০. (ঘ); ৪১. (খ); ৪২. (ক); ৪৩. (ক); ৪৪. (ঘ); ৪৫. (ঘ); ৪৬. (ঘ); ৪৭. (গ); ৪৮. (ক); ৪৯. (গ); ৫০. (ঘ); ৫১. (গ); ৫২. (খ); ৫৩. (গ)।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. হাইপোস্টোম কী? [যশোর বোর্ড-২০১৭]
২. নিডোব্লাস্ট বা নিডোসাইট কী? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭, যশোর বোর্ড-২০১৫]
৩. নেমাটোসিস্ট কী? [রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]
৪. হিপনোটক্সিন কী?
৫. সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার কী?
৬. গ্যাস্ট্রোডার্মিসের কোষসমূহের নাম লিখ।
৭. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ কী?
৮. টটিপটেন্সি কী?
৯. *Hydra*-র খাদ্যসমূহের নাম লিখ।
১০. পরিপাক কী?
১১. বহিঃকোষীয় পরিপাক কী?
১২. মিথোজীবিতা কী? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]
১৩. অন্তঃকোষীয় পরিপাক কী?
১৪. পুষ্টি কী?
১৫. চলন কী?
১৬. ফ্যাগোসাইটোসিস কী?
১৭. গ্লাইডিং কী?
১৮. জনন কী?
১৯. অযৌন প্রজনন কী?
২০. যৌন প্রজনন কী?
২১. মুকুলোদ্গম কী?
২২. বিভাজন কী?
২৩. গ্যামিটোজেনেসিস কী?
২৪. স্পার্মাটোজেনেসিস কী?
২৫. উওজেনেসিস কী?
২৬. নিষেক কী?
২৭. পরিস্ফুটন কী?
২৮. মরুলা কী?
২৯. গ্যাস্ট্রুলা কী?
৩০. ব্লাস্টুলা কী?
৩১. মেসোগ্লিয়া কী? [ঢা. বো.-১৯, ... বো.-১৭]

2020/3/4 12:50

Scanned with CamScanner

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. প্রজাতি পর্যন্ত *Hydra*-র শ্রেণিবিন্যাস লিখ।
২. *Hydra*-র এপিডার্মিসের কোষসমূহের নাম লিখ।
৩. মেসোগ্লিয়া বলতে কী বোঝ?
৪. সিলেন্টেরন বলতে কী বুঝ? *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৭] [চট্টগ্রাম বোর্ড-১৬]*
৫. *Hydra* কে Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণী বলা হয় কেন?
৬. নেমাটোসিস্ট কত প্রকার ও কী কী?
৭. *Hydra*-র নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ পদ্ধতি লিখ।
৮. সিলেন্টেরনকে পরিপাক-পরিবহন গহ্বর বলা হয় কেন?
৯. লুপিং ও সমারসল্টিং বলতে কী বুঝ?
১০. মিথোজীবিতা বলতে কী বুঝ? *[য. বো.-'১৭; চ. বো.-'১৫; ব. বো.-'১৬]*
১১. 'দুটি জীবের পরস্পরের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব'– ব্যাখ্যা কর।
১২. দ্বিস্তরী প্রাণী বলতে কী বোঝ? *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬]*
১৩. *Hydra*-র পরিস্ফুটনের প্রবাহচিত্র লিখ।
১৪. *Hydra*-তে স্বনিষেক ঘটে না কেন?
১৫. হাইড্রাকে অমর প্রাণী বলা হয় কেন?
১৬. নিডারিয়ানদের দ্বিস্তরী প্রাণী বলা হয় কেন? *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]*
১৭. **পার্থক্য লিখ/তুলনা কর :** দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী ও ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণীর, *Hydra*-র বিভিন্ন প্রকার নেমাটোসিস্টের মধ্যে তুলনা কর; নিডোব্লাস্ট ও নেমাটোসিস্ট, এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস, লুপিং ও সমারসল্টিং, বহিঃকোষীয় পরিপাক ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক, সিলেন্টেরণ ও সিলোম, পরজীবিতা এবং মিথোজীবিতা, পরজীবী এবং মিথোজীবী।

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। হাইড্রা স্বাদু পানির দ্বিস্তরী আণুবীক্ষণিক জীব। গ্যাস্ট্রোডার্মিসে পরিবৃত এর কেন্দ্রীয় গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৯]*
ক. হাইপোস্টোম কী?
খ. হাইড্রায় পরনিষেক ঘটে কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটি কীভাবে আত্মরক্ষা করে বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গহ্বরেই কি পরিপাক ক্রিয়া শেষ হয়? আলোচনা কর।

২। শ্রেণিশিক্ষক বললেন, ক্ষুদ্র বহুকোষী প্রাণীটির এপিডার্মিসের কিছু বিশেষ কোষ শিকার ধরা, আত্মরক্ষা ও চলনে সহায়তা করে। *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]*
ক. মেসোগ্লিয়া কী?
খ. সিলেন্টেরন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাণীটির বিশেষ কোষ কর্তৃক শিকার ধরার কৌশল ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ কোষটি 'আত্মরক্ষা ও চলনে সহায়তা করে'– উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দাও।

৩। শিক্ষক ক্লাসে প্রতীক প্রাণী হাইড্রার বহিঃত্বক ও অন্তঃত্বকের বিভিন্ন কোষের বর্ণনা দিয়ে বললেন, 'প্রতিটি কোষ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে যেমন শিকার ধরা, পরিপাক, প্রতিরক্ষা, সংবেদন গ্রহণ ইত্যাদি।'
ক. হিপনোটক্সিন কী?
খ. হাইড্রাকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলা হয় কেন? *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]*
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিকার ধরার কাজে জড়িত কোষের গঠন বর্ণনা কর। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন কাজে জড়িত কোষসমূহের মধ্যে শ্রম বণ্টন পরিলক্ষিত হয়– বিশ্লেষণ কর। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]*

৪। রাজু মিঠা পানিতে বসবাসকারী একটি প্রাণী সম্পর্কে জানল যার গ্রিক পুরাণে বর্ণিত প্রাণীর মতো পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা রয়েছে। সে আরও জানল এসব প্রাণিদেহে বিশেষ কোষ রয়েছে যা খাদ্য গ্রহণ, আত্মরক্ষা ও চলনে সহায়তা করে।
ক. গ্লাইডিং কী?
খ. সিলেন্টেরনকে পরিপাক-পরিবহন গহ্বর বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাণীটির বিশেষ কোষের গঠন সচিত্র বর্ণনা দাও। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকের কোষটি নানামুখী কাজে সাহায্য করে– যুক্তি দেখাও। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*

৫। রবিন সার্কাসে গিয়ে দেখল একজন মানুষ ও তার পোষা প্রাণী উল্টেপাল্টে চলে খেলা দেখাচ্ছে। এভাবে তারা উপার্জন করে পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবন ধারণ করে। *[ঢাকা বোর্ড-২০১৬]*
ক. পুষ্টি কী?
খ. হাইড্রাকে অমর প্রাণী বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে মিলসম্পন্ন একটা প্রাণীর অনুরূপ চলন বর্ণনা কর।
ঘ. উল্লিখিত সহযোগিতা একটি দ্বিস্তরী প্রাণীর জীবন ধারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

৬। মিতা মাইক্রোস্কোপে একটি স্থায়ী পাইড পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন প্রকার কোষের সমন্বয়ে গঠিত দুই স্তরবিশিষ্ট একটি প্রস্থচ্ছেদের গঠন দেখতে পেল।
ক. মরুলা কী?
খ. *Hydra* কে Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণী বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গঠনটির চিহ্নিত চিত্র দাও। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্তর দুটির কোষসমূহের কাজ বর্ণনা কর। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*

৭। প্রাণিজগতে এমন একটি প্রাণী রয়েছে যার দেহে আক্রমণাত্মক কোষ বিদ্যমান। আবার এ প্রাণীটি পদতলকে মুক্ত করে দ্রুত গতিতে এবং মুক্ত না করে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে। *[যশোর বোর্ড-২০১৭]*
ক. হাইপোস্টোম কী?
খ. মিথোজীবিতা বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আক্রমণাত্মক কোষটির গঠন ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চলন সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ কর।

৮। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. বহুরূপতা কী? *[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*
খ. মেসোগ্লিয়া বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির প্রস্থচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। *[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত 'X' ও 'Y' অংশ দ্বারা সৃষ্ট ডিপ্লয়েড কোষের পরিস্ফুটনই প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় একমাত্র উপায় নয়– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। *[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*

2020/8/4 12:30
Scanned with CamScanner

আহছানুল হক আবির

2020/

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

Scanned with CamScanner

প্রাণীর পরিচিতি
INTRODUCTION OF ANIMAL

অধ্যায় ২

প্রাণিজগতের বিস্তৃতি ব্যাপক। প্রাণিজগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে প্রাণীর দৈহিক গঠন, জীবতত্ত্ব ও জীবনচক্র সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগতের সকল সদস্যের জীবন ইতিহাস আলাদাভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। (কারণ এদের বসতি, গঠন, চলন, খাদ্য গ্রহণ, আচার-ব্যবহার, প্রজনন ইত্যাদিতে রয়েছে বৈচিত্র্য।) কিন্তু বিভিন্ন পর্বের একটি প্রাণী সম্পর্কে অধ্যয়ন করে ঐ পর্বের সকল প্রাণী সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। এ অধ্যায়ে হাইড্রা, ঘাসফড়িং এবং রুই মাছের জীবন ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট পর্বের সকল প্রাণী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

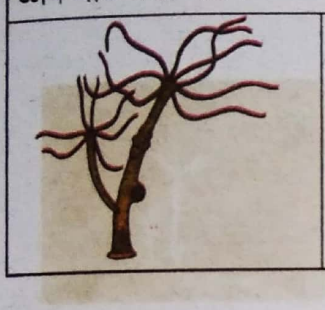
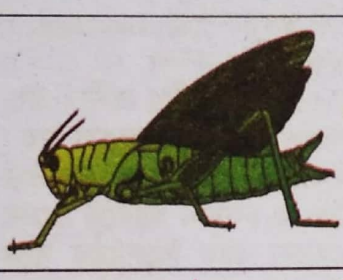


এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ২৫)
১. হাইড্রার গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ২. হাইড্রার খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৩. হাইড্রার চলন ও জনন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. হাইড্রার মিথোজীবিতা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. **ব্যবহারিক** হাইড্রা পর্যবেক্ষণ করে চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ৬. ঘাসফড়িং-এর গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ৭. ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র ও পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৮. **ব্যবহারিক** ঘাসফড়িং এর উপাঙ্গ শনাক্ত ও চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ঘাসফড়িং এর পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ শনাক্ত করতে পারবে। ৯. ঘাসফড়িং-এর সংবহন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১০. ঘাসফড়িং এর শ্বসন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১১. ঘাসফড়িং এর রেচন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১২. ঘাসফড়িং এর প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৩. ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষীর গঠন ও দর্শন কৌশল বর্ণনা করতে পারবে। ১৪. রুই মাছের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ১৫. রুই মাছের রক্ত সংবহন তন্ত্রের বর্ণনা করতে পারবে। ১৬. **ব্যবহারিক** ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের রক্ত সংবহন তন্ত্র পর্যবেক্ষণ এবং চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ১৭. রুই মাছের শ্বসন ও বায়ুথলির গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ১৮. ব্যবহারিক ○ রুই মাছের ফুলকা ও বায়ুথলি শনাক্ত করতে পারবে। ১৯. প্রকৃতিতে রুই মাছের প্রজনন ও নিষেক বর্ণনা করতে পারবে। ২০. রুই জাতীয় মাছের সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● **হাইড্রা** (*Hydra*) ○ গঠন (দেহপ্রাচীরের কোষের বৈশিষ্ট্যসহ) ○ খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া ○ চলন ও জনন ○ মিথোজীবিতা ● **ব্যবহারিক** ○ হাইড্রার স্থায়ী স্লাইড/মডেল পর্যবেক্ষণ ● **ঘাসফড়িং** (*Poecilocerux pictus*) ○ গঠন (বাহ্যিক) ○ পরিপাকতন্ত্র-মুখ উপাঙ্গ, পরিপাক গ্রন্থি ● **ব্যবহারিক** ○ ঘাসফড়িং/আরশোলা এর মুখ উপাঙ্গ ○ ঘাসফড়িং/আরশোলার পরিপাকতন্ত্র ও গ্রন্থি পর্যবেক্ষণ ● **ঘাসফড়িং** ○ সংবহন পদ্ধতি ○ শ্বসন পদ্ধতি ○ রেচন পদ্ধতি ○ প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর ● **ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষী** ○ গঠন ○ দর্শন কৌশল ● **রুই মাছ** (*Labeo*) ○ দেহ গঠন (বাহ্যিক) ○ রক্ত সংবহনতন্ত্র ● **ব্যবহারিক** ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের রক্ত সংবহন তন্ত্র পর্যবেক্ষণ। ○ শ্বসন ও বায়ুথলির গঠন ● **ব্যবহারিক** ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের ফুলকা ও বায়ুথলির পর্যবেক্ষণ ● জীবন চক্র ● সংরক্ষণ (প্রাকৃতিক)

2020/8/4 12:47

Scanned with CamScanner

২.২ ঘাসফড়িং (Grasshopper)

ঘাসফড়িং-এর নামকরণ : Arthropoda (Gr. *arthros* = joint + *podos* = foot) পর্বের Insecta শ্রেণির Orthoptera বর্গের Caelifera উপবর্গের প্রাণীদের ঘাসফড়িং (grasshopper) বলা হয়।

ঘাসফড়িং একপ্রকার **পতঙ্গ** (insect) পেস্ট। এরা শাকসবজি, ধান, পাট ইত্যাদি ফসলের পেস্ট হিসেবে থাকে। এটি ক্ষতিকারক পতঙ্গ এবং মানুষের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে। পৃথিবীতে ঘাসফড়িং-এর প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২০,০০০। এরা সাধারণত এককভাবে বাস করে, তবে এদের কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে বাস করে। যে প্রজাতিগুলো দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং **মাইগ্রেটরি** (migratory) অর্থাৎ একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে তারা **পঙ্গপাল** (locust) নামে পরিচিত। ঘাসফড়িং পিছনের লম্বা পায়ের সাহায্যে লাফিয়ে চলে। প্রয়োজনে উড়তে পারে। ঘাস ও লতাপাতার মধ্যে থেকে সেখানেই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে দেখে এর নাম হয়েছে **"ঘাসফড়িং"** (Grasshopper)। ঘাসফড়িং দুধরনের, যথা-লম্বা অ্যান্টেনাযুক্ত ঘাসফড়িং (Tettinonidae গোত্রের) এবং খাটো অ্যান্টেনাযুক্ত ঘাসফড়িং (Acrididae গোত্রের)।

ঘাসফড়িং-কাইটিনময় **বহিঃকংকাল** (exoskeleton); মস্তক, বক্ষ, ও উদর বিশিষ্ট **দেহ; তিনজোড়া সন্ধিযুক্ত পা**, জটিল **পুঞ্জাক্ষি** এবং একজোড়া **অ্যান্টেনা** বহন করে বলে এদের **Insecta** শ্রেণিভুক্ত সদস্য বা **পতঙ্গ** নামে অভিহিত করা হয়।

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান (Systematic Position)

Kingdom : Animalia (প্রাণী)
Phylum : Arthropoda (সন্ধিপদী, কাইটিননির্মিত বহিঃকঙ্কাল)
Class : Insecta (তিনজোড়া সন্ধিযুক্ত পদ)
Subclass : Pterygota (ডানাবিশিষ্ট পতঙ্গ)
Order : Orthoptera (দুজোড়া ডানাবিশিষ্ট)
Family : Acrididae (খাটো অ্যান্টেনাযুক্ত)
Genus : *Poekilocerus* [আগের নাম = *Poecilocerus*]
Species : *Poekilocerus pictus* (Fabricius, 1775)

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত **বিশ প্রজাতির** ঘাসফড়িং এর সন্ধান পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রজাতি হলো : *Acrida exaltata, Phlaeoba infumata, Chondracris rosea, Aulacobothrus luteipes, Schistocerca americana, Schistocerca gregaria, Romalea microptera, Oxya velox, Locusta danica, Locusta migratoria, Choroedocus robustus, Oedaleus abruptus, Orthacris elegans, Poekilocerus pictus.*

■ **স্বভাব ও বাসস্থান** (Habit and habitats) : পৃথিবীর সর্বত্র ঘাসফড়িং পাওয়া যায়। শাকসবজির বাগান, ধানের ক্ষেত কিংবা যেখানে তৃণভূমি বা ঘাস, লতাপাতা এমনকি সবুজ শস্য ক্ষেত বা উদ্ভিদরাজি আছে, সেখানেই এদের দেখা যায়। **তৃণভোজী** অঞ্চলে এদের ব্যাপকতা বেশি। স্বাদুপানির ও ম্যানগ্রোভ জলাশয়ে যেহেতু পানির উঠানামা বেশি হয় এবং ডিমপাড়ার জায়গা প্লাবিত হয়ে যায় সে কারণে এসব বসতিতে ঘাসফড়িং কম বাস করে। এরা ঝাঁক বেঁধে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। এমনকি এরা মুহূর্তেই একটি ক্ষেতের সমস্ত ফসল নষ্ট করে ফেলতে পারে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের শস্যক্ষেতের জন্য পঙ্গপাল মারাত্মক হুমকি। এরা আরশোলার ন্যায় নিশাচর নয়, এরা **দিবাচর**। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিপুল সংখ্যায় পরিযায়ী বা মাইগ্রেটরি হয়, দিনে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে। এরা **তৃণভোজী** বা **শাকাশী** (herbivorous) প্রাণী। ফসল ও শাকসবজির সবুজ কচিপাতা এদের প্রধান খাদ্য, তবে শক্ত উদ্ভিজ খাবারও গ্রহণ করে।

ঘাসফড়িং-এর গঠন (Features of Grasshopper)

■ **বাহ্যিক গঠন** (External features) :

(ক) আকার ও আকৃতি (Shape and size) : ঘাসফড়িং-এর দেহ সরু, লম্বাটে, বেলনাকার (cylindrical), খণ্ডায়িত এবং দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। এরা আকারে অন্যান্য পতঙ্গ থেকে তুলনামূলকভাবে বড় এবং লম্বায় সাধারণত ৮-৯ সেন্টিমিটার হয়।



চিত্র ২.২.১ : ঘাসফড়িং-এর বহিরাকৃতি

(খ) বর্ণ (Colour) : এদের বর্ণ হলুদাভ-সবুজ (yellowish green) বা বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে। তবে কিছু প্রজাতি (*Poekilocerus pictus*) উজ্জ্বল নীল-হলুদ বর্ণের হয়। অনেকক্ষেত্রে দেহে বিভিন্ন রঙের ফোঁটা (spots) বা ডোরাকাটা (markings) দেখা যায়। এদের অনেক প্রজাতি দেহের বর্ণ দ্বারা তাদের পরিবেশের সাথে মিলে যায় (camoflague), ফলে এরা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

2020/8/4 12:51
Scanned with CamScanner

(গ) বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton) : হলুদাভ সবুজ বর্ণের কাইটিন (chitin) নির্মিত **কিউটিকল** (cuticle) বা কৃত্তিকাবরণী বহিঃকঙ্কাল গঠন করে। বহিঃকঙ্কাল **হাইপোডার্মিস** (hypodermis) নিঃসৃত পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট। বহিঃকঙ্কাল প্রতি দেহখণ্ডকে **স্ক্লেরাইট** (sclerite) নামক কঠিন প্লেট বা পাতের ন্যায় গঠন সৃষ্টি করে। স্ক্লেরাইটসমূহের সংযোগস্থল পাতলা নরম ঝিল্লি দ্বারা আবৃত, এদেরকে **সুচার** (sutures) বলে। সুচারের কারণেই ঘাসফড়িং দেহকে সহজেই নড়াচড়া করতে পারে। প্রতি দেহখণ্ডকের পৃষ্ঠীয় স্ক্লেরাইটকে **টার্গাম** বা **টারগাইট** (tergum or tergite), অঙ্কীয় স্ক্লেরাইটকে **স্টার্নাম** বা **স্টার্নাইট** (sternum or sternite) এবং পার্শ্বীয় দুইটির প্রত্যেকটিকে **প্লুরা** বা **প্লুরাইট** (pleura or pleurite) বলে। কিউটিকলে বিভিন্ন ধরনের **রঞ্জক পদার্থ** (pigments) থাকায় ঘাসফড়িং-এর বর্ণময়তা সৃষ্টি হয়।

(ঘ) দেহের বিভাজন (Division of body) : অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় ঘাসফড়িং-এর দেহকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা– **মস্তক, বক্ষ** ও **উদর**।

ঘাসফড়িং-এর দেহের বিভিন্ন অংশ

দেহখণ্ড	অংশ
১. মস্তক (Head)	৬ খণ্ড বিশিষ্ট; ১ জোড়া পুঞ্জাক্ষি, ৩টি সরলাক্ষি বা ওসেলি, ১ জোড়া অ্যান্টেনা ও মুখোপাঙ্গ।
২. বক্ষ (Thorax)	ঘাসফড়িং-এর বক্ষ তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা– অগ্রবক্ষ (prothorax), মধ্যবক্ষ (mesothorax) এবং পশ্চাৎবক্ষ (metathorax)। ২ জোড়া শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল, ১ জোড়া ডানা ও ৩ জোড়া পা।
৩. উদর (Abdomen)	উদর ১১টি খণ্ডক নিয়ে গঠিত। ৮ জোড়া শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল ও জনন অঙ্গসমূহ।

১। মস্তক (Head) : ছয়টি দেহখণ্ডক সংযুক্ত হয়ে মস্তক গঠন করে। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে বিভিন্ন খণ্ডকের সংযুক্তির চিহ্ন থাকে না। তাই বাহ্যত একে অখণ্ড মনে হয়। মস্তক নাশপাতি আকৃতিবিশিষ্ট এবং **হাইপোগন্যাথাস** (hypognathous) ধরনের অর্থাৎ মুখছিদ্র নিম্নমুখী হয়ে মস্তকের নিচে অবস্থান করে। মস্তকের বহিঃকঙ্কালের নাম **হেড ক্যাপসিউল** বা **এপিক্রানিয়াম** (head capsule or epicranium)। মস্তকের বহিঃকঙ্কাল কয়েকটি অংশে বিভক্ত, যথা– **ভার্টেক্স, ফ্রন্স, জেনা** ও **ক্লাইপিয়াস**।

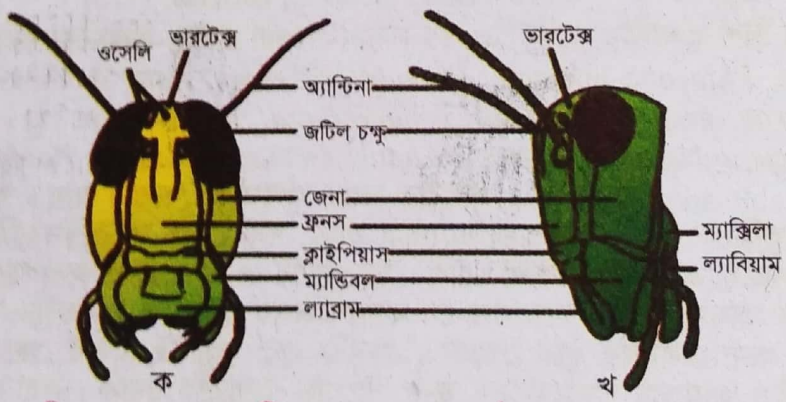

চিত্র ২.২.২ : ঘাসফড়িংয়ের মস্তক (ক) পৃষ্ঠদৃশ্য, (খ) পার্শ্বদৃশ্য

মস্তকের পৃষ্ঠীয়দেশের ত্রিকোণাকার অঞ্চলকে **ভার্টেক্স** (vertex) এবং সম্মুখভাগের অর্থাৎ কপালের দিকের চওড়া অংশকে **ফ্রন্স** (frons) বলে। এক জোড়া **জেনা** (genae) মস্তকের পার্শ্বদেশ গঠন করে। একটি প্রশস্ত ফ্রন্সের নিচে আয়তাকার প্লেটটিই **ক্লাইপিয়াস** (clypeus)। মস্তকের পেছনে যে অংশ পাত দ্বারা গঠিত তাকে **অক্সিপুট** (occiput) বলে। মস্তক একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** (compound eyes), তিনটি **ওসেলি** (ocelli, সরল চক্ষু/সরলাক্ষি), এক জোড়া শুঙ্গ বা **অ্যান্টেনা** (antenna) এবং এক প্রস্ত চোষণকারী **মুখোপাঙ্গ** (mouth parts) বহন করে। ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি, ওসেলি ও অ্যান্টেনা আরশোলা, চিংড়ি ইত্যাদি আর্থ্রোপোড প্রাণীর ন্যায়।

❐ **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eyes) : ঘাসফড়িং-এর মস্তকের উভয়দিকে পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশে, প্রথম খণ্ডকে একজোড়া কালো, বৃহৎ বৃক্কাকার, বোঁটাবিহীন (stalkless) পুঞ্জাক্ষি থাকে। ঘাসফড়িং দৃষ্টিশক্তির দিকে থেকে যে কোনো আর্থ্রোপোড অপেক্ষা উন্নত। সম্ভবত এরা রং শনাক্ত করতে সক্ষম। অসংখ্য (প্রায় ২০০০টি) **ওমাটিডিয়া** (ommatidia) নামক আলোক সংবেদী একক সমন্বয়ে পুঞ্জাক্ষি গঠিত। **ওমাটিডিয়াই পুঞ্জাক্ষির গঠন ও কাজের একক**।

কাজ : এটি দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করে।

❐ **ওসেলি** (Ocelli; একবচনে– ocellus) : ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষিদ্বয়ের মাঝখানে তিনটি সরল চক্ষু বা ওসেলি বিদ্যমান। প্রতিটি ওসেলাস একটি পুরু ও স্বচ্ছ কিউটিকলের স্তর, একটি র‍্যাবডোম, একগুচ্ছ গভীর আলোক সংবেদী কোষ, রঞ্জক কোষ এবং অল্প সংখ্যক স্নায়ুতন্তু নিয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষ রঞ্জক পদার্থসমৃদ্ধ। এর অভ্যন্তরের আলোক সংবেদী কোষগুলো রেটিনার মতো কাজ করে। এর স্বচ্ছ কিউটিকলের একাংশ লেন্সের কাজ করে।

কাজ : এটি আলোকের তীব্রতা অনুধাবনে ও একক প্রতিবিম্ব সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে।

2020/8/4 12:5
Scanned with CamScanner

অ্যান্টেনা (Antenna) : ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষিদ্বয়ের সম্মুখে, **ফ্রন্সের** দু'পাশে একটি করে মোট দুটি সরু সুতার ন্যায় অ্যান্টেনা বা **শুঙ্গ** থাকে। প্রতিটি অ্যান্টেনা **স্কেপ** (scape), **পেডিসেল** (pedicle) ও **ফ্ল্যাজেলাম** (flagellum) দ্বারা গঠিত। পেডিসেল খাটো ও অবিভক্ত। ফ্ল্যাজেলামটি লম্বা, সূত্রাকার এবং ২০-২৫টি খণ্ডকে বিভক্ত।

কাজ : অ্যান্টেনা ঘাসফড়িং-এর ঘ্রাণ, স্পর্শ ও শ্রবণেন্দ্রিয় অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

মুখোপাঙ্গ (Mouth parts) : ঘাসফড়িং-এর মুখছিদ্রকে ঘিরে অবস্থিত নড়নক্ষম, খাদ্যগ্রহণের সাথে জড়িত, সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গগুলোকে একত্রে মুখোপাঙ্গ বলে। ঘাসফড়িং ঘাসের কচি পাতা চুষে খায়। কাজেই মস্তকের অঙ্কীয় দেশে যে মুখোপাঙ্গ অবস্থিত তা **চর্বণ-উপযোগী** বা **ম্যান্ডিবুলেট** (chewing or mandibulate) ধরনের। ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গ ল্যাব্রাম, এক জোড়া ম্যান্ডিবল, এক জোড়া ম্যাক্সিলা, ল্যাবিয়াম এবং হাইপোফ্যারিংক্স নিয়ে গঠিত।

কাজ : মুখোপাঙ্গ খাদ্য নির্বাচন, খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য চর্বণ ও খাদ্যের গুণাগুণ নির্ণয়ে সহায়তা করে।

ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশ

(ক) ল্যাব্রাম (Labrum) : মুখছিদ্রের উপরের দিকে অবস্থিত প্রায় গোলাকার, চওড়া, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ও চ্যাপ্টাকৃতির উপাঙ্গ এবং এর মাঝ বরাবর অংশে একটি খাঁজ দেখা যায়। এটি পেশি দ্বারা মস্তকের ক্লাইপিয়াসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এর রঙ সবুজ, বাদামি বা অন্য ধরনের হতে পারে।

কাজ : ম্যান্ডিবলদ্বয়কে ঢেকে রাখে; ওপরের ওষ্ঠ (lip) গঠন করে যা খাদ্যবস্তু ধরতে এবং মুখের দিকে ঠেলে দিতে ও স্বাদ নিতে সাহায্য করে।

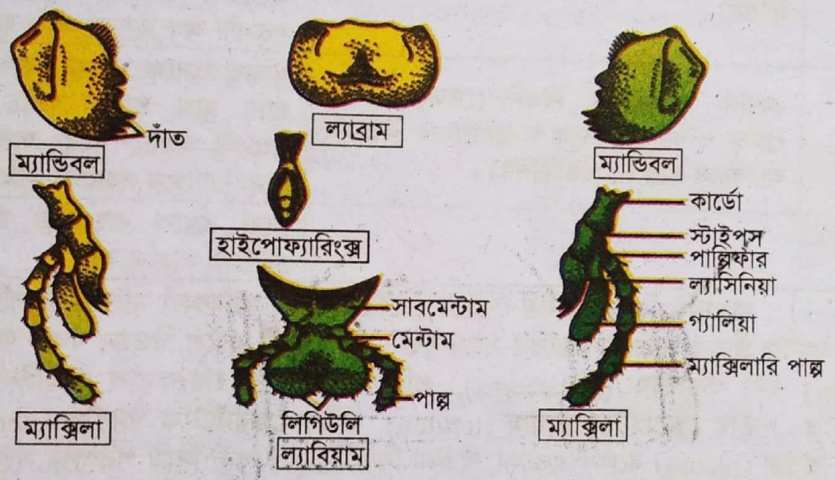

চিত্র ২.২.৩ : ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ

(খ) ম্যান্ডিবল (Mandible) : মুখছিদ্রের উভয় পাশে একটি করে বড়, সুদৃঢ় শক্ত ত্রিকোণাকার কৃষ্ণবর্ণের মোট ২টি ম্যান্ডিবল অবস্থিত। ম্যান্ডিবলের আন্তঃকিনারা তীক্ষ্ণ করাতের দাঁতের ন্যায়। প্রতিটি ম্যান্ডিবল দুই গুচ্ছ পেশি দ্বারা মস্তকের সঙ্গে যুক্ত থাকে। পেশিগুচ্ছ দুটি হলো–

(i) অ্যাডাক্টর পেশি (Adductor muscle) : এ পেশি সংকুচিত হয়ে ম্যান্ডিবলকে ভেতরের দিকে টেনে আনে।

(ii) অ্যাবডাক্টর পেশি (Abductor muscle) : পেশি সংকুচিত হয়ে ম্যান্ডিবলকে বাইরের দিকে সরিয়ে দেয়।

কাজ : ম্যান্ডিবল ধৃত খাদ্যবস্তু কর্তন, পেষণ ও চর্বণে সাহায্য করে।

(গ) ম্যাক্সিলা (Maxilla) : ম্যান্ডিবলের পেছনে ও বাইরের দিকে প্রতি পাশে একটি করে এক জোড়া ম্যাক্সিলা থাকে। প্রতিটি ম্যাক্সিলা **কার্ডো** (cardo), **স্টাইপস** (stipes), **ল্যাসিনিয়া** (lacinia) এবং **গ্যালিয়া** (galea) দ্বারা গঠিত। গ্যালিয়ার পাশ হতে পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট **ম্যাক্সিলারি পাল্প** (maxillary palp) উৎপন্ন হয়। এর উপর থাকে সূক্ষ্ম সংবেদী রোম।

কাজ : ম্যাক্সিলা খাদ্য ধরতে, মুখে প্রবেশ করতে, স্বাদ গ্রহণ করতে এবং অ্যান্টেনা ও পা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

(ঘ) ল্যাবিয়াম (Labium) : ঘাসফড়িং-এর মুখছিদ্রের অঙ্কীয় দিকে বৃহৎ, বহুসন্ধিল একটি ল্যাবিয়াম বা অধঃওষ্ঠ বিদ্যমান। এটি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম এবং **মেন্টাম** (mentum) ও **সাবমেন্টাম** (submentum) নামক দুটি উপাঙ্গের সংযুক্তির ফলে উৎপন্ন হয়েছে। ল্যাবিয়ামকে দ্বিতীয় জোড়া ম্যাক্সিলার প্রতিনিধি মনে করা হয়। প্রতি পাশে মেন্টামের মুক্ত প্রান্তে দুটি নড়নক্ষম **লিগিউলি** (ligulae) এবং তিন সন্ধিযুক্ত **ল্যাবিয়াল পাল্প** (labial palp) অবস্থিত। প্রতিটি লিগিউলি ভেতরের দিকে **গ্লোসা** (glossa) ও বাইরের দিকে **প্যারাগ্লোসায়** (paraglossa) বিভক্ত।

কাজ : ল্যাবিয়াম খাদ্যবস্তুকে মুখবিবরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রোধ করে এবং চর্বিত খাদ্য মুখে প্রবেশ করায়। ল্যাবিয়াল পাল্প সংবেদী অঙ্গরূপে এবং স্বাদ গ্রহণে ও উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচনে সহায়তা করে।

2020/8/4 12:51

Scanned with CamScanner

(ঙ) হাইপোফ্যারিংক্স বা লিঙ্গুয়া (Hypopharynx or lingua) : ল্যাব্রামের নিচে মাংসল ক্ষুদ্রাকার উপাঙ্গটিকে **হাইপোফ্যারিংক্স বা উপজিহ্বা** বলে। এর কেন্দ্রীয় অংশটির পৃষ্ঠীয়তল ম্যান্ডিবলদ্বয়, অঙ্কীয়তল ল্যাবিয়াম এবং পার্শ্বতল ম্যাক্সিলাদ্বয় দ্বারা পরিবৃত থাকে। ল্যাবিয়ামের ভেতর কিনারা থেকে সৃষ্ট একটি ঝিল্লি হাইপোফ্যারিংক্সের অঙ্কীয়তলের সাথে যুক্ত থাকে। এর গোড়ায় লালাগ্রন্থি উন্মুক্ত থাকে।

কাজ : খাদ্যবস্তুকে নাড়াচাড়া করে লালার সাথে মেশাতে সাহায্য করে।

মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশ ও কাজ

মুখোপাঙ্গের নাম	অংশসমূহ	কাজ
১। ল্যাব্রাম বা উর্ধোষ্ঠ	-	খাবার ধরে রাখতে, ম্যান্ডিবলের দিকে ঠেলে দিতে ও স্বাদ নিতে সাহায্য করে।
২। ম্যান্ডিবল বা চোয়াল	-	ধৃত খাদ্যবস্তু কর্তন, পেষণ ও চর্বণে সাহায্য করে।
৩। প্রথম ম্যাক্সিলা	কার্ডো, স্টাইপস, ল্যাসিনিয়া (নখর-সাদৃশ), গ্যালিয়া (ঢাকনি) ও ম্যাক্সিলারি পাল্প (৫ খণ্ড বিশিষ্ট)।	খাদ্যবস্তু ধরে রাখতে, মুখের ভেতরে প্রবেশ করাতে এবং খাদ্য চর্বণে সাহায্য করে। খাদ্যের স্বাদ গ্রহণে অংশ নেয়। ম্যাক্সিলারি পাল্প, অ্যান্টেনা ও পা পরিষ্কারে অংশ নেয় এবং সংবেদী অঙ্গ হিসাবে কাজ করে।
৪। ২য় ম্যাক্সিলা বা ল্যাবিয়াম বা অধঃওষ্ঠ	মেন্টাম, সাবমেন্টাম, লিগুলি (ভেতরের দিকে গ্লোসা ও বাইরের দিকে প্যারাগ্লোসায় বিভক্ত), ল্যাবিয়াল পাল্প (৩ খণ্ড বিশিষ্ট)।	খাবার ফসকে যাওয়া রোধ করে এবং চর্বিত খাদ্য মুখে প্রবেশ করায়। ল্যাবিয়াল পাল্প সংবেদী অঙ্গরূপে এবং স্বাদ গ্রহণে ও উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচনে সহায়তা করে।
৫। হাইপোফ্যারিংক্স বা উপজিহ্বা	-	খাদ্য বস্তুকে নাড়াচাড়া করে লালার সাথে মেশাতে সাহায্য করে।

২। বক্ষ (Thorax) : ঘাসফড়িং-এর মস্তকের পেছনে দেহের মধ্যাংশ গঠনকারী মাংসল অংশটিই হলো **বক্ষ**। এটি একটি খাটো, সরু ও নমনীয় গ্রীবার সাহায্যে মস্তকের সাথে যুক্ত। বক্ষ তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা– **অগ্রবক্ষ** (prothorax), **মধ্যবক্ষ** (mesothorax) এবং **পশ্চাৎবক্ষ** (metathorax)। প্রতিটি খণ্ডাংশের বহিঃকঙ্কাল কাইটিনজাত ৪টি **স্ক্লেরাইট** (sclerites) দ্বারা গঠিত। পৃষ্ঠীয় স্ক্লেরাইটকে **টার্গাম** (tergum), অঙ্কীয় স্ক্লেরাইটকে **স্টার্ণাম** (sternum) এবং পার্শ্বীয় দুইটির প্রত্যেকটিকে **প্লিউরা** (pleura) বলে। এগুলো পাতলা কিউটিকলের পর্দা দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। ঘাসফড়িং-এর বক্ষীয় বহিঃকঙ্কালের টার্গামসমূহকে **নোটাম** (notum) বলা হয়। এদের অগ্রবক্ষের টার্গামকে **প্রোনোটাম** (pronotum) বা **প্রোটার্গাম** (protergum) বলে। ইহা প্রশস্ত এবং পেছনে ও পাশে প্রসারিত থাকে। আবার মধ্যবক্ষের ও পশ্চাৎবক্ষের টার্গাম অংশকে যথাক্রমে **মেসোনোটাম** (mesonotum) ও **মেটানোটাম** (metanotum) বলা হয়। বক্ষাঞ্চলে রয়েছে **শ্বাসরন্ধ্র, পা ও ডানা**।

❐ **শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল** (Spiracles) : বক্ষের অঙ্কীয়-পার্শ্বদেশে দুই জোড়া শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল অবস্থিত। প্রথম জোড়া প্রোনোটামের নিচে অগ্রবক্ষ ও মধ্যবক্ষের মাঝে এবং দ্বিতীয় জোড়া মধ্য ও পশ্চাৎবক্ষের মাঝে অবস্থিত। শ্বাসরন্ধ্র দিয়ে শ্বাসবায়ুর আদান-প্রদান ঘটে।

❐ **পদ বা পা** (Legs) : বক্ষের প্রতিটি খণ্ডকে এক জোড়া করে মোট ৬টি (৩ জোড়া) সন্ধিযুক্ত পদ বা পা বহন করে (**পতঙ্গদের দেহে ৬টি পা থাকার কারণে এদের Hexapoda বলা হয়**)। প্রতিটি পা ৫টি খণ্ডক নিয়ে গঠিত এবং সকল খণ্ডকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা থাকে। গোড়ার দিক থেকে প্রান্তের দিকে খণ্ডকগুলো হলো– **কক্সা** (coxa), **ট্রোক্যান্টার** (trochanter), **ফিমার** (femur), **টিবিয়া** (tibia) ও **টার্সাস** (tarsus)। বক্ষের সঙ্গে কক্সা যুক্ত থাকে। ট্রোকান্টার ক্ষুদ্র এবং ফিমারের সঙ্গে একত্রিত থাকে।

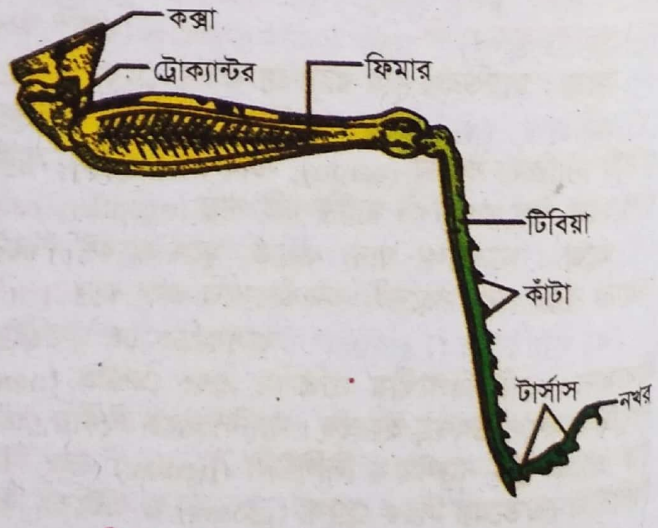

চিত্র ২.২.৪ : ঘাসফড়িংয়ের পায়ের বিভিন্ন অংশ

2020/8/4 12:51

Scanned with CamScanner

ফিমার ও টিবিয়া লম্বা ও কাঁটাযুক্ত। টার্সাস তিনটি ছোট উপখণ্ডকে বিভক্ত, প্রতিটি খণ্ডকে **টার্সোমিয়ার** (tarsomeres) বলে। প্রথম টার্সোমিয়ারের অঙ্কীয় দিকে **প্লান্টুলা** (plantula) নামক তিনটি নরম আসঞ্জন প্যাড থাকে। তৃতীয় টার্সোমিয়ারের প্রান্তে দুটি সুচালো ও বাঁকানো **নখর** (claws) থাকে। নখরদ্বয়ের মাঝে **পালভিলাস** (pulvilus) থাকে।

ঘাসফড়িং-এর সকল পায়ের গঠন একরকম নয়। এদের বক্ষের শেষ খণ্ডের বা পশ্চাৎবক্ষের (metathorax) পা দুটির ফিমার অংশ বিশেষভাবে লম্বা ও মাংসল হয়, যা লাফিয়ে চলার উপযোগী। এ ধরনের পাকে **স্যালটাটোরিয়াল পা** (saltatorial legs) বলে। ঘাসফড়িং-এর পা হাঁটা, আরোহণ ও খাদ্য ধরতে ব্যবহৃত হয়।

❐ **ডানা** (Wings) : পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এর মধ্যবক্ষ এবং পশ্চাৎবক্ষের পৃষ্ঠীয়তলে এক জোড়া করে মোট দুই জোড়া কিউটিকল নির্মিত **ডানা** বা পাখা সংযুক্ত থাকে। **মধ্যবক্ষীয় ডানা** (mesothoracic wings) বা **অগ্রডানা** (fore wings) উড়তে ব্যবহৃত হয় না। এ ডানা জোড়া সরু ও শক্ত এবং পশ্চাৎ ডানা অপেক্ষা বড়। এটি সমভাবে বর্ণময় বা দাগান্বিত থাকে। এরা **পশ্চাৎবক্ষীয় ডানা** (metathoracic wings) বা **পশ্চাৎ ডানাদ্বয়কে** (hing wings) আবৃত করে রাখে। সেজন্য এগুলোকে **এলিট্রা** (elytra) বা **ডানার আবরণ** (wings covers) বা **ট্যাগমিনা** (tegmina) বলে।



চিত্র ২.২.৫ : ঘাসফড়িং এর ডানা

পশ্চাৎ ডানাদ্বয় পাতলা, ঝিল্লিময় (membranous), বড় ও প্রশস্ত এবং এরা উড্ডয়নে ব্যবহৃত হয়। বিশ্রামের সময় পেছনের ডানা ভাঁজ করা অবস্থায় অগ্রডানা দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতিটি ডানা অসংখ্য ছোট নালির মতো ও রক্তে পূর্ণ শিরা-উপশিরায় গঠিত।

৩। **উদর** (Abdomen) : ঘাসফড়িং-এর উদর সরু ও লম্বা। উদর ১১টি খণ্ডক নিয়ে গঠিত। উদরের প্রতিটি খণ্ডের পৃষ্ঠীয়দেশে **টার্গাম** ও অঙ্কীয়দেশে **স্টার্নাম** থাকে, কিন্তু পার্শ্বে প্লিউরন নেই। ১ম উদরীয় খণ্ড অসম্পূর্ণ, কারণ এতে স্টার্নাম পশ্চাৎবক্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এতে শুধু **টার্গাম** অবস্থিত। এর পাশে **টিম্পানিক পর্দা** (tympanic membrane) বা টিমপেনাম (tympanum) অবস্থিত। এ পর্দা শ্রবণথলিকে (auditory sac) আবৃত করে রাখে।



চিত্র ২.২.৬ : ঘাসফড়িং এর উদর

১ম উদর খণ্ড থেকে ৮ম উদর খণ্ডকের প্রতিপার্শ্বে একটি করে মোট আট জোড়া **শ্বাসরন্ধ্র** বা **স্পাইরাকল** (spiracles) থাকে। ঘাসফড়িংয়ের শেষ উদরীয় খণ্ডকটি সঙ্গমের জন্য অথবা ডিম পাড়ার জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত হয়। পুরুষে এটি গোলাকার, কিন্তু স্ত্রীতে সুঁচালো। উভয় ক্ষেত্রে নবম ও দশম খণ্ডকের টার্গা আংশিকভাবে একীভূত হয়। পুরুষের একাদশ খণ্ডকের টার্গামটি পায়ুর উপরে **সুপ্রা-অ্যানাল প্লেট** (supra anal plate) গঠন করে। এদের ১০ম খণ্ডকের উভয় পাশে একটি করে **অ্যানাল সার্কাস** (anal circus; pl.-cerci) থাকে। এদের ৯ম খণ্ডকের স্টার্নামটি লম্বাটে ও বাঁকা হয়ে পৃষ্ঠীয় দিকে দুটি **সাব-জেনিটাল প্লেট** (sub genital plate) গঠন করে পুং জনন ছিদ্রকে (genetal apperatus) ঘিরে রাখে। ফলে উদর কিছুটা **মোচড়ানো** থাকে। স্ত্রীতে ৯ম খণ্ডকের স্টার্নামটি প্রলম্বিত ও উদরের শেষ প্রান্তে বিভক্ত হয়ে তিন জোড়া **কাইটিনময় প্লেট** (chitinous plate) তৈরি করে। এরা এক্ষেত্রে **ওভিপজিটর** (ovipositor) নামক একটি গঠন সৃষ্টি করে। এটি ডিম পাড়ার জন্য বিশেষ উপযোগী।

পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পুরুষ ঘাসফড়িং	স্ত্রী ঘাসফড়িং
১। আকার	পুরুষ ঘাসফড়িং তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট। উদর সরু।	স্ত্রী ঘাসফড়িং তুলনামূলকভাবে আকারে বড় এবং উদর প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা।
২। উদর	উদরের অগ্রভাগ গোলাকার, নবম খণ্ডকের স্টার্নাম, লম্বাটে এবং সঙ্গমাঙ্গকে আবৃত করে থাকে। ফলে উদর সামান্য মোচড়ানো থাকে।	উদর সরু এবং ডিম পাড়ার জন্য কয়েকটি জনন উপাঙ্গ এ অংশের সাথে সংযুক্ত থাকে।
৩। জনন ছিদ্র	উদরের ৯ম খণ্ডাংশে পুংজনন ছিদ্র বিদ্যমান।	উদরের ৮ম ও ৯ম খণ্ডাংশ মিলে জননছিদ্র গঠন করে।
৩। ডানা	উদর আবৃত করে কিছুটা বর্ধিত থাকে।	পাখনা দেহের উদর অঞ্চলের পশ্চাতে বর্ধিত নয়।
৪। অ্যানাল সারকি	দশম খণ্ডকে অ্যানাল সারকি (anal circi) থাকে।	থাকে না।
৫। ওভিপোজিটর	থাকে না।	থাকে।

❐ **কাজ :** ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গগুলোর চিহ্নিত চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর।

2020/8/4 12:51

Scanned with CamScanner

পরিপাকতন্ত্র ও পরিপাক পদ্ধতি (Digestive system and process of digestion)

যে তন্ত্র দ্বারা প্রাণী খাদ্যগ্রহণ, খাদ্য পরিপাক, খাদ্যসার শোষণ ও অপাচ্য অংশ দেহ হতে নিষ্কাশন করে তাকে পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র বলে। ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র খাদ্যাভ্যাসের সাথে অভিযোজিত। ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র প্রধানত **পৌষ্টিকনালি** ও **পৌষ্টিকগ্রন্থি** এবং কয়েকটি সহকারী অঙ্গ নিয়ে গঠিত। ছকে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ উপস্থাপন করা হলো।

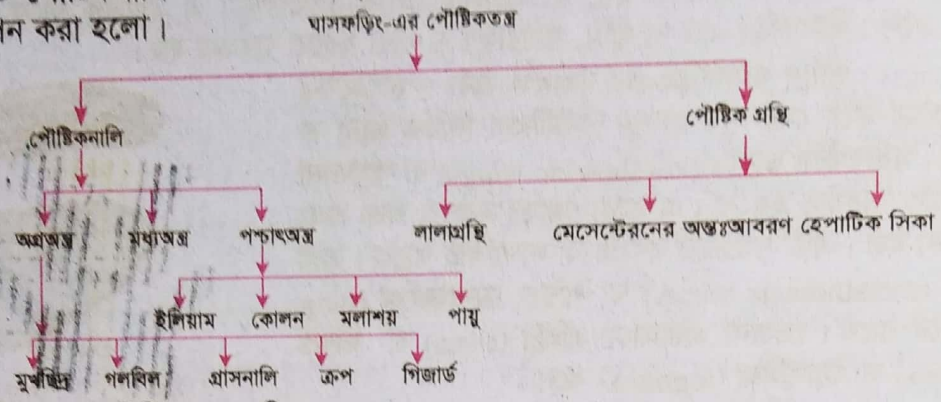

ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিম্নরূপ :

(১) পৌষ্টিকনালি (Alimentary canal) : ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকনালি সরল প্রকৃতির এবং মুখবিবর থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত পেঁচানো ও লম্বা নলাকৃতির নালিকে পৌষ্টিকনালি বলে। অর্থাৎ যে নালি ঘাসফড়িংয়ের মুখছিদ্র হতে শুরু করে দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত থেকে পায়ু ছিদ্রে শেষ হয় তাকে পৌষ্টিকনালি বলে। পৌষ্টিকনালির তিনটি অংশ রয়েছে। যথা– **স্টোমোডিয়াম** বা **অগ্রঅন্ত্র, মেসেন্টেরন** বা **মধ্যঅন্ত্র** ও **প্রোক্টোডিয়াম** বা **পশ্চাৎঅন্ত্র**।

(ক) স্টোমোডিয়াম বা অগ্রঅন্ত্র (Stomodaeum or foregut) : এটি মুখছিদ্র থেকে গিজার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। স্টোমোডিয়ামের অন্তঃপ্রাচীর **কাইটিন** (chitin) দ্বারা আবৃত থাকায় বেশ শক্ত ও পুরু হয় এবং এটি এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত। এর অংশগুলো নিম্নরূপ :



চিত্র ২.২.৭ক : ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র

১। মুখছিদ্র (Mouth opening) : ঘাসফড়িং-এর মুখছিদ্র ক্ষুদ্র এবং মুখোপাঙ্গ সমন্বিত। মুখছিদ্রটি **প্রাক্-মুখগহ্বর বা** প্রিওরাল প্রকোষ্ঠ (preoral cavity) বা **সিবেরিয়ামের** (cibarium) গোড়ায় অবস্থিত।

কাজ : সিবেরিয়ামে খাদ্যবস্তু গৃহীত হয় এবং মুখছিদ্রের মাধ্যমে গলবিলে প্রবেশ করে।

২। গলবিল (Pharynx) : মুখছিদ্র ও গ্রাসনালির মাঝের সংক্ষিপ্ত, নলাকার অংশ এবং এটি পেশিবহুল। এতে মুখছিদ্র উন্মুক্ত হয়।

কাজ : এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রাসনালিতে প্রবেশ করে।

৩। গ্রাসনালি (Oesophagus) : গলবিলের পরবর্তী সরু নলাকার ও লম্বা অংশটি হলো গ্রাসনালি। গলবিল ও গ্রাসনালির সংযোগস্থলে **পেশিবলয়** বা স্ফিংক্টার (sphincter) থাকে। এটি গ্রীবার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে বক্ষগহ্বরে ক্রপের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

কাজ : খাদ্যবস্তু মুখ থেকে বহন করে ক্রপে পৌঁছায়।

৪। ক্রপ (Crop) : গ্রাসনালির শেষভাগ ক্রমশ স্ফীত হয়ে একটি কনিকেল আকৃতির থলে গঠন করে। একে ক্রপ বলে। ক্রপ অগ্রঅন্ত্রের সর্ববৃহৎ অংশ। এর প্রাচীর পাতলা এবং পেশিবহুল।

কাজ : ক্রপে গৃহীত খাদ্যবস্তু সাময়িকভাবে জমা থাকে এবং খাদ্যের সাথে লালা মিশ্রিত হয়। এছাড়াও এর সংকোচন- প্রসারণে খাদ্য কিছুটা চূর্ণ হয় এবং লালাস্থ এনজাইম পরিপাকের সূত্রপাত ঘটায়।

৫। গিজার্ড বা প্রোভেন্ট্রিকুলাস (Gizzard or Proventriculus) : গিজার্ড ক্রপের পরবর্তী শক্ত, পেশিবহুল, পুরু প্রাচীরযুক্ত ত্রিকোণাকার বা ভালবের ন্যায় অংশ। এটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা– অগ্র অংশ বা **আর্মারিয়াম** (armarium) ও পশ্চাৎ অংশ বা **স্টোমোডিয়াল কপাটিকা** (stomodaeal valve)। অগ্র অংশের অন্তঃপ্রাচীরে কাইটিন নির্মিত ছয়টি **দাঁত** ও ছয়টি অনুলম্ব **ভাঁজ** থাকে। এ ছাড়া ছয়টি পাতলা **প্লেট**, ব্রিসলযুক্ত ছয়টি **প্যাড** বা **কুশন** (pad or cushion) এবং সূক্ষ্ম **ব্রিসল** (bristle) বা রোম বিদ্যমান থাকে। গিজার্ডের পশ্চাৎ অংশ ক্রমশ সরু হয়ে স্টোমোডিয়াল কপাটিকার মাধ্যমে মধ্যঅন্ত্র বা মেসেন্টেরনে উন্মুক্ত হয় এবং সরু টিউবের মতো অবস্থান করে।



চিত্র ২.২.৭খ : ঘাসফড়িং-এর গিজার্ডের প্রস্থচ্ছেদ

Scanned with CamScanner

কাজ : গিজার্ডের কাইটিন নির্মিত দাঁত সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে শক্ত খাদ্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। ব্রিসল ছাঁকনির মতো কাজ করে। কপাটিকা খাদ্যের বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

(খ) মেসেন্টেরন বা মধ্যঅন্ত্র (Mesenteron or midgut) : গিজার্ডের পরবর্তী ইলিয়াম পর্যন্ত বিস্তৃত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট সরু নলাকার অংশটিকে **মেসেন্টেরন** বা মধ্যঅন্ত্র বলে। এটি ভ্রূণীয় এন্ডোডার্ম থেকে উদ্ভূত হয় এবং এর অন্তঃপ্রাচীর **পেরিট্রোফিক পর্দা** (peritrophic membrane) দ্বারা আবৃত কিন্তু এতে কিউটিকল থাকে না। মেসেন্টেরনের অগ্র ও পশ্চাৎ প্রান্তে **পেশিলয়** বা **স্ফিংক্টার** (sphincter) থাকে। গিজার্ড ও মেসেন্টেরনের সংযোগস্থলকে **কার্ডিয়া** (cardia) বলে। এ স্থান হতে ৬ জোড়া ফাঁপা, লম্বা, মোচাকৃতির ন্যায় থলে বা আঙুলের মতো প্রবর্ধন বের হয় এদের **হেপাটিক সিকা** (hepatic caeca) বা **গ্যাস্ট্রিক সিকা** (gastric caeca) বা **মেসেন্টেরিক সিকা** (mesenteric caeca) বলে। প্রতি জোড়া হেপাটিক সিকা একটি সামনের দিকে অপরটি পেছন দিকে প্রসারিত থাকে। হেপাটিক সিকার অগ্রপ্রান্ত বদ্ধ এবং পশ্চাৎপ্রান্ত উন্মুক্ত হয় মধ্যঅন্ত্রে। এরা পাচক রস নিঃসরণ করে পরিপাকে সহায়তা করে। মেসেন্টেরন ও হেপাটিক সিকার অন্তঃপ্রাচীর স্তম্ভাকার বা কলামনার এন্ডোডার্মাল কোষে (columnar endodermal cells) গঠিত এবং এটি ভাঁজ খেয়ে অসংখ্য **ভিলাই** (villi) গঠন করে। মেসেন্টেরনের শেষ অংশে অসংখ্য সূক্ষ্ম চুলের মতো হলুদাভ-সবুজ বর্ণের **মালপিজিয়ান নালিকা** (malpighian tubules) থাকে যারা মূলত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।



চিত্র ২.২.৭গ : ঘাসফড়িং-এর স্টোমোডিয়াম ও মেসেন্টেরনের লম্বচ্ছেদ

কাজ : মেসেন্টেরনের গহ্বরে বা লুমেনে খাদ্যবস্তুর পরিপাক হয় এবং পরিপাককৃত খাদ্য এর প্রাচীরে অবস্থিত ভিলাই দ্বারা শোষিত হয়।

(গ) প্রোক্টোডিয়াম বা পশ্চাৎঅন্ত্র (Proctodaeum or hindgut) : মধ্যঅন্ত্রের শেষাংশ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত অংশটি হলো প্রোক্টোডিয়াম বা পশ্চাৎঅন্ত্র। এটি এক্টোডার্ম উদ্ভূত এবং এর অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকল দিয়ে আবৃত। মেসেন্টেরন ও পশ্চাৎঅন্ত্রের সংযোগস্থলে মূলত মালপিজিয়ান নালিকাগুলো অবস্থান করে। **ইলিয়াম, কোলন, মলাশয়** এবং **পায়ু** এই চারটি অংশ নিয়ে পশ্চাৎঅন্ত্র গঠিত।

১। **ইলিয়াম** (Ileum) : ইলিয়াম প্রোক্টোডিয়ামের প্রথম অংশ। এটি প্রশস্ত নলাকার এবং পাতলা প্রাচীরবেষ্টিত। রোমযুক্ত অনুদৈর্ঘ্য ভাঁজে এর অন্তঃপ্রাচীর গঠিত।

কাজ : ইলিয়ামের প্রাচীরে পরিপাকৃত খাদ্যসার ও কিছু পানি শোষিত হয়।

২। **কোলন** (Colon) : ইলিয়ামের পরবর্তী সরু ও নলাকৃতির অংশকে কোলন বলে। এর অন্তঃপ্রাচীর অনিয়মিত ভাঁজযুক্ত।

কাজ : এখানে পাচিত খাদ্যবস্তুর অবশিষ্টাংশ পানিসহ এবং খনিজ লবণ শোষিত হয়।

৩। **মলাশয় বা রেকটাম** (Rectum) : কোলনের পরবর্তী স্ফীত ও প্রশস্ত পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট অংশকে রেকটাম বা মলাশয় বলে। এর অন্তঃপ্রাচীরে ছয়টি অনুদৈর্ঘ্য ভাঁজ থাকে। এদের **রেক্টাল প্যাপিলি** বা **রেক্টাল গ্রন্থি** (rectal papillae or rectal gland) বলে। এগুলো মল থেকে অতিরিক্ত পানি শোষণের উপযোগী।



চিত্র ২.২.৭ঘ : ঘাসফড়িং-এর মলাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

কাজ : এটি মল থেকে অতিরিক্ত পানি, খনিজ লবণ ও অ্যামিনো এসিড শোষণ করে অর্থাৎ অসমোরেগুলেশনে সাহায্য করে। অপাচ্য খাদ্যবস্তু সাময়িক জমা রাখে।

৪। **পায়ু** (Anus) : মলাশয়ের শেষপ্রান্ত দেহের বাইরে একটি ছিদ্র দ্বারা উন্মুক্ত থাকে, একে পায়ু বলে। এটি দেহখণ্ডকের অঙ্কদেশে উন্মুক্ত হয়। এতে স্ফিংটার পেশি থাকে।

কাজ : মল (faeces) নির্গত করা এর প্রধান কাজ।

(২) পৌষ্টিক গ্রন্থি (Digestive glands) : যে সকল গ্রন্থির ক্ষরিত রস পরিপাকে সাহায্য করে তাদের **পৌষ্টিক গ্রন্থি** বলে। ঘাসফড়িং-এর লালাগ্রন্থি, হেপাটিক সিকা এবং মেসেন্টেরন অন্তঃআবরণ পৌষ্টিক গ্রন্থির কাজ করে। এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ–

(ক) লালাগ্রন্থি (Salivary glands) : ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিক গ্রন্থি বলতে ক্রপের নিচে ক্ষুদ্র একজোড়া নলাকার ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত লালাগ্রন্থিকেই (salivary glands) বোঝায়। লালাগ্রন্থির নালি ল্যাবিয়ামের গোড়ায় গলবিলে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারস (saliva) খাদ্য গলাধঃকরণ ও চর্বণে সাহায্য করে। কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকেও এটি ভূমিকা রাখে।

2020/8/4 12:51

Scanned with CamScanner

(খ) মেসেন্টেরন অন্তঃআবরণ : মেসেন্টেরন বা মধ্যঅন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান গ্রন্থিকোষ বা নিঃস্রাবী কোষ (secretary cells) থেকেও পরিপাক সহায়ক এনজাইম নিঃসৃত হয়।

কাজ : এটি থেকে নিঃসৃত পাচকরস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয়।

(গ) হেপাটিক সিকা (Hepatic caeca) **:** অগ্র ও মধ্য পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অবস্থিত কোন (cone) আকৃতির ৬ জোড়া লম্বা স্বচ্ছ নালিকাকে হেপাটিক বা গ্যাস্ট্রিক সিকা বলে।

কাজ : হেপাটিক সিকার অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত ক্ষরণকারী কোষ থেকে পাচকরস নিঃসৃত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

খাদ্য, খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ পদ্ধতি (Food, Feeding, Digestion & Absorption)

১। খাদ্য (Food) **:** ঘাসফড়িং তৃণভোজী বা **শাকাশী** (herbivorous) প্রাণী। খাদ্য হিসেবে এরা ঘাস, শাকসবজি, শস্যদানাসহ ফসলি উদ্ভিদের পাতাকে গ্রহণ করে থাকে। এদের খাদ্যে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় সকল উপাদানই বিদ্যমান।

২। খাদ্যগ্রহণ (Ingestion) **:** খাদ্যগ্রহণের সময় মুখোপাঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গ **চর্বণ বা ম্যান্ডিবুলার** (chewing or mandibular) প্রকৃতির। এরা সাধারণত খাদ্যবস্তু চিবিয়ে খায়। প্রথমেই আন্টেনা, ল্যাবিয়াল পাল্প এবং ম্যাক্সিলারি পাল্প ইত্যাদির সাহায্যে খাদ্য নির্বাচন করে। খাদ্যবস্তু গ্রহণের কাজে অগ্রপদ, ল্যাব্রাম ও ল্যাবিয়াম সহায়তা করে। ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলি খাদ্যবস্তুকে কর্তন ও পেষণ করে। কর্তিত ও পেষিত খাদ্যকণা প্রাক্-মুখগহ্বরে (preoral cavity) পৌঁছানোর পরই লালারসের সাথে মিশ্রিত হয় এবং সেখান থেকে গলবিল ও গ্রাসনালির মাধ্যমে ক্রপে এসে অস্থায়ীভাবে জমা হয়। ক্রপ থেকে লালামিশ্রিত খাদ্য যখন গিজার্ডে প্রবেশ করে তখন গিজার্ডের দাঁতগুলোর সাহায্যে খাদ্যবস্তু চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমৃদ্ধ **পেস্ট** (paste)-এ পরিণত হয়। এগুলো গিজার্ডে বিদ্যমান ব্রিসল বা সূক্ষ্ম রোমের সাহায্যে ছাঁকা হয়ে মেসেন্টেরনে বা মধ্যঅন্ত্রে প্রবেশ করে।

৩। পরিপাক (Digestion) **:** ঘাসফড়িং যখন খাদ্য চর্বণ করে তখন লালারস মিশ্রিত হয়, ফলে খাদ্যের পরিপাক প্রাক্-মুখগহ্বরেই শুরু হয়। ক্রপে থাকাকালীন খাদ্যের আংশিক পরিপাক সম্পন্ন হয়। গিজার্ডে খাদ্যের কোনো পরিপাক ঘটে না। তবে এটি খাদ্যকে সূক্ষ্ম কণায় পরিণত করে। গিজার্ড থেকে খাদ্য মেসেন্টেরনে প্রবেশ করলে হেপাটিক সিকা এবং মেসেন্টেরনের অন্তঃআবরণী থেকে নিঃসৃত পাচক রসের প্রভাবে খাদ্যবস্তুর পরিপাক ঘটে। খাদ্য মেসেন্টেরনে প্রবেশ করার পর **পেরিট্রফিক পর্দা** দ্বারা খাদ্যবস্তু আবৃত হয় এবং এর প্রাচীর শক্ত খাদ্যবস্তু থেকে রক্ষা পায়।

পরিপাকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া : লালারসে অ্যামাইলেজ, কাইটিনেজ ও সেলুলেজ এনজাইম থাকে যা বিভিন্ন ধরনের শর্করাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে। পরিপাক মূলত মেসেন্টেরনে ঘটে থাকে। ক্রপ ও গিজার্ড থেকে খাদ্যকণা মেসেন্টেরনে পৌঁছাবার পর হেপাটিক সিকা ও মেসেন্টেরন থেকে নিঃসৃত অ্যামাইলোলাইটিক (**অ্যামাইলেজ, মলটেজ, ল্যাক্টেজ, ইনভার্টেজ** প্রভৃতি), প্রোটিওলাইটিক (**পেপটাইডেজ, প্রোটিয়েজ, ট্রিপটেজ, ট্রিপসিন** প্রভৃতি) ও লাইপোলাইটিক (**লাইপেজ**) এনজাইমের কার্যকারিতায় খাদ্যবস্তু পরিপাক হয়ে সরল ও তরল খাদ্যরসে রূপান্তরিত হয়।

বিক্রিয়াসমূহ :

শর্করা (শ্বেতসার) $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ গ্লুকোজ

মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ

সেলুলোজ $\xrightarrow{\text{সেলুলেজ}}$ পরিপাককৃত সেলুলোজ

প্রোটিন ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{ট্রিপটেজ}}$ অ্যামিনো এসিড

স্নেহ বস্তু $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল

সুক্রোজ $\xrightarrow{\text{ইনভার্টেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

ল্যাক্টোজ $\xrightarrow{\text{ল্যাক্টেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ

প্রোটিন $\xrightarrow{\text{পেপটাইডেজ}}$ পেপটাইড + অ্যামিনো এসিড

প্রোটিন $\xrightarrow{\text{প্রোটিয়েজ}}$ অ্যামিনো এসিড

৪। খাদ্যসার শোষণ ও বহিষ্করণ (Absorption and Ejection) **:** হেপাটিক সিকা ও মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীরের শোষণকারী কোষ দ্বারা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রায় সকল খাদ্যসার শোষিত হয়। গ্লুকোজের অধিকাংশই হেপাটিক সিকাতে শোষিত হয়। শোষিত খাদ্যসার হিমোসিলে প্রবেশ করে সারা দেহে পরিবাহিত হয়। অপাচ্য খাদ্যবস্তু মলাশয়ে সাময়িকভাবে জমা থাকে। এখানে খাদ্যবস্তু থেকে পানি শোষিত হয় এবং মল তৈরি হয়। পরে মল পায়ুপথে বাইরে নির্গত হয়।

কাজ : ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র সবজি হজমে বেশ অভ্যস্ত– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : ঘাসফড়িং/আরশোলার মুখোপাঙ্গ পর্যবেক্ষণ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

পরীক্ষণের নাম : ঘাসফড়িং/আরশোলার পরিপাকতন্ত্র পর্যবেক্ষণ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

পরীক্ষণের নাম : আরশোলার লালাগ্রন্থি পর্যবেক্ষণ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

2020/8/4 12:52

Scanned with CamScanner

ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory System of Grasshopper)

সংবহনে সহায়তাকারী অঙ্গসমূহ নিয়ে যে তন্ত্র গঠিত তাকে **সংবহনতন্ত্র** বলে। অর্থাৎ যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত দেহের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয় তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। ঘাসফড়িং-এ রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুন্নত এবং মুক্ত বা ল্যাকুনার ধরনের। এদের কোনো শিরা, ধমনি বা কৈশিক জালিকা নেই। এদের রক্ত বাহিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয় না। হিমোসিলের মধ্যে রক্ত অবস্থান করে এবং হিমোসিলের শাখা বা সাইনাসের ভেতর দিয়ে রক্ত সংবহিত হয়। এজন্য এদের রক্ত সংবহনতন্ত্রকে **মুক্ত বা ল্যাকুনার ধরনের সংবহনতন্ত্র** (Open or lacunar type circulatory system) বলে। প্রাণিদেহে দু'ধরনের রক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়। যথা– **মুক্ত সংবহনতন্ত্র** ও **বদ্ধ সংবহনতন্ত্র**।

১। মুক্ত সংবহনতন্ত্র (Open circulatory system) : যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত নির্দিষ্ট নালির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ দেহগহ্বরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে মুক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। উদাহরণ : Arthropoda (ঘাসফড়িং, আরশোলা, চিংড়ি, মশা, মাছি ইত্যাদি) ও Mollusca (শামুক, ঝিনুক, অক্টোপাস ইত্যাদি) পর্বের সকল প্রাণীর রক্ত সংবহনতন্ত্র।

২। বদ্ধ সংবহনতন্ত্র (Closed circulatory system) : যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত সর্বদাই রক্তবাহিকা ও হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থেকে প্রবাহিত হয় এবং কোনো ক্রমেই দেহগহ্বরে মুক্ত হয় না তাকে বদ্ধ সংবহনতন্ত্র বলে। উদাহরণ : Annelida (কেঁচো, জোক ইত্যাদি) ও Chordata (মানুষ, বাঘ, গিনিপিগ, পাখি, সরীসৃপ, ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি) পর্বের সকল প্রাণীর রক্ত সংবহনতন্ত্র।

মুক্ত ও বদ্ধ রক্তসংবহনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র	বদ্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র
১। সংজ্ঞা	যে সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে হিমোলিম্ফ খোলা প্রান্ত বিশিষ্ট নালির মধ্য দিয়ে এবং দেহগহ্বরের (হিমোসিল) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে মুক্ত সংবহনতন্ত্র বলে।	যে সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত সর্বদাই বাহিকার মাধ্যমে বাহিত হয় তাকে বদ্ধ সংবহনতন্ত্র বলে।
২। বাহিকার প্রান্তদেশ	বাহিকাসমূহের প্রান্তদেশ মুক্ত।	বাহিকাসমূহের প্রান্তদেশ মুক্ত নয়।
৩। প্রবাহিত তরল পদার্থ	হিমোলিম্ফ পর্যায়ক্রমে বাহিকা ও দেহগহ্বরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।	রক্ত সর্বদাই বাহিকার মধ্যে আবদ্ধ থেকে প্রবাহিত হয়।
৪। প্রবাহিত তরল পদার্থের গতি	ধীরে প্রবাহিত হয়।	দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়।
৫। উদাহরণ	Arthropoda এবং Mollusca পর্বের প্রাণীদের রক্ত সংবহনতন্ত্র।	Annelida এবং Chordata পর্বের প্রাণীদের রক্ত সংবহনতন্ত্র।

ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র **হিমোলিম্ফ** বা **রক্ত, হিমোসিল** ও **হৃৎপিণ্ড** বা **হৃদযন্ত্র** নিয়ে গঠিত :

১। হিমোলিম্ফ (Haemolymph) বা **রক্ত** : ঘাসফড়িং-এর রক্ত **স্বচ্ছ ও বর্ণহীন**। এই বর্ণহীন রক্তধারা **দেহগহ্বর** বা **হিমোসিলে** পূর্ণ থাকে। রক্ত হিমোসিল নামক দেহগহ্বরে **লসিকার** (lymph) সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে বলে ঘাসফড়িংসহ বিভিন্ন পতঙ্গের রক্তকে **হিমোলিম্ফ** বলে। একটি ঘাসফড়িং-এর দেহের ওজনের ১৯% রক্ত থাকে। হিমোলিম্ফ দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত। যেমন–

(ক) রক্তরস (Plasma) : এটি রক্তের বর্ণহীন তরল অংশ। এতে পানির পরিমাণ ৭০%। এতে বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ, ফ্যাট, খাদ্যসার ও রেচন পদার্থ দ্রবীভূত থাকে।

(খ) রক্তকণিকা (Haemocytes) : ঘাসফড়িং-এর রক্তরসে বর্ণহীন **শ্বেতকণিকা** বা **হিমোসাইট** থাকে। এদের সংখ্যা প্রায় ৯ মিলিয়ন (প্রতি ঘন মিমি রক্তে ১৫-৬০ হাজার হিমোসাইট)। একটি হিমোসাইটে (স্বাভাবিক) একটি নিউক্লিয়াস থাকলেও অস্বাভাবিক অবস্থায় একাধিক নিউক্লিয়াস পরিলক্ষিত হয়। ঘাসফড়িং-এর হিমোসাইট তিন ধরনের, যথা– প্রোহিমোসাইট (prohaemocyte, 23%), পরিবর্তনশীল হিমোসাইট (transitional haemocyte, 68%) এবং বৃহৎ হিমোসাইট (large haemocytes, 9%)।

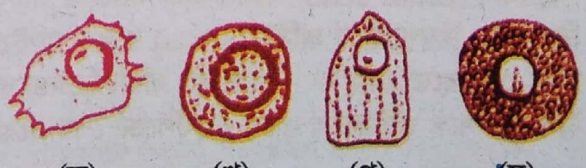

(ক) (খ) (গ) (ঘ)

চিত্র ২.২.৮ক : ঘাসফড়িংয়ের বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা
(ক) প্রোহিমোসাইট, (খ) প্লাজমাটোসাইট,
(গ) গ্রানুলোসাইট, (ঘ) স্ফেরিওল কোষ

2020/8/4 12:52

Scanned with CamScanner

Arnold (1972) এর মতে, ঘাসফড়িং-এর রক্তরসে চার ধরনের হিমোসাইট থাকে, যথা– প্রোহিমোসাইট (prohaemocyte), প্লাজমোটোসাইট (plasmotocyte), গ্রানুলোসাইট (granulocyte) এবং স্ফেরিওল কোষ (spheriol cell)। ঘাসফড়িং-এর রক্তের রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন বা অন্য কোনো **শ্বাসরঞ্জক** বা **শ্বসন রঞ্জক** (respiratory pigment) থাকে না, ফলে রক্ত বর্ণহীন রড এবং শ্বসনে অংশগ্রহণ করে না।

হিমোলিম্ফের কাজ : খাদ্যের সারাংশ, খনিজ লবণ ও হরমোনসহ বিভিন্ন রেচন পদার্থ পরিবহনে সহায়তা করে; সামান্য পরিমাণ CO_2 বহন করে; বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি জমা রাখে; হিমোসাইটগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে; রক্ত তঞ্চনে ও দেহের ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে; রক্তের পানি কোষীয় তরলের অভিস্রবণিক চাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। এ ছাড়াও ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন, ডানার সঞ্চালন এবং খোলস পরিবর্তনে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২। **হিমোসিল** (Haemocoel; Gr. *haema* = blood + *coel* = cavity) : ঘাসফড়িংসহ সকল সন্ধিপদী (arthropods) প্রাণীর দেহগহ্বর মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন পেরিটোনিয়ামে আবৃত থাকে না, রক্তে পূর্ণ এবং সংবহনতন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের রক্তপূর্ণ অপ্রকৃত দেহগহ্বরকে **হিমোসিল** বলে। ভ্রূণের সিলোম ও ব্লাস্টোসিল একত্রিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে হিমোসিল গঠন করে। এটি কতগুলো অনিয়ত ফাঁকা স্থান বা ল্যাকুনা বা সাইনাস (lacuna or sinus) নিয়ে গঠিত। এটি দেহের সম্মুখ থেকে পশ্চাৎ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং সকল উপাঙ্গে প্রসারিত থাকে। হিমোসিলে অবস্থিত পৌষ্টিকনালি, রেচনতন্ত্র ও জননতন্ত্র সরাসরি রক্তের সংস্পর্শে আসে। ইহা দুটি আনুভূমিক বা অনুদৈর্ঘ্য পর্দা, যথা– **পৃষ্ঠীয় পর্দা** (dorsal diaphragm) ও **অঙ্কীয় পর্দা** (ventral diaphragm) দ্বারা তিনটি গহ্বর বা **সাইনাসে** বিভক্ত। যথা–

(ক) **পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস বা পৃষ্ঠীয় সাইনাস** (Pericardial or dorsal sinus) : এটি পৃষ্ঠীয় পর্দার উপরে দেহের পৃষ্ঠদিকে অবস্থিত। এর মধ্যে হৃৎপিণ্ড অবস্থান করে।

(খ) **পেরিভিসেরাল সাইনাস বা মধ্য সাইনাস** (Perivisceral sinus or middle sinus) : এটি পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় পর্দার মাঝে দেহের মধ্যদেশীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এ সাইনাস সবচেয়ে বড় । এতে পৌষ্টিকনালি, রেচনতন্ত্র ও জননতন্ত্র অবস্থান করে। এছাড়াও প্রচুর চর্বিকোষ উপস্থিত থাকে।

(গ) **পেরিনিউরাল সাইনাস বা অঙ্কীয় সাইনাস বা পেরিস্টার্নাল সাইনাস** (Perineural sinus or ventral sinus or peristernal sinus) : এটি অঙ্কীয় পর্দার নিচে দেহের অঙ্কীয় দিকে অবস্থিত। এতে স্নায়ুরজ্জু অবস্থান করে। পর্দাগুলো ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় রক্ত এক সাইনাস হতে অন্য সাইনাসে সহজেই যাতায়াত করতে পারে। এদের অঙ্কীয় পর্দাটি পায়ের ভেতরেও বিস্তৃত থাকে।

কাজ : হিমোসিল দেহের সকল অন্তঃঅঙ্গ, রক্ত ও লসিকা ধারণ করে; এটি খাদ্যসার ও বর্জ্য পদার্থ পরিবহন করে।



চিত্র ২.২.৮খ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র

৩। **হৃৎপিণ্ড বা হৃদযন্ত্র** (Heart) : ঘাসফড়িং-এর হৃৎপিণ্ড দেহের পৃষ্ঠদেশে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে অবস্থান করে। ইহা সরু নলের মতো লম্বাটে। এটি বক্ষ ও উদরীয় অঞ্চলের পৃষ্ঠীয় দিকে লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে। হৃৎপিণ্ড পাতলা পর্দা বা **ডায়াফ্রাম** (diapram) দ্বারা দেহগহ্বর হতে পৃথক থাকে। হৃৎপিণ্ড সাতটি প্রকোষ্ঠে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে। হৃৎপিণ্ডের প্রথম প্রকোষ্ঠটির সম্মুখভাগ ক্রমশ সরু হয়ে একটি নলাকার অংশ গঠন করে। একে **সম্মুখ অ্যাওর্টা** বা **পৃষ্ঠীয় মহাধমনি** (dorsal aorta) বলে। এটি মস্তকের সাইনাসে উন্মুক্ত হয়। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের পার্শ্বীয় দিকে **একজোড়া** ছিদ্র বিদ্যমান। ছিদ্রগুলোকে **অস্টিয়া** (ostia) বলে। অস্টিয়ামে **কপাটিকা** (valve) থাকে যা রক্তকে শুধু হৃৎপিণ্ডে ঢুকতে দেয়; কিন্তু বের হতে দেয় না। হৃৎপিণ্ডটি ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত ত্রিকোণাকার **অ্যালারি পেশির** (alary muscle) সাহায্যে টার্গামের সঙ্গে আটকানো থাকে। হৃৎপিণ্ডের শেষ প্রকোষ্ঠটি **পশ্চাৎ অ্যাওর্টা** সৃষ্টি করে, যা পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

রক্তসংবহন প্রক্রিয়া (Mechanism of blood circulation)

যে পদ্ধতিতে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে গমন করে এবং সেখান হতে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে রক্ত সংবহন বলে। ঘাসফড়িংয়ের হৃৎপিণ্ড ও অ্যালারি পেশির সংকোচন-প্রসারণ ক্রিয়ায় দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ ঢেউয়ের মতো ক্রমাগত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।

2020/8/4 12:52

Scanned with CamScanner

ঘাসফড়িংয়ের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রতি মিনিটে 100 থেকে 110 বার।

❐ অ্যালারি পেশিসমূহের সংকোচনের ফলে রক্ত পেরিভিসেরাল সাইনাস হতে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে প্রবেশ করে।

❐ এ সময় হৃদযন্ত্রের প্রকোষ্ঠগুলোর প্রসারণের ফলে রক্ত অস্টিয়ার মাধ্যমে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস হতে হৃদযন্ত্রের গহ্বরে প্রবেশ করে।

❐ হৃদযন্ত্রের সকল প্রকোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হলে এর শেষ প্রকোষ্ঠ হতে একটি ধারাবাহিক সংকোচনী ঢেউ সামনের প্রকোষ্ঠগুলোর দিকে ধাবিত হয়। ফলে রক্ত সম্মুখ অ্যাওর্টার মাধ্যমে মস্তকের সাইনাসে প্রবেশ করে।

❐ এরপর রক্ত পশ্চাৎমুখী হয়ে পেরিভিসেরাল সাইনাসে ও শেষে পেরিনিউরাল সাইনাসে প্রবেশ করে দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়।

❐ অ্যালারি পেশির কার্যকারিতায় রক্ত পেরিভিসেরাল সাইনাস থেকে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে প্রবেশ করে এবং চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

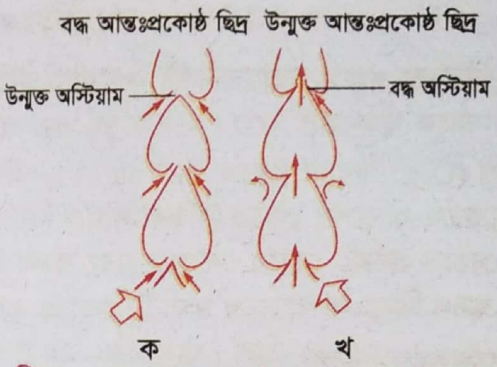

চিত্র ২.২.৮গ : (ক) হৃদযন্ত্রের প্রসারণ ও রক্ত পেরিকার্ডিয়াম হতে হৃদযন্ত্রে প্রবেশ এবং (খ) হৃদযন্ত্রের সংকোচন এবং রক্তের সম্মুখপ্রবাহ

ঘাসফড়িংয়ের সমগ্র দেহে একবার রক্তপ্রবাহ সম্পন্ন হতে 30 থেকে 60 মিনিট সময় লাগে। নিচে প্রবাহচিত্রে রক্ত সংবহন দেখানো হলো–



চিত্র ২.২.৮ঘ : ঘাসফড়িং-এর রক্তসংবহন প্রক্রিয়া

❐ **রক্তসংবহনের প্রবাহচিত্র :**

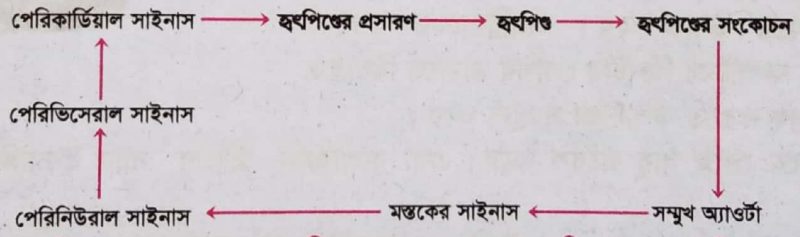

চিত্র : ২.২.৮ঙ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত প্রবাহের গতিপথের রেখাচিত্র

সিলোম ও হিমোসিলের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সিলোম	হিমোসিল
১। সংজ্ঞা	মেসোডার্ম থেকে সৃষ্ট পেরিটোনিয়াম নামক পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত দেহ প্রাচীর ও পৌষ্টিকনালির মাঝের ফাঁকা স্থানকে সিলোম বলে।	প্রাণীর দেহ প্রাচীর ও পৌষ্টিকনালির মধ্যবর্তী রক্তপূর্ণ গহ্বরকে হিমোসিল বলে।
২। ফাঁকা স্থানে থাকে	সিলোম সিলোমিক তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে।	হিমোলিম্ফ নামক তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে।
৩। রক্ত সংবহনে তন্ত্রের অংশ	রক্ত সংবহনতন্ত্রের অংশ গঠন করে না।	রক্ত সংবহনতন্ত্রের অংশ গঠন করে।
৪। পুষ্টি পদার্থ	পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয় না।	পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয়।
৫। কাজ	বিভিন্ন তন্ত্র ধারণ করে।	বিভিন্ন তন্ত্র ধারণ করে এবং হিমোলিম্ফ প্রবাহিত হয়ে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবহনে অংশ নেয়।
৬। উদাহরণ	Annelida-সহ Chordata পর্বভুক্ত প্রাণীতে পাওয়া যায়।	Mollusca ও Arthropoda পর্বের প্রাণীতে পাওয়া যায়।

❐ **কাজ :** (i) ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। (ii) ঘাসফড়িং-এর সংবহনতন্ত্রের সাথে মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রের পার্থক্য– বিশ্লেষণ কর।

Scanned with CamScanner

ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system of Grasshopper)

যে তন্ত্র শ্বসনে সহায়তাকারী অঙ্গসমূহ নিয়ে গঠিত এবং প্রাণিদেহ ও প্রকৃতির মধ্যে শ্বসন গ্যাস বিনিময়ে সাহায্য করে তাকে **শ্বসনতন্ত্র** বলে। ঘাসফড়িং-এর রক্তে কোনো শ্বাসরঞ্জক বা হিমোগ্লোবিন না থাকায় রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে (O_2) পরিবহন করতে পারে না। O_2 পরিবহনের এই অক্ষমতা পূরণের জন্য পরিবেশ থেকে গৃহীত O_2 সরাসরি দেহকোষে প্রবেশের ক্ষেত্রে ট্রাকিয়া নামক বিশেষ ধরনের সূক্ষ্ম শ্বাসনালির উদ্ভব ঘটেছে। এই শ্বাসনালিগুলোর মাধ্যমে O_2 দেহের প্রতিটি কোষে পৌঁছায় এবং শ্বসন ক্রিয়ায় উৎপন্ন CO_2 একই পথে দেহের বাইরে নির্গত হয়। ঘাসফড়িং-এর শ্বসন ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ট্রাকিয়া ও তার শাখা-প্রশাখা সম্মিলিতভাবে যে তন্ত্রের সৃষ্টি করে তাকে **ট্রাকিয়ালতন্ত্র** (trachaeal system) বলে। ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়াল তন্ত্র নিম্নলিখিত অংশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত–

(১) শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracle) : ১০ জোড়া; (২) শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া (Tracheae) : অসংখ্য; (৩) ট্রাকিওল কোষ (Tracheole cell) বা প্রান্তীয় কোষ: অসংখ্য; (৪) ট্রাকিওল (Tracheole) : অসংখ্য।

১। শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracles) : ঘাসফড়িং-এর দেহে বায়ু প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য মোট ১০ জোড়া শ্বাসরন্ধ্র থাকে। এদের মধ্যে দুই জোড়া শ্বাসরন্ধ্র বক্ষদেশ এবং অবশিষ্ট আট জোড়া উদর অঞ্চলে অবস্থিত। শ্বাসরন্ধ্রগুলো দেহের উভয় পাশের প্লিউরায় অবস্থিত। বক্ষদেশীয় শ্বাসরন্ধ্রের মধ্যে প্রথম জোড়া অগ্রবক্ষ ও মধ্যবক্ষের সংযোগস্থলে এবং দ্বিতীয় জোড়া মধ্যবক্ষ ও পশ্চাৎবক্ষের সংযোগস্থলে দেখা যায়। আট জোড়া উদরীয় শ্বাসরন্ধ্র প্রথম আটটি উদরীয় খণ্ডকের প্লিউরায় (pleura) অবস্থান করে। শ্বাসরন্ধ্রগুলো ডিম্বাকার ছিদ্র বিশেষ। এরা **পেরিট্রিম** (peritreme) নামক কাইটিন নির্মিত আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। শ্বাসরন্ধ্রের মুখে সূক্ষ্ম রোমযুক্ত ছাঁকনযন্ত্র থাকায় ধুলোবালি, জীবাণু, পানি ইত্যাদি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। বক্ষীয় শ্বাসরন্ধ্রগুলো সরাসরি ট্রাকিয়ায় উন্মুক্ত হলেও প্রতিটি উদরীয় শ্বাসরন্ধ্র ট্রাকিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পূর্বে **অ্যাট্রিয়াম** (atrium) নামক একটি ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত হয়। অ্যাট্রিয়ামের পেছনে কপাটিকা বিদ্যমান। এই কপাটিকা স্ফিংটার পেশির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্বাসরন্ধ্র খুলতে ও বন্ধ করতে কপাটিকা সাহায্য করে।



চিত্র ২.২.৯ক : একটি শ্বাসরন্ধ্র/স্পাইরাকল

কাজ : শ্বাসরন্ধ্র দিয়ে দেহে বায়ু প্রবেশ করে। এরা ধুলোবালি, জীবাণু, পানি ইত্যাদি দেহের ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

২। শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া (Tracheae) : ট্রাকিয়া ঘাসফড়িং-এর প্রধান শ্বসন অঙ্গ। অ্যাট্রিয়ামের পর থেকে দেহাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট স্থিতিস্থাপক কিউটিকল নির্মিত নালিগুলো **ট্রাকিয়া** নামে পরিচিত। ট্রাকিয়া বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সমগ্র দেহে জালিকাকারে বিন্যস্ত হয়। এগুলো ত্বকের অন্তঃপ্রবর্ধক হিসেবে গঠিত হয়। এদের প্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট। যথা–

(i) ট্রাকিয়ার অভ্যন্তরভাগে কিউটিকল নির্মিত স্তরটির নাম **ইন্টিমা** (intima)।

(ii) মধ্যস্থ স্তরটি চাপা বহুভুজাকার কোষ দ্বারা গঠিত **এপিথেলিয়াম** (epithelium)।

(iii) বাইরের স্তরটি একস্তর যুক্ত স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম নির্মিত **ভিত্তি ঝিল্লি** (basement membrane)।

প্রধান প্রধান ট্রাকিয়াগুলোর অভ্যন্তরে ইন্টিমা সর্পিলাকারে পেঁচিয়ে **টিনিডিয়া** (taenidia) নামক গঠন সৃষ্টি করে। টিনিডিয়া থাকার ফলে ট্রাকিয়া কখনো চুপসে যায় না।

ট্রাকিয়ার বিন্যাস : ঘাসফড়িং-এর দেহে ট্রাকিয়াগুলো জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকলেও এদের মধ্যে প্রধান কতগুলো নালি অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থভাবে বিন্যস্ত থাকে। এগুলোকে **ট্রাকিয়াল কাণ্ড** (tracheal trunk) বলে। ঘাসফড়িং-এর দেহে তিন জোড়া প্রধান ট্রাকিয়াল কাণ্ড উদরীয় গহ্বরের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে লম্বালম্বিভাবে বিন্যস্ত থাকে। যথা–

(i) পার্শ্বীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (lateral longitudinal tracheal trunk) – ১ জোড়া।

(ii) পৃষ্ঠীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (dorsal longitudinal tracheal trunk) – ১ জোড়া।

(iii) অঙ্কীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (ventral longitudinal tracheal trunk) – ১ জোড়া।

2020/8/4 12:52

Scanned with CamScanner

দেহের প্রতি পাশে অবস্থিত পার্শ্বীয় ট্রাকিয়াল কাণ্ড থেকে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয়দিকে কতগুলো **অনুপ্রস্থ ট্রাকিয়াল কাণ্ড** (transeverse tracheal trunk) সৃষ্টি হয়ে যথাক্রমে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় ট্রাকিয়াল কাণ্ডকে যুক্ত করে। ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্রের বিশেষত্ব হলো এদের ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালির কিছু শাখা প্রসারিত হয়ে বড়, ইন্টিমাবিহীন ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত বায়ুথলি (air sac) গঠন করে যেগুলো অতিরিক্ত বায়ু ধরে রাখে। বায়ুথলিগুলো সমগ্র দেহে অবস্থান করে। এটি শ্বসনের সময় উদরের সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ : ট্রাকিয়া সমগ্র দেহে শ্বসনিক গ্যাস পরিবহন করে।

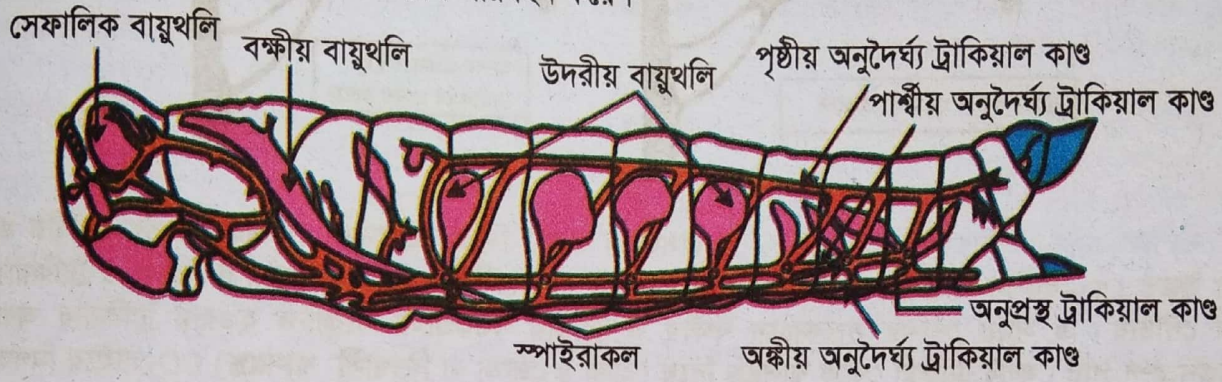

চিত্র ২.২.৯খ : ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়ালতন্ত্র (পার্শ্ব দৃশ্য)

৩। ট্রাকিওল কোষ (Tracheole cell) : প্রধান ট্রাকিয়াগুলো শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শাখা ট্রাকিয়া সৃষ্টি করে। প্রতিটি শাখা ট্রাকিয়ার শেষপ্রান্তে একটি বহুভুজাকার তারকাসদৃশ কোষ যুক্ত থাকে, একে **ট্রাকিওল কোষ** বলে। কোষগুলো কাইটিনে আবৃত নয় এবং সাধারণ কোষের মতো সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ও অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণু নিয়ে গঠিত। ট্রাকিয়ার শেষ প্রান্তে অবস্থান করে বলে এদের **প্রান্তীয় কোষও** বলে।

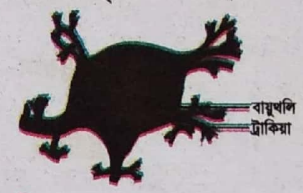

চিত্র : ২.২.৯ঘ : ঘাসফড়িং-এর একটি বায়ুথলি

কাজ : ট্রাকিওল কোষ থেকে ট্রাকিওল সৃষ্টি হয়।

৪। ট্রাকিওল (Tracheole) : ট্রাকিওল কোষ থেকে যেসব সূক্ষ্ম শাখা উৎপন্ন হয়ে দেহকোষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে তাদের নাম **ট্রাকিওল**। ট্রাকিওলের অন্তঃপ্রাচীরে ইন্টিমা ও টিনিডিয়া থাকে না। প্রত্যেক শাখার শেষপ্রান্তে **টিস্যুরস** বা **ট্রাকিওল রস** (tracheole sap) বা তরলে পূর্ণ **প্রান্তীয় থলি** (end sac) থাকে।

কাজ : দেহকোষে O_2 ও CO_2 বিনিময়ে ট্রাকিওল (ট্রাকিওল রস) বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

শ্বসন প্রক্রিয়া (Mechanism of Respiration)

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোষস্থ সরল খাদ্য জারিত হয়ে স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় ও CO_2 নির্গত হয় তাকে শ্বসন বলে। ঘাসফড়িংয়ের রক্তে **শ্বাসরঞ্জক** বা **হিমোগ্লোবিন** না থাকায় শ্বসনে রক্তের কোনো ভূমিকা নেই। এরা সরাসরি বায়ু থেকে O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করে। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ শ্বাসরন্ধ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঘাসফড়িং-এর প্রথম বক্ষীয় ও প্রথম উদরীয় শ্বাসরন্ধ্র জোড়া সর্বদা খোলা থাকে। কিন্তু অবশিষ্ট শ্বাসরন্ধ্রগুলো শ্বাস গ্রহণ করার সময় খোলে ও শ্বাসত্যাগের সময় বন্ধ থাকে।

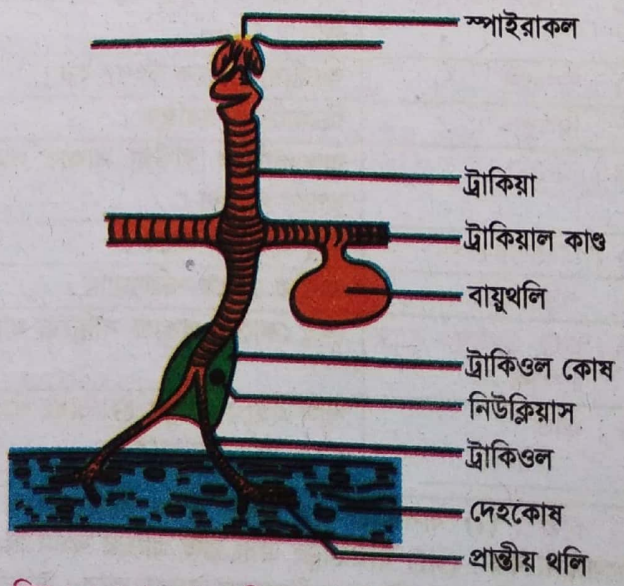

চিত্র ২.২.৯গ : ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়ালতন্ত্র (সরলীকৃত)

(ক) শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস (Inspiration) : শ্বাসগ্রহণ একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। পেশির প্রসারণে যখন বক্ষীয় ও উদরীয় খণ্ডকগুলো প্রসারিত হয় তখন ট্রাকিয়ার অভ্যন্তরের আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফলে O_2 যুক্ত বায়ু শ্বাসরন্ধ্রের(প্রথম ৪ জোড়া বা **প্রশ্বাসী শ্বাসরন্ধ্র**) মাধ্যমে অ্যাট্রিয়ামে ও পরে ট্রাকিয়ায় প্রবেশ করে। অতঃপর ট্রাকিয়ার শাখা-প্রশাখার মধ্য

Scanned with CamScanner

দিয়ে প্রান্তীয় কোষে আসে এবং ট্রাকিওল হয়ে অবশেষে প্রান্তীয় থলিতে পৌছায়। প্রান্তীয় থলিতে বিদ্যমান ট্রাকিওল রসে বায়ুস্থ O_2 দ্রবীভূত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহকোষে প্রবেশ করে।

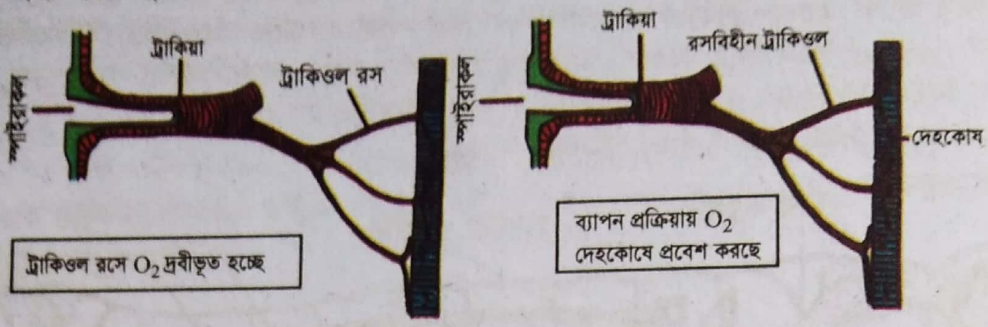

চিত্র ২.২.১০ক : ঘাসফড়িং-এর শ্বসন পদ্ধতি

(খ) শ্বাসত্যাগ বা নিঃশ্বাস (Expiration) : শ্বাসত্যাগ একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। O_2 গ্রহণের পর কোষীয় জারণের ফলে উদ্ভূত CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রান্তীয় থলিতে ট্রাকিওল রসে দ্রবীভূত হয় এবং পরে ট্রাকিওল ও ট্রাকিয়ায় CO_2 এসে পৌছায়। এ সময় পেশির সংকোচনে বক্ষীয় ও উদরীয় খণ্ডকগুলো সংকুচিত হওয়ায় ট্রাকিয়ার অভ্যন্তরের আয়তন হ্রাস পায়। ফলে ট্রাকিয়া থেকে শ্বাসরন্ধ্র দিয়ে (বাকি ৬ জোড়া বা **নিঃশ্বাসী শ্বাসরন্ধ্র**) CO_2 বাইরে নির্গত হয়।

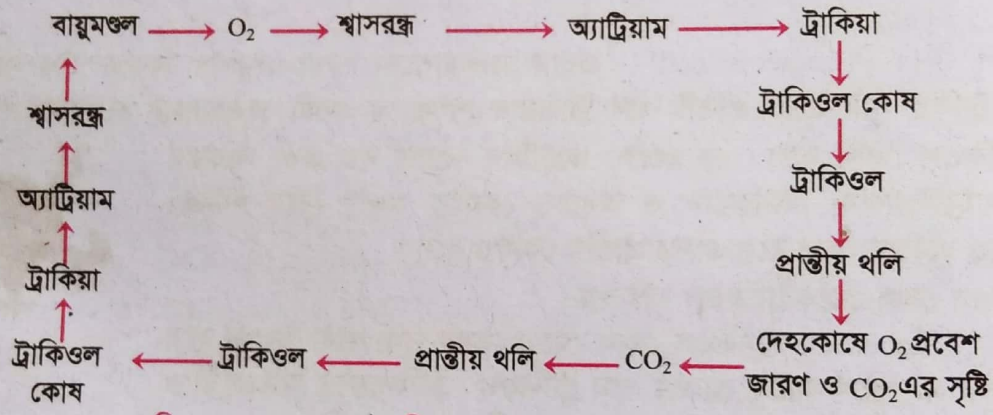

চিত্র ২.২.১০খ : ঘাসফড়িং-এর শ্বসনের গতিপথের প্রবাহচিত্র

ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ট্রাকিয়া	ট্রাকিওল
১। আকার-আকৃতি	শাখা-প্রশাখা যুক্ত বড় ব্যাসবিশিষ্ট নালি। ব্যাস প্রায় 2.5 μm।	শাখা-প্রশাখাবিহীন সূক্ষ্ম নালি; ব্যাস 1μm এর কম।
২। উৎপত্তি	অ্যাট্রিয়াম থেকে উৎপন্ন হয়।	ট্রাকিওল কোষ থেকে উৎপন্ন হয়।
৩। অবস্থান	হিমোসিলে অবস্থিত।	দেহকোষের নিবিড় সান্নিধ্যে অবস্থান করে।
৪। ইন্টিমা	অন্তঃপ্রাচীরে ইন্টিমা থাকায় বায়ুশূন্য অবস্থায় চুপসে যায় না।	অন্তঃপ্রাচীর ইন্টিমাবিহীন ফলে বায়ুশূন্য অবস্থায় চুপসে যায়।
৫। অভ্যন্তরভাগ	বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে।	তরলে পূর্ণ থাকে।
৬। পরিসমাপ্তি	প্রান্তীয় কোষে পরিসমাপ্তি।	দেহকোষে পরিসমাপ্তি।
৭। দেহ কোষের সাথে সম্পর্ক	দেহ কোষের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে থাকে না।	ট্রাকিওলের প্রান্তীয় থলি দেহকোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে।
৮। কাজ	শ্বাস গ্রহণের সময় O_2 এবং শ্বাসত্যাগের সময় CO_2 পরিবহন করে।	ব্যাপন ক্রিয়ায় O_2 ও CO_2 এর বিনিময়ে সাহায্য করে।

কাজ : (i) ঘাসফড়িং-এর প্রধান শ্বসন অঙ্গের গঠন বর্ণনা কর। (ii) ঘাসফড়িং-এর বিশেষ শ্বসন অঙ্গটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (iii) ঘাসফড়িং এবং রুই মাছের শ্বসন অঙ্গের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। (iv) ট্রাকিয়া এবং অ্যালভিওলাস দুটি ভিন্ন প্রাণীতে একই কাজ ভিন্নরূপে সম্পন্ন করে– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। (v) ট্রাকিয়া এবং অ্যালভিওলাস অঙ্গ দুটির মধ্যে তুলনা কর।

Scanned with CamScanner

ঘাসফড়িং-এর রেচনতন্ত্র (Excretory System of Grasshopper)

যে প্রক্রিয়ায় আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন (excretion) **বলে**। যে তন্ত্র দ্বারা প্রাণিদেহে নানা রকম বিপাকের ফলে উদ্ভূত ক্ষতিকারক নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয় তাকে **রেচনতন্ত্র** বলে। যেসব অঙ্গ রেচন কাজে সাহায্য করে তাদের **রেচন অঙ্গ** বলে। ঘাসফড়িং-এর হিমোলিম্ফের পানি, অজৈব লবণ ও নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। ঘাসফড়িং-এর সুসংগঠিত কোনো রেচনতন্ত্র নেই। অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় **মালপিজিয়ান নালিকা** এদের প্রধান রেচন অঙ্গ। এছাড়াও **নেফ্রোসাইট, ফ্যাটবডি, ইউরিকোজ গ্রন্থি, কিউটিকল** ও **নেফ্রোসাইট** আনুষঙ্গিক বা অতিরিক্ত রেচন অঙ্গ হিসেবে পরিচিত।

মালপিজিয়ান নালিকা (Malpighian tubules)

নালিকার নামকরণ : Macello Malpighi (1628-1694) নামক একজন ইতালীয় জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসক সর্বপ্রথম 1969 সালে এই নালিকা আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে এর নাম করা হয়েছে ম্যালপিজিয়ান নালিকা।

অবস্থান : মধ্যঅন্ত্র (মেসেন্টেরন) ও পশ্চাৎঅন্ত্রের (প্রোক্টোডিয়াম) সংযোগস্থলে সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় হালকা হলুদ বর্ণের কতগুলো নালিকা (প্রায় ১০০টি) গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এদের নাম **মালপিজিয়ান নালিকা**। মালপিজিয়ান নালিকাগুলো হিমোসিলের হিমোলিম্ফে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

গঠন : মালপিজিয়ান নালিকার মুক্ত প্রান্ত বদ্ধ এবং অপর প্রান্ত পৌষ্টিকনালির গহ্বরে উন্মুক্ত। মুক্ত প্রান্ত হিমোলিম্ফে নিমজ্জিত থাকে। প্রতিটি নালিকা প্রায় ২৫ মিলিমিটার লম্বা এবং প্রায় ১ মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত ফাঁপা, নলাকার ও শাখাবিহীন অঙ্গ। নালিকার ভেতরের গহ্বরকে **লুমেন** (lumen) বলে। মালপিজিয়ান নালিকার প্রাচীর একস্তরবিশিষ্ট এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত। নালিকার অন্তর্গাত্র গ্রন্থিময় এপিথেলিয়াম কোষযুক্ত। এই কোষগুলোর সিলিয়া নালিকার লুমেনের দিকে চক্রাকারে বিন্যস্ত হয়ে **ব্রাশ বর্ডার** (brush border) গঠন করে। নালিকার বহিঃপ্রাচীর যোজক কলা ও অনুদৈর্ঘ্য পেশিতন্তু নির্মিত **ভিত্তি পর্দা** (basement membrane) দিয়ে গঠিত। এরা হিমোলিম্ফ থেকে ইউরিয়া জাতীয় পদার্থ নিষ্কাশন করে পশ্চাৎঅন্ত্রে প্রেরণ করে। অতঃপর মলের সঙ্গে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

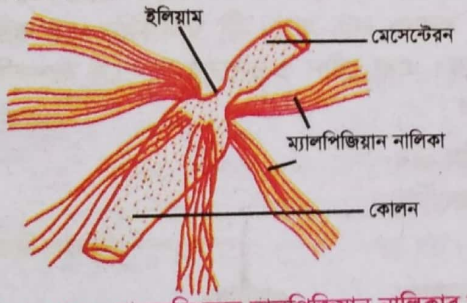

চিত্র ২.২.১১ক : ঘাসফড়িংয়ের মালপিজিয়ান নালিকার অবস্থান



চিত্র ২.২.১১খ : ঘাসফড়িং-এর মালপিজিয়ান নালিকার প্রস্থচ্ছেদ

মালপিজিয়ান নালিকার কাজ : ১। এটি হিমোসিলের হিমোলিম্ফ হতে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে অন্ত্রে প্রেরণ করে। ২। এরা দেহের অসমোরেগুলেশনে ভূমিকা রাখে।

রেচন পদার্থ : নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ মূলত অ্যামোনিয়া, ইউরেট, ইউরিক এসিড ইত্যাদি।

রেচন কৌশল বা প্রক্রিয়া (Mechanism of excretion) : প্রতিটি মালপিজিয়ান নালিকার পৌষ্টিকনালি সংলগ্ন গোড়ার অংশ ক্ষরণের জন্য এবং প্রান্তীয় অংশ শোষণের জন্য অভিযোজিত। এ নালিকার বদ্ধ প্রান্ত হিমোলিম্ফে ভাসমান অবস্থায় থেকে হিমোলিম্ফ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পটাশিয়াম ইউরেট, পানি ও CO_2 শোষণ করে। নালিকার মধ্যে এগুলো পরিবর্তিত হয়ে পটাশিয়াম বাইকার্বনেট, পানি ও ইউরিক এসিড তৈরি করে।

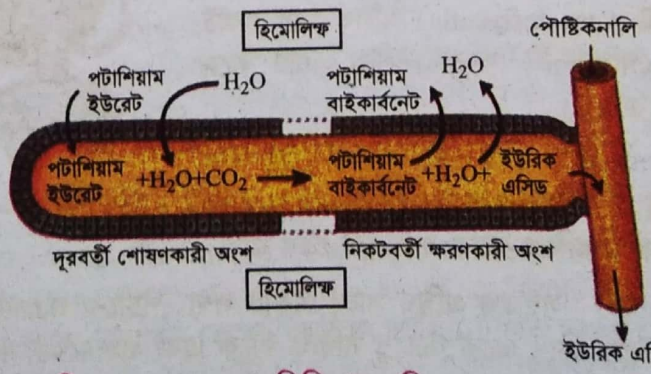

চিত্র ২.২.১১গ : মালপিজিয়ান নালিকার মধ্যে রেচন প্রক্রিয়া

Scanned with CamScanner

নালিকার গোড়ার অংশ দ্বারা পটাশিয়াম বাই কার্বনেট ও কিছু পানি পুনঃশোষিত হয়ে হিমোলিম্ফে ফিরে আসে। রেচন বর্জ্যরূপে ইউরিক এসিড সিলিয়ার আন্দোলনের ফলে মালপিজিয়ান নালিকার মধ্য দিয়ে পানির সাথে পৌষ্টিকনালিতে প্রবেশ করে এবং পশ্চাৎঅন্ত্রে গমন করে। মলাশয়ে অবস্থানকালে ইউরিক এসিড থেকে অতিরিক্ত পানি পরিশোষণের ফলে বিশুদ্ধ ইউরিক এসিড শক্ত দানা হিসেবে মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

সহকারী অন্যান্য রেচন অঙ্গ (Accessory Excretory other Organs)

১। **ফ্যাটবডি** (Fat body) : ঘাসফড়িং-এর ফ্যাটবডি বা চর্বিকোষ রেচনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ফ্যাটবডির কিছু **ইউরেট কোষের** (urate cell) মধ্যে ইউরেট আকারে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ জমা থাকে যা পরবর্তীতে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

২। **ইউরিকোজ গ্রন্থি** (Uricose gland) : পুরুষ ঘাসফড়িং-এর জননতন্ত্রের মাশরুম গ্রন্থিতে সরু লম্বাকৃতি এক ধরনের গ্রন্থি দেখা যায়। এগুলো হিমোলিম্ফ হতে রেচন পদার্থ ইউরিক এসিড হিসেবে সঞ্চয় করে রাখে। জননকোষ স্থানান্তরের সময় শুক্রাণুর সাথে এই ইউরিক এসিড দেহ থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। **কিউটিকল** (Cuticle) : ঘাসফড়িং যখন নিম্ফ অবস্থায় থাকে তখন তাদের দেহে তৈরি হওয়া রেচন পদার্থ কিউটিকলের নিচে এসে জমা হয়। খোলস পরিবর্তনের সময় এ রেচন পদার্থসহ কিউটিকল পরিবর্তিত হলে রেচন পদার্থগুলো দেহ থেকে মুক্ত হয়।

৪। **নেফ্রোসাইট** (Nephrocyte) : এ কোষগুলো পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে হৃদযন্ত্রের প্রতি পাশে সজ্জিত থাকে এবং দেহ থেকে রেচন পদার্থ সংগ্রহ করে রক্তের মাধ্যমে নিষ্কাশন করে।

ঘাসফড়িং-এর প্রজনন ও রূপান্তর (Reproduction and Metamorphosis)

প্রজননতন্ত্র (Reproductive System) : ঘাসফড়িং একলিঙ্গিক প্রাণী, এদের **যৌন দ্বিরূপতা** (sexual dimorphism) সুস্পষ্ট অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং শনাক্ত করা যায়। স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর **ওভিপজিটর** (ovipositor) দেখে সহজেই পুরুষ সদস্য থেকে আলাদা করা যায়। এরা যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এদের পুংজননতন্ত্র ও স্ত্রীজননতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিদেহে অবস্থান করে।

(ক) পুংজননতন্ত্র (Male reproductive system) : **ঘাসফড়িং**-এর পুংজননতন্ত্র শুক্রাশয়, শুক্রনালি, ক্ষেপণনালি, সহায়ক গ্রন্থি, শুক্রথলি, লিঙ্গ প্রভৃতি অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত।

১। **শুক্রাশয়** (Testis) : পুংজননতন্ত্রের মুখ্য সংগঠক একজোড়া শুক্রাশয় (testis)। শুক্রাশয় জোড়া ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম উদর খণ্ডকে অন্ত্রের ওপরে **মিডিয়ান লিগামেন্ট** (median ligament) দ্বারা পৃষ্ঠ প্রাচীরের সাথে আটকানো থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় অনেকগুলো ক্ষুদ্রাকার স্বচ্ছ **ফলিকল** (follicle) গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। শুক্রাশয়ের ফলিকলগুলোর মধ্যে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।

২। **শুক্রনালি** (Vas deferens) : প্রতিটি শুক্রাশয়ের অঙ্কীয় দিক হতে একটি সরু সূক্ষ্ম সুতার মতো লম্বা নালি উৎপন্ন হয়, একে শুক্রনালি বলে।

৩। **ক্ষেপণনালি** (Ejaculatory duct) : নবম উদর খণ্ডকে দু'পাশের দুটি শুক্রনালি বা ভাসা ডিফারেন্সিয়া (vasa deferentia) মিলিত হয়ে একটি সাধারণ ক্ষেপণনালি গঠন করে। ক্ষেপণনালি সংকোচনশীল। এটি লিঙ্গে অবস্থিত ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়।

৪। **সহায়ক গ্রন্থি** (Accessory gland) : লম্বা নালিগুচ্ছ সমন্বিত একজোড়া সহায়ক বা আনুষঙ্গিক গ্রন্থি ক্ষেপণনালির অগ্রভাগে উন্মুক্ত হয়ে তরল পদার্থ নিঃসৃত করে। এই তরলে শুক্রাণু নিমজ্জিত থাকে এবং পুষ্টি গ্রহণ করে।



চিত্র ২.২.১২ : ঘাসফড়িং-এর পুংপ্রজননতন্ত্র

৫। **শুক্রথলি** (Seminal vesicle) : সহায়ক গ্রন্থির সাথে একটি লম্বা পেঁচানো শুক্রথলি বা সেমিনাল ভেসিকল যুক্ত থাকে। এটি ক্ষেপণনালিতে উন্মুক্ত হয়। এতে শুক্রাণু সঞ্চিত থাকে এবং প্রজননের সময় ক্ষেপণনালিতে প্রবেশ করে স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ে স্থানান্তরে সহায়তা করে।

2020/8/4 12:53

Scanned with CamScanner

(খ) স্ত্রীজননতন্ত্র (Female reproductive system) : স্ত্রীজননতন্ত্র ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি, যোনি, শুক্রধানি বা স্পার্মাথিকা, স্ত্রীজনন রন্ধ্র ও সহায়ক বা আনুষঙ্গিক গ্রন্থি নিয়ে গঠিত।

১। ডিম্বাশয় (Ovary) : একজোড়া ডিম্বাশয় (ovaries) নিয়ে প্রধানত স্ত্রী প্রজননতন্ত্র গঠিত। ডিম্বাশয় দুটি অন্ত্রের ওপরে **মিডিয়ান লিগামেন্ট** (median ligament) দ্বারা পৃষ্ঠ প্রাচীরের সাথে আটকানো থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় নলের ন্যায় অনেকগুলো (৮টি) **অণুডিম্বাশয়** বা **ওভারিওল** (ovariole) নিয়ে গঠিত। অণুডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় এবং সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে।

২। ডিম্বনালি (Oviduct) : প্রতিটি ডিম্বাশয়ের ওভারিওলগুলোর বৃন্ত অংশ মিলিত হয়ে একটি প্রশস্ত ডিম্বনালি গঠন করে। ডিম্বনালি ডিম্বাণু বহন করে।

৩। যোনি (Vagina) : দু'পাশের দুটি ডিম্বনালি ৭ম উদরীয় খণ্ডকে মিলিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র, চওড়া পেশিময় নালি বা প্রকোষ্ঠ গঠন করে, একে যোনি বলে। এটি একটি স্ত্রী জননছিদ্রের মাধ্যমে ওভিপজিটর দ্বারা দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।

৪। শুক্রধানি (Spermatheca) : যোনিতে একজোড়া ডিম্বনালি ছাড়াও একটি কুণ্ডলীকৃত **স্পার্মাথিকাল নালি** যুক্ত থাকে। এ কুণ্ডলীকৃত নালির শেষ প্রান্তে একটি থলের ন্যায় শুক্রধানি বা **স্পার্মাথিকা** থাকে। এতে সঙ্গমকালে পুরুষ ঘাসফড়িং থেকে আগত শুক্রাণু সাময়িকভাবে জমা থাকে।

৫। সহায়ক গ্রন্থি (Accessory gland) : প্রতিটি ডিম্বাশয়ের উপরিভাগে একটি সহায়ক গ্রন্থি বা **কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি** (collaterial gland) রয়েছে যা ডিম্বনালির মাধ্যমে যোনিতে এসে সংযুক্ত হয়। এ গ্রন্থি নিঃসৃত আঠালো তরল ডিম পাড়ার সময় ডিমকে গুচ্ছাবদ্ধ রাখে।



চিত্র ২.২.১৩ : ঘাসফড়িং-এর স্ত্রী প্রজননতন্ত্র

জনন প্রক্রিয়া (Process of Reproduction)

প্রজনন হলো নতুন প্রজননক্ষম বংশধর সৃষ্টির প্রক্রিয়া। প্রজনন প্রধানত অযৌন ও যৌন এই দুই ধরনের হয়ে থাকে। কিন্তু ঘাসফড়িং যৌন (Sexual) প্রক্রিয়ায় প্রজনন ঘটায়। ঘাসফড়িং-এর প্রজনন প্রক্রিয়া নিচের কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়।



চিত্র ২.২.১৪ক : ঘাসফড়িং ডিম পাড়ছে এবং গর্তের ভেতর ডিমের গুচ্ছ

১। মিলন বা সঙ্গম (Copulation) : পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং মিলিত হয় গ্রীষ্মের শেষের দিকে। মিলনের সময় পুরুষ ঘাসফড়িং, স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর পিঠের উপর উঠে স্ত্রীকে আঁকড়ে ধরে। ফলে পুরুষ ঘাসফড়িং-এর শিশ্ন স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ করিয়ে সেখানে শুক্রাণু মিশ্রিত সেমিনাল ফ্লুইড ত্যাগ করে। ডিম না পাড়া পর্যন্ত শুক্রাণুগুলো স্ত্রী প্রাণীর **স্পার্মাথিকায়** (spermatheca) বা **শুক্রধানিতে** জমা থাকে। এভাবে ডিম পাড়ার পূর্ব পর্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রী ফড়িং কয়েকবার মিলিত হয়।

২। নিষেক (Fertilization) : ঘাসফড়িং-এ **অন্তঃনিষেক** ঘটে। ঘাসফড়িং-এর পরিপক্ব ডিম্বাণু ডিম্বনালি দিয়ে আসার সময় ভেতরের দিকে পাতলা **ভাইটেলিন পর্দা** (vitelline membrane) ও বাইরের দিকে শক্ত **কোরিয়ন** (chorion) দ্বারা আবৃত হয়। ডিম্বাণুটি ডিম্বনালি হয়ে যোনিতে নামলে স্পার্মাথিকা হতে শুক্রাণু কোরিয়নের একটি ছিদ্রপথ **মাইক্রোপাইল** (micropyle) এর মাধ্যমে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে। অতঃপর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে।

৩। ডিমপাড়া (Oviposition) : মিলনের পর স্ত্রী ঘাসফড়িং ডিম পাড়া শুরু করে। কিছুদিন পর পর ডিম পাড়ে এবং তা শরৎকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। ঘাসফড়িং-এর ডিমগুলো ৩-৫ মিলিমিটার লম্বা হয়। স্ত্রী ফড়িং ডিম পাড়ার সময় তার **ওভিপজিটর** দ্বারা মাটিতে প্রায় ১০ সে.মি. গভীর একটি গর্ত বা ছোট টানেল করে তাতে ডিম পাড়ে। একসঙ্গে গর্তে একটি স্ত্রী ফড়িং সাধারণত ২০টি ডিম গুচ্ছাকারে পাড়ে এবং ডিমগুলো আঠালো পদার্থ দ্বারা একটি গুচ্ছ তৈরি করে থাকে তাকে ডিম-পাত্র বা **এগপড** (egg-pod) বলে। একটি স্ত্রী ঘাসফড়িং ১০টি গুচ্ছে প্রায় ২০০টি ডিম পাড়ে। যৌন মিলন ও ডিম পাড়ার কিছুদিন পর পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং **মারা** যায়।

৪। ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন (Embryonic development) : ঘাসফড়িং-এর প্রতিটি ডিম্বাণু **সেন্ট্রোলেসিথাল** (centrolecithal) অর্থাৎ কুসুম ডিম্বাণুর কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকে। নিষিক্ত হওয়ার পর ডিমের ভেতর ভ্রূণের পরিস্ফুটন ঘটে। প্রায় ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত ভ্রূণের পরিস্ফুটন চলে এবং প্রতিকূল পরিবেশের জন্য অর্থাৎ শীতকালে পরিস্ফুটন বন্ধ

2020/8/4 12:53
Scanned with CamScanner

থাকে। এ অবস্থাকে **ডায়াপোজ** (diapause) বলে। ডায়াপোজ ঘাসফড়িংয়ের বিশেষ এক ধরনের অভিযোজন যার ফলে এদের শিশুগুলো প্রতিকূল পরিবেশের প্রচণ্ড শীত ও খাদ্যাভাবের হাত হতে রক্ষা পায়। **বসন্তের** আগমনে উষ্ণ পরিবেশ ফিরে পেলে পুনরায় পরিস্ফুটন শুরু হয় এবং ডিম থেকে শিশু ঘাসফড়িং বের হয়ে আসে যা **নিম্ফ** (nymph) নামে পরিচিত। নিম্ফ দেখতে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এর মতো। তবে এরা আকারে ছোট, **মাথাটি** দেহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড়, এতে **ডানা** থাকে না ও **জননাঙ্গ** অসম্পূর্ণ।

রূপান্তর (Metamorphosis)

যখন একটি ভ্রূণের পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্তি কয়েকটি পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনীয় ধাপের মাধ্যমে ঘটে তখন এ ধরনের ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুটনকে **রূপান্তর** বলে। রূপান্তর প্রধানত দুই প্রকার। যথা– **অসম্পূর্ণ রূপান্তর** ও **সম্পূর্ণ রূপান্তর**।

১। অসম্পূর্ণ রূপান্তর (Incomplete metamorphosis) : আকার, রং, ডানা ও জনন অঙ্গ ছাড়া যে রূপান্তরে অপরিণত অবস্থায় কোনো প্রাণী পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো দেখায় এবং বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপ নেয় তাকে **অসম্পূর্ণ রূপান্তর** বলে। অর্থাৎ যে রূপান্তরে একটি পতঙ্গ ডিম ফুটে বেরিয়ে কয়েকটি নিম্ফ দশা অতিক্রমের পর পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয় তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। এ রূপান্তরের শিশু প্রাণীকে **নিম্ফ** (nymph) বলে। এক্ষেত্রে রূপান্তরের ৩টি ধাপ দেখা যায় : **ডিম→ নিম্ফ→ পূর্ণাঙ্গ প্রাণী**। উদাহরণ– **ঘাসফড়িং**, তেলাপোকা ইত্যাদির রূপান্তর।

২। সম্পূর্ণ রূপান্তর (Complete metamorphosis) : যে রূপান্তরে শিশু অবস্থার প্রাণী ও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মধ্যে কোনোরূপ আঙ্গিক মিল থাকে না এবং ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশু প্রাণী পূর্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, সেরূপ রূপান্তরকে **সম্পূর্ণ রূপান্তর** বলে। এ রূপান্তরের শিশু প্রাণীকে **লার্ভা** (larva) বলে। এক্ষেত্রে রূপান্তরের ৪টি ধাপ দেখা যায় : **ডিম → লার্ভা→ পিউপা → ইমাগো (পূর্ণাঙ্গ প্রাণী)**। উদাহরণ– মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গের রূপান্তর।

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর **অসম্পূর্ণ** বা **হেমিমেটাবোলাস** (hemimetabolous) ধরনের কারণ এদের অপরিণত নিম্ফ আংশিক পরিস্ফুটনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এ রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ ঘাসফড়িংয়ের জীবন ইতিহাসে তিনটি ধাপ রয়েছে : **ডিম → নিম্ফ → পূর্ণাঙ্গ প্রাণী**।

ঘাসফড়িং-এর নিম্ফ শস্যজাতীয় সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃদ্ধিকালীন সময়ে এদের দেহের কাইটিন নির্মিত অনমনীয় খোলসটি বার বার ত্যাগ করে। এ প্রক্রিয়াকে **নির্মোচন** বা **মোল্টিং** বা **একডাইসিস** (moulting or ecdysis) বলে। দুটি খোলস বদলানোর বা মোল্টিং এর মধ্যবর্তী অবস্থাকে **ইনস্টার** (instar) বলে এবং এই মধ্যবর্তী সময়কালে ঘাসফড়িং-এর বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। এ সময় এদের **ডানা** গজায় ও **প্রজননতন্ত্র** বিকশিত হয়। নিম্ফ থেকে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং হওয়া পর্যন্ত ৫-৬ বার খোলস বদল করে। নিম্ফ থেকে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং সৃষ্টি হতে প্রায় দুই মাস সময় লাগে। ঘাসফড়িং-এর রূপান্তরের সময় নিম্ফের যে সকল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো- আকারে বৃদ্ধি পায় ও খোলস বদলাতে থাকে; দেহের বর্ণ ক্রমশ সবুজ হয়; ডানা সৃষ্টি হয় এবং জননাঙ্গ পরিণত হয়।

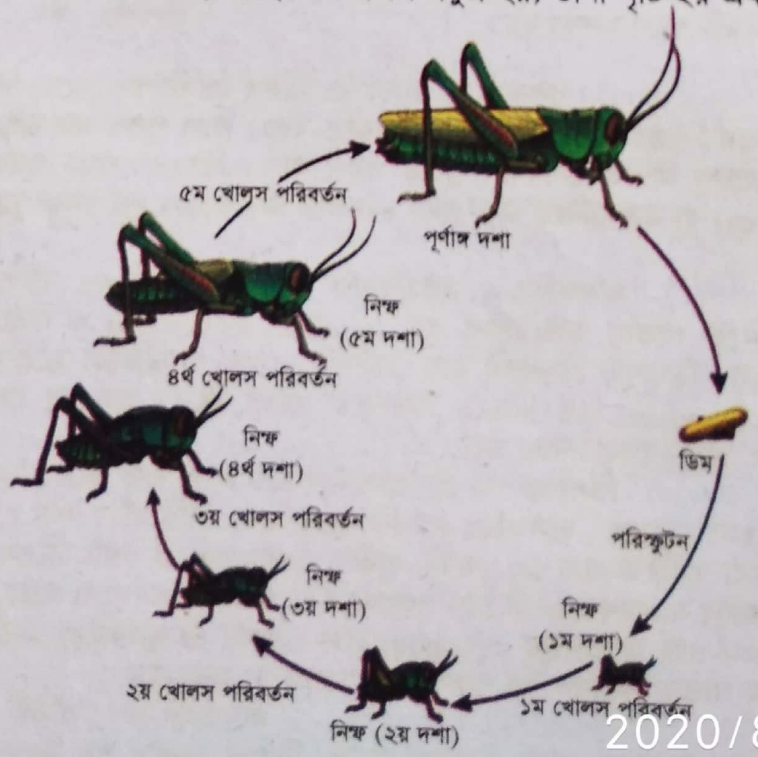

চিত্র ২.২.১৪খ : ঘাসফড়িং-এর জীবনচক্র

2020/8/4 12:53

Scanned with CamScanner

নিম্ফ দশায় খোলস পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের **করপোরা অ্যালাটা** (corpora allata) নিঃসৃত **জুভেনাইল হরমোন** (Juvenile Hormone-JH)। অগ্রবক্ষ থেকে নিঃসৃত **একডাইসোন হরমোন** (Ecdysone or Moulting Hormone-MH) শেষবারের খোলস পরিবর্তনে এবং পরিণতি লাভে সাহায্য করে।

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা

ঘাসফড়িং-এর দেহে ৪ ধরনের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি লক্ষ করা যায়। যেমন– **ইন্টার সেরিব্রাল গ্রন্থি কোষ, প্রোথোরাসিক গ্রন্থি, করপোরা অ্যালাটা** এবং **করপোরা কার্ডিয়াকা**। এদের মধ্যে প্রথম ৩টি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন ঘাসফড়িং-এর রূপান্তরে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

১। **ইন্টার সেরিব্রাল গ্রন্থি কোষ** (Inter cerebral gland cells) : মস্তিষ্কের এ গ্রন্থিকোষগুলো **প্রোথোরাসিকোট্রপিক হরমোন** বা **মস্তিষ্ক হরমোন** (prothoracicotropic hormone-PTTH or Brain hormone) নিঃসরণ করে যা প্রোথোরাসিক গ্রন্থিকে হরমোন নিঃসরণে উদ্দীপিত করে।

২। **প্রোথোরাসিক গ্রন্থি** (Prothoracic gland) : অগ্রবক্ষের এ গ্রন্থিগুলো **একডাইসোন হরমোন** (ecdysone hormone) নিঃসরণ করে যা নিম্ফ দশায় নির্মোচন বা মোল্টিং (ecdysis or moulting) নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে দেহের কোষ কলার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

৩। **করপোরা অ্যালাটা** (Corpora allata) : নিম্ফ দশায় এ গ্রন্থি **জুভেনাইল হরমোন** (juvenile hormone-neotinin) নিঃসরণ করে যা নিম্ফ দশার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এ হরমোনের প্রভাবেই ঘাসফড়িং-এর নিম্ফ দশা দীর্ঘ হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের করপোরা অ্যালাটা থেকে **গোনাডোট্রপিক হরমোন** (gonadotropic hormone) নিঃসৃত হয় যা প্রাপ্তবয়স্কদের জনন অঙ্গের পরিণতি ঘটায়।

৪। **করপোরা কার্ডিয়াকা** (Corpora cardiaca) : মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে গ্রাসনালির দু'পাশে অবস্থিত এ গ্রন্থিগুলো **গ্রোথ হরমোন** (growth hormone) নিঃসরণ করে।

নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিম্ফ	পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং
১। দেহবর্ণ	বাদামি।	সবুজ।
২। আকার	নিম্ফ আকারে ছোট।	পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং আকারে বড়।
৩। ডানা	থাকে না।	থাকে।
৪। জননাঙ্গ	অপরিণত থাকে।	পরিণত থাকে।
৫। মোল্টিং	ঘটে।	ঘটে না।
৬। উদাহরণ	Arthropoda পর্বের Insecta শ্রেণির জীবন চক্রের একটি দশা।	নিম্ফ দশার প্রাণী রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ দশায় পরিণত হয়।

❑ **কাজ :** (i) ঘাসফড়িং-এর প্রধান রেচন অঙ্গের গঠনবিন্যাস উল্লেখ কর। (ii) ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। (iii) ঘাসফড়িং-এর সুষ্ঠু রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

ঘাসফড়িং-এর সংবেদী অঙ্গ (Sensory organs of Grasshopper)

যেসব গ্রাহক অঙ্গের মাধ্যমে প্রাণিদেহে পরিবেশ থেকে আগত বিশেষ উদ্দীপনা (স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ, শব্দ, চাপ, তাপ ও আলোর তীব্রতা ইত্যাদি) গৃহীত হয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয় এবং উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি হয় তাকে **সংবেদী অঙ্গ** বা **জ্ঞানেন্দ্রিয়** বলে। ঘাসফড়িং-এর নিম্নলিখিত সংবেদী অঙ্গ দেখা যায়–

১। **আলোকসংবেদী অঙ্গ** (Photoreceptors) : মস্তকে বিদ্যমান পুঞ্জাক্ষি ও ওসেলি।

২। **স্পর্শ সংবেদী অঙ্গ** (Thigmoreceptors) : দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ব্রিসল ও রোম।

৩। **গন্ধ সংবেদী অঙ্গ** (Olfactoryreceptors) : অ্যান্টেনার রোম।

৪। **স্বাদ সংবেদী অঙ্গ** (Gastatoreceptors) : ম্যাক্সিলারি পাল্প ও ল্যাবিয়ামের রোম।

৫। **তাপ সংবেদী অঙ্গ** (Thermoreceptors) : পায়ের প্রথম তিনটি টার্সাসের গোড়ায় বিদ্যমান প্লান্টুলি প্যাড এবং অ্যান্টেনার কিছু রোম।

৬। **শ্রবণ সংবেদী অঙ্গ** (Chordotonal receptors) : পায়ু সারকিতে বিদ্যমান রোম।

2020/8/4 12:53

Scanned with CamScanner

ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি (Compound eye of Grasshopper)

পুঞ্জাক্ষির গঠন

Arthropoda পর্বের প্রাণীদের দর্শন ইন্দ্রিয়ের নাম **পুঞ্জাক্ষি** বা **জটিল চক্ষু** (compound eye)। **ঘাসফড়িং-এর মাথার দু'পাশে অবস্থিত বড়, বৃন্তহীন, বৃক্কাকার, উত্তল, কালো অংশকে পুঞ্জাক্ষি বলে**। ঘাসফড়িং-এর প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি প্রায় ২০০০ (প্রজাতিভেদে সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে) ষড়ভুজাকার দর্শন একক বা সরল চোখ নিয়ে গঠিত। এদের প্রতিটিকে **ওমাটিডিয়াম** (ommatidium; pl.- ommatidia) বলে। স্বচ্ছ **কিউটিকল** (cuticle) দ্বারা সমগ্র পুঞ্জাক্ষির উপরিভাগ আবৃত থাকে। ইহা আকৃতির দিক দিয়ে সাধারণ চক্ষু থেকে আলাদা ধরনের। পুঞ্জাক্ষিতে বিদ্যমান প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের গঠন ও কার্যপদ্ধতি অভিন্ন ধরনের।

একটি আদর্শ ওমাটিডিয়াম : একটি আদর্শ ওমাটিডিয়ামের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ নিম্নরূপ :

১। কর্নিয়া (Cornea) : ওমাটিডিয়ামের বাইরের দিকের স্বচ্ছ, বর্ণহীন, কিউটিকল নির্মিত, দ্বি-উত্তল ও ষড়ভুজাকৃতির অকোষীয় আবরণীকে কর্নিয়া বলে।

কাজ : কর্নিয়া লেন্স হিসেবে কাজ করে।

২। কর্নিয়াজেন কোষ (Corneagen cell) : কর্নিয়ার ঠিক নিচে পাশাপাশি অবস্থিত **একজোড়া** চ্যাপ্টা কর্নিয়াজেন কোষ অবস্থিত।

কাজ : এই স্তর থেকে নিঃসৃত রসে কর্নিয়া গঠিত হয়।

৩. ক্রিস্টালাইন কোন কোষ (Crystalline cone cells) : কর্নিয়াজেন কোষের নিচে **৪টি লম্বা কোষ** থাকে, এদের ক্রিস্টালাইন কোন কোষ বলে।

কাজ : এই কোষ কর্তৃক নিঃসৃত রসে প্রতিসরণশীল পদার্থে পূর্ণ ক্রিস্টালাইন কোন গঠিত হয়।

৪. ক্রিস্টালাইন কোন (Crystalline cone) : ক্রিস্টালাইন কোন কোষসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি মোচাকৃতি স্বচ্ছ প্রতিসরণশীল অঙ্গকে ক্রিস্টালাইন কোন বলে।

কাজ : প্রতিসরণশীল অঙ্গ হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ এর মাধ্যমে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হয়।

৫. আইরিস রঞ্জক আবরণ (Iris pigment sheath) : ইহা কালো কণিকাবাহী **ক্রোমাটোফোর কোষ** (chromatophore cells) দ্বারা গঠিত। এটি কর্নিয়াজেন কোষ ও ক্রিস্টালাইন কোন কোষগুলোকে বেষ্টন করে থাকে। একে প্রাথমিক আইরিশ পিগমেন্ট আবরণও বলে।

কাজ : তীব্র আলোতে আইরিশ পিগমেন্ট আবরণ প্রসারিত হয়ে কোন কোষকে আবৃত করে রাখে। মৃদু আলোতে সংকুচিত হয়ে এটি কোন কোষকে আংশিক উন্মুক্ত রাখে।

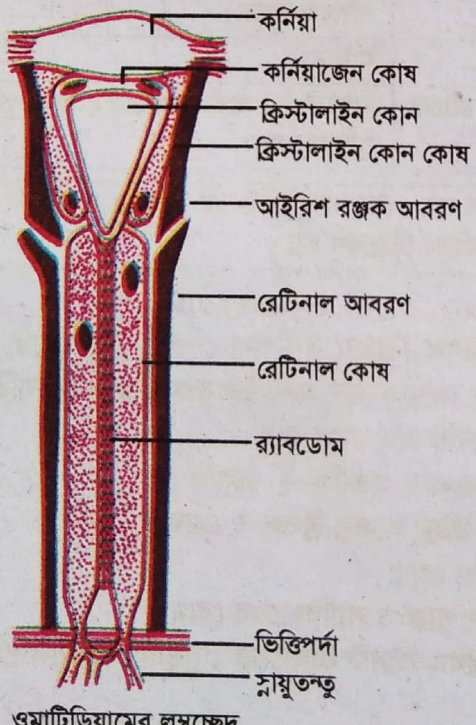

ওমাটিডিয়ামের লম্বচ্ছেদ



পুঞ্জাক্ষি (আংশিক ব্যবচ্ছেকৃত)

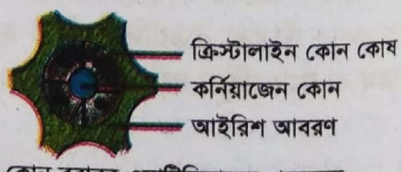

ক্রিস্টালাইন কোন বরাবর ওমাটিডিয়ামের প্রস্থচ্ছেদ



রেটিনাল আবরণ বরাবর ওমাটিডিয়ামের প্রস্থচ্ছেদ

চিত্র ২.২.১৫ : ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি ও ওমাটিডিয়াম

2020/8/4 12:53

Scanned with CamScanner

৬। রেটিনাল কোষ বা রেটিনুলার কোষ (Retinal cells or Retinular cell) : ক্রিস্টালাইন কোন কোষের নিচে বৃত্তাকারে সজ্জিত যে **৭/৮টি দীর্ঘাকার** কোষ দেখা যায়, এদের নাম রেটিনাল কোষ বা রেটিনুলার কোষ। এ কোষগুলোর এক প্রান্ত কোন কোষের সাথে এবং অপর প্রান্ত স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : এই কোষগুলো থেকে নিঃসৃত রস দ্বারা র‍্যাবডোম গঠিত হয়। এছাড়া এগুলো আলোক সংবেদীও বটে।

৭। র‍্যাবডোম (Rhabdome) : রেটিনাল কোষগুলোর মধ্যস্থলে এবং এ কোষগুলো কর্তৃক নিঃসৃত রস দ্বারা গঠিত দণ্ডাকৃতি, অকোষীয়, লম্বা ও স্বচ্ছ প্রতিসরণশীল অঙ্গকে র‍্যাবডোম কোষ বলে।

কাজ : এর মাধ্যমে আলো গৃহীত হয় এবং **বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।**

৮। রেটিনাল আবরণ (Retinal sheath) : রেটিনাল কোষের চারদিকে রঞ্জকময় কোষে গঠিত কালো পর্দার যে আবরণ থাকে তাকে রেটিনাল আবরণ বা মাধ্যমিক আইরিশ আবরণ বলে।

কাজ : এর মাধ্যমে একটি ওমাটিডিয়াম পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়াম থেকে পৃথক থাকে। তাছাড়া এটি আলোর তীব্রতা অনুযায়ী সংকুচিত-প্রসারিত হয়ে প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকে প্রভাবিত করে।

৯। ভিত্তি পর্দা (Basement membrane) : ওমাটিডিয়াম যে পাতলা পর্দার ওপর অবস্থিত তাকে ভিত্তি পর্দা বলে। এই পর্দা ভেদ করে অপটিক স্নায়ু মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে।

কাজ : ভিত্তি পর্দা ওমাটিডিয়া ধারণ করে।

১০। স্নায়ুতন্তু (Nerve fibre) : প্রতিটি রেটিনাল কোষ থেকে স্নায়ুতন্তু বের হয়ে অপটিক স্নায়ুর সাথে সংযুক্ত থাকে।

কাজ : এরা ওমাটিডিয়া কর্তৃক গৃহীত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

পুঞ্জাক্ষি ও সরলাক্ষির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পুঞ্জাক্ষি	সরলাক্ষি
১। অবস্থান	মাথার দু'পাশে অ্যান্টেনার গোড়ায় বৃক্কাকার পুঞ্জাক্ষি দুটি অবস্থান করে।	মস্তকের পৃষ্ঠীয় বা সম্মুখ অঞ্চলে উভয় পাশে চক্ষু কোটরে অবস্থান করে।
২। গঠন	অনেকগুলো ওমাটিডিয়ার সমন্বয়ে গঠিত।	সরলাক্ষি এককভাবে গঠিত।
৩। চক্ষুগোলক	থাকে না।	থাকে।
৪। প্রতিবিম্ব	অ্যাপোজিশন অথবা সুপারপোজিশন প্রতিবিম্ব গঠনের মাধ্যমে দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন করে।	মনোকুলার অথবা বাইনোকুলার দৃষ্টির মাধ্যমে দর্শনের কাজ সম্পন্ন করে।
৫। সঞ্চারণ ক্ষমতা	সঞ্চারণশীল নয় এবং উপযোজনে অক্ষম।	সঞ্চারণশীল এবং উপযোজনে সক্ষম।
৬। চক্ষুপেশি	থাকে না।	৬টি চক্ষুপেশি অক্ষিগোলকের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে।
৭। লেন্স	কোনো লেন্স নেই। কর্নিয়া লেন্সের মতো কাজ করে।	প্রতি চোখে ১টি করে লেন্স থাকে।
৮। আবরক	স্ক্লেরা বা কোরয়েড আবরক নেই।	স্ক্লেরা ও কোরয়েড আবরক থাকে।
৯। র‍্যাবডোম	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
১০। উদাহরণ	সাধারণত Arthropoda পর্বের প্রাণীতে পাওয়া যায়।	সাধারণত উচ্চ শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীতে পাওয়া যায়।

দর্শন কৌশল : প্রতিবিম্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া (Mechanism of vision or seeing)

সাধারণত প্রতিবিম্ব গঠন করেই প্রাণী বস্তুকে দেখে থাকে। সাধারণত ঘাসফড়িং একটি ওমাটিডিয়াম দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বস্তুকে দেখতে পায় না। প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে বস্তুর খণ্ডিত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। সকল ওমাটিডিয়ামের সম্মিলিত প্রতিবিম্ব বস্তুটিকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে সাহায্য করে। অপটিক স্নায়ুর (optic nerve) মাধ্যমে কোনো বস্তুর প্রতিবিম্বের সংবেদন মস্তিষ্কে পৌঁছালে ঘাসফড়িং তা দেখতে পায়। ঘাসফড়িং **দিবাচর** (diurnal) প্রাণী। কিন্তু দিনের উজ্জ্বল আলো ও দিনের শেষে মৃদু আলো দু'সময়েই ঘাসফড়িংয়ের দৃষ্টিশক্তি কার্যকর থাকে। **আলোর তীব্রতা অনুসারে ঘাসফড়িংয়ের ওমাটিডিয়াম দুই ধরনের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে পারে।** যথা–

১। উজ্জ্বল আলোতে মোজাইক বা অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব (Mosaic or Apposition image) : উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে ঘাসফড়িং এর ওমাটিডিয়ামে কোনো দর্শনীয় বস্তুর যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাকে **মোজাইক** বা **অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব** বলা হয়।

দিনের বেলায় **উজ্জ্বল আলোয়** আইরিশ রঞ্জক আবরণ ও রেটিনাল আবরণ এমনভাবে প্রসারিত হয় যাতে একটি ওমাটিডিয়াম পার্শ্বস্থ ওমাটিডিয়াম থেকে দর্শনগত দিক দিয়ে পৃথক হয়ে পড়ে। ফলে দৃশ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত যে আলোকরশ্মিগুলো কর্নিয়ার ওপর **উল্লম্বভাবে পড়ে** কেবল তারাই ক্রিস্টালাইন **কোনের** ভেতর দিয়ে র‍্যাবডোমে পৌঁছায় এবং সেখানে দৃশ্যবস্তুর একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। দৃশ্যবস্তু থেকে ভিন্নভাবে পতিত আলোরশ্মি রঞ্জক

2020/8/4 12:53

Scanned with CamScanner

আবরণী কর্তৃক শোষিত হওয়ায় এরা কখনো রঞ্জক আবরণী ভেদ করে র‍্যাবডোমে পৌঁছাতে পারে না। পাশাপাশি অবস্থিত অন্যান্য ওমাটিডিয়াম অনুরূপভাবে দৃশ্যবস্তুর অন্যান্য অংশের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। এভাবে সকল ওমাটিডিয়ামে প্রতিফলিত বিন্দু বিন্দু প্রতিবিম্বসমূহ সম্মিলিতভাবে দৃশ্যবস্তুর **পরিপূর্ণ, একক** ও **সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি** উপহার দেয়। একটি একটি করে বহু প্রতিবিম্বের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়ায় এ ধরনের প্রতিবিম্বকে **অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব** বলা হয়। আবার এ অবস্থায় ওমাটিডিয়ামে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব দেখতে অনেকটা মোজাইক করা মেঝের পাথরের মতো মনে হয়। এজন্য এটি **মোজাইক প্রতিবিম্ব** নামেও পরিচিত।

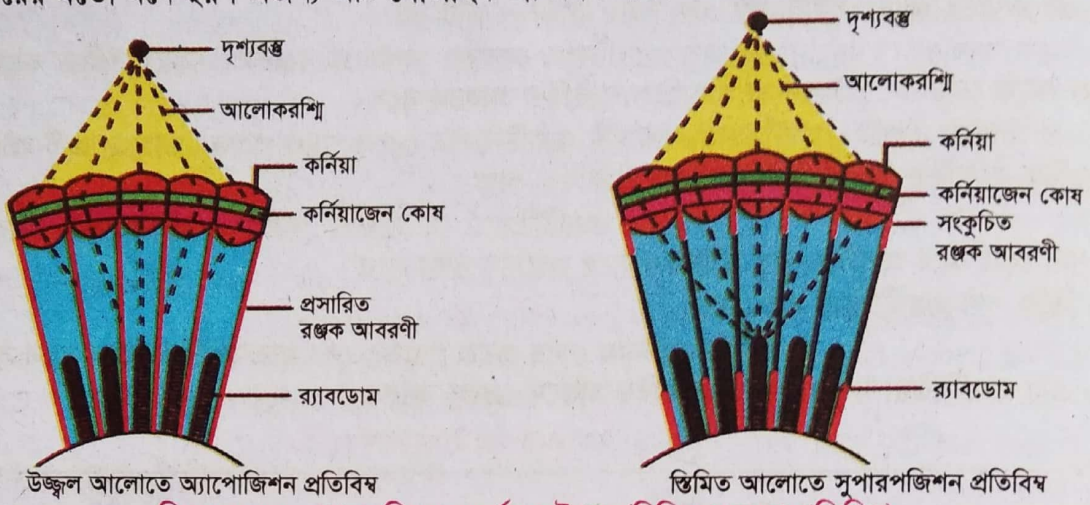

চিত্র ২.২.১৬ : ঘাসফড়িংয়ের দর্শন কৌশল (বিভিন্ন ধরনের প্রতিবিম্ব)

২। স্তিমিত আলোতে সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব (Superposition image) : স্তিমিত বা মৃদু আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়ামে কোনো দর্শনীয় বস্তুর যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাকে **সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব** বলা হয়।

স্তিমিত আলোয় (সাধারণত বিকেলে, সন্ধ্যায় বা রাতে) আইরিশ রঞ্জক আবরণ ও রেটিনাল আবরণ সংকুচিত হয়ে যথাক্রমে ওমাটিডিয়ামের শীর্ষে ও ভিত্তি পর্দার দিকে অপসারিত হয়। ফলে দৃশ্যবস্তু থেকে আলোকরশ্মি উল্লম্ব বা তির্যক যেকোনোভাবে পতিত হলে তা র‍্যাবডোমে এসে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে পার্শ্বস্থ ওমাটিডিয়ামগুলো দর্শনগত দিক দিয়ে পৃথক হয়ে পড়ে না। বরং প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের ক্রিস্টালাইন কোনের অধিকাংশ স্থান অনাবৃত থাকে। এ অবস্থায় দৃশ্যবস্তু থেকে পতিত **উল্লম্ব** ও **তির্যক রশ্মিগুলো** র‍্যাবডোমে পৌঁছে দৃশ্যবস্তুর পাশাপাশি বিন্দুগুলোর প্রতিবিম্ব একের পর এক সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু পাশাপাশি উৎপন্ন প্রতিবিম্বগুলো আংশিকভাবে অধিক্রম (overlap) করায় দৃশ্যবস্তুর একটি **অস্পষ্ট** ও **ঝাপসা** প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়। একটির উপর আরেকটি প্রতিবিম্ব পড়ার ফলে সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হওয়ায় এ ধরনের প্রতিবিম্বকে **সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব** বলা হয়।

অ্যাপোজিশন ও সুপারপজিশন প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অ্যাপোজিশন	সুপারপজিশন
১। আলোর উপস্থিতি	তীব্র বা উজ্জ্বল আলোতে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।	স্তিমিত বা মৃদু আলোয় প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।
২। গৃহীত আলোকরশ্মি	কেবলমাত্র উল্লম্বভাবে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।	উল্লম্ব ও তীর্যক উভয়ভাবে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
৩। রেটিনাল ও আইরিশ রঞ্জক আবরণ	প্রসারিত হয়।	সংকুচিত হয়।
৪। প্রতিবিম্ব	সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়।	প্রতিচ্ছবি অস্পষ্ট ও ঝাপসা হয়।
৫। ওমাটিডিয়াম	ওমাটিডিয়াম স্বাধীনভাবে কাজ করে।	ওমাটিডিয়ামগুলো মিলিতভাবে কাজ করে।
৬। প্রতিবিম্ব সৃষ্টি	বস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতিবিম্ব একে অপরের ওপর পতিত হয় না।	প্রতিবিম্বগুলো একে অপরের ওপর পতিত হয়।

❑ **কাজ :** (i) ঘাসফড়িং-এর আলোক সংবেদী অঙ্গের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র দাও। (ii) ঘাসফড়িং-এর দর্শন অঙ্গের এককের গঠন বর্ণনা কর। (iii) ঘাসফড়িং-এর দর্শন কৌশল আলোর ভিন্নতার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম- উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর। (iv) স্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরির ভিন্নতা আলোর প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে– বিশ্লেষণ কর। (v) ঘাসফড়িং-এর মৃদু আলোতে দর্শন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে উল্লম্ব ও তীর্যক দুই ধরনের আলোকরশ্মিই ব্যবহার করে- চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। (vi) শুধুমাত্র উল্লম্ব আলোক দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবিম্ব সচিত্র ব্যাখ্যা কর।

2020/8/4 12:54
Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

- ☑ **আর্থোপটেরোলজি :** প্রাণিবিজ্ঞানের যে শাখায় ঘাসফড়িং (grasshoppers), পঙ্গপাল (locusts) ও ঝিঝি পোকা (crickets) নিয়ে অধ্যয়ন করা হয় তাকে আর্থোপটেরোলজি (Orthopterology) বলে।
- ☑ **পঙ্গপাল :** ঘাসফড়িং-এর যে গণ বা প্রজাতিগুলো দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং মাইগ্রেটরি তারা পঙ্গপাল নামে পরিচিত।
- ☑ **কিউটিকল :** ঘাসফড়িং-এর দেহ কাইটিন নির্মিত কিউটিকল দিয়ে আবৃত। কিউটিকল বহিঃকঙ্কালের কাজ করে।
- ☑ **স্ক্লেরাইট :** ঘাসফড়িং-এর বহিঃকঙ্কাল হাইপোডার্মিস নিঃসৃত পদার্থে সৃষ্ট এবং প্রতিটি দেহখণ্ডকে একধরনের কঠিন প্লেট বা পাতের মতো সৃষ্টি করে। একে স্ক্লেরাইট বলে।
- ☑ **টার্গাম :** ঘাসফড়িং-এর স্ক্লেরাইটের পৃষ্ঠীয় অংশকে টার্গাম বলে।
- ☑ **স্টার্নাম :** ঘাসফড়িং-এর স্ক্লেরাইটের অঙ্কীয় অংশকে স্টার্নাম বলে।
- ☑ **প্লিউরন :** ঘাসফড়িং-এর স্ক্লেরাইটের পার্শ্বীয় অংশকে প্লিউরন বলে।
- ☑ **সুচার :** ঘাসফড়িং-এর স্ক্লেরাইটগুলোর সংযুক্তস্থল নরম কিউটিকল যুক্ত, এদের সুচার বলে।
- ☑ **ভার্টেক্স :** ঘাসফড়িং-এর মস্তক ৬টি খণ্ডক যুক্ত হয়ে গঠিত হয়। মস্তকের পৃষ্ঠীয়দেশে ত্রিকোণাকার অঞ্চলটিকে ভার্টেক্স বলে।
- ☑ **টেগমিনা :** ঘাসফড়িং-এর ২ জোড়া ডানা থাকে। ১ম জোড়া ডানা সরু ও শক্ত, একে টেগমিনা বলে। এরা উড়ার কাজে ব্যবহৃত হয় না। উড়ার সময় ডানা দুটি প্রসারিত রেখে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- ☑ **মুখোপাঙ্গ :** ঘাসফড়িং-এর মুখছিদ্রকে ঘিরে অবস্থিত নড়নক্ষম, খাদ্যগ্রহণের সাথে জড়িত, সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গগুলোকে একত্রে মুখোপাঙ্গ বলে। এদের মুখোপাঙ্গ চর্বণ-উপযোগী বা ম্যান্ডিবুলেট ধরনের। ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গ ল্যাব্রাম, এক জোড়া ম্যান্ডিবল, এক জোড়া ম্যাক্সিলা, ল্যাবিয়াম এবং হাইপোফ্যারিংক্স নিয়ে গঠিত।
- ☑ **ম্যান্ডিবল :** ঘাসফড়িং-এর মুখছিদ্রের উভয় পাশেই একটি করে মোট দুটি ম্যান্ডিবল অবস্থিত। ইহা ত্রিকোণাকার শক্ত, দৃঢ় উপাঙ্গ। এতে করাতের মতো তীক্ষ্ণ দাঁত রয়েছে।
- ☑ **হাইপোগন্যাথাস :** ঘাসফড়িং-এর মস্তক দেহের সম্মুখ প্রান্তে নিচের দিকে নির্দেশিত অবস্থায় থাকে। পতঙ্গের এ ধরনের মস্তককে হাইপোগন্যাথাস বলে।
- ☑ **ক্রপ :** ঘাসফড়িং-এর পরিপাক নালির অংশ। এটি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট থলির মতো অংশ। এখানে খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে।
- ☑ **গিজার্ড :** গিজার্ড পরিপাক নালির পেশিবহুল অংশ। গিজার্ডে কাইটিন যুক্ত প্লেট ও দাঁত থাকে। এখানে কাইটিন নির্মিত দাঁতের সাহায্যে খাদ্যবস্তু পিষ্ট হয় এবং ক্ষুদ্রাকার কণায় পরিণত হয়।
- ☑ **হেপাটিক সিকা :** ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকনালির অগ্রঅন্ত্র ও মধ্যঅন্ত্রের সংযোগস্থলে ছয় জোড়া ফাঁপা, লম্বা ও মোচাকৃতির থলি থাকে। এদের গ্যাস্ট্রিক সিকা বা হেপাটিক সিকা বলে। গ্যাস্ট্রিক সিকা পাচকরস নিঃসৃত করে।
- ☑ **মুক্ত বা ল্যাকুনার সংবহনতন্ত্র :** ঘাসফড়িং-এর রক্তনালিকাগুলো কৈশিক জালিকা গঠন না করে দেহের বিভিন্ন ফাঁকা স্থান বা ল্যাকুনিতে মুক্ত হয়। এজন্য এদের রক্ত সংবহনতন্ত্রকে মুক্ত বা ল্যাকুনার সংবহনতন্ত্র বলে।
- ☑ **হিমোলিম্ফ :** ঘাসফড়িং-এর রক্ত স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। রক্ত হিমোসিল নামক দেহগহ্বরে লসিকার সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে বলে ঘাসফড়িং-এর রক্তকে হিমোলিম্ফ বলে। হিমোলিম্ফে শ্বসন রঞ্জক থাকে না বলে শ্বসনে অংশ নেয় না। দ্রবীভূত খাদ্য সংগ্রহ, পানি ও খাদ্য সঞ্চয় করা হিমোলিম্ফের কাজ।
- ☑ **হিমোসিল :** ঘাসফড়িংসহ সকল সন্ধিপদী প্রাণীর দেহগহ্বর মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন পেরিটোনিয়ামে আবৃত থাকে না, রক্তে পূর্ণ এবং সংবহনতন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের রক্তপূর্ণ অপ্রকৃত দেহগহ্বরকে হিমোসিল বলে।
- ☑ **সাইনাস :** ঘাসফড়িং-এর হিমোসিল দুটি অনুদৈর্ঘ্য পর্দা বা ডায়াফ্রাম দিয়ে যে তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে তাদের সাইনাস বলে। যেমন– পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস, পেরিভিসেরাল সাইনাস ও পেরিনিউরাল সাইনাস।
- ☑ **অস্টিয়া :** ঘাসফড়িং-এর হৃৎপিণ্ড ৭টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের দু'পাশে একটি করে ছিদ্র থাকে। ছিদ্র দুটিকে অস্টিয়া বলে।
- ☑ **ট্রাকিয়াল তন্ত্র :** ঘাসফড়িং শ্বাসকার্য সম্পাদনের জন্য ট্রাকিয়া ও তার শাখা-প্রশাখা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যে তন্ত্রের সৃষ্টি করে তাকে ট্রাকিয়াল তন্ত্র বলে।
- ☑ **স্পাইরাকল :** ঘাসফড়িং-এর দেহের উভয় পাশে মোট ১০ জোড়া শ্বাসরন্ধ্র থাকে। এদের মধ্যে ২ জোড়া বক্ষে ও ৮ জোড়া প্রথম ৮টি উদরীয় খণ্ডকে অবস্থান করে। এ শ্বাসরন্ধ্রগুলোকে স্পাইরাকল বলে।
- ☑ **টিনিডিয়া :** ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়ার অভ্যন্তরীণ গাত্র কাইটিন নির্মিত সর্পিলাকার চক্র দ্বারা সুরক্ষিত। এদেরকে টিনিডিয়া বলে।
- ☑ **বায়ুথলি :** ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়ার কিছু শাখা প্রসারিত হয়ে বড় এবং পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট যে থলির মতো অংশ গঠন করে তাকে বায়ুথলি বলে। বায়ুথলিতে বাতাস জমা থাকে এবং শ্বসনের সময় বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ☑ **মালপিজিয়ান নালিকা :** ঘাসফড়িংসহ অন্যান্য কীটপতঙ্গের প্রধান রেচন অঙ্গকে মালপিজিয়ান নালিকা বলে। নালিকাগুলো সূক্ষ্ম চুলের মতো হালকা হলুদাভ-সবুজ বর্ণের।
- ☑ **ওভিপজিটর :** ওভিপজিটর স্ত্রী ঘাসফড়িং এর জননতন্ত্রের একটি অংশ। পুংজনন অঙ্গ ধারণ করা এবং ডিম পাড়ার জন্য এই অঙ্গটি ব্যবহৃত হয়। এতে তিন ধরনের ভালভুলি (valvulae) দেখা যায় যা মাটিতে গর্ত করে ডিম সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

2020/8/4 12:54

Scanned with CamScanner

☑ **কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি :** স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর যোনির সঙ্গে সংযুক্ত সহায়ক গ্রন্থিকে কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি বলে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রস সিমেন্ট জাতীয়। ডিম পাড়ার পর এই রস ডিমগুলোকে একত্রে রাখতে সাহায্য করে।

☑ **স্পার্মাথিকা :** স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর যোনিতে একজোড়া ডিম্বনালি ছাড়াও একটি কুণ্ডলীকৃত স্পার্মাথিকাল নালি যুক্ত থাকে। এ কুণ্ডলীকৃত নালির শেষ প্রান্তে থলের ন্যায় যে অংশটি থাকে তাকে স্পার্মাথিকা বা শুক্রধানি থাকে। সঙ্গমকালে এতে পুরুষ ঘাসফড়িং থেকে আগত শুক্রাণু সাময়িকভাবে জমা থাকে।

☑ **ডায়াপোজ :** ডায়াপোজ হলো ঘাসফড়িং-এর বিশেষ এক ধরনের অভিযোজন, যার ফলে এদের নিম্ফ বা শিশুগুলো প্রতিকূল পরিবেশের প্রচণ্ড শীত ও খাদ্যাভাবের হাত থেকে রক্ষা পায়। অথবা ঘাসফড়িং-এর ডিম প্রতিকূল আবহাওয়ার (শীতকালে) কারণে পরিস্ফুটন বন্ধ থাকে। এ অবস্থাকে ডায়াপোজ বলে। এরা পুরো শীতকালে ডায়াপোজ অবস্থায় অতিক্রম করে।

☑ **রূপান্তর :** কোনো প্রাণীর জীবনচক্রের প্রাথমিক দশা ও পূর্ণাঙ্গ দশার মধ্যে গঠনগত পার্থক্য থাকলে প্রাথমিক দশা থেকে পূর্ণাঙ্গ দশায় পৌঁছাতে যেসব দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে রূপান্তর বলে।

☑ **অসম্পূর্ণ রূপান্তর :** আকার, বর্ণ, ডানা ও জনন অঙ্গ ছাড়া যে রূপান্তরে অপরিণত অবস্থার কোনো প্রাণী পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপ নেয়, এ ধরনের রূপান্তরকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। অসম্পূর্ণ রূপান্তরের শিশু অবস্থায় প্রাণীকে নিম্ফ বলে। উদহারণ– ঘাসফড়িং ও তেলাপোকার রূপান্তর।

☑ **সম্পূর্ণ রূপান্তর :** যে রূপান্তরে শিশু প্রাণী ও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মধ্যে কোনো আঙ্গিক মিল থাকে না এবং ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশু প্রাণী পূর্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, সে ধরনের রূপান্তরকে সম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। সম্পূর্ণ রূপান্তরে শিশু অবস্থায় প্রাণীকে লার্ভা বলে। উদাহরণ– মৌমাছি ও প্রজাপতির রূপান্তর।

☑ **নিম্ফ :** ঘাসফড়িং, আরশোলা ইত্যাদি পতঙ্গে ডিম ফুটে যে শিশু দশা বের হয়ে আসে তাকে নিম্ফ বলে। নিম্ফ-এর গঠন, খাদ্যরুচি প্রায় পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতোই তবে এরা আকৃতিতে ছোট, মস্তক, তুলনামূলকভাবে বড়, অ্যান্টেনা খাটো, জননাঙ্গ অসম্পূর্ণ ও এদের ডানা থাকে না।

☑ **লার্ভা :** লার্ভা হলো পতঙ্গের পরিস্ফুটনের একটি দশা। অথবা সম্পূর্ণ রূপান্তরে শিশু অবস্থায় প্রাণীকে লার্ভা বলে।

☑ **ইমাগো :** ঘাসফড়িং-এর পরিণত অবস্থাকে ইমাগো বা পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং বলে। নিম্ফ থেকে পূর্ণাঙ্গ বা ইমাগো ঘাসফড়িং-এ পরিণত হতে প্রায় দুই মাস সময় লাগে।

☑ **মোল্টিং :** ঘাসফড়িংসহ অন্যান্য কীটপতঙ্গের খোলস পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে নির্মোচন বা মোল্টিং বলে।

☑ **ইনস্টার :** ঘাসফড়িং-এর জীবনচক্রে নিম্ফগুলো কয়েকবার খোলস নির্মোচন বা মোল্টিং-এর পর পূর্ণাঙ্গ দশাপ্রাপ্ত হয়। পরপর দুটি মোল্টিং এর মধ্যবর্তী দশা বা অবস্থাকে ইনস্টার বলে।

☑ **পুঞ্জাক্ষি :** ঘাসফড়িং-এর মস্তকের উভয় পাশে কালো, বৃন্তহীন, বৃত্তাকার উত্তল গঠনকে পুঞ্জাক্ষি বলে। পুঞ্জাক্ষি দর্শন ইন্দ্রিয়। প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি প্রায় ২০০০টি দর্শন একক বা ওমাটিডিয়া নিয়ে গঠিত।

☑ **ওমাটিডিয়াম :** ঘাসফড়িংসহ অন্যান্য কীটপতঙ্গের স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে প্রতিবিম্ব গঠনে সক্ষম পুঞ্জাক্ষির প্রতিটি সরলাক্ষি বা দর্শন একক বা একক আলোক সংবেদী অঙ্গকে ওমাটিডিয়াম বলে।

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন অংশটি ঘাসফড়িংয়ের পৌষ্টিকনালির প্রোক্টোডিয়ামের অন্তর্ভুক্ত? *[ঢাকা বোর্ড-২০১৮]*
ক ক্রপ খ গলবিল গ গিজার্ড ঘ রেক্টাম

২. ঘাসফড়িং-এর সুপারপজিশন দর্শনে কোনটি সঠিক? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*
ক সুস্পষ্ট বিম্ব তৈরি হয়
খ বস্তুর খণ্ড খণ্ড বিম্ব তৈরি হয়
গ আইরিশ আবরণ সংকুচিত থাকে
ঘ রেটিনাল আবরণ প্রসারিত থাকে

৩. ঘাসফড়িং-এর জীবনচক্রে নিচের কোন ক্রমটি সঠিক? *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*
ক ডিম→ লার্ভা → ইমাগো
খ ডিম → লার্ভা → পিউপা → ইমাগো
গ ডিম → নিম্ফ → ইমাগো
ঘ ডিম → লার্ভা → নিম্ফ → ইমাগো

৪. ঘাসফড়িংয়ের দেহ খণ্ডের কাইটিন নির্মিত পুরু ও শক্ত পৃষ্ঠীয় পাতকে বলে– *[যশোর বোর্ড-২০১৭]*
ক প্লুরাইট খ স্ক্লেরাইট গ স্টানাইট ঘ টারগাইট

৫. কোনটি ঘাসফড়িংয়ের স্ত্রী জননতন্ত্রের অংশ? *[যশোর বোর্ড-২০১৭]*
ক ক্ষেপণনালি খ শুক্রনালি গ শুক্রধানি ঘ শুক্রথলি

৬. ঘাসফড়িং নিম্ফ থেকে পূর্ণাঙ্গে পরিণত হতে কতবার খোলস ত্যাগ করে? *[যশোর বোর্ড-২০১৭]*
ক একবার খ তিনবার গ পাঁচবার ঘ সাতবার

৭. নিচের কোনটি Grasshopper এর মস্তকের বহিঃকঙ্কালের অংশ? *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]*
ক ফ্লাজেলাম খ পেডিসেল গ স্কেপ ঘ ফ্রন্স

৮. ঘাসফড়িং-এর হেপাটিক সিকার সংখ্যা কয়টি? *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]*
ক ১২ খ ১৩ গ ১৪ ঘ ১৫

৯. ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনের সঠিক পথ কোনটি? *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]*
ক মস্তকের সাইনাস → পেরিনিউরাল সাইনাস → পেরিভিসারেল সাইনাস → পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস
খ মস্তকের সাইনাস → পেরিভিসারেল সাইনাস → পেরিনিউরাল সাইনাস → পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস
গ পেরিনিউরাল সাইনাস → মস্তকের সাইনাস → পেরিভিসারেল সাইনাস → পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস
ঘ পেরিভিসারেল সাইনাস → পেরিনিউরাল সাইনাস → পেরিকার্ডিয়া সাইনাস → মস্তকের সাইনাস

১০. ঘাসফড়িং-এর উদরে কতটি খণ্ডক রয়েছে? *[যশোর বোর্ড-২০১৬]*
ক ১১টি খ ১০টি গ ৬টি ঘ ৩টি

2020/8/4 12:54
Scanned with CamScanner

১১. অসম্পূর্ণ রূপান্তরের ক্ষেত্রে শিশু অবস্থাকে কী বলে? *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]*
ক লার্ভা খ নিম্ফ গ ইমাগো ঘ পিউপা

১২. ল্যাসিনিয়া কোন উপাঙ্গের অংশ? *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]*
ক ম্যান্ডিবল খ ল্যাব্রাম গ ল্যাবিয়াম ঘ ম্যাক্সিলা

১৩. ঘাস ফড়িং এর মাথায় স্ক্লেরাইট কোনটি? *[ঢাকা বোর্ড-'১৯]*
ক ভার্টেক্স খ স্টারনাম গ টারগাম ঘ ল্যাবিয়াম

১৪. কোনটি রূপান্তরের সঠিক ধাপ? *[সিলেট বোর্ড-২০১৬]*
ক ডিম → পিউপা → লার্ভা → ইমাগো
খ ডিম → ইমাগো → লার্ভা → পিউপা
গ ডিম → লার্ভা → পিউপা → ইমাগো
ঘ ডিম → লার্ভা → ইমাগো → পিউপা

১৫. কোনটি ঘাসফড়িং-এর স্পাইরাকলকে পরিবেষ্টিত করে রাখে? *[সিলেট বোর্ড-২০১৬]*
ক টিনিডিয়া খ ইন্টিমা গ অপারকুলাম ঘ পেরিট্রিম

১৬. ঘাসফড়িং-এর বক্ষ অঞ্চলে কত জোড়া শ্বাসরন্ধ্র থাকে? *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬]*
ক ২ খ ৫ গ ৮ ঘ ১০

১৭. নিম্নের কোনটি ঘাসফড়িং-এর প্রতিসরণশীল অঙ্গ হিসেবে কাজ করে?
ক কর্নিয়া খ কর্নিয়াজেন কোষ
গ ক্রিস্টালাইন কোন কোষ ঘ ক্রিস্টালাইন কোন

১৮. সন্ধিপদী প্রাণীদের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক মালপিজিয়ান নালিকা খ মালপিজিয়ান বডি
গ নেফ্রিডিয়া ঘ পানি সংবহনতন্ত্র

১৯. কোন প্রাণীর 'রক্ত সংবহনতন্ত্র মুক্ত'? *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৫]*
ক ঘাসফড়িং খ রুই মাছ গ পাখি ঘ মানুষ

২০. ঘাসফড়িং-এর পরিপাক নালির ত্রিকোণাকার গঠনটির নাম কী? *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]*
ক কোলন খ গিজার্ড গ মলাশয় ঘ পাকস্থলী

২১. ঘাসফড়িং-এর ওভিপজিটর কী কাজে ব্যবহৃত হয়? *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]*
ক লালা নিঃসরণে খ বর্জ্য নিষ্কাশনে
গ শ্বসনকার্যে ঘ ডিম্ব ত্যাগে

২২. ঘাসফড়িং-এর প্রতি দেহ খণ্ডকের শক্ত আবরণকে কী বলে? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৫]*
ক সুচার খ স্টার্নাম গ টার্গাম ঘ স্ক্লেরাইট

২৩. টিনিডিয়া ঘাসফড়িং-এর কোন তন্ত্রে পাওয়া যায়? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৫]*
ক পরিপাকতন্ত্র খ রেচনতন্ত্র
গ শ্বসনতন্ত্র ঘ প্রজননতন্ত্র

২৪. ঘাসফড়িং-এর ডিম্বাণু কী ধরনের? *[সিলেট বোর্ড-২০১৫]*
ক মেসোলেসিথাল খ টেলোলেসিথাল
গ সেন্ট্রোলেসিথাল ঘ মাইক্রো-লেসিথাল

২৫. ঘাসফড়িং-এর মস্তকে ওসেলাম কয়টি? *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]*
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২৬. ঘাসফড়িং-এর পায়ের গঠনে সঠিকক্রম কোনটি? *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]*
ক ট্রোক্যান্টার→ফিমার→টিবিয়া→কক্সা→টার্সাস
খ কক্সা→ট্রোক্যান্টার→ফিমার→টিবিয়া→টার্সাস
গ কক্সা→ফিমার→ট্রোক্যান্টার→টিবিয়া→টার্সাস
ঘ কক্সা→টিবিয়া→ফিমার→ট্রোক্যান্টার→টার্সাস

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৭. ঘাসফড়িং এর রক্ত সংবহনতন্ত্র– *[সি.,কু.,ব.,চ.,য.,দি. ও রা. বোর্ড-২০১৮]*
i. উন্মুক্ত প্রকৃতির ii. শ্বাসরঞ্জকযুক্ত iii. অ্যাওর্টা বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. ঘাসফড়িং-এর সুপারপজিশন প্রতিবিম্বে সংকুচিত আবরণ হলো–
i. কর্নিয়া ii. রেটিনাল আবরণ
iii. আইরিশ পিগমেন্ট আবরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. ঘাসফড়িং-এর বক্ষ অঞ্চলের ক্ষেত্রে– *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৫]*
i. এক জোড়া শুঙ্গ থাকে ii. তিন জোড়া পা থাকে
iii. দুই জোড়া শ্বাসছিদ্র থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. ম্যাক্সিলারি পাল্পের কাজ হলো– *[যশোর বোর্ড-২০১৫]*
i পায়ের অগ্রভাগ পরিষ্কার করা
ii. খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা iii. খাদ্য ধরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. ঘাসফড়িং-এর বহিঃকঙ্কালের অংশগুলো হলো– *[যশোর বোর্ড-২০১৫]*
i ভার্টেক্স ii. স্টাইপস iii. ক্লাইপিয়াস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩২. উদ্দীপকের 'X' চিহ্নিত অংশের নাম কী? *[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*
ক লিগুলি খ মেন্টাল গ সাবমেন্টাম ঘ প্লিফার

৩৩. উদ্দীপকের 'Y' চিহ্নিত অংশের কাজ কী? *[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*
ক অ্যান্টেনা ও পা পরিষ্কার করে
খ খাদ্যের সাথে লালা মিশ্রিত করে
গ খাদ্যকে চর্বণ করে
ঘ খাদ্যের মান যাচাই করে

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

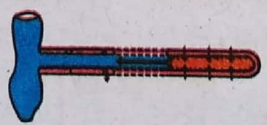

[ঢাকা বোর্ড-২০১৬]

৩৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটি পাওয়া যায়–
i. ঘাসফড়িং ii. আরশোলা iii. রুইমাছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫. উল্লিখিত অঙ্গ–
i. পরিপাকনালিতে উন্মুক্ত ii. রেচন পদার্থ নিষ্কাশন করে
iii. হিমোসিল হতে বিপাকীয় বর্জ্য সংগ্রহ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

2020/8/4 12:54
Scanned with CamScanner

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
খাবার গ্রহণে ঘাসফড়িং ও মানুষের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

৩৬. উদ্দীপকের প্রথম প্রাণীর কোন অঙ্গটি খাবার খাদ্যনালিতে প্রেরণে অধিকতর সহায়তা করে? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬]
ক হাইপোফ্যারিংস খ ম্যান্ডিবল
গ ম্যাক্সিলা ঘ ল্যাবিয়াম

৩৭. উদ্দীপকের প্রাণীদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনটি?
ক স্বাদ গ্রহণ খ সর্বভুক
গ ম্যান্ডিবল ও দাঁত ঘ চর্বণ কৌশল

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৮ ও ৩৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
হীরা এবং পান্না উন্মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র যুক্ত একটি প্রাণীর প্রলম্বিত নলের মতো বিশেষ অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিল। অঙ্গটি কতগুলো প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের দুই পাশে একটি করে ছিদ্র থাকে।

৩৮. হীরা এবং পান্না কোন অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিল?
ক বক্ষ খ পুঞ্জাক্ষি গ হৃৎপিণ্ড ঘ ফুসফুস

৩৯. উদ্দীপকের উল্লেখিত অঙ্গটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—
i. বক্ষ ও উদর অঞ্চলের পৃষ্ঠীয়তলের মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত
ii. পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস দ্বারা পরিবৃত থাকে
iii. যুগ্ম ত্রিকোণাবিশিষ্ট অ্যালারি পেশি দ্বারা সজ্জিত থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪০. বাংলাদেশে সন্ধানপ্রাপ্ত ঘাসফড়িংয়ের প্রজাতির সংখ্যা কত? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক দুই হাজারটি খ বিশ হাজারটি
গ বিশটি ঘ দুই শতটি

৪১. কোনটি ঘাসফড়িং এর মস্তকের বহিঃকঙ্কালের অংশ নয়? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক জেনা খ এপিক্রেনিয়াম গ ওসেলি ঘ ভার্টেক্স

৪২. ঘাসফড়িং এর অগ্রভাগের সরু ও শক্ত ডানাদ্বয়কে কী বলে? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক এক্সটার্না খ ট্রোক্যান্টার গ টেগমিনা ঘ টার্সাস

৪৩. তেলাপোকার প্রথম ম্যাক্সিলার অংশ নয় কোনটি? [মেডিকেল : ০৬-০৭]
ক স্টাইপস্ খ ল্যাসিনিয়া গ সাবমেন্টাম ঘ কার্ডো

৪৪. ঘাসফড়িংয়ের রক্তসংবহনতন্ত্রের অংশ নয় কোনটি? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক হিমোসিল খ সম্মুখ বাহিকা
গ পৃষ্ঠীয় বাহিকা ঘ হিমোলিম্ফ

৪৫. ঘাসফড়িংয়ের পুঞ্জাক্ষির কোন অংশটি আলো গ্রহণ করে? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক কর্নিয়া খ র‍্যাবডোম
গ কর্নিয়াজেন কোষ ঘ ক্রিস্টালাইন কোন কোষ

উত্তরমালা

১.(ঘ); ২.(গ); ৩.(গ); ৪.(ঘ); ৫.(গ); ৬.(গ); ৭.(ঘ); ৮.(ক); ৯. (খ); ১০. (ক); ১১. (খ); ১২. (ঘ); ১৩. (ক); ১৪. (গ); ১৫. (ঘ); ১৬. (ক); ১৭. (ঘ); ১৮. (ক); ১৯. (ক); ২০. (খ); ২১. (ঘ); ২২. (ঘ); ২৩. (গ); ২৪. (গ); ২৫. (খ); ২৬. (খ); ২৭.(খ); ২৮. (খ); ২৯. (গ); ৩০. (ঘ); ৩১. (ঘ); ৩২.(ক); ৩৩.(ঘ); ৩৪. (ক); ৩৫. (ঘ); ৩৬. (ঘ); ৩৭. (গ); ৩৮. (গ); ৩৯. (ঘ) ; ৪০.(গ); ৪১.(গ); ৪২.(গ); ৪৩.(গ); ৪৪.(খ); ৪৫.(খ); ।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. পঙ্গপাল কী? [কুমিল্লা বোর্ড-১৫]
২. পুঞ্জাক্ষি কী? [চট্টগ্রাম বোর্ড-১৭, ঢাকা বোর্ড-১৬]
৩. অ্যান্টেনা কী?
৪. স্ক্লেরাইট কী? [সিলেট বোর্ড-১৭]
৫. ওসেলি কী?
৬. ওসেলাস কী?
৭. মুখোপাঙ্গ কাকে বলে?
৮. পরিপাকতন্ত্র কাকে বলে?
৯. ক্রপ কী?
১০. গিজার্ড কী?
১১. রক্ত সংবহন কাকে বলে?
১২. হিমোলিম্ফ কী?
১৩. হিমোসিল কী? [বরিশাল বোর্ড-১৬]
১৪. অ্যালারি পেশি কী?
১৫. ট্রাকিয়ালতন্ত্র কাকে বলে?
১৬. স্পাইরাকল কী? [দিনাজপুর বোর্ড-১৭]
১৭. শ্বসন কী?
১৮. টিনিডিয়া কী? [ঢাকা বোর্ড-১৬]
১৯. রেচন কাকে বলে?
২০. মালপিজিয়ান নালিকা কী?
২১. ওমাটিডিয়াম কী? [যশোর বোর্ড-১৯; দিনাজপুর বোর্ড-১৭]
২২. কোলেটেরিয়াল গ্রন্থির কী?
২৩. রূপান্তর কী?
২৪. মোল্টিং কী?
২৫. ইনস্টার কী?
২৬. মাইক্রোপাইল কী?
২৭. ডায়াপোজ কী?
২৮. সেন্ট্রোলেসিথাল কী?
২৯. নিম্ফ কী?
৩০. লার্ভা কী? [যশোর বোর্ড-১৫]
৩১. ঘাসফড়িংয়ের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. প্রজাতি পর্যন্ত ঘাসফড়িং-এর শ্রেণিবিন্যাস লিখ।
২. ঘাসফড়িংকে পতঙ্গ শ্রেণিভুক্ত প্রাণী বলা হয় কেন?
৩. ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গগুলোর নাম ও কাজ লিখ।
৪. ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গকে ম্যান্ডিবুলেট মুখোপাঙ্গ বলা হয় কেন?
৫. গিজার্ডের কাজ লিখ।
৬. ঘাসফড়িং-এর রক্ত বর্ণহীন কেন?
৭. ঘাসফড়িং-এর রক্তকে হিমোলিম্ফ বলা হয় কেন?
৮. হিমোসিল বলতে কী বুঝ? [ঢাকা বোর্ড-১৭]
৯. ঘাসফড়িং-এর সংবহনকে মুক্ত সংবহন বলা হয় কেন?
১০. ঘাসফড়িং-এর হৃৎপিণ্ডের গঠন লিখ।
১১. ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়া কখনও বায়ুশূন্য অবস্থায় চুপসে যায় না কেন?
১২. ট্রাকিয়ালতন্ত্র বলতে কী বুঝ? [য. বো.-১৯]
১৩. ওমাটিডিয়াম বলতে কী বুঝ? [দিনাজপুর বোর্ড-১৬]
১৪. সুপারপজিশন ও অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব বলতে কী বুঝ?
১৫. কোন ধরনের আলোতে ঘাসফড়িং ভালো দেখে এবং কেন?
১৬. ঘাসফড়িং অনুজ্জ্বল আলোয় অস্পষ্ট দেখে কেন?
১৭. অসম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ রূপান্তর বলতে কী বুঝ? [সিলেট বোর্ড-১৭]
১৮. ঘাসফড়িং-এর রূপান্তরকে কেন হেমিমেটাবোলাস বলা হয়?

2020/8/4 12:54
Scanned with CamScanner

১৯. ঘাসফড়িং-এর নিম্ফ দশা দীর্ঘ হয় কেন?
২০. ঘাসফড়িং-এ ডায়াপজ ঘটে কেন? *[সিলেট বোর্ড-১৭]*
২১. ওভিপজিটরের কাজ লিখ। *[সিলেট বোর্ড-১৭]*

পার্থক্য লিখ/তুলনা কর :
২২. পুং ও স্ত্রী ঘাসফড়িং
২৩. ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওল
২৪. উন্মুক্ত ও বদ্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র
২৫. সুপারপজিশন ও অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব
২৬. সিলোম ও হিমোসিল
২৭. নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। আঁখি খেলতে যাওয়ার সময় ঘাসের উপর একটি পতঙ্গকে লাফ দিতে লক্ষ্য করল। বাবার কাছ থেকে এ পতঙ্গ সম্পর্কে জানতে চাইলে বাবা বললেন, "এর রেচন পদ্ধতি ভিন্ন প্রকৃতির। রেচনের বর্জ্য পদার্থ পরিপাকের বর্জ্যের সাথে নিষ্কাশিত হয়। আমাদের ক্ষেত্রে রক্ত O_2 পরিবহন করলেও শ্বসনে এ প্রাণীটিই রক্ত তেমন কোনো ভূমিকা রাখে না। এর রয়েছে বিশেষ ধরনের শ্বসনতন্ত্র যেখানে O_2 পরিবহনের প্রয়োজনই পড়ে না।" *[যশোরা বোর্ড-২০১৯]*
ক. ওমটিডিয়াম কী?
খ. ট্রাকিয়ালতন্ত্র বলতে কী বুঝ?
গ. রেচন সম্পর্কে আঁখির বাবার উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি বিশ্লেষণ কর।

২। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বললেন, এক ধরনের পতঙ্গ আছে যা শস্যক্ষেত, সবজির বাগানে থাকে। এদের সমান্তরাল অনেক প্রজাতি এক নিমিষেই ক্ষেতের ফসল বিনাশ করে। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য প্রতীক প্রাণী হিসেবে তোমার জীববিদ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। *[ঢাকা বোর্ড-২০১৭]*
ক. রেচন কী?
খ. হিমোসিল বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের প্রাণীটির রক্তসংবহন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
ঘ. প্রাণীটিই সুষ্ঠু রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৩। ঘাসফড়িংয়ের দেহে অবস্থিত বিশেষ অঙ্গ শ্বসন কার্য সম্পাদন করে, যা রুইমাছের শ্বসন অঙ্গ থেকে আলাদা।
ক. ডায়াপোজ কী?
খ. ঘাসফড়িংকে পতঙ্গ শ্রেণিভুক্ত প্রাণী বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ শ্বসন অঙ্গটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণী দুইটির শ্বসন অঙ্গের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]*

৪। মানবদেহে রক্তের মাধ্যমে O_2 ও CO_2 এর পরিবহন ঘটে। একইভাবে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত অন্য একটি প্রাণীতে কতগুলো সূক্ষ্মনালিকা এবং তাদের শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে O_2 ও CO_2 এর পরিবহন ঘটে।
ক. ওসেলি কী?
খ. ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গকে ম্যান্ডিবুলেট মুখোপাঙ্গ বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ২য় প্রাণীটির শ্বসন অঙ্গের বর্ণনা দাও। *[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির শ্বসন কৌশল কি একই রকম? যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখ। *[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*

৫। পঙ্গপাল নামধারী পতঙ্গটির দর্শন ইন্দ্রীয় হলো পুঞ্জাক্ষি। উজ্জ্বল আলোতে প্রাণীটি শুধুমাত্র উল্লম্ব আলোকরশ্মির মাধ্যমে দর্শন সম্পন্ন করে। মৃদু আলোতে প্রাণীটি দর্শন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে উল্লম্ব ও তীর্যক দুই ধরনের আলোকরশ্মিই ব্যবহার করে।
ক. হাইপোগন্যাথাস মস্তক কী? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*
খ. ঘাসফড়িং-এর রক্ত বর্ণহীন কেন?
গ. উদ্দীপক অনুসারে শুধুমাত্র উল্লম্ব আলোক দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবিম্ব সচিত্র ব্যাখ্যা কর। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষ বাক্যটির ঘটনাবলি চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*

৬। জীববিজ্ঞান শিক্ষক ক্লাসে পাঠ্যসূচিভুক্ত একটি পতঙ্গের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি পড়াতে গিয়ে বললেন যে, এদের রেচন অঙ্গটি অনেকগুলো সূক্ষ্ম নালিকা দ্বারা গঠিত। দর্শন অঙ্গটি আলোর ভিন্নতার উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম।
ক. রূপান্তর কী?
খ. ঘাসফড়িং-এর রক্তকে হিমোলিম্ফ বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের প্রথম উক্তিটির গঠন বিন্যাস উল্লেখ কর। *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]*
ঘ. উদ্দীপকে অনুযায়ী শিক্ষকের দ্বিতীয় উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর। *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]*

৭। কৃষিবিদ সামাদ সাহেব ফসলের জন্য ক্ষতিকর একটি পোকার আলোকসংবেদী অঙ্গ দেখিয়ে বললেন এটি স্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকারী অসংখ্য কার্যকরী একক নিয়ে গঠিত।
ক. উপযোজন কী? *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]*
খ. ঘাসফড়িং-এর সংবহনকে মুক্ত সংবহন বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র দাও। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]*
ঘ. উল্লিখিত প্রতিবিম্ব তৈরির ভিন্নতা আলোর প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে– বিশ্লেষণ কর। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]*

৮। সন্ধ্যায় রবিউল তার পড়ার টেবিলে একটি পতঙ্গ দেখতে পায় যা সন্ধিযুক্ত পায়ের সাহায্যে লাফ দিতে পারে এবং ডানার সাহায্যে উড়তেও পারে।
ক. হিমোসিল কী? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৬]*
খ. ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়া কখনও বায়ুশূন্য অবস্থায় চুপসে যায় না কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির দর্শন অঙ্গের একক গঠনের বর্ণনা কর। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৬]*
ঘ. উদ্দীপকের প্রাণীটির সংবহন তন্ত্রের সাথে তোমার রক্ত সংবহনতন্ত্রের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৬]*

৯। সবুজ বর্ণের এক ধরনের ফড়িং কৃষক আনোয়ারের ক্ষেতের সবজি খেয়ে ফেলে। অদ্ভুত মুখোপাঙ্গের এই প্রাণীটি সবজির নরম অংশ কাটতে ও খাদ্য গ্রহণের পর হজমে বেশ অভ্যস্ত। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬]*
ক. ঘাসফড়িংয়ের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।
খ. ওমাটিডিয়াম বলতে কী বোঝ?
গ. 'সবজি পাতা কেটে ফেলার সঙ্গে' সম্পর্কিত উপাঙ্গগুলোর চিহ্নিত চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর।
ঘ. 'প্রাণীটির পরিপাকতন্ত্র সবজি হজমে বেশ অভ্যস্ত'– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

2020/8/4 12:54
Scanned with CamScanner

2020/8/4 12:37

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়
মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

ঐতিহ্যে ৫১ বছর
কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড

Scanned with CamScanner

প্রাণীর পরিচিতি
INTRODUCTION OF ANIMAL

অধ্যায় ২

প্রাণিজগতের বিস্তৃতি ব্যাপক। প্রাণিজগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে প্রাণীর দৈহিক গঠন, জীবতত্ত্ব ও জীবনচক্র সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগতের সকল সদস্যের জীবন ইতিহাস আলাদাভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। (কারণ এদের বসতি, গঠন, চলন, খাদ্য গ্রহণ, আচার-ব্যবহার, প্রজনন ইত্যাদিতে রয়েছে বৈচিত্র্য।) কিন্তু বিভিন্ন পর্বের একটি প্রাণী সম্পর্কে অধ্যয়ন করে ঐ পর্বের সকল প্রাণী সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। এ অধ্যায়ে হাইড্রা, ঘাসফড়িং এবং রুই মাছের জীবন ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট পর্বের সকল প্রাণী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

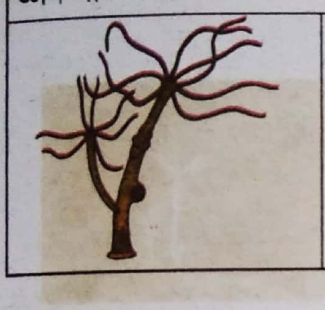
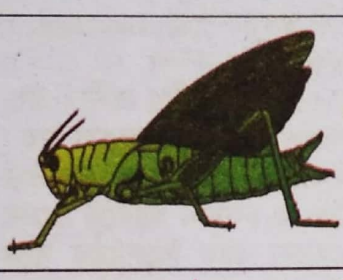


এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ২৫)
১. হাইড্রার গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ২. হাইড্রার খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৩. হাইড্রার চলন ও জনন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. হাইড্রার মিথোজীবিতা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. **ব্যবহারিক** হাইড্রা পর্যবেক্ষণ করে চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ৬. ঘাসফড়িং-এর গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ৭. ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র ও পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৮. **ব্যবহারিক** ঘাসফড়িং এর উপাঙ্গ শনাক্ত ও চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ঘাসফড়িং এর পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ শনাক্ত করতে পারবে। ৯. ঘাসফড়িং-এর সংবহন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১০. ঘাসফড়িং এর শ্বসন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১১. ঘাসফড়িং এর রেচন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১২. ঘাসফড়িং এর প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৩. ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষীর গঠন ও দর্শন কৌশল বর্ণনা করতে পারবে। ১৪. রুই মাছের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ১৫. রুই মাছের রক্ত সংবহন তন্ত্রের বর্ণনা করতে পারবে। ১৬. **ব্যবহারিক** ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের রক্ত সংবহন তন্ত্র পর্যবেক্ষণ এবং চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ১৭. রুই মাছের শ্বসন ও বায়ুথলির গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ১৮. ব্যবহারিক ○ রুই মাছের ফুলকা ও বায়ুথলি শনাক্ত করতে পারবে। ১৯. প্রকৃতিতে রুই মাছের প্রজনন ও নিষেক বর্ণনা করতে পারবে। ২০. রুই জাতীয় মাছের সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● **হাইড্রা** (*Hydra*) ○ গঠন (দেহপ্রাচীরের কোষের বৈশিষ্ট্যসহ) ○ খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া ○ চলন ও জনন ○ মিথোজীবিতা ● **ব্যবহারিক** ○ হাইড্রার স্থায়ী স্লাইড/মডেল পর্যবেক্ষণ ● **ঘাসফড়িং** (*Poecilocerux pictus*) ○ গঠন (বাহ্যিক) ○ পরিপাকতন্ত্র-মুখ উপাঙ্গ, পরিপাক গ্রন্থি ● **ব্যবহারিক** ○ ঘাসফড়িং/আরশোলা এর মুখ উপাঙ্গ ○ ঘাসফড়িং/আরশোলার পরিপাকতন্ত্র ও গ্রন্থি পর্যবেক্ষণ ● **ঘাসফড়িং** ○ সংবহন পদ্ধতি ○ শ্বসন পদ্ধতি ○ রেচন পদ্ধতি ○ প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর ● **ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষী** ○ গঠন ○ দর্শন কৌশল ● **রুই মাছ** (*Labeo*) ○ দেহ গঠন (বাহ্যিক) ○ রক্ত সংবহনতন্ত্র ● **ব্যবহারিক** ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের রক্ত সংবহন তন্ত্র পর্যবেক্ষণ। ○ শ্বসন ও বায়ুথলির গঠন ● **ব্যবহারিক** ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের ফুলকা ও বায়ুথলির পর্যবেক্ষণ ● জীবন চক্র ● সংরক্ষণ (প্রাকৃতিক)

2020/8/4 12:47

Scanned with CamScanner

২.৩ রুই মাছ (*Labeo rohita*)

কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে আমাদের দেশে **রুই মাছ** (*Labeo rohita*) সুপরিচিত অস্থিযুক্ত মাছ। এদের মেজর কার্প বলা হয়। প্রধানত Cyprinidae গোত্রের মাছদের মধ্যে যেগুলো পরিণত অবস্থায় 100 সেন্টিমিটার থেকে বড় এবং 1.5 কেজি ওজনের বেশি হয় তাদের **মেজর কার্প** বলা হয়। যেমন– রুই, কাতলা, মৃগেল। এছাড়া এ গোত্রের অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম ওজনের মাছদের **মাইনর কার্প** বলা হয়। যেমন– বাটা, ঘনিয়া। স্বাদ, সহজ চাষ পদ্ধতি, সুলভ, জনপ্রিয়, প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় এই মাছের অর্থনৈতিক যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ক্রান্তীয় আফ্রিকা, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এরা বিস্তৃত। বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারে বিভিন্ন স্বাদু পানির জলাশয়ের মধ্যস্তরে এদের পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অন্যান্য কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে রয়েছে কাতলা, মৃগেল কালিবাউস প্রভৃতি।

▪ শ্রেণিবিন্যাস (Classification)

Phylum — Chordata (জীবনের যে কোন পর্যায় নটোকর্ড, নার্ভকর্ড ও গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র থাকে)
Sub-phylum — Vertebrata (পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে নটোকর্ড মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়)
Sub class — Actinopterygii (রশ্মিযুক্ত পাখনা)
Order — Cypriniformes (পার্শ্বরেখা সংবেদী অঙ্গ লেজের শীর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত)
Family — Cyprinidae (দাঁতবিহীন ভোমার, গলবিলীয় দাঁত উপস্থিত)
Genus — *Labeo*
Species — *Labeo rohita* (Hamilton, 1822)

▪ **স্বভাব ও বাসস্থান (Habit and Habitat) :** রুই মাছ স্বাদু বা মিঠাপানির অধিবাসী। এরা স্বচ্ছ পানিতে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং ফুলকার সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। এরা প্রধানত **শাকাশী** (herbivorous), বিশেষ করে শ্যাওলা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে এবং পানির মধ্যস্তর বাসী। বিভিন্ন ধরনের **ক্ষুদ্র প্ল্যাঙ্কটন** (plankton) এরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। অপরিপক্ক বাচ্চারা (fry) **জ্যুওপ্ল্যাঙ্কটন** (zooplankton) ভক্ষণ করে। মাছের পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে চলে এবং পরিণত মাছ পৃথক জীবন অতিবাহিত করে। এদের যৌন পরিপক্কতা লাভ করতে সময় লাগে ২-৩ বছর। **জুন-জুলাই** (বর্ষাকালে) মাসে প্রবাহমান পানিতে স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে এবং পুরুষ মাছ শুক্রাণু ত্যাগ করে। বাংলাদেশের কর্ণফুলীর শাখা নদী হালদা (চট্টগ্রাম) রুই মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে গণ্য। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় প্রভৃতি জলাশয় এদের সাধারণ আবাসস্থল। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমেও বিভিন্ন জলাশয়ে এদের বাণিজ্যিক চাষ করা হয়। রুই মাছ ১৪° সেলসিয়াসের নিচের তাপমাত্রায় বাঁচতে পারে না।

রুই মাছের বাহ্যিক গঠন (External features of *Labeo*)

রুই (*Labeo*) একটি অস্থিময় মাছ। এর দেহ লম্বাটে মাকু আকৃতির। এর পিঠের দিক হালকা কালো বা হালকা ধূসর বর্ণের হয় এবং দু'পাশ ও উদর রূপালি সাদা বর্ণের হয়। চলনের সময় পানির ভেতর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলে এ ধরনের আকৃতিকে **স্ট্রিমলাইন্ড** (streamlined) বলে। পরিণত রুই মাছ এক মিটারের মতো দীর্ঘ হয় এবং ২০-২৫ কেজি ওজন বিশিষ্ট হয়। সমগ্র দেহ তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা– **মস্তক** বা **মাথা, দেহকাণ্ড** ও **লেজ**।



চিত্র ২.৩.১ক : রুই মাছের (*Labeo*-র) বাহ্যিক গঠন

১। মস্তক (Head) : দেহের অগ্রপ্রান্ত হতে কানকো পর্যন্ত অংশকে মস্তক বলে। মস্তকের কিছুটা নিচের দিকে অর্ধগোলাকার মুখছিদ্র অবস্থিত। মুখছিদ্র নরম **মাংসল ঠোঁট** (fleshy lip) দ্বারা পরিবেষ্টিত। এদের চোয়াল দাঁতশূন্য তবে ধারাল কর্তন **আল** (edge) বিদ্যমান। মুখছিদ্রের দু'পাশে উপরের চোয়ালে দুটি ক্ষুদ্র সুতার মতো সংবেদী **ম্যাক্সিলারি স্পর্শী** বা **বার্বেল** (maxillary barbels) থাকে। মস্তকের দু'পাশে দুটি বড় চোখ থাকে। চোখ দুটি গোলাকার এবং চক্ষুপল্লব বিহীন। প্রতিটি চোখের সামনে একটি করে নাসারন্ধ্র অবস্থান করে। মস্তকের প্রত্যেক পার্শ্বে একটি বৃহৎ ফুলকা প্রকোষ্ঠ থাকে। এতে চারটি করে চিরুনি আকারের ফুলকা থাকে। ফুলকা প্রকোষ্ঠটি বৃহৎ নড়নক্ষম

2020/8/4 12:55

Scanned with CamScanner

কানকো বা কানকুয়া (operculum) দ্বারা ঢাকা থাকে। কানকোর মুক্ত প্রান্তে একটি পেশিময় পর্দা থাকে, একে **ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা** (branchiostegal membrane) বলে। এটি কানকোকে দেহপৃষ্ঠের সাথে ঘনিষ্টভাবে আটকাতে এবং উঠা-নামা করতে সাহায্য করে। এটি মাছের শ্বসনেও ভূমিকা রাখে। মাছের পার্শ্বদেশে ও কানকোর মধ্যবর্তী স্থানে অর্ধচন্দ্রাকৃতির ফুলকাছিদ্র বিদ্যমান।

২। দেহকাণ্ড (Trunk) : কানকোর পেছন থেকে পায়ু পর্যন্ত অংশকে দেহকাণ্ড বলে। মস্তক ও লেজের তুলনায় দেহকাণ্ড অনেক বড়। দেহকাণ্ড প্রশস্ত, উঁচু এবং প্রস্থচ্ছেদে ডিম্বাকার। মস্তকের পরবর্তী দেহের অগ্রভাগ থেকে লেজের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দেহকাণ্ডের দুই পাশ বরাবর **পার্শ্বরেখা** (lateral line) নামে দুটি অনুদৈর্ঘ্য রেখা বিদ্যমান। এতে খাদ ও গর্তের সমন্বয়ে গঠিত অসংখ্য **পার্শ্বরেখা অঙ্গ নিউরোমাস্ট** (lateral line organ- neuromasts) নামক সংবেদি অঙ্গ বিদ্যমান যাদের মাধ্যমে মাছ পানির রাসায়নিক গুণাগুণ নির্ণয় করতে সক্ষম।

পাখনাসমূহ (Fins) : রুই মাছে মোট ৫ ধরনের পাখনা রয়েছে। পাখনা সাধারণত চাপা ও **পাখনা-রশ্মিযুক্ত** (fin-ray)। পাখনা মাছের চলনাঙ্গ হিসেবে কাজ করে। রুই মাছে পাখনাগুলো হলো: **যুগ্ম পাখনা** (paired fins)– বক্ষ পাখনা ও শ্রোণি পাখনা এবং **অযুগ্ম প্রকৃতির** (impaired fins)– পৃষ্ঠ পাখনা, পায়ু পাখনা ও পুচ্ছ পাখনা।

অবস্থান : দেহকাণ্ডের মাঝ বরাবর পৃষ্ঠদেশে একটি বৃহৎ **পৃষ্ঠ পাখনা** (dorsal fin), পার্শ্বদিকে কানকোর পেছনে একজোড়া বড় **বক্ষ পাখনা** (pectoral fin), বক্ষপাখনার পেছনে একজোড়া **শ্রোণি পাখনা** (pelvic fin) ও পায়ুর কাছাকাছি একটি **পায়ু পাখনা** (anal fin) থাকে। রুই মাছের পৃষ্ঠ পাখনায় ১৪-১৬টি পাখনা-রশ্মি, বক্ষ-পাখনায় ১৭-১৮টি পাখনা-রশ্মি, শ্রোণি পাখনায় ৯টি পাখনা-রশ্মি, পায়ু পাখনায় ৬-৭টি পাখনা-রশ্মি এবং পুচ্ছ পাখনায় ১৯টি পাখনা-রশ্মি থাকে। দেহকাণ্ডের পশ্চাৎ প্রান্তে মধ্য অক্ষীয় দিকে তিনটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। যথা– অগ্র **পায়ুছিদ্র**, মধ্য **জনন ছিদ্র** এবং পশ্চাৎ **রেচনছিদ্র**।

রুইমাছের পাখনা সূত্র (Fin formula) : D 3/12-13; P_1 1/17; P_2 1/8; A 2/5 (Encyclopedia of Flora & Fauna of Bangladesh, 2007. Vol. 23)

৩। লেজ (Tail) : মেরুদণ্ডী প্রাণীর পায়ু পরবর্তী কশেরুকা সমৃদ্ধ দেহাংশ লেজ নামে পরিচিত। রুই মাছের লেজ পাশাপাশি চাপা এবং পশ্চাৎদিকে ক্রমশ সরু। লেজের শীর্ষে একটি **হোমোসার্কাল** (homocercal) **পুচ্ছ পাখনা** (caudal fin) থাকে, যা দুটি সমান খণ্ডে বিভক্ত। পুচ্ছ পাখনাসহ লেজ **চলন অঙ্গ** হিসেবে কাজ করে।

আঁইশ (Scales)



চিত্র : ২.৩.১খ. রুই মাছের আঁইশ

রুই মাছের দেহকাণ্ড ডার্মাল মিউকাসময় **সাইক্লয়েড আঁইশ** (cycloid scale) দ্বারা আবৃত। আঁইশগুলোর উৎপত্তি ত্বকের **ডার্মাল স্তর** থেকে। এটি চাকতির ন্যায় আকার বিশিষ্ট এবং মোটামুটি গোলাকার ও রূপালি চকচকে। আঁইশের কেন্দ্রভাগ পুরু এবং কিনারার দিক ক্রমশ পাতলা। আঁইশের সম্মুখভাগ তন্তুময় যোজক টিস্যু-নির্মিত এবং ডার্মিস পকেটে প্রবিষ্ট থাকে। পশ্চাৎভাগ ডেন্টিন-নির্মিত ও উন্মুক্ত।

আঁইশের কেন্দ্রে একটি স্বচ্ছ অংশ দেখা যায়। একে **ফোকাস** বা **নিউক্লিয়াস** (focus or nucleus) বলে। ফোকাসের চারদিকে **সারকুলাস** (circulus; বহুবচনে-circuli) ও **অ্যানুলাস** (annulus) বা **বার্ষিক বৃদ্ধি রেখা** (annual growth ring) নামক দু'ধরনের বৃত্তাকার রেখা অবস্থান করে। বার্ষিক বৃদ্ধি রেখাগুলো গভীর, স্পষ্ট ও মোটা হয় এবং বছরে মাত্র একটি করে সৃষ্টি হয়। এ রেখার সাহায্যে মাছের বয়স ও বৃদ্ধিহার নির্ণয় করা যায়। সাধারণত **বসন্তকালে** ও **গ্রীষ্মে** মাছ ও আঁইশের বৃদ্ধি বেশি হয়। আঁইশগুলো টালির ন্যায় পরস্পরকে অতিক্রম করে (overlaping) অবস্থান করে অর্থাৎ একটির পশ্চাৎভাগ পরবর্তীটির সম্মুখভাগ ঢেকে রাখে। আঁইশের পশ্চাৎভাগ মসৃণ এবং পরিধি ঢেউ খেলানো। আঁইশের অগ্রক্ষেত্রে কতগুলো লম্বালম্বি খাঁজ দেখা যায়। এদের **রেডিই** (radii) বলে। আঁইশ রাসায়নিকভাবে চুন ও কোলাজেন তন্তু দিয়ে গঠিত। **আঁইশ মাছের প্রধান প্রতিরক্ষাকারী অঙ্গ**। এছাড়া আঁইশ চলনের সময় পানির বাধা হ্রাস করে এবং শ্রেণিবিন্যাস, বয়স ও বৃদ্ধিহার নির্ণয়ে ভূমিকা রাখে। আঁইশগুলো সব সময় মিউকাসের পাতলা পিচ্ছিল আস্তরণে আবৃত থাকে। স্যামন, লাংফিশ ও কার্পজাতীয় সকল মাছেই এ ধরনের আঁইশ পরিলক্ষিত হয়।

রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory System)

রুই মাছের রক্ত সংবহন বদ্ধ প্রকৃতির। রক্ত নির্দিষ্ট নালির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে দেহে সঞ্চারিত হয়। **রক্ত, হৃৎপিণ্ড, ধমনিতন্ত্র ও শিরাতন্ত্র** নিয়ে রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত।

2020/8/4 12:55

Scanned with CamScanner

রক্ত (Blood)

রুই মাছের রক্ত কিছুটা ফ্যাকাশে লাল। এটি **রক্তরস** (plasma) ও **রক্তকণিকা** (blood corpuscles) নিয়ে গঠিত। বর্ণহীন রক্তরসে দুই প্রকার কণিকা ভাসমান অবস্থায় থাকে, যথা– লোহিত কণিকা ও শ্বেতকণিকা। লোহিত কণিকা ডিম্বাকার, দ্বিউত্তল, নিউক্লিয়াসযুক্ত ও **হিমোগ্লোবিন** সমৃদ্ধ। শ্বেতকণিকা নির্দিষ্ট আকৃতিবিহীন অর্থাৎ অ্যামিবার ন্যায় (amoeboid) এবং এতে নিউক্লিয়াস থাকে না।

হৃৎপিণ্ড (Heart)

রুই মাছের হৃৎপিণ্ড কেবল CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে। এজন্য একে **শিরা হৃৎপিণ্ড** বা **ভেনাস হার্ট** (venous heart) বলে। সকল মাছের হৃৎপিণ্ডই ভেনাস প্রকৃতির। রুই মাছের হৃৎপিণ্ড দেহের অঙ্কীয়তলে **পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরে** (pericardial cavity) অবস্থিত। হৃৎপিণ্ড **পেরিকার্ডিয়াল পর্দা** (pericardial membrane) দ্বারা আবৃত থাকে। রুই মাছের হৃৎপিণ্ড **অলিন্দ** বা **অ্যাট্রিয়াম** (atrium) ও **নিলয়** বা **ভেন্ট্রিকল** (ventricle) দুটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। এ ছাড়া **সাইনাস ভেনোসাস** (sinus venosus) নামক একটি উপপ্রকোষ্ঠ থাকে। এর প্রাচীর পাতলা এবং এ উপপ্রকোষ্ঠে শিরার CO_2 যুক্ত রক্ত জমা হয়। এটি পার্শ্বদিকের দুটি বৃহৎ শিরা, **ডাক্টাস ক্যুভিয়ে** (ductus cuviri) এবং একজোড়া **হেপাটিক সাইনাস** (hepatic sinuses)-এর মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করে। এটি হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এবং **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল** (sino-atrial) ছিদ্রপথে অ্যাট্রিয়ামের সাথে যুক্ত। এ পথে CO_2 যুক্ত রক্ত অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।

অ্যাট্রিয়াম হৃৎপিণ্ডের বৃহত্তম প্রকোষ্ঠ। এটি পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের সম্মুখ পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত। এর প্রাচীরও পাতলা। এটি **অলিন্দ-নিলয়** (atrio-ventricular) ছিদ্রপথে ভেন্ট্রিকলে উন্মুক্ত হয়। এ পথে CO_2 যুক্ত রক্ত অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে যায়। **ভেন্ট্রিকল** হৃৎপিণ্ডের সর্বশেষ প্রকোষ্ঠ। এটি পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের অঙ্কীয় পশ্চাৎদেশে অবস্থিত। এর প্রাচীর পুরু ও মাংসল এবং এটি সম্মুখে **বাল্বাস আর্টারিওসাস** (bulbus arteriosus)-এ উন্মুক্ত।

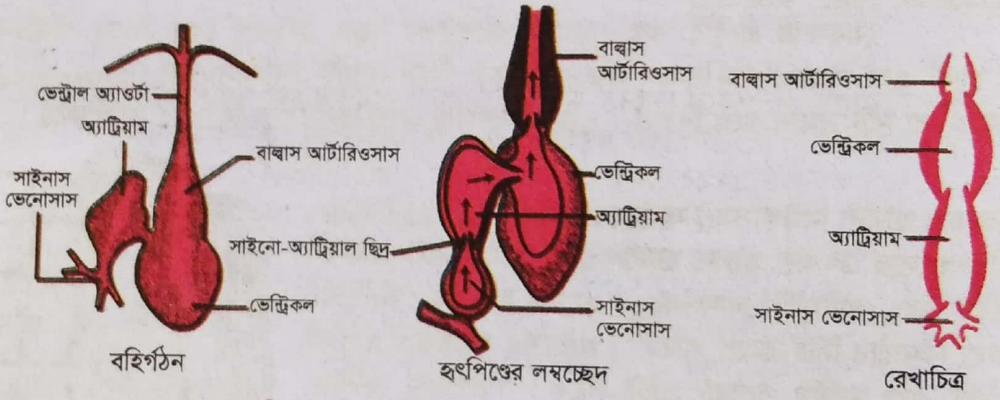

চিত্র ২.৩.২. রুই মাছের (*Labeo*-র) হৃৎপিণ্ড

রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে **কোনাস আর্টিরিওসাস** (conus arteriosus) নেই। তবে অঙ্কীয় ধমনির বা **ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার** (ventral aorta) গোড়া স্ফীত হয়ে বাল্বাস আর্টারিওসাস বা **বাল্বাস অ্যাওর্টা** (bulbus aorta) গঠন করে। এটি হৃৎপিণ্ড থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টায় রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এটি হৃৎপিণ্ডের কোনো অংশ নয়। হৃৎপিণ্ডের উপপ্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠগুলোর সংযোগস্থলে **কপাটিকা** (valve) থাকে। কপাটিকাগুলো শুধু সামনের দিকে খুলে, ফলে রক্ত শুধুমাত্র সামনের দিকে যেতে পারে এবং বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়। ফলে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে CO_2 যুক্ত রক্ত পেছন থেকে সামনের দিকে একমুখীভাবে প্রবাহিত হয়। এই ধরনের রক্ত প্রবাহকে **একচক্রী রক্তপ্রবাহ** (single circuit circulation) বলে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ দ্বারা রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ

- **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল কপাটিকা** (Sino-atrial valve) : সাইনাস ভেনোসাস ও অ্যাট্রিয়াম বা অলিন্দের সংযোগস্থলে অবস্থিত কপাটিকা।
- **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা** (Atrio-ventricular valve) : অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকল বা নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত কপাটিকা।
- **ভেন্ট্রিকুলো-বাল্বাস কপাটিকা** (Ventriculo-bulbus valve) : ভেন্ট্রিকল ও বাল্বাস আর্টিরিওসাসের সংযোগস্থলে অবস্থিত কপাটিকা।

2020/8/4 12:55

Scanned with CamScanner

রক্ত সংবহন কৌশল (Blood circulation mechanism)

হৃৎপিণ্ড হতে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত একমুখী প্রবাহে O_2 সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ফুলকাতে প্রেরিত হয়। একটি ছন্দোময় তালে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংকুচিত হয়। সর্বপ্রথম সাইনাস ভেনোসাসে সংকোচন ঘটে। পরে ক্রমে অ্যাট্রিয়াম, ভেন্ট্রিকল ও বাল্বাস আর্টারিওসাসে সংকোচন সংঘটিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রতিবার সংকোচনকে **সিস্টোল** (systole) বলে। সিস্টোলের পরপরই হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (diastole) বলা হয়। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকা রক্তের একমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করে।

রক্তের গতিপথ : সাইনাস ভেনোসাস → অ্যাট্রিয়াম → ভেন্ট্রিকল → বাল্বাস আর্টারিওসাস → ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা → ফুলকা

একচক্রী বা একবর্তনী সংবহন

যে সংবহনে রক্ত একবার মাত্র হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে একটি মাত্র চক্র সম্পন্ন করে তাকে একচক্রী সংবহন (single circuit circulation) **বলে**। যেমন– মাছের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত অন্তর্বাহী বা অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনির মাধ্যমে ফুলকায় যায়, সেখানে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় হয় এবং O_2 যুক্ত রক্ত বহির্বাহী বা ইফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি দিয়ে দেহ কোষে পৌঁছে। দেহে বিপাকীয় কাজের পর উৎপন্ন CO_2 যুক্ত রক্ত শিরাতন্ত্রের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এক্ষেত্রে রক্ত একটি চক্রে আবর্তিত হয়। হৃৎপিণ্ড শুধু CO_2 যুক্ত রক্ত বহন করে।

একচক্রী রক্ত সংবহনের প্রবাহচিত্র :

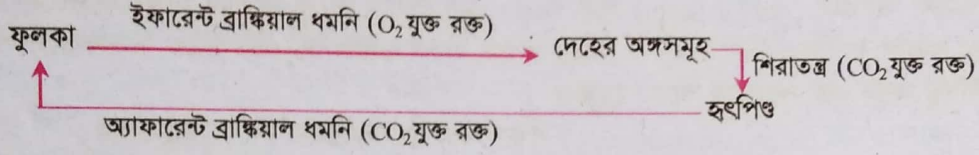

ধমনিতন্ত্র (Arterial System)

হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন যে বাহিকা দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ত পরিবহন করে তাদের **ধমনি** (artery) বলে। ধমনির সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে **ধমনিতন্ত্র** বলে। রুই মাছের ধমনিতন্ত্র প্রধানত অন্তর্বাহী (afferent) ও বহির্বাহী (efferent) ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি, ডর্সাল অ্যাওর্টা ও এর শাখা-প্রশাখা নিয়ে গঠিত।

(ক) অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনি বা অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল আর্টারি (Afferent branchial artery) **: যেসব ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুলকাতে বহন করে তাদের অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনি বলে**। হৃৎপিণ্ডের বাল্বাস আর্টিরিওসাস থেকে **ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা** (ventral aorta) উৎপন্ন হয়ে গলবিলের মাঝ বরাবর উভয় পাশের ফুলকাগুলোর মাঝ দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা থেকে মোট ৪ জোড়া অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি উৎপন্ন হয়ে উভয় পাশের ৪ জোড়া ফুলকার মধ্যে প্রবেশ করে। ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার অগ্রভাগ বিভক্ত হয়ে ১ম জোড়া এবং এর কিছুটা পশ্চাতে ২য় জোড়া অন্তর্বাহী বা অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি উৎপন্ন হয়। এরা পরবর্তী সময়ে ১ম ও ২য় জোড়া ফুলকায় প্রবেশ করে। ২য় জোড়া ধমনির পশ্চাতে অবস্থিত ৩য় ও ৪র্থ জোড়া অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার উভয় পাশ থেকে উৎপন্ন হয়ে যথাক্রমে ৩য় ও ৪র্থ ফুলকায় প্রবেশ করে। প্রতিটি ফুলকা ল্যামেলায় রক্ত সরবরাহ করার পর কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়।

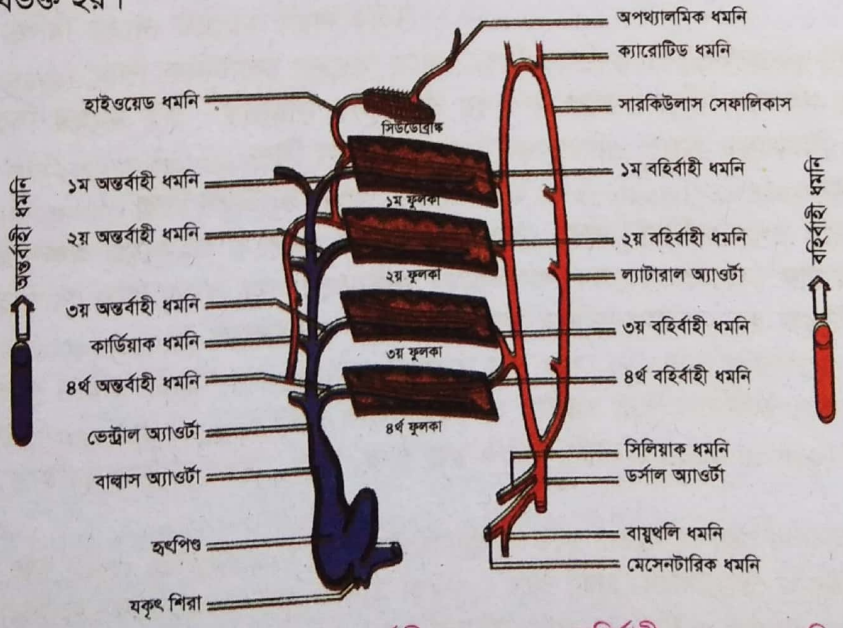

চিত্র ২.৩.৩ : রুই মাছের (*Labeo*-র) অন্তর্বাহী (afferent) ও বহির্বাহী (efferent) ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র

2020/8/4 12:55

Scanned with CamScanner

(খ) বহির্বাহী ফুলকা ধমনি বা ইফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল আর্টারি (Efferent branchial artery) : **যেসব ধমনি ফুলকা হতে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে তাদের বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বলে।**

রুই মাছের ৪ জোড়া ফুলকা থেকে ৪ জোড়া বহির্বাহী বা ইফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি সৃষ্টি হয় এবং ফুলকা হতে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সংগ্রহ করে। প্রত্যেক ফুলকা আর্চে একটি অ্যাফারেন্ট ও একটি ইফারেন্ট ফুলকা ধমনি থাকে। ১ম ইফারেন্ট ফুলকা ধমনি অঙ্কীয় দিকে হাইওয়েড আর্চের হ্রাস প্রাপ্ত ফুলকা বা **সিউডো ব্রাঙ্কে** (pseudo branch) রক্ত বহন করে এবং এটি সামনের দিকে **অপথ্যালমিক ধমনিতে** (ophthalmic artery) বিস্তৃত হয় এবং চোখে রক্ত সরবরাহ করে। প্রতি পার্শ্বের ১ম ও ২য় ইফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি মিলিত হয়ে **পার্শ্বীয় ধমনি** (lateral artery) সৃষ্টি করে। ৩য় ও ৪র্থ ধমনি পার্শ্বীয় ধমনিতে মুক্ত হওয়ার পূর্বে একত্রে মিলিত হয়ে পার্শ্বীয় ধমনিতে মুক্ত হয়। পার্শ্বীয় ধমনি সামনের দিকে **ক্যারোটিড ধমনি** (carotid artery) আকারে বিস্তৃত এবং করোটিকার মধ্যে প্রবেশ করে। দু'পাশের পার্শ্বীয় ধমনি ও ক্যারোটিড ধমনি গলবিল অঞ্চলে মিলিত হয় এবং পৃষ্ঠীয় দিকে একটি ডিম্বাকার ধমনি বলয় সৃষ্টি করে। একে **সারকিউলাস সেফালিকাস** (circulus cephalicus) বলে।

(গ) ডর্সাল অ্যাওর্টা (Dorsal aorta) : দুই পাশের দুটি পার্শ্বীয় ধমনি পরস্পর পশ্চাতে একত্রে মিলিত হয়ে **পৃষ্ঠীয় মহাধমনি বা ডর্সাল অ্যাওর্টা** (dorsal aorta) সৃষ্টি করে। এটি পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হয়ে মেরুদণ্ডের নিচ দিয়ে লেজ অঞ্চলে পুচ্ছ বা কডাল ধমনিতে মিলিত হয়। দেহের পশ্চাৎ দিকে ডর্সাল অ্যাওর্টা থেকে অনেকগুলো শাখা ধমনি বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে। যেমন–

১। **সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনি** (Subclavian artery) : বক্ষপাখনা ও বক্ষচক্রের দিকে বিস্তৃত হয়।

২। **সিলিয়াকো-মেসেন্টারিক ধমনি** (Coeliaco-mesenteric artery) : পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, মলাশয় ইত্যাদি অন্ত্রীয় অঙ্গাদিতে রক্ত পরিবহন করে।

৩। **প্যারাইটাল ধমনি** (Parietal artery) : দেহ প্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করে।

৪। **বৃক্কীয় ধমনি** (Renal artery) : বৃক্কে রক্ত পরিবহন করে।

৫। **জেনিটাল ধমনি** (Genital artery) : জনন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে।

৬। **ইলিয়াক** (Iliac artery) : শ্রোণি পাখনায় রক্ত পরিবহন করে।

৭। **কড্যাল বা পুচ্ছ ধমনি** (Caudal artery) : পুচ্ছে (লেজে) রক্ত সরবরাহ করে।

শিরাতন্ত্র (Venous system)

যেসব রক্তবাহিকা দেহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে পরিবহন করে তাদের **শিরা** (vein) বলে। বিভিন্ন শিরা নিয়ে গঠিত রক্ত সংবহনতন্ত্রকে **শিরাতন্ত্র** বলে। রুই মাছের শিরাতন্ত্রকে প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– ১। **সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র** এবং ২। **পোর্টাল শিরাতন্ত্র**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো–

১। **সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র** (Systemic venous system) : যেসব শিরার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্র হতে CO_2 যুক্ত রক্ত সরাসরি (প্রত্যক্ষভাবে) হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের সিস্টেমিক শিরা (systemic vein) বলে। সিস্টেমিক শিরাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে বলা হয় **সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র**। রুই মাছের সিস্টেমিক শিরাতন্ত্রের প্রধান অংশ গঠনকারী শিরাসমূহ হলো– একজোড়া **সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা** (anterior cardinal vein), একজোড়া **ইনফিরিয়র জুগুলার শিরা** (inferior jugular vein) ও একজোড়া **পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা** (posterior cardinal vein)।

দেহের সম্মুখ অংশ হতে সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা (চক্ষুগোলক, নাসা অঞ্চল ও হাইওয়েড অঞ্চল হতে) ও ইনফিরিয়র জুগুলার শিরা (নিম্নচোয়ালের পার্শ্বদেশ ও ফুলকা থলিসমূহের অঙ্কীয়দেশ) রক্ত সংগ্রহ করে সে পাশের **ডাক্টাস ক্যুভিয়ে** (ductus cuviri)- তে উন্মুক্ত হয়। ডাক্টাস কুভিয়ে আবার **সাইনাস ভেনোসাসে** (sinus venosus) মুক্ত হয়। **পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা** দেহের পশ্চাৎভাগ হতে CO_2 যুক্ত রক্ত সংগ্রহ করে এবং সে পাশের ডাক্টাস কুভিয়েতে উন্মুক্ত হয়। উভয় (বাম ও ডান) পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা **খণ্ডকীয় বা সেগমেন্টাল শিরা** (segmental vein), **রেনাল শিরা** (renal vein), **জেনিটাল শিরা** (genital vein) ইত্যাদি হতেও রক্ত গ্রহণ করে। উভয় ডাক্টাস ক্যুভিয়ে হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাসে মুক্ত হয়।

প্রতি পাশের বক্ষ-পাখনা ও শ্রোণির পাখনা হতে **সাবক্ল্যাভিয়ান শিরা** (subclavian vein) রক্ত সংগ্রহ করে ডাক্টাস ক্যুভিয়ে এর মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে প্রেরণ করে। এছাড়া ডান ও বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা কিছু অনুপ্রস্থ শিরা দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এদের **অনুপ্রস্থ বা ট্রান্সভার্স অ্যানাস্টোমোসিস** (transverse anastomosis) বলে।

2020/8/4 12:55

Scanned with CamScanner

২। পোর্টাল শিরাতন্ত্র (Portal venous system) : কৈশিক নালিকা হতে উৎপন্ন হয়ে CO_2 যুক্ত রক্ত নিয়ে হৃৎপিণ্ডে যাওয়ার পথে যেসব শিরা অন্য কোনো অঙ্গে প্রবেশ করে আবার কৈশিক নালিতে পরিণত হয়, তাদেরকে পোর্টাল শিরা বলে। পোর্টাল শিরাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে বলা হয় **পোর্টাল শিরাতন্ত্র**। পোর্টাল শিরা পরোক্ষভাবে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়ে আনে। রুই মাছের পোর্টাল শিরাতন্ত্র **যকৃৎ পোর্টাল শিরাতন্ত্র** (hepatic portal venous system) ও **বৃক্কীয় পোর্টাল শিরাতন্ত্র** (renal portal venous system) নিয়ে গঠিত।

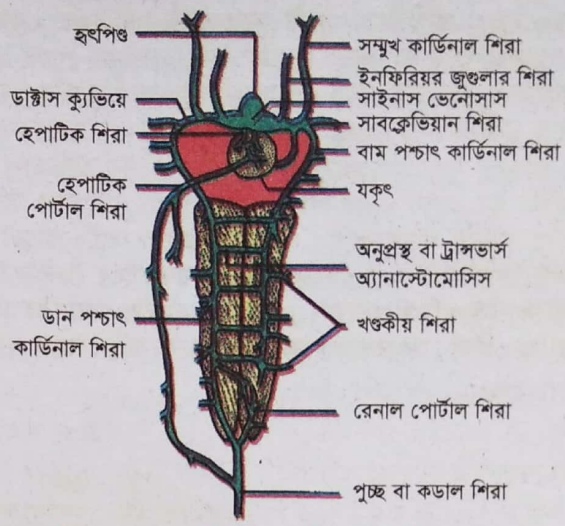

চিত্র ২.৩.৪ : রুই মাছের শিরাতন্ত্র (চিত্ররূপ)

যকৃৎ বা হেপাটিক পোর্টাল শিরা (hepatic portal vein) পরিপাকতন্ত্র হতে রক্ত সংগ্রহ করে যকৃতে নিয়ে আসে। যকৃৎ থেকে সেই রক্ত **হেপাটিক শিরার** (hepatic vein) মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে পৌঁছায়। উল্লেখ্য, রুই মাছে **উদরীয় শিরা** (abdominal vein) থাকে না।

লেজ অঞ্চল হতে **পুচ্ছ শিরা** (caudal vein) রক্ত সংগ্রহ করে দেহকাণ্ডে পৌঁছালে তা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। এদের ডান পাশেরটি **ডান পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা** গঠন করলেও বাম পাশেরটি **বৃক্কীয়** বা **রেনাল পোর্টাল শিরা** (renal portal vein) গঠন করে বৃক্কের অভ্যন্তরে কৈশিক জালিকা সৃষ্টি করে। ফলে রক্ত বৃক্কে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তিতে বৃক্ক হতে সে রক্ত **বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা** দ্বারা সংগৃহীত হয় এবং পরিশেষে ডাক্টাস ক্যুভিয়ের মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে পৌঁছায়।

❑ **কাজ :** (i) রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর। (ii) রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। (iii) রুই মাছের রক্ত সংবহন পদ্ধতি মানুষের রক্ত সংবহন পদ্ধতি অপেক্ষা ভিন্নতর– বিশ্লেষণ কর।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : রুই/কাতল/মৃগেল মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্র শনাক্ত ও পর্যবেক্ষণ ।

(ক) রুইমাছের অন্তর্বাহী বা অ্যাফারেন্ট (Afferent) ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র পর্যবেক্ষণ এবং

(খ) রুইমাছের বহির্বাহী বা ইফারেন্ট (efferent) ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

রুই মাছ এবং মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	রুই মাছের হৃৎপিণ্ড	মানুষের হৃৎপিণ্ড
১। প্রকোষ্ঠ	দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।	চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।
২। অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকল	একটি অ্যাট্রিয়াম ও একটি ভেন্ট্রিকল।	দুটি অ্যাট্রিয়াম ও দুটি ভেন্ট্রিকল।
৩। সাইনাস ভেনোসাস	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৪। CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত	পরিবহন করে।	পরিবহন করে।
৫। O_2 সমৃদ্ধ রক্ত	পরিবহন করে না।	পরিবহন করে।
৬। সংবহনের ধরন	একচক্রী রক্তসংবহন ঘটে।	দ্বিচক্রী রক্তসংবহন ঘটে।

রুই মাছের শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System of *Labeo rohita*)

শ্বসন প্রতিটি জীবের জন্য অপরিহার্য জৈবিক প্রক্রিয়া। শ্বসনের ফলেই পরিবেশ থেকে নেওয়া O_2 এর সাহায্যে জীবের কোষস্থ খাদ্য জারিত হয় এবং শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় ক্রিয়ার জন্য শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শ্বসনের জন্য যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রাণীর দেহে অব্যাহতভাবে এবং একযোগে নিয়োজিত থাকে তাকে **শ্বসনতন্ত্র** বলে। মাছ জলজ প্রাণী। এরা সাধারণত ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। রুই মাছের প্রধান শ্বসন অঙ্গের নাম **ফুলকা** (gill)। তবে তাদের দেহে অবস্থিত পটকা বা বায়ুথলি এবং **ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা** (branchiostegal membrane) কিছুটা শ্বসনের জন্য ভূমিকা পালন করে।

2020/8/4 12:55

Scanned with CamScanner

রুই মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বসনকার্য পরিচালনা করে। গলবিলের উভয় পাশে ব্রাঙ্কিয়াল প্রকোষ্ঠের (branchial chamber) প্রতিটিতে চারটি করে মোট চার জোড়া ফুলকা থাকে। কানকো (operculum) দিয়ে ব্রাঙ্কিয়াল প্রকোষ্ঠসহ ফুলকাগুলো ঢাকা থাকে। কানকোর পেছনের প্রান্তে ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা থাকে। এ পর্দা ওঠানামা করায় কানকো খুলতে ও বন্ধ হতে পারে। ফলে বহিঃফুলকা ছিদ্রপথে ফুলকা প্রকোষ্ঠ বাইরের সাথে যোগাযোগ ঘটাতে পারে। গলবিলের পার্শ্ব প্রাচীরে পাঁচ জোড়া ফুলকাছিদ্র থাকে। এ ছিদ্রগুলো দিয়ে গলবিল পাশের ফুলকা প্রকোষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

অন্তঃস্থ ফুলকাছিদ্রগুলোর গলবিলীয় প্রাচীর **ব্রাঙ্কিয়াল আর্চ** (branchial arches) বা **ফুলকা আর্চ** (gill arches) দ্বারা গঠিত হয়। গলবিলের প্রতি পাশে পাঁচটি ব্রাঙ্কিয়াল আর্চ থাকে। আর প্রতি পাশে প্রথম চারটি ব্রাঙ্কিয়াল আর্চ একটি করে ফুলকা ধারণ করে। পঞ্চম ব্রাঙ্কিয়াল আর্চ কোনো ফুলকা ধারণ করে না। হাইওয়েড আর্চের হ্রাসপ্রাপ্ত ফুলকা বা **সিউডোব্রাঙ্কিয়া** (pseudobranchea) কানকোর ভেতরের দিকে একটি চাকের মতো লেগে থাকে। এতে মাত্র একসারি ফুলকা ফিলামেন্ট থাকে। ব্রাঙ্কিয়াল আর্চের ভেতরের দিকে ফুলকায় কয়েকটি ভাঁজ বিশিষ্ট **গিল রেকার** (gill raker) থাকে। গিল রেকারগুলো ফুলকাগুলোকে কঠিন বস্তুর ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করে।

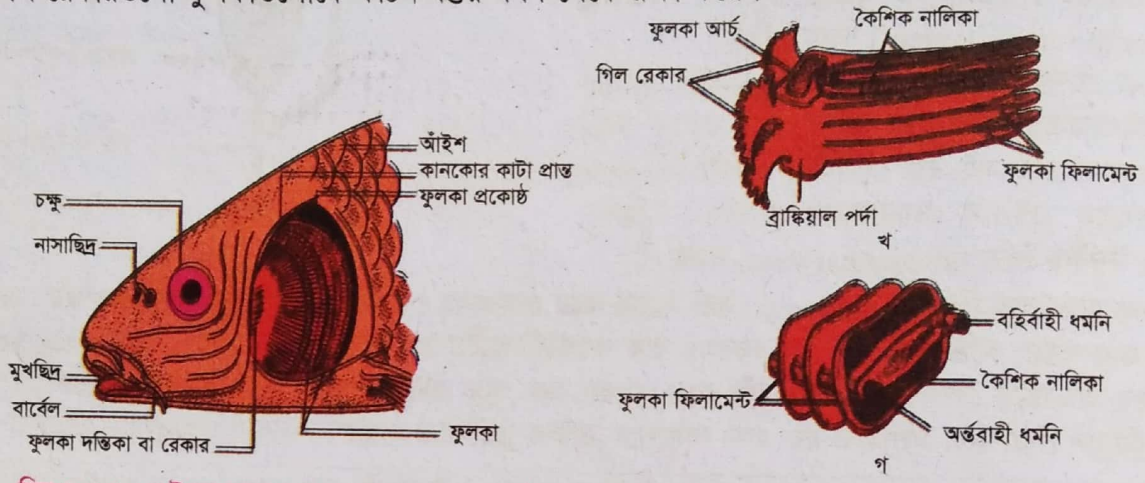

চিত্র ২.৩.৫ : রুই মাছের ফুলকা : (ক) ফুলকা প্রকোষ্ঠে ফুলকা, (খ) ফুলকার একাংশ এবং (গ) ফুলকার রক্তনালি

ফুলকার গঠন (Structure of a Gill)

রুই মাছের প্রতিটি ফুলকা দেখতে সুতার ন্যায় এবং **হলোব্রাঙ্ক** (holobranch) প্রকৃতির (পূর্ণ ফুলকা) অর্থাৎ প্রতিটি ফুলকা দুটি সদৃশ অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত। প্রতিটি ফুলকার অর্ধাংশকে বলা হয় **হেমিব্রাঙ্ক** বা **ডেমিব্রাঙ্ক** (hemibranch or demibranch)। প্রতিটি হেমিব্রাঙ্ক একসারি **ফুলকা সূত্র** বা **ফুলকা ল্যামেলা** (gill filament or gill lamella) নিয়ে গঠিত। এগুলো ভেতরের দিকে **ব্রাঙ্কিয়াল** বা **ফুলকা আর্চের** (gill arch) সাথে যুক্ত থাকে। আর্চের অন্তঃকিনারা প্রসারিত হয়ে কাঁটাযুক্ত পাতলা **ফুলকা রেকার** বা গিল রেকার (gill racher) গঠন করে। দুটি হেমিব্রাঙ্কের মাঝে হ্রাসপ্রাপ্ত **আন্তঃফুলকা ব্যবধায়ক** বা **ইন্টারব্রাঙ্কিয়াল সেপ্টাম** (interbranchial septum) থাকে। ফলে হেমিব্রাঙ্কের প্রান্তগুলো মুক্ত থাকে। প্রতিটি ফুলকা সূত্র অনেকগুলো ছোট ছোট অনুপ্রস্থ প্লেট বা **পাত** বহন করে। এই পাতগুলো রক্তের কৈশিক জালিকাসহ পাতলা এপিথেলিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতিটি পাতের একপাশে দিয়ে **অন্তর্বাহী ধমনি** (afferent artery) এবং অপর পাশ দিয়ে **বহির্বাহী ধমনি** (efferent artery) বিস্তৃত থাকে। পাতের এপিথেলিয়াম দ্বারা O_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কৈশিক জালিকায় অবস্থিত রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়।

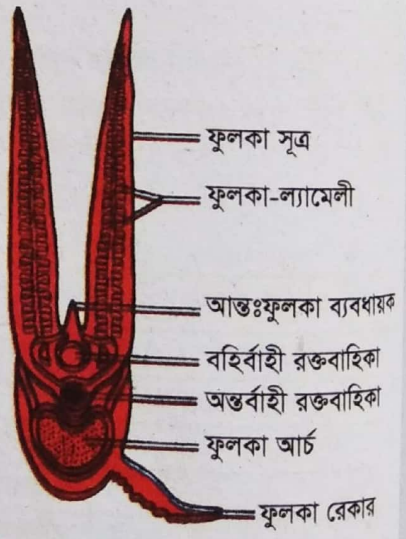

চিত্র ২.৩.৬ : একটি ফুলকা-সূত্রের লম্বচ্ছেদ

শ্বসন কৌশল (Mechanism of Respiration)

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় কোষ মধ্যস্থ খাদ্য জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করে এবং খাদ্যের স্থিতিশক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে **শ্বসন** বলে। রুই মাছের দুই ধাপে শ্বাসক্রিয়া ঘটে। যথা– (ক) **প্রশ্বাস** বা **শ্বাসগ্রহণ** ও (খ) **নিঃশ্বাস** বা **শ্বাসত্যাগ**।

■ **প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ (Inspiration) :** প্রশ্বাসের সময় মাছের মুখের পেশি প্রসারিত হয় বলে মুখবিবর ও গলবিলের আয়তন বেড়ে যায় ফলে মুখের সম্মুখের কপাটিকা (valve) খুলে যায়। এ সময় কানকো বন্ধ থাকে বলে পানি মুখ দিয়ে মুখবিবরে প্রবেশ করে। পরে কানকো ও মুখছিদ্র বন্ধ রেখে মাছ তার মুখবিবরের তলদেশের পেশি সংকুচিত করে

2020/8/14 12:55

Scanned with CamScanner

ও পরের দিকে ঠেলে ধরে এবং পার্শ্বদিক থেকে চাপ দেয়। এ সময় মুখবিবরের আয়তন ক্রমশ ছোট হয়। মুখের কপাটিকা বন্ধ হয়। গলবিল ও মুখবিবর পানি দ্বারা পূর্ণ হওয়ার পর পেশি সংকুচিত হলে ভেতরের পানির চাপ বেড়ে যায়। এ অবস্থায় মুখছিদ্র ও গ্রাসনালি বন্ধ থাকায় অন্তঃফুলকা ছিদ্রের মাধ্যমে পানি ফুলকা প্রকোষ্ঠের ফুলকার সংস্পর্শে আসে। ফুলকা সূত্র বা গিল ফিলামেন্টের উপর দিয়ে পানি প্রবাহের সময় ফুলকাতে অবস্থিত কৌশিক জালিকার রক্তের সাথে পানির গ্যাসীয় বিনিময় হয় ফলে পানি থেকে রক্তে O_2 প্রবেশ করে এবং রক্ত থেকে পানিতে CO_2 মুক্ত হয়।

■ **নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ** (Expiration) : O_2 এবং CO_2 গ্যাসের বিনিময় সম্পাদনের পর পেশি সংকোচনের ফলে মুখবিবর ও ফুলকা প্রকোষ্ঠ সংকুচিত হতে থাকে। ফলে CO_2 যুক্ত পানি ফুলকা প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে মুখবিবরে যায়। এ সময় মুখছিদ্রের কপাটিকা দুটি বন্ধ থাকায় পানি মুখছিদ্র পথে বের হতে পারে না। মুখবিবরের আয়তন হ্রাস পাওয়ায় পানির চাপ ধীরে ধীরে বাড়ার ফলে অপারকুলাম এবং ব্রাঙ্কি ও স্টেগাল পর্দা খুলে বহিঃফুলকা ছিদ্র পথে CO_2 যুক্ত পানি দেহের বাহিরে বের হয়ে আসে।

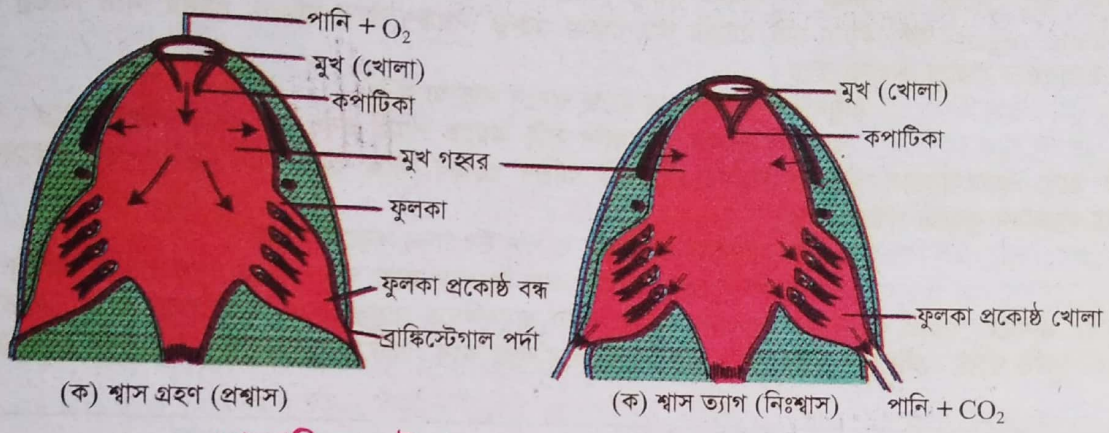

বায়ুথলি বা পটকা (Air bladder or Swim bladder)

রুই মাছের মেরুদণ্ডের নিচে এবং পৌষ্টিকনালির ওপরে অবস্থিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট বায়ুপূর্ণ চকচকে সাদা লম্বা থলিকে **বায়ুথলি** বা **পটকা** বা **সাঁতার থলি** (swim bladder) বলে। পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠীয় প্রাচীর থেকে বায়ুথলির উৎপত্তি ঘটে। এটি সিলোম গহ্বরে অবস্থিত। বায়ুথলিটি ছোট অগ্র প্রকোষ্ঠ ও বড় পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। এ দুটি প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানে একটি খাঁজ অবস্থিত। সাধারণত বায়ুথলি গ্রাসনালি বা অন্ননালির সাথে একটি সরু **ডাক্টাস নিউমেটিকাস** (ductus pneumaticus) নামক নালিকা দ্বারা যুক্ত থাকে। বায়ুথলি অন্তঃকর্ণের **ওয়েবেরিয়ান অসিকলের** (Weberian ossicles) সঙ্গে যুক্ত থাকে। এ সংযোগ দ্বারা বায়ুথলিতে বিদ্যমান গ্যাসের পরিবর্তিত চাপ অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফে পরিবাহিত হয় যা মাছের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।



চিত্র ২.৩.৮ক : রুই মাছের লম্বচ্ছেদে বায়ুথলির অবস্থান



চিত্র ২.৩.৮খ : রুই মাছের বায়ুথলি

বায়ুথলির বাইরের দিক ঘনসন্নিবিশিষ্ট রক্তজালক সমৃদ্ধ। দুটি স্তর নিয়ে এর প্রাচীর গঠিত, যথা- বাইরের যোজক টিস্যু দ্বারা গঠিত স্তর **টিউনিকা এক্সটার্না** (tunica externa) এবং ভেতরে মসৃণ পেশি নির্মিত স্তর **টিউনিকা ইন্টারনা** (tunica interna)। বায়ুথলির (উভয় প্রকোষ্ঠে) অন্তঃপ্রাচীরের এপিথেলিয়াম সংলগ্ন একটি লাল বর্ণের **গ্যাস গ্রন্থি** থাকে। এ গ্রন্থিতে ঘনসন্নিবিষ্ট অসংখ্য কৈশিকনালি দেখা যায় যাদের **রেটিয়া মিরাবিলিয়া** (*pl*-retia mirabilia; *sing*-rete mirabile) বলে। সামনের প্রকোষ্ঠের এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গ্যাস দ্বারা বায়ুথলি পূর্ণ হয়। কিন্তু পেছনের প্রকোষ্ঠে বিদ্যমান এ গ্রন্থি গ্যাস শোষণ করে। বায়ুথলির গ্যাসে বিভিন্ন উপাদান থাকতে পারে। বিজ্ঞানী Biot (1807) এবং Morean (1876) প্রমাণ করেন বায়ুথলিতে বিদ্যমান গ্যাসের অধিকাংশই অক্সিজেন (O_2)। এতে সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন (N_2) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) থাকে।

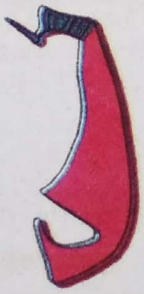
চিত্র ২.৩.৮গ : রুই মাছের ওয়েবেরিয়ান অসিকল

2020/8/4 12:56

Scanned with CamScanner

প্রকারভেদ (Types) : বায়ুথলি মাছের শ্রেণিবিন্যাসে গুরুত্ব বহন করে। ডাক্টাস নিউমেটিকাসের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে বায়ুথলি বা পটকা দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১। **ফাইসোসটোমাস (Physostomous) বায়ুথলি :** এ ক্ষেত্রে বায়ুথলি ও গ্রাসনালির মধ্যে সংযোগকারী নালি ডাক্টাস নিউমেটিকাস বিদ্যমান। যেমন– রুই, কাতলা ইত্যাদির বায়ুথলি।

২। **ফাইসোক্লিসটাস (Physoclistous) বায়ুথলি :** এ ক্ষেত্রে বায়ুথলি ও গ্রাসনালির মাঝে সংযোগকারী নালি ডাক্টাস নিউমেটিকাস ক্ষয়প্রাপ্ত। যেমন– টাকি, কই ইত্যাদির বায়ুথলি।

বায়ুথলির কাজ (Functions of Air bladder)

রুই মাছের বায়ুথলি নানাবিধ কাজ সম্পাদনে অংশগ্রহণ করে। নিচে এদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি উল্লেখ করা হলো–

১। **উদস্থিতিয় অঙ্গ হিসেবে :** পটকার সাহায্যে মাছ পানিতে ভাসতে পারে। পটকা গ্যাসের উৎপাদন এবং পুনঃশোষণ দ্বারা দেহের ও পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে বলে একে উদস্থিতিয় অঙ্গ বা **হাইড্রোস্ট্যাটিক অঙ্গ** (hydrostatic organ) বলা হয়। এটি মাছের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে মাছকে পানির নিচে বিভিন্ন গভীরতায় স্থিরভাবে অবস্থান করতে সাহায্য করে।

২। **শ্বসন অঙ্গ হিসেবে :** বায়ুথলির প্রধান কাজ হচ্ছে শ্বসনে সাহায্য করা।

৩। **শ্রবণ অঙ্গ হিসেবে :** বায়ুথলি শব্দের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে এবং শব্দ গ্রহণ করতে পারে। শব্দ তরঙ্গ বায়ুথলি হতে ওয়েবেরিয়ান অসিকল নামের কয়েকটি অস্থির ভেতর দিয়ে কর্ণে গমন করে। শব্দ গ্রহণের মাধ্যমে শিকারির আক্রমণ বুঝতে পারে।

৪। **শব্দ তৈরি অঙ্গ হিসেবে :** এর সাহায্যে প্রতিধ্বনি ও শব্দ উৎপাদন করতে সক্ষম।

৫। **সংবেদী অঙ্গ হিসেবে :** বায়ুথলি মাছের সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। মাছ যখন পানির বিভিন্ন গভীরতায় ছোটাছুটির মাধ্যমে পানির ও দেহের ভারসাম্য আনে তখন বায়ুথলিতে বায়ুর ঘনত্ব বিরলীকরণ ঘটে। এতে বায়ুথলির প্রাচীরের বিকৃতি ঘটায়। এটা চাপ সংগ্রাহক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। এটি মাছের যথাযথ মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র রক্ষা করে।

বায়ুথলি বা পটকা ও ফুসফুসের মধ্যে পার্থক্য

বায়ুথলি/পটকা	ফুসফুস
১। বায়ুথলি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠীয় প্রাচীর হতে উৎপন্ন হয়।	১। গলবিলের অঙ্কীয় প্রাচীর হতে ফুসফুস উৎপন্ন হয়।
২। বায়ুথলি গঠনগতভাবে খুবই সরল প্রকৃতির, ২টি প্রকোষ্ঠ ও ডাক্টাস নিউমেটিকাস সমন্বয়ে গঠিত।	২। ফুসফুসের গঠন জটিল। এটা গ্লটিস, শ্বাসনালি, ব্রঙ্কাই, ব্রঙ্কিওল ও এদের শাখা-প্রশাখা নিয়ে গঠিত।
৩। এরা আকারে ছোট, পরস্পরের সাথে ব্যবধায়ক পর্দা দ্বারা পৃথক থাকে।	৩। এরা বিভিন্ন ছোট-বড় শাখা-প্রশাখা দ্বারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।
৪। এরা শ্বসন, উদ্‌স্থিতি, সংবেদী, শব্দ উৎপাদক ও শব্দ গ্রাহক অংশ হিসেবে কাজ করে।	৪। এরা কেবল শ্বসনে ও রেচনে অংশগ্রহণ, রক্ত বিশুদ্ধিকরণ ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে।
৫। বায়ুথলি O_2 জমা রাখতে পারে।	৫। এরা বায়ু জমা রাখে না।

❑ **কাজ :** (i) রুই মাছের চিরুনীর ন্যায় অঙ্গটির বা ফুলকার গঠন বর্ণনা কর। (ii) মাছের শ্বাস নেওয়ার যে বিশেষ অঙ্গ আছে তার বর্ণনা দাও। (iii) রুই মাছের শ্বসন অঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের সংবহনতন্ত্র CO_2 যুক্ত রক্তকে O_2 যুক্ত করে– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। (iv) রুই মাছ কীভাবে পানির বিভিন্ন গভীরতায় শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক রেখে বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে অনায়াসে বিচরণ করে? ব্যাখ্যা কর। (v) রুই মাছের পানিতে দেহের ভারসাম্য ও শ্বসনে সহায়তাকারী অঙ্গটির গঠন ব্যাখ্যা কর। (vi) হাঙর প্রাণীদের শ্বসনতন্ত্রের সাথে রুই মাছের শ্বসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান– বিশ্লেষণ কর।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : রুই/কাতল/মৃগেল মাছের শ্বসনতন্ত্র পর্যবেক্ষণ।

(ক) রুই মাছের ফুলকা পর্যবেক্ষণ এবং (খ) রুই মাছের বায়ুথলি বা পটকা পর্যবেক্ষণ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

প্রকৃতিতে রুই মাছের প্রজনন ও নিষেক (Breeding and Fertilization in nature)

প্রজননতন্ত্র (Reproductive System) : রুই মাছ একলিঙ্গ মাছ। অর্থাৎ শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় পৃথক পৃথক প্রাণীতে অবস্থিত। প্রজননকালে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের আকার বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ণ বিকশিত হয়। প্রজনন ঋতুতে শুক্রাশয় দুটি বৃদ্ধি পেয়ে দেহকাণ্ডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং গোলাপি বর্ণ ধারণ করে। দেহপ্রাচীরে শুক্রাশয় পেরিটোনিয়ামের ভাঁজ **মেসোরকিয়াম** (mesorchium) পর্দা দিয়ে ঝুলানো থাকে। অপরদিকে, দেহপ্রাচীরে ডিম্বাশয়

2020/3/4 12:56

Scanned with CamScanner

পেরিটোনিয়ামের ভাঁজ **মেসোভেরিয়াম** (mesovarium) দিয়ে ঝুলানো থাকে। প্রত্যেক শুক্রাশয় থেকে একটি করে **শুক্রবাহী নালি** (sperm duct) পেরিটোনিয়াম দ্বারা সৃষ্টি হয়। দুটি শুক্রাশয়ের দুটি নালি পশ্চাদে এক হয়ে **রেচন-জননছিদ্র** (urino-genital pore) দ্বারা বাইরে উন্মুক্ত হয়। স্ত্রী মাছের ডিম্বাশয় বড়, জোড়া আকারে থাকে এবং **ডিম্বনালিবিহীন** (oviduct)। পরিপক্ব ডিম্বাশয় থেকে জনন ঋতুতে ডিম দেহগহ্বরে মুক্ত হয়। দেহগহ্বর থেকে **রেচন-জনন সাইনাসে** (urino-genital sinus) সৃষ্ট অস্থায়ী **জনন রন্ধ্রের** (genital aperture) মাধ্যমে ডিম্বাণু বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়। রুই মাছের ডিমে প্রচুর **কুসুম** (yolk) বিদ্যমান।

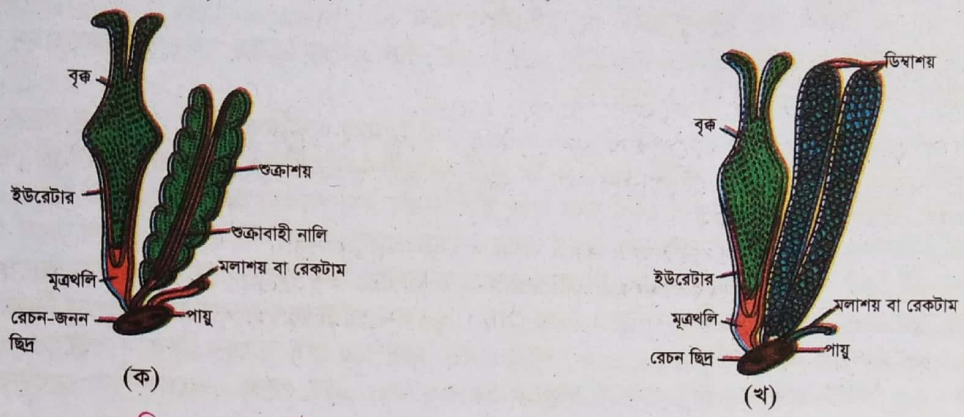

চিত্র ২.৩.৯ : রুই মাছের রেচন-জননতন্ত্র : (ক) পুরুষ ও (খ) স্ত্রী

প্রজনন (Reproduction) : রুই মাছের জনন পরিপক্বতা আসতে দু'বছর সময় লাগে। স্ত্রী রুই মাছ স্রোতস্বিনী পানিতে প্রজনন ঘটায়, বদ্ধ পানিতে নয়। এরা সাধারণত জুন থেকে আগস্ট মাসে ডিম ছাড়ে।

ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বা ফিকান্ডিটি : এক প্রজনন ঋতুতে এক কেজি ওজনের রুই মাছ ১-৪ লাখ পর্যন্ত ডিম উৎপাদনে সক্ষম যা বয়স ও দেহের ওজনের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ প্রতি কেজি ওজনের রুই মাছের ফিকান্ডিটি ১-৪ লাখ।

ডিম ধারণ ক্ষমতা : এক প্রজনন ঋতুতে কেজি ওজনের রুই মাছ ১ লাখ থেকে ৪ লাখ পর্যন্ত ডিম উৎপাদনে সক্ষম যা বয়স ও দেহের ওজনের উপর নির্ভর করে।

মাছের ডিম : ডিমগুলো ছোট ও কুসুম যুক্ত। এরা পানির তলায় ডুবে যায়। যেসব ডিম পানিতে ডুবে যায় তাদের **ডিমারসল** (demersal) বলে। প্রজনন ঋতুতে মাছের ডিম পাড়াকে বলে **স্পনিং** (spawning)।

ডিম ছাড়ার স্থান : সাধারণত কম গভীর পানিতে এবং স্রোতের টানে নদীর পাড়ে স্ত্রী রুই মাছ ডিম ছাড়ে।

নিষেক (Fertilization) : শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে নিষেক বলে। বর্ষায় যখন নদীর পানি ফুলে ওঠে তখন রুই মাছ নদীর অগভীর প্রবল বর্ষণে ঝাঁক বেঁধে **ডিম** (egg) ছাড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। এ সময় পানির তাপমাত্রা ২৭-৩০° সে. থাকে। পানিতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পানি ঘোলা থাকে। এসময় স্ত্রী ডিম ছাড়ার সাথে সাথে এরা **শুক্ররসের** (milt) সংস্পর্শে আসে এবং শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে জাইগোট গঠন করে। রুই মাছের নিষেককে **বহিঃনিষেক** (external fertilization) বলে। ২-১৫ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে আসে। ডিম থেকে বেরিয়ে আসা ডিম পোনা ২-৩ মি.মি. দীর্ঘ হয়। এরা খাদ্য গ্রহণ শুরু করে ২৫-৩০ মি.মি. লম্বা **আঙুল পোনা** বা **চারাপোনা** বা **ফিঙ্গারলিং** (fingerling)-এ পরিণত হয়। দেড় থেকে দু'বছর বয়সে রুই মাছে (পুরুষ ও স্ত্রী) জনন ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের কর্ণফুলীর শাখা নদী হালদাতে রুই মাছের প্রজনন ঋতুতে প্রাকৃতিক প্রজনন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে থেকে হাজার হাজার মাছের পোনা ব্যবসায়ী রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে। নিষিক্ত ডিমের ক্লিভেজ **মেরোব্লাস্টিক** (meroblastic) ধরনের এবং পরিস্ফুটন সরাসরি।

রুই মাছের জীবনচক্র (Life cycle of *Labeo*)

কোনো জীবের জন্মাবস্থা থেকে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে ঐ অবস্থার পুনঃজন্ম হওয়ার চক্রীয় ধারাকে **জীবনচক্র** (life cycle) বলে।

বিস্তার (Distribution) : বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, পাকিস্তান ও মিয়ানমার ইত্যাদি দেশের নদী, খাল, বিল, হাওর ও বাঁওড়ে রুই মাছ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত হলে রুই মাছ ধান ক্ষেতেও প্রবেশ করে। তবে সাধারণত পুকুরে প্রচুর রুই মাছের চাষ হয় এবং এদের দৈহিক বৃদ্ধি প্রথম বছর সবচেয়ে বেশি হয়।

2020/8/4 12:56
Scanned with CamScanner

গঠন (Structure) : রুই মাছকে সহজেই এর ছোট ও তীক্ষ্ণ মাথা দেখে চেনা যায়। এদের মুখ নিম্নমুখী, নিচের ঠোঁট খাঁজকাটা, পাশের আঁইশগুলো লালচে, পাখনাসমূহ গোলাপি লাল এবং পৃষ্ঠীয় পাখনায় ১৪-১৬টি শাখায়িত পাখনা রশ্মি বিদ্যমান। ফুলকা রন্ধ্র প্রশস্ত, আঁইশ সাইক্লয়েড ধরনের। পুচ্ছ পাখনা হোমোসার্কাল ধরনের হয়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস (Food and Feeding Habit) : এদের মুখ কিছুটা নিম্নমুখী এবং পুরু ঠোঁট থাকে। এরা জলজ উদ্ভিদ, আগাছা ও তলদেশ থেকে পচা জৈবিক পদার্থ আহার করে। ফুলকা দন্তিকার গঠন অনুযায়ী এরা অতি ক্ষুদ্র প্লাঙ্কটন খাদ্য হিসেবে বাছাই করে নিতে পারে। তবে পূর্ণ বয়স্ক রুই **প্লাঙ্কটন** (plankton) বাছাই করে নিতে অক্ষম। রুই মাছের পোনা শুধু **জুওপ্লাঙ্কটন** ও **ফাইটোপ্লাঙ্কটন** (zooplankton and phytoplankton) গ্রহণ করে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাঙ্কটন খাওয়ার হার হ্রাস পায়। এরা পানির মধ্য স্তরের খাদ্য সচরাচর গ্রহণ করে। তাই এরা **মধ্যস্তরের খাদক** (middle layer) নামে পরিচিতি।

প্রজনন আচরণ (Breeding/Courtship behaviour) : রুই মাছ একলিঙ্গ প্রাণী। দু'বছর বয়স হলে এরা জনন পরিপক্বতা লাভ করে। প্রজনন ঋতু ছাড়া পুরুষ ও স্ত্রী মাছ শনাক্ত করা কঠিন। প্রজননের সময় স্ত্রী মাছের উদর স্ফীত হয়। পুরুষ রুই মাছগুলোর বক্ষ পাখনা বেশ শক্ত এবং স্ত্রী মাছের বক্ষ পাখনা অত্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। সাধারণত **জুন-জুলাই** (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে এরা প্রজননে অংশ নেয়। ডিমগুলো প্রথমে পানির তলদেশে চলে যায়। তবে অল্প সময়ের মধ্যে ওই ডিম পুনরায় ভেসে ওঠে। নিষেকের কয়েক ঘণ্টায় ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়ে আসে। সাধারণত বদ্ধ পানিতে এরা ডিম দেয় না। স্রোতশীল নদীতে ডিম দেয়। এরকম পরিবেশের অভাবে পরিপক্ব ডিমগুলো দেহ কর্তৃক শোষিত হয়। এ ঘটনাকে **অ্যাটরেশিয়া** (atresia) বলে। বদ্ধ জলাশয়ে রুই মাছের জীবনে বছরের পর বছর এ ঘটনা ঘটতে থাকে। ১০ পাউন্ড ওজনের রুই প্রজনন ঋতুতে ১৯,০০,০০০ ডিম পাড়ে। এদের ডিম ফোটার পর ৬ সপ্তাহের মধ্যে পোনা পূর্ণাঙ্গ মাছে পরিণত হয়।

ডিম ছাড়ার সময় (Time of spawning) : এরা প্রধানত বর্ষাকালে প্রজনন করে। প্রজননকালে নদীর স্রোতযুক্ত অঞ্চলে মাছগুলো অবস্থান করে। বর্ষাকালে যখন নদীর পানি বাড়ে ও স্রোতযুক্ত হয়, পানির তাপমাত্রা ২৭°- ৩০°C (২৪°- ২৮°C) এবং O_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখনই এরা প্রজননের জন্য তৈরি হয়। O_2 সম্ভবত যৌনগ্রন্থিকে উত্তেজিত করে। প্রজননের সময় পুরুষ স্ত্রী মাছকে অনুসরণ করে। এ সময় এরা ছোটাছুটি করে এবং পানিতে তোলপাড় করে। স্ত্রী মাছ হঠাৎ দেহে ঝাঁকুনি দিয়ে ডিম ছাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ মাছ ওই ডিমগুলোর ওপর শুক্ররস ছিটিয়ে নিষিক্ত করে। এভাবে **বহিঃনিষেক** (external fertilization) সম্পন্ন করে। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে পরিণত ও জনন পরিপক্ব পুরুষ ও স্ত্রী রুই মাছে পিটুইটারি গ্রন্থি বা পিজি এবং **হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন** (Human Chorionic Gonadotropin-HCG) হরমোন প্রয়োগ করে পুকুরে বা হ্যাচারিতে **ইনডিউসড স্পনিং** (induced spawning) ঘটানো হয়।

পরিস্ফুটন (Development)

অন্যান্য মাছের মতো রুই মাছের পরিস্ফুটন বা পরিবর্তনগুলোকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- (ক) **ভ্রূণীয় পরিবর্ধন বা লার্ভা পূর্ব পরিবর্ধন** (Embryonic or pre-larval development), (খ) **লার্ভা দশার পরিবর্ধন** (Larval development) ও (গ) **লার্ভার পরবর্তী পরিবর্ধন** (Post larval development)।

(ক) ভ্রূণীয় পরিবর্ধন বা লার্ভা পূর্ব পরিবর্ধন (Embryonic or pre-larval development) : ডিম নিষিক্ত হওয়ার পর থেকে রুই মাছের ভ্রূণীয় অবস্থার পরিবর্তন হয়। এটা নিম্নলিখিত কয়েকটি ধাপে ঘটে থাকে।

যেমন– (১) **ক্লিভেজ**, (২) **ব্লাস্টুলেশন** ও (৩) **গ্যাস্ট্রুলেশন**।

১। **ক্লিভেজ** (Cleavage) : নিষেকের প্রায় ৪৫ মিনিট পর প্রথম বিভাজন আরম্ভ হয়। এদের ক্লিভেজ **মেরোব্লাস্টিক** (meroblastic) বলে। অর্থাৎ ক্লিভেজ ডিমের ওপরের অংশ অর্থাৎ **প্রাণিমেরু** (animal pole) অংশের ছোট সাইটোপ্লাজমিক ডিস্কে সীমাবদ্ধ থাকে। এ অবস্থায় জাইগোট কতগুলো ছোট ছোট কোষে বিভাজিত হয়। এদের **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) বলে। ব্লাস্টোমিয়ার দু'সারিতে সজ্জিত হয়ে **ব্লাস্টোডার্ম** (blastoderm) ও **পেরিব্লাস্ট** (periblast) নামক দু'ধরনের কোষস্তর গঠন করে। ব্লাস্টোডার্ম কোষগুলো পরবর্তী সময়ে **ভ্রূণ** (embryo) তৈরি করে এবং পেরিব্লাস্ট কোষগুলো **কুসুম** (yolk) এবং ব্লাস্টোডার্ম কোষের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে।

২। **ব্লাস্টুলেশন** (Blastulation) : ক্লিভেজ দশা পরে **ব্লাস্টুলা** (blastula) তৈরি করে। ব্লাস্টুলা একটি পাতের মতো স্তর বা কুসুমের ওপর একটি চ্যাপ্টা পাতের ন্যায় অবস্থান করে। ব্লাস্টুলার এ কোষগুলো **ব্লাস্টোডিস্ক** (blastodisc) তৈরি করে।

৩। **গ্যাস্ট্রুলেশন** (Gastrulation) : ব্লাস্টুলেশনের পরবর্তী দশাতেই শুরু হয় গ্যাস্ট্রুলেশন। এ দশায় মাছের দ্বিস্তরী দশা যা গ্যাস্ট্রুলায় পরিবর্তিত হয়। গ্যাস্ট্রুলার ওপরের স্তরকে **এপিব্লাস্ট** (epiblast) এবং ভেতরের স্তরকে **হাইপোব্লাস্ট** (hypoblast) বলে। গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় ব্লাস্টোডিস্কের নিচের অংশ ক্রমশ পুরু হয়ে ওঠে এবং **মার্জিনাল রিজ** (marginal ridge) নামে পরিচিত হয়। মার্জিনাল রিজের নিচেই অবস্থান করে জার্মবলয়। লেজের দিকে এ জার্মবলয় কিছুটা পুরু হয় এবং তা **ভ্রূণীয় বর্ম** নামে পরিচিত হয়। এ দশায় ডিম স্ফুটন হয়।

2020/8/4 12:56

Scanned with CamScanner

(খ) লার্ভা দশার পরিবর্ধন (Larval development) : ডিম ফোটার পর মুহূর্তেই শুরু হয় রুই মাছের লার্ভা দশার পরিবর্ধন। ভ্রূণ দেখতে স্বচ্ছ, তবে হালকা হলুদ বর্ণের হয়। নটোকর্ড ও স্নায়ুরজ্জু দেহের শেষ প্রান্তে কিছুটা উর্ধ্বমুখী। চোখের পেছন দিকে এবং শ্রবণ যন্ত্রে অনেকগুলো **ক্রোম্যাটোফোর** (chromatophore) রয়েছে। বায়ুথলি প্রকট। অঙ্কীয় পাখনা উপস্থিত।

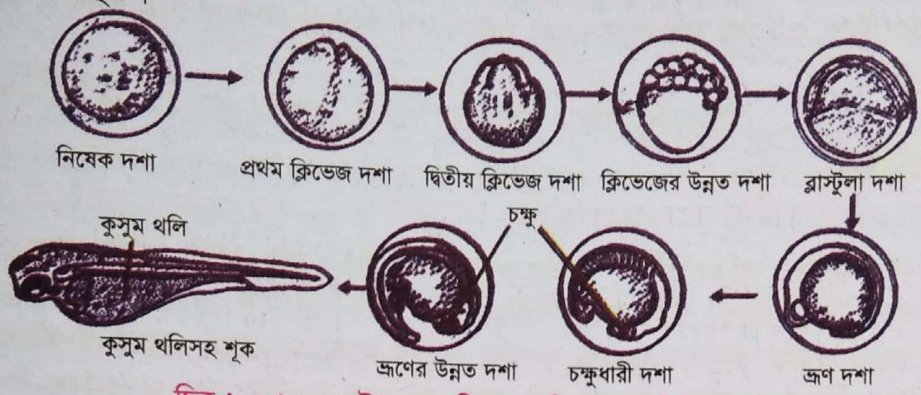

চিত্র ২.৩.১০ : রুই মাছের ডিমের পরিস্ফুরণের বিভিন্ন পর্যায়

(গ) লার্ভা-পরবর্তী দশার পরিবর্ধন (Post larval development) : রুই মাছের লার্ভা-পরবর্তী দশার পরিবর্ধন শুরু হয় ডিম ফোটার চতুর্থ দিন পর। কুসুম থলি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়, অপারকুলাম দেখা যায়। পৃষ্ঠ পাখনা, পুচ্ছ পাখনার উদ্ভব ঘটে। বায়ুথলি দুই ভাগে বিভক্ত হয়। লেজ হেটারোসার্কাল ধরনের। নাসারন্ধ্রের বিভাজন সম্পূর্ণ হয়, ঠোঁট সমান, মাংসল মুখ, চোখ ১.৩ সে.মি.। দেহ ধোঁয়াটে হলুদ। দেহে হলুদাভ সাদা আঁইশ উপস্থিত। এভাবে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রান্তের পর একটি পূর্ণ বয়স্ক রুই মাছ পাওয়া যায়। রুই মাছ সাধারণত দেড় দুই বছর বয়সে যৌন পরিপক্বতা লাভ করে।

লার্ভা দশার পরিবর্তনের সারসংক্ষেপ

সময়	পরিবর্ধনে পরিলক্ষিত বৈশিষ্ট্যসমূহ
৬ ঘণ্টা	(১) এই সময় পর মাছের লার্ভা মাঝে মধ্যে উপরে-নিচে নড়া-চড়া করতে দেখা যায়। (২) এই সময় কুসুমের দুই প্রান্ত সরু হয় এবং কুসুম থলির সামনে হৃৎপিণ্ড দেখা যায়। (৩) এই অবস্থায় কুসুম থলি বেশ বড় থাকে। (৪) লার্ভা পানির তলদেশে অনেক সময় কাটায়। ঐ সময় লার্ভা কুসুম থলি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে।
১২ ঘণ্টা	(১) ১২ ঘণ্টা পর কুসুম থলি সরু ও লম্বা হয়। (২) ক্রোমাটোফোর উৎপন্ন হওয়ায় লার্ভার চোখের রঙ কালো হতে শুরু করে।
২৪ ঘণ্টা	(১) এই সময় লার্ভায় ফুলকা আর্চ দৃশ্যমান হয়। (২) চোখ মাথার উপরে অবস্থান নেয় এবং নটোকর্ড লেজের দিকে উর্ধ্বমুখী হয়। (৩) কুসুম থলির পিঠে কালো দাগ দেখা যায়। (৪) লেজ ও পায়ু-পাখনা স্পষ্ট হয়। (৫) লার্ভা স্বচ্ছ হয় এবং ফ্যাকাশে হলদে রঙেরও হতে পারে।
৩৬ ঘণ্টা	(১) ৩৬ ঘণ্টা পর লার্ভায় নিচের ঠোঁট ও বক্ষ-পাখনা সুস্পষ্ট হয়। (২) পৃষ্ঠ-পাখনায় কিছু কালো দাগ দেখা যায়। (৩) পুচ্ছ-পাখনায় পুচ্ছ দণ্ড দেখা যায়।
৪৮ ঘণ্টা	(১) ৪৮ ঘণ্টা পর লার্ভা ৬.০-৬.৪ মি.মি. লম্বা হয়। (২) এ সময় কুসুম থলি সম্মুখের দিকে কিছুটা উত্তল হয়। (৩) এই সময় বায়ু থলি দেখা দেয়। (৪) লার্ভার মাথায় ক্রোমাটোফোর উৎপন্ন হওয়ার ফলে মাথা কালো বর্ণ ধারণ করে। (৫) ফুলকা আর্চ স্পষ্ট এবং দেহ ফ্যাকাশে হলদে রঙে পরিবর্তিত হয়।
৭২ ঘণ্টা	(১) লার্ভার বায়ু থলি ডিম্বাকৃতির হয়। (২) বক্ষীয়-পাখনা স্পষ্ট হতে শুরু করে। (৩) পিঠের দু'পাশে উজ্জ্বল হলুদ রঙ ধারণ করে। (৪) কুসুম থলি বিলীন হয়ে যায় এবং **লার্ভা দশার সমাপ্তি ঘটে** ।
৯৬ ঘণ্টা	(১) এই সময় কুসুম থলি প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। (২) ৯৬ ঘণ্টা পর লার্ভার মুখ স্পষ্ট হয় এবং খাদ্য গ্রহণ শুরু করে। (৩) এ সময় এরা ধানী পোনা বা আঙুলে পোনা হিসেবে পরিচিত হয়।
৫ দিন	(১) ৫ দিন বয়সের পোনা ৮-৮.৫ মি.মি. লম্বা হয়। (২) এ সময় লেজের কাছে লাল দাগ দেখা যায়, যার ফলে একে রুই মাছের পোনা বলে শনাক্ত করা যায়। (৩) কানকোর রেখা সুস্পষ্ট হয়। (৪) নটোকর্ডের শেষ প্রান্ত কিছুটা বেঁকে যায়। (৫) এই সময় পাখনাগুলোতে রশ্মি আরও স্পষ্ট হয়।
১০ দিন	(১) ১০ দিন বয়সে পোনার দৈর্ঘ্য ১৫-১৮ মি.মি. লম্বা হয়। (২) নাসারন্ধ্র দেখা যায় এবং অন্তঃস্থ বিভাজন স্পষ্ট হয়। (৩) সকল পাখনায় পূর্ণাঙ্গ সংখ্যক পাখনা-রশ্মি বিকশিত হয়।
১৫ দিন	(১) ১৫ দিন বয়সের পোনার দৈর্ঘ্য ২৩ মি.মি. লম্বা হয়। (২) মুখের দুপাশে একটি করে বার্বেল (barbel) দেখা যায়। (৩) খাদ্যনালি ও পায়ুর অবস্থান স্পষ্ট হয়। (৪) পোনার দৈহিক গড়ন মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়।
এরপর মাছটির কেবল আঙ্গিক পরিবর্তন ও আকারের পরিবর্ধন ঘটে। স্ত্রী মাছ আকারে পুরুষ অপেক্ষা বড় হয়। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করেও প্রজননে সক্ষম হয়।	

2020/8/4 12:56

Scanned with CamScanner

জনন পরিপক্ব পুরুষ ও স্ত্রী রুই মাছ চেনার সহজ উপায়

(১) প্রজনন ঋতুতে পুরুষ মাছের উদরের কোনো পরিবর্তন হয় না। স্ত্রী মাছের উদর স্ফীত হয় কারণ ঐ সময় স্ত্রী মাছের উদর ডিম দ্বারা পূর্ণ থাকে। (২) পুরুষের পায়ুতে চাপ দিলে শুক্ররস বা মিল্ট বের হয়ে আসে। স্ত্রীর পায়ুস্থান লাল বর্ণের হয় এবং চাপ দিলে ডিম বের হয়ে আসে। (৩) পুরুষে বক্ষ পাখনার উপরের দিক খসখসে হয়; কিন্তু স্ত্রীতে বক্ষ পাখনা মসৃণ থাকে।

রুই মাছের ডিম চেনার উপায় : ডিমগুলো লালচে বর্ণের, গোলাকার, আয়তন প্রায় ৫.০ মি.মি. এবং নিষিক্ত ডিমগুলো পানিতে ডুবে যায়, ভাসে না।

রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ (Natural Conservation)

রুই মাছ বাংলাদেশের অতিপরিচিত, সুস্বাদু ও জনপ্রিয় মাছ। মাছ থেকে মাছের স্বাদ পেতে হলে মাছকে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। বর্তমানে পৃথিবীতে জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে কিন্তু বাড়েনি ভূ-খণ্ড। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি অব্যাহত রাখতে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্টের পাশাপাশি প্রাকৃতিক জীবের সংকটও বেড়েছে, নদী প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং হাওর-বিল-বাঁওড় ভরাট ও দখল হয়ে যাওয়ায় মাছের প্রাকৃতিক জীবের জননক্ষেত্র ও লালনভূমি বহুগুণে কমে গেছে। বাংলাদেশের প্রায় সব বড় বড় নদী ও মূল শাখা নদী ছাড়াও বিভিন্ন হাওরে রুই মাছ বিস্তৃত। আর বড় নদী হচ্ছে রুই মাছের প্রজনন ক্ষেত্র। এর মধ্যে বলা যায়, হালদা নদীর কথা। হালদা নদী বাংলাদেশের কেবল একমাত্র দেশি নদী নয়, এটি একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী যেখান থেকে মাছচাষীরা পোনার বদলে রুই মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে যান।



চিত্র ২.৩.১১ : হালদা নদীতে মাছ আহরণের দৃশ্য

এসব ডিম থেকে ফোটানো পোনার বৃদ্ধি যতো দ্রুত ও বেশি হয় অন্য কোনো জায়গা থেকে সংগৃহীত পোনায় তা হয় না, এমনকি হ্যাচারিতে ও হয়ই না। তাই হালদা নদীকে প্রাকৃতিক জিনব্যাংক সমৃদ্ধ 'মৎস্য খনি' নামে অভিহিত করা হয়। এ নদীসহ অন্যান্য স্থানে রুই মাছের প্রাকৃতিক বিচরণ স্থলগুলোকে মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও রুই মাছের আবাসস্থলের যথাযথ সংরক্ষরণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অভ্যন্তরীণ নদীগুলো থেকে প্রাকৃতিক রুই মাছ পাওয়া যেমন– দুরূহ হয়ে পড়েছে। এজন্য অন্তত বিশুদ্ধ রুই মাছের সংরক্ষণে সবার নজর এখন বাংলাদেশের হালদা নদীর দিকে। সুতরাং এই হালদা নদী সংরক্ষণ করা উচিত।

হালদা নদী সংরক্ষণে কিছু সমস্যা : এই নদীর আশপাশে কিছু কলকারখানা গড়ে ওঠার ফলে এসব কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ নদীর পানিকে দূষিত করছে। এছাড়া এ নদীতে অনেক মা মাছ বসবাস করে। কিন্তু অতিরিক্ত আহরণের ফলে এ মা মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

নদী সংরক্ষণের পদক্ষেপ : মাছ আমাদের রূপালি সম্পদ। নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে বাংলাদেশের রুই জাতীয় মাছসহ অনেক মাছের প্রজাতি আজ হুমকির সম্মুখীন। এ সম্পদ রক্ষা করা অপরিহার্য। প্রাকৃতিকভাবে রুই জাতীয় মাছ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১। মাছের আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র (হালদা নদীসহ অনান্য জলাশয়) সংরক্ষণ : রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও প্লাবনভূমির প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্রগুলোর সঠিক সীমানা নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় 'মৎস্য অভয়াশ্রম' তৈরি করে মৎস্য সম্পদ সমৃদ্ধ করা। রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক উৎস ঠিক রাখার জন্য হালদা নদীকে সংরক্ষণ করতে হবে। হালদা নদী থেকে রুই জাতীয় মাছের ডিম সরাসরি সংগ্রহ করা হয়। এটি এশিয়ার **বৃহত্তম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র**।

২। মা মাছ আহরণ বন্ধ করা : প্রজননকালীন সময় (জুন-জুলাই) অর্থাৎ ডিম ছাড়ার ঋতুতে ডিমওয়ালা মাছ না ধরা বা না মারা। ডিম ছাড়ার সুযোগ দিলে একটি মাছ থেকে লাখ লাখ মাছ পাওয়া যায়। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করে প্রজনন মৌসুমে খাদ্য নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে মা মাছ আহরণ বন্ধ করা।

2020/8/4 12:56

Scanned with CamScanner

৩। বিষ প্রয়োগ বন্ধ করা : সরাসরি বিষ প্রয়োগ বা জলাশয়সমূহে বিষাক্ত দ্রব্যাদি ছড়িয়ে যাতে কেউ মাছ ধরতে না পারে সে ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪। বিস্ফোরক দ্রব্যাদির ব্যবহার বন্ধ করা : বিস্ফোরক দ্রব্যাদি যেমন– হাতবোমা, বন্দুক ইত্যাদি দ্বারা মাছ না মারা। বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে মাছ মারলে কেবল উক্ত মাছই মারা যায় না, যে জলাশয়ে এটি ব্যবহার করা হয় তার প্রায় সব মাছই মারা যায়। তাই বিস্ফোরক দ্রব্যাদির ব্যবহার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫। লবণাক্ততা কমিয়ে আনা : রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও পদক্ষেপের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ ঠিক রাখা ও নাব্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থার মাধ্যমে লবণাক্ততা কমিয়ে আনা।

৬। দূষণ রোধ : প্রাকৃতিক প্রজননে উপযোগী ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণের জন্য নদীর পানির সব ধরনের দূষণ রোধ করা যাতে মাছের প্রজনন সহজ হয়।

৭। বাজার নিয়ন্ত্রণ : নির্দিষ্ট মাপের (সাধারণত ৯ ইঞ্চি) নিচে কোনো রুই জাতীয় পোনা মাছ না ধরা এবং বিক্রি বন্ধ করা। এ মাছগুলো না মেরে বাড়তে দিলে এক বছর পরই এদের বড় মাছ হিসেবে পাওয়া যায়। পোনা মাছ মারার অর্থ দেশের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি অঙ্কুরে বিনাশ করা।

৮। নদী কমিশন গঠন : 'নদী কমিশন' গঠনের মাধ্যমে প্রজনন ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন জায়গায় অপরিকল্পিত স্লুইস গেট, বাঁধ, সেতু বা বৃহৎ কোনো স্থাপনা নির্মাণ না করা।

৯। নদী দখল না করা : প্রজননক্ষেত্রসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন জায়গায় অপরিকল্পিত নদী দখল বা নদী শাসন না করা।

১০। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একই জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি মাছের চাষ করার জন্য মাছচাষিদের উৎসাহ ও প্রণোদনা দিতে হবে।

১১। মৎস্যজীবীদের উদ্বুদ্ধকরণ : উপযুক্ত নার্সারি পুকুরের ব্যবস্থা করে পোনা মাছ সংরক্ষণ, রেণু বিক্রয় সহজীকরণের দ্বারা মৎস্যজীবীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক এ মৎস্য সম্পদকে রক্ষা করা।

১২। জনসচেতনতা : সাধারণ মানুষকে রুই জাতীয় মাছ চাষের গুরুত্ব, প্রজননক্ষম মাতৃ মাছের গুরুত্ব, মাছের জীবনচক্র, মাছ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় অবহিত করতে হবে।

১৩। নদীর গতিপথ পরিবর্তন না করা : নদীর বাঁক, পানির ওলটপালট, পানির স্রোতের গতিধারা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জৈব রাসায়নিক অনুঘটক মাছের প্রজননের বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং ডিম নিষিক্ত করতে সাহায্য করে। এজন্য নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে মাছের প্রজননক্ষেত্রসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

১৪। আইন প্রণয়ন ও আইন যথাযথ প্রয়োগ : জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে কঠোর আইন প্রণয়ন করে তা যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

সর্বোপরি, প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজননের ফলে রুই জাতীয় মাছে জিনগত ভিন্নতা (variation) বেশি হয়। এতে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবের ফলে এ জাতীয় মাছের বৃদ্ধিহার বেশি এবং মৃত্যুহার কম হয়। এতে প্রান্তিক চাষি লাভবান হয়। সুতরাং এভাবে রুইজাতীয় মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণের মাধ্যমে 'প্রাকৃতিক জিনপুল' সংরক্ষণ করা যায়।

সংরক্ষণের গুরুত্ব

আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য : আমাদের খাদ্যের একটি অন্যতম উপাদান আমিষ। দেহ গঠনের জন্য এটি অত্যাবশ্যকীয়। দেশের মানুষের অধিকাংশ আমিষের চাহিদা মাছ থেকেই আসে। তাই আমরা আমিষের চাহিদা মাছ থেকে পূরণ করতে পারে। মৎস্য সংরক্ষণ এই আমিষের চাহিদা পূরণে নিশ্চিত করবে।

প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য : বর্তমানে অধিকহারে মাছ শিকারের ফলে মাছের প্রজাতির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। মাছের প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য সরকারিভাবে মাছের অভয়াশ্রম তৈরি করতে হবে। মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টির মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিগুলো সংরক্ষিত হবে।

❑ **কাজ :** (i) রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? যুক্তিসহ মতামত দাও।/রুই মাছ রক্ষার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়– তোমার মতামত দাও। (ii) রুই মাছের পোনার উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাকৃতিক জলাশয়ে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। (iii) রুই মাছের প্রাকৃতিক বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র হুমকির মুখে কেন– আলোচনা কর।

2020/8/4 12:56

Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

- **মাছ বা মৎস্য :** জলজ ও শীতল রক্তবিশিষ্ট যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহ আঁইশ দ্বারা আবৃত (ব্যতিক্রম ক্যাটফিশ–শিং, মাগুর, বোয়াল ইত্যাদি) থাকে, ফুলকা দ্বারা (ব্যতিক্রম লাংফিশ) শ্বাসকার্য চালায় এবং যুগ্ম-অযুগ্ম পাখনা থাকে তাদের মাছ বা মৎস্য বলে।
- **কার্প :** Cypriniformes বর্গের অন্তর্ভুক্ত অতি দ্রুত বর্ধনশীল সাইক্লয়েড আঁইশযুক্ত, মস্তক ও পটকা বহনকারী অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মিঠাপানির মাছগুলো কার্প নামে পরিচিত। যেমন– রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশ, পুঁটি, টাটকানি ইত্যাদি।
- **মেজর কার্প :** কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে যেগুলো আকৃতিতে বড়, দ্রুত বর্ধনশীল এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাদের মেজর কার্প বলে। যেমন– রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশ ইত্যাদি।
- **পার্শ্বরেখা :** মস্তকের পরবর্তী দেহের অগ্রভাগ থেকে লেজের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দেহকাণ্ডের দুই পাশ বরাবর যে দুটি অনুদৈর্ঘ্য রেখা বিদ্যমান তাদের পার্শ্বরেখা (lateral line) বলে। এতে খাদ ও গর্তের সমন্বয়ে গঠিত অসংখ্য পার্শ্বরেখা অঙ্গ (lateral line organ) নামক সংবেদী অঙ্গ বিদ্যমান যাদের মাধ্যমে মাছ পানির রাসায়নিক গুণাগুণ নির্ণয় করতে সক্ষম।
- **ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা :** রুই মাছের কানকোর নিচে কৈশিক জালিকা সমৃদ্ধ পাতলা পর্দা থাকে। একে ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা বলে। এটি ফুলকা প্রকোষ্ঠে অবস্থিত পানি থেকে বা শ্বসনের জন্য যে পানি স্রোতের সৃষ্টি হয় তা থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় O_2 উক্ত কৈশিক জালিকায় প্রবেশ করে। ফলে এই পর্দা কিছুটা শ্বসনে সাহায্য করে।
- **রক্ত সংবহনতন্ত্র :** যে তন্ত্র রক্ত সংবহনে সহায়তা করে তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। রুই মাছের রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া বদ্ধ প্রকৃতির। রক্ত, হৃৎপিণ্ড, ধমনিতন্ত্র ও শিরাতন্ত্রের সমন্বয়ে রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত।
- **ভেনাস হার্ট বা শিরা হৃৎপিণ্ড :** মাছের (যেমন– রুই মাছ, কাতল মাছ ইত্যাদি) হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে শুধু CO_2 যুক্ত রক্ত বাহিত হয় বলে একে ভেনাস হার্ট বা শিরা হৃৎপিণ্ড বলে। অন্যভাবে, শুধু CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত বহনকারী হৃৎপিণ্ডই হলো ভেনাস হার্ট।
- **বাল্বাস আর্টারিওসাস :** অঙ্কীয় ধমনির গোড়া স্ফীত হয়ে নিলয়ের সম্মুখে ফ্লাস্কের ন্যায় পেশিবিহীন যে থলি গঠন করে তাকে বাল্বাস আর্টারিওসাস বলে।
- **ধমনিতন্ত্র :** হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন যে বাহিকা দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ত পরিবহন করে তাদের ধমনি বলে। ধমনির সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে ধমনিতন্ত্র বলে। রুই মাছের ধমনিতন্ত্র প্রধানত অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি, ডর্সাল অ্যাওর্টা ও এর শাখা-প্রশাখা নিয়ে গঠিত।
- **অ্যাফারেন্ট বা অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি :** যেসব ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে ফুলকার দিকে CO_2 যুক্ত রক্ত বহন করে তাদের অ্যাফারেন্ট বা অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বলে।
- **ইফারেন্ট বা বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি :** যেসব ধমনি ফুলকা হতে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে তাদের ইফারেন্ট বা বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বলে।
- **শিরাতন্ত্র :** যেসব রক্তবাহিকা দেহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের পরিবহন করে তাদের শিরা বলে। বিভিন্ন শিরা নিয়ে গঠিত রক্ত সংবহনতন্ত্রকে শিরাতন্ত্র বলে।
- **সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র :** যেসব শিরার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্র হতে CO_2 যুক্ত রক্ত সরাসরি হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের সিস্টেমিক শিরা বলে। সিস্টেমিক শিরাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে বলা হয় সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র।
- **পোর্টাল শিরাতন্ত্র :** কৈশিক নালিকা হতে উৎপন্ন হয়ে CO_2 যুক্ত রক্ত নিয়ে হৃৎপিণ্ডে যাওয়ার পথে যেসব শিরা অন্য কোনো অঙ্গে প্রবেশ করে আবার কৈশিক নালিতে পরিণত হয়, তাদের পোর্টাল শিরা বলে। পোর্টাল শিরাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে বলা হয় পোর্টাল শিরাতন্ত্র।
- **একচক্রী বা একবর্তনী সংবহন :** যে সংবহনে রক্ত একবার মাত্র হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে একটি মাত্র চক্র সম্পন্ন করে তাকে একচক্রী সংবহন বলে।
- **হলোব্রাঙ্ক :** একটি ফুলকা যদি দুটি সদৃশ অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে হলোব্রাঙ্ক বা পূর্ণফুলকা বলে। আর প্রতিটি সদৃশ অর্ধাংশকে বলা হয় হেমিব্রাঙ্ক বা ডেমিব্রাঙ্ক। ফুলকা সূত্রের প্রতিটি সারি মিলে গঠিত হয় হেমিব্রাঙ্ক ।
- **বায়ুথলি বা পটকা :** রুই মাছের মেরুদণ্ডের নিচে এবং পৌষ্টিকনালির ওপরে অবস্থিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট বায়ুপূর্ণ চকচকে সাদা লম্বা থলিকে বায়ুথলি বা পটকা বা সাঁতার থলি বলে। পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠীয় প্রাচীর থেকে বায়ুথলির উৎপত্তি ঘটে।
- **মেসরকিয়াম :** পুরুষ মাছে একজোড়া লম্বা শুক্রাশয় দেহপ্রাচীরের সঙ্গে মেসরকিয়াম দ্বারা ঝোলানো থাকে।
- **অ্যাটরেশিয়া :** রুই মাছের ডিম পাড়ার উপযুক্ত পরিবেশের (স্রোতশীল নদী) অভাব হলে পরিপক্ব ডিমগুলো এদের দেহ কর্তৃক শোষিত হয়। এ ঘটনাকে অ্যাটরেশিয়া বলে।
- **স্পনিং :** প্রজনন ঋতুতে মাছের ডিম পাড়াকে স্পনিং বলে। অথবা ডিমপাড়া ও শুক্রাণু নিঃসরণ প্রক্রিয়াকে স্পনিং বলে। স্রোতযুক্ত স্বাদু পানিতে রুই মাছের স্পনিং ঘটে। বদ্ধ পানিতে এদের প্রজনন ঘটে না।
- **ইনডিউসড্ স্পনিং :** মাছের খামারে কৃত্রিম প্রজননকে ইনডিউসড্ স্পনিং (induced spawning) বা প্রণোদিত প্রজনন বলে। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে পরিণত ও জনন পরিপক্ব পুরুষ ও স্ত্রী রুই মাছে পিটুইটারি গ্রন্থি বা পিজি এবং হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন (Human Chorionic Gonadotropin-HCG) হরমোন প্রয়োগ করে পুকুরে বা হ্যাচারিতে ইনডিউসড্ স্পনিং ঘটানো হয়।

Scanned with CamScanner

☑ **ডিমারসাল :** যেসব ডিম পানিতে ডুবে যায় তাদের ডিমারসাল বলে।

☑ **রেণু পোনা :** ডিম থেকে সদ্য নির্গত বয়স থেকে শুরু করে ৭২ ঘণ্টা বয়স পর্যন্ত পোনাকে রেণু পোনা (hatchlings) বলে। এটি দৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ ৭ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। অথবা সদ্যোজাত লার্ভাকে রেণু পোনা বা হ্যাচলিং বলে। রেণু পোনার দেহের অক্ষদিকে কুসুমথলি থাকে। কুসুমথলিতে সঞ্চিত খাদ্য খেয়ে এরা পুষ্টি লাভ করে ও বৃদ্ধি পায়।

☑ **ধানী পোনা :** ৭২ ঘণ্টা বয়স থেকে ৮ দিন বয়স পর্যন্ত পোনাকে ধানী পোনা (fry) বলে। এটি দৈর্ঘ্যে ১২ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

☑ **আঙুলে পোনা :** ৯ দিন বয়স থেকে ৩০ দিন বয়স পর্যন্ত পোনাকে আঙুলে পোনা (fingerling) বলে। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ মিলিমিটার হয়।

☑ **সংরক্ষণ :** যে পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সুপরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের হিসাবমতো ব্যবহার করা হয় এবং পরিবেশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষিত রাখা হয় তাকে সংরক্ষণ বলা হয়।

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রুই মাছের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
[সি.,কু.,ব.,চ.,য.,দি. ও রা.বোর্ড-২০১৮]
ক অলিন্দ → নিলয় → বাল্বাস অ্যাওর্টা → ফুলকা
খ ফুলকা → অলিন্দ → নিলয় → বাল্বাস অ্যাওর্টা
গ বাল্বাস অ্যাওর্টা → নিলয় → অলিন্দ → ফুলকা
ঘ ফুলকা → অলিন্দ → বাল্বাস অ্যাওর্টা → নিলয়

২. রুই মাছের দেহের অক্ষীয়তলে কয়টি ছিদ্র থাকে?
[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

৩. নিচের কোনটি রুই মাছকে অক্সিজেন গ্রহণে সাহায্য করে?
[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
ক ফুলকা আর্চ খ ফুলকা র‍্যাকার
গ ফুলকা আবরণী ঘ ফুলকা ফিলামেন্ট

৪. নিচের কোনটি রুই মাছের রেণু পোনার দৈর্ঘ্য?
[যশোর বোর্ড-২০১৭]
ক ৫.৮ মি.মি. খ ৭.৮ মি.মি.
গ ১২.৮ মি.মি. ঘ ২৩.৮ মি.মি.

৫. রুই মাছে কত ধরনের যুগ্ম পাখনা থাকে?*[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৬. কোন প্রাণীতে একচক্রী রক্ত সংবহনতন্ত্র উপস্থিত?
[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]
ক *Poekilocerus pictus* খ *Labeo rohita*
গ *Hydra vulgaris* ঘ *Homo sapiens*

৭. রুই মাছে প্রতি পার্শ্বে কতটি ফুলকা আর্চ থাকে?
[ঢাকা বোর্ড-২০১৬]
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ) ৫

৮. রুই মাছের কানকোর ঠিক পেছনে অবস্থিত পাখনা জোড়ার নাম কী?
[রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]
ক শ্রোণিপাখনা খ পায়ু পাখনা
গ বক্ষ পাখনা ঘ পুচ্ছ পাখনা

৯. রুইমাছের হৃৎপিণ্ড হতে ফুলকায় রক্ত সরবরাহ করে কোনটির মাধ্যমে?
[রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]
ক এফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি খ ইফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি
গ ল্যাটেরাল ধমনি ঘ পৃষ্ঠীয় ধমনি

১০. ভেনাস হার্ট পাওয়া যায়–?
[যশোর বোর্ড-২০১৬]
ক ব্যাঙ খ মাছ গ কুমির ঘ পাখি

১১. বাংলাদেশের কোন নদীতে রুই মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন হয়?
[যশোর বোর্ড-২০১৬]
ক বুড়িগঙ্গা নদী খ সুরমা নদী
গ হালদা নদী ঘ যমুনা নদী

১২. রুই মাছের পুচ্ছ পাখনা কোন ধরনের? *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]*
ক হেমোসার্কাল খ হেটারোসার্কাল
গ ডিফিসার্কাল ঘ প্রোটোসার্কাল

১৩. রুই মাছের বক্ষ অঞ্চলে কোন ধমনি রক্ত সরবরাহ করে?
[সিলেট বোর্ড-২০১৬]
ক প্যারাইটাল খ রেনাল গ ইলিয়াক ঘ সাবক্ল্যাভিয়ান

১৪. রুই মাছের আঁইশের নাম কী? *[যশোর বোর্ড-২০১৯]*
ক সাইক্লয়েড খ টিনয়েড গ প্লাকয়েড ঘ গ্যানয়েড

১৫. রুই মাছের হৃৎপিণ্ড কয়টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত?
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি

১৬. রুই মাছের প্রধান চলন অঙ্গ কোনটি? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৫]*
ক বক্ষপাখনা খ শ্রোণিপাখনা
গ পৃষ্ঠপাখনা ঘ পুচ্ছপাখনা

১৭. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?*[ঢাকা বোর্ড-২০১৫]*
ক O_2 যুক্ত রক্ত পাম্প করে
খ CO_2 যুক্ত রক্ত পাম্প করে
গ O_2 ও CO_2 যুক্ত রক্ত পাম্প করে
ঘ মিশ্রিত রক্ত পাম্প করে

১৮. রুই মাছের ফুলকা সংখ্যা কত জোড়া? *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৫]*
ক চার জোড়া খ পাঁচ জোড়া গ ছয় জোড়া ঘ সাত জোড়া

১৯. *Labeo rohita*-র আঁইশের কেন্দ্রকে কী বলে?
[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৫]
ক সারকুলি খ অ্যানুলি গ ফোকাস ঘ ক্রোম্যাটোফোর

২০. রুই মাছের বায়ুথলির কাজ হলো– *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]*
ক পানির গভীরতা নির্ধারণ খ দেহে শ্বসন পরিচালনা
গ রক্তে হিমোগ্লোবিন সঞ্চালন ঘ খাদ্য গ্রহণে সহায়তা দান

২১. রুই মাছের পৃষ্ঠ পাখনায় কতটি পাখনা রশ্মি বিদ্যমান?
ক ১০-১২টি খ ১২-১৩টি গ ১৪-১৬টি ঘ ১৭-১৮টি

২২. কোনটি রুই মাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]*
ক সারকুলাস খ হেটারোসার্কল
গ ডেন্টাইন ঘ বার্বেল

২৩. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত সঞ্চালনের সঠিক গতিপথ কোনটি? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৫]*
ক বাল্বাস আর্টোরিওসাস→ ভেন্ট্রিকল→ অ্যান্ট্রিয়াম → সাইনাস ভেনোসা
খ অ্যাট্রিয়াম→ ভেন্ট্রিকল→ বাল্বাস আর্টোরিওসাস → সাইনাস ভেনোসাস
গ সাইনাস ভেনোসাস→ অ্যাট্রিয়াম→ ভেন্ট্রিকল → বাল্বাস আর্টোরিওসাস
ঘ সাইনাস ভেনোসাস→ ভেন্ট্রিকল→ অ্যাট্রিয়াম → বাল্বাস আর্টোরিওসাস

২৪. রুই মাছের আঁইশ হলো– *[সিলেট বোর্ড-২০১৫]*
ক প্ল্যাকয়েড খ টিনয়েড গ গ্যানয়েড ঘ সাইক্লয়েড

2020/8/4 12:57
Scanned with CamScanner

২৫. নিচের কোনটি রুই মাছ স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের কাজ করে? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]

ক সাইক্লয়েড আঁইশ খ কানকো
গ পার্শ্বীয় রেখা ঘ বায়ুথলি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬. রুই মাছের রক্ত সংবহনের জন্য নিচের কোনটি প্রযোজ্য? [যশোর বোর্ড-২০১৭]

i. রক্তপ্রবাহ একমুখী ii. শীতল রক্তবিশিষ্ট
iii. হৃৎপিণ্ড হতে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুলকাতে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের অংশগুলো হলো– [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]

i. সাইনাস ভেনোসাস ii. কোনাস আর্টারিওসাস
iii. বাল্বাস আর্টারিওসাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. রুই মাছের বায়ুথলির কাজ হলো– [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]

i. শব্দ উৎপাদন করা ii. প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা
iii. শ্বসনে সাহায্য করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. রুই মাছের পটকায় বিদ্যমান গ্যাস হলো–

i. অক্সিজেন ii. কার্বন ডাইঅক্সাইড iii. হাইড্রোজেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. কঠিনাস্থি মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত–

i. রক্ত ii. অন্তর্বাহী রক্তনালি iii. ধমনি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. ব্রাঙ্কিয়াল আর্চের দৈর্ঘ্য বরাবর অবস্থিত–

i. অ্যাফারেন্ট ধমনি ii. ইফারেন্ট ধমনি
iii. ফুলকা দন্তিকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

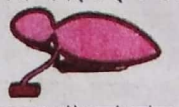

৩২. উল্লিখিত চিত্রের অঙ্গে পাওয়া যায়– [ঢাকা বোর্ড-২০১৬]

i. O_2 ii. CO_2 iii. N_2
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. উল্লিখিত অঙ্গটি–

i. উদস্থিতিয় অঙ্গ ii. শ্বসন অঙ্গ iii. শব্দ উৎপন্নকারী অঙ্গ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

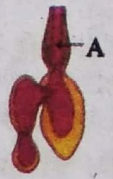

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]

৩৪. উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত অংশটির নাম কী?

ক ভেন্ট্রিকল খ বাল্বাস আর্টারিওসাস
গ অ্যাট্রিয়াম ঘ সাইনাস ভেনোসাস

৩৫. উদ্দীপকের অঙ্গটি–

i. চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট
ii. পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরে অবস্থান করে
iii. একমুখী রক্ত প্রবাহবিশিষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

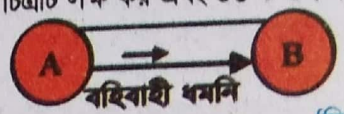

[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬]

৩৬. উদ্দীপকের A ও B অঙ্গদ্বয় নিচের কোনগুলো?

ক হৃৎপিণ্ড ও ফুলকা খ ফুলকা ও সারাদেহ
গ ফুলকা ও হৃৎপিণ্ড ঘ হৃৎপিণ্ড ও সারাদেহ

৩৭. উদ্দীপকের ধমনির ক্ষেত্রে নিচের কোনগুলো সঠিক?

i. এর সাবক্ল্যাভিয়ান শাখা আন্ত্রিক অঙ্গে যায়
ii. এটি ফুলকা হতে CO_2 যুক্ত রক্তবহন করে
iii. এর শাখা পার্শ্বীয় ধমনিতে যুক্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্বপ্নীল ব্যবহারিক ক্লাসে রুই মাছ দেখে তার কলেজপড়ুয়া বন্ধুকে বলল, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বলেছেন মাছটি বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া চালায়।

৩৮. উদ্দীপকের মাছটি নিম্নের যে শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?

ক Chondrichthyes খ Osteichthyes
গ Sarcopterygii ঘ Amphibia

৩৯. উক্ত শ্রেণিতে যে ধরনের আঁইশ পাওয়া যায়–

i. সাইক্লয়েড ii. প্ল্যাকয়েড iii. টিনয়েড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪০ ও ৪১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাদবিন একাদশ শ্রেণির ছাত্র। প্রাণিবিজ্ঞান ক্লাসে সে রুই মাছের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৫]

৪০. উদ্দীপকের মাছটির বৈশিষ্ট্য হলো–

i. পুচ্ছ পাখনা সমান ii. ফুলকা ৬ জোড়া
iii. মুখছিদ্র সম্মুখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১. উদ্দীপকের মাছটির রক্তপ্রবাহের দিক কোনটি?

ক অ্যাট্রিয়াম → ভেন্ট্রিকল → সাইনাস ভেনোসাস → বাল্বাস অর্টেরিওসাস
খ সাইনাস ভেনোসাস → অ্যাট্রিয়াম → ভেন্ট্রিকল → বাল্বাস আর্টেরিওসাস
গ ভেন্ট্রিকল → সাইনাস ভেনোসাস → বাল্বাস আর্টেরিওসাস → অ্যাট্রিয়াম
ঘ বাল্বাস আর্টেরিওসাস → অ্যাট্রিয়াম → ভেন্ট্রিকল → সাইনাস ভেনোসাস

2020/8/4 12:57

Scanned with CamScanner

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৪২ ও ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

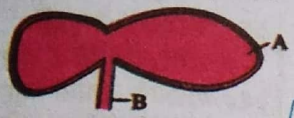

[যশোর বোর্ড-২০১৫]

৪২. উদ্দীপকে B চিহ্নিত অংশটির নাম কী?
ক ইউস্টেসিয়ান নালি খ অ্যালভিওলার নালি
গ নিউম্যাটিক নালি ঘ সংগ্রাহী নালি

৪৩. উদ্দীপক A এর কাজ–
i. আপেক্ষিক গুরুত্ব রক্ষা ii. শব্দ তৈরি iii. প্লবতা রক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৪৪ ও ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[ঢাকা বোর্ড-২০১৮]

৪৪. চিত্রের অঙ্গটির প্রকোষ্ঠের সংখ্যা কয়টি?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৭

৪৫. চিত্রের অঙ্গটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–
i. বাল্বাস আর্টারিওসাস বিদ্যমান
ii. এক চক্রীয় সংবহনতন্ত্রের অংশ
iii. অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৪৬ ও ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

[রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]



৪৬. উদ্দীপকের A অংশে গ্যাস পাওয়া যায়–
i. অক্সিজেন ii. নাইট্রোজেন iii. কার্বন ডাইঅক্সাইড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৭. উদ্দীপকের অঙ্গটি সহায়তা করে–
i. ভাসতে ii. শব্দ সৃষ্টিতে iii. শিকার ধরতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৮. কত সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে রুই মাছ বাঁচাতে পারে না? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক ২৪ ডিগ্রী সে. খ ১৬ ডিগ্রী সে.
গ ১৪ ডিগ্রী সে. ঘ ২০ ডিগ্রী সে.

৪৯. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডকে কী নামে অভিহিত করা হয় ? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক দ্বিচক্র হৃৎপিণ্ড খ শিরা হৃৎপিণ্ড
গ বহুচক্র হৃৎপিণ্ড ঘ ধমনি হৃৎপিণ্ড

৫০. রুই মাছের আঁইশ কোন ধরনের? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক প্ল্যাকয়েড খ সাইনয়েড গ টিনয়েড ঘ সাইক্লয়েড

৫১. রুই মাছের আঁইশের বৃদ্ধি কোন সময়ে বেশি হয়? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক বসন্তকালে খ শীতকালে গ শরৎকালে ঘ বর্ষাকালে

৫২. নিম্নে উল্লেখিত কোন মাছে সাইক্লোয়েড আঁইশ পাওয়া যায় না? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক ইলিশ খ স্যামন গ কার্প ঘ রুই

৫৩. স্ত্রী রুইমাছ ডিম পাড়ে কখন? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক জানুয়ারী-মার্চ মাস খ ফ্রেব্রুয়ারী-মে মাস
গ জুন-আগস্ট মাস ঘ সেপ্টেম্বর-জানুয়ারী মাস

উত্তরমালা

১.(ক); ২.(গ); ৩.(ঘ); ৪.(খ); ৫.(ক); ৬.(খ); ৭. (গ); ৮. (গ); ৯. (ক); ১০. (খ); ১১. (গ); ১২. (ক); ১৩. (ঘ); ১৪ . (ক); ১৫. (ক); ১৬. (ঘ); ১৭. (খ); ১৮. (ক); ১৯. (গ); ২০. (খ); ২১. (গ); ২২. (ঘ); ২৩. (গ); ২৪. (ঘ); ২৫. (গ); ২৬.(ঘ); ২৭.(খ); ২৮. (ঘ); ২৯. (ক); ৩০.(গ); ৩১. (ঘ); ৩২. (ঘ); ৩৩. (ঘ); ৩৪. (খ); ৩৫. (গ); ৩৬. (খ); ৩৭. (খ); ৩ ৮. (খ); ৩৯. (খ); ৪০. (খ); ৪১. (খ); ৪২. (গ); ৪৩. (ঘ); ৪৪.(ক); ৪৫.(ক); ৪৬.(ঘ); ৪৭. (ক); ৪৮. (গ); ৪৯. (খ); ৫০. (ঘ); ৫১. (ক); ৫২.(ক); ৫৩. (গ)।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. কার্প কী? [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
২. মাছ বা মৎস্য কী?
৩. স্ট্রিমলাইন্ড কী?
৪. ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা কী?
৫. পার্শ্বরেখা কী?
৬. ভেনাস হার্ট বা শিরা হৃৎপিণ্ড কী? [ঢাকা বোর্ড-২০১৫]
৭. বাল্বাস আর্টারিওসাস কী?
৮. সাইনাস ভেনোসাস কী?
৯. কোনাস আর্টারিওসাস কী?
১০. ধমনিতন্ত্র কী?
১১. অ্যাফারেন্ট বা অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি কাকে বলে?
১২. ইফারেন্ট বা বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি কাকে বলে?
১৩. শিরাতন্ত্র কী?
১৪. সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র কাকে বলে?
১৫. পোর্টাল শিরাতন্ত্র কী?
১৬. ট্রান্সভার্স অ্যানাস্টোমোসিস কী?
১৭. রুই মাছের শ্বসন অঙ্গের নাম কী?
১৮. হলোব্রাঙ্ক কী?
১৯. ওয়েবেরিয়ান অসিকল কী?
২০. ফাইসোক্লিসটাস বায়ুথলি কী?
২১. রেটিমিরাবিলি কী?
২২. ফাইসোসটোমাস বায়ুথলি কী?
২৩. ডাক্টাস নিউমেটিকাস কী?
২৪. জীবনচক্র কাকে বলে?
২৫. এপিব্লাস্ট কী?
২৬. হাইপোব্লাস্ট কী?
২৭. মার্জিনাল রিজ কী?
২৮. ভ্রূণীয় বর্ম কী?
২৯. মেসরকিয়াম কী?
৩০. স্পনিং কী?
৩১. অ্যাটরেশিয়া কী?
৩২. ডিমারসাল কী?
৩৩. রেণু পোনা কী?
৩৪. ধানী পোনা কী?
৩৫. আঙুলে পোনা বা চারাপোনা বা ফিঙ্গারলিং কী?
৩৬. রুই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।

2020/8/4 12:57
Scanned with CamScanner

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. রুই মাছ স্থির পানিতে ডিম পাড়ে না কেন? [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
২. কার্প জাতীয় মাছ বলতে কী বোঝ? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]
৩. প্রজাতি পর্যন্ত রুই মাছের শ্রেণিবিন্যাস লিখ।
৪. রুই মাছকে কার্প জাতীয় মাছ বলা হয় কেন?
৫. ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দার কাজ লিখ।
৬. সাইক্লয়েড আঁইশের গঠন ও কাজ লিখ।
৭. রুই মাছের বায়ুথলি গ্রাসনালির সাথে যুক্ত থাকে কেন? [সিলেট বোর্ড-২০১৭]
৮. রুই মাছের বয়স নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
৯. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের গঠন লিখ।
১০. একচক্রী বা একবর্তনী সংবহন বলতে কী বুঝ?
১১. রুই মাছের ফুলকার গঠন লিখ।
১২. বায়ুথলির বা পটকার গঠন লিখ।
১৩. বায়ুথলির কাজ লিখ।
১৪. মাছের বায়ুথলি বা পটকাকে হাইডোস্ট্যাটিক অঙ্গ বলা হয় কেন?
১৫. হ্যাচারি পোনা অপেক্ষা প্রাকৃতিক পোনার চাহিদা বেশি কেন? [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]
১৬. ভেনাস হার্ট বলতে কী বোঝ? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭, যশোর বোর্ড-১৫]

পার্থক্য/তুলনা :

১৭. রুই মাছের হৃৎপিণ্ড এবং মানুষের হৃৎপিণ্ড।
১৮. বায়ুথলি ও ফুসফুস।

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত একটি মাছ আছে, যার দেহে এমন একটি অঙ্গ আছে যা পানিতে দেহের ভারসাম্য ও শ্বসনে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও এর রক্তসংবহন পদ্ধতি তোমার রক্তসংবহন পদ্ধতি অপেক্ষা ভিন্নতর।
ক. ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা কী?
খ. রুই মাছকে কার্প জাতীয় মাছ বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটির গঠন ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড-২০১৮]
ঘ. উদ্দীপকের শেষের লাইনটি যথার্থতা মূল্যায়ন কর। [সকল বোর্ড-২০১৮]

২। শিক্ষক ব্যবহারিক ক্লাসে রুই মাছের ব্যবচ্ছেদপূর্বক সংকোচন প্রসারণশীল বিশেষ একটি অঙ্গকে দেখিয়ে বললেন– এটি রক্ত সংবহনের প্রাণকেন্দ্র। তিনি আরও বললেন– "মাছের ক্ষেত্রে এই সংবহন প্রক্রিয়াটি এক চক্রীয় প্রকৃতির।"
ক. পোর্টাল শিরাতন্ত্র কী?
খ. একচক্রী বা একবর্তনী সংবহন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ অঙ্গটির চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর। [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের শেষ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]

৩। পুকুর থেকে রুই মাছ ধরে তুলে আনার কিছুক্ষণ পর মাছটি মারা গেলে নাফিস তার মামাকে প্রশ্ন করল, মাছটি মারা গেল কেন? মামা বললেন, মাছেরা পানিতে বিশেষ ধরনের অঙ্গের সাহায্যে শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে।
ক. ভেনাস হার্ট কী? [ঢাকা বোর্ড-২০১৫]
খ. মাছের বায়ুথলি বা পটকাকে হাইডোস্ট্যাটিক অঙ্গ বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে মাছের শ্বাস নেওয়ার যে অঙ্গের কথা বলা হয়েছে, তার বর্ণনা কর। [ঢাকা বোর্ড-২০১৫]
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাছটি রক্ষার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়– তোমার মতামত দাও। [ঢাকা বোর্ড-২০১৫]

৪। শারমীনের বাবা পুকুর থেকে একটি রুই মাছ ধরার পর সে লক্ষ্য করল, পানি থেকে তোলার পর মাছটি লাফালাফি করতে লাগল এবং কানকোর নিচে লাল রঙের চিরুনির মতো কিছু দেখতে পেল, কিছুক্ষণ পর মাছটি মারা গেল। বিষয়টি সে বুঝতে পারল না যে, মাছটি কিছুক্ষণ পূর্বেই বেঁচে ছিল কিন্তু সেটি কেন ডাঙ্গায় তোলার পর মারা গেল। [বরিশাল বোর্ড-২০১৫]
ক. রুই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
খ. রুই মাছের বাহ্যিক গঠনের চিহ্নিত চিত্র আঁক।
গ. উদ্দীপকের চিরুনির ন্যায় অঙ্গটির গঠন বর্ণনা কর।
ঘ. ডাঙ্গার প্রাণীদের শ্বসনতন্ত্রের সাথে উদ্দীপকের মাছটির শ্বসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান– বিশ্লেষণ কর।

৫। কার্প জাতীয় মাছের মধ্যে রুই বাংলাদেশের অতিপরিচিত একটি মাছ। খাদ্যগ্রহণ ও চলাফেরার জন্য মাছটি একটি বিশেষ অঙ্গের সাহায্যে পানির বিভিন্ন গভীরতায় শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক রেখে অনায়াসে বিচরণ করে। বর্তমানে নদী ও জলাশয়ের গভীরতা কমে যাওয়ায় মাছটির বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র হুমকির মুখে পড়েছে। [যশোর বোর্ড-২০১৫]
ক. লার্ভা কী?
খ. ভেনাস হার্ট বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকের মাছটি কীভাবে পানির বিভিন্ন গভীরতায় শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক রেখে বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে অনায়াসে বিচরণ করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাছটির প্রাকৃতিক বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র হুমকির মুখে কেন– আলোচনা কর।

৬। শিক্ষক রুই মাছ ব্যবচ্ছেদ করার সময় কানকোর নিচে চিরুনির মতো একটি গঠন দেখিয়ে বললেন, এটি দিয়ে মাছ শ্বাসকার্য চালায়। পরবর্তীতে পেটের অংশে দেখালেন, সাদা রঙের লম্বাটে বালিশের মতো একটি গঠন। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]
ক. ডিমারসাল কী?
খ. হ্যাচারি পোনা অপেক্ষা প্রাকৃতিক পোনার চাহিদা বেশি কেন?
গ. উদ্দীপকের মাছটির পেটের অংশে প্রাপ্ত গঠনটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্বসন অঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের সংবহনতন্ত্র CO_2 যুক্ত রক্তকে O_2 যুক্ত করে– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৭। অপু তার বন্ধু কমলের ন্যায় রুই মাছ খেতে পছন্দ করে, কিন্তু কৈ মাছ খেতে পছন্দ করেনা। একসময় প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে রুই মাছের পোনা পাওয়া গেলেও এখন তেমন পাওয়া যায় না। [সিলেট বোর্ড-২০১৫]
ক. রুই মাছের শ্রেণির নাম লিখ।
খ. ভেনাস হার্ট বা শিরা হৃৎপিণ্ড বলতে কী বুঝায়?
গ. অপুর পছন্দের মাছটির বাহ্যিক গঠনের (সচিত্র) বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রথমোক্ত মাছটির পোনার উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাকৃতিক জলাশয়ে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব– ব্যাখ্যা কর।

2020/8/4 12:57
Scanned with CamScanner

2020/8/4 12:37

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়
মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

ঐতিহ্যে ৫১ বছর
কাজল প্রকাশ লিমিটেড

Scanned with CamScanner

মানব শারীরতত্ত্ব : পরিপাক ও শোষণ
PHYSIOLOGY OF HUMAN BODY : DIGESTION AND ABSORPTION

অধ্যায় ৩

আমরা সাধারণত জটিল খাদ্য গ্রহণ করি। এই জটিল খাদ্য পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন এনজাইমের প্রভাবে সরল খাদ্যে পরিণত হয় অর্থাৎ খাদ্য পাচিত বা হজম হয়। সুতরাং যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অদ্রবণীয় কঠিন ও জটিল খাদ্য বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় দ্রবণীয় তরল ও সরল খাদ্যে পরিণত হয়ে শোষণ ও আত্তীকরণের উপযোগী হয়, তাকে **পরিপাক** বলে। এক কথায়, জটিল খাদ্য সরল খাদ্যে পরিণত হওয়াকেই পরিপাক বলে। পৌষ্টিক গ্রন্থি থেকে পরিপাক রস নিঃসৃত হয়। পরিপাক রসস্থিত এনজাইম খাদ্য পরিপাকে প্রধান ভূমিকা পালন করে। মানবদেহের খাদ্য পরিপাকের প্রধান স্থানগুলো হলো মুখবিবর, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র। যেসব পৌষ্টিকগ্রন্থি খাদ্য পরিপাকে প্রধান ভূমিকা পালন করে সেগুলো হলো লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি। আমরা যেসব খাদ্য উপাদান গ্রহণ করি তাদের মধ্যে ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পানি তরল খাদ্যে পরিণত হওয়ায় পরিপাকনালিতে সরাসরি শোষিত হয়। সুতরাং কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।


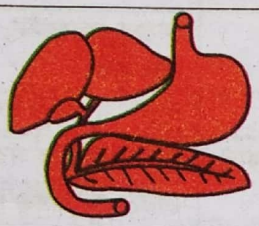
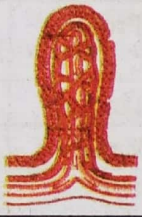

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ১১)
১. মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ২. পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশে সংগঠিত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। ৩. যকৃতের সঞ্চয়ী এবং বিপাকীয় ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে স্নায়ুতন্ত্র এবং গ্যাস্ট্রিক হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৬. খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশের মূখ্য ক্রিয়াসমূহ (Major actions) বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেন হতে রক্তনালিকা এবং ভিলাই পর্যন্ত পরিপাককৃত দ্রব্যের শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বৃহদন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. **ব্যবহারিক** ○ পরিপাক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কোষসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে। ১০. স্থূলতার ধারণা, কারণ ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাক ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশে সংগঠিত পরিপাক ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পরিপাক গ্রন্থির কাজ ○ যকৃৎ ○ অগ্ন্যাশয় ● পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা ● ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যর ○ পরিপাক ○ শোষণ ● বৃহদন্ত্রের কাজ ● **ব্যবহারিক** ○ যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদ (section) এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ ● স্থূলতা ○ ধারণা ○ কারণ ○ প্রতিরোধ

2020/8/4 12:58

Scanned with CamScanner

পরিপাক (Digestion)

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে ভক্ষণকৃত জটিল, অদ্রবণীয় ও অশোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানসমূহ (শর্করা, আমিষ ও স্নেহ) হরমোনের প্রভাবে নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে দ্রবণীয়, সরল এবং শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত হয়, তাকে পরিপাক (digestion) বা **হজম বলে**। মানুষ **সর্বভুক** (omnivorus) প্রাণী। শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি এ ছয় ধরনের খাদ্যই মানুষ গ্রহণ করে। এসব খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন, পানি ও খনিজ লবণ কোষ কর্তৃক সরাসরি গৃহীত হয়, ফলে মানুষের এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য জটিল বিধায় এগুলোকে পরিপাকের প্রয়োজন হয়। মানুষ অধিকাংশ খাদ্যকে সিদ্ধ অবস্থায় খেয়ে থাকে। কারণ মানুষের পরিপাকতন্ত্র কাঁচা খাদ্য হজমের উপযোগী নয়।

যে খাদ্যে ৬টি খাদ্য উপাদানই (শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি) সঠিক পরিমাণে বিদ্যমান এবং খাদ্য গ্রহণে কোনো ব্যক্তির বৃদ্ধি, পুষ্টি, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে তাকে **সুষম খাদ্য** (balance diet) বলে।

সুষম খাদ্যের প্রাত্যহিক চাহিদা : একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের নিম্নলিখিত হারে দৈনিক সুষম খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক–

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ	প্রধান কাজ
শর্করা (Carbohydrate)	৪১৫-৬০০ গ্রাম	দেহে তাপশক্তি উৎপাদন ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।
আমিষ (Protein)	১০০-১৫০ গ্রাম	দেহের কোষগঠন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন, এনজাইম ও হরমোন উৎপাদন।
স্নেহদ্রব্য (Lipid)	৫০-৫৫ গ্রাম	দেহে তাপশক্তি উৎপাদন ও তাপ নিয়ন্ত্রণ।
ভিটামিন (Vitamin)	৫৫০০-৫৬০০ মিলিগ্রাম	পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।
খনিজ লবণ (Mineral salts)	৮-১০ গ্রাম	দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
পানি (Water)	২-৩ লিটার	কোষের প্রোটোপ্লাজমকে সিক্ত ও সজীব রাখা এবং কোষের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা।

মানুষের খাদ্য পরিপাক প্রণালি (Process of Human Digestion)

মানুষের **বহিঃকোষীয়** (extra-celluler) ও **অন্তঃকোষীয়** (intra-celluler) উভয় ধরনের পরিপাক সংঘটিত হয়। পৌষ্টিকনালির গহ্বরের ভেতরে বহিঃকোষীয় এবং পৌষ্টিকনালির অন্তঃপ্রাচীরে শোষণক্ষম কোষের ভেতর অন্তঃকোষীয় পরিপাক সম্পন্ন হয়। যে তন্ত্রের মাধ্যমে পরিপাক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে **পরিপাকতন্ত্র** বা **পৌষ্টিকতন্ত্র** (digestive system) বলে। মানুষের পরিপাকতন্ত্র দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা– **পৌষ্টিকনালি** ও **পৌষ্টিক গ্রন্থি**। মানুষের পৌষ্টিকনালির অন্তর্গত **মুখবিবর, পাকস্থলী** ও **ক্ষুদ্রান্ত্রই** হলো খাদ্য পরিপাকের স্থান। মানুষের পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়। তবে পরিপাক দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। যথা– (১) **যান্ত্রিক প্রক্রিয়া** ও (২) **রাসায়নিক প্রক্রিয়া**।

(১) যান্ত্রিক প্রক্রিয়া (Mechanical process) : রাসায়নিক পরিপাকের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করাই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য। যেমন– মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তু দাঁত দ্বারা চিবানো, লালার মিউসিনের সঙ্গে মিশে সিক্ত ও পিচ্ছিল হওয়া, জীবাণুমুক্ত হওয়া ইত্যাদি। অনুরূপভাবে পাকস্থলী ও অন্ত্রে HCl, পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয় রসের প্রভাবে রাসায়নিক পরিপাকের পরিবেশ তৈরি, এনজাইমের সক্রিয়করণ এবং সর্বোপরি খাদ্যবস্তুগুলো মণ্ডে পরিণত হওয়া ইত্যাদি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ঘটে।

(২) রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Chemical process) : এটি পরিপাকের দ্বিতীয় ধাপ। পরিপাক রসের বিভিন্ন এনজাইম (যেমন– মুখগহ্বরের লালাগ্রন্থির লালা রসের এনজাইম ও বিভিন্ন পৌষ্টিক গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন এনজাইম) খাদ্যের উপর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে খাদ্যের জটিল উপাদানগুলো (যেমন– জটিল শর্করা, আমিষ ও স্নেহ বস্তু) ভেঙে দেহকোষের গ্রহণযোগ্য সরল উপাদানে পরিণত করে।

2020/8/4 12:58

Scanned with CamScanner

পরিপাকে পাচক এনজাইমের ভূমিকা (Role of Digestive Enzymes in Digestion)

মানুষের বিভিন্ন ধরনের জটিল খাদ্য পরিপাকে তিন ধরনের পাচক এনজাইম বা পরিপাককারী এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যথা–

❐ **শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী এনজাইম :** যেসব এনজাইম শর্করা বিশ্লিষ্ট করে তাদের **অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম** (amylolytic enzyme) বলে। যেমন– টায়ালিন, অ্যামাইলেজ, আইসোমল্টেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাকটেজ ইত্যাদি।

শর্করার প্রধান উৎস : ভাত, রুটি, গম, যব, আলু, চিনি প্রভৃতি।

শর্করার চূড়ান্ত পরিণতি : শর্করা —(অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম)→ গ্লুকোজ

❐ **আমিষ বা প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম :** যেসব এনজাইম প্রোটিন বিশ্লিষ্ট করে তাদের **প্রোটিওলাইটিক এনজাইম** (proteolytic enzyme) বলে। যেমন– পেপসিন, রেনিন, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বোক্সিপেপটাইডেজ, অ্যামাইনোপেপটাইডেজ, ডাইপেপটাইডেজ ইত্যাদি।

আমিষের প্রধান উৎস : মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, সবজি, ফল ইত্যাদি।

আমিষের চূড়ান্ত পরিণতি : আমিষ —(প্রোটিওলাইটিক এনজাইম)→ অ্যামিনো এসিড

❐ **স্নেহ বা লিপিড পরিপাককারী এনজাইম :** যেসব এনজাইম লিপিড বিশ্লিষ্ট করে তাদের **লাইপোলাইটিক এনজাইম** (lipolytic enzyme) বলে। যেমন– অগ্ন্যাশয় রসের **প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজ** (pancreatic lipase) এবং আন্ত্রিক রসের **ইনটেসটিনাল লাইপেজ** (intestinal lipase), ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ ইত্যাদি।

স্নেহজাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস : ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি ইত্যাদি।

স্নেহ বস্তুর চূড়ান্ত পরিণতি : স্নেহ বস্তু —(লাইপোলাইটিক এনজাইম)→ ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল

পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System)

(এই অংশটুকু সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে জানা থাকা ভালো)

যে তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে **পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র** বলে। মানুষের পরিপাকতন্ত্র দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা– **পৌষ্টিকনালি ও পৌষ্টিক গ্রন্থি।**

(ক) পৌষ্টিকনালি (Alimentary Canal/Digestive Tract) : পরিপাকতন্ত্রের যে অংশ খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ ও অপাচ্য অংশ নিষ্কাশন করে তাকে **পৌষ্টিকনালি** বলে। এটি মুখছিদ্র হতে শুরু করে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং লম্বায় প্রায় ১০ মিটার। এর বিভিন্ন অংশগুলো নিম্নরূপ–

১। মুখছিদ্র (Mouth opening) : পৌষ্টিকনালির শুরু মুখ থেকে। এটি নাসিকা ছিদ্রের নিচে এক আড়াআড়ি ছিদ্র, যা উপরের ও নিচের ঠোঁট দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। ঠোঁটদ্বয় খোলা ও বন্ধ করার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাজ : মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গৃহীত হয়।

২। মুখবিবর বা মুখগহ্বর (Buccal cavity/Mouth cavity) : মুখছিদ্রের ঠিক পেছনে অবস্থিত গহ্বরটি মুখগহ্বর বা মুখবিবর। মুখছিদ্রের মাধ্যমে এই গহ্বরে খাদ্য প্রবেশ করে। এটি উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়াল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। এই গহ্বরে দাঁত ও জিহ্বা থাকে। এতে লালাগ্রন্থি উন্মুক্ত হয়। মুখবিবরের ছাদকে **তালু** (palate) বলে।

কাজ : মুখবিবরে খাদ্যের স্বাদ অনুভূত হয় এবং খাদ্যবস্তু চর্বিত, পেষিত ও লালামিশ্রিত হয়ে গলাধঃকরণ উপযোগী হয়।

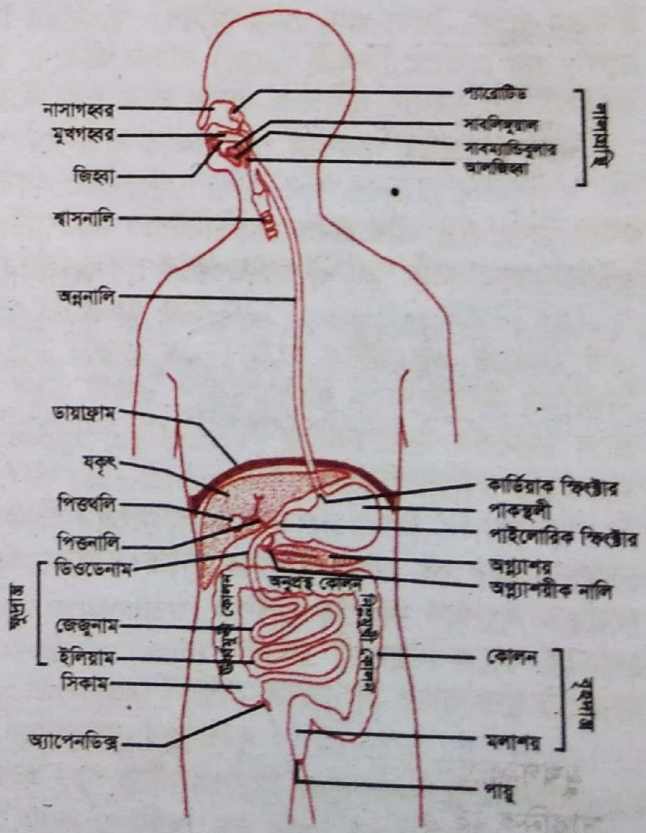

চিত্র ৩.১ : মানুষের পরিপাকতন্ত্র (রঙিন চিত্র)

2020/8/4 12:58
Scanned with CamScanner

৩। গলবিল (Pharynx) : এটি মুখবিবর ও অন্ননালির মধ্যবর্তী অংশ। এটি প্রায় ১০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও চওড়া ফানেলাকার অংশ। এই অংশের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু মুখবিবর থেকে অন্ননালিতে প্রবেশ করে। গলবিল তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা- i. নাসাগহ্বরের সাথে সংযোগকারী নাসাগলবিল (nasopharynx), ii. মুখবিবরের সঙ্গে সংযোগকারী মুখগলবিল (oropharynx) এবং iii. স্বরনালির (larynx) সঙ্গে সংযোগকারী স্বরগলবিল (laryngopharyx)।

কাজ : খাদ্য ও শ্বাসবায়ু চলাচলের সাধারণ পথ হিসেবে কাজ করে।

৪। অন্ননালি (Oesophagus) : গলবিলের পরবর্তী পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত ২৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ নলাকার অংশটিকে অন্ননালি বলে। এটি পৌষ্টিকনালির সবচেয়ে পেশিবহুল অংশ।

কাজ : অন্ননালির ক্রমসংকোচনের (peristalsis) মাধ্যমে খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছায়।

৫। পাকস্থলী (Stomach) : পাকস্থলী ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাঁকানো থলির মতো অংশ। পাকস্থলীর চারটি অংশ থাকে, যথা– (ক) **কার্ডিয়াক প্রান্ত** (cardiac end) অর্থাৎ অন্ননালি ও পাকস্থলীর সংযোগস্থল (বা এটি পাকস্থলীর হৃৎপিণ্ড সংলগ্ন অংশ), (খ) **ফানডাস** (fundus) অর্থাৎ পাকস্থলীর বাম পাশে গম্বুজাকৃতির অংশ, (গ) **দেহ** (body) অর্থাৎ পাকস্থলীর প্রধান ও মাঝখানের অংশ এবং (ঘ) **পাইলোরিক অঞ্চল** (pyloric region) অর্থাৎ পাকস্থলীর পশ্চাৎভাগে ডিওডেনাম সংলগ্ন অংশ। কার্ডিয়াক ও পাইলোরিক অঞ্চলে বৃত্তাকার পেশিবলয় থাকে। এদের যথাক্রমে **কার্ডিয়াক স্ফিংক্টার** (cardiac sphincter) ও **পাইলোরিক স্ফিংক্টার** (pyloric sphincter) বলে। পাকস্থলীতে দুটি বক্রতা দেখা যায়, যথা– ডান অবতল কিনারা তথা ছোট বাঁক এবং বাম উত্তল কিনারা তথা বড় বাঁক।

পাকস্থলীর প্রাচীর **সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা** ও **মিউকোসা** নামক পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। পাকস্থলীর মিউকোসা স্তরে **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** বিদ্যমান।

কাজ : পাকস্থলীতে সাময়িকভাবে খাদ্য জমা থাকে, খাদ্য জীবাণুমুক্ত হয় এবং কিছু খাদ্যের আংশিক পরিপাক হয়।

৬। ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine) : পাইলোরিক পাকস্থলীর পশ্চাৎ অংশ থেকে শুরু করে বৃহদন্ত্রের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৬ -৭ মিটার লম্বা নলাকার অংশকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে **ইলিওকোলিক স্ফিংক্টার** (ileocolic sphincter) নামক একটি পেশিবলয় বিদ্যমান। ক্ষুদ্রান্ত্র ৩টি প্রধান অংশে বিভক্ত। যথা–

(১) ডিওডেনাম (Duodenum) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের পাকস্থলী সংলগ্ন অংশ এবং প্রায় ২৫-৩০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এটি দেখতে 'U' আকৃতি এবং পিত্তনালি এবং অগ্ন্যাশয়নালি এই অংশে উন্মুক্ত হয়। ডিওডেনামে **ব্রুনার গ্রন্থি** (Bruner's gland) দেখা যায়।

(২) জেজুনাম (Jejunum) : এটি ডিওডেনামের পরবর্তী প্রায় ২-৩ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অংশ।

(৩) ইলিয়াম (Ileum) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ যা বৃহদন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের সবচেয়ে দীর্ঘতম অংশ, দৈর্ঘ্য প্রায় ৩-৪ মিটার। ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকোসা স্তরে যে নলাকার গ্রন্থি অবস্থিত তাদের **আন্ত্রিক গ্রন্থি** বলে। এর প্রাচীরে **ভিলাই** (villi) নামক অসংখ্য অভিক্ষেপ থাকে। আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত আন্ত্রিক রস এবং অগ্ন্যাশয় রস খাদ্যের পরিপাক সম্পন্ন করে এবং অন্ত্রের ভিলাই খাদ্যসার শোষণ করে।

কাজ : ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যবস্তু পরিপাক ও খাদ্যসার শোষিত হয়।

৭। বৃহদন্ত্র (Large intestine) : ক্ষুদ্রান্ত্রের পরবর্তী মোটা নলাকৃতি অংশকে বৃহদন্ত্র বলে। বৃহদন্ত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ মিটার এবং প্রস্থ প্রায় ৪-৭ সেন্টিমিটার। এটি ইলিয়ামের শেষ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। বৃহদন্ত্রে অধিক সংখ্যক মিউকাস ক্ষরণকারী **গবলেট কোষ** থাকে। বৃহদন্ত্রের তিনটি অংশ থাকে। যথা–

(১) সিকাম (Caecum) : সিকাম বৃহদন্ত্রের প্রথম অংশ এবং ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থল থেকে বিস্তৃত। এটি দেখতে বদ্ধ থলির মতো। বদ্ধ প্রান্তটি নিম্নমুখী এবং খোলা প্রান্ত উর্ধ্বমুখী হয়ে কোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। সিকামের নিচের দিকে বহিঃবৃদ্ধিরূপে একটি অংশ দেখা যায়, যা মিউকাসঝিল্লি নির্মিত কপাটিকায় সুরক্ষিত থাকে। একে **ভার্মিফর্ম অ্যাপেনডিক্স** (vermiform appendix) বলে। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে অ্যাপেনডিক্সের প্রদাহ হলে একে **অ্যাপেনডিসাইটিস** (appendicitis) বলে।

(২) কোলন (Colon) : এটি বৃহদন্ত্রের দীর্ঘতম অংশ। সিকামের পরের ১৫-১৯ সেন্টিমিটার লম্বা অংশ কোলন। এর যে অংশ উপরের দিকে উঠেছে তা **উর্ধ্বগামী কোলন** (ascending colon), বামদিকে আড়াআড়ি অবস্থিত অংশকে **অনুপ্রস্থ কোলন** (transverse colon) এবং এর পরবর্তী যে অংশ বাম পাশ ঘেঁষে নিচের দিকে নেমেছে তাকে **নিম্নগামী কোলন** (descending colon) বলে। নিম্নগামী কোলনের যে অংশ ফাঁসের মতো এস মলাশয়ে যুক্ত তাকে **সিগময়েড কোলন** (sigmoid colon) বলে।

(৩) মলাশয় (Rectum) : বৃহদন্ত্রের শেষপ্রান্তে শ্রোণিদেশে অবস্থিত অনেকটা থলির মতো অংশ। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩ সেন্টিমিটার। মলাশয়ের নিম্নাংশ স্ফীত হয়ে **মলাশয়িক অ্যাম্পুলা** (rectal ampulla) গঠন করে।

কাজ : বৃহদন্ত্রে মল তৈরি হয়, পানি ও স্যালাইন শোষিত হয় এবং খাদ্যাংশের গাঁজন ও পচন ঘটে। এছাড়া এখানে জীবাণু কর্তৃক ভিটামিন B_{12} ও K প্রস্তুত হয়।

2020/8/4 12:5

Scanned with CamScanner

৮। পায়ুছিদ্র (Anus) : মলাশয় পায়ুছিদ্র পথে বাইরে উন্মুক্ত। পায়ু অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ এই দুটি স্ফিংটারে আবদ্ধ। অন্তঃস্থটি মসৃণ পেশিনির্মিত ও অনৈচ্ছিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বহিঃস্থটি অমসৃণ পেশিনির্মিত এবং ঐচ্ছিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাজ : পায়ুপথে মলত্যাগ হয়।

(খ) পৌষ্টিকগ্রন্থি বা পরিপাক গ্রন্থি (Digestive Glands) : যেসব গ্রন্থির ক্ষরিত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে তাদের **পৌষ্টিকগ্রন্থি বা পরিপাক গ্রন্থি** বলে। মানবদেহে পাঁচ ধরনের পৌষ্টিকগ্রন্থি বিদ্যমান, যথা– **লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি**। এসব গ্রন্থির মধ্যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলীর প্রাচীরে এবং আন্ত্রিক গ্রন্থি অন্ত্রের প্রাচীরে অবস্থান করে। অন্য গ্রন্থিগুলো পৌষ্টিকনালির বাইরে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্র গঠনবিশিষ্ট। নিচে বিভিন্ন পৌষ্টিকগ্রন্থির বিবরণ দেওয়া হলো :

দাঁত ও দন্ত সংকেত (Teeth and Dental Formula)

মানুষের মুখবিবরে উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালে বিদ্যমান শক্ত, শৃঙ্গায়িত গঠনকে **দাঁত** (teeth) বলে। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের উপরের ও নিচের চোয়ালে ১৬টি করে মোট ৩২টি দাঁত থাকে। মানুষের দাঁত **ডাইফায়োডন্ট, থেকোডন্ট** এবং **হেটেরোডন্ট** প্রকৃতির হয়।

(ক) ডাইফায়োডন্ট (Diphyodont) : মানুষের দাঁত দু'বার ওঠে। প্রথমবার শিশুকালে ২০টি **দুধে দাঁত** (milky teeth) ওঠে, দ্বিতীয়বার দুধে দাঁত পড়ে গিয়ে ৮-১০ বছরের মধ্যে **স্থায়ী দাঁত** (parmanent teeth) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ১৮-২৪ বছরের মধ্যে মানুষের মুখে সর্বমোট ৩২টি স্থায়ী দাঁত পরিলক্ষিত হয়।

(খ) থেকোডন্ট (Thecodont) : মানুষের দাঁতগুলো চোয়ালের অস্থির গর্তে প্রোথিত থাকে।

(গ) হেটেরোডন্ট (Heterodont) : মানুষের উভয় চোয়ালে বিভিন্ন রকমের অর্থাৎ চার ধরনের স্থায়ী দাঁত থাকে। এগুলো হলো–

১। কর্তন দাঁত (Incisors teeth) : প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশের সামনে ২টি করে মোট ৮টি দাঁত থাকে। এগুলো ধারালো এবং খাদ্যবস্তুকে কাটতে ও ছিঁড়তে সাহায্য করে।

২। ছেদন দাঁত (Canine teeth) : কর্তন দাঁতের পরবর্তী কনিক্যাল আকৃতির দাঁত। প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে ১টি করে মোট ৪টি দাঁত থাকে। এগুলো খাদ্যবস্তু কাটা ও ছেঁড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩। অগ্রপেষণ দাঁত (Pre-molar teeth) : ছেদন পরবর্তী দাঁত। প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে ২টি করে মোট ৮টি দাঁত থাকে।

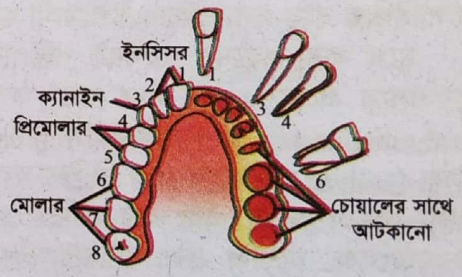

চিত্র ৩.২ : মানুষের বিভিন্ন ধরনের দাঁতের বিন্যাস

এগুলোর উর্ধ্বপ্রান্ত চওড়া ও খাঁজকাটা কাস্পযুক্ত। এরা খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণ করে। **শিশুদের দুধে দাঁতে প্রিমোলার বা অগ্রপেষণ দাঁত থাকে না।**

৪। পেষণ দাঁত (Molar teeth) : অগ্রপেষণের পরবর্তী দাঁত। প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে ৩টি করে মোট ১২টি দাঁত থাকে। এদের উর্ধ্বপ্রান্ত অনেক চওড়া ও খাঁজকাটা কাস্পযুক্ত। সর্বশেষ পেষণ দাঁতটি অনেক পরে উঠে। একে **আক্কেল দাঁত** (wisdom teeth) বলে। এরাও খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণে সাহায্য করে।

দন্ত সংকেত (Dental formula) : **যে সংকেতের সাহায্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দাঁতের সংখ্যা, ধরন ও বিন্যাস বা অবস্থান প্রকাশ করা হয়, তাকে দন্ত সংকেত বলে**। বিভিন্ন দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর দ্বারা দাঁতের ধরন বোঝানো হয়। যেহেতু প্রতিটি চোয়ালের দুটি অর্ধাংশই হুবহু একরকম সেহেতু দন্ত সংকেত দ্বারা প্রাণীর মোট অর্ধেক দাঁত দেখানো হয়। দন্ত সংকেতে একটি আড়াআড়ি রেখায় ওপরে ও নিচে বিভিন্ন দাঁতের নামের প্রথম অক্ষর ও সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। প্রতি চেয়ালের দাঁতের সংখ্যাকে ২ দ্বারা গুণ করে উভয় চোয়ালের দাঁতের সংখ্যা যোগ করলে প্রাণীর মোট দাঁতের সংখ্যা পাওয়া যায়। এ-পদ্ধতিতে মানুষের দন্ত সংকেত হলো–

(ক) শিশুদের (দুধে দাঁত) দন্ত সংকেত : $\frac{I_2C_1M_2}{I_2C_1M_2} = \frac{5 \times 2}{5 \times 2} = 10 + 10 = 20$

(খ) পরিণত মানুষের (স্থায়ী দাঁত) দন্ত সংকেত : $\frac{I_2C_1P_2M_3}{I_2C_1P_2M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = 16 + 16 = 32$

ব্যাখ্যা : কিশোরদের প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে ২টি ইনসিসর, ১টি ক্যানাইন ও ২টি মোলার দাঁত বিদ্যমান। পরিণত মানুষের প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে ২টি ইনসিসর, ১টি ক্যানাইন, ২টি প্রিমোলার ও ৩টি মোলার দাঁত এবং মুখে সর্বমোট ৩২টি দাঁত বিদ্যমান।

2020/8/4 12:59
Scanned with CamScanner

জিহ্বা (Tongue)

মুখবিবরের মেঝেতে অবস্থিত মাংসল, সঞ্চারণশীল ও সংবেদন অঙ্গটিকে **জিহ্বা** বলে। জিহ্বা আবরণী কলা, পেশি ও গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। জিহ্বার আবরণী কলায় **স্বাদকোরক** বা **স্বাদকুঁড়ি** (taste buds) এবং **প্যাপিলি** (papillae, sing. papilla) থাকে। স্বাদকোরক খাদ্যবস্তুর স্বাদগ্রহণে সাহায্য করে।

জিহ্বার অগ্রভাগে মিষ্টতা, পশ্চাৎভাগে তিক্ততা, দু'পাশে অম্লতা এবং মধ্যভাগে লবণাক্ততা স্বাদগ্রাহী স্বাদকোরক থাকে। ৫-১০ দিনের মধ্যে খাদ্যের ঘসায় স্বাদকোরক নষ্ট বা ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রতিস্থাপিত হয়। জিহ্বার পেশি ঐচ্ছিক ও তীর্যক ডোরাযুক্ত। জিহ্বায় তিন প্রকার গ্রন্থি থাকে। যথা– **শ্লেষ্মাক্ষরণকারী গ্রন্থি, সেরাসগ্রন্থি** এবং **লসিকা গ্রন্থি**। লসিকাগ্রন্থিগুলো সম্মিলিতভাবে **লিঙ্গুয়াল টনসিল** (lingual tonsil) গঠন করে।

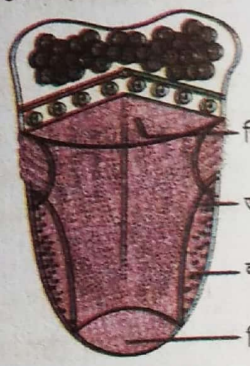

চিত্র ৩.৩ : বিভিন্ন স্বাদ কোরক

জিহ্বার কাজ : স্বাদ গ্রহণ, চর্বণ, আস্বাদন, গলাধঃকরণ, কথা বলা এবং শ্লেষ্মা ও জলীয় পদার্থ ক্ষরণ করা।

নিচে মানুষের পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্যের পরিপাক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৩.১ মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাক (Digestion in Mouth/Buccal Cavity)

মুখছিদ্রের ঠিক পেছনে অবস্থিত গহ্বরটি মুখগহ্বর বা মুখবিবর। মুখছিদ্রের মাধ্যমে এই গহ্বরে খাদ্য প্রবেশ করে। এটি **উর্ধ্ব** ও **নিম্ন** চোয়াল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। এই গহ্বরে দাঁত ও জিহ্বা থাকে। এতে লালাগ্রন্থি উন্মুক্ত হয়। মুখবিবরের ছাদকে **তালু** (palate) বলে। মুখবিবরে খাদ্যের স্বাদ অনুভূত হয় এবং খাদ্যবস্তু চর্বিত, পেষিত ও লালামিশ্রিত হয়ে গলাধঃকরণ উপযোগী হয়।

মুখে খাদ্য গ্রহণের পরপরই পরিপাক প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে মুখে খুব অল্পই পরিপাক হয়। কারণ খাদ্যবস্তু মুখগহ্বরে প্রবেশের পর দাঁত দ্বারা কর্তন, চর্বণ ও পেষণের পাশাপাশি **প্যারোটিড** (parotid), **সাবম্যান্ডিবুলার** (submandibular) ও **সাবলিঙ্গুয়াল** (sublingual) লালাগ্রন্থি (মুখগহ্বরে ৩ জোড়া লালাগ্রন্থি থাকে) থেকে ক্ষরিত লালা (saliva) খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়। একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ১২০০-১৫০০ মিলিলিটার লালা ক্ষরণ করে। লালা কিছুটা অম্লীয় এবং এর অধিকাংশই পানি (৯৫.৫%)। লালাতে প্রধানত মিউসিন, টায়ালিন বা স্যালিভারি অ্যামাইলেজ, মল্টেজ এবং লাইসোজাইম ইত্যাদি থাকায় মুখগহ্বরে শুধু **কার্বোহাইড্রেট** (শর্করা) খাদ্যের পরিপাক হয়। লালারসে প্রোটিন ও চর্বি পরিপাককারী এনজাইম না থাকায় মুখগহ্বরে প্রোটিন ও লিপিড খাদ্যের কোনো পরিপাক হয় না। খাদ্যবস্তু পরিপাকে মুখগহ্বরের ভূমিকা নিম্নরূপ :

(ক) যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion)

- মুখবিবরে খাদ্য গৃহীত হয়।
- দাঁত খাদ্যবস্তুকে কর্তন, চর্বণ ও পেষণে সাহায্য করে।
- জিহ্বা লালার সঙ্গে খাদ্য মিশ্রিত করে পিচ্ছিল করতে, খাদ্য গলাধঃকরণে এবং স্বাদকোরক খাদ্যের স্বাদ অনুভবে সাহায্য করে। লালা মিশ্রিত খাদ্যবস্তু **পিণ্ডাকার** (boles) ধারণ করে।
- লালারস মুখগহ্বরকে সিক্ত রেখে কথা বলায় সহায়তা করে।
- লালারসের পানিতে মুখগহ্বর, দাঁত, জিহ্বা ও মাড়ি ধুয়ে পরিষ্কার হওয়ায় মুখের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে।
- লালারস উষ্ণ এবং **উত্তেজক** (irrlont) খাদ্যবস্তুকে লঘু করে মিউকাস পর্দার ক্ষয় রোধ করে।
- **লাইসোজাইম** (lysozyme) এনজাইম ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে দাঁতকে রক্ষা করে।
- লালার **বাইকার্বনেট আয়ন** খাদ্যের আম্লিক অংশকে প্রশমিত করে, **থায়োসায়ানেট আয়ন** (thiocyanate ion) জীবাণু ধ্বংস করে।

(খ) রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion)

১। শর্করা পরিপাক : লালারসে অবস্থিত এনজাইম টায়ালিন জটিল সিদ্ধ শর্করাকে (শ্বেতসার) ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে। লালারসে অল্প পরিমাণে **মল্টেজ** থাকে। এটি মল্টোজকে দুই অণু গ্লুকোজে পরিণত করে। টায়ালিনের ক্রিয়া মুখগহ্বরে শুরু হলেও এর পরিপাক ক্রিয়া পাকস্থলীতে অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে।

জটিল শর্করা $\xrightarrow{\text{টায়ালিন}}$ মল্টোজ

মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ (২ অণু)

2020/8/4 12:59

Scanned with CamScanner

২। আমিষ পরিপাক : মুখগহ্বরে আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের কোনো এনজাইম থাকে না, ফলে আমিষের কোনো পরিপাক ক্রিয়া ঘটে না। তবে আমিষ খাদ্য চর্বিত ও লালামিশ্রিত হয়ে পিচ্ছিল ও নরম হয়।

৩। স্নেহ পরিপাক : মুখগহ্বরে স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকেরও কোনো এনজাইম থাকে না। এখানে স্নেহ জাতীয় খাদ্য চর্বিত ও লালামিশ্রিত হয়ে নরম হয়।

মুখগহ্বরে খাদ্যের এই পরিপাকের পর যে পিচ্ছিল মণ্ড তৈরি হয় তাকে **বোলাস** (bolus) বা **গ্রাস** বলে। বোলাস মুখ হতে **গলবিল** (pharynx) হয়ে গ্রাসনালি বা **অন্ননালিতে** (oesophagus) আসে এবং **ক্রমসংকোচনের** (peristalsis) মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছে। একে খাদ্য **গলাধঃকরণ** (swallowing) বলে। খাদ্য গিলবার সময় খাদ্যের কোনো অংশ যদি অন্ননালির মধ্যে প্রবেশ না করে সম্মুখদিকে অবস্থিত শ্বাসনালির মধ্যে প্রবেশ করে তখন হঠাৎ কাশির উদ্ভব হয় এবং শ্বাসনালি থেকে খাদ্যটিকে বের করার চেষ্টা চলে। একে **বিষম লাগা** বলে।

৩.২ পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশে পরিপাক (Digestion of Different Parts in Stomach)

পাকস্থলী ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত থলির মতো অংশ। এটি ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া। মুখগহ্বর থেকে খাদ্যবস্তু অন্ননালির মাধ্যমে পাকস্থলীতে আসে। পাকস্থলীর ৪টি অংশ থাকে, যথা–

১। **কার্ডিয়াক প্রান্ত** (Cardiac end) – অন্ননালি ও পাকস্থলীর সংযোগস্থল (বা এটি পাকস্থলীর হৃৎপিণ্ড সংলগ্ন অংশ)।

২। **ফানডাস** (Fundus)– পাকস্থলীর বাম পাশে গম্বুজাকৃতির অংশ।

৩। **দেহ** (Body)– পাকস্থলীর প্রধান ও মাঝখানের অংশ। পাকস্থলীতে দুটি বক্রতা দেখা যায়, যথা– ডান অবতল কিনারা তথা ছোট বাঁক এবং বাম উত্তল কিনারা তথা বড় বাঁক।

৪। **পাইলোরিক অঞ্চল** (Pyloric region) – পাকস্থলীর পশ্চাৎভাগে ডিওডেনাম সংলগ্ন অংশ।

কার্ডিয়াক ও পাইলোরিক অঞ্চলে বৃত্তাকার পেশিবলয় থাকে। এদের যথাক্রমে **কার্ডিয়াক স্ফিংক্টার** (cardiac sphincter) ও **পাইলোরিক স্ফিংক্টার** (pyloric sphincter) বলে।

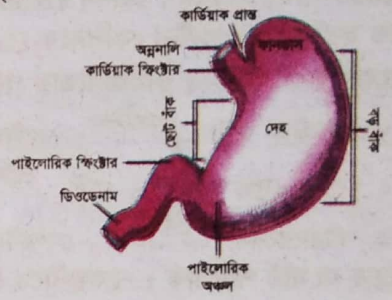

চিত্র ৩.৪ : পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশ

পাকস্থলীর প্রাচীর পর্যায়ক্রমে ৫টি প্রধান স্তরে বিভক্ত। যথা– **সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা** ও **মিউকোসা**। পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে পাকস্থলীর মিউকোসা স্তরে প্রায় ৪০ মিলিয়ন (প্রায় ৪ কোটি) গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে। গ্রন্থিগুলো গ্যাস্ট্রিক রস ধারণ করে। প্রতিদিন প্রায় ২ লিটার **গ্যাস্ট্রিক রস** (gastric juice) বা **পাকরস** নিঃসরণ করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কোষসমূহ পরিপাক সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত উপাদানগুলো ক্ষরণ করে।

১। **পেপটিক কোষ বা চিফ কোষ বা জাইমোজেনিক কোষ** (Peptic cell/Chief cell/Zymogenic cell) – পেপসিন (নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন), রেনিন, জিলেটিনেজ, লাইপেজ ইত্যাদি ক্ষরণ করে।

২। **প্যারাইটাল বা অক্সিনটিক কোষ** (Parietal/Oxyntic cell) – HCl ক্ষরণ করে।

৩। **আরজেন্টাফিন কোষ** (Argentaffine cell) – হরমোন ক্ষরণে ও এটি থেকে উৎপন্ন **গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর** (gastric intrinsic factor) Vit B_{12} শোষণে সহায়তা করে।

৪। **মিউকাস কোষ** (Mucous cell) – মিউকাস ক্ষরণ করে।

৫। **গ্যাস্ট্রিন কোষ বা জি (G) কোষ** (Gastrin cell/G-cell) – **গ্যাস্ট্রিন** (gastrin) নামক হরমোন ক্ষরণ করে, যা গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রথমেই **গ্যাস্ট্রিন হরমোন** পাকস্থলীতে খাদ্য গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে। পাকস্থলীতে খাদ্য গ্রহণের পর এর প্রাচীরের অন্তর্গাত্রে অবস্থিত গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস বা জুস নিঃসৃত হয়। এর ৯৯.৪৫%-ই পানি। গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান এনজাইমসমূহ খাদ্য পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাক (Digestion in stomach)

(ক) যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion)

১। পাকস্থলী গৃহীত খাদ্যবস্তুকে দেহে সাময়িকভাবে জমা রাখে এবং বিচলন প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তুকে গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচকরসের সঙ্গে মিশে যেতে সাহায্য করে।

২। **মিউসিন** নামক একটি প্রোটিন মিউকাসের প্রধান উপাদান। পাকস্থলীর মিউকাস কোষ থেকে মিউকাস নিঃসৃত হয়ে পাকস্থলীর প্রাচীরে একটি গাঢ় আবরণের সৃষ্টি করে। ফলে পাকস্থলীর প্রাচীর HCl বা পেপসিনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায়।

2020/8/4 12:59

Scanned with CamScanner

৩। খাদ্যে উপস্থিত পাকস্থলীর প্রাচীর কর্তৃক নিঃসৃত HCl, সব ধরনের খাদ্যবস্তুকে সামান্য পরিমাণ আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করতে পারে। এ ছাড়া HCl **অ্যান্টিসেপটিক** রূপে কাজ করে। অর্থাৎ খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত ব্যাকটেরিয়াসহ অন্যান্য বিজাতীয় বস্তুকে ধ্বংস করে।

৪। পাকস্থলীর পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুকে পিষে **মণ্ডে** বা **কাইমে** (chyme) পরিণত করে। HCl রক্তের অম্লক্ষারের সাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৫। এটি ভিটামিন B_{12} শোষণ এবং পরোক্ষভাবে লোহিত রক্তকণিকার বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে।

৬। HCl নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে আমিষ পরিপাকে সহায়তা করে।

(খ) রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion)

শর্করা পরিপাক : পাকস্থলীর পাচক রসে শর্করা পরিপাককারী কোনো এনজাইম থাকে না। তাই পাকস্থলীতে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কোনো পরিপাক হয় না। তবে HCl-এর সাহায্যে সুক্রোজের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটে।

আমিষ পরিপাক : গ্যাস্ট্রিক রসে প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম **পেপসিন, পেপসিনোজেন** (জাইমোজেন) রূপে (নিষ্ক্রিয়) নিঃসৃত হয়, যা HCl এসিডের সহায়তায় সক্রিয় **পেপসিনে** পরিণত হয়। পেপসিন প্রোটিনকে **প্রোটিওজ** ও **পেপটোনে** পরিণত করে। **রেনিন** (rennin, নিষ্ক্রিয় অবস্থা **প্রোরেনিন,** যা HCl এসিডের সহায়তায় সক্রিয় রেনিনে পরিণত হয়) দুধের প্রোটিন কেসিনকে Ca^{++} এর উপস্থিতিতে **প্যারাকেসিনে** বা **কেসিনোজেনে** পরিণত করে। অতঃপর প্যারাকেসিন পেপসিনের কার্যকারিতায় পরবর্তীতে **পেপটোন** ও **প্রোটিওজে** পরিণত হয়।

১. আমিষ + পানি $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ প্রোটিওজ + পেপটোন

২. কেসিন (দুগ্ধ আমিষ) + পানি $\xrightarrow{\text{রেনিন}}$ প্যারাকেসিন

৩. প্যারাকেসিন $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ পেপটোন + প্রোটিওজ

স্নেহ বা চর্বি পরিপাক : পাকস্থলীতে পিত্তলবণের অভাবে এবং অম্লধর্মী পরিবেশের জন্য **গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ** তেমন কাজ করতে পারে না। লাইপেজের প্রভাবে অতি অল্পমাত্রায় স্নেহদ্রব্য বিশ্লিষ্ট হয়ে **ফ্যাটি এসিড** এবং **গ্লিসারলে** পরিণত হয়।

স্নেহদ্রব্য $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল

পাকস্থলীতে খাদ্য **২-৬ ঘণ্টা** অবস্থান করে। পাকস্থলীতে পরিপাক সম্পন্ন হওয়ার পর খাদ্যের যে দানা তৈরি হয় তাকে **কাইম** (chyme) বা মণ্ড বলে। কাইম ক্রমসংকোচনের মাধ্যমে **পাইলোরিক স্ফিংক্টার** (pyloric sphincter) অতিক্রম করে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

পাকস্থলী বা অন্ত্র নিজে হজম হয় না কেন?

পাকস্থলী এবং অগ্ন্যাশয়ের অসংখ্য সনাল বা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি **প্রোটিয়েজ** (আমিষ হজমের এনজাইমকে প্রোটিয়েজ বলে, যেমন– পেপসিন, ট্রিপসিন এক একটি প্রোটিয়েজ) এনজাইম তৈরি করে। প্রোটিয়েজ দ্বারা পাকস্থলী বা অন্ত্রের লুমেনে আমিষ পরিপাক হলেও এসব প্রোটিয়েজ সৃষ্টিকারী গ্রন্থিকোষগুলো প্রোটিন দ্বারা গঠিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেরা পরিপাক হয় না। এর কারণ–

প্রথমত : প্রোটিয়েজগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ক্ষরিত হয়। যেমন– **পেপসিন** নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন হিসেবে ক্ষরিত হয় এবং HCl এর সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত সক্রিয় হয় না। একই ভাবে **ট্রিপসিন** নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন হিসেবে ক্ষরিত হয়ে ডিওডেনাম প্রাচীরের এন্টারোকাইনেজ এনজাইম দ্বারা সক্রিয় হয়।

দ্বিতীয়ত : পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র প্রাচীরের কিছু কোষ এবং লালাগ্রন্থি **মিউকাস** উৎপন্ন করে। মিউসিন নামক একটি প্রোটিন মিউকাসের প্রধান উপাদান। পাকস্থলী ও অন্ত্র প্রাচীরের ভিতরের গাত্র সব সময় মিউকাসের গাঢ় আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। সম্ভবত মিউকাসের এ আবরণের জন্যই আমিষ হজমকারী এনজাইমসমূহ পাকস্থলী বা অন্ত্র প্রাচীরের কোষের সংস্পর্শে আসতে পারে না।

তৃতীয়ত : কোষে কোনো **এন্টিএনজাইম** থাকার সম্ভাবনা আছে, যার জন্য এনজাইমগুলো পাকস্থলী বা অন্ত্র প্রাচীরে অবস্থিত সজীব কোষের উপর ক্রিয়া করতে পারে না।

❑ **কাজ :** (i) পাকস্থলীতে যান্ত্রিক পরিপাক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। (ii) পাকস্থলীতে খাদ্যের পরিপাকে পৌষ্টিক গ্রন্থির ভূমিকা বর্ণনা কর। (iii) পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাকে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থিকোষগুলোর নাম ও কাজ লেখ। (iv) পাকস্থলী খাদ্য পরিপাক করে কিন্তু নিজে পরিপাক হয় না– বিশ্লেষণ কর। (v) আমাদের গৃহীত জটিল খাদ্যবস্তুর পরিপাক আবশ্যকীয়– উক্তিটির যৌক্তিকতা উল্লেখ কর।

2020/8/4 13:00

Scanned with CamScanner

৩.৩ খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশের মুখ্য ক্রিয়াসমূহ
(Major Action of the Different Parts of Intestine in Digestion of Food Material)

সকল ধরনের জটিল খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ও শোষণের প্রধান স্থান হলো ক্ষুদ্রান্ত্র। এখানে খাদ্যবস্তুর যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় ধরনের পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

(ক) যান্ত্রিক পরিপাক : পাকস্থলী থেকে কাইম ডিওডেনামে প্রবেশের পর ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশির সংকোচন ও প্রসারণে খাদ্য পরিপাক রসের (পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রস) সাথে ভালোভাবে মিশ্রিত হয় এবং **পেরিস্ট্যালটিক সঞ্চালনের** (peristaltic movement) মাধ্যমে খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে ধীরভাবে প্রবাহিত হয়। খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে ৩-৫ ঘণ্টা অবস্থান করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক কাজগুলো হলো–

১। **খাদ্যমণ্ডের এসিড প্রশমন :** পিত্তরসের বাইকার্বনেট পাকস্থলী থেকে আগত খাদ্যমণ্ডের এসিডকে প্রশমিত করে ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্যান্য এনজাইমের ক্রিয়াশীলতার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

২। **খাদ্যবস্তু পিচ্ছিলকরণ :** আন্ত্রিক রসের মিউসিনের ক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যস্থিত খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

৩। **ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর সুরক্ষা :** ব্রুনার্স গ্রন্থি ও গবলেট কোষ থেকে মিউকাস তৈরি হয়। মিউকাস ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরকে এনজাইমের কার্যকারিতা থেকে রক্ষা করে।

৪। **জীবাণু নিয়ন্ত্রণ :** পিত্তরস পরোক্ষভাবে অন্ত্রে জীবাণুর ক্রিয়া কমায়।

৫। **ক্রমসংকোচন :** পিত্তলবণগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশির ক্রমসংকোচন বাড়িয়ে বৃহদন্ত্রের দিকে খাদ্যের গতি বৃদ্ধি করে।

৬। **কোলেসিস্টোকাইনিনের ক্রিয়া :** এই হরমোনটি পিত্তাশয়ের সংকোচন ঘটিয়ে পিত্তাশয়ের সঞ্চিত পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে দেয়।

৭। **স্নেহ পদার্থের ইমালসিফিকেশন :** পিত্তলবণ ফ্যাটকে ইমালসিফাই করে সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। পিত্তরস কোলেস্টেরলকে শোষণে সাহায্য করে।

৮। **pH নিয়ন্ত্রণ :** পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয় রস অন্ত্রের pH নিয়ন্ত্রণ করে।

৯। **অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ :** কোলেসিস্টোকাইনিন প্যানক্রিওজাইমিন (CCK-PZ) অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে সহায়তা করে এবং বাইকার্বনেটের ক্ষরণ বাড়ায়।

(খ) রাসায়নিক পরিপাক : পাকস্থলীতে অর্ধপরিপাককৃত খাদ্য **কাইম** (chyme) পাইলোরিক স্ফিংটারের নিয়ন্ত্রণে ধীরে ধীরে ডিওডেনামে প্রবেশ করে। ডিওডেনামে প্রবেশের পর কাইমের প্রভাবে ডিওডেনাম ও ঊর্ধ্ব জেজুনাম থেকে **সিক্রেটিন** (secretin) এবং **কোলেসিস্টোকাইনিন** (cholecystokinin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। হরমোনদ্বয়ের প্রভাবে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়ে ডিওডেনামে এসে পৌঁছায়। একইভাবে ডিওডেনাম নিঃসৃত **কোলেসিস্টোকাইনিন** হরমোনের প্রভাবে পিত্তথলি সংকুচিত হয়। ফলে পিত্তনালির মধ্য দিয়ে পিত্ত এসে ডিওডেনামে পৌঁছায়। এখানে অগ্ন্যাশয় রস পিত্তরসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। খাদ্যবস্তু ঊর্ধ্ব জেজুনামে প্রবেশ করার পর এর প্রভাবে **এন্টারোক্রাইনিন** (enterocrinin) হরমোন ক্ষরিত হয়। এই হরমোনের প্রভাবে আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে খাদ্য পরিপাকে বিভিন্ন পরিপাক রসের (পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রস) ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

(ক) পিওরসের ভূমিকা (Role of bile)

১। পিত্তরস ক্ষারজাতীয় পদার্থ। পিওরসে কোনো এনজাইম না থাকলেও পরিপাকের জন্য পিত্তরস অপরিহার্য। পিত্তরসের সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদান পাকস্থলী থেকে আগত HCl-কে প্রশমিত করে ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন।

২। পিত্তরসের পিওলবণ (সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট ও সোডিয়াম টরোকোলেট) চর্বিকে ছোট ছোট দানায় পরিণত করে এবং পানির সঙ্গে মিশ্রণযোগ্য করে তোলে। এই পদ্ধতিকে **অবদ্রবণ** বা **ইমালসিফিকেশন** (emulsification) বলে। ফলে লাইপেজ দ্বারা চর্বি সহজেই পরিপাক হয়।

(খ) অগ্ন্যাশয় রসের ভূমিকা (Role of Pancreatic Juice) **:** ক্ষারীয় অগ্ন্যাশয় রস অম্লীয় পাকরসকে প্রশমিত করে। প্রতিদিন ৬০০-৮০০ মিলি. অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরিত হয়। অগ্ন্যাশয় রসের মধ্যে অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বোক্সিপেপটাইডেজ, কোলাজিনেজ, লাইপেজ ইত্যাদি এনজাইম থাকে।

❐ শর্করা পরিপাক

১। **অ্যামাইলেজ** (amylase) এনজাইম জটিল শর্করা স্টার্চ ও গ্লাইকোজেনকে ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে।

স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ

2020/8/4 13:00

Scanned with CamScanner

২। **মল্টেজ** (maltase) এনজাইম মল্টোজকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করে।

মল্টোজ —মল্টেজ→ গ্লুকোজ

❐ আমিষ পরিপাক

১। **ট্রিপসিন** (trypsin) এনজাইম নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনরূপে নিঃসৃত হয়। ডিওডেনামের মিউকাস স্তর নিঃসৃত এন্টারোকাইনেজ এনজাইমের সহায়তায় এটি সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয়। ট্রিপসিন প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

প্রোটিওজ ও পেপটোন —ট্রিপসিন→ পলিপেপটাইড

২। **কাইমোট্রিপসিন** (chymotripsin) নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। ট্রিপসিন নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেনকে সক্রিয় কাইমোট্রিপসিনে পরিণত করে, যা প্রোটিওজ ও পেপটোনকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

প্রোটিওজ ও পেপটোন —কাইমোট্রিপসিন→ পলিপেপটাইড

৩। **কার্বোক্সিপেপটাইডেজ** (carboxypeptidase) এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড (ডাইপেপটাইড) ও অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড —কার্বোক্সিপেপটাইডেজ→ ডাইপেপটাইড + অ্যামিনো এসিড

৪। **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** (aminopeptidase) এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড —অ্যামিনোপেপটাইডেজ→ অ্যামিনো এসিড

৫। **ট্রাইপেপটাইডেজ** (tripeptidase) এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিড উৎপন্ন করে।

ট্রাইপেপটাইড —ট্রাইপেপটাইডেজ→ অ্যামিনো এসিড

৬। **ডাইপেপটাইডেজ** (dipeptidase) এনজাইম ডাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিড উৎপন্ন করে।

ডাইপেপটাইড —ডাইপেপটাইডেজ→ অ্যামিনো এসিড

৭। **কোলাজিনেজ** (colaginase) এনজাইম কোলাজেন (মাছ ও মাংসে বিদ্যমান) ভেঙে সরল পেপটাইড উৎপন্ন করে।

কোলাজেন —কোলাজিনেজ→ সরল পেপটাইড

❐ স্নেহ পরিপাক

১। **লাইপেজ** (lypase) এনজাইম পিত্তলবণের উপস্থিতিতে চর্বিকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

চর্বি (লিপিড) —লাইপেজ→ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল

২। **ফসফোলাইপেজ** (phospholypase) এনজাইম ফসফোলিপিডসমূহ (লেসিথিন ও সেফালিন) থেকে ফ্যাটি এসিডকে পৃথক করে।

ফসফোলিপিড —ফসফোলাইপেজ→ ফ্যাটি এসিড

৩। **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** (cholesterol estarase) এনজাইম খাদ্যের কোলেস্টেরল এস্টারগুলোকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড উৎপন্ন করে এবং কোলেস্টেরল মুক্ত করে।

কোলেস্টেরল এস্টার —কোলেস্টেরল এস্টারেজ→ ফ্যাটি এসিড

(গ) মেমব্রেন এনজাইম (আন্ত্রিক রস) এর ভূমিকা (Role of membrane enzyme) :

পূর্বে মনে করা হতো যে, অন্ত্রের গ্রন্থিকোষগুলো থেকে এনজাইমসমৃদ্ধ আন্ত্রিক রস (intestinal juice) বা **সাক্কাস এন্টেরিকাস** (succus entericus) লুমেনে মুক্ত হয়। এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অন্ত্রের প্রাচীরের ক্ষরণ কোষ থেকে যেসব এনজাইম উৎপন্ন হয়– সেগুলো ওইসব কোষের উন্মুক্ত প্রান্তে মাইক্রোভিলাইয়ের গায়ে গ্লাইকোপ্রোটিনের সাথে যুক্ত থাকে, অন্ত্রীয় গহ্বরে উন্মুক্ত হয় না। কোষ আবরণী বা মেমব্রেনের সঙ্গে লেগে থেকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে বলে এদের **মেমব্রেন এনজাইম** বলে।

2020/8/4 13:0
Scanned with CamScanner

মেমব্রেন এনজাইমগুলোর মধ্যে আছে অ্যামিনোপেপটাইডেজ ও ডাইস্যাকারাইডেজসমূহ, যেমন– মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ ইত্যাদি। এছাড়াও আছে অ্যালকালাইন ফসফেটেজ ও নিউক্লিক এসিড পরিপাককারী এনজাইম।

❐ শর্করা পরিপাক

১। **অ্যামাইলেজ** এনজাইম স্টার্চ, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিনে পরিণত করে।

স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন + পানি $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন

২। **আইসোমল্টেজ** এনজাইম আইসোমল্টোজ জাতীয় শর্করাকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ ও গ্লুকোজে পরিণত করে।

আইসোমল্টোজ + পানি $\xrightarrow{\text{আইসোমল্টেজ}}$ মল্টেজ + গ্লুকোজ

৩। **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করে।

মল্টোজ + পানি $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ (২ অণু)

৪। **সুক্রেজ** এনজাইম সুক্রোজকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত করে।

সুক্রোজ + পানি $\xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ ১ অণু গ্লুকোজ + ১ অণু ফ্রুক্টোজ

৫। **ল্যাক্টেজ** এনজাইম ল্যাক্টোজকে গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজে পরিণত করে।

ল্যাক্টোজ + পানি $\xrightarrow{\text{ল্যাক্টেজ}}$ ১ অণু গ্লুকোজ + ১ অণু গ্যালাক্টোজ

❐ আমিষ পরিপাক

অ্যামিনোপেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড

❐ স্নেহ পরিপাক

১। **লাইপেজ** এনজাইম ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইডকে মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিডে পরিণত করে।

ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইড (স্নেহকণা) $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ মনোগ্লিসারাইড + ফ্যাটি এসিড

২। **অ্যালকালাইন ফসফেটেজ** এনজাইমগুলো বিভিন্ন ধরনের ফসফেট যৌগকে (ফসফোলিপিড/লেসিথিন) আর্দ্রবিশ্লেষিত করে।

ফসফোলিপিড/লেসিথিন $\xrightarrow{\text{অ্যালকালাইন ফসফেটেজ/ লেসিথিনেজ}}$ গ্লিসারল + ফ্যাটি এসিড + ফসফোরিক এসিড + কোলিন ইত্যাদি

❐ নিউক্লিক এসিড পরিপাক

১। **নিউক্লিয়েজ** এনজাইম নিউক্লিক এসিডকে ভেঙে মনোনিউক্লিওটাইডে পরিণত করে।

নিউক্লিক এসিড $\xrightarrow{\text{নিউক্লিয়েজ}}$ মনোনিউক্লিওটাইড

২। **নিউক্লিওটাইডেজ** এনজাইম নিউক্লিওটাইডসমূহ থেকে ফসফেট গ্রুপ অপসারণপূর্বক নিউক্লিওসাইডে পরিণত করে।

নিউক্লিওটাইড $\xrightarrow{\text{নিউক্লিওটাইডেজ}}$ নিউক্লিওসাইড

৩। **নিউক্লিওসাইডেজ** এনজাইম নিউক্লিওসাইডসমূহকে বিশ্লিষ্ট করে পেন্টোজ সুগার এবং নাইট্রোজেন বেস (পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেস) উৎপন্ন করে।

নিউক্লিওসাইড $\xrightarrow{\text{নিউক্লিওসাইডেজ}}$ পেন্টোজ সুগার + নাইট্রোজেন বেস

❐ **কাজ :** (i) পরিপাক ক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।/ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের পরিণতি বিশ্লেষণ কর। (ii) ক্ষুদ্রান্ত্রে শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক বর্ণনা কর। (iii) প্রাণিজ প্রোটিনের পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা কর। (iv) বিভিন্ন রকম উৎসেচক খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে– বিশ্লেষণ কর।

2020/8/4 13:00

Scanned with CamScanner

৩.৪ পরিপাকগ্রন্থির কাজ (Role or Function of Digestive Gland)

১. লালাগ্রন্থি (Salivary Glands)

মানুষের মুখবিবরে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি থাকে। যথা–

১। প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid glands) : সবচেয়ে বড় এবং সেরাস প্রকৃতির গ্রন্থি। মুখমণ্ডলের একপাশে প্রত্যেক কানের সামান্য নিচে একটি করে দুটি প্যারোটিড গ্রন্থি অবস্থিত। প্যারোটিড গ্রন্থি **স্টেনসেন নালির** (duct of stensen) মাধ্যমে মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়। এই গ্রন্থি ভাইরাস আক্রান্ত হলে যে প্রদাহ হয় তাকে **মাম্পস** (mumps) বলে।



চিত্র ৩.৫ : মানুষের লালাগ্রন্থি

২। সাবম্যান্ডিবুলার বা সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থি (Submandibular or Submaxillary glands) : প্রতিটি ম্যান্ডিবল বা নিম্ন চোয়ালের নিচের দিকে একটি করে মোট দুটি সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি থাকে। এরা মিশ্র প্রকৃতির গ্রন্থি। এই গ্রন্থি মুখগহ্বরের মেঝেতে জিহ্বার নিচে **হোয়ারটন নালির** (Wharton's duct) মাধ্যমে উন্মুক্ত হয়।

৩। সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual glands) : জিহ্বার নিচে, মুখগহ্বরের মেঝের মিউকাস পর্দার নিচের দিকে অবস্থিত। এরা মিউকাস প্রকৃতির গ্রন্থি এবং এই গ্রন্থি কতগুলো সূক্ষ্ম নালির মাধ্যমে মুখগহ্বরের মেঝেতে উন্মুক্ত হয়। এই নালিগুলোকে **রিভিনাস নালি** (ducts of rivinus) বলা হয়।

লালাগ্রন্থিগুলো এপিথেলিয়াম আবৃত অসংখ্য গোলাকার বা ডিম্বাকার রস ক্ষরণকারী থলি নিয়ে গঠিত। প্রতিটি থলির কেন্দ্রস্থলে একটি করে নালিকা থাকে। নালিকাগুলো পরস্পর একত্রিত হয়ে গ্রন্থির মূল নালিতে মিলিত হয়। নালিটি পরে মুখবিবরে প্রবেশ করে। গ্রন্থির কোষগুলো দু'ধরনের, যথা– **সেরাস কোষ** (serous cell) : **টায়ালিন ও মল্টেজ এনজাইম** ক্ষরণ করে এবং **মিউকাস কোষ** (mucous cell) : **মিউকাস** ক্ষরণ করে।

লালাগ্রন্থির কাজ : লালাগ্রন্থি লালারস ক্ষরণ করে। লালারসের পানি ও মিউকাস খাদ্যবস্তুকে নরম ও পিচ্ছিল করে গলাধঃকরণে সাহায্য করে। লালারসস্থিত এনজাইমগুলো শর্করা (শ্বেতসার) জাতীয় খাদ্যবস্তু পরিপাকে অংশ নেয়। **লাইসোজাইম** খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে দাঁতকে রক্ষা করে।

লালা (Saliva)

লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে **লালা** বা **লালারস** বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক 1200-1500 মিলি লালা নিঃসরণ করে। লালা সামান্য অম্লধর্মী (pH : 6.02-7.05) ; আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.002-1.012; ফ্রিজিং বিন্দু : 0.07-0.34°C।

বৈশিষ্ট্য : কিছু কোষীয় উপাদান (ইস্ট, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, লিউকোসাইট, এপিথেলিয়াল কোষ ইত্যাদি) এবং মিউসিনের উপস্থিতির জন্য লালা কিছুটা ঘোলাটে ও চটচটে হয়।

লালার উপাদান

1. পানি : 99.5%; **2. কঠিন পদার্থ** : 0.5%

(a) অজৈব উপাদান : প্রায় 0.2%, সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম এবং সোডিয়াম ফসফেট, পটাশিয়াম থায়োসায়ানেট, বাইকার্বনেট ইত্যাদি অজৈব লবণ।

(b) জৈব উপাদান : প্রায় 0.3%

(১) এনজাইম : স্যালিভারি অ্যামাইলেজ বা টায়ালিন, লাইসোজাইম, ফসফাটেজ, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইত্যাদি।

(২) অন্যান্য জৈব পদার্থ : মিউসিন, ইউরিয়া, অ্যামিনো এসিড, কোলেস্টেরল, ভিটামিন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।

(৩) গ্যাসীয় উপাদান : 100 ml লালারসে দ্রবীভূত অবস্থায় CO_2 থাকে 50ml, O_2 থাকে 1.00 ml এবং N_2 থাকে 2.5ml.

লালার কাজ :

১। যান্ত্রিক কাজ : (ক) লালা মুখবিবরকে সর্বদা আর্দ্র রেখে কথা বলতে সহায়তা করে; (খ) এটি খাদ্যবস্তুকে সিক্ত করে এবং চর্বণের সময় লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে; (গ) লালা উত্তপ্ত ও প্রদাহিক বস্তুকে প্রশমিত করে মুখের মিউকাস প্রাচীরকে রক্ষা করে; (ঘ) এটি খাদ্যের সাথে আগত ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুকে ধ্বংস করে।

২। খাদ্য পরিপাক : লালায় কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী টায়ালিন ও মল্টেজ এনজাইম থাকে। এরা জটিল শর্করাকে সরলে পরিণত করে।

৩। রেচন : কিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্জ্য যেমন– ল্যাকটিক এসিড, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ভারী ধাতু (Hg, Pb, As), থায়োসায়ানেট, মরফিন, অ্যান্টিবায়োটিক, বিভিন্ন অ্যালকালয়েড ইত্যাদি লালার মাধ্যমে দেহ হতে রেচিত হয়।

৪। স্বাদ গ্রহণ : স্বাদ হলো এক ধরনের রাসায়নিক অনুভূতি। লালা খাদ্যের বিভিন্ন পদার্থকে দ্রবীভূত করে জিহ্বার মাধ্যমে স্বাদগ্রহণে সহায়তা করে। কম লালা নিঃসরী মানুষ **ডিসজিউসিয়া** (Dysgeusia) রোগে ভোগে।

2020/8/4 13:00
Scanned with CamScanner

৫। পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ : লালারস দেহের পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। দেহে পানিশূন্যতা দেখা দিলে লালা নিঃসরণ কমে যায় এবং এতে তৃষ্ণা বোধ হয়। তৃষ্ণার্ত মানুষ পানি পান করলে দেহের পানিসাম্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

৬। বাফার ক্রিয়া : লালারসের বাইকার্বনেট এবং অল্প পরিমাণে ফসফেট ও মিউসিন বাফার হিসেবে কাজ করে। লালারসের বাফার ক্রিয়া মুখগহ্বরের pH 7.0-তে বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. যকৃৎ (Liver)

যকৃৎ মানবদেহের সবচেয়ে **বড় গ্রন্থি**। দেহের ওজনের প্রায় ৩-৫%। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যকৃতের ওজন প্রায় ১.৫-২.০০ কেজি। স্ত্রীলোকে এর ওজন প্রায় ২০০ গ্রাম কম হয়। পরিপাকনালির বাইরে অবস্থান করলেও এটি প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় বস্তুর প্রধান বিপাকীয় স্থল।

অবস্থান : মানবদেহের যকৃৎটি ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে উদর-গহ্বরের উপরিভাগে পাকস্থলীর ডানদিকে অবস্থিত।

গঠন : যকৃৎ লালচে বাদামি বর্ণের ত্রিকোণাকার অঙ্গ, যা **গ্লিসন ক্যাপসুল** (Glisson's capsul) নামক যোজক টিস্যু দ্বারা আবৃত। চারটি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে যকৃৎ গঠিত। যকৃৎ **ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট** (falciform ligament) নামক মেসেন্টারি দ্বারা **ডান লোব** ও **বাম লোবে** বিভক্ত। ডান লোবটি বাম লোবের চেয়ে ছয়গুণ বড়। ডান লোবটি অক্ষীয় দিকে **কোয়াড্রেট** ও **কডেট** নামক ২টি লোবে বিভক্ত। নাশপাতি আকৃতির পিত্তাশয় বা **পিত্তথলিটি** (gall bladder) কোয়াড্রেট লোবের নিচে যুক্ত থাকে। যকৃতে সংশ্লেষিত **পিত্তরস** (bile) **সাধারণ যকৃৎ** বা **হেপাটিক নালির** মাধ্যমে বের হয়ে সাময়িকভাবে পিত্তাশয়ে জমা হয়। পিত্তাশয় **সাধারণ পিত্তনালির** মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়। পিত্তাশয় থেকে আগত পিত্তরস ডিওডেনামে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং স্নেহবস্তু পরিপাকে অংশগ্রহণ করে। **কুকুর ও ঘোড়ার পিত্তাশয় থাকে না।**

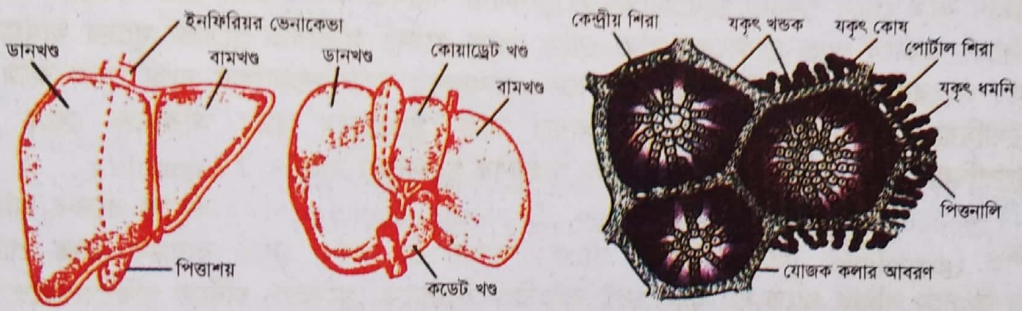

ক খ গ

চিত্র ৩.৬ক : ক-যকৃতের পৃষ্ঠদেশ : খ. যকৃতের অঙ্কদেশ; গ. যকৃতের কলাস্থানিক গঠন

যকৃৎ এক প্রকার ক্ষরণকারী ও রেচনকারী গ্রন্থি। যকৃতের প্রতিটি লোব (খণ্ডাংশ) অসংখ্য **লোবিউল** বা **অ্যাসিনাস** (উপখণ্ডক) নিয়ে গঠিত। প্রতিটি লোবিউলের কেন্দ্রে একটি **কেন্দ্রীয় শিরা** (central vein) থাকে। প্রতিটি লোবিউল আবার অসংখ্য **হেপাটিক কোষ** (হেপাটোসাইট) নিয়ে গঠিত। এ কোষগুলো কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে চাকার স্পোকের মতো সাজানো থাকে। লোবিউলের অন্তর্বর্তী স্থানে পোর্টাল শিরা, যকৃৎ ধমনি, পিত্তনালি ইত্যাদি থাকে। প্রতিটি

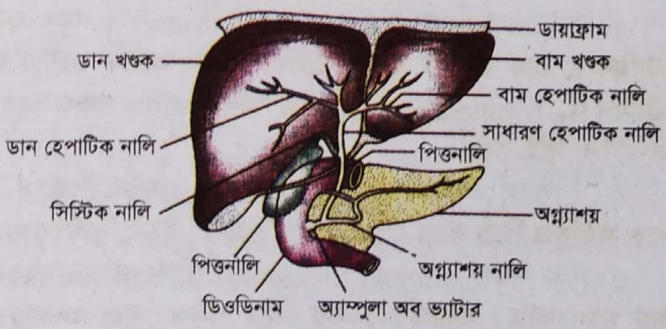

চিত্র ৩.৬খ : যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক

কোষ সারির একদিকে **সাইনুসয়েড** (sinusoid) এবং অপরদিকে **পিত্তনালিকা** (bile canaliculi) থাকে। সাইনুসয়েডের গাত্রে আগ্রাসী (ফ্যাগোসাইটিক) **কুফার কোষ** (kupffer cells) থাকে। যকৃতের ডান দিক ও বাম দিক থেকে আসা **ডান** ও **বাম হেপাটিক নালি** (যকৃৎ নালি) একত্রে মিলিত হয়ে **সাধারণ হেপাটিক নালি** গঠন করে। এটি পিত্তথলির **সিস্টিক নালির** (cystic duct) সাথে মিলিত হয়ে **পিত্তনালি** গঠন করে, যা নিচের দিক ও পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত হয়ে **অগ্ন্যাশয় নালির** সঙ্গে যুক্ত হয়ে **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** বা **হেপাটোপ্যানক্রিয়েটিক অ্যাম্পুলা** (ampulla of vater or hepatopancreatic ampulla) গঠন করে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : যকৃৎ পিত্ত ক্ষরণ করে পিত্তাশয়ে জমা রাখে এবং স্নেহজাতীয় পদার্থের শোষণে সাহায্য করে। তাছাড়া শর্করা, প্রোটিন ও ভিটামিন প্রভৃতি খাদ্যকে পরিপাকের পর রক্তস্রোতে পাঠাতে সাহায্য করে।

2020/8/4 13:00

Scanned with CamScanner

যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা

যকৃৎ মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পরিপাকগ্রন্থি, যা একটি সুসজ্জিত জৈব রসায়নাগার রূপে কাজ করে। পাকস্থলী ও অন্ত্র হতে সকল রক্ত যকৃতে প্রবেশ করে। যকৃৎ রক্ত থেকে পুষ্টি বস্তুকে রাসায়নিকভাবে ব্যবহারযোগ্য উপাদানে পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত সঞ্চিত রাখে। এছাড়া যকৃৎ বিভিন্ন বিপাকীয় কাজ, ক্ষরণ সম্পৃক্ত কাজ এবং রেচনকাজও সম্পাদন করে। বিজ্ঞানীরা যকৃতে প্রায় ৫০০ ধরনের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া শনাক্ত করেছেন। যকৃতে বিভিন্ন প্রকার জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হওয়ায় বিজ্ঞানীরা যকৃৎকে সুসজ্জিত জৈব **রসায়নাগার** বা **রাসায়নিক পরীক্ষাগার** (organic laboratory/chemical laboratory) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এটি সব ধরনের পুষ্টি পদার্থের, যেমন– কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় বস্তুর প্রধান বিপাকীয় স্থল। যকৃতে খাদ্যকণা ও ওষুধ ভেঙে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়, যা দেহ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। যকৃৎকে মৃতকোষের **কবরস্থান** ও **জীবনসমুদ্রের কর্মমুখর প্রোতাশ্রয়ও** বলা হয়।

যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা (Storage Functions of Liver)

১। গ্লাইকোজেন সঞ্চয় (Storage of Glycogen) : যকৃৎ দেহের প্রধান সঞ্চয় কেন্দ্র। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে গ্লুকোজ যকৃতে প্রবেশ করে। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি হলে যকৃৎ অতিরিক্ত গ্লুকোজকে **গ্লাইকোজেনেসিস** প্রক্রিয়ায় **গ্লাইকোজেন** হিসেবে জমা রাখে। যকৃতে প্রায় ১০০ gm গ্লাইকোজেন সঞ্চিত থাকে। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স থেকে নিঃসৃত **ইনসুলিন** প্রক্রিয়াটিকে উদ্দীপ্ত করে। ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে পুনরায় গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে পরিণত করে। ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইনসুলিনের অভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে গেলে রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এ রোগকে **ডায়াবেটিস মেলিটাস** বলে। সাধারণত রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি কমে গেলে তাকে **হাইপোগ্লাইসোমিয়া** (hypoglysemia) বলে। আবার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে তাকে **হাইপারগ্লাইসোমিয়া** (hyperglysemia) বলে। রক্তে স্বাভাবিক গ্লুকোজের মাত্রা < 7.8 mmol/l।

২। চর্বি ও অ্যামিনো এসিড সঞ্চয় (Storage of Fat and Amino acid) : যকৃতে রক্তের অতিরিক্ত লিপিড গ্লাইকোলিপিড (glycolipid) হিসেবে সঞ্চিত থাকে। আবার যে শর্করা দেহে ব্যবহৃত হতে পারে না কিংবা গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চিত থাকে না, যকৃৎ সেই অতিরিক্ত শর্করাকে (গ্লুকোজ) চর্বিতে পরিণত করে সঞ্চিত রাখে। অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে পরিবর্তিত হয়ে একদিকে ইউরিয়া এবং অন্যদিকে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। দেহের প্রয়োজনে চর্বি ও অ্যামিনো এসিড ব্যবহারযোগ্য গ্লুকোজে পরিণত হয়।

৩। ভিটামিন সঞ্চয় (Storage of Vitamin) : যকৃৎ ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন A, D, E ও K সঞ্চয় করে। ভিটামিন K রক্ত জমাটে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এছাড়া যকৃৎ কিছু পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন B, ভিটামিন C, ভিটামিন B_{12} (cyanocobalamin), ও ফলিক এসিড সঞ্চয় করে। ভিটামিন B_{12} ও ফলিক এসিড অস্থিমজ্জায় লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি করে।

৪। পিত্তরস সঞ্চয় (Storage of Bile) : যকৃৎ পিত্তরস তৈরি করে পিত্তথলিতে (gall bladder) সঞ্চয় করে। পিত্তে অবস্থিত পিত্ত লবণ স্নেহ জাতীয় খাদ্যের **ইমালসিফিকেশন** ঘটিয়ে ফ্যাট পরিপাকে সহায়তা করে।

৫। রক্ত সঞ্চয় (Storage of Blood) : প্লিহা ও অন্ত্র থেকে আগত রক্তনালিগুলো মিলিত হয়ে **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** গঠন করে। যকৃতের ভেতর দিয়ে যদিও রক্ত অনবরত প্রবাহিত হয় তবুও এর রক্তনালিসমূহ ও হেপাটিক পোর্টাল শিরা বিপুল পরিমাণ রক্ত ধারণ করে রক্তের **ভাণ্ডারের** (reservoir) কাজ করে। রক্তের আয়তন বেড়ে গেলে (অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে রক্ত গ্রহণ করলে) অন্যান্য শিরাসহ যকৃৎ শিরা প্রসারিত হয়ে অতিরিক্ত রক্তকে ধারণ করে। যকৃৎ প্রায় ১৫০০ ঘন সে.মি রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে পারে। যকৃতে বিদ্যমান **কুফার কোষ** (kupffer cells) রক্ত থেকে বিভিন্ন অণুজীব (যেমন- ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, ছত্রাক ইত্যাদি) ছাঁকন প্রক্রিয়ায় অপসারণ করে। এছাড়া যকৃতে রক্ত থেকে মৃত কোষ, মৃতপ্রায় লোহিত কণিকা, ক্যান্সার কোষ এবং কোষীয় বর্জ্য অপসারিত হয়।

৬। খনিজ দ্রব্য সঞ্চয় (Storage of Minerals) : লোহিত রক্তকণিকার ভাঙনে সৃষ্ট হিমোগ্লোবিন যকৃতের কুফার কোষের মাধ্যমে **হিম** ও **গ্লোবিনে** পরিণত হয়। হিম-এর লৌহ অংশ **ফিরিটিন** হিসেবে সঞ্চিত থাকে। এছাড়াও সুস্থ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ, যেমন– কপার, জিংক, কোবাল্ট, মলিবডেনাম, পটাশিয়াম, আয়রন ইত্যাদি মিনারেল যথা মাত্রায় সঞ্চিত থাকে।

2020/8/4 13:00

Scanned with CamScanner

যকৃতের বিপাকীয় কাজ (Metabolic Functions of Liver)

১। শর্করার বিপাক (Carbohydrate metabolism)

- যকৃৎ ফ্রুক্টোজ ও গ্যালাক্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে।
- যকৃৎ গ্লুকোজকে **গ্লাইকোজেনেসিস** (glycogenesis) প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেনে পরিণত করে সঞ্চিত করে। ইনসুলিনের উপস্থিতিতে প্রক্রিয়াটি উদ্দীপ্ত হয়। **ইনসুলিন** (insulin) হচ্ছে মানুষসহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর **অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (islets of Langerhans) থেকে উৎপন্ন হরমোন যা রক্তের চিনি বা গ্লুকোজের মাত্রা কমায়।
- গ্লুকোজের চাহিদার তুলনায় যদি গ্লাইকোজেনের ঘাটতি হয়, তখন নন-কার্বোহাইড্রেট উৎস যেমন– অ্যামিনো এসিড, ল্যাকটিক এসিড, পাইরুভিক এসিড এবং গ্লিসারল থেকে **গ্লুকোনিওজেনেসিস** (gluconeogenesis) প্রক্রিয়ায় যকৃতে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হয়।
- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস পেলে দেহের প্রয়োজনে অনেক সময় যকৃৎ **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** (glycogenolysis) প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের বিপাক ঘটিয়ে গ্লুকোজ তৈরি করে শক্তির চাহিদা পূরণ করে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় অতি মাত্রায় বেড়ে গেলে যকৃৎ **লাইপোজেনেসিস** (lipogenesis) প্রক্রিয়ায় ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে অতিরিক্ত গ্লুকোজকে **ট্রাইগ্লিসারাইডে** (triglyceride=TG) পরিণত করে। যা কোষে চর্বি হিসেবে সঞ্চিত থাকে। এজন্য অতিরিক্ত শর্করা খাদ্য গ্রহণ করলে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে যায় যা **হৃদরোগ ও স্ট্রোকের প্রধান কারণ**।
- যকৃৎ **ক্রেবস চক্রের** (Kreb's cycle) মাধ্যমে শর্করার বিপাক ঘটিয়ে CO_2 , পানি ও প্রচুর শক্তি উৎপন্ন করে।
- যকৃৎ রক্তে গ্লুকোজের ভারসাম্য রক্ষা করে।

২। আমিষ বিপাক (Protein metabolism)

- **ডিঅ্যামাইনেশন (Deamination) :** যকৃত অব্যবহৃত ও অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড থেকে **ডিঅ্যামাইনেজ** এনজাইমের উপস্থিতিতে ডিঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় কিটো এসিড ও অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) সৃষ্টি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য ক্রেবস চক্রে ব্যবহৃত হয়। অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+)-এর সাথে যুক্ত হয় এবং পরিবর্তিত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন করে যা দেহের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত ও ক্ষতিকর। এটি দেহে সঞ্চিত হলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে।
- **ইউরিয়া উৎপাদন (Production of urea) :** যকৃতে **অরনিথিন চক্রে** (Ornithine cycle) শর্করা বিপাকে সৃষ্ট CO_2 এর সাথে অ্যামোনিয়া মিলিত হয়ে ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$] সৃষ্টি করে। ইউরিয়া রক্তবাহিত হয়ে বৃক্কে প্রবেশ করে এবং বৃক্ক হতে মূত্ররূপে দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়।
- **অ্যামিনো এসিড উৎপাদন (Production of amino acid) :** আবার **ট্রান্সঅ্যামিনেশন** প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ একটি অ্যামিনো এসিড থেকে অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) বহন করে অন্য এক জৈব এসিডে স্থানান্তরের মাধ্যমে অ্যামিনো এসিডের সংশ্লেষণ করে।
- **প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ (Production of plasma protein) :** অধিকাংশ প্লাজমা প্রোটিন যেমন– অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথ্রোম্বিন, ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি যকৃতের অ্যামিনো এসিড থেকে সংশ্লেষিত হয়। এসব প্রোটিন (বিশেষ করে অ্যালবুমিন) রক্তের ভেতর দিয়ে ক্যালসিয়াম, পিত্ত লবণ ও কিছু স্টেরয়েড হরমোন বহন করে। যকৃৎ থেকে সৃষ্ট প্লাজমা প্রোটিন **প্রোথ্রোম্বিন** (prothrombin) ও **ফাইব্রিনোজেন** (fibrinogen) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রক্ত জমাট বাঁধার ফ্যাক্টর, যা রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে। গ্লোবিউলিনগুলো ইমিউনতন্ত্রকে সুরক্ষা দেয়।

৩। ফ্যাট বিপাক (Fat metabolism)

- অন্ত্র থেকে শোষিত স্নেহ পদার্থ যকৃতে পৌঁছে চর্বি বা ফ্যাটে পরিণত হয়।
- শর্করা ও প্রোটিন থেকে ফ্যাট সংশ্লেষ করে।
- ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, লাইপোপ্রোটিন প্রভৃতি যকৃৎ সংশ্লেষ করে।
- যকৃতে ফ্যাটের অক্সিজেন সংযোগে দহন বা অক্সিডেশনের ফলে ATP রূপে শক্তি উৎপন্ন হয়।
- যকৃতে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের জারণ ঘটে, ফলে কিটোনজাত পদার্থের সংশ্লেষ ঘটে।
- যকৃতে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের জারণ ঘটে, ফলে কিটোনজাত পদার্থের সংশ্লেষ ঘটে।
- শর্করার অভাবে সঞ্চিত ফ্যাট থেকে **গ্লুকোনিওজেনেসিস** প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।

৪। নিউক্লিক এসিড বিপাক (Nucleic acid metabolism) : যকৃতে অ্যামিনো এসিড, গ্লুটামিন প্রভৃতির সাহায্যে পিউরিন ও পাইরিমিডিন ঘটিত নিউক্লিওটাইডগুলো সংশ্লেষিত হয়ে থাকে। আবার যকৃতে পিউরিনের বিপাকের ফলে ইউরিক এসিড এবং পাইরিমিডিন বিপাকের ফলে **ইউরিয়া** উৎপন্ন হয়। যকৃতে গ্লাইসিন ও টরিন নামক অ্যামিনো এসিড হতে যথাক্রমে **গ্লাইকোকোলিক এসিড** ও **টারকোলিক এসিড** সংশ্লেষিত হয়।

2020/8/4 13:00

Scanned with CamScanner

৫। ভিটামিন বিপাক (Vitamin metabolism) : যকৃৎ বিটা-ক্যারোটিন হতে ভিটামিন A-এর সংশ্লেষ ঘটায়। আবার ভিটামিন K-এর সাহায্যে যকৃৎ প্রোথ্রম্বিন তৈরি করে।

৬। রক্তসংক্রান্ত কার্যাবলি (Function about blood) : ভ্রূণ অবস্থায় যকৃৎ লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি করে। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় লোহিত কণিকা ধ্বংস করে। যকৃৎ **প্রোথ্রম্বিন** ও **ফাইব্রিনোজেন** সৃষ্টি করে রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে। যকৃতে অবস্থিত **মাস্ট কোষ** (mast cell) **হেপারিন** (heparin) নিঃসরণ করে রক্তপ্রবাহের মধ্যে রক্ত তঞ্চনে বাধা দেয়। যকৃৎ RBC-এর হিমোগ্লোবিন ভেঙে **বিলিরুবিন** (bilirubin) ও **বিলিভার্ডিন** (biliverdin) সৃষ্টি করে। যকৃৎ লৌহ সঞ্চয় করে হিমোগ্লোবিন গঠন করে।

৭। রেচন সংক্রান্ত কার্যাবলি (Function about excretion) : যকৃৎ বিভিন্ন ধাতব পদার্থ, টক্সিন, ব্যাকটেরিয়া, অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত ওষুধ (drugs) পিত্তের মাধ্যমে দেহ থেকে দূরীভূত করে। এছাড়া যকৃৎ বিভিন্ন প্রকার **অ্যান্টিবডি** গঠন করে।

৮। তাপ নিয়ন্ত্রণ (Control of heat) : যকৃৎ রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত অধিক উত্তাপ শোষণ করে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৯। কোলেস্টেরল ও এনজাইম উৎপাদন (Cholesterol and enzyme production) : কোলেস্টেরল বা ফ্যাটসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করলে নানান প্রক্রিয়া শেষে যকৃতে কোলেস্টেরল উৎপন্ন হয়। হার্ট অ্যাটাক (coronary thrombosis) ও স্ট্রোক (cerebral thrombosis) সংক্রান্ত জটিলতায় কোলেস্টেরল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া যকৃৎ **ক্যাটালেজ** (catalase) এনজাইম উৎপন্ন করে যা কোষে সঞ্চিত বিষাক্ত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) ভেঙ্গে পানি ও অক্সিজেনে পরিণত করে। এছাড়াও মানুষের যকৃতে ক্যাটালেজ দ্বারা বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট হয়।

১০। পিত্ত উৎপাদন (Bile production): যকৃৎ কোষ (হেপাটোসাইট) সবসময় পিত্ত বা **পিত্তরস** ক্ষরণ করে এবং পিত্তথলিতে জমা রাখে। যকৃৎ কোষ স্টেরয়েড থেকে পিত্ত লবণ যেমন– **সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট** (sodium glycocholate), **সোডিয়াম টরোকোলেট** (sodium taurocholate) সংশ্লেষ করে। পরিপাক অঙ্গ হিসেবে যকৃতের পিত্ত উৎপাদন ও ক্ষরণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

১১। হরমোনের ভাঙন (Breakdown of Hormone) : যকৃৎ প্রায় সব হরমোনই কমবেশি ধ্বংস করে। তবে টেস্টোস্টেরন ও অ্যালডোস্টেরন যত দ্রুত ধ্বংস হয় অন্য হরমোনগুলো (ইনসুলিন, গ্লুকাগোন, আন্ত্রিক হরমোন, স্ত্রী যৌন হরমোন, অ্যাড্রেনাল হরমোন, থাইরক্সিন ইত্যাদি) তত দ্রুত ধ্বংস হয় না। এভাবে যকৃৎ বিভিন্ন হরমোনের কর্মকাণ্ডে স্থায়ী অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (হোমিওস্ট্যাসিস) সৃষ্টি করে।

১২। টক্সিন বা বিষ অপসারণ (Detoxification) : শরীরের ভেতর স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের ফলে উৎপন্ন যেসব পদার্থ মাত্রাতিরিক্ত জমা হলে দেহে বিষময়তার সৃষ্টি করে এমন সব পদার্থকে টক্সিন (toxin) বা বিষ বলে। যকৃৎ কোষের অভ্যন্তরে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই বিষ প্রশমিত হয়ে যায়।

পিত্তরস বা পিত্ত (Bile)

যকৃৎ নিঃসৃত রসকে **পিত্তরস** বা **পিত্ত** বলে। পিত্তরস পিত্তথলিতে জমা থাকে। এটি একটি হলুদাভ তরল পদার্থ। এটি তিক্ত স্বাদধারী, সামান্য ক্ষারধর্মী (pH 8.0-8.6); আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.010-1.011। যকৃৎ প্রতিদিন প্রায় 500-1000 মিলিলিটার পিত্তরস উৎপন্ন করে।

পিত্তরসের উপাদান

1. পানি : 89% - 98%

2. কঠিন পদার্থ : 2% -11%

(a) অজৈব পদার্থ : 0.7% - 0.8%; সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন লবণ।

(b) জৈব পদার্থ : 1.3% - 10.2%

(i) পিত্তলবণ : **সোডিয়াম টরোকোলেট** (sodium taurocholate) ও **সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট** (sodium glycocholate)।

(ii) পিত্তরঞ্জক : বিলিরুবিন (bilirubin), বিলিভার্ডিন (biliverdin)।

(iii) পিত্ত এসিড : কোলিক এসিড, লিথোকোলিক এসিড।

(c) অন্যান্য পদার্থ : কোলেস্টেরল, লেসিথিন, ফ্যাটি এসিড, মিউসিন, নিউক্লিওপ্রোটিন, মিউকাস ইত্যাদি।

পিত্তরসের কাজ : পিত্ত জীবনের পক্ষে একটি অপরিহার্য পদার্থ। পাচক এনজাইম না থাকা সত্ত্বেও এটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপাক বা পাচক রস হিসেবে কাজ করে। পিত্তরসের কাজগুলো নিম্নরূপ :

১। পরিপাক : পিত্তলবণ স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে **ইমালসিফিকেশনের** মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে। পিত্তলবণ চর্বি পরিপাককারী লাইপেজ এনজাইমকে সক্রিয় করে পরিপাকে সাহায্য করে।

2020/8/4 13:01

Scanned with CamScanner

২। শোষণ : চর্বি, লৌহ ও ক্যালসিয়াম, চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (ভিটামিন A, D, E ও K) ইত্যাদি শোষণের জন্য পিত্তলবণ অত্যাবশ্যক।

৩। রেচন : পিত্তরসের মাধ্যমে কপার, জিঙ্ক, লেড, পারদ, টক্সিন, পিত্তরঞ্জক, কোলেস্টেরল, ব্যাকটেরিয়া, লেসিথিন ইত্যাদি রেচন দ্রব্য দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়।

৪। জোলাপ ক্রিয়া : পিত্তলবণ পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়ায় উদ্দীপনা দেয়; এটি পায়খানাকে নরম করে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৫। pH নিয়ন্ত্রণ : পিত্তরসে অধিক ক্ষারকের উপস্থিতির জন্য HCl প্রশমিত হয়ে pH-এর সমতা বজায় থাকে এবং পিত্ত ডিওডেনামের pH-এর ভারসাম্য রক্ষা করে বিভিন্ন এনজাইম ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

৬। বাফার ও লুব্রিকেন্ট : পিত্তের মিউসিন বাফার ও লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে।

এনজাইম ও পিত্তরসের পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	এনজাইম (Enzyme)	পিত্তরস বা পিত্ত (Bile)
১। প্রকৃতি	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (নালিযুক্ত গ্রন্থি) নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ।	যকৃৎ নিঃসৃত মিশ্র পদার্থ।
২। উপাদান	পানি ও প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থ।	পানি, জৈব ও অজৈব পদার্থ।
৩। অবস্থান	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করে।	যকৃৎ থেকে উৎপন্ন হয়ে পিত্তথলিতে জমা থাকে।
৪। কার্যক্ষেত্র	সমগ্র দেহের বিভিন্ন অংশে।	শুধুমাত্র পরিপাকনালিতে।
৫। কাজ	রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে।	খাদ্য পরিপাকে ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে ।
৬। পরিণতি	কার্যশেষে অপরিবর্তিত থাকে।	কার্যশেষে বর্জ্যরূপে দেহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

৩. অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অবস্থান : অগ্ন্যাশয় উদরগহ্বরের পাকস্থলীর নিচে ডিওডেনাম ও প্লিহার সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

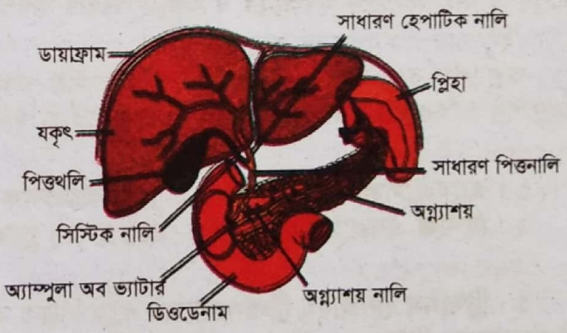

চিত্র ৩.৭ক : অগ্ন্যাশয়ের অবস্থান

গঠন : অগ্ন্যাশয় লম্বাটে, চ্যাপ্টা আকৃতির গোলাপি-ধূসর বর্ণের নরম মাংসল **মিশ্র প্রকৃতির** গ্রন্থি। এটি দেখতে অনেকটা মরিচ বা পাতার । এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২-১৫ সেন্টিমিটার ও চওড়ায় প্রায় ৫ সেন্টিমিটার। অগ্ন্যাশয় **মস্তক, দেহ ও লেজ** এই তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। মস্তক অংশটি চওড়া এবং এটি ডিওডেনামের সঙ্গে যুক্ত থাকে। লেজ অংশটি সরু ও প্লিহা পর্যন্ত বিস্তৃত। মস্তক ও লেজের মাঝের অংশটিকে দেহ বলে। অগ্ন্যাশয়ের এনজাইম নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলো থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিকা বেরিয়ে একত্রিত হয়ে প্রধান অগ্ন্যাশয় নালি বা **উইরসাং নালি** (duct of wirsung) গঠন করে, যা অগ্ন্যাশয়ের দৈর্ঘ্য বরাবর এসে পিত্তনালির সঙ্গে মিলিত হয়ে **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vater)-এর মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে। অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় অগ্ন্যাশয়কে **মিশ্র গ্রন্থি** বলা হয়। অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থিসমূহ–

(ক) বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine gland) **:** অসংখ্য **লোবিউল** (lobule) বা **অ্যাসিনাস** (acinus) নিয়ে অগ্ন্যাশয় গঠিত। প্রতিটি লোবিউল একটি কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র নালি **লুমেন** এবং লুমেনকে ঘিরে বৃত্তাকারে সজ্জিত একসারি কোষ নিয়ে গঠিত। **লোবিউলের কোষ থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়**। লুমেন বা ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকাগুলো একত্রিত হয়ে **প্রধান অগ্ন্যাশয় নালি** বা **উইরসাং নালি** গঠন করে। লোবিউল নালিযুক্ত গ্রন্থি, তাই একে **সনাল গ্রন্থি** বলে এবং এদের ক্ষরণ বহির্মুখী অর্থাৎ ক্ষরিত রস নালির মাধ্যমে বাহিত হয় বলে এদের **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থিকোষগুলো ছোট ছোট নালিকার প্রান্তে আঙুরের গোছার মতো সাজানো থাকে। এগুলো রস ক্ষরণকারী **সেরাস কোষ** দ্বারা গঠিত, যা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে এনজাইম ক্ষরণ করে খাদ্য পরিপাকে ভূমিকা রাখে। অগ্ন্যাশয়ের ৯০% হলো বহিঃক্ষরা গ্রন্থির অংশ।

2020/8/4 13:01

Scanned with CamScanner

(খ) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine gland) : অগ্ন্যাশয়ের রস ক্ষরণকারী থলিগুলোর বাইরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুকোণাকৃতি কোষের পুঞ্জ একত্রিত হয়ে **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (islets of Langerhans) বা **ল্যাঙ্গারহ্যান্স দ্বীপপুঞ্জ** গঠন করে। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স প্রায় ১০ লক্ষ কোষের একটি গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। প্রতিটি গুচ্ছে বা পুঞ্জে চার ধরনের কোষ থাকে। যথা– (i) **আলফা কোষ** (alpha cell)- **গ্লুকাগন** (glucagon) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে; (ii) **বিটা কোষ** (beta cell)- **ইনসুলিন** (insulin) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়; (iii) **ডেল্টা কোষ** (delta cell)- **সোমাটোস্ট্যাটিন** (somatostatin) হরমোন ক্ষরণ করে যা আলফা ও বিটা কোষের ক্ষরণ অর্থাৎ রক্তে গ্লুকাগন ও ইনসুলিন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং (iv) **গামা কোষ** বা **প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ** (pancreatic polypeptide cell = PP cell)– **প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড** ক্ষরণ করে যা পাকঅন্ত্রীয় ক্ষরণ বৃদ্ধি করে ও অগ্ন্যাশয়কে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপিত করে । **ল্যাঙ্গারহ্যান্স** দ্বীপপুঞ্জে নালি থাকে না বলে একে **নালিবিহীন গ্রন্থি** বলে। এদের ক্ষরণ অন্তর্মুখী অর্থাৎ ক্ষরিত হরমোন রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হয় বলে একে **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। অগ্ন্যাশয়ের ১০% হলো অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অংশ।



চিত্র ৩.৭খ : অগ্ন্যাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

কাজ : অগ্ন্যাশয় রসের এনজাইমসমূহ খাদ্য (শর্করা, আমিষ ও স্নেহ) পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এর হরমোনসমূহ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কাজ (Function of Pancreas as Exocrine Gland)

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম বলতে মূলত পরিপাক কাজকেই বোঝায়। অগ্ন্যাশয় পরিপাক ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তাকে অগ্ন্যাশয় রস বলে। এ রস **পরিপাক এনজাইম** ও **একটি ক্ষারীয় তরল** মিলে গঠিত হয়।

(ক) পরিপাক সংক্রান্ত কাজ

অগ্ন্যাশয় রসে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় পদার্থ পরিপাকের জন্য নানা ধরনের এনজাইম নিঃসৃত হয়, যা অগ্ন্যাশয় নালির মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে ও খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে।

❐ শর্করা পরিপাক

১। **অ্যামাইলেজ** এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেনকে ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে।

২। **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজকে ভেঙে ২ অণু গ্লুকোজে পরিণত করে।

❐ প্রোটিন পরিপাক

১। **ট্রিপসিন** এনজাইম **ট্রিপসিনোজেন** নামে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ক্ষরিত হয়। এই নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে **জাইমোজেন** বলে। ডিওডেনামের মিউকোসা নিঃসৃত **এন্টারোকাইনেজ** এনজাইমের সহায়তায় এটি সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয় এবং প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

২। **কাইমোট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

৩। **কার্বোক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে (পেপটোন) সরল পেপটাইডে ও অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

৪। **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

৫। **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

৬। **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

৭। **কোলাজিনেজ** এনজাইম কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে (অর্থাৎ পেপটোন ও প্রোটিওজ) পরিণত করে।

৮। **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে সরল পেপটাইডে (অর্থাৎ পেপটোন ও প্রোটিওজ) পরিণত করে।

❐ স্নেহ পরিপাক

১। **লাইপেজ :** এটি চর্বিকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

২। **কোলেস্টেরল এস্টারেজ :** এটি পিত্তলবণের উপস্থিতিতে খাদ্যের কোলেস্টেরল এস্টারগুলোকে ভেঙে কোলেস্টেরল ও ফ্যাটি এসিডে পরিণত করে।

2020/8/4 13:0
Scanned with CamScanner

(খ) অপরিপাকীয় কাজ

১। অম্ল-ক্ষারের সাম্য : অগ্ন্যাশয় রস অম্ল-ক্ষারের সাম্যতা বজায় রাখে।

২। এসিড প্রশমন : অগ্ন্যাশয় রস ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ায় এটি পাকস্থলী থেকে আগত কাইমের এসিড প্রশমিত করে আন্ত্রিক রসের কাজে সহায়তা করে।

৩। পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ : এটি দেহের পানিসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৪। দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ : অগ্ন্যাশয় রস তার নিঃসরণের দ্বারা দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। রেচন ক্রিয়া : কয়েকটি ভারী ধাতু, প্রতিবিষ, অ্যালকালয়েড প্রভৃতি অগ্ন্যাশয় রসের মাধ্যমে পৌষ্টিকনালিতে এসে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

৬। পিচ্ছিলকরণ : অগ্ন্যাশয়ের মিউসিনের সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্র মধ্যস্থ খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

৭। ট্রিপসিনের ক্রিয়া দমন : অগ্ন্যাশয় রসের ট্রিপসিন ইনহিবিটর ট্রিপসিনের ক্রিয়াকে বাধা প্রদান করে।]

পেপসিন ও ট্রিপসিনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পেপসিন (Pepsin)	ট্রিপসিন (Trypsin)
১। উৎপত্তিস্থল	পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির পেপটিক কোষ বা চিফ থেকে উৎপন্ন হয়।	অগ্ন্যাশয় থেকে উৎপন্ন হয়।
২। নিঃসরণের স্থান	পাকস্থলীতে নিঃসৃত হয়।	ক্ষুদ্রান্ত্রে (ডিওডেনামে) নিঃসৃত হয়।
৩। নিঃসরণের প্রকৃতি	নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন হিসেবে নিঃসৃত হয়ে পাকস্থলীর HCl দ্বারা সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হয়।	নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন হিসেবে নিঃসৃত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের (ডিওডেনাম) এন্টারোকাইনেজ এনজাইম দ্বারা সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয়।
৪। কাজের পরিবেশ	অম্লীয় পরিবেশে কাজ করে।	ক্ষারীয় পরিবেশে কাজ করে।
৫। ক্রিয়াস্থল	পাকস্থলীতে প্রোটিনকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।	ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রোটিনকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

অগ্ন্যাশয় রস (Pancreatic Juices)

অগ্ন্যাশয়ের নালিযুক্ত গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে **অগ্ন্যাশয় রস** বলে। এটি ক্ষারীয় (pH 8.0-8.3) প্রকৃতির; আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.010-1.030।

অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান

1. পানি : 97.6%; **2. কঠিন পদার্থ :** 2.4%

a. অজৈব উপাদান : 0.6%, Na^+, K^+, Ca^{2+}, Zn^{2+}, Cl^{-1}, HCO_3^-, PO_4^{3-} ইত্যাদি।

b. জৈব উপাদান : 1.8%, বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, যথা–

i. শর্করা পরিপাককারী : অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ প্রভৃতি এনজাইম।

ii. প্রোটিন পরিপাককারী : ট্রিপসিনোজেন, কাইমোট্রিপসিনোজেন, কার্বোক্সিপেপটাইডেজ, ইলাস্টেজ, কোলাজিনেজ, নিউক্লিয়েজ, নিউক্লিওটাইডেজ ইত্যাদি।

iii. স্নেহখাদ্য পরিপাককারী : অগ্ন্যাশয় লাইপেজ।

অগ্ন্যাশয় রসের কাজ

১। এটি ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ায় সমপরিমাণ পাকস্থলীয় রসকে প্রশমিত করে।

২। অগ্ন্যাশয় রসে বিদ্যমান অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ এনজাইম শর্করা জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

৩। ট্রিপসিনোজেন, কাইমোট্রিপসিনোজেন, নিউক্লিয়েজ, কার্বোক্সিপেপটাইডেজ আমিষ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

৪। লাইপেজ এনজাইম স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

❑ **কাজ :** (i) যকৃতের গঠন ও যকৃতের ক্রিয়াকৌশল ব্যাখ্যা কর। (ii) যকৃতের পরিপাকে ভূমিকা উল্লেখ কর। (iii) অগ্ন্যাশয় কীভাবে প্রোটিন পরিপাকে ভূমিকা রাখে– ব্যাখ্যা কর। (iv) রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে পাতার মতো গ্রন্থিটির ভূমিকা লেখ। (v) যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে কোনটি পরিপাকে অধিক ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণপূর্বক মন্তব্য কর। (vi) পাকস্থলী, পিত্তথলি এবং অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে কাজের সমন্বয় না থাকলে কী ঘটবে– বিশ্লেষণ কর। (vii) বহিঃক্ষরা গ্রন্থি খাদ্য পরিপাকে কী ভূমিকা রাখে ব্যাখ্যা কর।

2020/8/4 13:01

Scanned with CamScanner

৪. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric Glands)

পাকস্থলী একটি থলিসদৃশ পেশিবহুল অঙ্গ। পাকস্থলীর অন্তর্গাত্রের **মিউকোসা** (mucosa) স্তর কলামনার (স্তম্ভকার) এপিথেলিয়ামে আবৃত, যাতে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন **গ্যাস্ট্রিক পিট** (gastric pit) বিদ্যমান। এ সকল পিটে **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** থাকে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি এবং বিভিন্ন ধরনের কোষ (৪/৫ ধরনের) দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক প্রকার কোষের ক্ষরণ আলাদা আলাদা। যেমন- পাকস্থলীর অন্তর্গাত্রের **পেপটিক কোষ** থেকে পেপসিনোজেন, **অক্সিনটিক কোষ** হতে HCl, **মিউকাস কোষ** থেকে মিউসিন, **আরজেন্টাফিন কোষ** থেকে গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর এবং **গ্যাসট্রিন কোষ** বা **জি (G) কোষ** থেকে গ্যাস্ট্রিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এসব গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তাকে অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির রসকে **গ্যাস্ট্রিক রস** বা **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juices) বলে।

কাজ : গ্যাস্ট্রিক রস আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। HCl ব্যাকটেরিয়া বা রোগজীবাণু ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে। মিউসিন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে পাকস্থলীর প্রাচীরকে রক্ষা করে। গ্যাস্ট্রিন HCl, পেপসিন প্রভৃতির ক্ষরণ ঘটায়।

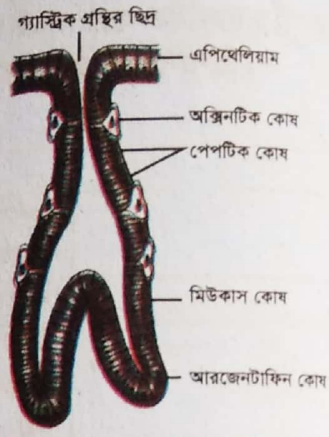

চিত্র ৩.৮ : গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি

গ্যাস্ট্রিক রস (Gastric Juice)

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তাকে **গ্যাস্ট্রিক রস** বলে। সমগ্র পরিমাণ : আহার প্রতি 500 – 1000 ml এবং প্রত্যহ 1200–1500 ml। এটি অম্লীয় (pH 0.9–1.5); আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.002–1.004; ফ্রিজিং বিন্দু : 0.59°C।

গ্যাস্ট্রিক রসের উপাদান

1. পানি : 99.45% ;

2. কঠিন পদার্থ : 0.55%

a. অজৈব পদার্থ : 0.15% সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ইত্যাদি।

b. জৈব পদার্থ : 0.40% – মিউসিন, ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর, এনজাইম (পেপসিন, রেনিন, লাইপেজ, লাইসোজাইম, জিলাটিনেজ, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ, ইউরিয়েজ ইত্যাদি)।

গ্যাস্ট্রিক রসের কাজ

১। গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান HCl পাকস্থলীতে অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে।

২। পেপসিন HCl এর সঙ্গে মিশে প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে।

৩। রেনিন দুধের ক্যাসিনোজেনকে ক্যাসিনে পরিণত করে।

৪। গ্যাস্ট্রিক রস পাকস্থলীর প্রাচীরকে সুরক্ষা করে।

৫। কিছু বিষাক্ত বস্তু, ভারী ধাতু, অ্যালকালয়েড বস্তু ইত্যাদি গ্যাস্ট্রিক রসের সঙ্গে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

৫. আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal Glands)

অন্ত্রের প্রাচীরের মিউকোসা ও সাবমিউকোসা স্তরে যথাক্রমে **ক্রিপ্টস অব লিবারকুন** (crypts of lieberkuhn) এবং **ব্রুনার গ্রন্থি** (glands of brunner) নামক দু'ধরনের আন্ত্রিক গ্রন্থি থাকে। ক্রিপ্টস অব লিবারকুন গবলেট কোষ, প্যানেথ কোষ, ব্রাশ কোষ ও আরজেন্টাফিন কোষ নিয়ে গঠিত। ব্রুনার গ্রন্থিগুলো **ক্রিপ্টস অব লিবারকুন**-এ যুক্ত থাকে। আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে আন্ত্রিক রস বা **সাক্কাস ইন্টেরিকাস** (intestinal juice or succus intericus) বলে।

কাজ : আন্ত্রিক রসের এনজাইমসমূহ শর্করা, আমিষ ও ফ্যাট জাতীয় অর্ধপাচ্য ও অপাচ্য বিভিন্ন খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক ও শোষণ করে।

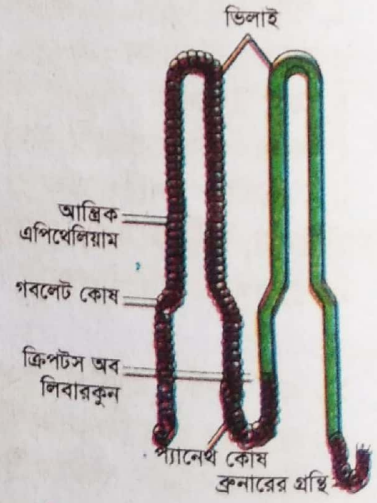

চিত্র ৩.৯ : আন্ত্রিক গ্রন্থি

আন্ত্রিক রস (Intestinal Juice)

আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে আন্ত্রিক রস বা **সাক্কাস ইন্টেরিকাস** বলে। সমগ্র পরিমাণ : 24 ঘণ্টায় 1-2 লিটার; ক্ষারীয় (pH 6.3-9.0, গড় 8.3); আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.010।

আন্ত্রিক রসের উপাদান

A. পানি : 98.5%; **B. কঠিন পদার্থ :** 1.5%

1. অজৈব উপাদান ঃ 0.8%; সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ।

2. জৈব উপাদান ঃ 0.7%

(a) সক্রিয়ক : এন্টারোপেপটাইডেজ বা এন্টারোকাইনেজ।

2020/8/4 13:01

Scanned with CamScanner

(b) এনজাইম :

(i) প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম : অ্যামাইনোপেপটাইডেজ, ডাইপেপটাইডেজ, নিউক্লিওটাইডেজ, নিউক্লিওসাইডেজ, ইরিপসিন ইত্যাদি।

(ii) শর্করা পরিপাককারী এনজাইম : অ্যামাইলেজ, সুক্রেজ, মল্টেজ, আইসোমল্টেজ, ল্যাক্টেজ।

(iii) স্নেহদ্রব্য পরিপাককারী এনজাইম : লাইপেজ।

(vi) অন্যান্য এনজাইম : অ্যালকালাইন ফসফাটেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ, লেসিথিনেজ।

(v) মিউসিন।

আন্ত্রিক রসের কাজ

১। আন্ত্রিক রসে বিদ্যমান মিউকাস অন্ত্রের প্রাচীরকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।
২। এর সক্রিয়ক এন্টারোকাইনেজ নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে পরিণত করে।
৩। এর মল্টেজ, সুক্রেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম যথাক্রমে মল্টোজ, সুক্রোজ ও ল্যাক্টোজ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।
৪। এতে বিদ্যমান পেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

মানুষের প্রধান পৌষ্টিকগ্রন্থিসমূহের নাম, অবস্থান, গঠন ও কাজ

নাম	অবস্থান	গঠন	কাজ
১। লালাগ্রন্থি (Salivary gland)	জিহ্বা ও ম্যান্ডিবলের নিচে এবং কানের পেছনে।	এরা সংখ্যায় ৩ জোড়া। যথা : (ক) প্যারোটিড (খ) সাবম্যান্ডিবুলার ও (গ) সাবলিঙ্গুয়াল	লালারস ক্ষরণ করে। লালারস প্রধানত শ্বেতসার পরিপাক করে।
২। যকৃৎ (Liver)	উদর গহ্বরে, ডায়াফ্রামের নিচে।	যকৃৎ দেহের বৃহত্তম গ্রন্থি। (যকৃৎকে জীবন সমুদ্রের কর্মমুখর পোতাশ্রয় বলা যায়)।	পিত্তরস ক্ষরণ করে। পিত্তরসে কোনো এনজাইম নেই। এই রস ক্ষারীয়। পিত্তরস ডিওডেনামে ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে এবং চর্বিকে ফেনায় পরিণত করে।
৩। অগ্ন্যাশয় (Pancreas)	পাকস্থলীর নিচে ও ডিওডেনামের বাঁকের মধ্যস্থলে।	পাতার মতো চ্যাপ্টা, মরিচের মতো আকৃতির গ্রন্থি।	অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণ করে। এই রসে পরিপাকে অংশগ্রহণকারী প্রধানত তিন ধরনের এনজাইম থাকে। যথা : ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ।

৩.৫ পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা
(Role of Nervous System and Hormone in Digestion)

মানুষের ক্ষুধা ও খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত **ক্ষুধা কেন্দ্র** (hunger centers) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ খাদ্য গ্রহণে উদ্দীপিত হয় যখন রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা কমে আসে। আমাদের পৌষ্টিকনালিতে যেসব পাচক রস নিঃসৃত হয়, সেগুলো হলো **লালারস, পাকরস** বা **গ্যাস্ট্রিক জুস, অগ্ন্যাশয় রস** ও **আন্ত্রিক রস** যা পরিপাকে ভূমিকা রাখে ।

(ক) স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা (Role of nervous system) : পাচক রসের ক্ষরণ ও খাদ্যবস্তু পরিপাক পদ্ধতি স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষের খাদ্য পরিপাক ক্রিয়ায় ২টি ভিন্ন ধরনের স্নায়ু কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। যথা– **অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক** বা **ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস** (Intrinsic plexuses) এবং **বহির্নিহিত স্নায়ুজালক** বা **এক্সট্রিনসিক প্লেক্সাস** (Extrinsic plexuses)।

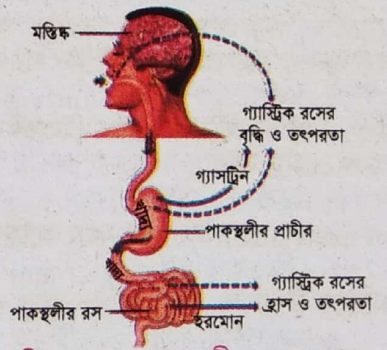

চিত্র ৩.১০ : পাকস্থলীর রস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির চিত্ররূপ

(১) ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস (Intrinsic plexuses) : ইনট্রিনসিক প্লেক্সাসকে **এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম** বা **আন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্রও** বলে যা পৌষ্টিকনালি জুড়ে বিশেষ করে অন্ননালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও কোলনের প্রাচীরে বিস্তৃত থাকে। এরা পৌষ্টিকনালির ভেতর থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। দুধরনের ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস বা অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক পৌষ্টিকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। যথা- (ক) **মায়েনটেরিক স্নায়ুজালক** (myenteric plexuses) : এটি পৌষ্টিকনালির বাইরের দিকে অবস্থিত এবং পৌষ্টিকতন্ত্রের মসৃণ পেশিগুলোর সংকোচন (বা পেরিস্ট্যালসিস) নিয়ন্ত্রণ করে। (খ) **সাব-মিউকোসাল স্নায়ুজালক** (submucosal plexuses) : এটি পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের নিঃসরণ ও স্থানীয় রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম খাদ্যের পুষ্টিগুণ ও পরিমাণ দেখে এর সাড়া প্রদান করার ক্ষমতা পরিবর্তন করতে পারে। এ জন্য বিজ্ঞানীরা এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমকে মানুষের **দ্বিতীয় মস্তিষ্ক** (second brain) নামে অভিহিত করেছেন।

2020/8/4 13:01
Scanned with CamScanner

(২) এক্সট্রিনসিক প্লেক্সাস (Extrinsic plexuses) : এগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (autonomous nervous system) **সিমপ্যাথেটিক** (sympathetic) ও **প্যারাসিমপ্যাথেটিক** (parasympathetic) শাখা থেকে আগত এবং এরা পৌষ্টিকনালির বাইরে থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। এরা পরিপাকতন্ত্রের দীর্ঘ প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন– খাদ্যের ঘ্রাণ নিয়ে, স্বাদ গ্রহণ করে বা খাদ্য দেখে খাদ্যের প্রতি সাড়া দেওয়া।

স্নায়ুতন্ত্র তথা এসব স্নায়ুজালকগুলো পরিপাকের জন্য পাচক রস, এনজাইম ও হরমোন ক্ষরণ করে পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন–

১। মুখবিবরে লালা ক্ষরণ : মুখের ভেতরে খাদ্য প্রবেশ করার পর জিহ্বার স্বাদকোরক থেকে মেমোরি নিউরন স্নায়ু উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। পরে মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা মোটর নিউরনের মাধ্যমে লালাগ্রন্থিতে আসে ফলে লালাগ্রন্থি লালা নিঃসরণ করে। একে **অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (unconditioned reflex) বলে। খাদ্যবস্তুর চর্বণ, গলাধঃকরণ ইত্যাদি থেকে অনপেক্ষ প্রতিবর্ত-এর উদ্ভব হয়। এ ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত, স্থির ও কোনো শর্তাধীন নয়। আবার অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে ঘটে **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (conditioned reflex), যেমন– আচার খাওয়ার কথায় মুখে লালা আসা। অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর দর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে সক্রিয় করে। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত নয়, বারবার অনুশীলনের ফলে অর্জিত হয়।

২। গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণ : খাদ্যবস্তু মুখবিবর থেকে গলবিল ও অন্ননালি হয়ে যখন পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তখন পাকস্থলী প্রসারিত হয় এবং প্রসারণ গ্রাহক উদ্দীপ্ত হয়ে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে মস্তিষ্কের নির্দেশে পাকস্থলীর মিউকোসায় অবস্থিত এন্ডোক্রিন কোষ **গ্যাস্ট্রিন** হরমোন ক্ষরণ করে, যা গ্যাস্ট্রিক জুস বা রস ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে।

৩। আন্ত্রিক রস ক্ষরণ : ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য প্রবেশকালে এর প্রাচীরে অবস্থিত গ্রাহকগুলো উদ্দীপিত হয়। মস্তিষ্কে এই উদ্দীপনা পৌঁছালে মস্তিষ্ক পাকস্থলী থেকে অর্ধপাচিত খাদ্য বা **কাইমের** নির্গমন এবং গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণ কমিয়ে দেয়। ফলে একসঙ্গে অনেক বেশি খাদ্যবস্তু ও গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না এবং আন্ত্রিক রসের ক্ষরণ শুরু হয়। পরবর্তীতে ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য পরিপাক শুরু হয়।

(খ) হরমোনের ভূমিকা (Role of hormone) : খাদ্য পরিপাকে নিম্নলিখিত হরমোনগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে, যেমন–

১। গ্যাস্ট্রিন (Gastrin) : পাকস্থলীর পাইলোরিক অঞ্চলের গ্যাস্ট্রিন কোষ (gastrin cells = G-cells) থেকে গ্যাস্ট্রিন হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন পাকস্থলীর প্রাচীরে বিদ্যমান গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলোকে (gastric glands) **গ্যাস্ট্রিক জুস** বা রস (gastric juice) ও পাকস্থলীর প্রাচীর হতে HCl নিঃসরণে উদ্দীপিত করে। এটি অন্ননালি হতে পাকস্থলীতে খাদ্যগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

২। সিক্রেটিন (Secretin) : এটি প্রথম আবিষ্কৃত হরমোন। **সিক্রেটিন** অন্ত্রের বা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে নিঃসৃত হয়। এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রসে নিঃসৃত হয়। তাছাড়া এটি পাকস্থলীর প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃৎকে পিত্ত ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এই হরমোন গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ ও পাকস্থলীর চলনও হ্রাস করে।

৩। এন্টারোগ্যাস্ট্রোন (Enterogastrone = Gastric Inhibitory Peptide– GIP) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে নিঃসৃত হয়। এ হরমোন পাকস্থলীর বিচলন ও গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে। গ্যাস্ট্রিক সংকোচন হ্রাস করার জন্য একে **গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড** বলা হয়।

৪। এন্টেরোকাইনিন (Enterokinin) : এটি ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম ক্ষরিত হয়।

৫। কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin - CCK) : এই হরমোন ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয়। এ হরমোন পিত্তাশয়কে পিত্ত ক্ষরণে, অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশে এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এই হরমোনকে **কোলেসিস্টোকাইনিন প্যানক্রিওজাইমিনও** (Cholecystokinin Pancreozymin - CCK-PZ) বলা হয়।

৬। সোমাটোস্টাটিন (Somatostatin) : এটি পাকস্থলী ও অন্ত্রের মিউকোসাতে অবস্থিত **ডি-কোষ** থেকে নিঃসৃত হয়। এটি গ্যাস্ট্রিনের ক্ষরণ নিবারণ করে ফলে পাকস্থলী থেকে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ হ্রাস পায়। এটি অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণও হ্রাস করে।

৭। এন্টারোক্রাইনিন (Enterocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হয়। এটি **লিবারকুন গ্রন্থিকে** (crypts of lieberkuhn) উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

৮। ডিওক্রাইনিন (Deocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে ক্ষরিত হয়। এ হরমোন **ব্রুনারের গ্রন্থিকে** উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

৯। পেপটাইড YY (Peptide YY) : এই হরমোন ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের ভেতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।

১০। প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (Pancreatic polypeptide = PP) : এই হরমোন আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ থেকে ক্ষরিত হয় এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে বাধা দেয়।

১১। ভিল্লিকাইনিন (Villikinin) : এই হরমোন ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয় এবং ভিলাই-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

১২। ভেসোয়াটিক ইনটেস্টাইনাল পেপটাইড (Vasoactive intestinal peptide-VIP) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের প্রাচীরের রক্ত জালিকাগুলো প্রসারিত হয় এবং গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ বন্ধ হয়।

❑ **কাজ :** মানুষের খাদ্য পরিপাকে এনজাইমের পাশাপাশি হরমোনও বিশেষ ভূমিকা পালন করে– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

2020/8/4 13:02

Scanned with CamScanner

খাদ্য পরিপাকে সহায়তাকারী হরমোনের সংক্ষিপ্তসার

হরমোন	উৎস	কাজ
১। গ্যাস্ট্রিন	পাকস্থলীর পাইলোরিক অঞ্চল	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিকে গ্যাস্ট্রিক রস এবং পাকস্থলীর প্রাচীর হতে HCl নিঃসরণ উদ্দীপিত করে। এটি অন্ননালি হতে পাকস্থলীতে খাদ্যগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে।
২। সিক্রেটিন	ডিওডেনাম	এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। তাছাড়া এটি পাকস্থলীর প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃৎকে পিত্ত ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এই হরমোন গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ ও পাকস্থলীর চলনও হ্রাস করে।
৩। এন্টারোগ্যাস্ট্রোন	ডিওডেনাম	পাকস্থলীর বিচলন ও গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে।
৪। এন্টেরোকাইনিন	ইলিয়াম	এর প্রভাবে আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম ক্ষরিত হয়।
৫। কোলেসিস্টোকাইনিন	ক্ষুদ্রান্ত্র	পিত্তাশয়কে পিত্ত ক্ষরণে, অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশে এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।
৬। সোমাটোস্টাটিন	পাকস্থলী ও অন্ত্রের ডি-কোষ	এটি গ্যাস্ট্রিনের ক্ষরণ নিবারণ করে ফলে পাকস্থলী থেকে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ হ্রাস পায়। এটি অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণও হ্রাস করে।
৭। এন্টারোক্রাইনিন	ক্ষুদ্রান্ত্র	লিবারকুন গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।
৮। ডিওক্রাইনিন	ক্ষুদ্রান্ত্র	ব্রুনারের গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।
৯। পেপটাইড YY	ইলিয়াম	এর প্রভাবে অন্ত্রের ভেতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।
১০। প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড	প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ	অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে বাধা দেয়।
১১। ভিল্লিকাইনিন	ক্ষুদ্রান্ত্র	ভিলাই-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
১২। ভেসোয়াটিক ইনটেস্টাইনাল পেপটাইড	ক্ষুদ্রান্ত্র	অন্ত্রের প্রাচীরের রক্ত জালিকাগুলোকে প্রসারিত করে এবং গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ বন্ধ করে।

৩.৬ খাদ্যসার শোষণ বা পরিশোষণ
(Absorption of Digested Nutrients)

পরিপাকের ফলে অদ্রবণীয় জটিল খাদ্যবস্তু দ্রবণীয় খাদ্যসারে পরিণত হয়, যা ক্ষুদ্রান্ত্রের কোষ দ্বারা শোষিত হতে পারে। **প্রায় ৯০% শোষণ ক্ষুদ্রান্ত্রে ঘটে**। তবে পাকস্থলী ও বৃহদন্ত্রে কিছু (১০%) খাদ্যসার শোষিত হয়। পাকস্থলীতে কিছু ওষুধ এবং অ্যালকোহলের অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই শোষণ হয় না। কারণ পাকস্থলীতে খাদ্য সম্পূর্ণভাবে পরিপাক হয় না এবং এতে ভিলাই অনুপস্থিত। বৃহদন্ত্রে বেশির ভাগ পানি শোষিত হয়। বিভিন্ন হরমোন খাদ্যসার শোষণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

ক্ষুদ্রান্ত্র শোষণের প্রধান স্থান। ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরের অংশ অর্থাৎ ডিওডেনাম এনজাইম ক্ষরণ করে শর্করা, প্রোটিন ও লিপিড জাতীয় খাদ্যবস্তুর পরিপাক ঘটায়। অপরপক্ষে ক্ষুদ্রান্ত্রের নিচের অংশ (জেজুনাম ও ইলিয়াম) শোষণকার্যের সঙ্গে সংযুক্ত। পরিচিত সকল খাদ্য এবং ভিটামিন, খনিজ লবণ, পানি ইত্যাদি ক্ষুদ্রান্ত্রের নিচের অংশে জমা হয়। শর্করা ও প্রোটিনের সরল উপাদানগুলো ভিলাসের মধ্যে অবস্থিত রক্তনালিতে শোষিত হয় এবং প্রোটিন সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। ফ্যাটের সকল উপাদান **ল্যাকটিয়ালের** মধ্যে শোষিত হয় এবং লসিকাতন্ত্রে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরের ভাঁজে ভাঁজে নড়াচড়ায় সক্ষম ভিলাই নামক অভিক্ষেপ বিদ্যমান। **ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই হলো শোষণ একক**। মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে (১০ বর্গমিটার ক্ষেত্রতলে) প্রায় **৫০ হাজার** (৫০,০০০) ভিলাই থাকে। এ ছাড়া ভিলাস গঠনকারী এপিথেলিয়াল কোষের প্লাজমামেমব্রেন দ্বারা **মাইক্রোভিলাই** বা **ব্রাশবর্ডার** নামক অভিক্ষেপ সৃষ্টি ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে শোষণ অঞ্চলের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ৭০ কেজি ওজনের একজন মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে গড়ে প্রায় ১০০ বর্গমিটার শোষণ অঞ্চল থাকে। নিচে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তুর শোষণ বর্ণনা করা হলো–



(ক) ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর



(খ) ভিলাই-অন্তর্গঠন

চিত্র ৩.১১ক : ক্ষুদ্রান্ত্রের অভ্যন্তরীণ গঠন

2020/8/4 13:02

Scanned with CamScanner

১। শর্করা শোষণ (Absorption of Carbohydrate) : শর্করা প্রধানত **মনোস্যাকারাইড** রূপে শোষিত হয়। শর্করা পাচিত হলে যেসব সরল খাদ্য উৎপন্ন হয় সেগুলো হলো গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ ইত্যাদি। এসব সরল খাদ্য উপাদান ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের মাধ্যমে শোষিত হয়ে পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। পোর্টাল শিরা দ্বারা শোষিত খাদ্যসার যকৃতে মুক্ত করে। **ইনসুলিন** ও **গ্লুকোকর্টিকয়েড** হরমোন শর্করা শোষণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ল্যাকটিক এনজাইম শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে।

২। প্রোটিনের শোষণ (Absorption of Protein) : প্রোটিন **অ্যামিনো এসিডরূপে** কোষে শোষিত হয়। সাধারণত এল-অ্যামিনো এসিডগুলো সক্রিয় পদ্ধতিতে এবং ডি-অ্যামিনো এসিডগুলো ব্যাপন পদ্ধতিতে শোষিত হয়। পেপটোন, প্রোটিওজ, পেপটাইড ইত্যাদি অর্ধজটিল প্রোটিনও খুব অল্প পরিমাণ শোষিত হয়। ডিমের সাদা অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রে কিছু পরিমাণ শোষিত হয়। চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদির প্রোটিন অপরিবর্তিত অবস্থায় অল্প পরিমাণ ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়ে রক্তে মিশে যায়। ফলে অনেক সময় অ্যালার্জির লক্ষণ প্রকাশ পায়। **থাইরক্সিন** হরমোন প্রোটিন শোষণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। লিপিডের শোষণ : পিত্তরস ও লাইপেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় চর্বি মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিডে পরিণত হয়। মনোগ্লিসারাইড ও কিছু ফ্যাটি এসিড পিত্তরসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে স্নেহকণা (fat droplets) বা **মাইসেলি** (micelle) নামক আণুবীক্ষণিক কণা সৃষ্টি করে। অন্যান্য ফ্যাটি এসিডসহ মাইসেলি ব্যাপনের মাধ্যমে কোষে প্রবেশ করে। কোষের ভেতরে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল পুনরায় যুক্ত হয়ে ট্রাইগ্লিসারাইড গঠন করে। তবে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল উভয় অণু আমিষের আবরণ দ্বারা পৃথক থাকার কারণে পরস্পর মিশে যায় না।

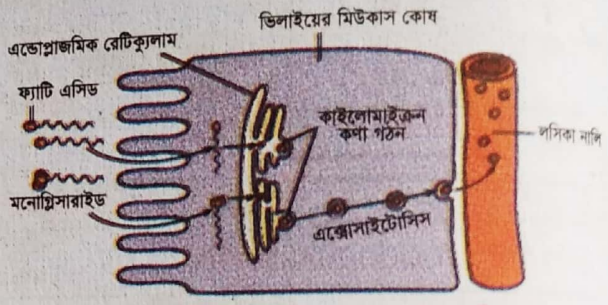

চিত্র ৩.১১খ : অন্ত্রে খাদ্যসার শোষণ (ফ্যাটি এসিড)

ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের এই অণুকে **কাইলোমাইক্রন** (chylomicron) বলে। সাদা বর্ণের কাইলোমাইক্রন কণাগুলো ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বা **এক্সোসাইটোসিস** (exocytosis) ভিলাইয়ের **ল্যাকটিয়েলে** (lacteal, অর্থ সাদাটে) প্রবেশ করে। লিপিডের শোষণ মূলত ডিওডেনাম ও জেজুনামের প্রথম অংশে সম্পন্ন হয়। **থাইরক্সিন** হরমোন লিপিড শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। পানি শোষণ : ক্ষুদ্রান্ত্রই পানি শোষণের প্রধান স্থান। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষিত হয়। সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় ২০০-৪০০ মিলিলিটার পানি শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষণের পর অবশিষ্ট পানি বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে।

৫। খনিজ লবণ শোষণ : ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা সক্রিয় পদ্ধতিতে অধিকাংশ খনিজ লবণ শোষিত হয়।

৬। ভিটামিন শোষণ : ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই কর্তৃক পানি বা চর্বিতে দ্রবীভূত হয়ে ভিটামিন শোষিত হয়। সাধারণত ভিটামিন A, D, E, K শোষিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ পিত্তলবণ সহায়তা করে। তবে ভিটামিন C ও কয়েক প্রকার B ভিটামিন ব্যাপন ও সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে শোষিত হয়।

পরিপাক এবং পরিশোষণ-এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পরিপাক (Digestion)	পরিশোষণ (Absorption)
১। সংজ্ঞা	যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে ভক্ষণকৃত জটিল, অদ্রবণীয় ও কঠিন খাদ্যবস্তু নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় সরল, দ্রবণীয় ও তরল খাদ্যসারে পরিণত হয়ে শোষণ উপযোগী হয় তাকে পরিপাক বলে।	যে প্রক্রিয়ায় পরিপাককৃত খাদ্যসার পরিপাকনালি থেকে রক্ত ও লসিকায় প্রবেশ করে তাকে পরিশোষণ বলে।
২। পরিণতি	জটিল খাদ্য গ্রহণের পর যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যসারে পরিণত হয়।	জটিল খাদ্য থেকে উৎপন্ন খাদ্যসার রক্ত ও লসিকায় গৃহীত হয়।
৩। সংঘটনস্থল	খাদ্য গ্রহণের পর পরিপাকনালিতে পরিপাক সংঘটিত হয়।	পরিপাকনালির লুমেন থেকে অন্ত্রের ভিলাইয়ের মাধ্যমে রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং লসিকাতন্ত্রে গমন করে।
৪। অংশগ্রহণকারী	বিভিন্ন গ্রন্থি নিঃসৃত রস পরিপাক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত।	ব্যাপন, সক্রিয় ও নির্বাচিত পরিবহন পরিশোষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

2020/8/4 13:02
Scanned with CamScanner

পরিপাকস্থল	পরিপাক গ্রন্থি ও পরিপাক রস	পরিপাকরসের এনজাইম	প্রভাবিত খাদ্যের নাম	সরলীকৃত উপাদান উৎপন্ন বস্তু
মুখবিবর	লালাগ্রন্থি নিঃসৃত 'লালারস'	**কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী**		
		১. টায়ালিন	স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন	মল্টোজ
		২. মল্টেজ (অল্পমাত্রায়)	মল্টোজ	গ্লুকোজ
পাকস্থলী	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত 'পাকরস'	**প্রোটিন পরিপাককারী**		
		১. পেপসিন	প্রোটিন	প্রোটিওজ ও পেপটোন
		২. জিলেটিনেজ	জিলেটিন	পেপটোন ও পলিপেপটাইড
		৩. রেনিন	দুগ্ধ কেসিন	প্যারাকেসিন
		লিপিড পরিপাককারী		
		১. লাইপেজ	লিপিড	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল
ক্ষুদ্রান্ত্র	অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত 'অগ্ন্যাশয় রস'	**প্রোটিন পরিপাককারী**		
		১. ট্রিপসিন	প্রোটিওজ ও পেপটোন	পলিপেপটাইড
		২. কাইমোট্রিপসিন	প্রোটিওজ ও পেপটোন	পলিপেপটাইড
		৩. কার্বোক্সিপেপটাইডেজ	পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজ	সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিড
		৪. অ্যামিনোপেপটাইডেজ	পলিপেপটাইড	অ্যামিনো এসিড
		৫. ট্রাইপেপটাইডেজ	ট্রাইপেপটাইড	অ্যামিনো এসিড
		৬. ডাইপেপটাইডেজ	ডাইপেপটাইড	অ্যামিনো এসিড
		৭. কোলাজিনেজ	কোলাজেন	সরল পেপটাইড
		শর্করা পরিপাককারী		
		১. অ্যামাইলেজ	স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন	মল্টোজ
		২. মল্টেজ	মল্টোজ	গ্লুকোজ
		লিপিড পরিপাককারী		
		১. লাইপেজ	চর্বি (লিপিড)	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল
		২. ফসফোলাইপেজ	ফসফোলিপিড	ফ্যাটি এসিড
		৩. কোলেস্টেরল এস্টারেজ	কোলেস্টেরল এস্টার	ফ্যাটি এসিড
	আন্ত্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত মেমব্রেন এনজাইমসমূহ	**প্রোটিন পরিপাককারী**		
		১. অ্যামিনোপেপটাইডেজ	পেপটাইড অণু	অ্যামিনো এসিড
		লিপিড পরিপাককারী		
		১. লাইপেজ	ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইড	মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড
		২. অ্যালকালাইন ফসফেটেজ	ফসফোলিপিড	গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড, ফসফোরিক এসিড এবং এদের বেস (যেমন- কোলিন)
		কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী		
		১. ল্যাক্টেজ	ল্যাক্টোজ	গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ
		২. মল্টেজ	মল্টোজ	গ্লুকোজ
		৩. সুক্রেজ	সুক্রোজ	গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ
		৪. অ্যামাইলেজ	স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন	সরল শর্করা
		নিউক্লিক এসিড পরিপাককারী		
		১. নিউক্লিয়েডেজ	নিউক্লিক এসিড	মনোনিউক্লিওটাইড
		২. নিউক্লিওটাইডেজ	নিউক্লিওটাইড	নিউক্লিওসাইড ও ফসফেট গ্রুপ
		৩. নিউক্লিওসাইডেজ	নিউক্লিওসাইড	পেন্টোজ সুগ্যার ও নাইট্রোজেন বেস

2020/8/4 13:02

Scanned with CamScanner

শোষিত খাদ্যসার পরিবহন (Transportation of Absorbed Nutrients)

পরিপাকনালিতে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যসার অন্ত্রের ভিলাসের কোষ কর্তৃক শোষিত হয়। ভিলাসের অভ্যন্তরে **কৈশিক জালক** (capillaries) এবং **ল্যাকটিয়েল** (lacteal) থাকে। গ্লুকোজ ও অ্যামিনো এসিড ভিলাসের কোষ থেকে ব্যাপনের মাধ্যমে কৈশিকনালিতে আসে। অতঃপর এরা হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে আসে এবং যকৃৎ থেকে হৃৎপিণ্ড হয়ে শরীরের বিভিন্ন কোষে পরিবাহিত হয়। চর্বি ও ফ্যাটি এসিড ভিলাসের কোষ থেকে ল্যাকটিয়েলে প্রবেশ করে। এ সময়ে ল্যাকটিয়েল সাদা দেখায়। ল্যাকটিয়েল থেকে এরা থোরাসিক লসিকানালির (thoracic lymphatic canal) মাধ্যমে বাহিত হয়ে শিরাতন্ত্রের রক্তপ্রবাহের সঙ্গে যকৃৎ হয়ে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছায়।

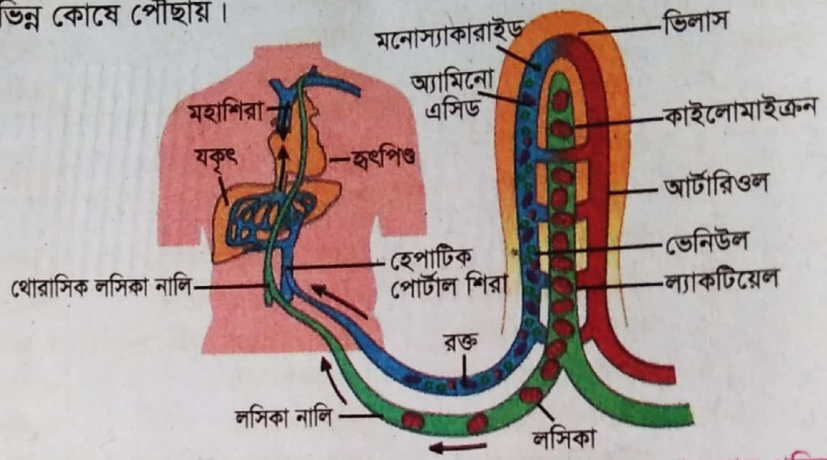

চিত্র ৩.১১গ : অন্ত্রের প্রাচীর (ভিলাই) থেকে রক্তনালির মাধ্যমে দেহে খাদ্যসার পরিবহন

শোষিত খাদ্যসারের পরিণতি (Fate of Absorbed Nutrients)

অ্যামিনো এসিড : অ্যামিনো এসিড কোষে গৃহীত হয়ে এনজাইমের সহায়তায় প্রোটিন গঠনে ব্যবহৃত হয়। অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে পরিবর্তিত হয়ে একদিকে ইউরিয়া এবং অন্যদিকে শর্করা বা চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। ইউরিয়া বর্জ্য পদার্থ, শর্করা বা চর্বি শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

গ্লুকোজ : গ্লুকোজ থেকে কোষে শক্তি উৎপন্ন হয়। কিছু গ্লুকোজ অন্যান্য বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে প্রোটোপ্লাজমের মেটালিক উপাদান গঠন করে এবং কিছু গ্লুকোজ যকৃৎ ও পেশিতে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে।

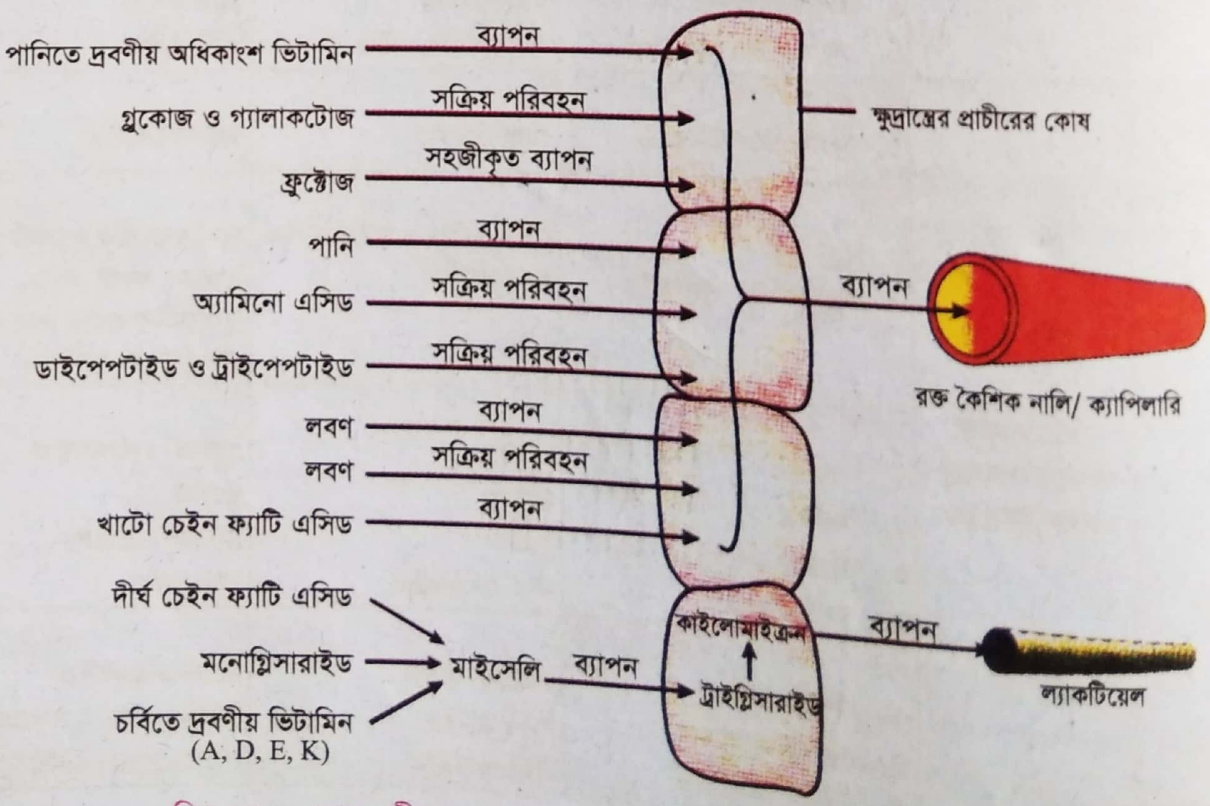

চিত্র ৩.১২ : অন্তঃপ্রাচীরের মাধ্যমে হজমকৃত খাদ্যসারের শোষণ ও পরিবহন

2020/8/4 13:0
Scanned with CamScanner

ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল : ফ্যাটি এসিডের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রাণী নিজ দেহের উপযোগী চর্বি তৈরি করে। কিছু ফ্যাটি এসিড প্লাজমামেমব্রেন ও নিউক্লিয়ারমেমব্রেন গঠনে ব্যবহৃত হয়। চর্বির শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা গ্লুকোজের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

❐ শোষিত খাদ্যসারের পরিবহন ও পরিণতির প্রবাহচিত্র :

১. গ্লুকোজ —সক্রিয় পরিবহন→ অন্ত্রের ভিলাস → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃৎ → হৃৎপিণ্ড → কোষ → শক্তি উৎপাদন

২. অ্যামিনো এসিড —সক্রিয় পরিবহন→ অন্ত্রের ভিলাস → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃৎ → হৃৎপিণ্ড → কোষ → দৈহিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ

৩. ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল —সক্রিয় পরিবহন→ অন্ত্রের ভিলাস → ল্যাকটিয়েল → থোরাসিক লসিকা নালি → শিরাতন্ত্র → যকৃৎ → হৃৎপিণ্ড → কোষ → শক্তি সঞ্চয়

৩.৭ বৃহদন্ত্রের কাজ (Functions of Large Intestine)

মানুষের পৌষ্টিকনালির ইলিয়ামের শেষপ্রান্ত হতে শুরু করে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে **বৃহদন্ত্র** বলে। এটি মোটা, নলাকৃতির ও খাঁজযুক্ত। এর দৈর্ঘ্য ১.৫-২.০ মিটার এবং প্রস্থ ৪-৭ সেন্টিমিটার। এটি তিন অংশে বিভক্ত। সম্মুখের জিজুনাম সংলগ্ন স্ফীত গোলাকৃতির অংশকে **সিকাম** (caecum), মধ্যবর্তী 'U' আকৃতির বৃহৎ অংশকে **কোলন** (colon) এবং পশ্চাতের পায়ু সংলগ্ন থলে আকৃতির অংশকে **মলাশয়** (rectum) বলে। সিকামের সাথে একটি বদ্ধ ধরনের থলি যুক্ত থাকে। একে **অ্যাপেনডিক্স** (appendix) বলে। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে অ্যাপেনডিক্সের প্রদাহ সৃষ্টি হলে একে **অ্যাপেনডিসাইটিস** (appendicitis) বলে। **বৃহদন্ত্রে কোনো পাচক রস ক্ষরিত হয় না বলে এখানে খাদ্যের পরিপাক ঘটে না।** কিন্তু এই অংশে মিউকাসসহ এক প্রকার জলীয় তরল নির্গত হয়। বৃহদন্ত্র বিভিন্ন প্রকার কাজ করে থাকে। নিচে মানুষের বৃহদন্ত্রের প্রধান কাজগুলো উল্লেখ করা হলো–

১। খাদ্যের অসার অংশ সঞ্চয় : খাদ্যের অপাচ্য অংশ সাময়িকভাবে বৃহদন্ত্রে সঞ্চিত থাকে। ইলিয়াম থেকে অপরিপাককৃত খাদ্যবস্তু পানিসহ সিকামের মাধ্যমে কোলনে আসে। অপাচ্য খাদ্যবস্তু এখানে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা থাকে।

২। ক্ষরণ : বৃহদন্ত্রের মিউকোসা স্তরে **গবলেট কোষ** মিউকাস ক্ষরণ করে এবং বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তরকে পিচ্ছিল রাখে।

৩। শোষণ : খাদ্যের অপাচ্য অংশের প্রায় শতকরা ৭০-৮০ ভাগ পানি বৃহদন্ত্রের কোলন দ্বারা পুনঃশোষিত হয়। এ ছাড়া গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, অজৈব লবণ, ফলিক এসিড, ভিটামিন-K এবং ভিটামিন-B এখানে শোষিত হয়।

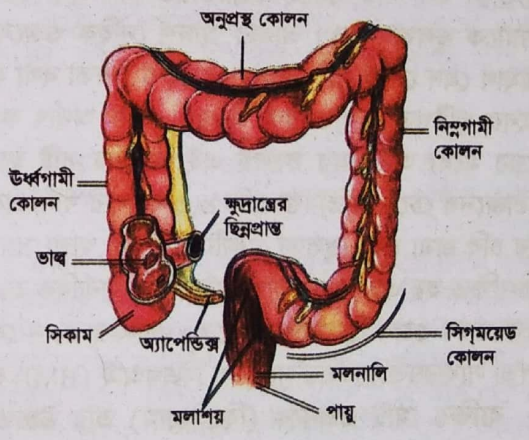

চিত্র ৩.১৩ : মানুষের বৃহদন্ত্র

৪। মল উৎপাদন : বৃহদন্ত্রে পানি, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, লবণ ইত্যাদি শোষণের পর ৩৫০ গ্রাম **তরল মণ্ড** (chyle) থেকে ১৩৫ গ্রাম **আর্দ্র মল** (faeces) উৎপন্ন হয়।

৫। ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া : বৃহদন্ত্রে অনেক মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া (প্রায় ৫০০ প্রজাতি) থাকে। এরা খাদ্যের অপাচ্য অংশের গাঁজন ও পাচন ঘটায়। ব্যাকটেরিয়া বৃহদন্ত্রে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ও অপাচ্য পলিস্যাকারাইডকে গাঁজন প্রক্রিয়ায় ভেঙে অ্যাসিটিক এসিড, প্রোপাওনিক এসিড, বিউটারিক এসিড ইত্যাদি ক্ষুদ্র শিকল ফ্যাটি এসিড

2020/8/4 13:02
Scanned with CamScanner

(short-chain fatty acids-SCFAs) উৎপন্ন করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন ও মিথেন গ্যাস মুক্ত করে। ক্ষুদ্র শিকল ফ্যাটি এসিড ব্যাকটেরিয়া এবং কোলনের প্রাচীরের কোষে শক্তি জোগায়। বৃহদন্ত্রে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ফলিক এসিড, ভিটামিন-K এবং ভিটামিন-B_{12} উৎপন্ন করে।

৬। সঞ্চালনমূলক কাজ : বৃহদন্ত্রের ক্রমসংকোচনের ফলে কোলন, পেলভিক কোলন ও মলাশয় হতে অর্ধকঠিন মল পায়ু পথে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

মলত্যাগ (Defecation)

যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে মলাশয় থেকে পায়ুপথে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে মলত্যাগ বা মল নির্গমন বা ডেফিকেশন বা ইজেসশন বলে।

খাদ্যের অপাচ্য, অশোষিত, পুষ্টিমূল্যহীন খাদ্য বস্তুকে **রাফেজ** (Roughage) বলে। এই রাফেজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় মলে পরিণত হয়। বৃহদন্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত মিউকাস **লুব্রিক্যান্ট** (lubricant) রূপে কাজ করে ফলে মল নির্গমন সহজ হয়। মল বৃহদন্ত্রে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা থাকে। এই সময় বাক্যটেরিয়া দ্বারা মল পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

মল মলাশয়ে প্রবেশ করলে মলাশয়ের প্রাচীরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা থেকে **ডেফিকেশন প্রতিবর্তী** (defecation reflex) ঘটে। ফলে কোলনে পেরিস্টালসিস শুরু হয় এবং মলকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। উদর পেশি এবং ডায়াফ্রামের ঐচ্ছিক সংকোচনের ফলে পায়ুনালির ভেতরে স্ফিংটার পেশি শিথিল হয় এবং মল পায়ু পথে দেহের বাইরে বের হয়ে আসে। সুস্থ স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক মানুষ সাধারণত দিনে একবার কিংবা দুবার, আর শিশুরা একাধিকবার মল ত্যাগ করে।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৩.৮ স্থূলতা (Obesity)

ইংরেজি Obesity শব্দটি ল্যাটিন শব্দ *obesitus* থেকে উদ্ভূত, যার আভিধানিক অর্থ মোটা। স্থূলতা বলতে বোঝায় দেহে অতিরিক্ত মেদ সঞ্চয়। অন্যভাবে বলা যায়, **দেহে মাত্রাতিরিক্ত চর্বি জমা হয়ে অস্বাভাবিকভাবে মুটিয়ে যাওয়াকে স্থূলতা বলে।** আবার **আদর্শ দৈহিক ওজনের ২০% বা তারও বেশি পরিমাণ মেদ দেহে সঞ্চিত হলে তাকেও স্থূলতা বলা হয়।** এটি প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের পুষ্টিগত অস্বাভাবিক অবস্থা। শক্তি অর্থাৎ ক্যালরি গ্রহণ এবং ক্যালরি ব্যয়ের মধ্যে অসাম্যের ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত প্রতি ৯.৩ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণের ফলে শরীরে ১ গ্রাম করে চর্বি জমা হয়। স্থূলতা একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি সাধারণত ৩০-৪০ বছর বয়সের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং মধ্যবয়সে ওজন বৃদ্ধি সর্বাধিক হয়। দেহের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিপাকীয় চাহিদা ও শক্তিগ্রহণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন ওজন স্থিতাবস্থায় থাকে। একবার ওজন বেড়ে গেলে ৬৫ বছর বয়সের আগে সহজে হ্রাস পায় না। বিশ্বব্যাপী স্থূলতা সাধারণত দেহভর সূচক বা বিএমআই (BMI) দ্বারা নিরূপণ করা হয়।



চিত্র ৩.১৪ : একজন স্থূলতাসম্পন্ন ব্যক্তি

ব্যক্তির মোট ওজনকে (কিলোগ্রাম) তার উচ্চতার (মিটার) বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে দেহভর সূচক বা বডি মাস ইনডেক্স বা **BMI** (Body Mass Index) **বলে।** নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে BMI নির্ণয় করা যায়।

$$\text{BMI} = \frac{\text{দেহের ওজন (Kg)}}{\text{দেহের উচ্চতা (m)}^2}$$

অর্থাৎ বিএমআই = কিলোগ্রাম/বর্গমিটার ($BMI = Kilograms/meters^2$)। এ হিসেবে 1.25 মিটার (125 সেন্টিমিটার) উচ্চতা ও 55 কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির BMI হচ্ছে প্রায় 35.20। একজন স্বাভাবিক মানুষের BMI-এর বিস্তৃতি হলো 25 – 29.9 পর্যন্ত অর্থাৎ এই মান 30 বা তার চেয়ে বেশি হলে তাকে **স্থূলকায় বা মোটা** বলা যাবে।

2020/8/4 13:03

Scanned with CamScanner

পাশাপাশি এই মান 18.5 এর নিচে হলে তাকে নিম্নমাত্রার ওজন ধরা হয়। তবে মাত্রা যদি 50 – 100 হয় তবে এই স্থূলতাকে **মরবিড স্থূলতা** (morbid obesity) বা **ব্যাধিগ্রস্ত বীভৎস স্থূলতা** বলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO) 2000 সালে BMI-এর যে মান নির্দেশিকা প্রকাশ করে তা দিয়ে খুব সহজেই মানুষের স্থূলতা নির্ণয় করা যায়।

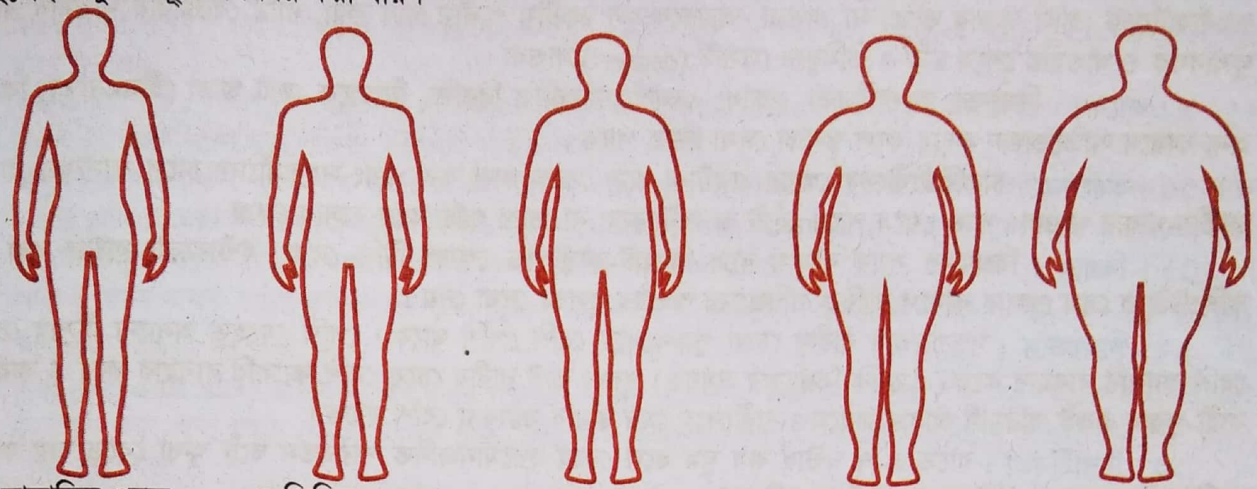

চিত্র ৩.১৫ : BMI নির্ণয়

BMI-এর মান নির্দেশিকাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
১	$< 18.5\ kg/m^2$	শরীরের ওজন কম (Under weight)
২	$18.5 – 24.9\ kg/m^2$	স্বাভাবিক ওজন (Normal weight)
৩	$25.0 – 29.9\ kg/m^2$	অতিরিক্ত ওজন (Over weight)
৪	$30.0 – 34.9\ kg/m^2$	১ম শ্রেণির স্থূলতা (Class I obesity)
৫	$35.0 – 39.0\ kg/m^2$	২য় শ্রেণির স্থূলতা (Class II obesity)
৬	$\geq 40.0\ kg/m^2$	৩য় শ্রেণির ঝুঁকিপূর্ণ স্থূলতা (Class III obesity)

স্থূলতার কারণে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের সৃষ্টি হতে পারে। ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি শাখাও সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে **বেরিয়াট্রিকস** (bariatrics) বলে।

স্থূলতার কারণ (Causes of obesity)

১। **অভ্যাসগত বিষয়** (Behavioural factors) : বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থূলতার প্রধান কারণ কর্মতৎপরতা হ্রাস। এছাড়া অতিরিক্ত স্নেহজাতীয় খাদ্য গ্রহণ, শক্তিবহুল (energetic) খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ, মদ্যপান ইত্যাদি ওজন বৃদ্ধির কারণ।

২। **জিনগত বিষয়** (Genetic factors) : একটি মাত্র জিনগত ত্রুটির ফলে সৃষ্ট স্থূলতা কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মেলানোকর্টিন-রিসেপ্টরের মিউটেশন, **প্রোডার উইলি সিনড্রোম** (এক প্রকার জিনগত রোগ। এর লক্ষণগুলো হলো অস্বাভাবিক চালচলন, লক্ষণীয় স্থূলতা, মানসিক বিকলতা ইত্যাদি) এবং **লেপটিন** (এক ধরনের হরমোন যা দৈহিক ওজন নিয়ন্ত্রণ করে) জিনের মিউটেশন। স্থূলকায় বাবা-মায়ের সন্তান প্রায় ৮০% ক্ষেত্রে স্থূলকায় হয়।

৩। **ওষুধের প্রভাব** (Certain medication) : স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ (কার্টিকোস্টেরয়েডস), এন্টিডিপ্রেসেন্ট (অবসন্ন দূর করার ওষুধ), জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি ইত্যাদি সেবন অনেক সময় দৈহিক স্থূলতার সৃষ্টি করে। তাছাড়া ইনসুলিন ও কিছু ডায়াবেটিক প্রতিষেধক ওষুধও স্থূলতা সৃষ্টি করে।

৪। **অসুস্থতা** (Sickness) : **পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম** (Polycystic ovary syndrome) হলে নারীর দেহে স্থূলতা দেখা দেয়। এ ছাড়া **কুসিং সিনড্রোম** (Cushing syndrome), **হাইপারথাইরয়েডিজম** (Hyperthyroidism) হলেও স্থূলতা সৃষ্টি হতে পারে।

৫। **গর্ভাবস্থা** (Pregnancy) : গর্ভাবস্থায় একজন মহিলার স্বভাবতই ওজন বাড়ে; কিন্তু সন্তান প্রসবের পরও অনেক মহিলা সেই বাড়তি ওজন কমাতে পারে না, ফলে স্থূলতা বাড়ে।

৬। **বংশগত কারণ** (Genetic cause) : একই পরিবারের বিভিন্ন জনুর সদস্যদের মাঝে ধারাবাহিক স্থূলতা বিরাজ করে। এমনকি যমজ ভাইবোনদের ক্ষেত্রেও এর তারতম্য হয় না। কারণ এদের মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় সেটি জিন নিয়ন্ত্রিত।

2020/8/4 13:03

Scanned with CamScanner

৭। মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) বিষয় ও মানসিক আঘাত : অনেক সময় মনস্তাত্ত্বিক বিষয় ও মানসিক আঘাতের কারণেও স্থূলতার সৃষ্টি হয়।

৮। পারিবারিক জীবনযাত্রা : পরিবারের জীবনযাত্রার উপর স্থূলতা প্রকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। খাদ্যাভ্যাস পারিবারিকভাবেই গড়ে ওঠে। চর্বিযুক্ত ফাস্টফুড (বার্গার, পিৎজা ইত্যাদি) খাওয়া, ফল, সবজি ও অপরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট (লাল চালের ভাত) না খাওয়া, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান করা, দামি রেস্তোরাঁয় খাওয়ার আগে ক্ষুধাবর্ধক ও খাওয়ার শেষে চর্বি ও চিনিযুক্ত ডেসার্ট (dessert) খাওয়া।

৯। আবেগ : বিষণ্নতা, আশাহীনতা, ক্রোধ, একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তি, নিজেকে ছোট ভাবা (হীনমন্যতা) কিংবা অন্য কারণে অতিভোজন করার ফলে স্থূলতা দেখা দিতে পারে।

১০। কর্মক্ষেত্র : চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে একটানা বসে থেকে কাজ করা এবং সহকর্মীদের চাপে ফাস্টফুড বা এ জাতীয় খাবার খাওয়া। কাজ শেষে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে না চেপে গাড়ি করে বাসায় ফেরা।

১১। বিশ্রাম : বিশ্রামের সময় বাসায় বসে রিমোট-কন্ট্রোলড কেবল টিভি দেখা, ইন্টারনেট ব্রাউজ করা বা কম্পিউটারে গেম খেলার কারণে কায়িক পরিশ্রমের অভাবে স্থূলতা দেখা দেয়।

১২। লিঙ্গভেদে : গড়পরতায় নারীর চেয়ে পুরুষদেহে বেশি পেশি থাকে। পেশি যেহেতু অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে (এমনকি বিশ্রামের সময়ও) পুরুষ তাই নারীর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে এ কারণে নারী-পুরুষ একই পরিমাণ আহার করলেও নারীদেহে মেদ জমার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

১৩। নিদ্রাহীনতা : রাতে ৬-৭ ঘণ্টার কম ঘুম হলে দেহে হরমোনজনিত পরিবর্তন ঘটে ক্ষুধা বেড়ে যায় ফলে বেশি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করায় স্থূলতার সৃষ্টি হয়।

১৪। শিক্ষার অভাব : সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা, সুষম খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, স্থূলতার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে না জানা ইত্যাদি কারণে স্থূলতা দেখা দেয়।

১৫। অন্যান্য কারণ (Other causes) : টিভি বা কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, দীর্ঘসময় অফিসিয়াল কাজ করা, হাঁটার পরিবর্তে গাড়ি ব্যবহার করা ওজন বৃদ্ধি বা স্থূলতার অন্যতম কারণ।

ওজন বৃদ্ধিজনিত বিভিন্ন সমস্যা : ওজন বৃদ্ধির ফলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে :

ডায়াবেটিস মেলিটাস (টাইপ-২), উচ্চ রক্তচাপ (hypertension), স্ট্রোক (stroke), করোনারি হৃদরোগ, গল স্টোন (gall stone), ক্যান্সারের প্রবণতা বৃদ্ধি (কোলন ও স্তন ক্যান্সার ইত্যাদি), যকৃৎ ও পিত্তথলির অসুখ, স্লিপ অ্যাপনিয়া (ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হওয়া), হাঁপানি (শ্বাস-প্রশ্বাসে ত্রুটি), হার্নিয়া, পায়ের শিরা ফুলে ওঠা (ভেরিকোসভেইন), ত্বক কালো হয়ে যাওয়া, ঋতুচক্রে ত্রুটি, বন্ধ্যত্ব, জরায়ুর সিস্ট, গিঁট বাত বা অস্টিওআর্থ্রাইটিস (অস্থিসন্ধির প্রদাহ) ইত্যাদি। স্থূলতার ফলে অনেকসময় মৃত্যু ঝুঁকিরও সম্ভাবনা দেখা যায়। সবচেয়ে বড় কথা দেহের ওজন উচ্চতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শারীরিক সৌন্দর্য বলতে কিছু থাকে না।

স্থূলতা থেকে পরিত্রাণের উপায় : একজন স্থূলতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্থূলতার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক বা ডায়েটিশিয়ান রোগীর ওজন, লিঙ্গ ও বয়সের কথা ভেবে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য তালিকা তৈরি করে দেবেন, যা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। সাধারণত শক্তি খরচের চেয়ে 600 Kcal কম শক্তিসম্পন্ন মাঝারি ধরনের খাবার নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে তা হলো–

১। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম বাড়াতে হবে।

২। টিভি বা কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা ও দীর্ঘসময় অফিসিয়াল কাজ করা যাবে না।

৩। স্ন্যাক ও মিষ্টি জাতীয় লোভনীয় খাবার পরিহার করতে হবে। অ্যালকোহল গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে।

৪। নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। প্রতিদিন একটানা ৩০ মিনিট হাঁটা প্রয়োজন, যা প্রতি মাসে ১ কেজি করে ওজন হ্রাস করে।

৫। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী Orlistat (Xenical), Suprenza (Phentermine), Lorcaserin (Belviq) ইত্যাদি ওষুধ ব্যবহার করলে স্থূলতা থেকে পরিত্রাণের ভালো ফল পাওয়া যায়।

৬। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন কিংবা ওষুধে স্থূলতা না কমলে প্রয়োজনে **ল্যাপারস্কোপি** (laparoscopy), **গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি, গ্যাস্ট্রিক স্লিভ** (gastric sleeve) ইত্যাদি **ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি** (bariatric surgery) করে স্থূলতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

❑ **কাজ :** (i) অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণই BMI বাড়ার একমাত্র কারণ নয়– ব্যাখ্যা কর। (ii) মানুষের শারীরিক সমস্যা শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিত অনুসরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। (iii) লিপিড জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলা উচিত– ব্যাখ্যা কর।

2020/8/4 13:0

Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

- ☑ **শারীরতত্ত্ব :** জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যাবলি (যেমন– পরিপাক, সংবহন, শ্বসন, রেচন, জনন, ক্ষরণ ইত্যাদি বিষয়াদি) আলোচনা করা হয় তাকে শারীরতত্ত্ব বা শারীরবিজ্ঞান বলে।
- ☑ **পরিপাক :** যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অদ্রবণীয়, কঠিন ও জটিল খাদ্য বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় তরল ও সরল খাদ্যে পরিণত হয়ে শোষণ ও আত্তীকরণের উপযোগী হয় তাকে পরিপাক বলে। মানুষের খাদ্য পরিপাকের প্রধান স্থান হলো ক্ষুদ্রান্ত্র।
- ☑ **যান্ত্রিক পরিপাক :** জটিল খাদ্যবস্তু দাঁত ও জিহ্বার সাহায্যে বা পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশির ক্রমসংকোচনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে এবং অর্ধ-তরল মণ্ডে পরিণত হওয়াকে যান্ত্রিক পরিপাক বলে।
- ☑ **রাসায়নিক পরিপাক :** মুখগহ্বরে অবস্থিত লালা গ্রন্থির লালারসের এনজাইম ও পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন পৌষ্টিকগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন এনজাইমের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে জটিল শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্য সরল ও কোষের গ্রহণ উপযোগী ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক পরিপাক বলে।
- ☑ **খাদ্য :** যেসব খাবার খেলে প্রাণিদেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে তাদেরই খাদ্য বলে।
- ☑ **সুষম খাদ্য :** যে খাদ্যে ৬টি খাদ্য উপাদানই (শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি) সঠিক পরিমানে বিদ্যমান এবং খাদ্য গ্রহণে কোনো ব্যক্তির বৃদ্ধি, পুষ্টি, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে তাকে সুষম খাদ্য বলে।
- ☑ **বোলাস :** মুখের মধ্যে চর্বিত খাদ্য লালারসের মাধ্যমে পরিপাকের পর যে পিচ্ছিল মণ্ড তৈরি হয় তাকে বোলাস বা গ্রাস বলে।
- ☑ **টায়ালিন :** লালাগ্রন্থির সেরাস কোষ নিঃসৃত স্যালিভারি অ্যামাইলেজকে টায়ালিন বলে। এটি সিদ্ধ শর্করাকে আংশিক পরিপাক করে।
- ☑ **গ্যাস্ট্রিক জুস :** পাকস্থলীর প্রাচীরের গ্রন্থি কোষ নিঃসৃত রসকে গ্যাস্ট্রিক জুস বলে।
- ☑ **কাইম :** পাকস্থলীতে বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের প্রভাবে খাদ্য পরিপাকের পর অম্ল সমন্বিত নরম পিচ্ছিল খাদ্যের যে পিণ্ড বা দানা তৈরি হয় তাকে কাইম বলে।
- ☑ **পেরিস্টালসিস :** যে ক্রমসংকোচন প্রক্রিয়ায় খাদ্য গলাধঃকরণের পর খাদ্যের দলা অন্ননালির মধ্য দিয়ে পাকস্থলীতে এসে পৌছায় তাকে **পেরিস্টালসিস** বলে।
- ☑ **পরিপাকগ্রন্থি :** যেসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে তাদের পরিপাকগ্রন্থি বা পৌষ্টিকগ্রন্থি বলে। মানবদেহের প্রধান পরিপাকগ্রন্থিগুলো হলো লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি।
- ☑ **মিশ্র গ্রন্থি :** যেসব গ্রন্থি বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত তাদের মিশ্রগ্রন্থি বলে। অথবা, মানবদেহের যে গ্রন্থি একাধারে এনজাইম নিঃসরণ ও হরমোন ক্ষরণ করে তাকে মিশ্রগ্রন্থি বলে। যেমন– অগ্ন্যাশয়।
- ☑ **গবলেট কোষ :** ক্ষুদ্রান্ত্রের বিশেষ ধরনের রূপান্তরিত ও শোষণ তল বৃদ্ধিকারী কোষ।
- ☑ **পিত্ত পাথুরী :** পিত্ত থলিতে পিত্ত লবণ বা পিত্ত রঞ্জক জমাট বেঁধে সৃষ্ট পাথুরী হলো পিত্ত পাথুরী।
- ☑ **মেমব্রেন এনজাইম :** অন্ত্রের প্রাচীরের ক্ষরণ কোষ থেকে যেসব এনজাইম উৎপন্ন হয়ে অন্ত্রের গহ্বরে নিঃসৃত না হয়ে অন্ত্রের মেমব্রেনের সঙ্গে লেগে থেকেই খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে তাদের মেমব্রেন এনজাইম বলে।
- ☑ **গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল হরমোন :** কয়েক প্রকার হরমোন দ্বারা খাদ্য পরিপাকের সকল প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব হরমোন পাকস্থলী ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয় এবং এরা রাসায়নিকভাবে পেপটাইড জাতীয়। সামগ্রিকভাবে এসব হরমোন গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল হরমোন বা **জিআই** হরমোন নামে পরিচিত।
- ☑ **জৈব রসায়নাগার :** যকৃৎ মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ পরিপাকগ্রন্থি। পরিপাকে অংশগ্রহণ ছাড়াও যকৃতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এজন্য যকৃৎকে মানবদেহের জৈব রসায়নাগার বা জীবনসমুদ্রের কর্মমুখর প্রোতাশ্রয় বলা হয়।
- ☑ **গ্লাইকোজেনেসিস :** যে প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হয় তাকে **গ্লাইকোজেনেসিস** বলে। প্রধানত যকৃৎ এবং পেশিতে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হয়।
- ☑ **গ্লাইকোজেনোলাইসিস :** যে পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ মুক্ত হয় তাকে গ্লাইকোজেনোলাইসিস বলে। এ প্রক্রিয়া প্রধানত যকৃতে সংঘটিত হয়। তবে বৃক্কেও অনেক সময় সংঘটিত হতে দেখা যায়।

2020/8/4 13:03

Scanned with CamScanner

☑ **গ্লুকোনিওজেনেসিস :** কার্বোহাইড্রেট ছাড়া অন্যান্য পদার্থ (অ্যামিনো এসিড, পাইরুভিক এসিড ইত্যাদি) থেকে গ্লুকোজ কিংবা গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় **গ্লুকোনিওজেনেসিস**। এ প্রক্রিয়া যকৃৎ, অস্থিকোষ ও বৃক্কে সংঘটিত হয়। একে **গ্লাইকোনিওজেনেসিসও** বলা হয়।

☑ **পিত্তলবণ :** কোলেস্টেরল বিপাকে সৃষ্ট গ্লাইকোকোলিক ও টরোকোলিক নামক পিত্ত এসিড দুটি সোডিয়াম লবণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট এবং সোডিয়াম টরোকোলেট নামক পিত্তলবণ তৈরি করে। পিত্তলবণদ্বয় ফ্যাটকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে (ইমালসিফিকেশন প্রক্রিয়ায়) ফ্যাট পরিপাকে সহায়তা করে।

☑ **ডিঅ্যামিনেশন :** যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো এসিড থেকে অ্যামিনো মূলক ($-NH_2$) অপসারিত হয় তাকে ডিঅ্যামিনেশন বলে। যকৃৎ অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড ডিঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে কিটো এসিড ও অ্যামিনো মূলক তৈরি করে।

☑ **অ্যাপেনডিক্স :** বৃহদন্ত্রের সিকাম থেকে প্রসারিত ক্ষুদ্র আঙুলের মতো নিষ্ক্রিয় অঙ্গ।

☑ **ইমালসিফিকেশন :** যে প্রক্রিয়ায় পিত্তরসে অবস্থিত পিত্ত লবণ (সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট ও সোডিয়াম টরোকোলেট) স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে তাকে ইমালসিফিকেশন বা অবদ্রবণ বলে।

☑ **পরিপাক স্নায়ু :** দুটি ভিন্ন ধরনের স্নায়ু মানুষের খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এদেরকে অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক বা ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস ও বহির্নিহিত স্নায়ুজালক বা এক্সট্রিনসিক প্লেক্সাস বলে।

☑ **শোষণ :** পরিপাকের ফলে উৎপন্ন সরল যৌগ যে প্রক্রিয়ায় অন্ত্রের কোষ আবরণী ভেদ করে রক্ত ও লসিকা প্রবাহে প্রবেশ করে তাকে শোষণ বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রেই খাদ্যবস্তুর চূড়ান্ত পরিপাক ও শোষণ ঘটে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই খাদ্যসার শোষণ করে। প্রায় ৯০% শোষণ ক্ষুদ্রান্ত্রে ঘটে। পাকস্থলীতে কিছু ওষুধ শোষিত হয়। বৃহদন্ত্রে বেশির ভাগ পানি শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে স্নেহ দ্রব্যের শোষণ দু'ভাবে সম্পন্ন হয়। যথা– **পোর্টাল শিরার** মাধ্যমে ও ভিলাসের কেন্দ্রীয় লসিকানালি বা **ল্যাকটিয়েলের** মাধ্যমে।

☑ **ল্যাকটিয়েল :** মানুষের পরিপাকনালির ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরগাত্রে অবস্থিত ভিলাস এর কেন্দ্রে একটি লসিকাবাহ থাকে, তাকে ল্যাকটিয়েল বলে। চর্বি ও ফ্যাটি এসিড ভিলাসের কোষ থেকে ল্যাকটিয়েলে প্রবেশ করে।

☑ **মাইসেলি :** উচ্চ ফ্যাটি এসিড অণু, মনোগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল ও ডাইগ্লিসারাইডগুলো অন্ত্র গহ্বরে পিত্তলবণের সাথে যুক্ত হয়ে যে স্নেহকণা গঠন করে তাকে মাইসেলি বলে।

☑ **কাইলোমাইক্রন :** ট্রাইগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত শোষণযোগ্য লিপোপ্রোটিন কণাকে কাইলোমাইক্রন বলে।

☑ **আত্তীকরণ :** যে প্রক্রিয়ায় শোষিত সরল খাদ্যবস্তু কোষের প্রোটোপ্লাজমের অংশীভূত হয় এবং শক্তি সরবরাহ, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে আত্তীকরণ বলে।

☑ **মলত্যাগ :** যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে মলাশয় থেকে পায়ুপথে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে মলত্যাগ বা মল নির্গমন বা ডেফিকেশন বা ইজেসশন বলে।

☑ **স্বাস্থ্য :** রোগ-ব্যাধি বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতিমুক্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলকর অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলে।

☑ **স্থূলতা :** দেহে মাত্রাতিরিক্ত চর্বি জমা হয়ে অস্বাভাবিকভাবে মুটিয়ে যাওয়াকে স্থূলতা বলে। অথবা আদর্শ দৈহিক ওজনের ২০% বা তারও বেশি পরিমাণ মেদ দেহে সঞ্চিত হলে তাকে স্থূলতা বলা হয়। স্থূলতার ফলে দেহের ওজন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়।

☑ **BMI :** কোনো ব্যক্তির মোট ওজনকে (কিলোগ্রাম) তার উচ্চতার (মিটার) বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে BMI (Body Mass Index) বলে। অর্থাৎ বিএমআই = কিলোগ্রাম/বর্গমিটার ($BMI = Kilograms/meters^2$)। অথবা পূর্ণবয়স্ক মানুষে দেহের মাত্রাতিরিক্ত ওজন নির্ধারণের জন্য উচ্চতা ও ওজনের যে আনুপাতিক হার উপস্থাপন করা হয় তাকে দেহের ওজন সূচক বা বা বডি মাস ইনডেক্স (Body Mass Index = BMI) বলে। একজন মানুষকে তখনই স্থূল বা মোটা বলা হয় যখন তার দেহের ইগও (Body Mass Index) 30 Kg/m^2 এর অধিক হয়।

☑ **বেরিয়াট্রিকস :** চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে বেরিয়াট্রিকস বলে।

2020/8/4 13:03

Scanned with CamScanner

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অশর্করা থেকে শর্করা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়? [রা. বো. ২০১৬]
ক গ্লুকোনিওজেনেসিস খ গ্লাইকোজেনেসিস
গ গ্লুকোজেনেসিস ঘ গ্লাইকোলাইসিস

২. ল্যাকটেজ এনজাইম কোন খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত? [য. বো. ২০১৬]
ক চর্বি খ ভিটামিন গ আমিষ ঘ শর্করা

৩. শর্করা যকৃতে সঞ্চিত হয় কী রূপে? [য. বো. ২০১৬]
ক গ্লুকোজরূপে খ গ্লিসারলরূপে
গ গ্লাইকোজেনরূপে ঘ সেলুলোজরূপে

৪. যকৃৎ গ্লুকোনিওজেনেসিস (Gluconeogenesis) প্রক্রিয়ায় কোন উৎস থেকে গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হয়? [কু. বো. ২০১৬]
ক অ্যামিনো এসিড ও গ্লিসারল
খ গ্লিসারল ও ফ্ল্যাট এসিড
গ ফ্যাটি এসিড ও গ্লাইকোজেন
ঘ গ্লাইকোজেন ও অ্যামিনো এসিড

৫. বৃহদন্ত্রের অংশ নিচের কোনটি? [চ. বো. ২০১৬]
ক ডিওডেনাম খ ইলিয়াম গ সিকাম ঘ জেজুনাম

৬. পাকস্থলী প্রাচীরের প্যারাটাইল কোষ থেকে নিঃসৃত হয় কোনটি? [চ. বো. ২০১৬]
ক পেপসিনোজেন খ HCl গ মিউসিন ঘ গ্যাস্ট্রিন

৭. নিচের কোনটি মিশ্র গ্রন্থি? [বরিশাল বোর্ড-২০১৬]
ক অগ্ন্যাশয় খ লালাগ্রন্থি গ যকৃৎ ঘ পিটুইটারি

৮. গলবিলে উন্মুক্ত হয় না কোনটি? [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
ক শ্বাসনালি খ অন্ননালি
গ ইউস্টেশিয়ান নালি ঘ উইর্সাং-এর নালি

৯. নিচের কোন এনজাইম অম্লীয় পরিবেশে অধিক কার্যকরী? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
ক ট্রিপসিন খ ইরেপসিন গ পেপসিন ঘ কাইমোট্রিপসিন

১০. ইউরিয়া প্রধানত তৈরি হয় কোথায়? [ঢাকা বোর্ড-২০১৭]
ক পাকস্থলীতে খ যকৃতে গ অগ্ন্যাশয়ে ঘ ক্ষুদ্রান্ত্রে

১১. দুধ দাঁতে অনুপস্থিত থাকে কোনটি? [ঢা. বো. ২০১৫]
ক ইনসিসর খ ক্যানাইন
গ প্রিমোলার ঘ মোলার

১২. ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ নয় কোনটি? [ঢা. বো. ২০১৫]
ক ডিওডেনাম খ সিকাম গ জেজুনাম ঘ ইলিয়াম

১৩. মানুষের কত জোড়া লালাগ্রন্থি থাকে? [কু. বো. ২০১৫]
ক এক জোড়া খ দুই জোড়া গ তিন জোড়া ঘ চার জোড়া

১৪. পিত্তরস ক্ষরিত হয় কোনটি থেকে? [ঢাকা বোর্ড-২০১৭]
ক লালাগ্রন্থি খ পাকস্থলীর গ যকৃৎ ঘ অগ্ন্যাশয়

১৫. 'কেসিন' কোন ধরনের উপাদান? [রা. বো. ২০১৫]
ক শর্করা খ প্রোটিন গ ফ্যাট ঘ ভিটামিন

১৬. ক্ষুদ্রান্ত্রের কোন স্তরে গবলেট কোষ থাকে? [য. বো. ২০১৫]
ক সেরোসা খ মিউকোসা
গ সাবমিউকোসা ঘ মাসকিউলারিস মিউকোসা

১৭. পরিপাকে সাহায্যকারী উৎসেচক কোনটি? [চ. বো. ২০১৫]
ক গ্লুকাগন খ এড্রিন্যালিন গ ইনসুলিন ঘ সিক্রেটিন

১৮. কোনটিকে মানবদেহের ল্যাবরেটরি বলা হয়? [বরিশাল বোর্ড-২০১৫]
ক যকৃৎ খ অগ্ন্যাশয় গ হৃৎপিণ্ড ঘ ফুসফুস

১৯. শরীরের সবচেয়ে বড় গ্রন্থির নাম কী? [য. বো. ২০১৯]
ক যকৃৎ খ অগ্ন্যাশয় গ থাইরয়েড ঘ পিটুইটারী

২০. কোন এনজাইম লালাগ্রন্থিতে পাওয়া যায়? [য. বো. ২০১৯]
ক ট্রিপসিন খ পেপসিন গ অ্যামাইলেজ ঘ টায়ালিন

২১. সুক্রেজ কী? [সিলেট বোর্ড-২০১৫]
ক অগ্ন্যাশয় রস খ আন্ত্রিক রস গ পিত্তরস ঘ গ্যাস্ট্রিক রস

২২. মানুষের অ্যাপেনডিক্স পরিপাক নালির কোন অংশের সাথে যুক্ত? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]
ক জেজুনাম খ ইলিয়াম গ সিকাম ঘ কোলন

২৩. গবলেট কোষ পাওয়া যায় কোন অঙ্গে? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]
ক ফুসফুস খ অন্ত্র গ অগ্ন্যাশয় ঘ যকৃৎ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৪. মলজাতীয় পদার্থ জমা থাকে– [ঢাকা বোর্ড-২০১৬]
i. মলাশয়ে ii. সিগময়েড কোলনে iii. পেলভিক কোলনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. শর্করা জাতীয় খাদ্য শোষণ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন– [সিলেট বোর্ড-২০১৬]
i. ইনসুলিন ii. গ্লুকোকর্টিকয়েড iii. থাইরক্সিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. প্রোটিন পরিপাকে অংশ নেয় কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
i. পেপসিন ii. অ্যামাইলেজ iii. কার্বোক্সিপেপটাইড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হয়– [রা. সি. বো. ২০১৯]
i. গ্যাস্ট্রিন ii. ইনসুলিন iii. ট্রিপসিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

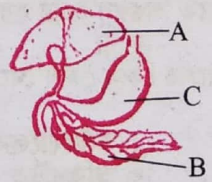

[ঢা. বো. ২০১৯]

২৮. A চিহ্নিত অঙ্গটি কয়টি খণ্ডাংশে বিভক্ত?
ক ৪ খ ৩ গ ২ ঘ ১

২৯. চিত্রের B অংশ হতে নিঃসৃত রসে পাওয়া যায়–
i. বিভিন্ন রঞ্জক ii. বিভিন্ন উৎসেচক iii. বিভিন্ন প্রাণরস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

2020/8/4 13:03
Scanned with CamScanner

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩০ ও ৩১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহিম সাহেব আরামপ্রিয় ব্যক্তি। তার উচ্চতা ১.৫ মিটার এবং ওজন ৬৫ কেজি। [কু. বো. ২০১৬]

৩০. উদ্দীপক অনুযায়ী রহিম সাহেবের BMI কত?
ক ২০ খ ২৩ গ ২৮ ঘ ৩২

৩১. তার জীবনচর্চায় কী পরিবর্তন করা উচিত?
i. নিয়মিত শরীরচর্চা ii. খাদ্য গ্রহণে
iii. ওষুধ গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩২ ও ৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও : [চ. বো. ২০১৬]

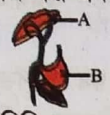

৩২. উদ্দীপকের 'B' চিহ্নিত অঙ্গে কোন জাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম থাকে?
i. শর্করা ii. আমিষ iii. স্নেহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. 'A' চিহ্নিত অঙ্গটি নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ–
i. গ্লাইকোজেন সঞ্চয় করে ii. তাপ উৎপাদন করে
iii. কোলেস্টেরল উৎপাদন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩৪ ও ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও : [ব. বো. ২০১৬]



৩৪. উদ্দীপকের চিত্রটি–
ক পাকস্থলীয় প্রস্থচ্ছেদ খ ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ
গ অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ ঘ যকৃতের অনুচ্ছেদ

৩৫. উদ্দীপকের চিত্রটির ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক খাদ্য সাময়িকভাবে জমা রাখে
খ খাদ্যকে অম্লীয় ভাবাপন্ন করে
গ খাদ্য পরিশোষণে সহায়তা করে
ঘ খাদ্যস্থিত ভিটামিন ও A ও D সঞ্চিত রাখে

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও : [সি. বো.২০১৬]



৩৬. উদ্দীপকের কোন অংশ হতে পিত্তরস তৈরি হয়?
ক P খ Q গ R ঘ S

৩৭. উদ্দীপকের R চিহ্নিত অংশের কোন কোষ থেকে লাইপেজ নিঃসৃত হয়?
ক আর্জেন্টাফাইন খ জাইমোজেন
গ এন্টরোক্রোমাফিন ঘ অক্সিনটিক

⏭ নিচের উদ্দীপকটির সাহায্যে ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩৮. উদ্দীপকের 'X' চিহ্নিত অংশ থেকে ক্ষরিত হয় না কোনটি? [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
ক পেপসিন খ ট্রিপসিন গ লাইপেজ ঘ অ্যামাইলেজ

৩৯. উদ্দীপকের 'Y' চিহ্নিত অংশটি– [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
i. ইনসুলিন ক্ষরণ করে ii. গ্লুকাগন ক্ষরণ করে
iii. ইনসুলিন ও গ্লুকাগন ক্ষরণ বন্ধ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি থেকে ৪০ ও ৪১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিক্ষক বললেন যে, পরিপাকতন্ত্রে এমন একটি অঙ্গ আছে যা HCl ক্ষরণ করে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করলেও নিজে কখনও পরিপাক হয় না। [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৫]

৪০. উদ্দীপকের অঙ্গটি কোন স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?
ক অকুলোমোটর খ অপথ্যালমিক
গ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল ঘ ভেগাস

৪১. উদ্দীপক অঙ্গের কোন কোষ থেকে HCl ক্ষরিত হয়?
ক অক্সিনটিক কোষ খ মিউকাস কোষ
গ আর্জেন্টাফিন কোষ ঘ জাইমোজেনিক কোষ

⏭ উদ্দীপকটি পড় এবং ৪২ ও ৪৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাজিবের ওজন ৫০ কেজি ও উচ্চতা ১.২ মিটার। স্থূলতার কারণে সে শুধুমাত্র সবজি দিয়ে ভাত খায়। কথাটি শুনে ডাক্তার বললেন মাঝে মধ্যে মাছ-মাংসও খেতে হবে, তাতে আমিষের চাহিদা পূরণ হবে। [চ. বো. ২০১৫]

৪২. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডাক্তারের নির্দেশিত খাবারসমূহ কীভাবে রাজিবের শরীর গঠনে সাহায্য করে?
ক অ্যামাইনো এসিড সৃষ্টির মাধ্যমে
খ বেশি রক্ত উৎপাদনের মাধ্যমে
গ প্রচুর স্নেহযুক্ত খাবারের কারণে
ঘ প্রচুর শর্করাযুক্ত খাবারের কারণে

৪৩. রাজিবের দেহ ভর সূচক (Body Mass Index) কোনটি?
ক ৩১ খ ৩২ গ ৩৩ ঘ ৩৪

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৪৪ ও ৪৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

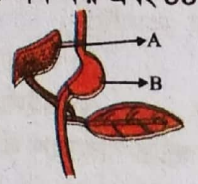

[সি. বো. ২০১৫]

৪৪. উদ্দীপকের "B" অংশে কী উৎপন্ন হয়?
ক ট্রিপসিন এনজাইম খ মল্টেজ এনজাইম
গ টায়ালিন এনজাইম ঘ রেনিন এনজাইম

৪৫. উদ্দীপকের "A" অংশের কাজ হলো–
i. ভিটামিন A ও D তৈরি ii. ফাইব্রিনোজেন তৈরি
iii. প্রোথম্বিন তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি দেখে ৪৬ ও ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৪৬. উল্লেখিত চিত্রটির 'A' অঙ্গের অন্তঃক্ষরা অংশ থেকে নিঃসৃত পদার্থ কোনটি? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]
ক থাইরক্সিন খ প্রোল্যাকটিন গ অ্যাড্রেনালিন ঘ ইনসুলিন

৪৭. প্রদর্শিত গ্রন্থিটির অন্তঃক্ষরা অংশ থেকে নিঃসৃত পদার্থের কাজ কী? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]
ক রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস করে
খ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে
গ রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হ্রাস করে
ঘ রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি করে

2020/8/24 13:03
Scanned with CamScanner

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৮ ও ৪৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও : সালামের বয়স ১৬ বৎসর। তার দৈহিক ওজন ৫৫ কেজি ও উচ্চতা ১.২৫ মিটার। [সকল বোর্ড ২০১৮]

৪৮. সালামের BMI এর মান কত হবে?
ক ২৭.৯৮ খ ৩২.৯৮ গ ৩৫.২০ ঘ ৩৭.৯৮

৪৯. WHO এর মতে সালাম BMI নির্দেশিকার কোন শ্রেণিতে পড়ে?
ক অতিরিক্ত ওজন খ স্থূলতার ২য় স্তর
গ স্বাভাবিক ওজন ঘ স্থূলতার ৩য় স্তর

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫০. একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের নিচের চোয়ালে মোলার দাঁতের সংখ্যা কত? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক ২টি খ ৪টি গ ৩টি ঘ ৬টি

৫১. প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের নিচের চোয়ালে দন্ত কুঠরীর সংখ্যা কত? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক ৩২টি খ ১২টি গ ১৬টি ঘ ৮টি

৫২. মোলার দাঁতের কাজ কোনটি? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক খাবার টুকরা করা ও ছেঁড়া
খ খাবার টুকরা করা ও পেষণ করা
গ খাবার চর্বন করা ও পেষণ করা
ঘ খাবার ছেঁড়া ও চর্বন করা

৫৩. একজন ৬ বছরের বালিকার দাঁতের সংকেত (ICPM) কোনটি? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক $I_2C_1P_2M_3$ খ $I_2C_1P_0M_2$ গ $I_2C_2P_1M_0$ ঘ $I_2C_0P_1M_2$

৫৪. কোনটি ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ নয়? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক ডিওডেনাম খ ইলিয়াম গ এপেনডিক্স ঘ জেজুনাম

৫৫. মাইক্রোভিলাইগুলো একত্রিতভাবে ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিভাগে কী সৃষ্টি করে? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক লুমেন খ ব্রাশ বর্ডার
গ পাইলোরিক স্ফিংক্টার ঘ মিউকোসাল ফোল্ড

৫৬. মানুষের ক্ষেত্রে নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ১২-১৩, ০৮-০৯]
ক প্যারোটিড গ্রন্থি একটি লালাগ্রন্থি
খ পূর্ণ বয়স্ক মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসেবে শরীরে থাকে
গ জিহবার পিছনের অংশের স্বাদকোরক মিষ্টতা অনুভবে সাহায্য করে
ঘ গলনালি প্রায় ২৫ সেমি. লম্ব

৫৭. এপেনডিক্স নিম্নের কোনটির অংশ? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক রেকটাম খ সিকাম গ ডিওডেমান ঘ সিগময়েড কোলন

৫৮. কোন উক্তিটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক মানুষের পিত্তথলি কোন গ্রন্থি নয়
খ লালাগ্রন্থিগুলো সনালি গ্রন্থি
গ ডিওডেনাম পাকস্থলীর একটির অংশ
ঘ দুধ দাঁতে অগ্রপেষণ দাঁত থাকে না

৫৯. স্থায়ী দাঁতের দন্ত সংকেত নিম্নের কোনটি? [ডেন্টাল : ০৮-০৯, ০৪-০৫]
ক $\frac{I_1C_2Pm_3M_2}{I_2C_2Pm_3M_2}$ খ $\frac{I_2C_1Pm_2M_3}{I_2C_1Pm_2M_3}$
গ $\frac{I_2C_1Pm_3M_2}{I_2C_1Pm_3M_2}$ ঘ $\frac{I_2C_1M_3\ Pm_2}{I_2C_1\ M_3Pm_2}$

৬০. নিম্নের কোনটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মোলার দাঁতের মোট সংখ্যা? [ডেন্টাল : ০৭-০৮]
ক 3 খ 6 গ 8 ঘ 12

৬১. মানুষের জিহ্বার অগ্রভাগে কোন ধরনের স্বাদকোরক (Taste bud) থাকে? [মেডিকেল : ০৬-০৭]
ক মিষ্টতা খ লবণাক্ত গ তিক্ততা ঘ টক

৬২. নিম্নের কোনটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক লালারসে টায়ালিন ও মল্টেজ থাকে
খ পাকস্থলীর যে অংশে অন্ননালি উন্মুক্ত হয় তা পাইলোরাস
গ যকৃৎ দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি
ঘ ডিওডেনাম 25-30 সেমি লম্বা

৬৩. কোন অংশটি বৃহদন্ত্রের? [ডেন্টাল : ০০-০১]
ক ইলিয়াম খ ডিওডেনাম গ জেজুনাম ঘ সিকাম

৬৪. কোনটি লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় না? [মেডিকেল : ১৩-১৪]
ক মিউসিন খ টায়ালিন গ লিউসিন ঘ মলটেজ

৬৫. লালারসে নিম্নের কোন এনজাইমটি থাকে? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক প্রোটিওজ খ লাইপেজ গ টায়ালিন ঘ পেপসিন

৬৬. টায়ালিন ও মল্টেজ কোন রসে পাওয়া যায়? [মেডিকেল : ০৬-০৭]
ক আন্ত্রিক খ পাকস্থলী গ লালা ঘ অগ্ন্যাশয়

৬৭. মানুষের যকৃতের বাহিরের দিকে আবৃতকারী পর্দার নাম কী? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক বোম্যান্স ক্যাপসুল খ স্প্লিনিক ক্যাপসুল
গ রেনাল ক্যাপসুল ঘ গ্লিসনস ক্যাপসুল

৬৮. মানুষের যকৃতে অবস্থানকারী ম্যাক্রোফেজের নাম কী? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক মনোসাইট খ কুপফার কোষ
গ সাইনাস হিস্টোসাইট ঘ নিউট্রোফিল

৬৯. মানব পিত্তরস সম্বন্ধে নিচের কোন তথ্যটি সঠিক? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক এটি অম্লীয় তরল খ এনজাইম সমৃদ্ধ
গ পাকস্থলীতে পরিপাকে সহায়তা করে
ঘ যকৃতে তৈরি হয়

৭০. Kupffer's cell থাকে কোথায়? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক প্লীহা খ মস্তিষ্ক গ যকৃৎ ঘ অগ্ন্যাশয়

৭১. মানুষের যকৃতের সবচেয়ে বড় খন্ডাংশটি হলো– [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক বাম খণ্ড খ ডান খণ্ড গ কডেট খণ্ড ঘ কোয়াড্রেট খণ্ড

৭২. কোন ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয়? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক ভিটামিন B কমপ্লেক্স খ ভিটামিন D
গ ভিটামিন A ঘ ভিটামিন K

৭৩. রক্তস্রোতে থাকা অতিরিক্ত গ্লুকোজ থেকে যকৃৎ সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড হলো– [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক স্টার্চ খ সেলুলোজ গ গ্লাইকোজেন ঘ সুক্রোজ

৭৪. মানবদেহে পিত্ত উৎপন্ন হয়– [মেডিকেল : ১২-১৩]
ক অগ্ন্যাশয়ে খ যকৃতে গ ল্যারিংসে ঘ পিত্তথলিতে

৭৫. কোনটি প্লাজমা প্রোটিন নয়? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক ফাইব্রিনোজেন খ অ্যালবুমিন
গ প্রোথ্রম্বিন ঘ বিলিরুবিন

৭৬. নিম্নের কোন অঙ্গ পিত্তরস তৈরি করে? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক অগ্ন্যাশয় খ পিত্তাশয় গ যকৃৎ ঘ প্লিহা

৭৭. যকৃতের কাজ নয় কোনটি? [ডেন্টাল : ০৪-০৫]
ক যকৃতে রক্ত তৈরি হয়
খ অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ নিঃসৃত করা
গ পিত্তরস নিঃসরণের মাধ্যমে পরিপাকে সাহায্য করা
ঘ রক্ত থেকে মৃতপ্রায় লোহিত কণিকাসমূহ অপসারিত করা

2020/8/4 13:03

Scanned with CamScanner

৭৮. যকৃৎনালি পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে অভিন্ন পিত্তনালি তৈরি করে। এই অভিন্ন নালি ভ্যাটার-অব অ্যাম্পুলা নামে নালির মাধ্যমে কোথায় উন্মুক্ত হয়? [ডেন্টাল : ০০-০১]
ক অনুপ্রস্থ কোলনে খ পাইলোরিকে
গ ডিওডেনামে ঘ জেজুনামে

৭৯. কোনটি মিশ্র গ্রন্থি? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক প্যারোটিড খ অগ্ন্যাশয় গ সোয়েট ঘ অশ্রু

৮০. অগ্ন্যাশয়ের আলফা কোষ থেকে নিঃসৃত হয়– [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক ইনসুলিন খ প্যানক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড
গ গ্লুকাগন ঘ লাইপেজ

৮১. নিম্নের কোনটি অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হয় না? [মেডিকেল : ১১-১২]
ক ট্রিপসিন খ অ্যামাইলেজ
গ বাইল সল্ট ঘ গ্লুকাগন

৮২. অ্যামাইলেজের প্রদান উৎস নিম্নের কোনটি? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক যকৃৎ খ উদ্ভিদকোষ
গ অঙ্কুরিত বীজ ঘ অগ্ন্যাশয়

৮৩. উইর্সাং নালি নিম্নের কোথায় অবস্থিত? [ডেন্টাল : ১০-১১]
ক অগ্ন্যাশয় খ লালাগ্রন্থি
গ যকৃৎ ঘ আন্ত্রিক গ্রন্থি

৮৪. কোনটি অগ্ন্যাশয়ের রসে থাকে না? [মেডিকেল : ০৫-০৬]
ক পেপসিন খ লাইপেজ
গ ট্রিপসিন ঘ অ্যামাইলেজ

৮৫. অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত পাচক রস হলো– [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক অ্যামাইলেজ খ টায়ালিন
গ ল্যাকটোজ ঘ পিত্ত

৮৬. অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস ল্যাঙ্গারহ্যান্স নিম্নের কোন হরমোন নিঃসৃত করে? [মেডিকেল : ০১-০২]
ক এন্টারোগ্যাস্ট্রোন খ ইস্ট্রোজেন
গ প্রোজেস্টেরন ঘ গ্লুকাগন

৮৭. কোন কোষ হতে পাকস্থলীতে HCl তৈরি হয়? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক চীফ কোষ খ G কোষ গ প্যারাইটাল কোষ ঘ বিটা কোষ

৮৮. নিম্নের কোনটি সঠিক নয়? [ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক লালারসে টায়ালিন নামক উৎসেচক উপস্থিত থাকে
খ প্রতিদিন প্রায় 2 লিটার গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসৃত হয়
গ মিউসিন HCl-এর ক্ষতিকর ভূমিকা থেকে পাকস্থলী প্রাচীরকে রক্ষা করে
ঘ হাইড্রোক্লোরিক এসিডের উপস্থিতি পেপসিনের কার্যক্রমকে বাঁধাগ্রস্থ করে

৮৯. নিম্নের কোনটি পাকস্থলীর প্যারাইটাল কোষ থেকে নিঃসৃত হয়? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক পেপসিনোজেন খ হাইড্রোক্লোরিক এসিড
গ মিউসিন ঘ গ্যাসট্রিন

৯০. পাকস্থলীর পাচক রসে থাকে না কোনটি? [ডেন্টাল : ০৬-০৭]
ক পেপসিন খ অ্যামাইলেজ
গ লাইপেজ ঘ হাইড্রোক্লোরিক এসিড

৯১. মানুষের পাকস্থলীতে প্রতিদিন কতটুকু গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসৃত হয়? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক প্রায় এক লিটার খ প্রায় দেড় লিটার
গ প্রায় দুই লিটার ঘ প্রায় আড়াই লিটার

৯২. কোনটি পাকস্থলীর গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক পেপসিন খ HCl এসিড গ মিউসিন ঘ টায়ালিন

৯৩. আমিষ পরিপাককারী এনজাইম কোনটি? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক মল্টেজ খ সুক্রেজ গ ট্রিপসিন ঘ লাইপেজ

৯৪. প্রোটিন পরপাককারী এনজাইম নয় কোনটি? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক ট্রিপসিন খ অ্যামাইনোপেপটাইডেজ
গ কাইমোট্রিপসিন ঘ অ্যামাইলেজ

৯৫. পেপসিনের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য নয়? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক ইহা পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত হয়
খ ইহা আমিষ পরিপাক শুরু করে
গ পরিপাকের জন্য ইহা অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।
ঘ ইহা অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হয়

৯৬. পরিপাক সম্পর্কিত নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ১১-১২]
ক মুখগহ্বরে কোন এনজাইম নিঃসৃত হয় না
খ চর্বি জাতীয় খাদ্যের জন্য পিত্তরসের বিশেষ লবণ প্রয়োজন হয়
গ বৃহদান্ত্রে কোন প্রকার খাদ্য উপাদান পরিপাক হয় না
ঘ ক্ষুদ্রান্ত্রে pH ক্ষারীয় মাত্রায় থাকে

৯৭. নিম্নের কোনটি আমিষ জাতীয় উপাদান কিন্তু এনজাইম নয়? [মেডিকেল : ১১-১২]
ক টায়ালিন খ গামা গ্লোবিউলিন
গ ট্রপোনিন ঘ লাইপেজ

৯৮. নিচের কোন বিক্রিয়াটি সঠিক? [ডেন্টাল : ১০-১১]
ক ডেক্সট্রিন $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ
খ তৈল + চর্বি $\xrightarrow{\text{এস্টারেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারিন
গ সেলুলোজ $\xrightarrow{\text{সেলুলোজ}}$ গ্লুকোজ + গ্লুকোজ
ঘ প্রোটিন $\xrightarrow{\text{ট্রিপসিন}}$ অ্যামাইনো এসিড

৯৯. নিম্নের কোনটি শ্বেতসার পরিপাকে সাহায্যকারী উৎসেচক নয়? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক মল্টেজ খ টায়ালিন
গ অ্যামাইলেজ ঘ লাইসোজাইম

১০০. কোনটি লাইপেজ এনজাইম নয়? [মেডিকেল : ০৬-০৭]
ক এস্টারেজ খ কোলেস্টারেজ
গ লেসিথিনেজ ঘ ইনুলিনেজ

১০১. শোষিত খাদ্যবস্তুর প্রোটোপ্লাজমে রূপান্তরকে বলে– [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক পরিপাক খ শোষণ গ আত্তীকরণ ঘ অভিশোষণ

১০২. নিচের কোন হরমোনটি পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক এন্টেরোকাইনিন খ সিক্রেটিন
গ সোমাটোস্ট্যানিন ঘ গ্যাস্ট্রিন

১০৩. নিচের কোন জোড়াটি লোকাল হরমোনের উদাহরণ? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক ইনসুলিন ও অ্যাড্রেনালিন খ থাইরক্সিন ও সিক্রিটিন
গ সিক্রিটিন ও এন্টারোগ্যাস্ট্রিন ঘ ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন

১০৪. নিম্নের বামদিকের কোনটি ডানদিকের কোনটি সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? [ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক গ্যাস্টিন-আন্ত্রিক রস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে
খ কোলেসিস্টোকাইনিন-লালারস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রক করে
গ সিক্রেটিন-অগ্ন্যাশয় রস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রক করে
ঘ প্যানক্রিওজাইমিন-পাচক রস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রক করে

2020/8/4 13:04
Scanned with CamScanner

১০৫. স্থূলতার সাথে নিচের কোন রোগটি সম্পর্ক যুক্ত নয়? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক স্ট্রোক খ টাইপ-১ ডায়াবেটিস মেলাইটাস
গ উচ্চ রক্তচাপ ঘ ক্যানসার

১০৬. স্বাভাবিক ওজনের মানুষের বডিমাস ইনডেক্স (BMI) কত? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক 25 – 29.9 kg/m^2 খ 18.5 – 24.9 kg/m^2
গ 30 – 34.9 kg/m^2 ঘ 35 – 39.9 kg/m^2

১০৭. নিচের কোন BMI (Body Mass Index) অতিরিক্ত ওজন নির্দেশ করে? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক 18.5 – 24.9 kg.m^2 খ 25.0 – 29.9kg/m^2
গ 30.0 – 34.9 kg/m^2 ঘ 35 – 39.9kg/m^2

১০৮. স্থূলতার সহিত সম্পর্কযুক্ত রোগ কোনটি? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক করোনারি হার্ট ডিজিজ খ রক্তশূন্যতা
গ রেনাল ফেইলিওর ঘ হাঁপানি

উত্তরমালা

১. (ক); ২. (ঘ); ৩. (গ); ৪. (ক); ৫. (গ); ৬. (খ); ৭. (ক); ৮. (ঘ); ৯. (গ); ১০. (খ); ১১. (গ); ১২. (খ); ১৩. (গ); ১৪. (গ); ১৫. (খ); ১৬. (খ); ১৭. (ঘ); ১৮. (ক); ১৯. (ক); ২০. (ঘ); ২১. (খ); ২২. (গ); ২৩. (খ); ২৪. (ক); ২৫. (ক); ২৬. (গ); ২৭. (গ); ২৮. (ক); ২৯. (গ); ৩০. (গ); ৩১. (ঘ); ৩২. (গ); ৩৩. (ঘ); ৩৪. (খ); ৩৫. (গ); ৩৬. (ক); ৩৭. (খ); ৩৮. (ক); ৩৯. (ক); ৪০. (ঘ); ৪১. (ক); ৪২. (ক); ৪৩. (ঘ); ৪৪. (ঘ); ৪৫. (ঘ); ৪৬. (ঘ); ৪৭. (ক); ৪৮. (গ); ৪৯. (খ); ৫০. (ঘ); ৫১. (গ); ৫২. (গ); ৫৩. (খ); ৫৪. (গ); ৫৫. (খ); ৫৬. (গ); ৫৭. (খ); ৫৮. (গ); ৫৯. (খ); ৬০. (ঘ); ৬১. (ক); ৬২. (খ); ৬৩. (ঘ); ৬৪. (গ); ৬৫. (গ); ৬৬. (গ); ৬৭. (ঘ); ৬৮. (খ); ৬৯. (ঘ); ৭০. (গ); ৭১. (খ); ৭২. (ক); ৭৩. (গ); ৭৪. (খ); ৭৫. (ঘ); ৭৬. (গ); ৭৭. (খ); ৭৮. (গ); ৭৯. (খ); ৮০. (গ); ৮১. (গ); ৮২. (ঘ); ৮৩. (ক); ৮৪. (ক); ৮৫. (ক); ৮৬. (ঘ); ৮৭. (গ); ৮৮. (ঘ); ৮৯. (খ); ৯০. (খ); ৯১. (গ); ৯২. (ঘ); ৯৩. (গ); ৯৪. (ঘ); ৯৫. (ঘ); ৯৬. (ক); ৯৭. (খ); ৯৮. (ঘ); ৯৯. (ঘ); ১০০. (ঘ); ১০১. (গ); ১০২. (ঘ); ১০৩. (গ); ১০৪. (গ); ১০৫. (খ); ১০৬. (খ); ১০৭. (খ); ১০৮. (ক)।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। পরিপাক কী? [য. বো. '১৯ ঢা. বো. '১৭, ব. বো. '১৭, '১৫]
২। যান্ত্রিক পরিপাক কী?
৩। রাসায়নিক পরিপাক কী?
৪। খাদ্য কী? [য. বো. ২০১৬]
৫। পৌষ্টিকতন্ত্র কাকে বলে?
৬। পৌষ্টিকনালি কী?
৭। পরিপাকগ্রন্থি কী?
৮। কার্ডিয়াক স্ফিংটার কী?
৯। টায়ালিন কী?
১০। বোলাস বা গ্রাস কী?
১১। কাইম কী?
১২। পেরিস্টালসিস কী? [কু. বো. ২০১৬]
১৩। মিশ্র গ্রন্থি কাকে বলে?
১৪। উর্ইসাং নালি কী?
১৫। অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার কী?
১৬। অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম কী?
১৭। প্রোটিওলাইটিক এনজাইম কী?
১৮। লাইপোলাইটিক এনজাইম কী?
১৯। মেমব্রেন এনজাইম কী?
২০। গ্যাস্ট্রিন কী?
২১। গ্লাইকোজেনোলাইসিস কী?
২২। গ্লুকোনিওজেনেসিস কী?
২৩। গ্লাইকোজেনেসিস কী?
২৪। ইমালসিফিকেশন কী?
২৫। পিত্ত কী? [চ. বো. ২০১৯]
২৬। ল্যাকটিয়েল কী?
২৭। মাইসেলি কী?
২৮। কাইলোমাইক্রন কী?
২৯। আন্তীকরণ কী?
৩০। শোষণ কী?
৩১। স্থূলতা কী? [ঢা. রা. সি. বো. ২০১৯]
৩২। BMI কী?
৩৩। বেরিয়াট্রিকস কী?
৩৪। মলত্যাগ কাকে বলে?
৩৫। মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি কোনটি? [ঢা. বো. ২০১৫]
৩৬। মানব দেহের 'জৈব রসায়নাগার' কাকে বলে?
৩৭। লালা কী? [য. বো. '১৭, রা. বো. '১৭]

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। মিশ্রগ্রন্থি বলতে কী বোঝ? [য. বো. ২০১৯; ঢা. বো. ২০১৭]
২। খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা লিখ। [যা. বো. ২০১৬]
৩। মানুষের লালাগ্রন্থিসমূহের নাম লিখ। [রা. বো. ২০১৬]
৪। লালার উপাদানগুলো লিখ।
৫। পরিপাকে লালা রসের প্রয়োজন কেন?
৬। দন্তসংকেত বলতে কী বুঝ?
৭। ডাইফায়োডন্ট দাঁত ও হেটোরোডন্ট দাঁত কী?
৮। মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া লিখ।
৯। পরিপাকে দাঁতের ভূমিকা উল্লেখ কর।
১০। মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের রাসায়নিক প্রক্রিয়া লিখ।
১১। পাকস্থলী বা অন্ত্র নিজে হজম হয় না কেন?
১২। পাকস্থলীতে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় না কেন? [ঢা. বো. ২০১৫]
১৩। পাকস্থলীর মিউকোসা স্তরের কোষগুলোর নাম ও কাজ লিখ।
১৪। অগ্ন্যাশয়কে মিশ্রগ্রন্থি বলা হয় কেন? [ঢা. বো. ২০১৬]
১৫। পেরিস্ট্যালসিস বলতে কী বোঝ? [চ. রা. সি. বো. ২০১৯; সি. বো. ২০১৭]
১৬। অগ্ন্যাশয় রসের কাজ লিখ।
১৭। অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান লিখ।
১৮। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম লিখ।
১৯। যকৃৎকে জৈব রসায়নাগার বলা হয় কেন? [ঢা., কু., ব.বোর্ড-২০১৭]
২০। BMI বলতে কী বোঝ? [য., চ., ব.বো.-২০১৭]
২১। মানুষের পরিপাকগ্রন্থি নিঃসৃত ৪টি এনজাইম ও হরমোনের নাম লিখ।
২২। পাকরসে কী কী এনজাইম থাকে?
২৩। ডিওডেনামে নিঃসৃত এনজাইমগুলোর নাম লিখ?
২৪। পেপসিনোজেন ও ট্রিপসিনোজেন কীভাবে সক্রিয় হয়?
২৫। ৪-৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য দেওয়া হয় না কেন?
২৬। স্থূলতা বলতে কী বোঝ? [রা. বো. ২০১৭]
২৭। পিত্তের কাজ লিখ।
২৮। পিত্তরসের উপাদান লিখ।
২৯। শোষিত খাদ্যসার পরিবহন বলতে কী বুঝ?
৩০। শোষিত খাদ্যসারের পরিণতি লিখ।
৩১। শোষিত খাদ্যসারের পরিবহন ও পরিণতির প্রবাহচিত্র লিখ।
৩২। জৈব রসায়ণাগার বলতে কী বুঝায়? [ঢা. বো. ২০১৯]
৩৩। বৃহদন্ত্রের কাজ লিখ।

পার্থক্য লিখ/তুলনা কর

৩৪। এনজাইম এবং পিত্তরস।
৩৫। পেপসিন ও ট্রিপসিন।
৩৬। পরিপাক এবং পরিশোষণ।

2020/8/4 13:04
Scanned with CamScanner

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। এক বিশেষ ধরনের খাদ্য কতিপয় এনজাইম দ্বারা পরিপাক হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত দুটি বিপরীত ধর্মী হরমোন দেহে এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। [ঢাকা বোর্ড-১৯]
ক. স্থূলতা কী?
খ. জৈব রসায়নাগার বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
ঘ. রক্তে উপাদানটির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে হরমোন দুটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২। ইরা ভাত খেতে পছন্দ করে। [রাজশাহী, সিলেট বোর্ড-১৯]
ক. স্থূলতা কাকে বলে?
খ. পেরিস্টালসিস বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খাদ্যটির পরিপাক ব্যাখ্যা কর।
ঘ মানবদেহে উদ্দীপকে উল্লিখিত খাদ্য উপাদানটির বিপাকীয় প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কর।

৩।
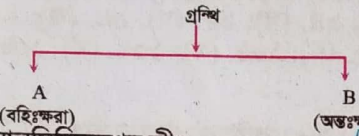

ক. ইমালসিফিকেশন কী? [সকল বোর্ড ২০১৮]
খ. মানুষের লালাগ্রন্থিসমূহের নাম লিখ।
গ. উদ্দীপকে A গ্রন্থি খাদ্য পরিপাকে কী ভূমিকা রাখে ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড ২০১৮]
ঘ. উদ্দীপকে B গ্রন্থি দেহের শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশগ্রহণ করে– তা আলোচনা কর। [সকল বোর্ড ২০১৮]

৪। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
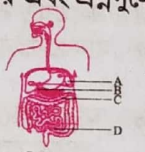

চিত্র : X [ঢাকা বোর্ড-২০১৭]
ক. পরিপাক কী?
খ. মিশ্রগ্রন্থি বলতে কী বুঝ?
গ. পরিপাক ক্রিয়ায় 'D' এর অংশের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত A, B ও C অংশের মধ্যে কাজের সমন্বয় না থাকলে কী ঘটবে– বিশ্লেষণ কর।

৫। ষাটোর্ধ বয়সী 'S' এর পছন্দনীয় খাবার চর্বিযুক্ত মাংস। প্যাথোলজিক্যাল পর্যবেক্ষণ শেষে ডাক্তার তাকে শারীরিক সমস্যার কারণে চর্বিযুক্ত মাংস পরিহার করার পাশাপাশি শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিমিত গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও বললেন– 'খাদ্য পরিপাকে শুধুমাত্র এনজাইম নয় বরং হরমোনও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।' [কু. বো. ২০১৭]
ক. খাদ্য কী?
খ. খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা লিখ।
গ. উদ্দীপকে ডাক্তার যে খাদ্য পরিমিত গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিল সে খাদ্যের মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রের পরিপাক বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্দীপকে ডাক্তারের শেষোক্ত উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

৬। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
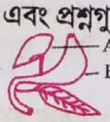

চিত্র-D [রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]
ক. লালা কী?
খ. স্থূলতা বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের 'A' অংশের পরিপাকে ভূমিকা উল্লেখ কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' অংশটিতে যান্ত্রিক পরিপাক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

৭। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :


ক. পৌষ্টিকনালি কী?
খ. অগ্ন্যাশয়কে মিশ্রগ্রন্থি বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত B অংশে খাদ্যের পরিপাকে পৌষ্টিক গ্রন্থির ভূমিকা বর্ণনা কর। [দিনাজপুর বোর্ড-১৭]
ঘ. উদ্দীপকের C অংশে খাদ্যের পরিণতি বিশ্লেষণ কর। [দিনাজপুর বোর্ড-১৭]

৮। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
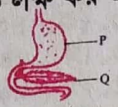

ক. অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার কী?
খ. যকৃৎকে জৈব রসায়নাগার বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে 'P' চিহ্নিত অংশে খাদ্য পরিপাকে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থি কোষগুলোর নাম ও কাজ লিখ। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
ঘ. উদ্দীপকের 'Q' অংশ কীভাবে প্রোটিন পরিপাকে ভূমিকা রাখে– ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]

৯। মানুষের গৃহীত খাদ্যের মধ্যে আমিষ, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য জটিল প্রকৃতির। এসব জটিল খাদ্যের পরিপাকের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন রকম উৎসেচক খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। [যশোর বোর্ড-২০১৬]
ক. খাদ্য কী?
খ. খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা লিখ।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় অংশের যৌক্তিকতা উল্লেখ কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষের উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১০। ডায়াফ্রামের নিচে অবস্থিত আমাদের পরিপাকে সহায়ক বহুকোষী গ্রন্থিগুলোর মধ্যে একটি বহিঃক্ষরা ও অপরটি মিশ্র। গ্রন্থিগুলো সম্মিলিতভাবে দেহের জৈবনিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে
ক. প্যারিস্ট্যালসিস কী? [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]
খ. BMI বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথমোক্ত গ্রন্থিটির গঠন বর্ণনা কর। [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]
ঘ. গ্রন্থিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি পরিপাকে অধিক ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণপূর্বক মন্তব্য কর। [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]

১১। পাশের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
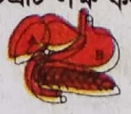
[ঢা. বো. ২০১৫]
ক. মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি কোনটি?
খ. পাকস্থলীতে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় না কেন?
গ. উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত অংশের ক্রিয়াকৌশল ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে 'B' চিহ্নিত অংশটি খাদ্য পরিপাক করে কিন্তু নিজে পরিপাক হয় না– বিশ্লেষণ কর।

১২। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :


ক. আন্ত্রীকরণ কী?
খ. ৪-৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য দেওয়া হয় না কেন?
গ. উদ্দীপকের 'ক' এবং 'খ' এর কাজের মধ্যে তুলনা কর। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৫]
ঘ. 'উদ্দীপকে 'ক' অংশটি হতে আগত খাদ্য পরিপাকের জন্য 'ঘ' অংশটির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী বোর্ড-১৫]

2020/8/13 04
Scanned with CamScanner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

ঐতিহ্যে ৫১ বছর
কাজলা ব্রাদার্স লিমিটেড

2020/8/4 17:26

Scanned with CamScanner

মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সংবহন
HUMAN PHYSIOLOGY : BLOOD AND CIRCULATION

অধ্যায় ৪

মানবদেহে সার্বক্ষণিকভাবে বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। এসব বিপাকীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন বস্তু, যেমন খাদ্য, অক্সিজেন, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি প্রতিনিয়ত কোষে সরবরাহ করা দরকার এবং সে সঙ্গে কোষে উৎপন্ন বিপাকজাত দূষিত পদার্থগুলোকে কোষ থেকে দূরীভূত করা দরকার। মানবদেহে এসব বস্তুর পরিবহন যে তন্ত্রের মাধ্যমে হয় তাকে সংবহনতন্ত্র বলে। মানুষের দেহে দুই ধরনের সংবহনতন্ত্র বিদ্যমান যথা– **রক্তসংবহনতন্ত্র** এবং **লসিকা সংবহনতন্ত্র**। প্রাণিদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্র সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **উইলিয়াম হার্ভে** (William Harvey, 1928)। এ অধ্যায়ে মানবদেহের রক্ত ও সংবহনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে।

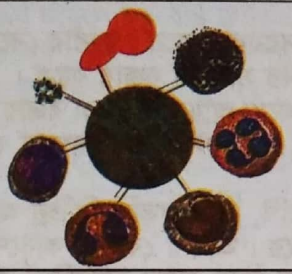

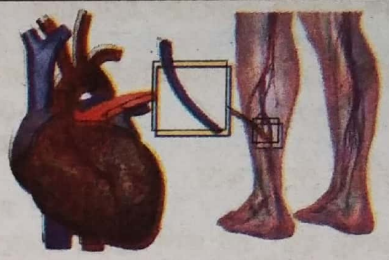

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে–

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা-১৪)
১. রক্তকণিকা ও লসিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. রক্ত জমাট বাঁধার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ব্যবহারিক ○ রক্তকণিকা শনাক্ত করতে পারবে এবং চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ৪. হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ৫. হার্টবিটের দশাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসিপ্টার (baro-recptors) এবং আয়তন রিসিপ্টারের (volume recptors) ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. মানবদেহের রক্ত সংবহন পদ্ধতির তুলনা করতে পারবে। ৯. হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনে পেসমেকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. ওপেন হার্ট সার্জারি, করোনারি বাইপাস ও এনজিওপ্লাস্টের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● রক্ত ও লাসিকা ● রক্ত জমাট বাধা ● ব্যবহারিক ○ রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ● হৃৎপিণ্ডের গঠন ● হার্টবিট, বিভিন্ন দশা ও নিয়ন্ত্রণে SA নোড AB নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা ● রক্তচাপ ও ব্যারোরিসিপ্টার এবং আয়তন রিসিপ্টারের ভূমিকা ● মানবদেহের রক্তসংবহন তন্ত্র ○ সিষ্টেমিক সংবহন ○ পালমোনারী সংবহন ● হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয় ○ বুক ব্যাথা, ○ হার্ট এটাক ○ হার্ট ফেইলিউর ● হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা ○ পেসমেকার কার্যক্রম ○ ওপেন হার্ট সার্জারী ○ করোনারী বাইপাস ○ এনজিওপ্লাস্টি

৪.১ রক্ত (Blood)

রক্ত এক প্রকার বিশেষ ধরনের **তরল যোজক কলা**। রক্তের রং লাল। রক্ত ঈষৎ লবণাক্ত ও ক্ষারধর্মী। এর pH-এর মাত্রা ৭.৩৫-৭.৪৫ এবং তাপমাত্রা ৩৬-৩৮° সেলসিয়াস। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১.০৫-১.০৬৫ (পানির চেয়ে বেশি)। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে গড়ে প্রায় ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে, যা মানুষের মোট ওজনের প্রায় ৭-৮% কিন্তু রক্ত মোট কোষ-বহিঃস্থ তরলের ৩০-৩৫%। রক্তরস ও **রক্তকণিকা** নিয়ে রক্ত গঠিত। রক্তের ক্ষেত্রে **নিউটনের সান্দ্রতা সূত্র** (Newton's Law of Viscosity) প্রযোজ্য নয়।

2020/8/4 17:26

Scanned with CamScanner

শরীরে হিমোগ্লোবিনের অভাব হলে (অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ৫০ লাখের চেয়ে ২৫% কম হলে) রক্তশূন্যতা বা **রক্তাল্পতা** বা **অ্যানিমিয়া** (anaemia) দেখা দেয়। অ্যানিমিয়াতে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা হ্রাস পায় এবং রক্তের এই অবস্থাকে **অলিগোসাইথেমিয়া** (oligocythemia) বলে। আবার কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে (অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ৬৫ লাখের বেশি হলে) একে **পলিসাইথেমিয়া** (polycythemia) বলে।

ভ্রূণীয় জীবনে যকৃৎ, প্লিহা ও থাইমাস থেকে উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে রক্তকণিকাগুলো অস্থিমজ্জার **স্টেম কোষ** (stem cell) বা **হিমোসাইটোব্লাস্ট** (haemocytoblast) কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। লোহিত কণিকা সৃষ্টিকে **এরিথ্রোপোয়েসিস** (erythropoesis) বলে। লোহিত রক্তকণিকা প্রায় ১২০ দিন বা ৪ মাস জীবিত থাকে। এরা এই সময়কালে বার বার কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদসহ প্রায় ১১০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। এরা যকৃৎ ও প্লিহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এজন্য যকৃৎ ও প্লিহাকে RBC-এর **কবরস্থান** (graveyard of RBC) বলা হয়। লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংসের পর এর অধিকাংশ হিমোগ্লোবিনের লৌহঘটিত অংশ **ফেরিটিন** হিসেবে যকৃতে জমা হয়, যা পরবর্তী সময় RBC তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। হিমোগ্লোবিনের বাকি অংশ **বিলিভার্ডিনে** রূপান্তরিত হয়, যা পরে **বিলিরুবিনে** পরিণত হয়। মানবদেহে প্রতি সেকেন্ডে ২০ লাখের বেশি লোহিত কণিকা ধ্বংস হয় এবং সমসংখ্যায় তৈরি হয়। বৃক্কের গ্লোমেরুলাস থেকে উৎপন্ন **এরিথ্রোপোয়েটিন** (erythropoietin) নামক হরমোন RBC তৈরি নিয়ন্ত্রণ করে। **মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকা প্রতি মিনিটে একবার সমগ্র দেহ পরিভ্রমণ করে।**

রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে পানি : ৬০-৭০%, কঠিন পদার্থ : ৩০% (কঠিন পদার্থের প্রায় ৯০% হিমোগ্লোবিন) এবং অবশিষ্ট ১০% প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অজৈব লবণ, অজৈব ফসফেট, পটাশিয়াম ইত্যাদি।

লোহিত রক্তকণিকা কাজ : (১) লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন **অক্সিহিমোগ্লোবিন** যৌগরূপে ফুসফুস থেকে দেহের সকল কোষে O_2 পরিবহন করে। (২) হিমোগ্লোবিন কোষ নির্গত CO_2-এর একাংশকে **কার্বামিনো** যৌগরূপে পরিবহন করে ফুসফুসে নিয়ে আসে। (৩) রক্তের ঘনত্ব ও সান্দ্রতা (viscocity) রক্ষা করে। (৪) এগুলোর হিমোগ্লোবিন ও অন্যান্য অন্তঃকোষীয় বস্তু বাফাররূপে রক্তে অম্ল-ক্ষারের সাম্য রক্ষা করে। (৫) প্লাজমামেমব্রেনে অ্যান্টিজেন সংযুক্ত থাকে, যা মানুষের রক্ত গ্রুপিংয়ের জন্য দায়ী। (৬) রক্তে বিভিন্ন রঞ্জকের উৎস হিসেবে **বিলিরুবিন** ও **বিলিভার্ডিন** উৎপন্ন করে। (৭) এরা **হাইড্রোজেন সালফাইড** গ্যাস উৎপাদন করতে পারে যা রক্তনালির সঙ্কোচনের জন্য সংকেত প্রদান করে।

২। শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট (Leucocytes; Gr. *leucos* = colourless + *kytos* = cell)

রক্তরসে বিদ্যমান যেসব কণিকা নিউক্লিয়াসযুক্ত, বর্ণহীন, দানাদার বা অদানাদার, অনিয়তাকার ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং দেহের প্রতিরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের **শ্বেত রক্তকণিকা** বা **লিউকোসাইট** বলে। এরা হিমোগ্লোবিনবিহীন, স্বচ্ছ, এবং লোহিত রক্তকণিকার তুলনায় বৃহৎ। শ্বেত রক্তকণিকার আকৃতি এবং গঠন পরিবর্তনশীল। প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াস প্রাথমিক অবস্থায় গোল বা ডিম্বাকার হয় কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কাকার বা অশ্বক্ষুরের আকৃতি বিশিষ্ট হয়। এর নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের চাপে এক প্রান্তে অবস্থান করে। গড় ব্যাস আকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে ৭.৫-২০μm।

রক্তে এদের পরিমাণ খুব কম। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ৫-৮ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে এদের সংখ্যা বেড়ে যায়। লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত ৭০০ : ১ (বা ৬০০ : ১)। শ্বেত রক্তকণিকা আয়তনের দিক দিয়ে পরিণত সুস্থ মানুষের রক্তের মাত্র ১%। এদের আয়ুকাল প্রায় ১-১৫ দিন। এরা অস্থিমজ্জার **হিমাটোপয়টিক মাতৃকোষ** (hematopoietic stem cell) থেকে **মায়েলোপয়সিস** (myelopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্লিহা ও লসিকাগ্রন্থি থেকেও উৎপন্ন হয়। এগুলো **ফ্যাগোসাইটোসিস** প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। এরা অ্যামিবয়েড চলন প্রদর্শন করে এবং রক্তবাহের প্রাচীর ভেদ করে বাইরে যেতে পারে

রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক থাকলে তাকে **লিউকোসাইথিমিয়া** বা **লিউকোসাইটোসিস** (leukocythemia/leukocytosis) এবং কম থাকলে তাকে **লিউকোপিনিয়া** (leukopenia) বলে। শ্বেতকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেলে **লিউকোমিয়া** (leukamia) ক্যান্সারের সৃষ্টি হয় কিন্তু এসময় লোহিত কণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু শ্বেত রক্তকণিকা রক্ত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে দেহের অন্য কোন কলায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। যকৃতে বিদ্যমান **কুপার কোষ** (Kupffer cells) নামক শ্বেত রক্তকণিকা অনাক্রম্যতন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করে।

এ কণিকাগুলো নিউক্লিওপ্রোটিন, গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যাসকরবিক এসিড ও বিভিন্ন ধরনের প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বহন করে। এদেরকে দেহের **ভ্রাম্যমাণ প্রতিরক্ষাকারী একক** (mobile defensive units) বলা হয়।

2020/8/4 17:27

Scanned with CamScanner

শ্বেত রক্তকণিকার প্রকারভেদ (Classification of WBC)

কোষের আকৃতি, নিউক্লিয়াসের গঠন প্রকৃতি ও সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে শ্বেত রক্তকণিকা প্রধানত দু'প্রকার, যথা– **গ্র্যানিউলোসাইট** (granulocyte) বা **দানাদার শ্বেত রক্তকণিকা** এবং **অ্যাগ্রানিউলোসাইট**(agronulocyte) বা **অদানাদার শ্বেত রক্তকণিকা**।

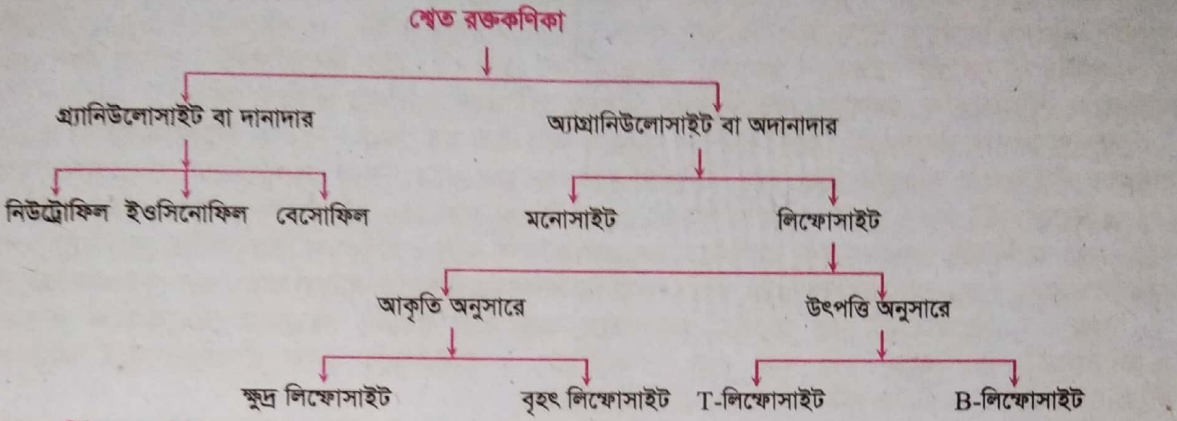

(ক) গ্র্যানিউলোসাইট বা দানাদার শ্বেতকণিকা (Granulocyte) : এ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে দানাদার, নিউক্লিয়াস ছোট ও খণ্ডায়িত (২-৭টি) এবং লোবযুক্ত। এদের ব্যাস ৮-১৫μm (কারও মতে ১২-১৫μm)। এরা সম্পূর্ণরূপে অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়। লিশম্যান বা ইওসিন রঞ্জকে দানাগুলো বিভিন্নভাবে রঞ্জিত হয়। রঞ্জক ধারণ ক্ষমতা এবং নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে গ্র্যানিউলোসাইটগুলো আবার তিন প্রকার। যথা :

(i) নিউট্রোফিল (Neutrophil) : এরা মোট শ্বেতকণিকার প্রায় ৭০% অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা ৩-৬ হাজার। এদের নিউক্লিয়াস ২-৭ খণ্ডকবিশিষ্ট এবং এর সাইটোপ্লাজম **বর্ণ-নিরপেক্ষ** দানাযুক্ত, যেগুলো ইওসিন রঞ্জকে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। এরা ক্ষুদ্র সক্রিয় ফ্যাগোসাইট। যার জন্য এদেরকে কখনো **মাইক্রোফাজ** (microphage) বলা হয়। মৃত অণুজীব এবং নিউট্রোফিল একত্রে **পুঁজ** গঠন করে। এদের জীবনকাল ২-৪ দিন।

কাজ : নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে অণুজীব, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে দেহকে রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে। রক্তবাহিকার বাইরে acute inflammation সৃষ্টি করে।



চিত্র ৪.১ : মানুষের রক্তের রক্তকণিকাসমূহ

(ii) ইওসিনোফিল (Eosinophil) : মোট শ্বেতকণিকার প্রায় ২-৫% অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা ১০০-৪০০। নিউক্লিয়াস ২-৩ খণ্ডকবিশিষ্ট এবং অম্লাসক্ত দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে **লাল বর্ণ** ধারণ করে। এদের জীবনকাল ৮-১২ দিন। পরজীবীর সংক্রমণ, অ্যালার্জি, প্লিহা ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগের কারণে রক্তে ইওসিনোফিলের সংখ্যা বেড়ে যায়।

কাজ : এরা হিস্টামিন নিঃসরণ করে রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা এবং অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে। এছাড়াও অনাক্রম্যতা ও হাইপারসেনসিটিভিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(iii) বেসোফিল (Basophil) : মোট শ্বেতকণিকার প্রায় ০.৫% অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা ২৫-২০০টি। নিউক্লিয়াস খণ্ডকবিশিষ্ট এবং ক্ষারাসক্ত দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে **নীল বর্ণ** ধারণ করে। এদের জীবনকাল ১২-১৫ দিন। এরা **হেপারিন** (heparin) ও **হিস্টামিন** (histamin) নামক দুই ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে।

কাজ : এই কোষ নিঃসৃত **হিস্টামিন** দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং **হেপারিন** প্রোটিন তৈরি করে, যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা প্রদান করে।

2020/8/4 17:27

Scanned with CamScanner

(খ) অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট বা অদানাদার (Agranuloecyte) : এদের সাইটোপ্লাজমে কোনো দানা থাকে না। নিউক্লিয়াস স্বচ্ছ ও বৃহৎ এবং অখণ্ডায়িত। এদের উৎপত্তি লসিকা গ্রন্থি, প্লিহা, থাইমাস ও ক্ষুদ্রান্ত্রের লসিকা টিস্যু থেকে। দুই ধরনের অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট দেখা যায়। যথা : **লিম্ফোসাইট** (lymphocyte) ও **মনোসাইট** (monocyte)।

(i) **লিম্ফোসাইট** (Lymphocyte) : এরা মোট শ্বেত রক্তকণিকার ২৫% অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০-২৭০০। এরা গোলাকার, সাইটোপ্লাজম স্বল্প ও ক্ষারীয় এবং নিউক্লিয়াস বৃহৎ ও গোলাকার। আকৃতি অনুসারে এদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– (১) **ছোট লিম্ফোসাইট** : এদের ব্যাস ৭-৮μm; নিউক্লিয়াস বৃহৎ ও গোলাকার যা কোষের অধিকাংশ স্থানজুড়ে অবস্থান করে এবং (২) **বৃহৎ লিম্ফোসাইট** : এদের ব্যাস ১০-১৪μm; নিউক্লিয়াস গোলাকার বা বৃক্কাকার; সাইটোপ্লাজম কোষের অধিকাংশ স্থানজুড়ে অবস্থান করে।

আবার উৎপত্তি অনুসারেও লিম্ফোসাইটকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– (১) **T- লিম্ফোসাইট** বা T-cell : এরা থাইমাস গ্রন্থি থেকে পরিণতি লাভ করে লসিকাগ্রন্থিতে অবস্থান করে। এরা কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা রক্ষা করে। (২) **B-লিম্ফোসাইট** বা B- cell : এরা অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয় এবং পরিণতি লাভ করে লসিকাগ্রন্থিতে অবস্থান করে। এরা অ্যান্টিবডি উৎপাদন দ্বারা রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা রক্ষা করে। অধিকাংশ লিম্ফোসাইট **দেহ টিস্যু** অর্থাৎ বিশেষ করে লিম্ফনোড, প্লিহা, অ্যাডেনয়েড এবং পরিপাকনালির লিম্ফয়েড টিস্যুতে পাওয়া যায়। এরা ফ্যাগোসাইট নয়।

কাজ : T- লিম্ফোসাইট কিছু অণুজীব ধ্বংস করে, তবে এরা প্রধানত সংক্রমিত দেহকোষকে আক্রমণ করে। B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে দেহে প্রবেশের পূর্বে আক্রমণ করে। লিম্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে।

(ii) **মনোসাইট** (Monocyte) : এদের নিউক্লিয়াস অপেক্ষাকৃত ছোট, ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার এবং সাইটোপ্লাজম বেশি, স্বচ্ছ ও দানাহীন। এরা বৃহৎ আকৃতির শ্বেত রক্তকণিকা। এদের ব্যাস ১০μm-২০μm। এরা **চলমান ফ্যাগোসাইট** (mobile phagocyte)। রক্তে মাত্র ৩০-৪০ ঘণ্টা থাকার পর এরা **ম্যাক্রোফাজে** পরিণত হয়। এরা অস্থিমজ্জায় বৃদ্ধি লাভ করে এবং রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। এদের সংখ্যা প্রায় ৩৫০-৮০০।

কাজ : ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে এরা রোগজীবাণু ধ্বংস করে এবং টিস্যুর মৃতকোষ ভক্ষণ করে। সাধারণভাবে এদের **'rubbish collecting'** কোষ বলে।

শ্বেত রক্তকণিকার কাজ : (১) লিউকোসাইট দেহরক্ষাকারী অতন্দ্র প্রহরী ও বিশ্বস্ত সৈনিক। (২) মনোসাইট ও নিউট্রোফিল **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) পদ্ধতিতে জীবাণুকে বিনষ্ট করে এবং দেহকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। (৩) লিম্ফোসাইটগুলো **অ্যান্টিবডি** সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে, এজন্য এদের **আণুবীক্ষণিক সৈনিক** (microscopic soldier) বলে। (৪) দানাদার লিউকোসাইট **হিস্টামিন** (histamine) সৃষ্টি করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। (৫) বেসোফিল **হেপারিন** (heparine) তৈরি করে, যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ততঞ্চন রোধ করে। (৬) নিউট্রোফিলের বিষাক্ত দানা জীবাণু ধ্বংস করে। (৭) ইউসিনোফিল রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা এবং দেহের **অ্যালার্জিক-অ্যান্টিবডির** বিরুদ্ধে কাজ করে।

৩। অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট বা প্লেটলেট (Thrombocyte or Blood Platelets)

রক্তরসে বিদ্যমান বর্ণহীন, ক্ষুদ্র, ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার, নিউক্লিয়াসবিহীন ও রক্ততঞ্চনে সাহায্যকারী কণিকাগুলোকে **অনুচক্রিকা** বা **থ্রম্বোসাইট** বলে। এগুলো গোলাকার বা ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার ও নিউক্লিয়াসবিহীন। এরা **ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা**। এদের ব্যাস প্রায় ২-৫μm। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্লেটলেটের সংখ্যা ২.৫ লাখ - ৫ লাখ। অসুস্থ দেহে এগুলোর সংখ্যা আরও বেশি হয়। রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক থাকলে তাকে **থ্রম্বোসাইটোসিস** (thrombocytosis) এবং কম থাকলে তাকে **থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া** (thrombocytopenia) বলে।

এদের দানাময় সাইটোপ্লাজমে পিনোসাইটিক গহ্বর, সংকোচী গহ্বর, বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণু (যেমন- মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বস্তু, লাইসোজোম, রাইবোজোম প্রভৃতি), গ্লাইকোজেন দানা, অ্যাকটিন, মায়োসিন, শ্বসন এনজাইম, অন্তঃকোষজালক ইত্যাদি থাকে। এতে **প্রোটিন** ও প্রচুর পরিমাণ **সেফালিন** (cephalin) নামক ফসফোলিপিড থাকে। এগুলো লাল অস্থিমজ্জার **ম্যাগাক্যারিওসাইট** (megakaryocyte) কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। অনেকের মতে, শ্বেত রক্তকণিকা থেকেও থ্রম্বোসাইটের সৃষ্টি হয়। এদের আয়ুকাল প্রায় ৫-১০ দিন। এরা যকৃৎ ও প্লিহা এবং অন্যান্য রেটিকিউলো-এন্ডোথেলিয়াল (Reticulo-endothelial-RE) কোষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরা সহজেই ভেঙ্গে যায় এবং রক্ত তঞ্চনের জন্য প্রয়োজনীয় **থ্রম্বোকাইনেজ** (thrombokinase) এনজাইম সৃষ্টি করে।

অনুচক্রিকার কাজ : (১) শরীরে কোনো ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হলে অনুচক্রিকা **হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ** (hemostatic plug = blood platelets + plasma proteins) গঠন করে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে, ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়। (২) রক্তজালিকার অন্তঃআবরণীর পর্দার গায়ে এঁটে গিয়ে মেরামতের কাজ দ্রুততর করে। (৩) **সেরোটোনিন** বা 5-HT (serotonin or 5-hydroxytryptamine) নামক একটি রাসায়নিক বস্তু উৎপন্ন করে, যার মাধ্যমে রক্তনালির সংকোচন ঘটে। (৪) ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে কার্বনকণা, ইমিউন কমপ্লেক্স, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে ভক্ষণ করে। (৫) এরা কিছু অ্যান্টিজেনিক বস্তুও ধারণ করে।

2020/8/4 17:27

Scanned with CamScanner

মানবদেহের রক্তের বিভিন্ন রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ

রক্তকণিকা	প্রকারভেদ	সংখ্যা (প্রতি ঘন মিমি রক্তে)	উৎসস্থল	গঠন বৈশিষ্ট্য	কাজ	আয়ুষ্কাল (জীবনকাল)
লোহিত রক্তকণিকা	-	৫০ লাখ	ভ্রূণাবস্থায় যকৃৎ ও প্লিহা এবং জন্মের পর লাল অস্থিমজ্জা।	গোলাকার, দ্বি-অবতল, পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিউক্লিয়াসবিহীন; গড় ব্যাস ৭.৩ μm ও স্থূলতা ২.২ μm.	O_2 ও CO_2 বহন করে। অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করে।	১২০ দিন
শ্বেত রক্তকণিকা	নিউট্রোফিল	৩-৬ হাজার	লাল অস্থিমজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত, নিউক্লিয়াস ২-৭ খণ্ডবিশিষ্ট। ব্যাস ১০μm -১৪μm.	ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে।	২-৪ দিন
	ইওসিনোফিল	১০০-৪০০	লাল অস্থিমজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত, নিউক্লিয়াস ২-৩ খণ্ডবিশিষ্ট। ব্যাস ১০μm -১২μm.	হিস্টামিন ক্ষরণ করে অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে।	৮-১২ দিন
	বেসোফিল	২৫-২০০	লাল অস্থিমজ্জা	দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস বৃক্কাকার, খণ্ডক বিশিষ্ট ব্যাস ৮μm - ১০μm.	হেপারিন নিঃসরণ করে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।	১২-১৫ দিন
	লিম্ফোসাইট	১৫০০-২৭০০	প্লিহা, লসিকা গ্রন্থি, যকৃৎ, লাল অস্থিমজ্জা।	দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, প্রায় গোলাকার, বৃহদাকার নিউক্লিয়াস। ব্যাস ৭μm -১৪μm.	অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে।	সপ্তাহ থেকে সমগ্র জীবনব্যাপী
	মনোসাইট	৩৫০-৮০০	প্লিহা, লসিকা গ্রন্থি, যকৃৎ, লাল অস্থিমজ্জা।	দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, বৃক্কাকার নিউক্লিয়াস। ব্যাস ১০μm -২০μm.	ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে।	২-৪ দিন
অনুচক্রিকা	-	২.৫ লাখ - ৫ লাখ	লাল অস্থিমজ্জা।	গোল, ডিম্বাকার বা রডের মতো, দানাময় কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন। ব্যাস ২μm -৫μm.	রক্ততঞ্চনে সহায়তা করে।	৫-১০ দিন

লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকার মধ্যে তুলনা

তুলনীয় বিষয়	লোহিত কণিকা	শ্বেত রক্তকণিকা	অনুচক্রিকা
১। সংখ্যা (প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে)	প্রায় ৫০ লাখ।	৫-৮ হাজার।	২.৫ লাখ - ৫ লাখ।
২। নিউক্লিয়াস	প্রাথমিকভাবে নিউক্লিয়াস থাকলেও পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াসবিহীন।	নিউক্লিয়াসযুক্ত।	নিউক্লিয়াসবিহীন।
৩। সাইটোপ্লাজম	দানাবিহীন।	দানাযুক্ত।	দানাযুক্ত।
৪। হিমোগ্লোবিন	উপস্থিত।	থাকে না।	থাকে না।
৫। বর্ণ	লাল বর্ণের।	বর্ণহীন।	বর্ণহীন।
৬। আকার	গোলাকার ও দ্বি-অবতল।	গোলাকার বা অনিয়তাকার।	গোলাকার বা ডিম্বাকার বা অনিয়তাকার।
৭। গড় আয়ু	১২০ দিন।	১-১৫ দিন।	৫-১০ দিন।
৮। প্রকারভেদ	নেই।	এরা পাঁচ প্রকার। যথা– নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, বেসোফিল, লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট।	নেই।
৯। কাজ	O_2 ও CO_2 পরিবহন করা।	রোগজীবাণু ধ্বংস ও রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করা।	রক্ত তঞ্চন করা।

2020/8/4 17:27

Scanned with CamScanner

[**প্রাসঙ্গিক তথ্য : রক্তের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের স্বাভাবিক মান**
হিমোগ্লোবিন : 13 – 15 gm/dl (গড় 14.5 gm); **শর্করা :** PP (Post Parandial) 80 – 120 mg/dl; Fasting 70 – 110 mg/dl
সিরাম কোলেস্টেরল : 100 – 150 mg/dl; **সিরাম ইউরিয়া :** 15 – 40 mg/dl; **সিরাম বিলিরুবিন :** 0.2 – 1.0 mg/dl
ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) : প্রথম ঘণ্টায় 5 mm এবং দ্বিতীয় ঘণ্টায় 10 mm হয়।
BT (Bleeding Time) : 2 – 5 মিনিট; **CT (Clotting Time)** : 2 – 8 মিনিট ; **dl = Decilitre**

রক্তের কয়েকটি অস্বাভাবিক অবস্থা

পলিসাইথিমিয়া : লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাওয়া। কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি রোগে লোহিত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। এটি মুখ্য ও গৌণ হতে পারে।

অলিগোসাইথিমিয়া : রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক কমে যাওয়া। অ্যানিমিয়া রোগে লোহিত কণিকার সংখ্যা কমে যায়।

অ্যানিমিয়া : শরীরে হিমোগ্লোবিনের অভাব হলে রক্তশূন্যতা বা **অ্যানিমিয়া** দেখা দেয়।

থ্যালাসেমিয়া : হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষের ত্রুটিজনিত এক ধরনের বংশগত রোগ, যেক্ষেত্রে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়।

লিউকোসাইথিমিয়া বা লিউকোসাইটোসিস : রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বেড়ে যাওয়া। নিউমোনিয়া, হুপিংকাশি ইত্যাদি রোগে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়।

লিউকোমিয়া : যখন শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে যায় (প্রতি মাইক্রোলিটারে ৫০,০০০ - ১,০০০,০০০)। যেমন– ব্লাড ক্যান্সার।

লিউকোপিনিয়া : রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা যখন স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক কমে যায়।

থ্রম্বোসাইটোসিস : রক্তে অনুচক্রিকার পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়া।

থ্রম্বোসাইটেপিনিয়া : রক্তে অনুচক্রিকার পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা কমে যাওয়া।

পেরিকার্ডাইটিস : হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লির প্রদাহ; বুকে তীব্র ব্যথা ও কাশি।

BT এবং CT : রক্তক্ষরণ শুরু থেকে রক্ত তঞ্চিত হওয়ার সময়কালকে তঞ্চনকাল বা CT (Clotting time) বলে। অপরপক্ষে, রক্তক্ষরণ শুরু হওয়া থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে রক্ত মোক্ষণকাল বা BT (Bleeding time) বলে। CT = 4-5 মিনিট এবং BT = 2-5 মিনিট।]

রক্ততঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধা (Blood Clotting)

দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে বা আঘাতের কারণে ক্ষতস্থানের মাধ্যমে রক্তপাত হলে রক্তে উপস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বাঁধে। ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। **যে প্রক্রিয়ায় কোনো ক্ষতের মুখে রক্ত জমাট বেঁধে দেহ থেকে অবাঞ্ছিত রক্তপাত বন্ধ হয় তাকে রক্ততঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধা বলে।** রক্ততঞ্চনে **অনুচক্রিকা** ও **ফাইব্রিনোজেন** সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। দ্রবণীয় ফাইব্রিনোজেন অদ্রবণীয় ফাইব্রিন জালকে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে এতে রক্তকণিকাসমূহ আবদ্ধ হওয়ার জন্য রক্ত তরলতা হারিয়ে জেলিতে পরিণত হয়ে ক্ষতস্থান বন্ধ করে। সমগ্র রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল এবং **১৩টি রক্ততঞ্চন ফ্যাক্টর** বা **ক্লটিং ফ্যাক্টর** (coagulation factors or clotting factor) সমন্বিত কার্যের দ্বারা সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন, থ্রম্বোপ্লাস্টিন ও Ca++ -এ ৪টি ফ্যাক্টর গুরুত্বপূর্ণ। এ ফ্যাক্টরগুলো রক্তরস ও রক্তকণিকায় বিদ্যমান থাকে।

রক্ততঞ্চন ফ্যাক্টরগুলোর নাম এবং রক্ততঞ্চনে এদের ভূমিকার ছক

ফ্যাক্টর	তঞ্চনে ভূমিকা
১। Factor I বা ফাইব্রিনোজেন (Fibrinogen)	এটি গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিন। তঞ্চনের সময় **ফাইব্রিনে** পরিণত হয়।
২। Factor II বা প্রোথ্রম্বিন (Prothrombin)	এটি প্লাজমা প্রোটিন। ভিটামিন K-র উপস্থিতিতে যকৃতে সংশ্লেষিত হয়। তঞ্চনের সময় **থ্রম্বিনে** পরিণত হয়।
৩। Factor III বা থ্রম্বোপ্লাস্টিন (Thromboplastin)	এটি বিনষ্ট কলাকোষ বা ভাঙা অনুচক্রিকা থেকে নিঃসৃত হয়। এটি ক্যালসিয়াম আয়নের সহায়তায় **প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে** পরিণত করে।
৪। Factor IV বা ক্যালসিয়াম আয়ন (Calcium ion)	ক্যালসিয়াম আয়ন একাধারে থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে প্রোথম্বিনকে **থ্রম্বিনে** পরিণত করে।
৫। Factor V বা ল্যাবাইল ফ্যাক্টর বা প্রোঅ্যাকসেলারিন (Proaccelerin)	প্লাজমায় অবস্থিত প্রোটিন জাতীয় এ পদার্থটি **প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে** পরিণত করে।

2020/8/4 11:27

Scanned with CamScanner

ফ্যাক্টর	তঞ্চনে ভূমিকা
৬। Factor VI বা অ্যাকসেলারিন (Accelerin)	এটি প্রকল্পিত (অর্থাৎ Does not exist)।
৭। Factor VII বা স্টেবল ফ্যাক্টর বা প্রোকনভারটিন (Proconvertin)	প্লাজমায় অবস্থিত এই প্রোটিনটি **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** উৎপাদনে সাহায্য করে।
৮। Factor VIII বা অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর (AHF)/Antihaemophilic factor A	এটি প্লাজমায় থাকে এবং **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** সৃষ্টিতে সাহায্য করে।
৯। Factor IX বা ক্রিস্টমাস (Chrismas) ফ্যাক্টর	এটি প্লাজমায় থাকে এবং থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে।
১০। Factor X বা স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর/Antihaemophilic factor B	এর রাসায়নিক উপাদান ফ্যাক্টর VII-এর মতো। এর অভাবে **রক্ততঞ্চন** ব্যাহত হয়।
১১। Factor XI বা প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন অ্যান্টিসিডেন্ট (PTA)/Antihaemophilic factor C	রক্তরসে অবস্থিত প্রোটিন **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** গঠনে অংশ নেয়।
১২। Factor XII বা হ্যাগমান (Hageman) ফ্যাক্টর	রক্তরসে অবস্থিত এই ফ্যাক্টর **ক্যালিক্রেইনকে** (kallikrein) সক্রিয় করে এবং **প্লাজমাকাইনিন** (plasmakinin) নামক পদার্থ সৃষ্টি করে রক্তনালির ভেদ্যতা ও সম্প্রসারণশীলতা বাড়ায়।
১৩। Factor XIII বা ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং (Fibrin stabilizing) ফ্যাক্টর	এটি ক্যালসিয়াম আয়নের সহযোগিতায় রক্তের নরম তঞ্চন পিণ্ডকে অদ্রবণীয় কঠিন তন্তুতে রূপান্তরিত করে।

রক্ততঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধার কৌশল

১। দেহের কোনো স্থান কেটে ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত বায়ুর সংস্পর্শে আসে এবং ক্ষতস্থানের অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট ভাঙনের ফলে **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** নামক এনজাইমে পরিণত হয়।

২। থ্রম্বোপ্লাস্টিন রক্তের **হেপারিনকে** অকেজো করে দেয় এবং রক্তরসে অবস্থিত ক্যালসিয়াম আয়নের (Ca^{2+}) উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় **প্রোথ্রোম্বিন** নামক গ্লাইকোপ্রোটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সক্রিয় **থ্রোম্বিন** এনজাইম উৎপন্ন করে।

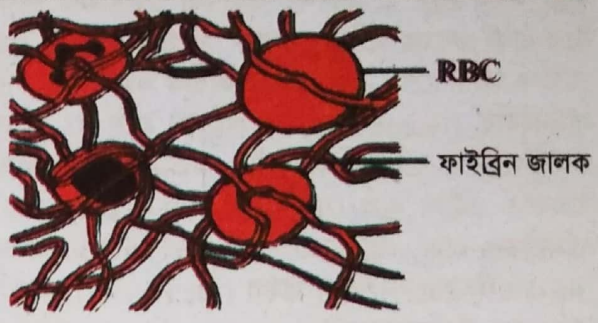

চিত্র ৪.২ : ফাইব্রিন জালকে রক্তকণিকা আবদ্ধ

৩। থ্রোম্বিন রক্তে অবস্থিত দ্রবণীয় প্লাজমাপ্রোটিন **ফাইব্রিনোজেনকে** প্রথমে অদ্রবণীয় **ফাইব্রিন মনোমার** ও পরে **ফাইব্রিন পলিমার** এবং **ফাইব্রিন জালক** সৃষ্টি করে।

৪। ফাইব্রিন জালকে রক্তকণিকা আটকা পড়ে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়। মানুষে রক্ত জমাট বাঁধার স্বাভাবিক সময় **৪-৫ মিনিট**।

সংক্ষেপে রক্ততঞ্চন কৌশলের পর্যায়ক্রমিক ধাপ :

১. বিনষ্ট কলা ও বিমুক্ত রক্তের থ্রম্বোসাইট বাতাসের সংস্পর্শে এসে

২. থ্রম্বোসাইট ⟶ থ্রম্বোপ্লাস্টিন

৩. থ্রম্বোপ্লাস্টিন + প্রোথ্রোম্বিন —(প্লাজমা এনজাইম (ফ্যাক্টর VII, VIII, IX, X) ও Ca_{2+})⟶ থ্রোম্বিন

৪. থ্রোম্বিন + ফাইব্রিনোজেন ⟶ ফাইব্রিন মনোমার

৫. ফাইব্রিন মনোমার (অনেকগুলো) ⟶ ফাইব্রিন পলিমার ⟶ ফাইব্রিন জালক

৬. ফাইব্রিন জালক + আবদ্ধ লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকা ⟶ রক্ততঞ্চন

তঞ্চন ফ্যাক্টরের অনুপস্থিতি কিংবা স্বল্প মাত্রায় উপস্থিতির কারণে তঞ্চন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। যেমন : তঞ্চন ফ্যাক্টর VIII বা ফ্যাক্টর IX-এর অনুপস্থিতির কারণে থ্রম্বোপ্লাস্টিন অকার্যকর থেকে **হিমোফিলিয়া** (haemophilia) রোগের সৃষ্টি করে। **রক্ত জমাট বাঁধার পর খড় (straw) রং সদৃশ যে তরল পৃথক হয় তাকে সিরাম (serum) বলে**। সিরাম বস্তুতপক্ষে রক্তরস, তবে এতে ফাইব্রিনোজেন ও তঞ্চন ফ্যাক্টর II, V ও VIII থাকে না এবং এতে অধিক সেরোটোনিন থাকে। **সেরোটোনিন** রক্তনালির সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হ্রাস করে। রক্ত সিরাম নিয়ে অধ্যয়নের বিষয়কে **সেরোলজি** (serology) বলা হয়। রক্তরসে **হেপারিন** (heparin)-এর উপস্থিতির কারণে রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না। হেপারিন প্রোথ্রোম্বিনকে থ্রোম্বিনে ও ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিবর্তন প্রতিহত করে।

2020/8/4 17:27

Scanned with CamScanner

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তনালিতে রক্তজমাট না বাঁধার কারণ–

১। দেহে রক্ত প্রচণ্ড গতিতে অবিরাম প্রবহমান থাকার ফলে।
২। রক্তনালীর এন্ডোথেলিয়াম প্রাচীর অত্যন্ত মসৃণ থাকায়।
৩। রক্তের মধ্যে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর হেপারিন থাকায়।
৪। সক্রিয় কোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টরগুলোকে যকৃৎ কর্তৃক সর্বদা অপসারিত হওয়ায়।
৫। মানুষের রক্ত ও অন্যান্য কলাতে প্রায় ৫০ ধরনের উপাদান বা ফ্যাক্টর আছে যেগুলো রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এদেরকে দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়, যথা– (ক) **প্রোকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর–** এরা রক্ততঞ্চনকে উদ্দীপিত করে এবং (খ) **অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর–** এরা রক্ততঞ্চনকে প্রতিরোধ করে। রক্ততঞ্চন নির্ভর করে দেহে প্রোকোয়াগুলেন্ট ও অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট উপাদানসমূহের ভারসাম্যের উপর। স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রোকোয়াগুলেন্টের উপর প্রকট। ফলে রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না।

❑ **কাজ :** (i) হাত সামান্য কেটে গেলে রক্তক্ষরণের এক পর্যায়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়– প্রক্রিয়াটির শারীরতত্ত্ব ব্যাখ্যা দাও। (ii) হাত কেটে গেলে বিশেষ তরল পদার্থ বের হওয়া বন্ধ হয় কিভাবে তা ব্যাখ্যা কর। (iii) রক্ত জমাট বাঁধার কৌশল ব্যাখ্যা কর।

৪.২ লসিকা বা লিম্ফ (Lymph)

প্রধানত কৈশিক জালিকার ভেদ্য প্রাচীরের মাধ্যমে রক্তের যে তরল অংশ বের হয়ে শিরা ও ধমনির জালকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে দেহের প্রতিটি কোষকে সিক্ত রাখে তাকে **লসিকা** বলে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যে **স্বচ্ছ, ঈষৎ হলুদ বা বর্ণহীন, ক্ষারধর্মী পরিবর্তিত কলারস বা টিস্যুরস** (tissue fluid) **যা কলাকোষে পুষ্টিদ্রব্য সরবরাহ করে এবং দেহের প্রতিরক্ষামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তাকে লসিকা বা লিম্ফ বলে**। লসিকা রক্তের ন্যায় এক প্রকার যোজক কলাবিশেষ। এরা **বহিঃকোষীয় তরল** নামে পরিচিত। লসিকা সাধারণত **লসিকা জালক** (lymph capillaries), **লসিকাবাহ** (lymphatics) **ও লসিকা গ্রন্থি** বা **লসিকা-গণ্ডে** (lymph glands or lymph nodes) অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে এ লসিকার মাধ্যমেই প্রতিটি কোষে খাদ্যরস ও অক্সিজেন পৌঁছায় এবং অপ্রয়োজনীয় CO_2 ও বর্জ্য পদার্থ লসিকায় গৃহীত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত রক্ত ও লসিকার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী তরলকে **লসিকারস** বলে। মানবদেহে লসিকার পরিমাণ প্রায় রক্তের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০-১২ লিটার। দেহ কোষের পারপাশে বিদ্যমান **ইন্টারস্টেশিয়াল তরল** (interstitial fluid) থেকে লসিকা সৃষ্টি হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় লসিকা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **লিম্ফোজেনেসিস** (lymphogenesis) বলা হয়।

লসিকায় কেবল লিম্ফোসাইট (T-Lymphocytes and B-Lymphocytes) প্রকৃতির শ্বেতকণিকা বিদ্যমান। অনেকে মনে করেন, কিছু অনুচক্রিকাও উপস্থিত থাকে। লোহিত রক্তকণিকা অনুপস্থিত। লসিকার উপাদান অনেকটা রক্তের মতো হলেও তাতে প্রোটিনের পরিমাণ রক্তরস বা প্লাজমার অর্ধেক। লসিকার pH ৭.৪-৯.০ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১.০১-১.০১৬। এর ৯৪%ই পানি এবং ৬% কঠিন পদার্থ। লসিকায় অধিক পরিমাণ CO_2 দ্রবীভূত থাকে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। বেশি চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকা দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে **কাইল** (chyle) বলে। লসিকার বিভিন্ন উপাদান ছকের সাহায্যে উল্লেখ করা হলো–

লসিকার উপাদানের ছক

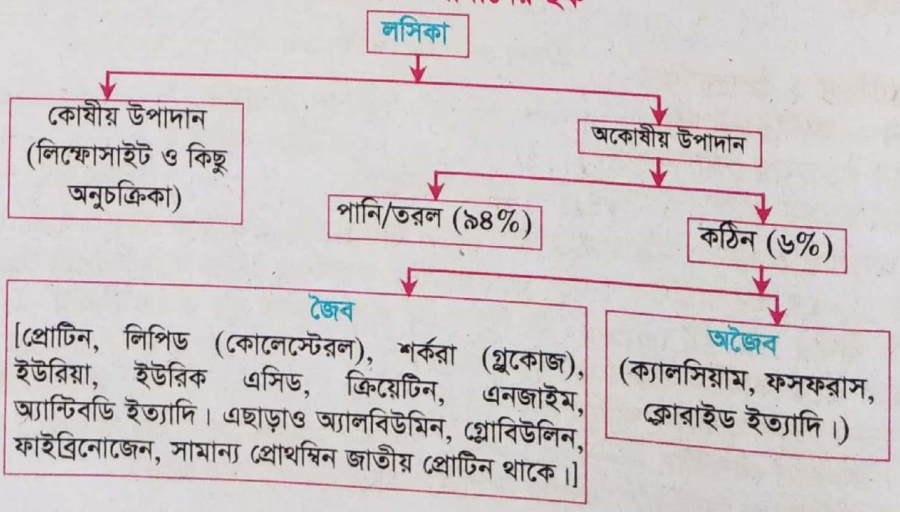

2020/8/4 17:28

Scanned with CamScanner

লসিকার গুরুত্ব বা কাজ (Importance of lymph)

১। লসিকার মাধ্যমে প্রতিটি কোষে খাদ্যরস ও O_2 পৌঁছায়।

২। আন্তঃকোষীয় উন্মুক্ত স্থান থেকে অধিকাংশ প্রোটিন লসিকার মাধ্যমে রক্তে ফিরে আসে।

৩। যেসব লিপিড কণা রক্তের কৈশিক জালিকার মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হতে পারে না, সেগুলো লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

৪। অপ্রয়োজনীয় CO_2 এবং বর্জ্য পদার্থ লসিকায় গৃহীত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হয়।

৫। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের ল্যাকটিয়েলের মাধ্যমে চর্বিজাতীয় খাদ্য শোষিত হয় এবং লসিকানালির লসিকার সাহায্যে রক্তস্রোতে প্রেরিত হয়।

৬। দেহের যেসব স্থানে রক্ত পৌঁছাতে পারে না, সেসব অঞ্চলে লসিকা রক্ত থেকে খাদ্যবস্তু, অক্সিজেন, হরমোন ও ভিটামিন সরবরাহ করে। লসিকা দেহে একটি **মধ্যস্থতাকারী** (mediator) তরল হিসেবে কাজ করে।

৭। লসিকা দেহরক্ষার কাজ করে এবং ইমিউনিটি বৃদ্ধি করে।

৮। লসিকা মধ্যস্থ শ্বেতকণিকা (লিম্ফোসাইট) জীবাণু ধ্বংস করে এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

৯। বিভিন্ন অঙ্গে টিস্যুর গাঠনিক অখণ্ডতা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১০। কলারসের এক-দশমাংশ লসিকার মাধ্যমে অপসারিত হয়। লসিকানালির মধ্যে কোনো কারণে লসিকা প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে সে স্থানে লসিকা পুঞ্জীভূত হয় এবং ফুলে ওঠে। একে **শোথ** বা **ইডিমা** (edema) বলে।

১১। লসিকা Antigen-presenting cell (APCs) পরিবহন করে লসিকা গ্রন্থিতে নিয়ে যায় যেখানে অনাক্রম্যতা সাড়াদানের সূচনা ঘটে।

মানুষের রক্ত ও লসিকা-এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	রক্ত	লসিকা
১। বর্ণ	লাল বর্ণের।	বর্ণহীন বা হালকা হলুদ।
২। কণিকা	লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা এবং অনুচক্রিকা থাকে।	কেবল লিম্ফোসাইট নামক শ্বেতকণিকা থাকে।
৩। হিমোগ্লোবিন	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৪। ফাইব্রিনোজেন	রক্তে অধিক পরিমাণে থাকে।	লসিকায় কম পরিমাণে থাকে।
৫। পরিবহন	রক্তবাহের মাধ্যমে সংবাহিত হয়।	লসিকাবাহের মাধ্যমে সংবাহিত হয়।
৬। যোগাযোগ	রক্তের সাথে কলাকোষের সরাসরি যোগাযোগ থাকে না।	লসিকার সাথে কলাকোষের সরাসরি যোগাযোগ থাকে।
৭। প্রোটিন	লসিকা অপেক্ষা বেশি।	রক্ত অপেক্ষা অনেক কম।
৮। কাজ	রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস ও খাদ্যকণা (শর্করা ও আমিষ) পরিবাহিত হয়।	লসিকার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্যসার (লিপিড) পরিবাহিত হয়।

লসিকা সংবহনতন্ত্র (Lymphatic System)

যে তন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেহে লসিকা বা লিম্ফ প্রবাহিত হয় তাকে **লসিকা সংবহনতন্ত্র** বলে। ডেনিস বিজ্ঞানী **Olaus, Rudbeck** এবং **Thomas Bartholin** (1760) সর্বপ্রথম মানুষের লসিকা সংবহনতন্ত্রের বর্ণনা দেন। মানুষের তথা প্রাণীদের লসিকা সংবহনতন্ত্র **লসিকা, লসিকা জালক, লসিকানালি** এবং **লসিকাগ্রন্থি** নিয়ে গঠিত।

১। **লসিকা** (Lymph) : লসিকা একপ্রকারের পরিবর্তিত কলারস। রক্তজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে কোষান্তর স্থানে সঞ্চিত হয়। এর উপাদান রক্তের মতো, তবে এতে লোহিত কণিকা, অনুচক্রিকা এবং রক্তে প্রাপ্ত অধিকাংশ প্রোটিন অনুপস্থিত। অনেকে মনে করেন, কিছু অনুচক্রিকাও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

২। **লসিকা জালক** (Lymph capillaries) : রক্তজালক থেকে উৎপন্ন লসিকা প্রথমে কোষান্তর স্থানে এসে জমা হয়। কোষান্তর স্থানের চারদিকে লসিকা জালক থাকে। লসিকা এই জালকে প্রবেশ করে এবং লসিকাবাহে আসে। লসিকা জালকের প্রাচীর কেবল এন্ডোথেলিয়াম পরিবেষ্টিত থাকে।

Scanned with CamScanner

৩। লসিকাবাহ বা লসিকানালি (Lymphatic vessels) : লসিকা জালকগুলো মিলিত হয়ে লসিকাবাহ বা লসিকানালি গঠন করে। **যে বিশেষ ধরনের নালিকার মাধ্যমে লসিকা সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয় তাদের লসিকাবাহ বা লসিকানালি বলে।** লসিকাবাহের প্রাচীরের তিনটি স্তর হলো– ফাইব্রিন কলা নিয়ে গঠিত **বহিঃপ্রাচীর**, পেশিময় **মধ্যপ্রাচীর** এবং এন্ডোথেলিয়াম বেষ্টিত **অন্তঃপ্রাচীর**।

লসিকাবাহের প্রাচীরের একস্তরী এন্ডোথেলিয়াম কোষগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যাতে কোনো বস্তু নালিকার ভেতর প্রবেশ করতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না। দেহের বিভিন্ন স্থানের আন্তঃকোষীয় ফাঁকা স্থান থেকে সূক্ষ্ম ও বদ্ধপ্রান্ত বিশিষ্ট লসিকানালির যাত্রা শুরু হয়। অন্ত্রের প্রাচীরের সুবিকশিত লসিকানালিগুলোকে **ল্যাকটিয়েল** (lacteal) বলে। লসিকাবাহে কপাটিকা থাকে। সমস্ত দেহে অসংখ্য লসিকাবাহ থাকে। লসিকাবাহগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রধান দুটি বৃহৎ নালি গঠন করে, যথা– বাঁদিকে **থোরাসিক ডাক্ট বা বক্ষ লসিকানালি** এবং ডানদিকে **ডান লিম্ফাটিক ডাক্ট বা দক্ষিণ লসিকানালি**।

(ক) থোরাসিক ডাক্ট (Thoracic duct) : বাম দিকের লসিকাবাহগুলো মিলিত হয়ে যে প্রধান লসিকাবাহ গঠন করে তাকে থোরাসিক ডাক্ট বলে। থোরাসিক ডাক্ট **বাম সাবক্লেভিয়ান শিরায়** উন্মুক্ত থাকে।

(খ) ডান লিম্ফাটিক ডাক্ট (Right lymphatic) : ডান দিকের লসিকাবাহগুলো মিলিত হয়ে ডান লিম্ফাটিক ডাক্ট গঠন করে। এই ডাক্ট **ডান সাবক্লেভিয়ান শিরায়** উন্মুক্ত থাকে।

৪. লসিকা গ্রন্থি বা লসিকা পর্ব (Lymph gland/ Lymph node) : লসিকানালির স্বল্প ব্যবধানে বহু গোলাকার বা ডিম্বাকার বা বৃক্কাকার স্ফীত অংশ থাকে, এদের **লসিকা গ্রন্থি** বা **লসিকা পর্ব** বা **লসিকা-গণ্ড** বলে। এদের সংখ্যা অনেক (প্রায় ৪০০-৭০০)। সাধারণত লসিকাবাহের দৈর্ঘ্য বরাবর অবস্থান করে।

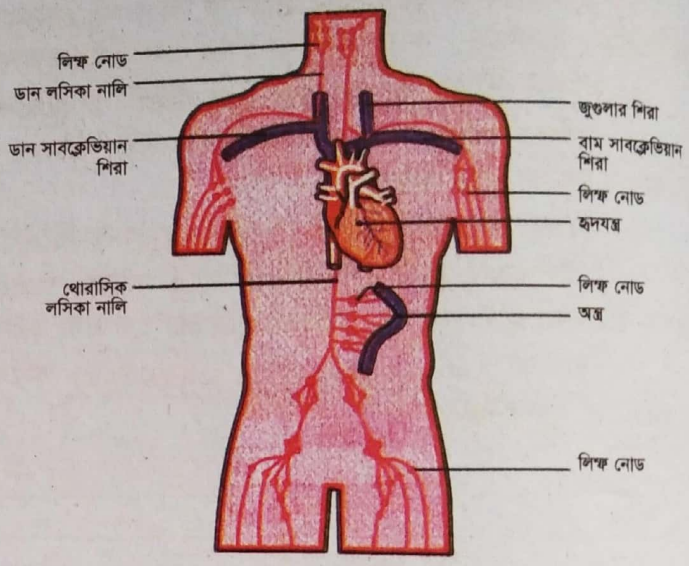

চিত্র ৪.৩ : মানুষের লসিকা সংবহনতন্ত্র

প্রতিটি লসিকাগ্রন্থি **ক্যাপসুল** (capsule) নামক আবরণ দিয়ে আবৃত। ভেতরের কলা বাইরের দিকে **কর্টেক্স** এবং ভেতরের দিকে **মেডুলা** নিয়ে গঠিত। লসিকাগ্রন্থি রক্তে B-**লিম্ফোসাইট** ও T-**লিম্ফোসাইট** সরবরাহ করে। লিম্ফোসাইট কোষ আগ্রাসন প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধ্বংস করে। প্লিহা (spleen), টনসিল (tonsil), অ্যাডেনয়েড (adenoid) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য লসিকাগ্রন্থি।

প্লিহাকে মানবদেহের সবচেয়ে বড় লসিকাগ্রন্থি হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি রক্তের **রিজার্ভার** বা **ব্লাড ব্যাংক** নামেও পরিচিত এবং এটি প্রায় ৩০০ মিলিলিটার রক্ত জমা রাখে। টনসিল গলার ভেতরে ডান ও বাম দিকে অবস্থিত ছোট বলের মতো গঠন বিশেষ। এটি প্রচুর লিম্ফোসাইট ও অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে মুখে প্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অনেকসময় ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস দ্বারা টনসিল আক্রান্ত হয়ে **টনসিলাইটিস** (tonsillitis) বা **টনসিলের প্রদাহ** সৃষ্টি করে। লসিকাগ্রন্থিগুলো ঘাড়ে (neck), বগলে (armpit), কুঁচকিতে (groin) এবং থোরাসিক মিডিয়াস্টাইনামে (thoracic mediastinum) অধিক পরিমাণে থাকে। এরা যান্ত্রিক ছাঁকুনি হিসেবে কাজ করে এবং বিভিন্ন প্রকার জীবাণু ও ক্ষতিকর কোষের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করে।

মানুষ ফাইলেরিয়া কৃমি (*Wuchereria bancrofti*) দ্বারা আক্রান্ত হলে লসিকানালি ও লসিকা গ্রন্থিগুলোতে লসিকা প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয় এবং এগুলো অস্বাভাবিক ফুলে গিয়ে **গোদ রোগ** বা **ফাইলেরিয়া** বা **এলিফ্যানটিয়াসিস** (elephantiasis) সৃষ্টি করে।

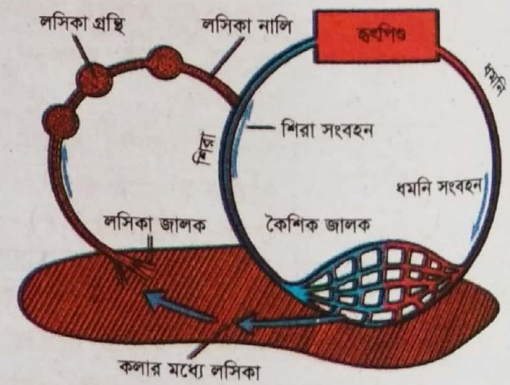

চিত্র ৪.৪(ক) : লসিকা সংবহনের রেখাচিত্র

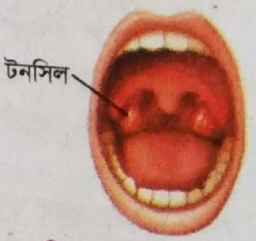

চিত্র ৪.৪(খ) : টনসিল

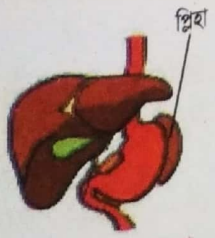

চিত্র ৪.৪(গ) : প্লিহা

2020/8/4 17:28

Scanned with CamScanner

লসিকা সংবহন (Circulation of lymph) : লসিকা রক্তজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে কোষান্তর স্থানে আসে। সেখান থেকে লসিকা জালকে প্রবেশ করে। লসিকা জালক থেকে লসিকা লসিকাবাহে আসে এবং সেখান থেকে থোরাসিক ডাক্ট ও ডান লিম্ফাটিক ডাক্টে প্রবেশ করে। এই ডাক্ট থেকে লসিকা সাবক্লেভিয়ান শিরার মাধ্যমে রক্তে মুক্ত।

লসিকা সংবহনের রেখাচিত্র :

রক্তজালক → লসিকা কোষান্তর স্থান → লসিকা জালক → লসিকাবাহ → থোরাসিক ডাক্ট ও ডান লিম্ফাটিক ডাক্ট → সাবক্লেভিয়ান শিরা

প্লাজমা, লসিকা ও সিরামের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	প্লাজমা বা রক্তরস	লসিকা	সিরাম
১। প্রকৃতি	রক্তের তরল অংশ।	রক্তজালক থেকে নিঃসৃত তরল অংশ।	রক্ত তঞ্চনের পর তঞ্চিত পদার্থ নিঃসৃত তরল অংশ।
২। রক্তকণিকা	লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা এবং অনুচক্রিকা থাকে।	লিম্ফোসাইট প্রকৃতির শ্বেতকণিকা বিদ্যমান।	এতে রক্তকণিকা থাকে না।
৩। ফাইব্রিনোজেন	অধিক পরিমাণ থাকে।	সামান্য পরিমাণ থাকে।	অনুপস্থিত।
৪। অবস্থান	প্রধানত রক্তবাহে ও হৃৎপ্রকোষ্ঠে।	প্রধানত আন্তঃকোষীয় স্থানে।	সাধারণ অবস্থায় দেহে থাকে না।
৫। জমাট বাঁধার ক্ষমতা	জমাট বাধতে পারে।	জমাট বাঁধতে পারে না।	জমাট বাঁধতে পারে না।

লসিকা জালক ও রক্তজালকের মধ্যে পার্থক্য

লসিকা জালক	রক্তজালক
১। এটি বর্ণহীন হওয়ায় পর্যবেক্ষণ করা কঠিন।	১। লালচে রঙের হওয়ায় সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়।
২। অগ্রভাগ বন্ধ।	২। একপ্রান্ত উপধমনির (arterioles) সঙ্গে এবং অপরপ্রান্ত উপশিরার (venules) সঙ্গে যুক্ত থাকে।
৩। রক্তজালক অপেক্ষা প্রশস্ত।	৩। লসিকা জালকের তুলনায় সরু।
৪। পুরুত্ব সব স্থানে সমান নয়।	৪। পুরুত্ব সব স্থানেই সমান।
৫। প্রাচীর পাতলা এন্ডোথেলিয়াম নিয়ে গঠিত এবং ভিত্তিপর্দা খুব দুর্বল।	৫। প্রাচীর সাধারণ এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্তিপর্দা দিয়ে গঠিত।
৬। বর্ণহীন লসিকা ধারণ করে।	৬। লাল রক্ত ধারণ করে।

কলারস (Tissue Fluid) [প্রাসঙ্গিক বিষয়]

দেহের আন্তঃকোষীয় ফাঁকে বিদ্যমান তরলকে **কলারস** বা **টিস্যু ফ্লুইড** বলে। ইহা কৈশিক নালিকা, কোষ ও লসিকার মধ্যে পুষ্টি পদার্থ, গ্যাস ও বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ বিনিময়ের সংযোগ সৃষ্টি করে। ইহা প্রকৃতপক্ষে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ গঠন করে এবং সকল কোষ-কলাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। কলারস উৎপাদনে রক্ত এবং কোষ-কলা উভয়েই অংশগ্রহণ করে। তবে এর অধিকাংশই রক্তের প্লাজমা থেকে সৃষ্টি হয়।

কলারসের প্রকৃত উপাদান সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে যেহেতু ইহা রক্ত এবং কোষ-কলা থেকে সৃষ্টি হয় সেহেতু কোষ হতে আগত CO_2, রেচন বর্জ্য, পানি এবং কৈশিকনালিকার প্রাচীর ভেদ করে রক্ত থেকে আসা পানি, দ্রবীভূত O_2, খাদ্যসার, গ্লুকোজ, ফ্যাটি এসিড, অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন, হরমোন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি কলারসের উপাদান হিসেবে গণ্য। কলারসে লোহিত রক্তকণিকা, প্লেটলেট (থ্রোম্বোসাইট) এবং প্লাজমা প্রোটিন থাকে না।

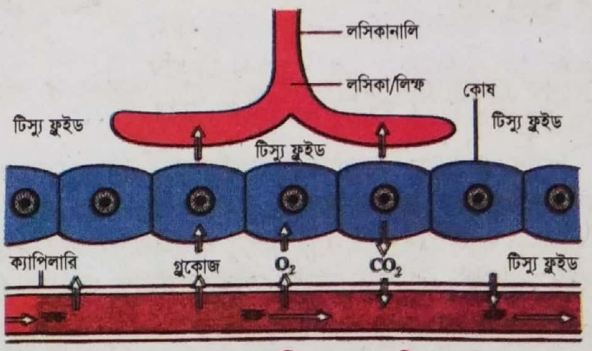

চিত্র ৪.৫ : রক্ত, লসিকা এবং টিস্যু ফ্লুইড

2020/8/4 17:28

Scanned with CamScanner

কলারসের কাজ

(১) কলারস দেহাভ্যন্তরে এমন একটি মাধ্যম গঠন করে যেখানে কোষ-কলা নিমজ্জিত থাকে। (২) কোষ কলারস থেকে অক্সিজেন ও পুষ্টি পদার্থ গ্রহণ করে এবং সকল বিপাকীয় বর্জ্য এতে ত্যাগ করে। (৩) ইহা পানি, লবণ ও পুষ্টি পদার্থের বৃহৎ ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (৪) কলারসের পানি দেহে রক্তের পরিমাণের সাম্যতা রক্ষা করে। (৫) ইহা দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে। (৬) কৈশিক জালকের রক্ত কলারসের প্রায় ৯০% অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পুনরায় গ্রহণ করে নেয়।

কলারস ও লসিকা-এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	কলারস	লসিকা
১। উৎপত্তি	রক্তের প্লাজমা থেকে উৎপন্ন হয়।	কলারস থেকে উৎপন্ন হয়।
২। অবস্থান	আন্তঃকোষীয় স্থানে।	লসিকাবাহে।
৩। প্রোটিন	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।
৪। শ্বেত কণিকা	অনুপস্থিত।	উপস্থিত (লিম্ফোসাইট)।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : রক্তকণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৪.৩ মানুষের হৃৎপিণ্ডের গঠন (Structure of Human Heart)

হৃৎপিণ্ড (heart) রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার জন্য চাপ সৃষ্টিকারী মাংসল ফাঁপা, বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, সর্বক্ষণ নির্দিষ্ট ছন্দ ও হারে স্পন্দনশীল একটি প্রধান কেন্দ্রীয় যন্ত্র বিশেষ। যাকে সজীব পাম্পিং অঙ্গও বলা হয়। এটি ছান্দিক গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহের অঙ্গ ও কলায় O_2-যুক্ত রক্ত (ফুসফুস ব্যাতীত) সরবরাহ করে এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গ ও কলা থেকে CO_2-যুক্ত রক্ত গ্রহণ করে। একজন সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃৎপিণ্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি নিলয় বা ভেন্ট্রিকল থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার (বা দেড় লাখ টন) রক্ত বের করে দেয়।

১। অবস্থান (Position) : বক্ষগহ্বরের মেডিয়াস্টিনাল স্থানে (mediastinal space) অর্থাৎ মধ্যস্থলে একটু বেশি বাঁদিকে ঘেঁষে, উভয় ফুসফুসের মাঝখানে এবং মধ্যচ্ছদার উপরে হৃৎপিণ্ড অবস্থিত।

২। আকার ও আকৃতি (Shape and Size) : লালচে-খয়েরি বর্ণের হৃৎপিণ্ডটি প্রায় ত্রিকোণাকৃতির মোচার মতো এবং হৃৎপেশি দ্বারা গঠিত। এর চওড়া ঊর্ধ্বমুখী অংশটিকে **বেস** (base) ও ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশটিকে **এপেক্স** (apex) বলে। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য ১২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ ৯ সেন্টিমিটার এবং এটি ৬ সেন্টিমিটার পুরু। একটি হৃৎপিণ্ডের ওজন প্রায় ২৫০-৩৫০ গ্রাম (গড়ে ৩০০ গ্রাম)।

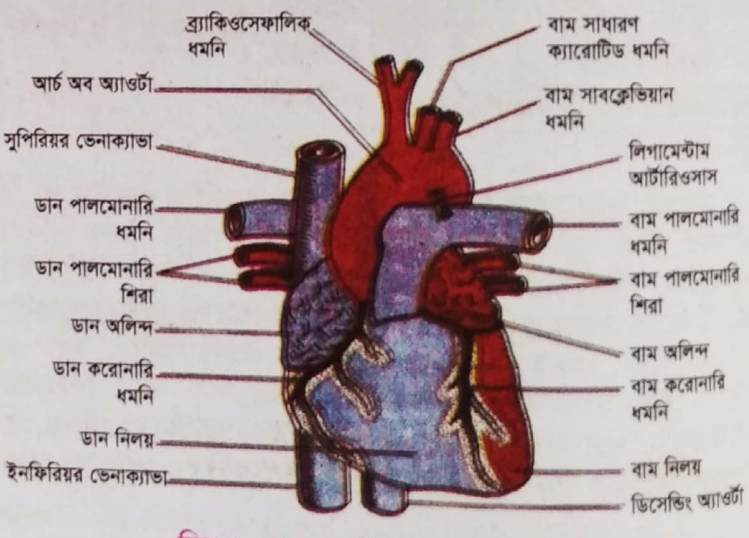

চিত্র ৪.৬ক : হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক গঠন

স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এর ওজন পুরুষের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কম হয়। পুরুষ ও মহিলাদের হৃৎপিণ্ডের ওজন, দেহ-ওজনের যথাক্রমে ০.৪৫% ও ০.৪০%।

৩। আবরণ (Covering) : সমগ্র হৃৎপিণ্ড দ্বিস্তরবিশিষ্ট **পেরিকার্ডিয়াম** (pericardium) নামক মসৃণ ও পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। পেরিকার্ডিয়ামের হৃৎপিণ্ডসংলগ্ন স্তরকে **ভিসেরাল স্তর** (visceral layer) এবং বাইরের স্তরকে **প্যারাইটাল স্তর** (parietal layer) বলে। প্যারাইটাল স্তরটি হৃৎপিণ্ডকে অতিরিক্ত প্রসারিত হতে বাধা দেয়। দুটি স্তরের মাঝে একটি সংকীর্ণ গহ্বর থাকে। এ গহ্বরকে **পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর** (pericardial cavity) বলে যা **পেরিকার্ডিয়াল তরল** (pericardial fluid) দ্বারা পূর্ণ থাকে। এই তরলের পিচ্ছিলতা হৃৎপিণ্ডের অবিরাম ছান্দিক স্পন্দনের অন্যতম কারণ। এ ছাড়া এই তরলই হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে।

2020/8/4 17:28

Scanned with CamScanner

৪। **হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর** (Walls of heart) : হৃৎপিণ্ড প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি ও যোজক কলা দ্বারা গঠিত। এসব পেশিকে হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি (cardiac muscle) বলে। পেশিগুলো তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। যথা :

(ক) এপিকার্ডিয়াম (Epicardium) : হৃৎপ্রাচীরের সবচেয়ে বাইরের স্তর, যা পাতলা ও স্বচ্ছ যোজক কলা নির্মিত। এ স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে।

(খ) মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium) : হৃৎপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর। এই স্তরটি সর্বাপেক্ষা পুরু এবং হৃৎপেশি দ্বারা গঠিত। এটি হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের সংকোচন-প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অলিন্দের মায়োকার্ডিয়ামের স্থূলতা নিলয়ের চেয়ে কম।

(গ) এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium) : এটি যোজক কলা নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তর, যা মসৃণ এবং অপেক্ষাকৃত পাতলা। এটি হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৃৎকপাটিকাসমূহ ঢেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।

৫। **হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ** (Chambers of heart) : মানুষের হৃৎপিণ্ডে প্রকোষ্ঠের সংখ্যা **চারটি**। উপরের দুটিকে ডান ও বাম **অলিন্দ** বা **অ্যাট্রিয়াম** (right & left atrium; pl. atria) এবং নিচের দুটিকে ডান ও বাম **নিলয়** বা **ভেন্ট্রিকল** (right & left ventricle) বলে। অলিন্দ হৃৎপিণ্ডের **গ্রাহক প্রকোষ্ঠ** এবং নিলয় হৃৎপিণ্ডের **প্রেরক প্রকোষ্ঠ** হিসেবে কাজ করে। হৃৎপিণ্ডের এ বিভাজন বাইরের দিক থেকে **করোনারি সালকাস** (coronary sulcus) নামক খাঁজের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়।

(ক) অলিন্দ (Atrium) : দুটি অলিন্দই পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ। কারণ অলিন্দের সংকোচনে রক্ত কেবল নিলয় পর্যন্ত পৌঁছায়। অলিন্দদ্বয়ের মাঝে **আন্তঃঅলিন্দ পর্দা** (inter-atrial septum) থাকে। এর ফলে O_2 ও CO_2 যুক্ত (অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও দূষিত) রক্তের মিশ্রণ ঘটে না। ডান অলিন্দটি বাম অলিন্দের চেয়ে সামান্য বড়। ডান অলিন্দে তিনটি বৃহৎ শিরা উন্মুক্ত হয়। যথা : (১) উপরের দিকে **ঊর্ধ্ব মহাশিরা** বা **সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা** (superior vena cava), (২) নিচের দিকে **নিম্ন মহাশিরা** বা **ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা** (inferior vena cava) এবং (৩) মাঝের দিকে **করোনারি সাইনাস** (coronary sinus)। ডান অলিন্দ একটি **ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র** (right atrio-ventricular orifice) দ্বারা ডান নিলয়ে উন্মুক্ত হয়।

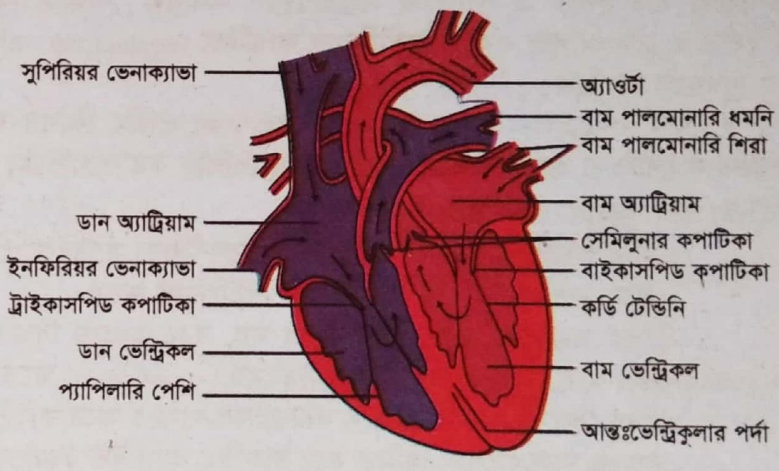

চিত্র ৪.৬খ : হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ [তীর চিহ্ন (→) দিয়ে রক্তের গতিপথ দেখানো হয়েছে]

বাম অলিন্দ একটি ছোট ত্রিকোণাকার প্রকোষ্ঠ বিশেষ। প্রতি পাশে দুটি করে মোট চারটি ফুসফুসীয় বা পালমোনারি শিরা (pulmonary vein) উপরের দিকে কপাটিকাবিহীন ছিদ্রের মাধ্যমে বাম অলিন্দে উন্মুক্ত হয়। বাম অলিন্দ একটি **বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র** (left atrio-ventricular orifice) দ্বারা বাম নিলয়ে উন্মুক্ত হয়।

(খ) নিলয় (Ventricle) : দুটি নিলয়ই পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট। বাম নিলয়ের প্রাচীর সবচেয়ে বেশি পেশিবহুল ও পুরু। এটি ডান নিলয়ের প্রাচীর থেকে প্রায় তিন গুণ পুরু থাকে। এর কারণ হচ্ছে, ডান নিলয় কেবল ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালিত করে কিন্তু বাম নিলয়ের সংকোচনে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। দুটি নিলয়ের প্রাচীরেই খাঁজ থাকে। এ খাঁজগুলোকে **কলামনি কার্নি** বা **ট্রাবিকিউলি কার্নি** (columnae carneae or trabeculae carnae) বলে। এ খাঁজে **প্যাপিলারি পেশি** (papillary muscle) নামক বিশেষ হৃৎপেশি যুক্ত থাকে। নিলয় দুটি একটি **আন্তঃনিলয় পর্দা** (inter-ventricular septum) দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক থাকে। এর ফলে O_2 ও CO_2 যুক্ত রক্তের মিশ্রণ ঘটে না। ডান নিলয় থেকে **পালমোনারি ধমনি** (pulmonary artery) এবং বাম নিলয় থেকে **মহাধমনি** (aorta) বের হয়।

2020/8/4 17:28

Scanned with CamScanner

৬। হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা (Valves of heart) : যা ধমনি বা শিরার রক্তকে একত্রে মিশতে না দিয়ে রক্তপ্রবাহের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে একমুখী করে, তাকেই **কপাটিকা** (valve) বলে। ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মাঝে **ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** (tricuspid valve, তিনটি ঝিল্লিময় কাস্প বা ফ্লাপ বিশিষ্ট) এবং বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝে **বাইকাসপিড কপাটিকা** (bicuspid valve, দুটি ঝিল্লিময় কাস্প বা ফ্লাপ বিশিষ্ট) বা **মাইট্রাল কপাটিকা** (mitral valve) অবস্থান করে। উভয় ধরনের কপাটিকা নিলয় প্রাচীরের মাংসল অভিক্ষেপকারী **প্যাপিলারি পেশির** (papillary muscle) সাথে **কর্ডি টেন্ডিনি** (chordae tendinae) নামক তন্তু দিয়ে যুক্ত থাকে। ডান নিলয় থেকে উদ্ভূত পালমোনারি ধমনি ছিদ্রপথে এবং বাম নিলয় থেকে সৃষ্ট **আওর্টার** মুখে **সেমিলুনার** (semilunar) বা **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা** বা **পকেট ভাল্ব** বিদ্যমান। বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা সামনের দিকে যুক্ত থাকায় কপাটিকাগুলো রক্তের চাপে বিপরীত দিকে ফিরে যায় না। অর্থাৎ রক্ত অলিন্দ থেকে নিলয়ে এলেও নিলয়ের সংকোচনের সময় অলিন্দে ফিরে যেতে পারে না। সেমিলুনার কপাটিকা ধমনিতে প্রবাহিত রক্ত নিলয়ে ফিরে আসতে দেয় না। **পালমোনারি সেমিলুনার কপাটিকা** ডান নিলয় ও পালমোনারি ধমনির সংযোগস্থলে এবং **অ্যাওর্টিক সেমিলুনার কপাটিকা** বাম নিলয় ও অ্যাওর্টার সংযোগস্থলে অবস্থিত। এছাড়া **থিবেসিয়ান** বা **করোনারি কপাটিকা** করোনারি সাইনাস ও ডান অলিন্দ এবং **ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা** (eustachian valve) ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে অবস্থিত।



চিত্র ৪.৬গ : মানুষের হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ

৭। হৃৎপেশি (Muscles of heart) : হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। এদের **কার্ডিয়াক পেশি** বা হৃৎপেশি বলে। এদের কিছু বৈশিষ্ট্য কঙ্কালপেশি বা অন্যান্য পেশির মতো হলেও এরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দ্বারা অন্যান্য পেশি হতে আলাদা–

- এদের স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দময় সংকোচন-প্রসারণশীলতা সম্পূর্ণরূপে অনৈচ্ছিক, কখনো ক্লান্ত হয় না।
- এদের কোষের কেন্দ্রের দিকে একটি নিউক্লিয়াস থাকে।
- এদের তন্তুগুলো সরল চোঙ্গাকৃতির নয়, বরং এগুলো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পাশেরটির সাথে মিশে ত্রৈমাত্রিক নেটওয়ার্ক গঠন করে, যা অপ্রকৃত **সিনসাইসিয়ামের** (syncycium) মতো দেখায়।
- এদের কোষের সারকোপ্লাজমে সমান্তরালে সজ্জিত **মায়োফাইব্রিল** (myofibrils) নামক সূক্ষ্ম তন্তু থাকে।
- কোষের সারকোলেমা মিলিত হয়ে চাকতির ন্যায় **ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক** (intercalated disc) নামক একটি বিশেষ অনুপ্রস্থ রেখা সৃষ্টি করে।
- হৃৎপেশি হৃৎপিণ্ডের প্রতিরক্ষাকারী স্তর গঠন করে।
- হৃৎপেশির কোষগুলোতে (cardiomyocytes) মাইটোকন্ড্রিয়ার আধিক্য দেখা যায়, যা কোষের অবিরাম অবাত শ্বসনের সুযোগ প্রদান করে।
- অধিকাংশ হৃৎপেশি হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত রক্তনালিতে প্রেরণের কাজে নিয়োজিত থাকে।

৮। হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যু (Junctional tissues of heart) : হৃৎপেশিতে কতগুলো প্রয়োজনীয় ও বিশেষ ধরনের গঠন থাকে, যারা হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি ও পরিবহন করে। এদেরকে হৃৎপিণ্ডের **সংযোগী টিস্যু** বা **সংযোগকারী টিস্যু** বলে। এগুলো হলো–

(ক) সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-atrial Node = SAN)
(খ) অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrio-ventricular Node = AVN)
(গ) বান্ডল অব হিজ (Bundle of His = BH)
(ঘ) বান্ডল অব হিজের ডান ও বাম শাখা (Right & Left branches of BH)
(ঙ) পারকিন্‌জি ফাইবার (Purkinje fibres)

❐ **কাজ :** শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র পোস্টার পেপারে অঙ্কন করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন।

2020/8/4 17:28

Scanned with CamScanner

মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকার নাম, অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও কাজ

নাম	অবস্থান	বৈশিষ্ট্য	কাজ
১। বাইকাসপিড কপাটিকা বা মাইট্রাল কপাটিকা বা দ্বিপত্র কপাটিকা	বাম অ্যাট্রিয়াম ও বাম ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।	দুই কাস্প (cusp)/ফ্লাপ (flap)/ পাল্লাযুক্ত কপাটিকা	বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
২। ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বা ত্রিপত্র কপাটিকা	ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।	তিন পাল্লাযুক্ত কপাটিকা	ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে ডান ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৩। অ্যাওর্টিক কপাটিকা	বাম ভেন্ট্রিকল ও অ্যাওর্টার সংযোগস্থলে।	অর্ধচন্দ্রাকার/ সেমিলুনার কপাটিকা	বাম ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টায় রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৪। পালমোনারি কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকল ও পালমোনারি ধমনির সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ধমনীতে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৫। থিবেসিয়ান বা করোনারি কপাটিকা	কারোনারি সাইনাস ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার কপাটিকা	করোনারি সাইনাস থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৬। ইউস্টেসিয়ান কপাটিকা	ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার কপাটিকা	ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা ও সেমিলুনার কপাটিকার মধ্যে পার্থক্য

অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা	সেমিলুনার কপাটিকা
১। অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের ছিদ্র পথে অবস্থিত।	১। অ্যাওর্টা ও পালমোনারি ধমনির উৎপত্তি স্থলে অবস্থিত।
২। অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে একমুখী রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে।	২। ভেন্ট্রিকল থেকে ধমনিতে একমুখী রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে।
৩। দুই বা তিন ফ্লাপযুক্ত ।	৩। অর্ধচন্দ্রাকৃতি। এদেরকে পকেট ভাল্ব বলে ।
৪। কপাটিকাগুলো কর্ডি টেন্ডিনির সাথে যুক্ত।	৪। কর্ডি টেন্ডিনির সাথে যুক্ত নয়। কপাটিকাগুলো রক্তনালির প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত।

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তসংবহন (Circulation of Blood by Heart)

মানব হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭০-৮০ বার (গড়ে ৭৫ বার) স্পন্দিত হয়। অর্থাৎ দিনে প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বার স্পন্দন ঘটে। তাছাড়া এতে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাতে ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালকের মাধ্যমে ৮০,০০০ কিলোমিটারেরও অধিক পথ অতিক্রম সম্ভব হয়। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের ফলেই হৃৎস্পন্দন হয়। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে বলে **সিস্টোল** (systole) এবং প্রসারণকে বলে **ডায়াস্টোল** (diastole)। হৃৎপিণ্ডের সব প্রকোষ্ঠ একসঙ্গে সংকুচিত বা প্রসারিত হয় না। হৃৎপিণ্ডে অ্যাট্রিয়ামদ্বয় (অলিন্দদ্বয়) সংকুচিত হলে ভেন্ট্রিকলদ্বয় (নিলয়দ্বয়) প্রসারিত হয় আবার ভেন্ট্রিকলদ্বয় সংকুচিত হলে অ্যাট্রিয়ামদ্বয় প্রসারিত হয়। এভাবে হৃৎপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক সংকোচন-প্রসারনের ফলে রক্ত সমগ্র দেহে সংবহিত হয়। মানুষের হৃৎপিণ্ডে **দ্বি-বর্তনী** বা **দ্বৈত সংবহন** (double circuit circulation) ঘটে। **যে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্ত সমগ্র দেহে একবার পরিপূর্ণ চক্র সম্পন্ন করার পূর্বে হৃৎপিণ্ড দিয়ে দু'বার প্রবাহিত হয় তাকে দ্বি-বর্তনী বা দ্বৈত সংবহনতন্ত্র বলে**। এ ধরনের সংবহন মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী এবং সকল পাখিদের থাকে।

হৃৎপিণ্ডে রক্তসংবহন নিম্নরূপে সম্পন্ন হয়–

১। হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়াম দুটি যখন **প্রসারিত** (ডায়াস্টোল) অবস্থায় থাকে তখন দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। সারাদেহ থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত **সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা** (ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা) দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে এবং ফুসফুস থেকে O_2 যুক্ত রক্ত **পালমোনারি শিরা** দিয়ে বাম অ্যাট্রিয়ামে আসে। হৃৎপেশি থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত **করোনারি সাইনাস** দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে। এ সময় **বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** বন্ধ থাকে।

2020/8/4 17:29

Scanned with CamScanner

২। অ্যাট্রিয়ামদ্বয় রক্তপূর্ণ হলে **সংকুচিত** (সিস্টোল) হয়। এ সময় অ্যাট্রিয়ামের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং **বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** খুলে যায়, ফলে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে এবং বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে O_2 যুক্ত রক্ত বাম ভেন্ট্রিকলে আসে। এই সময় ভেন্ট্রিকলদ্বয় প্রসারিত অবস্থায় থাকে।

৩। ভেন্ট্রিকলদ্বয় রক্তপূর্ণ হলে **সংকুচিত** হয়। ফলে ভেন্ট্রিকলের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং **পালমোনারি ও অ্যাওর্টিক কপাটিকা** খুলে যায়। তখন ডান ভেন্ট্রিকল থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম ভেন্ট্রিকল থেকে O_2 যুক্ত রক্ত অ্যাওর্টায় (মহাধমনি) প্রবেশ করে। এভাবে হৃৎপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের মাধ্যমে মানব হৃৎপিণ্ডে তথা সারাদেহে রক্ত সংবহিত হয়। ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে এবং হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালনকে **পালমোনারি সংবহন** বলে। অপরদিকে হৃৎপিণ্ড ও দেহের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনকে **সিস্টেমিক সংবহন** বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে কোনো নিউরন নেই। সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (SAN) বা পেসমেকার এবং অন্যান্য নোডাল টিস্যু দ্বারা হৃৎস্পন্দন শুরু ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

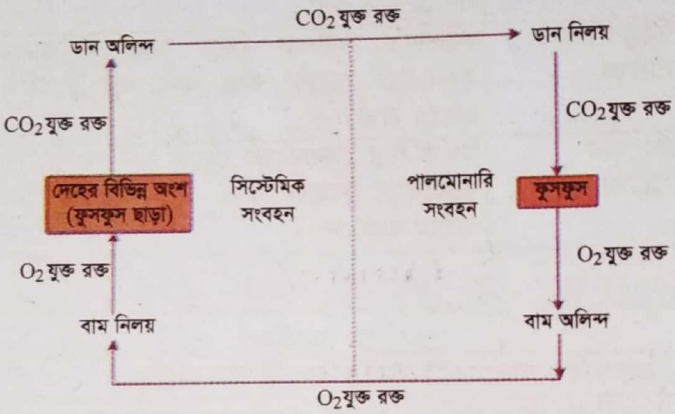

চিত্র ৪.৭ক : মানব হৃৎপিণ্ডের দ্বি-বর্তনী সংবহন(সরল চিত্র)

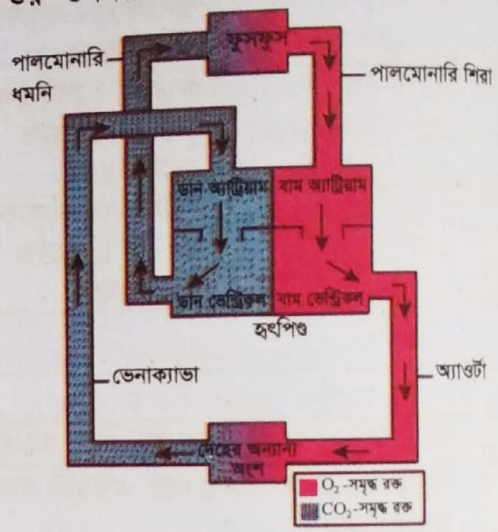

চিত্র ৪.৭খ : হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তসংবহন (সরল চিত্র)

❑ হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহনের প্রবাহচিত্র :

সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা → ডান অ্যাট্রিয়াম → ডান অ্যাট্রিও– ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রপথ → ডান ভেন্ট্রিকল → পালমোনারি ধমনি → ফুসফুস

↑ CO_2 যুক্ত রক্ত — O_2 যুক্ত রক্ত ↓

সমগ্রদেহ ← অ্যাওর্টা ← বাম ভেন্ট্রিকল ← বাম অ্যাট্রিও–ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রপথ ← বাম অ্যাট্রিয়াম ← পালমোনারি শিরা

❑ **কাজ :** (i) হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র আঁক। (ii) হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহের বিবরণ দাও। (iii) হৃৎপিণ্ডে যে সমস্ত কপাটিকা আছে তাদের গুরুত্ব উল্লেখ কর। (iv) স্তন্যপায়ী প্রাণীদের রক্তসংবহন প্রক্রিয়া ছকের সাহায্য দেখাও। (v) হৃৎপিণ্ডে রক্তসঞ্চালন গতিপথ কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়– ব্যাখ্যা কর।

৪.৪ কার্ডিয়াক চক্র বা হার্টবিটের দশাসমূহ (Cardiac cycle or Stages of heartbeat)

হৃৎপিণ্ডের একবার সংকোচন (সিস্টোল) ও একবার প্রসারণ (ডায়াস্টোল)-কে একত্রে **হার্টবিট** বা **হৃৎস্পন্দন** (heart beat) বলে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার। সদ্যজাত ভ্রূণের হৃদগতি মিনিটে ১৪০-১৫০ বার। ব্যায়াম ও দৈহিক পরিশ্রমের সময় হৃদগতি বৃদ্ধি পায়। দেহের আকার ছোট হলে হৃদগতি বেশি হয়। বিশ্রাম, নিদ্রা ইত্যাদির সময় হৃদগতি মন্থর হয়। **একটি হৃৎস্পন্দন বা হার্টবিট সম্পন্ন করতে হৃৎপিণ্ডে পরপর সংঘটিত ঘটনার সমষ্টিকে কার্ডিয়াক চক্র বা হৃৎচক্র বলে**। এ চক্রে হৃৎপিণ্ডে অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের বারবার সংকোচন এবং প্রসারণের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হৃৎস্পন্দন হয় তবে কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল $\frac{৬০}{৭৫} = ০.৮$ সেকেন্ড। স্বাভাবিকভাবেই একটি কার্ডিয়াক চক্রের স্থিতিকাল ০.৮ সেকেন্ড।

2020/8/4 17:29

Scanned with CamScanner

কার্ডিয়াক চক্র বা হার্টবিটের ধাপসমূহ

১। অ্যাট্রিয়ামে ডায়াস্টোল (Atrial diastole) : এ সময় অ্যাট্রিয়াম প্রসারিত বা শিথিল অবস্থায় থাকে। বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসাপিড কপাটিকা বন্ধ থাকে। অ্যাট্রিয়াম মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায়, ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা (superior & inferior vena cava) দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে এবং ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। দশার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড।

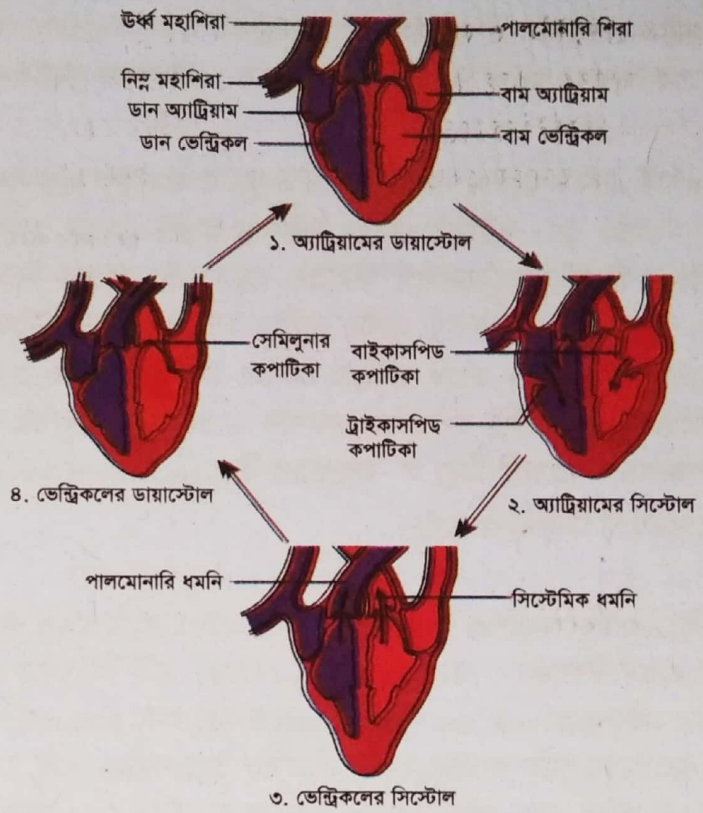

চিত্র ৪.৮ : কার্ডিয়াক চক্রের বিভিন্ন ধাপে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা

২। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল (Atrial systole) : উভয় অ্যাট্রিয়াম একই সঙ্গে সংকুচিত হয়। যদিও সংকোচনের ঢেউ প্রথমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে শুরু করে বাম অ্যাট্রিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে। ডান অ্যাট্রিয়ামের **সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড** বা SAN থেকে সংকোচনের সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ডান অলিন্দ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ও বাম অলিন্দ থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান ও বাম ভেন্ট্রিকলে প্রেরিত হয়। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ০·১ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় : (i) **গতিশীল পর্যায়** (dynamic phase): অ্যাট্রিয়াম সিস্টোলের প্রথমার্ধে সংকোচন বল (force of contraction) বেশি থাকায় এ পর্যায়ের সৃষ্টি হয়। এর স্থিতিকাল প্রায় ০.০৫ সেকেন্ড। (ii) **গতিহীন পর্যায়** (adynamic phase): অ্যাট্রিয়াম সিস্টোলের শেষের দিকে সংকোচন বল অপেক্ষাকৃত কম থাকায় এ পর্যায়ের সৃষ্টি হয়। এ পর্যায় খুব কম পরিমাণ রক্ত নিলয়ে প্রেরিত হয়। এর স্থিতিকালও প্রায় ০.০৫ সেকেন্ড।

৩। ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল (Ventricular systole) : অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের পরপরই (প্রায় ০.১-০.২ সেকেন্ড পর) রক্তপূর্ণ অবস্থায় ভেন্ট্রিকলের সংকোচন ঘটে। ভেন্ট্রিকলের সংকোচনে ভেন্ট্রিকলে চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয় এবং একই সঙ্গে পালমোনারি ধমনি ও অ্যাওর্টার মুখের সেমিলুনার কপাটিকা খুলে গিয়ে অ্যাট্রিয়ামের রক্ত ধমনিতে প্রবেশ করে। নিলয়ের সিস্টোলের কারণে বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধের সময় প্রথম যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে **লাব** (lub) বলে। এই দশায় সময়কাল ০.৩ সেকেন্ড।

Scanned with CamScanner

৪। ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল (Ventricular diastole) : ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলের পরপর ডায়াস্টোল শুরু হয়ে যখনই ভেন্ট্রিকল প্রসারিত হতে থাকে তখন ভেন্ট্রিকল মধ্যস্থ চাপ কমতে থাকে। ফলে অ্যাওর্টা ও পালমোনারি ধমনিতে যে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয় তাতে কিছু রক্ত ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে চায়; কিন্তু অতি দ্রুত ধমনির মুখের সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় **ডাব** (dub) সদৃশ দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন হয়।

ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল = লাব (lub) এবং **ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল = ডাব** (dub)

ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ অব্যাহত থাকায় এর অভ্যন্তরের চাপ ক্রমশ কমতে থাকে এবং তা যখন অ্যাট্রিয়ামের চাপের নিচে নেমে যায় তখন **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার** ছিদ্র খুলে যায়। ভেন্ট্রিকল তখন অ্যাট্রিয়াম থেকে আসা রক্ত দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে। সামান্য বিশ্রামের পর আবার ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল শুরু হয়। এই দশার সময়কাল ০.৫ সেকেন্ড।

হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা

মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকুচিত-প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়। এতে প্রচণ্ড গতিতে রক্ত প্রবাহিত হয়। **বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই (অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র বা হরমোন, কিংবা অন্য কোনো উদ্দীপনা) হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ** (myogenic regulation) **বলে**। কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে O_2-সমৃদ্ধ লবণ দ্রবণে ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে দিলে তাতে বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই বেশ কিছু পর্যন্ত হার্টবিট চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু রূপান্তরিত হৃৎপেশি মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডে বিদ্যমান এই বিশেষ ধরনের পেশিগুলোকে **সংযোগী টিস্যু** বা **জাংশনাল টিস্যু** (junctional tissues) বলা হয়, যারা হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে। হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যুগুলো হলো—

(ক) সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড বা এসএনোড বা পেসমেকার (Sino-Atrial Node or SAN or SA Node or Pace-maker) : ডান অলিন্দের উর্ধ্ব মহাশিরা বা সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার কাছে **SAN** বা **Pace-maker** অবস্থিত এবং এ অংশই হৃৎস্পন্দনের প্রধান উৎসস্থল। **Martin Flack** (1907) এটি আবিষ্কার করেন। এটি **কলা আকৃতির** (banana-shaped) গঠন। এগুলো ১০-১৫ mm লম্বা, ৩ mm চওড়া এবং ১ mm পুরু। এটি মিনিটে ৭০-৮০ বার স্পন্দন প্রবাহ সৃষ্টি করে হৃৎপিণ্ডের বাকি অংশের ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। তাই SAN-কে **প্রাকৃতিক পেসমেকার** বা **ছন্দনিয়ামক** বলে। SAN ঘড়ির মতো প্রতি সেকেন্ডে একবার সঙ্কোচিত হয়। হৃৎপিণ্ডকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলেও এ সঙ্কোচন চলতে থাকে। এ কারণেই হৃৎপিণ্ড সংস্থাপনের সময়ও সচল থাকে। অনেকসময় SAN এর কার্যকারিতা কমে গেলে ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট অনুভব হয় যাকে **ইশকেমিয়া** (ischaemia) বলা হয়।

(খ) অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড বা এভিনোড (Atrio-Ventricular Node or AVN or AV Node) : যে নোড বা পর্ব করোনারি সাইনাসের নিকট আন্তঃঅলিন্দ প্রাচীর বা ইন্টার-অ্যাট্রিয়াল সেপ্টামের পেছনে অবস্থান করে তাকে **AVN** বা **AV Node** বলে। SAN-এর স্পন্দনপ্রবাহকে গ্রহণ করে এবং নিজেও প্রতি মিনিটে ৪০-৬০ বার স্পন্দনপ্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম। AVN-কে **সংরক্ষিত পেসমেকার** বলা হয়, কারণ কোনো কারণে SAN হৃৎস্পন্দন প্রবাহ বা হৃৎউদ্দীপনা বা বৈদ্যুতিক সংকেত (electrical signal) সৃষ্টিতে অক্ষম হলে AVN উহা সৃষ্টি করে।

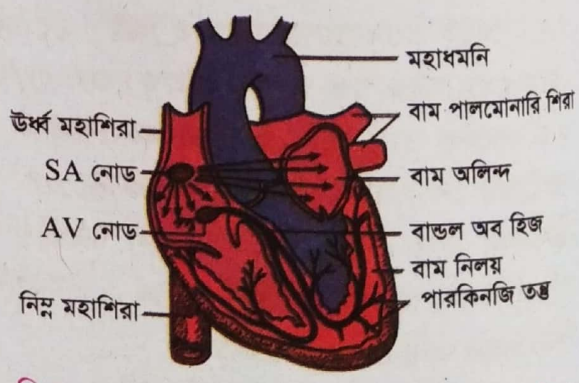

চিত্র ৪.৯ : মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যু

(গ) বান্ডল অব হিজ (Bundle of His-BH) **বা হিজের বান্ডল** : মিনিটে ৩৬ বার স্পন্দন সৃষ্টিতে সক্ষম AVN থেকে উৎপন্ন যে হৃৎপিণ্ডের সংযোগী কলা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ডান ও বাম নিলয়ের প্রাচীরে বিস্তৃত এবং AVN থেকে উৎপন্ন স্পন্দনকে নিলয়ের প্রাচীরে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম, তাদের **বান্ডল অব হিজ** বলে।

2020/8/4 17:29

Scanned with CamScanner

(ঘ) পারকিনজি তন্তু (Purkinje fibre) : যখন বান্ডল অব হিজের শেষপ্রান্ত সূক্ষ্ম তন্তুতে রূপান্তরিত হয়ে নিলয়ের প্যাপিলারি পেশি এবং পার্শ্বপ্রাচীরে বিন্যস্ত থেকে মিনিটে ৩০-৩৫ বার স্পন্দন সৃষ্টিতে সক্ষম ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রবাহকে দ্রুত নিলয় পেশিতে ছড়িয়ে দিতে পারে তাদের **পারকিনজি তন্তু** বলে।

Kitch ও Flack (1907)-এর মত অনুসারে SAN থেকে হৃৎস্পন্দনের সূচনা ঘটে। স্বাভাবিক অবস্থায় SAN-এর ছন্দময় ক্রিয়াকলাপ দ্বারা বিশিষ্ট হৃৎপেশির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ডান অলিন্দের প্রাচীরে **সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড** (SAN) থেকে সৃষ্ট একটি **অ্যাকশন পটেনশিয়াল** (action potential) ইলেকট্রিকাল সিগন্যালের মাধ্যমে একটি হৃৎস্পন্দন বা হার্টবিটের শুরু হয়। SAN থেকে উৎপন্ন ইলেকট্রিকাল সিগন্যাল সমগ্র অলিন্দের প্রাচীরে ছড়িয়ে গিয়ে অলিন্দের সংকোচন ঘটায়। SAN থেকে সিগন্যাল **অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড** (AVN) কর্তৃক গৃহীত হয়। AVN কর্তৃক গৃহীত সিগন্যাল অতঃপর বান্ডল অব হিজ নামক বিশেষ হৃৎপেশি সূত্রকে যায়। এখন থেকে সিগন্যাল পারকিনজি সূত্রকের মাধ্যমে নিলয় প্রাচীরে সঞ্চারিত হয় এবং ফলে রক্তপূর্ণ নিলয়ের সংকোচন ঘটে। এভাবে হার্টবিট নিয়ন্ত্রিত হয়। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যুগুলো দ্বারা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের অনুক্রমটি নিম্নরূপ–

SA নোড → AV নোড → বান্ডল অব হিজ → পারকিনজি তন্তু

SA নোড ও AV নোডের মধ্যে পার্থক্য

SA Node (SAN)	AV Node (AVN)
১। এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার ছিদ্রের নিকটে অবস্থিত।	১। এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের আন্তঃঅ্যাট্রিয়াম পর্দার মূলদেশে অবস্থিত।
২। এর ছন্দময়তা খুব বেশি।	২। এর ছন্দময়তা খুব কম।
৩। এটি স্পন্দনপ্রবাহ সৃষ্টি করে।	৩। এটি SA Node থেকে উৎপন্ন স্পন্দনপ্রবাহ গ্রহণ করে।
৪। একে পেসমেকার বা ছন্দ-নিয়ামক বলে।	৪। একে সংরক্ষী ছন্দ-নিয়ামক বলে।

❑ **কাজ :** (i) হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন চাক্রিক গতিতে সম্পন্ন হয়– বিশ্লেষণ কর। (ii) হৃৎপিণ্ড স্নায়ু উদ্দীপনা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যসম্পাদনে সক্ষম– যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর। (iii) হৃৎপিণ্ডের স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী নোডসমূহের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

৪.৫ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টরের ভূমিকা
(Role of Baroreceptor for controlling Blood Pressure)

রক্তচাপ (Blood Pressure)

প্রবহমান রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তবাহিকার প্রাচীরে যে পার্শ্বীয় চাপ প্রয়োগ করে তাকে **রক্তচাপ** বা **ব্লাড প্রেসার** বলে। রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনির প্রাচীরের রক্তচাপকেই বোঝায়। হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি ধমনিতে রক্তচাপ সবচেয়ে বেশি এবং এ চাপ দূরবর্তী ধমনিতে ক্রমশ কমে যায়। শিরায় রক্তচাপ খুবই কম। দেহে রক্তের পরিমাণ, হৃৎপিণ্ড থেকে নিষ্কৃত রক্তের পরিমাণ, রক্তের সান্দ্রতা এবং ধমনির স্থিতিস্থাপকতা রক্তচাপকে প্রভাবিত করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে **সিস্টোল** (systole) এবং প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (diastole) বলে। **স্ফিগমোম্যানোমিটার** (Sphygmomanometer) যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়। রক্তচাপ দুই ধরনের, যথা–

(ক) সিস্টোলিক চাপ (Systolic pressure) : হৃৎপিণ্ডের সিস্টোল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে তাকে সিস্টোলিক চাপ বলে। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের এই রক্তচাপ ১১০-১৪০ mm Hg।

(খ) ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic pressure) : হৃৎপিণ্ডের ডায়াস্টোল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে তাকে ডায়াস্টোলিক চাপ বলে। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের এই রক্তচাপ ৬০-৯০ mm Hg।

2020/8/4 17:29

Scanned with CamScanner

উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)

নির্দিষ্ট বয়সে মানুষের সুস্থ শরীরে যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি পরিমাণের রক্তচাপ সর্বদা বিদ্যমান থাকলে তাকে **উচ্চ রক্তচাপ** বা **হাইপারটেনশন** বলে। নির্দিষ্ট বয়সে স্বাভাবিক যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে যদি বেশি থাকে বা কম থাকে তবে রোগের নির্দেশ করে। রক্তচাপ বেশি হলে তাকে **উচ্চ রক্তচাপ** ও কম হলে তাকে **নিম্ন রক্তচাপ** বলে। সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ যথাক্রমে ১৪০ ও ৯০ mm Hg-এর বেশি হলে তাকে **উচ্চ রক্তচাপ** হিসেবে গণ্য করা হয়। উত্তেজনা, চিন্তা, বিষণ্নতা, নিদ্রাহীনতা বা অন্য কোনো কারণে যদি রক্তচাপ সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে তবে তাকে হাইপারটেনশন বলা যাবে না এবং এ অবস্থায় কোনো ওষুধেরও প্রয়োজন হয় না।

মানুষের উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেওয়ার কারণ : (১) বংশগতীয় উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত। (২) অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণের ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে। (৩) বৃক্ক সংক্রমণের কারণে বৃক্কের রক্ত পরিশোধন ক্ষমতা হ্রাস পেলে। (৪) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অস্বাভাবিকতার কারণে অ্যাডরেনালিন, অ্যালডোস্টেরন ও গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে গিয়ে রক্তের সোডিয়াম আয়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে। (৫) অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, মেদবহুল শরীর। (৬) অপর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রম। (৭) ধূমপান, মদ্যপান বা অন্য কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন। (৮) মানসিক বিষণ্নতা, নিদ্রাহীনতা, চাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগ বা সমস্যা : উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন আধুনিক বিশ্বের একটি মারাত্মক রোগ। নিম্ন রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপের মতো তত মারাত্মক নয়। তবে রক্তচাপ যথেষ্ট কমে গেলে নানা রকম অসুবিধা হয়। উচ্চ রক্তচাপের কারণে মানবদেহে নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে– স্ট্রোক (stroke), প্যারালাইসিস, হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক ও হার্ট ফেইলিউর, অ্যানজাইনা, বৃক্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত (দৃষ্টিক্ষীণতা, প্যাপিলিওডিমা ও অন্ধত্ব) প্রভৃতি।

উচ্চ রক্তচাপের প্রতিরোধ : রক্তচাপ প্রতিরোধ করার জন্য কিংবা প্রতিকার হিসেবে নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক উপায়গুলো পালনের মাধ্যমে উপকার পাওয়া যায় :

(১) দেহের ওজন বৃদ্ধি না করা। (২) নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা, হাঁটা, ব্যায়াম করা এবং খেলাধুলার অভ্যাস করা। (৩) চর্বিযুক্ত খাবার বর্জন করা। (৪) সুষম খাদ্য গ্রহণ করা। (৫) পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। (৬) ধূমপান, মদ্যপান ও অন্য যেকোনো নেশা হতে বিরত থাকা। (৭) নিয়মিত দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানো। (৮) মানসিক চাপমুক্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করা। (৯) খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। (১০) নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ সেবন করে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনা।

ব্যারোরিসেপ্টর (Baroreceptor)

রক্তনালির প্রাচীরে বিদ্যমান কতগুলো সংবেদী স্নায়ুপ্রান্ত, যা রক্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয়। সেই স্নায়ুপ্রান্তকে ব্যারোরিসেপ্টর (baroreceptor) **বলে**। এগুলো মস্তিষ্কের **ভেগাস স্নায়ু** ও **গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু** থেকে সৃষ্টি হয় এবং রক্তচাপ পরিবর্তনে সাড়া দিয়ে দেহে রক্তচাপের ভারসাম্য (বা হোমিওস্টেসিস) বজায় রাখে। রক্তনালিতে কোনো কারণে অস্বাভাবিক রক্তচাপ সৃষ্টি হলে ব্যারোরিসেপ্টর খুব দ্রুত এ উদ্দীপনা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে। এরপর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এ পদ্ধতিকে **ব্যারোরিফ্লেক্স** (baroreflex) বলে।

ব্যারোরিসেপ্টর দু'প্রকার, যথা : (১) **উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর** (high-pressure baroreceptor) বা **আর্টারিয়াল ব্যারোরিসেপ্টর** (arterial baroreceptor) এবং (২) **নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর** (low-pressure baroreceptor) বা **আয়তন ব্যারোরিসেপ্টর** (volume baroreceptor) বা **কার্ডিওপালমোনারি ব্যারোরিসেপ্টর** (cardiopulmonary baroreceptor)।

(১) উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর (High-Pressure Baroreceptor) **: ক্যারোটিড সাইনাস** ও **অ্যাওর্টিক আর্চের** প্রাচীর গাত্রে এই জাতীয় রিসেপ্টরগুলো অবস্থান করে। হৃৎপিণ্ডে রক্তচাপের পরিবর্তন ঘটলে এই পরিবর্তন রক্তনালির প্রাচীরে সঞ্চালিত হয়। এই সঞ্চালনের ফলে সেন্সর তথা ব্যারোরিসেপ্টরগুলো উদ্দীপ্ত হয়। ব্যারোরিসেপ্টর রক্তনালির গাত্রে রক্তচাপ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকতা অনুধাবন করে এবং তা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, ফলে প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যে হৃৎস্পন্দনের মাত্রা অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

2020/8/4 17:29

Scanned with CamScanner

দেহে যখন রক্তচাপ কমে যায় তখন ব্যারোরিসেপ্টরের সংকেত মাত্রা কমে যায়। এই তথ্য **গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল** ও **ভেগাস স্নায়ুর** মাধ্যমে মস্তিষ্কের **মেডুলা অবলংগাটায়** পৌঁছে। মেডুলা অবলংগাটার তথ্যগুলো হৃৎপেশি দেহের আর্টারিওল ও শিরায় প্রেরণ করে। ফলে আর্টারিওল ও শিরা সংকুচিত হয় এবং সামগ্রিক প্রান্তীয় প্রতিরোধ বেড়ে যায়। ফলে রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

- **রক্তচাপ কমে গেলে :** ব্যারোরিসেপ্টরের সংকেত প্রদানের মাত্রা কমে যায় → এই তথ্য মস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগাটায় পৌঁছে → মেডুলা অবলংগাটা থেকে তথ্য রক্তনালিতে পৌঁছে এবং রক্তনালির সংকোচন ঘটায় → রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়।
- **রক্তচাপ বেড়ে গেলে :** ব্যারোরিসেপ্টরের সংকেত প্রদানের মাত্রা বেড়ে যায় → ফলে হৃৎস্পন্দন ও রক্তনালির ক্রিয়া কমে যায় → সংকেত প্রদান বন্ধ হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৃৎস্পন্দন ও রক্তনালির ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয় → ফলে রক্তনালির প্রসারণ ঘটে → রক্তচাপ কমে যায়। ব্যারোরিসেপ্টরগুলো খুব অল্প সময়ের জন্য রক্তচাপ বৃদ্ধিতে সাড়া দেয়। দীর্ঘ সময় ধরে রক্তচাপ উচ্চ মাত্রায় থাকলে ব্যারোরিসেপ্টর এটাকে স্বাভাবিক মনে করে। এর **ফলে স্থায়ী উচ্চ রক্তচাপ** (hypertension) **সৃষ্টি হয়**।

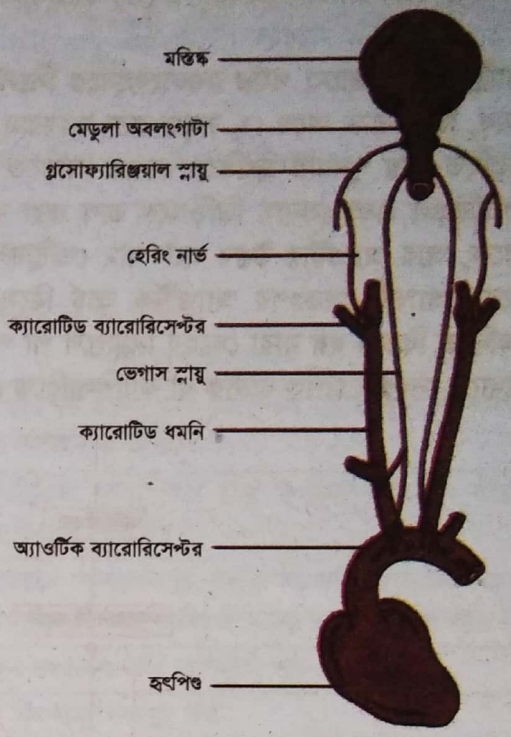

চিত্র ৪.১০ : অ্যাওর্টিক ব্যারোরিসেপ্টর এবং ক্যারোটিড ব্যারোরিসেপ্টর

(২) নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর বা আয়তন রিসেপ্টর (Low-Pressure Baroreceptor/Volume Baroreceptor) : এই রিসেপ্টরগুলো বড় **সিস্টেমিক শিরা, পালমোনারি শিরা** এবং হৃৎপিণ্ডের **ডান অলিন্দ** ও **নিলয়ের প্রাচীরে** অবস্থান করে। এরা রক্তের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে বলে এদেরকে **ভলিউম** বা **আয়তন রিসেপ্টর** বলে। রক্তসংবহন ছাড়াও রেচনে বিশেষত মূত্র নিষ্কাশনে এরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর বৃক্কের হরমোন উৎপাদনের পরিবর্তন এনে রক্তের পানি ও লবণ ধরে রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রক্তের লবণ ও পানির মাত্রা রক্তচাপের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

হৃৎপিণ্ডে রক্তের আয়তন হ্রাস পেলে আয়তন রিসেপ্টর এ সংকেত মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে প্রেরণ করে। এই সংকেত পেয়ে হাইপোথ্যালামাসের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে **অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন** (antidiuretic hormone-ADH) ক্ষরণ শুরু হয়। ক্ষরিত ADH বৃক্কে পৌঁছালে বৃক্কে অল্প পরিমাণ মূত্র তৈরি করে। ফলে রক্তে পানির পরিমাণ ঠিক থাকে ও রক্তের স্বাভাবিক আয়তন বজায় থাকে। এছাড়াও রক্তের আয়তন হ্রাস পেলে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উদ্দীপ্ত হয়। উদ্দীপ্ত স্নায়ু **রেনিন** (renin) ক্ষরণের জন্য বৃক্কে সংকেত পাঠায়। রেনিন এনজাইমের প্রভাবে **অ্যানজিওটেনসিন** (angiotensin) হরমোন সক্রিয় হয়, ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

৪.৬ মানবদেহে রক্তসংবহন পদ্ধতি (Process of Blood Circulation in Human body)

মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্র **রক্ত, হৃৎপিণ্ড** ও **রক্তবাহিকা** নিয়ে গঠিত। মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির (closed type) অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকার (ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি) মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে অভ্যন্তরীণ পরিবহন সম্পন্ন করে। মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে ২টি বর্তনী বা চক্রের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত হয়, যথা : **সিস্টেমিক চক্র** (systemic cycle) এবং **পালমোনারি চক্র** (pulmonary cycle)। এ ধরনের দ্বি-চক্রীয় সংবহনকে **দ্বি-বর্তনী** বা **দ্বি-চক্রীয় সংবহন** (double circuit circulation) বলা হয়। রক্ত প্রবাহের মাত্রা দেহের বিভিন্ন কলায় ভিন্নরকম পরিলক্ষিত হয়। যকৃতে রক্ত সর্বাধিক মাত্রায় (1350 ml/min) প্রবাহিত হয়। অতঃপর বৃক্ক (1100 ml/min) ও মস্তিষ্কে (700 ml/min) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রায় রক্ত প্রবাহিত হয়।

2020/8/4 17:29

Scanned with CamScanner

মানবদেহে সাধারণত চার পদ্ধতিতে রক্তসংবহন সংঘটিত হয়, যথা– (১) সিস্টেমিক সংবহন, (২) পালমোনারি সংবহন, (৩) পোর্টাল সংবহন ও (৪) করোনারি সংবহন।

১। **সিস্টেমিক সংবহন** (Systemic circulation) : **বাম ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু করে দেহের বিভিন্ন অংশ হতে ডান অ্যাট্রিয়ামে পৌঁছানো পর্যন্ত রক্তসংবহনকে সিস্টেমিক বা তন্ত্রীয় সংবহন বলে।** এই সংবহনের মাধ্যমে দেহের সকল কোষ, টিস্যু এবং অঙ্গে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ হয় এবং CO_2 যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসতে সিস্টেমিক সার্কিটের সময় লাগে ২৫-৩০ সেকেন্ড। এই সংবহনকে আর্টেরিওল এবং ভেনাস ডিভিশনে ভাগ করা যায়। সিস্টেমিক সংবহনের **আর্টেরিওল ডিভিশনের** শুরু হয় অ্যাওর্টা থেকে, আর অ্যাওর্টার উদ্ভব ঘটে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে। বাম ভেন্ট্রিকলের সংকোচনের ফলে রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে। অ্যাওর্টা অতঃপর অ্যাওর্টিক আর্চ হিসেবে বক্ষ এবং উদরের মাঝ বরাবর অগ্রসর হয়ে সাধারণ **ইলিয়াক ধমনিতে** বিভক্ত হয় যারা দেহের নিম্নাংশে পা পর্যন্ত রক্ত সরবরাহ করে। এরা সকলেই ধমনি, ধমনিকার (arteriole) মাধ্যমে দেহস্থ কৈশিক জালক বা ক্যাপিলারিতে (capillary) উপস্থিত হয়।

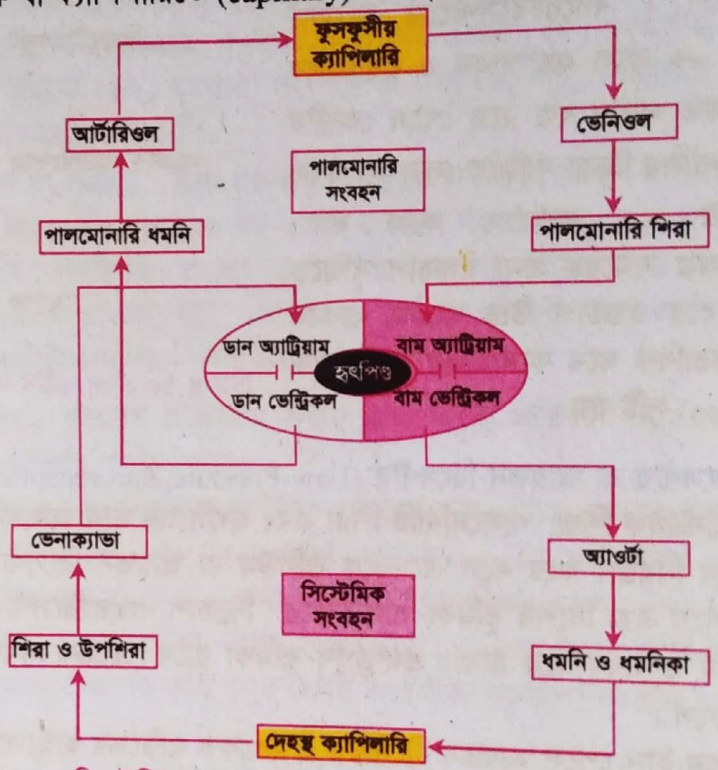

চিত্র ৪.১১ : সিস্টেমিক সংবহনের ও পালমোনারি সংবহনের ডায়াগ্রামাটিক চিত্র

সিস্টেমিক সংবহনের **ভেনাস ডিভিশন** ক্যাপিলারি দ্বারা আর্টিরিওল সিস্টেমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দেহের উপরের অংশের ভেনাস রক্ত শেষ পর্যন্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং পেলভিস, উদরসহ দেহের নিম্নাংশের রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দ্বারা সংগৃহীত হয়। উভয় ভেনাক্যাভা এদের CO_2 যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রদান করে এবং পরবর্তীতে রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের রক্ত করোনারি সাইনাস দ্বারা সংগ্রহ হয় এবং এটি সিস্টেমিক সংবহনের ভেনাস ডিভিশনের অন্তর্গত। একে **গ্রেটার সংবহন** বা প্রান্তীয় সংবহনও বলা হয়।

সিস্টেমিক সংবহনের গতিপথ হলো:

বাম ভেন্ট্রিকল → অ্যাওর্টা → টিস্যু ও অঙ্গ → ভেনাক্যাভা → ডান অ্যাট্রিয়াম → ডান ভেন্ট্রিকল

কাজ : সিস্টেমিক সংবহনের রক্ত দেহকোষের চারপাশে অবস্থিত ক্যাপিলারি অতিক্রমকালে কোষে অক্সিজেন, খাদ্যসারসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ হয়। একই সঙ্গে কোষে সৃষ্ট বর্জ্য কোষ থেকে অপসারিত হয়।

২। **পালমোনারি সংবহন** (Pulmonary circulation) : **যে সংবহনে রক্ত ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে গমন করে এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে পুনরায় ফেরত আসে তাকে পালমোনারি সংবহন বলে।** পালমোনারি সংবহন শুরু হয় পালমোনারি ধমনি থেকে, আর পালমোনারি ধমনির উদ্ভব হয় ডান ভেন্ট্রিকল থেকে। ডান ভেন্ট্রিকলের সংকোচনের ফলে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে প্রবেশ করে। অতঃপর রক্ত ধমনিকা হয়ে

2020/8/4 17:30

Scanned with CamScanner

ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের চারপাশে অবস্থিত ক্যাপিলারিতে উপস্থিত হয়। ফুসফুসীয় ক্যাপিলারি থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় ভেনিউল, ক্ষুদ্রতর শিরা এবং অবশেষে ৪টি (প্রতিটি ফুসফুস থেকে ২টি) **পালমোনারি শিরার** মাধ্যমে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফেরত আসে এবং রক্ত পরে বাম ভেন্ট্রিকলে প্রবেশ করে।

পালমোনারি সংবহনের গতিপথ হলো :

ডান ভেন্ট্রিকল → পালমোনারি ধমনি → ফুসফুস → পালমোনারি শিরা → বাম অ্যাট্রিয়াম → বাম ভেন্ট্রিকল

কাজ : এই সংবহনের মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে গমন করে এবং অ্যালভিওলাস অতিক্রমকালে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটে। ফলে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে।

সিস্টেমিক সংবহন ও পালমোনারি সংবহনের মধ্যে পার্থক্য

সিস্টেমিক সংবহন	পালমোনারি সংবহন
১। রক্তের গতিপথ হলো বাম ভেন্ট্রিকল থেকে দেহ টিস্যু এবং দেহ টিস্যু থেকে ডান অ্যাট্রিয়াম।	১। রক্তের গতিপথ হলো ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুস এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়াম ।
২। বাম ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু হয়ে দেহ টিস্যু অতিক্রম করে ডান অ্যাট্রিয়ামে শেষ হয়।	২। ডান ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু হয়ে ফুসফুস অতিক্রম করে বাম অ্যাট্রিয়ামে শেষ হয়।
৩। এই সংবহনে ধমনি অক্সিজেনেটেড রক্ত এবং শিরা ডিঅক্সিজেনেটেড রক্ত পরিবহন করে।	৩। এই সংবহনে পালমোনারি ধমনি ডি-অক্সিজেনেটেড রক্ত এবং পালমোনারি শিরা অক্সিজেনেটেড রক্ত পরিবহন করে।
৪। দেহ টিস্যুতে নিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ করে ।	৪। অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য ফুসফুসে গমন করে।
৫। রক্তচাপ অধিক।	৫। রক্তচাপ তুলনামূলকভাবে কম।

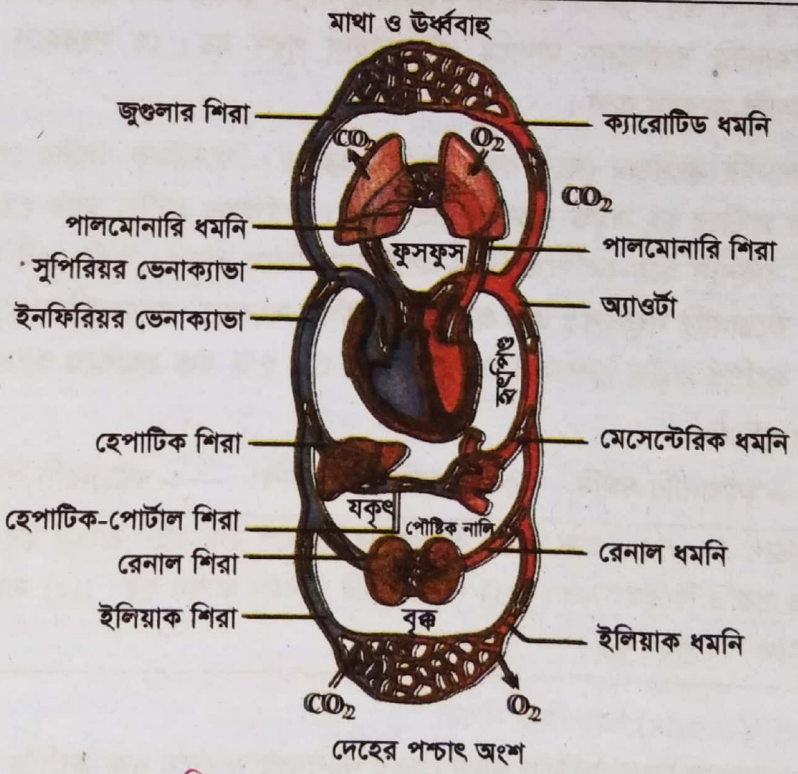

চিত্র ৪.১২ : মানবদেহের রক্তসংবহন

৩। পোর্টাল সংবহন (Portal circulation) : দেহের কোনো অঙ্গ বা অংশের কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে যে শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে হৃৎপিণ্ডে না পৌঁছে দেহের অন্য কোনো মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয় তাকে **পোর্টাল শিরা** বলে। পোর্টাল শিরার মাধ্যমে রক্তসংবহন ব্যবস্থাকে **পোর্টাল সংবহন** বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সাধারণত **যকৃৎ বা হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র** (hepatic portal system) এবং **বৃক্কীয় বা রেনাল পোর্টাল তন্ত্র** (renal portal system) থাকে। মানুষের প্রধানত **হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র** থাকে কিন্তু **রেনাল পোর্টাল তন্ত্র** থাকে না।

2020/8/4 17:30

Scanned with CamScanner

পাকস্থলী থেকে গ্যাস্ট্রিক শিরা, স্প্লিন থেকে স্প্লিনিক শিরা, অন্ত্র থেকে আন্ত্রিক শিরা, সিকাম থেকে সিকাল শিরা এবং রেকটাম থেকে রেকটাল শিরাগুলো মিলিত হয়ে যকৃৎ বা **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** (hepatic portal vein) গঠন করে। যকৃৎ পোর্টাল শিরা কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর দুটি শাখায় ভাগ হয় এবং অবশেষে যকৃতে প্রবেশ করে পুনরায় কৈশিক জালকে পরিণত হয়। যকৃতের কৈশিক জালক হতে উৎপন্ন যকৃৎ শিরার মাধ্যমে রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভায় বা নিম্ন মহাশিরায় পৌঁছে এবং সেখান থেকে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। পোর্টাল শিরা সমন্বয়ে গঠিত এই সংবহনকে **পোর্টাল সংবহন** বলে। **পোর্টাল সংবহন এক প্রকার সিস্টেমিক সংবহন**।

যকৃৎ পোর্টাল সংবহনের প্রয়োজনীয়তা : (১) পৌষ্টিকনালি থেকে শোষিত সরল খাদ্য (গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ইত্যাদি) পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে আসে। সেখানে অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়। দেহকোষে গ্লুকোজের অভাব ঘটলে গ্লাইকোজেন পুনরায় গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয়। (২) দূষিত নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ অ্যামোনিয়া যকৃতে ইউরিয়ায় পরিণত হয়ে বৃক্কের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়। ফলে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। (৩) যকৃৎ রক্তে প্রোটিন উৎপাদন করে রক্তে সরবরাহ করে।

পোর্টাল সংবহনের গতিপথ হলো :

পৌষ্টিক অঙ্গাদি ⟶ হেপাটিক পোর্টাল শিরা ⟶ যকৃৎ ⟶ হেপাটিক শিরা ⟶ ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ⟶ ডান অ্যাট্রিয়াম

৪। করোনারি সংবহন (Coronary circulation) **:** রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হৃৎপিণ্ডের উপস্থিতি। সজীব সংকোচনশীল হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং (pumping) কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র দেহে রক্ত সংবাহিত হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড নিজেই দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দেহে অবিরাম রক্তপ্রবাহ বহাল রাখার জন্য হৃৎপিণ্ডের নিজের জন্য পুষ্টি এবং অক্সিজেন প্রয়োজন। করোনারি সংবহনের মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ হয়। যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সংবাহিত হয় তাকে **করোনারি সংবহন** বলে।

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃৎগহ্বর থেকে রক্ত সঞ্চারিত হয় না। সিস্টেমিক ধমনির গোড়া হতে সৃষ্ট করোনারি ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সংবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর হতে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে করোনারি সাইনাস হয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে। অর্থাৎ এই ধরনের সংবহন হৃৎপেশি ও হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঘটে। **করোনারি সংবহনও এক প্রকার সিস্টেমিক সংবহন**। করোনারি সংবহনের মাধ্যমে প্রায় ৩৮০ লিটার (১০০ গ্যালন) বা হৃৎপিণ্ড কর্তৃক পাম্পকৃত সম্পূর্ণ রক্তের প্রায় ৫% রক্ত হৃৎপিণ্ডে পাম্প হয়।

করোনারি সংবহনের গতিপথ :

সিস্টেমিক ধমনি ⟶ করোনারি ধমনি ⟶ হৃৎপ্রাচীর (হৃৎপেশি) ⟶ করোনারি শিরা ⟶ ডান অ্যাট্রিয়াম

❑ **কাজ :** (i) দেহে রক্তচাপ ১৭৫/১১০ হলে তাকে কী ধরনের রক্তচাপ বলা হয়– ব্যাখ্যা কর। (ii) টাকি মাছের এবং মানুষের রক্ত সংবহন দুটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। (iii) পালমোনারি সংবহন ব্যাখ্যা কর। (iv) মাছ ও মানুষের রক্ত সংবহন পদ্ধতি পরস্পর থেকে ভিন্নতর– বিশ্লেষণ কর।

রক্তবাহিকা (Blood Vessels) [প্রাসঙ্গিক বিষয়]

মানুষের পুরো শরীরে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা যেসব নালিকার মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন তন্ত্র, অঙ্গ, কলা ও কোষে বাহিত হয় এবং দেহের ঐসব স্থান হতে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের **রক্তবাহিকা** (blood vessels) বলে। তিন ধরনের রক্তবাহিকা দ্বারা মানবদেহে রক্ত পরিবাহিত হয়, যথা– **ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা**।

ধমনি (Artery) **:** যেসব রক্ত নালিকার মাধ্যমে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয় তাদের ধমনি বলে (ব্যতিক্রম– পালমোনারি ধমনি)। ধমনির প্রাচীর বেশ পুরু, মজবুত ও স্থিতিস্থাপক। এর প্রাচীর তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত। বাইরের স্তরটি যোজক কলা নির্মিত **টিউনিকা এক্সটার্না** বা **টিউনিকা এডভেনটিশিয়া** (tunica externa or tunica adventitia), মাঝের স্তরটি পেশিকলা নির্মিত **টিউনিকা মিডিয়া** (tunica media) এবং ভেতরের

2020/8/4 17:30

Scanned with CamScanner

স্তরটি এন্ডোথেলিয়াম কলা নির্মিত **টিউনিকা ইন্টিমা** (tunica intima)। ধমনির কেন্দ্রের ছিদ্র বা **লুমেন** ছোট; এতে কপাটিকা থাকে না। ধমনি দিয়ে উচ্চচাপে রক্ত প্রবাহিত হয়। **হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে ধমনি দেহের বিভিন্ন অংশে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে কৈশিক জালিকাতে পরিসমাপ্তি ঘটায়।**

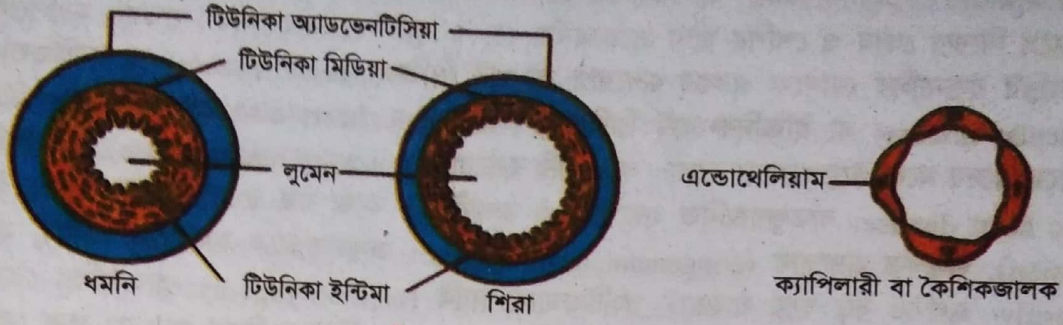

চিত্র ৪.১৩ : রক্তবাহিকা

শিরা (Vein) : যেসব রক্তনালিকার মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে (ব্যতিক্রম– পালমোনারি শিরা)। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো তিনস্তর বিশিষ্ট হলেও এটি পাতলা, পেশিবিহীন ও কম স্থিতিস্থাপক। এদের লুমেন বড় এবং কপাটিকাযুক্ত। **সকল শিরাই কৈশিক জালিকা থেকে সৃষ্টি হয়ে হৃৎপিণ্ডে শেষ হয়।**

কৈশিক জালিকা (Capillary) : কোষ-কলার ফাঁকে ফাঁকে জালিকার ন্যায় বিস্তৃত, সূক্ষ্ম প্রাচীরবিশিষ্ট, অতি সরু আণুবীক্ষণিক রক্তনালিকাকে **কৈশিক জালিকা** বলে। এদের প্রাচীর একস্তরী এন্ডোথেলিয়াম দ্বারা গঠিত। **এরা প্রশাখা-ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকে।** এদের প্রাচীর সূক্ষ্ম হওয়াতে রক্ত ও কলারসের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় খাদ্যরস, রেচন বর্জ্য, শ্বসন গ্যাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময় ঘটে।

ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ধমনি	শিরা
১। উৎপত্তি ও সমাপ্তি	হৃৎপিণ্ডে উৎপন্ন হয়ে দেহের কৈশিকনালিতে সমাপ্ত হয়।	কৈশিকনালি থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে সমাপ্ত হয়।
২। রক্ত প্রবাহের দিক	হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের দিকে পরিবহন করে।	দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে পরিবহন করে।
৩। রক্তের প্রকৃতি	পালমোনারি ধমনি ব্যতীত অন্য ধমনিগুলো O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণের।	পালমোনারি শিরা ব্যতীত অন্য শিরাগুলো CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত কালচে বর্ণের।
৪। প্রাচীর	বেশ পুরু ও স্থিতিস্থাপক।	কম পুরু ও অস্থিতিস্থাপক।
৫। লুমেন (গহ্বর)	লুমেন ছোট ।	লুমেন বড়।
৬। কপাটিকা	কপাটিকা থাকে না।	সেমিলুনার কপাটিকার মতো কপাটিকা থাকে।
৭। অবস্থান	প্রধানত দেহের গভীর অংশে বিস্তৃত থাকে।	দেহের পরিধি অংশে বিস্তৃত থাকে।
৮। রক্তচাপ	উচ্চ চাপে রক্ত পরিবহন করে।	কম চাপে রক্ত পরিবহন করে।
৯। স্পন্দন	ধমনির স্পন্দন আছে।	শিরার স্পন্দন নেই।
১০। খাদ্যসার	অধিক খাদ্যসার সম্পন্ন রক্ত পরিবহন করে।	হেপাটিক পোর্টাল শিরা ব্যতীত কম খাদ্যসার সম্পন্ন রক্ত পরিবহন করে।
১১। বর্জ্য পদার্থ	রক্তে কম বর্জ্য থাকে।	রক্তে বেশি বর্জ্য থাকে।

পালমোনারি ধমনি ও পালমোনারি শিরার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পালমোনারি ধমনি	পালমোনারি শিরা
১। উৎপত্তিস্থল	হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় বা ডান ভেন্ট্রিকল।	ফুসফুসের কৈশিক জালক।
২। পরিসমাপ্তি	ফুসফুসের কৈশিক জালক।	হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দ বা বাম অ্যাট্রিয়াম।
৩। প্রাচীর	পুরু এবং স্থিতিস্থাপক।	পাতলা এবং অস্থিতিস্থাপক।
৪। হৃৎপিণ্ডের সংযোগস্থলে কপাটিকা	থাকে।	থাকে না।
৫। রক্তচাপ	বেশি।	কম।
৬। কাজ	CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত O_2 সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে ফুসফুসে নিয়ে যায়।	O_2 সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে দেহে সরবরাহের জন্য হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে নিয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

৪.৭ হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয় (Measures to be taken in different conditions of Heart Disease)

হৃৎপিণ্ড আমাদের দেহের পাম্পযন্ত্র, যা সঞ্চালিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরণ করে। আবার হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির মাধ্যমে নিজের কোষ ও পেশির জন্য প্রয়োজনীয় O_2 ও পুষ্টি সরবরাহ করে। সুতরাং হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনি ও সংশ্লিষ্ট রক্তনালির রোগকে একত্রে **হৃদরোগ বা হার্ট ডিজিজ** (heart disease) বা **কার্ডিওভাস্কুলার রোগ** (cardiovascular disease) বা **ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজও** (ischaemic heart disease) বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ আছে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– **করোনারি হৃদরোগ** (coronary heart disease), **রিউম্যাটিক হৃদরোগ** (rheumatic heart disease: বাতজ্বরজনিত হৃৎপেশি ও কপাটিকার কাজ বন্ধ হওয়ার জন্য রোগ), **উচ্চ রক্তচাপ** (hypertension), **জন্মগত হৃদরোগ** (congenetal heart disease: জন্মগতভাবে হৃৎপিণ্ডের ত্রুটি), **কার্ডিওমেগালি** (cardiomegaly: হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া), **কার্ডিওমায়োপ্যাথি** (cardiomyopathy: হৃৎপেশির রোগ) ইত্যাদি। বর্তমান পৃথিবীতে মোট মৃত্যুর 30% হয়ে থাকে হৃদরোগের কারণে। প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় 73 লক্ষ লোক এ রোগে মারা যায়। তাই হৃদরোগকে **'বিশ্বের এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি'** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বুকে ব্যথা বা অ্যানজাইনা (Chest Pain or Angina) বা হৃদশূল

বুকে ব্যথা অনেক ধরনের হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হৃৎপিণ্ডজনিত বুকে ব্যথা। কোনো কারণে করোনারি ধমনির (coronary artery) দ্বারা হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশিতে রক্ত সরবরাহ কমে গেলে বা সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেড়ে গেলে বুকে এক ধরনের ব্যথা অনুভূত হয়। এই ধরনের বুকের ব্যথাকে **অ্যানজাইনা** বা **অ্যানজাইনা পেকটোরিস** (Angina pectoris; Lt. *angere* = কষ্ট + *pectoris* = বুক) বলে। অ্যানজাইনাকে হার্ট অ্যাটাকের পূর্বাবস্থা মনে করা হয়।

অ্যানজাইনার প্রকার: অ্যানজাইনা সাধারণত ৩ ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

১। **সুস্থিত অ্যানজাইনা** (Stable angina) : এ ধরনের অ্যানজাইনায় বুকের ব্যথা অনুভূত হয় কেবল পরিশ্রম কিংবা চরম আবেগীয় বিষন্নতার কারণে। বিশ্রামে থাকলে এ ব্যথা চলে যায়।

২। **অস্থিত অ্যানজাইনা** (Unstable angina) : এক্ষেত্রে বিশ্রামের সময় বুকের ব্যথা অনুভূত হয়। এ ব্যথা মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে এবং অনেক সময় ব্যাপী প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। এ ধরনের অ্যানজাইনা হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ।

৩। **প্রিনজমেটাল অ্যানজাইনা** (Prinzmetal angina) : এ ধরনের অ্যানজাইনায় বিশ্রামের সময় কিংবা ঘুমের সময় কিংবা ঠাণ্ডার কারণে দেখা দেয়।

কারণ (Causes)

করোনারি ধমনির ভেতরে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল জমে ধমনির অভ্যন্তরে গহ্বর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে হৃৎপেশিতে O_2 ও পুষ্টি পদার্থ (গ্লুকোজ) সরবরাহ বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু হৃৎপেশিগুলোকে দেহে অবিরাম রক্ত সরবরাহের জন্য কার্যক্ষম থাকতে হয়। তখন হৃৎপেশিগুলো বিকল্প পথ ধরে অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় পাইরুভিক এসিড থেকে শক্তি উৎপন্ন করে। এই সময় উপজাত (biproduct) পদার্থ হিসেবে **ল্যাকটিক এসিড** (lactic acid) উৎপন্ন হয় যা হৃৎপেশিতে জমা হয়। **অধিক ল্যাকটিক এসিড হৃৎপেশিতে জমা হওয়ার কারণে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়।**

করোনারি ধমনির সমস্যা ছাড়াও বুকে ব্যথা বা অ্যানজাইনা হতে পারে, যেমন– হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাজনিত সমস্যার কারণে অর্থাৎ এ সময় করোনারি ধমনিতে রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরও অ্যানজাইনা দেখা দেয়, কারণ এদের রক্তে পরিমিত O_2 থাকে না। আবার যাদের হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অতিমাত্রায় পুরু তাদের হৃৎপ্রাচীর প্রয়োজনীয় O_2 পায় না। সাধারণত যেকোনো ধরনের পরিশ্রম বা ভারী কাজ করলে বা সিঁড়িতে ওঠানামার মতো পরিশ্রম করলে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। যারা ধূমপায়ী, যাদের বেশি মাত্রায় ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ আছে, তারাই মূলত অ্যানজাইনায় আক্রান্ত হয়।

অ্যানজাইনার লক্ষণ (Symptoms of Angina)

১। রোগী বুকের ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়ে, বিশেষত স্টার্নামের পেছনে চাপ সৃষ্টি হয়।

২। বুক ভারী লাগে। সমগ্র বুক জুড়ে মোচড়ানো ব্যথা অনুভূত হয় এবং একই সঙ্গে ঘাম ঝরতে থাকে। **হৃদরোগজনিত বুকের ব্যথা প্রথম দিকে নির্দিষ্ট করে নির্দেশ করা গেলেও পরবর্তীতে নির্দেশ করা যায় না কারণ অনেক সময় এটি কাঁধ, বাহু, ধড়, চোয়াল বা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে।**

2020/8/4 17:30

Scanned with CamScanner

৩। এই ব্যথা বুকে বাম বা ডান যেকোনো পাশে হতে পারে। ব্যথা ৫-৩০ মিনিট স্থায়ী হয়। বিশ্রাম নিলে ব্যথা আস্তে আস্তে কমে যায়।

৪। বমি বমি ভাব দেখা দেয় অথবা বমি হয়।

৫। পেটে প্রচণ্ড গ্যাস অনুভূত ও জ্বালাপোড়া, চাপ, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। অনেক সময় একে বদহজমজনিত ব্যথা বলে ভ্রান্ত ধারণা করা হয়।

৬। ক্লান্তি বোধ হয়, মাথা ঘুরে এবং অনেক সময় রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

৭। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কিংবা দম ফুরিয়ে হাঁপানো দেখা দিতে পারে।

৮। মাথা ঝিমঝিম করে বা শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

করণীয়/প্রতিকার (Control)

বুকে ব্যথা হলে দেরি না করে রোগীকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। অনেক সময় হৃদরোগের ব্যথাকে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা মনে করে ডাক্তারের কাছে যেতে দেরি করেন, যা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বুকে ব্যথা হলে অবশ্যই কার্ডিওলজিস্টের কাছে যেতে হবে এবং **ECG** ও **ইকোকার্ডিওগ্রামের** মাধ্যমে ব্যথার কারণ শনাক্ত করতে হবে। উপযুক্ত চিকিৎসা (অপারেশন বা এনজিওগ্রাম) এবং সমস্যার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিলে অ্যানজাইনা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বিশ্রাম নিলে বা জিহ্বার নিচে **গ্লিসারাইল ট্রাইনাইট্রেট** (glyceryl trinitrate -GTN) স্প্রে করলে বা ওষুধ খেলে ব্যথা কমে। এই ধরনের ওষুধের ফলে করোনারি ধমনির প্রসারণ ঘটে এবং রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক হয়। এছাড়া ধূমপান বর্জন করা উচিত। প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করা, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করা, ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করা, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখলে অ্যানজাইনার সম্ভাবনা কমে যায়। প্রয়োজনে সম্পূর্ণ শরীর বছরে একবার বা দু'বার চেকআপ করিয়ে নেওয়া।

হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack or Myocardial Infraction)

করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজের পরিমাণ বেড়ে শতভাগ হয়ে যায় এবং ধমনিপথে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসে তখন পর্যাপ্ত O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহের অভাবে কার্ডিয়াক পেশিগুলো অকার্যকর হয়ে কিংবা মরে গিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করে তাকেই সাধারণ ভাষায় **হার্ট অ্যাটাক** (heart attack) বলে। হার্ট অ্যাটাকের অপর নাম **মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন** বা **এম আই** (myocardial infraction-MI)। **Myocardial অর্থ—হৃৎপেশি ও infraction অর্থ—O_2 এর অভাবে শ্বাসবন্ধ হয়ে যাওয়া**। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, মস্তিষ্কের রক্তনালিতে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হলে তাকে **স্ট্রোক** (stroke) বলা হয়। স্ট্রোককে কখনো কখনো **সেরিব্রোভাস্কুলার দুর্ঘটনা** (cerebro-vascular accidents) বলা হয়।

কারণ (Causes)

হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণগুলো হলো ধূমপান, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি ধমনিতে স্নেহ জাতীয় পদার্থের (কোলেস্টেরল) আধিক্য ও পজেটিভ ফেমিলি হিস্ট্রি। মূলত করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল সঞ্চিত হওয়ার ফলে ধমনির গহ্বর ছোট হয়ে বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে অপর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহের ফলে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও রক্তের অনুচক্রিকার কার্যকারিতা বেড়ে গেলে এবং রক্তের ফাইব্রিনোজেন ও ফ্যাক্টর VIII বেড়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। হার্ট অ্যাটাক কখন ঘটবে তা কেউ জানে না।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ (Symptoms of Heart Attack)

১। হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক লক্ষণ হলো বুকে তীব্র ও অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হওয়া। এছাড়া **প্রচুর ঘাম বা শীতল ঘাম হওয়া হার্ট অ্যাটাকের একটি সাধারণ লক্ষণ**।

২। স্টার্নামের পেছনে হঠাৎ তীব্র ব্যথা; এই ব্যথা কখনো কখনো বুক, গলা, ঘাড়, ওপরের পেট, দুই হাত এবং পিঠেও চলে যেতে পারে। তবে সব সময় বুকে ব্যথা নাও হতে পারে। পুরুষের হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা অনেকসময় বাম বাহুতে এবং নারীদের দু'বাহুতে হতে পারে।

৩। শ্বাসকষ্ট (shortness of breath), বমি বমি ভাব (nausea) বা বমি (vomiting) হতে পারে, বুক ধড়ফড়ানি (palpitations), বদহজম ও মাথা ঝিমঝিম করা।

৪। দ্রুত বা অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, ঘুমে ব্যাঘাত এবং সেই সঙ্গে দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্ট।

Scanned with CamScanner

৫। সংজ্ঞাহীন হওয়া (loss of consciousness) বা হঠাৎ মৃত্যু ঘটা (sudden death)। শেষ রাতে ও সকাল ৮-৯টার পূর্ব পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাকের হার সবচেয়ে বেশি। তাই শেষ রাতে বা ভোরে বুকের ব্যথাকে অবহেলা করা ঠিক নয়।

৬। অনেক সময় অবিরাম কাশি বা বুকে শোঁ শোঁ শব্দ হতে পারে।

৭। হার্ট অ্যাটাকের কয়েকদিনের মধ্যে পায়ে, গোড়ালিতে, পায়ের পাতা বা উদরে পানি জমা হতে পারে।

৮। হার্ট অ্যাটাকের সময় কিংবা অ্যাটাকের কয়েকদিন পূর্ব হতে শরীর অস্বাভাবিক দুর্বল অনুভূত হবে।

করণীয়/প্রতিকার (Control)

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। যত দেরি হবে তত বেশি হৃৎপেশি নষ্ট হতে থাকবে এবং রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। সন্নিকটে হৃদরোগের চিকিৎসা সুবিধা সংবলিত হাসপাতাল থাকলে সেখানে নিয়ে যাওয়া উত্তম। এসব রোগীর জন্য কার্ডিয়াক হাসপাতালে **করোনারি কেয়ার ইউনিট** বা **ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট** (coronary care unit-CCU or intensive care unit-ICU) থাকে। ফলে রোগী দ্রুত চিকিৎসার আওতায় চলে আসে। হাসপাতালে নেওয়ার মাঝামাঝি সময়ে করণীয় বিষয়গুলো হলো–

(i) জিহ্বার নিচে **নাইট্রোগ্লিসারিন স্প্রে** দুই চাপ দিতে হবে বা **১টি গ্লিসারাইল ট্রাইনাইট্রেট** ট্যাবলেট দিতে হবে।

(ii) এছাড়া ৭৫ মি. গ্রাম ৪টি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট গুলিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

(iii) আধাশোয়া অবস্থায় হাসপাতালে নিতে হবে এবং দ্রুত কার্ডিওলজিস্টের তত্ত্বাবধানে আনতে হবে।

কার্ডিওলজিস্টের নির্দেশমতো হার্ট অ্যাটাক নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা, যেমন– ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (electrocardiogram-ECG), ইকোকার্ডিওগ্রাম (echocardiogram), MRI, করোনারি এনজিওগ্রাম (coronary angiogram), চেস্ট রেডিওগ্রাফ (chest radiograph) ইত্যাদি করতে হবে। অতঃপর রোগ শনাক্ত হলে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এনজিওপ্লাস্টি অথবা করোনারি বাইপাস করতে হবে।

হার্ট ফেইলিউর (Heart failure)

হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকল বা উভয়ের সংকোচন ক্ষমতা লোপ পাওয়াকে **হার্ট ফেইলিউর** বলে। হার্ট ফেইলিউরের ফলে হৃৎপিণ্ড শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত রক্ত সঞ্চালন করতে পারে না। হার্ট ফেইলিউর হৃৎপিণ্ডের বামপাশে বা ডানপাশে হতে পারে।

কারণ (Causes)

হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির অন্তঃস্থ গাত্র কোলেস্টেরলের কারণে সরু হলে পর্যাপ্ত O_2 এর অভাবে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের কারণে হার্ট ফেইলিউর হতে পারে। দেহে ইনসুলিন উৎপাদন বা সঠিক ব্যবহার ব্যাহত হলে হৃৎপেশি ও হৃৎপিণ্ডের কণিকাগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। হৃৎপিণ্ডের জন্মগত বা সংক্রমণজনিত রোগের কারণেও হার্ট ফেইলিউর ঘটে। এমনকি হৃৎপিণ্ডের ভাল্ব বা কপাটিকাজনিত সমস্যা, হৃৎপিণ্ডের ছন্দোপতন, এম্ফাইসেমা, থাইরয়েড গ্রন্থির অতিসক্রিয়তা, প্রবল রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া, স্থূলতা, অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান, ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ এবং বুকের সংক্রমণেও হার্ট ফেইলিউর হয়।

হার্ট ফেইলিউর-এর লক্ষণ (Symptoms of Heart failure)

হৃৎপিণ্ডের বাম পাশে হার্ট ফেইলিউর হলে : (১) শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও সময় কমে যায়। (২) যেকোনো কায়িক পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হয়। (৩) শুষ্ক কফের সৃষ্টি হয় যা বের করা যায় না। (৪) হৃৎপেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। (৫) ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত অনুভূত হয়। (৬) রোগীর ওজন কমে যায়।

ডান পাশে হার্ট ফেইলিউর হলে : (১) হাত-পা ফুলে যায় (ওডেমা)। (২) পা এর নিচের অংশের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। (৩) পায়ে লাল দাগ পড়ে যা পরবর্তীতে ঘায়ে পরিণত হয়। (৪) রাত্রে প্রস্রাবের বেগ বেড়ে যায়। (৫) ফুসফুস ও যকৃতে পানি জমে ফুলে যায়। (৬) উদরীয় অঞ্চলে ব্যথা অনুভব হয়।

করণীয়/প্রতিকার (Control)

হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ডাক্তারের নির্দেশমতো ওষুধ সেবন করতে হবে। এই ধরনের রোগীদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম। প্রচুর বিশ্রাম নিতে হবে। খাবারে আলগা লবণ বর্জন করতে হবে। রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে। BMI মেনে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। শরীরে ধমনি ও শিরাকে প্রসারিত রাখে এমন ওষুধ সেবন করতে হবে। সর্বোপরি হার্ট ফেইলিউর রোগীদের সবসময় চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী শল্যচিকিৎসা (যেমন– এনজিওপ্লাস্টি অথবা করোনারি বাইপাস ইত্যাদি) করতে হবে।

2020/8/4 17:31

Scanned with CamScanner

করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ (Risk Factors of Coronary Heart Disease) : ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি ধমনিতে স্নেহ জাতীয় পদার্থের (কোলেস্টেরল) আধিক্য অর্থাৎ **অ্যার্টারিওস্ক্লেরোসিস** (arteriosclerosis) হওয়া, পজেটিভ ফেমিলি হিস্ট্রি, বয়স, লিঙ্গ, ধূমপান, স্থূলতা, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ও বিকিরণ চিকিৎসা প্রভৃতি।

হৃদরোগ প্রতিরোধে করণীয় (Measures to Prevent Coronary Heart Disease)

- আদর্শ জীবনযাপন করা।
- ধূমপান বর্জন করা।
- অ্যালকোহল বা মদ্যপান পরিত্যাগ করা।
- প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করা এবং নিয়মিত কায়িক শ্রমে নিযুক্ত থাকা অর্থাৎ দেহের ওজন স্বাভাবিক রাখা। নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করা।
- বেশি শাকসবজি ও সালাদ খাওয়া এবং গিলা, কলিজা, মগজ ও গরু-মহিষের লাল মাংস বর্জন করা।
- তেল, চর্বি, মিষ্টি কম খাওয়া।
- আলগা লবণ বর্জন করা অর্থাৎ খাদ্যে লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।
- উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস বা কিডনির সমস্যা থাকলে চিকিৎসা গ্রহণ করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ ওষুধ ধারাবাহিকভাবে সেবন করা।
- উত্তেজনা প্রশমন করা। দুশ্চিন্তামুক্ত প্রফুল্ল-আনন্দময় জীবনযাপন করা ইত্যাদি।
- বছরে অন্তত একবার অথবা সম্ভব হলে দু'বার সমগ্রদেহ চেকআপের ব্যবস্থা করা।

সর্বোপরি, হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য নিজে সচেতন থাকা এবং অপরকে সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করা।

❑ **কাজ :** (i) অ্যানজাইনা রোগ হলে কী ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে? (ii) অ্যানজাইনা রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।/অ্যানজাইনা থেকে নিরাময়ে তোমার মতামত দাও। (iii) হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণগুলো সম্পর্কে লেখ। (iv) উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত মানুষের দেহে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থাকলেও রক্তশূন্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই– বিশ্লেষণ কর। (v) বুকে ব্যথা যে সকল রোগের কারণে হতে পারে তা প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

৪.৮ হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা
(The Concept of the Treatment of Heart Disease)

হৃদরোগের চিকিৎসা যেমন হৃদরোগের মৃত্যুর সম্ভাবনা কমায়, ঠিক তেমনি রোগীকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করে। কাজেই হৃদরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কিছু শারীরিক উপসর্গ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ সহজেই নির্ণয় করা যায়, যা পরবর্তী সময় চিকিৎসার ধরন ঠিক করতে সাহায্য করে।

সহজলভ্য এবং তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়ের পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে :

- ইসিজি (ECG-Electrocardiogram): করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের প্রাথমিক পরীক্ষা।
- কার্ডিয়াক এনজাইমস (Cardiac Enzymes) : যেমন– ট্রপোনিন, সিকে-এমবি (CK-MB- Creatine Kinase, Muscle and Brain): এদের পরিমাণ বা মাত্রা দ্বারা নির্ণয় করা হয় রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা।
- ইটিটি (ETT-Exercise Tolerance Test): হার্টের অবস্থা বা কর্মক্ষমতা বোঝার জন্য।
- ইকোকার্ডিওগ্রাম (Ecocardiogram): হার্টের অবস্থা বা কর্মক্ষমতা বোঝার জন্য।
- রক্তের BNP (Brain Natriuretic Peptide) পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে জানা।
- হৃৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানার জন্য MRI (Magnetic Resonance Imaging) পরীক্ষা করা।
- উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- রক্তে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ পরীক্ষা করা।

2020/8/4 17:31

Scanned with CamScanner

ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে :

(ক) করোনারি এনজিওগ্রাম (Coronary angiogram) : (i) প্রচলিত পদ্ধতিতে এনজিওগ্রাম ও (ii) সিটি এনজিওগ্রাম।

(খ) থেলিয়াম আপটেক টেস্ট বা মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন ইমাজিং (Thallium uptake test or myocardial perfusion imaging -MPI)।

ইসিজি (ECG-Electrocardiogram) : রোগী বুকে ব্যথা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে গেলে চিকিৎসক যদি মনে করেন এটি হৃদরোগজনিত ব্যথা হতে পারে, তবে সর্বপ্রথম তিনি রোগীকে একটি ইসিজি করার পরামর্শ দেন। ইসিজি হলো করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের প্রাথমিক পরীক্ষা। ইসিজিতে কিছু বৈশিষ্ট্যমূলক পরিবর্তন দেখে শনাক্ত করা যায় যে, রোগী করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন কিনা অথবা তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা।

কার্ডিয়াক এনজাইমস (Cardiac Enzymes) : রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে কার্ডিয়াক এনজাইমস, যেমন– **ট্রপোনিন, সিকে-এমবি** ইত্যাদির পরিমাণ বা মাত্রা দ্বারা নির্ণয় করা হয় রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা।

ইটিটি ও ইকোকার্ডিওগ্রাম (ETT-Exercise Tolerance Test and Ecocardiogram) : আবার কিছু রোগী আছেন, যারা বিশ্রামের সময়, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বা জোরে হাঁটেন তখন বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তাদের ক্ষেত্রে করা হয় **ইটিটি** আর হার্টের কর্মক্ষমতা বোঝার জন্য করা হয় **ইকোকার্ডিওগ্রাম**।

করোনারি এনজিওগ্রাম (Coronary Angiogram) : করোনারি এনজিওগ্রামের মাধ্যমে করোনারি ধমনিতে **ব্লকেজের** পরিমাণ কতটুকু তা নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে রোগীর হাত বা উরুর শিরাপথে ইনজেকশনের মাধ্যমে **তরল রঞ্জক পদার্থ** (dye) প্রবেশ করানো হয় এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন **গামা ক্যামেরার** মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

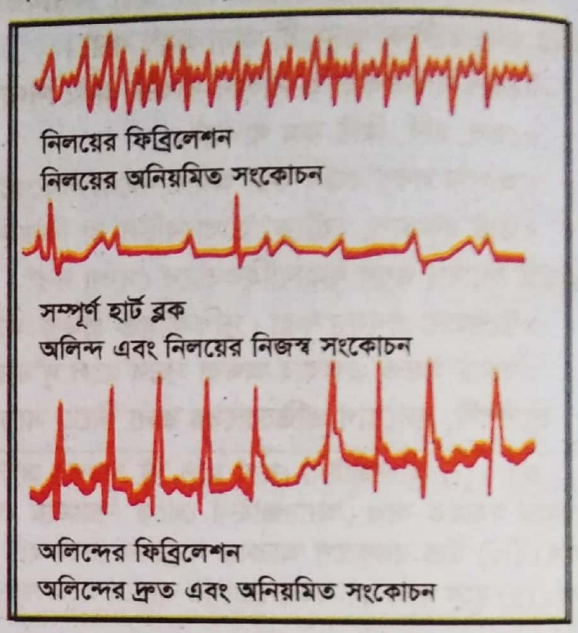

চিত্র ৪.১৪ : হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক অবস্থায় ধারণকৃত ইসিজি

হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা

প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় হৃদরোগীদের যেসব ওষুধ সেবন করার পরামর্শ দেওয়া হয় তাদের তিন ধরনের ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথা– **প্রথমত**, ব্যথা কমানোর ওষুধ। হৃদরোগীদের পকেটে বা ব্যাগে সবসময় একটি স্প্রে জাতীয় ওষুধ (**নাইট্রোগ্লিসারিন,** Nitroglycerin) রাখতে দেওয়া হয়। বুকে ব্যথা বা চাপ অনুভূত হলে এটি ব্যবহার করে থাকেন। **দ্বিতীয়ত**, রক্ত জমাটবদ্ধতা রোধের জন্য **অ্যান্টিপ্লেটলেট** ওষুধ। যেমন : **অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডগ্রেল** ইত্যাদি। **তৃতীয়ত**, রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা কমানোর ওষুধ। যেমন : **স্ট্যাটিন, ফাইব্রেট** ইত্যাদি। আবার ব্লকেজের পরিমাণ বেশি হলে প্রয়োজন হয় **ইন্টারভেনশন** ও **সার্জিক্যাল** চিকিৎসার। ইন্টারভেনশন হলো **এনজিওপ্লাস্টি** (বেলুনিং ও স্টেন্টিং বা ধাতব রিং পরানো) আর সার্জিক্যাল চিকিৎসা হচ্ছে **বাইপাস অপারেশন**।

পেসমেকার (Pacemaker)

মানুষের হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে অবস্থিত SAN বা **সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড** (Sino-Atrial Node) প্রাকৃতিক পেসমেকার হিসেবে কাজ করে যাকে **প্রাথমিক পেসমেকার** (Primary Pacemaker) বলে। SAN হলো হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী কলা (specialized junctional tissue)। SAN ডান অলিন্দের **উর্ধ্ব মহাশিরা** (superior venacava) এবং অলিন্দ উপাঙ্গের (atrial appendage) সংযোগস্থলে **এপিকার্ডিয়াম** এবং **এন্ডোকার্ডিয়ামের** মধ্যে অবস্থিত।

SAN-এর উর্ধ্ব প্রান্ত প্রশস্ত এবং প্রান্তদেশ সুচালো। এটি সূক্ষ্ম লম্বাটে দুই মুখ সুচালো রূপান্তরিত পেশিকোষের সমন্বয়ে গঠিত। এদের ব্যাস স্বাভাবিক হৃৎপেশির এক-তৃতীয়াংশ। এরূপ পেশিকোষে নিউক্লিয়াস কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে এবং এরা অস্পষ্ট অনুদৈর্ঘ্য ডোরাসম্পন্ন। পেশিকোষগুলো পরস্পর তন্তুজাল গঠন করে। এদের সারকোপ্লাজমের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং মায়োফাইব্রিলের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়া SAN-এ পারকিনজি

2020/8/4 17:31

Scanned with CamScanner

তন্তুর ঘন তন্তুজাল থাকে। স্পন্দনপ্রবাহ প্রথম SAN-এ উৎপন্ন হয় এবং হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য সংযোগী কলার দ্বারা অলিন্দ ও নিলয় পেশিতে পরিবাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই SAN-কে **ছন্দনিয়ামক** বা **প্রাকৃতিক পেসমেকারও** বলা হয়। হৃৎপেশিকোষ অন্যান্য কোষের মতো বাইরের দিকে **ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট** এবং ভেতরের দিকে **ঋণাত্মক চার্জ** থাকে। পেসমেকারে এই আধান বা চার্জ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার পরিবর্তিত হয়। এটি আবার সংলগ্ন পেশিকোষে আধান পরিবর্তনের সূচনা করে এবং এভাবে একটি সূক্ষ্ম প্রবাহ অলিন্দের সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলে অলিন্দ সংকুচিত হয়। এই উদ্দীপনা সরাসরি নিলয়ে সঞ্চালিত হতে পারে না। কারণ অলিন্দ পেশি ও নিলয় পেশির মাঝে স্নেহ বস্তুর একটি পাতলা স্তর থাকে।

কৃত্রিম বা যান্ত্রিক পেসমেকার (Artificial Pacemaker)

কৃত্রিম পেসমেকার একটি লিথিয়াম **ব্যাটারি**, কম্পিউটারাইজড **জেনারেটর** ও শীর্ষে **সেন্সরযুক্ত** কতকগুলো তার বা **লিড** (lead) নিয়ে গঠিত। সেন্সরগুলোকে **ইলেকট্রোড** (electrode) বা **ক্যাথোড** বলে। ব্যাটারি জেনারেটরকে শক্তি সরবরাহ করে। এ দুটি জিনিস একটি পাতলা ধাতব বাক্সে আবৃত থাকে। তারগুলোর সাহায্যে জেনারেটরকে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ইলেকট্রোডগুলো হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কর্মকাণ্ড শনাক্ত করে তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে। পেসমেকারে অপরিবাহী আবরণযুক্ত (insulated) ১-৩টি তার থাকে। ইহার ওজন প্রায় ৩০-১৩০ গ্রাম। **কৃত্রিম পেসমেকারের মাধ্যমে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়**। কৃত্রিম পেসমেকারের আয়ুষ্কাল প্রায় ৫-১০ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

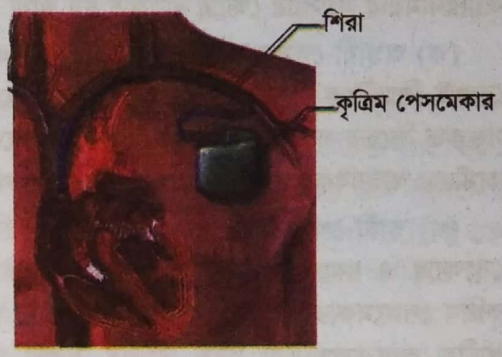

চিত্র ৪.১৫ : হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে কৃত্রিম পেসমেকার

আমেরিকান বিজ্ঞানী **William Chardack** এবং **Wilson Greatbatch** (1969) দেহে স্থাপনযোগ্য পেসমেকার আবিষ্কার করেন। পেসমেকার স্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে। বর্তমানে হৃদরোগের চিকিৎসায় পেসমেকার ছাড়াও **আইসিডি** (ICD- implantable cardioverter defibrillator) নামক আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তার প্রবেশের ধরন অনুযায়ী পেসমেকার সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা– এক-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার, দ্বি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার এবং ত্রি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার।

১। এক-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার : এ ধরনের পেসমেকারে একটি তার দ্বারা জেনারেটর থেকে হৃৎপিণ্ডের শুধু ডান অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ) বা ডান ভেন্ট্রিকলে (নিলয়) বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

২। দ্বি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার : এ ধরনের পেসমেকারে দুটি তার দ্বারা জেনারেটর থেকে হৃৎপিণ্ডের দুটি প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

৩। ত্রি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার : এ ধরনের পেসমেকারে তিনটি তার দ্বারা একটি জেনারেটর থেকে যথাক্রমে ডান অ্যাট্রিয়াম, ডান ভেন্ট্রিকল এবং বাম ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে। এটি অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে পেসমেকার ভেন্ট্রিকলদ্বয়ের সংকোচন ক্ষমতার উন্নতি ঘটিয়ে রক্তপ্রবাহে উন্নতি ঘটায়। পেসমেকার মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ যন্ত্র হতে নিম্ন মাত্রার বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয়ে হৃৎস্পন্দনের সূচনা করে।

কৃত্রিম পেসমেকারের কার্যক্রম (Artificial Pacemaker Activities) **:** SAN অর্থাৎ প্রাকৃতিক পেসমেকার বিকল হলে একটি স্পন্দন প্রবাহ উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তখন হৃৎস্পন্দন (heart beat) অনিয়মিত হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় **অ্যারিথমিয়া** (arrhythmia)। এসময় হার্ট বিট খুব দ্রুত (tachycardia) গতিতে বা খুব মন্থর (bradycardia) গতিতে সংঘটিত হয়। ফলে হৃৎপিণ্ড পর্যাপ্ত রক্ত দেহে সরবরাহ করতে পারে না। কৃত্রিম পেসমেকার দ্বারা অ্যারিথমিয়া সংশোধন করা হয়।

কৃত্রিম পেসমেকার হৃৎপিণ্ডকে নিয়মিত ব্যবধানে উদ্দীপিত করে এবং ফলে হৃৎপিণ্ড তার **ছন্দময়তা** (rhythmicity) ফিরে পায়। একটি পেসমেকার প্রয়োজনের অত্যন্ত সাধারণ মেডিকেল অবস্থাকে বলা হয় **ব্রাডিকার্ডিয়া** (bradycardia) অর্থাৎ এটা হৃৎপিণ্ডের হার যা দেহের চাহিদা মেটাতে অপ্রতুল। ব্রাডিকার্ডিয়াতে ভুগলে, হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০ এর নিচে থাকবে এবং দেহের অঙ্গাদিতে রক্তের সরবরাহ বিশেষত মস্তিষ্কে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ হবে।

Scanned with CamScanner

ফলস্বরূপ, সম্ভবত ব্রাডিকার্ডিয়ার উপসর্গের অভিজ্ঞতা পাবে, যেমন– ঝিমুনি ভাব, চূড়ান্ত অবসাদ, শ্বাসকষ্ট, ব্যায়ামে অবসন্নতা, মূর্ছা যাওয়া। যখনই রোগীর হৃৎস্পন্দন অত্যন্ত ধীরে হবে, তখনই কৃত্রিম পেসমেকার এটাকে উদ্দীপিত করে নির্দিষ্ট হারে হৃৎস্পন্দন ঘটাবে। এইসব বৈদ্যুতিক নাড়ির স্পন্দনের কারণে হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের কম-বেশি স্বাভাবিক হার ফিরে আসে, যা ব্রাডিকার্ডিয়ার উপসর্গগুলো কমায় বা দূর করে।

কৃত্রিম পেসমেকার স্থাপন কৌশল : রোগের মাত্রা অনুসারে রোগীর দেহে অস্থায়ী বা স্থায়ী পেসমেকার স্থাপন করা হয়। সাধারণত স্বল্প মেয়াদি হৃৎপিণ্ডের সমস্যা (যেমন– হার্ট অ্যাটাক ঘটাতে পারে এমন ধীর হার্টবিট বা হৃৎস্পন্দন) কিংবা হার্ট সার্জারির সময় জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী পেসমেকার ব্যবহার করা হয়। আর দীর্ঘমেয়াদি হৃৎপিণ্ডের অ্যারিথমিয়ার সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় স্থায়ী পেসমেকার।

(ক) অস্থায়ী পেসমেকার স্থাপন কৌশল : এ ধরনের পেসমেকার স্থাপনের ক্ষেত্রে জেনারেটরটিকে শরীরের বাইরে রেখেই লিডটিকে শিরার ভেতরে ঢুকিয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছানো হয়। জেনারেটরটি বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি করে এবং এ সংকেত লিডের সাহায্যে পরিমিত মাত্রায় হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়। এতে প্রয়োজনীয় হারে হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়। এটি সর্বোচ্চ একমাস পর্যন্ত রাখা যেতে পারে।

(খ) স্থায়ী পেসমেকার স্থাপন কৌশল : যদি রোগীর দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য পেসমেকারের প্রয়োজন হয় তবে সেক্ষেত্রে এ ধরনের পেসমেকার সংস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে দ্বি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার ব্যবহার করাই শ্রেয়। কৃত্রিম পেসমেকার রোগীর বুকে শল্যচিকিৎসার দ্বারা বসিয়ে দেওয়া হয়। স্থায়ী পেসমেকার স্থাপনের শুরুতে রোগীকে স্থানীয় অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সংবেদনহীন (অবশ) করা হয়। এরপর **কণ্ঠাস্থির** বা **ক্ল্যাভিকলের** (clavicle) নিচে ত্বকের একটি অংশ কেটে একটি পকেট তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত বাম দিক বরাবর করা হয়ে থাকে। এ পকেটটির মধ্যে পেসমেকার বসানো হয়। ক্ল্যাভিকলের পেছনে একটি ছিদ্র করে সেন্সরযুক্ত লিড বা তারের ক্যাথোড প্রান্তটি উপযুক্ত শিরার ভেতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডের উপযুক্ত স্থানে সংযুক্ত করা হয় অর্থাৎ একটি লিডের মুক্ত প্রান্ত ডান অ্যাট্রিয়ামে ও অন্যটির মুক্ত প্রান্ত ডান ভেন্ট্রিকলে সংযুক্ত করা হয়। পেসমেকারের জেনারেটর দ্বারা উৎপাদিত বৈদ্যুতিক সংকেত গ্রহণযোগ্য মাত্রাতে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে এবং প্রয়োজনীয় স্পন্দন শুরু হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডের মন্থর স্পন্দন গতিশীল হয় এবং দ্রুত হারের স্পন্দন কমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এরূপ সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি তৈরিকৃত পকেটটির মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়। পকেট তৈরির জন্য কাটা অংশটি শোষণ উপযোগী সূচার দিয়ে বন্ধ করা হয়।

একটি পেসমেকার স্থাপন করতে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার মতো সময় লাগে। পেসমেকার স্থাপন করার পর রোগীকে হাসপাতাল থেকে ১-৩ দিনের মধ্যে বিদায় দেওয়া হয়। পেসমেকার সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তবে এতে স্বল্প মাত্রায় রক্তক্ষরণ, ফুসফুসের হালকা ছিদ্র, এমনকি হৃৎপিণ্ডেও হালকা ছিদ্র হতে পারে। পেসমেকার যন্ত্রটি বেশিদিন স্থায়ী হলেও লিথিয়াম ব্যাটারির আয়ুষ্কাল (প্রায় ৫-১০ বছর) কম হওয়ার কারণে এটি প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হয়।

সাবধানতা

কৃত্রিম পেসমেকার স্থাপনকারী রোগীদের কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যায়াম, খেলাধুলা এমনকি দৈহিক পরিশ্রম না করা এবং নিয়মিত হৃৎস্পন্দন পর্যবেক্ষণ করা। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা। সেলুলার ফোন নিকটবর্তী স্থানে না রাখা। ইলেকট্রিক ওভেন ও ইলেকট্রিক জেনারেটর ব্যবহারে সতর্ক থাকা। পেসমেকার বসানোর স্থানে চাপ না দেওয়া। X-Ray বা MRI করার সময় সর্তক থাকা। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ সেবন এবং যেকোনো শারীরিক সমস্যা মনে হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ওপেন হার্ট সার্জারি (Open Heart Surgery)

চিকিৎসকরা যখন বক্ষের অস্থিকে কেটে হৃৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করেন এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমিয়ে অপারেশনের মাধ্যমে হার্টের সমস্যাগুলো দূরীভূত করেন তাকে **ওপেন হার্ট সার্জারি** বলে। স্টেন্ট বা রিং এবং এনজিওপ্লাস্টির মাধ্যমে যখন সমস্যা সমাধান না হয় তখনই এই কঠিন সমস্যা দূর করার জন্য এই অপারেশন করা হয়। টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **Dr. Wilfred G. Bigelow** (1950) সর্বপ্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি প্রয়োগ করেন।

2020/8/4 17:31

Scanned with CamScanner

যেসব কারণ ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয় : ওপেন হার্ট সার্জারি নিম্নলিখিত কারণে হতে পারে। যথা—

১। হৃৎপিণ্ডে কোনো জন্মগত ত্রুটির কারণে।

২। করোনারি ধমনিতে একাধিক ব্লকেজ বা যেকোনো ধমনি ১০০% ব্লকেজ থাকার কারণে এই অপারেশন করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে **করোনারি বাইপাস** বা **CABG** (Coronary Artery Bypass Graft) বলে।

৩। হৃৎপিণ্ডের কোনো কপাটিকার মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা।

৪। হৃৎপিণ্ডে কোনো যন্ত্র বা পেসমেকার বসানো।

৫। হৃৎপিণ্ড নষ্ট হয়ে গেলে দাতার হৃৎপিণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।

ওপেন হার্ট সার্জারির প্রকারভেদ : ওপেন হার্ট সার্জারিতে চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যথা—

১। অন-পাম্প সার্জারি (On pump surgery) : এই ধরনের সার্জারিতে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহ বন্ধ রাখা হয়। এই সময় **হার্ট লাং মেশিনের** (heart-lung machine) সাহায্যে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন অব্যাহত রাখা হয়। মেশিনটিতে সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠ, O_2 প্রকোষ্ঠ বা বাক্স, পাম্প মেশিন ও টিউব থাকে। টিউবের একপ্রান্ত ডান অলিন্দের সাথে ও অপর প্রান্ত সিস্টেমিক মহাধমনির সাথে লাগানো হয়। উক্ত মেশিনের সাহায্যে হার্টের ডান অলিন্দ থেকে রক্ত একটি কক্ষে গ্রহণ করা হয় এবং সেখান থেকে রক্ত O_2 সমৃদ্ধ বাক্সে প্রবেশ করানো হয়। O_2 বাক্সের মধ্য দিয়ে পার হওয়ার সময় লোহিত কণিকা (RBC) O_2 গ্রহণ করে এবং অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করে। সেই কক্ষ থেকে পাম্প দ্বারা রক্ত শরীরের সব অঙ্গে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমে মেশিনের রক্ত নল দিয়ে মহাধমনিতে (aorta) প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে রক্ত রক্তনালি দিয়ে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

২। অফ-পাম্প সার্জারি (Off pump surgery or Beating heart) : এইক্ষেত্রে হার্ট লাং মেশিন ব্যবহার করা হয় না। এই ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডকে সচল রেখে সার্জারি করা হয়। একে **অবক্যাব** (opcab) সার্জারি বলে।

৩। মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি (Minimally invasive surgery) : এক্ষেত্রে বুকের খুব অল্প অংশ কাটা হয়। এক্ষেত্রে হার্ট লাং মেশিন ব্যবহারিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। একে **মিডক্যাব** (MIDCAB-Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) সার্জারি বলে।

৪। রোবট-সহযোগী সার্জারি (Robot-assisted surgery) : এ ধরনের সার্জারিতে রোগীর গায়ে খুবই সামান্য একটি কাটা দাগ থাকে। এ ধরনের সার্জারি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঠিক হয়ে থাকে। কারণ এ পদ্ধতিতে শল্যচিকিৎসকরা বিশেষ কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাত (যান্ত্রিক হাত)-এর সাহায্যে অস্ত্রোপচার করেন। চিকিৎসক কম্পিউটার সার্জারির ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দেখতে পান এবং কাজ সম্পন্ন করেন।

ওপেন হার্ট সার্জারির কৌশল

এই ধরনের চিকিৎসার জন্য **লাইফ সাপোর্ট যন্ত্র** ও **হৃদ-ফুসফুস মেশিন** বা **হার্ট লাং মেশিন** (heart-lung machine) ব্যবহার করা হয়। এতে একটি কার্ডিওভাস্কুলার শল্যচিকিৎসক দল জটিল অস্ত্রোপ্রচার পরিচালনা করেন। সার্জারি বা অপারেশনের শুরুতে চিকিৎসকের নির্দেশে **সাধারণ অ্যানেসথেসিয়া** (general anesthesia) বা **স্নায়ুবন্ধক অ্যানেসথেসিয়া** (nerve block anesthesia) দিয়ে রোগীকে অজ্ঞান করা হয়। অজ্ঞান করার প্রক্রিয়া ও কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হলেই শল্যচিকিৎসকরা অপারেশন শুরু করেন। সার্জারির সময় যেন রক্ত জমাট না বাঁধে সেজন্য হেপারিন ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়। অপারেশনের শুরুতে প্রথমে সার্জন মাংস ও বুকের স্টার্নাম অস্থি ৮-৯ ইঞ্চি লম্বা করে কেটে আলাদা করেন তারপর বিশেষ ধরনের যন্ত্র দিয়ে এটিকে ফাঁক করে হার্টে পৌঁছান। তারপর হার্টের পেরিকার্ডিয়াম পর্দা কেটে হার্টকে হার্ট লাং মেশিনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

হার্ট লাং মেশিন কাজ আরম্ভ করলে তখন হার্টের উপর অবস্থিত অ্যাওর্টার বা মহাধমনির রক্তসঞ্চালন বন্ধ করে হার্টকে রক্তনালি হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। সেই সঙ্গে অ্যাওর্টাতে একটি ইনজেকশনের মাধ্যমে হার্টবিট বন্ধ করা হয়। ফলে রোগী সম্পূর্ণভাবে বাইপাস মেশিনে চলে যায়। ফলে মেশিনের মাধ্যমে রোগীর দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। এরপর সার্জনরা করোনারি বাইপাস সার্জারি আরম্ভ করেন।

2020/8/4 17:31
Scanned with CamScanner

অন্যদিকে, করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি বা হৃৎকপাটিকা মেরামত করার সময় বড় ধরনের কাটা-ছেঁড়া না করে বুকের মাঝামাঝি ছোট ফুটা করে ভেতরে ক্যামেরাযুক্ত যন্ত্র ঢুকিয়ে রোগীর অভ্যন্তরভাগ ভিডিও পর্দায় দেখা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সার্জারি হলে সময় ও ব্যথা উভয়ই কম লাগে।

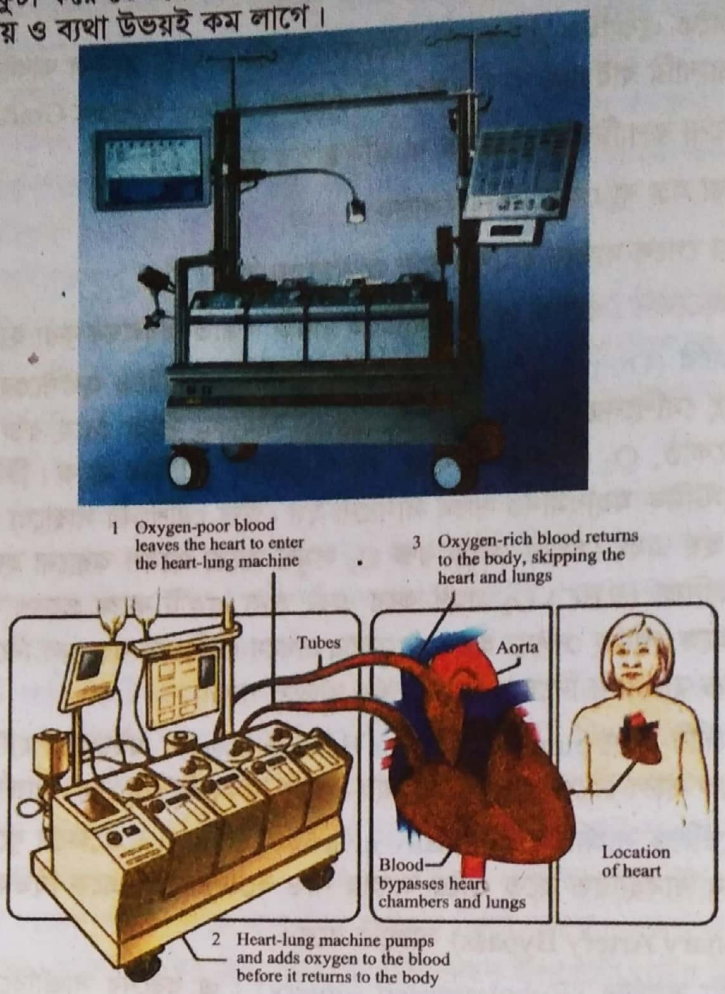

চিত্র ৪.১৬ : ওপেন হার্ট সার্জারিতে ব্যবহৃত হার্ট লাং মেশিন ও এর কার্যকারিতা

সাবধানতা :

ওপেন হার্ট সার্জারির রোগীদের কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন– সার্জারির পর রোগীকে **ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে** (intensive care unit-ICU) নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়; ধূমপান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে; চর্বিমুক্ত খাবার খেতে হবে; উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা; নিয়মিত চলাফেরা করা; স্বাস্থ্যসম্মত ওজন বজায় রাখা; চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন এবং যেকোনো শারীরিক সমস্যা মনে হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

করোনারি বাইপাস (Coronary Bypass)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় করোনারি বাইপাসকে **করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট** বা **সিএবিজি** (Coronary Artery Bypass Graft/Grafting - CABG) সার্জারি বোঝায়। করোনারি ধমনিতে ব্লক হলে তা যদি **স্টেন্ট** বা রিং পরানো সম্ভব না হয় বা এনজিওপ্লাস্টি করে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাদের পরামর্শ দেওয়া হয় করোনারি বাইপাস সার্জারির। অর্থাৎ যাদের ব্লকেজের পরিমাণ বেশি, যেমন– ২টি করোনারি ধমনিতেই একাধিক ব্লকেজ কিংবা একটি ধমনিই পুরোপুরি বন্ধ। সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের অপারেশন করা হয়। করোনারি বাইপাস সার্জারি ওপেন হার্ট সার্জারির অন্তর্গত।

করোনারি হৃদরোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে– করোনারি ধমনির রুদ্ধতা। ধমনির অন্তঃস্থ প্রাচীর ঘিরে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল জাতীয় হলদে রং-এ চর্বি সঞ্চিত হয়ে করোনারি হৃদরোগে সৃষ্টি করে। ধমনি প্রাচীরের এন্ডোথেলিয়ামে এগুলো জমা হয়। পরে এসব পদার্থে তন্তু পুঞ্জীভূত হয়ে শক্ত চুনময় পদার্থে পরিণত হয়। এসব পদার্থের আধিক্যের কারণে ধমনিপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় অথবা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় হৃৎপেশি অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত না পেলে হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর প্রভৃতি জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে করোনারি বাইপাস সার্জারি মতো জটিল প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হয়।

2020/8/4 17:32

Scanned with CamScanner

এ পদ্ধতিতে রোগীর বুকের হাড়টিকে **ইলেকট্রিক করাত** দিয়ে কেটে বিশেষ ধরনের টেনে আনার মেশিন দিয়ে ফাঁক করে হার্টটিকে মুক্ত করা হয়। অতঃপর ধমনির যেসব স্থানে ব্লক আছে, সেখানে শরীরের অন্যস্থানের (যেমন– পায়ের বা হাতের) একটি শিরা বা ধমনি (গ্রাফট) দিয়ে বন্ধ রক্তনালির পাশ দিয়ে নতুন রক্তনালি সংস্থাপন করে রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়। এ কারণেই এই অস্ত্রোপচারকে **করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং** বা **সিএবিজি (CABG)** বলে। অপারেশনের সময় সংগৃহীত পায়ের শিরার একপ্রান্ত হার্টের উপরিভাগে অবস্থিত অ্যাওর্টার সাথে এবং অপর প্রান্ত রক্তনালির বন্ধ হয়ে যাওয়া অংশকে পাশ কাটিয়ে ঐ একই রক্তনালির সাথে জোড়া দিয়ে দেওয়া হয়। এতে হার্ট লাং মেশিন ব্যবহার করা হয় যাতে সূক্ষ্ম শিরাগুলো যথাযথ ও সঠিকভাবে যুক্ত করা যায়। সাধারণত ৩-৫ ঘণ্টার মধ্যে বাইপাস সার্জারির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। রোগীকে ২-৩ দিন হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। দুই মাসের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে যান। সিএবিজি অপারেশনের রোগীর পা এবং হাতে কাটা দাগ থেকে যায়।

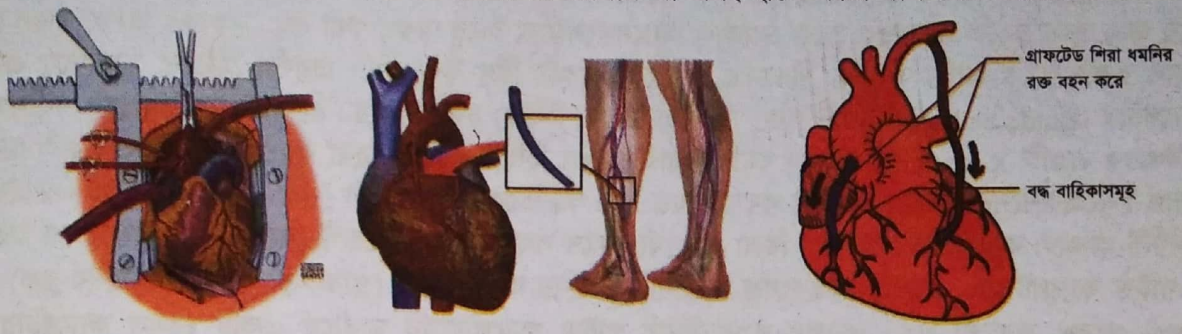

চিত্র ৪.১৯ : করোনারি বাইপাস সার্জারি : (ক) উন্মুক্ত হার্ট, (খ ও গ) বাম পা থেকে শিরা এনে করোনারি ধমনিতে সংযোজন, (ঘ) করোনারি বাইপাস করা হার্ট

সাবধানতা

বাইপাস সার্জারির পর রোগীকে সাবধানতার সাথে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন– সার্জারির পর রোগীকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়; ধূমপান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা; চর্বিমুক্ত খাবার খাওয়া; উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা; নিয়মিত পরিমিত ব্যায়াম করা; স্বাস্থ্যসম্মত ওজন বজায় রাখা; চাপ ও রাগ নিয়ন্ত্রণে আনা; চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন এবং চিকিৎসকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

এনজিওপ্লাস্টি (Angioplasty)

এনজিওপ্লাস্টি হচ্ছে এক ধরনের চিকিৎসা যার সাহায্যে ধমনির যে অংশে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজ ও রক্ত চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই জায়গাটিকে প্রসারিত করা হয়। একে **পারকিউটেনাস করোনারি ইন্টারভেনশন** (Percutaneous Coronary Intervention- PCI) বা Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) বলা হয়। এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে না, কেবল করোনারি ধমনির ভেতর **ক্যাথেটার** (catheter) প্রবেশ করিয়ে ধমনিকে প্রশস্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিকভাবে এনজিওগ্রাম করে ধমনিতে ব্লকেজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। তারপর রোগীর শারীরিক অবস্থা ও ব্লকেজের পরিমাণ অনুসারে **এনজিওপ্লাস্টি** অথবা বাইপাস সার্জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাধারণত অ্যানজাইনা ও হার্ট অ্যাটাকের হৃৎরোগীদের করোনারি এনজিওপ্লাস্টি করাতে হয়। সুইজারল্যান্ডের **ডা. অ্যানড্রেস গ্রয়েন জিগ** ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

এনজিওপ্লাস্টির প্রকারভেদ : এনজিওপ্লাস্টি মূলত দু'ধরনের, যথা– **বেলুনিং** এবং **স্টেন্টিং** বা **রিং পরানো**।

১। বেলুনিং (Ballooning) : এ পদ্ধতিতে ধমনির যে জায়গায় ব্লকেজ রয়েছে সেখানে ক্যাথেটারের (লম্বা সরু তারবিশেষ) সাহায্যে একটি বেলুন প্রবেশ করানো হয়। তারপর সেই বেলুনটিকে ফুলিয়ে দিয়ে সেই জায়গাটিকে প্রসারিত করা হয়।



চিত্র ৪.২০ : বেলুন এনজিওপ্লাস্টি : ক. প্লাক জমে ধমনির লুমেন প্রায় বন্ধ, খ. উন্মুক্ত বেলুন ও গ. প্রশস্ত ধমনি লুমেন

Scanned with CamScanner

২। স্টেন্টিং বা রিং পরানো (Stenting) : এ পদ্ধতিতে আগের মতোই ক্যাথেটারের (catheter) সাহায্যে বেলুন ঢুকিয়ে ধমনির সংকুচিত অংশটিকে প্রসারিত করা হয়। তারপর সেখানে একটি **স্টেন্ট বা ধাতব রিং** (বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মিত) প্রবেশ করিয়ে সেটা স্থাপন করা হয় যাতে তা ধমনিকে প্রসারিত করে রাখার মাধ্যমে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহে সহায়তা করে। রিং দু'ধরনের যথা : **মেডিকেটেড স্টেন্ট** অর্থাৎ রিং-এর গায়ে ওষুধ লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে পুনঃ ব্লকেজ প্রতিরোধ করা যেতে পারে এবং অপরটি **নন মেডিকেটেড স্টেন্ট**। করোনারি ধমনিতে ব্লকেজের পরিমাণ ৭০-৮০% কিংবা যাদের দুটি করোনারি ধমনিতে ৫০-৬০% ব্লকেজ এবং একটিতে ৮০% ব্লকেজ, তাদের শুধু ৮০% ব্লকড ধমনিতে স্টেন্টিং করা হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে ৩০ মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে।

এনজিওপ্লাস্টির (স্টেন্টিং বা রিং পরানো) কৌশল

এনজিওপ্লাস্টির শুরুতে রোগীর হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। রোগী যাতে ব্যথা অনুভব না করে তার জন্য কুঁচকি বা বাহুর ত্বকে লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে অবশ করা হয়। কুঁচকির অথবা বাহুর (catheter) প্রধান রক্তনালিতে মোটা সুঁই বা নিডলের সাহায্যে একটি ছিদ্র করা হয়। এরপর ছিদ্রটির মধ্যদিয়ে একটি গাইড ক্যাথেটার (guide catheter-একটি সরু, নমনীয় ও লম্বা টিউব) ঢুকানো হয়। ক্যাথেটারের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য চিকিৎসক একটি X-ray মনিটর এবং ধমনির প্লাক অঞ্চল চিহ্নিতকরণের জন্য ক্যাথেটারটির মধ্যে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ ইনজেকশনের সাহায্যে প্রবেশ করানো হয়। এ পদ্ধতিকে **ফ্লুরোস্কোপি** (fluoroscopy) বলে। এ ধরনের রঞ্জক সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে ক্যাথেটার পৌঁছালো কিনা তা পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। রোগী নিজেও এটি পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

গাইড ক্যাথেটারের প্রান্তটি শেষ পর্যন্ত করোনারি ধমনির অ্যাথারোমা (প্লাক বা করোনারি ধমনির ব্লক) গঠিত সরু অংশে প্রবেশ করানো হয়। এরপর রক্তনালিতে গাইড ক্যাথেটারের মাধ্যমে একটি **বেলুন ক্যাথেটার** (balloon catheter) প্রবেশ করানো হয়। এর প্রান্তে একটি **বেলুন** ও একটি **স্টেন্ট** (ধাতুর তৈরি তারের জালিকার মতো কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা খাঁচা। এটি সুতার তৈরিও হতে পারে) থাকে। করোনারি ধমনির অ্যাথারোমা অংশে বেলুন ও স্টেন্ট প্রবেশ করানোর পর কয়েক সেকেন্ডের (৩০-৬০ সেকেন্ড) মধ্যে বেলুনটি ফোলানো হয়। ফলে ধমনির অ্যাথারোমার চর্বিগুলো নিষ্পেশিত হয়ে সরু ধমনিকে প্রশস্ত করে। এর ফলে ধমনির ভেতর দিয়ে রক্ত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করে। চর্বিগুলো নিষ্পেশিত হওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য বুকে অ্যানজাইনার মতো তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এরপর বেলুনটি চুপসিয়ে বেলুনসহ ক্যাথেটার বাইরে বের করে আনা হয়। কিন্তু স্টেন্টটি ধমনির ভেতরেই রেখে দেওয়া হয়। এটি সর্বদা ধমনির প্রাচীরকে বাইরের দিক চেপে রাখে বলে ধমনিতে সহজে অ্যাথারোমা বা ব্লক তৈরি হতে পারে না। স্টেন্টটির গায়ে এক ধরনের ওষুধের প্রলেপ লাগানো হয়। এটি চর্বি গলিয়ে ধমনিকে পুনরায় সরু হওয়া থেকে রক্ষা করে। করোনারি ধমনির একাধিক স্থানে অ্যাথারোমা বা ব্লক থাকলে একাধিক স্থানেই স্টেন্ট অ্যানজিওপ্লাস্ট করা যায়। প্রতিটি স্টেন্ট অ্যানজিওপ্লাস্টিতে প্রায় ৩০ মিনিট সময় লাগে। তবে ব্লকের সংখ্যা ও ধরণ অনুসারে তা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত লাগতে পারে। চিকিৎসক রোগীকে অপারেশনের পর নিবিড় পর্যবেক্ষণে একদিন বা তারও বেশি রাখতে পারেন। **সাধারণভাবে স্টেন্টের মাধ্যমে এনজিওপ্লাস্টিকে রিং পরানো বলে।**



চিত্র ৪.২১ : স্টেন্ট পদ্ধতিতে এনজিওপ্লাস্টি করার ধাপসমূহ

বর্তমানে চিকিৎসকগণ উপরোক্ত এনজিওপ্লাস্টি ছাড়াও **লেজার এনজিওপ্লাস্টি** এবং **করোনারি অ্যাথেরেকটমির** মাধ্যমে হৃদরোগের চিকিৎসা করে থাকেন।

লেজার এনজিওপ্লাস্টি : এ ধরনের এনজিওপ্লাস্টিতে বেলুনের পরিবর্তে ক্যাথেটারের শীর্ষে একটি লেজার লাগানো থাকে। করোনারি ধমনির প্লাকযুক্ত অংশে লেজার রশ্মি পৌঁছে স্তরে স্তরে প্লাক ধ্বংস করে এবং গ্যাসীয় কণায় বাষ্পীভূত করে দেয়। এ প্রক্রিয়াটি লেজার ছাড়া, বেলুন এনজিওপ্লাস্টির পাশাপাশিও প্রয়োগ করা যায়।

2020/8/4 17:32

Scanned with CamScanner

করোনারি অ্যাথেরেকটমি : এটিও এনজিওপ্লাস্টির মতো একটি পদ্ধতি, তবে এ প্রযুক্তিতে ধমনি প্রাচীরের প্লাককে বেলুনের সাহায্যে চেপে ল্যুমেন প্রশস্ত করার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, যেমন– ব্লেড, ক্ষুদ্র ঘূর্ণী ব্লেড, বেলুন, ড্রিল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

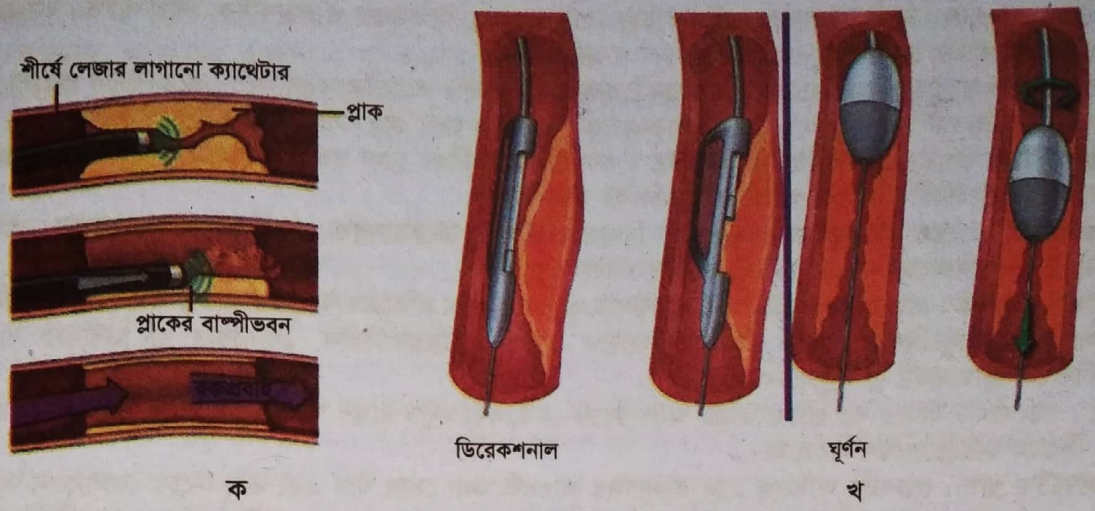

চিত্র ৪.২২ : (ক) লেজার ও (খ) করোনারি অ্যাথেরেকটমি পদ্ধতিতে এনজিওপ্লাস্টি করার ধাপসমূহ

এনজিওপ্লাস্টির উপকারিতা

করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান রোগ সৃষ্টি হয় করোনারি ধমনিতে। ধমনির ভেতর ব্লক সৃষ্টি হলে পর্যাপ্ত অক্সিজেন O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপেশিতে সংবহিত হতে পারে না। ফলে হার্ট ফেইলিউর ও হার্ট অ্যার্টাকের মতো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ মারাত্মক অবস্থা মোকাবেলায় এনজিওপ্লাস্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এনজিওপ্লাস্টি ধমনির ল্যুমেন থেকে ব্লক অপসারণ করতে পারে। তাছাড়া শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা উপশম হয়। এ পদ্ধতিটি হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমিয়ে জীবন রক্ষায় অবদান রাখে। বুক উন্মুক্ত করতে হয় না বলে, সংক্রমণ ও দীর্ঘকালীন সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে না। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় জীবন রক্ষাকারী এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে এবং কয়েক দিন পর থেকেই হালকা কাজকর্ম করা সম্ভব। সুস্থ হতে ৪ সপ্তাহের বেশি লাগে না।

এনজিওপ্লাস্টির ঝুঁকি

এনজিওপ্লাস্টি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার শুরুতে, বিশেষত স্টেন্টিং করার সময় ২% রোগীর ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। আবার যে রক্তনালির মধ্য দিয়ে ক্যাথেটার ঢুকানো হয়, সেখান থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে। আবার বেলুনিং-এর সময় বেলুন ছিঁড়ে যেতে পারে অথবা স্টেন্টিং-এর সময় স্টেন্ট চুপসে রক্ত চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। এনজিওপ্লাস্টি করার পরও রোগীর বিপদের সম্ভাবনা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে স্টেন্ট লাগানো অংশটিতে রক্ত জমাট বাঁধে এবং জমাটবদ্ধ রক্ত ছুটে গিয়ে মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালিকে আক্রান্ত করে স্ট্রোক ঘটাতে পারে। আবার কোনো কোনো রোগী পুনরায় ব্লকেজে আক্রান্ত হতে পারে। সর্বোপরি এনজিওপ্লাস্টি একটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা। একটি বেসরকারি হৃদরোগ হাসপাতালে বেলুনিং-এর জন্য খরচ হয় ৭৫ হাজার টাকা। স্টেন্টিং-এর ক্ষেত্রে প্রতিটি মেডিকেটেড রিং-এর মূল্য ৮০ হাজার থেকে দুই লাখ টাকা। নন মেডিকেটেড রিং-এর মূল্য ৫০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা, এছাড়া বাড়তি ওষুধপত্র ও হাসপাতালের খরচ যুক্ত হয়ে ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় তিন থেকে চার লাখ টাকা দাঁড়ায়।

তাছাড়া যারা বৃক্কের অসুখে ভুগছেন, কিংবা এনজিওগ্রামের সময় রঞ্জকের প্রতি অ্যালার্জি দেখা দেয় এবং যাদের বয়স ৭৫ বছরের বেশি তাদের ক্ষেত্রে এনজিওপ্লাস্টি কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে।

❑ **কাজ :** (i) এনজিওপ্লাস্টি হৃৎপিণ্ডে রোগ নিরাময়ে কতটুকু সহায়ক হবে– বিশ্লেষণ কর। (ii) এনজিওপ্লাস্টি সম্পর্কে আলোচনা কর।

2007874 17:32

Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

- **রক্ত সংবহনতন্ত্র :** দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সংবহনের জন্য বিভিন্ন অঙ্গের পারস্পরিক সহযোগিতায় যে অঙ্গতন্ত্র গড়ে ওঠে, তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। এ তন্ত্র রক্ত, হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকা নিয়ে গঠিত।
- **রক্ত :** রক্ত এক প্রকার বিশেষ ধরনের প্রবাহমান তরল যোজক কলা, যা রক্তরস ও রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত। রক্তকণিকা তিন প্রকার, যথা– লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা।
- **রক্তরস :** রক্তরস বা প্লাজমা হচ্ছে রক্তের ঈষৎ ক্ষারধর্মী হালকা হলুদ বর্ণের অকোষীয় তরল অংশ। এতে পানির পরিমাণ ৯০-৯২% এবং দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ ৮-১০%। প্লাজমা রক্তকণিকাসমূহ ধারণ করে এবং রক্তের তারল্যতা রক্ষা করে।
- **এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা বা হিমাটিড :** লোহিত রক্তকণিকা হলো রক্তরসে বিদ্যমান লালবর্ণের, বৃত্তাকার, দ্বি-অবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন ও চাকতির মতো গঠনবিশিষ্ট রক্তকণিকা।
- **লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা :** রক্তরসে বিদ্যমান স্বচ্ছ, নিউক্লিয়াসযুক্ত, দানাদার বা অদানাদার, অনিয়তাকার গঠনবিশিষ্ট রক্তকণিকাকে লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা বলে।
- **আণুবীক্ষণিক সৈনিক :** রক্তের লিম্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে বলে এদের আণুবীক্ষণিক সৈনিক বলে।
- **থ্রোম্বাসাইট বা অনুচক্রিকা :** রক্তে বিদ্যমান বর্ণহীন, ক্ষুদ্র, নিউক্লিয়াসবিহীন, গোলাকার বা ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার রক্তকণিকাকে থ্রোম্বাসাইট বা অনুচক্রিকা বলে।
- **সিরাম :** রক্ত জমাট বাঁধার পর রক্তের জমাট অংশ থেকে যে হালকা হলুদ রঙের স্বচ্ছ জলীয় অংশ নির্গত হয় তাকে সিরাম বলে। সিরামে ফাইব্রিনোজেন থাকে না।
- **হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ :** রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তনালির আবরণী কলা ভেঙে যায় এবং তার নিচের কোলাজেন তন্তু বেরিয়ে পড়ে। কোলাজেন তন্তু অনুচক্রিকাকে আকর্ষণ করে। অনুচক্রিকাগুলো কোলাজেনে আটকে গিয়ে সেরোটোনিন ও ADP ক্ষরণ করে। ফলে আরও অনুচক্রিকা ক্ষতস্থানে জড়ো হয়ে ক্ষতস্থানে শিথিল প্লাগ বা ছিপির সৃষ্টি করে। একে হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ বলে। এই প্লাগ হেপারিন জাতীয় তঞ্চনবিরোধী দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
- **রক্ততঞ্চন :** যে প্রক্রিয়ায় কোনো ক্ষতের মুখে রক্ত জমাট বেঁধে দেহ থেকে অবাঞ্ছিত রক্তপাত বন্ধ হয় তাকে রক্ততঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধা বলে।
- **লসিকা :** প্রধানত কৈশিক জালিকার ভেদ্য প্রাচীরের মাধ্যমে রক্তের যে তরল অংশ বের হয়ে শিরা ও ধমনির জালকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে দেহের প্রতিটি কোষকে সিক্ত রাখে তাকে লসিকা বলে।
- **লসিকাবাহ :** যে বিশেষ ধরনের নালিকার মাধ্যমে লসিকা সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয় তাদের লসিকাবাহ বা লসিকানালি বলে।
- **লসিকা গ্রন্থি :** লসিকানালির স্বল্প ব্যবধানে বহু গোলাকার বা ডিম্বাকার বা বৃক্কাকার স্ফীত অংশ থাকে, এদের লসিকা গ্রন্থি বা লসিকা পর্ব বলে।
- **কলারস :** আন্তঃকোষীয় স্থানে অবস্থানকারী যে স্বচ্ছ, বর্ণহীন তরল কলাকোষগুলোকে পুষ্টি প্রদান করে তাকে কলারস বা টিস্যু ফ্লুয়িড বলে।
- **হৃৎপিণ্ড :** হৃৎপিণ্ড হলো রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার জন্য চাপ সৃষ্টিকারী মাংসল ফাঁপা, বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, সর্বক্ষণ নির্দিষ্ট ছন্দ ও হারে স্পন্দনশীল একটি প্রধান কেন্দ্রীয় যন্ত্র বিশেষ। যাকে সজীব পাম্পিং অঙ্গও বলা হয়। অর্থাৎ মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় পাম্প যন্ত্র হলো হৃৎপিণ্ড। এটি সর্বদা একটি ছন্দোময় সংকোচন-প্রসারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ফিরে আসা রক্ত সংগ্রহ করে এবং পুনরায় সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরণ করে।
- **কলামনি কার্নি :** হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকল বা নিলয় প্রাচীরের অন্তর্গাত্র হতে কতগুলো মাংসল পেশি ভেন্ট্রিকল প্রকোষ্ঠে অভিক্ষেপিত অবস্থায় থাকে। এদের কলামনি কার্নি বলে।
- **দ্বি-বর্তনী সংবহন :** যে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্ত সমগ্র দেহে একবার পরিপূর্ণ চক্র সম্পন্ন করার পূর্বে হৃৎপিণ্ড দিয়ে দুবার প্রবাহিত হয় তাকে দ্বি-বর্তনী সংবহন বা দ্বৈত সংবহন বলে। সিস্টেমিক সংবহন ও পালমোনারি সংবহন নিয়ে এ ধরনের চক্র গঠিত। এটি অক্সিজেনেটেড ও ডিঅক্সিজেনেটেড রক্তের মিশ্রণে বাধা দেয়, অক্সিজেনেটেড ব্লাড অধিক অক্সিজেন বহন করে এবং ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড অধিক কার্বন ডাইঅক্সাইড বহন করে দেহ থেকে অপসারণের জন্য।
- **হার্টবিট :** হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ বা স্পন্দন ছন্দময় গতিতে অবিরাম চলতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের একবার সংকোচন (সিস্টোল) ও একবার প্রসারণ (ডায়াস্টোল)-কে একত্রে হার্টবিট বা হৃৎস্পন্দন বলে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার।
- **কার্ডিয়াক চক্র :** হৃৎস্পন্দনের সময় হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের জন্য ধারাবাহিকভাবে কতকগুলো ঘটনা ঘটে। একটি হৃৎস্পন্দন বা হার্টবিট সম্পন্ন করতে হৃৎপিণ্ডে পরপর সংঘটিত ঘটনার সমষ্টিকে কার্ডিয়াক চক্র বা হৃৎচক্র বলে।
- **মায়োজেনিক হৃৎপিণ্ড :** মানুষের হৃৎপিণ্ড স্নায়ুতন্ত্র, হরমোন বা অন্য কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই নিজেই স্পন্দন তৈরি করতে পারে। এজন্য একে মায়োজেনিক হৃৎপিণ্ড বলে।
- **মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ :** মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকুচিত-প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়। এতে প্রচণ্ড গতিতে রক্ত প্রবাহিত হয়। বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে। বিশেষ চার ধরনের সংযোগী কলা বা টিস্যু হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে।

2020/8/4 17:32

Scanned with CamScanner

☑ **রক্তচাপ :** রক্ত রক্তবাহিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তবাহিকার প্রাচীরে (প্রধানত ধমনির প্রাচীরে) যে পার্শ্বীয় চাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ বলে। পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহের স্বাভাবিক রক্তচাপ ১২০/৮০ mm Hg.

☑ **ধমনি রক্তচাপ :** ধমনিতে প্রবহমান রক্ত ধমনিগাত্রে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে ধমনি রক্তচাপ বলে। রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনি রক্তচাপকেই বোঝায়।

☑ **হাইপারটেনশন :** নির্দিষ্ট বয়সে মানুষের সুস্থ শরীরে যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি পরিমাণের রক্তচাপ সর্বদা বিদ্যমান থাকলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে।

☑ **ব্যারোরিসেপ্টর :** রক্তনালির প্রাচীরে বিদ্যমান কতগুলো সংবেদী স্নায়ুপ্রান্ত, যা রক্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয়। সেই স্নায়ুপ্রান্তকে ব্যারোরিসেপ্টর বলে। এরা রক্তচাপ পরিবর্তনে সাড়া দিয়ে দেহে রক্তচাপের ভারসাম্য বা হোমিওস্ট্যাসিস বজায় রাখে। মানুষের দেহের ঊর্ধ্বাংশে বৃহৎ ধমনির বিভক্তি অঞ্চলে, যেমন– অ্যাওর্টিক আর্চ, ক্যারোটিড ধমনি ইত্যাদিতে এদের পাওয়া যায়।

☑ **ব্যারোরিফ্লেক্স :** রক্তনালির প্রাচীরে অবস্থিত বিশেষ সংবেদী স্নায়ুপ্রান্তকে ব্যারোরিসেপ্টর বলে। রক্তনালিতে কোনো কারণে অস্বাভাবিক রক্তচাপ সৃষ্টি হলে ব্যারোরিসেপ্টর খুব দ্রুত এই উদ্দীপনা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে। এরপর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ড পরিচলনার মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদ্ধতিকে ব্যারোরিফ্লেক্স বলে।

☑ **আয়তনরিসেপ্টর :** শিরা, হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ, ডান নিলয়, পালমোনারি ধমনি ও পালমোনারি শিরায় যেখানে রক্তের চাপ কম থাকে সেখানকার ব্যারোরিসেপ্টরগুলোকে আয়তনরিসেপ্টর বলে।

☑ **রক্তবাহিকা :** যেসব নালিকার মাধ্যমে রক্ত বাহিত হয় অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় হৃৎপিণ্ড ফিরে আসে, সেগুলোকে রক্তবাহিকা বলে। তিন ধরনের রক্তবাহিকা দ্বারা রক্ত পরিবাহিত হয়, যথা– ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা।

☑ **ধমনি :** যেসব রক্ত নালিকার মাধ্যমে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয় তাদের ধমনি বলে (ব্যতিক্রম– পালমোনারি ধমনি)।

☑ **শিরা :** যেসব রক্তনালিকার মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে (ব্যতিক্রম– পালমোনারি শিরা)।

☑ **কৈশিক জালিকা :** কোষ-কলার ফাঁকে ফাঁকে জালিকার ন্যায় বিস্তৃত, সূক্ষ্ম প্রাচীরবিশিষ্ট, অতি সরু আণুবীক্ষণিক রক্তনালিকাকে কৈশিক জালিকা বলে।

☑ **সিস্টেমিক সংবহন :** যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু করে দেহের বিভিন্ন অংশ হতে ডান অ্যাট্রিয়ামে পৌঁছায় তাকে সিস্টেমিক সংবহন বলে। এই সংবহনে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম ভেন্ট্রিকল থেকে ধমনির মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশের জালকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঐ সকল জালক থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে অর্থাৎ এই সংবহনের মাধ্যমে দেহের সকল কোষ, টিস্যু ও অঙ্গে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ হয় এবং CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে।

☑ **পালমোনারি সংবহন :** যে সংবহনে রক্ত ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে গমন করে এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে পুনরায় ফেরত আসে তাকে পালমোনারি সংবহন বলে। অর্থাৎ এই সংবহনে হৃৎপিণ্ডের ডান ভেন্ট্রিকল থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে যায় এবং ফুসফুস থেকে পালমোনারি শিরার মাধ্যমে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে।

☑ **করোনারি সংবহন :** যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব পেশিতে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সংবাহিত হয় তাকে করোনারি সংবহন বলে। এই সংবহনে হৃৎপিণ্ডের বাম ভেন্ট্রিকল থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি ধমনির মাধ্যমে হৃৎপেশিতে সরবরাহ হয় এবং হৃৎপেশি থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে করোনারি সাইনাস হয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে। অর্থাৎ এই ধরনের সংবহন হৃৎপেশি ও হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঘটে।

☑ **পোর্টাল সংবহন :** কোনো কোনো অঙ্গে কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয় তাকে পোর্টাল শিরা বলে। পোর্টাল শিরার মাধ্যমে রক্তসংবহন ব্যবস্থাকে পোর্টাল সংবহন বলে। এই সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে বিভিন্ন ধমনির মাধ্যমে পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, প্লিহা এবং অন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ওইসব অংশের জালক থেকে রক্ত পোর্টাল শিরার মধ্য দিয়ে যকৃতে অবস্থিত জালকে আসে। যকৃৎ থেকে রক্ত হেপাটিক শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। মানবদেহে কেবল হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র বিদ্যমান।

☑ **সিস্টেমিক শিরা :** যেসব শিরা দেহস্থ রক্তজালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে মিলিত হয় তাদের সিস্টেমিক শিরা বলে। যেমন– ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা।

☑ **পোর্টাল শিরা :** যেসব শিরা দেহস্থ রক্তজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে যাওয়ার পথে অন্য কোনো অঙ্গে পুনরায় জালক সৃষ্টি করে তাদের পোর্টাল শিরা বলে। যেমন– হেপাটিক পোর্টাল শিরা, রেনাল পোর্টাল শিরা।

☑ **ধমনিতন্ত্র :** মানবদেহের সর্বত্র বিস্তৃত ছোট-বড় বিভিন্ন ধমনি মিলে যে তন্ত্রের সৃষ্টি করে তাকে ধমনিতন্ত্র বলে।

☑ **শিরাতন্ত্র :** মানবদেহের সর্বত্র বিস্তৃত ছোট-বড় সকল শিরার সমন্বয়ে গঠিত জটিল তন্ত্রকে শিরাতন্ত্র বলে।

☑ **করোনারি ধমনি :** যে রক্তনালি দ্বারা হৃৎপিণ্ড নিজে রক্ত সরবরাহ পেয়ে থাকে তাকে করোনারি ধমনি বলে।

☑ **হৃদরোগ :** হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনি ও সংশ্লিষ্ট রক্তনালির কতিপয় সমস্যা বা রোগকে একত্রে হৃদরোগ বা হার্ট ডিজিজ বা কার্ডিওভাস্কুলার রোগ বা ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ বলা হয়।

2020/8/4 17:32

Scanned with CamScanner

☑ **অ্যানজাইনা :** করোনারি ধমনি সংক্রান্ত একটি অতি পরিচিত উপসর্গ। কোনো কারণে করোনারি ধমনির দ্বারা হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশিতে রক্ত সরবরাহ কমে গেলে বা সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেড়ে গেলে এক ধরনের ব্যথা অনুভূত হয়। এই ধরনের বুকের ব্যথাকে অ্যানজাইনা বলে।

☑ **অ্যার্টারিওস্ক্লেরোসিস :** যে প্রক্রিয়ায় ধমনি প্রাচীরে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল জাতীয় হলদে চর্বি পদার্থ জমা হয়ে ধমনির প্রাচীর পুরু হয়ে শক্ত হতে শুরু করে তাকে আর্টারিওস্ক্লেরোসিস বলে। আর পুঞ্জীভূত কোলেস্টেরল জাতীয় পদার্থগুলোকে অ্যাথেরোমেটাস প্লাক বলে।

☑ **করোনারি হৃদরোগ :** অ্যাথেরোমেটাস প্লাকের জন্য ধমনির গহ্বর সরু হওয়ার ফলে হৃৎপেশিতে পর্যাপ্ত O_2 ও পুষ্টি সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে করোনারি হৃদরোগ বা ইস্কিমিয়া বলে। অ্যানজাইনা, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর ইত্যাদি করোনারি হৃৎরোগ। করোনারি ধমনির অস্বাভাবিকতার জন্য এই রোগগুলো সৃষ্টি হয়।

☑ **হার্ট ব্লক :** হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের উদ্দীপনা সৃষ্টি না হওয়া অথবা উদ্দীপনা পরিবহনের ত্রুটিজনিত রোগ।

☑ **হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন :** হৃৎপিণ্ডের কোনো অংশে দীর্ঘ সময় ব্যাপী রক্ত সরবরাহ বন্ধ থাকলে ঐ অংশের পেশিগুলো অকেজো হয়ে কিংবা মরে গিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করে তাকেই হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন বলে। হার্ট অ্যাটাকের ফলে রোগী সাধারণত অজ্ঞান হয় না কিংবা দেহের একদিকে প্যারালাইজড (paralized) হয় না।

☑ **হার্ট ফেইলিউর :** হৃৎপিণ্ড যখন দক্ষতার সঙ্গে দেহে রক্ত সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাকে হার্ট ফেইলিউর বলে।

☑ **স্ট্রোক :** উচ্চ রক্তচাপের জন্য রক্তবাহ বিদীর্ণ হওয়ার ফলে (রক্তক্ষরণের ফলে) অথবা দুর্ঘটনায় বিদীর্ণ কিংবা মস্তিষ্কে রক্তবাহের অবরোধের ফলে স্ট্রোক হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ু কোষগুলো পুষ্টি ও অক্সিজেনের অভাবে দেহাংশে পক্ষাঘাত দেখা যায়। অর্থাৎ এর ফলে সাধারণত রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় কিংবা দেহের একদিকে প্যারালাইজড হয়ে যায়।

☑ **কার্ডিওলজিস্ট :** হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালি সম্পর্কিত বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসককে কার্ডিওলজিস্ট (Cardiologist) বলে।

☑ **পেসমেকার :** হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino Atrial Node-SAN) নামক বিশেষ ধরনের সংযোজী টিস্যু থেকে বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয়ে সমগ্র হৃৎপিণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় এবং স্পন্দন ছন্দময়তা বজায় থাকে। তাই SAN-কে পেসমেকার বলে। একে ছন্দনিয়ামকও বলা হয়।

☑ **কৃত্রিম পেসমেকার :** কৃত্রিম পেসমেকার একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র, যা একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, কম্পিউটারাইজড জেনারেটর ও শীর্ষে সেন্সরযুক্ত কতকগুলো তার বা লিড (lead) নিয়ে গঠিত। দেহের SAN বা পেসমেকার কাজ না করলে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে কৃত্রিম পেসমেকার স্থাপন করে হার্টবিট বা হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক করা যায়। অথবা, কৃত্রিম পেসমেকার হলো একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র যার মাধ্যমে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ যন্ত্র হতে নিম্ন মাত্রার বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয়ে হার্টবিটের সূচনা করে।

☑ **অ্যারিথমিয়া :** কোনো কারণে প্রাকৃতিক পেসমেকারে (SAN) কাজ না করলে বা বিকল হলে একটি স্পন্দন প্রবাহ উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তখন হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় অ্যারিথমিয়া (arrhythmia)। অথবা- হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে মন্থর বা দ্রুত গতিসম্পন্ন কিংবা অনিয়মিত হলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন হলে তাকে অ্যারিথমিয়া বলে।

☑ **ব্রাডিকার্ডিয়া :** হৃৎস্পন্দনের হার অস্বাভাবিক কমে যাওয়াকে (প্রতি মিনিটে 60 বা তারও কম) ব্রাডিকার্ডিয়া (bradycardia) বলে।

☑ **টাকিকার্ডিয়া :** হৃৎস্পন্দনের হার অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়াকে (প্রতি মিনিটে 100-200 বার) টাকিকার্ডিয়া বলে।

☑ **এনজিওগ্রাম :** উরু ও পেটের সংযোগস্থলে কুঁচকিতে স্থানীয়ভাবে অবশ করে সুচ ঢোকানোর পর এক ধরনের ইনজেকশন পুশ করে ছবি নেওয়ার মাধ্যমে ব্লক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে এনজিওগ্রাম বলে।

☑ **থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি :** রক্তনালিকার ভেতরের রক্ত জমাট ভাঙ্গতে রোগীকে ওষুধ সেবন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বুকে ব্যথা অনুভূত হওয়ার ৩ ঘন্টার মধ্যে এ ধরনের ওষুধ সেবন করতে হয়। এ চিকিৎসাকে থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি (thrombolytic therapy) বলে।

☑ **ওপেন হার্ট সার্জারি :** চিকিৎসকরা যখন বক্ষের অস্থিকে কেটে হৃৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করেন এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমিয়ে অপারেশনের মাধ্যমে হার্টের সমস্যাগুলো দূরীভূত করেন তাকে ওপেন হার্ট সার্জারি বলে।

☑ **করোনারি বাইপাস :** করোনারি ধমনির ভেতরে ব্লক তৈরি হয়ে যদি হৃৎপেশিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয় তবে উক্ত রক্ত বিকল্প আরেকটি পথে হৃৎপেশিতে পৌছানোর পদ্ধতিকে করোনারি বাইপাস বা সিএবিজি (Coronary Artery Bypass Graft/Grafting -CABG) বলে।

☑ **অ্যাথারোমা :** যে কারণে করোনারি ধমনি সরু হয়ে যায় তাকে অ্যাথারোমা (atheroma) বলে। অথবা, চর্বি জাতীয় পদার্থ, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন প্রভৃতি করোনারি ধমনির অন্তর্গাত্রে জমা হয়ে বিভিন্ন আকৃতির প্লাক (plaques) গঠন করে। একে অ্যাথারোমা বা করোনারি অ্যাথারোমা (atheroma/coronary atheroma) বলে।

☑ **ক্যাথেটার :** ক্যাথেটার হলো একটি নমনীয়, লম্বা ও সরু টিউব বিশেষ যার দ্বারা করোনারি ধমনির সরু হয়ে যাওয়া অংশে একটি করোনারি স্টেন্ট (coronary stent) বা রিং স্থাপন করা হয়। এটি যান্ত্রিক পেসমেকার ও এনজিওপ্লাস্টিতে ব্যবহার করা হয়।

☑ **এনজিওপ্লাস্টি :** এনজিওপ্লাস্টি হচ্ছে এক ধরনের চিকিৎসা, যার সাহায্যে ধমনির যে অংশে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজ ও রক্ত চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, সে জায়গাটিকে প্রসারিত করা। এনজিওপ্লাস্টির ফলে করোনারি ধমনি দিয়ে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ঘটে এবং হৃৎপিণ্ড সচল থাকে।

2020/8/4 17:33

Scanned with CamScanner

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বুকের ব্যথা ঘাড়, চোয়াল ও বাম বাহুতে ছড়িয়ে পড়ে কখন? [ব.বো.-২০১৭]
ক নিউমোনিয়াম খ প্ল্যুরিসি
গ অ্যানজাইনা ঘ পেরিকার্ডাইটিস

২. কার্ডিয়াক চক্রের কোন দশার সময়কাল ০.১ সেকেন্ড? [চ.বো.-২০১৭]
ক অলিন্দের সিস্টোল খ অলিন্দের ডায়াস্টোল
গ নিলয়ের সিস্টোল ঘ নিলয়ের ডায়াস্টোল

৩. নিচের কোন ক্রমটি সঠিক? [ঢা.বো.-২০১৭]
ক SAN → AVN → পারকিনজি তন্তু → বান্ডল অব হিজ
খ SAN → AVN → বান্ডল অব হিজ → পারকিনজি তন্তু
গ SAN → বান্ডল অব হিজ → AVN → পারকিনজি তন্তু
ঘ SAN → পারকিনজি তন্তু → AVN → বান্ডল অব হিজ

৪. করোনারি ধমনি রক্ত সংবহন করে কোথায়? [ঢা.বো.-২০১৭]
ক যকৃতে খ ফুসফুসে গ বৃক্কে ঘ হৃৎপিণ্ডে

৫. কোন রক্তকণিকা হেপারিন ক্ষরণ করে? [ঢাকা বোর্ড-২০১৮]
ক ইওসিনোফিল খ নিউট্রোফিল গ বেসোফিল ঘ মনোসাইট

৬. রক্তরসে নাইট্রোজেন ঘটিত অপ্রোটিন পদার্থ কোনটি? [ঢা.বো.-২০১৬]
ক প্রোথম্বিন খ ফ্রাইব্রিনোজেন গ ক্রিয়েটিনিন ঘ অ্যালবুমিন

৭. রক্তের গতিপথের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [ঢা.বো.-২০১৬]
ক ডান অলিন্দ → ডান নিলয় → ফুসফুস → বাম অলিন্দ
খ বাম অলিন্দ → বাম নিলয় → ফুসফুস → সারাদেহ
গ ডান নিলয় → সারাদেহ → ডান অলিন্দ → ফুসফুস
ঘ বাম নিলয় → ফুসফুস → বাম অলিন্দ → সারাদেহ

৮. SAN এর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য? [ঢা.বো.-২০১৬]
ক এটি বাম অ্যাট্রিয়ামে অবস্থিত
খ সৃষ্ট তরঙ্গের গতিপথ SAN → পারকিনজি তন্তু → বান্ডেল অব হিজ
গ এটি হৃৎচক্র নিয়ন্ত্রণ করে না ঘ এটিকে পেসমেকার বলে

৯. ফুসফুস থেকে O_2 যুক্ত রক্ত দেহ পর্যন্ত পৌঁছায় কোন পথে? [রা.বো.-২০১৬]
ক পালমোনারি শিরা → বাম অলিন্দ → বাম নিলয় → মহাধমনি
খ পালমোনারি ধমনি → বাম অলিন্দ → বাম নিলয় → মহাধমনি
গ পালমোনারি ধমনি → ডান অলিন্দ → ডান নিলয় → মহাশিরা
ঘ পালমোনারি ধমনি → ডান অলিন্দ → ডান নিলয় → মহাধমনি

১০. বাম নিলয় → মহাধমনি → অঙ্গতন্ত্র → মহাশিরা → ডান অলিন্দ।
নিচের কোনটি উল্লিখিত গতিপথ অনুসরণ করে? [সি., কু., ব., চ., য., দি. ও রা. বোর্ড-২০১৮]
ক পালমোনারি খ পোর্টাল গ সিস্টেমিক ঘ করোনারি

১১. বাইকাসপিড কপাটিকার অবস্থান কোথায়? [ব.দি.বো.-২০১৬]
ক বাম নিলয় ও মহাধমনির মাঝে
খ ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মাঝে
গ বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝে
ঘ ডান অলিন্দ ও ঊর্ধ্ব মহাশিরার মাঝে

১২. নিম্ন মহাশিরা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে অবস্থিত কপাটিকার নাম কী? [সি.বো.-২০১৬]
ক মাইট্রাল খ অ্যাওর্টিক গ ইউস্টেশিয়ান ঘ ত্রিপত্র

১৩. কোনটি হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ গঠন করে? [সি.বো.-২০১৬]
ক লোহিত রক্তকণিকা খ শ্বেত রক্তকণিকা
গ অনুচক্রিকা ঘ লসিকা

১৪. কোনটি হৃৎপিণ্ডের অংশ? [দি.বো.-২০১৬]
ক ক্যানালিকুলি খ ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক
গ পেশিসূত্র ঘ কন্ড্রোসাইট

১৫. হিমোস্ট্রাটিক প্লাগ গঠন করে কোনটি? [সি. বো.-২০১৭]
ক এরিথ্রোসাইট খ লিম্ফোসাইট গ মনোসাইট ঘ থ্রম্বোসাইট

১৬. করোনারি ধমনি রক্ত সংবহন করে কোনটিতে? [দি.বো.-২০১৭]
ক ফুসফুস খ যকৃৎ গ বৃক্ক ঘ হৃৎপিণ্ড

১৭. নিচের কোন কোন অঙ্গে এরিথ্রোসাইট ধ্বংস হয়? [কু. বো.-২০১৬]
ক যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় খ লসিকা গ্রন্থি ও টনসিল
গ যকৃৎ ও প্লিহা ঘ বৃক্ক ও অস্থিমজ্জা

১৮. হৃৎপিণ্ডের কোন প্রাচীর সংকোচন-প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে? [কু.বো.-২০১৫]
ক পেরিকার্ডিয়াম খ এপিকার্ডিয়াম
গ এন্ডোকার্ডিয়াম ঘ মায়োকার্ডিয়াম

১৯. অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তাকারী রক্তকণিকার নাম কী? [কু.বো.-২০১৫]
ক লিম্ফোসাইট খ মনোসাইট
গ এরিথ্রোসাইট ঘ থ্রোম্বোসাইট

২০. আয়তন রিসেপ্টর কোথায় অবস্থান করে? [দি. বো.-২০১৬]
ক সাবক্লাভিয়ান ধমনিতে খ ক্যারোটিড সাইনাসে
গ পালমোনারি শিরায় ঘ মহাধমনিতে

২১. ডায়াফ্রামে রক্ত সরবরাহ করে কোন ধমনি? [য.বো.-২০১৫]
ক বৃক্কীয় খ ফ্রেনিক গ সাবক্ল্যাভিয়ান ঘ ক্যারোটিড

২২. রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা ও অ্যালার্জিক অ্যান্টিবডি ধ্বংস করে কোন ধরনের রক্তকণিকা? [য.বো.-২০১৫]
ক নিউট্রোফিল খ মনোসাইট
গ ইওসিনোফিল ঘ লিউকোসাইট

২৩. কোন শ্বেত রক্ত কণিকায় হেপারিন থাকে? [ঢা.বো.-২০১৯]
ক বেসোফিল খ নিউট্রোফিল গ ইউসিনোফিল ঘ লিম্ফোসাইট

২৪. মিট্রাল ভাল্‌ভ-এর অবস্থান কোথায়? [চ.বো.-২০১৫]
ক বাম নিলয় ও মহাধমনি
খ বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়
গ ডাল অলিন্দ ও সুপিরিয়র ভেনাকাভা
ঘ ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়

২৫. রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে কোনটি? [রা. সি.বো.-২০১৯]
ক হেপারিন খ ফাইব্রিন গ হিস্টামিন ঘ সিরাম

২৬. স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত জমাট বন্ধ না হওয়ার জন্য দায়ী প্রোটিনটি কোথা হতে নিঃসৃত হয়? [কু.বো.-২০১৯]
ক মনোসাইট খ নিউট্রোফিল গ বেসোফিল ঘ ইওসিনোফিল

২৭. রক্ত তঞ্চনের জন্য নিচের কোনটি সঠিক? [দি.বো.-২০১৫]
ক প্রোথ্রোম্বিন $\xrightarrow{\text{ফাইব্রিন} + Ca^{++}}$ থ্রম্বিন
খ প্রোথ্রোম্বিন $\xrightarrow{\text{থ্রম্বোপ্লাস্টিন} + Ca^{++}}$ থ্রম্বিন
গ ফাইব্রিনোজেন $\xrightarrow{\text{প্রোথ্রোম্বিন} + Ca^{++}}$ থ্রম্বিন

2020/8/4 17:33

Scanned with CamScanner

২৮. মানুষের হৃৎপিণ্ডে ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল হলে নিচের কী ঘটবে? [দি.বো.-২০১৫]
ক সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যাবে
খ বাইকাপপিড কপাটিকা খুলে যাবে
গ সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ হবে
ঘ ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যাবে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯. লসিকার কাজ হচ্ছে– [চা.বো.-২০১৮]
i. লিপিড পরিবহন ii. দেহের প্রতিরক্ষা
iii. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধে না। কারণ হলো– [য.বো.-২০১৭]
i. রক্ত প্রচণ্ড গতিতে অবিরাম প্রবহমান থাকে
ii. রক্তে হেপারিন নামক উপাদান থাকে
iii. রক্তনালির ভেতরের প্রাচীর অমসৃণ থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. হৃৎপিণ্ডের লাব-ডাব শব্দের কারণ– [য.বো.-২০১৬]
i. অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ii. ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল
iii. ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২. ডাক্তার কখন ওপেন হার্ট সার্জারি করেন? [সি. বো.-২০১৭]
i. করোনারি বাইপাসে ii. পেসমেকার স্থাপনে
iii. হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা প্রতিস্থাপনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. রক্তে পরিবাহিত CO_2 যৌগ– [রা. বো.-২০১৫]
i. $NaHCO_3$ ii. H_2CO_3 iii. $KHCO_3$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪. হৃৎপিণ্ডের এন্ডোকার্ডিয়ামের কাজ হলো– [য.বো.-২০১৫]
i. অন্তঃপ্রাচীর গঠন করা
ii. হৃৎকপাটিকাসমূহ খুলতে সাহায্য করা
iii. রক্তবাহিকার সাথে হৃৎপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫. পেসমেকার ব্যবহারের কারণ হলো– [চ. বো.-২০১৫]
i হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সংকেত প্রবাহে বাধাগ্রস্ত হলে
ii. রক্তবাহিকায় প্লাক জমার কারণে
iii. সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড ক্ষতিগ্রস্ত হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৬. হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণসমূহ হলো– [সি.বো.-২০১৫]
i. দ্রুত ও অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন
ii. অতিরিক্ত ঘাম নির্গত হওয়া iii. পায়ে পানি জমা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় ৩৭ ও ৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ট্রাই-কাসপিড ও বাই-কাসপিড কপাটিকা বন্ধের কারণে নিলয় থেকে রক্ত যথাক্রমে পালমোনারি ও সিস্টেমিক মহাধমনিতে যায়। [য.বো.-২০১৭]

৩৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটির ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
ক অলিন্দের ডায়াস্টোল খ অলিন্দের সিস্টোল
গ নিলয়ের সিস্টোল ঘ নিলয়ের ডায়াস্টোল

৩৮. উদ্দীপকের উল্লিখিত কপাটিকা দুই বন্ধ থাকে যে ধাপে–
i. অলিন্দের সিস্টোল ii. অলিন্দের ডায়াস্টোল
iii. নিলয়ের সিস্টোল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি থেকে ৩৯ ও ৪০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

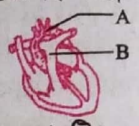

৩৯. 'A' চিহ্নিত রক্তনালির প্রবাহপথ কোনটি? [কু. বো.-২০১৬]
ক ডান অ্যাট্রিয়াম→ফুসফুস খ বাম ভেন্ট্রিকল→দেহ
গ ডান ভেন্ট্রিকল→ফুসফুস ঘ বাম অ্যাট্রিয়াম→দেহ

৪০. চিত্রে– [কু. বো.-২০১৬]
i. CO_2 যুক্ত রক্তনালি ii. বাম ভেন্ট্রিকল থেকে উত্থিত
iii. সিস্টেমিক সংবহন তন্ত্রের অংশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪১ ও ৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ব্যক্তির নাম	রক্তের গ্রুপ
V	B^+
W	O^+
X	AB^+
Y	A^+
Z	B^-

[সি., কু., ব. , চ., য., দি. ও রা. বো. – ২০১৮]

৪১. উদ্দীপকের ব্যক্তি 'V' জরুরি প্রয়োজনে কার নিকট থেকে রক্ত নিতে পারবে?
ক W খ X গ Y ঘ Z

৪২. X (♂) এবং V(♀) এর মধ্যে বিয়ে হলে তাদের সন্তানদের সম্ভাব্য রক্তগ্রুপ হবে–
i. A^+ ii. B^+ iii. AB^+
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

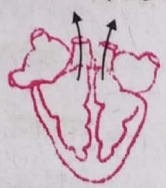

[রা. সি. বো.-২০১৯]

৪৩. উদ্দীপকের চিত্রটি নিম্নের কোন অবস্থা?
ক অলিন্দের সিস্টোল খ নিলয়ের ডায়াস্টোল
গ অলিন্দের ডায়াস্টোল ঘ নিলয়ের সিস্টোল

৪৪. চিত্রে উল্লিখিত অবস্থায় যা ঘটে–
i. 'লাব' সদৃশ শব্দ সৃষ্টি হয় ii. ভেন্ট্রিকল দুটি রক্তে পূর্ণ হয়
iii. বাই ও ট্রাইকাসপিড ভাল্‌ভ বন্ধ থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

2020/8/4 17:34

Scanned with CamScanner

⏭ উদ্দীপকটির সাহায্যে নিচের দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও :



[ঢা.বো.-২০১৫]

৪৫. 'X' চিহ্নিত অংশের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক মাকুআকৃতির খ নিউক্লিয়াস একাধিক
গ নলাকার ও শাখান্বিত ঘ ঐচ্ছিক

৪৬. অঙ্গটিতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের সঠিক অনুঃক্রম কোনটি?
ক Q→R→S→P খ R→S→Q→P
গ S→P→Q→R ঘ P→S→R→Q

⏭ নিচের উদ্দীপকটি থেকে ৪৭ ও ৪৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[রা.বো.-২০১৫]

৪৭. উদ্দীপকে ট্রাইকাসপিড কপাটিকা পৃথক করে–
ক P ও Q খ P ও R গ R ও S ঘ Q ও S

৪৮. উদ্দীপকের কোন অংশ থেকে O_2 যুক্ত রক্ত দেহে প্রবাহিত হয়?
ক P খ Q গ R ঘ S

⏭ উদ্দীপকের আলোকে ৪৯ ও ৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুমন নেইলকাটার দিয়ে হাতের নখ কাটার সময় আঙুলের কিছু অংশ কেটে গিয়ে কিছু লাল তরল বের হলো এবং একসময় তা বন্ধ হয়ে গেল। [য.বো.-২০১৫]

৪৯. উদ্দীপকে উল্লেখিত তরলের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. এটি কোনো কণিকা বহন করে না
ii. এটি শ্বসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে
iii. এটি রেচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫০. উদ্দীপকের তরল পড়া বন্ধ হওয়ার কারণ হলো–
i. হেপারিনের কাজ বন্ধ হয়েছে ii. থ্রোম্বিনে কণিকা আটকা পড়েছে
iii. সিরাম নিঃসৃত হওয়ায় নালির সংকোচন ঘটেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি থেকে ৫১ ও ৫২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানুষের হৃৎপিণ্ড থেকে মহাধমনির মাধ্যমে O_2 যুক্ত রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে যায় এবং CO_2 যুক্ত রক্ত মহাশিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এজন্য হৃৎপিণ্ডকে সজীব পাম্প বলা হয়? [ব.বো.-২০১৫]

৫১. উদ্দীপকের বর্ণিত ধমনি হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকোষ্ঠ থেকে উৎপত্তি লাভ করে?
ক ডান অ্যাট্রিয়াম খ বাম অ্যাট্রিয়াম
গ ডান ভেন্ট্রিকল ঘ বাম ভেন্ট্রিকল

৫২. উদ্দীপকে উল্লেখিত পাম্পযন্ত্রটির পেশিতে রক্ত সঞ্চালনকে কোন ধরনের রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে?
ক সিস্টেমিক খ করোনারি গ পোর্টাল ঘ পালমোনারি

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৩ ও ৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানুষের হৃৎপিণ্ড একটি পাম্প অঙ্গ। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হৃৎস্পন্দন তৈরি করে এবং বিশেষ বাহিকার মাধ্যমে সারা দেহে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পরিবহন করে। [সি.বো.-২০১৫]

৫৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গে কোনটি বিদ্যমান থাকে?
i. SAN ii. পার্কিনজি তন্তু iii. ঐচ্ছিক পেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৪. উদ্দীপকের উল্লিখিত রক্ত বাহিকার বৈশিষ্ট্য হলো–
i. প্রাচীর পুরু ii. কপাটিকা থাকে না iii. লুমেন বড়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৫. মানুষের রক্তের pH এর মান কত? [মেডিকেল : ১৫-১৬, ১৪-১৫]
ক 6.5 খ 7.0 গ 7.4 ঘ 7.8

৫৬. রক্তের pH নির্ভর করে যার উপর– [মেডিকেল : ১২-১৩]
ক অ্যান্টিজেন খ বাফার গ রক্তের গ্রুপ ঘ এন্টিবডি

৫৭. নিম্নের কোনটি প্লাজমা প্রোটিন নয়? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক টাইরোসিন খ ফিব্রিনোজেন গ প্রোথ্রোম্বিন ঘ অ্যালবুমিন

৫৮. রক্তরসে যে সকল জৈব পদার্থ বিদ্যমান তার মধ্যে কিছু অপ্রোটিন N_2 যুক্ত দ্রব্যও আছে, নিচের কোনটি সঠিক নয়? [ডেন্টাল : ০০-০১]
ক ক্রিয়েটিনিন খ লেসিথিন গ জ্যানথিন ঘ ক্রিয়েটিন

৫৯. হেপারিন তৈরি ও নিঃসরণ করা কোন কোষের কাজ? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক Lymphocyte খ Basophil
গ Monocyte ঘ Neutrophil

৬০. মানবদেহে শ্বেত রক্ত কণিকার পরিমাণ 4000/dl এর চেয়ে কমে গেলে সেই অবস্থাকে কী বলে? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক Lukopenia খ Leulaemia
গ Thrombocytopenia ঘ Polycythemia

৬১. নিচের কোনটি তৈরির প্রক্রিয়াকে এরিথ্রোপোয়েসিস বলে? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক লোহিত রক্তকণিকা খ অনুচক্রিকা
গ প্লাজমা ঘ শ্বেত রক্তকণিকা

৬২. অ্যাগ্রানুলোসাইট কোনটি? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক নিউট্রোফিল খ মনোসাইট গ ইওসিনোফিল ঘ বেসোফিল

৬৩. নিউক্লিয়াস বিহিন কোষ হলো- [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক হৃদকোষ খ স্নায়ুকোষ
গ শ্বেত রক্তকণিকা ঘ লোহিত রক্ত কণিকা

৬৪. কোনটি অদানাদার শ্বেত কণিকা? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক ইউসিনোফিল খ নিউট্রোফিল গ বেসোফিল ঘ মনোসাইট

৬৫. নিম্নের কোন অঙ্গে লোহিত কণিকা ধ্বংস হয়? [মেডিকেল : ১১-১২]
ক প্লিহা খ যকৃৎ গ পাকস্থলী ঘ বৃক্ক

৬৬. নিম্নের কোনটি শরীরে অণুপ্রবেশকারী জীবাণুকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক অটোফ্যাগি খ অটোলাইসিস
গ ফ্যাগোসাইটোসিস ঘ পিনোসাইটোসিস

৬৭. বিশ্বব্যাপী রক্তশূন্যতার প্রধানতম কারণ কী? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক ভিটামিন সি ঘাটতি জনিত খ লৌহ ঘাটতি জনিত
গ জন্মগত রক্তশূন্যতা ঘ ভিটামিন বি-১২ ঘাটতি জনিত

৬৮. নিম্নের কোন কোষটি হেপারিন নিঃসরণ করে? [ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক নিউট্রোফিল খ বেসোফিল গ ইউসিনোফিল ঘ লিম্ফোসাইট

৬৯. নিম্নের কোন শ্বেতকণিকার নিউক্লিয়াসটি দুই লোব বিশিষ্ট? [ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক নিউট্রোফিল খ ইউসিনোফিল গ মনোসাইট ঘ লিম্ফোসাইট

৭০. নিম্নের কোনটি মানুষের রক্তের বৈশিষ্ট্য নয়? [ডেন্টাল : ০৮-০৯]
ক বিভিন্ন ধরনের অনিয়মিত আকৃতির শ্বেত কণিকা আছে
খ লোহিত কণিকাগুলো দ্বি-অবতল এবং গোলাকৃতি
গ রক্তে প্লাজমা এবং রক্তকণিকা বিদ্যমান
ঘ রক্তে নিউক্লিয়াস সম্বলিত অনুচক্রিকা থাকে

2020/8/4 17:34

Scanned with CamScanner

৭১. কোনটি মানবদেহের রক্ত ও রক্তসংবহনতন্ত্রের জন্য সঠিক নয়? [ডেন্টাল : ০৬-০৭]
ক ইওসিনোফিলের দানাগুলো ক্ষারাসক্ত হয়ে নীল বর্ণ ধারণ করে
খ রক্তরসে পানির পরিমাণ 90 – 92%
গ কলার অধিকাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্তরসে বাইকার্বনেট রূপে দ্রবীভূত থাকে
ঘ রক্ত পরিপাককৃত খাদ্যসার অন্ত্র থেকে কলা কোষে পরিবহন করে

৭২. শিশুদের রক্তে লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বয়স্কদের তুলনায়– [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক কম খ বেশি গ সমান ঘ অর্ধেক

৭৩. নিচের কোনটি সঠিক? [ডেন্টাল : ০২-০৩]
ক লোহিত রক্তকণিকার ভেতরের হিমোগ্লোবিন শরীরের সবখানে O_2 বহন করে
খ রক্তরস কলা থেকে বর্জ্য দ্রব্য বের করে রেচনের জন্য যকৃতে নিয়ে যায়
গ পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা হচ্ছে 70 লক্ষ
ঘ মনোসাইট অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে

৭৪. মানুষের রক্ত জমাট বাঁধার মূল উপাদান নয় কোনটি? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক ক্যালসিয়াম আয়ন খ লসিকা রস
গ ফাইব্রিনোজেন ঘ প্রোথ্রম্বিন

৭৫. মানুষের স্বাভাবিক রক্ত ক্ষরণকাল– [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক ৫ – ৭ মিনিট খ ১২ – ১৪ মিনিট
গ ১ – ৪ মিনিট ঘ ৪৫ – ৫৫ সেকেন্ড

৭৬. কোনটি মানব দেহের রক্ত জমাট বাঁধার কাজে সহযোগিতা করে না? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক ফাইব্রিনোজেন খ প্রোথ্রম্বিন গ থ্রম্বোপ্লাস্টিন ঘ ইওসিনোফিল

৭৭. রক্ত প্রবাহের সময় রক্ত জমাট না বাঁধার কারণ নিম্নের কোনটি? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক চলাচলের স্থথগতি খ পানির উপস্থিত
গ নালির অসমৃণ গাত্র ঘ হেপারিনের উপস্থিতি

৭৮. নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক রক্তে থ্রম্বোপ্লাস্টিন থেকে থ্রম্বিন তৈরি করে
খ রক্তনালির অভ্যন্তর গাত্র মসৃণ
গ রক্ত এসিড ও ক্ষারের সমতা নিয়ন্ত্রক করে
ঘ 'O' গ্রুপ রক্তে 'A' অথবা 'B' কোনও অ্যান্টিজেন থাকে না

৭৯. নিম্নের কোনটি রক্ত জমাট বাঁধার মূল উপাদান নয়? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক ফিব্রিনোজেন খ প্রোথ্রম্বিন গ অ্যালবুমিন ঘ Ca

৮০. কোনটি রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক হেপারিন খ অ্যাড্রেনালিন গ ইনসুলিন ঘ বিলিরুবিন

৮১. জমাটবদ্ধ রক্তের জলীয় অংশকে কী বলে? [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক রক্ত রস খ শ্বেত রক্তকণিকা
গ মৃত রক্তকণিকা ঘ রক্তের সিরাম

৮২. নিম্নে উল্লিখিত কয়টি ফ্যাক্টর রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে? [ডেন্টাল : ০৭-০৮]
ক 10 খ 11 গ 12 ঘ 13

৮৩. নিম্নের কোন তথ্যটি লসিকাতন্ত্র সম্পর্কে সত্য নয়? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের পরিবর্তিত কলারস
খ কলা থেকে কলারসের প্রায় ১০% লসিকা দ্বারা অপসৃত হয়
গ লসিকায় অনেক অনুচক্রিকা থাকে
ঘ লসিকাগ্রন্থি অ্যান্টিবডি তৈরি করে

৮৪. লসিকা সম্বন্ধে কোনটি সঠিক নয়? [ডেন্টাল : ০৫-০৬]
ক লোহিত কণিকা থাকে না খ লসিকা নালিতে চলাচল করে
গ লসিকা স্বচ্ছ ঘ লসিকাতে অনুচক্রিকা আছে

৮৫. লসিকার আপেক্ষিক গুরুত্ব– [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক ১.০২২ খ ১.০১৩ গ ১.০১৪ ঘ ১.০১৩

৮৬. লসিকায় নিম্নোক্ত কোন কঠিন পদার্থ থাকে না? [ডেন্টাল : ০৩-০৪]
ক ফসফরাস খ নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ
গ ম্যাগনেসিয়াম ঘ প্রোটিন

৮৭. হৃৎপিণ্ডের কোন কপাটিকায় তিনটি কাস্প (Cusp) থাকে না? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক ডান এট্রিওভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা
খ বাম এন্ট্রিওভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা
গ অ্যাওর্টিক কপাটিকা ঘ পালমোনারি কপাটিকা

৮৮. হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সংযোগস্থলের কপাটিকার নাম– [মেডিকেল : ১৩-১৪]
ক মাইট্রাল কপাটিকা খ ট্রাইকাসপিড কপাটিকা
গ পালমোনারি কপাটিকা ঘ অ্যাওর্টিক কপাটিকা

৮৯. ফোসা ওভালিস হৃৎপিণ্ডের কোথায় থাকে? [ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের আন্তঃঅলিন্দ পর্দার গাত্রে
খ হৃৎপিণ্ডের আন্তঃনিলয় পর্দার গাত্রে
গ অলিন্দ-নিলয় পর্দার গাত্রে
ঘ ডান নিলয়ের অভ্যন্তর গাত্রে

৯০. নিম্নের কোনটি হৃৎপিণ্ডকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে? [ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক এপিকার্ডিয়াম খ পেরিকার্ডিয়াম গ এন্ডোকার্ডিয়াম ঘ মায়োকার্ডিয়াম

৯১. মাইট্রাল কপাটিকা নিম্নে উল্লেখিত কোথায় অবস্থিত? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক ডান ও বাম নিলয়ের গোড়ায় খ ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র মুখ
গ বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রমুখে ঘ অ্যাওর্টার ছিদ্র মুখে

৯২. নিম্নের কোন উক্তিটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক অলিন্দে আগত শিরাগুলির প্রবেশ পথ কপাটিকাবিহীন
খ ডান নিলয় থেকে পালমোনারি ধমনি শুরু হয়
গ মাইট্রাল কপাটিকা ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে থাকে
ঘ সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (SAN) ডান অলিন্দের প্রাচীরে থাকে

৯৩. পেসমেকারের অবস্থান হৃৎপিণ্ডের কোথায়? [ডেন্টাল : ১৭-১৮, ০৮-০৯]
ক বাম অলিন্দ খ বাম নিলয় গ ডান অলিন্দ ঘ ডান নিলয়

৯৪. একটি হৃৎপিণ্ডে প্রতি মিনিটে ৮০ বার হৃদকম্পন হয়, তাহলে হৃদ চক্রের স্থায়িত্ব কত? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক ০.৬০ সে. খ ০.৭৫ সে. গ ৭.৫০ সে. ঘ ০.৮০ সে.

৯৫. অলিন্দের ডায়াস্টোল দশার সময়কাল কোনটি? [মেডিকেল : ১০-১১, ০৭-০৮]
ক ০.৩ সে. খ ০.৭ সে. গ ০.১ সে. ঘ ০.৫ সে.

৯৬. নিলয়ের ডায়াস্টোলের সময় নিম্নের কত সেকেন্ড? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক ০.৭ সে. খ ০.৫ সে. গ ০.৩ সে. ঘ ০.১ সে.

৯৭. ডান অলিন্দ প্রসারিত হলে অগ্রদেশীয় মহাশিরার মাধ্যমে দেহের সামনে অঞ্চল থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ নিম্নের কোন অলিন্দে ফিরে আসে? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক ডান নিলয় খ ডান অলিন্দ গ বাম নিলয় ঘ বাম অলিন্দ

৯৮. নিম্নের কোনটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক শিরায় রক্তচাপ কম থাকে
খ লসিকা দেহের কিছু কিছু স্থানে রক্তের পরিবর্তন হিসাবে কাজ করে
গ কৈশিক জালক থেকে শিরার উৎপত্তি
ঘ কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সমানুপাতিক

৯৯. নিম্নের কোনটি হৃৎপিণ্ডের সংবহনতন্ত্রের অংশ নয়? [ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক পেস মেকার খ মায়োকার্ডিয়াম
গ বান্ডেল অব হিজ ঘ পারিকিনজি তন্তু

2020/8/4 17:34

Scanned with CamScanner

১০০.নিম্নের কোনটি হৃৎপিণ্ডের নিলয়ের সিস্টোলের সময়কাল? [ডেন্টাল : ০৭-০৮]
ক 0.1 s খ 0.3 s গ 0.5 s ঘ 0.7 s

১০১.হৃৎপিণ্ডের অলিন্দের সিস্টোলের সময়কাল কত? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক ০.৭ সে. খ ০.৮ সে. গ ০.৩ সে. ঘ ০.১ সে.

১০২.কোন জাতীয় ব্যারোরিসেপ্টর রক্তের আয়তন নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর খ ক্যারোটিড ব্যারোরিসেপ্টর
গ নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর ঘ অ্যাট্রিয়াল ব্যারোরিসেপ্টর

১০৩.সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসারের পার্থক্যকে বলা হয়– [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক পরিস্রাবণ প্রেসার খ বেসাল প্রেসার
গ মিন প্রেসার ঘ পালস্ প্রেসার

১০৪.শূন্যস্থানের জন্য নিম্নের কোনটি প্রযোজ্য? অ্যাডরেনালিন হৃদস্পন্দনের হারকে– [ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক স্বাভাবিক রাখে খ বাড়ায় গ কমায় ঘ প্রভাবিত করে না

১০৫.নিম্নের কোনটি সঠিক? [ডেন্টাল : ০৫-০৬]
ক স্ট্রোক হচ্ছে রক্তচাপজনিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা
খ বেসোফিল অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে
গ রক্তের প্রায় ৫৪% তরল প্লাজমা
ঘ লোহিত রক্তকণিকা রক্তের তরলতা রক্ষা করে

১০৬.কোনো ব্যক্তির রক্তচাপ যদি সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক সবসময় পারদস্তম্ভে নিম্নের কোনটির চেয়ে বেশি হয় তবে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে বলা যায়? [ডেন্টাল : ০২-০৩]
ক 160/90 mm(Hg) খ 145/90 mm(Hg)
গ 140/70 mm(Hg) ঘ 180/50 mm(Hg)

১০৭.নিম্নের কোনটি পালমোনারি সংবহনের অংশ নয়? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক ফুসফুস খ ডান নিলয় গ মহাধমনি ঘ বাম অলিন্দ

১০৮.স্যাফেনা পার্ভা শিরা নিম্নের কোন শিরায় উন্মুক্ত? [ডেন্টাল : ১০-১১]
ক রেনাল খ হেপাটিক গ পপলিটিয়াল ঘ সুপ্রারেনাল

১০৯.নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দ থেকে পালমোনারি ধমনি উৎপন্ন হয়
খ পালমোনারি ধমনির প্রবেশ মুখে একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকে
গ পালমোনারি শিরা ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত নিয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে
ঘ মানুষের রক্তসংবহনতন্ত্রে দ্বিচক্রীয় সংবহন দেখা যায়

১১০.সিলিয়াক ধমনি নিম্নের কোন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে না? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক পাকস্থলী খ বৃক্ক গ প্লীহা ঘ যকৃৎ

১১১.মানব শিরাতন্ত্রে নিম্নের কোনটি অনুপস্থিত? [ডেন্টাল : ০৮-০৯]
ক পোর্টাল খ করোনারি গ পালমোনারি ঘ সিস্টেমিক

১১২.নিম্ন প্রদত্ত কোন ধমনিটির উৎপত্তি অ্যাওর্টার বাঁক থেকে হয় না? [ডেন্টাল : ০৮-০৯]
ক বাম সাবক্লেভিয়ান খ ইনোমিনেট
গ বাম সাধারণ ক্যারোটিড ঘ ডান সাধারণ ক্যারোটিড

১১৩.নিম্নের কোন তথ্যটি শিরার ক্ষেত্রে সঠিক নয়? [ডেন্টাল : ০৭-০৮]
ক দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে রক্ত পরিবহন করে
খ পালমোনারি শিরা CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে
গ কপাটিকা থাকে
ঘ প্রাচীর কম পুরু এবং অস্থিতিস্থাপক

১১৪.শিরার জন্য কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৫-০৬]
ক লুমেন বড়
খ সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে
গ শিরাপ্রাচীর তিন স্তরে গঠিত
ঘ প্রাচীর স্থিতিস্থাপক

১১৫.আর্চ অব অ্যাওর্টা থেকে বের হয় না কোন ধমনি? [ডেন্টাল : ০৪-০৫]
ক ইনোমিনেট বা ব্রাকিওসেফালিক খ ব্রাকিয়াল ধমনি
গ বাম সাধারণ ক্যারেটিড ধমনি ঘ বাম সাবক্লেভিয়ান ধমনি

১১৬.ধমনি ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? [ডেন্টাল : ০২-০৩]
ক উৎসস্থল কৈশিক জালিকা খ সমাপ্তিস্থল হৃৎপিণ্ড
গ কপাটিকা আছে
ঘ রক্ত সাধারণত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়

১১৭.যে দুটো শিরা মিলিত হয়ে "ইনোমিনেট শিরা" গঠিত হয়ে তার মধ্যে একটি হলো– [মেডিকেল : ০১-০২]
ক এক্সিলারি শিরা খ সাবক্লেভিয়ান শিরা
গ সেফালিক শিরা ঘ এজাইগাস শিরা

১১৮.নিম্নের কোনটি কারোনারি হার্ট ডিজিজের অন্তর্ভুক্ত নয়? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক এনজাইনা পেকটোরিস খ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন
গ আনস্টেবল এনজাইনা ঘ স্ট্রোক

১১৯.হৃদ-ফুসফুস যন্ত্র কোন কাজে ব্যবহৃত হয়? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক অ্যানজিওপ্লাস্টিতে খ হৃৎপিণ্ডের বাইপাস সার্জারিতে
গ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে ঘ পেসমেকার বসাতে

১২০.একই সাথে শরীরে রক্তে অক্সিজেনের ঘনত্ব ও হৃদকম্পনের পরিমাপ যন্ত্রের নাম কী? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক থার্মোমিটার খ স্ফিগমোম্যানোমিটার
গ পালস্অক্সিমিটার ঘ ব্যারোমিটার

১২১.হৃদযন্ত্রের রোগ নির্ণয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা কোনটি? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক এনজিওগ্রাম খ লিপিড প্রোফাইল গ ইসিজি ঘ ইটিটি

১২২.কৃত্রিম পেসমেকার যন্ত্রে কোন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক Ni – Cd ব্যাটারি খ Li ব্যাটারি
গ Li আয়ন ব্যাটারি ঘ শুষ্ক (Dry Cell) ব্যাটারি

১২৩.করোনারি ধমনি সরু হয়ে যাওয়া নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় কোন পরীক্ষা? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক ইকোকার্ডিগ্রাম খ এনজিওগ্রাম
গ ইটিটি ঘ ইসিজি

উত্তরমালা

১ (গ); ২ (ক); ৩ (খ); ৪ (ঘ); ৫ (গ); ৬ (গ); ৭ (ক); ৮ (ঘ); ৯ (ক); ১০ (গ); ১১ (গ); ১২ (গ); ১৩ (গ); ১৪ (খ); ১৫ (ঘ); ১৬ (ঘ); ১৭ (গ); ১৮ (ঘ); ১৯ (গ); ২০ (গ); ২১ (খ); ২২ (গ); ২৩ (ক); ২৪ (খ); ২৫ (খ); ২৬ (গ); ২৭ (খ); ২৮ (ক); ২৯ (ঘ); ৩০ (ক); ৩১ (খ); ৩২ (ঘ); ৩৩ (ঘ); ৩৪ (খ); ৩৫ (খ); ৩৬ (ক); ৩৭ (গ); ৩৮ (গ); ৩৯ (খ); ৪০ (ক); ৪১ (ক); ৪২ (ঘ); ৪৩ (ঘ); ৪৪ (ঘ); ৪৫ (গ); ৪৬ (ঘ); ৪৭ (খ); ৪৮ (ঘ); ৪৯ (গ); ৫০ (ঘ); ৫১ (ঘ); ৫২ (ক); ৫৩ (ক); ৫৪ (ক); ৫৫ (গ); ৫৬ (খ); ৫৭ (ক); ৫৮ (খ); ৫৯ (খ); ৬০ (ক); ৬১ (ক); ৬২ (খ); ৬৩ (ঘ); ৬৪ (ঘ); ৬৫ (ক,খ); ৬৬ (গ); ৬৭ (খ); ৬৮ (খ); ৬৯ (খ); ৭০ (ঘ); ৭১ (ক); ৭২ (খ); ৭৩ (ক); ৭৪ (খ); ৭৫ (গ); ৭৬ (ঘ); ৭৭ (ঘ); ৭৮ (ক); ৭৯ (গ); ৮০ (ক); ৮১ (ঘ); ৮২ (ঘ); ৮৩ (গ); ৮৪ (ঘ); ৮৫ (ঘ); ৮৬ (গ); ৮৭ (খ); ৮৮ (খ); ৮৯ (ক); ৯০ (গ); ৯১ (ঘ); ৯২ (গ); ৯৩ (গ); ৯৪ (খ); ৯৫ (গ); ৯৬ (খ); ৯৭ (খ); ৯৮ (ঘ); ৯৯ (খ); ১০০ (খ); ১০১ (ঘ); ১০২ (গ); ১০৩ (ঘ); ১০৪ (খ); ১০৫ (ক); ১০৬ (ক); ১০৭ (গ); ১০৮ (গ); ১০৯ (ক); ১১০ (খ); ১১১ (খ); ১১২ (ঘ); ১১৩ (খ); ১১৪ (ঘ); ১১৫ (খ); ১১৬ (ঘ); ১১৭ (খ); ১১৮ (ঘ); ১১৯ (খ); ১২০ (গ); ১২১ (গ); ১২২ (খ); ১২৩ (খ)।

Scanned with CamScanner

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. রক্ত সংবহনতন্ত্র কী?
২. রক্ত কী? [য.বো-২০১৬]
৩. রক্তরস কী?
৪. এরিথ্রোসাইট কী?
৫. লিউকোসাইট কী?
৬. থ্রোম্বাসাইট কী?
৭. অ্যানিমিয়া কী?
৮. অলিগোসাইথিমিয়া কী?
৯. পলিসাইথিমিয়া কী?
১০. সিরাম কী?
১১. হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ কী?
১২. রক্ততঞ্চন কী?
১৩. হেপারিন কী? [ব. বো.- ২০১৯; চ.বো-২০১৭]
১৪. লসিকা কী?
১৫. লসিকাবাহ কী?
১৬. লসিকা গ্রন্থি কী?
১৭. কলারস কী?
১৮. হৃৎপিণ্ড কী?
১৯. পেরিকার্ডিয়াম কী?
২০. কলামনি কর্নি কী? [রা.বো-২০১৭]
২১. হার্টবিট কী? [ব.বো-২০১৭, দি.বো-২০১৬]
২২. কার্ডিয়াক চক্র বা হৃদচক্র কী?
২৩. মায়োজেনিক হৃৎপিণ্ড কী?
২৪. মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ কী?
২৫. রক্ত চাপ কী? [ঢা. বো-২০১৯]
২৬. হাইপারটেনশন কী?
২৭. ব্যারোরিসেপ্টর কী? [রা. সি. বো.- ২০১৯; ঢা.বো-২০১৭]
২৮. আয়তনরিসেপ্টর কী?
২৯. রক্তবাহিকা বলতে কী বুঝ?
৩০. ধমনি কী?
৩১. শিরা কী?
৩২. কৈশিকজালিকা কী?
৩৩. সিস্টেমিক শিরা কী?
৩৪. পোর্টাল শিরা কী?
৩৫. ধমনিতন্ত্র কাকে বলে?
৩৬. শিরাতন্ত্র কাকে বলে?
৩৭. অ্যার্টারিওস্ক্লেরোসিস কী?
৩৮. স্ট্রোক কী?
৩৯. পেসমেকার কী?
৪০. ব্রাডিকার্ডিয়া কী?
৪১. টাকিকার্ডিয়া কী?
৪২. অ্যারাথমিয়া কী?
৪৩. এনজিওপ্লাস্টি কী? [কু.বো-২০১৭]
৪৪. পারকিউটেনাস করোনারি ইন্টারভেনশন কী?
৪৫. CABG এর পূর্ণরূপ লিখ।
৪৬. ব্যারোরিফ্লেক্স কী? [সি.বো-২০১৭]
৪৭. সিস্টোল কী? [য.বো-২০১৯]

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. রক্তের কাজ লিখ।
২. লোহিত রক্তকণিকার কাজ লিখ।
৩. শ্বেত রক্তকণিকার কাজ লিখ।
৪. অনুচক্রিকার কাজ লিখ।
৫. শ্বেত রক্তকণিকাসমূহের নাম ও কাজ লিখ।
৬. দেহের আণুবীক্ষণিক সৈনিক বলতে কী বোঝায়?
৭. রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া লিখ।
৮. রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ লিখ।
৯. লসিকার কাজ লিখ।
১০. লসিকা সংবহনের রেখাচিত্র লিখ।
১১. লসিকা দুধের মতো সাদা দেখায় কখন?
১২. রক্তবাহে কখন রক্ত তঞ্চিত হয়?
১৩. স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তবাহের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে না কেন?
১৪. স্ট্রোক ও হার্ট অ্যার্টাক বলতে কী বোঝ? [য.বো-২০১৯; ২০১৬]
১৫. কোন রোগে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং কোন রোগে হ্রাস পায়?
১৬. রক্তকণিকাসমূহকে কোষ না বলে কণিকা বলা হয় কেন?
১৭. মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝ? [দি.বো-২০১৭]
১৮. হৃৎপিণ্ডের সংযোজী টিস্যুগুলোর কাজ কী?
১৯. হার্টবিট নিয়ন্ত্রণ জরুরি কেন?
২০. হিমোগ্লোবিন কেন লোহিত কণিকায় থাকে?
২১. হিমোগ্লোবিন প্লাজমায় থাকলে কী ঘটবে?
২২. হৃৎপিণ্ড কখনও অবসন্ন বা অসাড় না হওয়ায় কারণ কী?
২৩. কার্ডিয়াক চক্রের প্রতিটি ঘটনার স্থিতিকাল উল্লেখ কর।
২৪. Lub-Dub বলতে কী বোঝায়?
২৫. হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলোর নাম অবস্থান ও কাজ।
২৬. হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া লিখ।
২৭. বাম ও ডান নিলয়ের মধ্যে কোনটির প্রাচীর পুরু এবং কেন? [ঢা.বো-২০১৯]
২৮. দ্বৈত সংবহন বলতে কী বুঝ?
২৯. দ্বৈত সংবহন প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলো লিখ।
৩০. সিস্টেমিক সংবহন বলতে কী বুঝ?
৩১. পালমোনারি সংবহন বলতে কী বুঝ?
৩২. করোনারি রক্ত সংবহন বলতে কী বুঝ?
৩৩. পোর্টাল সংবহন বলতে কী বুঝ? [চ.বো-২০১৭, দি.বো-২০১৬]
৩৪. করোনারি হৃদরোগ বলতে কী বুঝ?
৩৫. করোনারি বাইপাস বলতে কী বুঝ?
৩৬. হৃদরোগের কারণ ও করণীয় লিখ।
৩৭. অ্যানাজাইনা বলতে কী বুঝ? [কু. বো-২০১৯]
৩৮. হার্ট ব্লক বলতে কী বুঝ?
৩৯. হার্ট ফেইলিউর বলতে কী বুঝ?
৪০. হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন বা MI বলতে কী বুঝ? [রা. সি. বো-২০১৯]
৪১. কীভাবে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হয়?
৪২. হৃদরোগ ছাড়াও বুকে ব্যথা হয় কেন?
৪৩. ব্যারোরিফ্লেক্স বলতে কী বুঝ?
৪৪. কৃত্রিম পেসমেকার বলতে কী বুঝ?
৪৫. পেসমেকার কেন ব্যবহার করা হয়?
৪৬. এনজিওগ্রাম বলতে কী বুঝ?
৪৭. ওপেন হার্ট সার্জারি বলতে কী বুঝ?
৪৮. এনজিওপ্লাস্টি বলতে কী বুঝ?
৪৯. রক্তচাপ বলতে কী বোঝ? [রা.বো-২০১৭]
৫০. **পার্থক্য লিখ/তুলনা কর :**
লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা, সিস্টেমিক সংবহন ও পালমোনারি সংবহন, ধমনি ও শিরা, পালমোনারি ধমনি ও পালমোনারি শিরা, প্লাজমা, লসিকা ও সিরাম, রক্ত ও লসিকা, লসিকাজালক ও রক্তজালক, কলারস ও লসিকা, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা ও সেমিলুনার কপাটিকা, SA নোড ও AV নোড।

2020/8/4 17:34

Scanned with CamScanner

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

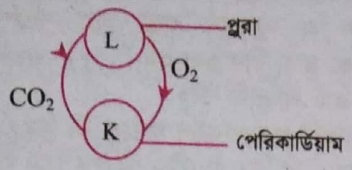

[ঢাকা বোর্ড-২০১৯]

ক. রক্তচাপ কী?
খ. বাম ও ডান নিলয়ের মধ্যে কোনটির প্রাচীর পুরু এবং কেন?
গ. উদ্দীপকের 'K' অঙ্গটির লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রক্তের গতিপথ বিশ্লেষণ কর।

২। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

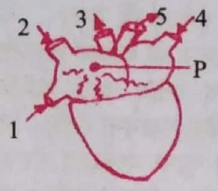

[রাজশাহী , সিলেট বোর্ড-২০১৯]

ক. ব্যারোরিসিপ্টর কাকে বলে?
খ. MI বলতে কী বুঝায়?
গ. ধারাবাহিকভাবে চিত্রের তীর চিহ্নিত গতিপথগুলো ব্যাখ্যা কর।
ঘ মানবদেহে 'P' অকেজো হয়ে পড়লে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে মৃত্যু ঘটতে পারে– বিশ্লেষণ কর।

৩। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

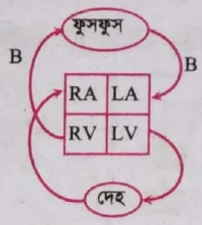

[যশোর বোর্ড-২০১৯]

ক. সিস্টোল কী?
খ. হার্ট অ্যাটাক বলতে কী বুঝ?
গ. 'A' এবং 'B' রক্তবাহীকাগুলো ব্যতিকমধর্মী–ব্যাখ্যা কর।
ঘ চিত্রে দ্বিচক্রী রক্ত সংবহন প্রদর্শিত হয়েছে– বিশ্লেষণ কর।

৪। ফারিনের হাত আপেল কাটতে গিয়ে কেটে গেল। এর ফলে সেখান থেকে লাল তরল পদার্থ বের হলো। এতে এক ধরনের Y আকৃতির জৈব রাসায়নিক পদার্থ আছে, যা তার দেহের রোগ প্রতিরোধ করে।

ক. মায়োজেনিক হৃৎপিণ্ড কী?
খ. Rh ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝ? *[সকল বোর্ড-২০১৮]*
গ. উদ্দীপকে ফারিনের লাল তরল পদার্থ বন্ধ হওয়ার কৌশল ব্যাখ্যা কর। *[সকল বোর্ড-২০১৮]*
ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগ প্রতিরোধী উপাদানের কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ কর। *[সকল বোর্ড-২০১৮]*

৫। 'M' ও 'N' এর রক্তের গ্রুপ যথাক্রমে A^+ ও B^-। দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের কারণে 'M' এর দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় কিন্তু 'N' এর তেমনটি নয়। তার হাত সামান্য কেটে রক্তক্ষরণের এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে 'M' এর শল্য চিকিৎসার জন্য রক্তের প্রয়োজনে 'N' এর রক্ত দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে ডাক্তার তার রক্ত নিতে অপরাগতা প্রকাশ করলেন।

ক. এনজিওপ্লাস্টি কী? *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]*
খ. হার্টবিট নিয়ন্ত্রণ জরুরি কেন?
গ. উদ্দীপকে 'N' এর হাতে সংঘটিত প্রক্রিয়াটির শারীরতত্ত্ব ব্যাখ্যা দাও। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকের ডাক্তার 'N' এর রক্ত নিতে অপরাগতার কারণ বিশ্লেষণ কর। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]*

৬। আমাদের হৃদযন্ত্রটি কিছু কপাটিকা ও নোড-এর সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]*

ক. কলামনি কর্নি কী?
খ. রক্তচাপ বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কপাটিকাসমূহের বিবরণ দাও।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী নোডসমূহের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

৭। মানুষের বক্ষদেশের অভ্যন্তরে এমন একটি যন্ত্র আছে যার স্পন্দনে রক্ত দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে পারে এবং দেহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুনরায় ফিরে আসতে পারে। সুস্থ দেহের জন্য প্রয়োজন যন্ত্রটির স্বাভাবিক স্পন্দন।

ক. অ্যানিমিয়া কী?
খ. মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝ? *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]*
গ. যন্ত্রটির মধ্যে যে সমস্ত কপাটিকা আছে তাদের গুরুত্ব উল্লেখ কর। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত যন্ত্রটির স্বাভাবিক স্পন্দন চাক্রিক গতিতে সম্পন্ন হয়– বিশ্লেষণ কর। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]*

৮। বিজ্ঞানীগণ হৃৎপিণ্ডের এবং ভ্রূণের গাঠনিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে বলেন– 'স্তন্যপায়ী প্রাণীরা অভিন্ন পূর্বপুরুষের বংশধর'।

ক. পেরিকার্ডিয়াম কী?
খ. স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তবাহের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে না কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রেণির প্রাণীদের রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া ছকের সাহায্যে দেখাও। *[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. তুমি কি উদ্দীপকের উদ্ধৃতিটির সাথে একমত? বুঝিয়ে লিখ। *[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*

৯। মানুষের বক্ষগহ্বরে দুই ফুসফুসের মাঝে মোচাকৃতির একটি অঙ্গ আছে– যা রক্ত সংবহনের কেন্দ্রবিন্দু। এই অঙ্গটি স্নায়ু উদ্দীপনা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্য সম্পাদনে সক্ষম।

ক. কার্ডিয়াক চক্র কী?
খ. পেসমেকার কেন ব্যবহার করা হয়?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটির লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ অঙ্গটি সম্পর্কিত শেষ উদ্ধৃতিটি যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*

Scanned with CamScanner

১০। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

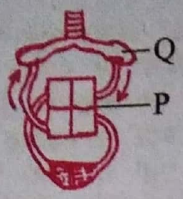

ক. রক্তচাপ কী?
খ. করোনারি সংবহন বলতে কী বুঝায়? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
গ. উদ্দীপকে 'P' চিহ্নিত অঙ্গটির লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র আঁক। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে P ⇌ Q গতিপথ ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]

১১। জনাব ডাবলু রায় বুকে ব্যথা, বুক ভারী ভারী লাগা, বুকের চারদিকে চাপ, জ্বালাপোড়া, অস্বস্তি লাগা প্রভৃতি উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের নিকট গেলেন। চিকিৎসক বললেন জনাব রায় হার্ট ফেইলিউর নয়, তিনি অ্যানজাইনা পেকটোরিস রোগে আক্রান্ত। [যশোর বোর্ড-২০১৬]

ক. রক্ত কী?
খ. স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডাক্তার সাহেবের প্রথম উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি উল্লেখ কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডাক্তার সাহেবের শেষের উক্তিটির যৌক্তিকতাসহ তা থেকে নিরাময়ে তোমার মতামত দাও।

১২। রফিক সাহেব বুকে তীব্র ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষার পর দেখলেন যে, বিশেষ একটি অঙ্গের দুইটি রক্তনালি বন্ধ অবস্থায় আছে। ডাক্তার বললেন বড় রকমের অপারেশন ছাড়াই বিশেষ একটি পদ্ধতিতে চিকিৎসা সম্ভব। [বরিশাল বোর্ড-২০১৬]

ক. হার্ট ফেইলিউর কী?
খ. হৃদরোগকে বিশ্বের এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটির সাথে জড়িত অঙ্গটির লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ পদ্ধতিটি রফিক সাহেবের রোগ নিরাময়ে কতটুকু সহায়ক হবে– বিশ্লেষণ কর।

১৩। জামিল সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। তিনি একটু পরিশ্রম করলেই তার বুকে ব্যথাসহ অস্বস্তি অনুভব করেন। তিনি রাতে ভালো ঘুমাতে পারেন না এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় উপক্রম হয়।

ক. পোর্টাল শিরা কী?
খ. মানুষের লালাগ্রন্থিগুলোর নাম লেখ। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]
গ. জামিল সাহেব কী ধরনের অসুস্থতায় ভুগছেন? এবং এর ফলে তার আরও কী ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে? [রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]
ঘ. জামিল সাহেবের সুস্থতার জন্য করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]

১৪। প্রাণিবিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষক বললেন, 'মুষ্টিবদ্ধ হাতের আকৃতিবিশিষ্ট পাম্প যন্ত্রটি দুটি ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থান করে। জীবনের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত রক্তকে সঞ্চালন ও সংবহন করে যার গতিপথ অনেকগুলো কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।' [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬]

ক. ওপেন হার্ট সার্জারি কী?
খ. পালমোনারি রক্তসংবহন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যন্ত্রটির চিহ্নিত চিত্র আঁক।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন গতিপথ কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়– ব্যাখ্যা কর।

১৫। মি. মমতাজ স্ফিগমোম্যানোমিটার দ্বারা নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করেন। আজ দুপুরে তার রক্তচাপ ১৭৫/১১০। [ঢাকা বোর্ড-২০১৫]

ক. সিস্টোল কী?
খ. ব্যারোরিফ্লেক্স বলতে কী বুঝ?
গ. মি. মমতাজের দেহে কী ধরনের রক্তচাপ বিদ্যমান– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মি. মমতাজের দেহে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থাকলেও রক্তশূন্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই– বিশ্লেষণ কর।

১৬। মিতুলের বাবা বুকে ব্যথাসহ আরও কিছু উপসর্গ নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার তাকে ই.সি.জি করার পরামর্শ দেন। [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৫]

ক. CABG কী?
খ. সিস্টেমিক সংবহন ও পালমোনারি সংবহনের তুলনা কর।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আক্রান্ত অঙ্গটির লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর।
ঘ. মিতুলের বাবার সম্ভাব্য রোগসমূহ প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়?– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

১৭। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

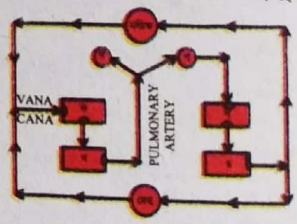

[রাজশাহী বোর্ড-২০১৫]

ক. কলামনি কার্নি কী?
খ. মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকের প্রবাহচিত্রটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখাও।
ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রমাণ কর যে, সকল ধমনি O_2-যুক্ত রক্ত এবং সকল শিরা CO_2 যুক্ত রক্ত বহন করে না।

১৮। নাদিম আম কাটতে গিয়ে হাত কেটে গেল। এর ফলে সেখান থেকে কিছু লাল তরল পদার্থ বের হলো। একটু পরে সেই পদার্থ বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

ক. অ্যানজাইনা কী? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]
খ. হার্টবিট নিয়ন্ত্রণ জরুরি কেন?
গ. নাদিমের হাতের ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়া লাল তরল পদার্থের কাজ লিখ। [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]
ঘ. বিশেষ তরল পদার্থ বের হওয়া বন্ধ হলো কীভাবে তা ব্যাখ্যা কর। [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]

2020/8/4 17:35

Scanned with CamScanner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

Scanned with CamScanner

মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া
HUMAN PHYSIOLOGY : RESPIRATION AND BREATHING

অধ্যায় ৫

দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজের জন্য শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি খাদ্যের মাধ্যমে সঞ্চিত হয়। প্রতিটি সজীব কোষেই খাদ্যবস্তুর জারণ হয়ে থাকে। তবে খাদ্যে শক্তি স্থিতিশক্তি হিসেবে থাকে। কোষের অভ্যন্তরে অক্সিজেনের সহায়তায় খাদ্য জারিত হয়ে কোষস্থ স্থিতিশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জীব এই তাপশক্তিকেই ব্যবহার করে। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোষের অভ্যন্তরে সরল খাদ্যবস্তু (গ্লুকোজ) অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে কোষস্থ স্থিতিশক্তি তাপশক্তিরূপে মুক্ত হয় এবং বিপাকীয় বর্জ্য হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি হয় তাকে শ্বসন (respiration) বলে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে শ্বসন সম্পাদিত হয় তাকে **শ্বসনতন্ত্র** (Respiratory System) **বলা হয়**।

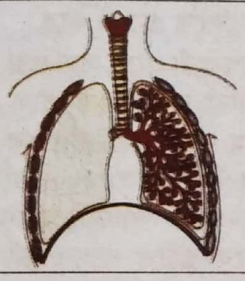
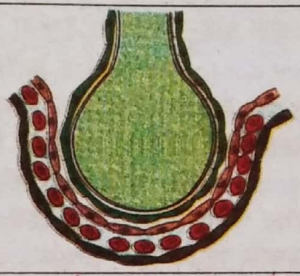
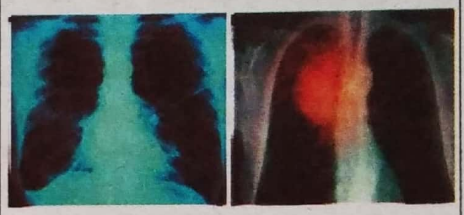

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে–

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা-১০)
১. মানুষের শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠনের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে। ২. **ব্যবহারিক** ফুসফুসের অনুচ্ছেদ শনাক্ত ও চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ৩. মানুষের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম Ventilation Mechanism) ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৪. রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন ব্যাখ্যা করতে পারবে পরিবহন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. শ্বসনে রঞ্জকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. শ্বাসনালির রোগ সংক্রমণের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. একজন ধূমপায়ী ও একজন অধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা করতে পারবে। ৮. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।	● শ্বসন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও কাজ ● **ব্যবহারিক** ○ ফুসফুসের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ● প্রশ্বাস-নিশ্বাস কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণ ● গ্যাসীয় পরিবহন ○ অক্সিজেন ○ কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন ● শ্বাসরঞ্জক ● শ্বসননালি সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার ○ সাইনুসাইটিস ○ ওটিটিস মিডিয়া ● ফুসফুসের এক্স-রের তুলনা ○ ধুমপায়ী মানুষের ○ অধুমপায়ী মানুষের ● কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের উদ্দেশ্য ○ মুখ হতে মুখের সাহায্যে

৫.১ মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System of Human)

দেহের যে অঙ্গগুলো শ্বসন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তা হলো নাসিকা, নাসাগলবিল, ল্যারিংক্স, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস এবং ফুসফুস। এদের সমন্বয়ে মানুষের শ্বসনতন্ত্র গঠিত। শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশের O_2 দেহে প্রবেশ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে। শ্বসনতন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন অংশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা– **বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল, বায়ু পরিবহন অঞ্চল** ও **শ্বসন অঞ্চল**। নিম্নে শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ বর্ণনা করা হলো।

(ক) বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল (ঊর্ধ্ব শ্বসন নালি)

১। **নাসিকা** (Nostril) : মুখমণ্ডলের সম্মুখভাগে মুখছিদ্রের ঠিক উপরে একটি ত্রিকোণাকার ফাঁপা অঙ্গকে নাসিকা বলে। ইহা অস্থি, তরুণাস্থি, যোজককলা ও পেশি নিয়ে গঠিত। নাসিকার সম্মুখ ছিদ্রকে নাসাছিদ্র এবং ভেতরের ফাঁপা

2020/8/4 17:35

Scanned with CamScanner

গহ্বরকে নাসাগহ্বর বলে। নাসাগহ্বর একটি উল্লম্ব ব্যবধায়ক দ্বারা বাম ও ডান নাসাপথে বিভক্ত। নাসাপথ নাসাগলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। এর অন্তঃপ্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত এপিথেলিয়াম, মিউকাস পর্দা, রক্তবাহিকা, ঘ্রাণ সংবেদী কোষ এবং অসংখ্য লোম ও তৈলগ্রন্থি বিদ্যমান থাকে।

কাজ : (i) নাসিকা বায়ু প্রবেশে সাহায্য করে। (ii) যেসব ধূলিকণা বা রোগজীবাণু বায়ুতে থাকে তা লোম ও মিউকাসের কারণে ছাঁকনির মতো কাজ করে। (iii) অলফ্যাক্টরি কোষ ঘ্রাণ উদ্দীপনা গ্রহণে সহায়তা করে। (iv) নাসারন্ধ্র অতিক্রমকারী বাতাস কিছুটা গরম ও আর্দ্র হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে ফলে শুষ্ক ও শীতল বাতাস ফুসফুসের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। (v) আমরা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধময় দ্রব্য বা গ্যাসের উপস্থিতিও নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে পাই।

২। নাসাগলবিল (Naso-pharynx) **:** নাসাগহ্বরের পেছন দিকে স্বরযন্ত্রের উপরিভাগের প্রশস্ত অংশকে নাসাগলবিল বলে। এটি **কোয়ানা** (choana) নামক দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগহ্বরের সাথে যুক্ত। নাসাগলবিল একটি অভিন্ন গমনপথ যেখান থেকে খাদ্যনালি ও শ্বাসনালি দুটি ভিন্ন পথে নিচের দিকে নেমে যায়। নাসাগলবিলের পশ্চাৎভাগের উপরের দিকে ছোট একটি জিহ্বার মতো মাংসপিণ্ড থাকে, একে **আলজিহ্বা** (uvula) বলে।

কাজ : (i) বায়ু নাসাগলবিল অতিক্রম করে **ল্যারিংক্সে** প্রবেশ করে। (ii) খাদ্য গ্রহণকালে **ইপিগ্লটিস** (epiglottis) ট্রাকিয়ার প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়, ফলে খাদ্যকণা শ্বাসনালিতে প্রবেশ না করে খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে।

৩। ল্যারিংক্স বা স্বরযন্ত্র (Larynx or Voice box)**:** মুখবিহ্বর ও ট্রাকিয়ার সংযোগকারী হচ্ছে ল্যারিংক্স। ল্যারিংক্স একটি ছোট পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট নলাকার অংশ, যা গলদেশে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ গ্রীবা কশেরুকার তলে **হাইওয়েড অস্থির** (Hyoid bone) ঠিক নিচে অবস্থিত। **বয়ঃসন্ধিকালের পর স্বরনালি স্ত্রীদের চেয়ে পুরুষদের বেশি স্থূল হয়। তাই পুরুষের গলার স্বর অপেক্ষাকৃত ভারী হয়।** এটি ছোট ছোট খণ্ডবিশিষ্ট তরুণাস্থি নির্মিত অংশ। এগুলোর মধ্যে থাইরয়েড তরুণাস্থি সবচেয়ে বড় এবং পুরুষের গলার সামনে উঁচু হয়ে ওঠে। এ অংশকে **অ্যাডাম অ্যাপল** (adam apple) বলা হয়। ল্যারিংক্সটি মুখবিবরে একটি ছিদ্র দিয়ে উন্মুক্ত। এই ছিদ্রটিকে **গ্লটিস** বলে। গ্লটিসের মুখে এপিগ্লটিস নামক ঢাকনার মতো অংশ থাকে। ল্যারিংক্স গহ্বরে ছয়টি **স্বররজ্জু** বা **ভোকাল কর্ড** (vocal cord) থাকে। ভোকাল কর্ড পেশির সঙ্গে সংযুক্ত। পেশি ভোকাল কর্ডের টান বা টেনসন (tension) নিয়ন্ত্রণ করে। টানটান অবস্থায় বায়ু দ্বারা ভোকাল কর্ড কম্পিত হয়ে **শব্দ** উৎপন্ন করে। ভোকাল কর্ডের টান এবং এদের মধ্যে দূরত্বের উপর স্বরের পিচ (pitch) নির্ভর করে।

কাজ : (i) খাদ্য গ্রহণের সময় গ্লটিসটি এপিগ্লটিস নামক ঢাকনার মাধ্যমে বন্ধ থাকে। (ii) স্বরযন্ত্রে শব্দ উৎপন্ন হয়।

(খ) বায়ু পরিবহন অঞ্চল (নিম্ন শ্বসন নালি)

৪। শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া (Trachea) **:** ল্যারিংক্সের শেষ ভাগে গ্রীবার মাধ্যমে বক্ষগহ্বর পর্যন্ত যে নালি রয়েছে তাকে ট্রাকিয়া বা **শ্বাসনালি** বলে। এটি প্রায় ১২ সেন্টিমিটার লম্বা ও ২ সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট হয়। এর প্রাচীর ১৬-২০টি 'C' আকৃতিবিশিষ্ট কার্টিলেজ নির্মিত বলয় দ্বারা গঠিত। তন্তুময় কলা দিয়ে বলয়গুলো পরস্পর সংযুক্ত থাকে বলে শ্বাসনালি কখনো চুপসে যায় না। এর বহিঃপ্রাচীর যোজক আবরণী দ্বারা এবং অন্তঃপ্রাচীর সিলিয়াযুক্ত মিউকাস পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে।

কাজ : (i) ট্রাকিয়া চুপসে যায় না বলে অতি সহজে এর মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে।
(ii) এর অন্তঃপ্রাচীরে সিলিয়া অবাঞ্ছিত বস্তু (যেমন– ধূলিকণা, খাদ্যকণা, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি) প্রবেশ রোধ করে।

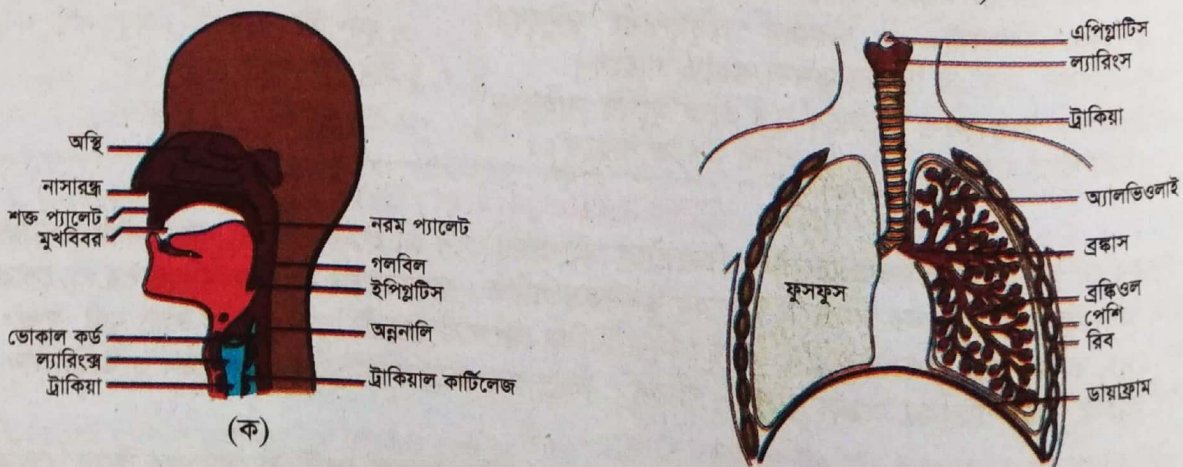

চিত্র ৫.১ : মানুষের শ্বসনতন্ত্র (ক ও খ)

2020/8/4 17:36

Scanned with CamScanner

৫। ব্রঙ্কাস (Bronchus) : বক্ষগহ্বরে ট্রাকিয়ার শেষ অংশ চতুর্থ ও পঞ্চম থোরাসিক কশেরুকার লেভেলে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যে নালি গঠন করে তাকে **ব্রঙ্কাস** (বহুবচনে bronchi- ব্রঙ্কাই) বা ক্রোমনালি বলে। প্রতি পাশের ব্রঙ্কাস বাম ও ডান ফুসফুসে প্রবেশ করে পুনরায় ফুসফুসে কতগুলো শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এদেরকে **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) বলে। ব্রঙ্কিওল দু'ধরনের, যথা– প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল ও শ্বসন ব্রঙ্কিওল। ব্রঙ্কাসের প্রাচীরও তরুণাস্থি বলয় ও রোমযুক্ত ঝিল্লি দ্বারা গঠিত।

কাজ : ব্রঙ্কাই দিয়ে বায়ু বাম ও ডান ফুসফুসে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ব্রঙ্কাসদ্বয় ট্রাকিয়া থেকে ফুসফুসে O_2 যুক্ত বাতাস পরিবহন করে ও ফুসফুস থেকে CO_2 যুক্ত বাতাস ট্রাকিয়ায় নিয়ে যায়।

(গ) শ্বসন অঞ্চল

৬। ফুসফুস (Lung) : মানুষের দুটি ফুসফুস বক্ষীয় গহ্বরে ডায়াফ্রামের উপরে হৃৎপিণ্ডের দু'পাশে অবস্থিত। এটি হালকা গোলাপি রঙের স্পঞ্জের মতো নরম অঙ্গ। ফুসফুস দুই স্তরবিশিষ্ট **প্লিউরা** (pleura) পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। ভেতরের পর্দাকে **ভিসেরাল** ও বাইরের পর্দাকে **প্যারাটাইল** প্লিউরা বলে। দুই স্তরের মাঝে **সেরাস ফ্লুইড** বা **প্লিউরাল ফ্লুইড** (serous fluid or pleural fluid) নামক তরল পদার্থ থাকে, যা ফুসফুসকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে। প্রতিটি ফুসফুসের যে স্থান দিয়ে ব্রঙ্কাস, রক্তনালি ও লসিকানালি প্রবেশ করে তাকে **হাইলাম** (hilum) বলে। ব্রঙ্কাস, রক্তনালি ও লসিকানালি ঘন যোজক কলা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে **ফুসফুসীয় মূল** (pulmonary root) গঠন করে যার মাধ্যমে ফুসফুস ঝুলে থাকে।

মানুষের বাম ও ডান দুটি ফুসফুস রয়েছে। বাম ফুসফুসটি আকারে ছোট এবং ডান ফুসফুসটি আকারে বড়। এ দুটি ফুসফুস আবার খাঁজের সাহায্যে ডান ও বাম খণ্ডে বিভক্ত। মানব ফুসফুসে মোট পাঁচটি **খণ্ড** বা **লোব** (lobe) বিদ্যমান। এর মধ্যে ডান ফুসফুস **তিন লোব** (সুপিরিয়র লোব, মিডল লোব ও ইনফিরিয়র লোব) বিশিষ্ট এবং বাম ফুসফুস **দুই লোব** (সুপিরিয়র লোব ও ইনফিরিয়র লোব) বিশিষ্ট। প্রতিটি লোব আবার **লোবিউল** (lobules) নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। ডান ফুসফুসে ১০টি এবং বাম ফুসফুসে ৮টি লোবিউল থাকে। লোবিউলগুলো প্রকৃতপক্ষে ফুসফুসীয় একক **অ্যালভিওলাই** (একবচন-অ্যালভিওলাস alveolus, বহুবচন অ্যালভিওলাই-alveoli)-এর সমষ্টি। তাছাড়া বাম ফুসফুসে একটি **হৃদখাঁজ** (cardiac notch) থাকে যা হৃৎপিণ্ডকে ধারণ করে। অ্যালভিওলাই-এর চারপাশে থাকে পালমোনারি ধমনি ও শিরার কৈশিক জালিকা। **অ্যালভিওলাই**-এর প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা হওয়ায় রক্ত ও ফুসফুস মধ্যস্থ গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে ব্যাপন ঘটে। ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্রঙ্কাস প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টারসিয়ারি শাখায় বিভক্ত হয়। টারসিয়ারি ব্রঙ্কাস বার বার বিভক্ত হয়ে যেসব সূক্ষ্ম নালিকা সৃষ্টি করে তাদেরকে **প্রান্তীয়** বা **টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল** (terminal bronchiole) বলে, যা এক একটি লোবিউলে প্রবেশ করে।

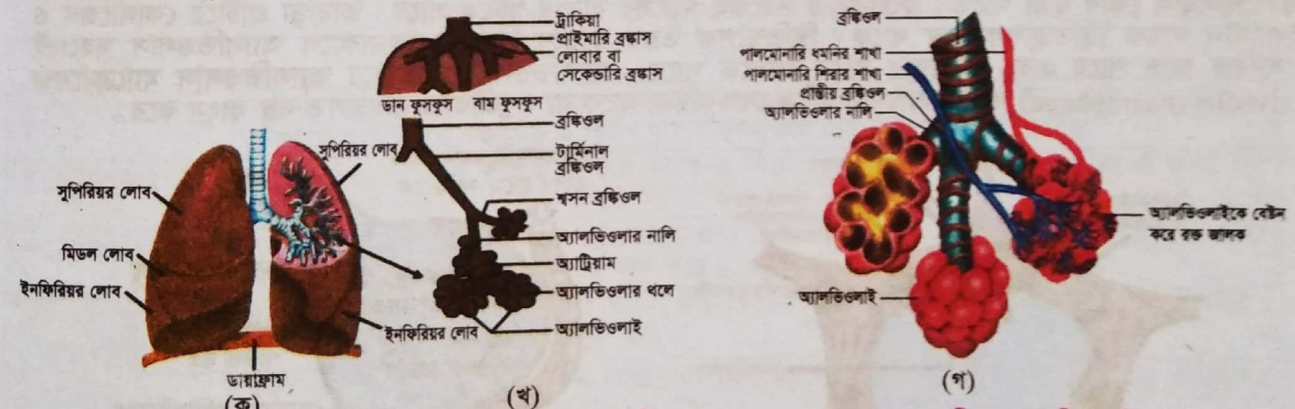

চিত্র ৫.২ : ফুসফুসের গঠন : ক. ফুসফুস, খ. ব্রঙ্কিয়াল বৃক্ষ ও গ. রক্তজালক বেষ্টিত অ্যালভিওলাই

লোবিউলের ভেতরে প্রতিটি টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল আবার **শ্বসন ব্রঙ্কিওল** (respiratory bronchioles), **অ্যালভিওলার নালি** (alveolar duct), অ্যাট্রিয়াম, **অ্যালভিওলার থলি** (alveolar sac) হয়ে পরিশেষে **অ্যালভিওলাসে** (alveolus, pl. alveoli) উন্মুক্ত হয়। প্রাইমারি ব্রঙ্কাস থেকে শুরু করে অ্যালভিওলাস পর্যন্ত ফুসফুসের গঠনচিত্র দেখতে অনেকটা বৃক্ষের মতো বলে একে **শ্বসন বৃক্ষ** বা **ব্রঙ্কিয়াল বৃক্ষ** (respiratory tree) বলে। শ্বসনতন্ত্রে বায়ু প্রবাহের গতিপথ হলো:

ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কাস → ব্রঙ্কিওল → অ্যালভিওলার নালি → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলাস

কাজ : ফুসফুস মানুষের প্রধান শ্বসন অঙ্গ। ফুসফুসের অ্যালভিওলাসে ব্যাপন প্রক্রিয়া শ্বসন গ্যাস O_2 ও CO_2 এর গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে। এতে ট্রাকিয়ার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত থাকে। এটিতে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণ ঘটে। ফুসফুস দেহ থেকে শ্বসন বর্জ্য CO_2 নিষ্কাশন করে। ফুসফুস দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, পানিসাম্যতা রক্ষা করে ও শব্দ সৃষ্টি করে।

2020/8/4 17:36

Scanned with CamScanner

ট্রাকিওল এবং ব্রঙ্কিওলের মধ্যে পার্থক্য

ট্রাকিওল	ব্রঙ্কিওল
ঘাসফড়িংসহ অন্যান্য কীটপতঙ্গের শ্বসনতন্ত্রের অংশ।	মানুষের শ্বসনতন্ত্রের অংশ।
আন্তঃকোষীয় নালি যা কোষের গভীরে বিস্তৃত।	আন্তঃকোষীয় নালি নয় এবং ফুসফুসে অবস্থিত।
ট্রাকিওলের প্রান্তদেশ বন্ধ এবং কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।	পুনরায় শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অ্যালভিওলার থলিতে সমাপ্তি ঘটে।
প্রান্তদেশে তরল পদার্থ থাকে।	তরল পদার্থ অনুপস্থিত।
কোষ অভ্যন্তরে O_2 সরবরাহ করে।	অ্যালভিওলার থলি পর্যন্ত O_2 পরিবহন করে।

মাছের ফুলকা এবং মানুষের ফুসফুসের মধ্যে পার্থক্য

ফুলকা (মাছের)	ফুসফুস (মানুষের)
বহু জলজ প্রাণীসহ মাছের শ্বসন অঙ্গ।	প্রধানত স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্বসন অঙ্গ।
ফুলকা সাধারণত দেখতে চ্যাপ্টা ও খণ্ডিত।	ফুসফুস দেখতে বেলুনের মতো।
ফুলকা নির্দিষ্ট ফুলকা প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে।	ফুসফুস বক্ষ গহ্বরে অবস্থান করে।
প্রতিটি ফুলকা দু'সারি গিল ফিলামেন্ট দিয়ে গঠিত এবং প্রচুর রক্তজালক সমৃদ্ধ।	প্রতিটি ফুসফুস অসংখ্য অ্যালভিওলাই নিয়ে গঠিত।
সহজেই পানিতে দ্রবীভূত O_2 গ্রহণ করতে পারে কারণ ফুলকা রক্তজালকসমৃদ্ধ ।	অ্যালভিওলাইয়ের কৈশিকনালির মাধ্যমে বায়ু থেকে গৃহীত O_2 রক্তে প্রবেশ করে।

অ্যালভিওলাসের গঠন (Structure of Alveolus)

অ্যালভিওলাস হলো ফুসফুসের মধ্যে অবস্থিত স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা আবৃত ও কৈশিকজালিকাসমৃদ্ধ অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির বুদবুদ (bubble) সদৃশ বায়ুথলি বিশেষ। একে ফুসফুসের **গঠনগত ও কার্যগত** এককও বলা হয়। এরা গ্যাস বিনিময়ের তল (gas exchange surface) গঠন করে। মানুষের দুটি ফুসফুসে ৭০ কোটির (৭০০ মিলিয়ন) অধিক অ্যালভিওলাই থাকে যা প্রায় ৭০-৯০ বর্গমিটার আয়তনের তল জুড়ে অবস্থান করে।

অ্যালভিওলাসের ব্যাস ০.২ মি.মি. এবং প্রাচীর মাত্র ০.০০০১ মি.মি. (= ০.১ মাইক্রোমিটার) পুরু। এদের বাইরের দিকে প্রচুর কৈশিকজালক নিবিড়ভাবে অবস্থান করে। পালমোনারি ধমনি থেকে এদের উৎপত্তি ঘটে এবং পুনরায় মিলে পালমোনারি শিরা গঠন করে। প্রতিটি অ্যালভিওলাসের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা, চ্যাপ্টাকৃতির **স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ** দ্বারা গঠিত। ফলে অতি সহজেই গ্যাসের ব্যাপন ঘটতে পারে। তাছাড়া প্রাচীরে কোলাজেন ও ইলাস্টিন নামক স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে। স্থিতিস্থাপক তন্তুর কারণে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকালে অ্যালভিওলাস সহজেই প্রসারিত হতে পারে এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে। অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে **অ্যালভিওলাস ম্যাক্রোফেজ** (alveolar macrophage) নামক ফ্যাগোসাইটিক শ্বেতকণিকা থাকে যা অণুজীবসহ বহিরাগত বস্তু ধ্বংস করে।

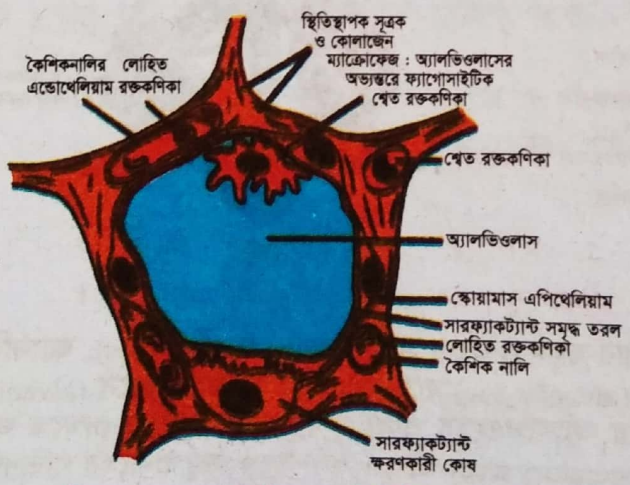

চিত্র ৫.৩ক : অ্যালভিওলাসের গঠন (প্রস্থচ্ছেদ)

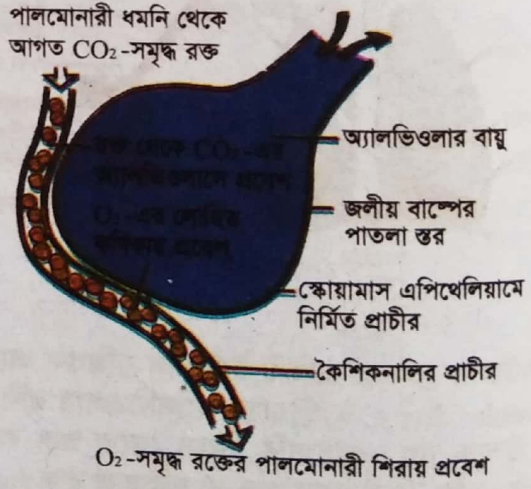

চিত্র ৫.৩খ : অ্যালভিওলাসের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময়

অ্যালভিওলাস প্রাচীরে কিছু বিশেষ কোষ থাকে, যারা প্রাচীরের অন্তঃতলে ডিটারজেন্ট (detergent) এর অনুরূপ **সারফেকট্যান্ট** (surfactant) নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। **এটি ফসফোলিপিড, নিউট্রাললিপিড (প্রধানত কোলেস্টেরল), বিভিন্ন আয়ন ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত**। এ পদার্থ অ্যালভিওলাস-প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান (surface tension) কমিয়ে দিয়ে ফুসফুসকে সহজে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে সহায়তা করে, ফলে গ্যাসীয় (O_2 ও CO_2) বিনিময় সহজ হয়। এছাড়া এটি অ্যালভিওলাসে আগত জীবাণুকে (ব্যাকটেরিয়া) ধ্বংস করে।

2020/8/4 17:36

Scanned with CamScanner

সারফেকট্যান্টবিহীন অ্যালভিওলাস তথা ফুসফুস যথাযথ কাজ করতে পারে না। ২৩ সপ্তাহ বয়সের পূর্বে কোনো ভ্রূণে সারফেকট্যান্ট ক্ষরণ শুরু হয় না। এই কারণে ২৪ সপ্তাহের আগেই মানবভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয় না। অনেক দেশে তাই এ সময়কাল পর্যন্ত গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হয়। অনেক সময় সারফেকট্যান্ট তৈরি না হওয়ায় শিশুদের শ্বসন কষ্টজনিত রোগ **RDS** (Respiratory Distress Syndrome) হয়। প্রশ্বাস ক্রিয়ার অক্ষমতার জন্য অনেক সময় শিশু মারা যায়। অ্যালভিওলাসের মাধ্যমে গ্যাসের বিনিময় ঘটে।

অ্যালভিওলাসে গ্যাসীয় আদান-প্রদান

প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস এই দুটি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের বায়ু প্রথমে ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাইতে প্রবেশ করে। সেই কারণে অ্যালভিওলাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বায়ুথলির চারদিকে অবস্থিত পালমোনারি শিরার রক্তজালিকায় অবস্থিত অক্সিজেনের চেয়ে বেশি থাকে। আবার পালমোনারি ধমনি দিয়ে আনীত রক্তে CO_2 এর পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে O_2 ও CO_2 এর মধ্যে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে। এই গ্যাসীয় আদান-প্রদানই হলো **বহিঃশ্বসন**। এই গ্যাসীয় আদান-প্রদান পার্শ্ব চাপের ওপর নির্ভরশীল।

শ্বসনতন্ত্রের কাজ

১। **শ্বসন গ্যাসের বিনিময় :** শ্বাসক্রিয়ার সময় পরিবেশের অক্সিজেন (O_2) রক্তে মিশে এবং রক্ত থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়।

২। **পানি সাম্যতা :** নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৪০০-৬০০ মিলিলিটার পানি দেহ থেকে বের হয়ে যায়। এতে দেহের পানির সাম্যতা বজায় রাখতে সহায়তা হয়।

৩। **তাপ নিয়ন্ত্রণ :** নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এর সঙ্গে দেহের কিছু তাপ নির্গত হয়ে দেহের তাপমাত্রা বজায় থাকতে সহায়তা করে।

৪। **সংশ্লেষণ :** ফুসফুসে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণ ঘটে।

৫। **এসিড ও ক্ষারের সাম্যতা :** নিঃশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হওয়ায় pH নিয়ন্ত্রণে সহায়তা হয়।

৬। **শক্তি উৎপাদনের ভূমিকা :** শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে গৃহীত অক্সিজেন (O_2) কোষীয় শ্বসনে ব্যবহৃত হয় এবং শক্তি উৎপন্ন হয়।

৭। **অন্যান্য কাজ :** এটি শ্বসন ছাড়াও অন্যান্য অনেক কাজ সম্পাদন করে। যথা– (ক) ফুসফুসীয় কলা সেরোটোনিন ও হিস্টামিন সংরক্ষণ ও বিমুক্ত করে। (খ) নরঅ্যাড্রিনালিন ও অ্যাড্রিনালিনকে নিষ্ক্রিয় করে। (গ) ইমিউনোগ্লোবিন ক্ষরণ করে, এটি অ্যানজিওটেনসিন-I কে অ্যানজিওটেনসিন-II এ রূপান্তরিত করে। (ঘ) ফুসফুসীয় কলা ব্রাডিকিনিন ও প্রোস্টাগ্লান্ডিন সংশ্লেষ ও দেহ হতে অপসারণ করে।

❑ **কাজ :** (i) মানব শ্বসনতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম এককের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা কর। (ii) মানবদেহের বক্ষগহ্বরের একটি বায়ুকুঠুরীর গঠন বর্ণনা কর।

শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গসমূহের নাম এবং কাজ

অঙ্গ	প্রধান কাজ
১। নাসিকা	নাসিকা বায়ু প্রবেশে সাহায্য করে। নাসিকার নাসারন্ধ্র অতিক্রমকারী বাতাস কিছুটা গরম ও আর্দ্র হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে ফলে শুষ্ক ও শীতল বাতাস ফুসফুসের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।
২। নাসাগহ্বর	আগত (incoming) বায়ুকে ফিল্টার, গরম ও সিক্ত করে। নাসাগলবিলে বায়ু প্রবেশের জন্য পথ হিসেবে কাজ করে।
৩। নাসাগলবিল	নাক এবং ল্যারিংক্সের মধ্যে বায়ুপ্রবাহের জন্য এবং মুখ থেকে গলবিলে খাদ্যের চলনের জন্য করিডোর (passageway) হিসেবে কাজ করে।
৪। ল্যারিংক্স (স্বরথলি)	নাসাগলবিল ও শ্বাসনালির অবশিষ্ট অংশে বায়ু চলনের জন্য করিডোর প্রদান করে। শব্দ তৈরি করে। ট্রাকিয়াকে বহিরাগত বস্তু থেকে রক্ষা করে।
৫। ট্রাকিয়া	বক্ষগহ্বর থেকে বায়ু যাতায়াতের করিডোর (passageway) প্রদান করে। সিলিয়া দ্বারা বহিরাগত বস্তুকে আটকায় এবং বহিষ্কার করে।
৬। ব্রঙ্কাই	ফুসফুসে বায়ুর যাতায়াতের জন্য করিডোর (passageway) প্রদান করে। বায়ু ফিল্টার করে।
৭। ব্রঙ্কিওল	অ্যালভিওলাসে বায়ুর যাতায়াতের জন্য করিডোর প্রদান করে।
৮। অ্যালভিওলাই	শ্বসন গ্যাস (O_2 এবং CO_2) বিনিময়ের স্থান। ফুসফুসের গাঠনিক ও কার্যকরী একক।
৯। ফুসফুস	প্রধান শ্বসন অঙ্গ। রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং পরিবেশের মধ্যে O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটায়।
১০। প্লিউরা	ফুসফুসের বহিঃপৃষ্ঠকে রক্ষা করে। কামরায় বিভক্ত করে (compartmentalize) এবং লুব্রিকেট (lubricate) করে।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : ফুসফুসের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

2020/8/4 17:36

Scanned with CamScanner

৫.২ প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম (Ventilation Mechanism)

যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে অক্সিজেন (O_2) সমৃদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) সমৃদ্ধ বায়ু ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে **শ্বাসক্রিয়া** (breathing) বা **শ্বসন কৌশল** বলে। প্রকৃতপক্ষে এটি বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়া। বক্ষগহ্বরের আয়তনের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বক্ষগহ্বর সম্প্রসারিত হলে ফুসফুসেরও সম্প্রসারণ ঘটে এবং বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে। বিপরীতক্রমে বক্ষগহ্বর সংকুচিত হলে ফুসফুসেরও সংকোচন ঘটে, ফলে ফুসফুসীয় চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। বায়ু তখন ফুসফুস থেকে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। দুই ধরনের পেশির ক্রিয়ায় বক্ষগহ্বরের আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। পেশিগুলো হলো বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝে **ডায়াফ্রাম** (diaphram) এবং পর্শুকাসমূহের (ribs) ফাঁকে অবস্থিত **ইন্টারকোস্টাল পেশি** (intercoastal muscle)।



চিত্র ৫.৪ক : ইন্টারকোস্টাল পেশি

শ্বাসক্রিয়া দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা : **শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ**।

(ক) শ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস (Inhalation/Inspiration) : **শ্বাসকার্যের যে পর্যায়ে বায়ুমন্ডলের O_2 সমৃদ্ধ বায়ু ফুসফুসের অ্যালভিওলাসে প্রবেশ করে, তাকে প্রশ্বাস বলে**। প্রশ্বাসের সময় বক্ষপিঞ্জরের পর্শুকাগুলোর (ribs) মধ্যবর্তী ইন্টারকোস্টাল পেশি সংকুচিত হয় ফলে বক্ষপিঞ্জর উপরের দিকে বা সামনের দিকে প্রসারিত হয়। এতে বক্ষগহ্বরের আয়তন বেড়ে যায়। অন্যদিকে ডায়াফ্রামের পেশি সংকুচিত হয় ফলে ডায়াফ্রাম নিচে নেমে আসে এবং দৈর্ঘ্য বরাবর বক্ষগহ্বর বৃদ্ধি পায়। এভাবে বক্ষগহ্বর প্রসারণের ফলে **অন্তঃপ্লিউরাল** (intrapleural) ও **অন্তঃবক্ষীয়** (intrathoracic) চাপ হ্রাস পায় এবং ফুসফুস প্রসারিত হয়। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বৃদ্ধি পাওয়ায় বক্ষ গহ্বরের আয়তন বেড়ে যায়। ফলে ভেতরের চাপ ও পরিবেশের চাপের তুলনায় কম হওয়ার কারণে চাপের সমতা রক্ষার জন্য নাক ও ট্রাকিয়ার মাধ্যমে ফুসফুসে O_2 যুক্ত বায়ু প্রবেশ করে।

ফুসফুসে O_2 যুক্ত বায়ুর চলন :

বায়ু → বহিঃনাসারন্ধ্র → নাসাগহ্বর → নাসাপথ → নাসাগলবিল → গ্লটিস (শ্বাসছিদ্র) → ল্যারিংক্স → ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কাই ↓ ব্রঙ্কিওল → অ্যালভিওলার নালি → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলাই

(খ) শ্বাসত্যাগ বা নিঃশ্বাস (Exhalation/Expiration) : **শ্বাসকার্যের যে পর্যায়ে ফুসফুসের অ্যালভিওলাস হতে CO_2 সমৃদ্ধ বায়ু দেহের বাইরে তথা বায়ুমন্ডলে নির্গত হয়, তাকে নিঃশ্বাস বলে**। প্রশ্বাসের পর পরই নিঃশ্বাস প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এটি একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। নিঃশ্বাসকালে বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি এবং ডায়াফ্রাম শিথিল হয়। উদরীয় পেশিগুলোর চাপে ডায়াফ্রাম ধনুকের মতো বেঁকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয় এবং এতে **অন্তঃবক্ষীয়** ও **অন্তঃফুসফুসীয়** বায়ুচাপ বাহিরের বায়ুচাপ হতে অনেক বেড়ে যায়। ফলে ফুসফুস থেকে CO_2 যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায়।

ফুসফুস থেকে CO_2 যুক্ত বায়ু নির্গমন :

বায়ু → অ্যালভিওলাই → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলার নালি → ব্রঙ্কিওল → ব্রঙ্কাই → ট্রাকিয়া → ল্যারিংক্স → গ্লটিস ↓ দেহের বাইরে ← বহিঃনাসারন্ধ্র ← নাসাগহ্বর ← নাসাপথ ← নাসাগলবিল

2020/8/4 17:36

Scanned with CamScanner

শ্বসন একটি ছন্দময় প্রক্রিয়া। পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষ বিশ্রামকালে এ প্রক্রিয়া প্রতি মিনিটে ১৪-১৮ বার এবং নবজাত শিশুতে ৪০ বার সংঘটিত হয়। তবে ব্যায়াম বা অন্য কারণে শ্বসনের হার দ্রুত হয় বলে উদরীয় পেশিও তখন শ্বসন কাজে যোগ দেয়।

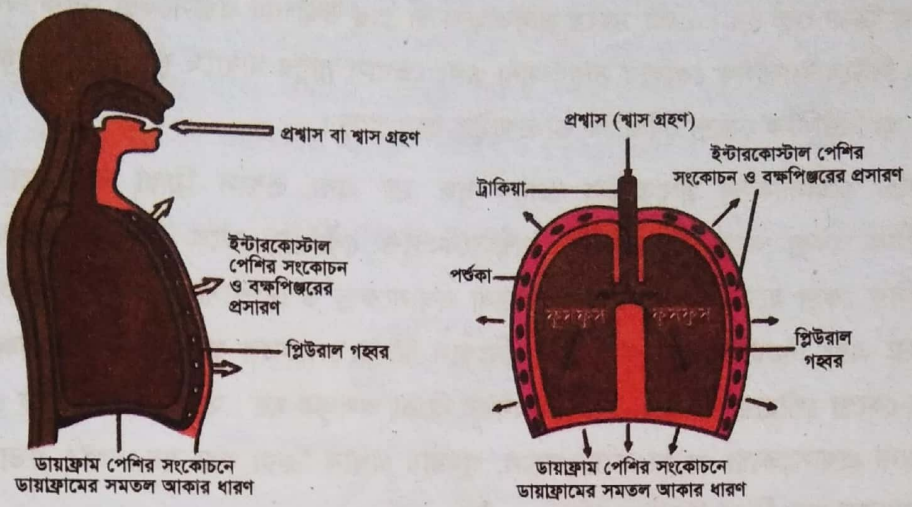

ফুসফুসের বায়ুর প্রবেশ (প্রশ্বাস)

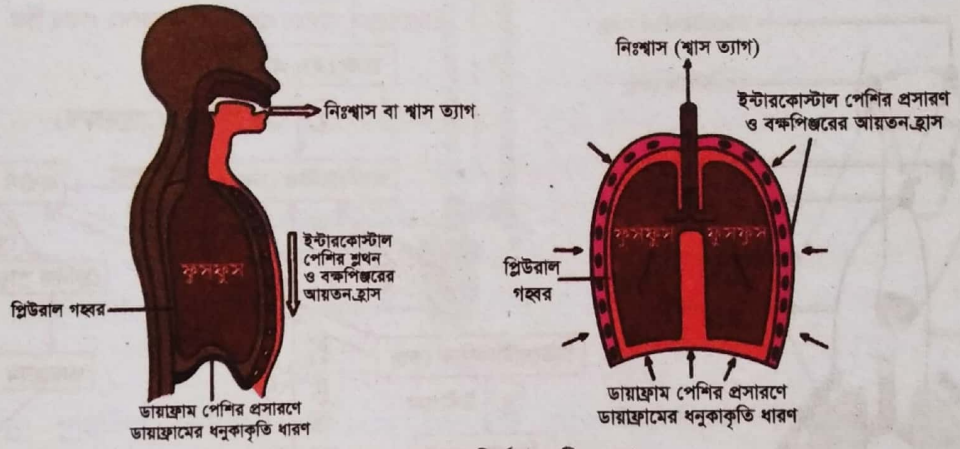

ফুসফুসে বায়ু নির্গমন (নিঃশ্বাস)

চিত্র ৫.৪খ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম

প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (Ventilation/Breathing Control)

মানবদেহের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস অর্থাৎ শ্বাস প্রক্রিয়া দু'ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। যথা– **স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ** এবং **রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ**।

(ক) স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ (Nervous control) : মস্তিষ্কের শ্বাসকেন্দ্র, শ্বসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে বিদ্যমান প্রতিবর্তি ক্রিয়া এবং অন্যান্য কতিপয় স্নায়বিক উদ্দীপনা শ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

১। **শ্বাসকেন্দ্র** (Respiratory center) : প্রধানত মস্তিষ্কে বিদ্যমান ৪টি কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন একগুচ্ছ স্নায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের **পনসের** (pons) পার্শ্বদেশে অবস্থিত একজোড়া স্নায়ুকেন্দ্র এবং **মেডুলা অবলংগাটার** (medulla oblongata) পার্শ্বদেশে অবস্থিত একজোড়া স্নায়ুকেন্দ্র প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এদেরকে **শ্বাসকেন্দ্র** বলে। পনসের পাশে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রদ্বয় যথাক্রমে **নিউমোট্যাকসিক** (pneumotaxic) ও **অ্যানিউস্টিক** (apneustic) স্নায়ুকেন্দ্র নামে পরিচিত। অন্যদিকে মেডুলার পাশে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রদ্বয় যথাক্রমে **প্রশ্বাসকেন্দ্র** (inspiratory centre) ও **নিঃশ্বাসকেন্দ্র** (expiratory centre) নামে পরিচিত। শ্বাসকেন্দ্র বা স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ শ্বসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে স্নায়ুজালক দ্বারা যুক্ত থাকে। তাছাড়া স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ রক্তে CO_2 ও H^+ আয়নের মাত্রার প্রতি বিশেষ সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করে। স্নায়ুকেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রশ্বাসকেন্দ্র ও নিঃশ্বাসকেন্দ্রের কার্যকারিতা পরস্পর বিপরীতমুখী অর্থাৎ এদের একটি উদ্দীপিত হলে অপরটি অবদমিত হয়ে পড়ে। এ জন্য প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া ছন্দময় আবর্তনে ঘটে থাকে।

2020/8/4 17:36

Scanned with CamScanner

রক্তে CO_2 এর উপস্থিতিতে **অ্যানিউস্টিক কেন্দ্র** উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা প্রশ্বাসকেন্দ্রে পৌঁছালে সেখান থেকে যথাক্রমে **ফ্রেনিক স্নায়ু** ও **ইন্টারকোস্টাল স্নায়ুর** মাধ্যমে উদ্দীপনা **ডায়াফ্রাম** ও **ইন্টারকোস্টাল পেশিতে** পৌঁছায় এবং তখনই প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। একই সময়ে স্নায়ুতাড়না বা স্নায়ু উদ্দীপনা প্রশ্বাসকেন্দ্র থেকে নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্রেও প্রেরিত হয়। **নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্রের** স্নায়ুতাড়না এবং ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে ফুসফুসে বায়ুস্ফীতির উদ্দীপনা (প্রশ্বাস গ্রহণজনিত) অ্যানিউস্টিক কেন্দ্রে পৌঁছালে তা প্রশমিত হয়ে পড়ে।

এর ফলে প্রশ্বাসকেন্দ্রে স্নায়ুতাড়না প্রেরণ বন্ধ হয় এবং প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। একই সময়ে নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্র হতে স্নায়ুতাড়না নিঃশ্বাসকেন্দ্রেও পৌঁছায়, ফলে নিঃশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্র হতে একই সঙ্গে স্নায়ুতাড়না প্রশ্বাসকেন্দ্র ও নিঃশ্বাসকেন্দ্রে পৌঁছানোতে একই সময়ে প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং নিঃশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। নিঃশ্বাস ক্রিয়া চলাকালে ফুসফুস সংকোচনজনিত কোনো উদ্দীপনা অ্যানিউস্টিক কেন্দ্রে পৌঁছায় না বলে সেটির অবদমন ক্রিয়া অপসৃত হয়। তাই অ্যানিউস্টিক কেন্দ্র পুনরায় উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ুতাড়না প্রশ্বাসকেন্দ্রে প্রেরণ করে। ফলে, পুনরায় প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। আর এভাবে পর্যায়ক্রমে ঘটনার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

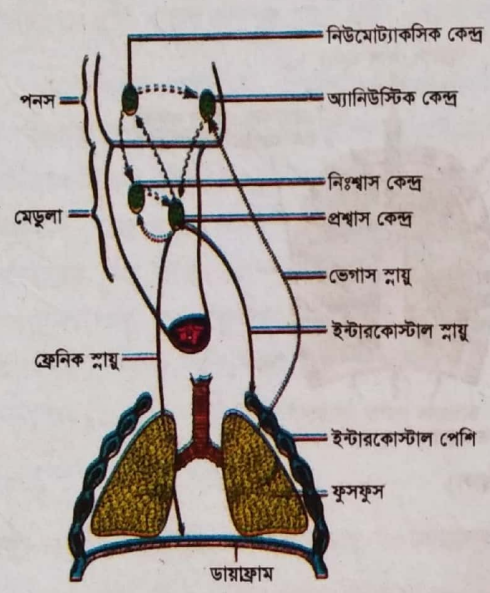

শ্বাসকেন্দ্রের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের প্রবাহ চিত্র

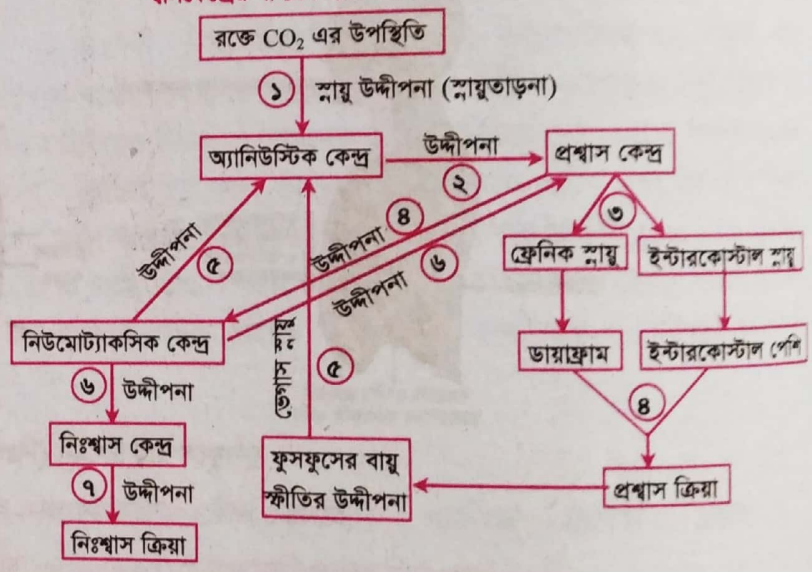

চিত্র ৫.৫ : শ্বাসকেন্দ্রের মাধ্যমে শ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ

২। প্রতিবর্তি বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) : শ্বাস ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংঘটিত কয়েকটি প্রতিবর্তি ক্রিয়ার মাধ্যমে শ্বসন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেমন–

- প্রশ্বাস ক্রিয়ায় ফুসফুস বায়ুপূর্ণ হলে ফুসফুসের প্রাচীরের টান গ্রাহক কোষসমূহ উদ্দীপিত হয়। এ উদ্দীপনা ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে অ্যানিউস্টিক স্নায়ুকেন্দ্রে প্রেরণ করে এর কার্যক্রম প্রশমিত করে, ফলে প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়। নিঃশ্বাস ক্রিয়ার সময় ফুসফুস সংকোচিত থাকে বলে টান গ্রাহক কোষসমূহ উদ্দীপিত হয় না, তাই ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে কোনো স্নায়ুতাড়না পরিবাহিত হয় না। এতে অ্যানিউস্টিক স্নায়ুকেন্দ্র কার্যকারিতা ফিরে পেয়ে প্রশ্বাস ক্রিয়া ঘটায়। ফুসফুসের এরূপ প্রসারণ ও সংকোচনের ফলে সৃষ্ট প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে **হেরিং-ব্রয়ার প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (Hering-Breur reflex) বলে। এর দ্বারা শ্বাসক্রিয়ার ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয়।

2020/8/4 17:36

Scanned with CamScanner

■ নাসিকাগহ্বরের প্রাচীরের মিউকাস পর্দায় উদ্দীপনাজনিত স্নায়ুতাড়না অলফ্যাক্টরি স্নায়ুর (olfactory nerve) মাধ্যমে **হাঁচি** (sneezing) প্রতিবর্তি ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায় এবং শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্তন আনে।

■ ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালিতে বহিরাগত কোনো পদার্থ প্রবেশ করলে এর মিউকাস পর্দা উদ্দীপিত হয়ে ভেগাস স্নায়ুর (vagus nerve) মাধ্যমে **কাশি** (caughing) প্রতিবর্তি ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায় এবং শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্তন আনে।

■ খাদ্য গলাধঃকরণ বাধাগ্রস্থ হলে গলবিল গাত্রের উদ্দীপনাজনিত স্নায়ুতাড়না গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ুর (glossopharyngeal nerve) মাধ্যমে **গলবিলীয় বা গ্যাগ প্রতিবর্তি** (pharyngeal or gag reflex) ক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।

■ অনেকসময় দেহের ত্বক, ভিসেরা, পেশি, অস্থিসন্ধি ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত স্নায়ুতাড়না প্রতিবর্তি ক্রিয়ার মাধ্যমে শ্বাস ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

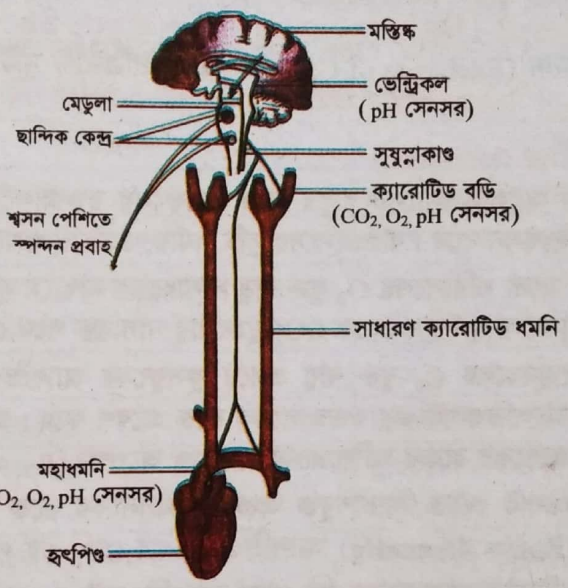

চিত্র ৫.৬ : শ্বসনের রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ

৩. অন্যান্য স্নায়বিক উদ্দীপনা (Others nervous stimulation) : সেরিব্রাল কর্টেক্স, মধ্যমস্তিষ্ক, হাইপোথ্যালামাস ইত্যাদি স্থানে গৃহীত স্নায়ুতাড়নাও অনেক ক্ষেত্রে শ্বাস ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। সেরিব্রাল কর্টেক্সের যেসব স্থান কথা বলা, ঘ্রাণ গ্রহণ, খাদ্য চর্বণ ও গলাধঃকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব স্নায়ুকেন্দ্র অনেকসময় শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটায়। যেমন– কথা বলার সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ক্রিয়ার পরই দ্রুত প্রশ্বাস ক্রিয়া ঘটায়। হাইপোথ্যালামাসের আবেগজনিত স্নায়ুতাড়না শ্বাস ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। দেহের যে কোনো স্থান থেকে উদ্ভুত যন্ত্রণাদায়ক স্নায়ুতাড়ানা শ্বাস ক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে। কিন্তু অধিক যন্ত্রণাজনিত স্নায়ুতাড়না অনেকসময় শ্বাস ক্রিয়াকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়।

(খ) রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ (Chemical control) : শ্বাসগতি নিয়ন্ত্রিত হয় রক্তের এবং সেরিব্রোস্পাইনাল তরলের (Cerebro Spinal Fluid-CSF) CO_2 লেভেলের ওপর। **মস্তিষ্ক, অ্যাওর্টিক আর্চ** এবং **ক্যারোটিড সাইনাসে** অবস্থিত কেমোরিসেপ্টরগুলো রক্তের CO_2, pH এবং অক্সিজেন লেভেল শনাক্ত করে এবং মস্তিষ্কের শ্বাসকেন্দ্রে বা **ছান্দিক কেন্দ্রে** (rythmic centre) প্রেরণ করে। শ্বাসকেন্দ্র শ্বাসপেশিতে স্নায়ুস্পন্দন (nerve impulse) পাঠায়, যা শ্বাসগতিকে দ্রুত বা মন্থর করে CO_2 ও O_2 -কে স্বাভাবিক লেভেলে নিয়ে আসে। ফলে শ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

❑ **কাজ :** (i) মানুষের প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস কার্যক্রমটি বিশ্লেষণ কর। (ii) বায়ুকুঠুরির ভেন্টিলেশন কৌশলটি ব্যাখ্যা কর। (iii) সিগারেটের ধোঁয়া আমাদের দেহে প্রবেশের যান্ত্রিক কৌশল বর্ণনা কর। (iv) মানুষের এবং মাছের শ্বসন কৌশল কি একইরকম? যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। (v) মানুষের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস মস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগাটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়–বিশ্লেষণ কর।

20207874 17:36

Scanned with CamScanner

৫.৩ শ্বসনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Respiration)

শ্বসন একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশ থেকে O_2 গ্রহণ করে কোষস্থ খাদ্যকে জারিত করে খাদ্যের স্থিতিশক্তিকে তাপ ও গতিশক্তিকে রূপান্তরিত ও মুক্ত করে এবং CO_2 ও পানি দেহ থেকে বের করে দেয়। শ্বসনের শারীরবৃত্তকে তিনটি শিরোনামে আলোচনা করা যায়। যথা– (১) গ্যাসীয় আদান-প্রদান, (২) রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস (O_2 ও CO_2) পরিবহন ও (৩) কোষে খাদ্যবস্তুর জারণ বা কোষীয় শ্বসন। শ্বসনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির রেখাচিত্র–

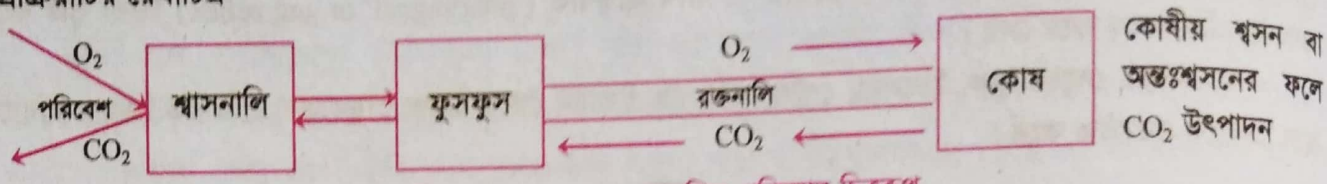

চিত্র ৫.৭ক : শ্বসনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার চিত্ররূপ

১। গ্যাসীয় আদান-প্রদান (Exchange of Gases) : শ্বসন প্রক্রিয়াটি দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। যথা– **বহিঃশ্বসন** ও **অন্তঃশ্বসন**।

(ক) বহিঃশ্বসন (External respiration)

ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাসের বায়ুর সঙ্গে ফুসফুসের রক্তজালকের মধ্যে যে গ্যাসীয় (O_2 ও CO_2) আদান-প্রদান হয় তাকে **বহিঃশ্বসন** বলে। বহিঃশ্বসনের দুটি পর্যায়, যেমন– প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস।

প্রশ্বাস (inspiration) হলো পরিবেশের O_2 যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে ফুসফুসের অ্যালভিওলাসে প্রেরণ করে।
নিঃশ্বাস (expiration) হলো ফুসফুস থেকে CO_2 যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্র পথে দেহ থেকে বের করে দেয়।

বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের O_2 যুক্ত বায়ু প্রথমে ফুসফুসের অ্যালভিওলাই-এ আসে। অ্যালভিওলাই থেকে অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অ্যালভিওলাই-এর রক্তজালকের রক্তে প্রবেশ করে। অ্যালভিওলাই-এর অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ (P_{O_2} = 104 mmHg) রক্তজালকের রক্তের অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ অপেক্ষা (P_{O_2} = 95 mmHg) বেশি হওয়ায় অক্সিজেন উচ্চচাপযুক্ত অঞ্চল অ্যালভিওলাই থেকে নিম্নচাপযুক্ত অঞ্চল রক্তজালকের রক্তে প্রবেশ করে। অন্যদিকে, রক্তজালকের রক্তের CO_2-এর পার্শ্বচাপ (P_{CO_2} = 45 mmHg) অ্যালভিওলাই-এর CO_2-এর পার্শ্বচাপ (P_{CO_2} = 40 mmHg) অপেক্ষা বেশি হওয়ায় CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তজালকের রক্ত থেকে অ্যালভিওলাই-এ প্রবেশ করে।

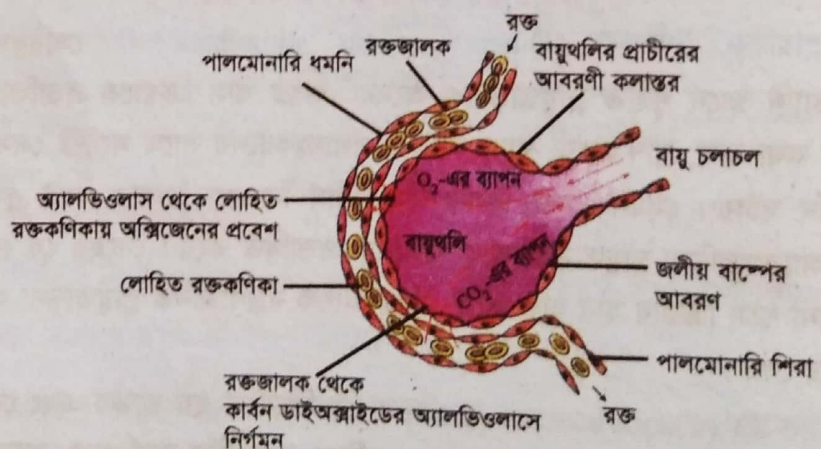

চিত্র ৫.৭খ : বহিঃশ্বসন-অ্যালভিওলাই এবং রক্তজালকের মধ্যে গ্যাসীয় আদান-প্রদানের চিত্ররূপ

চারটি প্রভাবক শ্বসন গ্যাস আদান-প্রদানকে প্রভাবিত করে, যেমন–

- শ্বসনক্ষেত্রের আয়তন, পুরুত্ব ও গঠন।
- অ্যালভিওলাসে O_2 ও CO_2-এর চাপ।
- O_2 ও CO_2-এর দ্রাবণ ও ব্যাপন ক্ষমতা এবং
- অ্যালভিওলাস ও রক্তে বিদ্যমান গ্যাসের শারীরবৃত্তীয় সম্পর্ক।

❑ **কাজ :** ফুসফুসের গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

2020/8/4 17:37

Scanned with CamScanner

(খ) অন্তঃশ্বসন (Internal respiration) : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রক্তের মাধ্যমে O_2 দেহের কলাকোষে প্রবেশ করে কোষস্থ খাদ্যের সঙ্গে বিক্রিয়া করে CO_2, পানি ও শক্তি উৎপন্ন করে তাকে **অন্তঃশ্বসন** বলে। অন্তঃশ্বসনের বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 38ADP + 38Pi \xrightarrow[\text{এনজাইম}]{\text{বিভিন্ন}} 6CO_2 + 6\,H_2O + 38ATP\ (\text{শক্তি})$$

ধমনি রক্ত দিয়ে বাহিত অক্সিজেন রক্তজালক থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কলারসের মাধ্যমে কলাকোষে প্রবেশ করে। এই সময় রক্তজালকের রক্তের O_2-এর পার্শ্বচাপ ($P_{O_2} = 95$ mmHg) কলাকোষের অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ ($P_{O_2} = 40$ mmHg) অপেক্ষা বেশি হওয়ায় অক্সিজেন রক্তজালক থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রথমে কলারসে এবং পরে কলাকোষে প্রবেশ করে। অপরদিকে, বিপাকে উৎপন্ন CO_2 কলাকোষ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কলারসের মাধ্যমে রক্তজালকের রক্তে প্রবেশ করে। এইসময় কলাকোষের CO_2-এর পার্শ্বচাপ ($P_{CO_2} = 45$ mmHg) রক্তজালকের CO_2-এর পার্শ্বচাপ ($P_{CO_2} = 40$ mmHg) অপেক্ষা বেশি হওয়ায় CO_2 কলাকোষ থেকে রক্তজালকের রক্তে প্রবেশ করে।

বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	বহিঃশ্বসন	অন্তঃশ্বসন
১। প্রকৃতি	ভৌত প্রক্রিয়া।	জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
২। ক্রিয়াস্থল	কোষের বাইরে অর্থাৎ ফুসফুস।	কোষ অভ্যন্তর অর্থাৎ কোষ ও রক্ত।
৩। ক্রিয়ার পদ্ধতি	পরিবেশ থেকে O_2 শ্বসনাঙ্গে প্রবেশ করে এবং CO_2 শ্বসনাঙ্গ থেকে বাইরের পরিবেশে মুক্ত হয়।	কোষ মধ্যস্থ খাদ্যসার O_2 দ্বারা জারিত হয়ে শক্তি, পানি ও CO_2 তৈরি করে।
৪। এনজাইমের ভূমিকা	নেই।	আছে।
৫। শক্তি	শক্তি উৎপন্ন হয় না।	নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়
৬। প্রধান উপ-পর্যায়	শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ।	গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস চক্র ও গ্যাস পরিবহন।
৭। সীমাবদ্ধতা	শুধু প্রাণীর শ্বসনাঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।	জীবদেহের (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) সকল সজীব কোষে সংঘটিত হয়।

২। রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস (O_2 ও CO_2) পরিবহন (Transportation of gases by Blood)

জীবনধারণের জন্য শ্বসন অপরিহার্য। জীবের শ্বসনের জন্য অক্সিজেন (O_2) প্রয়োজন হয়। O_2 এর উপস্থিতিতে কোষ মধ্যস্থ খাদ্যবস্তু জারিত হয়। আর কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) হলো শ্বসনজাত বর্জ্য। পরিবেশ থেকে জীব O_2 গ্রহণ করে এবং উৎপন্ন CO_2 পরিবেশে ত্যাগ করে। একে গ্যাস বিনিময় বলে। গ্যাস পরিবহনে রক্তের **শ্বাসরঞ্জকের** (যেমন– হিমোগ্লোবিন) ভূমিকাই মুখ্য। এটি একটি **অন্তঃশ্বসন** প্রক্রিয়া। মানুষের দেহের মধ্যে O_2 এবং CO_2 পরিবহন কৌশল আলোচনা করা হলো।

(ক) রক্ত কর্তৃক O_2 পরিবহন (Transportation of O_2 by blood)

কোষীয় শ্বসনে জারণ কার্যসম্পাদনের জন্য কোষে প্রচুর পরিমাণ O_2 এর প্রয়োজন হয়। এই O_2 ফুসফুস কর্তৃক বায়ুমণ্ডলে গৃহীত হয় এবং রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে দেহকোষে পৌঁছায়। রক্ত কর্তৃক O_2 দুই ভাবে পরিবাহিত হয়।

(১) ভৌত দ্রবণ রূপে : প্রায় ২% O_2 রক্তের প্লাজমায় দ্রবীভূত হয়ে ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়। অর্থাৎ প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ০.২ মিলিলিটার O_2 ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়। দ্রবীভূত অংশই রক্তে ১০০ মিলিমিটার পারদ চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

(২) রাসায়নিক যৌগ রূপে : প্রায় ৯৮% O_2 রাসায়নিক যৌগ রূপে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। ফুসফুসের অ্যালভিওলাই থেকে ব্যাপনের মাধ্যমে O_2 কৈশিক জালিকার রক্তে প্রবেশ করে। O_2 রক্তে প্রবেশের পর লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অস্থায়ী যৌগ **অক্সিহিমোগ্লোবিন** (oxyhaemoglobin) গঠন করে। রক্তের pH মান বেশি থাকলে অক্সিজেনের প্রতি হিমোগ্লোবিনের আকর্ষণ বেশি হয়।

2020/8/4 17:37

Scanned with CamScanner

হিমোগ্লোবিন O_2 পরিবহন করে বলে একে **শ্বাসরঞ্জক** (respiratory pigment) বলে। হিমোগ্লোবিন হিম নামক আয়রন রঞ্জক এবং **গ্লোবিন** নামক প্রোটিন নিয়ে গঠিত। উল্লেখ্য যে, হিমোগ্লোবিনকে Hb_4 বা Hb দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং প্রতি অণু হিমোগ্লোবিন চার অণু অক্সিজেন যুক্ত করতে পারে। O_2 এর সাথে হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক বিক্রিয়া উভমুখী।

$$Hb + O_2 \underset{\text{কম পরিমাণ } O_2}{\overset{\text{বেশি পরিমাণ } O_2}{\rightleftharpoons}} HbO_2 \text{ (অক্সিহিমোগ্লোবিন)}$$

অক্সিহিমোগ্লোবিন রক্ত দিয়ে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ এবং কলায় পৌঁছায়। অক্সিহিমোগ্লোবিন যখন কলাকোষের জালকে পৌঁছায় তখনই বিশ্লিষ্ট হয়। কলাকোষে গ্লুকোজের অবিরাম বিপাক ঘটতে থাকে। ফলে কোষে CO_2 উৎপাদন হতে থাকে এবং O_2-ও অবিরাম ব্যবহৃত হয়। ফলে কলারসে এবং কলাকোষে O_2 এর চাপ সবসময় কম থাকে এবং CO_2-এর চাপ জালক অপেক্ষা সর্বদা বেশি থাকে। সুতরাং কম O_2 চাপে অক্সিহিমোগ্লোবিন বিশ্লিষ্ট হয়ে O_2 মুক্ত করে। এই O_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তজালকের রক্ত থেকে প্রথমে কলারসে (tissue fluid) এবং পরে কোষে প্রবেশ করে।

(খ) রক্ত কর্তৃক CO_2 পরিবহন (Transportation of CO_2 by blood)

শর্করা জারণের সময় কোষে CO_2 সৃষ্টি হয়। এই CO_2 দেহের জন্য ক্ষতিকর। কোষ থেকে CO_2 রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে বায়ুতে মুক্ত হয়। রক্তে সাধারণত ২৩-২৯ mEq (milliequivalents per liter) CO_2 থাকে। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে CO_2 রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়।

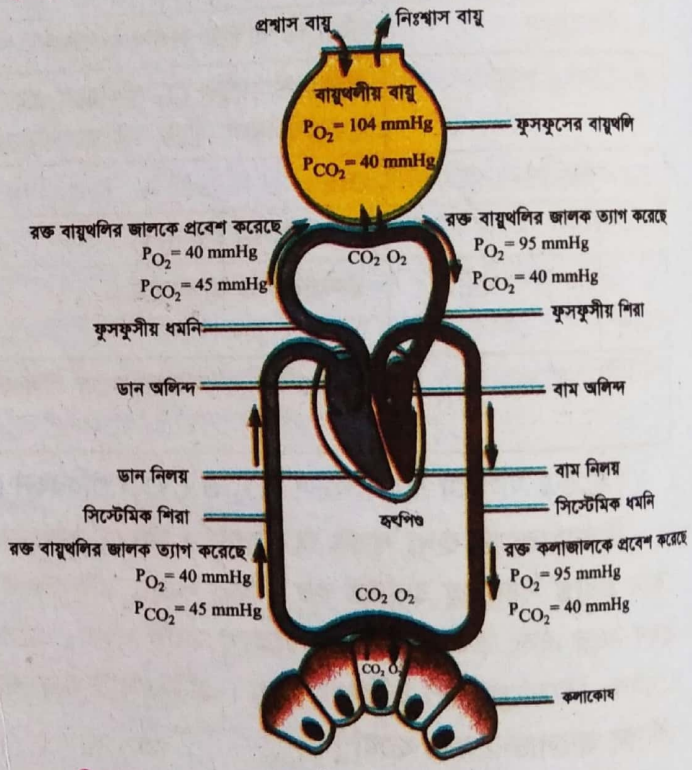

চিত্র ৫.৭গ : দেহের বিভিন্ন অংশে শ্বসন গ্যাস বিনিময়

(১) ভৌত দ্রবণ রূপে

কিছু CO_2 (৫%) রক্তের প্লাজমার বা রক্তরসের H_2O এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড উৎপন্ন করে। এই কার্বনিক এসিড বিশেষ কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্লাজমার মাধ্যমে ফুসফুসে পরিবাহিত হয়।

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow \underset{\text{কার্বনিক এসিড}}{H_2CO_3}$$

প্রতি হাজার CO_2 অণুর মধ্যে মাত্র এক অণু H_2CO_3 রূপে দ্রবণে উপস্থিত থাকে। সুতরাং CO_2 এর খুব সামান্য অংশই H_2CO_3 রূপে পরিবাহিত হয়।

(২) রাসায়নিক যৌগ রূপে :

(i) কার্বামিনো যৌগ রূপে : রক্তের প্লাজমায় আগত CO_2 এর কিছু অংশ (১০%) লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। লোহিত কণিকার মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন থাকে তার প্রোটিন (গ্লোবিন) অংশের অ্যামিনো গ্রুপের ($-NH_2$) সঙ্গে CO_2 বিক্রিয়া করে **কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন** যৌগ গঠন করে ও ফুসফুসে আসার পর CO_2 মুক্ত করে।

$$CO_2 + HbNH_2 \longrightarrow \underset{\text{কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন}}{HbNHCOOH}$$

প্লাজমা বা রক্তরসে অবস্থিত CO_2 এর একাংশ প্রোটিন শ্রেণিভুক্ত অ্যামিনো গ্রুপের ($PrNH_2$) সঙ্গে যুক্ত হয়ে **কার্বামিনোপ্রোটিন** গঠন করে পরিবাহিত হয়।

$$CO_2 + Pr\,NH_2 \longrightarrow \underset{\text{কার্বামিনো প্রোটিন}}{PrNHCOOH}$$

2020/8/4 17:37

Scanned with CamScanner

(ii) বাই-কার্বনেট যৌগ রূপে

৮৫% CO_2 বাই-কার্বনেট যৌগ রূপে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে **কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ** নামক এনজাইমের উপস্থিতিতে পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বানিক এসিড (H_2CO_3) সৃষ্টি করে। এই কার্বনিক এসিডের অধিকাংশ ভেঙে H^+ ও HCO_3^- আয়নে পরিণত হয়।

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ}} \underset{\text{কার্বনিক এসিড}}{H_2CO_3}$$

$$H_2CO_3 \longrightarrow H^+ + HCO_3^-$$

HCO_3^- রক্তের লোহিত রক্তকণিকায় K^+ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পটাশিয়াম বাইকার্বনেট ($KHCO_3$) গঠন করে। কিছু HCO_3^- লোহিত রক্তকণিকা হতে বের হয়ে রক্তরসে চলে আসে এবং Na^+ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম বাইকার্বনেট ($NaHCO_3$) গঠন করে।

লোহিত রক্তকণিকায় : $K^+ + HCO_3^- \longrightarrow KHCO_3$

রক্তরসে : $Na^+ + HCO_3^- \longrightarrow NaHCO_3$

এভাবে সৃষ্ট $KHCO_3$ ও $NaHCO_3$ রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। লোহিত রক্তকণিকা থেকে যতটি HCO_3^- রক্তরসে আসে ততটি Cl^- রক্তরস থেকে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। একে **ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া** বা **হ্যামবার্জার বিক্রিয়া** (Chloride shift reaction or Hamburger's reaction) বলা হয়। লোহিত রক্তকণিকা থেকে বাইকার্বনেট আয়ন রক্তরসে প্রবেশ করার ফলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য ক্লোরাইড আয়ন রক্তরস থেকে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। এর ফলে রক্তে অম্ল-ক্ষার (pH = 7.4) ভারসাম্য বজায় থাকে।

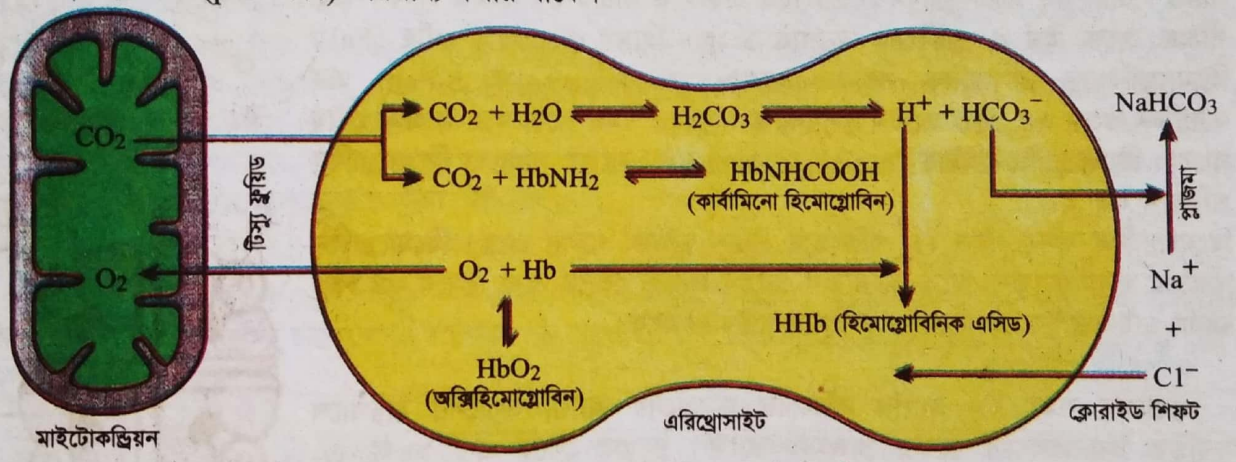

চিত্র ৫.৭ঘ : প্লাজমা ও এরিথ্রোসাইট দ্বারা CO_2 পরিবহন

(গ) কোষে খাদ্যবস্তুর জারণ (Oxidation of Food materials in Cell)

কোষে খাদ্যবস্তুর জারণ ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সাধারণত শর্করা (গ্লুকোজ) জাতীয় খাদ্যের জারণ বেশি হয়। কোষের অভ্যন্তরে গ্লুকোজ O_2 দ্বারা জারিত হয়ে CO_2 ও শক্তি অর্থাৎ ATP উৎপাদন করে। এ প্রক্রিয়াটি চারটি ধাপে সংঘটিত হয়।

(i) **গ্লাইকোলাইসিস** : এটি কোষের সাইটোপ্লাজমের তরল অংশে সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ ভেঙে দুই অণু পাইরুভিক এসিড উৎপন্ন করে।

$$\text{গ্লুকোজ} \xrightarrow{\text{এনজাইম}} \text{পাইরুভিক এসিড}$$

(ii) **পাইরুভেট অক্সিডেশন** : এটিও কোষের সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় পাইরুভিক এসিড কো-এনজাইমের (CoA) সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে **অ্যাসিটাইল CoA** গঠন করে।

পাইরুভিক এসিড + কো-এনজাইম (CoA) = অ্যাসিটাইল CoA

(iii) **ক্রেবস চক্র** : এটি মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে সংঘটিত হয়। এ চক্রে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাসিটাইল CoA ও অক্সালো অ্যাসিটেট হতে ATP ও H^+ সৃষ্টি হয়।

2020/8/4 17:37

Scanned with CamScanner

(iv) ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম/চেইন (ETS/ETC) : এ ক্ষেত্রে H^+ থেকে ATP ও পানি সৃষ্টি হয়। খাদ্যবস্তু জারণের সময় প্রচুর পরিমাণে O_2 ব্যবহৃত হয় এবং CO_2 সৃষ্টি হয়।

শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেন্ট (Respiration Quotient or RQ)

শ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে পরিমাণ O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেন্ট বলে।

$$\text{শ্বসনিক হার (RQ)} = \frac{\text{নির্গত } CO_2 \text{ এর পরিমাণ}}{\text{গৃহীত } O_2 \text{ এর পরিমাণ}}$$

বিভিন্ন শ্বসনিক বস্তুর জন্য শ্বসনিক কোসেন্ট বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। শ্বসনিক বস্তু গ্লুকোজ হলে RQ এর মান ১ হয়। চর্বি জাতীয় পদার্থ শ্বসনিক বস্তু হলে RQ এর মান ১ এর কম হয়, কারণ চর্বি জাতীয় পদার্থ সম্পূর্ণ জারিত হতে অধিক পরিমাণ O_2 এর প্রয়োজন পড়ে। জৈব এসিডের RQ এর মান ১ এর বেশি হয়, কারণ জৈব এসিডে CO_2 এর পরিমাণ O_2 থেকে বেশি। প্রোটিনের RQ এর মান ১ এর কম হয়। মরুজ উদ্ভিদে RQ অত্যন্ত কম এমনকি শূন্য হতে পারে।

৫.৪ শ্বসনে শ্বাসরঞ্জকের ভূমিকা (Role of Respiratory Pigment During Respiration)

রক্তের যে অংশ দ্বারা শ্বসন গ্যাস, বিশেষ করে O_2 পরিবাহিত হয় তাকে **শ্বাসরঞ্জক** বলে। মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় বিদ্যমান লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী ভারী পদার্থ **হিমোগ্লোবিন** হলো **শ্বাসরঞ্জক**। **হিমোগ্লোবিন এর** বর্ণের জন্যই রক্ত লাল দেখায়। প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু ৫% **হিম** (heme) নামক লৌহ ধারণকারী পিগমেন্ট এবং ৯৫% **গ্লোবিন** (globin) নামক পলিপেপটাইড প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। এক অণু হিমোগ্লোবিন চারটি হিম একক ও চারটি পেপটাইড শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত। রক্তে হিম ও গ্লোবিনের অনুপাত ১:২৫। হিমের ৩৩.৩৩% লৌহ (Fe)। হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক সংকেত হলো– $(C_{712}H_{1130}O_{245}N_{214}S_2Fe)_4$, এর আণবিক ওজন ৬৪,৪৫০ ডাল্টন। পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে মাত্র ৩ গ্রাম লৌহ থাকে। **হিমোগ্লোবিনোমিটার** (haemoglobinometer) যন্ত্রের সাহায্যে হিমোগ্লোবিন পরিমাপ করা হয়।

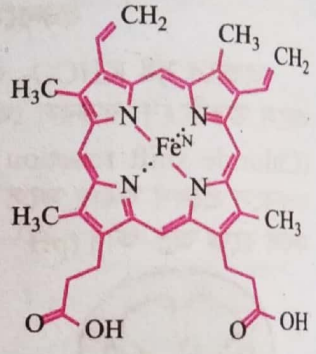

চিত্র ৫.৮ক : হিমোগ্লোবিনের গাঠনিক সংকেত

হিমোগ্লোবিন শ্বসন গ্যাস O_2 পরিবহনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। হিমোগ্লোবিন শ্বসনের জন্য ফুসফুস থেকে অক্সিজেন দেহের প্রতিটি কোষে এবং শ্বসনে সৃষ্ট কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড কোষ থেকে ফুসফুসে পরিবহন করে।



চিত্র ৫.৮খ : হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন সংবন্ধন

অক্সিজেন পরিবহন

প্রশ্বাসের সময় O_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের চারপাশে অবস্থিত রক্তজালিকার রক্তের প্লাজমায় আসে। প্লাজমা থেকে প্রায় ৯৮% O_2 হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে অস্থায়ী যৌগ **অক্সিহিমোগ্লোবিন** হিসেবে দেহকোষে পরিবাহিত হয়। দেহকোষের চারপাশে যেহেতু অক্সিজেনের পরিমাণ কম তাই অক্সিহিমোগ্লোবিন ভেঙে অক্সিজেন মুক্ত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষে প্রবেশ করে।

$$Hb + O_2 \rightleftharpoons HbO_2$$

কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন

শ্বসনে সৃষ্ট কিছু CO_2 (১০%) লোহিত কণিকার মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন থাকে তার প্রোটিন (গ্লোবিন) অংশের অ্যামিনো গ্রুপের ($-NH_2$) সঙ্গে বিক্রিয়া করে **কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন** যৌগ গঠন করে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ কর্তৃক হৃৎপিণ্ড হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে গমন করে। ফুসফুসে আসার পর বিপরীতমুখী পরিবর্তন দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইড মুক্ত হয়।

$$CO_2 + HbNH_2 \longrightarrow \underset{\text{কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন}}{HbNHCOOH}$$

এই রাসায়নিক বিক্রিয়া এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে (০.০১ সেকেন্ডের কম) অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

❑ **কাজ :** (i) হিমোগ্লোবিন শ্বসনে কী ভূমিকা পালন করে– ব্যাখ্যা কর। (ii) হিমোগ্লোবিন O_2 এবং CO_2 পরিবহনের মাধ্যমে দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– ব্যাখ্যা কর। (iii) মানুষের অন্তঃশ্বসনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

2020/8/4 17:37

Scanned with CamScanner

৫.৫ শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ এবং প্রতিকার
(Problems, Symptoms and Remedy of Respiratory Tract)

মানবদেহের জন্য সুস্থ অঙ্গতন্ত্র প্রয়োজন। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে শ্বসনতন্ত্রের শ্বসননালি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ফুসফুস, শ্বসননালি, গলা বা সাইনাসের যেকোন ধরনের সংক্রমণকে **শ্বসননালির সংক্রমণ** (respiratory tract infections-RTI) বলে। কিন্তু এ শ্বসননালি প্রায়ই ভাইরাসে, মাঝে মধ্যে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সচল দেহকে আধা-অচল করে দেয়। সাধারণ ঠান্ডা লাগা সবচেয়ে বড় ধরণের RTI জটিলতা।

এছাড়াও পরিবেশ দূষণ ও ধূমপানের কারণে শ্বসননালির বিশেষ ক্ষতি হয়ে থাকে। আমাদের শ্বসননালির গাত্রে সিলিয়েটেড কোষ ও মিউকাস কোষ নামক দু'ধরনের বিশেষ কোষ থাকে। এ কোষগুলো ধুলাবালি ও জীবাণু থেকে আমাদের ফুসফুসকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু ধূমপান ও পরিবেশ দূষণের কারণে এ কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আমরা সহজেই রোগাক্রান্ত হই। এ ধরনের সমস্যা শিশুদের বেশি হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা RTI কে দুভাবে চিহ্নিত করে থাকেন।



চিত্র ৫.৯ক : শ্বসননালির বিশেষ কোষ

(১) **উর্ধ্ব শ্বসননালির সংক্রমণ** (Upper respiratory tract infection) : এর ফলে সাধারণত নাক, কান, সাইনাস ও গলা আক্রান্ত হয়। উর্ধ্ব শ্বসননালির সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে **সাধারণ ঠান্ডা, টনসিলাইটিস** (টনসিলের সংক্রমণ), **সাইনুসাইটিস** (সাইনাসের সংক্রমণ), **ল্যারিনজাইটিস** (ল্যারিংক্স বা স্বরযন্ত্রের সংক্রমণ), **ওটিটিস মিডিয়া** (মধ্যকর্ণের সংক্রমণ) ইত্যাদি। কাশি হলো এ ধরনের সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ। এছাড়া মাথা ব্যথা, নাক দিয়ে পানি ঝরা, হাঁচি, গলাব্যথা, পেশির ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

(২) **নিম্ন শ্বসননালির সংক্রমণ** (Lower respiratory tract infection) : এ ধরনের সংক্রমণে শ্বাসনালি ও ফুসফুস আক্রান্ত হয়। নিম্ন শ্বসননালির সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে **ফ্লু** (শ্বাসনালির সংক্রমণ), **ব্রঙ্কাইটিস** (শ্বাসনালির সংক্রমণ), **নিউমোনিয়া** (ফুসফুসের সংক্রমণ), **যক্ষ্মা** বা **টিউবারকুলোসিস** (ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ) ইত্যাদি। এ ধরনের সংক্রমণেরও প্রধান লক্ষণ হলো কাশি।

নিচে শ্বসননালির সমস্যাজনিত রোগের উদাহরণ হিসেবে সিলেবাসভুক্ত **সাইনুসাইটিস** ও **ওটিটিস মিডিয়া** সৃষ্ট রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার আলোচনা করা হলো–

সাইনুসাইটিস (Sinusitis)

সাইনাস শব্দের শাব্দিক অর্থ **গহ্বর**। চিকিৎসাবিজ্ঞানে সাইনাস বলতে মুখমণ্ডলীয় অস্থির মধ্যস্থিত গহ্বরকে বোঝায়। মানুষের মুখমণ্ডলে চার জোড়া **সাইনাস** বা **প্যারান্যাসাল সাইনাস** (sinus or paranasal sinus) আছে। এগুলো হলো–

সাইনাসের নাম	প্রদাহের ধরন
১। ম্যাক্সিলারি সাইনাস	ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে (গালে) ব্যথা বা চাপ, যেমন– দাঁতব্যথা, মাথাব্যথা ইত্যাদি।
২। ফ্রন্টাল সাইনাস	ফ্রন্টাল সাইনাস গহ্বরে (চোখের উপরে অবস্থিত) ব্যথা বা চাপ, মাথাব্যথা।
৩। এথময়ডাল সাইনাস	দু'চোখের মাঝখানে বা পেছনে ব্যথা, মাথাব্যথা।
৪। স্ফেনয়ডাল সাইনাস	চোখের পেছনে বা মাথার চূড়ায় ব্যথা বা চাপ।

এসব সাইনাস মিউকাস পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এবং পিচ্ছিল মিউকাস সৃষ্টির মাধ্যমে নাসিকা পথকে সিক্ত ও জীবাণুমুক্ত রাখে। এসব সাইনাস থেকে রস নিঃসৃত হয় এবং নাকের মাধ্যমেই তা বের হয়।

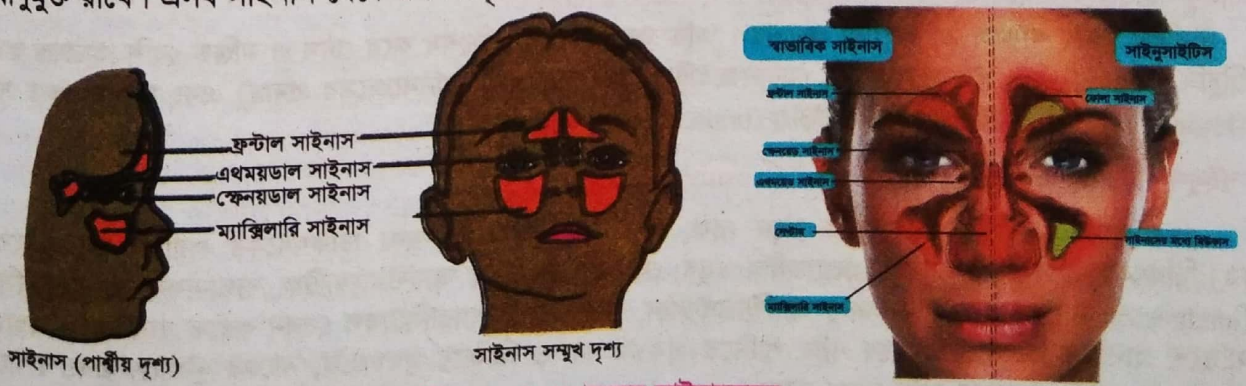

চিত্র ৫.৯খ : মুখমণ্ডলে সাইনাসসমূহ

2020/8/4 17:37
Scanned with CamScanner

কোনো কারণে ওই নালি বন্ধ হয়ে গেলে বা অন্য কোনো কারণে সাইনাসের ঝিল্লির প্রদাহ হলে সাইনুসাইটিসের সৃষ্টি হয়। **কোনো কারণে (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি) মুখনগুলে বিদ্যমান সাইনাসগুলোর ঝিল্লিতে ঘা বা প্রদাহ হলে তাকে সাইনুসাইটিস বলে।** সাইনুসাইটিস (sinusitis) হলো কোনো **গহ্বরের প্রদাহ**। একে **রাইনোসাইনুসাইটিস** (rhinosinusitis) ও বলা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে সাইনুসাইটিসকে উর্ধ্ব শ্বসননালির সংক্রমণ (upper respiratory tract infection) বলে বিবেচনা করা হয়।

সাইনুসাইটিসের প্রকারভেদ (Types of sinusitis) : প্রদাহের স্থায়িত্ব ও লক্ষণের উপর ভিত্তি করে সাইনুসাইটিস দুই প্রকার। যথা–

১। **অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস** (Acute sinusitis) : সাইনুসাইটিস আট সপ্তাহের কম সময় থাকলে তাকে অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস বলে।

২। **ক্রোনিক সাইনুসাইটিস** (Chronic sinusitis) : সাইনুসাইটিস তিন মাসের অধিককাল থাকলে তাকে ক্রোনিক সাইনুসাইটিস বলে।

সাইনুসাইটিসের কারণ (Causes of sinusitis)

(১) জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ : ভাইরাস (Respiratory syncytial virus -RSV, Metapneumo virus), ব্যাকটেরিয়া (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*), ছত্রাক ইত্যাদি। (২) নাকের অ্যালার্জি : ধূমপান করলে বা ধূমপায়ীর আশপাশে থাকলে। (৩) নাকের ভেতর **পলিপ** (polyp) অর্থাৎ মাংসপিণ্ড সৃষ্টি হলে। (৪) নাকের হাড় বাঁকা থাকলে। দাঁতের ইনফেকশন থেকে। (৫) সাধারণ সর্দি-কাশির কারণে সাইনাসের নালিপথ বন্ধ হয়ে গেলে। (৬) অ্যালার্জিক **হে ফিভার** (hay fever), **সিস্টিক ফাইব্রোসিস** (cystic fibrosis) থাকলে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে। (৭) এছাড়া অপুষ্টি, রোগ সংক্রমণ ক্ষমতা কমে গেলে, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ এবং পরিবেশ দূষণের কারণেও হতে পারে। (৮) যারা হাঁপানি সমস্যায় ভোগে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সাইনুসাইটিস দেখা যায়। (৯) সাধারণত ঘরের পোকামাকড়, ধুলাবালি, পেস্ট, তেলাপোকাজনিত বায়ুবিদূষণ যেসব অ্যালার্জেন ধারণ করে তাদের প্রভাবে এ রোগের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। (১০) ইউস্টেশিয়ান নালির (eustachian tube) সামান্য অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে এবং সংক্রমণের ফলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।

সাইনুসাইটিসের লক্ষণ (Symptoms of sinusitis)

(১) প্রধান লক্ষণ হলো মাথাব্যথা। কারও ক্ষেত্রে পুরো মাথায় ব্যথা অথবা শুধু কপালে ব্যথা। মাথা হেলান বা নিচু করা যায় না, করলে তীব্র টনটন ব্যথা করে। সঙ্গে জ্বর থাকতে পারে। [কারও কারও মাথায় হাত দেওয়া যায় না, ব্যথা করে। চুল ধরলে কষ্ট অনুভব করে, মাথায় চিরুনি পর্যন্ত ব্যবহার করা খুব কষ্টকর হয়। সকাল বেলা যন্ত্রণা খুব বেশি থাকে। দিনের রৌদ্র বাড়তে থাকলে ব্যথা কিছুটা কম হয়।] (২) চোখের পেছনের দিকে ব্যথা। (৩) নাক বন্ধ হয়ে থাকা এবং নাক দিয়ে মাঝে মাঝে পানি ঝড়া। নিঃশ্বাসের সময় দুর্গন্ধ আসা বা ঘ্রাণশক্তিহীনতা, কাশি। (৪) খাবারের স্বাদ রুচি নষ্ট হয়ে যায়। (৫) দাঁতে ব্যথা, গলাভাঙা। (৬) ক্লান্তি, অবসন্নতার সাথে জ্বরও থাকতে পারে। মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয়। (৭) Para-nasal sinus X-ray (**PNS X-ray**) করলে সাইনাসগুলো খোলা দেখা যাবে (তরল বা পুঁজ জমে থাকার কারণে)। (৮) নাক থেকে ঘন তরল বের হতে থাকে। এটি সাধারণত হলদে বা সবুজ বর্ণের হয় এবং তাতে পুঁজ বা রক্ত থাকতে পারে।

সাইনুসাইটিসের কারণে জটিলতা (Complication due to sinusitis)

দীর্ঘদিন প্রদাহ থাকলে তা অন্যান্য অংশেরও ক্ষতি করতে পারে। বিশেষ করে চোখ ও মস্তিষ্ক বেশি আক্রান্ত হয়। খিঁচুনি (convulsion), চোখের অন্ধত্ব, মেনিনজাইটিস (মস্তিষ্কের পর্দা মেনিনজেসের প্রদাহ) এবং মস্তিষ্কে ক্ষত সৃষ্টি (brain abscess); এমনকি মস্তিষ্কে ফোঁড়াও (brain abceus) হতে পারে।

সাইনুসাইটিসের প্রতিকার (Treatment of sinusitis)

(১) লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক, কান, গলারোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। (২) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ, যেমন প্রদাহনাশক অ্যান্টিবায়োটিক, ব্যথানাশক **অ্যানালজেসিক** (analgesic); নাকের ড্রপ, সর্দির জন্য **অ্যান্টিহিস্টামিন**, জ্বরের জন্য **প্যারাসিটামল** সেবন করতে হবে। (৩) এছাড়া বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে গরম পানিতে একখণ্ড কাপড় ভিজিয়ে মুখমণ্ডল, নাকের গোড়া এবং কপালে চেপে ধরা। (৪) প্রশ্বাসের সময় বাষ্প গ্রহণ (steam inhalation)। (৫) গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগানো যাবে না।

2020/8/14 17:37

Scanned with CamScanner

শরীর গরম থাকাকালীন ফ্রিজের ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া ঠিক নয়। (৬) নাসাপথ খোলা রাখার জন্য স্প্রে ব্যবহার। (৭) নাসাপথে পানি সঞ্চালন করা। (৮) প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা। (৯) ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা। (১০) এটি জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী হলে সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে। (১১) সাইনাসসমূহ পরিষ্কার করতে হবে। এমনকি নাক সম্পর্কিত এবং সাইনাসের বিভিন্ন অপারেশনের ক্ষেত্রে এন্ডোস্কোপি করা যেতে পারে।

সাইনুসাইটিসের প্রতিরোধ (Prevention of sinusitis)

(১) শাকসবজি, ফলমূল অর্থাৎ পুষ্টিকর ও প্রচুর ভিটামিনযুক্ত খাবার বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা। (২) যেকোনো ধরনের এলার্জির প্রভাব এড়িয়ে চলা। (৩) দাঁত নিয়মিত পরিষ্কার রাখা। (৪) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান বর্জন করা। (৫) অতিরিক্ত পরিশ্রম পরিহার করা এবং ঠাণ্ডা, ধুলাবালি, বায়ুদূষণ পরিবেশে কাজ থেকে বিরত থাকা। (৬) নিয়মিত গোসল করা, ঘামমুক্ত পোশাক পরিধান করা। (vii) অতিরিক্ত ঠাণ্ডাজাতীয় খাবার পরিহার করা।

ওটিটিস মিডিয়া (Otitis Media)

কানের ভেতরে বা বাইরে যেকোনো অংশে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে **ওটিটিস** (chronic sinusitis) বলে। মধ্যকর্ণের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে **ওটিটিস মিডিয়া** (otitis media) বা মধ্যকর্ণের সংক্রমণও বলে। কানের পর্দা ও অন্তঃকর্ণের মাঝে বিদ্যমান **ইউস্টেশিয়ান নালিতে** (eustachian tube) ওটিটিস মিডিয়া হয়। বয়স্কদের তুলনায় কম বয়সী শিশু ও কিশোরদের মধ্যে মধ্যকর্ণের প্রদাহ বা ওটিটিস মিডিয়া রোগ অধিক দেখা যায়। ওটিটিস মিডিয়াও উর্ধ্ব শ্বাসনালির সংক্রমণ বা ইনফেকশন। এ রোগ দ্বারা দীর্ঘদিনের সংক্রমণে কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে, এমনকি সাময়িক বা দীর্ঘস্থায়ী কানে না শোনা।



চিত্র ৫.১০ : ক. স্বাভাবিক মধ্যকর্ণ ও খ. ওটিটিস মিডিয়া

ওটিটিস মিডিয়ার প্রকারভেদ (Types of otitis media) : স্থায়িত্বকালের উপর ভিত্তি করে ওটিটিস মিডিয়া ২ প্রকার। যথা–

রোগের নাম	স্থায়িত্বকাল	প্রদাহের ধরন
১। স্বল্পস্থায়ী বা একিউট ওটিটিস মিডিয়া (acute otitis media-AOM)। একে **তীব্র কর্ণপ্রদাহ** বলা হয়।	২ থেকে ৪ সপ্তাহের বেশি।	মধ্যকর্ণ পুঁজে ভরে যায় ও প্রচণ্ড ব্যথা হয়।
২। দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রোনিক ওটিটিস মিডিয়া (chronic otitis media-COM)। একে **তরল জমাট কর্ণপ্রদাহ** (otitis media with effusion) বলা হয়।	১ মাস বা তার বেশি।	মধ্যকর্ণে তরল ঘন আঠার মতো হয় ও শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটে।

রোগের কারণ (Causes of disease)

(১) উর্ধ্ব শ্বাসনালির ইনফেকশন। (২) দীর্ঘস্থায়ী টনসিলের ইনফেকশন। (৩) মধ্যকর্ণের সঙ্গে নাকের সংযোগস্থল (ইউস্টেশিয়ান নালি) ফুলে গিয়ে বন্ধ হলে। (৪) শিশুদের ক্ষেত্রে **অ্যাডিনয়েড** (adenoid) ফুলে ওঠা। (৫) শিশুদের ঠাণ্ডা লাগলে এবং কানে সংক্রমণ হলে। (৬) ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাক দ্বারা সংক্রমণ। ভাইরাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– Respiratory syncytial virus (RSV), Mamps virus, Influenza virus; ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে *Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa* ইত্যাদি এবং ছত্রাকের মধ্যে *Candida* উল্লেখযোগ্য। (৭) অপুষ্টি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেও মধ্যকর্ণের প্রদাহ হতে পারে।

শিশুদের বা বাচ্চাদের ওটিটিস মিডিয়া হওয়া প্রবণতা বেশি। কারণ–

(১) শিশুদের ইউস্টেশিয়ান টিউব ছোট। (২) শিশুদের মধ্যকর্ণ, ইউস্টেশিয়ান টিউব এবং নাসাগলবিল (nasopharynx) প্রায় একই লেভেলে অবস্থিত। যার ফলে শিশুদের বিছানায় শুইয়ে দুধ খাওয়ালে ওটিটিস মিডিয়া হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। (৩) যেসব শিশু ধূমপানযুক্ত ও বায়ুদূষণপূর্ণ এলাকায় বাস করে। (৪) ডে-কেয়ার সেন্টারগুলোর মতো জায়গায় যেখানে একসঙ্গে অনেক শিশু বেড়ে ওঠে। (৫) পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের কানে সংক্রমণ হলে শিশুদেরও কানের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

Scanned with CamScanner

রোগের লক্ষণ (Symptoms of the diseases)

(১) কানে তীব্র ব্যথা; শিশুরা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কান্না করে। (২) শরীরে অত্যধিক জ্বর (high grade fever) থাকা। (৩) কানে অস্বস্তি ভাব; কান বন্ধ লাগা ও কানে কম শোনা। (৪) কান দিয়ে পুঁজ পড়া অথবা পানি পড়া। (৫) মনোযোগ কমে যাওয়া, মাথা ঝিমঝিম করা। (৬) মধ্যকর্ণে জলীয় পদার্থ জমার জন্য মাথা ঘুরানি হতে পারে। (৭) ভাইরাসঘটিত ওটিটিসের ফলে টিম্পেনিক পর্দার বাইরের পাশে ফোসকা সৃষ্টি হয়। একে **বুলাস মাইরিঙ্গিটিস** (bullous myringitis) বলে। (৮) কান চুলকান ও জোরে কান টানা এবং ঘুমে ব্যাঘাত। (৯) প্রচণ্ড মাথাব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, কাশি ও নাক দিয়ে পানি ঝরা। (১০) কান ভোঁ ভোঁ করা বা গুণ গুণ ধ্বনি শোনা। (১১) কানের পর্দা ফেটে গেলে পিনা গড়িয়ে তরল পদার্থ নির্গমন। (১২) দেহের ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা এবং শ্রবণ সমস্যা।

ওটিটিস মিডিয়ার কারণে জটিলতা (Complication due to otitis media)

সাধারণত কানের সংক্রমণজনিত জটিলতা কম পরিলক্ষিত হয়। তবে সংক্রমণের মাত্রা বেড়ে গেলে প্রধান দুধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। যথা- (১) **ম্যাস্টোডাইটিস** (Mastoiditis) : রকানের নিচে বিদ্যমান ম্যাস্টয়ড অস্থির সংক্রমণ এবং (২) **মেনিনজাইটিস** (Meningitis) : মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের পর্দা মেনিনজেসের প্রদাহ।

ওটিটিস মিডিয়ার প্রতিকার (Treatment of otitis media)

(১) প্রাথমিক অবস্থায় কান পরিষ্কার রাখা। কানে তুলাজাতীয় পদার্থ দিয়ে বন্ধ করে গোসল করা। শিশুদের কোলে নিয়ে দুধ খাওয়ানো। (২) যদি লক্ষণগুলো একদিনের বেশি থাকে অথবা কান দিয়ে পুঁজ পড়া বন্ধ না হয় তাহলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। (৩) তারপর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইনফেকশনের জন্য **অ্যান্টিবায়োটিক** (antibiotic), ব্যথানাশক ওষুধ **অ্যানালজেসিক** (analgesic) এবং জ্বরের উপদ্রব কমানোর জন্য **প্যারাসিটামল** (paracetamol) সেবন; কানে ড্রপ দেওয়া এবং কানের অপারেশন করা। (৪) উর্ধ্ব শ্বসননালির ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। (৫) টনসিল ও এডিনয়েড ফুলে গেলে তা অপারেশন করে ফেলে দিতে হবে। (৬) অ্যালার্জি থাকলে **অ্যান্টি-হিস্টামিন** (anti-histamine) খেতে হবে। (৭) চিকিৎসকরা এ রোগে ঘনঘন আক্রান্ত রোগীদের **টিমপেনোস্টোমি টিউব** (tympanostomy tube) দ্বারা চিকিৎসা করে থাকেন।

ওটিটিস মিডিয়ার প্রতিরোধ (Prevention of otitis media)

(১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে হবে। (২) শিশুদের বিছানায় শুইয়ে দুধ খাওয়ানো যাবে না। (৩) শিশুদের ধোঁয়ামুক্ত পরিবেশে রাখতে হবে। (৪) নিজের বাচ্চাকে অসুস্থ বাচ্চাদের থেকে দূরে রাখতে হবে। (৫) বাচ্চাকে ছয় মাস পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। (৬) বাচ্চাকে নিয়মিত নিউমোনিয়া ও মেনিনজাইটিসের টিকা দিতে হবে। (৭) কোনো অবস্থাতেই কানে যেন পানি না ঢোকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

❑ **কাজ :** (i) সাইনাসের গহ্বরগুলোর নাম, অবস্থান ও প্রদাহ সম্পর্কে লেখ। (ii) সাইনুসাইটিস থেকে কীভাবে মুক্ত থাকা যায়– ব্যাখ্যা কর। (iii) শ্বাসনালিতে সংক্রমণ হলে যে সমস্যা দেখা যায় তা প্রতিকারের উপায় বর্ণনা কর। (iv) সাইনুসাইটিস রোগের জটিলতাসমূহ ব্যাখ্যা কর।

৫.৬ একজন অধূমপায়ী ও একজন ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা (Comparison Between the X-ray Film of Smoker and Nonsmoker)

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য, বিশেষ করে ফুসফুসের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ধূমপানের কারণে প্রতি বছর পৃথিবীতে লাখ লাখ মানুষের অকালমৃত্যু ঘটে। একটি সিগারেটের শলায় প্রায় ৪ হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ থাকে। ধূমপানের ফলে এগুলো দেহের ভেতরে, বিশেষ করে ফুসফুসে প্রবেশ করে দেহকে অসুস্থ করা শুরু করে। সিগারেটের ধোঁয়ায় যেসব ক্ষতিকর উপাদান থাকে তাদের মধ্যে নিকোটিন, টার, কার্বন মনোক্সাইড (CO), আর্সেনিক, অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ইত্যাদি প্রধান। একজন অধূমপায়ী ও একজন ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে (X-ray) চিত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়।

১। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে একটি সামঞ্জস্য ফুসফুস ক্ষেত্র দেখা যায় অর্থাৎ আকৃতিগতভাবে ফুসফুস স্বাভাবিক থাকে। আর একজন ধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে একটি অসামঞ্জস্য ফুসফুস ক্ষেত্র দেখা যায়। অর্থাৎ সার্বিকভাবে ফুসফুসের আকার বৃদ্ধি পায়।

২। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রের কালো দাগ ও সাদা দাগের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদ দেখা যায়। কিন্তু ধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রের ক্ষেত্রে কালো দাগগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়।

2020/8/4 17:38

Scanned with CamScanner

৩। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে ফুসফুস ও অ্যালভিওলাইয়ের প্রাচীরের ক্ষয় লক্ষণীয় নয়; কিন্তু ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে ক্ষয় লক্ষণীয়।

৪। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায়। অন্যদিকে ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায় না।

৫। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে অ্যালভিওলাস প্রাচীরের সিলিয়াগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। কিন্তু ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অ্যালভিওলাস প্রাচীরের সিলিয়াগুলো বিনষ্ট অবস্থায় দেখা যায়।

৬। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে **মধ্যকা** স্বাভাবিক দেখা যায়; কিন্তু ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে **মধ্যকা** বিস্তৃত থাকে।

৭। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে এমফাইসেমার চিহ্ন দেখা যায় না। অপরপক্ষে ধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে এমফাইসেমার চিহ্ন দেখা যায়। সিগারেটের ধোঁয়ায় অ্যালভিওলাসের আয়তন বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যালভিওলাস ফেটে গিয়ে ফুসফুসে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে, একে **এমফাইসেমা** (emphysema) বলে।

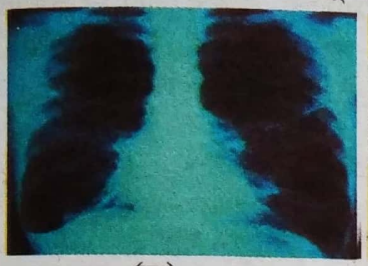

(ক)



(খ)

চিত্র ৫.১১ক : (ক) একজন অধূমপায়ী ও (খ) একজন ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্র



(গ) (ঘ)

চিত্র ৫.১১খ : (গ) স্বাভাবিক এবং (ঘ) এমফাইসেমা রোগীর ফুসফুস

৮। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের প্রচ্ছায়া সমানুপাতিক ও স্বাভাবিক দেখা যায়; কিন্তু ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের প্রচ্ছায়া ফুসফুসের তুলনায় ছোট দেখা যায়।

৯। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষের চিহ্ন দেখা যায় না। অন্যদিকে ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এরূপ চিত্র দেখা যায়।

১০। ধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমার উপবৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায়। অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।

১১। ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে TB রোগীর বুকের X-ray তে ফাঁকা জায়গা দেখা যায়, যা অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

অধূমপায়ী ও ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা

তুলনীয় বিষয়	অধূমপায়ীর ফুসফুসের এক্স-রে চিত্র	ধূমপায়ীর ফুসফুসের এক্স-রে চিত্র
১। আকার	আকৃতিগতভাবে ফুসফুস স্বাভাবিক দেখা যায়।	সার্বিকভাবে ফুসফুসের আকার বড় দেখায়।
২। মধ্যকা	স্বাভাবিক দেখা যায়।	বিস্তৃত থাকে।
৩। সাদা-কালো দাগ	সাদা ও কালো দাগের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদন দেখা যায়। এটি সাধারণত কালো দেখায়।	কালো দাগগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ কোথাও কোথাও সাদাটে বা সাদা দেখায়।
৪। ফুসফুস ও অ্যালভিওলাসের প্রাচীর	প্রাচীরের ক্ষয় লক্ষণীয় নয়।	প্রাচীরের ক্ষয় লক্ষণীয়।
৫। এমফাইসেমা	এমফাইসেমার চিহ্ন দেখা যায় না।	চিহ্ন দেখা যায়।
৬। ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের প্রচ্ছায়া	সমানুপাতিক ও স্বাভাবিক দেখা যায়।	হৃৎপিণ্ডের প্রচ্ছায়া ফুসফুসের তুলনায় ছোট দেখা যায়।
৭। টিউমার	টিউমার উপবৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায় না।	দেখা যায়।
৮। স্বচ্ছতা	অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায়।	অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায় না।
৯। ক্যান্সার	ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষের চিহ্ন দেখা যায় না।	চিহ্ন দেখা যায়।
১০। পানি জমা	ফুসফুসে কোনো পানি জমা শনাক্ত করা যাবে না।	ফুসফুসে পানি জমা শনাক্ত করা যাবে।

❑ **কাজ :** **"ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" শিরোনামে ধূমপানে সৃষ্ট জটিলতাসমূহ চিহ্নিত করে বিশ্ব ধূমপানমুক্ত দিবস ও বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস (৩১ মে) উপলক্ষে সহপাঠীদের নিয়ে জনসচেতনতামূলক একটি তথ্যবহুল পোস্টার তৈরি করে কলেজ বোর্ডে স্থাপন কর।**

(এক্ষেত্রে নিম্নের তথ্যগুলো সহযোগিতা করবে)

2020/8/4 17:38

Scanned with CamScanner

ধূমপান মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

WHO (World Health Organization)-এর মতে বিংশ শতাব্দীতে সারাবিশ্বে প্রায় ১০ কোটি লোক তামাক ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটেছে। বর্তমান বিশ্বে আনুমানিক ১২৫ কোটি লোক ধূমপায়ী। ধূমপানে কোনো উপকারিতা নেই অথচ বিশ্বে প্রতিদিন এর পেছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে যা দিয়ে বহু বুভুক্ষু মানুষের অন্নসংস্থান হতো। ধূমপান পরিবেশেরও দূষণ ঘটায় এবং অধূমপায়ীদের শ্বাস গ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এটি মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বায়ুদূষণ ও শ্বসন জটিলতা

যখন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় কিংবা মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেষ্টক বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসের ঘনীভবন ও কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ স্বাভাবিক বা সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেড়ে যায়, তখন এ অবস্থাকে বায়ুদূষণ বলে। প্রধানত জ্বালানি পোড়ানোর উৎস থেকে (পরিবহন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কলকারখানা, তাপযন্ত্র প্রভৃতি) এবং কিছুটা কীটনাশক ব্যবহার, কৃষিকর্মের ফলে ধুলা বৃষ্টি, ক্ষেতে শস্য উদ্ভিদের অংশ পোড়ানোর, কুয়াশা ও ধোঁয়াশা, সজীব কণা (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাকের রেণু, পরাগরেণু), ধূমপানে সৃষ্ট ধোঁয়া, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও রঞ্জনরশ্মি, সৌর অবলোহিত (ইনফ্রারেড) রশ্মি থেকে বায়ু দূষকের উৎপত্তি হয়।

বায়ুদূষণের ফলে সংঘটিতব্য শ্বসন জটিলতাজনিত কিছু রোগ।

১। **সর্দি-কাশি :** বায়ুতে অস্বাভাবিক ধুলাবালি থাকলে সর্দি-কাশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২। **নিউমোনিয়া :** বায়ুর মাধ্যমে নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ায় (*Diplococcus pneumoniae*) আক্রান্ত হলে নিউমোনিয়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, জ্বর নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণ।

৩। **যক্ষ্মা :** বায়ু দূষিত হলে যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। টিউবারকিউলা ব্যাকটেরিয়ায় (*Mycobacterium tuberculosis*) আক্রান্ত হলে যক্ষ্মা হয়। এ মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে শিশুদের বি.সি.জি টিকা অবশ্যই দিতে হবে।

৪। **অ্যাজমা :** এ রোগ কোনো জীবাণু আক্রান্ত রোগ নয়। ধুলাবালি অথবা কোনো নির্দিষ্ট খাবার গ্রহণে এ রোগ হতে দেখা যায়। এ রোগের লক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট। শ্বাসনালির গাত্র সংকুচিত হওয়ার ফলে বায়ু-কোষগুলো প্রয়োজনমতো অক্সিজেন না পেয়ে দারুণ শ্বাসকষ্ট অনুভব করে।

৫। **প্লুরোসি :** প্রতিটি ফুসফুস প্লুরা নামক ঝিল্লিতে আবৃত থাকে। এ ঝিল্লি আক্রান্ত হয়ে স্ফীত হয় এবং প্লুরার গহ্বরে লসিকা জমে। ফলে অত্যধিক ব্যথায় শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটে। ফুসফুসের চারদিকে এ তরল পুঁজ ফুসফুসের নড়াচড়া সীমিত করে দেয়। প্লুরোসিসে জ্বর হয়। পেনিসিলিন ওষুধ প্রয়োগে এর উপশম হয়।

৬। **ব্রঙ্কাইটিস :** শ্বাসনালির ভেতরে আবৃত ঝিল্লির প্রদাহের কারণে ব্রঙ্কাইটিস রোগ হয়। জ্বর, খুসখুসে কাশি ও শ্বাসকষ্ট এ রোগের লক্ষণ। স্যাঁতসেঁতে ধূলিকণা মিশ্রিত আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগলে মানুষ ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়।

ধূমপানজনিত শ্বসন জটিলতা

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য, বিশেষ করে ফুসফুসের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ধূমপানে সৃষ্ট ধোঁয়াতে প্রায় ৫০০ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। ধূমপানে যেসব ক্ষতিকর উপাদান থাকে তার মধ্যে **নিকোটিন, টার** (tar) এবং **CO** প্রধান। নিকোটিন উত্তেজক, বিষাক্ত ও নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু। ধূমপানের কয়েকটি ক্ষতিকর দিক নিম্নরূপ–

১। ধূমপানের ধোঁয়ায় অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে যে ক্ষতি হয় তার ফলে অ্যালভিওলাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থান ফেটে গিয়ে ফুসফুসে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে। এ অবস্থাকে **এমফাইসেমা** (emphysema) বলে। এ রোগে ফুসফুসের শ্বসন অঞ্চল হ্রাস পায় এবং ফুসফুসের কোষের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। এতে শ্বাস-প্রশ্বাসে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়।

২। সিগারেটের ধোঁয়ায় বিদ্যমান বিষাক্ত নিকোটিন ও টার ফুসফুসে **ক্যান্সার** সৃষ্টি করে। ৯০% ফুসফুসীয় ক্যান্সার ধূমপানের কারণে হয় বলে মনে করা হয়। যাদের গ্যাস্ট্রিক আলসার রয়েছে তারা ধূমপান করলে এ রোগ আরও বেড়ে যায়। এছাড়াও ধোঁয়ার CO শ্বাসনালিতে **ব্রঙ্কাইটিস** (bronchities) সৃষ্টি করে। ব্রঙ্কাইটিস হলে ট্রাকিয়া ও ব্রঙ্কাসের সিলিয়া অবশ হয়ে পড়ে। সাধারণত সিলিয়া অনবরত দুলতে থাকে। এতে ট্রাকিয়া বা ফুসফুস, ধুলাবালি, রোগজীবাণুমুক্ত থাকতে সহায়ক হয়; কিন্তু সিলিয়া অবশ হয়ে গেলে ট্রাকিয়ায় মিউকাস জমে প্রদাহের সৃষ্টি করে।

৩। CO রক্তের O_2 পরিবহনের ক্ষমতা কমায় এবং ধমনির ভেতরে কোলেস্টেরল জমতে সাহায্য করে। ফলে ধমনি গহ্বর সংকীর্ণ হয়ে বা বন্ধ হয়ে O_2 সরবরাহ কমিয়ে দেয়। এতে **হার্ট অ্যাটাক** (heart attack) এবং উচ্চ রক্তচাপসহ **স্ট্রোক** (stroke) করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

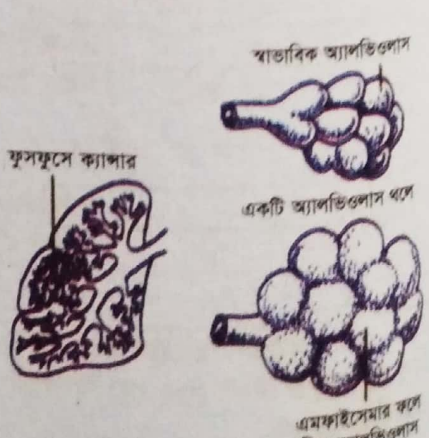

চিত্র ৫.১২ : ধূমপানজনিত শ্বসন জটিলতা

2020/8/4 17:3
Scanned with CamScanner

৪। ধূমপায়ী নারীদের বন্ধ্যা হওয়ার এবং সন্তান বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
৫। নিয়মিত ধূমপান গলবিল ও অন্ননালিতে **ক্যান্সার** সৃষ্টি করে। মুখ, গলা ও খাদ্যনালিতে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি ধূমপায়ীর জন্য অধূমপায়ীর চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি।
৬। ধূমপান পরিবেশ দূষণ ঘটায়, ফলে সিগারেটের ধোঁয়ায় একই কক্ষে অবস্থানরত অধূমপায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধূমপান ছাড়ার কয়েকটি উপায় (Some way of leave from smoking)

অনেক মানুষ আছে যারা ধূমপান ছাড়তে চাইলেও শেষমেশ ব্যর্থ হয়। এর প্রধান কারণ হলো মানসিক দৃঢ়তার অভাব। চেষ্টা করেও যখন ধূমপান ছাড়া সম্ভব হয় না, তখন মানসিক যন্ত্রণায় হতাশ হয়ে পড়ে অনেকে। চেষ্টা করেও যারা ধূমপান ছাড়তে পারে না তাদের জন্য কয়েকটি উপায় বের করেছেন বিশেষজ্ঞরা। মানসিক দৃঢ়তা ও নিচের পন্থাগুলো অনুসরণ করলে হয়তো ধূমপান ত্যাগ করাটা খুব সহজ হয়ে যাবে ধূমপায়ীদের জন্য।

১। **পরিবার ও বন্ধুদের সমর্থন :** ধূমপান থেকে মুক্তি পেতে পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে উৎসাহ ও সমর্থন প্রয়োজন। এর ফলে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

২। **ধূমপান সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা :** আশপাশে থাকা ধূমপান সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র যেমন– লাইটার, ছাইদানি, সিগারেটের পুরনো প্যাকেট প্রভৃতি সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩। **গভীর শ্বাস :** মনকে শান্ত ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থেকে বের করে আনতে গভীরভাবে শ্বাস নেওয়া বা মেডিটেশন করা শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

৪। **প্রচুর পানি পান :** প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান শরীরের নিকোটিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বের করে দেয়।

৫। **ব্যায়াম :** নিয়মিত ব্যায়াম পারে, ধূমপান ছাড়ার ফলে যেসব প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় তার বিরুদ্ধে লড়তে।

৬। **ইতিবাচক মনোভাব :** আত্মনিয়ন্ত্রণ করা লিখতে হবে। প্রতিদিন নিজের দৃঢ় প্রত্যয় সম্পর্কে মনে করতে হবে

❑ **কাজ :** (i) ধূমপানের পরোক্ষক্ষতি অনেক বেশি– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। (ii) ধূমপানের ফলে ফুসফুসের গঠনে কিছু ভিন্নতা দেখা যায়– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। (iii) ধূমপান মানুষের জীবনে কী ধরনের জটিলতা ও পরিণতি ডেকে আনতে পারে বলে তুমি মনে কর।

৫.৭ কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া (Process of Artificial Breathing)

পানিতে ডোবা, ইলেকট্রিক শক খাওয়া, কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়া, ভূমিকম্প, দেহে প্রচণ্ড আঘাত প্রভৃতি সংকটময় মুহূর্তে জীবন রক্ষার প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আর এজন্য CPR বা **কার্ডিওপালমোনারি রিসাসসিটেশন** (Cardiopulmonary Resuscitation) বা হৃৎ-ফুসফুসের পুনঃজাগরণ চিকিৎসা পদ্ধতি সহজতর। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় বা প্রাকৃতিক কারণে কোনো ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এ পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। যে ব্যক্তি CPR দেবেন তাকে **উদ্ধারকর্মী** বা **রেসকিওর** (rescur) বলা হয়। এ পদ্ধতির সহায়তাকারী বা রেসকিওর হিসেবে বিভিন্ন লোককে (যেমন– ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, সমাজকর্মী, পুলিশ, দমকল বাহিনী, সেনাসদস্য ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য

১। যখন কোনো ব্যক্তির নিজ চেষ্টায় শ্বাস গ্রহণে সক্ষম হয় না কিংবা শ্বাস গ্রহণে তাকে সাহায্য করার প্রয়োজন হয় তখন কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনের ব্যবস্থা করা হয়।

২। ফুসফুস ও রক্তসংবহনে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে শ্বাসকেন্দ্র ও হৃৎপিণ্ডের প্রাণশক্তি বজায় রাখা।

৩। ফুসফুসকে পর্যায়ক্রমে বায়ু স্ফীত ও সংকুচিত করে শ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করা, যাতে সে তার নিজস্ব স্বাভাবিক সক্রিয়তা ফিরে পেতে পারে।

৪। এই পদ্ধতি প্রয়োগে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে অক্সিজেন পৌঁছানোর মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে সক্রিয় করা।

৫। তাৎক্ষণিকভাবে রক্তে অক্সিজেন পৌঁছানোর মাধ্যমে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হতে না দেওয়া।

অতএব, কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া এমন হওয়া উচিত যাতে– (i) ফুসফুসে বায়ুচলন পর্যাপ্ত হয়; (ii) শ্বাসনালি যথাসম্ভব উন্মুক্ত থাকে ও (iii) ফুসফুসে বায়ুচলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন

১। **মুখ থেকে মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস :** রোগীর নাক বন্ধ করে তার মুখকে নিজের মুখের ভেতর দিয়ে জোরে জোরে নিজের শ্বাস রোগীর ফুসফুসে প্রবেশ করানো।

২। **মুখ থেকে নাকে শ্বাস-প্রশ্বাস :** রোগীর মুখ বন্ধ করে ধরে তার নাক নিজের মুখের ভেতর নিয়ে জোরে জোরে নিজের শ্বাস রোগীর ফুসফুসে প্রবেশ করানো।

2020/8/4 17:39

Scanned with CamScanner

৩। **মুখ থেকে মাস্ক শ্বাস-প্রশ্বাস :** রোগীর নাক বা মুখের উপরে এক টুকরো কাপড় রেখে কাপড়ের উপর দিয়ে জোরে জোরে নিজের শ্বাস রোগীর ফুসফুসে প্রবেশ করানো।

৪। **মুখ থেকে কৃত্রিম শ্বাসনালিতে (স্টোমা) শ্বাস-প্রশ্বাস :** রোগীর কৃত্রিম শ্বাসনল লাগানো থাকা অবস্থায় তার সাহায্যে মুখ দিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখা।

৫। **ভেন্টিলেটর ব্যবহার :** এসকল পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ সম্ভব না হলে সহজে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা **ভেন্টিলেটর** (mechanical ventilator) ব্যবহার করা যায়।

মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস (Artificial Respiration by Mouth to Mouth)

হস্তকৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এই পদ্ধতি উৎকৃষ্ট কারণ। এ পদ্ধতিতে সর্বক্ষেত্রে ফুসফুসীয় বায়ুচলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিশু ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পদ্ধতি নিম্নরূপ–

শিশুদের ক্ষেত্রে

১। প্রথমে শিশুকে শক্ত সমতল জায়গায় শোয়াতে হবে।

২। এরপর মুখ ও গলা ভালো করে লক্ষ করতে হবে যেন এর মধ্যে কোনো বস্তু আছে কি-না এবং বায়ু চলাচলের রাস্তা পরিষ্কার কি-না। যদি কোনো বস্তু থাকে তাহলে তা আঙুলের সাহায্যে উঠিয়ে ফেলতে হবে এবং যদি বমি হয় সেটা দুই আঙুলের সাহায্যে পরিষ্কার করতে হবে।

৩। বায়ু চলাচলের রাস্তা ঠিক রাখতে মাথা পেছনে হালকা হেলিয়ে নিতে হবে।

৪। নিজের মুখ শক্তভাবে শিশুর নাক এবং মুখ চেপে ধরতে হবে। দ্রুত দুইবার অল্প অল্প বাতাস শিশুর ফুসফুসে প্রেরণ করা এবং লক্ষ রাখা বুক উপরের দিকে ফুলে উঠছে কি-না; জোরে ফুঁ না দেওয়া কারণ এতে করে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৫। মুখ উঠিয়ে নেওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়েছে কি-না লক্ষ রাখা। শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ খেয়াল রাখা। যদি শিশু ঠিকমতো শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে ব্যর্থ হয় তাহলে এ প্রক্রিয়াটি আবার শুরু করা। যতক্ষণ পর্যন্ত না রোগী নিজ থেকে শ্বাস নিতে পারছে প্রতি মিনিটে ২০ বার ফুঁ দেওয়া যেতে পারে। এ প্রক্রিয়া ঘণ্টাকাল স্থায়ী হতে পারে।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে

১। রোগীকে প্রথমে চিৎ করে শোয়ানো হয় এবং রোগীর গ্রীবা ও বক্ষের কাপড় ঢিলা করে দিতে হয়।

২। এর পর নিচের চোয়ালকে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর দ্বারা চেপে ধরে অন্য বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর সাহায্যে রোগীর নাসারন্ধ্র চেপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেন মুখের বাতাস নাক দিয়ে বের না হয়ে যায়।

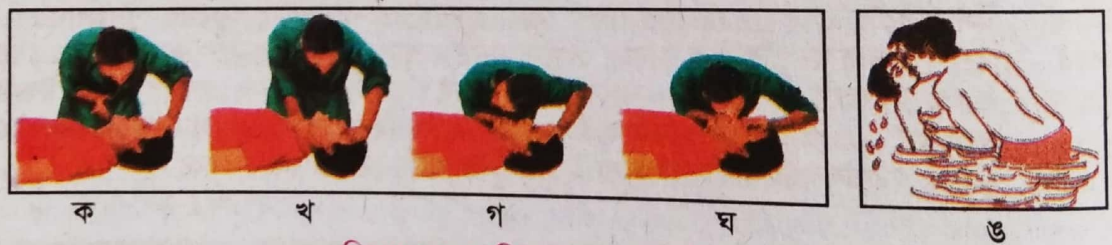

ক খ গ ঘ ঙ

চিত্র ৫.১৩ : কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া (মুখ হতে মুখের সাহায্যে)

৩। এরপর রোগীর মুখে মুখ লাগিয়ে স্বাভাবিক প্রবাহী বায়ুর দ্বিগুণ পরিমাণ বায়ুকে জোর করে তার ফুসফুসে প্রবেশ করানো হয়। ফলে ফুসফুস ও বক্ষ প্রসারিত হয়।

৪। এর পরই মুখ সরিয়ে নিয়ে পুনরায় একইভাবে জোর করে রোগীর দেহে বায়ু প্রবেশ করানো হয়। মিনিটে ১৪-২৮ বার এই প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা দরকার। রোগীর পাল্‌স কিংবা হার্টবিট না আসা পর্যন্ত এ প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে হবে।

৫। এ প্রক্রিয়া চালানোর ফলে যদি দেখা যায় রোগীর বুক নিজ থেকেই উঠানামা করছে তখন তা বন্ধ করে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তা না হলে যতক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসক, অক্সিজেন নল, অক্সিজেন ব্যাগ, সিলিন্ডার ও অ্যাম্বুলেন্স না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে **সিপিআর** (CPR) চালিয়ে যেতে হবে।

বিশেষ মুখ-মুখে শ্বাস প্রশ্বাস

শিশু-কিশোর-যুবক বয়সি লোক অনেক সময় পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণ করে। যেকোনো কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি ডুবে যায় তাহলে উদ্ধারকারী ব্যক্তি ডুবন্ত ব্যক্তিকে কূলের কাছে টেনে এনে একটু দাঁড়ানোর জায়গা পেলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে মুখে শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে হবে (চিত্র ৫.১২-ঘ)।

2020/8/4 17:39

Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

- **শ্বসনতন্ত্র :** দেহের যে অঙ্গগুলো শ্বসন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের সমষ্টিকে শ্বসনতন্ত্র বলে। অথবা, যে তন্ত্র দেহ ও প্রকৃতির মধ্যে শ্বসন গ্যাস বিনিময় প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সে তন্ত্রকে শ্বসনতন্ত্র বলে।
- **শ্বসন :** যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশ থেকে O_2 গ্রহণ করে কোষস্থ খাদ্যবস্তুকে জারিত করে খাদ্যের স্থিতিশক্তিকে তাপ ও গতিশক্তিতে রূপান্তরিত ও মুক্ত করে এবং উপজাত পদার্থ হিসেবে CO_2 ও পানি উৎপন্ন করে তাকে শ্বসন বলে।
- **ভেস্টিবিউল :** নাসারন্ধ্রের পরে নাকের ভেতরের অংশের নাম ভেস্টিবিউল। এর প্রাচীরে অনেক লোম থাকে। লোমগুলো ছাঁকনির মতো বাতাস পরিষ্কারে সহায়তা করে।
- **গ্লটিস :** মুখ গলবিল বা মুখবিবর ও স্বরযন্ত্রের সংযোগস্থলে একটি রন্ধ্র থাকে। একে গ্লটিস বলে।
- **এপিগ্লটিস :** গ্লটিসের মুখটি তরুণাস্থির তৈরি ঢাকনার বা জিহ্বার মতো গঠন দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। একে এপিগ্লটিস বলে। এটি খাদ্য গলাধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রের মুখ বন্ধ করে দেয়।
- **অ্যাডামস অ্যাপল :** গলবিলের নিচের অংশের ঠিক সামনের দিকে থাকে স্বরযন্ত্র। এটি টুকরো টুকরো কোমলাস্থি বা কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি। এগুলোর মধ্যে থাইরয়েড ক্যার্টিলেজ সবচেয়ে বড় এবং এটি গলার সামনে উঁচু হয়ে ওঠে। হাত দিলে এর অবস্থান বোঝা যায় এবং বাইরে থেকে দেখা যায়, যাকে অ্যাডামস অ্যাপল বা কণ্ঠমনি বলে।
- **কোয়ানি :** নাসা গহ্বরদ্বয় যে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগলবিলে উন্মুক্ত হয় তাকে কোয়ানি (choanae) বা পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রবলে।
- **হাইলাম :** প্রতিটি ফুসফুসের যে স্থান দিয়ে ব্রঙ্কাস, রক্তনালি ও লসিকানালি প্রবেশ করে তাকে হাইলাম (hilum) বলে।
- **শ্বসন বৃক্ষ :** প্রাইমারি ব্রঙ্কাস থেকে শুরু করে অ্যালভিওলাস পর্যন্ত ফুসফুসের গঠনচিত্র দেখতে অনেকটা বৃক্ষের মতো বলে একে শ্বসন বৃক্ষ বা ব্রঙ্কিয়াল বৃক্ষ বলে।
- **অ্যালভিওলাস :** অ্যালভিওলাস হলো ফুসফুসের মধ্যে অবস্থিত স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা আবৃত ও কৈশিক জালিকাসমৃদ্ধ অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির বুদবুদ সদৃশ বায়ুথলি বিশেষ। একে ফুসফুসের গঠনগত ও কার্যগত এককও বলা হয়।
- **প্লুরিসি :** প্রতিটি ফুসফুস প্লুরা নামক ঝিল্লিতে আবৃত থাকে। এ ঝিল্লি আক্রান্ত হয়ে স্ফীত হয় এবং প্লুরার গহ্বরে লসিকা জমে। ফলে অত্যধিক ব্যথায় শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটে। ফুসফুসের চারদিকে এ তরল পুঁজ ফুসফুসের নড়াচড়া সীমিত করে দেয়। একে প্লুরিসি বলে।
- **শ্বাসক্রিয়া :** যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ বায়ু ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে শ্বাসক্রিয়া বলে।
- **বহিঃশ্বসন :** শ্বসনের যে পর্যায়ে পরিবেশীয় বহিঃস্থ বাতাস বা গ্যাসের সাথে ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের বাতাস বা গ্যাসের বিনিময় ঘটে, তাকে বহিঃশ্বসন বলে। একে ফুসফুসীয় শ্বসনও বলা হয়। সংক্ষেপে, যে প্রক্রিয়ায় শ্বসন অঙ্গে শ্বসন গ্যাসের বিনিময় ঘটে তাকে বহিঃশ্বসন বলে।
- **প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ :** শ্বসনের যে প্রক্রিয়ায় মানুষ পরিবেশ থেকে O_2 যুক্ত বায়ু ফুসফুসে গ্রহণ করে তাকে প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ বলে।
- **নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ :** শ্বসনের যে প্রক্রিয়ায় মানুষ ফুসফুস থেকে CO_2 যুক্ত বায়ু বাইরে পরিবেশে ছেড়ে দেয়, তাকে নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ বলে।
- **অন্তঃশ্বসন :** কলাকোষ এবং রক্তজালকের রক্তের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময়কে (O_2 এবং CO_2) অন্তঃশ্বসন বলে। অথবা- শ্বসনের যে পর্যায়ে কোষে খাদ্যবস্তুর জারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং রক্ত দ্বারা শ্বসন গ্যাস পরিবাহিত হয় তাকে অন্তঃশ্বসন বলে।
- **স্বরযন্ত্র :** নাসাগলবিলের পেছনে অবস্থিত পেশি ও কোমলাস্থির সমন্বয়ে গঠিত যে গহ্বর শব্দ সৃষ্টি করে তাকে স্বরযন্ত্র বলা হয়।
- **ট্রাকিয়া :** স্বরযন্ত্রের পশ্চাতে অবস্থিত নলাকার যে নালি দ্বারা বাতাস পরিবাহিত হয় তাকে ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালি বলে।
- **শ্বাসকেন্দ্র :** মস্তিষ্কের পনস ও মেডুলাতে অবস্থিত বিশেষ ধরনের স্নায়ুগুচ্ছ দ্বারা গঠিত যে কেন্দ্র নানামুখী স্নায়ু উদ্দীপনার মাধ্যমে বিভিন্ন পেশির সমন্বিত সংকোচন-প্রসারণের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে তাকে শ্বাসকেন্দ্র বলে।
- **শ্বাসরঞ্জক :** মানুষের রক্তের লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থিত লৌহ ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত রঞ্জক পদার্থ, যা শ্বসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাকে শ্বাসরঞ্জক বলে। যেমন- হিমোগ্লোবিন। অক্সিজেন রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে। অথবা- রক্তের যে অংশ দ্বারা শ্বসন গ্যাস, বিশেষ করে অক্সিজেন পরিবাহিত হয় তাকে শ্বাসরঞ্জক বলে। প্রাণিজগতের প্রধান শ্বাসরঞ্জকগুলো হলো- হিমোগ্লোবিন (Vertebrates), হিমোসায়ানিন (Mollusca & Arthropoda), হিমিইরিথ্রিন (Sipunculids & Brachiopods) ও ক্লোরোক্রুরিন (Polychaetes)।
- **ক্লোরাইড শিফট :** লোহিত রক্তকণিকা থেকে যতটি HCO_3^- রক্তরসে আসে ততটি Cl^- রক্তরস থেকে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। একে ক্লোরাইড শিফট বা হ্যামবার্জার বিক্রিয়া বলা হয়।
- **ব্রঙ্কাইটিস :** শ্বাসনালির ভেতরে আবৃত ঝিল্লির প্রদাহের কারণে ব্রঙ্কাইটিস রোগ হয়। জ্বর ও খুসখুসে কাশি ও শ্বাসকষ্ট এ রোগের লক্ষণ। স্যাঁতসেতে ধূলিকণা মিশ্রিত আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগলে মানুষ ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়।
- **এমফাইসেমা :** ধূমপানের ধোঁয়ায় অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে যে ক্ষতি হয় তার ফলে অ্যালভিওলাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থান ফেটে গিয়ে ফুসফুসে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে। এ অবস্থাকে এমফাইসেমা বলে। এ রোগে ফুসফুসের শ্বসন অঞ্চল হ্রাস পায় এবং ফুসফুসের কোষের স্থিতিস্থাপকতা কম যায়।

2020/8/4 17:39

Scanned with CamScanner

☑ **সাইনুসাইটিস :** কোনো কারণে (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি) মুখমণ্ডলে বিদ্যমান সাইনাসগুলোর ঝিল্লিতে ঘা বা প্রদাহ হলে তাকে সাইনুসাইটিস বলে।

☑ **সারফেকট্যান্ট :** ফুসফুসের অ্যালভিওলাস প্রাচীরে কিছু বিশেষ কোষ থাকে, যারা প্রাচীরের অন্তঃতলে ডিটারজেন্ট এর অনুরূপ রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। এ পদার্থকে সারফেকট্যান্ট বলে।

☑ **ওটিটিস মিডিয়া :** জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে বা অন্য কোনো কারণে মধ্যকর্ণের সংক্রমণজনিত প্রদাহ সৃষ্টি হলে তাকে ওটিটিস মিডিয়া বলে। সংক্ষেপে, মধ্যকর্ণের সংক্রমণকে ওটিটিস মিডিয়া বা মধ্যকর্ণের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ বলে। কানের পর্দা ও অন্তঃকর্ণের মাঝে বিদ্যমান ইউস্টেশিয়ান নালিতে ওটিটিস মিডিয়া হয়।

☑ **রেসপিরেটরি কোসেন্ট :** শ্বসনের সময় O_2 ও CO_2 গ্যাসের বিনিময়ের অনুপাতকে রেসপিরেটরি কোসেন্ট বলে।

☑ **সিপিআর :** সিপিআর (CPR) হলো কার্ডিওপালমোনারি রিসাসসিটেশন (Cardiopulmonary Resuscitation) বা হৃৎ-ফুসফুসের পুনঃজাগরণ। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় বা প্রাকৃতিক কারণে কোনো ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এ পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। যে ব্যক্তি CPR দেবেন তাকে উদ্ধারকর্মী বা রেসকিওর (rescur) বলা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানব ভ্রূণে কয় সপ্তাহ বয়স থেকে সারফেকটেন্ট ক্ষরণ শুরু হয়? *[ঢাকা বোর্ড-১৮]*
ক ২১ খ ২২ গ ২৩ ঘ ২৪

২. নিচের চিত্রের অঙ্গটির কাজ কী?

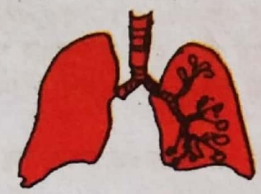

[ঢাকা বোর্ড-১৮]
ক রোগ প্রতিরোধ খ গ্যাসীয় পদার্থের বিনিময়
গ ভারসাম্য রক্ষা ঘ হরমোন নিঃসরণ

৩. শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিনিময় হয়? *[রা.,কু.,দি.,য.,সি.,ব. ও চ. বোর্ড-১৮]*
ক ট্রাকিওল খ ট্রাকিয়া
গ ব্রঙ্কাস ঘ অ্যালভিওলাস

৪. নিচের কোন প্রবাহ চিত্রটি সঠিক? *[ঢা.দি. বোর্ড-২০১৭]*
ক ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কাই → ব্রঙ্কিওল → অ্যালডিওলার নালি → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলাস
খ ব্রঙ্কাই → ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কিওল → অ্যালভিওলার নালি → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলাস
গ ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কিওল → ব্রঙ্কাই → অ্যালবিওলার নালি → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালবিওলাস
ঘ ট্রাকিয়া → অ্যালভিওলার থলি → ব্রঙ্কাই → ব্রঙ্কিওল → অ্যালভিওলার নালি → অ্যালভিওলাস

৫. ডায়াফ্রামের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*
ক শ্বসনে এর কোনো ভূমিকা নেই
খ বক্ষ ও উদর গহ্বরকে পৃথক রাখে
গ ফ্রেনিক ধমনি রক্ত সংগ্রহ করে
ঘ সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীতে পাওয়া যায়

৬. ফুসফুসের সর্বমোট ধারণ ক্ষমতাকে বলে– *[যশোর বোর্ড-২০১৭]*
ক ভাইটাল ক্যাপাসিটি খ টাইডাল বায়ু
গ টাইডাল ভলিউম ঘ রেসিডিউয়াল ভলিউম

৭. সেরাস ফ্লুইড কোন অঙ্গকে রক্ষা করে? *[সিলেট বোর্ড-২০১৭]*
ক হৃৎপিণ্ড খ ফুসফুস
গ মস্তিষ্ক ঘ অস্থিসন্ধি

৮. মানবদেহে ডান ফুসফুসে কয়টি লোবিউল থাকে? *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]*
ক ১০ খ ৮ গ ৬ ঘ ৪

৯. অ্যালভিওলাস কোথায় পাওয়া যায়? *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]*
ক হৃৎপিণ্ড খ ফুসফুস গ পাকস্থলী ঘ বৃক্ক

১০. ল্যারিংক্স গহ্বরে ভোকাল কর্ডের সংখ্যা কয়টি? *[ঢা. বো. '১৬]*
ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

১১. শব্দ উৎপন্ন করে নিচের কোনটি? *[য. বো. '১৬]*
ক ফুসফুস খ ব্রঙ্কাস
গ ল্যারিংক্স ঘ গলবিল

১২. মানুষের ফুসফুসে মোট কয়টি লোব বিদ্যমান? *[কু. বো. '১৬]*
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৩. ফুসফুসে বায়ু প্রবেশের সঠিক গতিপথ কোনটি? *[কু. বো. '১৬]*
ক ল্যারিংক্স → ব্রঙ্কাই → ট্রাকিয়া → অ্যালভিওলি
খ ট্রাকিয়া → ল্যারিংক্স → ব্রঙ্কাই → অ্যালভিওলি
গ ব্রঙ্কাই → ট্রাকিয়া → ল্যারিংক্স → অ্যালভিওলি
ঘ ল্যারিংক্স → ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কাই → অ্যালভিওলি

১৪. O_2 এবং CO_2 এর বিনিময় ঘটে নিম্নের কোন অংশে? *[য. বো. '১৬]*
ক অ্যালভিওলাস খ নেফ্রন গ নিউরন ঘ ভিলাই

১৫. বাম ফুসফুসের লোবিওল সংখ্যা কতটি? *[চ. বো. '১৬]*
ক ৬ খ ৭ গ ৮ ঘ ৯

১৬. কোন সাইনাসের প্রদাহের কারণে গালে, দাঁতে বা মাথায় ব্যথা হয়? *[ব. বো. '১৬]*
ক ফ্রন্টাল খ এথময়ডাল গ ম্যাক্সিলারি ঘ স্ফেনয়ডাল

১৭. সারফ্যাকট্যান্ট কোথায় পাওয়া যায়? *[ব., দি. বো. '১৬]*
ক অ্যালভিওলাসে খ ব্রঙ্কাসে গ ট্রাকিয়াতে ঘ নাসারন্ধ্রে

2020/8/4 17:39
Scanned with CamScanner

১৮. কোথায় সেরাস ফ্লুইড পাওয়া যায়? [সি. বো. '১৬]
ক ফুসফুস খ ব্রঙ্কাস গ ট্রাকিয়া ঘ অ্যালভিওলাস

১৯. কোন রোগে অ্যালভিওলাস ফেটে ফুসফুসে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে? [সি. বো. '১৬]
ক ব্রঙ্কাইটিস খ এমফাইসেমা গ প্ল্যুরেসি ঘ নিউমোনিয়া

২০. পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে মাত্র কত গ্রাম লৌহ থাকে?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

⏭ উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

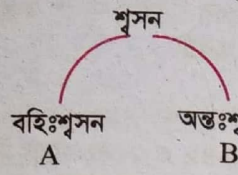

[ঢা. বো. '১৯]

২১. A চিহ্নিত অংশে নিচের কোনটি ঘটে?
ক স্থিতিশক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তর
খ অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপন
গ জারণ প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন
ঘ শক্তির সুষম বণ্টন

২২. যে আবরণটি ফুসফুসকে ঘিরে রাখে তাকে কী বলে?
ক প্লুরা খ পেরিকার্ডিয়াম গ পেরিটোনিয়াম ঘ মেডিস্টেনিয়াম

২৩. ভোকাল কর্ড শ্বাসতন্ত্রের কোন অংশে পাওয়া যায়?
ক গলবিল খ ল্যারিংক্স গ গ্লটিস ঘ ব্রঙ্কাস

২৪. অধিক ধূমপানের ফলে সৃষ্ট রোগ কোনটি? [রা. বো. '১৫]
ক ব্রঙ্কাইটিস খ প্ল্যুরোসি গ এমফাইসেমা ঘ ওটিটিস মিডিয়া

২৫. শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে এপিগ্লটিস অবস্থিত? [য. বো. '১৫]
ক শ্বাসনালি খ স্বরযন্ত্র গ গলবিল ঘ ভেস্টিবিউল

২৬. মানুষের শ্বসনে শতকরা কতভাগ অক্সিজেন প্লাজমায় ভৌত দ্রবণরূপে পরিবাহিত হয়? [য. বো. '১৫]
ক 0.1% খ 0.2% গ 2.0% ঘ 10.0%

২৭. ফুসফুসের প্রদাহকে কী বলা হয়? [চ. বো. '১৫]
ক ওটিটিস মিডিয়া খ সাইনুসাইটিস
গ অ্যালার্জি ঘ এমফাইসেমা

২৮. বহিঃশ্বসন কয়টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৬

২৯. ডান ফুসফুস কয়টি লোবিউলে বিভক্ত? [সি. বো. '১৫]
ক ২ খ ৩ গ ১০ ঘ অসংখ্য

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩০. অ্যালভিওলাস– [যশোর বোর্ড-২০১৭]
i. ফুসফুসের গঠন ও কার্যের একক
ii. প্রাচীরে কোলজেন তন্তু থাকে iii. জীবাণু ধ্বংস করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. সারফেকট্যান্ট– [ঢা. বো. '১৬]
i. তরলের পৃষ্ঠটান কমিয়ে দেয় ii. জীবাণু ধ্বংস করে
iii. ২৩ সপ্তাহের মানব ভ্রূণে পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২. সাইনুসাইটিসে আক্রান্ত সাইনাসগুলো– [ঢা. বো. '১৯]
i. ম্যাক্সিলারি ii. এথময়েড iii. স্ফেনয়েড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. শ্বসনে সহায়তা করে– [ব. বো. '১৫]
i. ডায়াফ্রাম ii. ট্রাকিয়া iii. ইন্টারকস্টাল পেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪. অ্যালভিওলাসের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. সারফেকট্যান্ট ক্ষরণ করে
ii. আঁইশাকার কোষে গঠিত
iii. গ্যাসীয় বিনিময় ঘটায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৫ ও ৩৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও : [কু. বো. '১৬]

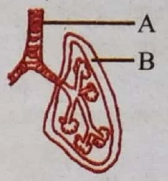

৩৫. উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত অংশটির নাম কী?
ক প্লাজমা ফ্লুইড খ পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড
গ সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড ঘ সেরাস ফ্লুইড

৩৬. উদ্দীপকের 'B' চিহ্নিত অংশ–
i. আংটির মতো তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত
ii. বায়ুহীন অবস্থায় চুপসে যায় না
iii. সিলিয়াযুক্ত অন্তঃপ্রাচীর বিশিষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩৭ ও ৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফুসফুসের কার্যিক একক হলো অ্যালভিওলাস, যা অত্যন্ত পাতলা এবং চ্যাপ্টা আঁইশাকার কোষ দ্বারা গঠিত। এই কোষের ফাঁকে ফাঁকে বিশেষ এক ধরনের কোষ থাকে। এই কোষ থেকে ক্ষরিত বিশেষ পদার্থ মানব ভ্রূণের স্বাধীন অস্তিত্বের অন্যতম ধারক হিসেবে বিবেচ্য। [ব. বো. '১৯]

৩৭. উদ্দীপকের বিশেষ পদার্থটি হলো–
ক সারফেকট্যান্ট খ সেরুমেন
গ ইন্টারফেরন ঘ পাইরোজেন

৩৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ পদার্থটির কাজ হলো–
i. অ্যালভিওলাসের প্রাচীরের পৃষ্ঠটান কমানো
ii. গ্যাস বিনিময়ে সাহায্য করা
iii. রোগ জীবাণু ধ্বংস করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩৯ ও ৪০নং প্রশ্নের উত্তর দাও : [কু. বো. '১৫]



৩৯. উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত অংশটির আবরণের নাম কী?
ক পেরিকার্ডিয়াম খ ট্রাবেকিউলি গ প্লুরা ঘ ডায়াফ্রাম

Scanned with CamScanner

৪০. উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত অংশের জন্য প্রযোজ্য–
i. O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটে
ii. সারফেকট্যান্ট ক্ষরণ করে
iii. কোলাজেন তন্তু অনুপস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৪১ ও ৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

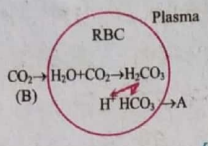

[সকল বোর্ড-২০১৮]

৪১. 'A' এর আয়নিক সমতা রক্ষার্থে প্লাজমা থেকে লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে কোনটি?
ক Cl^- খ H^+ গ Na^+ ঘ K^+

৪২. 'B' চিহ্নিত যৌগটি প্রাণিকোষের কোথায় উৎপন্ন হয়?
ক গলজি বস্তু খ মাইটোকন্ড্রিয়া
গ রাইবোজোম ঘ লাইসোজোম

⏭ নিচের উদ্দীপকটির সাহায্যে ৪৩ ও ৪৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তাড়াতাড়ি করে খাবার খেতে গেলে আমরা অনেক সময় খাবার বন্ধ করে এক নাগাড়ে কাশতে থাকি।

৪৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা কোন করোটিক স্নায়ুর উদ্দীপনা ঘটে? [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
ক viii, ix খ ix, x গ x, xi ঘ xi, xii

৪৪. উল্লিখিত ঘটনা ঘটে যখন– [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
i. ট্রাকিয়ায় খাবার ঢুকে যায়
ii. এপিগণ্ডটিস যথাস্থানে থাকে না
iii. ট্রাকিয়ার মিউকাস পর্দা উদ্দীপিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি দেখ এবং ৪৫ ও ৪৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

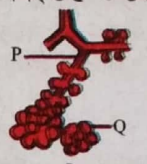

৪৫. উদ্দীপকে 'P' চিহ্নিত অংশটির নাম কী? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
ক ট্রাকিয়া খ ব্রঙ্কাস গ ব্রঙ্কিওল ঘ অ্যালভিওলার নালি

৪৬. উদ্দীপকের Q চিহ্নিত অংশে– [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
i. স্কোয়ামাশ এপিথেলিয়াম থাকে
ii. সারফেকট্যান্ট নিঃসৃত হয় iii. গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৭ ও ৪৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুজন নিয়মিত ধূমপান করে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে সে প্রায়ই অসুস্থ থাকছে। ডাক্তারের নিকট গেলে ডাক্তার তার দেহের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা জানালেন। তিনি আরও বললেন সুজন এখনই ধূমপান ত্যাগ না করলে ভবিষ্যতে তাকে মারাত্মক শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

৪৭. উদ্দীপকের উপাদানে ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে তা হলো– [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]
i. CO ii. নিকোটিন iii. টার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৮. উদ্দীপক অনুযায়ী সুজনের যে সমস্যা হতে পারে তা হলো– [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]
i. অ্যালভিওলাই নষ্ট হওয়া
ii. ফুসফুসের অন্তঃপ্রাচীরের সিলিয়া অবশ হওয়া
iii. এক্সর ফিল্ম সাদাটে হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৯ ও ৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বর্ণার বয়স ৫ বছর। তার কান ব্যথা ও কানে পুঁজ জমেছে। ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে তিনি বললেন, "এটি অণুজীবঘটিত রোগ তবে সংক্রামক নয়।"

৪৯. বর্ণার রোগটির নাম কী? [রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]
ক সাইনুসাইটিস খ ওটিটিস মিডিয়া
গ হার্ট অ্যাটাক ঘ থ্যালাসোমিয়া

৫০. বর্ণার রোগটি প্রতিরোধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে? [রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]
i. ভ্যাকসিন নেওয়া ii. বায়ু দূষণ থেকে দূরে থাকা
iii. অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫১. নিচের কোনটি মানবদেহের শ্বসনতন্ত্রের বায়ু পরিবহন অঞ্চল নয়? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক শ্বাসনালি খ ব্রঙ্কাস
গ প্রান্তীয় ব্রাঙ্কিওল ঘ অ্যালভিওলার নালি

৫২. সারফেকট্যান্ট কোথায় পাওয়া যায়? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক স্বরযন্ত্রে খ শ্বাসনালিতে গ অ্যালভিওলাসে ঘ ব্রঙ্কাসে

৫৩. Adam's Apple কোথায় থাকে? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক স্বরযন্ত্র খ শ্বাসনালিতে গ ব্রঙ্কাস ঘ ফুসফুস

৫৪. নিচের কোন উক্তিটি সত্য নয়? [মেডিকেল : ১১-১২]
ক আরশোলার ভ্রূণোত্তর রূপান্তরের দুই খোলস মোচনের অন্তর্বর্তী কালকে স্টেডিয়াম বলে
খ মেদ কলা দেহের সুষম আকৃতি দানে সাহায্য করে
গ মানবদেহের ডান ফুসফুস দুই খণ্ডবিশিষ্ট এবং বাঁ ফুসফুস তিন খণ্ডবিশিষ্ট
ঘ হাইড্রার সিলোম সিলোমিক পাউচ থেকে উৎপত্তি লাভ করে

৫৫. স্বরতন্ত্রীর অবস্থান হচ্ছে– [মেডিকেল : ০৬-০৭]
ক গলবিল খ ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালি
গ নাসা গহ্বর ঘ ল্যারিংক্স

৫৬. ফুসফুসের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক? [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক ডান ফুসফুসটি তিনটি খণ্ডে এবং বাম ফুসফুসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত
খ ডান ফুসফুসটি চারটি খণ্ডে এবং বাম ফুসফুসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত
গ ডান ফুসফুসটি দুইটি খণ্ডে এবং বাম ফুসফুসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত
ঘ কোনটিই ঠিক নয়

2020/8/4 17:40
Scanned with CamScanner

৫৭. একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষ বিশ্রামরত অবস্থায় মিনিটে কতবার শ্বসনক্রিয়া সম্পাদন করে? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক ২০-২৫ বার খ ১৪-১৮ বার
গ ৭-১০ বার ঘ ৩০-৪০ বার

৫৮. পূর্ণ বয়স্ক মানুষের বিশ্রামকালে প্রতি মিনিটে শ্বসনের হার? [ডেন্টাল : ০২-০৩]
ক 15 – 20 বার খ 20 – 24 বার
গ 16 – 20 বার ঘ 14 – 18 বার

৫৯. রক্তে CO_2 পরিবহনের মাধ্যম নয় কোনটি? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক কার্বনিক এসিড খ বাইকার্বনেট যৌগ
গ কার্বন মনোঅক্সাইড ঘ কার্বামিনো যৌগ

৬০. শ্বাসতন্ত্র সম্পর্কে নিম্নের কোন কথাটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ১১-১২, ০৮-০৯]
ক ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন বায়ুথলি থেকে কৈশিক নালির রক্তে প্রবেশ করে।
খ ফুসফুসের কৈশিক নালিতে অক্সিজেন রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে স্থায়ী যৌগ অক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরি করে।
গ উপজিহ্বা খাদ্যদ্রব্য শ্বাসনালিতে প্রবেশে বাঁধা দান করে
ঘ প্রশ্বাসের সময় ফুসফুস প্রসারিত হয়

৬১. কার্বন ডাই অক্সাইড হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে নিম্নের কোনটি তৈরি করে? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক কার্বামাইনো প্রোটিন খ কার্বামাইনো হিমোগ্লোবিন
গ মিথ হিমোগ্লোবিন ঘ অক্সি-হিমোগ্লোবিন

৬২. কোনটি মানব দেহের শ্বসনের জন্য সঠিক নয়? [ডেন্টাল : ০৬-০৭]
ক ফুসফুসের কৈশিক জালিকায় দেহ থেকে আগত রক্তে অক্সিজেনের চাপ থাকে 107 mm Hg
খ গ্লাইকোলাইসিসের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরে সাইটোসলের মধ্যে পাওয়া যায়
গ অন্তঃশ্বসন একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া
ঘ বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন হয় না

৬৩. যেটি অন্তঃশ্বসনের বৈশিষ্ট্য নয়– [মেডিকেল : ০০-০১]
ক প্রতিটি ধাপ এক বা একাধিক উৎসেকচ ও সহ উৎসেচক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
খ কোষ থেকে রক্তে CO_2 পরিত্যাগ করে
গ এটি একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া
ঘ কোন শক্তি উৎপন্ন হয় না

৬৪. সাইনোসাইটিস রোগের প্রধান উপসর্গ কোনটি? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক কাশি খ বমি গ জ্বর ঘ মাথা ব্যাথা

৬৫. কোনটি প্যারান্যাসাল সাইনাস নয়? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক ফ্রন্টাল সাইনাস খ ম্যাক্সিলারি সাইনাস
গ স্ফেনয়ডাল সাইনাস ঘ অক্সিপিটাল সাইনাস

৬৬. ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য দায়ী– [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক SiO_2 খ CO_2 গ MnO_2 ঘ H_2S

উত্তরমালা

১. (গ); ২. (খ); ৩. (ঘ); ৪. (ক); ৫. (খ); ৬. (ক); ৭. (খ); ৮. (ক); ৯. (খ); ১০. (ঘ); ১১. (গ); ১২. (ঘ); ১৩. (ঘ); ১৪. (ক); ১৫. (গ); ১৬. (গ); ১৭. (ক); ১৮. (ক); ১৯. (খ); ২০. (খ); ২১. (খ); ২২. (ক); ২৩. (খ); ২৪. (ক); ২৫. (খ); ২৬. (গ); ২৭. (ঘ); ২৮. (ক); ২৯. (গ); ৩০.(ঘ); ৩১. (ঘ); ৩২. (ঘ); ৩৩. (ঘ); ৩৪. (ঘ); ৩৫. (ঘ); ৩৬. (ঘ); ৩৭. (খ); ৩৮. (ঘ); ৩৯. (খ); ৪০. (ক); ৪১. (ক); ৪২. (খ); ৪৩. (ঘ); ৪৪. (ঘ); ৪৫. (গ); ৪৬. (ঘ); ৪৭. (ঘ); ৪৮. (ঘ); ৪৯. (খ); ৫০. (ঘ); ৫১. (ঘ); ৫২. (গ); ৫৩. (ক); ৫৪. (গ); ৫৫. (ঘ); ৫৬. (ক); ৫৭. (খ); ৫৮. (ঘ); ৫৯. (গ); ৬০. (খ); ৬১. (খ); ৬২. (ক); ৬৩. (ঘ); ৬৪. (ঘ); ৬৫. (ঘ); ৬৬. (ক)।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. শ্বসন কী? [দিনাজপুর বোর্ড-১৬]
২. শ্বসনতন্ত্র কী?
৩. অ্যাডামস অ্যাপল কী?
৪. গ্লটিস কী?
৫. শ্বসন বৃক্ষ কী?
৬. অ্যালভিওলাস কী? [ব. বো.-১৯; য. চ. বো.-১৭]
৭. সারফেকট্যান্ট কী? [বরিশাল বোর্ড-১৭, চট্টগ্রাম বোর্ড-১৫]
৮. প্লুরা কী?
৯. প্ল্যুরিসি কী?
১০. সেরাস ফ্লুইড কী?
১১. শ্বাসক্রিয়া কী?
১২. বহিঃশ্বসন কী?
১৩. প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ কী?
১৪. নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ কী?
১৫. অন্তঃশ্বসন কী?
১৬. শ্বাসকেন্দ্র কী?
১৭. শ্বাসরঞ্জক কী?
১৮. ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া কী?
১৯. হ্যামবার্জার বিক্রিয়া কী?
২০. শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেন্ট কী?
২১. ব্রঙ্কাইটিস কী?
২২. এমফাইসেমা কী?
২৩. সাইনুসাইটিস কী? [ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ড-১৭]
২৪. ওটিটিস মিডিয়া কী? [সিলেট বোর্ড-১৫]
২৫. সিপিআর কী?
২৬. অ্যাপনিয়া কী?
২৭. হাইপারপ্নিয়া কী?
২৮. ডিসপনিয়া কী?
২৯. হাইপোক্সিয়া কী?
৩০. অ্যাসফিক্সিয়া কী?
৩১. নীলব্যাধি বা সাইনোসিস কী?
৩২. ডেড স্পেস কী?

Scanned with CamScanner

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. শ্বসনবৃক্ষ বলতে কী বোঝ?
২. শ্বসনতন্ত্রের কাজ লিখ।
৩. এপিগ্লটিস কীভাবে কাজ করে?
৪. অ্যালভিওলাসের গঠন লিখ।
৫. অ্যালভিওলাসে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ব্যাখ্যা কর।
৬. ২৪ সপ্তাহের আগে মানব ভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয় না কেন?
৭. প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ বলতে কী বুঝ?
৮. নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ বলতে কী বুঝ?
৯. প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ কেন?
১০. শ্বসন বিপাকীয় প্রক্রিয়া কিন্তু শ্বাসকার্য নয় কেন?
১১. কী কারণে রক্তরসের চেয়ে লোহিত কণিকায় বেশি পরিমাণে কার্বোনিক এসিড প্রস্তুত হয়?
১২. খুব বেশি খাবার খেলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় কেন?
১৩. এক অণু অক্সিজেন অ্যালভিওলাস থেকে হিমোগ্লোবিন/দেহ কোষ পর্যন্ত পৌঁছাতে কোন কোন কোষ পর্দা অতিক্রম করে?
১৪. শ্বাসরঞ্জক বলতে কী বুঝ? *[রাজশাহী বোর্ড-১৬]*
১৫. শ্বসনে হিমোগ্লোবিন বা শ্বাসরঞ্জকের ভূমিকা লিখ।
১৬. এক অণু হিমোগ্লোবিনে 4 অণু O_2 থাকে কেন?
১৭. সাইনাস বলতে কী বোঝ? *[রাজশাহী বোর্ড-১৭]*
১৮. সাইনাসের প্রকারভেদ লিখ।
১৯. সাইনুসাইটিস বলতে কী বুঝায়? *[বরিশাল বোর্ড-১৯; রাজশাহী বোর্ড-১৫]*
২০. সাইনুসাইটিস কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ।
২১. ওটিটিস মিডিয়ার কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ।
২২. ধূমপানের ফলে ফুসফুসের কী পরিণতি হয়? *[সিলেট বোর্ড-১৬]*
২৩. ধূমপানজনিত শ্বসন জটিলতা লিখ।
২৪. সারফেকটেন্ট কেন ক্ষরণ হয়? *[কুমিল্লা বোর্ড-১৯]*

পার্থক্য লিখ/তুলনা কর :

২৫. ট্রাকিওল এবং ব্রঙ্কিওল, বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসন, মাছের ফুলকা এবং মানুষের ফুসফুস, একজন ধূমপায়ী ও একজন অধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রের চিত্র।

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। আমাদের শরীরের বক্ষ গহ্বরের উভয় পাশে অসংখ্য বায়ু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট দু'টি অঙ্গ আছে যাতে O_2 ও CO_2 গ্যাস দুটির বিনিময় ঘটে। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৯]*
ক. অ্যালভিওলাস কী?
খ. সাইনুসাইটিস বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটির গঠন বর্ণনা কর।
ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় গ্যাসটির পরিবহন কৌশল বিশ্লেষণ কর।

২। রক্তের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে যা অক্সিজেন পরিবহনে ভূমিকা পালন করে। এছাড়া আমাদের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রমটি মস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগাটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
ক. সাইনোসাইটিস কী? *[ঢাকা বোর্ড-২০১৭]*
খ. যকৃৎকে জৈব রসায়নাগার বলা হয় কেন?
গ. রঞ্জক পদার্থটির কাজ উদ্দীপকের সাপেক্ষে ব্যাখ্যা কর। *[ঢাকা বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত ২য় কার্যক্রমটি বিশেষণ কর। *[ঢাকা বোর্ড-২০১৭]*

৩। মাথার খুলিতে মুখমণ্ডলীয় অংশে নাসা গহ্বরের দু'পাশে কয়েক জোড়া বিশেষ গহ্বর থাকে যা বাতাসের পরিবর্তে তরলে পূর্ণ হলে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে প্রদাহের সৃষ্টি করে। *[যশোর বোর্ড-২০১৭]*
ক. অ্যালভিওলাস কী?
খ. এপিগ্লটিসের কাজগুলো লিখ।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গহ্বরগুলোর নাম, অবস্থান ও প্রদাহ সম্পর্কে লিখ।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রদাহ থেকে কীভাবে মুক্ত থাকা যায়– ব্যাখ্যা কর।

৪। মানবদেহের বক্ষগহ্বরে দুটি বায়ুপূর্ণ থলি রয়েছে। প্রতিটি থলি অসংখ্য বায়ুকুঠুরিতে বিভক্ত। এরা বিশেষ কৌশলে সংকোচিত প্রসারিত (ভেন্টিলেশন) হয়।
ক. হেপারিন কী?
খ. BMI বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত একটি বায়ুকুঠুরির গঠন বর্ণনা কর। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভেন্টিলেশন কৌশলটি ব্যাখ্যা কর। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*

৫। 'সিগারেটের ধোঁয়া আমাদের প্রত্যক্ষ ক্ষতির চেয়ে পরোক্ষ ক্ষতি বেশি করে। এতে অধূমপায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'
ক. অ্যাডামস অ্যাপল কী?
খ. ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দার কাজ লিখ। *[ঢাকা বোর্ড-১৬]*
গ. উল্লিখিত উপাদান আমাদের দেহে প্রবেশের যান্ত্রিক কৌশল বর্ণনা কর। *[ঢাকা বোর্ড-১৬]*
ঘ. উদ্দীপকের উক্তির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। *[ঢাকা বোর্ড-১৬]*

৬। মানবদেহের একটি অঙ্গের গঠন পড়ানোর সময় শিক্ষক বললেন এটি বক্ষ গহ্বরে অবস্থান করে, এটি লোবিওল নামক কতকগুলো অংশে বিভক্ত এবং এতে অসংখ্য বায়ুকুঠুরিও থাকে। তিনি আরও বললেন, ধূমপায়ী ব্যক্তির ক্ষেত্রে অঙ্গটির গঠনে কিছু ভিন্নতা দেখা যেতে পারে। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৬]*
ক. সাইনুসাইটিস কী?
খ. শ্বাসরঞ্জক বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গের গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্দীপক অনুসারে শিক্ষকের শেষ উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

৭। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

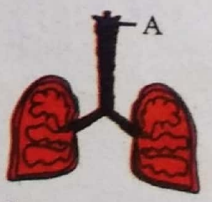

ক. শ্বসন কী? *[সিলেট বোর্ড-২০১৫]*
খ. ওটিটিস মিডিয়া কী?
গ. চিত্রে প্রদর্শিত তন্ত্রটির ক্ষুদ্রতম এককের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা কর। *[সিলেট বোর্ড-২০১৫]*
ঘ. উপরের 'A' চিত্রের অংশে সংক্রমণ হলে যে সমস্যা দেখা যায় তা প্রতিকারের উপায় বর্ণনা কর। *[সিলেট বোর্ড-২০১৫]*

2020/8/4 17:40
Scanned with CamScanner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

Scanned with CamScanner

মানব শারীরতত্ত্ব : বর্জ্য ও নিষ্কাশন
HUMAN PHYSIOLOGY : EXCRETORY PRODUCT AND EXCRETION

অধ্যায় ৬

প্রাণীদের অভ্যন্তরে নানা ধরনের বিপাকীয় কার্যাবলি সংঘটিত হয়। এসব বিপাকীয় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সংশ্লেষিত হয়ে কিছু অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর পদার্থ তৈরি হয়। এ জন্য এসব দ্রব্য দেহ থেকে নিষ্কাশন করা একান্ত অপরিহার্য। বিপাক কার্যের ফলে সৃষ্ট এসব অপ্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থকে **রেচন পদার্থ** বলে। রেচন পদার্থের মধ্যে অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন, অ্যামিনো এসিড, ইউরোক্রোম ইত্যাদি উপস্থিত থাকে।

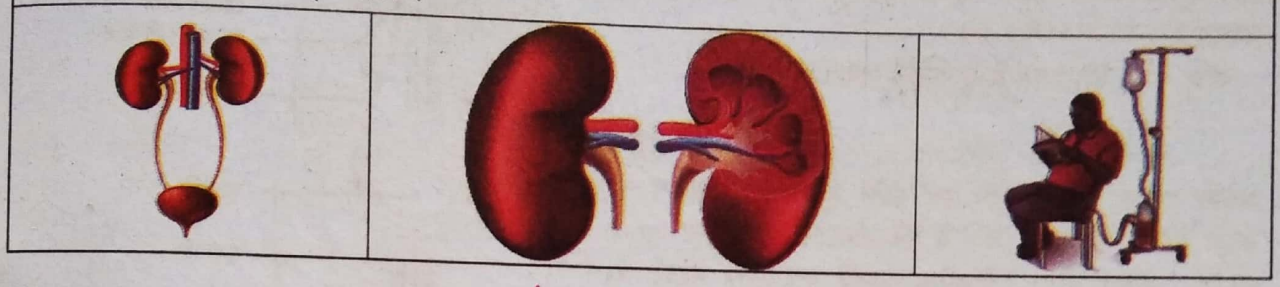

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ৬)
১. বৃক্কের গঠন ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। ২. রেচনের শারীরবৃত্ত ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. মানব শরীর রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের কার্যক্রমের যথাযর্থ মূল্যায়ন করতে পারবে। ৪. বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের (Instanteneous Kidney Failure) লক্ষণ ও ঐ মুহূর্তে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. রক্ত ও মূত্রে হরমোনের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. ব্যবহারিক ○ বৃক্কের অনুচ্ছেদ শনাক্ত ও চিত্র অঙ্কন করতে পারবে।	● বৃক্ক ○ গঠন ও কাজ ● রেচনের শারীররবৃত্ত ● বৃক্কের ভূমিকা ○ রেচন, ○ সমোরেগুলেশন ● বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় ● হরমোনাল ক্রিয়া সূত্রে ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ ○ রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণ ● ব্যবহারিক ○ বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য পদার্থ (Different types of waste product)

১। **রেচন পদার্থ** (Excretory product) : রেচন পদার্থ যথা– ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া এগুলো প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড থেকে সৃষ্ট। **মানুষের প্রধান রেচন বর্জ্যের নাম হলো মূত্র** (urine)।

যেসব প্রাণী ইউরিয়াকে রেচন পদার্থ হিসেবে ত্যাগ করে তাদের **ইউরিওটেলিক** (ureotelic) প্রাণী বলে। যেমন– মানুষসহ কিছু স্থলজ প্রাণী ও সামুদ্রিক প্রাণী।

যেসব প্রাণী ইউরিক এসিডকে রেচন পদার্থ হিসেবে ত্যাগ করে তাদের **ইউরিকোটেলিক** (uricotelic) প্রাণী বলে। যেমন– পতঙ্গ, গিরগিটি, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

যেসব প্রাণী অ্যামোনিয়াকে রেচন পদার্থ হিসেবে ত্যাগ করে তাদের **অ্যামোনোটেলিক** (ammonotelic) প্রাণী বলে। যেমন– হাইড্রা, কেঁচো, চিংড়ি, রুই মাছ ইত্যাদি।

২। **পিত্তরঞ্জক** (Bile product) : যকৃতে পুরাতন লোহিত রক্তকণিকা হিমোগ্লোবিনের ভাঙনের ফলে **বিলিরুবিন** ও **বিলিভারডিন** নামক পিত্তরঞ্জক উৎপন্ন হয়।

৩। **ঘাম** (Sweat) : ত্বকে অবস্থিত ঘামগ্রন্থি থেকে ঘাম উৎপন্ন হয়। এতে অতিরিক্ত পানি, খনিজ লবণ (NaCl) ও সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া বিদ্যমান থাকে।

৪। **কার্বন ডাইঅক্সাইড** : শ্বসনের ফলে উৎপন্ন হয়।

৫। **লৌহ ও ক্যালসিয়াম ঘটিত লবণ** : অন্ত্রে উৎপন্ন হয়।

Scanned with CamScanner

মানুষের রেচনতন্ত্র (Excretory System of Human)

বিপাকের ফলে সৃষ্ট N_2 ঘটিত পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়, তাকে **রেচন** বলে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে রেচনকার্য সম্পাদিত হয়, তাকে **রেচনতন্ত্র** বলে। মানুষের রেচনতন্ত্রটি এক জোড়া **বৃক্ক**, এক জোড়া **ইউরেটার** বা **গবিনী**, একটি **মূত্রথলি** বা **মূত্রাশয়** ও একটি **মূত্রনালি** নিয়ে গঠিত।

মানুষের রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

১। বৃক্ক (Kidney) : বৃক্কই মানুষের প্রধান রেচনঅঙ্গ। এ মাধ্যমেই দেহের শতকরা ৮০% রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। বাকি ২০% রেচন পদার্থ বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে উৎপন্ন এবং বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়।

কাজ : মূত্র উৎপাদন করা বৃক্কের প্রধান কাজ।

২। রেচননালি বা ইউরেটার (Ureter) : বৃক্কের হাইলাম অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে যে নালি মূত্রথলিতে প্রবেশ করে তাকে ইউরেটার বলে। প্রতিটি ইউরেটারের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫-৩০ সে.মি। বৃক্কের মধ্যে ইউরেটার একটি ফানেলের মতো অংশ গঠন করে তাকে **পেলভিস** (pelvis) বলে।

কাজ : বৃক্কে উৎপন্ন মূত্র মূত্রথলিতে পরিবহন করে।

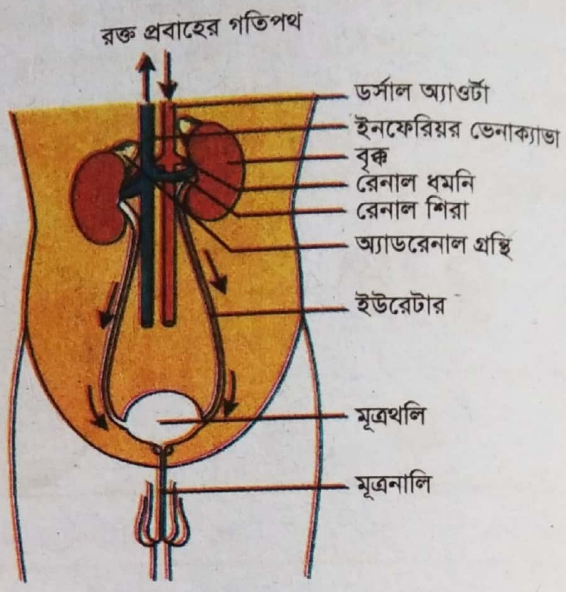

চিত্র ৬.১ : মানুষের রেচনতন্ত্র

৩। মূত্রথলি বা মূত্রাশয় (Urinary bladder) : এটি শ্রোণিগহ্বরে অবস্থিত অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে তৈরি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট ত্রিকোণাকার থলিবিশেষ। এটি সংকোচন প্রসারণক্ষম। মূত্রথলির মূত্রধারণ ক্ষমতা ৭০০-৭৫০ মিলিলিটার। তবে ২৮০-৩২০ মিলিলিটার মূত্র মূত্রথলিতে জমা হলেই মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা জাগে।

কাজ : মূত্র সাময়িকভাবে জমা রাখে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মূত্র নিষ্কাশন করে।

৪। মূত্রনালি বা ইউরেথ্রা (Urethra) : এটি মূত্রথলি থেকে উৎপন্ন হয়ে মূত্রছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়। স্ত্রী ও পুরুষে মূত্রনালির গঠন, বৈশিষ্ট্য ও অবস্থানগত পার্থক্য বিদ্যমান। পুরুষে এটি ১৮-২০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং লিঙ্গ বা শিশ্নের (penis) মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে লিঙ্গের প্রান্তের ছিদ্র পথে বাইরে উন্মুক্ত হয়। মূত্র ও বীর্য বহন করায় একে **মূত্র-জনন নালি** বা **রেচন-জনন নালি** বলে। স্ত্রীদের মূত্রনালিটি ৩.৫-৪ সেন্টিমিটার লম্বা এবং যোনি সংলগ্ন ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত হয়। স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এটিকে মূত্রনালি বা **রেচন নালি** বলা হয়।

কাজ : এটি মূত্রাশয় থেকে মূত্রকে দেহের বাইরে নিষ্কাশন করে। সঙ্গমকালে পুরুষের ক্ষেত্রে বীর্য স্খলিত হয়।

৬.১ বৃক্কের গঠন ও কাজ (Structure and Function of Kidney)

বৃক্কের বাহ্যিক গঠন : মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গের নাম বৃক্ক। উদর গহ্বরে পেছনের দিকে মেরুদণ্ডের দু'পাশে বক্ষপিঞ্জরের নিচে ও পৃষ্ঠপ্রাচীর সংলগ্ন হয়ে দুটি বৃক্ক অবস্থান করে। বৃক্কের **ঊর্ধ্বপ্রান্তে দ্বাদশ থোরাসিক কশেরুকার** (T_{12}) নিচে এবং **নিম্নপ্রান্ত তৃতীয় লাম্বার কশেরুকার** (L_3) উপরে অবস্থিত। বাম বৃক্কটি ডান বৃক্কের কিছুটা উপরে অবস্থিত (উদর গহ্বরের যকৃতের অবস্থানের কারণে)। বৃক্ক দুটি দেখতে অনেকটা **শিম বীজের ন্যায়** বা বাংলা পাঁচ (৫) সংখ্যার মতো। সজীব অবস্থায় বৃক্কের রং লালচে হলুদ। এর বাইরের দিক উত্তল এবং ভেতরের দিক অবতল। প্রতিটি বৃক্ক **পেরিটোনিয়াম পর্দা** (peritonium membrane) দ্বারা বেষ্টিত এবং মেসেন্টারি দ্বারা দেহপ্রাচীরের সঙ্গে আটকানো থাকে। বৃক্কের অবতল অংশের ভাঁজকে বৃক্কনাভি বা **হাইলাম** (hilum) বা **হাইলাস** (hilus) বলে। হাইলামের মাধ্যমে বৃক্কীয় বা রেনাল ধমনি ও স্নায়ু বৃক্কে প্রবেশ করে এবং ইউরেটার ও বৃক্কীয় বা রেনাল শিরা বৃক্ক থেকে বের হয়। মানুষের বৃক্ক দৈর্ঘ্যে প্রায় ১১-১৩ সেন্টিমিটার, প্রস্থে প্রায় ৫-৬ সেন্টিমিটার এবং পুরুত্বে প্রায় ৩ সেন্টিমিটার হয়।

Scanned with CamScanner

পুরুষ মানুষের একটি বৃক্ক ওজনে ১৫০-১৭০ গ্রাম এবং স্ত্রীলোকের ১৩০-১৫০ গ্রাম হয়। সমগ্র বৃক্ক যোজক কলা নির্মিত যে ক্যাপসুলে আবৃত থাকে তাকে **রেনাল ক্যাপসুল** বা **টিউনিকা ফাইব্রোসা** (renal capsule or tunica fibrosa) বলে। এ আবরণের বাইরে **রেনাল ফাসা** (renal fascia) নামক চর্বিযুক্ত তন্তুময় আবরণ থাকে যা বৃক্ককে যে কোনো ঘর্ষণ হতে রক্ষা করে। বৃক্কের অগ্রপ্রান্তে **অ্যাডরেনাল গ্রন্থি** (adrenal gland) টুপির মতো আচ্ছাদন করে অবস্থান করে।



চিত্র ৬.২ : মানুষের বৃক্কের লম্বচ্ছেদ (ক ও খ)

বৃক্কের অন্তর্গঠন : বৃক্কের লম্বচ্ছেদে প্রতিটি অর্ধাংশে দুটি অংশ দেখা যায়। বাইরের দিকের রেনাল ক্যাপসুল সংলগ্ন অংশকে **রেনাল কর্টেক্স** (renal cortex) এবং ভেতরের দিকের অংশকে **রেনাল মেডুলা** (renal medulla) বলে। বৃক্কের কর্টেক্স অংশ ঈষৎ বাদামি রঙের এবং মেডুলা অংশ গাঢ় বাদামি বা ঈষৎ কালচে রঙের হয়। কর্টেক্সের বাইরের দুই-তৃতীয়াংশকে **সুপারফিশিয়াল কর্টেক্স** (superficial cortex) এবং ভেতরের এক-তৃতীয়াংশকে **জাক্সটামেডুলারি কর্টেক্স** (juxtamedullary cortex) বলে। বৃক্কের কর্টেক্সে নেফ্রনের রেনাল করপাসল, প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকা ও ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা ঘনিষ্টভাবে অবস্থান করে। বৃক্কের মেডুলা অংশ নেফ্রনের হেনলির লুপ এবং সংগ্রাহক নালিকা ও রক্তজালিকা নিয়ে গঠিত। মেডুলা অংশ ত্রিভুজাকৃতির কতগুলো (৮-১৮টি) **রেনাল পিরামিড** (renal pyramids) নিয়ে গঠিত। রেনাল পিরামিডের ফাঁকে ফাঁকে কর্টেক্সের যে অংশ বিস্তৃত থাকে তাকে **রেনাল কলাম** বা **বার্টিনির রেনাল স্তম্ভ** (renal columns of Bertini) বলে। রেনাল পিরামিডের শীর্ষকে **রেনাল প্যাপিলা** (renal papilla) বলে।

এটি ক্রমশ সরু হয়ে নালিকাকার ধারণ করে। এ নালিকাকে **ক্যালিক্স মাইনর** (calyx minor) বলে। কয়েকটি ক্যালিক্স মাইনর যুক্ত হয়ে **ক্যালিক্স মেজর** (calyx major) গঠন করে। এগুলো রেচননালির **ঊর্ধ্ব** প্রান্তের স্ফীত অংশ **রেনাল পেলভিসের** (renal pelvis) সাথে সংযুক্ত থাকে এবং পরিশেষে রেচন নালি বা **ইউরেটার** (ureter) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। একজোড়া **রেনাল ধমনির** (renal artery) মাধ্যমে বৃক্কে রক্ত প্রবেশ করে এবং একজোড়া **রেনাল শিরার** (renal vein) মাধ্যমে বৃক্ক হতে রক্ত বের হয়ে যায়। প্রতিটি বৃক্ক অসংখ্য (প্রায় ১০-১২ লাখ) **নেফ্রন** নিয়ে গঠিত।

❑ **কাজ :** মানুষের বৃক্কের লম্বচ্ছেদের চিত্র পোস্টারে এঁকে শিক্ষককে দেখাও।

বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠন : নেফ্রন (Ultra structure of kidney : Nephron)

বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত এককে নেফ্রন বলে। মানুষের প্রতিটি বৃক্কে প্রায় ১০ লাখ থেকে ১২ লাখ নেফ্রন রয়েছে। প্রতিটি নেফ্রনের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ সেন্টিমিটার। এ হিসেবে প্রত্যেক বৃক্কের নেফ্রনগুলো পরপর জুড়ে দিলে ৩৬ কি.মি. (প্রায় ২২.৫ মাইল) এরও বেশি লম্বা হবে। বৃক্কে থাকা নেফ্রনের অবিরত কাজের ফলে প্রতি মিনিটে প্রায় ১২৫ ঘন সে.মি. তরল রক্ত পরিস্রুত হয়। এর ৯৯% পানিই বিশোধিত হয়ে রক্তে ফিরে যায়। প্রতি ঘন সেমি. মূত্র সৃষ্টি হতে

Scanned with CamScanner

সময় লাগে প্রায় ১ মিনিট। প্রকৃতপক্ষে বৃক্কের কার্যাবলি হলো সকল নেফ্রনের কাজের সমষ্টি। মূত্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া মূলত নেফ্রনেই সংঘটিত হয়। তোমরা নবম ও দশম শ্রেণিতে নেফ্রন সম্পর্কে পড়েছ। তাই সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া হলো।

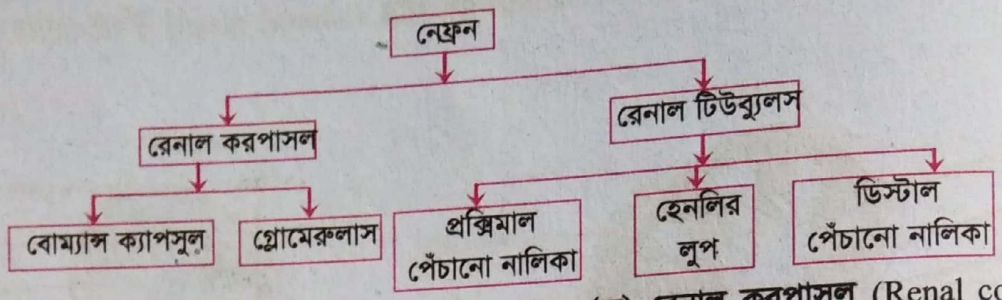

একটি নেফ্রনকে প্রধানত ২টি অংশে ভাগ করা যায়, যথা– **(ক) রেনাল করপাসল** (Renal corpuscle) এবং (খ) **রেনাল টিউব্যুলস** (Renal tubules)।

(ক) রেনাল করপাসল (Renal corpuscle) বা **মালপিজিয়ান করপাসল** বা **মালপিজিয়ান বডি :** বৃক্কের কর্টেক্স অঞ্চলে অবস্থিত গোলাকার থলে আকৃতির অংশকে **রেনাল করপাসল** বলে। ইহা নেফ্রনের অগ্রভাগে অবস্থিত। **বোম্যান্স ক্যাপসুল** ও **গ্লোমেরুলাসের** সমন্বয়ে রেনাল করপাসল গঠিত।

১। **বোম্যান্স ক্যাপসুল বা রেনাল ক্যাপসুল** (Bowman's or Renal capsule) **:** রেনাল করপাসলে গ্লোমেরুলার কৈশিক জালিকা গুচ্ছকে ঘিরে অবস্থিত ০.২ মিলিমিটার ব্যাসের ও আঁইশাকার এপিথেলিয়ামে গঠিত দ্বিস্তরী পেয়ালার মতো প্রসারিত অংশকে **বোম্যানস ক্যাপসুল** বলে। এটি নেফ্রনের বদ্ধ, পেয়ালাকৃতির স্ফীত প্রান্ত, যা গ্লোমেরুলাসকে আবৃত করে রাখে। এটি বাইরের দিকে **প্যারাইটাল স্তর** (parietal layer) এবং ভেতরের দিকে **ভিসেরাল স্তর** (visceral layer) নামক দুটি একক স্তর দিয়ে গঠিত এবং দুই স্তরের মাঝে **ক্যাপসুলার স্পেস** নামক সংকীর্ণ গহ্বর থাকে। প্যারাইটাল স্তরটি **স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ** এবং ভিসেরাল স্তরটি **পোডোসাইট** (podocyte) নামক বিশেষ ধরনের প্রবর্ধনযুক্ত কোষে গঠিত। পোডোসাইট কোষ থেকে যে ক্ষণপদ নির্গত হয়েছে তাদের **পেডিসেল** (pedicels) বলে। দুটি পেডিসেলের মাঝখানে যে ফাঁকা স্থানগুলো থাকে তাদের **পরিস্রাবণ ছিদ্র** (filtering slits or Slit pore) বলে। এই ছিদ্রের মাধ্যমে **পরিস্রাবণ** প্রক্রিয়াটি ঘটে।

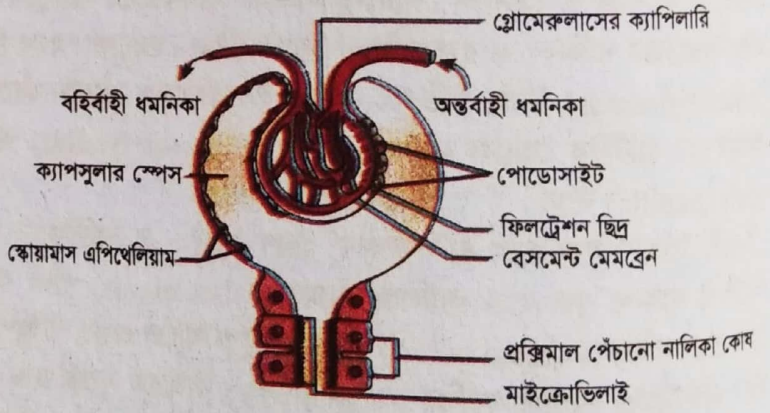

চিত্র ৬.৩.১ : একটি রেনাল করপাসল

২। **গ্লোমেরুলাস** (Glomerulus) **:** বোম্যান্স ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে কৈশিক জালিকার গুচ্ছকে **গ্লোমেরুলাস** বলে। বৃক্কীয় বা রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্ট একটি ক্ষুদ্র **অন্তর্বাহী** বা **অ্যাফারেন্ট ধমনিকা** (afferent arteriole) বোম্যান্স ক্যাপসুলে প্রবেশ করে এবং ৫০-৬০টি কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়ে **গ্লোমেরুলাস** গঠন করে। কৈশিক জালিকাগুলো পুনরায় মিলিত হয়ে **বহির্বাহী** বা **ইফারেন্ট** ধমনিকা (efferent arteriole) রূপে বোম্যান্স ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে **রেনাল টিউব্যুলস**-এর চারদিকে সূক্ষ্ম কৈশিক জালিকা গঠন করে। **অন্তর্বাহী ধমনিকার ব্যাস বহির্বাহী ধমনিকার চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে গ্লোমেরুলাসে সর্বদা উচ্চ রক্তচাপ বজায় থাকে।**

কাজ : রেনাল করপাসলে রক্তের আল্ট্রাফিলট্রেশন বা অতি সূক্ষ্ম ছাঁকন ঘটে এবং রক্ত হতে রেচন বর্জ্য, পানিসহ অন্যান্য দ্রব্য পরিস্রুত হয়ে **গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেট** (glumerulars filtrate) হিসেবে বোম্যান্স ক্যাপসুলে জমা হয়।

2020/8/4 17:41

Scanned with CamScanner

(খ) বৃক্কীয় বা রেনাল নালিকা বা রেনাল টিউব্যুলস (Renal tubules) : এটি রেনাল করপাসলের পরবর্তী অংশ। প্রতিটি রেনাল টিউব্যুলস প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা সূক্ষ্ম নালিকা। এর কোনো অংশ পেঁচানো, কোনো অংশ সোজা। একে ৩টি অংশে ভাগ করা যায়। যথা–

১। প্রক্সিমাল (নিকটবর্তী) পেঁচানো নালিকা (Proximal convoluted tubule) : বোমান্স ক্যাপস্যুলের পরবর্তী পেঁচানো দীর্ঘ নালিকাকে **প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকা** বলে। এটি প্রায় ১৪ মিলিমিটার লম্বা, পেঁচানো অংশ। ইহা কর্টেক্স অঞ্চলে অবস্থান করে। এ নালিকার মাধ্যমে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট **হেনলির লুপে** পরিবাহিত হয়। এ নালিকা কিউবয়ডাল ঘনতলাকার একস্তর এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। কোষগুলোর একপ্রান্তে অসংখ্য **মাইক্রোভিলাই** (microvilli) যুক্ত, যা ব্রাশকর্তার নামে পরিচিত এবং অন্যপ্রান্তটি ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে ব্যাসাল চ্যানেল তৈরি করে।

২। হেনলির লুপ (Loop of Henle) : প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকার শেষপ্রান্ত সোজা হয়ে মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে ও একটি লুপ বা ফাঁস গঠন করে। আবিষ্কারক **ফ্রেডরিখ হেনলির** (Friedrich Henle) নামানুসারে একে **হেনলির লুপ** বলে। হেনলির লুপ দেখতে অনেকটা ইংরেজি U অক্ষরের মতো। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ মিলিমিটার। হেনলির লুপে দুটি অংশ দেখা যায়, যথা– **নিম্নগামী বাহু** (descending limb) ও **উর্ধ্বগামী বাহু** (ascending limb)। নিম্নগামী বাহুটি প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকার শেষ প্রান্ত থেকে মেডুলার অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উর্ধ্বগামী বাহু কর্টেক্স অঞ্চলে অবস্থিত। স্থূলপ্রাচীর বিশিষ্ট বাহু কিউবয়ডাল ও এপিথেলিয়াল কোষ এবং সরু বাহু স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম দ্বারা গঠিত।

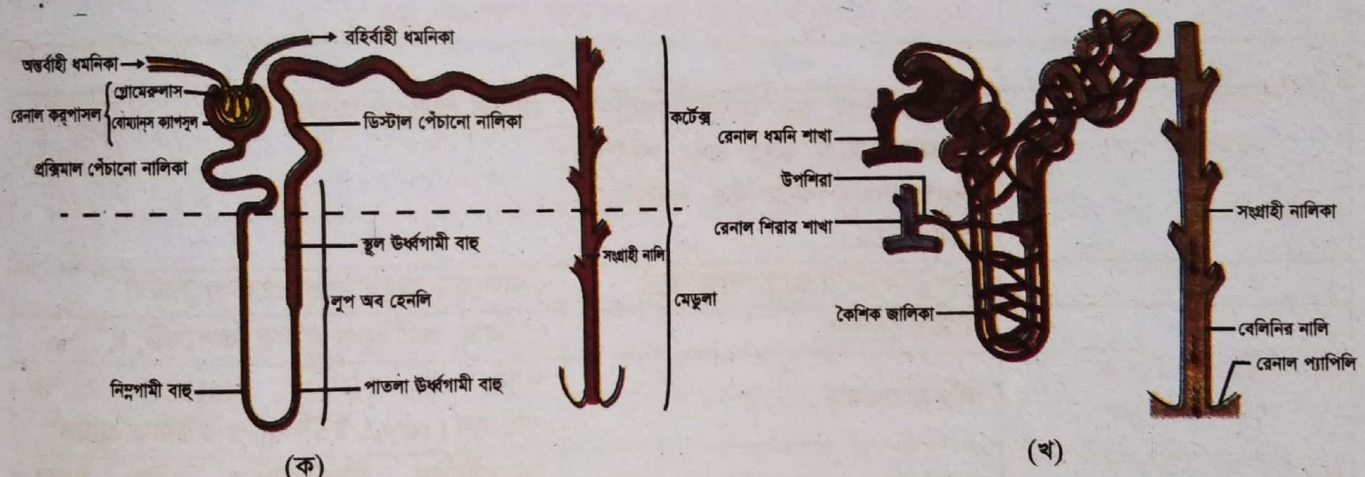

৬.৩.২ : একটি নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ : (ক) কৈশিক জালিকাবিহীন সরলচিত্র ও (খ) কৈশিক জালিকাযুক্ত

৩। ডিস্টাল (দূরবর্তী) পেঁচানো নালিকা (Distal convoluted Tubule) : হেনলির লুপের উর্ধ্ববাহুর পরবর্তী পেঁচানো দীর্ঘ নালিকে **ডিস্টাল পেঁচানো** নালিকা বলে। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ মিলিমিটার। ইহা বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থান করে। এর শেষ প্রান্ত সংগ্রাহক নালিকায় উন্মুক্ত হয়। এর প্রাচীর একস্তরী কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াম কোষ দিয়ে গঠিত।

বৃক্কীয় নালিকার কাজ : গ্লোমেরুলাস পরিস্রুত তরল থেকে দেহের প্রয়োজনীয় বস্তু সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে শোষণ করে। রেনাল টিউব্যুলসের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী নালিকা সূক্ষ্ম **কৈশিক জালিকা** বা **পেরিটিউব্যুলস ক্যাপিলারি** (peritubules capillaries) দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এগুলো নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ হতে বিভিন্ন বস্তু পুনঃশোষণ করে। নেফ্রনের নিকটবর্তী পেঁচানো নালিকায় **নির্বাচিত পুনঃশোষণ** (selective reabsorption) ঘটে। এর হেনলির লুপ হতে পানি এবং দূরবর্তী পেঁচানো নালিকা হতে সামান্য পানি ও অন্যান্য বস্তু পুনঃশোষিত হয়।

সংগ্রাহক নালিকা (Collecting duct) : নেফ্রনের ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা পরবর্তী যে সোজা নালির সাথে যুক্ত থাকে তাকে **সংগ্রাহক বা সংগ্রাহী নালিকা** বলে। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ মিলিমিটার। একটি সংগ্রাহক নালিতে কয়েকটি নেফ্রন যুক্ত থাকে। এর কিছু অংশ কর্টেক্সে এবং কিছু অংশ মেডুলাতে অবস্থান করে। এর প্রাচীর একস্তরী ঘনতলাকার কোষে গঠিত। কয়েকটি সংগ্রাহক নালি মিলিত হয়ে **ডাক্ট অব বেলিনি** (duct of Bellini) নামের সাধারণ নালি গঠন করে। বেলিনির নালিগুলো রেনাল পিরামিডের শীর্ষভাগে **বেলিনির ছিদ্র** বা রেনাল প্যাপিলার মাধ্যমে বৃক্কের পেলভিসে উন্মুক্ত হয়।

Scanned with CamScanner

নেফ্রনের কাজ (Functions of Nephron) : নেফ্রনের প্রধান কাজ হলো মূত্র উৎপাদন করা। অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন, পুনঃশোষণ, ক্ষরণ ও নতুন পদার্থ উৎপাদনের মাধ্যমে নেফ্রন মূত্র উৎপাদন করে।

১। অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন (Ultrafiltration) : নেফ্রন এর রেনাল করপাসলের গ্লোমেরুলাস অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন রূপে কাজ করে। এটি রক্ত থেকে কোলয়েড অংশ ছাড়া বাকি উপাদানগুলোকে পরিস্রুত করে বোম্যান্স ক্যাপসুলে পাঠায়। পরিস্রুত এই তরলকে **গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটও** বলে।

২। পুনঃশোষণ (Re-absorption) : বৃক্কীয় বা রেনাল নালিকা গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেট থেকে দেহের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ অংশ, বিশেষ করে গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, অধিকাংশ খনিজ লবণ এবং পানির বেশিরভাগ অংশ পুনরায় শোষণ করে রক্তে ফেরত পাঠায়। ADH (Anti Diuretic Hormone) পানি পুনঃশোষণে সাহায্য করে। ফলে প্রয়োজনীয় এই উপাদানগুলো সাধারণভাবে মূত্রে থাকে না।

৩। টিউব্যুলার ক্ষরণ (Tubular secretion) : বৃক্কীয় নালিকা রক্তের কিছু অপ্রয়োজনীয় উপাদান ক্ষরণ করে নালিকাগহ্বরে মুক্ত করে। এই উপাদানগুলো হলো প্রধানত সালফার ঘটিত যৌগ, ক্রিয়েটিনিন, K^+, NH_4^+, বিভিন্ন রকম জৈব এসিড ইত্যাদি।

৪। নতুন পদার্থ উৎপাদন (Formation of new substances) : বৃক্কীয় নালিকার এপিথেলীয় কোষ দ্বারা বিভিন্ন ক্ষতিকারক যৌগ উৎপন্ন হয়ে নালিকাগহ্বরে মুক্ত হয় এবং মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। এই যৌগগুলো হলো– অ্যামোনিয়া, হিপপিউরিক এসিড, অজৈব ফসফেট ইত্যাদি।

৫। pH মাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Balancing of pH) : দেহস্থিত pH এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ ও সংগ্রাহক নালির কাজের ছক

নেফ্রনের অংশ	কাজ	বস্তুর নাম
১। বোম্যান্স ক্যাপসুল বা রেনাল ক্যাপসুল	এর ভিসেরাল স্তর আলট্রাফিলট্রেশন অঙ্গরূপে কাজ করে এবং পরিস্রুত তরল সংগ্রহ করে বৃক্ক নালিকাতে প্রেরণ করে।	রক্তের পরিস্রুত তরল।
২। গ্লোমেরুলাস	আলট্রাফিলটার রূপে কাজ করে	কোলয়েড অংশ ছাড়া রক্তের প্লাজমা।
৩। বৃক্কীয় নালিকা বা রেনাল টিউব্যুলস : (i) প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকা	সক্রিয় শোষণ	গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফসফেট, K^+, Na^+.
	নিষ্ক্রিয় শোষণ	পানি, Cl^-, HCO_3^-, $NaHCO_3$ ও স্বল্প পরিমাণ (10%) ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড।
	ক্ষরণ	ক্রিয়েটিনিন, হিপপিউরিক এসিড, রঞ্জক, পেনিসিলিনসহ ড্রাগস, H^+ ও NH_3।
(ii) হেনলির লুপ	সক্রিয় শোষণ	K^+, Na^+, Cl^-, ইউরিয়া, Ca^{++}, Mg^{++}
	নিষ্ক্রিয় শোষণ	পানি
	ক্ষরণ	ইউরিয়া
(iii) ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা	শোষণ	পানি, Na^+
	ক্ষরণ	H^+, K^+, NH_3
সংগ্রাহক বা সংগ্রাহী নালি	সক্রিয় শোষণ	K^+
	নিষ্ক্রিয় শোষণ	পানি, Na^+
	ক্ষরণ	K^+, H^+, HCO_3^-, NH_3
	পরিস্রুত ও পুনঃশোষিত তরল সংগ্রহ করে ইউরেটারে প্রেরণ।	-

বৃক্কে রক্ত সরবরাহ : রেনাল ধমনির মাধ্যমে রক্ত সরাসরি বৃক্কে প্রবেশ করে। রেনাল ধমনি শাখান্বিত হয়ে অ্যাফারেন্ট ধমনিকা উৎপন্ন করে যা রক্তকে ফিলট্রেশন স্থানে অর্থাৎ গ্লোমেরুলাসে পরিবহন করে। গ্লোমেরুলাস প্রকৃতপক্ষে একগুচ্ছ কৈশিক জালিকা যা সব শেষে যুক্ত হয়ে একটি ইফারেন্ট ধমনিকা সৃষ্টি করে, যা রক্তকে গ্লোমেরুলাসের বাইরে পরিবহন করে। রেনাল ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে ইফারেন্ট ধমনিকা রেনাল টিবিউল-এর (অর্থাৎ

2020/8/4 17:41

Scanned with CamScanner

প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকা, লুপ অব হেনলি ও ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা) চারপাশে একটি বিস্তৃত কৈশিক জালিকা বা **পেরিটিউবুলার নেটওয়ার্ক অব ক্যাপিলারিস** সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এই কৈশিক জালিকা মিলিত হয়ে ভেনিউলের (উপশিরা) সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বৃক্কের ভেনিউল মিলিত হয়ে একটি একক রেনাল শিরা গঠন করে যা বৃক্ক থেকে পরিষ্কার রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভার মাধ্যমে সংবহনতন্ত্রে প্রেরণ করে।

নেফ্রনের প্রকারভেদ : বৃক্কের কর্টেক্সে নেফ্রনের মালপিজিয়ান বডি বা রেনাল করপাসলের অবস্থানের ভিত্তিতে মানুষের নেফ্রন ৩ প্রকার, যথা–

১। **সুপারফিসিয়াল কর্টিক্যাল নেফ্রন** (Superficial cortical nephrons) : এদের করপাসল বৃক্কের কর্টেক্সের পরিধির দিকে এক মিলিমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। বৃক্কের ৮৫% নেফ্রনই এ প্রকৃতির। এদের হেনলির লুপ খাটো এবং এগুলো ছোট আকৃতির হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এরা মূত্র উৎপাদন করে।

২। **মিড কর্টিক্যাল নেফ্রন** (Midcortical nephrons) : এদের রেনাল করপাসল কর্টেক্সের মাঝামাঝিতে অবস্থান করে। এদের হেনলির লুপ খাটো বা লম্বা হয়ে থাকে। বৃক্কের মাত্র ৫% নেফ্রন এ প্রকৃতির।

৩। **জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন** (Juxtamedullary nephrons) : এদের রেনাল করপাসল কর্টেক্সের গভীরে কর্টেক্স-মেডুলার সংযোগস্থলের ওপরে অবস্থান করে। বৃক্কের মাত্র ১০% নেফ্রন এ প্রকৃতির। এদের হেনলির লুপ লম্বা এবং এগুলো তুলনামূলকভাবে বড় আকৃতির হয়। এরা জরুরি অবস্থায় মূত্র উৎপাদন করে।

বৃক্কের কাজ : মূত্র উৎপাদন বৃক্কের প্রধান কাজ হলেও এটি নিম্নলিখিত বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

১। **রেচন বর্জ্য অপসারণ :** বৃক্ক দেহ হতে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে।

২। **পানি সাম্যতা রক্ষা বা অসমোরেগুলেশন :** বৃক্ক দেহে এবং রক্তে পানির ভারসাম্য রক্ষা করে।

৩। **অন্যান্য পদার্থের অপসারণ :** বৃক্ক হতে বিভিন্ন টক্সিক পদার্থ, ভেষজ পদার্থ, রঞ্জক, অতিরিক্ত ভিটামিন, ওষুধ ও হরমোন বহিষ্কৃত হয়; বৃক্কের মাধ্যমে রক্ত থেকে অতিরিক্ত চিনি ও অ্যামিনো এসিড অপসারিত হয়।

৪। **pH এর নিয়ন্ত্রণ :** বৃক্ক দেহের বিভিন্ন তরলের pH নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেহে অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

৫। **লবণের সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ :** বৃক্ক রক্তের সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খনিজ লবণের সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। **অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ :** বৃক্ক দেহে রক্ত ও কোষ-কলার অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৭। **রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ :** বৃক্ক দেহের সাম্যতা বজায় রাখে, ফলে দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৮। **রক্তের উপাদান নির্দিষ্ট রাখা :** বৃক্ক রক্তের রক্তরস ও রক্তকণিকার পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখে।

৯। **হরমোন উৎপাদন :** বৃক্কে **এরিথ্রোপয়েটিন** (erythropoietin), **প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন** (prostaglandin) এবং **অ্যানজিওটেনসিন** (angiotensin) হরমোন উৎপন্ন হয়। এরিথ্রোপয়েটিন **এরিথ্রোসাইট** (RBC) উৎপাদনে উদ্দীপনা জোগায়।

১০। **এনজাইম ক্ষরণ :** বৃক্ক **রেনিন** (renin) নামক একপ্রকার এনজাইম ক্ষরণ করে যার কার্যকারিতা হরমোনের মতো।

১১। **হোমিওস্ট্যাসিস** (Homeostasis) : বৃক্ক রক্ত থেকে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বস্তু অপসারিত করে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে স্থিতাবস্থায় রাখে।

১২। **গ্লাইকোনিওজেনেসিস** (Glyconeogenesis) : দেহে শর্করার অভাব ঘটলে বৃক্ক গ্লাইকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রোটিন ও লিপিড থেকে শর্করা উৎপাদন করে। বৃক্ক এসময় প্রায় ২০% গ্লুকোজ সরবরাহ করতে পারে।

[**তথ্য :** বৃক্কীয় এনজাইম রেনিন অ্যানজিওটেনসিনোজেনকে (angiotensinogen-যকৃতে উৎপন্ন ও প্লাজমায় অবস্থিত একধরনের প্রোটিন) **অ্যানজিওটেনসিন-I** (angiotensin-I)-তে রূপান্তরিত করে। অ্যানজিওটেনসিন-I ফুসফুসীয় জালকে Angiotensin Converting Enzyme (ACE) দ্বারা **অ্যানজিওটেনসিন-II** তে পরিণত হয়। অ্যানজিওটেনসিন-II অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে **অ্যালডোস্টেরন** (aldosterone) হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপনা দান করে। এই হরমোন নেফ্রনের কোষকে উদ্দীপিত করে Na^+ পুনঃশোষণ হার বৃদ্ধি করে।]

১৩। **পুনঃশোষণ :** বৃক্ক দেহে পানি, গ্লুকোজ ও অ্যামিনো এসিড পুনঃশোষণের সাথে জড়িত।

কাজ : (i) মানুষের বৃক্কের চিত্রসহ অন্তর্গঠন বর্ণনা কর। (ii) মানুষের বৃক্কের লম্বচ্ছেদের চিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। (iii) বৃক্কের গাঠনিক এককের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। (iv) বৃক্কের গাঠনিক এককের বর্ণনা দাও। (v) বৃক্কের গাঠনিক ও কার্যিক এককের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (vi) বৃক্কের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

Scanned with CamScanner

নেফ্রন ও নিউরনের পার্থক্য

নেফ্রন	নিউরন
১। নেফ্রন শুধু বৃক্কে অবস্থান করে।	১। নিউরন দেহের সর্বত্রই বিদ্যমান।
২। বৃক্কের গঠন ও কার্যের একক।	২। স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যের একক।
৩। রেনাল করপাসল (বোম্যান্স ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাস) ও রেনাল টিউব্যুলস (প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকা, লুপ অব হেনলি এবং ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা) নিয়ে গঠিত।	৩। কোষদেহ, ডেনড্রাইট ও অ্যাক্সন নিয়ে গঠিত।
৪। রক্ত থেকে N_2 ঘটিত বর্জ্য পৃথক করে মূত্র তৈরি করে।	৪। মস্তিষ্কের দিকে বা মস্তিষ্ক থেকে উদ্দীপনা পরিবহন করে।
৫। ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয়।	৫। ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয়।

মালপিজিয়ান বডি ও মালপিজিয়ান নালিকার মধ্যে পার্থক্য

মালপিজিয়ান বডি/করপাসল	মালপিজিয়ান নালিকা
১। মানবদেহের রেচনঅঙ্গ বৃক্কে অবস্থিত নেফ্রনের উপরের পেয়ালাকৃতির অংশ।	১। ঘাসফড়িং ও আরশোলাসহ অন্যান্য কীটপতঙ্গে রেচনঅঙ্গ যা মেসেন্টেরন ও প্রোক্টোডিয়ামের সংযোগস্থলে অবস্থিত।
২। গোলাকার গঠন; বোম্যান্স ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাস নামক কৈশিক জালিকাগুচ্ছ নিয়ে গঠিত।	২। নলাকার নালি; একস্তরবিশিষ্ট কোষ দ্বারা গঠিত।
৩। এদের সংখ্যা প্রতি বৃক্কে ১০-১২ লাখ।	৩। এদের সংখ্যা ৬০-১০০টি।
৪। রক্ত থেকে আল্ট্রাফিলট্রেশনের মাধ্যমে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট তৈরি করে।	৪। হিমোলিম্ফ থেকে ইউরেট ও ইউরিক এসিড শোষণ করে খাদ্যনালিতে প্রেরণ করে।

Rennin (রেনিন) ও Renin (রেনিন) এর মধ্যে পার্থক্য

Rennin (রেনিন)	Renin (রেনিন)
১। এটি পাকস্থলীর পেপটিক কোষ থেকে ক্ষরিত হয়।	১। এটি বৃক্কের জাক্সটাগ্লোমেরুলার কোষ থেকে ক্ষরিত হয়।
২। এটি প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম।	২। এটি এনজাইম হলেও হরমোন হিসেবে কাজ করে।
৩। এটি প্রোরেনিন রূপে নিঃসৃত হয়ে HCl-এর সহায়তায় রেনিনে (rennin) পরিণত হয়।	৩। এটি রেনিন (renin) রূপে নিঃসৃত হয়।
৪। দুগ্ধ প্রোটিন ক্যাসিনকে পরিপাকে সাহায্যে করে।	৪। এটি অ্যানজিওটেনসিনোজেনকে অ্যানজিওটেনসিন-I-এ পরিণত করে। অতঃপর Na+ পুনঃশোষণ হার বৃদ্ধি করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

৬.২ রেচনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Excretion)

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন (excretion) **বলে**। রক্তরসই মূত্র সৃষ্টির একমাত্র উৎস; কিন্তু রক্তরস ও মূত্রের উপাদানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। দেহে আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এসব বর্জ্য পদার্থ দেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং ইহা অবশ্যই দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হয়। মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত **রেচন বর্জ্য** হলো- **ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ক্রিয়েটিন** ইত্যাদি। এদের মধ্যে ইউরিয়ার পরিমাণ সর্বাধিক এবং ইহা মূত্রের সাথে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। যকৃতে ইউরিয়া সৃষ্টি হয় এবং রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে বৃক্কে পৌঁছায়। বৃক্কে মূত্র তৈরি হয়। রেচনে এরূপ ইউরিয়ার আধিক্য থাকাকে **ইউরিটেলিজম** (ureotelism) বলে। রেচনের শারীরবৃত্তকে দুটি ধাপে আলোচনা করা যায়। যথা– ১। **নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্যের উৎপত্তি** ও ২। **মূত্র তৈরির প্রক্রিয়া**।

2020/8/4 17:42

Scanned with CamScanner

১। নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্যের উৎপত্তি (Production of Nitrogenous Waste)

(ক) ইউরিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া (Formation of Urea)

প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। অ্যামিনো এসিড প্রধানত দেহ গঠন ও বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। যকৃতে অব্যবহৃত ও অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড থেকে এনজাইমের উপস্থিতিতে **ডিঅ্যামিনেশন** (deamination) প্রক্রিয়ায় কিটো এসিড ও অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) সৃষ্টি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে। অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন করে।

এই অ্যামোনিয়া দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইহা শর্করা বিপাকে সৃষ্ট CO_2 এর সাথে মিলিত হয়ে **যকৃতে ইউরিয়া** [$CO(NH_2)_2$] সৃষ্টি করে। এক অণু CO_2 দুই অণু NH_3 এর সাথে মিলিত হয়ে এক অণু ইউরিয়া গঠন করে। **Hans Krebs** এবং **Kurt Henseleit** (1932) ইউরিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন। তাঁদের মতে **ইউরিয়া চক্র** (urea cycle) বা **অরনিথিন চক্রের** (ornithine cycle) মাধ্যমে ইউরিয়া সৃষ্টি হয়। ইউরিয়া রক্তরসে (প্লাজমায়) অবস্থান করে এবং সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌছায়। ইউরিয়া সৃষ্টির সরল বিক্রিয়াসমূহ নিম্নরূপ :

(i) অ্যামিনো এসিড $\xrightarrow[\text{ডিঅ্যামিনেশন}]{\text{ডিঅ্যামাইনেজ}}$ কিটো এসিড + $-NH_2$

(ii) $-NH_2 + H^+ \longrightarrow NH_3$ (অ্যামোনিয়া)

(iii) $2NH_3 + CO_2 \xrightarrow{\text{অরনিথিন চক্র}} CO(NH_2)_2$ (ইউরিয়া) + H_2O

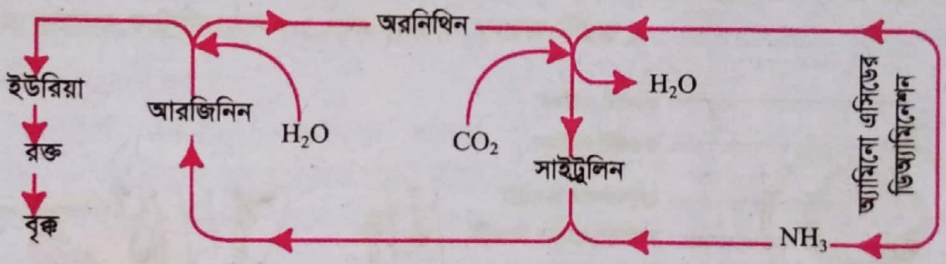

চিত্র ৬.৪ : অরনিথিন চক্র

(খ) ইউরিক এসিড সৃষ্টির প্রক্রিয়া : মানবদেহের যকৃতের কোষে পিউরিন বিপাকের শেষ পরিণতি হচ্ছে ইউরিক এসিড উৎপাদন। দেহজাত ও গৃহীত খাদ্য এ দু'ধরনের পিউরিন জাতীয় পদার্থ থেকেই ইউরিক এসিড উৎপন্ন হয়ে বৃক্কে পৌছে। এটি বৃক্ক দ্বারা দেহ হতে বহিষ্কৃত হয়। ইউরিক এসিডের রাসায়নিক সংকেত হলো– $C_5H_4O_3N_4$। অনেক সময় মূত্রে অতিমাত্রায় ইউরিক এসিড (হাইপারইউরিকোসিয়া) থাকলে ইউরিক এসিড বৃক্ক, রেচননালি কিংবা মূত্রথলিতে সঞ্চিত হয়ে সুই আকৃতির স্ফটিক সৃষ্টি করে যা **বৃক্কের পাথর** বা **রেনাল ক্যালকুলি** (kidney stone or renal calculi) নামে চিহ্নিত। তবে বৃক্কের পাথর অন্যান্য পদার্থ জমা হয়েও সৃষ্টি হতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম গ্রহণ, পানি পান কম করা, মূত্রে অতিরিক্ত ক্ষার বা অম্ল সৃষ্টি হওয়া, প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির অতি সক্রিয়তা ইত্যাদি বৃক্ক পাথর সৃষ্টির মূল কারণ। বৃক্ক পাথর প্রধানত ক্যালসিয়াম অক্সালেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং ইউরিক এসিড উপাদানে গঠিত।

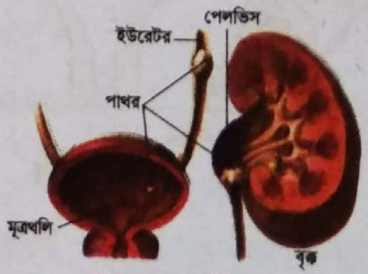

মানব রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গে পাথর



রেচন অঙ্গে সৃষ্ট পাথর

(গ) ক্রিয়েটিনিন সৃষ্টির প্রক্রিয়া : দেহের পেশির কলা-প্রোটিনের ভাঙনের মধ্য দিয়ে যে জটিল নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্যের সৃষ্টি হয় যা ক্রিয়েটিনিন নামে পরিচিত। বৃক্কে রক্ত থেকে ক্রিয়েটিনিন পরিস্রুত হয়ে মূত্রের সাথে বহিঃষ্কৃত হয়। বৃক্কের সুস্থতা নির্ণয়ে রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। এজন্য এর মাত্রাকে **বৃক্কের রোগ নির্ণয়ের নির্দেশক** (dignostic index) হিসেবে গণ্য করা হয়। বৃক্কে সমস্যা দেখা দিলে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে যায়। পুরুষের রক্তে এর স্বাভাবিক মাত্রা 0.6 - 1.2 mg/dl এবং মহিলাদের রক্তে এর স্বাভাবিক মাত্রা 0.5 - 1.1 mg/dl (mg= milligrams, dl= deciliter).

Scanned with CamScanner

২। মূত্র তৈরির প্রক্রিয়া (Mechanism of Formation of Urine)

রক্তের প্লাজমার পানির সাথে ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড পরিবাহিত হয়ে বৃক্কে আসে এবং ছাঁকন পদ্ধতিতে রক্ত থেকে নিষ্কাশিত হয়। গ্লোমেরুলার আল্ট্রাফিলট্রেশন নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ ও কিছু বস্তুর ক্ষরণের ফলে মূত্র তৈরি হয়। **দেহের সকল রক্ত ছাঁকনের জন্য প্রতি ৪-৫ মিনিটে একবার বৃক্ক অতিক্রম করে।** স্কটিস শারীরবিজ্ঞানী কাশনি (Cushney, 1917) এর মত অনুসারে, N_2 ঘটিত বর্জ্য রক্তের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় বৃক্কে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে আল্ট্রাফিলট্রেশন পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ত থেকে বর্জ্য পৃথক হয়ে গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেট তৈরি হয়। গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেট থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান পুনঃশোষণ হয়ে রক্তে ফেরত যায় এবং রক্ত থেকে কিছু বস্তু ক্ষরিত হয়ে ফিলট্রেটের সাথে যুক্ত হয় এবং মূত্র তৈরি হয়। মূত্র তৈরির প্রক্রিয়া ৩টি ধাপে সংঘটিত হয়। যথা–

(ক) গ্লোমেরুলার ছাঁকন বা অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন (Glomerular filtration or Ultrafiltration) : বৃক্কের রেনাল করপাসলে **আল্ট্রাফিলট্রেশন** ঘটে। স্বাভাবিকভাবে যেকোনো ফিলট্রেশনের জন্য প্রয়োজন চাপ তৈরির প্রক্রিয়া এবং একটি ফিল্টার বা ছাঁকনযন্ত্র। রক্তের **হাইড্রোস্টেটিক চাপ** (hydrostatic pressure) থেকে এই চাপ তৈরি হয়। হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন পৃষ্ঠীয় ধমনি, রেনাল ধমনি ও অ্যাফারেন্ট ধমনিকার মাধ্যমে রক্ত অতি উচ্চ চাপে গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে। অ্যাফারেন্ট ধমনিকার ব্যাস ইফারেন্ট ধমনিকা ও কৈশিক জালিকার ব্যাসের চেয়ে বেশি। ফলে বড় ব্যাসবিশিষ্ট অ্যাফারেন্ট ধমনিকার মাধ্যমে রক্ত যখন গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে তখন চাপ বৃদ্ধি পায়। এই চাপের ফলে পানি ও ক্ষুদ্র দ্রব (যেমন-লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড প্রভৃতি) অণুসহ **গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেট** (glomerulars filtrate) বা প্রাথমিক মূত্র রেনাল **ক্যাপসুলার স্পেস** বা গহ্বরে জমা হয়। বৃহৎ প্রোটিন অণু, লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা রক্তে থেকে যায়। ফিলট্রেশনের জন্য গ্লোমেরুলাস ও রেনাল ক্যাপসুল বিশেষভাবে অভিযোজিত। ফিলট্রেশনে তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত ফিল্টারের মাধ্যমে সংঘটিত হয়, যথা–

(i) গ্লোমেরুলাসের এন্ডোথেলিয়াম : এ স্তরটি অত্যন্ত পাতলা এবং ১০ ন্যানোমিটার ব্যাসের অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত।

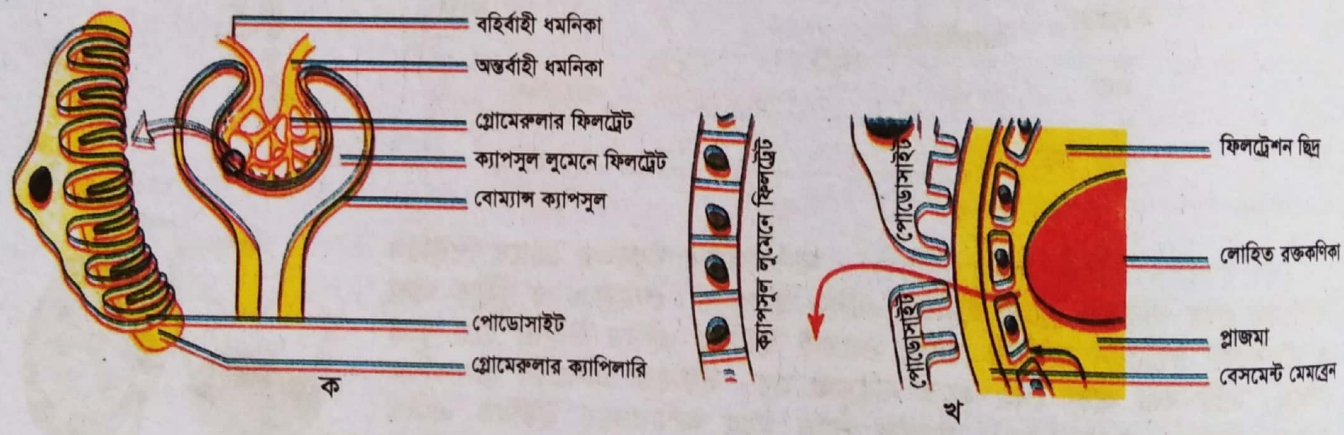

চিত্র ৬.৫.১ : রেনাল ক্যাপসুলের সূক্ষ্ম গঠন ও ফিলট্রেশন (ক ও খ)

(ii) গ্লোমেরুলাসের বেসমেন্ট মেমব্রেন : গ্লোমেরুলাসের এপিথেলিয়াল কোষ যে মেমব্রেনের উপর অবস্থান করে তাকে **বেসমেন্ট মেমব্রেন** বা ভিত্তি পর্দা বলে। এটি কোলাজেন সূত্রকসহ অসংখ্য সূত্রক দ্বারা তৈরি জালিকাকৃতির গঠন। পানি ও ক্ষুদ্র দ্রব অণু জালকের মাঝে ফাঁকা স্থান দিয়ে অতিক্রম করতে পারে কিন্তু লোহিত রক্তকণিকা, অনুচক্রিকা ও আমিষ অণু পারে না।

(iii) রেনাল ক্যাপসুলের এন্ডোথেলিয়াম : এ স্তরে ফিলট্রেশনের জন্য **পোডোসাইট** (podocyte) নামক বিশেষ কোষ থাকে। প্রতিটি কোষে আঙুলের মতো অনেক অভিক্ষেপ থাকে। পাশাপাশি পোডোসাইটের সংযোগস্থলে ২৫ ন্যানোমিটার ব্যাসের **ফিলট্রেশন** বা **ছাঁকনি ছিদ্র** থাকে।

এই ছাঁকনিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যাসের ছিদ্রপথে গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেট পরিস্রুত হয়। অপরদিকে এ পরিস্রুত রক্ত পরে বহির্বাহী ধমনিকাতে আসে। যে চাপের মাধ্যমে দ্রাব্য বস্তু পরিস্রুত হয়, তাকে **কার্যকরী পরিস্রাবণ চাপ** (effective filteration pressure) বলা হয়। মানবদেহে দুটি বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে প্রায় ১২০০ সিসি রক্ত প্রবাহিত হয়। এর মধ্যে প্রায় ১২৫ সিসি গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেটে পরিস্রুত হয়ে রেনাল ক্যাপসুল বা বোম্যান্স ক্যাপসুলার স্পেস-এ জমা হয়। এর মধ্যে ১২৪ সিসি রেনাল টিউব্যুলসে পুনঃশোষিত হয়।

Scanned with CamScanner

2020/8/4 17:42

(খ) টিউব্যুলার বা নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ (Tubular or Selective reabsorption) : গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেট নেফ্রনের রেনাল করপাসল থেকে রেনাল টিউব্যুলসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এর (গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেটে) ৮০% নির্বাচিত দ্রব্যাদি রক্তনালিকা কর্তৃক পুনঃশোষিত হয়। রেনাল টিউব্যুলস নিম্নলিখিত কারণে পুনঃশোষণের জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত :

(i) এর প্রাচীরের কোষগুলোতে মাইক্রোভিলাই ও বেসাল চ্যানেল থাকায় এদের শোষণ ক্ষেত্র বেশি।

(ii) এর কোষের সাইটোপ্লাজমে অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়ার উপস্থিতি।

(iii) কৈশিক জালিকার সাথে এদের ঘনসন্নিবিষ্ট অবস্থানের কারণে।

রেনাল টিউব্যুলসের বিভিন্ন অংশে যেসব পদার্থের পুনঃশোষণ সম্পন্ন হয় তা হলো–

(১) প্রক্সিমাল বা নিকটবর্তী পেঁচানো নালিকার কোষেই অধিকাংশ নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ ঘটে। এই অংশেই পরিস্রুত তরলের ৬০-৭০% পুনঃশোষিত হয়। প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকা হতে গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, Na^+, K^+, HCO_3^-, পানি ও সামান্য ইউরিয়া ইত্যাদি সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে শোষিত হয়।

(২) হেনলির লুপে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় ৭০% পানি পুনঃশোষিত হয়।

(৩) ডিস্টাল বা দূরবর্তী পেঁচানো নালিকা থেকে Na^+, Cl^- আয়ন, ভিটামিন ও কিছু পরিমাণ পানি পুনঃশোষিত হয়। **অ্যাল্ডোস্টেরন** হরমোন এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। অপরপক্ষে ADH (Anti Diuretic Hormone) পানি পুনঃশোষণে সাহায্য করে। এই কারণে ADH ক্ষরণ হ্রাস পেলে পানির পুনঃশোষণ হয় না ফলে বহুমূত্র বা **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস** রোগ হয়।

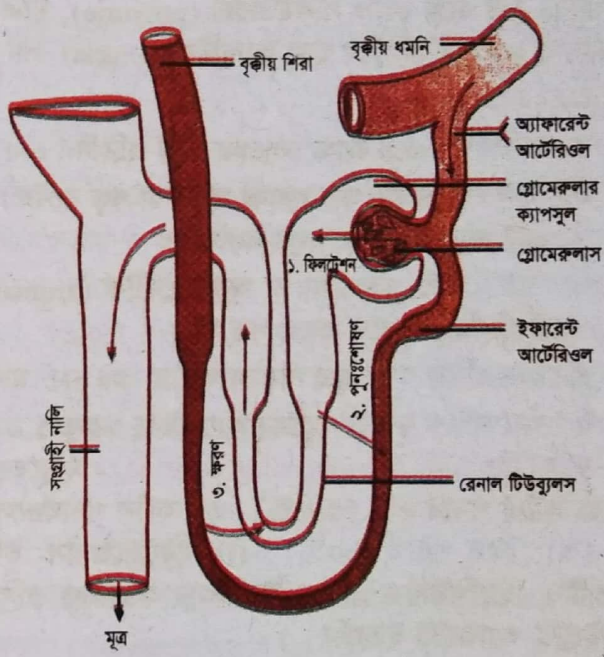

চিত্র ৬.৫.২ : নেফ্রনে মূত্র তৈরির কৌশল

গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটে ৪০-৫০% ইউরিয়া রেনাল টিউব্যুলস থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে ফিরে আসে। বাকি ইউরিয়া মূত্রের সাথে দেহ থেকে অপসারিত হয়।

(গ) নালিকা কর্তৃক ক্ষরণ বা সক্রিয় ক্ষরণ (Tubular or active secretion) : বিপাকে সৃষ্ট কিছু অপ্রয়োজনীয় উপজাত পদার্থ, যথা– ক্রিয়েটিনিন ও সামান্য ইউরিয়া প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকার চারপাশের কৈশিক জালিকা থেকে সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং মূত্রের সঙ্গে অপসারিত হয়। হেনলির লুপে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি ও লবণ পুনঃশোষিত হয়। ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা হতে (হাইড্রোজেন আয়ন, পটাশিয়াম ও অ্যামোনিয়াম আয়ন, সেরোটিনিন, কোলিন, হিস্টামিন ইত্যাদি ক্ষরিত হয়) গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট সংগ্রাহী নালিতে আসে এবং কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তনের (যথা– পানি ও আয়ন পরিশোষণ) ফলে শেষ পর্যন্ত মূত্রে পরিণত হয়। সুতরাং গ্লোমেরুলাসে ফিলট্রেট হয়ে ক্ষরিত পদার্থসহ অপেক্ষাকৃত গাঢ় যে তরল সংগ্রাহক নালি হয়ে পরিশেষে মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে **মূত্র** (urine) বলে। অতঃপর উৎপন্ন মূত্র সংগ্রাহী নালিকা, ইউরেটার হয়ে মূত্রথলি এবং মূত্রথলি থেকে মূত্রনালির মাধ্যমে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

❑ **কাজ :** (i) বৃক্কে তরল পদার্থ উৎপাদন কৌশল ব্যাখ্যা কর। (ii) বৃক্কের গ্লোমেরুলাস থেকে কীভাবে বর্জ্য পৃথক হয়– বর্ণনা কর। (iii) বিপাকীয় বর্জ্য CO_2 যৌগ আকারে পরিবাহিত হয়– ব্যাখ্যা কর। (iv) নেফ্রন কীভাবে উপজাত দ্রব্য নিষ্কাশন করে– ব্যাখ্যা কর। (v) নাইট্রোজেন জাত পদার্থ তৈরি ও নিষ্কাশন অতীব জরুরি– বিশ্লেষণ কর। (vi) নেফ্রনে জৈব রাসায়নিক পদার্থের বহুমুখী আচরণ সম্পর্কে আলোচনা কর। (vii) রেচনতন্ত্র ও শ্বসনতন্ত্র ভিন্ন তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে- বিশ্লেষণ কর।।

Scanned with CamScanner

মানবদেহে মূত্র নিষ্কাশনের প্রবাহচিত্র :

হৃৎপিণ্ড → অ্যাওর্টা → পৃষ্ঠীয় মহাধমনি → রেনাল ধমনি → অন্তর্বাহী ধমনিকা → গ্লোমেরুলাস → রেনাল ক্যাপসুল ↓ রেনাল নালিকা → সংগ্রাহী নালি → বৃক্কের পেলভিস → ইউরেটার → মূত্রথলি → মূত্রনালি → রেচনরন্ধ্র → নির্গমন

এছাড়াও বৃক্ক হতে বিভিন্ন বিষ, অতিরিক্ত ওষুধ ও হরমোন বহিঃষ্কৃত হয়। বৃক্কের মাধ্যমে রক্ত থেকে চিনি ও অ্যামিনো এসিড অপসারিত হয়।

মূত্র (Urine)

নেফ্রনের রেনাল টিউব্যুলসে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট-এর নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অম্লধর্মী তরল রেচন বর্জ্য মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে **মূত্র** (urine) বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক গড়ে ১.৫ লিটার মূত্র ত্যাগ করে। তবে কতকগুলো কারণ, যেমন- পানিগ্রহণ, খাদ্যের তারতম্য, পরিবেশের তাপমাত্রা, মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর মূত্র উৎপাদন ও ত্যাগ নির্ভর করে। সাধারণত লবণাক্ত খাদ্য মূত্রের পরিমাণ বাড়ায়। কিছু রোগ, যেমন- বহুমূত্র (diabetes), বৃক্ক প্রদাহ (nephritis) ইত্যাদি মূত্রের হার ও মাত্রা উভয়কে প্রভাবিত করে। আবার কিছু দ্রব্য (পানি, লবণাক্ত পানি, চা এবং কফি) মূত্রের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয়। এসব দ্রব্যকে **ডাইইউরেটিকস** (diuretics) বা **মূত্রবর্ধক** বলা হয়। দেহে দৈনিক স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত মূত্র (>২.৫ লিটার) সৃষ্টি হলে তাকে **পলিইউরিয়া** (polyuria), মূত্রের পরিমাণ < ৪০০ মিলিলিটার হলে **অলিগোরিয়া** (oliguria) এবং < ১০০ মিলিলিটার হলে **অ্যানুরিয়া** (anuria) বলা হয়।

মূত্রের বৈশিষ্ট্য

১। **পরিমাণ :** প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের বৃক্কে প্রতিদিন ০.৫ – ২.৫ লিটার মূত্র উৎপন্ন হয় যা ৬-৮ বার মূত্র ত্যাগ ঘটায়।

২। **বর্ণ :** স্বাভাবিক মূত্র **হালকা হলুদ** বা **খড়** বর্ণের। মূত্রে **ইউরোক্রোম** (urochrome) নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় এটি খড় বা হালকা হলুদ বর্ণের হয়।

৩। **গন্ধ :** এটি ঝাঁঝালো বা **অ্যারোমেটিক** (aromatic) গন্ধবিশিষ্ট। মূত্রে **ইউরিনোড** (C_6H_8O) নামক পদার্থের উপস্থিতির কারণে এরূপ গন্ধ হয়।

৪। **রাসায়নিক ধর্ম :** মূত্র সামান্য অম্লীয়, এর pH মান ৫.০ - ৬.৫।

৫। **আপেক্ষিক গুরুত্ব :** মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৮ - ১.০৩০।

মূত্রের উপাদান (Composition of urine) : মানুষের মূত্রের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে **পানি** ৯৫% (৯৫-৯৭%) এবং **কঠিন পদার্থ** ৫% (৩-৫%)। এই কঠিন পদার্থগুলো বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ নিয়ে গঠিত।

(ক) জৈব পদার্থ (৬০%) : (i) **নাইট্রোজেনাস**- ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন, ক্রিয়েটিন, প্রোটিন, হিপপিউরিক এসিড, ইনডিকান অক্সালিক এসিড, ফেনল ইত্যাদি। (ii) **নন-নাইট্রোজেনাস**- কিটোন বডিস, সাইট্রেট, ল্যাকটেট ইত্যাদি।

(খ) অজৈব পদার্থ (৪০%) : (i) **ক্যাটায়ন** (ধনাত্মক)- Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, NH_4^+ ইত্যাদি। (ii) **অ্যানায়ন** (ঋনাত্মক)- SO_4^{3-}, PO_4^{3-}, Cl^-, HCO_3^- ইত্যাদি।

এছাড়াও মূত্রে আয়োডিন, সিসা, আর্সেনিক ইত্যাদি উপাদান পাওয়া যায়।

মূত্রের রাসায়নিক উপাদানের শতকরা পরিমাণ

জৈব উপাদান	শতকরা হার (%)	অজৈব উপাদান	শতকরা হার (%)
ইউরিয়া [$(CO(NH_2)_2$]	২	সোডিয়াম	০.৩৫
ক্রিয়েটিনিন	০.০৭	পটাশিয়াম	০.১৫
ইউরিক এসিড ($C_5H_4N_4O_3$)	০.০৫	অ্যামোনিয়াম	০.০৪
হিপপিউরিক এসিড	০.০৫	ক্যালসিয়াম	০.০৩
কিটোন বডিস	০.০২	ম্যাগনেসিয়াম	০.০১
ক্রিয়েটিন	০.০১	ক্লোরাইড	০.৬০
-	-	ফসফেট	০.২৭
-	-	সালফেট	০.১৮

Scanned with CamScanner

2020/8/4 17:42

মূত্রের কাজ

১। মূত্রের মাধ্যমে দেহে বিপাকজাত নাইট্রোজেনঘটিত এবং সালফারঘটিত দূষিত পদার্থগুলো দেহ থেকে নির্গত হয়। ফলে দেহ সুস্থ থাকে।

২। দেহ থেকে মূত্র নির্গত হয় বলে দেহে পানি ও খনিজ লবণের সাম্যতা বজায় থাকে।

৩। মূত্র ত্যাগের সময় মূত্রের মাধ্যমে কিছুটা তাপ নির্গত হয়ে যায়, ফলে দেহে তাপের সাম্যতা বজায় থাকে।

৪। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গেলে (100 cc রক্তে 180 gm) রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, ফলে রক্তে গ্লুকোজের সাম্যতা বজায় থাকে।

৬.৩ রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা

রেচনে বৃক্কের ভূমিকা (Role of Kidney in Excretion)

দেহে আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে N_2-ঘটিত তরল বর্জ্য বা মূত্রের সৃষ্টি হয়। মূত্র মানুষের দেহের প্রধান রেচন পদার্থ। মূত্র উৎপন্ন ও ত্যাগের মাধ্যমে বৃক্ক N_2-ঘটিত বিপাকীয় পদার্থ অপসারণ করে দেহকে রক্ষা করে। মূত্রের উপাদানগুলোর মধ্যে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন, অ্যামিনো এসিড ইত্যাদি দেহের জন্য ক্ষতিকর। সে জন্য উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুলো অপসারণ করা প্রয়োজন। দেহের সব রক্ত প্রতি পাঁচ মিনিটে রক্তজালক সমৃদ্ধ বৃক্কের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়। প্রতিটি বৃক্ক প্রায় ১০-১২ লাখ নেফ্রনের সমন্বয়ে গঠিত। নেফ্রন হচ্ছে বৃক্কের গঠন ও কার্যের একক যার মাধ্যমে মূত্র উৎপন্ন হয়।

মূলত বিপাক ক্রিয়ায় সৃষ্ট N_2- ঘটিত বর্জ্য হৃৎপিণ্ড থেকে পৃষ্ঠীয় ধমনি, রেনাল ধমনি ও অন্তর্বাহী ধমনিকার মাধ্যমে গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে গ্লোমেরুলাস পরিস্রুত তরল বা গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট তৈরি করে। রেনাল নালিকা দিয়ে অতিক্রম কালে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট পানি, বিভিন্ন আয়ন, ইউরিয়া সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে পুনঃশোধিত হয়ে রক্তে ফেরত যায়। পরবর্তীতে রক্তজালক থেকে ক্রিয়েটিনিন ও কিছু ইউরিয়া ফিলট্রেটের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মূত্র উৎপন্ন করে। এইভাবে উৎপন্ন মূত্র সংগ্রাহী নালির মাধ্যমে বৃক্কের পেলভিসে পৌঁছে। পেলভিস থেকে ইউরেটারের মাধ্যমে মূত্রথলিতে আসে। মূত্রথলি থেকে মূত্রনালির মাধ্যমে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয়। এভাবে বৃক্ক দেহ থেকে N_2-ঘটিত বর্জ্যবস্তু পৃথক করে শরীরের রক্তকে পরিশোধন করে দেহকে সুস্থ রাখে।

অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা (Role of Kidney in Osmoregulation)

অসমোরেগুলেশনের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে বৃক্ক। **দেহাভ্যন্তরের কোষকলায় বিদ্যমান পানি ও বিভিন্ন লবণের ভারসাম্য রক্ষার কৌশলকে অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ** বা **অসমোরেগুলেশন** (osmoregulation) **বলে**। বৃক্ক মানবদেহের অন্তঃপরিবেশের সমতা (homeostasis) রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ দেহের পানি, সোডিয়াম, পটাশিয়াম লবণ এবং ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে একটি আন্তঃসাম্য রক্ষা করে। দেহের অন্তঃঅভিস্রবণিক চাপের সমতা বিধান দেহের জন্য অপরিহার্য। দেহের মধ্যস্থ তরল পদার্থ ও দ্রবীভূত লবণসমূহের ঘনত্বের ওপর অভিস্রবণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে। সুতরাং **অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়া বলতে কোষের অন্তঃপরিবেশ এবং বহিঃপরিবেশের মধ্যকার অভিস্রবণিক চাপের সমতা রক্ষাকে বোঝায়।**

পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ : স্বাভাবিক অবস্থায় দেহে পানি গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। প্রচুর পরিমাণ পানি পান করলে রক্তে পানির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং রক্তের ঘনত্ব কমে যায়। আবার ঘামের সাথে প্রচুর পরিমাণ পানি ও লবণ নির্গত হয়ে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। বৃক্ক দেহে পানি ও লবণের মাত্রা সঠিক রাখে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মিনিটে ১২৫ ঘন সেন্টিমিটার তরল পদার্থ গ্লোমেরুলাসে পরিস্রুত হয়। এর মধ্যে ১২৪ ঘন সেন্টিমিটার তরল পদার্থই পুনঃশোষিত হয় এবং মাত্র ১ ঘনসেন্টিমিটার মূত্র নির্গত হয়। এর মধ্যে পুনঃশোষণ প্রক্রিয়ায় ৮০% সম্পন্ন হয় নেফ্রনের **প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকায়** এবং বাকি ২০% নেফ্রনের অন্যান্য অংশে সম্পন্ন হয়। দেহের পানির সমতা রক্ষা করার জন্য **অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন** (Anti Diuretic Hormone, ADH) নামক একটি হরমোন

Scanned with CamScanner

2020/8/4 17:43

রয়েছে। ADH পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয় এবং বৃক্কের পানির শোষণমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে দেহে পানির পরিমাণ কম হলে রক্ত অধিকতর ঘন হয়। এই পরিবর্তনে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত অসমোরিসেপ্টর (osmoreceptor) নামক স্নায়ুকোষগুলো উত্তেজিত হয় এবং ADH হরমোন ক্ষরণ করে।

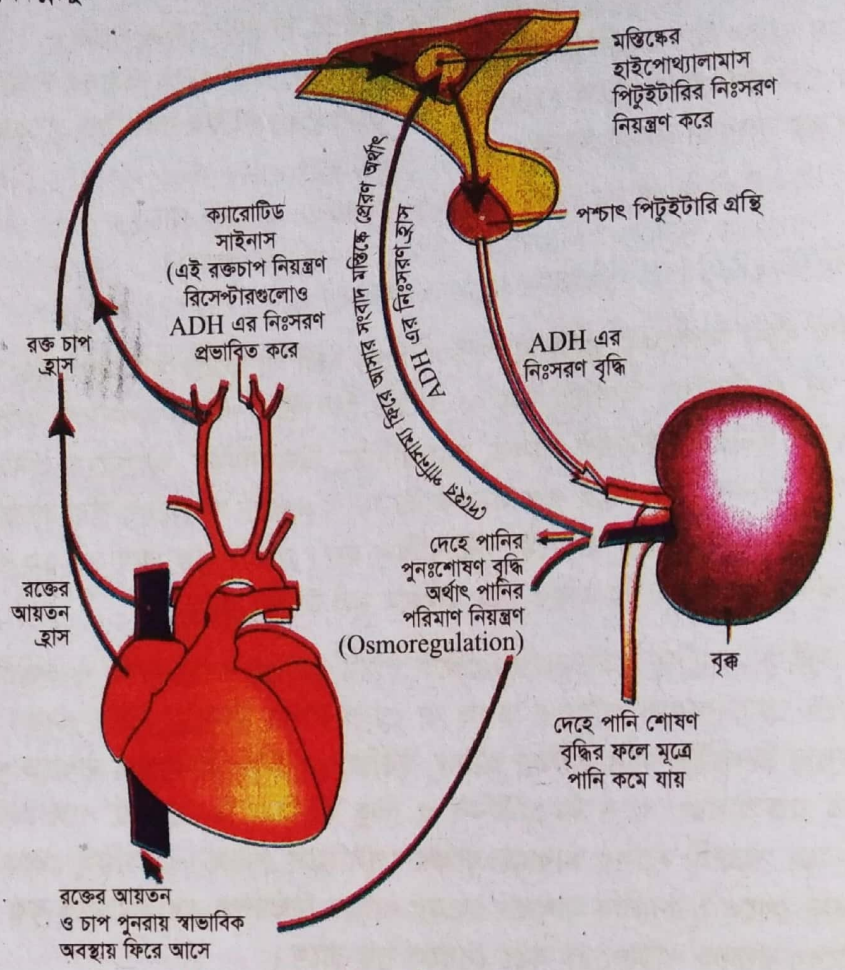

চিত্র ৬.৬ : পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ (অসমোরেগুলেশন)

ADH হরমোন রক্তস্রোত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে বৃক্কে পৌঁছে। বৃক্কের নেফ্রনগুলোর সংগ্রাহী নালিতে ADH পৌঁছালে সংগ্রাহী নালির ঝিল্লিতে অবস্থিত গ্রাহক অণু ADH গ্রহণ করে, ঝিল্লির ভেদ্যতা বেড়ে যায়। ফলে অধিক পরিমাণ পানি গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে ফিরে যায়। ফলে সংগ্রাহী নালিতে তরল বেশ ঘন হয়ে যায় এবং ব্যক্তি অল্প পরিমাণ ঘন মূত্র উৎপন্ন করে। আবার অতিরিক্ত পানি পান করলে, রক্তে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়। ফলে অসমোরিসেপ্টর কোষগুলো ADH হরমোনের ক্ষরণ কমিয়ে দেয়। ফলে সংগ্রাহী নালির কোষগুলো প্রায় পানির জন্য অভেদ্য হয়ে যায় এবং গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে পানি পুনঃশোষণ বন্ধ থাকে। সংগ্রাহী নালি গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট অধিক পরিমাণ তরল থাকে। ফলে ব্যক্তি বেশি পরিমাণ অতি তরল মূত্র ত্যাগ করে।

$$ADH \propto \frac{1}{\text{পানি গ্রহণের পরিমাণ/পানি ত্যাগের পরিমাণ}}$$

অথবা- ADH ∝ পানির পুনঃশোষণ

লবণসাম্য নিয়ন্ত্রণ : বৃক্ক দেহ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লবণ, যেমন– সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড প্রভৃতি বিমুক্ত করে লবণের সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে বিপাকীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্কের অ্যাডরেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত হরমোন **অ্যাল্ডোস্টেরন** (aldosterone)-এর প্রভাবে মূত্র ও ঘাম থেকে সোডিয়াম পুনঃশোষণ, গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড পুনঃশোষণ ও পটাশিয়ামের নির্গমন নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে দেহে অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় তরলে সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্লোরাইডের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। বৃক্ক থেকে ক্ষরিত হরমোন সদৃশ এনজাইম **রেনিনও** বৃক্কে সোডিয়ামের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

❑ **কাজ :** (i) বৃক্ক কীভাবে মানবদেহের পানিসাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্লেষণ কর। (ii) বৃক্ক অপজাত পদার্থ অপসারণ ছাড়াও পানি সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে– বিশ্লেষণ কর।

Scanned with CamScanner

৬.৪ বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় (Instantaneous Kidney Failure, Symptoms and Measures)

বৃক্ক বা কিডনি শরীরের ফ্লুইড ব্যালেন্স বজায় রাখে, বর্জ্য পদার্থ বের করে এবং রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। প্রোটিন, ক্যালসিয়াম আর ফসফরাসের সঠিক ব্যালেন্স ও অতিরিক্ত ফ্লুইড এড়িয়ে চলাই কিডনি ভালো রাখার মূল মন্ত্র। কিডনির প্রধান কাজ হচ্ছে শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে বের করে দেওয়া। অতিরিক্ত পানি বের করা বা মূত্র যখন তৈরি হতে পারে না তখন আমরা বলি **কিডনি বিকল** বা **রেনাল ফেইলিউর** (kidney failure or renal failure)। কিডনি ফেইলিউর দু'ধরনের **তাৎক্ষণিক বিকল** (Acute Renal Failure-ARF) ও **দীর্ঘস্থায়ী বিকল** (Chronic Renal Failure-CRF)। উভয় ক্ষেত্রেই অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাবসহ স্বাস্থ্যসমস্যা ঘটে থাকে।


বিকল বৃক্ক

কোনো সুস্থ লোকের হঠাৎ করে বৃক্কের কার্যক্রম কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল বা অ্যাকিউট রেনাল ফেইলিউর বলে। বৃক্ক অনেক সময় নিজস্ব রোগে অথবা অন্য কোনো রোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বৃক্কের অন্যান্য রোগের মধ্যে রয়েছে– একিউট গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস (Acute Glumerulo Nephrities-AGN), হেমাচুরিয়া (hematuria) বা প্রস্রাবে রক্ত যাওয়া, এনুরিয়া (anuria) ইত্যাদি। অনেকের মতে, **রেনিন অ্যানজিওটেনসিন** (renin angiotensin) এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেলে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল ঘটতে পারে।

যখন কিডনি নিজে কোনো রোগে আক্রান্ত হয় বা অন্য কোনো রোগের কারণে আক্রান্ত হয়ে তিন মাস বা তার বেশি সময় ধরে কিডনির কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় তখন তাকে দীর্ঘমেয়াদি বা দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ বা ক্রনিক বৃক্কীয় রোগ (Chronic Kidney Disease-CKD) **বলা হয়**। ইনফেকশনের কারণে কিডনির ছাঁকনি সংক্রমিত হয়ে ক্রমান্বয়ে কিডনির কার্যকারিতা কমিয়ে অবশেষে নষ্ট করে ফেলতে পারে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগ দেখা দেয়। দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগের অসুবিধা হলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীদের কোনো উপসর্গ হয় না। বৃক্কের কার্যকারিতা ৭৫% লোপ পেলে এর উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও পেশি থেকে নিঃসৃত মায়োগ্লোবিন বৃক্কের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের কারণ

সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৭০% কিডনি বিকলের জন্য দায়ী **ডায়াবেটিস** ও **উচ্চ রক্তচাপ**। তবে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের অন্য কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে–

১। **বৃক্কে রক্তপ্রবাহ হ্রাস** (Reduced blood flow to kidneys) : ডায়রিয়া, রক্তক্ষরণ, যেমন– রক্তবমি, সার্জিক্যাল অপারেশন, গর্ভপাত, শক, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর, রক্তে পানি ও লবণ জাতীয় পদার্থের অভাব, ভুল রক্ত দেওয়া, যকৃৎ বৈকল্য, তীব্র অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া, তীব্র সংক্রমণ, তীব্র পানিশূন্যতা, মারাত্মকভাবে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে রক্তের প্রবাহ হ্রাস পায়। ফলে বৃক্ক পর্যাপ্ত মূত্র তৈরি করতে পারে না।

২। **ক্ষতিগ্রস্ত বৃক্ক** (Damage to kidneys) : হঠাৎ বৃক্ক প্রদাহ, ওষুধের বিষক্রিয়া (বিশেষত ব্যথানাশক ওষুধ; এছাড়াও কিডনির ইনফেকশনের কারণ হিসেবে ব্যাকটেরিয়াজনিত ইনফেকশন, ভাইরাস, হেপাটাইটিস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া এদের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াকে দায়ী করা হয়), সর্প দংশন, বৃক্ক সংক্রমণ, বৃক্কীয় রক্তনালির প্রদাহ, হিমোলাইটিক ইউরেনিক সিনড্রোম, বৃক্কীয় নালিতে রক্ত জমাট বাঁধা ইত্যাদি কারণে বৃক্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ফলে বৃক্ক পর্যাপ্ত মূত্র তৈরি করতে পারে না।

৩। **মূত্র নিঃসরণে বাধাগ্রস্ততা** (Urine blockage in kidneys) : মূত্রনালির বাধাগ্রস্ততা, বৃক্ক ও মূত্রনালিতে পাথর, টিউমার, পুরুষের প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি, মূত্রনালিতে ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার, সার্ভিক্স ক্যান্সার হওয়া ইত্যাদি কারণে মূত্র নিঃসরণ বাধাগ্রস্ত হয়। বৃক্ক মূত্র উৎপাদনের সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মূত্র বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে পৌঁছাতে পারে না। জন্মগত কারণেও কারও কিডনির কার্যকারিতা কম হতে পারে। খাবারে রাসায়নিক পদার্থ মিশানো, পানিতে অধিক হারে আর্সেনিক, কিডনি রোগের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

লক্ষণ (Symptoms)

- বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, এমনকি রক্তবমি হতে পারে। ফলে তন্দ্রাচ্ছন্নতা, খিঁচুনি বা অজ্ঞান হওয়ার লক্ষণও দেখা যেতে পারে।
- বার বার অনেক পরিমাণে বা অনেকক্ষণ পরে অল্প পরিমাণ মূত্রত্যাগ বা মূত্র বন্ধ হয়ে যাওয়া; বলপূর্বক মূত্রত্যাগ; মূত্রে রক্তের উপস্থিতি।

2020/8/4 17:43

Scanned with CamScanner

- অতিরিক্ত পানি জমে গিয়ে শরীর ফুলে যায় অথবা শরীরের পানি কমে যেতে পারে।
- ডায়রিয়া, রক্ত পায়খানা, ক্ষুধামান্দ্য, মুখে মেটালিক স্বাদ (metallic taste) অনুভূতি, রক্তস্বল্পতা, শ্বাসকষ্ট (ঘন ঘন শ্বাস নেয়া), ক্লান্তি ও অবসাদগ্রস্ততা, স্মৃতিশক্তির সমস্যা, বিভ্রান্তি সৃষ্টি, রক্তচাপ কম বা বেশি, দুর্বলতা, বুকে ব্যথা, পেটে ব্যথা, চুলকানি, অনেকক্ষণ ধরে হেঁচকি তোলা ইত্যাদি উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায়।
- হাড়ের সন্ধিতে বা পাঁজর ও কোমরের মাঝামাঝি দুপাশে ব্যথা (flank pain), রক্তমূত্র ও ফোঁটা ফোঁটা মূত্র ত্যাগের অবস্থান থাকতে পারে।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল নির্ণয় (Acute renal failure diagnosis)

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল নির্ণয়ের জন্য সাধারণত রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করা হয়। নিম্নলিখিত কারণে পরীক্ষাগুলো করা হয়-

- বৃক্ক বিকল হলে রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়।
- বৃক্ক বিকল হলে রক্তে বিভিন্ন আয়নের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় কিংবা বেড়ে যায়।
- বৃক্ক বিকল হলে রক্তে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ কমে গিয়ে **অ্যানিমিয়া** (anemia) সৃষ্টি করে।
- বৃক্ক বিকল হলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায় (< 0.5 ml/kg/h for 6 hours)।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলে প্রতিকার/করণীয় (Measures of instantaneous kidney failure)

১। বৃক্ক তাৎক্ষণিক বিকলতার বিষয়টি বুঝতে পারা মাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা।

২। বৃক্কের বিকলতার কারণসমূহ দূরীভূত করা।

৩। নিয়ন্ত্রিত আহার, অর্থাৎ কম প্রোটিন, কম লবণ, কম পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ (যেমন– চকোলেট, কমলা, মাশরুম ইত্যাদি), নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি পান করা। উচ্চমাত্রায় সোডিয়াম যুক্ত খাবার যেমন– পনির, লবণ, আচার, চাটনি, পটেটো চিপস, সয়া সস এবং ফলের মধ্যে কলা, খেজুর, আম, কমলালেবু কিডনির রোগে ভালো নয়। সুস্থ ও সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা।

৪। দেহে দেহরস ও ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ পাতলা পায়খানা, বমি বা জ্বর হলে ঘন ঘন খাবার স্যালাইন বা চিনির সরবত পান করতে হবে। প্রয়োজনে আইভি স্যালাইন (আইভি ফ্লুইড বা ইন্ট্রিভেনাস ফ্লুইড) প্রয়োগ করতে হবে।

৫। শরীর সুস্থ ও সচল রাখার জন্য নিয়মিত হাঁটা ও ব্যায়াম করা।

৬। বয়স্কদের (যাদের বয়স ৫০ বছরের অধিক), যাদের নিজের কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যের ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের বৃক্ক নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। ভুল রক্তদান যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ রাখা। আনাড়ি দাই দিয়ে কোনো অবস্থাতেই প্রসব কিংবা গর্ভপাত না ঘটানো।

৮। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ সেবন না করা।

৯। নিজেকে ধূমপান থেকে বিরত রাখা এবং অন্যকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করা।

১০। রক্ত থেকে বিষাক্ত দ্রব্য অপসারণের জন্য **ডায়ালাইসিস** (dialysis)করা।

১১। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে **বৃক্ক প্রতিস্থাপন** (kidney transplantation) করা।

[**তথ্য : বৃক্ক বা কিডনি পরিস্কারক খাবার :** আপেল সিডার ভিনিগার, বিট, গাঢ় সবুজ শাক, কালো আঙ্গুর, রসুন, বাদাম ও ডাল, ড্যান্ডিলায়ন শাক, হলুদ, গাজর ইত্যাদি।]

ডায়ালাইসিস ও বৃক্ক প্রতিস্থাপন (Dialysis and Kidney Transplant)

ডায়ালাইসিস (Dialysis)

যে বায়োফিজিক্যাল পদ্ধতিতে একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট দ্রবণের কেলাস পদার্থের ক্ষুদ্র অণুর কণাগুলো কলয়েড পদার্থের বৃহৎ অণুকণা থেকে পৃথক করা হয় তাকে ডায়ালাইসিস (dialysis) বা **ঝিল্লি বিশ্লেষণ বলে**। সংক্ষেপে, যে প্রক্রিয়ায় বৃক্ক সম্পূর্ণভাবে অকেজো বা বিকল হওয়ার পর শরীরে জমে থাকা বর্জ্য (যেমন– ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম ইত্যাদি) পরিশোধিত করা হয় তাকে **ডায়ালাইসিস** বলে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে দেহে কৃত্রিম বৃক্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ, অতিরিক্ত পানি অপসারণ করা হয়। রক্তে রেচন বর্জ্যের বৃদ্ধি পাওয়াকে **অ্যাজোটিমিয়া** (azotemia) বলা হয়। মানবদেহে এ অবস্থায় **ইউরেমিয়া** (uremia) নামক অসুস্থা সৃষ্টি হয়। ডায়ালাইসিস দুই ধরনের– (ক) **হিমোডায়ালাইসিস** (haemodialysis) ও (খ) **পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস** (peritonial dialysis)।

2020/8/4 17:43

Scanned with CamScanner

(ক) হিমোডায়ালাইসিস (Haemodialysis) : এই পদ্ধতিটি বেশ জটিল। বৃক্কের স্বাভাবিক কার্যকারিতা রক্ষার জন্য ডায়ালাইজার বা কৃত্রিম বৃক্ক বা হিমোডায়ালাইজার নামক একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। কৃত্রিম বৃক্কের সাহায্যে রক্তকে পাম্প করে শরীর থেকে বের করে বর্জ্য পদার্থ অপসারণের উদ্দেশ্যে রক্ত পরিস্রুত করে পুনরায় দেহে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াকে **হিমোডায়ালাইসিস** বলে। কৃত্রিম বৃক্ক আসল বৃক্কের মতোই কাজ করে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু যন্ত্রপাতি, ডায়ালাইজিং দ্রবণ (ডায়ালাইসেট) ও একটি নমনীয় ডায়ালাইসিস টিউব নিয়ে একটি কৃত্রিম বৃক্ক মেশিন প্রস্তুত করা হয়। ডায়ালাইসিস টিউবটি লম্বা, এর দুই প্রান্ত খোলা এবং মাঝের অংশ জিগজ্যাগভাবে বৃক্ক মেশিনের ভেতরে ডায়ালাইজিং দ্রবণে শায়িত অবস্থায় থাকে।

কার্যপদ্ধতি : প্রথমে রোগীর বাহুর নিম্ন প্রান্ত বা পায়ের ধমনির ভেতর **ক্যাথেটার** নামক ফাঁপা নলাকার সুচ প্রবেশ করানো হয়। ক্যাথেটারের পেছন দিকে ডায়ালাইসিস টিউবের এক প্রান্ত লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং টিউবের অন্য প্রান্ত আর একটি ক্যাথেটারের সাহায্যে বাহু বা পায়ের শিরার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। ডায়ালাইসিস টিউবের মাঝের অংশ জিগজ্যাগভাবে বৃক্ক মেশিনের ডায়ালাইসিস দ্রবণে শায়িত অবস্থায় থাকে। এবার ব্লাড পাম্পের সাহায্যে ধমনি থেকে রক্ত বের করে শিরার দিকে চালনা করা হয়। রক্ত ধীরে ধীরে কিডনি মেশিনে, ডায়ালাইসিস দ্রবণে শায়িত ডায়ালাইসিস টিউবের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ডায়ালাইসিস টিউবটি অর্ধভেদ্য ঝিল্লি নির্মিত হওয়ায় ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অতিক্ষুদ্র অণু ও পানি ব্যাপিত হয় কিন্তু রক্তকণিকা, প্রোটিন অণু বড় হওয়ায় ব্যাপিত হতে পারে না। ফলে রক্তের অবাঞ্ছিত বস্তু বিশেষ করে ইউরিয়া, অতিরিক্ত সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি অপসারিত হয় এবং রক্তের প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে যায়। কিডনি মেশিনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অসমোরেগুলেশন অব্যাহত থাকে কারণ এখানে রোগীর রক্তের অভিস্রবণিক ঘনত্ব অনুযায়ী রক্তে পানি প্রবেশ করে বা পানি বের হয়ে যায়। এভাবে রক্ত পরিস্রুত হয়ে টিউবের অন্য প্রান্ত দিয়ে বাহু বা পায়ের শিরায় প্রবেশ করে। রক্ত কিডনি মেশিন থেকে টিউবের মাধ্যমে বের হয়ে শিরার দিকে প্রবাহিত করার সময় রক্তে যাতে কোনো বুদবুদ না থাকে তার জন্য টিউবের গোড়ায় বুদবুদ ফাঁদ থাকে। এটি বুদবুদ অপসারণ করে।

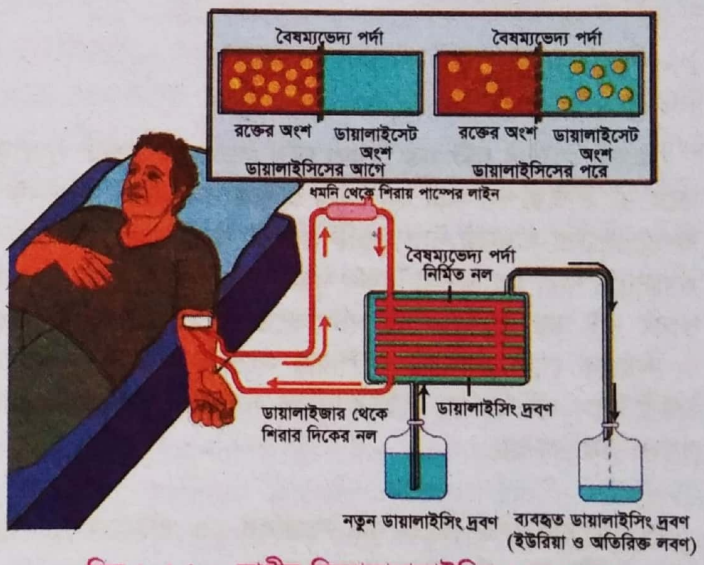

চিত্র ৬.৭.১ : রোগীর হিমোডায়ালাইসিস করা হচ্ছে

ডায়ালাইসেট (Dialysate) : হিমোডায়ালাইসিসের উদ্দেশ্যে ডায়ালাইসিস টিউব যে দ্রবণে রাখা হয় তাকে **ডায়ালাইসেট** বা **ডায়ালাইসিং দ্রবণ** বলে। ডায়ালাইসেটের উপাদানগুলো হলো– সঠিক আয়নিক তাপমাত্রা (স্থির দেহের তাপমাত্রা), সঠিক আয়নিক ভারসাম্য, বিশেষ করে Na^+, K^+, Cl^-, Mg^{++}, Ca^{++}, HCO_3^- (এসিটেট রূপে); অতিরিক্ত পুষ্টি, যেমন– গ্লুকোজ; সঠিক pH ও বাফারিং ক্ষমতা ইত্যাদি।

সতর্কতা : রক্ত ও ডায়ালাইসেট দ্রবণ চালনা করার সময় কতকগুলো বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। যেমন– ডায়ালাইসেট দ্রবণকে সামান্য উষ্ণ করা হয় যাতে এর উষ্ণতা রক্তের উষ্ণতার সঙ্গে সমান হয়। তাছাড়া ডায়ালাইসেট দ্রবণ ও রক্তের চাপের যাতে তারতম্য সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। চাপের তারতম্য ঘটলে অর্ধভেদ্য ঝিল্লি ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস (Peritonial dialysis) : কৃত্রিম ঝিল্লির পরিবর্তে দেহে অবস্থিত প্রকৃত পেরিটোনিয়াল ঝিল্লিকে ডায়ালাইসিং ঝিল্লি হিসেবে ব্যবহার করে বৃক্কের ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়াকে **পেরিটোনিয়াল** ডায়ালাইসিস বলে।

এই পদ্ধতিতে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর দেহের উদরীয় অঞ্চলে পেরিটোনিয়াল ঝিল্লিতে একটি ক্যাথেটার (প্লাস্টিক নল) বসানো হয়। নলটির মধ্য দিয়ে ডায়ালাইসিং দ্রবণ (ডায়ালাইসেট) প্রবেশ করিয়ে কয়েক ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। এই সময়ে উদরীয় অঞ্চলের ছোট ছোট রক্তনালির রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ, অতিরিক্ত পানি ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ডায়ালাইসিং দ্রবণে চলে আসে। এরপর বর্জ্য পদার্থ অতিরিক্ত পানির সহিত ডায়ালাইসিং দ্রবণ ড্রেন ব্যাগে

2020/8/4 17:43

Scanned with CamScanner

জমা হয়। দিনে ৩/৪ বার ডায়ালাইসিং দ্রবণ প্রতিস্থাপন করা হয়। যেহেতু ওই সময়ে রোগী স্বাধীনভাবে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে, তাই এই ডায়ালাইসিসকে CAPD (Continuous Ambulatory Peritonial Dialysis) বলা হয়। এই প্রক্রিয়া সহজ ও কম ব্যয়সাপেক্ষ হলেও সংক্রমণের (পেরিটোনাইটিস) সম্ভাবনা অনেক বেশি। এ পদ্ধতি বাসাতেও পরিচালনা করা যেতে পারে। সঠিক সময়ে ডায়ালাইসিস করালে ও ওষুধ সেবন করলে বৃক্ক আবার ভালো হতে পারে। তাই বৃক্কের সমস্যা হলেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

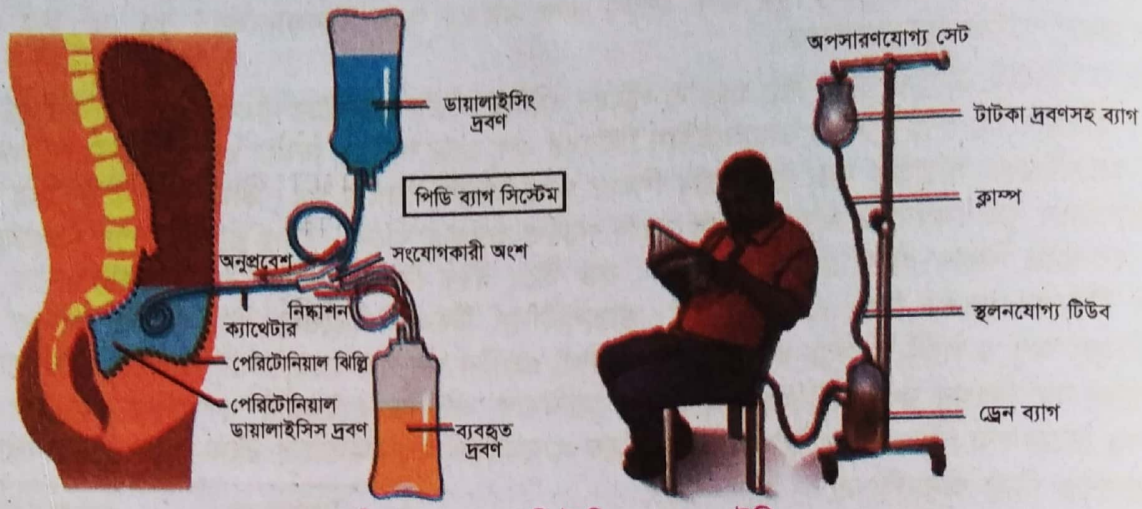

চিত্র ৬.৭.২ : পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস

বৃক্ক প্রতিস্থাপন (Kidney Transplant)

কোনো ব্যক্তির দুটি বৃক্ক বিকল হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথোপযুক্ত বৃক্ক সংগ্রহ করে তা প্রতিস্থাপন করা হয়। বৃক্ক প্রতিস্থাপন একটি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে রোগীর দেহের শ্রোণিদেশে অপারেশনের মাধ্যমে দাতাবৃক্কটি (নিকট আত্মীয় বা অনাত্মীয় বা মৃত ব্যক্তির বৃক্ক) স্থাপন করা হয় এবং বিকল বৃক্কটি অপসারণ করা হয় অথবা বিকল বৃক্ক থেকে কোনো রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা না থাকলে বৃক্কটি রেখে দেওয়া হয়। কারণ এই বৃক্ক অনেক সময় সচল হতে পারে। নতুন বৃক্কের ধমনি ও শিরাকে রোগীর ধমনি ও শিরার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে প্রতিস্থাপিত ইউরেটারকে সরাসরি মূত্রথলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয়।

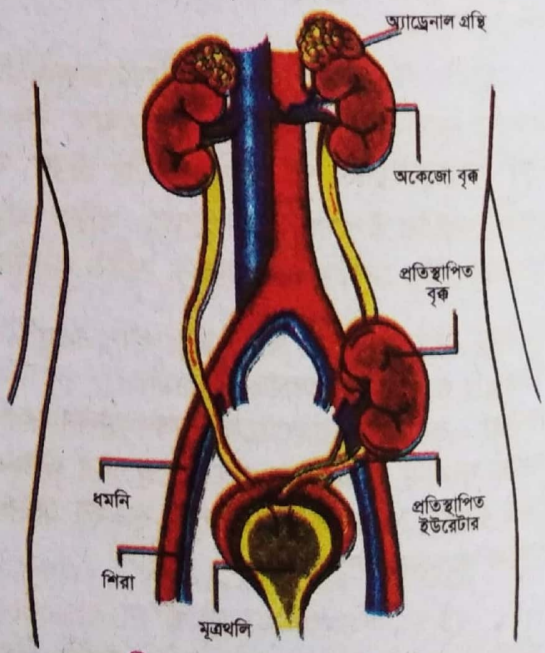

চিত্র ৬.৭.৩ : বৃক্ক প্রতিস্থাপন

সতর্কতা :

১। দাতার দেহ থেকে বৃক্ক সংগ্রহের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর দেহে (গ্রহীতার) প্রতিস্থাপন করতে হবে।

২। সংগৃহীত বৃক্কটি HIV বা অন্যান্য সংক্রমণ মুক্ত ও সুস্থ হতে হবে।

৩। বৃক্কদাতা ও গ্রহীতার ব্লাড গ্রুপ অবশ্যই এক হতে হবে।

৪। বৃক্কদাতা ও গ্রহীতার উভয়ের টিস্যুর ধরনও এক হতে হবে।

৫। বৃক্ক প্রতিস্থাপনের পর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে।

উল্লেখ্য যে **কোনো ব্যক্তির দুটি বৃক্কের মধ্যে একটি বৃক্ক সুস্থ থাকলে সে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে পারে।** তবে যদি দুটি বৃক্কই বিকল বা অকেজো হয়ে পড়ে তখন শেষ চিকিৎসা হিসেবে বৃক্ক প্রতিস্থাপন করা হয়। যেহেতু কিডনি রোগ প্রতিরোধ সম্ভব কাজেই এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

❑ **কাজ :** (i) বৃক্ক বিকল হলে গৃহীত সাময়িক বিকল্প পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক বলে তুমি মনে কর? বুঝিয়ে লেখ। (ii) N_2 জনিত বর্জ্য নিষ্কাশনে নিয়োজিত অঙ্গের বিকলতা মানবজীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ– বিশ্লেষণ কর। (iii) সহপাঠীদের নিয়ে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, ডায়ালাইসিস ও বৃক্ক প্রতিস্থাপনের উপর একটি তথ্যবহুল পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় কলেজ বোর্ডে স্থাপন কর।

2020/8/4 17:43
Scanned with CamScanner

2020/8/4 17:43

৬.৫ রক্ত ও মূত্রে হরমোনের ক্রিয়া (Hormonal function in Blood and Urine)

রক্ত ও মূত্রের বিভিন্ন কাজে একাধিক হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এদের মধ্যে **অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন** (Anti Diuretic Hormone, ADH), **অ্যালডোস্টেরন** (aldosterone), **এরিথ্রোপয়েটিন** (erythropoietin), **প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন** (prostaglandin) এবং **অ্যানজিওটেনসিন** (angiotensin) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানবদেহে মূত্রের ঘনত্ব, রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা ও রক্তের pH নিয়ন্ত্রণে হরমোনের ক্রিয়া সংক্ষেপে নিচে উপস্থাপন করা হলো–

মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ (Control of Urine Concentration)

কোষের অভ্যন্তরে সঠিকমাত্রায় তরল পদার্থ থাকা অর্থাৎ পানির সমতা বজায় থাকা মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। অন্যথায় দেহে বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়। দেহের এই সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে অর্থাৎ মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণে বৃক্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর বৃক্কের এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে **অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন** বা **ভ্যাসোপ্রেসিন** (ADH-Anti Diuretic Hormone or vasopressin) হরমোন কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ADH-এর প্রভাবে বৃক্কের পানিশোষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত কিছু স্নায়ু কোষ বা **অসমোরিসেপ্টর** (osmoreceptor) পানির সমতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থিকে ADH নিঃসরণে যথাযথভাবে উদ্দীপ্ত করা অথবা বাধা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রেরণ করে। ফলে দেহে পানি গ্রহণের পরিমাণ কম হলে অথবা অত্যধিক ঘাম নিঃসৃত হলে কিংবা লবণ গ্রহণের পরিমাণ অধিক হলে রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

এ সময়ে অসমোরিসেপ্টর ADH নিঃসরণের জন্য নির্দেশনা পাঠায়। ADH এর উপস্থিতিতে পানি নিঃসরণ পথ (water channel) সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি বৃক্কের কর্টেক্স ও মেডুলায় যায়। ফলে মূত্রে পানির পরিমাণ কমে যায় এবং পানি রক্তে ফেরত আসে। অর্থাৎ মূত্রের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

আবার, যখন পানি গ্রহণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায় তখন উল্টো প্রক্রিয়া ঘটে। অর্থাৎ রক্তের ঘনত্ব কমে যায় এবং ADH নিঃসরণ হ্রাস পায়। এতে ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা এবং সংগ্রাহক নালিকার প্রাচীর পানি অপ্রবেশ্যতা সৃষ্টি করে। ফলে মেডুলা দিয়ে যে ফিলট্রেট অতিক্রম করে সেখান হতে পানি পুনঃশোষণ কমে যায়। এ কারণে মূত্রের তরলতা বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, হাইপোথ্যালামাসে একটি পিপাসা **নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রও** (thirst centre) রয়েছে। যখন রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় তখন এই কেন্দ্র পিপাসার উদ্দীপনা সৃষ্টির সংকেত প্রদান করে।

ADH ∝ মূত্রের ঘনত্ব

রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Control of Sodium in Blood)

অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চল থেকে নিঃসৃত **অ্যালডোস্টেরন** (aldosterone) রক্তের প্লাজমায় সোডিয়াম আয়নের (Na^+) পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোনটি পানির পুনঃশোষণও প্রভাবিত করে। সোডিয়াম আয়নের পরিমাণের সাথে ক্লোরাইড আয়নের পরিমাণ সম্পৃক্ত। শরীরে সোডিয়াম আয়নের পরিমাণ কমে গেলে পানির পরিমাণও কমে যায়। এতে রক্তের আয়তন বা ভলিউম কমে যায় ফলে রক্তচাপও কমে যায়। আয়তন ও চাপ কমে গেলে ডিস্টাল নালি ও অ্যাফারেন্ট ধমনিকার মাঝখানে অবস্থিত **জাক্সটাগ্লোমেরুলার কমপ্লেক্স** (juxtaglomerular complex) নামক এক গুচ্ছ সংবেদী কোষ উদ্দীপিত হয় এবং **রেনিন** (renin) এনজাইম ক্ষরণ করে। যকৃৎ থেকে উৎপন্ন ও প্লাজমায় অবস্থিত একধরনের প্রোটিনকে (অ্যানজিওটেনসিনোজেন-angiotensinogen) রেনিন সক্রিয় করে **অ্যানজিওটেনসিন** (angiotensin) হরমোনে পরিণত করে। এই হরমোন অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চল থেকে অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। অ্যালডোস্টেরন রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে ডিস্টাল পেঁচানো নালিকায় পৌঁছায় এবং নালিকার কোষগুলোতে **সোডিয়াম-পটাসিয়াম পাম্প** (sodium-potassium pump)-কে উদ্দীপিত করে। ফলে ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা থেকে Na^+ বেরিয়ে নালিকার চারপাশের কৈশিকজালিকায় প্রবেশ করে। অপরদিকে, K^+ প্রবেশ করে কৈশিকজালিকা থেকে ডিস্টাল পেঁচানো নালিকায়।

অ্যালডোস্টেরন বৃক্ক ও অন্ত্রে সোডিয়াম আয়নের পরিশোষণ বাড়ায় এবং ঘামে কম সোডিয়াম ত্যাগকে উদ্দীপিত করে। ফলে রক্তে সোডিয়াম আয়নের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে ক্লোরাইড আয়নের পরিমাণ সমভাবে বেড়ে যায়। এতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে রক্তের আয়তন বা ভলিউম ও রক্তের চাপ পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। প্রতিদিন গ্লোমেরুলাসের পরিস্রুত ৫৬০ গ্রাম Na^+ আয়নের মধ্যে প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকায় ৪৯০ গ্রাম এবং ডিস্টাল পেঁচানো নালিকায় ৬৫ গ্রাম Na^+ পুনঃশোষিত হয়। অবশিষ্ট ৫ গ্রাম মূত্রের সঙ্গে নিঃসরিত হয়। Na^+ পরিশোষণে অ্যালডোস্টেরন হরমোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Scanned with CamScanner

আবার রক্তরসের আয়তন বেড়ে গেলে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে বিদ্যমান কিছু কোষ **অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিইউরেটিক হরমোন** (Atrial Natriuretic Hormone-ANH) ক্ষরণ করে যা অ্যালডোস্টেরন নিঃসরণে বাধা দিয়ে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। খাদ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করলে রক্তের সোডিয়াম আয়নের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে পানির পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে রক্তচাপ বাড়ে। তাই যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের অতিরিক্ত লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত।

রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ (Control of Blood pH)

pH-এর অর্থ হলো দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের শক্তি বা ঘনত্ব। অর্থাৎ **হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার পরিমাপকে pH বলে**। স্বাভাবিক মানের তুলনায় হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার সামান্য পরিবর্তন হলে কোষীয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায়। **নিউট্রাল pH হলো ৭.০**। ৭.০ এর কম হলে অম্লীয় pH এবং অধিক হলে ক্ষারীয় pH। দেহে pH নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রকৃতপক্ষে দেহ তরলে বিশেষ করে বহিঃকোষীয় তরলে হাইড্রোজেন আয়নের নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। হাইড্রোজেন আয়নের উচ্চ ঘনত্বে অর্থাৎ **অ্যাসিডোসিস** অবস্থায় মানুষ অচেতন হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব হ্রাস পেলে অর্থাৎ **অ্যালক্যালোসিস** অবস্থায় প্রচণ্ড খিঁচুনিতে মানুষ মারা যায়। মানুষের রক্তের প্লাজমার স্বাভাবিক pH হলো ৭·৩৫ থেকে ৭.৪৫।

স্বাভাবিক অবস্থায় দেহতরলের pH এর মান ৭.৩-৭·৭ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। pH এর মান এর চেয়ে বেশি বা কম হলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বহিঃকোষীয় তরল (রক্তরস, কলারস) অপেক্ষা অন্তঃকোষীয় তরলের pH মান কিছুটা কম থাকে। এটি অবশ্য কলা থেকে কলাতে CO_2 উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে। বহিঃকোষীয় তরলের pH মানের যে কোনো ধরনের পরিবর্তন অন্তঃকোষীয় তরলের pH মানের উপর প্রভাব ফেলে। দেহতরলের অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষায় বা pH নিয়ন্ত্রণে বৃক্ক মুখ্য ভূমিকা রাখে। pH নিয়ন্ত্রণে বৃক্কের প্রাথমিক কাজ হলো দেহতরলের অ্যানায়ন ও ক্যাটায়নসমূহ সংরক্ষণ করা। বৃক্ক হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ক্ষরণ এবং বাইকার্বনেট আয়ন (HCO_3^-) পুনঃশোষণ দ্বারা রক্তের এসিড বেস নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। দেহের আয়নসমূহের সার্বিক সংখ্যা ও ঘনত্ব স্বাভাবিক রাখার জন্য বৃক্ক প্রধানত দুটি কাজ সম্পন্ন করে-

প্রথমত- বৃক্ক শোষণ ও পুনঃশোষণের মাধ্যমে দেহতরলের HCO_3^-এর প্রমাণ মান বজায় রাখে এবং

দ্বিতীয়ত- দেহতরল হতে প্রচুর পরিমাণ H^+, নন-কার্বোনিক এসিড ও অ্যামোনিয়ারূপে মূত্রের সাথে নিষ্কাশন করে।

বৃক্কের H^+ নিঃসরণ নির্ভর করে অন্তঃকোষীয় তরলের pH মানের উপর যা বহিঃকোষীয় তরলের pH মানের ওপর নির্ভরশীল। ফলে দেহে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে H^+ নিঃসরণও বৃদ্ধি পায়। বৃক্কীয় নালিকা দ্বারা যে পরিমাণ Na^+ পুনঃশোষিত হয় সে পরিমাণ H^+ রেচিত হয়।

অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ক্ষরিত **অ্যালডোস্টেরন** হরমোন দ্বারা বৃক্কের H^+ রেচন মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী বৃক্ক HCO_3^- পুনরুদ্ধার করে। ইহা নির্ভর করে বৃক্কের H^+ নিঃসরণ ও বৃক্কীয় নালিতে বিদ্যমান HCO_3^- এর পরিমাণের ওপর। যখন বৃক্কীয় নালিকার তরলে যথেষ্ট পরিমাণ H^+ বিদ্যমান থাকে অথবা তাতে HCO_3^- এর পরিমাণ কম থাকে তখন তরল থেকে সব ধরনের বাইকার্বনেট শোষিত হয়। কিন্তু এর বিপরীত অবস্থা হলে HCO_3^- মূত্রের সাথে বের হয়ে যায়।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

Scanned with CamScanner

2020/8/4 17:44

সারসংক্ষেপ

- **রেচনতন্ত্র :** যে তন্ত্রের মাধ্যমে রেচনকার্য সম্পাদিত হয় তাকে রেচনতন্ত্র বলে। মানুষের রেচনতন্ত্র এক জোড়া বৃক্ক, এক জোড়া ইউরেটার বা গবিনী, একটি মূত্রথলি বা মূত্রাশয় ও একটি মূত্রনালি নিয়ে গঠিত।
- **রেচন পদার্থ :** আমিষ বিপাকের ফলে প্রাণিদেহে নাইট্রোজেন ঘটিত যেসব বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হয় তাকে রেচন পদার্থ বলে। মানুষের প্রধান রেচন পদার্থ হলো– অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি।
- **রেচন :** কোষীয় বিপাকের ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রেচন বলে। অথবা- যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন বলে। মানুষের প্রধান রেচন বর্জ্য হলো মূত্র।
- **বৃক্ক :** মানুষের প্রধান রেচনঅঙ্গকে বৃক্ক বলে। এর মাধ্যমেই দেহের শতকরা ৮০ ভাগ রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। বৃক্কের মূল গাঠনিক ও কার্যকরী একক হলো নেফ্রন।
- **কর্টেক্স :** বৃক্কের বাইরের দিকে রেনাল ক্যাপসুলসংলগ্ন অংশকে কর্টেক্স বলে। এ অংশটি ঈষৎ বাদামি রঙের হয়।
- **মেডুলা :** বৃক্কের ভেতরের দিকের কেন্দ্রীয় অংশকে মেডুলা বলে। এ অংশটি গাঢ় বাদামি বা ঈষৎ কালচে রঙের হয়।
- **হাইলাম :** বৃক্কের অবতল অংশের ভাঁজকে হাইলাম বা হাইলাস বলে। হাইলামের মাধ্যমে রেনাল ধমনি ও স্নায়ু বৃক্কে প্রবেশ করে এবং ইউরেটার ও রেনাল শিরা বৃক্ক থেকে বের হয়।
- **রেনাল পিরামিড :** বৃক্কের মেডুলা অংশে ত্রিভুজাকৃতি কয়েকটি (৮-১৮) গঠন দেখা যায় এদের রেনাল পিরামিড বলে। রেনাল পিরামিডের ফাঁকে ফাঁকে কর্টেক্সের যে অংশ বিস্তৃত থাকে তাকে রেনাল কলাম বা বার্টিনির রেনাল স্তম্ভ বলে। রেনাল পিরামিডের শীর্ষকে রেনাল প্যাপিলা বলে।
- **নেফ্রন :** বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একককে নেফ্রন বলে। প্রতিটি বৃক্কে প্রায় ১০-১২ লাখ নেফ্রন থাকে। মানুষের বৃক্কে ৩ ধরনের নেফ্রন থাকে। যথা : সুপারফিসিয়াল কর্টিক্যাল নেফ্রন, মিড কর্টিক্যাল নেফ্রন এবং জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন।
- **রেনাল করপাসল বা মালপিজিয়ান বডি :** নেফ্রনের যে অংশ রেনাল ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাসের সমন্বয়ে গঠিত তাকে রেনাল করপাসল বা মালপিজিয়ান বডি বা মালপিজিয়ান করপাসল বলে।
- **রেনাল ক্যাপসুল বা বোম্যান্স ক্যাপসুল :** এটি নেফ্রনের বদ্ধ, পেয়ালাকৃতির স্ফীতপ্রান্ত, যা গ্লোমেরুলাসকে আবৃত করে রাখে। এটি বাইরের দিকে প্যারাইটাল স্তর এবং ভেতরের দিকে ভিসেরাল স্তর দিয়ে গঠিত।
- **হেনলির লুপ :** প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে বৃক্কের মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি U–আকৃতির লুপ গঠন করে। আবিষ্কারক ফ্রেডরিখ হেনলির (Friedrich Henle) নামানুসারে একে হেনলির লুপ বলে।
- **আলট্রাফিলট্রেশন :** যে পদ্ধতিতে নেফ্রনের রেনাল করপাসল বা মালপিজিয়ান বডিতে রক্ত থেকে পানি, রেচন বর্জ্য ও অন্যান্য পদার্থ পরিস্রুত হয় তাকে আলট্রাফিলট্রেশন বলে। এ পদ্ধতিতে রক্তের প্রোটিন ও রক্তকণিকাসমূহ পরিস্রুত হয় না।
- **পোডোসাইট :** রেনাল ক্যাপসুলের ভিসেরাল স্তরের এন্ডোথেলিয়ামে বিদ্যমান অ্যামিবার মতো দেখতে যেসব কোষ গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশনে বিশেষ ভূমিকা রাখে তাদের পোডোসাইট বলে।
- **গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট :** গ্লোমেরুলাসে সক্রিয় পরিবহন চাপের মাধ্যমে রক্তের প্লাজমা থেকে প্রোটিন ও রক্তকণিকা ছাড়া প্রায় সকল উপাদান, যেমন– পানি, লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, হরমোন, ধাতব আয়ন ইত্যাদি পরিস্রুত হয়ে রেনাল ক্যাপসুলে জমা হয়। পরিস্রুত এসব তরল পদার্থকে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বলে। গ্লোমেরুলাসে অতিসূক্ষ্ম ছাঁকনের জন্য তিন স্তরবিশিষ্ট একটি ফিল্টার বা ছাঁকনি থাকে। এই ছাঁকনি যথাক্রমে গ্লোমেরুলাসের রক্তনালির এন্ডোথেলিয়াম; গ্লোমেরুলার রক্তনালির বেসমেন্ট মেমব্রেন ও বোম্যান্স ক্যাপসুলের এন্ডোথেলিয়াম নিয়ে গঠিত।
- **নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ :** গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেট নেফ্রনের রেনাল করপাসল থেকে রেনাল নালিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বিভিন্ন দ্রব্য রেনাল নালিকা-প্রাচীরের কোষে শোষিত হয়ে নালিকা সংলগ্ন কৈশিকজালিকায় প্রবেশের প্রক্রিয়াকে নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ বলে। প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকার কোষেই অধিকাংশ পুনঃশোষণ সংঘটিত হয়।
- **সক্রিয় ক্ষরণ :** নেফ্রনের বহির্বাহী ধমনিতে কিছু অপ্রয়োজনীয় বস্তু থেকে যায় যেগুলো আলট্রাফিলট্রেশনের সময় গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেটে আসে না। কিন্তু পরবর্তীতে রেনাল নালিকার প্রাচীরের এপিথেলিয়াল কোষ নালিকার চারপাশের কৈশিকজালিকার রক্ত থেকে এসব অপ্রয়োজনীয় বস্তু শোষণ করে সক্রিয় পদ্ধতিতে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের সঙ্গে যুক্ত করে যা মূত্রের সঙ্গে অপসারিত হয়। এ সক্রিয় পদ্ধতিকে সক্রিয় ক্ষরণ বলা হয়।
- **ইউরিওটেলিক প্রাণী :** যেসব প্রাণী ইউরিয়াকে রেচন পদার্থ হিসেবে ত্যাগ করে তাদের ইউরিওটেলিক প্রাণী বলে। যেমন– মানুষসহ কিছু স্থলজ প্রাণী ও সামুদ্রিক প্রাণী।

Scanned with CamScanner

2020/8/17 14

☑ **অরনিথিন চক্র :** যে চক্রের মাধ্যমে অ্যামোনিয়া ও শর্করা বিপাকে সৃষ্ট CO_2 পরস্পর মিলিত হয়ে যকৃতে ইউরিয়া $[CO(NH_2)_2]$ উৎপন্ন হয় তাকে অরনিথিন চক্র বলে। হ্যান্স ক্রেবস ও কার্ট হেনসেমলিট অরনিথিন চক্র বর্ণনা করেন।

☑ **বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল :** কোনো সুস্থ মানুষের হঠাৎ করে (মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে) বৃক্কের কার্যক্রম কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল বা অ্যাকিউট রেনাল ফেইলিউর বলে। বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায় এবং রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।

☑ **নেফ্রোলজি :** চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় বৃক্কের বিভিন্ন বিষয়াবলী (বিশেষ করে বৃক্কের কার্যাবলি ও রোগ) নিয়ে অধ্যয়ন করা হয় তাকে নেফ্রলজি (Nephrology) বলে।

☑ **ডায়ালাইসিস :** যে বায়োফিজিক্যাল পদ্ধতিতে একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট দ্রবণের কেলাস পদার্থের ক্ষুদ্র অণুর কণাগুলো কলয়েড পদার্থের বৃহৎ অণুকণা থেকে পৃথক করা হয় তাকে ডায়ালাইসিস বলে। অথবা– যে বায়োফিজিক্যাল পদ্ধতিতে বৃক্ক সম্পূর্ণভাবে অকেজো হওয়ার পর শরীরে জমে থাকা বর্জ্য (ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম ইত্যাদি) পরিশোধিত করা হয় তাকে ডায়ালাইসিস বলে। তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকল চিকিৎসায় ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে কৃত্রিম বৃক্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ, অতিরিক্ত পানি অপসারণ করা হয়। ডায়ালাইসিস দুই প্রকার, যথা– হিমোডায়ালাইসিস ও পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস।

☑ **ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স :** মানব বৃক্কে প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ রক্ত থেকে ক্রিয়েটিনিন পরিশোধিত হয় তাকে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স (creatinine clearance) বলা হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স হলো ১২৫ সিসি/মিনিট। বৃক্কের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ১০-১২ সিস/মিনিট হলেই সাধারণত ডায়ালাইসিস করতে হয়।

☑ **হিমোডায়ালাইসিস :** কৃত্রিম বৃক্কের সাহায্যে (ডায়ালাইজার) রক্তকে পাম্প করে শরীর থেকে বের করে বর্জ্য পদার্থ অপসারণের উদ্দেশ্যে রক্ত পরিস্রুত করে পুনরায় দেহে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াকে হিমোডায়ালাইসিস বলে।

☑ **পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস :** কৃত্রিম ঝিল্লির পরিবর্তে দেহে অবস্থিত প্রকৃত পেরিটোনিয়াল ঝিল্লিকে ডায়ালাসিং ঝিল্লি হিসেবে ব্যবহার করে বৃক্কের ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়াকে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস বলে।

☑ **ডায়ালাইজার :** যে কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে ডায়ালাইসিস করা হয় তাকে ডায়ালাইজার বলে। ডায়ালাইজারকে অন্য কথায় কৃত্রিম বৃক্ক বা হিমোডায়ালাইজার বলে। এর কাজ হলো হিমোডায়ালাইসিস।

☑ **ডায়ালাইসেট :** হিমোডায়ালাইসিসের উদ্দেশ্যে ডায়ালাইসিস টিউবগুলোকে যে দ্রবণে রাখা হয় তাকে ডায়ালাইসেট বলে।

☑ **বৃক্কের পাথর :** অনেক সময় ইউরিক এসিড মূত্রনালিতে সঞ্চিত হয়ে সুঁই আকৃতির স্ফটিক সৃষ্টি করে যা বৃক্কের পাথর বা রেনাল ক্যালকুলি নামে চিহ্নিত। অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম গ্রহণ, পানি পান কম করা, মূত্রে অতিরিক্ত ক্ষার বা অম্ল সৃষ্টি হওয়া, প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির অতি সক্রিয়তা ইত্যাদি বৃক্ক পাথর সৃষ্টির মূল কারণ। বৃক্ক পাথর প্রধানত ক্যালসিয়াম অক্সালেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং ইউরিক এসিড উপাদানে গঠিত।

☑ **মূত্র :** নেফ্রনের রেনাল টিউব্যুলসে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট-এর নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অম্ল ধর্মীয় তরল রেচন বর্জ্য মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে মূত্র বলে। ইরোক্রোম নামক রঞ্জক পদার্থ থাকার জন্য মূত্রের রং হালকা হলুদ হয়।

☑ **ডাইইউরেটিকস :** যেসব দ্রব্য মূত্রের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয় তাদের ডাইইউরেটিকস বলে। যেমন– পানি, লবণাক্ত পানি, চা এবং কফি ইত্যাদি।

☑ **মূত্রথলি :** দেহের শ্রোণিগহ্বরে অবস্থিত অনৈচ্ছিক পেশি নির্মিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট ত্রিকোণাকৃতির থলিকে মূত্রথলি বলে। ইহা মূত্রকে সাময়িকভাবে জমা রাখে।

☑ **অসমোরেগুলেশন :** দেহ অভ্যন্তরের কোষকলায় বিদ্যমান পানি ও বিভিন্ন লবণের ভারসাম্য রক্ষার কৌশলকে অসমোরেগুলেশন বলে।

☑ **pH :** pH হলো কোনো দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়ন ঘনমাত্রার বা $[H^+]$ এর 10 ভিত্তির ঋণাত্মক লগারিদম বা, $pH = -Log_{10}[H^+]$.

☑ **বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস :** পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ADH ক্ষরণ কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে বৃক্ক নালিকায় পানি শোষণ ব্যাহত হয় এবং মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে অধিক পরিমাণ মূত্র ত্যাগ ঘটে। এই অবস্থাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বলে। ADH ইনজেকশন কিংবা ADH ন্যাজাল স্প্রের মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

☑ **ডায়াবেটিস মেলিটাস :** বহুমূত্র রোগে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে না এবং মূত্রে শর্করা নির্গত হয় না। ইনসুলিন হরমোনের অভাবে যে বহুমূত্র হয় তাকে মধুমেহ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। এতে মূত্রের সাথে শর্করা নির্গত হয়।

Scanned with CamScanner

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মূত্রথলি হতে মূত্র পরিবহনের কাজ করে কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
ক ওভিডাক্ট খ ইউরেথ্রা
গ ইউরেটার ঘ ভাস ডিফারেন্স

২. গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটে কোনটি অনুপস্থিত? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
ক প্রোটিন খ গ্লুকোজ গ আয়ন ঘ ইউরিয়া

৩. মালপিজিয়ান বডি কোন অঙ্গে পাওয়া যায়? [রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]
ক বৃক্ক খ ফুসফুস গ যকৃৎ ঘ অগ্ন্যাশয়

৪. মানবদেহে মূত্র নিষ্কাশনের সঠিক গতিপথ কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]
ক পেলভিস → ইউরেটার → মূত্রথলি → মূত্রনালি → নির্গমন
খ পেলভিস → মূত্রথলি → ইউরেটার → মূত্রনালি → নির্গমন
গ পেলভিস → মূত্রথলি → মূত্রনালি → ইউরেটার → নির্গমন
ঘ পেলভিস → ইউরেটার → মূত্রনালি → মূত্রথলি → নির্গমন

৫. ইউরিয়া তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট চক্র নিচের কোনটি? [যশোর বোর্ড-২০১৬]
ক নাইট্রোজেন চক্র খ অরনিথিন চক্র
গ ক্রেবস চক্র ঘ সাইট্রিক এসিড চক্র

৬. ডায়ালাইসিস পদ্ধতি যে অঙ্গের কাজের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা নিচের কোনটি? [যশোর বোর্ড-২০১৬]
ক হৃৎপিণ্ড খ ফুসফুস গ বৃক্ক ঘ মস্তিষ্ক

৭. বৃক্কের গাঠনিক ও কার্যিক একককে কী বলে? [যশোর বোর্ড-২০১৬]
ক নিউরন খ নেফ্রন গ অ্যালভিওলাস ঘ ল্যাকুনা

৮. পোডোসাইট কোষ কোথায় পাওয়া যায়? [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]
ক ডিস্টাল পেঁচানো নালিকায় খ হেনলির লুপে
গ প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকায় ঘ বোম্যান্স ক্যাপসুলে

৯. মূত্রের pH = ? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]
ক 4.5 খ 6.5 গ 7.0 ঘ 8.5

১০. পেশি নিঃসৃত কোন রাসায়নিক পদার্থ বৃক্কের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়? [বরিশাল বোর্ড-২০১৬]
ক সিক্রেটিন খ গ্লুকাগন
গ কোলোসিসটোকাইনিন ঘ মায়োগ্লোবিন

১১. রেনাল করপাসলে কোন ধরনের কোষ দেখা যায়? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬; বরিশাল. বোর্ড-২০১৬]
ক নিডোসাইট খ পোডোসাইট
গ লিম্ফোসাইট ঘ অস্টিওসাইট

১২. কোথায় ইউরিয়া তৈরি হয়? [ঢাকা বোর্ড-২০১৯]
ক যকৃতে খ বৃক্কে গ অগ্ন্যাশয়ে ঘ প্লিহাতে

১৩. গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটের অধিকাংশ পুনঃশোষিত হয় কোন অংশে? [যশোর বোর্ড-২০১৯]
ক নিকটবর্তী পেঁচানো নালিকায় খ হেনলির লুপে
গ দূরবর্তী পেঁচানো নালিকায় ঘ সংগ্রাহী নালিতে

১৪. মূত্রে বিদ্যমান নন-নাইট্রোজেনাস উপাদান কোনটি? [বরিশাল বোর্ড-২০১৯]
ক ক্রিয়েটিনিন খ ইউরিক এসিড
গ কিটোন বডিস ঘ ইউরিয়া

১৫. মূত্রের রং খড় বর্ণ হওয়ার জন্য দায়ী বস্তু কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৫]
ক অ্যামোনিয়া খ বিলুরুবিন
গ ইউরোক্রোম ঘ কিটোন বডিস

১৬. নেফ্রনের কোন অংশে নির্বাচিত পুনঃশোষণ ঘটে? [বরিশাল বোর্ড-২০১৫]
ক প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকায় খ হেনলির লুপ
গ নিকটবর্তী পেঁচানো নালিকায় ঘ সংগ্রাহক নালিকায়

১৭. গ্লোমেরুলাসের অবস্থান বৃক্কের কোথায়? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]
ক পেলভিসে খ হাইলামে
গ বোম্যানস ক্যাপসুলে ঘ হেনলির লুপে

১৮. ডায়ালাইসিস কত প্রকার? [বরিশাল বোর্ড-২০১৫]
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৯. ডায়ালাইসিসের সময় রক্তে হেপারিন মেশাতে হয় কেন?
ক রক্ত জমাট বাঁধার জন্য খ তরল হওয়ার জন্য
গ রক্ত জমাট না বাঁধার জন্য ঘ ধমনির জন্য

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২০. মানুষের মূত্র তৈরির ধাপগুলো হচ্ছে– [সি.,কু.,ব.,চ.,য.,দি. ও রা. বোর্ড-২০১৮]
i. অতিপরিস্রাবণ ii. পুনঃশোষণ iii. টিউব্যুলার ক্ষরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. নেফ্রনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [ঢাকা বোর্ড-২০১৭]
i. ভিসেরাল স্তর পোডোসাইট কোষ দ্বারা গঠিত
ii. প্যারাইটাল স্তর আঁইশাকার এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত
iii. পেয়ালার মতো প্রসারিত অংশকে বোম্যান্স ক্যাপসুল বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. রক্তের pH নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে– [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
i. H_2O ii. H^+ iii. HCO^-_3
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. বৃক্কের কাজ হলো– [যশোর বোর্ড-২০১৭]
i. নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য অপসারণ
ii. দেহের পানি ও সাম্যতা রক্ষা
iii. রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. নেফ্রনের নিকটবর্তী পেঁচানো নালিতে সংঘটিত হয়– [ঢাকা বোর্ড-২০১৬]
i. ফিলট্রেশন ii. পুনঃশোষণ iii. ক্ষরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. রেচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীর– [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]
i. বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত করে
ii. পানির সাম্যতা বজায় রাখে
iii. অসুস্থতা থেকে মুক্তি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

2020/8/4 17:44

Scanned with CamScanner



[যশোর বোর্ড-২০১৯]

২৬. চিত্রে প্রদর্শিত অঙ্গটি–
i. নিউরন নামক একক দিয়ে গঠিত
ii. নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থ অপসারণে ভূমিকা রাখে
iii. দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. বৃক্কের কাজ হচ্ছে–
i. কোলেস্টেরল উৎপাদন করে
ii. রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে
iii. রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সেলিনার শরীর পূর্বের চেয়ে ফুলে গেছে। মূত্র নিঃসরণ পরিমাণ মারাত্মকভাবে কমে গেছে। [ঢাকা বোর্ড-২০১৮]

২৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত লক্ষণ ছাড়াও সেলিনার অন্যান্য যে লক্ষণ দেখা যেতে পারে তা হলো–
i. ক্ষুধামান্দ্য ii. বমি হওয়া iii. কোমরে ব্যথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. সেলিনার অবস্থা নিরাময়ের জন্য করণীয় পন্থাগুলো হচ্ছে–
i. চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া
ii. নিয়ন্ত্রিত আহার iii. ডায়ালাইসিস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

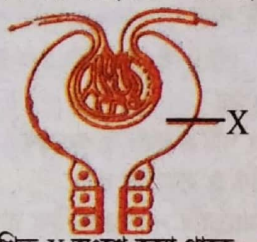

৩০. উদ্দীপকে উল্লিখিত X অংশে জমা থাকে– [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
i. প্রোটিন ii. গ্লুকোজ iii. ইউরিক এসিড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. উল্লিখিত অঙ্গে ব্যবহৃত হরমোনের উৎস স্থল– [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
i. পিটুইটারি গ্রন্থি ii. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি iii. হৃৎপিণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
$2NH_3 + CO_2 \rightarrow CO(NH_2)_2 + H_2O$

৩২. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিক্রিয়া কোথায় ঘটে? [সিলেট বোর্ড-২০১৭]
ক অরনিথিন চক্রে খ ডি-অ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায়
গ ক্রেবস চক্রে ঘ গ্লাইকোজেনোসিস প্রক্রিয়ায়

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
প্রাণিবিজ্ঞান ক্লাসে মানবদেহের একটি অঙ্গের গঠন বর্ণনা করতে গিয়ে শিক্ষক বলেন, এটি আকারে অনেকটা শিম বীজের মতো এবং এটি লালচে খয়েরি রঙের।

৩৩. উদ্দীপকে বর্ণিত অঙ্গটি হলো– [রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]
ক যকৃৎ খ পাকস্থলী গ অগ্ন্যাশয় ঘ বৃক্ক

৩৪. উদ্দীপকে বর্ণিত অঙ্গটির অন্তঃগঠন পাওয়া যায়– [রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]
i. অ্যালভিওলাস ii. রেনাল পিরামিড iii. পেলভিস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩৫. রক্তের কোন উপাদানের মাত্রাকে উদ্দীপকের অঙ্গের রোগ নির্ণয়ের নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা হয়? [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]
ক পটাশিয়াম খ অ্যামোনিয়াম
গ ক্রিয়েটিনিন ঘ সোডিয়াম

৩৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গের তাৎক্ষণিক বিকলের কারণ হলো– [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]
i. নেফ্রাইটিস ii. ইউরেটারে পাথর হওয়া iii. হার্ট অ্যাটাক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানবদেহের একজোড়া বিশেষ অঙ্গ রক্ত হতে ইউরিয়া, অতিরিক্ত লবণ ও পানি অপসারণ করে। এটি কয়েক লক্ষ সূক্ষ্ম নালিকা দ্বারা গঠিত। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]

৩৭. উদ্দীপকের অঙ্গটির কাজে কোন হরমোনের ভূমিকা রয়েছে?
ক প্যারাথ হরমোন খ অক্সিটোসিন
গ অ্যান্টি-ডাইইউরেটিক হরমোন
ঘ লিউনাইজিং হরমোন

৩৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূক্ষ্ম নালিকার কাজ হলো–
i. অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ ii. অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা
iii. গ্লুকোজ অপসারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানবদেহের পানিসাম্যতা একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বজায় থাকে। এ প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। [বরিশাল বোর্ড-২০১৬]

৩৯. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রক্রিয়াটি হলো–
ক বহিঃশ্বসন খ গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন
গ অসমোরেগুলেশন ঘ সমন্বয় সাধন

2020/8/4 11:44
Scanned with CamScanner

৪০. উদ্দীপকের মুখ্য ভূমিকা পালনকারী রাসায়নিক পদার্থটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. ADH হরমোন
ii. সংগ্রাহক নালির ভেদ্যতা কম-বেশি করে
iii. থাইরয়েড গ্রন্থি হতে নিঃসৃত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৪১ ও ৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

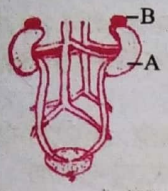

[ঢাকা বোর্ড-২০১৯]

৪১. A অঙ্গের পরিশ্রুত তরলে ক্রিয়েটিনিন এর শতকরা হার কত?
ক ০.০৪ খ ০.০৫ গ ০.০৭ ঘ ০.৩৫

৪২. উদ্দীপকের 'B' গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন কোনটি?
ক থাইমোসিন খ থাইরক্সিন
গ ভেসোপ্রেসিন ঘ অ্যাড্রেনালিন

⏭ উদ্দীপকটি থেকে নিচের দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

অ্যামাইনো এসিড $\xrightarrow[\text{ডিঅ্যামাইনেজ}]{\text{ডিঅ্যামাইনেশন}}$ [X] + (– NH_2)

[ঢাকা বোর্ড-২০১৫]

৪৩. উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি কোথায় সংঘটিত হয়?
ক যকৃৎ খ গ্লোমেরুলাসে
গ হেনলির লুপে ঘ পেঁচানো নালিকায়

৪৪. 'X' চিহ্নিত পদার্থটি–
i. এসিড ii. এটি চর্বিতে রূপান্তরিত হয়
iii. মূত্র সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি থেকে ৪৫ ও ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

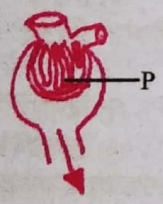

[রাজশাহী, সিলেট বোর্ড-২০১৯]

৪৫. উদ্দীপকের চিত্রের 'P' চিহ্নিত অংশের নাম কী?
ক বোম্যান্স ক্যাপসুল খ হেনলির লুপ
গ প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকা ঘ গ্লোমেরুলাস

৪৬. উদ্দীপকের চিত্রের তীর চিহ্নিত সঠিক গতিপথ কোনটি?
ক গ্লোমেরুলাস → প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকা → সংগ্রাহী নালিকা → হেনলির লুপ
খ বোম্যানস ক্যাপসুল → হেনলির লুপ → ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা → সংগ্রাহী নালিকা
গ প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকা → হেনলির লুপ → ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা → সংগ্রাহী নালিকা
ঘ রেনাল করপাসল → সংগ্রাহী নালিকা → ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা → হেনলির লুপ

⏭ নিচের উদ্দীপকটি থেকে ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

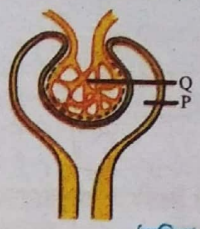

[কুমিল্লা ও রাজশাহী বোর্ড-২০১৫]

৪৭. চিত্রে উল্লিখিত 'P' চিহ্নিত অংশটি কী?
ক মাইক্রোভিলাই খ বোম্যান্স ক্যাপসুল
গ গ্লোমেরুলাস ঘ পোডোসাইট

৪৮. চিত্রে উল্লিখিত 'Q' চিহ্নিত অংশের কাজ হলো–
i. অ্যালট্রাফিলট্রেশন ii. পুনঃশোষণ
iii. N_2-ঘটিত বর্জ্য পরিস্রুতকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানবদেহে বর্জ্য নিষ্কাশনে সাধারণত দুটি বৃক্ক থাকে। বৃক্কের গাঠনিক ও কার্যিক একক তথা নেফ্রনসমূহ মূত্র তৈরিতে সাহায্য করে থাকে। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫]

৪৯. উদ্দীপকের গাঠনিক ও কার্যিক এককের কোন অংশে মূত্র তৈরির প্রথম ধাপটি সম্পন্ন হয়?
ক হেনলির লুপে খ দূরবর্তী পেঁচানো নালিকায়
গ সংগ্রাহক নালিকায় ঘ গ্লোমেরুলাসে

৫০. উদ্দীপকের অঙ্গ দুটি থেকে নিঃসৃত হরমোন কার্যকর ভূমিকা পালন করে–
i. মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণে
ii. রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে
iii. রক্তের pH নিয়ন্ত্রণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি থেকে ৫১ ও ৫২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[সিলেট বোর্ড-২০১৫]

৫১. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গে ফিল্টার হয়–
i. ইউরিয়া ii. প্রোটিন iii. শর্করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫২. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গের কাজ হলো–
i. রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ
ii. নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ
iii. রেনিন এনজাইম ক্ষরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

Scanned with CamScanner

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৫৩ ও ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

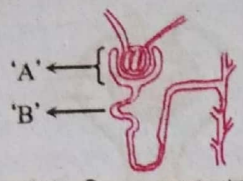

[কু. বো : ১৯]

৫৩. 'A' চিহ্নিত অংশটি তৈরিতে অংশগ্রহণকারী উপাদান হলো–
i. পোডোসাইট কোষ ii. ক্যাপসুলার স্পেস
iii. গ্লোমেরুলার এন্ডোথেলিয়াম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৪. উল্লিখিত গঠনটির 'B' চিহ্নিত অংশটির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন কোনটি?
ক ADH খ FSH গ STH ঘ LH

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৫. মানব রেচনতন্ত্রের অংশ নয় কোনটি? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক বৃক্ক খ মূত্রনালি গ অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ঘ রেচননালি

৫৬. মানুষের রেচনতন্ত্রের সাহায্যে দেহের প্রায় কত শতাংশ রেচন পদার্থ রেচিত হয়? [মেডিকেল: ০৬-০৭, ডেন্টাল: ০৩-০৪]
ক ৭০ খ ৮০ গ ৯০ ঘ ১০০

৫৭. রেচনতন্ত্রে নিম্নের কোনটি ইউরেটার নামক নালি গঠন করে? [ডেন্টাল : ০৪-০৫]
ক ডাক্ট অব বেলিনি খ সংগ্রাহক নালিকা
গ ডিস্টাল নালিকা ঘ হেনলির লুপ

৫৮. বৃক্কের কাজ নয় কোনটি? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা খ অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করা
গ তাপ নিয়ন্ত্রণ করা ঘ রক্তের আয়ন নিয়ন্ত্রণ করা

৫৯. নিম্নের কোনটি বৃক্কের কাজ নয়?
[মেডিকেল : ০৮-০৯, ডেন্টাল : ০৪-০৫]
ক দেহ থেকে নাইট্রোজেন যুক্ত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করা
খ শ্বেত রক্তকণিকা তৈরিতে ভূমিকা রাখা
গ রক্তে অম্ল-ক্ষারের সমতা রক্ষা করা
ঘ দেহে পানির সমতা রক্ষা করা

৬০. বৃক্কের কাজ নয় কোনটি? [মেডিকেল : ০৪-০৫, ০২ - ০৩]
ক রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা
খ রক্তে অম্লের পরিমাণ বৃদ্ধি করা
গ দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা
ঘ ভিটামিন 'ডি' ও লোহিত কণিকা তৈরিতে অংশ নেওয়া

৬১. নিম্নের কোনটি বৃক্কের কাজ নয়? [ডেন্টাল : ০২-০৩]
ক রক্ত থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য অপসারণ
খ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা
গ ভিটামিন-বি তৈরিতে অংশ নেওয়া
ঘ দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষ করা

৬২. হেনলির লুপের অবস্থান কোথায়? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক বৃক্কীয় নালিকায় খ রেনাল করপাসলে
গ এফারেন্ট ধমনিকাতে ঘ ইফারেন্ট ধমনিকাতে

৬৩. লুপ অব হেনলি শরীরের নিম্নলিখিত কোন অঙ্গের অংশ?
[মেডিকেল : ১৩-১৪]
ক যকৃৎ খ বৃক্ক গ প্লিহা ঘ হৃৎপিণ্ড

৬৪. কোন তথ্যটি নেফ্রনের জন্য প্রয়োজ্য হবে? [মেডিকেল : ০৫-০৬]
ক নেফ্রনগুলো মাঝে মাঝে সরল প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন বর্জ্য পৃথক করে
খ ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে সৃষ্টি হয়
গ ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে সৃষ্টি হয়
ঘ প্রত্যেক বৃক্কে 12 কোটি নেফ্রন থাকে

৬৫. প্রতিটি বৃক্কে নেফ্রন থাকে– [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক প্রায় ৮ থেকে ৯ লক্ষ খ প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ
গ প্রায় ১২ থেকে ১৪ লক্ষ ঘ প্রায় ১৩ থেকে ১৪ লক্ষ

৬৬. নিচের কোন অংশটি রেনাল টিউব্যুলে এর অংশ নয়?
[মেডিকেল : ০২-০৩]
ক গোড়াদেশীয় বা প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকা
খ প্রান্তীয় বা ডিস্টাল পেঁচানো নালিকা
গ হেনলি-র লুপ
ঘ অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল

৬৭. স্বাভাবিক মূত্রের রং খড়ের রং এর মতন হবার কারণ–
[ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক ইউরিয়া খ ইউরোক্রোম গ অ্যামোনিয়া ঘ বিলিরুবিন

৬৮. কোন চক্রের মাধ্যমে যকৃতে ইউরিয়া তৈরি হয়?
[মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক কার্বন চক্র খ অরনিথিন চক্র
গ ক্রেবস চক্র ঘ নাইট্রোজেন চক্র

৬৯. স্বাভাবিক মূত্রের বর্ণ হালকা হলুদ হয় কিসের উপস্থিতিতে?
[মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক বিলিরুবিন খ বিলিভারডিন
গ অ্যামোনিয়া ঘ ইউরোক্রোম

৭০. মূত্রের উপাদান নয় কোনটি? [মেডিকেল : ১২-১৩]
ক ক্রিয়েটিনিন খ ইউরিক এসিড
গ বিলিরুবিন ঘ ইউরোক্রোম

৭১. মানুষের গ্লোমেরুলাসে পরিস্রুত মূত্র ADH এর প্রভাব ছাড়া নিম্নের (%) কতভাগ পুনঃশোষণ নেফ্রনের প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকায় শোষিত হয়? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক ৪০% খ ৬০% গ ৮০% ঘ ২০%

৭২. প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকায় নিম্নের কোনটির সক্রিয় ক্ষরণ হয়? [ডেন্টাল : ১০-১১]
ক ভিটামিন খ ক্রিয়েটিনিন
গ অ্যামিনো অ্যাসিড ঘ ক্লোরাইড আয়ন

৭৩. মানুষের মূত্রে নিম্নের শতকরা কতভাগ অ্যামোনিয়াম পাওয়া যায়? [ডেন্টাল : ১০-১১]
ক ০.০৪ খ ০.০১ গ ০.৩৫ ঘ ০.১৫

৭৪. নিচের কোনটি বৃক্ক সম্পর্কে সঠিক নয়? [ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক অসমোরেগুলেশনের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে বৃক্ক
খ বৃক্কে অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়
গ ADH-এর প্রভাবে পানির পুনঃশোষণ বেশি হয়
ঘ সক্রিয় পরিবহন পদ্ধতিতে গ্লুকোজ শোষিত হয়

৭৫. কোনটি মানবদেহের রেচন/রেচনতন্ত্রের জন্য সঠিক নয়?
[ডেন্টাল : ০৬-০৭]
ক মূত্র দুইটি ধাপে সৃষ্টি হয় : অতিপরিস্রাবণ ও সক্রিয় ক্ষরণ
খ নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থই হচ্ছে রেচন পদার্থ
গ মানুষের প্রত্যেক বৃক্কে 10 লক্ষ থেকে 12 লক্ষ নেফ্রন রয়েছে
ঘ সাধারণত মূত্রের pH কিছুটা অম্লিক

Scanned with CamScanner

2020/8/4 17:44

৭৬. কোন ধাপটি মূত্র সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় নয়? [ডেন্টাল : ০৫-০৬]
ক সক্রিয় ক্ষরণ খ নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ
গ শোষণ ঘ অতিপরিস্রাবন

৭৭. কোন রঞ্জক পদার্থের জন্য মূত্র তার স্বাভাবিক খড় রং প্রাপ্ত হয়? [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক ইউরিক এসিড খ ইউরোক্রোম
গ ক্রিয়েটিনিন ঘ অ্যামোনিয়া

৭৮. নিচের কোন হরমোন রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রন করে? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক রেনিন খ অ্যানজিওটেনসিন
গ অ্যালডোস্টেরন ঘ ভেসোপ্রেসিন

৭৯. দাতার দেহ থেকে বৃক্ক কতক্ষণের মধ্যে গ্রহীতার দেহে স্থাপন করতে হয়? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে খ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে
গ ১০০ ঘণ্টার মধ্যে ঘ ২ ঘণ্টার মধ্যে

উত্তরমালা

১. (খ); ২. (ক); ৩. (ক); ৪. (ক); ৫. (খ); ৬. (গ); ৭. (খ); ৮. (ঘ); ৯. (খ); ১০. (ঘ); ১১. (খ); ১২. (খ); ১৩. (ক); ১৪. (গ); ১৫. (গ); ১৬. (গ); ১৭. (গ); ১৮. (ক); ১৯. (গ); ২০. (ঘ); ২১. (ঘ); ২২. (খ); ২৩. (ক) ২৪. (ক); ২৫. (ঘ); ২৬. (ঘ); ২৭. (খ); ২৮. (ঘ); ২৯. (ঘ); ৩০. (ঘ); ৩১. (ক); ৩২. (ক); ৩৩. (ঘ); ৩৪. (গ); ৩৫.(গ); ৩৬.(ঘ); ৩৭. (গ); ৩৮. (ঘ); ৩৯. (গ); ৪০. (ক); ৪১. (গ); ৪২. (ঘ); ৪৩. (ক); ৪৪. (গ); ৪৫. (ঘ); ৪৬. (খ); ৪৭. (খ); ৪৮. (খ); ৪৯. (ঘ); ৫০. (ঘ); ৫১. (ঘ); ৫২. (ঘ); ৫৩. (খ); ৫৪. (ক); ৫৫. (গ); ৫৬. (খ); ৫৭. (ক); ৫৮. (গ); ৫৯. (খ); ৬০. (খ); ৬১. (গ); ৬২. (ক); ৬৩. (খ); ৬৪. (খ); ৬৫. (খ); ৬৬. (ঘ); ৬৭. (খ); ৬৮. (খ); ৬৯. (ঘ); ৭০. (গ); ৭১. (গ); ৭২. (খ); ৭৩. (ক); ৭৪. (খ); ৭৫. (ক); ৭৬.(গ); ৭৭. (খ); ৭৮. (গ); ৭৯. (খ)।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. রেচনতন্ত্র কাকে বলে?
২. রেচন পদার্থ কী?
৩. রেচন কী? [যশোর বোর্ড-১৯; ১৬]
৪. বৃক্ক কী?
৫. কর্টেক্স কী?
৬. মেডুলা কী?
৭. হাইলাম বা হাইলাস কী?
৮. রেনাল পিরামিড কী?
৯. পেলভিস কী?
১০. প্যাপিলা কী? [সিলেট বোর্ড-১৬]
১১. নেফ্রন কী? [ব. চ. বো.-১৯; সি. বো.-১৬]
১২. রেনাল ক্যাপসুল বা বোম্যান্স ক্যাপসুল কী?
১৩. হেনলির লুপ কী?
১৪. মূত্র কী?
১৫. পোডোসাইট কী?
১৬. গ্লোমেরুলাস কী?
১৭. গ্লোমেরুলাস ফিলট্রেট কী?
১৮. ইউরিকোটেলিক প্রাণী কাকে বলে?
১৯. ইউরিওটেলিক প্রাণী কাকে বলে?
২০. অ্যামোনোটেলিক প্রাণী কাকে বলে?
২১. ডিঅ্যামিনেশন কী?
২২. অরনিথিন চক্র কী?
২৩. এরিথ্রোপোয়েসিস কী?
২৪. ডায়ালাইসিস কী?
২৫. হিমোডায়ালাইসিস কী?
২৬. পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস কী?
২৭. ডায়ালাইজার কী?
২৮. ADH কী? [যশোর বোর্ড-১৭]
২৯. ডাইইউরেটিকস কী?
৩০. অসমোরেগুলেশন কাকে বলে? [যশোর বোর্ড-১৬,১৭]
৩১. pH কী? [রাজশাহী, সিলেট বোর্ড-১৯]

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. মানুষের রেচন পদার্থগুলোর নাম লিখ [দিনাজপুর বোর্ড-১৬]
২. সব রেচন পদার্থই বর্জ্য পদার্থ, কিন্তু সকল বর্জ্য পদার্থ রেচন পদার্থ নয় কেন? বৃক্কের কাজ লিখ।
৩. বৃক্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ?
৪. রেনাল করপাসল বা মালপিজিয়ান বডি বলতে কী বুঝ?
৫. ডাক্ট অব বেলিনি বলতে কী বুঝ?
৬. আলট্রাফিলট্রেশন বলতে কী বুঝ?
৭. সক্রিয় ক্ষরণ বলতে কী বুঝ? [ঢাকা বোর্ড-১৬]
৮. নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ বলতে কী বুঝ? [চট্টগ্রাম বোর্ড-১৯]
৯. অসমোরেগুলেশন বলতে কী বোঝ? [যশোর বোর্ড-১৭]
১০. মানবদেহে ইউরিয়া সৃষ্টির কারণ লিখ।
১১. মানবদেহের প্রধান রেচন বর্জ্য কোন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়?
১২. ইউরিয়া সৃষ্টির দেহে অতিপরিস্রাবণের হার কি কারণে বৃদ্ধি পায়?
১৩. ডায়াবেটিস মেলিটাস কী?
১৪. ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস বা বহুমূত্র কী?
১৫. গ্লাইকোসুরিয়া ও হিমাচুরিয়া কী?
১৬. বৃক্ক পাথর ও নেফ্রাইটিস কী?
১৭. অসমোরেগুলেশন বলতে কী বুঝ?
১৮. বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল বলতে কী বুঝ?
১৯. তাৎক্ষণিক বিকলের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ।
২০. মূত্রের মুখ্য উপাদানগুলোর নাম লিখ। [রাজশাহী বোর্ড-১৬]
২১. হিমোডায়ালাইসিস বলতে কী বুঝায়? [রাজশাহী ও সিলেট বোর্ড-১৯]
২২. গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট বলতে কী বুঝ? [যশোর বোর্ড-১৯]

পার্থক্য লিখ/তুলনা কর :

২৩. নেফ্রন ও নিউরন।
২৪. মালপিজিয়ান করপাসল/বডি ও মালপিজিয়ান নালিকা।
২৫. Rennin ও Renin.

Scanned with CamScanner

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। রহিমের প্রস্রাবের পরিমাণ কয়েকদিন যাবৎ কমে যাওয়ায় ডাক্তার তাকে প্রচুর পানি খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। *(রাজশাহী ও সিলেট বোর্ড-২০১৯)*

ক. pH কাকে বলে?
খ. হিমোডায়ালাইসিস বলতে কী বুঝায়?
গ. রহিমের সমস্যা- সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি কীভাবে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ রহিমের সমস্যা সমাধানে একটি হরমোনও ভূমিকা রাখবে– বিশ্লেষণ কর।

২। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

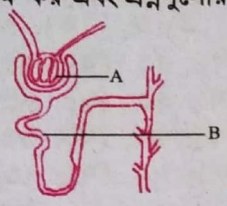

(যশোর বোর্ড-২০১৯)

ক. রেচন কী?
খ. গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট বলতে কী বুঝ?
গ. মূত্র সৃষ্টিতে 'A' অংশটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
ঘ পুনঃশোষনে 'B' অংশ কাজ না করলে আমাদের কী সমস্যা হত– বিশ্লেষণ কর।

৩। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

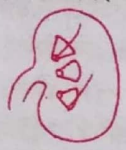

(চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৯)

ক. নেফ্রন কী?
খ. নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকটির চিত্রটির এককের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
ঘ দেহের বর্জ্য নিষ্কাষণে উদ্দীপকের অঙ্গটি প্রধান ভূমিকা পালন করে– বিশ্লেষণ কর।

৪। তন্ত্র – A : নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন
তন্ত্র – B : CO_2 নিষ্কাশন

ক. এপিগ্লটিস কী?
খ. অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন বলতে কী বুঝ? *(সকল বোর্ড-২০১৮)*
গ. উদ্দীপকে তন্ত্র A এর গঠনগত ও কার্যগত এককের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। *(সকল বোর্ড-২০১৮)*
ঘ. উদ্দীপকে তন্ত্র A ও তন্ত্র B, ভিন্নতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে– তা বিশ্লেষণ কর। *(সকল বোর্ড-২০১৮)*

৫। শ্রেণিশিক্ষক বোর্ডে শিমবীজের ন্যায় একটি চিত্র অঙ্কন করে বললেন যে, অঙ্গটির উল্লেখযোগ্য দুটি কাজ হলো–
⇒ মানবদেহের মূত্র তৈরিতে ভূমিকা রাখে।
⇒ মানবদেহের পানিসাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. উপযোজন কী?
খ. পিটুইটারি গ্রন্থিকে মাস্টারগ্লান্ড বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকের অঙ্গটির চিত্রসহ অন্তর্গঠন বর্ণনা কর। *(কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭)*
ঘ. উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি কীভাবে দ্বিতীয় কাজটি সম্পন্ন করে তা বিশ্লেষণ কর। *(কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭)*

৬। শিম বীজের মতো দেখতে মানবদেহের একজোড়া অঙ্গ প্রতিনিয়ত অম্লধর্মী তরল বর্জ্য সৃষ্টি ও অপসারণ করে মানব শরীরকে বিষমুক্ত রাখে। *(যশোর বোর্ড-২০১৭)*

ক. ADH কী?
খ. অসমোরেগুলেশন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটির গাঠনিক এককের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
ঘ. উল্লিখিত তরল পদার্থ উৎপাদন কৌশল ব্যাখ্যা কর।

৭। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

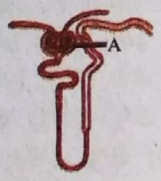

ক. ব্যারোরিসেপ্টর কী?
খ. সক্রিয় ক্ষরণ বলতে কী বুঝায়? *[ঢাকা বোর্ড-১৬]*
গ. উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত অংশ থেকে কীভাবে বর্জ্য পৃথক হয় বর্ণনা কর। *[ঢাকা বোর্ড-১৬]*
ঘ. উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশিত অঙ্গটি বিকল হলে গৃহীত সাময়িক বিকল্প পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক বলে তুমি মনে কর? বুঝিয়ে লিখ। *[ঢাকা বোর্ড-১৬]*

৮। অ্যামিনো এসিড শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়ায় কিছু নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থের সৃষ্টি হয়। মূত্র মানুষের প্রধান রেচন পদার্থ এবং বৃক্ক প্রধান রেচন অঙ্গ। *(যশোর বোর্ড-২০১৬)*

ক. রেচন কী?
খ. অসমোরেগুলেশন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটির গাঠনিক এককের চিহ্নিত চিত্র দাও।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদার্থটির তৈরি ও নিষ্কাশন অতীব জরুরি– বিশ্লেষণ কর।

৯। আমাদের দেহ যখন লবণ ও পানি ধরে রাখে তখন শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ ফুলে যায়। রক্তের ঘনত্বের অস্বাভাবিকতায় শরীরের বিশেষ একটি অঙ্গে হরমোনের পরিমাণ বেড়ে গেলে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ক. শিখা কোষ কী?
খ. লিম্ফোসাইটকে স্মৃতি কোষ বলা হয় কেন?
গ. অঙ্গটির গাঠনিক এককের বর্ণনা দাও। *(কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬)*
ঘ. অঙ্গটিতে উল্লিখিত জৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহের বহুমুখী আচরণ সম্পর্কে আলোচনা কর। *(কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬)*

১০। আমাদের দেহে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি হয়, সাথে সাথে কিছু অপজাত দ্রব্যও তৈরি হয়। উদর গহ্বরে মেরুদণ্ডের দুইপাশে শিম বীজ আকৃতির অঙ্গের মধ্যকার সূক্ষ্ম গঠনটির মাধ্যমে উৎপন্ন অপজাত দ্রব্যগুলো দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

ক. প্রতিসাম্যতা কী?
খ. অপত্য যত্ন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অঙ্গটি কীভাবে অপজাত দ্রব্য অপসারণ করে– ব্যাখ্যা কর। *(বরিশাল বোর্ড-২০১৬)*
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গঠনটি অপজাত পদার্থ অপসারণ ছাড়াও পানি সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে– বিশ্লেষণ কর। *(বরিশাল বোর্ড-২০১৬)*

Scanned with CamScanner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

Scanned with CamScanner

মানব শারীরতত্ত্ব : চলন ও অঙ্গচালনা
HUMAN PHYSIOLOGY : LOCOMOTION AND MOVEMENT OF ORGANS

অধ্যায় ৭

প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্যান্বেষণ, আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। নিজের প্রচেষ্টায় মানুষের সাময়িকভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়াকে মানুষের চলন বলে। চলন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের সাথে বিভিন্ন ধরনের পেশি সংযুক্ত থেকে অঙ্গ-চালনায় সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত কারণে আমাদের কঙ্কালতন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যার ফলস্বরূপ, আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে দুর্বিষহ ও কষ্টদায়ক। এ অধ্যায়ে কঙ্কালতন্ত্রের গঠন ও কাজ, বিভিন্ন পেশির গঠন ও কাজ এবং অস্থিভঙ্গ, অস্থিসন্ধিতে আঘাত ও এর প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।


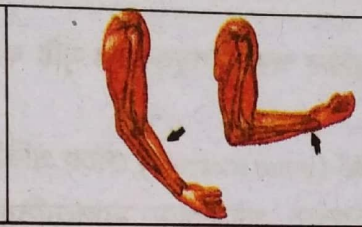
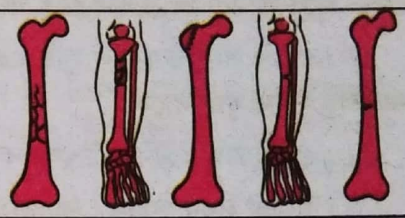

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ১২)
১. মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ২. অস্থি ও তরুণাস্থির গঠনের তুলনা করতে পারবে। ৩ ব্যবহারিক ○ মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের অস্থিসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন প্রকার পেশির গঠন ও কাজের তুলনা করতে পারবে। ৫. পেশিতে টান পরে কিন্তু ধাক্কা দেয়না ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. ব্যবহারিক ○ প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্য মসৃণ ও হৃদয়পেশির কাঠামোর তুলনা করতে পারবে। ৬. কঙ্কারের প্রধান কার্যক্রম "রডস ও লিভারের" একটি তন্ত্র হিসাবে কাজ করে বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. মানুষের হাটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বিভিন্ন ধরনের অস্থিভঙ্গ এবং এদের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বিভিন্ন ধরনের অস্থিসন্ধিতে আঘাত এবং এদের প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারবে।	● মানুষের কঙ্কালতন্ত্র ○ প্রধান ভাগ ○ অস্থি ও তরুণাস্থির গঠন ● ব্যবহারিক ○ মানুষের বিভিন্ন অস্থি (মডেল) পর্যবেক্ষণ ● পেশির গঠন ও কাজ ○ প্রধান ভাগ, ○ মসৃণ ○ হৃদ, ○ কঙ্কাল ● পেশির টান পরে কিন্তু ধাক্কা দেয়না ব্যবহারিক ○ প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্য মসৃণ ও হৃদ পেশির কাঠামোর তুলনা। ● কঙ্কালের কার্যক্রম ও 'রডস ও লিডার' তন্ত্র ● হাটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয় ● অস্থিভঙ্গ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ○ সাধারণ ○ যৌগিক ○ জটিল ● সন্ধির আঘাত এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ○ স্থানচ্যুতি ○ মচকানো

2020/8/4 17:45

Scanned with CamScanner

৭.১ মানুষের কঙ্কালতন্ত্র (Skeletal System of Human body)

ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত অস্থি, তরুণাস্থি ও লিগামেন্ট সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহের প্রধান কাঠামো গঠন করে, দৃঢ়তা দানসহ অভ্যন্তরীণ নরম অঙ্গাদি রক্ষা করে, দেহের ভার বহন করে এবং পেশি সংযোজনের তল সৃষ্টি করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে। মানুষের কঙ্কাল মূলত অন্তঃকঙ্কাল, কারণ দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। তোমরা নবম ও দশম শ্রেণিতে কঙ্কালতন্ত্র সম্পর্কে জেনেছ।

কঙ্কালতন্ত্রের কাজ (Functions of Skeletal System)

১। **দেহ কাঠামো গঠন :** কঙ্কালতন্ত্র মানবদেহকে একটি নির্দিষ্ট আকার ও কাঠামো দান করে।

২। **রক্ষণাবেক্ষণ ও ভারবহন :** মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord), হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদিকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়া পেশিসমূহ কঙ্কালের সাথে আটকে থেকে দেহের ভার বহন করে এবং দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

৩। **নড়াচড়া ও চলাচল :** বক্ষ অস্থিচক্র, শ্রোণি অস্থিচক্র, হাত ও পা নড়াচড়ায় সাহায্য করে। পেশিতন্ত্রও এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পেশিসমূহ বিভিন্ন অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। পেশির সংকোচনের ফলেই অস্থি চালিত হয়ে আমরা চলাচল করতে পারি।

৪। **পেশি সংযুক্তির তল সৃষ্টি :** পেশি সংযুক্তির জন্য উপযুক্ত তল সৃষ্টি করে। পেশি, লিগামেন্ট, টেনডন ইত্যাদি কঙ্কালের সাথে যুক্ত থাকে।

৫। **লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন :** অস্থিমজ্জা (bone marrow) থেকে প্রতিনিয়ত লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়।

৬। **খনিজ লবণ সঞ্চয় :** ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম জাতীয় খনিজ লবণ অস্থিতে সঞ্চিত হয় এবং প্রয়োজনে রক্তে সরবরাহ করে। প্রায় ৯৭% ক্যালসিয়াম অস্থিতে সঞ্চিত থাকে।

৭। **শ্বসন ও শ্রবণ :** মধ্যকর্ণের ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস নামক অস্থি শ্রবণে এবং তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাই ইত্যাদি শ্বসনে সহায়তা করে।

৮। **রোগ প্রতিরোধে :** অস্থির রেটিক্যুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম (Reticulo-endothelial System, RES) দেহের রোগ প্রতিরোধে অংশ নেয়।

৯। **চাপ ও আয়নিক সমতা রক্ষা :** দেহের অভ্যন্তরীণ চাপ নিয়ন্ত্রণে ও আয়নিক সমতা রক্ষায় অস্থিসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১০। **বিষাক্ত মৌল সঞ্চয় :** দেহের অস্থিসমূহ অনেক বিষাক্ত মৌল যেমন– লেড, আর্সেনিক ইত্যাদি সঞ্চয় করে দেহকে রক্ষা করে।

১১। **হরমোনাল নিয়ন্ত্রণ :** অস্থির কোষ থেকে **অস্টিওক্যালসিন** (osteocalcin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয় যা দেহের রক্তের চিনি ও চর্বির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

কঙ্কালতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Skeletal System)

মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১। **বহিঃকঙ্কালতন্ত্র** (Exoskeletal system) **:** এই তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গাদি হলো– নখ, দাঁত, লোম ইত্যাদি। ত্বকের বহিঃত্বক (epidermis) থেকে এই তন্ত্রের অঙ্গাদি উদ্ভূত হয় বলে এদেরকে **ত্বকোদ্ভূত অঙ্গাদি** (integumentary derivatives) বলা হয়।

২। **অন্তঃকঙ্কালতন্ত্র** (Endoskeletal system) **:** মানবদেহের কঙ্কাল বলতে মূলত অন্তঃকঙ্কালকেই বোঝায়। অস্থি, তরুণাস্থি, লিগামেন্ট, টেনডন ও অস্থিসন্ধি নিয়ে এই কঙ্কালতন্ত্র গঠিত। মানুষের ২১ বছর বয়সে অস্থির ঘনত্ব সর্বাধিক। অন্তঃকঙ্কাল প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। যথা–

(i) অক্ষীয় কঙ্কাল (Axial skeleton) ও

(ii) উপাঙ্গীয় কঙ্কাল (Appendicular skeleton)

2020/8/4 17:45

Scanned with CamScanner

৩। **স্প্ল্যাংকনিক কঙ্কালতন্ত্র** (Splanchnic skeletal system) : স্বরযন্ত্র (larynx), শ্বাসনালি (trachea), ক্রোমনালি (bronchi) ইত্যাদি এই তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই তন্ত্র ব্যাপক অর্থে অন্তঃকঙ্কালতন্ত্রের অন্তর্গত। মূলত তরুণাস্থি দ্বারা এদের কাঠামো গঠিত।

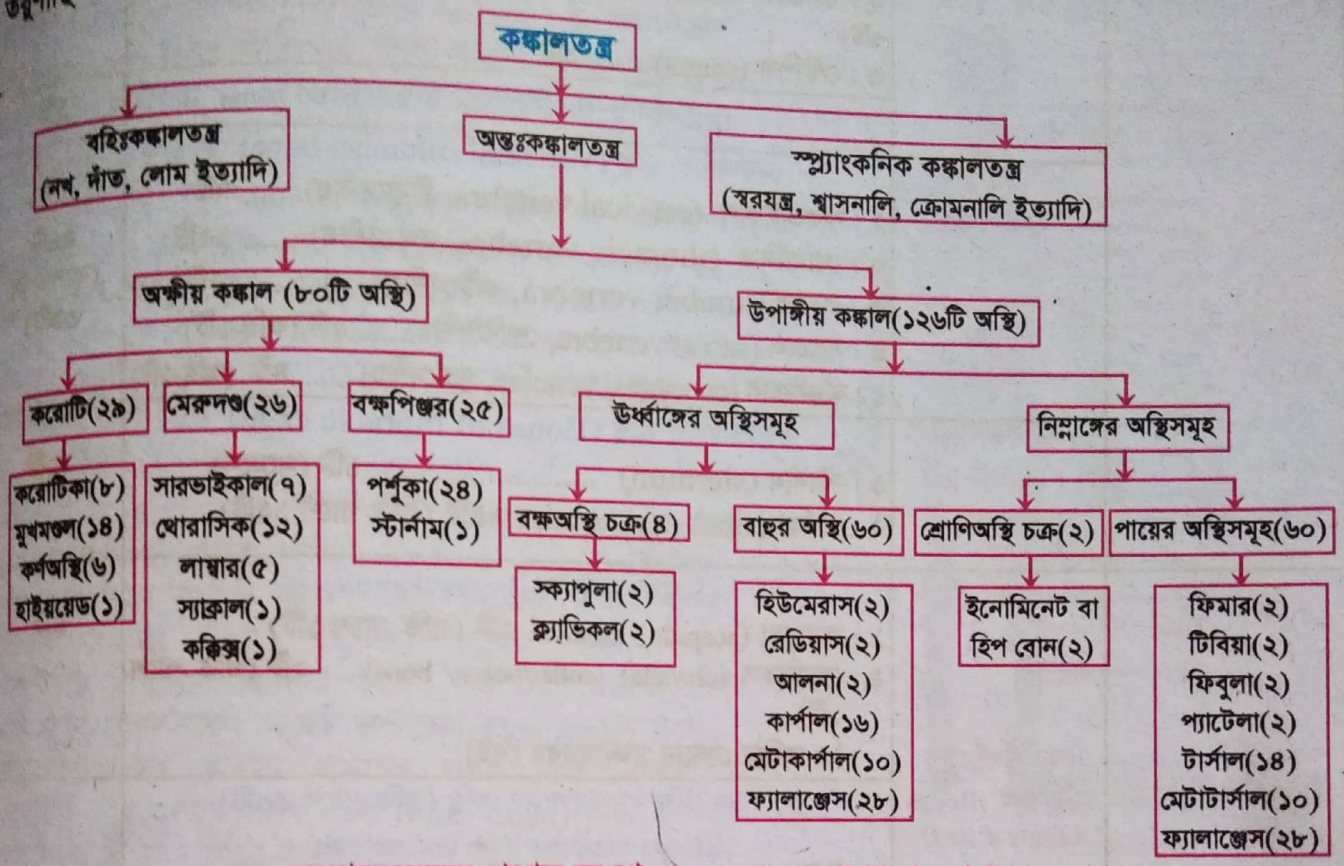

কঙ্কালতন্ত্রের প্রধান অংশ (Main Part of Skeletal System)

মানবশিশু জন্মের সময় দেহে প্রায় ৩০০টি অস্থি থাকে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কঙ্কালতন্ত্র ছোট-বড় মোট ২০৬টি অস্থি নিয়ে গঠিত। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্র প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা– **A. অক্ষীয় কঙ্কাল** (Axial skeleton) এবং **B. উপাঙ্গীয় কঙ্কাল** (Appendicular skeleton)।

মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের প্রধান অংশ এবং অস্থিবিন্যাস ও সংখ্যার ছক

প্রধান অংশ		অন্তর্ভুক্ত অংশ ও বিন্যাস সংখ্যা	অস্থি সংখ্যা
A. অক্ষীয় কঙ্কাল (Axial skeleton) (৮০)	(ক) করোটি (Skull) (২৯)	I. করোটিকা (Cranium/Calvarium/ Brain box/ Neurocranium) ১। ফ্রন্টাল (ললাট/কপালের অস্থি) (frontal) ..... ১টি ২। প্যারাইটাল (চাঁদির অস্থি) (parietal) ..... ২টি ৩। টেমপোরাল (কর্ণমূল অস্থি) (temporal) ..... ২টি ৪। অক্সিপিটাল (occipital)..... ১টি ৫। স্ফেনয়েড (sphenoid)..... ১টি ৬। এথময়েড (ethmiod) ..... ১টি	৮টি
		II. মুখমণ্ডলের অস্থি (Bones of face) ১। ম্যাক্সিলা (অচল, উর্ধ্বচোয়াল) (maxilla) ..... ২টি ২। ম্যান্ডিবল (সচল, নিম্নচোয়াল) (mandible) ..... ১টি ৩। জাইগোম্যাটিক (zygomatic) ..... ২টি ৪। ন্যাসাল (nasal) ..... ২টি ৫। ল্যাক্রিমাল (lacrimal) ..... ২টি ৬। ইনফিরিয়র ন্যাসাল কঙ্কা (inferior nasal concha)..... ২টি ৭। ভোমার (vomer) ..... ১টি ৮। প্যালেটাইন (palatine) ..... ২টি	১৪টি

Scanned with CamScanner

		III. কর্ণাস্থি (Auditory ossicles) ১। ম্যালিয়াস (malleus) ... ১টি ২। ইনকাস (incus) ..... ১টি (দুই কানে ৩টি করে মোট ৬টি) ৩। স্টেপিস (stapes) ..... ১টি	৬টি
		IV. কণ্ঠাস্থি বা হাইওয়েড অস্থি (Hyoid bone) ... ১টি	১টি
	(খ) মেরুদণ্ড (Vertebral column /Back bone) (২৬)	মেরুদণ্ডীয় অস্থি (Vertebral columner bone) ১। সারভাইকাল (cervical vertebra, গ্রীবাদেশীয়)..... ৭টি ২। থোরাসিক (thoracic vertebra, বক্ষদেশীয়) ..... ১২টি ৩। লাম্বার (lumber vertebra, কটিদেশীয়) ..... ৫টি ৪। স্যাক্রাল (sacral vertebra, শ্রোণিদেশীয়).....৫টি (অস্থি-১টি) ৫। কক্সিজিয়াল (coccygeal vertebra, পুচ্ছদেশীয়) .....৪টি (অস্থি-১টি)	২৬টি (কশেরুকা ৩৩টি)
	(গ) বক্ষপিঞ্জর (Thoracic cage) (২৫)	বক্ষপিঞ্জরীয় অস্থি (Bones of thoracic cage) ১। স্টার্নাম (sternum) ..... ১টি (সামনে) ২। পর্শুকা (ribs) ..... ২৪টি (প্রতি পাশে ১২টি)	২৫টি
B. উপাঙ্গীয় কঙ্কাল (Appendicular skeleton) (১২৬)	(ক) উর্ধ্বাঙ্গের অস্থিসমূহ (Bones of upper part) (৬৪)	I. বক্ষ-অস্থিচক্র (Pectoral girdle) ১। স্ক্যাপুলা (scapula) ..... ২টি (প্রতি পাশে ১টি) ২। ক্ল্যাভিকল (clavicle) (collar/beauty bone) ... ২টি (প্রতি পাশে ১টি) [এ অস্থির কোনো মজ্জাগহবর নেই]	৪টি
		II. বাহুর অস্থি বা অগ্রপদের অস্থি (প্রতি পাশে ৩০টি) (Bones of upper limb or forelimb) ১। হিউমেরাস (humerus) ..... ১টি ২। রেডিয়াস (radius) ..... ১টি ৩। আলনা (ulna) ..... ১টি ৪। কার্পাল (carpal) ..... ৮টি ৫। মেটাকার্পাল (metacarpal) ..... ৫টি ৬। ফ্যালাঞ্জেস (phalanges) ..... ১৪টি	৬০টি
	(খ) নিম্নাঙ্গের অস্থিসমূহ (Bones of lower part) (৬২)	I. শ্রোণি-অস্থিচক্র (Pelvic girdle) ১। ইলিয়াম (ilium) ..... ১টি ২। ইশ্চিয়াম (ischium) ..... ১টি ৩। পিউবিস (pubis) ..... ১টি [প্রতি পাশের অস্থিগুলো মিলিত হয়ে একটি করে নিতম্বাস্থি (Hip bone/Innominate bone/Os coxa) গঠন করে। সে হিসেবে দুটি নিতম্বাস্থি থাকে]	২টি
		II. পা-এর অস্থি বা পশ্চাৎপদের অস্থি (প্রতি পাশে ৩০টি) (Bones of hind limbs) ১। ফিমার (femur) ..... ১টি ২। টিবিয়া (tibia) ..... ১টি ৩। ফিবুলা (fibula) ..... ১টি ৪। প্যাটেলা (patella) ..... ১টি ৫। টার্সাল (tarsal) ..... ৭টি ৬। মেটাটার্সাল (metatarsal) ..... ৫টি ৭। ফ্যালাঞ্জেস (phalanges) ..... ১৪টি	৬০টি
		মোট অস্থি সংখ্যা	২০৬

2020/8/4 17:46

Scanned with CamScanner

A. অক্ষীয় কঙ্কাল (Axial Skeleton)

দেহের মূল অক্ষ বরাবর অবস্থিত যে অস্থিগুলো কোমল, নমনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোকে ঘিরে রাখে এবং দেহকাণ্ডের অংশগুলোকে যুক্ত করে কাঠামো দান করে সে অস্থিগুলোকে অক্ষীয় কঙ্কাল বলা হয়। **করোটি** (skull), **মেরুদণ্ড** (vertebral column) ও **বক্ষপিঞ্জর** (thoracic cage)-এর অস্থিসমূহ নিয়ে অক্ষীয় কঙ্কাল গঠিত। অক্ষীয় কঙ্কাল মোট ৮০টি অস্থি নিয়ে গঠিত। নিম্নে অক্ষীয় কঙ্কাল বর্ণনা করা হলো–



চিত্র ৭.১ : মানুষের কঙ্কালতন্ত্র

(ক) করোটি (Skull) : মানুষের মস্তিষ্ককে করোটির **করোটিকা** বা **ক্রেনিয়াম** বা **ক্যালভেরিয়াম** (cranium or calvarium) আবৃত করে সুরক্ষা করে। এ ছাড়াও চোয়াল (jaw), নাক, কান, চোখ ইত্যাদি করোটিতে অবস্থান করে। করোটি ২৯টি অস্থি নিয়ে গঠিত। করোটি **করোটিকা** ও **মুখমণ্ডলের অস্থি** নিয়ে গঠিত।

(I) করোটিকা (Cranium or calvarium)

করোটিকার অস্থিসমূহকে **খুলির অস্থি** (cranial bones) বলা হয়। অস্থিগুলো **সুচার সন্ধির** (suture joint) সাহায্যে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই সন্ধিগুলো মাথার খুলির দাগকাটা জোড়া নামে পরিচিত। জন্মের সময় শিশুর করোটিকায় অস্থিগুলো আলাদা থাকে। যার ফলে মস্তকে ৬টি ফাঁকা স্থান দেখা যায়। এদের **ফন্টানেল** (fontanels) বলে। ফন্টানেল থাকার কারণে প্রসবের সময় মাথার আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে মায়ের প্রসব নালি (birth canal) দিয়ে শিশুর প্রসব সহজতর হয়। শিশুর করোটির সকল অস্থি দুই বছর বয়সের মধ্যে **সুচার সন্ধির** সাহায্যে পরস্পরের সাথে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। করোটিকায় ৬ ধরনের মোট ৮টি অস্থি থাকে। যথা–

১। ফ্রন্টাল অস্থি (Frontal bone) : এটি মানুষের মাথার সামনে অবস্থিত। এ অস্থিটি চোখের উপরের অংশ এবং এর মাঝের খাঁজ কাটা অংশটি আংশিকভাবে নাক গঠন করে থাকে। একে **ললাট বা কপালের** অস্থিও বলা হয়।

২। প্যারাইটাল অস্থি (Parietal bone) : এটি চতুষ্কোণাকৃতির। দু'পাশ থেকে দুটি প্যারাইটাল অস্থি এসে মাথার ছাদের মধ্যরেখা বরাবর মিলিত হয়। একে **চাঁদির** অস্থি বলা হয়।

৩। টেম্পোরাল অস্থি (Temporal bone) : দুটি টেম্পোরাল অস্থি করোটিকার দু'পার্শ্বে অবস্থান করে। প্রতিটি অস্থি ৪টি অংশে বিভক্ত, যথা– **স্কোয়ামা, পেট্রোম্যাস্টয়েড, টিম্পানিক ও স্টাইলয়েড প্রসেস**। এ অস্থিতে শ্রবণাঙ্গ, শ্রুতিনালি, ক্যারোটিড নালি ও মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুর নালি অবস্থান করে।

৪। অক্সিপিটাল অস্থি (Occipital bone) : এটি করোটিকার পেছনে অবস্থিত। এর মাঝে অবস্থিত **মহাবিবর** (foramen of magnum) ছিদ্রপথে মস্তিষ্ক থেকে **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) বের হয়ে আসে। অ্যাটলাসের সাথে সংযুক্তির জন্য এতে দুটি **কন্ডাইলার ফ্যাসেট** থাকে।

৫। স্ফেনয়েড অস্থি (Sphenoid bone) : এটি করোটিকার নিচে অবস্থিত। দেখতে কিছুটা প্রজাপতি সদৃশ; একটি **দেহকাণ্ড** এবং **বড় ডানা, ছোট ডানা** ও **টেরিগয়েড প্রসেস** নামক তিন জোড়া উদ্‌গত অংশ নিয়ে গঠিত, যা প্যারাইটাল ও ফ্রন্টাল অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। এছাড়া এতে একটি গর্ত থাকে যার উপরিভাগে **পিটুইটারি গ্রন্থি** (pituitary gland) অবস্থান করে।

৬। এথময়েড অস্থি (Ethmoid bone) : এটি স্পঞ্জের মতো এবং অক্ষিকোটরের (orbit) কিছু অংশজুড়ে অবস্থান করে। এটি অক্ষিকোটরের প্রাচীর, **আন্তঃনাসিকা পর্দা** (septum) এবং নাসিকা গহ্বরের ছাদ ও পার্শ্বীয় প্রাচীর গঠন করে।

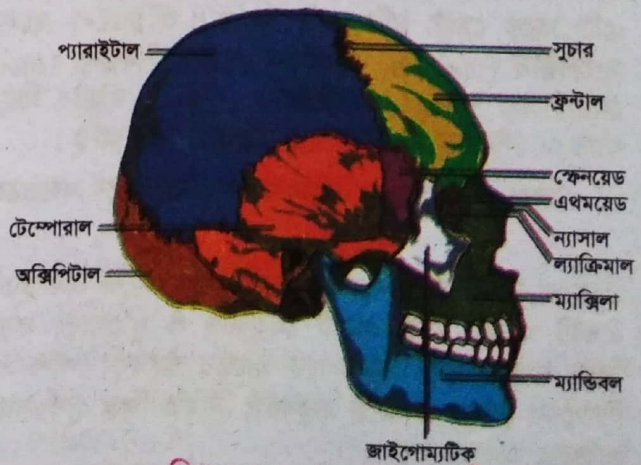

চিত্র ৭.২ : মানুষের করোটি

2020/8/4 17:46
Scanned with CamScanner

করোটিকার কাজ : করোটিকার কাজ হলো মস্তিষ্ককে আবৃত ও সুরক্ষিত করে রাখা। অক্ষিকোটর অক্ষিগোলককে রক্ষা করে।

(II) **মুখমণ্ডলের অস্থি** (Bones of face) : মুখমণ্ডলে ৮ ধরনের মোট ১৪টি অস্থি আছে। যথা–

১। **ম্যাক্সিলা** (Maxilla) বা **ঊর্ধ্বচোয়াল** (Upper jaw) : দুটি ম্যাক্সিলার দ্বারা উপরের চোয়াল গঠিত। প্রতিটি ম্যাক্সিলা একটি **দেহকাণ্ড** ও **জাইগোম্যাটিক, ফ্রন্টাল, প্যালেটাইন** ও **অ্যালভিওলার** নামক চারটি প্রবর্ধন (processes) নিয়ে গঠিত।

২। **ম্যান্ডিবল** (Mandible) বা **নিম্নচোয়াল** (Lower Jaw) : ইহা নিম্নচোয়াল গঠন করে। করোটির সর্ববৃহৎ, মজবুত ও "U/V" আকৃতির অস্থি বিশেষ। এতে দুটি অংশ থাকে– **দেহ** (body) ও র‍্যামাস (ramus)। দেহ অংশটি বেস ও অ্যালভিওলার প্রসেস নিয়ে গঠিত। অ্যালভিওলার প্রসেসে মানুষের দাঁতগুলো অবস্থান করে। প্রতিটি হাতলের ন্যায় র‍্যামাসে **করোনয়েড** (coronoid) ও **কন্ডাইলয়েড** (condyloid) নামক দুটি প্রবর্ধন এবং ম্যান্ডিবুলার ছিদ্র নামক একটি ছিদ্র থাকে। র‍্যামাসের বাইরের দিকে প্যারোটিড গ্রন্থি এবং পেশি থাকে। ম্যান্ডিবলের সামনের মাঝের অংশকে **সিমফাইসিস** (symphysis) বলে। ম্যান্ডিবল করোটির একমাত্র নড়নক্ষম অস্থি।

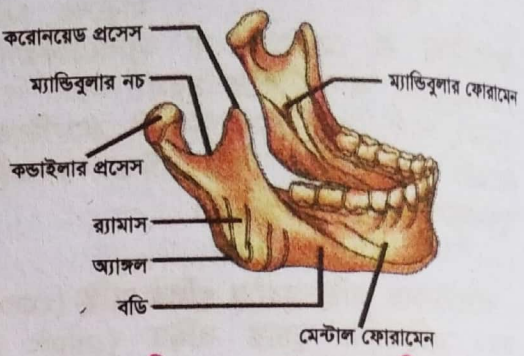

চিত্র ৭.৩ : মানুষের ম্যান্ডিবল

৩। **জাইগোম্যাটিক অস্থি** (Zygomatic bone) : এটি কিছুটা চতুষ্কোণাকৃতির অস্থি, যা মুখমণ্ডলের পার্শ্বদেশে উঁচু অংশ গঠন করে, জাইগোম্যাটিক আর্চ গঠনে অংশ নেয়।

৪। **ন্যাসাল অস্থি** (Nasal bone) : এটি আয়তাকার অস্থি যা নাকের পিঠ গঠন করে।

৫। **ল্যাক্রিমাল অস্থি** (Lacrimal bone) : এটা ল্যাক্রিমাল খাদ ও ঝুঁটি সংবলিত করোটির সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর প্রকৃতির অস্থি। প্রতিটি ল্যাক্রিমাল খাদে ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি (অশ্রুগ্রন্থি) অবস্থান করে।

৬। **ইনফিরিয়র ন্যাসাল কঙ্কা** (Inferior nasal concha) : এটি পাতলা ও বাঁকা অস্থি। যা নাসিকা গহ্বরের দু'পাশে অবস্থান করে এবং নাসিকা গহ্বরের প্রাচীর গঠন করে।

৭। **ভোমার** (Vomer) : এটি পাতলা, চ্যাপ্টা, অনিয়ত চতুষ্কোণা অস্থি, যা এথময়েড অস্থির সাথে যুক্ত থাকে এবং নাকের পার্শ্বের শক্ত অংশ গঠন করে।

৮। **প্যালাটাইন অস্থি** (Palatine bone) : ম্যাক্সিলা ও স্ফেনয়েড অস্থিসমূহের মাঝে এবং নাসিকা গহ্বরের পশ্চাৎ অংশে অবস্থিত। এটি "L" আকৃতির এবং তালু (palate), নাকের গোড়ার দিক ও অক্ষিকোটরের (orbit) মেঝে গঠন করে।

মুখমণ্ডলের অস্থির কাজ : মুখমণ্ডলের কাঠামো গঠন; মুখগহ্বর, চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও দাঁতের অবস্থানের জন্য গহ্বর ও তল সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন করোটিকা স্নায়ুকে আবৃত করে রাখা ও রক্তবাহিকাকে ধারণ ও রক্ষা করা।

(III) **কর্ণাস্থি** (Auditory ossicles) : মানুষের প্রত্যেক মধ্যকর্ণে ৩টি করে মোট ৬টি অস্থি থাকে। অস্থিগুলো হলো যথাক্রমে– **ম্যালিয়াস** (malleus, হাতুড়ির মতো), **ইনকাস** (incus, কামারের নেহাই-এর ন্যায়) ও **স্টেপিস** (stapes, ঘোড়ার জিনের পাদানির ন্যায়)। **স্টেপিস** মানবদেহের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অস্থি।

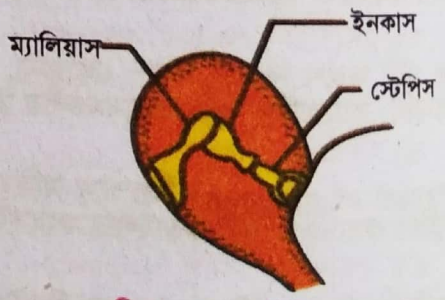

চিত্র ৭.৪ : কর্ণাস্থিসমূহ

কাজ : কর্ণাস্থিসমূহ বহিঃকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে শব্দতরঙ্গ বহন করে।

(IV) **কণ্ঠাস্থি বা হাইওয়েড অস্থি** (Hyoid bone) : এটি জিহ্বার গোড়ার দিকে ম্যান্ডিবল ও ল্যারিংক্সের মাঝে অবস্থিত U-আকৃতির একটি অস্থি। এটি একটি দেহকাণ্ড ও দু'জোড়া বড়-ছোট কর্ণুয়া নিয়ে গঠিত এবং এর সাথে ঘাড়ের অনেক পেশি সংযুক্ত থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে এ অস্থি তরুণাস্থি নির্মিত কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষে এটি অস্থিতে পরিণত হয়।

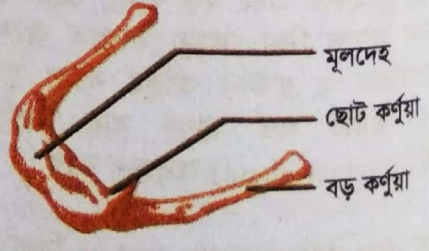

চিত্র ৭.৫ : হাইওয়েড অস্থি

কাজ : জিহ্বার অবস্থানকে দৃঢ় করা এবং কথা বলা ও খাদ্য গলাধঃকরণে ব্যবহৃত পেশি সংযুক্তির স্থান প্রদান করা।

2020/8/4 17:46
Scanned with CamScanner

(খ) মেরুদণ্ড (Vertebral column)

দেহের পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখা বরাবর সুষুম্নাকাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে অবস্থিত একসারি কশেরুকা নিয়ে গঠিত এবং দেহের অক্ষকে অবলম্বনদানকারী অস্থিময় ও নমনীয় গঠনকে মেরুদণ্ড বলে। ৩৩টি কশেরুকা বা ২৬টি অস্থি নিয়ে মেরুদণ্ড গঠিত। একে **শিরদাঁড়া, স্পাইন, স্পাইনাল কলাম** প্রভৃতি নামেও নামকরণ করা হয়। মেরুদণ্ড কোনো একক অস্থি নয়। পর পর সজ্জিত অনেকগুলো ছোট ছোট অস্থি নিয়ে গঠিত। প্রতিটি অস্থিকে **কশেরুকা** (একবচন-vertebra; বহুবচন-vertebrae) বলে। পরপর অবস্থিত দুটি কশেরুকার মাঝখানে তরুণাস্থি নির্মিত **আন্তঃকশেরুকীয় চাকতি** (intervertebral disc) বা **সিমফাইসিস** (symphysis) থাকে এবং **আন্তঃকশেরুকা ছিদ্র** (intervertebral foramen) নামক একটি ছিদ্র থাকে যার মধ্য দিয়ে সুষুম্না স্নায়ু (spinal nerves) ও রক্তনালি বের হয়ে আসে। **পুরুষে মেরুদণ্ডের দৈর্ঘ্য গড়ে ৭০ সেন্টিমিটার এবং স্ত্রীতে ৬০ সেন্টিমিটার।**

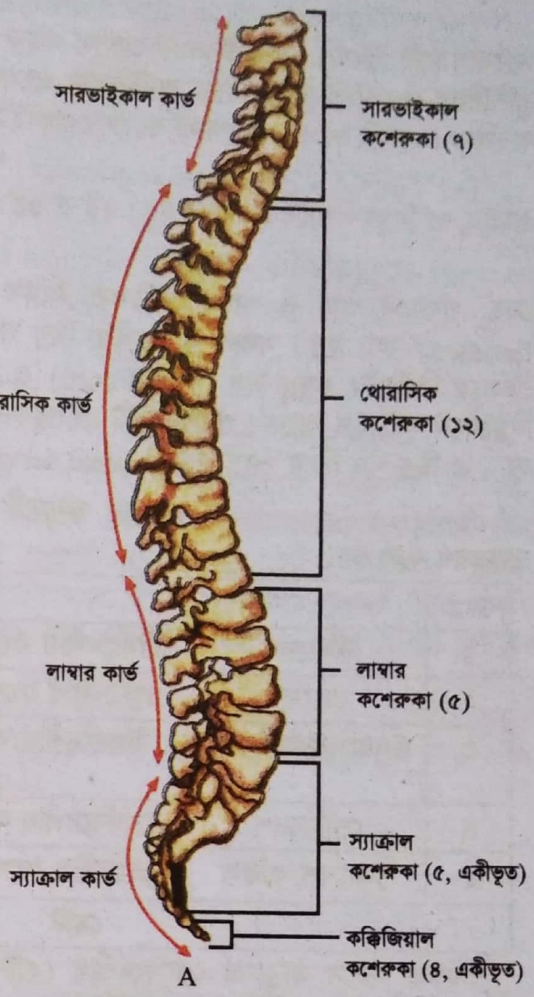

চিত্র ৭.৬ : মানুষের মেরুদণ্ডের কশেরুকাসমূহ

মেরুদণ্ডের কাজ :

১। মেরুদণ্ড দেহের কাঠামো গঠন, ভার বহন, সোজা হয়ে দাঁড়াতে এবং চলাফেরায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২। এটি **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) এবং **সুষুম্না স্নায়ুকে** (spinal nerves) সুরক্ষিত রাখে।

৩। এটি দেহের অক্ষীয় পেশি ও পর্শুকা সংযোগের ক্ষেত্র তৈরি করে।

৪। সারভাইকাল কশেরুকা গ্রীবা সঞ্চালনে সাহায্য করে।

৫। মাথাকে অবলম্বন দেয় এবং পিভট (pivot) এর মতো কাজ করে।

একটি আদর্শ কশেরুকার গঠন (The Structure of Typical Vertebra)

কশেরুকা অনিয়ত আকৃতির অস্থি, ফলে দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের কশেরুকার গঠনে কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবে একই অঞ্চলের কশেরুকাসমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ। একটি আদর্শ কশেরুকার (মধ্য-বক্ষদেশীয় কশেরুকার) গঠন নিম্নরূপ :

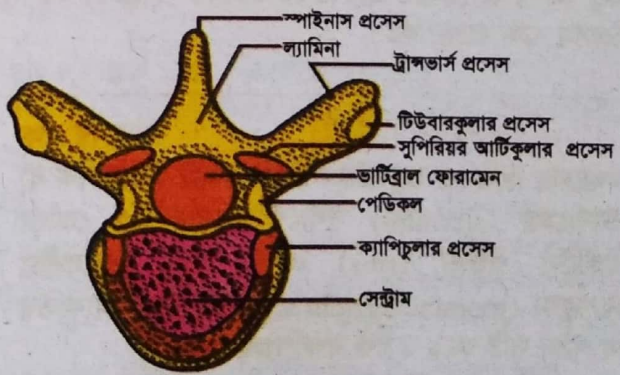

চিত্র ৭.৭ : মানুষের আদর্শ কশেরুকা

১। দেহ বা সেন্ট্রাম বা ভার্টিব্রাল বডি (Body or centrum or vertebral body) : এটি কশেরুকার বৃহত্তম ও সম্মুখের স্থূল অংশ, যা আন্তঃকশেরুকীয় চাকতির (intervertebral disc) সাহায্যে অপর কশেরুকার সাথে আটকে থাকে। এটি শক্ত, পুরু ও স্পঞ্জি অস্থিতে গঠিত।

২। আর্চ (Arch) : এটি কশেরুকার দেহের পেছনের দিকের রিং আকৃতির অংশ। আর্চ আবার কয়েকটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। যথা–

(i) **পেডিকল** (Pedicle) : ট্রান্সভার্স প্রসেস ও দেহের মধ্যবর্তী অংশকে পেডিকল বলে। এ অংশটি কশেরুকার ল্যামিনা ও দেহকে সংযুক্ত করে।

(ii) **ট্রান্সভার্স প্রসেস** (Transverse process) : কশেরুকার উভয় পাশে ল্যামিনা ও পেডিকলের সংযোগস্থল থেকে বর্ধিত পার্শ্বীয় প্রবর্ধন।

(iii) **ল্যামিনা** (Lamina) : কশেরুকার উভয় পাশে ট্রান্সভার্স প্রসেস ও স্পাইনাস প্রসেস বা নিউরাল প্রসেস বা নিউরাল স্পাইনের মাঝখানে অবস্থিত চাপা, চওড়া অংশ।

2020/8/4 17:46

Scanned with CamScanner

(iv) **আর্টিকুলার প্রসেস বা জাইগাপোফাইসিস** (Articular process or zygapophysis) : একটি কশেরুকাতে ৪টি সংযোগকারী প্রবর্ধন বা আর্টিকুলার প্রসেস থাকে। কশেরুকার উভয় পাশে ল্যামিনা ও পেডিকলের সংযোগস্থলে একটি **সুপিরিয়র** ও একটি **ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস** (বা ১টি **প্রি-জাইগাপোফাইসিস** ও ১টি **পোস্ট-জাইগাপোফাইসিস**) অবস্থিত। একটি কশেরুকার পোস্ট জাইগাপোফাইসিস অন্য কশেরুকার প্রি-জাইগাপোফাইসিসের সাথে যুক্ত থাকে।

(v) **স্পাইনাস প্রসেস** (Spinous process) : কশেরুকার দুই ল্যামিনির মিলনস্থল থেকে বর্ধিত একটি পশ্চাৎ মধ্যরেখীয় প্রবর্ধন, যা নিম্নমুখীভাবে প্রসারিত হয়। **২য়** ও **৬ষ্ঠ** গ্রীবাদেশীয় কশেরুকার স্পাইনাস প্রসেসের প্রান্ত **দ্বিখণ্ডিত**।

(vi) **কশেরুকার ছিদ্র ও নালি** (Vertebral foramen and vertebral canal) : কশেরুকার যে বড় ছিদ্রটির সম্মুখে দেহ, পশ্চাতে আর্চ ও পাশে পেডিকল নির্মিত থাকে তাকে **নিউরাল** বা **কশেরুকীয় ছিদ্র** (neural or vertebral foramen) বলা হয়। সকল কশেরুকীয় ছিদ্র সম্মিলিতভাবে **কশেরুকীয় নালি** (vertebral canal) গঠন করে। এর ভেতরে ঝিল্লিসহ সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) ও রক্তনালিকা (blood vessels) সুরক্ষিত থাকে। পেডিকলের উর্ধ্ব ও নিম্নদেশে দুটি নচ থাকে। পরপর দুটি কশেরুকার নচ মিলে **আন্তঃকশেরুকীয় ছিদ্র** (intervertebral foramen) গঠিত হয়। এ ছিদ্র পথ দিয়ে সুষুম্না স্নায়ু (spinal nerve) ও রক্তবাহিকা অতিক্রান্ত হয়।

কশেরুকার প্রকারভেদ : অবস্থান অনুযায়ী কশেরুকাগুলোকে ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা যায় এবং বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়।

ক্রম	অঞ্চলের নাম	কশেরুকার নাম	কশেরুকার সংখ্যা	অস্থি সংখ্যা
১	গ্রীবাদেশ	গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা (Cervical vertebrae)	০৭	০৭
২	বক্ষদেশ	বক্ষদেশীয় কশেরুকা (Thoracic vertebrae)	১২	১২
৩	উদরদেশ/কটিদেশ	উদরদেশীয়/কটিদেশীয়/নিতম্বীয় কশেরুকা (Lumber vertebrae)	০৫	০৫
৪	শ্রোণিদেশ	শ্রোণিদেশীয় কশেরুকা (Sacral vertebrae)	০৫	০১
৫	পুচ্ছদেশ/কক্সিস	পুচ্ছদেশীয় কশেরুকা (Coccygeal vertebrae)	৩–৫ (গড়ে ৪)	০১
মোট			**৩৩টি**	**২৬টি**

পরিণত বয়সে মানুষের শ্রোণিদেশীয় (৫টি) কশেরুকাগুলো মিলিত হয়ে **স্যাক্রাম** (sacrum) এবং পুচ্ছদেশীয় (৪টি) কশেরুকাগুলো মিলিত হয়ে **কক্সিস** (coccyx) গঠন করে। ফলে, মানবদেহের মেরুদণ্ডে কশেরুকার সংখ্যা ৩৩টি এবং অস্থির সংখ্যা ২৬টি হয়। **ব্যবহারিক অংশে বিভিন্ন ধরনের কশেরুকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।**

❑ **কাজ :** (i) মানব কঙ্কালতন্ত্রের বিভিন্ন কশেরুকার নাম, অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য ছক আকারে উপস্থাপন কর। (ii) মেরুদণ্ডের কিছু কশেরুকা দেখতে প্রায় একই রকমের– বিশ্লেষণ কর। (iii) আমাদের মেরুদণ্ডের আংটি সদৃশ (অ্যাটলাস) কশেরুকাটির চিত্রসহ গঠন ব্যাখ্যা কর।

(প্রশ্নগুলোর উত্তরের ক্ষেত্রে অধ্যায় ৭ এর ব্যবহারিক অংশ তোমাকে সহযোগিতা করবে)

(গ) বক্ষপিঞ্জর (Thoracic cage) : মানুষের বক্ষ অঞ্চলের অস্থি ও তরুণাস্থি নির্মিত একটি **উরঃফলক বা স্টার্নামের** (sternum) দুপার্শ্বে সংযুক্ত ১২ জোড়া বাঁকানো **পর্শুকা** (ribs) এবং ১২টি **বক্ষদেশীয় কশেরুকা** (thoracic vertebrae) মিলে খাঁচা আকৃতির যে গঠন সৃষ্টি করে তাকে বক্ষপিঞ্জর বলে।

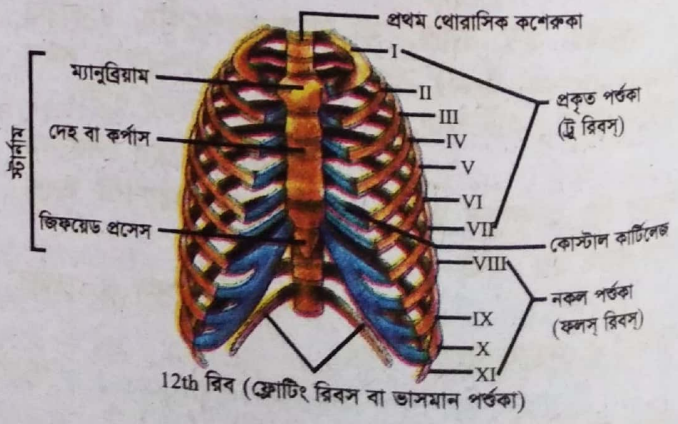

চিত্র ৭.৮ : মানুষের বক্ষপিঞ্জর

স্টার্নাম (Sternum) : বক্ষের অঙ্কীয় দেশে মধ্যরেখা বরাবর চাপা অস্থিটিই স্টার্নাম। এর ৩টি অংশ– উপরের অংশটি ত্রিকোণাকৃতির **ম্যানুব্রিয়াম** (manubrium), মাঝের লম্বাকৃতির **দেহ বা কর্পাস** (body or corpus) এবং প্রান্তের **ক্ষুদ্র** (xiphoid process)। স্টার্নামের উর্ধ্বাংশের কিনারার দিকে একটি **সুপ্রা-স্টার্নাল নচ বা জুগুলার নচ**, পার্শ্ব কিনারায় দুটি **ক্লাভিকুলার নচ** এবং ৭ জোড়া পর্শুকার খাঁজ থাকে। পুরুষের ক্ষেত্রে এর গড় দৈর্ঘ্য ১৭ সে.মি. এবং কিছুটা কম।

2020/8/4 17:46
Scanned with CamScanner

পর্শুকা (Ribs) : পর্শুকাগুলো লম্বা, সরু, চ্যাপ্টা ও বাঁকানো অস্থি। মানবদেহে ১২ জোড়া পর্শুকা থাকে। ৩য় থেকে ৯ম পর্শুকাকে **আদর্শ পর্শুকা** (typical rib) বলা হয়। একটি আদর্শ পর্শুকা **মস্তক** (head), **গ্রীবা** (neck), **টিউবার্কল** (tubercle), **দেহ বা শ্যাফট** (body or shaft) এবং **কোস্টাল কার্টিলেজ** (costal cartilage) নিয়ে গঠিত। পর্শুকা মস্তক দিয়ে গ্রীবাদেশীয় কশেরুকার (Cervical vertebra) সেন্ট্রামের সাথে, টিউবার্কল দিয়ে একই কশেরুকার ট্রান্সভার্স প্রসেসের সাথে এবং কোস্টাল কার্টিলেজ দ্বারা স্টার্নামের সাথে যুক্ত থাকে। সকল পর্শুকাই মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। দুই পর্শুকার অন্তর্বর্তী স্থানকে **ইন্টারকোস্টাল স্পেস** (intercostal space) বলে। ইন্টারকোস্টাল স্পেসে তির্যকভাবে **বহিঃ** ও **অন্তঃ ইন্টারকোস্টাল পেশি** অবস্থান করে। পর্শুকার প্রান্তভাগ তরুণাস্থিময়।

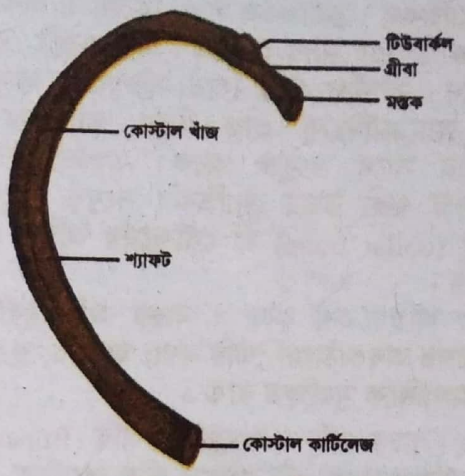

চিত্র ৭.৯ : একটি পর্শুকা

প্রথম ৭ জোড়া পর্শুকা পেছনের দিকে প্রথম ৭টি থোরাসিক কশেরুকার সাথে এবং সামনের দিকে কোস্টাল কার্টিলেজের মাধ্যমে স্টার্নামের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে। এদের **প্রকৃত পর্শুকা** (true ribs) বলে। বাকি ৫ জোড়া (৮ম-১২তম) পর্শুকাকে **নকল পর্শুকা** (false ribs) বলে, কারণ এগুলো সামনে স্টানার্মের সাথে যুক্ত নয়। ৮ম, ৯ম ও ১০ম পর্শুকা উপরস্থিত পর্শুকার কোস্টাল কার্টিলেজের সাথে মিলিত হয়ে **কোস্টাল আর্চ** (costal arch) গঠনের মাধ্যমে স্টার্নামের সাথে যুক্ত হয়। এদের **ভার্টিব্রো-কন্ড্রাল পর্শুকা** (vertebro-chondral ribs) বলে। ১১তম ও ১২তম পর্শুকা মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে এবং এদের সম্মুখ প্রান্ত মাংসপেশিতে উন্মুক্ত থাকে, তাই এদের **ভাসমান পর্শুকা** (floating ribs) বলা হয়। প্রথম ৭ জোড়া (১-৭) পর্শুকা ক্রমশ আকারে বড় কিন্তু বাকি ৫ জোড়া (৮-১২) পর্শুকা ক্রমশ ছোট হয়।

বক্ষপিঞ্জরের কাজ :

১। শ্বসন ও রক্তসংবহনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে সুরক্ষিত রাখে।
২। সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে শ্বসন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

B. উপাঙ্গীয় কঙ্কাল (Appendicular Skeleton)

উপাঙ্গীয় কঙ্কাল দুটি অংশের অস্থিসমূহ নিয়ে গঠিত। যথা– (ক) **উর্ধ্বাঙ্গের অস্থিসমূহ** (Bones of upper part) : বক্ষ-অস্থিচক্র (Pectoral girdle) ও তার সাথে যুক্ত বাহুর অস্থিসমূহ। এই অংশে দেহের উভয় পাশে ৩২টি করে মোট ৬৪টি অস্থি থাকে। (খ) **নিম্নাঙ্গের অস্থিসমূহ** (Bones of lower part) : শ্রোণি-অস্থিচক্র (pelvic girdle) ও তার সাথে যুক্ত পা-এর অস্থিসমূহ। এই অংশে দেহের উভয় পাশে ৩১টি করে মোট ৬২টি অস্থি থাকে।

(ক) উর্ধ্বাঙ্গের অস্থিসমূহ (Bones of Upper part)

১। বক্ষ-অস্থিচক্র (Pectoral girdle)

মানুষের বক্ষ অঞ্চলে এক জোড়া **স্ক্যাপুলা** (scapula) ও এক জোড়া **ক্ল্যাভিকল** (clavicle) নিয়ে **বক্ষ-অস্থিচক্র** গঠিত হয়। ইহা লিগামেন্ট ও পেশি দ্বারা অক্ষীয় কঙ্কালের সাথে যুক্ত থাকে।

স্ক্যাপুলা : স্ক্যাপুলা দেখতে প্রশস্ত, চ্যাপ্টা ও ত্রিকোণাকার। এর সম্মুখ দিকে **কোরাকয়েড প্রসেস** (coracoid process) ও **অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস** (acromial process) নামে দুটি অস্থিময় প্রবর্ধন থাকে। সরু প্রান্তে **গ্লিনয়েড গহ্বর** (glenoid cavity) নামে একটি সংযোগী অবতল থাকে যাতে হিউমেরাসের (humerus) মস্তক সংযুক্ত থাকে। এর সম্মুখ তল পর্শুকার দিকে মুখ করে থাকে। এতে **সাবস্ক্যাপুলার ফসা** (subscapular fossa) নামে একটি অবতল অংশ বিদ্যমান। এর পশ্চাৎতলে একটি **স্ক্যাপুলার কাঁটা** (spine of scapula) থাকে, যার উপর ও নিচ অংশ যথাক্রমে **সুপ্রাস্পাইনাস ফসা** (supraspinous fossa) এবং **ইনফ্রাস্পাইনাস ফসা** (infraspinous fossa) নামে পরিচিত।

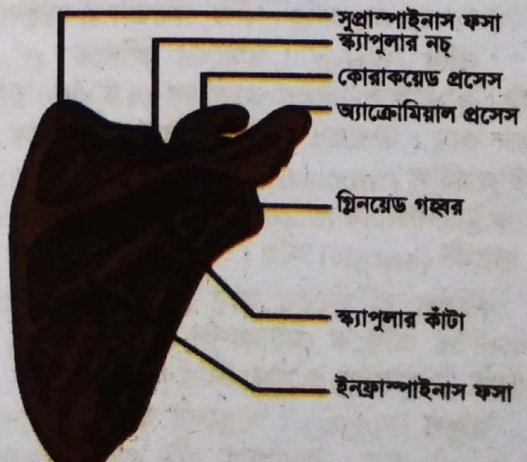

চিত্র ৭.১০ : মানবের স্ক্যাপুলা (পৃষ্ঠদৃশ্য)

2020/8/4 17:47
Scanned with CamScanner

ক্ল্যাভিকল : ক্ল্যাভিকল লম্বা, নিরেট ও বাঁকানো অস্থি অর্থাৎ ইটালিক 'f' এর ন্যায় দেখতে। এর একটি দেহ ও দুটি প্রান্ত বিদ্যমান। **স্টার্নাল প্রান্ত** দিয়ে স্টার্নামের ম্যানুব্রিয়ামের সাথে এবং **অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত** দিয়ে স্ক্যাপুলার অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেসের সাথে সংযুক্ত থাকে। এছাড়া **ইন্টার-ক্ল্যাভিকুলার** লিগামেন্ট দ্বারা উভয় ক্ল্যাভিকল সংযুক্ত থাকে। এ অস্থিকে **কণ্ঠাস্থি** (collar bone) বা **সৌন্দর্যের অস্থি**ও (beauty bone) বলা হয়।

বক্ষ-অস্থিচক্রের কাজ : বাহুর অস্থিসমূহকে ধারণ করা; ঊর্ধ্বাংশের অবকাঠামো তৈরি করা; হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসসহ অন্যান্য নরম অঙ্গাদিকে সুরক্ষিত রাখা।

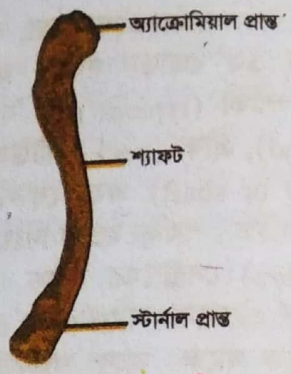

চিত্র ৭.১১ : ক্ল্যাভিকল

২। বাহুর অস্থি বা অগ্রপদের অস্থি (Bones of upper limb or fore limb)

বাহুর অস্থিসমূহকে ৩টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়, যথা– ঊর্ধ্ববাহু, সম্মুখ বাহু এবং হাতের অস্থিসমূহ। বাহুর অস্থিসংখ্যা মোট ৬০টি (প্রতিপার্শ্বে ৩০টি করে)।

(ক) ঊর্ধ্ববাহুর অস্থি (হিউমেরাস) : ঊর্ধ্ববাহু **হিউমেরাস** (humerus) নামে একটি বৃহৎ, লম্বা, দণ্ডাকার অস্থি দিয়ে গঠিত। এর ঊর্ধ্ব প্রান্তের মসৃণ ও গোলাকার মস্তকটি স্ক্যাপুলার **গ্লেনয়েড গহ্বরের** সাথে সংযুক্ত থাকে। মস্তকের নিচে থাকে **অ্যানাটোমিক্যাল গ্রীবা** (anatomical neck) এবং এর পাশে ছোট ও বড় **টিউবার্কল** (tubercle) নামক দুটি উঁচু অংশ থাকে। দেহ বা শ্যাফট (shaft) ও টিউবার্কলের মাঝের সরু অংশকে **সার্জিক্যাল গ্রীবা** (surgical neck) বলে। কারণ দুর্ঘটনায় এ অংশেই সাধারণত ফাটল ধরে। দেহের কিছুটা উপরে পেশি সংযুক্তির জন্য **ডেল্টয়েড রিজ** (deltoid ridge) নামক উঁচু অঞ্চল থাকে। হিউমেরাসের নিম্নপ্রান্তে **ক্যাপিচুলাম** (capitulum) ও **ট্রকলিয়া** (trochlea) থাকে। এছাড়া ২টি **এপিকন্ডাইল** (epicondyl), ১টি **অলিক্রেনন ফসা** (olicranon fossa), ১টি **করোনয়েড ফসা** (coronoid fossa) এবং ১টি **রেডিয়াল ফসা** (radial fossa) থাকে।

(খ) সম্মুখ বাহুর অস্থি : সম্মুখ বাহু দুটি লম্বা ও গঠিত। যাদের উপরের প্রান্ত **হিউমেরাসের** সাথে এবং নিচের প্রান্ত **কার্পাল** (carpal) অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে। যেমন– রেডিয়াস ও আলনা।

আলনা (Ulna) : আলনা অন্তর্দিকের (দেহের দিকে) অস্থিটি। এর উপরের প্রান্ত মোটা ও নিচের প্রান্ত সরু। উপরের প্রান্তে **অলিক্রেনন প্রসেস, করোনয়েড প্রসেস, ট্রকলিয়ার নচ, টিউবারোসিটি** (অর্বুদ) বিদ্যমান। নিচের প্রান্তে **মাথা** ও **স্টাইলয়েড প্রসেস** (styloid process) বিদ্যমান।

রেডিয়াস (Radius) : রেডিয়াস অস্থিটি দেহের বাহিরের দিকে থাকে। এর উপরের দিক সরু এবং নিচের দিকে ক্রমশ মোটা। এর অগ্রপ্রান্তে মাথা, **গ্রীবা** ও **টিউবারোসিটি** এবং নিম্নপ্রান্তে **স্টাইলয়েড প্রসেস** ও **টিউবার্কল** থাকে। উপরের প্রান্তে রেডিয়াস ও আলনা **অ্যানুলার** পেশিতে এবং বাকি অংশ **অ্যান্টিব্রাকিয়াল** আবরণ দিয়ে যুক্ত থাকে। উভয়েরই **স্টাইলয়েড প্রসেস** থাকে।

(গ) হাতের অস্থি : কব্জি, করতল ও আঙুল নিয়ে হাত গঠিত।

কব্জি (Wrist) : মানুষের কব্জিতে (Carpal Region) হাড়ের সংখ্যা ৮টি। দু'সারিতে বিভিন্ন আকৃতির ছোট ছোট ৮টি **কার্পাল** (carpal) অস্থি কব্জি গঠন করে। উপরের সারিতে থাকে **স্ক্যাফয়েড** (scaphoid), **লুনেট** (lunate), **ট্রাইকুয়েটাল** (triquetal) এবং **পিসিফর্ম** (pisiform) অস্থি এবং নিচের সারিতে থাকে **ট্র্যাপেজিয়াম** (trapezium), **ট্র্যাপেজয়েড** (trapezoid), **ক্যাপিটেট** (capitate) ও **হ্যামেট** (hamate) অস্থি।

করতল বা হাতের তালু (Palm) : করতল গঠনকারী ৫টি নলাকার ও লম্বাকৃতির অস্থিকে **মেটাকার্পাল** (metacarpal) বলে। এগুলো একটি **গোড়া, শ্যাফট** বা **মূলদেহ** ও **মাথা** নিয়ে গঠিত।

আঙুল (Finger) : আঙুলের অস্থিকে **ফ্যালাঞ্জেস** (phalanges, একবচনে- phalanx) বলে। বৃদ্ধাঙ্গুলে ২টি এবং বাকিগুলোতে ৩টি করে মোট ১৪টি ফ্যালাঞ্জেস থাকে। এগুলো খাটো ও নলাকার।

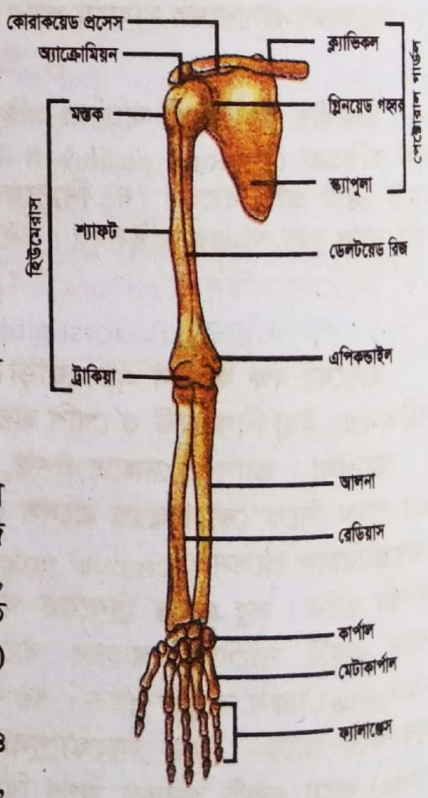

চিত্র ৭.১২ : বাহুর অস্থিসমূহ (ডান অস্থিচক্রসহ)

2020/8/4 17:47

Scanned with CamScanner

সম্মুখ বাহুর কাজ : অগ্রবাহুর হিউমেরাসের মস্তক গ্লিনয়েড গহ্বরে অবস্থান করে হাতকে ঘুরাতে পারে।

অগ্রপদের অস্থির নাম ও সংখ্যা

অস্থির নাম	সংখ্যা (দ্বিগুণ হবে)
হিউমেরাস	১
রেডিয়াস	১
আলনা	১
কার্পাল	৮
মেটাকার্পাল	৫
ফ্যালাঞ্জেস	১৪

(খ) নিম্নাঙ্গের অস্থিসমূহ (Bones of lower part)

১। শ্রোণি-অস্থিচক্র (Pelvic girdle) : প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শ্রোণি-অস্থিচক্র দুটি **ইনোমিনেট অস্থি** (innominate bone) বা **নিতম্বাস্থি** (hipbone) বা Os coxa নিয়ে গঠিত। প্রতিটি নিতম্বাস্থি আবার **ইলিয়াম** (ilium), **ইশ্চিয়াম** (ischium) ও **পিউবিস** (pubis) অস্থি নিয়ে গঠিত। এই তিনটি অস্থিসহ সংশ্লিষ্ট অংশগুলো নিম্নরূপ :

(ক) ইলিয়াম (Ilium) : এটি একটি বৃহৎ ও চ্যাপ্টা অস্থি। এটি পেছনে **স্যাক্রামের** সাথে যুক্ত থাকে। এর উঁচু প্রান্তকে **ইলিয়াম ক্রেস্ট** (ilium crest) বলে। এতে **সম্মুখ স্যুপিরিয়র** ও **পশ্চাৎ সুপিরিয়র কাঁটা** থাকে। তা ছাড়াও ইলিয়ামে তিনটি **গ্লুটাল রেখা**, একটি **ফসা** এবং একটি **টিউবার্কল** বিদ্যমান।

(খ) ইশ্চিয়াম (Ischium) : এটি ইলিয়ামের নিচে পশ্চাৎদিকে অবস্থিত। দুটি **বাহু** বা **রেমি** ও **মূলদেহ** নিয়ে গঠিত। এতে উপরের দিকে একটি **কাঁটা** (spine) এবং নিচের দিকে একটি **টিউবার্কল** (অর্বুদ) আছে।

(গ) পিউবিস (Pubis) : ইলিয়ামের নিচে সম্মুখ দিকে এ অস্থিটি বিদ্যমান। পিউবিস **দেহ** এবং **ঊর্ধ্ব** ও **নিম্ন র‍্যামি** (একবচনে– র‍্যামাস) নিয়ে গঠিত। ঊর্ধ্ব র‍্যামাসে একটি **পিউবিক ক্রেস্ট** বা **ঝুঁটি** ও একটি **পিউবিক টিউবারোসিটি** থাকে। দু'পার্শ্বের দুটি পিউবিস অঙ্কীয় মধ্যরেখায় মিলিত হয়ে **পিউবিক সিমফাইসিস** (pubic symphysis) গঠন করে। পুরুষের ক্ষেত্রে **পিউবিক আর্চ** (pubic arch-angle of pubic symphysis) ৯০°-এর চেয়ে কম হয় এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ৯০°-এর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

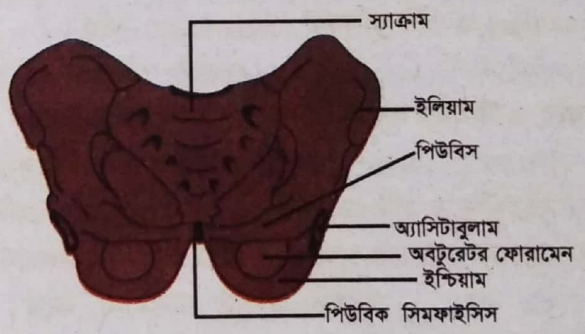

চিত্র ৭.১৩ : শ্রোণি-অস্থিচক্র

(ঘ) অবটুরেটর ফোরামেন (Obturator foramen) : ইশ্চিয়াম ও পিউবিসের মাঝে অবটুরেটর ফোরামেন নামে একটি বড় ছিদ্র পথ রয়েছে।

(ঙ) অ্যাসিটাবুলাম (Acetabulum) : ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম ও পিউবিসের সংযোগস্থলে অ্যাসিটাবুলাম নামক অগভীর গর্ত থাকে। এতে ফিমারের মস্তক আটকানো থাকে।

শ্রোণি-অস্থিচক্রের কাজ : পায়ের অস্থিসমূহকে কঙ্কালের সাথে সংযোগ স্থাপন করা; মূত্রাশয়, অন্ত্রিকোটর প্রভৃতি অঙ্গের অবলম্বন দান করা, ভার বহন করা এবং সুরক্ষিত করা।

২। পা-এর অস্থি বা পশ্চাৎপদের অস্থি (Bones of hind limbs) : মানুষের পা ঊর্ধ্ব পা, নিম্ন পা ও চরণ নিয়ে গঠিত।

(ক) ঊর্ধ্ব পা-এর অস্থি (ফিমার) : ফিমার (femur) হলো ঊর্ধ্ব পায়ের অস্থি। এটি দেহের সবচেয়ে লম্বা, শক্ত ও ভারী অস্থি। এর ঊর্ধ্ব প্রান্তে একটি গোলাকার **মস্তক**, **গ্রীবা**, ছোট-বড় **ট্রোক্যান্টার** (lesser trochanter and greater trochanter) এবং **ইন্টারট্রোক্যান্টার ক্রেস্ট** রয়েছে। নিম্ন প্রান্তে দুটি **কন্ডাইলের** মাঝে **আন্তঃকন্ডাইলার নচ** নামে একটি

গর্ত থাকে। **প্যাটেলা** (patella) নামক একটি প্রায় ত্রিকোণাকার ও চ্যাপ্টা অস্থি এই গর্তে অবস্থিত। প্যাটেলা **সিসাময়েড অস্থি**, কারণ ইহা পেশির টেনডন (tendon) থেকে উৎপত্তি লাভ করে। এর ঊর্ধ্ব ভাগ ফিমারের সাথে এবং নিম্নভাগ টিবিয়ার সাথে সংযুক্ত থাকে। প্যাটেলার অবস্থানের কারণে হাঁটার সময় টিবিয়া ফিবুলা সামনের দিকে বের হয়ে আসে না।

(খ) নিম্ন পা-এর অস্থি (টিবিয়া-ফিবুলা): টিবিয়া (tibia) ও ফিবুলা (fibula) নামক দুটি অস্থি নিয়ে নিম্ন পা গঠিত। এ দুটি অস্থির মধ্যে টিবিয়া মোটা এবং ফিবুলা সরু। টিবিয়া দেহের অন্তর্দিকে এবং ফিবুলা বহির্দিকে অবস্থান করে। টিবিয়ার ঊর্ধ্ব প্রান্তে দুটি **কন্ডাইল**, একটি **টিবিয়াল টিউবারোসিটি**, একটি **আন্তঃকন্ডাইলার** স্ফীতি ও ফিমারযুক্ত হওয়ায় দুটি সংযোগী তল নিয়ে গঠিত। নিম্নপ্রান্তে **মিডিয়াল ম্যালিওলাস** (medial malleolus) ও **ট্যালাসের** (টার্সাল অস্থি) জন্য একটি সংযোগী তল থাকে। ফিবুলা একটি দীর্ঘ সরু অস্থি। এর ঊর্ধ্বপ্রান্তে একটি মস্তক ও টিবিয়ার সংযোগের জন্য একটি সংযোগী তল থাকে। নিম্নপ্রান্তে **ল্যাটারাল ম্যালিওলাস** (lateral malleolus) থাকে।

(গ) চরণ (Foot) : গোড়ালি, পদতল ও আঙুল নিয়ে চরণ গঠিত।

টার্সাল (Tarsal) : পায়ের গোড়ালি ও পদতলের পৃষ্ঠভাগ ৭টি বিভিন্ন আকৃতির টার্সাল অস্থি দিয়ে গঠিত। এগুলো হলো– **ক্যালকেনিয়াস** (calcaneus), **ট্যালাস** (talus), **কিউবয়েড** (cuboid), **নেভিকুলার** (navicular) ও ৩টি **কুনিফর্ম** (cuneiform) অস্থি।

মেটাটার্সাল (Metatarsal) : পায়ের পাতা বা পদতল গঠনকারী ৫টি নলাকার ও সামান্য লম্বা অস্থিকে বলা হয় **মেটাটার্সাল**।

ফ্যালাঞ্জেস (Phalanges) : পায়ের আঙুলের অস্থিগুলোকে ফ্যালাঞ্জেস বলে। বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ২টি এবং বাকিগুলোতে ৩টি করে মোট ১৪টি ফ্যালাঞ্জেস থাকে। হাতের ফ্যালাঞ্জেস অপেক্ষা পায়ের ফ্যালাঞ্জেসগুলো খাটো।

পায়ের কাজ : দেহের সম্পূর্ণ ভারবহন করে। ফিমারের মস্তক অ্যাসিটাবুলামে সংলগ্ন থেকে পা-কে বিভিন্ন দিকে ঘুরাতে ও চলাচলে সহায়তা করে।

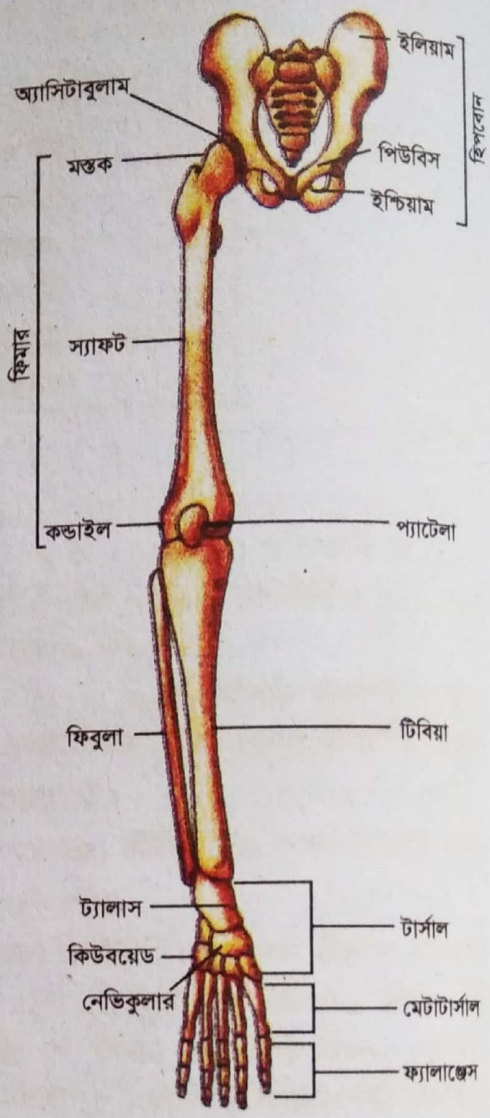

চিত্র ৭.১৪ : পা-এর অস্থিসমূহ (শ্রোণি অস্থিচক্রসহ)

পশ্চাৎপদের অস্থির নাম ও সংখ্যা	
অস্থির নাম	সংখ্যা (দ্বিগুণ হবে)
ফিমার	১
টিবিয়া	১
ফিবুলা	১
প্যাটেলা	১
টার্সাল	৭
মেটাটার্সাল	৫
ফ্যালাঞ্জেস	১৪

❑ **কাজ :** (i) মানবদেহের সবচেয়ে দীর্ঘ ও মোটা অস্থিটির বর্ণনা দাও। (ii) ফিমার দ্বারা সৃষ্ট উপাঙ্গের বিভিন্ন অস্থিসমূহের সংখ্যা লেখ।

Scanned with CamScanner

বক্ষ-অস্থিচক্র ও শ্রোণি-অস্থিচক্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	বক্ষ-অস্থিচক্র (Pectoral girdle)	শ্রোণি-অস্থিচক্র (Pelvic girdle)
১। উৎপত্তি	এটির উৎপত্তি সোলডার বা স্কন্ধ থেকে।	এটির উৎপত্তি হিপ অস্থি থেকে ।
২। অবস্থান ও গঠন	বক্ষ-অস্থিচক্র দুটি পৃথকভাবে অবস্থিত। প্রত্যেকটি দুটি অস্থি নিয়ে গঠিত। যেমন– একটি ক্ল্যাভিকল ও একটি স্ক্যাপুলা।	দুটি হিপ অস্থি পরস্পর একসঙ্গে সংলগ্নভাবে অবস্থিত। প্রতিটি হিপ অস্থি ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম ও পিউবিস নিয়ে গঠিত, যা পৃথক অস্থি নয়।
৩। সংযুক্তি	বক্ষ-অস্থিচক্রের স্ক্যাপুলার গ্লেনয়েড গহ্বরের সাথে হিউমেরাসের মস্তক সংযুক্ত থাকে।	শ্রোণি-অস্থিচক্রের অ্যাসিটাবুলামে ফিমারের মস্তক সংযুক্ত থাকে।
৪। মেরুদণ্ডের সাথে সম্পর্ক	মেরুদণ্ডের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ নেই।	মেরুদণ্ডের স্যাক্রামের সঙ্গে এর সংযোগ রয়েছে।
৫। ধরন	এই অস্থি হালকা।	এই অস্থি ভারী।

পুরুষ ও নারীর অস্থির পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পুরুষের অস্থি	নারীর অস্থি
১। স্কন্ধের অস্থির আকার	শোল্ডার বা স্কন্ধের অস্থি চওড়া।	শোল্ডার বা স্কন্ধের অস্থি তুলনামূলকভাবে সরু।
২। হিপ অস্থির প্রশস্ততা	নারীদের তুলনায় হিপ অস্থি কম প্রশস্ত।	নারীদের হিপ অস্থি তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত।
৩। অ্যাসিটাবুলামের ব্যাস	অ্যাসিটাবুলামের ব্যাস 5 cm-এর বেশি।	অ্যাসিটাবুলামের ব্যাস 5 cm-এর কম।
৪। অবটুরেটর ফোরামেনের আকৃতি	অবটুরেটর ফোরামেন ডিম্বাকার।	অবটুরেটর ফোরামেন ত্রিকোণাকার।
৫। পেলভিক গহ্বরের আকার	পেলভিক গহ্বর নারীদের তুলনায় বেশ ছোট।	নারীদের পেলভিক গহ্বর বেশ প্রশস্ত।
৬। স্যাক্রামের আকৃতি	স্যাক্রাম ক্ষুদ্র ও প্রশস্ত নয়।	স্যাক্রাম তুলনামূলকভাবে বড় এবং প্রশস্ত।
৭। কক্সিসের দৃঢ়তা	পুরুষদের কক্সিস সবল নয়।	নারীদের কক্সিস সবল।

ইলিয়াম (Ilium) ও ইলিয়ামের (Ileum) মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ইলিয়াম (Ilium)	ইলিয়াম (Ileum)
১। প্রকৃতি	মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্রোণিচক্রের একটি অস্থি বিশেষ।	সকল মেরুদণ্ডী এবং কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পরিপাকনালির একটি অংশ।
২। গঠন	অস্থিকোষ, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট দ্বারা গঠিত।	পেশিকোষ এবং এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত।
৩। ধরন	এটি শক্ত ও অস্থিময়।	এটি নরম এবং পেশিময়।
৪। হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র	হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বা অস্টিওন উপস্থিত।	হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বা অস্টিওন অনুপস্থিত।
৫। ভিলাই	ভিলাই অনুপস্থিত।	ভিলাই উপস্থিত।
৬। পেয়ারের প্যাঁচ	পেয়ারের প্যাঁচ অনুপস্থিত।	পেয়ারের প্যাঁচ উপস্থিত।
৭। কাজ	দেহের কাঠামো গঠন করে এবং ফিমারকে ধারণ করে চলনে সাহায্য করে।	খাদ্য পরিপাক এবং পরিপাককৃত খাদ্যসার পরিশোষণ হয়।

৭.২ অস্থি ও তরুণাস্থির গঠন (Structure of Bone and Cartilage)

অস্থির গঠন (Structure of Bone)

অস্থি দেহের কঠিনতম, অনমনীয়, অস্থিতিস্থাপক ও ভঙ্গুর প্রকৃতির যোজক কলা। অস্থি অন্যান্য যোজক কলার ন্যায় মাতৃকা (matrix) ও অস্থিকোষ নিয়ে গঠিত। **পেরিঅস্টিয়াম** (periosteum) নামক পাতলা আবরণ দ্বারা সমগ্র অস্থি আবৃত থাকে। ৪০% জৈব এবং ৬০% অজৈব পদার্থ থাকে। জৈব পদার্থের মধ্যে কোলাজেন তন্তু

2020/8/4 17:47

Scanned with CamScanner

এবং **মিউকোপলিস্যাকারাইড** এবং অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও অন্যান্য যৌগ থাকে। মাতৃকায় **ক্যালসিয়াম** লবণের উপস্থিতির কারণে অস্থি শক্ত প্রকৃতির হয়। মাতৃকায় প্রধানত তিন ধরনের অস্থিকোষ থাকে, যেমন– **অস্টিওব্লাস্ট** (osteoblast)– অপরিণত অস্থি উৎপাদনকারী কোষ, **অস্টিওসাইট** (osteocyte)- পরিণত অস্থিকোষ এবং **অস্টিওক্লাস্ট** (osteoclast)– অস্থির ধ্বংসকারী কোষ। এসব কোষ দেখতে অনেকটা মাকড়সার জালের ন্যায়। অস্থি মানুষসহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তঃকঙ্কাল গঠন করে। দেহে অস্থির গঠন প্রক্রিয়াকে **অসিফিকেশন** (ossification) বলে।

অস্থির প্রকারভেদ (Types of Bone)

(ক) উপাদানের ঘনত্ব, দৃঢ়তা ও গঠন অনুসারে অস্থিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১। নিরেট বা কর্টিকেল বা দৃঢ় বা ঘন সন্নিবিষ্ট অস্থি (Compact or Cortical bone) : দেহের অধিকাংশ অস্থিই নিরেট প্রকৃতির। এ অস্থির ভেতরে মজ্জা গহ্বর (marrow cavity) থাকে এবং যাকে তন্তুময় **এন্ডোস্টিয়াম** (endosteum) আবৃত করে রাখে। মজ্জা গহ্বর লোহিত বা শ্বেত মজ্জায় (marrow) পরিপূর্ণ থাকে।

নিরেট অস্থির গঠন : নিরেট অস্থির মাতৃকায় মজ্জা গহ্বরকে ঘিরে **হ্যাভারসিয়ানতন্ত্র** (Haversian system) বা **অস্টিওন** (osteon) নামক অসংখ্য একক গঠন ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। আর এ হ্যাভারসিয়ানতন্ত্রই হলো অস্থির গাঠনিক ও কার্যিক একক। **হ্যাভারসিয়ান নালি** (Haversian canal) এবং একে ঘিরে অবস্থিত **ল্যামিলি** (বহুবচন-lamellae, একবচন-lamella), **ল্যাকুনি** (বহুবচন-lacuni, একবচন-lacuna), **ক্যানালিকুলি** (বহুবচন-canaliculi, একবচন-canaliculus) ইত্যাদি নিয়ে হ্যাভারসিয়ানতন্ত্র গঠিত। প্রতিটি হ্যাভারসিয়ানতন্ত্রে হ্যাভারসিয়ান নালি নামক কেন্দ্রীয় নালি থাকে। এ নালিতে রক্তনালি (ধমনি, শিরা ইত্যাদি), স্নায়ুতন্তু, লসিকানালি বিদ্যমান। হ্যাভারসিয়ান নালিকা ঘিরে ৮-১৫টি স্তরে মাতৃকা বিন্যস্ত থাকে। স্তরগুলোকে **ল্যামিলি** (lamellae) বলে। ল্যামেলাসমূহের সংযোগস্থলে **ল্যাকুনি** (lacuni) নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর থাকে, যেখানে অস্টিওসাইট বা অস্থিকোষ অবস্থান করে। ল্যাকুনা থেকে চতুর্দিকে **ক্যানালিকুলি** (canaliculi) নামক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালিকা বিস্তৃত হয়ে ল্যাকুনিসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

নিরেট অস্থির অভ্যন্তরে হ্যাভারসিয়ান নালিগুলো আড়াআড়িভাবে অবস্থিত **ভকম্যানস নালি** (Volkmann's canal) দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে মাতৃকা এবং অস্টিওসাইটগুলো অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত থাকে। এ অঞ্চলসমূহকে **ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামিলি** (interstitial lamellae) বলে। যেমন- হিউমেরাস, রেডিও-আলনা, ফিমার, টিবিয়া-ফিবুলা ইত্যাদি এ প্রকৃতির অস্থি।

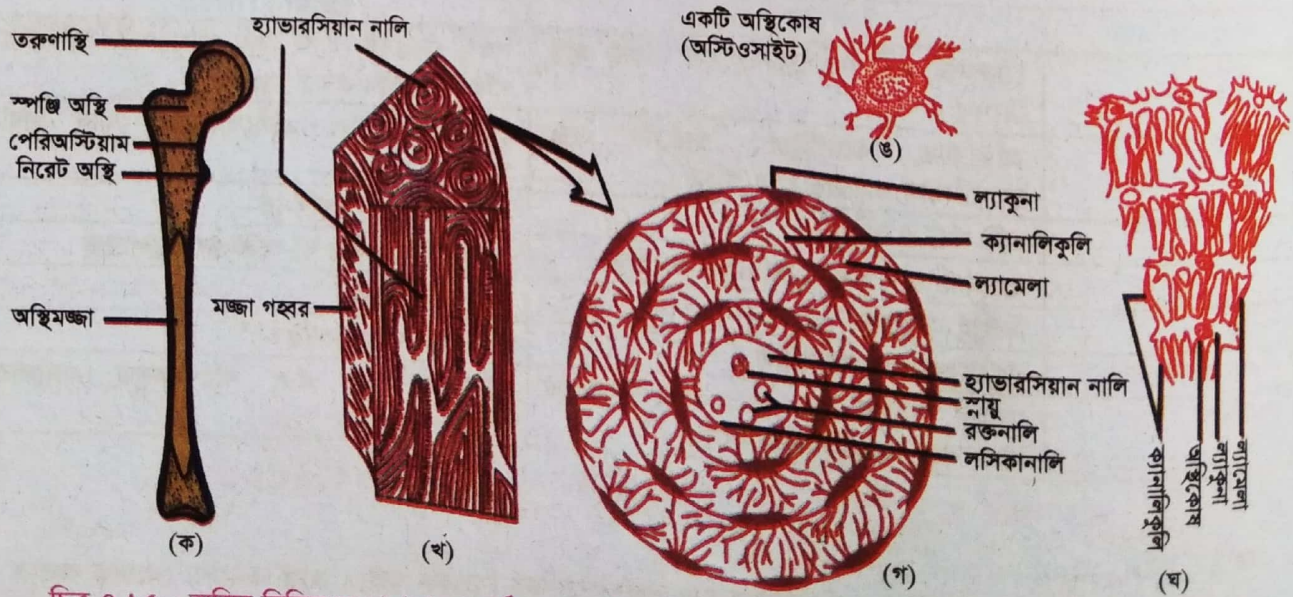

চিত্র ৭.১৫ : অস্থির বিভিন্ন অংশ (ক) অন্তর্গঠন, (খ) নিরেট অস্থির অংশবিশেষ, (গ) হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বা অস্টিওন, (ঘ) হ্যাভারসিয়ানতন্ত্রের অংশ এবং (ঙ) একটি অস্থিকোষ

2020/8/4 17:47

Scanned with CamScanner

২। **স্পঞ্জসদৃশ বা স্পঞ্জি অস্থি** (Spongy bone) : নিরেট অস্থির অভ্যন্তরে এ অস্থি বিদ্যমান। এ অস্থিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর থাকে, যা মজ্জায় পরিপূর্ণ থাকে। এদের গঠন স্পঞ্জ বা মৌচাকের মতো বলে এদেরকে **ক্যানসেলাস** বা **ট্রাবেকুলার** অস্থি বলা হয়। এ অস্থির গাঠনিক ও কার্যকরি একককে **ট্রাবেকুলা** (trabecula) বলে যা ল্যামিলি, অস্টিওসাইট, ল্যাকুনি ও ক্যানালিকুলির সমন্বয়ে গঠিত। এতে হ্যাভারসিয়ানতন্ত্র অনুপস্থিত। অস্থিতে অসংখ্য সূক্ষ্ম **ব্যবধায়ক** (septa) থাকায় এবং ক্যালসিয়াম ও মজ্জার পরিমাণ কম থাকায় এ অস্থি নরম প্রকৃতির হয়। মাতৃকায় অস্থিকোষগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে। এ ধরনের অস্থি হলো– করোটিকা (মাথার খুলি), চ্যাপ্টা অস্থি, বৃহৎ অস্থির প্রান্তভাগ, পাখিদের সকল অস্থি প্রভৃতি। তা ছাড়া নিরেট অস্থির মজ্জা গহ্বরকে ঘিরেও এই ধরনের অস্থি দেখা যায়। **শিশুদের প্রায় সকল অস্থিই এ প্রকৃতির অস্থি।**

(খ) আকৃতি অনুসারে অস্থিকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়–

১। **লম্বা অস্থি** (Long bone) : হিউমেরাস, রেডিয়াস, আলনা, টিবিয়া, ফিবুলা ইত্যাদি অস্থি।
২। **খাটো অস্থি** (Short bone) : কারপাল, টারসাল, ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস।
৩। **চাপা অস্থি** (Compressed/Flat bone) : স্ক্যাপুলা, পর্শুকা, স্টার্নাম, করোটিকার প্যারাইটাল অস্থি।
৪। **অনিয়ত অস্থি** (Irregular bone) : কশেরুকা ও নিতম্বাস্থি।
৫। **বায়ুপূর্ণ অস্থি** (Pneumatic bone) : ম্যাক্সিলা (সবচেয়ে বড়), ফ্রন্টাল, স্ফেনয়েড, এথময়েড।

অস্থির কাজ (Functions of Bone) : দেহের কাঠামো গঠন করে; পেশি সংযোজনের তল সৃষ্টি করে, দেহের নরম অংশসমূহ (যেমন– মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি) সুরক্ষিত রাখে; রক্ত থেকে বিষাক্ত পদার্থ (যেমন– লেড, আর্সেনিক ইত্যাদি) সঞ্চয় করে রাখে; ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় অজৈব পদার্থের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে; অস্থিমজ্জা বিভিন্ন রক্তকোষ ও R.E কোষ উৎপন্ন করে ও অস্থিমজ্জাকে ঘিরে রাখে। অস্থিকোষ থেকে **অস্টিওক্যালসিন** (osteocalcin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয় যা রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ ও দেহে চর্বি সঞ্চয় নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

নিরেট অস্থি ও স্পঞ্জি অস্থির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিরেট অস্থি	স্পঞ্জি অস্থি
১। নাম	এদের কর্টিকেল অস্থি বলে।	এদের ট্রাবেকুলার অস্থি বলে।
২। গাঠনিক একক	এ অস্থির গাঠনিক একক হ্যাভারসিয়ানতন্ত্র ।	এ অস্থির গাঠনিক একক ট্রাবেকুলা।
৩। প্রকৃতি	এ অস্থি ঘন, ভারী ও মজবুত প্রকৃতির।	এ অস্থি পাতলা ও হালকা প্রকৃতির।
৪। অবস্থান	এটি অস্থির বাইরের প্রধান স্তর গঠন করে।	এটি নিরেট অস্থির ভেতরে অবস্থান করে।
৫। পরিমাণ	মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ৮০% নিরেট অস্থি।	মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ২০% স্পঞ্জি অস্থি।

তরুণাস্থি বা কোমলাস্থির গঠন (Structure of Cartilage)

তরুণাস্থি অস্থির মতো দৃঢ় ও ভঙ্গুর নয়। এগুলো অপেক্ষাকৃত নরম, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক যোজক কলা। অস্থির ন্যায় তরুণাস্থিও কোষ ও মাতৃকা (matrix) নিয়ে গঠিত। তরুণাস্থির মাতৃকা অর্ধকঠিন, স্থিতিস্থাপক এবং **কনড্রিন** (chondrin) নামক পদার্থে গঠিত। **কনড্রোমিউকয়েড** (chondromucoid) ও **কনড্রোঅ্যালবুনয়েড** (chondroalbunoid) নামক প্রোটিন দিয়ে মাতৃকা গঠিত। মাতৃকায় **কোলাজেন, ইলাস্টিন** প্রোটিনের তৈরি বিভিন্ন তন্তু, **প্রোটিওগ্লাইকেন** ভিত্তি পদার্থ, **কন্ড্রোব্লাস্ট** (chondroblasts, সক্রিয় তরুণ কোষ) বা **কন্ড্রোসাইট** (chondrocyte, বিভাজন ক্ষমতাহীন পরিণত কোষ) এবং **ল্যাকুনা** নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর থাকে। তরুণাস্থি **পেরিকন্ড্রিয়াম** (perichondrium) নামক তন্তুময় যোজককলায় নির্মিত আবরণী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। প্রতিটি ল্যাকুনায় এক বা একাধিক তরুণাস্থি কোষ (কন্ড্রোসাইট) এককভাবে বা গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এর মাতৃকায় ক্যালসিয়াম লবণ থাকে না। এর পরিবর্তে **কনড্রয়টিন** (chondroitin) নামক পদার্থ থাকে যা তরুণাস্থিকে নমনীয়তা প্রদান করে।

তরুণাস্থির প্রকারভেদ (Types of Cartilage)

মাতৃকার গঠনের ভিত্তিতে তরুণাস্থি চার ধরনের হয়। যথা–

১। **স্বচ্ছ তরুণাস্থি** (Hyaline cartilage) : এর মাতৃকা (matrix) ঈষৎ স্বচ্ছ, হালকা নীলাভ, স্থিতিস্থাপক, নমনীয় সমসত্ত্ব এবং তন্তুবিহীন। **পেরিকন্ড্রিয়াম** দ্বারা আবৃত থাকে। নাক, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, পর্শুকার প্রান্তভাগ, অস্থিসন্ধিস্থল, সকল মেরুদণ্ডীয় ভ্রূণীয় কঙ্কাল ইত্যাদি এবং ব্যাঙ ও হাঙরের ভ্রূণে বা পরিণত দেহে এ তরুণাস্থি বিদ্যমান।

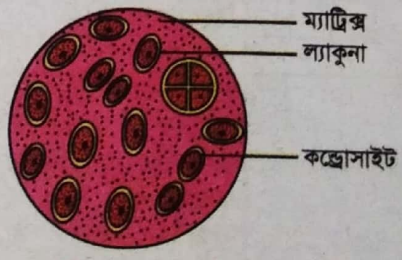

চিত্র ৭.১৯ : স্বচ্ছ তরুণাস্থি

2020/8/4 17:47
Scanned with CamScanner

২. স্থিতিস্থাপক বা পীততন্তুময় তরুণাস্থি (Elastic or Yellow fibrous cartilage) : এর মাতৃকা হালকা হলুদ, অস্বচ্ছ, নমনীয়, অসমসত্ত্ব এবং স্থিতিস্থাপক। এর মাতৃকায় হলুদ বা পীত বর্ণের, শাখান্বিত ও স্থিতিস্থাপক তন্তু জালকের ন্যায় সজ্জিত থাকে। বহিঃকর্ণ বা পিনা, নাসিকার অগ্রভাগ, স্বরযন্ত্র, আলজিহ্বা (epiglottis), ইউস্টেসিয়ান নালি ইত্যাদি অংশে এ তরুণাস্থি বিদ্যমান।

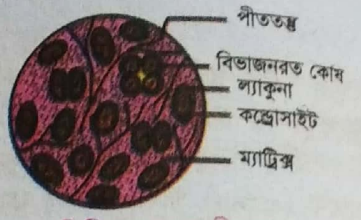

চিত্র ৭·১৬.২ : স্থিতিস্থাপক বা পীততন্তুময় তরুণাস্থি

৩. শ্বেত তন্তুময় তরুণাস্থি (White fibrous cartilage) : এর মাতৃকায় সাদা বা শ্বেত বর্ণের, অশাখ, অস্থিতিস্থাপক, কোলাজেন নির্মিত তন্তু সমান্তরালে অবস্থান করে। কশেরুকাসমূহের মধ্যবর্তী স্থান (আন্তঃকশেরুকা চাকতি), অস্থি ও টেনডনের সংযোগস্থল, গ্লিনয়েড গহ্বর, পিউবিস সিমফাইসিস প্রভৃতি অংশে এ তরুণাস্থি বিদ্যমান।

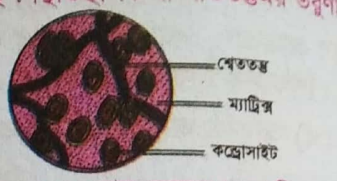

চিত্র ৭·১৬.৩: শ্বেত তন্তুময় তরুণাস্থি

৪. চুনময় বা ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি (Calcified cartilage) : এর মাতৃকায় প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) সঞ্চিত থাকে, ফলে কঠিনাস্থির মতো শক্ত হয়। হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে এ তরুণাস্থি পাওয়া যায়।



চিত্র ৭·১৬.৪: চুনময় বা ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি

তরুণাস্থির কাজ (Functions of Cartilage) : তরুণাস্থি বিভিন্ন অঙ্গের চাপ ও টান (tenson) নিয়ন্ত্রণ করে, বিভিন্ন অঙ্গের আকৃতি নির্মাণ করে, টেনডন ও লিগামেন্টকে অস্থির সাথে যুক্ত করতে সাহায্য করে, অস্থিসন্ধিতে অস্থির প্রান্তভাগকে ঘর্ষণের হাত থেকে প্রতিরোধ করে (**লুব্রিসিন** নামক গ্লাইকোপ্রোটিনের কারণে) ও Vertebrata উপপর্বের প্রাণীদের **ভ্রূণীয় কঙ্কাল ও কন্ড্রিকথিস** (Chondrichthyes) জাতীয় মাছের অন্তঃকঙ্কাল নির্মাণ করে।

❑ **কাজ :** (i) হাড় দেহের কাঠামো গঠন ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে– বর্ণনা কর। (ii) কান ও হাতের অন্তঃকঙ্কাল কি একই প্রকৃতির?–বিশ্লেষণ কর।

শ্বেততন্তু ও পীততন্তুর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	শ্বেততন্তু	পীততন্তু
১। বর্ণ	সাদা বর্ণের।	পীত বর্ণের।
২। উপাদান	কোলাজেন প্রোটিন দ্বারা তৈরি।	ইলাস্টিন প্রোটিন দ্বারা তৈরি।
৩। বিস্তৃতি	তন্তুগুলো স্থূল ও গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত।	তন্তুগুলো সূক্ষ্ম ও এককভাবে বিন্যস্ত।
৪। শাখার ধরন	একক তন্তু শাখাহীন।	একক তন্তু শাখা-প্রশাখাযুক্ত।
৫। স্থিতিস্থাপকতা	তন্তুগুলো অস্থিতিস্থাপক।	তন্তুগুলো স্থিতিস্থাপক।
৬। অবস্থান	প্রাণিদেহের দৃঢ়তা প্রদানকারী অঙ্গে।	প্রাণিদেহের স্থিতিস্থাপক অঙ্গে।

স্বচ্ছ তরুণাস্থি, পীত তন্তুময় তরুণাস্থি, শ্বেত তন্তুময় তরুণাস্থি ও ক্যালসিফাইড তরুণাস্থির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	স্বচ্ছ তরুণাস্থি	পীত তন্তুময় তরুণাস্থি	শ্বেত তন্তুময় তরুণাস্থি	ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি
১। মাতৃকা বা ধাত্র	স্বচ্ছ।	অস্বচ্ছ।	অস্বচ্ছ।	অস্বচ্ছ।
২। তন্তু, মাতৃকা ও কোষের পরিমাণ	তন্তু অপেক্ষা মাতৃকা ও কোষের পরিমাণ বেশি।	তন্তু, মাতৃকা ও কোষ মাঝামাঝি প্রকারের।	তন্তু অপেক্ষা মাতৃকা ও কোষের পরিমাণ বেশি।	মাতৃকা ক্যালসিফাইড, তন্তু অনুপস্থিত।
৩। পেরিকন্ড্রিয়াম	উপস্থিত।	উপস্থিত।	অস্পষ্ট।	উপস্থিত।
৪। স্থিতিস্থাপকতা	স্থিতিস্থাপক।	অস্থিতিস্থাপক।	অপেক্ষাকৃত দৃঢ়।	শক্ত ও অস্থিতিস্থাপক।
৫। বর্ণ	নীলাভ-সাদা।	হলুদাভ।	উজ্জ্বল সাদা।	সাদা।
৬। অবস্থান	নাক, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, পর্শুকার প্রান্তভাগ, অস্থিসন্ধি, ভ্রূণীয় কঙ্কাল এবং ব্যাঙ ও হাঙরের ভ্রূণ বা পরিণত দেহ ইত্যাদি।	পিনা, নাসিকার অগ্রভাগ, আলজিহ্বা, ইউস্টেসিয়ান নালি ইত্যাদি অংশে এ তরুণাস্থি বিদ্যমান।	কশেরুকাসমূহের মধ্যবর্তী স্থান, অস্থি ও টেনডনের সংযোগস্থল, গ্লিনয়েড গহ্বর, চোয়ালের সন্ধি প্রভৃতি।	হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তক, ব্যাঙের শ্রোণিচক্র, হাঙরের কশেরুকা ইত্যাদি।

2020/8/4 17:48

Scanned with CamScanner

তরুণাস্থি ও অস্থির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	তরুণাস্থি (কোমলাস্থি)	অস্থি
১। গঠন	নরম, নমনীয় ও অকঠিন যোজক কলা।	দৃঢ়, অনমনীয় ও কঠিন যোজক কলা।
২। প্রকৃতি	স্থিতিস্থাপক।	অস্থিতিস্থাপক।
৩। ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র	ম্যাট্রিক্সে কন্ড্রিন নামক জৈব পদার্থ থাকে, অনেক সময় তন্তু থাকে। তবে অজৈব পদার্থ অনুপস্থিত।	ম্যাট্রিক্সে জৈব পদার্থের মধ্যে কোলাজেন তন্তু, মিউকোপলিস্যাকারাইড এবং অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ইত্যাদি থাকে।
৪। কোষের গঠন	গোলাকার বা ডিম্বাকার।	মাকড়সার জালের মতো।
৫। আবরণ	এর আবরণকে পেরিকন্ড্রিয়াম বলে।	এর আবরণকে পেরিঅস্টিয়াম বলে।
৬। হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র (অস্টিওন)	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।
৭। মজ্জাগহ্বর ও রক্তবাহ	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।
৮। রক্তকণিকা	রক্তকণিকা উৎপাদন করে না।	রক্তকণিকা উৎপাদন করে।
৯। অবস্থান	নাক, কান (পিনা), স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, অস্থিসন্ধি, আন্তঃকশেরুকা চাকতি, পর্শুকার শেষপ্রান্ত ইত্যাদিতে।	দেহের অন্তঃকঙ্কালরূপে অবস্থান করে।
১০। কাজ	দেহের আকৃতি ও ঋজুতা দান; অস্থি গঠন; এবং অস্থিসন্ধিকে দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক করায় সহায়তা দান।	দেহের কাঠামো গঠন; নির্দিষ্ট আকৃতি দান; ভার বহন; দেহযন্ত্রের সুরক্ষা ইত্যাদি।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : মানুষের বিভিন্ন অস্থি (মডেল) পর্যবেক্ষণ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৭.৩ পেশির গঠন ও কাজ (Structure and Functions of Muscle)

ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ধরনের তন্তু দ্বারা গঠিত সংকোচন ও প্রসারণশীল বিশেষ ধরনের কলাকে (tissue) **পেশি** (muscle) বা **পেশি কলা বলে**। যেমন– মসৃণ পেশি, হৃৎপেশি ও কঙ্কাল পেশি ইত্যাদি। পেশি বা পেশি কলা সমগ্র দেহে বিস্তৃত। মানবদেহের মোট ওজনের অধিকাংশই (৪০%) হলো পেশি বা পেশিকলা। পেশিকলা রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ভ্রূণীয় বিকাশের সময় মেসোডার্ম থেকে **মায়োজেনেসিস** (myogenesis) প্রক্রিয়ায় পেশিকলা সৃষ্টি হয়।

পেশির সাধারণ বৈশিষ্ট্য : পেশির কোষগুলো সরু, লম্বা ও তন্তুর ন্যায় এবং ঘনসন্নিবেশিতভাবে গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে। এজন্য এদের পেশি তন্তু বলা হয়। পেশি কোষ সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন, চলন ও অভ্যন্তরীণ পরিবহন ঘটে। এদের মাতৃকা (matrix) প্রায় অনুপস্থিত। পেশিকলার একক হলো **পেশি কোষ** (muscle cell) বা **পেশি তন্তু** (muscle fibre), যা **মায়োব্লাস্ট** (myoblast) নামক আদিকোষ থেকে সৃষ্টি হয়। পেশি কোষের আবরণকে **সারকোলেমা** (sarcolemma) এবং সাইটোপ্লাজমকে **সারকোপ্লাজম** (sarcoplasm) বলা হয়। সারকোপ্লাজমে **অ্যাকটিন** (actin) ও **মায়োসিন** (myosin) নামক প্রোটিন ফিলামেন্ট দ্বারা গঠিত। এতে **মায়োফাইব্রিল** (myofibril) নামক সংকোচন ও প্রসারণশীল অতি সূক্ষ্ম অণুতন্তু পরস্পর সমান্তরালে সজ্জিত থাকে। মায়োফাইব্রিলগুলো পেশিকে স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) ও সহনশীলতা প্রদান করে।

পেশির উপাদান : পেশিটিস্যু প্রায় ৭৫ শতাংশ পানি ও অবশিষ্টাংশ কঠিন পদার্থে গঠিত।

উপাদানের নাম	শতকরা পরিমাণ (%)
পানি	৭৫
বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন-অ্যাকটিন, মায়োসিন, অ্যাক্টোমায়োসিন কমপ্লেক্স, মায়োজেন, মায়োঅ্যালবুমিন, মায়োগ্লোবিউলিন ইত্যাদি।	২০
স্নেহ পদার্থ– ফসফোলিপিড ও কোলেস্টেরল।	০.২
শর্করা– গ্লাইকোজেন।	৩.৩
অজৈব লবণ– পটাশিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম।	১.৫

Scanned with CamScanner

পেশির কাজ

(১) সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায়। (২) চলনে ও ভার বহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (৩) এরা সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে পরিপাক, রক্তসংবহন, রেচন ও প্রজনন কাজে সাহায্য করে। (৪) ভিসেরাল পেশি সিলোমিক প্রাচীর তৈরি ও দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহকে রক্ষা করে। (৫) হৃৎপেশি উত্তেজনায় সাড়া প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (৬) অস্থি পেশির সমদৈর্ঘ্য সংকোচন ও পেশিটান বজায় রেখে দেহ ভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করে।

পেশির প্রকারভেদ (Types of Muscle)

অবস্থান, গঠন ও কাজের ভিত্তিতে পেশি বা পেশিকলা তিন ধরনের, যথা– **মসৃণ পেশি, হৃৎপেশি** ও **কঙ্কাল পেশি**। এ সম্পর্কে তোমরা নবম-দশম শ্রেণিতে জেনেছ। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

(ক) অনৈচ্ছিক/অরৈখিক/ভিসেরাল/ মসৃণ পেশি (Involuntary/Non-striated/Visceral/ Smooth muscle)

যেসব পেশি কলার সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয় বরং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের **অনৈচ্ছিক পেশি** বলে। এসব পেশির মায়োফাইব্রিলে ডোরাকাটা থাকে না বলে এদের মসৃণ বা অরৈখিক পেশি বলে।

অবস্থান : পৌষ্টিকনালি, রক্তনালি, শ্বাসনালি, রেচন-জনন নালি, জরায়ু, গ্রন্থির নালি, রক্তবাহ, লসিকাবাহ, চোখের আইরিশ ইত্যাদি অঙ্গের প্রাচীরে মসৃণ পেশি অবস্থান করে। এসব পেশি আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের (visceral organs) প্রাচীরে থাকে বলে এদেরকে **ভিসেরাল পেশি** বা **দেহযন্ত্রের পেশি** এবং কঙ্কালের গায়ে থাকে না বলে এদেরকে **অকঙ্কাল** পেশিও বলে।

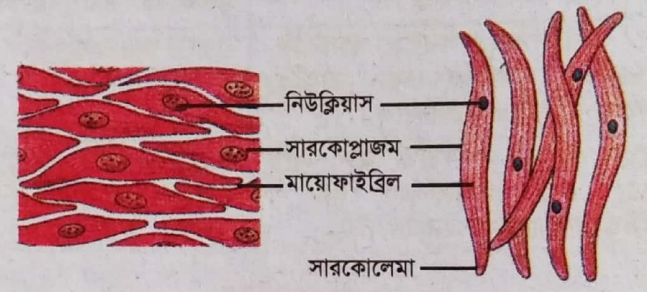

চিত্র ৭.১৭ : মসৃণ পেশির (অনৈচ্ছিক পেশি) কলাস্থানিক গঠন

গঠন : এ পেশির কোষগুলো মাকু আকৃতির (spindle shape) ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। এরা দৈর্ঘ্যে ১৫-২০০ μm এবং প্রস্থে ৮-১০ μm পর্যন্ত হয়। এদের সারকোলেমা অস্পষ্ট। কোষের মধ্যস্থানে একটি ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে। পেশিতে একটি কোষের স্ফীত অংশ অন্য কোষের সরু অংশের সাথে যুক্ত থাকে। কোষের সারকোপ্লাজমে অসংখ্য মায়োফাইব্রিল অনুসূত্র লম্বালম্বিভাবে বিন্যস্ত থাকে।

কাজ : এ পেশির সংকোচন ও প্রসারণ ধীর ও দীর্ঘস্থায়ী। সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ছন্দবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ (যেমন- **পেরিস্ট্যালসিস** (peristalsis) রক্তনালির অবিরাম সংকোচন-প্রসারণ ইত্যাদি) এসব পেশি নিয়ন্ত্রণ করে। এ পেশি প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদি সঞ্চালন করে থাকে। এ পেশি দেহের ভঙ্গি (posture) নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের অবস্থার পরিবর্তনে এবং গমনে সহায়তা করে। দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং দেহ তরলের পরিমাণের সাম্যতা বজায় রাখে।

(খ) হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি (Cardiac muscle)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের (মানুষ) হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর গঠনে অংশগ্রহণকারী এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশিকে হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি বলে। এ পেশি স্বেচ্ছায় সংকোচনশীল নয়, কিন্তু নিজে নিজে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃৎপেশি চিহ্নিত কিন্তু অনৈচ্ছিক।

অবস্থান : হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তরে (মায়োকার্ডিয়াম) এ পেশি অবস্থিত। মায়োকার্ডিয়ামের বাইরের দিকে এপিকার্ডিয়াম ও ভেতরের দিকে এন্ডোকার্ডিয়াম নামক যোজক কলা নির্মিত আবরণ থাকে।



চিত্র ৭.১৮ : হৃৎপেশি

গঠন : এ পেশির কোষগুলো অনিয়তকার, লম্বা, শাখান্বিত ও আড়াআড়ি দাগযুক্ত। কোষগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে জালিকাকার গঠনের সৃষ্টি করে। এ পেশির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ μm এবং প্রস্থ ১০-১৫ μm। সারকোলেমা পাতলা, প্রতিটি কোষের কেন্দ্রভাগে একটি (কদাচিৎ দুটি) বড় নিউক্লিয়াস থাকে। এদের সংকোচন-প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ হৃৎপেশির গঠন কঙ্কাল পেশির ন্যায় হলেও কাজ **অনৈচ্ছিক** বা **মসৃণ** পেশির ন্যায়। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কোষের সারকোলেমা মিলিত হয়ে চাকতির ন্যায় **ইন্টারকালেটেড ডিস্ক** (intercalated disc) নামক একটি বিশেষ অনুপ্রস্থ রেখা সৃষ্টি করে। এ ডিস্ক হৃৎপেশির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ পেশির সংকোচন

2020/8/4 17:48
Scanned with CamScanner

প্রসারণ ছান্দিক ও সাধারণভাবে দ্রুত, কখনো ক্লান্ত হয় না। এ পেশির তন্তুগুলোর মধ্যবর্তী স্থানসমূহ **অ্যারিওলার যোজক কলা** (areolar connective tissue) দ্বারা পূর্ণ থাকে যাতে কৈশিকজালিকা বিস্তৃত থাকায় এ পেশি পুষ্টি ও অক্সিজেন প্রাপ্ত হয়।

কাজ : হৃৎপিণ্ডের অবিরাম সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে প্রাণিদেহের রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এ পেশি কখনো অবসাদগ্রস্ত হয় না।

❑ **কাজ :** হৃৎপিণ্ড গঠনকারী পেশির বৈশিষ্ট্য লেখ।

(গ) ঐচ্ছিক/ অমসৃণ/ রৈখিক বা চিহ্নিত বা ডোরাকাটা/কঙ্কাল পেশি (Voluntary/Non-smooth/Striated /Skeletal muscle)

মানবদেহের যেসব পেশি মানুষের ইচ্ছেমতো সংকুচিত বা প্রসারিত হতে পারে তাদের **ঐচ্ছিক পেশি** বলে। এসব পেশি কঙ্কালের সাথে আটকে থাকে বলে এদের **কঙ্কাল** পেশিও বলে। এই পেশিকে সাধারণত **মাংস** বলা হয়।

অবস্থান : বিভিন্ন অস্থির সংযোগস্থলে, চোখ, জিহ্বা, গলবিলসহ হাত-পায়ে এ ধরনের পেশি অবস্থান করে।

গঠন : এ পেশির কোষগুলো বা পেশিতন্তুগুলো গুচ্ছ আকারে অবস্থান করে। পেশিতন্তুর এ ধরনের প্রতিটি গুচ্ছকে **ফ্যাসিকুলাস** (fasciculus, বহুবচনে– fasciculi) বলা হয়। এসব গুচ্ছ (bundle) যোজক কলা নির্মিত **পেরিমাইসিয়াম** (perimycium) নামক আবরণে আবৃত থাকে। কতগুলো ফ্যাসিকুলি মিলিত হয়ে একটি বৃহৎ গুচ্ছ গঠন করে। যোজক কলা নির্মিত **এপিমাইসিয়াম** (epimycium) দ্বারা এসব গুচ্ছ আবৃত থাকে। প্রতিটি পেশিতন্তু **নলাকার** (cylindrical), অশাখান্বিত ও আড়াআড়ি ডোরাযুক্ত। এরা দৈর্ঘ্যে ১ – ৪০ মি.মি. এবং প্রস্থে ০·০১ – ০·১ মি.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। পেশিতন্তুর বা পেশি কোষের আবরণকে **সারকোলেমা** এবং সাইটোপ্লোজমকে **সারকোপ্লাজম** বলে। সারকোপ্লাজমে একাধিক গোলাকার বা ডিম্বাকার নিউক্লিয়াসসহ প্রায় সকল কোষীয় অঙ্গাণুই উপস্থিত থাকে। এছাড়া সারকোপ্লাজমে **মায়োফাইব্রিল** (myofibril) নামক অসংখ্য অনুসূত্রক সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে। প্রতিটি মায়োফাইব্রিল প্রধানত **অ্যাকটিন** (actin) ও **মায়োসিন** (myosin) নামক প্রোটিন ফিলামেন্ট দ্বারা গঠিত। অ্যাকটিন ফিলামেন্টে **ট্রপোমায়োসিন** (tropomyosin) ও **ট্রপোনিন** (troponin) নামক দুটি প্রোটিন অণু যুক্ত হয়ে **অ্যাকটিন ফিলামেন্টে কমপ্লেক্স** গঠন করে।

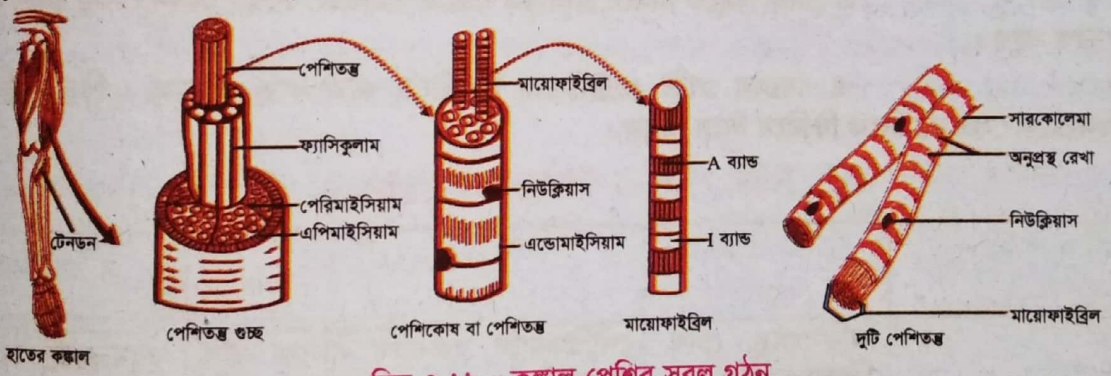

চিত্র ৭.১৯ : কঙ্কাল পেশির সরল গঠন

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে মায়োফাইব্রিলে পর্যায়ক্রমিকভাবে অবস্থিত কতকগুলো স্বচ্ছ বা সাদা বা হালকা এবং অস্বচ্ছ বা কালো অনুপ্রস্থ দাগ বা রেখা (band) দেখা যায়। অ্যাকটিন ও মায়োসিনের বিন্যাসের ফলেই মূলত এ ধরনের দাগের সৃষ্টি। সাধারণত **হালকা** ও **স্বচ্ছ** এবং **কালো** ও **অস্বচ্ছ** দাগগুলোকে যথাক্রমে **আইসোট্রপিক** (Isotropic) বা I ব্যান্ড (এ ব্যান্ড অ্যাকটিন ফিলামেন্ট গঠন করে) এবং **অ্যানাইসোট্রপিক** (Anisotropic) বা A ব্যান্ড (এ ব্যান্ড মায়োসিন ফিলামেন্ট গঠন করে) বলা হয়। এসব দাগের কারণেই পেশিকে ডোরাকাটা বলে মনে হয়।

কাজ : উন্নত প্রাণীদের চলন প্রধানত এই পেশির মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। এ পেশি **দ্রুত** সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং **শক্তিশালী**। এ পেশি প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ঐচ্ছিক পেশির প্রকারভেদ : মানবদেহে অস্থি পেশির মোট ওজন দৈহিক ওজনের ৪০-৫০%। প্রত্যেক মানুষের দেহে প্রায় ৪৩৪টি পেশি গ্রুপ আছে। এসব পেশি গ্রুপের মধ্যে মোট পেশি তন্তু বা পেশি কোষের সংখ্যা প্রায় ২৫×১০^{৮} লাখ। মানবদেহের সবচেয়ে বড় পেশি পায়ের **সারটোরিয়াস** এবং সবচেয়ে ছোট পেশি **চক্ষুর সিলিয়ারি** এবং সর্বাধিক শক্তিশালী পেশি নিতম্বের **গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস**। **মানবদেহে ঐচ্ছিক পেশির সংখ্যা ৬৫৬টি**। এদের মধ্যে ৩২৭টি জোড় এবং ২টি বিজোড়। কার্যকারিতা অনুসারে ঐচ্ছিক পেশি বিভিন্ন প্রকার হয়। যথা–

১। **ফ্লেক্সর** (Flexor) : এ পেশি দেহের কোনো অংশকে অন্য কোনো অংশের উপর ভাঁজ হতে সাহায্য করে। যেমন: **বাইসেপস** (biceps) পেশির সংকোচনে কনুই ভাঁজ হয়।

2020/8/4 17:48

Scanned with CamScanner

২। **এক্সটেনসর** (Extensor) : এ পেশি ভাঁজ করা অংশকে পুনরায় সোজা হতে সাহায্য করে। যেমন: **ট্রাইসেপস** (triceps) পেশি সম্মুখ বাহুকে প্রসারিত করে।

৩। **অ্যাবডাক্টর** (Abductor) : এ পেশি দেহের কোনো অংশকে দেহাক্ষ থেকে দূরে সরে যেতে সাহায্য করে। যেমন: **ডেলটয়েড** (deltoid) পেশি হাতকে দেহ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

৪। **অ্যাডাক্টর** (Adductor) : এ পেশি দেহের কোনো অংশকে দেহাক্ষের কাছে আনতে সহায়তা করে। যেমন : **অ্যাডাক্টর লংগাস** (adductor longus) পেশি পা-কে দেহ অক্ষের দিকে নিয়ে আসে।

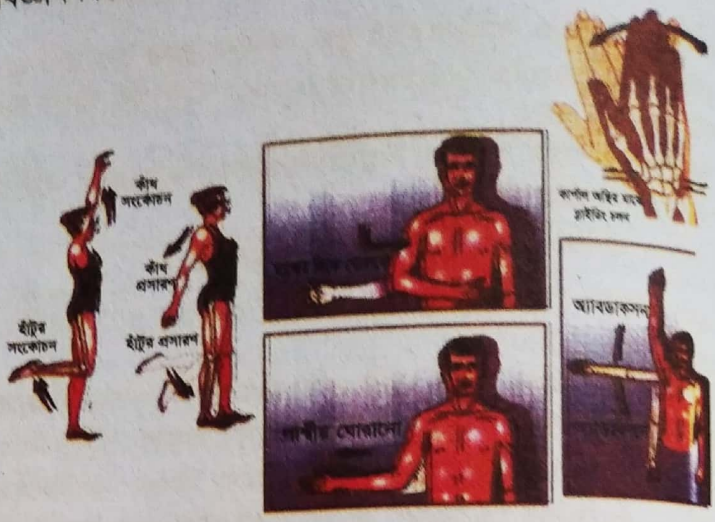

চিত্র ৭.২০ : ঐচ্ছিক পেশির বিভিন্ন কার্যকারিতা দেখানো হয়েছে

৫। **ডিপ্রেসর** (Depressor) : এ পেশি কোনো অংশকে নিচে নামাতে সাহায্য করে। যেমন : **ডিপ্রেসর ম্যান্ডিবুলার** (depressor mandibula) পেশি উত্তোলিত নিম্ন চোয়ালকে নিচে নামিয়ে মুখগহ্বরকে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে।

৬। **লিভেটর** (Levator) : এ পেশি দেহের কোনো অংশকে উপরে উঠতে সাহায্য করে। যেমন : **ম্যাসিয়েটর** (maseator) পেশি নিচের চোয়াল উপরে তুলে মুখ বন্ধ করতে সহায়তা করে।

৭। **রোটেটর** (Rotator) : এ পেশি দেহের কোনো অংশকে আবর্তিত হতে সাহায্য করে। যেমন : **পাইরিফরমিস** (pyriformis) নামক রোটেটর পেশি ফিমারকে আবর্তিত হতে সাহায্য করে। **অঙ্কদেশীয়** ঘূর্ণন সংক্রান্ত পেশিকে **প্রোনেটর** (pronator) এবং **পৃষ্ঠদেশীয়** ঘূর্ণন সংক্রান্ত পেশিকে **সুপিনেটর** (supinator) বলে।

৮। **প্রোট্রাক্টর** (Protractor) : এ পেশি অঙ্গকে সামনে প্রসারিত করতে সহায়তা করে। যেমন : কিছু পেশি ফিমারকে সামনে প্রসারিত করে।

৯। **রিট্রাক্টর** (Retractor) : এ ধরনের পেশি প্রোট্রাক্টরের বিপরীতে কাজ করে। যেমন : কিছু পেশি সামনে প্রসারিত ফিমারকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

বিভিন্ন ধরনের পেশিকলার মধ্যে তুলনা

তুলনীয় বিষয়	রৈখিক/ঐচ্ছিক পেশি	মসৃণ/অনৈচ্ছিক পেশি	হৃৎপেশি
১। অবস্থান	অস্থিসংলগ্ন, চোখ, জিহ্বার পেশি এবং উদরগাত্র প্রভৃতি।	পৌষ্টিকনালি, রক্তনালি, লসিকা নালি, শ্বাসনালি, রেচন-জনন নালি, গ্রন্থিনালি, চোখের সিলীয় পেশি, জরায়ু প্রভৃতির প্রাচীর।	শুধুমাত্র হৃৎপিণ্ড।
২। প্রকৃতি	ঐচ্ছিক।	অনৈচ্ছিক।	অনৈচ্ছিক।
৩। পেশিতন্তু	দীর্ঘ, নলাকার ও শাখা বিহীন।	মাকু আকৃতির ও শাখাবিহীন।	নলাকার ও শাখান্বিত।
৪। নিউক্লিয়াসের সংখ্যা ও অবস্থান	অসংখ্য ; পরিধির দিকে।	একটি ; স্ফীত কেন্দ্রে।	একটি বা দুটি; কেন্দ্রস্থলে।
৫। অনুপ্রস্থ রেখা	থাকে।	থাকে না।	অস্পষ্টভাবে থাকে।
৬। ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক	অনুপস্থিত।	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।
৭। সংকোচন ক্ষমতা	দ্রুত ও শক্তিশালী।	মন্থর ও দীর্ঘস্থায়ী।	পরিমিত ও ছন্দময়।
৮। সারকোপ্লাজম	স্বল্প পরিমাণ।	স্বল্প পরিমাণ।	যথেষ্ট পরিমাণ।
৯। অবসাদগ্রস্ততা	সহজেই অবসাদগ্রস্ত হয়।	সহজে অবসাদগ্রস্ত হয় না।	সাধারণত অবসাদগ্রস্ত হয় না।
১০। কাজ	অঙ্গ সঞ্চালন ঘটায়।	নালিতে বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।	হৃৎস্পন্দন ঘটায়।

2020/8/4 17:48

Scanned with CamScanner

৭.৪ পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না (Muscle can Pull but cannot Push)

পেশিতে বা পেশি কলায় বিভিন্ন ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান (যেমন– পেশিটান, উত্তেজনা, সংকোচনশীলতা, পরিবাহিতা, প্রসারণ ক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা, নিঃসাড় কাল, টিটেনাস, অবসাদ, মরণসংকোচ, ছন্দোবদ্ধতা প্রভৃতি)। পেশির বিভিন্ন ধর্মের কারণেই পেশিতে টান পড়ে, কিন্তু ধাক্কা পরিলক্ষিত হয় না। তবে প্রধানত ঐচ্ছিক পেশির বিভিন্ন ধর্মের কারণেই এরূপ ঘটনা লক্ষ করা যায়।



চিত্র ৭.২১ : ফ্লেক্সর (বাইসেপস) ও এক্সটেনসর (ট্রাইসেপস) পেশির কার্যকারিতা দেখানো হয়েছে

দেহে অস্থি পেশি সবসময় এক ধরনের টানটান অবস্থায় থাকে। ঐচ্ছিক পেশির এই টানটান ভাবকে **পেশিটান** (muscle tone or tonicity) বলা হয়। পেশিটানকে **প্রতিবর্তী ক্রিয়াজনিত** (reflex acition) আংশিক সংকোচনরূপে অভিহিত করা হয়। ব্যবচ্ছেদ করা পেশিতে কিংবা পেশির চেষ্টীয় স্নায়ুকে (motor nerve) ব্যবচ্ছেদ করলে পেশিটান বিনষ্ট হয়। পেশিটান সম্পন্ন পেশিতে কখনো **অবসাদ** (fatigue) লক্ষ করা যায় না। এর কারণ হলো টান উৎপাদনে (in tone production) সমগ্র পেশি একসঙ্গে সংকুচিত হয় না; পেশি তন্তুগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে সংকুচিত হয়। একটি পেশির কিছু সংখ্যক তন্তু যখন সংকুচিত হয় তখন বাকি অংশ প্রসারিত হয়। তাই সমগ্র পেশিতে কখনো অবসাদ (fatigue) পরিলক্ষিত হয় না।

অপর পক্ষে, মসৃণ পেশি সর্বদা হালকা টানে (in light tension) থাকে এবং ঐচ্ছিক পেশির মতো হৃৎপেশিতেও পেশিটান লক্ষ করা যায়। তবে হৃৎপেশির পেশিটানের ওপর স্নায়ুর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। একটি পেশি একটি অস্থির সাথে **কণ্ডরা** (tendon) দ্বারা আটকানো থাকে। পেশির সংকোচনের ফলে শরীরের নড়াচড়া হয় এবং এভাবে তারা কঙ্কালকে টেনে একটি **সন্ধিতে** (joint) ভাঁজ করতে পারে। পেশি টানতে পারে কিন্তু ধাক্কা দিতে পারে না।

সুতরাং একটি পেশি যখন একটি সন্ধিতে ভাঁজ হয় তখন সেই পেশি আবার সোজা হতে পারে না। অন্য একটি পেশি অর্থাৎ **অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশি** (antagonistic muscle) অপর দিক থেকে টেনে এই পেশিকে সোজা করার কাজটি করে। তাই কমপক্ষে দুটি পেশি একটি সন্ধিতে থাকে, যথা– **বাইসেপস** বা **ফ্লেক্সর পেশি** (flexor muscle)– সন্ধি ভাঁজ করে এবং অপরটি **ট্রাইসেপস** বা **এক্সটেনসর পেশি** (extensor muscles)-সন্ধিকে আবার সোজা করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

এছাড়াও **অ্যাকটিন** (actin) ও **মায়োসিন** (myosin) এ দু'ধরনের প্রোটিন থাকে বলে পেশি টানতে পারে। এসব প্রোটিন পেশিকোষের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। সংশ্লিষ্ট পেশির প্রতিটি কোষ মস্তিষ্কের কোনো অংশ থেকে সংকোচনের সংকেত পেলে মস্তিষ্কের অন্য অংশ থেকে পৃথক বৈদ্যুতিক উদ্দীপনাগুলোকে সমন্বিত করে 'টান' দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করে। হাড়কে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিতে বিপরীতধর্মী পেশিও সম্মিলিতভাবে একই কাজ করে অর্থাৎ টেনে সোজা করে দেয়। এ কারণেই বলা হয় যে **পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না।**

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্যে মসৃণ ও হৃৎপেশির কাঠামোর তুলনা পর্যবেক্ষণ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

2020/8/4 17:48

Scanned with CamScanner

৭.৫ কঙ্কালের কার্যক্রম ও 'রডস ও লিভার' তন্ত্র
(Functions of Skeleton and 'Rods and Lever' System)

মানবদেহের কঙ্কালের অস্থি ও পেশির আন্তঃক্রিয়ায় এক বিশেষ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়। দেহের অস্থি ও পেশির এরূপ আন্তঃক্রিয়া একটি সাধারণ যন্ত্রের সাথে তুলনা করা হয়। একে **লিভার** বলে। মানুষের মাথা নাড়ানো, হাঁটা, দৌড়ানো, হাত দিয়ে কোনো কিছু ধরা বা উত্তোলন করা ইত্যাদি কার্যক্রম এই লিভার তন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

প্রকৃতপক্ষে, লিভার হচ্ছে সরল যন্ত্র বিশেষ, যা বল বৃদ্ধি করে কাজ করাকে সহজ করে দেয়। লিভার ঠেকানোর জন্য কোনো বিন্দু বা রেখাকে স্পর্শ করে থাকে এবং এ বিন্দু বা রেখাকে কেন্দ্র করে লিভার ওঠানামা করে বা ঘোরে। একে **ফালক্রাম** (Fulcrum) বলে। লিভারের সাহায্যে যে ভারী বস্তুকে তোলা হয় তাকে **ভার** (Load) বলে এবং এই ভারকে তোলার জন্য অপর প্রান্তে **বল** (Effort) প্রয়োগ করা হয়। লিভারের ফালক্রাম থেকে ভার পর্যন্ত অংশকে **ভারবাহু** এবং ফালক্রাম থেকে প্রয়োগের স্থানকে **বলবাহু** বলে।

লিভারের মূলনীতি :

বল × বলবাহুর দৈর্ঘ্য = ভার × ভারবাহুর দৈর্ঘ্য বা, $\frac{\text{বলবাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ভারবাহুর দৈর্ঘ্য}} = \frac{\text{ভার}}{\text{বল}}$

সাধারণত কোনো যন্ত্র প্রযুক্ত বলকে যতগুণ পরিবর্তন করে তাই ওই যন্ত্রের যান্ত্রিক সুবিধা।

সুতরাং **লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা** $= \frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{বলবাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ভারবাহুর দৈর্ঘ্য}}$

যদি চিত্রানুযায়ী (চিত্র : ৭.২২.১) ২ নিউটন ভার, ১ নিউটন বল প্রয়োগে তোলা যায় তবে যান্ত্রিক সুবিধা হবে ২। যান্ত্রিক সুবিধা ১ থেকে বেশি, ১ এর সমান অথবা ১ থেকে কম হতে পারে। যদি বেশি বল দিয়ে কম ভার তোলা হয় তবে যান্ত্রিক সুবিধা ১ থেকে কম।

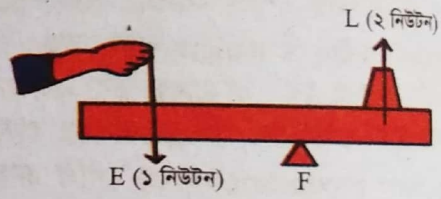

চিত্র ৭.২২.১ : লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা নির্ণয়

লিভারের গঠনগত উপাদান : লিভার ৪ প্রকার উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা–

১। একটি মজবুত **রডস/লিভারের বাহু** (Lever-arm),
২। একটি **ফালক্রাম** বা **পিভট** (Fulcrum/Pivot),
৩। একটি **বল** বা **প্রচেষ্টা** (Effort) ও
৪। একটি **ভার** বা **ভারী বস্তু** (Load)।

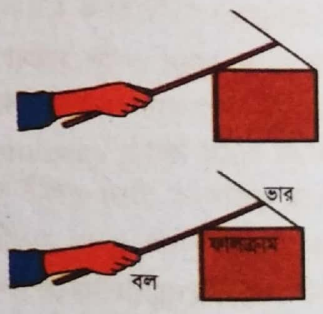

চিত্র ৭.২২.২ : লিভার এর সরল চিত্র

ধরে নাও যে, তুমি লোহার রড দিয়ে চিত্র ৭.২২.২-এর ন্যায় একটি বক্সের ঢাকনা খোলার চেষ্টা করছ। তুমি এখানে রডটি লিভারের মতো ব্যবহার করছ। লিভার হচ্ছে একটি **রড**, যেটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে (fixed point) কেন্দ্র করে ঘোরে। এই নির্দিষ্ট বিন্দুকে বলা হয় **ফালক্রাম**। চিত্র : ৭.২২.২ এ যে লিভারটি দেখানো হয়েছে, সেটির ভেতরে ফালক্রামের এক পাশে একটি **ভার** (ঢাকনা) আছে এবং অন্যপাশে তোমার হাত দিয়ে একটি **বল** বা শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাদের দেহেও কিছু অস্থি লিভারের মতো কাজ করে।

লিভার বাহু একটি শক্ত অনমনীয় দণ্ড, যা একটি **নির্ভর বিন্দু** বা **ফালক্রামের** বা **পিভটের** উপর অবস্থান করে। মানবদেহে লম্বা অস্থিগুলো লিভারের (রডস) কাজ করলে অস্থিসন্ধিগুলো লিভারের মাঝে **ফালক্রাম** বা পিভটের (fulcrum/pivot) কাজ করে। গতি অর্জনের জন্য লিভারের যে বিন্দুতে শক্তি প্রয়োগ করা হয় তাকে **বল** বা **প্রচেষ্টা** (effort) বলে এবং লিভারের বিপরীত একটি বিন্দুতে প্রচেষ্টা প্রশমিত হয় অর্থাৎ লিভারের চলন বাধাগ্রস্ত হয় তাকে **ভার** (load) বা **প্রতিবন্ধক** (resistance) বলে। যেমন– পেশির সংকোচন হচ্ছে প্রচেষ্টা আর এতে সংশ্লিষ্ট দেহের অংশটি হচ্ছে ভার বা বাধা। সুতরাং লিভারের সঞ্চালনের ক্ষেত্রে **ফালক্রাম** বা **পিভট** অবস্থান, **বল** বা **প্রচেষ্টা** এবং **ভার** বা **ওজন** এই তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়েই মানবদেহের রডস ও লিভার তন্ত্রের কার্যক্রম সংঘটিত হয়।

2020/8/4 17:48
Scanned with CamScanner

লিভারের প্রকারভেদ

ফালক্রাম (F), **বল** (E) ও **ভারের** (L) অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে মানব কঙ্কালে তিন ধরনের বা তিন শ্রেণির লিভার লক্ষ করা যায়। যথা–

(ক) প্রথম শ্রেণির লিভার (first class lever) : যে লিভারে ফালক্রাম, বল ও ভারের মাঝে থাকে (চিত্র-৭.২২.৩ক) তাকে প্রথম শ্রেণির লিভার বলে। যেমন– মাথা ও ঘাড়ের সংযোগস্থলের অস্থি (কাঁচি ও খুনতি বা শাবল ইত্যাদি)। করোটি ও অ্যাটলাস সঞ্চালন প্রথম শ্রেণির লিভারের মতো কাজ করে। এক্ষেত্রে করোটি হচ্ছে লিভার বাহু; করোটি ও অ্যাটলাসের মধ্যকার সন্ধিটি পিভট; মাথার পেছনে অবস্থিত পেশি থেকে আসার পেশল ক্রিয়া হচ্ছে বল এবং ভার হচ্ছে মাথার ওজন যা বলের কর্মকাণ্ডে উঁচু হয়ে থাকে (ওজনের বিরুদ্ধে)। এ লিভারের কারণে আমরা মাথাকে সামনে ও পেছনে উঁচু-নিচু করতে পারি। **এ ধরনের লিভারের মাধ্যমে অল্প বল প্রয়োগে বেশি ফল পাওয়া যায়।**

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার (second class lever) : যে লিভারে ফালক্রাম ও বলের মাঝে ভার থাকে (চিত্র-৭.২২.৩খ) তাকে দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার বলে। যেমন– পায়ের গোড়ালিতে অবস্থিত অস্থি (ঠেলাগাড়ি, এক চাকার গাড়ি ইত্যাদি)। পায়ের আঙ্গুলের ডগায় দাঁড়ালে দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার সৃষ্টি হয়। তখন আঙ্গুলের সন্ধিগুলো হয় পিভট; দুইপা লিভার বাহু; কাফ পেশি ও গোড়ালির টেনডন প্রচেষ্টা এবং দেহের ওজন হচ্ছে ভার। এ লিভারের কারণে আমরা দ্রুত দৌড়াতে পারি। **এ ধরনের লিভারের মাধ্যমে সামান্য প্রচেষ্টায় বেশি ওজনকে উপরে তুলে ধরা সহজ হয়।**

(গ) তৃতীয় শ্রেণির লিভার (third class lever) : যে লিভারে ফালক্রাম ও ভারের মাঝে বল থাকে (চিত্র-৭.২২.৩গ) তাকে তৃতীয় শ্রেণির লিভার বলে। যেমন– হাতের কনুইয়ে অবস্থিত অস্থি (নেল কাটার, ফরসেফ বা চিমটা ইত্যাদি)। মানবদেহে এ শ্রেণির লিভার অনেক। একটি ভাঁজ করা বাহু হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণির লিভার। এক্ষেত্রে কনুই সন্ধি হচ্ছে পিভট; সম্মুখ বাহু হলো লিভার বাহু; বাইসেপস পেশি হচ্ছে প্রচেষ্টা; সম্মুখ বাহু কিংবা কোনো ওজনদার বস্তুসহ সম্মুখ বাহু হচ্ছে ভার। এ লিভারের কারণে আমরা অল্প শক্তি ব্যয় করে অধিক ভার উত্তোলন করতে পারি। **এ ধরনের লিভার থেকে দ্রুতগতির সঞ্চালন সুবিধা পাওয়া যায়।**

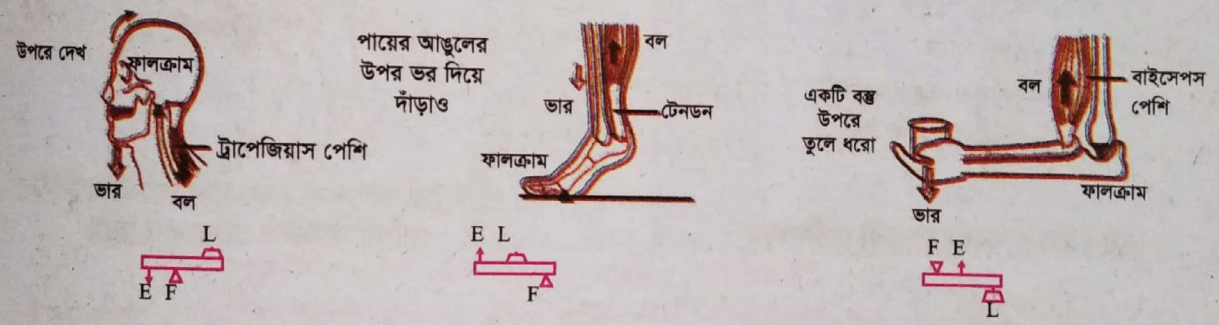

চিত্র ৭.২২.৩ : মানব কঙ্কালের তিন শ্রেণির লিভার

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রে রয়েছে উপরোক্ত তিন প্রকারের লিভারের ক্রিয়া পদ্ধতি ও লিভার অস্থির বিন্যাস। তাই পরিশেষে বলা যায়, মানবদেহের কঙ্কাল, রড ও লিভার তন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যাদি সম্পন্ন করে।

৭.৬ হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয়
(Coordination of Bone and Muscle in Knee movement)

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের জন্য এবং গমনের জন্য পেশি ও কঙ্কালতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূলত খাদ্য গ্রহণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন ও পরিবেশের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিতে প্রাণীরা স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ চলন সম্পন্ন করে। যেসব পেশি কঙ্কালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তাদের কঙ্কাল পেশি বলে। কঙ্কাল পেশি ঐচ্ছিক ধরনের হওয়ায় এরা দেহকে বা দেহের কোনো উপাঙ্গকে ইচ্ছামতো সঞ্চালিত করতে পারে। **কণ্ডরা** বা **টেনডন** (tendon) এর সাহায্যে পেশি অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। কোনো অঙ্গকে সঞ্চালিত করা বা স্থানান্তরে নেওয়া **পেশি-কঙ্কালতন্ত্র** (musculo-skeletal system) এর পারস্পরিক ছন্দবদ্ধ ক্রিয়াকলাপেই সম্পন্ন হয়। মানুষের মস্তিষ্কের **সেরিবেলাম** ঐচ্ছিক চলন নিয়ন্ত্রণ করে। এই তন্ত্র অস্থি, পেশি, টেনডন এবং লিগামেন্ট নিয়ে গঠিত। হাঁটু বা জানু (knee) মূলত একটি **কব্জা সংযুক্তি** (hing joint)। হাঁটুসন্ধি (knee joint)-র উপরের অস্থিগুলো **ফিমার** ও নিচের অস্থি হলো **টিবিওফিবুলা**।

2020/8/4 17:49
Scanned with CamScanner

হাঁটুসন্ধিতে ফিমার ও টিবিওফিবুলার সংযোগস্থলে প্যাটেলা নামক ত্রিকোণাকার অস্থি কণ্ডাইলার অস্থিসন্ধির মাধ্যমে মজবুতভাবে আটকানো থাকে। হাত, পা ইত্যাদি সঞ্চালনের জন্য অর্থাৎ ওঠানামার জন্য জোড়া জোড়া পেশি কাজ করে। জোড়া পেশির কার্যক্রমের সমন্বয়ে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়। একজোড়া পেশি যা একই সন্ধিতে অবস্থিত কিন্তু একে অপরের বিপরীত অভিমুখে চলন ঘটায় সেই পেশিকে **অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশি** (antagonistic muscle) বলে। উরুর অস্থি (ফিমার) সংলগ্ন পিছনে ও সামনে দু'ধরনের পেশি থাকে। এরা অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশির উদাহরণ। এদের সংকোচন (contraction) ও প্রসারণ বা শ্লথনের (relaxation) দ্বারা হাঁটু ভাঁজ হয় ও প্রসারিত হয়। উরুর পেছনে থাকে **বাইসেপস ফিমোরিস বা হ্যামস্ট্রিং পেশি** ও উরুর সামনে থাকে **কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস পেশি**। এ পেশিদ্বয় যথাক্রমে **ফ্লেক্সর** (flexor) ও **এক্সটেনসর** (extensor) পেশির কাজ করে। একই অঙ্গ সঞ্চালনকারী এরকম দুটি পেশিকে **প্রতিপক্ষীয় পেশি জোড় বা অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশি জোড়** (antagonistic muscle partner) বলা হয়।

হ্যামস্ট্রিং পেশি (Hamstring muscle) : এই পেশি শ্রোণিচক্রের ইশ্চিয়াম অংশে উৎপন্ন হয়ে ফিমারের পিছন দিয়ে টিবিয়ার উপরে যুক্ত থাকে। এর সংকোচনে ফিমার ও টিবিয়া পিছন দিকে কাছাকাছি আসে ও হাঁটুতে ভাঁজ হয়।

কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস পেশি (Quadriceps femoris muscle) : এটি শ্রোণিচক্র ও ফিমারের শীর্ষ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্যাটেলার টেনডনের মাধ্যমে টিবিয়ার সামনে যুক্ত থাকে। এই পেশির সংকোচনে হাঁটুসন্ধির প্রসারণ ঘটে।

এই দুই পেশি পর্যায়ক্রমিক বিপরীতভাবে কাজ (antagonistic) করে অর্থাৎ একটি সংকোচিত হলে অন্যটির শ্লথন ঘটে। এভাবে হাঁটু সঞ্চালিত হয়ে চলনে সাহায্য করে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পেশির **মোটর নিউরনের** স্নায়ু প্রণোদনার মাধ্যমে ঘটে এবং **প্রতিবর্তী ক্রিয়া** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।



(ক) চলনে অংশগ্রহণকারী পেশিসমূহ



(খ) হাঁটুর সঞ্চালনে একজোড়া অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশির কার্যক্রম দেখানো হয়েছে

চিত্র ৭.২৩ : হাঁটু সঞ্চালনে ও চলনে অংশগ্রহণকারী প্রধান পেশিসমূহ

দেহের বিভিন্ন অবস্থানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপক্ষীয় পেশি জোড় বা অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশি জোড়

দেহের অবস্থান	অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশি জোড়
বাহু	বাইসেপস ও ট্রাইসেপস
স্কন্ধ-বক্ষ	ডেল্টয়েড পেশি ও পেকটোরালিস মেজর
উদর-পিঠ	রেকটাস অ্যাবডোমিনিস ও ইরেকটাস স্পাইনি
উরু	কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস ও বাইসেপস ফিমোরিস
হাঁটু	টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র ও সোলিয়াস মাসলস

❑ **কাজ :** (i) কঙ্কালতন্ত্র ও পেশিতন্ত্রের সমন্বিত কার্যক্রমেই দেহ সঞ্চালিত হয়– বিশ্লেষণ কর। (ii) বিশেষ ধরনের কতকগুলো পেশি ফিমারের সঞ্চালনে সাহায্য করে– বাক্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৭.৭ অস্থিভঙ্গ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা (Fractures of Bone and First aid)

আকস্মিক কোনো কিছুর চাপে বা আঘাতের কারণে কিংবা রোগের কারণে দেহের কোনো অস্থি বা হাড় (bone) ভেঙে গেলে বা অস্থিতে ফাটল ধরলে তাকে বলা হয় **অস্থিভঙ্গ বা হাড় ভাঙা** (fractures of bone)। সংক্ষেপে, যেকোনো কারণে হাড় ফেটে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়াই হলো অস্থিভঙ্গ বা **ফ্র্যাকচার**। চিকিৎসকেরা একে **FRX** বা **Fx** সংকেত দ্বারা প্রকাশ করেন।

প্রচণ্ড শক্তি, চাপ কিংবা অসুখে (অস্টিওপোরোসিস, অস্থি ক্যান্সার, মেটাস্টাসিস ইত্যাদি) ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ায় অস্থিভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়। নানা কারণে অস্থি ভাঙতে বা ফ্র্যাকচার হতে পারে। যেমনঃ সড়ক দুর্ঘটনা অর্থাৎ যানবাহনের ধাক্কা, উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া, উপর থেকে কোনো অঙ্গের ওপর ভারী কিছু পড়া, খেলাজনিত আঘাতের কারণে বা অন্য যেকোনোভাবে প্রচণ্ড আঘাতের ফলে অস্থি বা হাড় ভেঙে যায়। ফ্র্যাকচারের পর হাড় বা অস্থি ত্বক ফুঁড়ে বাইরে

2020/8/4 17:49
Scanned with CamScanner

বেরিয়ে আসতে পারে। তবে ত্বক ফুঁড়ে না বেরিয়েও ত্বকের অভ্যন্তরে হাড় ভাঙতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে ফ্র্যাকচারের পর হাড় ত্বক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে সেসব ক্ষেত্রে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই বেশি। ফ্র্যাকচার সাধারণত মাথার খুলি (skull), নিম্ন চোয়াল (lower jaw), মেরুদণ্ডের সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord), পাঁজর বা পশুর্কা (rib), কণ্ঠাস্থি (clavicle), কাঁধের অস্থি (scapula), উর্ধ্ববাহু (arm), অগ্রবাহু (fore arm), উরুর অস্থি (femur), হাঁটু (knee), অগ্রপদ (fore leg), পায়ের পাতা (foot) ইত্যাদি অঙ্গে দেখা যায়।

অস্থিভঙ্গের প্রকারভেদ (Types of fracture of bone) : অস্থি বা হাড় ভাঙার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অস্থিভঙ্গকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়–

১। **সাধারণ অস্থিভঙ্গ (Simple fracture) :** যে ধরনের অস্থিভঙ্গে অস্থি চামড়া ভেদ করে বের হয় না তাকে সাধারণ অস্থিভঙ্গ বলে। শুধু একটি অস্থি বা হাড় ভাঙার কারণে এ ধরনের অস্থিভঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। অস্থিভঙ্গের ফলে কেবল ভেতরের ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তার আশপাশের টিস্যু কিংবা চামড়ার ক্ষতি হয় না (চিত্র-৭.২৪.১ : ক, খ, গ ও ঘ)। একে **অভ্যন্তরীণ বা বদ্ধ অস্থিভঙ্গও** (closed fracture) বলা হয়।

২। **যৌগিক অস্থিভঙ্গ (Compound fracture) :** অস্থিভঙ্গ বা হাড় ভাঙার ফলে ভাঙা হাড়ের প্রান্ত সেখানকার ত্বক ভেদ করে বেরিয়ে আসে (চিত্র-৭.২৪.১ ঙ ও চ)। একে **মুক্ত অস্থিভঙ্গও** (open fracture) বলা হয়। এক্ষেত্রে ভাঙা স্থান দিয়ে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই বেশি থাকে।

৩। **জটিল অস্থিভঙ্গ (Complex fracture) :** প্রচণ্ড আঘাতজনিত কারণে এ ধরনের অস্থিভঙ্গ হয়ে থাকে। একে **চাপা অস্থিভঙ্গও** (compression fracture) বলা হয়। জটিল অস্থিভঙ্গের ফলে বেশ কয়েকটি হাড়, অস্থিসন্ধি, টেনডন ও লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভাঙা হাড়ের বা অস্থির প্রান্ত, নিকটস্থ কোনো দেহযন্ত্র (organ) যথা– যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, ফুসফুস বা কোনো রক্তনালিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং নরম পেশিসমূহ (soft muscles) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, একই সাথে প্রচুর রক্তক্ষরণও হতে পারে।

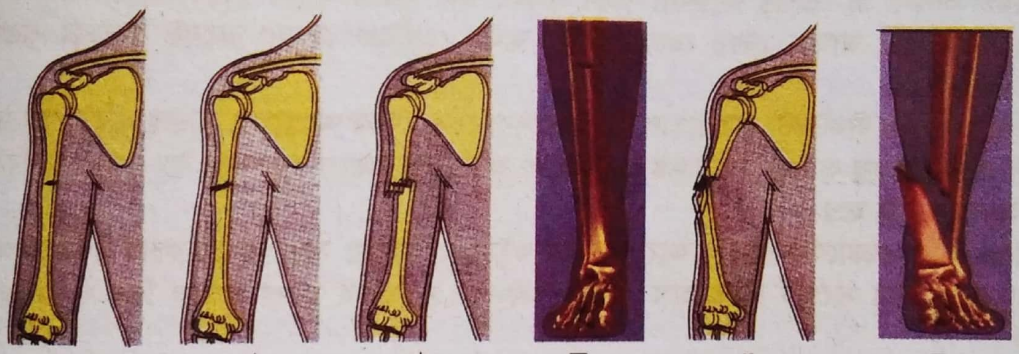

চিত্র ৭.২৪.১ : বিভিন্ন ধরনের অস্থিভঙ্গ– সাধারণ অস্থিভঙ্গ (ক, খ, গ ও ঘ) এবং যৌগিক অস্থিভঙ্গ (ঙ ও চ)

উপরোক্ত অস্থিভঙ্গ ছাড়াও আরও কয়েক প্রকার অস্থিভঙ্গ আছে। যথা–

(ক) **কমিনিউটেড (Comminuted) :** যেখানে হাড় ভেঙে গিয়ে কয়েক খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে (চিত্র-৭.২৪.২ ক ও খ)।

(খ) **ইমপ্যাকটেড (Impacted) :** এ ধরনের অস্থিভঙ্গে ভাঙা হাড়ের প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে পড়ে (চিত্র-৭.২৪.২ গ)।

(গ) **গ্রিনস্টিক (Green stick) :** শিশুদের এ ধরনের অস্থিভঙ্গ দেখা যায়, বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে হাড় না ভেঙে কেবল হাড়ে ফাটল বা চির দেখা যায় (চিত্র-৭.২৪.২ ঘ ও ঙ)। কচি নিম ডাল খানিকটা দুমড়ে ছেড়ে দিলে যেমন হয়।

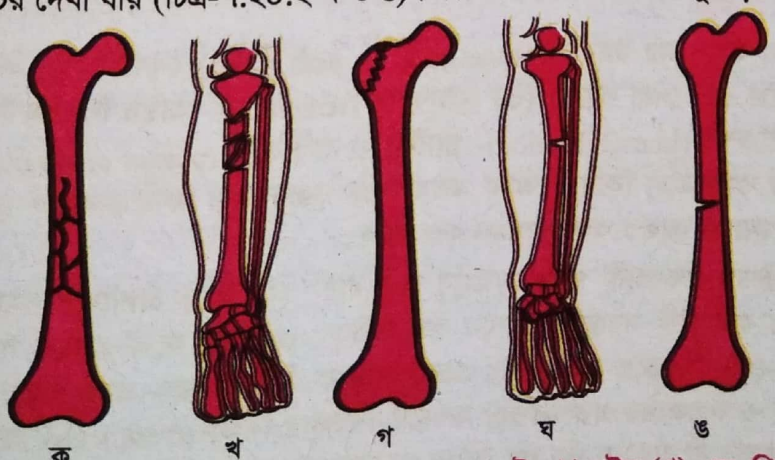

চিত্র ৭.২৪.২ : বিভিন্ন ধরনের অস্থিভঙ্গ– কমিনিউটেড (ক ও খ), ইমপ্যাকটেড (গ) এবং গ্রিনস্টিক (ঘ ও ঙ)

2020/8/4 17:49

Scanned with CamScanner

অস্থিভঙ্গের লক্ষণ বা উপসর্গ (Symptoms of fractures of bone)

(১) ক্ষতস্থানে বা ইনজুরির জায়গায় ব্যথা হয়। (২) ইনজুরির জায়গা বা ক্ষতস্থান ফোলা থাকে। (৩) টেন্ডারনেস বা টাটানো থাকে। (৪) অনুভূতি হারিয়ে যেতে পারে। (৫) অঙ্গ বিকল হতে পারে বা নড়াচড়ায় অসুবিধা হতে পারে। (৬) শক হতে পারে। (৭) হাত, পা কিংবা অস্থিসন্ধি বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

অস্থিভঙ্গের নিম্ন বর্ণিত অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োজন :

(১) রোগী অচেতন (unresponsive) অথবা অজ্ঞান (unconscious) হয়ে পড়লে। (২) ব্যাপক রক্তপাত (bleeding) হলে। (৩) ভগ্ন অস্থি দেহ ভেদ করে বাইরে উদগত হলে অথবা ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হলে। (৪) হাত, পা অথবা তাদের সন্ধির আকার পরিবর্তন (deformed) হলে। (৫) হাত-পা অসাড় (numbness) হয়ে পড়লে অথবা নীলাভ বা কালো বর্ণ ধারণ করলে।

প্রাথমিক চিকিৎসা (First aid in Fracture of Bones) : যেকোনো কারণে মানুষের হঠাৎ কোনো অসুস্থতায় তাকে সুস্থ রাখার জন্য ডাক্তারের (চিকিৎসকের) নিকট পৌঁছে চিকিৎসা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অসুস্থ মানুষটির জীবন বাঁচানোর জন্য তাকে প্রাথমিকভাবে যেসব জরুরি চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় সেগুলোকে প্রাথমিক চিকিৎসা বা তাৎক্ষণিক চিকিৎসা বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য প্রতিবিধান বলে।

যেমন : গাছ থেকে পড়ে হাড় ভাঙা, পানিতে ডোবা, বিষ খাওয়া, অনেকক্ষণ রোদে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়া ইত্যাদি।

অস্থি বা **হাড় ভেঙে** গেলে বা **ফ্র্যাকচার** হলে জরুরি ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো নিতে হবে–

১। যত দ্রুত সম্ভব যার আঘাত লেগেছে বা ফ্র্যাকচার হয়েছে তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যতটা নিরাপদে সম্ভব।

২। আহত ব্যক্তির বা রোগীর চিকিৎসা সাথে সাথেই শুরু করতে হবে। কারণ ঘটনার স্থান থেকে রোগীকে সরানোর মুহূর্তেই তার আঘাত বেড়ে যেতে পারে। অর্থাৎ রোগীকে কোনো ক্রমেই নড়াচড়া করানো যাবে না (immobilization)।

৩। টেলিফোন করে নিকটবর্তী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে অ্যাম্বুলেন্স আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। যদি রক্তক্ষরণ হয় বা শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তাহলে অন্য কিছুর আগে রক্তক্ষরণ বন্ধ এবং স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিশ্চিতের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। আহত ব্যক্তি যেভাবে স্বস্তিবোধ করে সেভাবে শুইয়ে বা বসিয়ে ভাঙা বা ফ্র্যাকচার হওয়া অঙ্গ নরম বালিশ বা লেপ বা কম্বল দিয়ে সাপোর্ট দিতে হবে। অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ ফ্র্যাকচার হওয়া অঙ্গকে স্থির বা সোজা রাখার চেষ্টা করতে হবে।

৬। চাপ প্রয়োগ করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বরফ ব্যবহার করতে হবে।

৭। প্রয়োজন হলে ফ্র্যাকচার হওয়া অংশ **ব্যান্ডেজ** বা **স্প্লিন্ট** বেঁধে (কাঠের লম্বা টুকরা, বাঁশের চটা ইত্যাদি) দিতে হবে।

৮। ব্যথা কমানোর জন্য রোগীকে Aspirin or Diclofenac ট্যাবলেট ভরা পেটে দিতে হয়।

৯। যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে মেডিকেল সাহায্যের জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

চিকিৎসা (Medical Treatments)

প্রতিকার : (১) ব্যথা উপশমের ট্যাবলেট (analgesic or pain killer) সেবন। (২) শিরাপথে স্যালাইন অথবা ব্যাপক রক্তপাতের ক্ষেত্রে রক্ত নেয়া যাবে। (৩) রিডাকশন (reduction)- অস্থির লিগামেন্টকে নির্দিষ্ট স্থানে আনতে হবে। (৪) ইমমোবিলাইজেশন (immobilisation)- প্লাস্টার বা সার্জিক্যাল (plaster or surgical) উপায়ে সম্পন্ন করতে হবে। (৫) হাত-পায়ের কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনা অথবা বৃদ্ধি করার জন্য ফিজিওথেরাপি (physiotherapy) দেওয়া যাবে। (৬) প্রয়োজনে অন্যান্য আহত অঙ্গ পুনর্গঠন করা যাবে।

প্রতিরোধ : (১) অস্থিভঙ্গ রক্ষাকারী প্যাড ব্যবহার করা যায়। (২) গাড়ি চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার করা হয়। (৩) খেলার সময় রক্ষাকারী সরঞ্জাম পরিধান করা উচিত। এগুলোর মধ্যে এলবো প্যাড, নি প্যাড, শিনপ্যাড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। (৪) শিশুদের চলাফেরার জন্য বাড়িকে নিরাপদকরণ এবং দরজা ও জানালা বন্ধ রাখা। (৫) নিজেদের নিরাপদ ও নিজেদের যত্ন নেওয়া সম্পর্কে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া। (৬) ছেলেমেয়েদের যত্নসহকারে তত্ত্বাবধান করা। (৭) চেয়ার বা অন্যান্য উঁচু বস্তু থেকে পড়া যাওয়া বন্ধ করুন।

2020/8/4 17:49

Scanned with CamScanner

৭.৮ সন্ধির আঘাত এবং প্রাথমিক চিকিৎসা (Injury of joint and First aid)

অস্থিভঙ্গের ন্যায় বিভিন্ন কারণে আমাদের অস্থিসন্ধিতে (bone joint) আঘাত লাগতে পারে। আর এই সন্ধির আঘাতের ফলে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই সাথে সাথেই প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। সন্ধির আঘাতের ফলে প্রধানত নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়–



চিত্র ৭.২৫ : কাঁধের অস্থির স্থানচ্যুতি

স্থানচ্যুতি বা সন্ধিচ্যুতি (Dislocation)

একটি অস্থি (bone) অপর একটি অস্থির সঙ্গে যে স্থানে মিলিত হয় সে স্থানই হলো অস্থিদ্বয়ের সন্ধি স্থান। আর এই সন্ধি স্থান থেকে কোনো অস্থি যদি সরে যায় তখন তাকে **স্থানচ্যুতি** বা **সন্ধিচ্যুতি** বা লাক্সেশন (dislocation or luxation) বলা হয়। American Red Cross প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী বলা যায়, A dislocation is the movement of a bone at a joint away from its normal position.

সাধারণত কাঁধ, কনুই, কব্জি, বৃদ্ধাঙ্গুল, নিম্নচোয়াল, হাঁটু ইত্যাদি অঙ্গে সন্ধিচ্যুতি হতে দেখা যায়।

প্রকারভেদ : প্রধানত চার ধরনের অস্থির স্থানচ্যুতি ঘটে, যেমন–

১। **জন্মগত চ্যুতি** (Congential dislocation) : জন্মের সময় অস্থিচ্যুতি নিয়ে শিশু ভূমিষ্ট হলে জন্মগত চ্যুতি ঘটে।

২। **আঘাতজনিত চ্যুতি** (Traumatic dislocation) : দুর্ঘটনার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে। সাধারণত কাঁধ, কনুই, হাঁটু বা নিতম্বের সন্ধিতে এ ধরনের অস্থিচ্যুতি ঘটে।

৩। **রোগজনিত চ্যুতি** (Pathological dislocation) : কিছু রোগের কারণে অনেক সময় অস্থিচ্যুতি ঘটে। নিতম্বের সন্ধিতে এ ধরনের অস্থিচ্যুতি ঘটে।

৪। **বাতব্যাধিগ্রস্ত চ্যুতি** (Paralytic dislocation) : বাতব্যাধির কারণে পেশির ভারসাম্য হারালে নিতম্বের সন্ধিতে অস্থিচ্যুতি ঘটে।

সন্ধিচ্যুতির লক্ষণ বা উপসর্গ (Symptoms of dislocation)

(১) সন্ধিস্থলে ভীষণ ব্যথা অনুভূত হয়। (২) সন্ধিচ্যুত অঙ্গ নড়াচড়া করা যায় না। (৩) সন্ধিস্থলে অঙ্গের বিকৃতি ঘটে। (৪) স্থানচ্যুতি স্থান এবং তার আশপাশের স্থান বেশ ফুলে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা (First aid)

সকল স্থানের সন্ধিচ্যুতির বা **স্থানচ্যুতির** (dislocation) তাৎক্ষণিক চিকিৎসা এক নয়। তবে স্থান বিশেষে প্রাথমিক চিকিৎসা কিছুটা ভিন্ন হলেও নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো প্রায় সকল ক্ষেত্রে একই রকম হয়ে থাকে–

১। সন্ধিচ্যুতি হলে অযথা টানাটানি করে অস্থিটি স্বস্থানে বসানোর চেষ্টা না করে রোগী যেভাবে আরামবোধ করে সেই উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

২। **ফোলা** (swelling) কমানোর জন্য সন্ধিচ্যুত স্থানে বরফ ব্যবহার করতে হবে।

৩। সন্ধিচ্যুতির ফলে যদি ত্বকে ক্ষতের (skin lesions) সৃষ্টি হয় তাহলে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে **জীবাণুমুক্ত** (sterile) ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

৪। কাঁধ বা কনুইসন্ধিতে স্থানচ্যুতি হলে বন্ধফলক (ভাঙা হাড় যথাস্থানে বসানোর জন্য কাঠের খণ্ড বেঁধে দেওয়া) বেঁধে রাখতে হবে যাতে হাড় আরও সরে না যায়।

৫। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

চিকিৎসা (Medical Treatments)

(১) ব্যথা উপশমের জন্য ভরা পেটে ব্যথানাশক ওষুধ সেবন। (২) রিডাকসন– স্থানচ্যুত সন্ধি জোড়া লাগানো। (৩) ব্যান্ডেজ দ্বারা ক্ষতস্থানকে স্থির রাখা। (৪) প্রয়োজনে শল্য চিকিৎসা গ্রহণ। (৫) সন্ধিকে সচল রাখার জন্য ফিজিওথেরাপি গ্রহণ।

2020/8/4 17:49

Scanned with CamScanner

মচকানো (Sprain)

আমাদের দেহে অনেকগুলো **অস্থিসন্ধি** বা জয়েন্ট (joint) আছে। প্রত্যেকটি অস্থিসন্ধিতে থাকে একাধিক সংখ্যক **অস্থিবন্ধনী** বা **লিগামেন্ট** (ligament)। এই লিগামেন্টের কাজ হলো জয়েন্টের হাড়গুলোকে যথাস্থানে রাখা এবং নড়াচড়ায় সাহায্য করা। জয়েন্টের এই লিগামেন্টগুলো যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ টান পড়ে বা ছিঁড়ে যায় তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে সাধারণত **মচকানো** বলা হয়। অস্থি বা হাড়ে ঝাঁকুনি লাগলে বা মুচড়ে গেলে সে স্থানের **অস্থিবন্ধনী** (ligament) ও এর চারদিকের তন্তুগুলো (fibrils) ছিঁড়ে যায় বলে খুব কষ্টদায়ক হয়। আর এ অবস্থাকেই **মচকানো** (sprain) বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, লিগামেন্টের ইনজুরিই হলো মচকানো।

হাঁটা বা দৌড়ানো এবং ব্যায়াম বা খেলাধুলা করার সময় মাঝে মাঝে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ [পায়ের গোড়ালি (ankle), কব্জি (wrist) এবং অন্যান্য অস্থিসন্ধি] বেকায়দায় পড়ার কারণে অস্থিসন্ধির লিগামেন্টের অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। তবে অন্যান্য জয়েন্টের তুলনায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় পায়ের **গোড়ালি** (ankle)।

লক্ষণ বা উপসর্গ (Symptoms)

(১) জয়েন্টের নড়াচড়ায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। (২) জয়েন্ট ফুলে যায় এবং কিছুক্ষণ পর ত্বকের রং পরিবর্তিত হয়। (৩) আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো এবং নড়াচড়া করা অসম্ভব বা কঠিন হয়ে পড়ে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

(১) বাহ্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মচকানো নির্ণয় করা যায়। (২) X-ray এর মাধ্যমে মচকানো স্থানে অস্থিভঙ্গ নির্ণয় করা। (৩) লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেলে MRI (Magnetic Resonance Imaging) বা আর্থ্রোস্কোপির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা (First aid)

(১) ব্যথা উপশমের ট্যাবলেট (analgesic or pain killer) সেবন। (২) মচকানো সন্ধিকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। (৩) মচকে গেলে তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা পানি বা বরফ কুঁচি দিয়ে আক্রান্ত স্থানে চেপে ধরতে হবে। (৪) আক্রান্ত স্থান (যেমন– গোড়ালি, কব্জি ইত্যাদি) তুলে ধরতে হবে। (৫) প্রচণ্ড ব্যথা হলে শক্ত করে সে স্থানটিতে ব্যান্ডেজ বেঁধে ঠাণ্ডা পানি বা বরফ পানিতে ডুবিয়ে বা ভিজিয়ে রাখতে হবে। (৬) ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার পরও যদি ব্যথা না কমে তখন সেঁক দিতে হবে। (৭) আঘাত বা মচকানো গুরুতর হলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

তবে মচকানো ঘটনাটি গুরুতর হলে চারটি কাজ গুরুত্বের সাথে করতে হবে। যথা–

R– Rest (বিশ্রাম) : রোগীকে বিশ্রামে রাখা। সাবধানে হাঁটাচলা করা।

I– Ice (বরফ) : মচকানোর সাথে সাথে বরফ দেওয়া। তবে বরফ সরাসরি ক্ষতস্থানে না লাগিয়ে কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে লাগাতে হবে। একাধারে দিনে ৩-৪ বার ১০-১৫ মিনিট করে বরফ লাগাতে হবে।

C– Compression (ক্ষত পরিষ্কার) : ক্ষতস্থান পরিষ্কার রাখা এবং সন্ধি সঠিক স্থানে থাকে এমন করে ব্যান্ডেজ করা।

E– Elevation (উচ্চতায় রাখা) : দেহের অন্যান্য অংশ থেকে মচকানো সন্ধিটি সামান্য উঁচুতে রাখা। ফলে ফোলা কিছুটা কমে যাবে।

উপরের চারটি কাজ **RICE** নামে প্রচলিত। সকলেরই এ কাজগুলো সম্পর্কে জানা উচিত।

❑ **কাজ :** (i) আঘাতপ্রাপ্ত পা ফুলা ও ব্যথার কারণ ব্যাখ্যা কর। (ii) পা ফুলে ব্যথা সৃষ্টি হওয়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও। (iii) আঘাতপ্রাপ্ত পায়ের গোড়ালি ফুলে গেলে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়– ব্যাখ্যা কর।

টেনডন ও লিগামেন্টের মধ্যে পার্থক্য

টেনডন (Tendon)	লিগামেন্ট (Ligament)
১। এটি এক প্রকার শ্বেত তন্তুময় যোজক কলা।	১। এটি এক প্রকার পীত তন্তুময় যোজক কলা।
২। এটি দৃঢ়, অস্থিতিস্থাপক ও উচ্চ টানসহনশীল।	২। এটি শক্তিশালী কিন্তু স্থিতিস্থাপক।
৩। কোলাজেন সমৃদ্ধ শ্বেততন্তু দ্বারা গঠিত।	৩। ইলাস্টিন সমৃদ্ধ পীততন্তু দ্বারা গঠিত।
৪। এতে ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত।	৪। এতে ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ বিক্ষিপ্তভাবে সজ্জিত।
৫। এটি কঙ্কাল পেশিকে অস্থির সাথে যুক্ত করে।	৫। এটি একটি অস্থিকে অপর অস্থির সাথে যুক্ত করে। অর্থাৎ দুটি অস্থিকে সংযুক্ত করে।
৬। অবস্থান- পেশি প্রান্তে।	৬। অবস্থান- অস্থিসন্ধিতে।

2020/8/4 17:49

Scanned with CamScanner

অস্থিসন্ধি বা জয়েন্ট (Bone Joint) [প্রাসঙ্গিক তথ্য]

দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে **অস্থিসন্ধি** বা জয়েন্ট বলে।

অস্থিসন্ধির প্রকার : মানবদেহের অস্থিসন্ধিকে কয়েকভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়, যথা–

১। **তন্তুময় বা অনড় অস্থিসন্ধি** (Fibrous or Immovable joints) : এই রকম অস্থিসন্ধির মিলিত অস্থি দুটির প্রান্তদেশ **শ্বেত তন্তুকলা** দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে অস্থিসন্ধিগুলো **অনড় প্রকৃতির** হয়। করোটিতে এই ধরনের সন্ধি পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার অস্থিসন্ধি তিন প্রকার, যথা–

(ক) **সুচার** (Suters) : এরকম অস্থিসন্ধিতে করোটিকার অস্থির দুটি প্রান্ত খুব পাতলা **সুচারাল লিগামেন্ট** (sutural ligament) দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে।

(খ) **গোমফোসিস** (Gomphosis) : এরকম অস্থিসন্ধিতে একটি অস্থির **সুচালো প্রান্ত** (peglike end) একটি সকেটের মধ্যে প্রবেশ করানো থাকে। যেমন– দাঁত ও চোয়ালের সকেটের সন্ধি।

(গ) **সিনডেসমোসিস** (Syndesmosis) : এরকম অস্থিসন্ধির অস্থি দুটি একটি **ইন্টারোসিয়াস লিগামেন্ট** (interoseous ligament) দিয়ে পরস্পর সংলগ্ন থাকে। যেমন– ইনফিরিয়র টিবিও-ফিবিউলার সন্ধি।

২। **তরুণাস্থিময় অস্থিসন্ধি বা আংশিক সচল সন্ধি** (Cartilagenous joints or Slightly movable joints) : এরকম অস্থিসন্ধিতে মিলিত অস্থি দুটির প্রান্তদেশ পরস্পরের সঙ্গে তরুণাস্থি দিয়ে যুক্ত থাকে। এই প্রকারের সন্ধি দু'রকমের, যেমন–

(ক) **সিনকনড্রোসিস** (Synchondrosis) : এরকম অস্থিসন্ধিতে **হায়ালিন** তরুণাস্থি থাকে। যেমন– দীর্ঘাস্থির এপিফাইসিস ও ডায়াফাইসিসের সংযোগস্থলের সন্ধি।

(খ) **সিম্ফাইসিস** (Symphysis) : এরকম অস্থিসন্ধিতে **তন্তুময়** তরুণাস্থি থাকে। যেমন– সিমফাইসিস-পিউবিস অস্থিসন্ধি।

৩। **সাইনোভিয়াল বা সচল অস্থিসন্ধি** (Synovial or Freely Movable Joints) : **সাইনোভিয়াল গহ্বর সমন্বিত অস্থিসন্ধিকে সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলে।** এরকম অস্থিসন্ধির মিলিত অস্থি দুটি একটি তরলপূর্ণ গহ্বর দিয়ে পৃথক থাকে। এটি সচল প্রকৃতির সন্ধি। আমাদের অধিকাংশ সন্ধি এই রকমের।

সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধির গঠন (Structure of Synovial Joint)

এই প্রকার অস্থিসন্ধি যে পর্দা বেষ্টিত থাকে তাকে **সাইনোভিয়াল পর্দা** (synovial membrane) বলে। পর্দা বেষ্টিত যে ক্ষুদ্র গহ্বর থাকে তাকে **সাইনোভিয়াল গহ্বর** (synovial cavity) বলে। সাইনোভিয়াল পর্দা সাধারণত এপিথিলিয়াম দিয়ে গঠিত। এই পর্দা থেকে **সাইনোভিয়াল তরল** (synovial fluid) ক্ষরিত হয়ে সাইনোভিয়াল গহ্বরে সঞ্চিত থাকে। এই তরল সংযুক্ত অস্থি দুটিকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়া এই তরলে পুষ্টি উপাদান থাকে, যা অস্থিসন্ধিকে পুষ্টি সরবরাহ করে। অস্থির প্রান্ত **অ্যার্টিকুলার কার্টিলেজ** (articular cartilage) বেষ্টিত থাকে। **লিগামেন্ট** (ligament) অস্থি দুটিকে সংযুক্ত রাখে এবং **টেনডন** (tendon) অস্থি দুটিকে পেশির সঙ্গে সংযুক্ত রাখে।

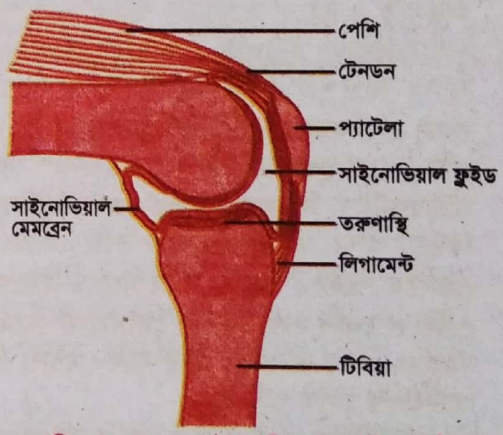

চিত্র ৭.২৬ : সাইনোভিয়াল অস্থির গঠন

সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধির প্রকারভেদ (Types of Synovial Joint) :

সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি ৬ প্রকার, যথা– **গ্লাইডিং বা প্লেন জয়েন্ট** (Gliding or Plane Joint), **হিঞ্জ জয়েন্ট** (Hinge Joint), **পিভট জয়েন্ট** (Pivot Joint), **কন্ডাইলয়েড বা ইলিপসয়েড জয়েন্ট** (Condyloid or Ellipsoid Joint), **স্যাডল জয়েন্ট** (Saddle Joint) ও **বল ও সকেট জয়েন্ট** (Ball and Socket Joint)।

অস্থিসন্ধির কাজ

১। **দেহের নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান :** অস্থিসন্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন অস্থি নির্দিষ্ট রীতিতে সংযুক্ত হয়ে দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে।

২। **গুরুত্বপূর্ণ দেহাঙ্গ তৈরি :** অস্থিসন্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন অস্থি সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেহাঙ্গ তৈরিতে সাহায্য করে। যেমন– করোটিকা, বক্ষপিঞ্জর প্রভৃতি তৈরিতে।

৩। **ভৌত শক্তির সঞ্চারণ :** অস্থিসন্ধির মাধ্যমে এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গে ভৌত শক্তি সঞ্চারিত হয়।

৪। **দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন :** অস্থিসন্ধিগুলো বিশেষ করে সচল অস্থিসন্ধিগুলোর সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অস্থি এক বা একাধিক দিক বরাবর সঞ্চালিত হয়ে নড়ন, চলন, ভারবহন প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করে।

2020/8/4 17:49
Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

☑ **চলন :** যে প্রক্রিয়ায় জীব নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থেকে অর্থাৎ স্থানান্তরে না গিয়ে উদ্দীপকের প্রভাবে অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে তাকে চলন (movement) বলে।

☑ **গমন :** যে প্রক্রিয়ায় প্রাণীরা স্বেচ্ছায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন করে তাকে গমন (locomotion) বলে।

☑ **কঙ্কালতন্ত্র :** ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত অস্থি, তরুণাস্থি ও লিগামেন্ট সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহের প্রধান কাঠামো গঠন করে, দৃঢ়তা দানসহ অভ্যন্তরীণ নরম অঙ্গাদি রক্ষা করে, দেহের ভারবহন করে এবং পেশি সংযোজনের তল সৃষ্টি করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।

☑ **অস্টিওলজি :** অস্থি নিয়ে অধ্যয়নের বিজ্ঞানকে অস্টিওলজি বলে।

☑ **মায়োলজি :** পেশি নিয়ে অধ্যয়নের বিজ্ঞানকে মায়োলজি বলে।

☑ **কঙ্কাল :** অস্থি ও তরুণাস্থি নির্মিত দেহের কাঠামোকে কঙ্কাল বলে। মানুষের কঙ্কাল ২০৬টি অস্থি সমন্বয়ে গঠিত।

☑ **অক্ষীয় কঙ্কাল :** দেহের লম্ব অক্ষ বরাবর অবস্থিত কঙ্কালতন্ত্রের অস্থিসমূহকে একত্রে অক্ষীয় কঙ্কাল বলে। করোটি (করোটিকা, মুখমণ্ডলের অস্থি, কর্ণাস্থি ও হাইওয়েড অস্থি), মেরুদণ্ড ও বক্ষপিঞ্জর নিয়ে অক্ষীয় কঙ্কাল গঠিত।

☑ **উপাঙ্গীয় কঙ্কাল :** বক্ষ-অস্থিচক্র, অগ্রপদের অস্থি (হাত), শ্রোণি-অস্থিচক্র ও পশ্চাৎপদ (পা)-এর অস্থিসমূহ নিয়ে গঠিত কঙ্কালকে উপাঙ্গীয় কঙ্কাল বলে। ইহা অক্ষীয় কঙ্কালের দু'পার্শ্বে প্রতিসমভাবে অবস্থান করে।

☑ **অস্থি :** পেরিঅস্টিয়াম নামক পাতলা আবরণে আবৃত, দেহের সর্বাপেক্ষা দৃঢ়, কঠিনতম, অনমনীয় ও ভঙ্গুর প্রকৃতির যোজক কলাকে অস্থি বলে।

☑ **তরুণাস্থি :** পেরিকন্ড্রিয়াম নামক পাতলা আবরণে আবৃত, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক যোজক কলাকে তরুণাস্থি বলে। এর মাতৃকা কনড্রিন নামক এক ধরনের অর্ধকঠিন ও স্থিতিস্থাপক পদার্থে গঠিত।

☑ **হ্যাভারসিয়ানতন্ত্র** বা **অস্টিওন :** হ্যাভারসিয়ানতন্ত্র হলো নিরেট অস্থির গাঠনিক ও কার্যিক একক। হ্যাভারসিয়ান নালি এবং একে ঘিরে অবস্থিত ল্যামিলি, ল্যাকুনি, ক্যানালিকুলি ইত্যাদি নিয়ে হ্যাভারসিয়ানতন্ত্র গঠিত। হ্যাভারসিয়ান নালির মধ্য দিয়ে শিরা, ধমনি, লসিকানালি ও স্নায়ুতন্তু প্রসারিত হয়। নিরেট অস্থির মাতৃকায় অস্টিওন অবস্থান করে।

☑ **অস্থিসন্ধি :** দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি বা জয়েন্ট বলে।

☑ **সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি :** সাইনোভিয়াল গহ্বর সমন্বিত অস্থিসন্ধিকে সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলে। এরকম অস্থিসন্ধির মিলিত অস্থি দুটি একটি তরলপূর্ণ গহ্বর দিয়ে পৃথক থাকে। এটি সচল প্রকৃতির সন্ধি।

☑ **কণ্ডরা** বা **টেনডন :** দৃঢ়, অস্থিতিস্থাপক ও উচ্চ টান সহনশীল শ্বেত তন্তুময় যোজক কলাকে কণ্ডরা বা টেনডন বলে। এটি পেশিকে অস্থির সাথে যুক্ত করে। পেশি প্রান্ত ক্রমশ শুরু হয়ে কণ্ডরা বা টেনডন গঠন করে। পেশি ও টেন্ডনের প্রকৃতি প্রায় এক।

☑ **অস্থিবন্ধনী** বা **লিগামেন্ট :** শক্ত কিন্তু স্থিতিস্থাপক পীত তন্তুময় যোজক কলাকে অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট বলে। এটি একটি অস্থিকে অপর অস্থির সাথে যুক্ত করে। অর্থাৎ দুটি অস্থিকে সংযুক্ত রাখে।

☑ **গ্লেনয়েড গহ্বর :** স্ক্যাপুলার যে গহ্বরে হিউমেরাসের মস্তক সংযুক্ত থাকে তাকে গ্লেনয়েড গহ্বর বলে।

☑ **পেশি** বা **পেশি কলা :** ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ধরনের তন্তু দ্বারা গঠিত সংকোচন ও প্রসারণশীল বিশেষ ধরনের কলাকে পেশি বা পেশি কলা বলে। পেশি বা পেশিকলার একক হলো পেশি কোষ বা পেশি তন্তু, যা মায়োব্লাস্ট নামক আদিকোষ থেকে সৃষ্টি হয়।

☑ **এন্ডোমাইসিয়াম :** পেশিতন্তুর সূক্ষ্ম অ্যারিওলার যোজক কলা নির্মিত আবরণকে এন্ডোমাইসিয়াম বলে।

☑ **ফ্যাসিকুলাস :** পেশির কোষগুলো বা পেশি তন্তুগুলো গুচ্ছ আকারে অবস্থান করে। পেশিতন্তুর এ ধরনের প্রতিটি গুচ্ছকে ফ্যাসিকুলাস বলা হয়। সংক্ষেপে, পেশিতন্তুর প্রতিটি গুচ্ছই হলো ফ্যাসিকুলাস।

☑ **পেরিমাইসিয়াম :** ফ্যাসিকুলাসের অর্থাৎ পেশিতন্তুর প্রতিটি গুচ্ছের অ্যারিওলার যোজক কলা নির্মিত আবরণকে পেরিমাইসিয়াম বলে।

☑ **এপিমাইসিয়াম :** কতগুলো ফ্যাসিকুলাসের অর্থাৎ কয়েকটি পেশিতন্তুগুচ্ছের অ্যারিওলার যোজক কলা নির্মিত আবরণকে এপিমাইসিয়াম বলে।

☑ **সারকোলেমা :** প্রতিটি পেশিতন্তু বা পেশি কোষ যে সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে তাকে সারকোলেমা বলে। সংক্ষেপে পেশিতন্তু বা পেশি কোষের আবরণকে সারকোলেমা বলে।

☑ **সারকোপ্লাজম :** পেশিতন্তু বা পেশি কোষের সাইটোপ্লোজমকে সারকোপ্লাজম বলে।

☑ **মায়োফাইব্রিল :** পেশি কোষের সারকোপ্লাজমে অবস্থিত অসংখ্য সমান্তরাল প্রোটিনতন্তু বিশেষকে মায়োফাইব্রিল বলা হয়। প্রতিটি মায়োফাইব্রিল প্রধানত অ্যাকটিন ও মায়োসিন নামক প্রোটিন ফিলামেন্ট দ্বারা গঠিত।

☑ **মায়োফিলামেন্ট :** মায়োফাইব্রিলের মধ্যে যে সূক্ষ্ম প্রোটিনতন্তু থাকে তাকে মায়োফিলামেন্ট বলে। অ্যাকটিন ও মায়োসিন হলো মায়োফিলামেন্ট বা প্রোটিন ফিলামেন্ট।

2020/8/4 17:49

Scanned with CamScanner

☑ **অ্যাকটিন ও মায়োসিন :** অ্যাকটিন ও মায়োসিন একধরনের প্রোটিন। পেশিকলা সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে এরা বিভিন্ন কাজ করে। এ ছাড়া সারকোপ্লাজমে অসংখ্য সমান্তরাল মায়োফাইব্রিল বা অণুতন্তু থাকে। মায়োফাইব্রিলের ভেতরে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত দু'প্রকারের সূক্ষ্ম ফিলামেন্ট বা তন্তু পাওয়া যায়, এদেরকে যথাক্রমে অ্যাকটিন ও মায়োসিন বলে। এরাই পেশির সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সংকোচনশীল একক।

☑ **অনৈচ্ছিক পেশি :** যে পেশিসমূহের সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর (মানুষের) ইচ্ছাধীন নয় অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেসব পেশিকে অনৈচ্ছিক পেশি বলে।

☑ **হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি :** মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে বিদ্যমান পেশিকে হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি বলে। এটি এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি। এ পেশি দ্রুত সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং শক্তিশালী।

☑ **ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক :** হৃৎপেশি কোষসমূহের সংযোগস্থলে কোষপর্দা ঘনভাবে সজ্জিত হয়ে যে অনুপ্রস্থ রেখা সৃষ্টি করে, তাকে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক বা নিবেশিত ফলক বলে। এর কারণে এক কোষ থেকে অন্য কোষে দ্রুত আয়ন যাতায়াত করতে পারে। তবে এটা সংকোচনশীল একক নয়। অন্যভাবে বলা যায়, হৃৎপেশিতে অবস্থিত একপ্রকার সমান্তরাল খাঁজ বিশেষ, যা দুটি পেশির সংযোগ স্থাপন করে।

☑ **সিনসাইটিয়াম :** কোনো কোনো স্থানে হৃৎপিণ্ডের পেশিকোষগুলো পরস্পর এত নিবিড়ভাবে সহবস্থান করে যে মনে হয় এগুলো যেন পরস্পর প্রোটোপ্লাজম দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এসব স্থানের সংযোগকে সিনসাইটিয়াম বলা হয়।

☑ **পেশিটান :** পেশিতে সব সময় একটা টান-টান ভাব থাকে, যা দেহ থেকে আলাদা করা পেশিতে দেখা যায় না। পেশির এ টান-টান ভাবকে পেশিটান বা মাসল টান বলে।

☑ **রাইগর মর্টিস :** রাইগর মর্টিস হলো প্রাণীর মৃত্যুর পরে পেশির কাঠিন্য ও প্রসারণ ক্ষমতা লোপ পাওয়ার ঘটনা।

☑ **অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশি :** দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনে অংশগ্রহণকারী ঐচ্ছিক পেশি জোড় পরস্পরের বিপরীতমুখী কাজ করে। এধরনের বিপরীতধর্মী কাজ সম্পাদনকারী পেশিদ্বয়ের একটিকে অপরটির অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশি বা প্রতিপক্ষীয় পেশি (antagonistic muscle) বলে। একই অঙ্গ সঞ্চালনকারী এরকম দুটি পেশিকে প্রতিপক্ষীয় পেশি জোড় বা অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশি জোড় (antagonistic muscle partner) বলা হয়। এদের একটি পেশি যখন সংকুচিত (contracts) হয় অন্যটি তখন শিথিল (relax) হয় এবং বিপরীতক্রম (vice-versa) ঘটনা ঘটে। এদের সমন্বিত কাজের মাধ্যমেই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ পরিচালিত হয়ে থাকে।

☑ **লিভার :** লিভার হলো একটি শক্ত, অনমনীয় লম্বা দণ্ড, যা একটি 'নির্ভর বিন্দু' বা ফালক্রাম এর উপর অবস্থান করে এবং একপ্রান্তে যেকোনো মাত্রার বল প্রয়োগে অপর প্রান্তে কোনো ভরের উপর সমপরিমাণ কিংবা ততোধিক কার্য সম্পাদিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, লিভার হচ্ছে সরল যন্ত্র বিশেষ, যা বল বৃদ্ধি করে কাজ করাকে সহজ করে দেয়। লিভার ৪ প্রকার উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা– ১. একটি মজবুত রডস/লিভারের বাহু, ২. একটি ফালক্রাম বা পিভট, ৩. একটি বল বা প্রচেষ্টা ও ৪. একটি ভার বা ভারী বস্তু।

☑ **অস্থিভঙ্গ :** আকস্মিক কোনো কিছুর চাপে বা আঘাতের কারণে কিংবা রোগের কারণে দেহের কোনো অস্থি বা হাড় (bone) ভেঙে গেলে বা অস্থিতে ফাটল ধরলে তাকে বলা হয় অস্থিভঙ্গ বা হাড় ভাঙা। অথবা, যখন ব্যাপক চাপে বা আঘাতের ফলে কিংবা রোগের কারণে দেহের কোনো অস্থি অখণ্ডতা হারায় তখন তাকে অস্থিভঙ্গ বলে। সংক্ষেপে, যেকোনো কারণে হাড় ফেটে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়াই হলো অস্থিভঙ্গ বা ফ্র্যাকচার। চিকিৎসকগণ একে FRX বা Fx সংকেত দ্বারা প্রকাশ করেন।

☑ **প্রাথমিক চিকিৎসা :** প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রতিবিধান, চিকিৎসা শাস্ত্রের অংশ। প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে হঠাৎ কোনো পীড়া কিংবা দৈব দুর্ঘটনায় ডাক্তার না আসা পর্যন্ত হাতের কাছের জিনিসের দ্বারা রোগীকে প্রাথমিক সাহায্য করা। রোগীর অবস্থা যাতে জটিলতর না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন– গাছ থেকে পড়ে হাড় ভাঙা, পানিতে ডোবা, বিষ খাওয়া, অনেকক্ষণ রোদে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়া, ইত্যাদির প্রাথমিক চিকিৎসা।

☑ **স্থানচ্যুতি বা সন্ধিচ্যুতি :** একটি অস্থি অপর একটি অস্থির সঙ্গে যে স্থানে মিলিত হয় সে স্থানই হলো অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থান। আর এই সন্ধিস্থান থেকে কোনো অস্থি যদি সরে যায় তখন তাকে স্থানচ্যুতি বা সন্ধিচ্যুতি বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যখন কোনো আঘাত বা অন্য কোনো কারণে দেহের অস্থিসন্ধি গঠনকারী কোনো অস্থি সরে যায় তখন তাকে স্থানচ্যুতি বা লাক্সেশন বলে। **সাধারণত কাঁধ, কনুই, কব্জি, বৃদ্ধাঙ্গুল, নিম্নচোয়াল, হাঁটু ইত্যাদি অঙ্গে সন্ধিচ্যুতি হতে দেখা যায়।**

☑ **মচকানো :** অস্থি বা হাড়ে ঝাঁকুনি লাগলে বা মুচড়ে গেলে সে স্থানের অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট ও এর চারদিকের তন্তুগুলো ছিঁড়ে যায় বলে খুব কষ্টদায়ক অবস্থাকেই মচকানো বা স্প্রেইন বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, লিগামেন্টের ইনজুরিই হলো মচকানো। অন্যভাবে বলা যায়, আঘাতজনিত বা অন্য কোনো কারণে লিগামেন্ট তার নিজস্ব ক্ষমতার বাইরে প্রসারিত হলে বা ছিঁড়ে গেলে তাকে মচকানো বলে।

☑ **স্ট্রেইন :** আঘাতজনিত বা অন্য কোনো কারণে পেশি বা টেনডন তাদের নিজস্ব ক্ষমতার বাইরে প্রসারিত হলে বা ছিঁড়ে গেলে তাকে স্ট্রেইন বলে।

☑ **অস্টিওপোরোসিস :** অস্টিওপোরোসিস (osteoporosis) রোগে অস্থিমজ্জা থেকে খনিজ লবণ ও তন্তুজাত পদার্থ অপসারিত হয়। বিশেষ করে অস্থিভঙ্গের জন্য এই রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে। চিকিৎসাজনিত কারণে অতিরিক্ত মাত্রায় গ্লুকোকর্টিকয়েড অর্থাৎ **কর্টিসোন** (cortisone) জাতীয় ওষুধ বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হলে অস্টিওপোরোসিস হতে পারে। এই রোগের প্রধান কয়েকটি কারণ হলো– থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত **ক্যালসিটোনিন** (calsitonin), প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত প্যারাথরমোন (parathormone), যৌন হরমোনের (যেমন– অ্যান্ড্রোজেন, ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন) অতিরিক্ত ক্ষরণ। এছাড়া ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনের কম ক্ষরণ। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে অস্থিসন্ধিজনিত ব্যথা এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

2020/8/4 17:50

Scanned with CamScanner

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের মুখমণ্ডলীয় অস্থি সংখ্যা কয়টি? [সি.,কু.,ব.,চ.,য.,দি.ও রা.বোর্ড-১৮]
ক ০৮ খ ১২ গ ১৪ ঘ ৩৩

২. এক্সিস কোন অঞ্চলের কশেরুকা? [ঢা. বোর্ড-১৮]
ক উদর দেশীয় খ গ্রীবাদেশীয়
গ বক্ষদেশীয় ঘ শ্রোণীদেশীয়

৩. কোনটি করোটিকার জোড় অস্থি? [সি.,কু.,ব.,চ.,য., দি.ও রা. বোর্ড-১৮]
ক স্ফেনয়েড খ অক্সিপিটাল
গ ফ্রন্টাল ঘ প্যারাইটাল

৪. থোরাসিক কশেরুকার সংখ্যা কয়টি? [চ. বোর্ড-১৭]
ক ৪টি খ ৫টি গ ৭টি ঘ ১২টি

৫. মানবদেহে অক্ষীয় কঙ্কাল অস্থির সংখ্যা কতটি? [ঢা. বোর্ড-১৭]
ক ৫০ খ ৬০ গ ৭০ ঘ ৮০

৬. চুনময় তরুণাস্থি পাওয়া যায় কোথায়? ঢা.বোর্ড-১৭]
ক পিনা খ শ্বাসনালি
গ হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তক ঘ ইউস্টেশিয়ান নালি

৭. শ্বাসনালি ও নাকে কোন ধরনের তরুণাস্থি থাকে? [য.বোর্ড-১৭]
ক হায়ালিন খ পীত তন্তুময়
গ শ্বেত তন্তুময় ঘ চুনময়

৮. মানুষের এক হাতে ফ্যালাঞ্জেসের সংখ্যা কয়টি? [সি.বোর্ড-১৭]
ক ১০ খ ১৩ গ ১৪ ঘ ১৫

৯. ঐচ্ছিক পেশিতন্তুর আবরণীকে কী বলে? [সি.বোর্ড-১৭]
ক প্লাজমালেমা খ মায়োসিন
গ সারকোলেমা ঘ মায়োফাইব্রিল

১০. দীর্ঘ ষষ্ঠির মতো দেখতে নিচের কোনটি? [দি.বোর্ড-১৭]
ক টিবিয়া খ ফিবুলা গ ফিমার ঘ হিউমেরাস

১১. মানুষের উপাঙ্গীয় কঙ্কালে অস্থির সংখ্যা কতটি? [দি.বোর্ড-১৭]
ক ১২৪ খ ১২৫ গ ১২৬ ঘ ১২৭

১২. হায়ালাইন তরুণাস্থি কোনটি? [রা.বোর্ড-১৭]
ক কর্ণছত্র খ আলজিহ্বা
গ শ্বাসনালি ঘ ফিমারের মস্তক

১৩. মানুষের করোটির অস্থির সংখ্যা কতটি? [রা.বোর্ড-১৭]
ক ২৯ খ ৩০ গ ৩১ ঘ ৩৩

১৪. কোন কশেরুকাতে ট্রান্সভার্স ফোরামেন পাওয়া যায় না? [কু.বোর্ড-১৭]
ক স্যাক্রাম খ ভার্টিব্রা প্রমিন্যান্স
গ অ্যাটলাস ঘ অ্যাক্সিস

১৫. ফিমারের মস্তক কোথায় আটকানো থাকে? [কু.বো-১৭]
ক গ্রেনয়েড গহ্বর খ অ্যাসিটাবুলাম
গ অবটুরেটির ফোরামেন ঘ ইন্টারকন্ডাইলার নচ

১৬. টেনডনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [ঢা. বোর্ড-১৬]
ক দুটি হাড়কে যুক্ত করে
খ পেশিকে অস্থির সাথে যুক্ত করে
গ পেশি ও টেন্ডনের প্রকৃতি ভিন্ন
ঘ অঙ্গ সঞ্চালনে এর কোনো ভূমিকা নেই

১৭. কোনটি দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার? [ঢা. বোর্ড-১৬]
ক মাথার খুলি ও এটলাস সন্ধি খ পায়ের গোড়ালি
গ কনুই সন্ধি ঘ হাঁটু সন্ধি

১৮. মানুষের গ্রীবা দেশীয় কশেরুকা কয়টি? [রা. বোর্ড-১৬]
ক ৪টি খ ৫টি গ ৭টি ঘ ১২টি

১৯. মানুষের কব্জিতে (Carpal region) হাড়ের সংখ্যা কত ?
ক ৫টি খ ৭টি গ ৮ টি ঘ ১১০টি

২০. মানুষের অক্ষিকোটরের কিছু অংশজুড়ে অবস্থান করে কোন অস্থি?
ক ম্যাক্সিলারি খ ফ্রন্টাল গ স্ফেনয়েড ঘ এথময়েড

২১. কোনটি করোটিকার অস্থি? [কু. বোর্ড-১৬]
ক প্যারাইটাল খ প্যালেটাইন
গ জাইগোম্যাটিক ঘ ল্যাক্রিমাল

২২. সুষুম্নাকাণ্ডকে সুরক্ষিত রাখে কোনটি? [কু. বোর্ড-১৬]
ক বক্ষ অস্থিচক্র খ মেরুদণ্ড
গ বক্ষপিঞ্জর ঘ করোটি

২৩. ঐচ্ছিক পেশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিচের কোনটি? [চ. বোর্ড-১৬]
ক মাকু আকৃতির
খ নিউক্লিয়াস অসংখ্য
গ ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক বিদ্যমান
ঘ অনুপ্রস্থ রেখা থাকে না

২৪. বক্ষ অস্থিচক্রের অস্থি নিচের কোনটি? [চ. বোর্ড-১৬]
ক স্টার্নাম খ ইশ্চিয়াম গ পর্শুকা ঘ ক্লাভিকল

২৫. মানবদেহের সবচেয়ে বড় অস্থি কোনটি? [চ. বোর্ড-১৬]
ক হিউমেরাস খ ফিমার গ স্টার্নাম ঘ টিবিয়া

২৬. 'জিফয়েড প্রসেস' কোথায় অবস্থিত? [দি.,ব.বোর্ড-১৬]
ক স্ক্যাপুলা খ স্যাক্রাম গ স্টার্নাম ঘ অ্যাটলাস

২৭. প্রথম শ্রেণির লিভারের মতো কাজ করে কোনটি? [ব. বোর্ড-১৬]
ক কনুই সন্ধির সঞ্চালন
খ হাতের আঙুলের সঞ্চালন
গ পায়ের আঙুলের সঞ্চালন
ঘ করোটি ও অ্যাটলাসের সঞ্চালন

২৮. মায়োফাইব্রিল কোন প্রোটিন দ্বারা তৈরি? [সি. বোর্ড-১৬]
ক অ্যাকটিন ও জিলেটিন খ মায়োসিন ও ইলাস্টিন
গ কোলাজেন ও মায়োসিন ঘ মায়োসিন ও অ্যাকটিন

২৯. দুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে কোন তরুণাস্থি পাওয়া যায়? [ঢা. বো. '১৯]
ক হায়ালিন খ শ্বেত তন্তুময় গ স্থিতিস্থাপক ঘ চুনময়

৩০. মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্র কতটি অস্থি নিয়ে গঠিত?
ক ১০৬ খ ২০৬ গ ৩০৬ ঘ ৪০৬

৩১. মানবদেহের গ্লিনয়েড গহ্বর কোথায় থাকে? [দি. বো. '১৫]
ক অগ্রপদে খ পশ্চাৎপদে
গ বক্ষাস্থি চক্রে ঘ শ্রোণিচক্রে

৩২. মানবদেহে অস্থির সংখ্যা কত? [য. বো. '১৯]
ক ১০৬ খ ১২৬ গ ২০৬ ঘ ২২৬

৩৩. কোন পেশিতে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক পাওয়া যায়? [য. বো. '১৯]
ক অনৈচ্ছিক খ কার্ডিয়াক গ রৈখিক ঘ ঐচ্ছিক

৩৪. বক্ষপিঞ্জর গঠনকারী অস্থির সংখ্যা কয়টি? [ঢা. বোর্ড-১৫]
ক ২১টি খ ২৫টি গ ৩১টি ঘ ৩৫টি

৩৫. শ্বাসনালিতে কোন ধরনের তরুণাস্থি দেখা যায়? [ঢা. বোর্ড-১৫]
ক পীততন্তুময় খ হায়ালিন
গ শ্বেততন্তুময় ঘ ক্যালসিফাইড

2020/8/4 17:50
Scanned with CamScanner

৩৬. পেশি কোষের আবরণীকে কী বলা হয়? [কু.বোর্ড-১৫]
ক সারকোলেমা খ মায়োব্লাস্ট
গ মায়োফাইব্রিল ঘ পেশিতন্তু

৩৭. হিউমেরাসের মস্তকে পাওয়া যায় কোন ধরনের তরুণাস্থি? [য.বোর্ড-১৫]
ক শ্বেত-তন্তুময় খ ক্যালসিফাইড
গ হায়ালিন ঘ পীত-তন্তুময়

৩৮. নিচের কোনটি করোটিকার অস্থি? [য. বো. '১৫]
ক প্যালেটাইন খ ল্যাক্রিমাল
গ প্যারাইটাল ঘ ভোমার

৩৯. ১ম শ্রেণির লিভারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [কু. বো. '১৯]
ক বল – ভার – ফ্যালক্রাম খ ফ্যালক্রাম – বল – ভার
গ ভার – ফ্যালক্রাম – বল ঘ ভার – বল – ফ্যালক্রাম

৪০. মানব কঙ্কালতন্ত্রে তৃতীয় শ্রেণির লিভার কোন অঙ্গে কার্যকরী? [চ. বো. '১৫]
ক হাতের কনুই সঞ্চালনে খ পায়ের গোড়ালি সঞ্চালনে
গ মানুষের মাথা সঞ্চালনে ঘ মানুষের কোমর সঞ্চালনে

৪১. করোটিকার অংশ কোনটি? [চ. বো. '১৫]
ক মাক্সিলা খ জাইগোথেটিক (প্রসেস)
গ ন্যাসাল ঘ এথময়েড

৪২. হৃৎপেশির সংকোচনে কোন উপাদানটি কাজ করে? [চ. বো. '১৫]
ক পেরিমাইসিয়াম খ মায়োকাইব্রিল
গ ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক ঘ সারকোলেমা

৪৩. মানুষের বক্ষদেশীয় অঞ্চলে কশেরুকা কয়টি? [ব. বো. '১৫]
ক ৪ খ ৫ গ ৭ ঘ ১২

৪৪. ঐচ্ছিক পেশি পাওয়া যায় কোথায়? [সি. বো. '১৫]
ক জিহ্বায় খ হৃৎপিণ্ডে গ পাকস্থলীতে ঘ জরায়ুতে

৪৫. মানুষের করোটিকার অস্থি কোনটি? [ব. বো. '১৯]
ক স্ফেনয়েড খ জাইগোম্যাটিক
গ ভোমার ঘ প্যালাটাইন

৪৬. অনৈচ্ছিক পেশির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য? [চ. বো. '১৯]
ক প্রতিটি কোষে অসংখ্য নিউক্লিয়াস বিদ্যমান
খ ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে
গ পেশি তন্তু মাকু আকৃতির
ঘ চোখ ও জিহ্বায় বিদ্যমান

৪৭. স্বচ্ছ তরুণাস্থি কোথায় পাওয়া যায়? [ব. বো. '১৯]
ক স্বরযন্ত্র খ বহিঃকর্ণ
গ আলজিহ্বা ঘ ইউস্টেশিয়ান নালি

৪৮. কোনটি মানুষের টার্সাল অস্থি? [চ. বো. '১৯]
ক ট্যালাস খ ট্রাপেজিয়াম গ ট্রাপেজয়েড ঘ ট্রাইকুয়েট্রাল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৯. শ্রোণিচক্রের অংশ– [সি.,কু.,ব.,চ.,য.,দি.ও রা.বোর্ড-১৮]
i. Ileum ii. Pubis iii. Ischium
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৫০. হৃৎপেশির বৈশিষ্ট্য– [রা. বো. '১৭]
i. এটি সরেখ ও অনৈচ্ছিক প্রকৃতির
ii. এটি মসৃণ ও অনৈচ্ছিক প্রকৃতির
iii. এতে ইন্টারক্যালাটেড ডিস্ক থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫১. অনৈচ্ছিক পেশি সাধারণত অবস্থান করে–
i. পৌষ্টিকনালিতে ii. চোখে ও জিহ্বায়
iii. শ্বাসনালিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৫২. অ্যাটলাসের বৈশিষ্ট্য–
i. সেন্ট্রাম ও স্পাইনাস প্রসেস অনুপস্থিত
ii. কশেরুকা আংটি সদৃশ
iii. ওডোন্টোয়েড প্রসেস উপস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৩. থোরাসিক কশেরুকার বৈশিষ্ট্য হলো– [য. বোর্ড-১৫]
i. সেন্ট্রাম মাঝারি ও হৃৎপিণ্ড আকৃতির
ii. ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় ও ত্রিকোণা
iii. স্পাইনাস প্রসেস লম্বা ও সরু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র [সি. বোর্ড-১৭]

৫৪. উদ্দীপকের 'X' চিহ্নিত অংশ কোন ধরনের তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত?
ক হায়ালিন খ পীততন্তুময়
গ শ্বেত তন্তুময় ঘ ক্যালসিফাইড

৫৫. 'Y' চিহ্নিত নালির জন্য কোনটি সঠিক?
i. মধ্যকর্ণ বায়ুপূর্ণ করে
ii. কর্ণপটহের উভয় পাশে বায়ুচাপ সমান রাখে
iii. পেরিলিম্ফ থেকে আগত শব্দ তরঙ্গ প্রশমিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সড়ক দুর্ঘটনায় রহিমের পায়ের হাঁটু হতে গোড়ালির মাঝে অবস্থিত দুটি হাড়ের সরুটি ভেঙে গেছে। [রা. বোর্ড-১৬]

৫৬. উদ্দীপক অনুসারে রহিমের ভেঙে যাওয়া হাড়টির নাম কী?
ক ফিবুলা খ টিবিয়া গ টারসাল ঘ ফিমার

৫৭. রহিমের ভেঙে যাওয়া হাড়টির মাতৃকার কোষ–
i. কন্ড্রোসাইট ii. অস্টিওসাইট iii. অস্টিওব্লাস্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কঙ্কালতন্ত্র পড়াতে গিয়ে শিক্ষক বললেন, 'উপাঙ্গিক কঙ্কাল দুটি অস্থিচক্র- সম্মুখ বক্ষ অস্থিচক্র ও পশ্চাৎ শ্রোণি চক্র নিয়ে গঠিত। অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ এই অস্থিচক্রের মাধ্যমে অক্ষীয় কঙ্কালের সাথে সংযুক্ত।'

৫৮. উদ্দীপকের সম্মুখ অস্থিচক্রের অস্থি কোনটি? [য. বোর্ড-১৬]
ক ইশ্চিয়াম খ স্ক্যাপুলা গ হিউমেরাস ঘ টিবিয়া

2020/8/4 17:50
Scanned with CamScanner

৫৯. প্যাটেলা অস্থিটি হলো— [য. বোর্ড-১৬]
ক মেরুদণ্ডের খ করোটির
গ অগ্রপদের ঘ পশ্চাৎ পদের

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

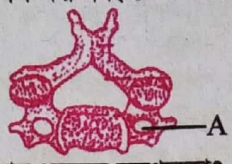

৬০. উদ্দীপকটি কোন ধরনের কশেরুকা? [কু. বোর্ড-১৬]
ক সারভাইকাল খ থোরাসিক
গ লাম্বার ঘ স্যাক্রাল

৬১. উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত অংশের নাম কী? [কু. বোর্ড-১৬]
ক অবটুরেটর ফোরামেন খ ভার্টিব্রাল ফোরামেন
গ ট্রান্সভার্স ফোরামেন ঘ কোস্টাল ফ্যাসেট

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রুমীর হাতের পেশিগুলো ব্যায়ামের সময় ফুলে উঠে। একদিন এ সময় অসাবধানতাবশত তার হাত মচকে গেল। [ব. বোর্ড-১৬]

৬২. ব্যায়ামের সময় রুমীর উক্ত অঙ্গের পরিবর্তনের কারণ হলো—
i. এরা সংকোচনশীল
ii. এটি বাইসেপ ও ট্রাইসেপ পেশিসমৃদ্ধ
iii. এটি শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৩. রুমীর হাতের সমস্যাটির কারণ কী হতে পারে?
ক স্নায়ুসমূহের ক্ষতি
খ অস্থিসমূহের স্বাভাবিক সজ্জায় ব্যাঘাত
গ অস্থিসন্ধির লিগামেন্টে অতিরিক্ত চাপ
ঘ লিগামেন্টে আমিষে উপস্থিতির তারতম্য

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৬৪. উদ্দীপকটি কোন ধরনের তরুণাস্থির? [সি. বোর্ড-১৬]
ক হায়ালিন খ স্থিতিস্থাপক
গ শ্বেততন্তুময় ঘ ক্যালসিফাইড

৬৫. উদ্দীপকের তরুণাস্থিটি কোথায় অনুপস্থিত? [সি. বোর্ড-১৬]
ক পিনা খ আলজিহ্বা
গ ইউস্টেশিয়ান নালি ঘ শ্বাসনালি

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কামরুলকে তার শিক্ষক মানুষের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অস্থি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। কামরুল প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দিল।

৬৬. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অস্থির নাম কী?
ক স্টেপিস খ ম্যালিয়াস গ ইনকাস ঘ পর্শুকা

৬৭. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অস্থির আকৃতি কেমন?
ক হাতুরির ন্যায়
খ কামারের নেহাইয়ের ন্যায়
গ ঘোড়ার জিনের পাদানির ন্যায়
ঘ করোটিকার ন্যায়

⏭ চিত্রের আলোকে ৬৮ ও ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

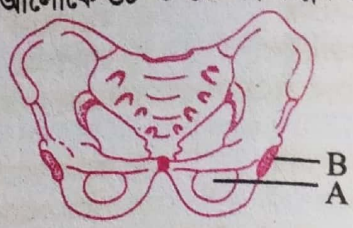

৬৮. চিত্রের A অংশের নাম কী?
ক ইলিয়াম খ ইশ্চিয়াম
গ অবটুরেটর ফোরামেন ঘ অ্যাসিটাবুলাম

৬৯. চিত্রের B অংশের সাথে কোনটির মাথা আটকানো থাকে?
ক ফিমারের খ টিবিয়ার
গ হিউমেরাসের ঘ ফিবুলার

⏭ নিচের চিত্রটি থেকে ৭০ ও ৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

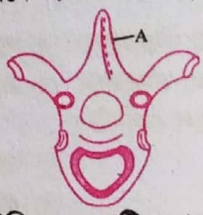

৭০. উদ্দীপকের A চিহ্নিত অংশটির নাম কী? [কু. বোর্ড-১৫]
ক স্পাইনাস প্রসেস খ ট্রান্সভার্স প্রসেস
গ ক্যাপিচুলার প্রসেস ঘ আর্টিকুলার প্রসেস

৭১. উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— [কু. বোর্ড-১৫]
i. পাঁজরের ক্যাপিচুলামের সাথে যুক্ত
ii. মেরুদণ্ড গঠন করে
iii. ভার্টিব্রাল ফোরামেন বিদ্যামান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭২ ও ৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
খেলার মাঠে সোহেল চাকতি নিক্ষেপের সময় বাহুর গোড়ায় তীব্র ব্যথা অনুভব করল। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেল বাহুর অস্থিটি সংশ্লিষ্ট গহ্বর থেকে স্থানচ্যুত হয়েছে। [রা. বোর্ড-১৫]

৭২. উদ্দীপকে উল্লিখিত অস্থিটির নাম কী?
ক রেডিও আলনা খ হিউমেরাস
গ ফিমার ঘ টিবিও ফিবুলা

৭৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত গহ্বর সংশ্লিষ্ট অস্থিগুলো হচ্ছে—
i. স্ক্যাপুলা ii. ক্লাভিকল iii. স্টার্নাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপক থেকে ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
পেশি ও অস্থি মানবদেহের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এদের সম্মিলিত কার্যক্রমের ফলেই বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয় এবং মানুষ চলাচল করতে পারে।

৭৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথমোক্ত অঙ্গের কোষ ঝিল্লিকে কী বলে?
ক নিউরিলেমা খ প্লাজমালেমা
গ সারকোলেমা ঘ মায়োলেমা

৭৫. অঙ্গ দুটি নিচের কোন অংশের মাধ্যমে যুক্ত থাকে?
ক লিগামেন্ট খ টেন্ডন
গ সাইনোভিয়াল ঘ মায়োফাইব্রিল

2020/8/4 17:50
Scanned with CamScanner

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭৬. নিচের কোনটি মানুষের অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্রের অংশ? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক শ্রোণি অস্থিচক্র খ বক্ষ অস্থিচক্র
গ করোটি ঘ ফিমার

৭৭. নিম্নলিখিত কয়টি অস্থি নিয়ে মানব করোটি গঠিত? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক 31 খ 21 গ 27 ঘ 29

৭৮. কোনটি মানুষের মুখমণ্ডলীয় অস্থি নয়? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক ন্যাসাল অস্থি খ ম্যাক্সিলা অস্থি
গ এথময়েড অস্থি ঘ ম্যান্ডিবল অস্থি

৭৯. মানুষের কপাল কোন অস্থি দিয়ে তৈরি হয়? [ডেন্টাল: ১৬-১৭]
ক অক্সিপিটাল খ ফ্রন্টাল
গ প্যারাইটাল ঘ টেমপোরাল

৮০. স্ফেনয়েড অস্থি কঙ্কালের কোন অংশে থাকে? [মেডিকেল : ১৩-১৪]
ক করোটিকা খ মুখমণ্ডল
গ পেকটোরাল গার্ডল ঘ মেরুদণ্ড

৮১. নিম্নের উল্লেখিত কয়টি অস্থি নিয়ে মুখমণ্ডল গঠিত? [মেডিকেল : ০৮-০৯, ডেন্টাল : ০৭-০৮]
ক 12 খ 13 গ 14 ঘ 15

৮২. কোনটি মানুষের মুখমণ্ডলীয় অস্থি? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক প্যারাইটাল খ স্ফেনয়েড
গ ভোমার ঘ এথময়েড

৮৩. নিম্নের কোনটি মুখমণ্ডলীয় অস্থি নয়? [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক ভোমার খ ল্যাক্রিমাল
গ নাসিকা অস্থি ঘ এথময়েড

৮৪. করোটিকার অস্থি নয় কোনটি? [মেডিকেল: ০২-০৩]
ক ফ্রন্টাল অস্থি খ প্যারাইটাল অস্থি
গ হাইওয়েড অস্থি ঘ এথময়েড অস্থি

৮৫. উপরের চোয়াল যে ধরনের অস্থি– [ডেন্টাল : ০০-০১]
ক খাটো বা ক্ষুদ্র অস্থি খ অনিয়ত অস্থি
গ চাপা অস্থি ঘ বায়ুপূর্ণ অস্থি

৮৬. মানুষের গ্রীবাদেশীয় কোন কশেরুকাটির নাম অ্যাক্সিস? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক ষষ্ঠ খ সপ্তম গ প্রথম ঘ দ্বিতীয়

৮৭. কোনটি মানবদেহের সারভাইকাল কশেরুকার সঠিক বৈশিষ্ট্য নয়? [ডেন্টাল : ০৬-০৭]
ক ভার্টিব্রাল ফোরামেন ছোট ও গোলাকার
খ অ্যাটলাসের ট্রান্সভার্স প্রসেস বড় আকৃতির এবং ট্রান্সভার্স ফোরামেন যুক্ত
গ অ্যাক্সিসের পেডিকল চওড়া ও দৃঢ়
ঘ ভার্টিব্রাল প্রোমিনেন্স এর ট্রান্সভার্স ফোরামেন বড়

৮৮. মানুষের কব্জিতে (Carpal region) হাড়ের সংখ্যা কত? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক ৫টি খ ৮টি গ ৭টি ঘ ১০টি

৮৯. সিসামায়েড অস্থি কোনটি? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক পর্শুকা খ প্যাটেলা গ কিউবয়েড ঘ টিবিয়া

৯০. নিচের কোনটি বক্ষ অস্থি চক্রের হাড়? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক ক্ল্যাভিকল খ স্ফেনয়েড গ এথময়েড ঘ পিউবিস

৯১. নিচের কোনটি ক্লাভিকলের বৈশিষ্ট্য? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক এটি একটি খাঁটো অস্থি
খ এটি একটি বাঁকানো অস্থি
গ এই অস্থির মজ্জা গহ্বর আছে
ঘ একপ্রান্ত হিউমেরাসের সাথে যুক্ত থাকে

৯২. কোনটি মানব দেহের টার্সাল অস্থির অন্তর্ভুক্ত নয়? [মেডিকেল : ১২-১৩, ০৬-০৭]
ক ক্যালকেনিয়াস খ ট্রাপেজিয়াম
গ কুনিফর্ম ঘ কিউবয়েড

৯৩. নিম্নের কোনটি হাতের তালুর অস্থি নয়? [মেডিকেল: ১১-১২]
ক পিসিফর্ম খ ট্রাপিজিয়াম গ হেমেট ঘ ইথময়েড

৯৪. নিম্নের কোন অস্থিতে মজ্জা গহ্বর নাই? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক ইশ্চিয়াম খ স্টারনাম গ কারপাল ঘ ক্ল্যাভিকল

৯৫. ওলিক্রেনন প্রসেস কোন অস্থির অংশ? [ডেন্টাল : ০২-০৩]
ক ব্যাঙের ফিমার খ গিনিপিগের হিউমেরাস
গ গিনিপিগের রেডিও আলনা ঘ মানুষের ফিবুলা

৯৬. নিচের কোন অঙ্গে স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি পাওয়া যায় না? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক বহিঃকর্ণ খ অন্তঃকর্ণ
গ ইউস্টেশিয়ান নালি ঘ উপজিহ্বা

৯৭. ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি পাওয়া যায় কোন অঙ্গে? [মেডিকেল : ১৩-১৪]
ক হেড অফ হিউমেরাসে খ আলজিহ্বা
গ স্তন্যপায়ীর নাক ঘ শ্বাসনালি

৯৮. নিম্নের কোনটিতে তরুণাস্থি নাই? [মেডিকেল : ১১-১২]
ক বহিঃকর্ণের পিনা খ নাকের অন্তঃস্থিত বিভক্তি দেয়াল
গ স্বরথলি ঘ মূত্রথলি

৯৯. মেরুদণ্ডের এটলাস ও এক্সিসের মধ্যবর্তী অস্থিসন্ধি নিম্নের কোনটি? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক কমফোসিস খ কব্জা
গ কীলক / পিভট ঘ স্যাডেল

১০০. নিম্নে উল্লেখিত কোন অঙ্গে স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি থাকে? [মেডিকেল: ০৮-০৯]
ক বহিঃকর্ণ খ শ্বাসনালি গ হিউমেরাস ঘ স্বরযন্ত্র

১০১. বাম দিকের কোনটি ডান দিকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়? [ডেন্টাল : ০৮-০৯]
ক ফাইবোব্লাস্ট–পীততন্তু তৈরি করে
খ মাস্ট কোষ– হেপারিন নিঃসৃত করে
গ প্লাজমা কোষ– অ্যান্টিবডি তৈরি করে
ঘ হিস্টিওসাইট–ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে

১০২. নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক তরুনাস্থি ম্যাট্রিক্সে কনড্রিন থাকে
খ যোজক কলা মেসোডার্ম নামক ভ্রূণস্তর থেকে উৎপন্ন করে
গ ফাইটোব্লাস্ট শ্বেততন্তু উৎপাদনে সহায়তা করে
ঘ হৃৎপেশি ঐচ্ছিক পেশি

১০৩. ম্যাট্রিক্সের গঠনের উপর ভিত্তি করে যেটি তরুণাস্থি প্রকারভেদে পড়বে না– [মেডিকেল : ০৬-০৭]
ক ক্যালসিফাইড খ স্পঞ্জি
গ স্বচ্ছ ঘ স্থিতিস্থাপক

১০৪. কোনটি হায়ালিন তরুণাস্থির উদাহরণ নয়? [মেডিকেল : ০৫-০৬]
ক পর্শুকা খ শ্বাসনালি
গ ইউস্টেশিয়াল নালি ঘ কলপোয়ীর নাক

2020/8/4 17:50

Scanned with CamScanner

১০৫. কব্জাসন্ধির উদাহরণ কোনটি? [ডেন্টাল : ০৪-০৫]
ক হিউমেরাস ও আলনার মধ্যবর্তী কনুই এর সন্ধি
খ স্কন্ধ সন্ধি
গ স্টার্নোক্লাভিকুলার সন্ধি
ঘ হাঁটুর সন্ধি

১০৬. মানবদেহের সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি নয় কোনটি? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক কন্ডাইলয়িড খ স্যাডেল
গ হিঞ্জ/কব্জা ঘ সিমফাইসিস

১০৭. পীত তন্তুময় যোজক কলার অবস্থান কোথায়? [ডেন্টাল : ০৩-০৫]
ক পাকস্থলীতে খ অন্ত্রপ্রাচীরে
গ দেহত্বকের নিচে ঘ ধমনির প্রাচীরে

১০৮. ঐচ্ছিক পেশি নিচের কোনটির দ্বারা অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক পেরিঅস্টিয়াম খ লিগামেন্ট
গ টেনডম ঘ পেরিমাইসিয়াম

১০৯. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক কোন ধরনের পেশির বৈশিষ্ট্য? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক ঐচ্ছিক পেশি খ হৃৎপেশি
গ মসৃণ পেশি ঘ রৈখিক পেশি

১১০. চলনের সময় হাঁটুতে ভাজ করে কোন মাংসপেশি? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক বাইসেপস ফিমোরিস খ ট্রাইসেপস
গ ডেল্টয়েড ঘ রেকটাস ফিমোরিস

১১১. গোড়ালির পেশি নিম্নের কোনটি? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক ডিজিটোরাম লঙ্গাস
খ গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস
গ এক্সটেনসর ডিজিটোরাম
ঘ কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস

১১২. নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক? [ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক HCl নিষ্ক্রিয় আন্ত্রিক পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে
খ মানুষের ক্ষেত্রে মেলাটোনিন সক্রিয় থাকে
গ দশম পর্শুকাকে ভাসমান পর্শুকা বলে
ঘ টেন্ডন পেশিকে অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে

১১৩. চলনের সময় পায়ের কোন পেশি সংকোচন এর ফলে গোড়ালির অস্থিটিতে টান পড়ে ফলে গোড়ালি মাটি থেকে উত্থিত হয়? [ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক ট্রাপিজিয়াম খ সোলিয়াস গ রেকটাস ঘ গ্লুটিয়াস

১১৪. নিম্নের কোনটিতে ঐচ্ছিক পেশি থাকে না? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক চোখ খ জিহ্বা গ জরায়ু ঘ হাত

১১৫. নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [ডেন্টাল : ০৮-০৯]
ক ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস হয়
খ হৃৎপেশি এক ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি
গ একটিন ও মায়োসিস নামক প্রোটিন দ্বারা মায়োফাইব্রিল গঠিত
ঘ মায়োলিনযুক্ত নিউরনের এক্সনে র‍্যানভিয়ার পর্ব থাকে না

১১৬. হৃৎপেশির বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি? [ডেন্টাল : ০৪-০৫]
ক শাখান্বিত পেশিতন্তু
খ দৈর্ঘ্য 100 মাইক্রন
গ নিউক্লিয়াস একাধিক এবং একপাশে
ঘ প্রকৃতি অনৈচ্ছিক

১১৭. ঐচ্ছিক পেশি পাওয়া যায়– [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে খ পৌষ্টিক নালির প্রাচীরে
গ বৃক্কের প্রাচীরে ঘ কঙ্কালের গায়ে

১১৮. কোনটির হৃৎপেশির বৈশিষ্ট্য নয়? [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক পেশিতন্তু শাখান্বিত খ ডোরাবিশিষ্ট
গ রক্ত সরবরাহ প্রচুর ঘ প্রকৃতি অনৈচ্ছিক

১১৯. একটি চিহ্নিত পেশিতে নিউক্লিয়াস থাকে– [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক একটি খ দুইটি গ পাঁচটি ঘ শতাধিক

১২০. বিভিন্ন পেশিকলার গঠন প্রকৃতিতে যেটি সত্য নয়– [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক রৈখিক বা ঐচ্ছিক পেশিতন্তু সারকোলেমা নামক স্পষ্ট এক আবরণে আবৃত থাকে
খ মসৃণ বা অনৈচ্ছিক পেশিতে কোষের আবরণী বা সারকোলেমা অস্পষ্ট
গ হৃৎপেশি বা কর্ডিয়াক পেশিতে সারকোলেমা বেশ সূক্ষ্ম
ঘ মসৃন বা অনৈচ্ছিক পেশির কোষের নিউক্লিয়াসটি কোষের সরু অংশে অবস্থান করে

১২১. সাধারণ হাড়ভাঙ্গার অপর নাম কী? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক যৌগিক হাড়ভাঙ্গা খ উন্মুক্ত হাড়ভাঙ্গা
গ জটিল হাড়ভাঙ্গা ঘ বদ্ধ হারভাঙ্গা

১২২. উন্মুক্ত হাড়ভাঙ্গার অপর নাম- [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক সাধারণ হাড়ভাঙ্গা খ যৌগিক হাড়ভাঙ্গা
গ জটিল হাড়ভাঙ্গা ঘ কয়েক টুকরা বিশিষ্ট হাড়ভাঙ্গা

উত্তরমালা

১.(গ); ২.(খ); ৩.(ঘ); ৪.(ঘ); ৫.(ঘ); ৬.(গ); ৭.(ক); ৮.(গ); ৯.(গ); ১০.(খ); ১১.(গ); ১২.(গ); ১৩.(ক); ১৪.(ক); ১৫(খ); ১৬.(খ); ১৭.(খ); ১৮.(গ); ১৯.(গ); ২০.(ঘ); ২১.(ক); ২২.(খ); ২৩.(খ); ২৪.(ঘ); ২৫.(খ); ২৬.(গ); ২৭.(ঘ); ২৮.(ঘ); ২৯.(খ); ৩০.(খ); ৩১.(গ); ৩২.(গ); ৩৩.(খ); ৩৪.(খ); ৩৫.(খ); ৩৬.(ক); ৩৭.(খ); ৩৮.(গ); ৩৯.(গ); ৪০.(ক); ৪১.(ঘ); ৪২.(গ); ৪৩.(ঘ); ৪৪.(ক); ৪৫.(ক); ৪৬.(গ); ৪৭.(ক); ৪৮.(ক); ৪৯.(গ); ৫০.(গ); ৫১.(গ); ৫২.(ক); ৫৩.(খ); ৫৪(খ); ৫৫(ক); ৫৬.(ক); ৫৭.(গ); ৫৮.(খ); ৫৯.(ঘ); ৬০.(ক); ৬১.(গ); ৬২.(ক); ৬৩.(গ); ৬৪.(খ); ৬৫.(ঘ); ৬৬.(ক); ৬৭.(গ); ৬৮.(গ); ৬৯.(ক); ৭০.(ক); ৭১.(খ); ৭২.(খ); ৭৩.(ক); ৭৪.(গ); ৭৫.(খ); ৭৬.(গ); ৭৭.(ঘ); ৭৮.(গ); ৭৯.(খ); ৮০.(ক); ৮১.(গ); ৮২.(গ); ৮৩.(ঘ); ৮৪.(গ); ৮৫.(ঘ); ৮৬.(ঘ); ৮৭.(ক); ৮৮.(খ); ৮৯.(খ); ৯০.(ক); ৯১.(খ); ৯২.(খ); ৯৩.(ঘ); ৯৪.(ঘ); ৯৫.(গ); ৯৬.(খ); ৯৭.(ক); ৯৮.(ঘ); ৯৯.(গ); ১০০.(ক); ১০১.(ক); ১০২.(ঘ); ১০৩.(খ); ১০৪.(ক,গ); ১০৫.(ক); ১০৬.(ঘ); ১০৭.(ঘ); ১০৮.(গ); ১০৯.(খ); ১১০.(ক); ১১১.(খ); ১১২.(ঘ); ১১৩.(খ); ১১৪.(গ); ১১৫.(ঘ); ১১৬.(গ); ১১৭.(গ); ১১৮.(গ); ১১৯.(ক); ১২০.(ঘ); ১২১.(ঘ); ১২২.(খ)।

2020/8/4 17:50
Scanned with CamScanner

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. কঙ্কালতন্ত্র কাকে বলে?
২. অস্টিওলজি কী?
৩. মায়োলজি কী?
৪. কঙ্কালতন্ত্র কী? [দি. বোর্ড-১৫]
৫. অক্ষীয় কঙ্কাল কী?
৬. উপাঙ্গীয় কঙ্কাল কী?
৭. কশেরুকা কী?
৮. মেরুদণ্ডে কয়টি কশেরুকা আছে?
৯. সুচার কী?
১০. স্যাক্রাম কী? [কু. বোর্ড-১৯]
১১. কক্সিক্স কী?
১২. বিউটি বোন কী?
১৩. কলার বোন কী?
১৪. ইনোমিনেট অস্থি/হিপ বোন কী?
১৫. অ্যাসিটাবুলাম কী?
১৬. ইন্টারকোস্টাল স্পেস কী?
১৭. অবটুরেটর ফোরামেন কী?
১৮. ফোরামেন অব মেগনাম/ মহাবিবর কী?
১৯. ভার্টিব্রা প্রমিনেন্স কী?
২০. প্যাটেলা কী?
২১. বক্ষঅস্থিচক্র কী?
২২. শ্রোণিচক্র কী?
২৩. আসল বা প্রকৃত পর্শুকা কী?
২৪. অস্থি কী?
২৫. অস্থি বা হাড়ের প্রধান রাসায়নিক উপাদান কী? [ব.বোর্ড-১৫]
২৬. তরুণাস্থি কী?
২৭. হায়ালিন তরুণাস্থি কী?
২৮. অস্থিসন্ধি কী?
২৯. সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি কী?
৩০. কণ্ডরা বা টেনডন কী?
৩১. অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট কী?
৩২. গ্লেনয়েড গহ্বর কী?
৩৩. পেশি বা পেশি কলা কী?
৩৪. এন্ডোমাইসিয়াম কী?
৩৫. ফ্যাসিকুলাস কী? [সকল বোর্ড-১৮]
৩৬. পেরিমাইসিয়াম কী?
৩৭. এপিমাইসিয়াম কী?
৩৮. সারকোলেমা কী?
৩৯. সারকোপ্লাজম কী?
৪০. মায়োফাইব্রিল কী?
৪১. মায়োফিলামেন্ট কী?
৪২. কঙ্কাল পেশি বা ঐচ্ছিক পেশি কী?
৪৩. অনৈচ্ছিক পেশি কী? [রা. বোর্ড-১৭]
৪৪. হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি কী?
৪৫. অ্যাকটিন ও মায়োসিন কী?
৪৬. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক কী?
৪৭. পেশিটান কী?
৪৮. রাইগর মর্টিস কী?
৪৯. অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি কাকে বলে?
৫০. লিভার কী?
৫১. অস্থিভঙ্গ কী?
৫২. প্রাথমিক চিকিৎসা কী?
৫৩. স্থানচ্যুতি বা সন্ধিচ্যুতি কী?
৫৪. মচকানো কী? [সি.বোর্ড-১৭]
৫৫. স্ট্রেইন কী?
৫৬. RICE কী?
৫৭. মায়াসথেমিয়া গ্রেভিস কী?
৫৮. টিটেনি কী?
৫৯. ম্যাসক্যুলার ডিস্ট্রফি কী?
৬০. আর্থ্রাইটিস কী?
৬১. অস্টিওপোরোসিস কী?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. কঙ্কালতন্ত্রের কাজ লিখ।
২. কঙ্কালতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস লিখ।
৩. মানুষের মোট অস্থির সংখ্যার বিন্যাস দেখাও।
৪. মেরদণ্ডের কাজ লিখ।
৫. বক্ষঅস্থিচক্রের কাজ লিখ।
৬. শ্রোণিচক্রের কাজ লিখ।
৭. অ্যাটলাসের বৈশিষ্ট্য লিখ।
৮. অ্যাক্সিসের বৈশিষ্ট্য লিখ।
৯. সব কশেরুকাই অস্থি, কিন্তু সব অস্থি কশেরুকা নয়– কেন?
১০. যেকোনো একটি অস্থি সন্ধির চিহ্নিত চিত্র আঁক। [ব.বোর্ড-১৭]
১১. কোন তরুণাস্থি হাড়ের মতো শক্ত এবং কেন? [সকল বোর্ড-১৮]
১২. অস্থির কাজ লিখ।
১৩. তরুণাস্থির কাজ লিখ।
১৪. হ্যাভারসিয়ানতন্ত্র বা অস্টিওন বলতে কী বুঝ? [রা.বোর্ড-১৭; দি.বোর্ড-১৫]
১৫. কঙ্কাল পেশির বৈশিষ্ট্য লিখ।
১৬. কঙ্কাল পেশির শ্রেণিবিন্যাস লিখ।
১৭. অনৈচ্ছিক পেশির বৈশিষ্ট্য লিখ।
১৮. হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশির বৈশিষ্ট্য লিখ।
১৯. পেশির উপাদান লিখ।
২০. পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না কেন?
২১. ১ম কশেরুকা ও করোটির সংযোগস্থলকে প্রথম শ্রেণির লিভার বলা হয় কেন? [কু. বোর্ড-১৯]
২২. **পার্থক্য লিখ/তুলনা কর :** পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অস্থি; পুরুষ ও নারীর শ্রোণি-অস্থিচক্র; বক্ষ-অস্থিচক্র ও শ্রোণি-অস্থিচক্র; অস্থি ও তরুণাস্থি; শ্বেততন্তু ও পীততন্তু; স্বচ্ছ তরুণাস্থি, পীততন্তুময় তরুণাস্থি, শ্বেত তন্তুময় তরুণাস্থি ও ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি; সারভাইক্যাল, থোরাসিস এবং লাম্বার কশেরুকার মধ্যে তুলনা; ঐচ্ছিক পেশি, অনৈচ্ছিক পেশি ও হৃৎপেশি; টেনডন ও লিগামেন্ট

2020/8/4 17:50
Scanned with CamScanner

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

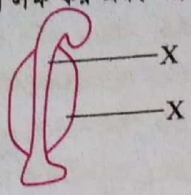

[কুমিল্লা বোর্ড-১৯]

ক. স্যাক্রাম কী?
খ. ১ম কাশেরুকা ও করোটির সংযোগস্থলকে প্রথম শ্রেণির লিভার বলা হয় কেন?
গ. 'X' এর অভ্যন্তরীণ গঠন বর্ণনা কর।
ঘ 'X' এর সঞ্চালনে 'Y' কি কোনো ভূমিকা পালন করে? আলোচনা কর।

২। জীববিজ্ঞানের ক্লাসে শিক্ষক বললেন যে, আমাদের মেরুদণ্ড কতগুলো কশেরুকার সমন্বয়ে গঠিত। কশেরুকারগুলোর মধ্যে একটি আংটি আকৃতির। এটি কঙ্কালতন্ত্রের একটি অংশ। মানবদেহের চলনে এই তন্ত্র ছাড়াও পেশিতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[সকল বোর্ড-১৮]

ক. ফ্যাসিকুলাস কী?
খ. কোন তরুণাস্থি হাড়ের মতো শক্ত এবং কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কশেরুকাটির চিত্রসহ গঠন ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই ধরনের তন্ত্রের সমন্বিত কার্যক্রমেই দেহ সঞ্চালিত হয়– বিশ্লেষণ কর।

৩। নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র-P চিত্র-Q চিত্র- R [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]

ক. সাইনুসাইটিস কী?
খ. ডিম্বাশয় চক্র বলতে কী বুঝ?
গ. চিত্রের 'P' অঙ্গ গঠনকারী পেশির বৈশিষ্ট্য লিখ।
ঘ. চিত্রের 'Q' ও 'R' অঙ্গের অন্তঃকঙ্কাল কি একই প্রকৃতির? বিশ্লেষণ কর।

৪। ফুটবল মাঠে পড়ে গিয়ে রনি পায়ে আঘাত পায়। আঘাতের ১০ মিনিটেই পায়ের সন্ধি ফুলে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথার সৃষ্টি হয়। এক্স-রে করার পর দেখা গেল তার হাড় ভাঙেনি।

[রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]

ক. অনৈচ্ছিক পেশি কী?
খ. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের আলোকে তার ফুলা ও ব্যথার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রনির সমস্যার চিকিৎসা সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।

৫। রোদেলা প্রাণিবিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষকের নিকট মানবদেহের কঙ্কালের সবচেয়ে দীর্ঘ ও মোটা অস্থিটি সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষক তাকে অস্থিটির অবস্থান, গঠন ও কাজ বুঝিয়ে বললেন। তিনি আরও বললেন, বিশেষ ধরনের কতকগুলো পেশি অস্থিটির সঞ্চালনে সাহায্য করে।

[দিনাজপুর বোর্ড-১৭]

ক. রূপান্তর কী?
খ. ল্যাটারাল লাইনের কাজ উল্লেখ কর।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অস্থিটির বর্ণনা দাও।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শেষ বাক্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৬। নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



A B

[সিলেট বোর্ড-১৭]

ক. মচকানো কী?
খ. পেরিস্ট্যালসিস বলতে কী বোঝায়?
গ. 'A' দ্বারা সৃষ্ট উপাঙ্গের বিভিন্ন অস্থিসমূহের সংখ্যা লিখ।
ঘ. 'A' এর সঞ্চালনে 'B' এর ভূমিকা অপরিহার্য– যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখ।

৭। শান্তর দাদু উঠতে বসতে এবং সোজা হয়ে ঘুমাতে দেহের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত হাড়ে ব্যথা অনুভব করেন। অর্থোপেডিক চিকিৎসকের নিকট গেলে চিকিৎসক ঔষধ দেন ও উপদেশের সঙ্গে বলেন, মাথার খুলি, মেরুদণ্ড এবং হাতে-পায়ে অনেকগুলো হাড় সংযুক্ত হয়ে আমাদের দেহ কাঠামো গঠন করে। মেরুদণ্ডের অনেকগুলো কশেরুকা প্রায় একই রকমের হয়ে থাকে। [বরিশাল বোর্ড-২০১৫]

ক. হাড়ের প্রধান রাসায়নিক উপাদান কি?
খ. যে কোনো একটি অস্থি সন্ধির চিহ্নিত চিত্র আঁক।
গ. মেরুদণ্ডের কিছু কশেরুকা দেখতে প্রায় একই রকমের– বিশ্লেষণ কর।
ঘ. হাড় দেহের কাঠামো গঠন ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে বর্ণনা কর।

৮। অন্বেষা রিকশা হতে তড়িঘড়ি করে নামতে গিয়ে পায়ের গোড়ালিতে প্রচণ্ড আঘাত পেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার গোড়ালি ফুলে গেল এবং সে ভালোভাবে হাঁটতে পারছিল না। ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে তিনি বললেন, 'তার হাড় ভাঙেনি বা স্থানচ্যুত হয়নি।' [দিনাজপুর বোর্ড-১৫]

ক. কঙ্কালতন্ত্র কী?
খ. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অন্বেষার সমস্যাটির ধরন ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি নিরাময়ে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর?

Scanned with CamScanner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়
মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

ঐতিহ্যে ৫১ বছর
কাকলী প্রকাশ লিমিটেড

Scanned with CamScanner

মানব শারীরতত্ত্ব : সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ
HUMAN PHYSIOLOGY : CO-ORDINATION AND CONTROL

অধ্যায় ৮

পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে যথাযথ সাড়া দিয়ে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখা প্রত্যেক জীবেরই একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেহকোষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখতে কিংবা কাজের নিয়ন্ত্রণে অথবা বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনে স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্তঃক্ষরা তন্ত্র উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করে। জীবদেহে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া যে সৃষ্টি করতে পারে তাকে **উদ্দীপক** বলে। আর উদ্দীপকের প্রভাবে জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাকে **উত্তেজিতা** (irritability) বলে। উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্ট উদ্দীপনা জীবদেহে সাড়া জাগায়। পরিবেশ থেকে আসা চাপ, তাপ, ব্যথা, বেদনা, স্পর্শ, আলো, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি নানা রকমের উদ্দীপনা গ্রহণের জন্য এক প্রকার গ্রাহক যন্ত্র থাকে যাকে **রিসেপ্টর (receptor)** বলে। আবার এই রিসেপ্টর থেকে গৃহীত উদ্দীপনা পরিবহনের জন্য প্রাণিদেহে অসংখ্য নিউরন বা স্নায়ুকোষ থাকে। জীবদেহে গৃহীত উদ্দীপনা যার মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে জীবদেহে ছড়িয়ে পড়ে তাকে **বাহক** বা **সঞ্চারক** (conductor) বলে। প্রতিবেদন অঙ্গ বলতে আমরা বুঝি, দেহের যেসব যন্ত্র বিভিন্ন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়। যেমন– বিভিন্ন পেশি ও গ্রন্থি। উচ্চতর প্রাণিদেহে এক বা একাধিক স্নায়ুকোষ দিয়ে গঠিত সাদা বা ধূসর রঙের যে এক রকমের সুতার মতো তন্তু দেখা যায়, তাদের **নার্ভ** বা **স্নায়ু** বলে। প্রকৃতপক্ষে স্নায়ুর সাহায্যেই স্নায়ুস্পন্দন গ্রাহক (receptor) থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র থেকে প্রতিবেদন অঙ্গে পৌঁছলে তারা উদ্দীপিত হয়। আর এর ফলে প্রাণীরা উত্তেজনায় সাড়া দেয়। রাস্তায় চলতে চলতে পায়ে কাঁটা ফুটলে বা চামড়ায় সুচ ফোটালে আমরা ব্যথা পাই। চোখে হঠাৎ উজ্জ্বল আলো পড়লে চোখ বন্ধ করি। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে দেহের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে **সমন্বয়** (Co-ordination) বলে। এ অধ্যায়ে মানবদেহের সমন্বয় ব্যবস্থা এবং এদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

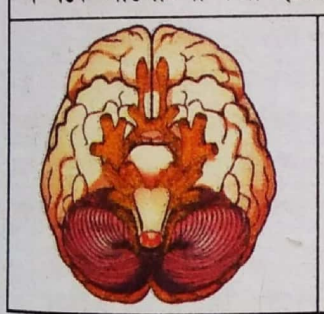
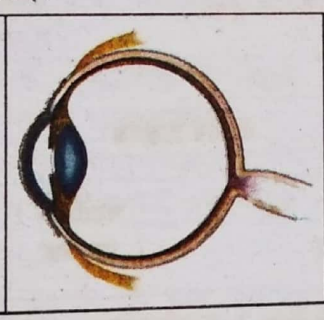
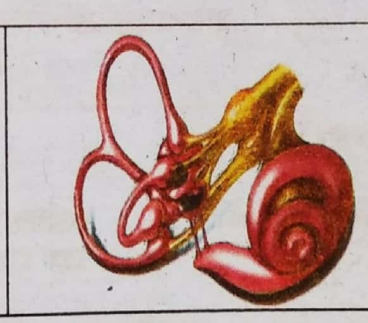
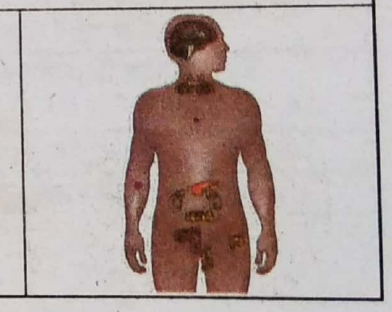

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ১২)
১. স্নায়বিক সমন্বয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. মস্তিষ্কের প্রধান অংশের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. মানুষের বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে করোটিক স্নায়ুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. মানব সংবেদী অঙ্গসমূহের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্ক তুলনা করতে পারবে। ৫. রাসায়নিক সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. মানবদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. দেহের বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব ও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• স্নায়ুবিক সমন্বয় ○ ধারণা ○ মস্তিষ্ক (গঠন, ভাগ, কাজ) ○ করটি স্নায়ু (উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কাজ) • মানব সংবেদী অঙ্গ ○ চোখ ও কান (গঠন ও কাজ) • রাসায়নিক সমন্বয় • অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া ○ পিটুইটারি, ○ থাইরয়েড, ○ এড্রেনাল, ○ গোনাড ○ অগ্নাশয় (আইলেটস অব ল্যাঙ্গারনহ্যান্স) • হরমোনের প্রভাব ও অনিয়ন্ত্রিত হরমোনের ব্যবহারের ফলাফল

Scanned with CamScanner

৮.১ স্নায়বিক সমন্বয়ের ধারণা (Concept of Neural Coordination)

প্রাণী যে প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে দেহের সকল কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তাকে **সমন্বয়** (coordination) বলে। প্রাণীর সমগ্র সমন্বয় ব্যবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– **স্নায়বিক সমন্বয়** ও **রাসায়নিক সমন্বয়**। স্নায়বিক সমন্বয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে ও রাসায়নিক সমন্বয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্রের (হরমোন) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। স্নায়ুতন্ত্র প্রাণিদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। এটি প্রাণিদেহের বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ, তন্ত্র, কলা ও কোষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে স্নায়বিক সমন্বয় সম্পন্ন করে।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)

নিউরন সমন্বিত যে তন্ত্রের অঙ্গসমূহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ সাধন ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করে এবং বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে বিভিন্ন পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে **স্নায়ুতন্ত্র** বলে।



চিত্র ৮.১ : মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ

১। প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

২। দেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা গ্রহণ করা।

৩। উদ্দীপকে সাড়া দিয়ে নিজ নিজ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা।

৪। দেহস্থ বিভিন্ন পেশি সংকোচন ও বিভিন্ন গ্রন্থির ক্ষরণে সহায়তা করা।

৫। মানসিক প্রবৃত্তি, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ : সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রকে ২টি প্রধান তন্ত্রে ভাগ করা যায়, যথা– **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** ও **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র**।

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাসের ছক

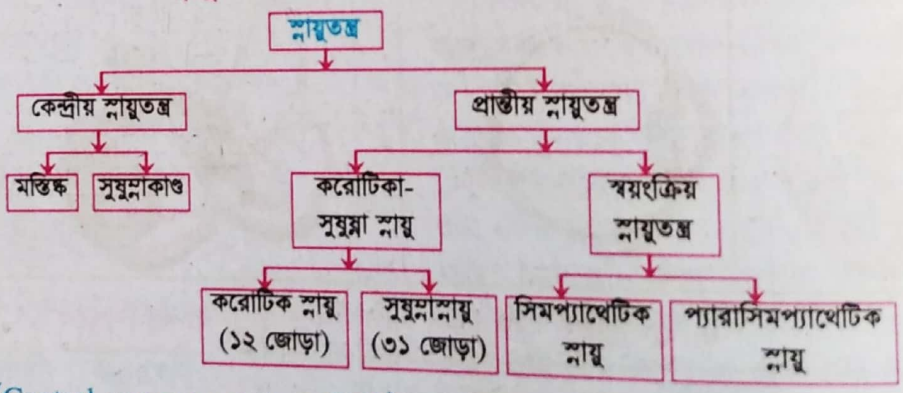

১। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system-CNS) : মানুষসহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠদেশে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত অর্থাৎ কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর **মস্তিষ্ক** ও **সুষুম্নাকাণ্ড** নিয়ে গঠিত, স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ স্নায়বিক কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** বলে। স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ দেহের ভাবুক বা তথ্য প্রসেসর হিসেবে কাজ করে। এর দুটি প্রধান অংশ, যথা– i. **মস্তিষ্ক** (brain) ও ii. **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord)। দেহের পৃষ্ঠীয় মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত ফাঁপা নলাকৃতি স্নায়ুতন্ত্রের অগ্রভাগে অবস্থিত স্ফীত অংশকে বলা হয় **মস্তিষ্ক** এবং পশ্চাতের সরু দণ্ডাকৃতি অংশের নাম **সুষুম্নাকাণ্ড**। **ফোরামেন ম্যাগনাম** (foramen magnum) নামক বিবরে মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের ফাঁপা গহ্বরে অর্থাৎ নিউরোসিলে একপ্রকার লসিকা জাতীয় তরল থাকে। এই তরলকে বলা হয় **মস্তিষ্ক-সুষুম্না রস** (Cerebrospinal fluid-CSF)। সমগ্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড তিনটি তন্তুময় আবরক দ্বারা গঠিত **মেনিনজেস** (meninges) নামক ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। এই আবরক তিনটি হলো- (i) **বহিঃস্থ দৃঢ় আবরক** বা **ডুরা ম্যাটার** (dura mater), (ii) **মধ্যস্থ আবরক ঝিল্লি** বা **অ্যারাকনয়েড ম্যাটার** (arachnoid mater) ও (iii) **অন্তঃআবরক ঝিল্লি** বা **পায়া ম্যাটার** (pia mater)। মেনিনজেস জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হলে **মেনিনজাইটিস** (meningitis) রোগ হয়। মস্তিষ্কের বাইরের দিকে **ধূসর পদার্থ** (gray matter) এবং ভেতরের দিকে **শ্বেতপদার্থ** (white matter) থাকে। কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডের ভেতরের দিকে ধূসর পদার্থ এবং বাইরের দিকে শ্বেত পদার্থ থাকে।

Scanned with CamScanner

২। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system-PNS) : মানবদেহে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরের করোটিক স্নায়ু ও সুষুম্নাস্নায়ুগুলো একত্রে যে স্নায়ুতন্ত্র গঠন করে তাকে **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র** বলে। এই অংশ অভিনেতা বা কুশীলব হিসেবে পরিচিত। মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন ৩১ জোড়া সুষুম্নাস্নায়ু এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র** গঠিত। এসব স্নায়ু দেহের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্র (visceral organ) বা বিভিন্ন অংশে বিস্তার লাভ করে এবং এ অঙ্গসমূহ বা অংশসমূহ থেকে **সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা** (sensory impulse)-কে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পরিবাহিত করে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কার্যকরী নির্দেশ ঐ সমস্ত অঙ্গ বা অংশে পরিবাহিত করে। তার ফলে ঐ সমস্ত অঙ্গে বা অংশে প্রতিক্রিয়া ঘটে ও বিভিন্ন কার্য সম্পাদিত হয়।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বা আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system or Visceral nervous system) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে সৃষ্ট স্নায়ুসমূহের দ্বারা গঠিত স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ দেহের আন্তরযন্ত্রের (visceral organs) বিভিন্ন কাজ (যেমন– হৃৎস্পন্দনের হার, লালা ক্ষরণ, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলন ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে তাকে **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বা আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** বলে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে (অনৈচ্ছিক) এরা কার্য সম্পাদনে সক্ষম। দেহের ভেতরের অঙ্গসমূহ যেমন– হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি, ফুসফুস, অন্ত্র, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, গ্রন্থি এবং সমগ্র দেহের অনৈচ্ছিক পেশির সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণসহ ইত্যাদির কাজ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু দু'রকম। যথা– **সিমপ্যাথেটিক** (sympathetic) এবং **প্যারাসিমপ্যাথেটিক** (parasympathetic)। এদের উৎপত্তি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে। সুষুম্নাকাণ্ডের বক্ষ ও কটিদেশের খণ্ড থেকে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর উৎপত্তি হয়। প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ু কয়েকটি করোটিক স্নায়ুর (III, VII, IX এবং X) স্নায়ুকেন্দ্র থেকে এবং সুষুম্নাকাণ্ডের স্যাক্রাল খণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়। সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুগুলো সাধারণত বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়ার উদ্দীপনা জোগায় এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুগুলো সাধারণত বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়ার উদ্দীপনা দমিত করে বা ওদের দমনমূলক কাজে সাহায্য করে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও পেরিফেরাল বা প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র	প্রান্তীয় বা পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্র
১। সংজ্ঞা	মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে যে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত তাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে।	করোটিক স্নায়ু, সুষুম্না স্নায়ু ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু নিয়ে যে স্নায়ুতন্ত্র তাকে পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্র বলে।
২। উৎপত্তি	সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়।	মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়।
৩। সংখ্যা	করোটিকার মধ্যে অবস্থিত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরজ্জু দুটি প্রধান অংশ।	স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু ও ৩১ জোড়া সুষুম্না স্নায়ু নিয়ে গঠিত।
৪। প্রতিরক্ষামূলক আবরণ	মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড উভয়েরই তিনটি করে প্রতিরক্ষাকারী আবরণ আছে।	তেমন কোনো প্রতিরক্ষাকারী আবরণ নেই।
৫। গহ্বর	মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের ভেতরে বেশ কিছু গহ্বর আছে।	তেমন কোনো গহ্বর নেই।
৬। বিস্তৃতি	মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরজ্জুতেই এর বিস্তার।	মস্তিষ্ক থেকে বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রীয়ে বিস্তার।

স্নায়ুকলা (Nervous tissue)

ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উৎপন্ন যে কলা কোনো উদ্দীপনা গ্রহণ করে তার উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম তাকে **স্নায়ুকলা** বলে। অসংখ্য **স্নায়ুকোষ** বা **নিউরন** ও কিছু সংখ্যক **নিউরোগ্লিয়া** বা **ধারক** কোষের সমন্বয়ে স্নায়ুকলা গঠিত। তবে স্নায়ুকলার প্রধান উপাদান হলো নিউরন।

নিউরন (Neurone)

কোষদেহ ও সব ধরনের প্রবর্ধক নিয়ে গঠিত স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একককে **নিউরন** বলে।

গঠন (Structure) : নিউরন দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা–

১। কোষদেহ বা সোমা বা সেল বডি (Cell body) : এটি একক পর্দাবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমযুক্ত গোলাকার, ডিম্বাকার বা নক্ষত্রাকার অংশবিশেষ। এর মধ্যে নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম (নিউরোপ্লাজম), **নিসল দানা** (nissl's granule), নিউরোফাইব্রিল, **বারবস্তু** (barr bodies) ও বিভিন্ন ধরনের কোষঅঙ্গাণু থাকে। উল্লেখ্য, নিউরনের সেন্ট্রোজোমটি নিষ্ক্রিয় হওয়ায় নিউরন বিভাজিত হয় না। নিউরনের কোষদেহকে **নিউরোসাইটন** (neurocyton) বলে। নিসল দানা প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

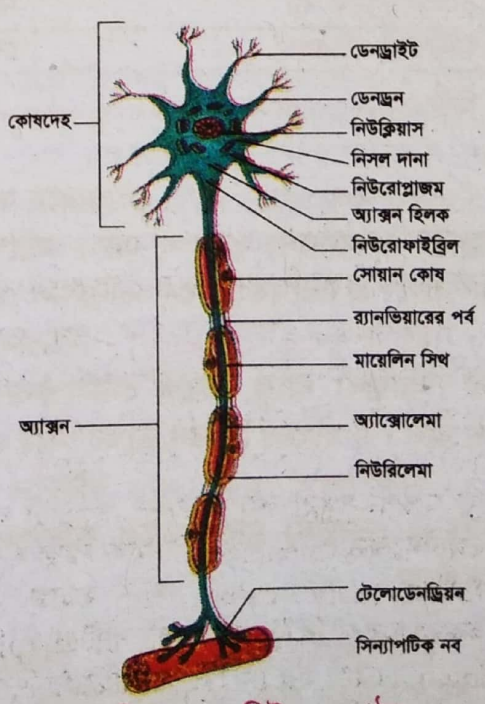

চিত্র ৮.২ : নিউরনের গঠন

Scanned with CamScanner

২। প্রবর্ধক বা প্রসেস (Process) : নিউরনে দু'রকমের প্রবর্ধক থাকে। যথা– (ক) **অ্যাক্সন** ও (খ) **ডেনড্রন**। এদের একত্রে **নিউরাইটস** (neurites) বলে।

(ক) অ্যাক্সন (Axon) : এটি নিউরনের দীর্ঘ চেষ্টীয় প্রবর্ধক। এটি সাধারণত শাখাহীন বা স্বল্প শাখাযুক্ত হয়। অ্যাক্সনের শাখাকে **অক্ষশাখা** (collateral) বলে। অ্যাক্সনের কোষদেহ সংলগ্ন অংশটি নিউরিলেমা আবরণবিহীন হয়। এই অংশকে **অ্যাক্সন হিলক** (axon hillock) বলে। অ্যাক্সনের সাইটোপ্লাজমকে **অ্যাক্সোপ্লাজম** (axoplasm) বলে। অ্যাক্সনে নিসল দানা থাকে না। অ্যাক্সনটি **নিউরিলেমা** (neurilemma) নামক আবরণে আবৃত থাকে। এছাড়াও নিউরনে **অ্যাক্সোলেমা** (axolemma) ও **মায়েলিন সিথ** (myelin sheath) বা **মেডুলারি আবরণ** (medullary sheath) থাকে। নিউরিলেমার নিচে **সোয়ান কোষ** (schwann cell) থাকে। নিউরিলেমা মাঝে মাঝে সংকুচিত হয়ে **র‍্যানভিয়ারের পর্ব** (nodes of ranvier) গঠন করেছে, যেখানে মেডুলারি আবরণ থাকে না।

অ্যাক্সনের শেষপ্রান্ত অসংখ্য সূক্ষ্ম শাখান্বিত হয়ে **প্রান্তবুরুশ** বা **এন্ড ব্রাশ** (end brush) বা টেলোডেনড্রিয়া (telodendri, একবচনে telodendrion) গঠন করে। টেলোডেনড্রিয়ার শেষ প্রান্তের স্ফীত অংশের নাম সিন্যাপটিক **নব** (synaptic knob)। অ্যাক্সন লম্বায় ১ মিটারের বেশি হতে পারে। সমস্ত দীর্ঘ স্নায়ুতন্তুগুচ্ছকে (bundle) **স্নায়ু** (nerve) বলে।

(খ) ডেনড্রন (Dendron) : ডেনড্রন কোষদেহ থেকে উৎপন্ন ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখাযুক্ত সংজ্ঞাবহ বা সংবেদী প্রবর্ধক। ডেনড্রনের এক-একটি শাখাকে **ডেনড্রাইট** (dendrite) বলে। ডেনড্রনে নিউরোপ্লাজম, নিউরোফাইব্রিল ও নিসল দানা থাকে। ডেনড্রন উহার শাখা দ্বারা (ডেনড্রাইট) অন্য একটি নিউরনের সাথে যুক্ত থাকে। ডেনড্রাইটের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা কোষদেহ বা সোমার দিকে প্রেরিত হয়। স্নায়ুতন্ত্রে নিউরনের সোমা ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হয়ে **গ্রে ম্যাটার** (grey matter) এবং অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট একত্রিত হয়ে **হোয়াইট ম্যাটার** (white matter) গঠন করে।

নিউরনের কাজ : নিউরনের প্রধান কাজ হলো স্নায়ুস্পন্দন পরিবহন করা। সংজ্ঞাবহ নিউরন স্নায়ু-আবেগকে রিসেপ্টর থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং চেষ্টীয় নিউরন প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে ইফেক্টর অঙ্গে বহন করে।

অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অ্যাক্সন	ডেনড্রাইট
১। প্রতিটি স্নায়ুকোষে সংখ্যা	একটি মাত্র	এক বা একাধিক কখনও অনুপস্থিত
২। প্রকৃতি	চেষ্টীয় প্রবর্ধক	সংবেদী প্রবর্ধক
৩। দৈর্ঘ্য	লম্বা	খাটো
৪। শাখা-প্রশাখা	নেই	আছে
৫। মেডুলারি আবরণ	আছে	নেই
৬। র‍্যানভিয়ারের পর্ব	থাকে	থাকে না
৭। উদ্দীপনা পরিবহন	কোষদেহ থেকে দূরে	দূর থেকে কোষদেহে

নিউরনের প্রকারভেদ (Types of neurone)

(ক) গঠন অনুসারে নিউরন পাঁচ প্রকার, যথা–

১। অ্যাপোলার (Apolar) : কোষদেহে যখন কোনো প্রবর্ধক (ডেনড্রাইট ও অ্যাক্সন) থাকে না তাকে অ্যাপোলার বা মেরুহীন নিউরন বলে। এ ধরনের নিউরন অ্যাড্রিনাল মেডুলায় থাকে।

২। ইউনিপোলার (Unipolar) : নিউরনে যখন একটি মাত্র প্রবর্ধক (অ্যাক্সন) থাকে, তাকে ইউনিপোলার বা একমেরুযুক্ত নিউরন বলে। এ ধরনের নিউরন ভ্রূণের দেহে থাকে।

৩। বাইপোলার (Bipolar) : নিউরনে যখন দুটি প্রবর্ধক (অ্যাক্সন ও ডেনড্রন) থাকে তাকে বাইপোলার বা দ্বিমেরুযুক্ত নিউরন বলে।

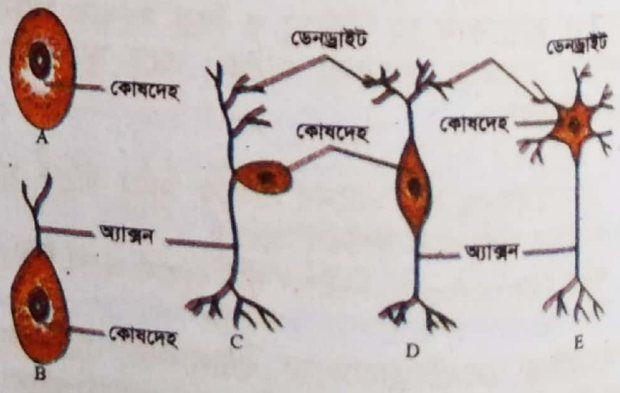

চিত্র ৮.৩ : নিউরনের প্রকারভেদ : A. অ্যাপোলার, B. ইউনিপোলার, C. সিউডোইউনিপোলার, D. বাইপোলার, E. মাল্টিপোলার

৪। মাল্টিপোলার (Multipolar) : নিউরনে যখন তিন বা ততোধিক প্রবর্ধক থাকে তখন তাকে মাল্টিপোলার বা বহুমেরুযুক্ত নিউরন বলে। এ ধরনের নিউরন কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রে থাকে।

Scanned with CamScanner

৫। **সিউডোইউনিপোলার** (Pseudounipolar) : কোষদেহ থেকে একটি প্রবর্ধক নির্গত হয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। এ ধরনের নিউরন সুষুম্নাকাণ্ডের বাইরের অংশে থাকে।

(খ) কাজের ভিত্তিতে নিউরন তিন প্রকার, যথা–

১। **সংজ্ঞাবহ নিউরন** (Sensory neurone) : এই প্রকার নিউরন স্নায়ুস্পন্দনকে রিসেপ্টর থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে।

২। **চেষ্টীয় নিউরন** (Motor neurone) : এই প্রকার নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন অঙ্গে প্রেরণ করে।

৩। **সহযোগী নিউরন** (Adjustor neurone) : এই প্রকার নিউরন সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয় নিউরনের মধ্যে সংযোগ সাধন করে।

সংজ্ঞাবহ স্নায়ু ও চেষ্টীয় স্নায়ুর পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সংজ্ঞাবহ স্নায়ু	চেষ্টীয় স্নায়ু
১। গঠন	অন্তর্মুখী স্নায়কোষে গঠিত।	বহির্মুখী স্নায়ুকোষে গঠিত।
২। স্নায়ু আবেগ সংগ্রহ	দেহের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে।	দেহের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কাজ করার নির্দেশ পৌঁছে দেয়।
৩। স্নায়ু আবেগ পরিবহন	গ্রাহক কোষ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পরিবহন করে।	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিবহন করে।
৪। শাখা-প্রশাখার সমাপ্তি	সাধারণত জ্ঞানেন্দ্রীয়।	সাধারণত পেশিতে।
৫। সংখ্যা	সংজ্ঞাবহ স্নায়ু অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় কম।	চেষ্টীয় স্নায়ুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি।

স্নায়ুতন্তু (Nerve fibre)

নিউরনের চেষ্টীয় প্রবর্ধক অর্থাৎ অ্যাক্সনকে **স্নায়ুতন্তু** বলে। গঠন অনুসারে স্নায়ুতন্তু প্রধানত দুই প্রকার, যথা– ১। **মায়েলিন সিথযুক্ত বা মেডুলারি** আবরণযুক্ত স্নায়ুতন্তু ও ২। **মায়েলিন সিথবিহীন বা মেডুলারি** আবরণবিহীন স্নায়ুতন্তু।

স্নায়ু (Nerve)

এপিনিউরিয়াম নামক যোজক কলার আবরণী বেষ্টিত, রক্তবাহ ও ফ্যাট কোষযুক্ত স্নায়ুতন্তুগুচ্ছকে **স্নায়ু** বলে।

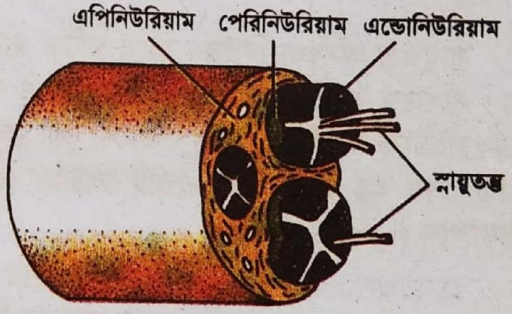

চিত্র ৮.৪ : প্রস্থচ্ছেদে স্নায়ুর অংশ

গঠন (Structure) : স্নায়ুতে যোজক কলার তিনটি আবরণ থাকে। যথা– বাইরেরটি **এপিনিউরিয়াম** (epineurium), মাঝেরটি **পেরিনিউরিয়াম** (perineurium) এবং ভেতরেরটিকে **এন্ডোনিউরিয়াম** (endoneurium) বলে।

প্রকারভেদ (Types)

(ক) গঠন অনুসারে স্নায়ু দুই প্রকার, যথা–

১। **মেডুলেটেড স্নায়ু** (Medulated nerve) : এ ধরনের স্নায়ুর স্নায়ুতন্তুতে মেডুলারি আবরণ থাকে।

২। **নন মেডুলেটেড স্নায়ু** (Non-medulated nerve) : এ ধরনের স্নায়ুতন্তুতে মেডুলারি আবরণ থাকে না।

(খ) কাজ অনুসারে স্নায়ু দুই প্রকার, যথা–

১। **অন্তর্বাহী স্নায়ু** (Afferent nerve) : যে স্নায়ু উদ্দীপনা রিসেপ্টর থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বহন করে তাকে অন্তর্বাহী স্নায়ু বলে। এ প্রকার স্নায়ু সংজ্ঞাবহ বা সংবেদী নিউরন দিয়ে গঠিত। যেমন– অপটিক স্নায়ু।

২। **বহির্বাহী স্নায়ু** (Efferent nerve) : যে স্নায়ু উদ্দীপনা বা সাড়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে প্রান্তীয় অঞ্চলে বহন করে তাকে বহির্বাহী স্নায়ু বলে। এ ধরনের স্নায়ু চেষ্টীয় নিউরন দিয়ে গঠিত। যেমন– হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু।

এছাড়াও কিছু স্নায়ু আছে যারা উদ্দীপনা উভয়দিকে পরিবহন করে এবং সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয় উভয় নিউরন দিয়ে গঠিত। এদের **মিশ্র স্নায়ু** (mixed nerve) বলে। যেমন– ভেগাস স্নায়ু।

নিউরোগ্লিয়া (Neuroglea)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যোজক কলাকে **নিউরোগ্লিয়া** বলে। নিউরনের সুরক্ষাই ইহার প্রধান কাজ। নিউরনের মৃত্যুর পর নিউরোগ্লিয়া তার স্থান দখল করে। এটি এক ধরনের পরিবর্তিত যোজক কলা। স্নায়ুতন্ত্রের কোষ সমষ্টির 90% নিউরোগ্লিয়া। এরা স্নায়ুস্পন্দন পরিবহন করতে পারে না। এরা বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন– (১) তারকাকার **অ্যাস্ট্রোসাইট** (astrocyte): এরা নিউরনে পুষ্টি সরবরাহ করে; (২) স্বল্প প্রবর্ধকযুক্ত **অলিগোডেন্ড্রোগ্লিয়া** বা **অলিগোডেন্ড্রোসাইট** (oligodendroglea or oligodendrocyte): এরা স্নায়ুরজ্জুর মায়েলিন আবরণী গঠন করে এবং (৩) ক্ষুদ্রাকার **মাইক্রোগ্লিয়া** (microglea): এরা গতিশীল এবং ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে।

Scanned with CamScanner

নিউরোগ্লিয়ার কাজ : এরা ধারক কোষ হিসেবে কাজ করে। আগ্রাসী কোষ হিসেবে কাজ করে। স্নায়ুকোষে আয়ন পরিবহনে সহায়তা করে। মায়েলিন সিথ গঠনে অংশ নেয়।

নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitters)

স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে যেসব রাসায়নিক বস্তু স্নায়ু উদ্দীপনার তথ্যকে এক নিউরন হতে অন্য নিউরন কিংবা পেশি কোষ কিংবা কোনো গ্রন্থিতে পরিবহনে সহায়তা করে তাদের **নিউরোট্রান্সমিটার** বলে। নিউরন থেকে ক্ষরিত কোনো রাসায়নিক দ্রব্য যখন রক্তে প্রবেশ করে এবং হরমোনের ন্যায় কাজ করে তখন তাকে **নিউরোহরমোন** (neurohormone) বলে।

স্নায়ু প্রান্ত থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক বস্তু যখন বহিঃকোষীয় তরল বা কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গে মুক্ত হয় তখন তাকে **নিউরোসিক্রেশন** (neurosecretion) বলে। নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে যেসব রাসায়নিক পদার্থই গণ্য হয়, সেগুলো– (১) সংশ্লিষ্ট নিউরনে সংশ্লেষিত হয়; (২) প্রিসিন্যাপটিক প্রান্তে সঞ্চিত থাকতে পারে; (৩) কেবলমাত্র সিন্যাপসে মুক্ত হয়; (৪) পোস্টসিন্যাপটিক মেমব্রেনে সুনির্দিষ্ট রিসেপ্টর দ্বারা গৃহীত হয় ও (৫) ক্রিয়া শেষে খুব দ্রুত উপযোগী মাধ্যম দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিউরোট্রান্সমিটারের নাম ও প্রকৃতি : (১) **জৈব অ্যামিনো :** সেরোটোনিন, নরইপিনেফ্রাইন, হিস্টামিন, ডোপামিন, ইপিনেফ্রাইন; (২) **পেপটাইড :** নিউরোটেনসিন, সোমাটোস্টেটিন, ডাইনোরফিন, সাব্‌সটেন্স-P, এন্ডোরফিন; (৩) **অ্যামিনো এসিড :** অ্যাসপারটিক এসিড, গ্লুটামিক এসিড, গ্লাইসিন, GABA এবং (৪) **অন্যান্য :** অ্যাসেটিলকোলিন, ATP, অ্যাডিনোসিন, CO, প্রোস্টাগ্লান্ডিন, নাইট্রিক অক্সাইড (NO)।

সিন্যাপস (Synapse)

স্নায়ুতন্ত্র অসংখ্য নিউরন নিয়ে গঠিত হলেও নিউরনগুলোর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ থাকে না। সাধারণ একটি নিউরনের **অ্যাক্সন** প্রান্ত অন্য নিউরনের **ডেনড্রাইট** প্রান্তের খুব কাছে অবস্থান করে কিন্তু অ্যাক্সন ডেনড্রাইটকে স্পর্শ করে না। এভাবে, **দুটি স্নায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁকযুক্ত সংযোগস্থল যেখানে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের প্রান্ত শেষ হয় এবং অন্য একটি নিউরন (যেকোনো অংশ অর্থাৎ অ্যাক্সন ডেনড্রাইট বা সোমা) শুরু হয়, তাকে সিন্যাপস** (synapse) **বলে**।

সিন্যাপস-এর গঠন : দুটি নিউরনের অংশ মিলিত হয়ে সিন্যাপস গঠন করে। যে নিউরনের অ্যাক্সন সিন্যাপস গঠনে অংশ নেয় তাকে **প্রিসিন্যাপটিক নিউরন** বলে। সিন্যাপস গঠনকারী অন্য নিউরনকে **পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন** বলা হয়। প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের প্রিসিন্যাপটিক ঝিল্লি এবং পোস্টসিন্যাপটিক নিউরনের পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লি সম্মিলিতভাবে সিন্যাপস গঠন করে। এ দুটি ঝিল্লির মাঝে প্রায় 20nm (ন্যানোমিটার) ফাঁক থাকে। এই ফাঁককে **সিন্যাপটিক ক্লেফট** (synaptic cleft) বলে। প্রিসিন্যাপটিক ঝিল্লি প্রকৃতপক্ষে প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তের অংশ। অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তকে **সিন্যাপটিক নব** (synaptic knob) বলে। এই নবের ভেতরে অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইক্রোফিলামেন্ট এবং নিউরোট্রান্সমিটারযুক্ত ভেসিকল থাকে। পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লি, পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন সোমা বা ডেনড্রাইট বা অ্যাক্সনের অংশ।

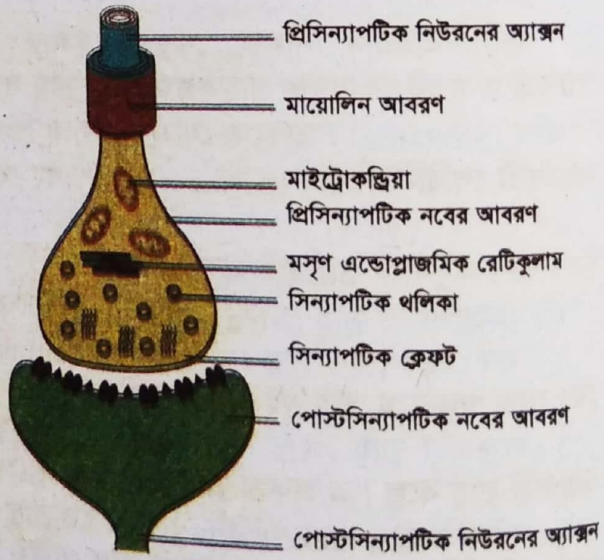

চিত্র ৮.৫ক : সিন্যাপসের গঠন

সিন্যাপসের প্রকারভেদ : সিন্যাপস চার রকম, যথা–

১। **অ্যাক্সোসোমাটিক সিন্যাপস** (Axosomatic synapse) : এ জাতীয় সিন্যাপসে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের শাখা প্রান্তগুলো অন্য নিউরনের সোমাক কোষদেহের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

২। **অ্যাক্সোডেনড্রাইটিক সিন্যাপস** (Axodendritic synapse) : এ জাতীয় সিন্যাপসে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের শাখা প্রান্তগুলো অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

৩। **অ্যাক্সোঅ্যাক্সোনিক সিন্যাপস** (Axoaxonic synapse) : এ জাতীয় সিন্যাপসে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের শাখা প্রান্তগুলো অন্য নিউরনের অ্যাক্সনের শাখা প্রান্তের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

Scanned with CamScanner

৪। **ডেনড্রোডেনড্রাইটিক সিন্যাপস** (Dendrodendritic synapse) : এ ধরনের সিন্যাপসে একটি নিউরনের ডেনড্রাইট অংশ অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

সিন্যাপসের কাজ :

১। নিউরনের প্রধান কাজ নিউরন থেকে নিউরনে তথ্য স্থানান্তর করা।
২। স্নায়ু-উদ্দীপনাকে শুধুমাত্র একদিকে প্রেরণ করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে।
৩। বিভিন্ন নিউরনের প্রতি সমন্বিত সাড়া দেয়।
৪। অতি নিচু মাত্রার উদ্দীপনাকে বাছাই করে বাদ দিয়ে দেয়।
৫। প্রচণ্ড স্নায়ু-উদ্দীপনায় নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থের ক্ষরণ কমিয়ে অতি-উদ্দীপনা প্রবাহে বাধা দেয়, ফলে কার্যকর (effector) অংশ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন (Nerve impulse transmission)

অ্যাক্সনের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন (Axonal transmission)

সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যাক্সনের বহিঃকোষীয় তরলে Na^+ ও CI^- অধিক ঘনত্বে এবং অ্যাক্সনের ভেতরের তরল বা অ্যাক্রোপ্লাজমে K^+ অধিক ঘনত্বে বিরাজ করে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, অ্যাক্সনের বহিঃকোষীয় তরলে অ্যাক্সোপ্লাজম অপেক্ষা 10 গুণ Na^+ ও CI^- আয়ন বেশি এবং অ্যাক্সোপ্লাজমে বহিঃকোষীয় তরল অপেক্ষা 25 গুণ বেশি K^+ আয়ন বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় অ্যাক্সনের বাইরে ও ভেতরে বিদ্যমান আয়নের পার্থক্যের কারণে অ্যাক্সন মেমব্রেনে

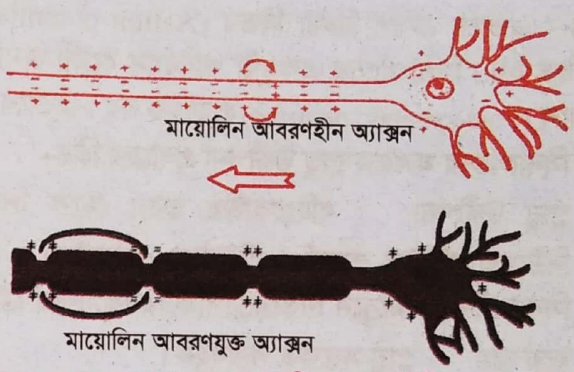

চিত্র : ৮.৫ খ : অ্যাক্সনের মধ্যদিয়ে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন

যে, বৈদ্যুতিক বিভব বজায় থাকে তাকে স্থির বিভব বা resting potential বলে। স্থির বিভব অবস্থায় অ্যাক্সন মেমব্রেনের কিছু K^+ আয়ন মেমব্রেন ভেদ করে বাইরে আসতে পারে কিন্তু আয়ন ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। এর ফলে বাহিরের তুলনায় ভেতরের ঋণাত্মক চার্জের পরিমাণ বেশি থাকে।

মেমব্রেনের কোনো স্থান অ্যাক্সন উদ্দীপিত হলে সে স্থানের ভেদ্যতার ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের ফলে মেমব্রেনের বাইরের Na^+ আয়ন অ্যাক্সনের ভেতরে প্রবেশ করে **ডিপোলারাইজেশন** (depolarization) ঘটায় অর্থাৎ মেমব্রেনের বহির্ভাগ দিক ঋণাত্মক ও ভেতরের দিক ধনাত্মক চার্জযুক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় অ্যাক্সনের মেমব্রেন অংশে যে বৈদ্যুতিক বিভব সৃষ্টি হয় তাকে ক্রিয়াবিভব (action potential) বলে। এ সময় অ্যাক্সন মেমব্রেনের উদ্দীপিত পরিবর্তিত অঞ্চল ও স্বাভাবিক অঞ্চলের মধ্যে তড়িৎবর্তনীর সৃষ্টি হয়। মেমব্রেনের বহির্ভাগের ধনাত্মক তড়িৎ প্রবাহ পরিবর্তিত অঞ্চলের ঋণাত্মক তড়িতের দিকে পরিবাহিত হয় এবং পুনরায় অন্তর্দেশীয় পরিবর্তিত অঞ্চল হতে স্বাভাবিক অঞ্চলে ফিরে আসে। এভাবে সৃষ্ট তড়িৎবর্তনী অ্যাক্সন মেমব্রেনের সন্নিহিত অঞ্চলকে ক্রমান্বয়ে উদ্দীপিত করে। এর ফলে স্নায়ু উদ্দীপনা অ্যাক্সনের দৈর্ঘ্য বরাবর উভয়দিকে সঞ্চারিত হয়। খুব শীঘ্রই উদ্দীপিত স্থানে **রিপোলারাইজেশন** (repolarization) ঘটে আবার পূর্বাবস্থা ফিরে আসে। প্রথমে স্নায়ু উদ্দীপনা অ্যাক্সনের উভয় দিকে সঞ্চারিত হলেও সাইন্যাপসের কার্যকারিতার মাধ্যমে তা একমুখী হয়ে পড়ে। অ্যাক্সন মায়োলিন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকলে উহা বহিঃকোষীয় তরলের সংস্পর্শে আসতে পারে না। কেবল র‍্যানভিয়ারের নোড বরাবর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং স্নায়ু উদ্দীপনা এক নোড হতে অন্য নোডে লাফিয়ে লাফিয়ে পরিবাহিত হয়। এতে স্নায়ু উদ্দীপনার স্বাভাবিক গতি দ্রুত হয়।

সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন (Synaptic transmission)

সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা পরিবাহিত হয়। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া নিম্নরূপ–

১। একটি স্নায়ু উদ্দীপ্ত হলে যে **স্নায়ু আবেগ** (Nerve impulse) উৎপন্ন হয় তা স্নায়ুর ভেতর দিয়ে পরিবাহিত হয়ে সিন্যাপটিক নবে পৌঁছে নবের ঝিল্লিকে উদ্দীপ্ত করে, ফলে ঝিল্লির ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়।

২। ভেদ্যতা বেড়ে গেলে নবের চারপাশের অর্থাৎ কোষবহিঃস্থ তরল পদার্থ থেকে Ca^{++} নবের মধ্যে প্রবেশ করে।

Scanned with CamScanner

৩। Ca^{++} নবের ভেতরকার তরলে (কোষমধ্যস্থ তরলে) অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়ার নিষ্ক্রিয় ATP-ase (অ্যাডোনোসিন ট্রাইফসফোটেজ) এনজাইমকে সক্রিয় করে।

৪। সক্রিয় **ATP-ase** এনজাইম ATP-কে ভেঙে তা থেকে জৈবশক্তি বের করে।

৫। এ জৈবশক্তি সিন্যাপটিক নবে অবস্থিত অ্যাসিটাইলকোলিন নামে রাসায়নিক প্রেরক পদার্থে পূর্ণ থলিগুলোকে বিদীর্ণ করে। ফলে অ্যাসিটাইলকোলিন বেরিয়ে পড়ে।

৬। অ্যাসিটাইলকোলিন সিন্যাপটিক ক্লেফট পেরিয়ে পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লিতে অবস্থিত রিসেপ্টরের উপর জমা হয়ে **অ্যাসিটাইলকোলিন রিসেপ্টর** যৌগ সৃষ্টি করে।

৭। যৌগটি পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লির ভেদ্যতা বাড়িয়ে দেয়, ফলে Na^+ ঝিল্লির ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে এবং K^+ ঝিল্লির বাইরে চলে আসে। অর্থাৎ Na^+ ও K^+ এর **আদান-প্রদান** ঘটে।

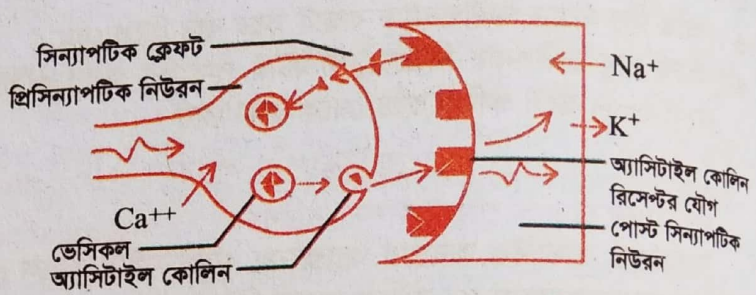

চিত্র : ৮.৫ গ : সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন

৮। এভাবে ক্রমশ **ক্রিয়া বিভব** (Action potential) এর সৃষ্টি হয়। ক্রিয়া বিভব অ্যাক্সন বা কোষদেহ বরাবর প্রবাহিত হয়। সিন্যাপসের একমুখী পরিবহন ধর্মের জন্য স্নায়ু প্রবাহ শুধু একদিকে অর্থাৎ নিউরনের অ্যাক্সন থেকে অন্য **নিউরনে** (Post-synaptic neurone) প্রবাহিত হয়। এভাবে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে উদ্দীপনা পরিবাহিত হয়।

সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা প্রবাহের চিত্র–

স্নায়ু উদ্দীপনা → বহিঃকোষীয় তরল থেকে সিন্যাপটিক নবে Ca^{++} প্রবেশ → সিন্যাপটিক ভেসিকল → নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থ (এসিটাইল কোলাইন) → প্রিসিন্যাপটিক মেমব্রেন → সিন্যাপটিক ক্লেফট → পোস্ট সিন্যাপটিক মেমব্রেনে নিউরোট্রান্সমিটার রিসেপ্টর যৌগ তৈরি। বহিঃকোষীয় তরল থেকে Na^+ প্রবেশ এবং K^+ বের হয়ে যায় → স্নায়ু সংকেত পরিবহন।

৮.২ মস্তিষ্ক : গঠন ও কাজ (Brain: Structure and Functions)

করোটি দ্বারা সুরক্ষিত মেনিনজেস পর্দাবেষ্টিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত অংশ দেহের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে **মস্তিষ্ক** বা **এনসেফালন** (brain or encephalon) বলে। ভ্রূণীয় বিকাশের সময় এক্টোডার্ম থেকে সৃষ্ট নিউরাল টিউবের সামনের অংশ স্ফীত হয়ে মস্তিষ্ক গঠন করে। মানব মস্তিষ্কই প্রাণিজগতের মধ্যে সবচেয়ে জটিল। এজন্য ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ **Sir Charles Sherrington** মস্তিষ্ককে 'great ravelled knot' বা **'বৃহৎ জটপাকানো গাঁট'** হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১৫০০ সিসি, গড় ওজন প্রায় ১.৩৬ কেজি (১২০০-১৪০০ গ্রাম) যা দেহের মোট ওজনের ২% গঠন করে। এতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১ লক্ষ কোটি) **নিউরন** এবং ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) **নিউরোগ্লিয়া** কোষ থাকে।

মানুষের মস্তিষ্ক তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা– ক. **অগ্রমস্তিষ্ক** বা **প্রোসেনসেফালন** (forebrain or prosencephalon), খ. **মধ্যমস্তিষ্ক** বা **মেসেনসেফালন** (midbrain or mesencephalon) এবং গ. **পশ্চাৎমস্তিষ্ক** বা **রম্বেনসেফালন** (hindbrain or rhombencephalon)।

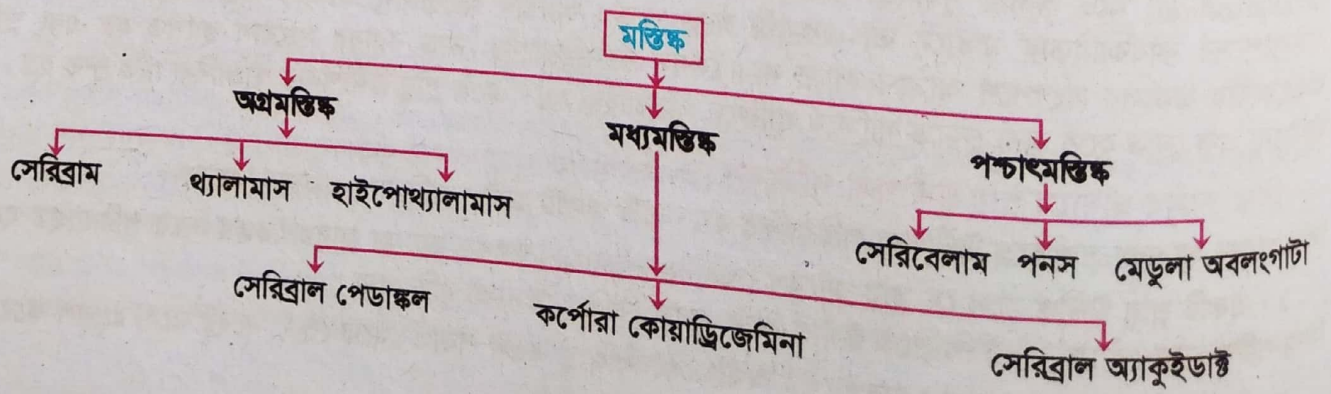

Scanned with CamScanner

মস্তিষ্কের প্রধান অংশসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

(ক) অগ্রমস্তিষ্ক বা প্রোসেনসেফালন (Forebrain or Prosencephalon) : মানুষের অগ্রমস্তিষ্ক তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা– ১. **গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম** (cerebral cortex or cerebrum), ২. **থ্যালামাস** (thalamus) ও ৩. **হাইপোথ্যালামাস** (hypothalamus)।

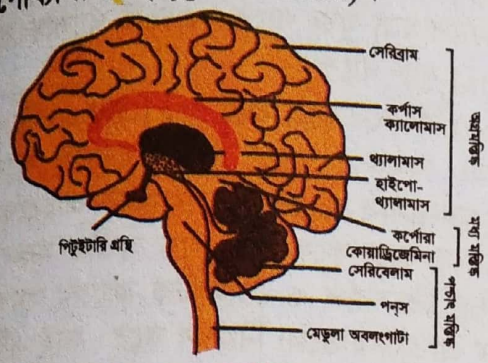

চিত্র ৮.৬ ক : মানুষের মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

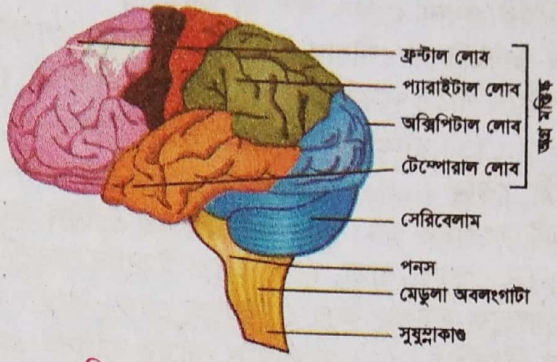

চিত্র ৮.৬ খ : মানুষের মস্তিষ্কের লোবসমূহ

১। সেরিব্রাম বা সেরিব্রাল কর্টেক্স বা টেলেনসেফালন (Cerebrum or Cerebral cortex or Telencephalon) বা **গুরুমস্তিষ্ক :** অগ্রমস্তিষ্কের যে অংশ করোটির বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে অবস্থান করে এবং প্রাণীর বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে **সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক** বলে। সেরিব্রাম (cerebrum) মানুষের মস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশ (মস্তিষ্কের ওজনের প্রায় ৮০%-ই হচ্ছে সেরিব্রাম) এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে আবৃত করে রাখে। ইহা ধূসর পদার্থ (grey matter) অর্থাৎ নিউরনের কোষদেহ নিয়ে গঠিত।

সেরিব্রামটি **একটি অনুদৈর্ঘ্য মস্তিষ্ক** খাঁজ দিয়ে দুটি গোলার্ধে বিভক্ত। এদের যথাক্রমে **ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার ও বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার** (right and left cerebral hemisphere) বলে। গোলার্ধ দুটি **করপাস ক্যালোসাম** (corpus callosum) নামক স্নায়ুযোজক দিয়ে যুক্ত থাকে। ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম অংশ এবং বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের অভ্যন্তরে একটি তরলপূর্ণ প্রকোষ্ঠ থাকে। এদের **পার্শ্বীয় প্রকোষ্ঠ** (lateral ventricle) বলে। দুটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার এর আয়তন প্রায় ১৩৫০ মিলিমিটার (সিসি)। সেরিব্রামের বহির্দেশে অবস্থিত গভীর খাঁজগুলোকে **সালকাস** (sulcus) এবং ঢেউ খেলানো ভাঁজগুলোকে **জাইরাস** (gyrus) বলে। সেরিব্রামের বহির্ভাগকে **সেরিব্রাল কর্টেক্স** (cerebral cortex) বলে, এটি ৩ সে.মি. পুরু ও **গ্রে ম্যাটার** (grey matter)-এ গঠিত। আবার অন্তর্ভাগকে **সেরিব্রাল মেডুলা** (cerebral medulla) বলে, এটি **হোয়াইট ম্যাটার** (white matter)-এ গঠিত। উল্লেখ্য যে, সুষুম্নাকাণ্ডের ক্ষেত্রে হোয়াইট ম্যাটার বাইরের দিকে এবং গ্রে ম্যাটার ভেতরের দিকে থাকে। সেরিব্রামের প্রতিটি গোলার্ধ (সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার) চারটি খণ্ড বা **লোব** (lobe) নিয়ে গঠিত। যথা–

(i) **ফ্রন্টাল লোব** (Frontal lobe) : এটি সেরিব্রামের সামনের দিকে অবস্থিত। এখানে মননকেন্দ্র ও বাকশুরু কেন্দ্র অবস্থিত।

(ii) **প্যারাইটাল লোব** (Parietal lobe) : এটি সেরিব্রামের তালুতে অর্থাৎ মাঝামাঝি অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে ভাব-নিয়ামক অঞ্চল অবস্থিত।

(iii) **টেম্পোরাল লোব** (Temporal lobe) : এটি সেরিব্রামের দুপাশে কানের ঠিক ওপরে অবস্থিত। এখানে শ্রবণকেন্দ্র থাকে।

(iv) **অক্সিপিটাল লোব** (Occipital lobe) : এটি সেরিব্রামের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত। এখানে দর্শন কেন্দ্র থাকে। পূর্বের **লিম্বিক লোব** (limbic lobe) বর্তমানে পৃথক লিম্বিকতন্ত্র নামে পরিচিত।

কাজ : (১) সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক দেহের বিভিন্ন অংশের ঐচ্ছিক কার্যকলাপ, পেশিটান, দেহভঙ্গি, বাকশক্তি ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। (২) সকল সংবেদী তথ্যকে সমন্বয় ও প্রক্রিয়াজাত করে। (৩) স্পর্শ, ব্যথা, উত্তাপ, ঠাণ্ডা এবং স্বাদ, গন্ধ বা ঘ্রাণ, দৃষ্টি, শ্রবণ ইত্যাদি অনুভূতি গ্রহণ করে। (৪) সকল বুদ্ধিদীপ্ত কাজের জন্য যেমন– স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা, পরিকল্পনা, সৃজনশীলতা, বিচার, সহজাত প্রবৃত্তি, কর্ম প্রেরণা, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

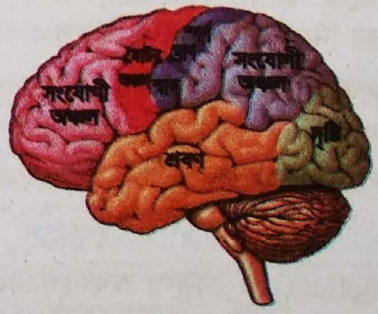

চিত্র ৮.৬ গ : মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ

Scanned with CamScanner

২। থ্যালামাস (Thalamus) : মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের দু'পাশে সেরিব্রামের নিচে এবং মধ্যমস্তিষ্কের ওপরের শ্বেত বস্তুর মধ্যে যে দুটি ধূসর বর্ণের ডিম্বাকার অংশ থাকে তাদের **থ্যালামাস** বলে। থ্যালামাস সুবৃহৎ ডিম্বাকৃতি **ধূসর পদার্থের** (grey matter) স্নায়ুপুঞ্জ বিশেষ। প্রতিটি থ্যালামাসের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ সে.মি.। একে গুরুমস্তিষ্কের বা সেরিব্রামের প্রধান প্রবেশ পথ বা **সিংহদ্বার** বলা হয়। কারণ পরিবেশ ও দেহগত সবরকম সংবাদই থ্যালামাসের মাধ্যমে গুরুমস্তিষ্কে পৌঁছায়। একটি স্নায়ুরজ্জুর যোজক দ্বারা দুটি থ্যালামাস যুক্ত থাকে। প্রতিটি থ্যালামাসের সাথে ধূসর পদার্থে গঠিত একটি পিণ্ডাকার **বেসাল গ্যাংলিয়া** (basal ganglia) যুক্ত থাকে।

কাজ : (১) থ্যালামাস প্রেরক স্থান বা **রিলে কেন্দ্র** (relay station) হিসেবে কাজ করে। (২) ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ **প্রতিবর্তী কেন্দ্র** (reflex centre)। বিভিন্ন আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া যেমন– ক্রোধ, পীড়ন ইত্যাদি থ্যালামাসের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। (৩) গুরুমস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবের মাধ্যমে থ্যালামাস ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। (৪) স্পর্শ, ব্যথা, চাপ, যন্ত্রণা ইত্যাদি অনুভূতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। (৫) গন্ধ ব্যতীত সকল সংবেদী স্নায়ু প্রবাহকে সমন্বয় করে সেরিব্রামে প্রেরণ করে। (৬) এটি বিভিন্ন ভিসেরাল ও সোমাটিক কাজের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। (৭) থ্যালামাস দেহের জাগরণ এবং সতর্কীকরণ প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এটি নিদ্রিত প্রাণীকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা এবং পরিবেশ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করার ব্যাপারে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে।

৩। হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus) : মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠ ও থ্যালামাসের তলদেশে অবস্থিত কতগুলো গুচ্ছ নিয়ে গঠিত অগ্রমস্তিষ্কের যে অংশ মানসিক আবেগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে হাইপোথ্যালামাস বলে। পৃষ্ঠদেশে এটি থ্যালামাস ও সাব-থ্যালামাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। অঙ্কদেশে এটি পিটুইটারির সঙ্গে যুক্ত হয়। ইহা শ্বেত পদার্থ ও ধূসর পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এর ধূসর পদার্থ বিক্ষিপ্তভাবে স্নায়ুকেন্দ্র গঠন করে।

কাজ : (১) হাইপোথ্যালামাস স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। (২) ইহা দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) ইহা মানসিক আবেগের, যেমন– হাসি, কান্না, ভয়, ক্রোধ, উত্তেজনা, ভালোলাগা, ঘৃণা, উদ্বেগ এবং দেহের ভারসাম্য ও হোমিওস্ট্যাটিক রক্ষা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। (৪) ইহা ক্ষুধা, খাদ্য গ্রহণ, পরিতৃপ্তি ও স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ করে। (৫) প্রাণীর যৌন আচরণে হাইপোথ্যালামাস প্রভাব বিস্তার করে। (৬) পাকস্থলীর এসিড ক্ষরণে হাইপোথ্যালামাসের প্রভাব সর্বজনগ্রাহ্য। (৭) নিউরোহরমোন উৎপন্ন করে ট্রপিক হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। (৮) অক্সিটোসিন ও ভ্যাসোপ্রেসিন বা অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH) ক্ষরণ করে। (৯) এটি দিবা-রাত্রির ছন্দোময়তার সাথে ঘুম-জাগ্রত চক্র নিয়ন্ত্রণ করে। এ অবস্থাকে **জীবতাত্ত্বিক ঘড়ি** (biological clock) বলা হয়।

(খ) মধ্যমস্তিষ্ক বা মেসেনসেফালন (Midbrain or Mesencephalon) : হাইপোথ্যালামাসের নিচে এবং সেরিবেলামের সম্মুখে অবস্থিত ছোট ও সংকুচিত অংশটিকে মধ্যমস্তিষ্ক বলে। এটি অঙ্কদিকে দুটি নলাকার ও পুরু স্নায়ুরজ্জু এবং পৃষ্ঠদিকে দুটি গোলাকার খণ্ড নিয়ে গঠিত। প্রথম দুটিকে **সেরিব্রাল পেডাঙ্কল** (cerebral peduncle) এবং শেষের দুটোকে **কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা** (corpora quadregemina) বলে। প্রতিটি কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে মোট ৪টি খণ্ড গঠন করে। মধ্যমস্তিষ্কের অন্তর্ভাগের তরলপূর্ণ সরু নালি হচ্ছে **সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট** (cerebral aquiduct)। এটি ৩য় ও ৪র্থ মস্তিষ্কের গহ্বর বা ভেন্ট্রিকলকে যুক্ত করে।

কাজ : (১) এটি অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। (২) বিভিন্ন দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।

(গ) পশ্চাৎমস্তিষ্ক (Hindbrain or Rhombencephalon)

১। সেরিবেলাম (Cerebellum) বা লঘুমস্তিষ্ক : দুটি গোলার্ধ নিয়ে গঠিত পশ্চাৎমস্তিষ্কের যে সর্ববৃহৎ অংশ করোটির পশ্চাৎভাগে অবস্থান করে এবং প্রাণিদেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে তাকে **সেরিবেলাম** বা **লঘুমস্তিষ্ক** বলে। গোলার্ধদুটি **ভার্মিস** (vermis) নামে একটি ক্ষুদ্র যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে। এর বাইরের দিকে ধূসর পদার্থ এবং ভেতরের দিকে শ্বেত পদার্থ বিদ্যমান। পূর্ণ বয়স্ক মানুষে সেরিবেলামের গড় ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম।

কাজ : (১) দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ এর প্রধান কাজ। (২) মাথা ও চোখের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) ঐচ্ছিক চলাফেরা অর্থাৎ দেহভঙ্গি, পেশিটান নিয়ন্ত্রণ, দৌড়ানো, টাইপ করা, পিয়ানো বাজানো, দেহের সুষ্ঠু ও সাবলীল চলাফেরা, চলাফেরার দিক নির্ধারণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। (৪) দেহের সকল স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

২। পনস (Pons) বা যোজক বা সেতুমস্তিষ্ক : পশ্চাৎমস্তিষ্কের যে অংশটি মধ্যমস্তিষ্কের সঙ্গে সেরিবেলাম (cerebellum) ও মেডুলা অবলংগাটার সংযোগ রক্ষা করে তাকে **পনস** বলে। পনসের অঙ্কীয়দেশ উত্তল এবং পৃষ্ঠীয় দেশ সমতল। এটি মস্তিষ্কের ৪র্থ ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর গঠন করে। এতে ধূসর ও শ্বেত পদার্থ সমভাবে বিস্তৃত থেকে

Scanned with CamScanner

একটি স্নায়ুজালিকা গঠন করে। এতে নিম্নগামী স্নায়ুতন্তু এবং কিছু সংখ্যক স্নায়ুগুচ্ছ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। তবে এর মধ্য দিয়ে মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান স্নায়ুতন্তুগুলো আড়াআড়িভাবে পরস্পরকে অতিক্রম করে। স্নায়ুতন্তুগুলোর এ ধরনের বিন্যাসের কারণে **মস্তিষ্কের বাম অংশ দেহের ডান অংশের এবং মস্তিষ্কের ডান অংশ দেহের বাম অংশের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।**

কাজ : (১) ইহা মূত্রনালির পেশির সংকোচন ঘটিয়ে মূত্র ত্যাগে সহায়তা করে। (২) চোয়ালের বিচলন, অক্ষিগোলকের পার্শ্ববিচলন, মুখের অভিব্যক্তি ও উত্তোলন (অর্থাৎ দেহের দু'পাশের পেশির কার্মকাণ্ড সমন্বয়) এবং লালাক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) সেরিবেলাম, সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের অংশের মধ্যে রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে। (৪) পনসের অ্যানিউস্টিক ও নিউমোট্যাক্সিক স্নায়ুকেন্দ্র বা শ্বাসকেন্দ্র শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে। (৫) পনসে V - VIII করোটিক স্নায়ুর কেন্দ্র অবস্থিত, ফলে স্নায়ুগুলো দেহের নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করে।

৩। মেডুলা অবলংগাটা (Medulla oblongata) : পনসের নিচ থেকে শুরু করে সুষুম্নাকাণ্ডের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত যে অংশে বিভিন্ন প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে **মেডুলা অবলংগাটা** বলে। এটি মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা পেছনের অংশ। এটি লম্বায় প্রায় ৩ সেমি., চওড়ায় ২ সেমি. এবং স্থূলত্বে ১.২ সেমি.। ইহা অনেকাংশে পিরামিডের ন্যায় দণ্ডাকার অংশ।

কাজ : (১) ইহা স্বাভাবিক হৃদ রক্তপ্রবাহ টান (cardiovascular tone) বজায় রাখে। (২) পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস, রক্তবাহিকার সংকোচন, হৃৎস্পন্দন হার, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া, ঘাম নিঃসরণ, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। (৪) বিভিন্ন প্রতিবর্তী (reflex) ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন– কাশি (coughing), গলাধঃকরণ (swallowing), লালাক্ষরণ (salivary secretion), বমন (vomiting), মলমূত্র-ত্যাগ ইত্যাদি। (৫) এটি প্রধানত IX - XII (অথবা V - XII) করোটিক স্নায়ুর উৎসস্থল হিসেবে কাজ করে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে পার্থক্য

অগ্রমস্তিষ্ক	মধ্যমস্তিষ্ক	পশ্চাৎমস্তিষ্ক
অগ্রমস্তিষ্কের আয়তন সবচেয়ে বড়।	আয়তন সবচেয়ে ছোট।	এর আয়তন অগ্রমস্তিষ্কের চেয়ে ছোট তবে মধ্যমস্তিষ্কের চেয়ে বড়।
এটি ৩টি অংশে বিভক্ত– ▪ সেরেব্রাম ▪ থ্যালামাস ও ▪ হাইপোথ্যালামাস	এটি ২টি অংশে বিভক্ত– ▪ মেসেনসেফালেন ▪ ডায়েনসেফালন	এটি ৩টি অংশে বিভক্ত– ▪ সেরেবেলাম ▪ পনস ▪ মেডুলা অবলংগাটা
অগ্রমস্তিষ্ক থেকে ২ জোড়া করোটিক স্নায়ু উৎপত্তি লাভ করে।	মধ্যমস্তিষ্ক থেকেও ২ জোড়া করোটিক স্নায়ু উৎপত্তি লাভ করে।	পশ্চাৎমস্তিষ্ক থেকে ৮ জোড়া করোটিক স্নায়ু সৃষ্টি হয়।
এটি বুদ্ধি ও স্মৃতিবোধের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।	এটি দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায়।	এটি দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।

সেরিব্রাম ও সেরিবেলামের পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সেরিব্রাম	সেরিবেলাম
১। অবস্থান	অগ্রমস্তিষ্কে ।	পশ্চাৎ মস্তিষ্কে।
২। প্রধান অংশ	সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার ও কর্পাস ক্যালোসাম।	সেরিব্রাল পেডাঙ্কল ও ভার্মিস নামক যোজক কলা।
৩। বিভাজন	দুটি প্রতিসম গোলার্ধে বিভক্ত।	দুটি সমগোলার্ধে বিভক্ত।
৪। মস্তিষ্কের অংশ	মস্তিষ্কের প্রধান অংশ।	পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ।
৫। ওজন	সেরিবেলামের চেয়ে প্রায় ৬ গুণ বেশি ওজন।	গড় ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম।
৬। লোব	চারটি লোবে বিভক্ত, যথা– প্যারাইটাল, ফ্রন্টাল, টেম্পোরাল ও অক্সিপিটাল লোব।	কোনো লোবে বিভক্ত নয়।
৭। কাজ	চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি ও সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক।	ঐচ্ছিক পেশির টান, নিয়ন্ত্রণ দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ ও চলাফেরার দিক নির্ধারণ।

Scanned with CamScanner

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ

মস্তিষ্কের প্রধান অংশ	মস্তিষ্কের সাব-অংশ	কাজ
অগ্রমস্তিষ্ক (প্রোসেনসেফালন)	গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম)	১। বিভিন্ন চেষ্টীয় ক্রিয়ার কেন্দ্ররূপে কাজ করে। ২। প্রাণীর বাকশক্তি, বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি, সৃজনশীলতা, ইচ্ছাশক্তি, সহজাত প্রবৃত্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদি মানবিক বোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। ৩। চাপ, তাপ, ব্যথা, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি স্পর্শবোধগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। ৪। খাদ্য গ্রহণ, রেচন, জনন ইত্যাদি বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয়, ক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। ৫। বিভিন্ন গ্রাহক থেকে আগত স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে ও ঐ অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করে।
	থ্যালামাস	১। থ্যালামাস প্রেরক স্থান বা রিলে কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। ২। চাপ, তাপ, স্পর্শ, ব্যথা, টান, কম্পন ইত্যাদি অনুভূতির প্রেরক স্থান রূপে কাজ করে। ৩। গুরুমস্তিষ্কের সাহায্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ৪। নিদ্রিত প্রাণীকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা এবং পরিবেশ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করার ব্যাপারে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে।
	হাইপোথ্যালামাস	১। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলি ও দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে। ২। হাসি, কান্না, ভয়, ক্রোধ, উত্তেজনা, ভালোলাগা, ঘৃণা, উদ্বেগ ও দেহের ভারসাম্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। ৩। ক্ষুধা, খাদ্য গ্রহণ, পরিতৃপ্তি, স্থূলতা ও যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। ৪। পাকস্থলীর এসিড ক্ষরণ এবং নিউরোহরমোন উৎপন্ন করে ট্রপিক হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ৫। অক্সিটোসিন ও অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH) হরমোন ক্ষরণ করে। ৬। এটি দিবা-রাত্রির ছন্দোময়তার সাথে ঘুম-জাগ্রত চক্র নিয়ন্ত্রণ করে। এ অবস্থাকে জীবতাত্ত্বিক ঘড়ি (biological clock) বলা হয়।
মধ্যমস্তিষ্ক (মেসেনসেফালন)	মেসেনসেফালন	১। অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। ২। বিভিন্ন দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।
পশ্চাৎমস্তিষ্ক (রম্বেনসেফালন)	সেরিবেলাম	১। দৈহিক ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। ২। মাথা ও চোখের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে। ৩। ঐচ্ছিক চলাফেরা অর্থাৎ দেহভঙ্গি, পেশিটান, দেহের সুষ্ঠু ও সাবলীল চলাফেরা, চলাফেরার দিক নির্ধারণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। ৪। দেহের সকল স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
	পনস	১। সেরিবেলাম, সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের অংশের মধ্যে রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে। ২। ইহা চোয়ালের সঞ্চালন, অক্ষিগোলকের সঞ্চালন ও মুখের অভিব্যক্তি অর্থাৎ দেহের দুপাশের পেশির কার্মকাণ্ড সমন্বয় করে এবং লালাক্ষরণ, মূত্রত্যাগ, শ্বসন ইত্যাদি কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।
	মেডুলা অবলংগাটা	১। সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। ২। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ, যেমন– পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস, রক্তবাহিকার সংকোচন, হৃৎস্পন্দন হার, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া, ঘাম নিঃসরণ, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। ৩। বিভিন্ন প্রতিবর্তী ক্রিয়া (যেমন– কাশি, বমন, লালাক্ষরণ ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে।

Scanned with CamScanner

মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠ বা গহ্বর বা ভেন্ট্রিকল (Ventricle of Brain)

মস্তিষ্কের গঠন নিরেট নয়, এর অভ্যন্তর ভাগে তরলপূর্ণ গহ্বর থাকে। এ গহ্বর কয়েকটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। মস্তিষ্কের এসব তরলপূর্ণ গহ্বরকে **নিলয় বা ভেন্ট্রিকল** (ventricle) বলে। মস্তিষ্কে মোট ৪টি ভেন্ট্রিকল থাকে। এদের যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকল বলা হয়। ১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকলকে **পার্শ্বীয় বা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলও** বলা হয়। মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকলগুলো **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** (cerebrospinal fluid, CSF) বা **সুষুম্নারস** দ্বারা পূর্ণ থাকে।

১। পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল (Lateral ventricle): অগ্রমস্তিষ্কের দুটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের অভ্যন্তরের প্রকোষ্ঠদ্বয়কে (১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকল) পার্শ্বীয় বা **ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল** বলে। এরা পৃথকভাবে মধ্যমস্তিষ্কের ৩য় ভেন্ট্রিকলের সঙ্গে দুটি ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র বা **ফোরামেন অব মনরো** (foramen of monro) দিয়ে যুক্ত থাকে।

২। তৃতীয় ভেন্ট্রিকল (Third ventricle): অগ্রমস্তিষ্কের শেষভাগের অর্থাৎ হাইপোথ্যালামাসের গহ্বরটিকে **৩য় ভেন্ট্রিকল** বলে। ৩য় ভেন্ট্রিকল ৪র্থ ভেন্ট্রিকলের সঙ্গে **সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট** (cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvius) দ্বারা যুক্ত থাকে।

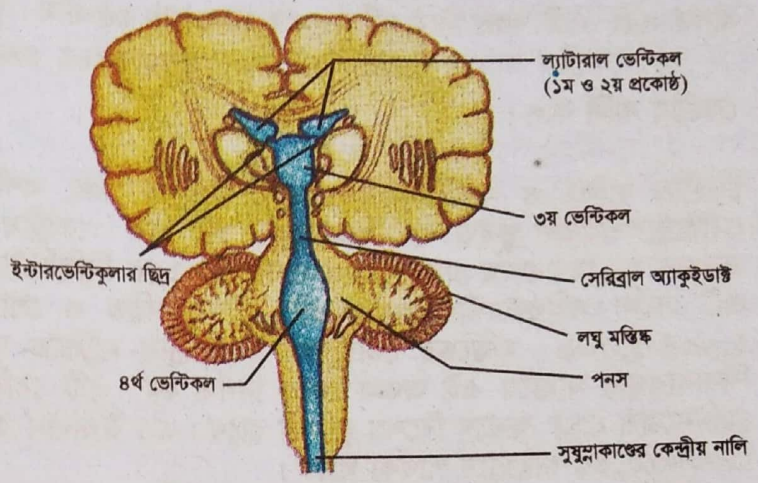

চিত্র- ৮.৭ : মস্তিষ্কের গহ্বর বা ভেন্ট্রিকল

৩। চতুর্থ ভেন্ট্রিকল (Fourth ventricle) : এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগাটায় অবস্থিত। এটি পশ্চাৎ দিকে সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালিতে উন্মুক্ত থাকে।

মেনিনজেস (Meninges)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র একটি দৃঢ় ও মজবুত আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে, যা করোটিকা ও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত থাকে। একে **মেনিনজেস** বলে। মেনিনজেস তিনটি ঝিল্লি নিয়ে গঠিত। বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ঝিল্লি তিনটি যথাক্রমে– **ড্যুরা ম্যাটার, অ্যারাকনয়েড ম্যাটার ও পায়া ম্যাটার**।

১। ড্যুরা ম্যাটার বা প্যাকাইমেনিক্স বা ড্যুরা (Dura matter or Pachymeninx or Dura): এটি মেনিনজেসের বহিঃস্থতম, সুদৃঢ় ঝিল্লি। এতে শিরা ও সাইনাস প্রলম্বিত থাকে। এটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের সাথে লাগানো থাকে। তবে করোটিকা ও কশেরুকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে। এটি ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে এটি দ্বিস্তরী কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডে একস্তরী। এর বাইরের ও ভেতরের ফাঁকা স্থানকে যথাক্রমে **এপিড্যুরাল** (epidural) ও **সাবড্যুরাল** (subdural) স্পেস বলে। [অস্ত্রোপচারের সময় এপিড্যুরাল স্পেসে ইনজেকশনের মাধ্যমে চেতনানাশক প্রবেশ করিয়ে মানুষকে অজ্ঞান করা (অ্যানেসথেসিয়া) হয়।]

২। অ্যারাকনয়েড ম্যাটার (Arachnoid matter) : এটি মেনিনজেসের মধ্যবর্তী ঝিল্লি অর্থাৎ ড্যুরা ম্যাটার ও পায়া ম্যাটার এর মধ্যবর্তী ঝিল্লি। এটি প্রকৃতপক্ষে **সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস** (subarachnoid space) নামে একটি ফাঁকা স্থান, যোজক কলার সূত্র, রক্তবাহিকা ও **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** (cerebrospinal fluid) নিয়ে গঠিত। কোনো কোনো স্থানে সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস বেশি প্রসারিত থাকে। এদের **সিস্টারনি** (cisternae) বলে।

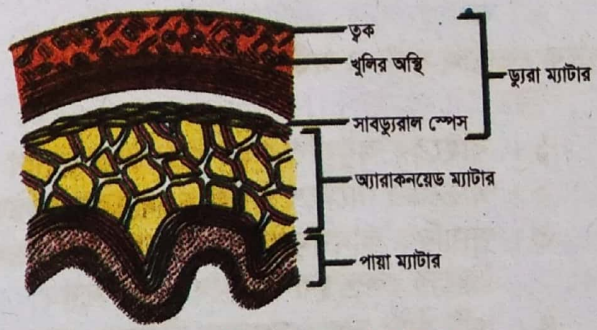

চিত্র ৮.৮ : মেনিনজেসের প্রস্থচ্ছেদ

৩। পায়া ম্যাটার (Pia mater) : এটি মেনিনজেসের অন্তঃস্থতম পাতলা ঝিল্লি। এটি স্নায়ুকলার (nerve tissue) সংলগ্ন থেকে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের বহির্তলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে।

মেনিনজেসের কাজ : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে যান্ত্রিক আঘাত ও জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পুষ্টি পদার্থ সরবরাহ করে। সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড ক্ষরণ করে। মেনিনজেস নিজে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হলে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে **মেনিনজাইটিস** (meningitis) বলে। ব্যাকটেরিয়া (প্রধানত *Neisseria meningitidis*) দ্বারা সাধারণত মেনিনজেস আক্রান্ত হয়।

Scanned with CamScanner

সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord)

কশেরুকায় গঠিত মেরুদণ্ডের গহ্বরে সুরক্ষিত **সুষুম্নাশীর্ষক** (medulla oblongata) থেকে আরম্ভ করে সুষুম্নানালির মধ্য দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় কটিদেশীয় কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত ফাঁপা গোলাকার রজ্জুর মতো সরু স্নায়ুদণ্ডকে **সুষুম্নাকাণ্ড** বা **স্পাইনাল কর্ড** (spinal cord) বলে।

গঠন : পুরুষ মানুষের সুষুম্নাকাণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ ইঞ্চি বা ৪৫ সেমি ও স্ত্রীলোকের প্রায় ৪৩ সে.মি.। এটি ১.২৫ সে.মি. প্রশস্ত এবং ৩১টি খণ্ডক নিয়ে গঠিত। এর ওজন প্রায় ৩৫ গ্রাম। সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে নিম্নলিখিত অংশগুলো দেখা যায় :

১। কেন্দ্রীয় নালি (Central canal) : সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রে যে ছোট গহ্বর রোমশ কোষ দ্বারা আবৃত তাকে কেন্দ্রীয় নালি বলে।

২। সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebrospinal fluid-CSF) : নিউরোসিল (মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল ও সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালি) ও সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস যে স্বচ্ছ, বর্ণহীন ও পরিবর্তিত কলারস দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাকে **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** বা **মস্তিষ্ক-সুষুম্না রস** বলে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে লসিকার পরিবর্তে CSF থাকে। পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের দেহে এর পরিমাণ প্রায় **১৪০-১৫০ মিলিলিটার**। দৈনন্দিন ক্ষরণের পরিমাণ প্রায় ৫০০ মিলিলিটার। এটি সর্বদা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এটি সর্বদা ক্ষরিত ও শোষিত হয়। এর pH ৭.৩৩ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৪-১.০০৬। মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল ও কেন্দ্রীয় নালিতে অনুপ্রবিষ্ট ধমনি থেকে এই তরল উৎপন্ন হয় এবং শিরাব্যবস্থার মাধ্যমে এই অঞ্চল থেকে নির্গত হয়। এটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের প্রাচীর থেকেও ক্ষরিত হয় এবং মেনিনজেস CSF ক্ষরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এর উপাদান কলয়েডমুক্ত প্লাজমা উপাদানের মতোই, তবে কয়েকটি ক্রিস্টালয়েডের পরিমাণে পার্থক্য থাকে।

কাজ : (১) এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে যান্ত্রিক আঘাত ও জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে; (২) মস্তিষ্ককে ভাসিয়ে রেখে এর ওজন হ্রাস করে; (৩) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পুষ্টি পদার্থ সরবরাহ, গ্যাস বিনিময়, বর্জ্য নিষ্কাশন প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পাদন করে; (৪) করোটি মধ্যস্থ চাপকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখে; (৫) এটি মস্তিষ্ক থেকে ইপিনেফ্রাইন ও কিছু ওষুধ অপসারণ করে।

৩। ধূসর বস্তু বা গ্রে ম্যাটার (Grey matter) : সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে সেন্ট্রাল ক্যানালের চারদিকে ইংরেজি **'H'** বর্ণমালার আকৃতিবিশিষ্ট যে অংশটি দেখা যায় তাকে ধূসর বস্তু বা **গ্রে ম্যাটার** বলে। নিউরন দ্বারা ধূসর বস্তু গঠিত।

৪। শ্বেত বস্তু বা হোয়াইট ম্যাটার (White matter) : প্রধানত মায়েলিন আবরণযুক্ত স্নায়ুতন্ত্র ও নিউরোগ্লিয়া কোষ নিয়ে গঠিত সুষুম্নাকাণ্ডের বাইরের সাদা অংশকে শ্বেত বস্তু বা **হোয়াইট ম্যাটার** বলে।

৫। পৃষ্ঠীয়মূল বা ডরসাল রুট (Dorsal root) : স্পাইনাল কর্ডের পৃষ্ঠদেশে অন্তর্বাহী স্নায়ুতন্ত্র যুক্ত থাকে বলে এই স্থানকে **ডরসাল রুট** বা **পৃষ্ঠীয় মূল** বলে।

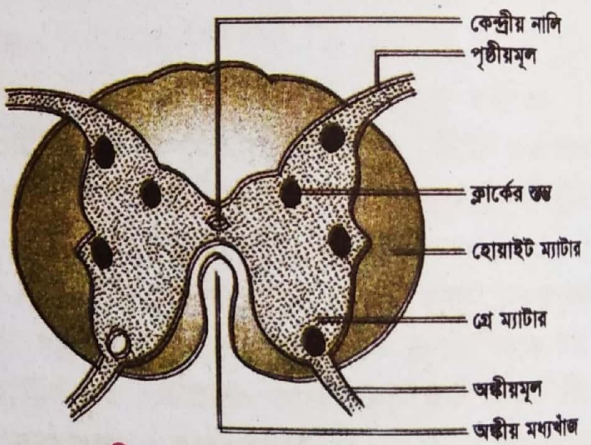

চিত্র ৮.৯ : সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

৬। অঙ্কীয়মূল বা ভেন্ট্রাল রুট (Ventral root) : বহির্বাহী স্নায়ুতন্ত্র স্পাইনাল কর্ড থেকে যে স্থানে নির্গত হয়, তাকে **ভেন্ট্রাল রুট** বা **অঙ্কীয় মূল** বলে।

সুষুম্নাকাণ্ডের কাজ (Functions of spinal cord)

১। বাইরের অনুভূতি গ্রহণ ও মস্তিষ্কে প্রেরণ।
২। মস্তিষ্কের নির্দেশে পেশি ও আন্তঃযন্ত্রগ্রন্থিগুলোতে প্রেরণ।
৩। স্নায়বিক কার্যসমূহের সমন্বয় ঘটানো (অর্থাৎ সুষম্না স্নায়ু ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম) ও প্রতিবর্তী ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজ করে।
৪। এটি হাঁটা-চলার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যথা, চাপ ও তাপ অনুভূতি গ্রহণে সহায়তা করে।

গ্রে ম্যাটার ও হোয়াইট ম্যাটার এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	গ্রে ম্যাটার বা ধূসর পদার্থ	হোয়াইট ম্যাটার বা শ্বেত পদার্থ
১। বর্ণ	ধূসর বর্ণের।	শ্বেত বর্ণের।
২। গঠন	কোষদেহ, ডেনড্রাইট এবং সিন্যাপস নিয়ে গঠিত।	নিউরনের অ্যাক্সন নিয়ে গঠিত।
৩। অবস্থান	মস্তিষ্কে গ্রে ম্যাটারের নিচে হোয়াইট ম্যাটার থাকে।	সুষুম্নাকাণ্ডে হোয়াইট ম্যাটারের নিচে গ্রে ম্যাটার থাকে।

Scanned with CamScanner

৮.৩ করোটিক স্নায়ু (Cranial nerves)

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট যেসব প্রান্তীয় স্নায়ুসমূহ করোটির বিভিন্ন ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তার লাভ করে তাদের **করোটিক স্নায়ু** বলে। মানুষের করোটিক স্নায়ু ১২ জোড়া। এদের সম্মুখ অংশ থেকে পরপর রোমান ক্যাপিটাল সংখ্যা I হতে XII দ্বারা সূচিত করা হয়।

কার্যপ্রকৃতিভেদে এদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

১। **সংবেদী বা সংজ্ঞাবহ বা অন্তর্বাহী স্নায়ু** (Sensory nerve): যেসব স্নায়ুর মাধ্যমে উদ্দীপনা (impulse) রিসেপ্টর বা সংবেদী অঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বাহিত হয় তাদের **সংবেদী বা সংজ্ঞাবহ স্নায়ু** বলে। সংবেদী স্নায়ু ৩ জোড়া। যেমন– অলফ্যাক্টরি (I), অপটিক (II) ও অডিটরি (VIII)।

২। **চেষ্টীয় বা মোটর বা বহির্বাহী বা আজ্ঞাবাহী স্নায়ু** (Motor nerve) : যেসব স্নায়ুর মাধ্যমে সাড়া (response) বা নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে ইফেক্টরে বা নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌঁছায় তাদের **চেষ্টীয় বা মোটর স্নায়ু** বলে। চেষ্টীয় স্নায়ু ৫ জোড়া। যেমন– অকুলোমোটর (III), ট্রকলিয়ার (IV), অ্যাবডুসেন্স (VI), স্পাইনাল অ্যাকসেসরি (XI) ও হাইপোগ্লোসাল (XII)।

৩। **মিশ্র বা মিক্সড স্নায়ু** (Mixed nerve) : যেসব স্নায়ুতে সংবেদী ও চেষ্টীয় উভয় প্রকার স্নায়ুতন্তু থাকে, ফলে স্নায়ু স্পন্দন উভয়দিকেই পরিবাহিত হয় তাদের **মিশ্র বা মিক্সড স্নায়ু** বলে। মিশ্র স্নায়ু ৪ জোড়া। যেমন– ট্রাইজেমিনাল (V), ফেসিয়াল (VII), গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল (IX) ও ভেগাস (X)।

ক্রমিক বিস্তৃতি সংখ্যা	
(I)	নাসিকা
(II)	রেটিনা
(III)	চক্ষুপেশি
(IV)	চক্ষুপেশি
(V)	নেত্রপল্লব, উর্ধ্বোষ্ঠ, নিম্নোষ্ঠ ও চোয়াল
(VI)	চক্ষুপেশি
(VII)	মুখবিবর ও বহিঃকর্ণ
(VIII)	অন্তঃকর্ণ
(IX)	জিহ্বা ও গলবিল
(X)	হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, ল্যারিংক্স
(XI)	গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধ
(XII)	জিহ্বা

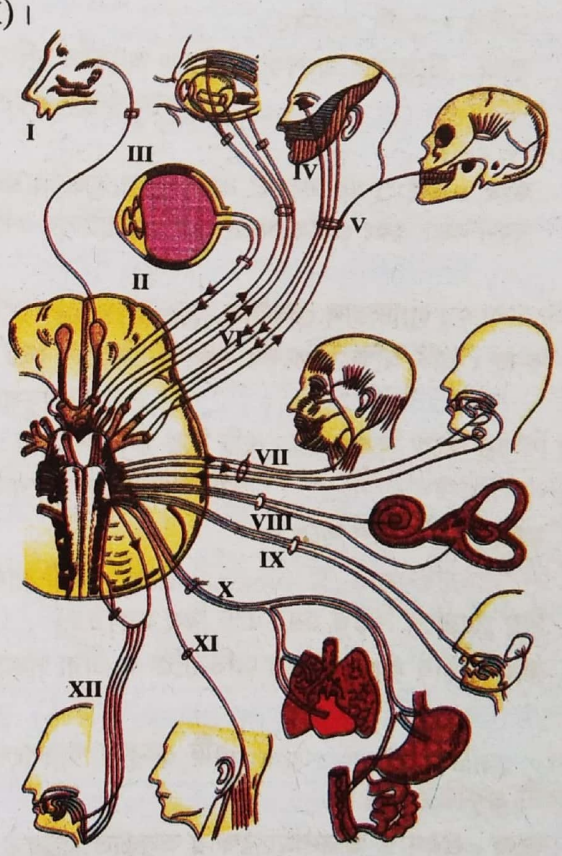

চিত্র ৮.১০ : করোটিক স্নায়ুর উৎপত্তি ও বিস্তৃতির চিত্ররূপ

মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম, উৎপত্তি, প্রকৃতি, বিস্তার ও কাজ বর্ণনা করা হলো–

(I) অলফ্যাক্টরি স্নায়ু (Olfactory nerve): অগ্রমস্তিষ্কের অলফ্যাক্টরি লোবের শীর্ষদেশ (অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ) থেকে উৎপন্ন হয়ে নাসিকা গহ্বরের মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এরা সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : মস্তিষ্কে ঘ্রাণ উদ্দীপনা বহন করে।

(II) অপটিক স্নায়ু (Optic nerve): অগ্রমস্তিষ্কের অপটিক লোবের অঙ্কীয়দেশ (অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ) থেকে উৎপন্ন হয়ে X আকৃতির আড়াআড়ি **অপটিক কায়াজমা** (optic chiasma) সৃষ্টি করে চোখের রেটিনাতে বিস্তৃত হয়। এরাও সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : চোখ থেকে দর্শনের অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে আনে অর্থাৎ দর্শনে সাহায্য করে।

Scanned with CamScanner

(III) অকুলোমোটর স্নায়ু (Oculomotor nerve): মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে চোখে প্রবেশ করে এবং চোখের **ইনফিরিয়র অবলিক** (inferior oblique) ও **তিনটি রেকটাস** (superior, inferior ও medial rectus) পেশিতে বিস্তৃত হয়। এরা চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

(IV) ট্রকলিয়ার স্নায়ু (Trochlear nerve) বা প্যাথেটিক স্নায়ু (Pathetic nerve): মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে **সুপিরিয়র অবলিক** (superior oblique) নামক চক্ষু পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি সবচেয়ে পাতলা ও **ক্ষুদ্র করোটিক স্নায়ু**। এরা চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

(V) ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু (Trigeminal nerve): এরা মেডুলা অবলংগাটার অগ্র-পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে, ৩টি শাখায় বিভক্ত হয়। যথা–

(ক) **অপথ্যালমিক** (Opthalmic) : এটি **সবচেয়ে ছোট শাখা**। এ শাখা **উর্ধ্ব** অক্ষিপল্লব, মস্তকের অগ্রভাগের ত্বক ও নাসিকার মিউকাস প্রাচীরে বিস্তৃত হয়। এরা সংবেদী প্রকৃতির।

কাজ : উল্লেখিত অংশগুলো থেকে অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।

(খ) **ম্যাক্সিলারি** (Maxillary) : এ শাখা নিম্ন অক্ষিপল্লব, **উর্ধ্ব** ওষ্ঠ ও **উর্ধ্ব** চোয়ালের মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এটিও সংবেদী প্রকৃতির।

কাজ : উল্লেখিত অংশগুলো থেকে অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।

(গ) **ম্যান্ডিবুলার** (Mandibular) : এ শাখা নিম্ন চোয়াল, মুখবিবরের তলদেশের পেশি ও ত্বকে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির।

কাজ : এই স্নায়ুর সংবদী কাজ হলো মুখবিবরের পেশি ও ত্বকের চাপ, স্পর্শ, উত্তাপ ইত্যাদি অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করা এবং চেষ্টীয় কাজ হলো চোয়ালের পেশির সঞ্চালন।

(VI) অ্যাবডুসেন্স স্নায়ু (Abducens nerve) : মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়-পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে অক্ষিগোলকের **ল্যাটারাল রেকটাস** (lateral rectus) পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : এটি অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

(VII) ফেসিয়াল স্নায়ু (Facial nerve) : মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এর শাখা দুটি হলো–

(ক) **প্যাল্যাটাইন** (Palatine) : এটি মুখবিবরের ছাদে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির।

কাজ : স্বাদ গ্রহণ করে।

(খ) **হ্যায়োম্যান্ডিবুলার** (Hyomandibular) : এটি শাখা মুখবিবরের তলদেশ বরাবর অগ্রসর হয়ে কর্ণপটহ, মুখবিবর ও নিম্ন চোয়ালে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির।

কাজ : স্বাদ গ্রহণ, মুখের অভিব্যক্তি ও গ্রীবা সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

(VIII) অডিটরি স্নায়ু (Auditory nerve) বা অ্যাকাউস্টিক বা ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার স্নায়ু (Acoustic or Vestibulocochlear nerve) : এটি মেডুলা অবলংগাটায় পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে অন্তঃকর্ণে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষার অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।

(IX) গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু (Glossopharyngeal nerve): মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে লালাগ্রন্থি, জিহ্বা ও গলবিলে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : স্বাদ গ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালন এবং লালাক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(X) ভেগাস স্নায়ু (Vagus nerve) বা নিউমোগ্যাসট্রিক স্নায়ু (Pneumogastric nerve) : এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। **সবচেয়ে দীর্ঘ করোটিক স্নায়ু**। মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে, ৪টি শাখায় বিভক্ত হয়। যেমন–

(ক) **ল্যারিঞ্জিয়াল** (Laryngeal) : এটি স্বরযন্ত্রে বিস্তৃত হয়। মিশ্র প্রকৃতির।

কাজ : স্বরযন্ত্রের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) **কার্ডিয়াক** (Cardiac) : এটি হৃৎপিণ্ডে বিস্তৃত হয়। মিশ্র প্রকৃতির।

কাজ : হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

Scanned with CamScanner

(গ) **গ্যাস্ট্রিক** (Gastric) : এটি পাকস্থলীতে বিস্তৃত হয়। মিশ্র প্রকৃতির।
কাজ : পাকস্থলীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) **পালমোনারি** (Pulmonary) : এটি ফুসফুসে বিস্তৃত হয়। মিশ্র প্রকৃতির।
কাজ : ফুসফুসের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

(XI) স্পাইনাল অ্যাকসেসরি স্নায়ু (Spinal accessory nerve) : মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ (মেঝে) থেকে উৎপন্ন হয়ে গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধ অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। এটি চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।
কাজ : এটি সংশ্লিষ্ট অঙ্গের পেশি সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

(XII) হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু (Hypoglossal nerve) : এটি মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে জিহ্বাতে বিস্তৃত হয়। এটি চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।
কাজ : জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

করোটিক স্নায়ুর নাম, উৎপত্তি, বিস্তৃতি, প্রকৃতি ও কাজের ছক

স্নায়ুর নাম	উৎপত্তি ও শাখা	প্রকৃতি	বিস্তৃতি	কাজ
I. অলফ্যাক্টরি (Olfactory)	অগ্রমস্তিষ্কের অলফ্যাক্টরি লোবের শীর্ষদেশ	সংবেদী স্নায়ু (sensory nerve)	নাসিকার মিউকাস পর্দা	মস্তিষ্কে ঘ্রাণ উদ্দীপনা বহন করে।
II. অপটিক (Optic)	অগ্রমস্তিষ্কের অপটিক লোবের অঙ্কীয়দেশ	সংবেদী স্নায়ু	চোখের রেটিনা	দর্শনে সাহায্য করে।
III. অকুলোমোটর (Oculomotor)	মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ	চেষ্টীয় স্নায়ু (motor nerve)	চোখের (inferior oblique এবং superior, inferior ও medial rectus) পেশিতে	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
IV. ট্রকলিয়ার (Trochlear)/ প্যাথেটিক স্নায়ু	মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ	চেষ্টীয় স্নায়ু	চোখের (superior oblique) পেশিতে	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
V. ট্রাইজেমিনাল (Trigeminal)	মেডুলা অবলংগাটার অগ্র-পার্শ্বদেশ। **শাখা :** i.অপথ্যালমিক (সংবেদী) ii.ম্যাক্সিলারি (সংবেদী) iii.ম্যান্ডিবুলার (মিশ্র)	মিশ্র স্নায়ু (mixed nerve)	অক্ষিপল্লব, নাসিকার পর্দা, উর্ধ্ব ও নিম্নচোয়াল, মুখবিবরের অঙ্কীয় দেশের পেশি	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদন মস্তিষ্কে বহন করে এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন ও তাপ, চাপ ও স্পর্শ সঞ্চালন করে।
VI. অ্যাবডুসেন্স (Abducens)	মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়-পার্শ্বদেশ	চেষ্টীয় স্নায়ু	চোখের (lateral rectus) পেশিতে	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
VII. ফেসিয়াল (Facial)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ। **শাখা :** i. প্যাল্যাটাইন (সংবেদী) ii. হায়োম্যান্ডিবুলার (মিশ্র)	মিশ্র স্নায়ু	মুখমণ্ডল, কর্ণপটহ ও নিম্ন চোয়াল	সংবেদীরূপে স্বাদ গ্রহণ করে এবং মোটর স্নায়ুরূপে মৌখিক অভিব্যক্তি, চর্বণ ও গ্রীবা সঞ্চালন করে।
VIII. অডিটরি (Auditory) (অ্যাকাউস্টিক)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	সংবেদী স্নায়ু	অন্তঃকর্ণ	শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষার অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে আনে।
IX. গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল (Glosso pharyngeal)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	মিশ্র স্নায়ু	জিহ্বা ও গলবিল	স্বাদ গ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালনে সহায়তা করে।

Scanned with CamScanner

স্নায়ুর নাম	উৎপত্তি ও শাখা	প্রকৃতি	বিস্তৃতি	কাজ
X. ভেগাস (Vagus) (নিউমোগ্যাসট্রিক)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ, শাখা : i. ল্যারিঞ্জিয়াল (মিশ্র) ii. কার্ডিয়াক (মিশ্র) iii. গ্যাস্ট্রিক (মিশ্র) iv. পালমোনারি (মিশ্র)	মিশ্র স্নায়ু	স্বরযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও ফুসফুস	স্বরযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড পাকস্থলী ও ফুসফুসের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।
XI. স্পাইনাল অ্যাকসেসরি (Spinal accessory)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	চেষ্টীয় স্নায়ু	গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধ	মাথা (গ্রীবা) ও কাঁধের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
XII. হাইপোগ্লোসাল (Hypoglossal)	মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ	চেষ্টীয় স্নায়ু	জিহ্বা	জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

[মানুষের ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ুর নাম ধারাবাহিকভাবে সহজে মনে রাখার জন্য- **"ওরে ও অকু ত্বরা ত্বরি আয় ফটিক আজ গাইছে ভাল আ হা"** (OOO-TTA-FAG-VAH): **ওরে** (O) = অলফ্যাক্টরি; **ও** (O) = অপটিক; **অকু** (O) = অকুলোমোটর; **ত্বরা** (T) = ট্রকলিয়ার; **ত্বরি** (T) = ট্রাইজেমিনাল ; **আয়** (A) = অ্যাবডুসেন্স; **ফটিক** (F) = ফেসিয়াল; **আজ** (A) = অডিটরি; **গাইছে** (G) = গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল; **ভাল** (V) = ভেগাস; **আ** (A) = স্পাইনাল অ্যাকসেসরি; **হা** (H) = হাইপোগ্লোসাল।]

সুষুম্নাস্নায়ু (Spinal nerve)

যেসব স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ড থেকে সৃষ্ট, মিশ্র প্রকৃতির এবং সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদের **সুষুম্নাস্নায়ু** বা **স্পাইনাল নার্ভ** (spinal nerve) বলে। **সুষুম্নাস্নায়ু ৩১ জোড়া**। প্রতিটি স্নায়ু সুষম্নাকাণ্ডের সাথে **একটি ডর্সাল সেনসরি রুট** (dorsal sensory root) এবং একটি **ভেন্ট্রাল মটর রুট** (ventral motor root) দ্বারা যুক্ত থাকে। প্রতিটি সুষম্না স্নায়ু প্রান্তের দিকে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পেশিতে প্রবেশ করে। এদের নাম, অবস্থান ও সংখ্যা ছকে উপস্থাপন করা হলো–

স্নায়ুর নাম	অবস্থান	সংখ্যা
গ্রীবাদেশীয় (Cervical)	গ্রীবাদেশ	৮ জোড়া
বক্ষদেশীয় (Thoracic)	বক্ষদেশ	১২ জোড়া
কটিদেশীয় (Lumber)	কটিদেশ	৫ জোড়া
শ্রোণিদেশীয় (Sacral)	শ্রোণিদেশ	৫ জোড়া
পুচ্ছদেশীয় (Coccygeal)	পুচ্ছদেশ	১ জোড়া

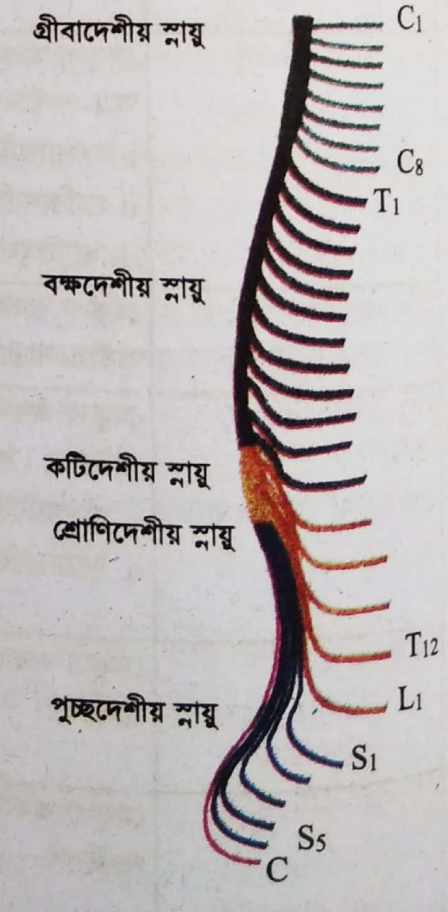

চিত্র : সুষুম্নাস্নায়ু

Scanned with CamScanner

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	মস্তিষ্ক	সুষুম্নাকাণ্ড
১। অবস্থান	এটি করোটিকার মধ্যে অবস্থান করে।	এটি মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে।
২। আকৃতি	এটি স্ফীত ও ডিম্বাকৃতির।	এটি লম্বা ও প্রায় চোঙাকৃতির।
৩। বিভক্তি	এটি বাইরের দিক থেকে সালকি ও জাইরি ফিশার দ্বারা বিভক্ত থাকে।	এটি বাইরের দিক থেকে অ্যান্টেরিয়র ও পস্টেরিয়র ফিশার দ্বারা বিভক্ত থাকে।
৪। স্নায়ুর সংখ্যা	মস্তিষ্ক থেকে ১২ জোড়া স্নায়ু সৃষ্টি হয়।	সুষুম্নাকাণ্ড থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু সৃষ্টি হয়।
৫। কাজ	দেহের সকল যান্ত্রিক, জৈব রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।	সুষুম্না স্নায়ু ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

করোটিক স্নায়ু ও সুষুম্নাস্নায়ুর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	করোটিক স্নায়ু	সুষুম্নাস্নায়ু
১। উৎপত্তিস্থল	মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়।	সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়।
২। সংখ্যা	১২ জোড়া।	৩১ জোড়া ।
৩। স্নায়ুমূল	প্রতিটি স্নায়ুর ১টি স্নায়ুমূল থাকে।	প্রতিটি স্নায়ুর ১ জোড়া স্নায়ুমূল আছে ।
৪। স্নায়ু প্রকৃতি	স্নায়ু সংবেদী অথবা চেষ্টীয় অথবা মিশ্র প্রকৃতির হয়।	সকল স্নায়ু মিশ্র প্রকৃতির।
৫। অবস্থা	করোটিক স্নায়ু সুষুম্নাস্নায়ু অপেক্ষা অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং উন্নততর।	করোটিক স্নায়ুর মতো উন্নত নয়। ফলে মস্তিষ্কে উদ্দীপনা পৌঁছাতে পারে না। সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সৃষ্টি করে।

❑ **কাজ :** (i) করোটিক স্নায়ুগুলোর উৎপত্তি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। (ii) সংবেদী অঙ্গগুলোর সাথে সম্পর্কিত স্নায়ুগুলো কার্যকারিতা হারালে উপযুক্ত প্রতিবেদন অসম্ভব– বিশ্লেষণ কর।

৮.৪ মানব সংবেদী অঙ্গ (Human Sensory Organs)

জীব বিবর্তনের ফলে যখন এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবের উদ্ভব ঘটে তখন বহুকোষী জীবের কোষগুলোর মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজনে প্রাণিদেহে দুই প্রকার যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী তন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। প্রথমটি হলো স্নায়ুতন্ত্র এবং দ্বিতীয়টি হলো সংবেদী অঙ্গ। **যেসব গ্রাহক অঙ্গের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে আগত বিশেষ উদ্দীপনা** (চাপ, তাপ, স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্বাদ ইত্যাদি) **গৃহীত হয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয় তাকে সংবেদী অঙ্গ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে।** মানবদেহে প্রায় ১১ ধরনের সংবেদী গ্রাহক বিদ্যমান। মানবদেহের প্রধান সংবেদী অঙ্গগুলো হলো **চক্ষু বা চোখ** (eye), **কর্ণ** (ear), **নাসিকা** (nose), **জিহ্বা** (tongue) ও **ত্বক** (skin)। এ পাঁচটি প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়কে একত্রে **পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ও** বলা হয়। এগুলো দর্শন (vision), শ্রবণ ও ভারসাম্য (hearing and equilibrium), ঘ্রাণ (smell), স্বাদ (taste) এবং স্পর্শ (touch) রক্ষাকারী অঙ্গ হিসেবে পরিচিত।

চোখ : আলোক সংবেদী ও দর্শনেন্দ্রিয় (EYES : Photoreceptor and Vision organs)

চোখের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের রূপ অনুভব করি, তাই চোখকে **দর্শনেন্দ্রিয়** (organ of vision) বলে।

অবস্থান : মানুষের চোখ দুটি নাসিকার দু'পাশে করোটির অক্ষিকোটরে অবস্থিত। চোখের মাত্র $\frac{১}{৬}$ অংশ বাইরের থেকে দেখা যায় এবং বাকি $\frac{৫}{৬}$ অংশ কোটরের ভেতরে অবস্থান করে।

চোখের গঠন : মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– **অক্ষিগোলক** বা নেত্রগোলক (eye ball) ও **আনুষঙ্গিক অংশ** (accessory parts)। মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

Scanned with CamScanner

মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশের ছক

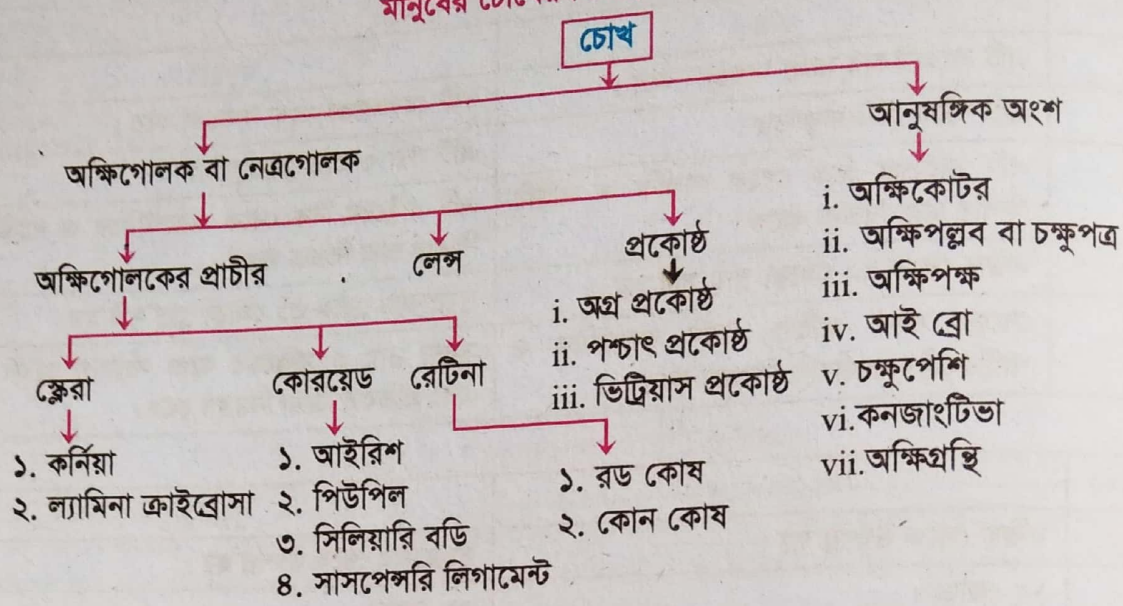

(ক) অক্ষিগোলক বা নেত্রগোলক (Eye ball)

অক্ষিগোলক চোখের প্রধান অংশ। এটি একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরার মতো। এটি অক্ষিকোটরের মধ্যে ছয়টি অক্ষিপেশি দ্বারা ঝুলে থাকে। অক্ষিগোলক তরল পদার্থ পূর্ণ গোলাকার অংশবিশেষ। এর ব্যাস ২৩-২৫ মিলিমিটার। এটি তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত, যথা– ১। **অক্ষিগোলকের প্রাচীর**, ২। **লেন্স** ও ৩। **প্রকোষ্ঠ**।

১। **অক্ষিগোলকের প্রাচীর** (Wall of Eye ball) : অক্ষিগোলকের প্রাচীর তিনটি স্তর দ্বারা আবৃত। যথা : (ক) **স্ক্লেরা**, (খ) **কোরয়েড** ও (গ) **রেটিনা**।

(ক) স্ক্লেরা (Sclera) : এটি অক্ষিগোলকের সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তর। স্তরটি সাদা, পুরু ও দৃঢ়, অস্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক, তন্তুময় যোজক কলা এবং তরুণাস্থি নির্মিত।

স্ক্লেরার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য অংশগুলো হলো–

১। **কর্নিয়া** (Cornea) : স্ক্লেরার সম্মুখভাগে উৎগত, উন্মুক্ত, স্বচ্ছ ও সামান্য উত্তলাকার অংশকে কর্নিয়া বলে। কর্নিয়াকে **চোখের জানালা** (window of eye) বলা হয় কারণ এর মধ্য দিয়ে চোখে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে।

কাজ : প্রতিসারক মাধ্যমরূপে কাজ করে। অক্ষিগোলকের মধ্যে আলো প্রবেশে সাহায্য করে।

২। **ল্যামিনা ক্রাইব্রোসা** (Lamina cribrosa) : চোখের পশ্চাৎ দিকে স্ক্লেরার যে বিন্দু দিয়ে অপটিক স্নায়ু প্রবেশ করে সে অংশকে ল্যামিনা ক্রাইব্রোসা বলে।

কাজ : এটি চোখ ও চোখের চারপাশের টিস্যুর মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

স্ক্লেরার কাজ : এটি অক্ষিগোলকের আকার নিয়ন্ত্রণ করে, বহিঃআঘাত থেকে ভেতরের অংশসমূহকে ও জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে এবং চক্ষুপেশিসমূহ সংযুক্ত রাখে। অক্ষিগোলকের মধ্যে আলো প্রবেশে বাধা দান করে।

(খ) কোরয়েড (Choroid) : এটি স্ক্লেরা ও রেটিনার মধ্যবর্তী স্তর। এটি স্নায়ু ও কৈশিক জালিকাসমৃদ্ধ, যোজক কলা ও রঞ্জক কোষ (**মেলানিন**) সমন্বয়ে গঠিত। এটি কালো বর্ণের। এই স্তরটি আলো অপ্রবেশ্য।

কোরয়েডের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশ–

১। **আইরিশ** (Iris) : কর্নিয়ার সংযোগস্থল বরাবর কোরয়েড স্ক্লেরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কর্নিয়ার পেছনে একটি অস্বচ্ছ, রঙিন, বৃত্তাকার সংকোচনশীল ডিস্ক গঠন করে, একে আইরিশ বলে। আইরিশের কেন্দ্রে পিউপিল (Pupil) নামক একটি ছিদ্র থাকে।

কাজ : পিউপিলকে সংকুচিত-প্রসারিত করে চোখের রেটিনায় আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

Scanned with CamScanner

২। পিউপিল (Pupil) : এটি আইরিশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি গোলাকার ছিদ্র (ব্যাস ১-৮ মিলিমিটার)। একে ঘিরে বৃত্তাকার ও অরীয় পেশি অবস্থিত। আলোকের তীব্রতা অনুযায়ী এ পেশিগুলোর সংকোচন-প্রসারণের ফলে পিউপিল ছোট (এ সময় অরীয় পেশি প্রসারিত হয় এবং বৃত্তাকার পেশি সংকুচিত হয়) ও বড় (এ সময় অরীয় পেশি সংকুচিত হয় এবং বৃত্তাকার পেশি প্রসারিত হয়) হয়।

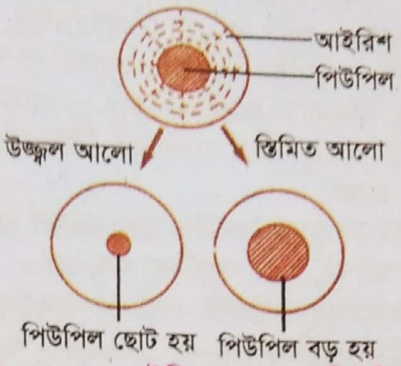

চিত্র ৮.১২.২ : আইরিশের মাধ্যমে পিউপিল নিয়ন্ত্রণ

কাজ : পিউপিল অক্ষিগোলকে আলোক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর মধ্য দিয়ে আলো লেন্সে এসে পড়ে। মৃদু আলোতে পিউপিল বড় হয় এবং উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে পিউপিল ছোট হয়।

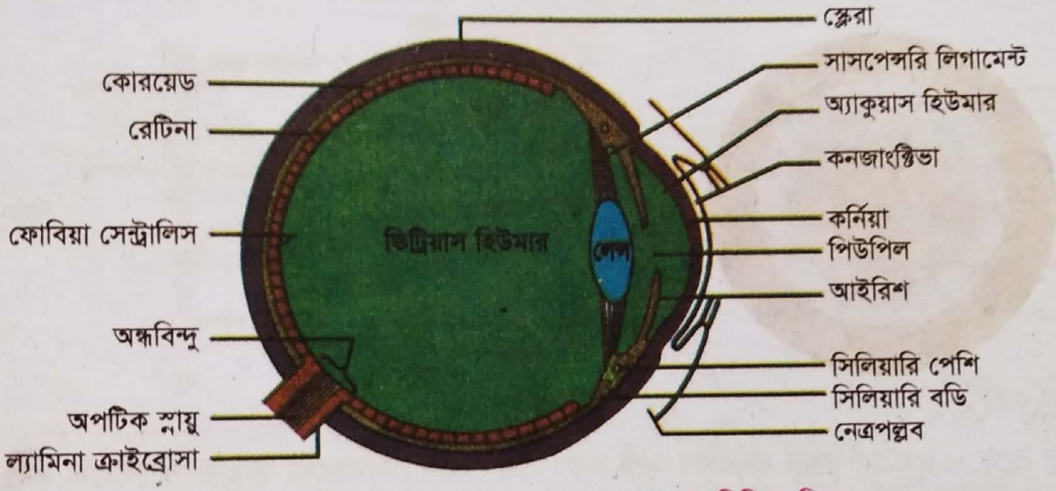

চিত্র ৮.১২.১ : মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র

৩। সিলিয়ারি বডি (Ciliary body) : আইরিশের পেছনে কোরয়েডের অপর একটি অংশ গোলাকার ও স্ফীত হয়ে সিলিয়ারি বডি বা সিলীয় অঙ্গ গঠন করে। এটি **সিলিয়ারি বলয়** (ciliary ring), **সিলিয়ারি প্রবর্ধক** (ciliary process) ও **সিলিয়ারি পেশি** (ciliary muscle) নিয়ে গঠিত। চোখের লেন্স সাসপেন্সরী লিগামেন্ট (Suspensory ligament) দিয়ে সিলিয়ারী বডির সাথে যুক্ত, সিলীয় পেশিগুলো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে উপযোজন ক্রিয়ায় অংশ নেয়।

কাজ : এটি লেন্সকে ঝুলিয়ে রাখা ছাড়াও লেন্সের বক্রতার ব্যাসার্ধের পরিবর্তনের মাধ্যমে সঠিক প্রতিবিম্ব গঠনে সহায়তা করে। সিলিয়ারি পেশিগুলো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে উপযোজনে অংশ নেয়। সিলিয়ারি বডি অ্যাকুয়াস হিউমারও উৎপন্ন করে।

৪। সাসপেন্সরি লিগামেন্ট (Suspensory ligament) : লেন্সের চতুর্দিক বেষ্টনকারী লিগামেন্টকে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট বলে। লিগামেন্টের অপর প্রান্ত সিলিয়ারি বডির সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : সাসপেন্সরি লিগামেন্ট দিয়ে লেন্সটি যথাস্থানে অবস্থান করে এবং সিলিয়ারি বডির সাথে সংযুক্ত থাকে।

কোরয়েডের কাজ : অক্ষিগোলকের বিভিন্ন অংশে (বিশেষ করে স্ক্লেরা ও রেটিনায়) পুষ্টিদ্রব্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং বর্জ্য অপসারণ করে।

(গ) রেটিনা (Retina) : অক্ষিগোলকের সবচেয়ে ভেতরের **আলোক সংবেদী** কোষস্তরকে রেটিনা বা অক্ষিপট বলে। রেটিনা ১০টি উপস্তর নিয়ে গঠিত। রেটিনায় দু'ধরনের স্নায়ুকোষ বা আলোক সংবেদী কোষ নিয়ে গঠিত উপস্তরটিই প্রধান। আলোক সংবেদী কোষ দুটি হলো–

১। রড কোষ (Rod cell) : এরা দণ্ডাকার এবং মৃদু আলোর প্রতি সংবেদনশীল। মানুষের চোখের রেটিনায় ১২ কোটি থেকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ রড কোষ থাকে। রড কোষে **রোডোপসিন** (rhodopsin) নামক প্রোটিন এবং ভিটামিন A থাকে। ভিটামিন A এর অভাবে রড কোষ নষ্ট হয়ে যায়, তাই **রাতকানা** (night blindness) রোগ দেখা দেয়। এ কোষগুলো মৃদু বা অনুজ্জ্বল আলোতে (dim light) দর্শনে সহায়তা করে।

Scanned with CamScanner

২। কোন কোষ (Cone cell) : এরা মোচাকার বা কোনাকৃতি এবং উজ্জ্বল বা তীব্র ও রঙিন আলোর প্রতি সংবেদনশীল। মানুষের চোখের রেটিনায় ৬০-৭০ লক্ষ কোন কোষ থাকে। কোন কোষে **আইডোপসিন** (iodopsin) নামক নীল রঞ্জক এবং **সায়ানোপসিন** (cyanopsin) নামক বেগুনি রঞ্জক থাকে। এরা বর্ণ শোষণে এবং ছবির সঠিক বিশ্লেষণে সক্ষম। মানুষের রেটিনাতে তিন ধরনের কোন কোষ থাকে যারা ভিন্ন ধরনের আলোর বর্ণ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীল। প্রথম ধরনের কোন কোষ লাল বা হলুদ বর্ণ (দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য), দ্বিতীয় ধরন সবুজ বর্ণ (মধ্যম তরঙ্গদৈর্ঘ্য) এবং তৃতীয় ধরন নীল বর্ণ (ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য) অনুধাবন করে। এ কোষগুলো সমভাবে উদ্দীপ্ত হলে সাদা বর্ণ দৃষ্ট হয়।

উভয় কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রচুর পরিমাণে মাইটোকন্ড্রিয়া ও অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণু থাকে। কোষগুলোর প্রান্তীয় সাইন্যাপটিক্যাল অংশ স্ফীত হয়ে বাল্ব গঠন করে যা দ্বিমেরু নিউরনের সাথে সিন্যাপস গঠন করে। রেটিনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশগুলো হলো–

(i) অন্ধবিন্দু (Blind spot) : রেটিনার যে স্থানে অপটিক স্নায়ু প্রবেশ করে সেখানে **রড** বা **কোন** কোষ থাকে না। ফলে ওই স্থানে কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় না, একে **অন্ধবিন্দু** বলা হয়।

(ii) পীতবিন্দু (Yellow spot) : অন্ধবিন্দুর সন্নিকটে রেটিনার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন টোল খাওয়ানো সংক্ষিপ্ত অঞ্চলটিকে **পীতবিন্দু** বা **ফোভিয়া সেন্ট্রালিস** (fovea centralis) বলে। এতে কেবল **কোন কোষ** থাকে, রড কোষ থাকে না। এটি অতিরিক্ত আলো সংবেদী, তাই এখানে সবচেয়ে ভালো ও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

(iii) অপটিক স্নায়ু (Optic nerve) : এটি দ্বিতীয় **করোটিক স্নায়ু** যা অক্ষিগোলকের অন্ধবিন্দু দিয়ে রেটিনায় বিস্তার লাভ করে। এটি দর্শনীয় বস্তুর অনুভূতি মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

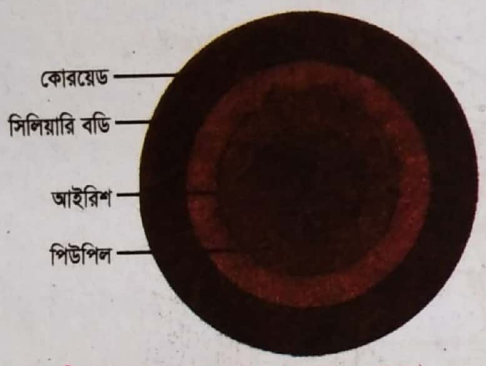

চিত্র ৮.১৩ : চোখের সামনের অংশ

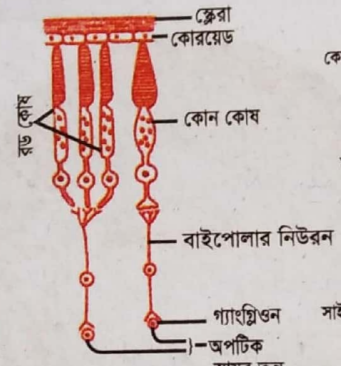

চিত্র ৮.১৪ (ক) : রেটিনার গঠন

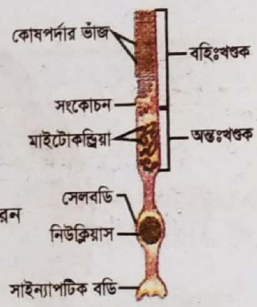



চিত্র ৮.১৪ (খ) : (ক) রড কোষ ও (খ) কোন কোষ

রেটিনার কাজ : এখানে বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এর কোন কোষগুলো উজ্জ্বল আলোতে এবং রড কোষগুলো মৃদু আলোতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। পীতবিন্দু বা ফোবিয়া সেন্ট্রালিসে দর্শনীয় বস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এটি বিভিন্ন ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

২। লেন্স (Lens) : পিউপিলের পেছনে একটি স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক ও দ্বিউত্তল লেন্স সিলিয়ারি বডির সাথে সাসপেন্সরি লিগামেন্টযুক্ত হয়ে ঝুলে থাকা অংশকে লেন্স বলে। লেন্সে রক্ত সরবরাহ নেই। সিলীয় পেশির সংকোচন-প্রসারণে লেন্সও সংকুচিত-প্রসারিত হয়। লেন্সটি একটি ক্যাপসুল পরিবেষ্টিত থাকে। লেন্সটির ব্যাস ১১ মিলিমিটার এবং মাঝখানের স্থূলত্ব প্রায় ৩.৬-৩.৯ মিলিমিটার।

কাজ : লেন্সের মাধ্যমে বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি রেটিনার নির্দিষ্ট অংশে প্রতিফলিত হয়।

৩। প্রকোষ্ঠ বা গহ্বর (Chamber) : অক্ষিগোলকে তিনটি গহ্বর বা প্রকোষ্ঠ থাকে। যথা :

(i) অগ্র প্রকোষ্ঠ (Anterior chamber): আইরিশ ও কর্নিয়ার মাঝে অবস্থিত মাঝারি আকৃতির প্রকোষ্ঠ। এ প্রকোষ্ঠটি **অ্যাকুয়াস হিউমার** (aquous humour) নামক তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে।

(ii) পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ (Posterior chamber) : আইরিশ ও লেন্সের মাঝে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকৃতির প্রকোষ্ঠ। এ প্রকোষ্ঠটিও **অ্যাকুয়াস হিউমার** তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। অ্যাকুয়াস হিউমারের প্রকৃতি অনেকটা সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের মতো।

(iii) ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ (Vitreous chamber): এটি লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী গোলাকৃতির বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। এটি চোখের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ গঠন করে। এটি **ভিট্রিয়াস হিউমার** (vitreous humour) নামক জেলির মতো তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। ভিট্রিয়াস হিউমারে ৯৯% পানি এবং ১% কোলাজেন ও হায়ালোরোনিক এসিড (hyaluronic acid) থাকে। ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ থেকে রেটিনার উপরে একটি সূক্ষ্ম ও রঙিন এপিথেলিয়াম স্তর সৃষ্টি হয়।

অক্ষিপ্রকোষ্ঠের কাজ : অক্ষিগোলকের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিদ্যমান তরল চোখের সঠিক আকৃতি বজায় রাখে। চোখের অন্তঃচাপ ও বহিঃচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। আলোকরশ্মি প্রতিসরণ করে এবং রেটিনা ও লেন্সে পুষ্টি যোগায়।

Scanned with CamScanner

(খ) আনুষঙ্গিক অংশ (Accessory parts)

১। **অক্ষিকোটর** (Orbit) : মানুষের করোটির সম্মুখে নাসিকার দু-পাশে অস্থিনির্মিত গহ্বর দুটিকে **অক্ষিকোটর** বলে।
কাজ : এখানে অক্ষিগোলক সুরক্ষিত থাকে।

২। **অক্ষিপল্লব বা নেত্রপল্লব বা চোখের পাতা** (Eyelids) : মানুষের প্রতিটি চোখের ওপরে ও নিচে একটি করে মোট দুটি পেশিময়, পাতার ন্যায় পাতলা পর্দা থাকে, এগুলো যথাক্রমে ঊর্ধ্ব অক্ষিপল্লব এবং একটি নিম্ন অক্ষিপল্লব নামে পরিচিত। এছাড়াও মানুষের চোখের কোণে (নাসিকার দিকে) তৃতীয় অক্ষিপল্লব বা **উপ-অক্ষিপল্লব** বা **নিকটিটেটিং পর্দা** (nictitating membrane), ক্ষয়প্রাপ্ত (vestigeal) অবস্থায় নিষ্ক্রিয় অঙ্গ ও ক্ষুদ্র লালচে মাংসপিণ্ডরূপে অবস্থান করে। অক্ষিপল্লব দুটি সঞ্চারণশীল হওয়ায় অশ্রুগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অশ্রু (tear) অক্ষিগোলকের বহির্ভাগে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে অক্ষিগোলক শুকিয়ে যায় না।
কাজ : অক্ষিপল্লব চোখকে ঢেকে রাখে এবং ধূলিকণা, পানি, ঘাম, তীব্র আলো, বাতাস প্রভৃতি থেকে চোখকে রক্ষা করে।

৩। **অক্ষিপক্ষ** (Eyelash) : মানুষের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন অক্ষিপল্লবের মুক্তপ্রান্তে একসারি লোম সাজানো থাকে, এগুলোকেই **অক্ষিপক্ষ** বা **পল্লব রোম** বলে।
কাজ : এরা ধূলাবালিকে চোখে প্রবেশে বাধা দেয় এবং তীব্র আলো থেকেও চোখকে রক্ষা করে।

৪। **আই ব্রো** (Eye-brows) : প্রতিটি চোখের কিছুটা ওপরের দিকে ও কপালের নিচের দিকে ঘনসন্নিবিশিষ্ট লোমযুক্ত ও বাঁকা ধনুকের মতো অঞ্চলকে **আই ব্রো** বলে।
কাজ : বৃষ্টির পানি ও ঘামকে কপাল থেকে গড়িয়ে চোখে আসতে বাধা দেয়।

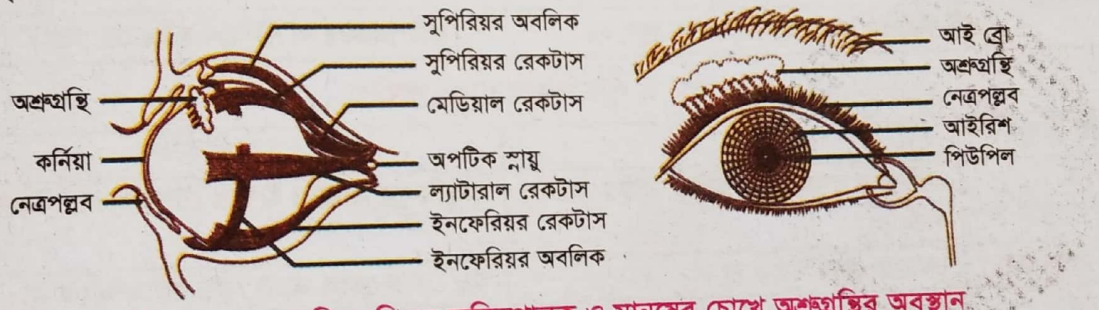

চিত্র ৮.১৫ : অক্ষিপেশিসহ অক্ষিগোলক ও মানুষের চোখে অশ্রুগ্রন্থির অবস্থান

৫। **অক্ষিপেশি** (Eye muscles) : প্রতিটি অক্ষিগোলক ৬টি করে অক্ষিপেশির সাহায্যে অক্ষিকোটরের মধ্যে অবস্থান করে। এদের মধ্যে ৪টি **রেক্টাস** (rectus) পেশি এবং ২টি **অবলিক** (oblique) পেশি। প্রতিটি চোখে নিম্নলিখিত ৬টি পেশি থাকে। যথা–

- **মেডিয়াল রেক্টাস** (Medial rectus) : অক্ষিগোলককে অক্ষিকোটরের ভেতরের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **ল্যাটারাল রেক্টাস** (Lateral rectus) : অক্ষিগোলককে অক্ষিকোটরের বাইরের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **সুপিরিয়র রেক্টাস** (Superior rectus) : অক্ষিগোলককে চক্ষুকোটরের উপরের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **ইনফিরিয়র রেক্টাস** (Inferior rectus) : অক্ষিগোলককে চক্ষুকোটরের নিচের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **সুপিরিয়র অবলিক** (Superior oblique) : অক্ষিগোলককে অপটিক স্নায়ু কর্নিয়ার মধ্য অক্ষ বরাবর ঘুরতে সহায়তা করে।
- **ইনফিরিয়র অবলিক** (Inferior oblique) : অক্ষিগোলককে অবলিক পেশির বিপরীত দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।

কাজ : উল্লেখিত ৬টি পেশির সাহায্যে চোখ অক্ষিকোটরে আটকানো থাকে এবং অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। **কনজাংটিভা** (Conjunctiva) : অক্ষিগোলকের কর্নিয়া একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দাবৃত থাকে, একে কনজাংটিভা বলে। কনজাংটিভার প্রদাহকে **কনজাংটিভাইটিস** (conjunctivitis) বলে।
কাজ : কর্নিয়াকে বাইরের আঘাত, ধুলাবালি ও জীবাণু থেকে রক্ষা করে এবং পরিষ্কার ও ভেজা রাখে।

৭। **অক্ষিগ্রন্থি** (Eye gland) : প্রত্যেক চোখে তিন ধরনের গ্রন্থি থাকে। যথা–

- **অশ্রুগ্রন্থি বা ল্যাকরিমাল গ্রন্থি** (Lacrimal gland): প্রতিটি অক্ষিগোলকের ওপরের ও সামনে অবস্থিত।
- **হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি** (Harderian gland): অক্ষিগোলকের পশ্চাতে অক্ষীয় দিকে অবস্থিত।
- **মেবোমিয়ান গ্রন্থি** (Meibomian gland): অক্ষিপল্লবের কোণায় অবস্থিত।

কাজ : হার্ডেরিয়ান ও মেবোমিয়ান গ্রন্থি তৈলাক্ত ক্ষরণ করে অক্ষিপল্লব ও কর্নিয়াকে পিচ্ছিল রাখে। অশ্রুগ্রন্থির অশ্রু চোখকে ভেজা রাখতে এবং চোখে উৎপন্ন ময়লা বের করে অক্ষিগোলককে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া অশ্রুতে অবস্থিত এনজাইম **লাইসোজাইম** (lysozyme) ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে চোখকে সুরক্ষা প্রদান করে। অশ্রু এক প্রকারের সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম বাই-কার্বনেট নিয়ে গঠিত জলীয় দ্রবণ। অশ্রু চোখের উপরিতলের ধুলোবালি ধুয়ে দেয়।

Scanned with CamScanner

রড কোষ ও কোন কোষের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	রড কোষ	কোন কোষ
১। আকৃতি	বাইরের খণ্ড রড আকৃতির।	বাইরের খণ্ড কোন আকৃতির।
২। দর্শনের তীক্ষ্ণতা	কম।	বেশি ।
৩। রঞ্জক পদার্থ	রডপসিন নামক প্রোটিন ।	আয়োডপসিন নামক প্রোটিন।
৪। সংযুক্তি	একটি বাইপোলার কোষের সঙ্গে অনেকগুলো রড কোষ সংযুক্ত থাকে।	একটি বাইপোলার কোষের সঙ্গে একটি মাত্র কোন কোষ সংযুক্ত থাকে।
৫। সংখ্যা	প্রতি রেটিনায় ১২ কোটি থেকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ।	প্রতি রেটিনায় ৬০-৭০ লক্ষ।
৬। বিতরণ	সমগ্র রেটিনায় সমভাবে উপস্থিত ।	রেটিনার মধ্যস্থলে বিশেষ করে হলুদ বিন্দুতে সবচেয়ে বেশি।
৭। সংবেদনশীলতা	আলোর প্রতি অধিক সংবেদনশীল,তাই রাতের দর্শনে ব্যবহৃত হয়। একে **স্ক্যাটোপিক দর্শন** বলা হয়।	আলোর প্রতি কম সংবেদনশীল,তাই দিনের দর্শনে ব্যবহৃত হয়। একে **ফটোপিক দর্শন** বলা হয়।
৮। প্রতিবিম্ব	দর্শন বস্তুর সাদাকালো প্রতিবিম্ব তৈরি করে।	দর্শন বস্তুর রঙিন প্রতিবিম্ব তৈরি করে।
৯। রোগ	এটি ক্ষতিগ্রস্থ বা নষ্ট হলে **রাতকানা** রোগ হয়।	এটি ক্ষতিগ্রস্থ বা নষ্ট হলে **বর্ণান্ধ** রোগ হয়।

অন্ধবিন্দু ও পীতবিন্দুর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অন্ধবিন্দু	পীতবিন্দু
১। অবস্থান	রেটিনার পেছনে অপটিক স্নায়ুর প্রবেশ পথে।	অন্ধবিন্দুর সামান্য উপরে টোল খাওয়া হলদে অঞ্চল।
২। রড ও কোন কোষ	কোনো কোষ থাকে না।	শুধু কোন কোষ থাকে, রড কোষ থাকে না।
৩। আলো সংবেদন	আলোসংবেদী নয়।	অতিমাত্রায় আলোসংবেদী।
৪। প্রতিবিম্ব গঠন	রড কোষ ও কোন কোষ না থাকায় কোনো প্রতিবিম্ব গঠিত হয় না।	আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।
৫। স্নায়ুতন্ত্র	কোনো স্নায়ুতন্ত্র দেখা যায় না।	অসংখ্য স্নায়ুতন্ত্র থাকে।

প্রতিবিম্ব গঠন ও দর্শন প্রক্রিয়া (Formation of Image and Machanism of vision)

আমরা যে বস্তুকে দেখি তার থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি স্বচ্ছ **কর্নিয়া** ও অ্যাকুয়াস হিউমারকে ভেদ করে পিউপিল দিয়ে লেন্সের ওপর পড়ে। লেন্স থেকে আলো প্রতিসরিত হয়ে ভিট্রিয়াস হিউমারের মধ্য দিয়ে **রেটিনায়** পড়ে। রেটিনায় বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এই সময় চোখটি ক্যামেরার মতো কাজ করে। রেটিনার রড ও কোন কোষ থেকে আলোক অনুভূতি অপটিক স্নায়ু মাধ্যমে **সেরিব্রাম** বা **গুরুমস্তিষ্কের** দর্শন কেন্দ্র বা ভিসুয়্যাল কর্টেক্সে (visual cortex) পৌঁছে। মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষমতা বলে রেটিনার উল্টো প্রতিবিম্বকে আমরা সোজাভাবে দেখি।

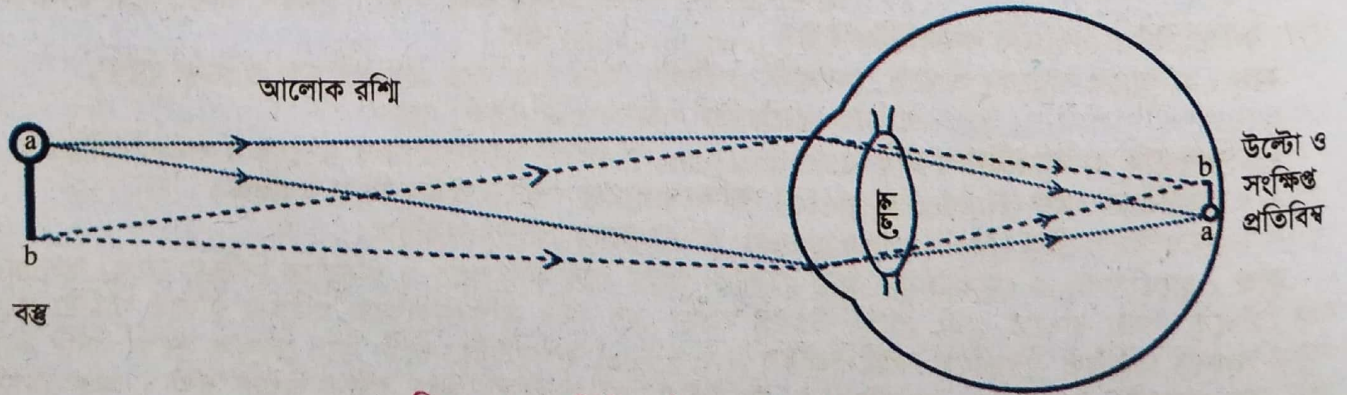

চিত্র ৮.১৬ : প্রতিবিম্ব গঠন ও দর্শন প্রক্রিয়া

Scanned with CamScanner

দর্শন কৌশলের প্রবাহচিত্র :

আলোকরশ্মি → কর্নিয়া → অ্যাকুয়াস হিউমার → পিউপিল → লেন্স → ভিট্রিয়াস হিউমার → লেন্স → রেটিনা

↓

দর্শন (সোজা প্রতিবিম্ব গঠন) ← মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্র ← অপটিকস স্নায়ু

উপযোজন (Accommodation)

স্থান পরিবর্তন না করে অক্ষিগোলকের পেশি ও লেন্সের সাহায্যে যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তাকে **উপযোজন** বা **অ্যাকোমোডেশন** বলে।

উপযোজন এক প্রকার প্রতিবর্ত প্রক্রিয়া। মানবচক্ষুর ভালো উপযোজন ক্ষমতা আছে। ২৫ সেমি দূর থেকে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত কোনো বস্তু থেকে আগত আলোর দ্বারা চক্ষু প্রভাবিত হতে পারে। চোখের সিলিয়ারি বডি ও সাসপেন্সরি লিগামেন্টকে একত্রে **উপযোজন যন্ত্র** (accomodation apparatus) বলে। কাছে ও দূরের বস্তুদেখার জন্য স্তন্যপায়ীতে দু'ভাবে উপযোজন হয়। যথা–

(ক) খুব কাছে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন প্রক্রিয়া : কোনো দর্শনীয় বস্তু যখন চোখের খুব নিকটে অবস্থান করে, তখন চোখের বাইরে অপ্রকৃত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এবং অবস্থাকে এড়ানোর জন্য সিলিয়ারি পেশি প্রসারিত হয়। এর ফলে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট প্রসারিত হয় এবং লেন্সের বক্রতা বৃদ্ধি পায়। এতে লেন্সটি মোটা ও খাটো হয় এবং লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে যায়। ফোকাস দূরত্ব কমে যাওয়ার ফলে কাছের বস্তু থেকে আসা আলোকরশ্মি রেটিনায় পতিত হয়ে রেটিনায় প্রকৃত প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

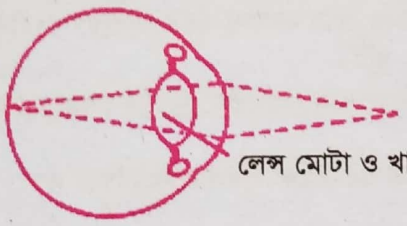

চিত্র ৮.১৭ ক : খুব কাছে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন প্রক্রিয়া

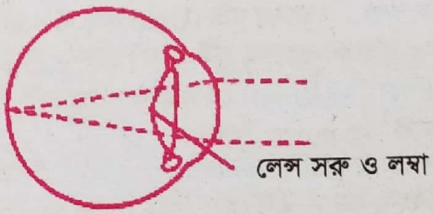

চিত্র ৮.১৭ খ : দূরে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন প্রক্রিয়া

(খ) দূরে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন প্রক্রিয়া : দূরে অবস্থিত বস্তু কোনো থেকে আসা আলোকরশ্মি আমাদের চোখে অবস্থিত পিউপিলের মাধ্যমে প্রবেশ করলে সিলিয়ারি পেশি সংকুচিত হয়। ফলে সাসপেন্সারি লিগামেন্টও সংকুচিত হয় এবং লেন্সের বক্রতা কমে যায়। ফলে লেন্স সরু ও লম্বা হয়। এতে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যায়। ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে দূরের বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি রেটিনায় পতিত হয়ে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এভাবে প্রয়োজনমতো লেন্সের বক্রতা কমিয়ে রেটিনার দৃষ্টি সংবেদী অঞ্চলে আলোকরশ্মি ফেলে মানুষের চোখে দূরের বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

এভাবে দর্শনীয় বস্তু ও লেন্সের মধ্যকার দূরত্বের পরিবর্তন সাধন না করেই সিলিয়ারি পেশি এবং সাসপেন্সারি লিগামেন্টের প্রসারণ বা সংকোচন ঘটিয়ে লেন্সের বক্রতার তথা ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে মানবচক্ষুর উপযোজন ঘটে। সুস্থ ও স্বাভাবিক চোখের সহজাত উপযোজন ঘটে। মানুষের চল্লিশ বছর বয়স থেকে এ ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এ অবস্থাকে চালশে বলে। এটা কোনো রোগ নয়। লেন্স বা চশমা ব্যবহার করার সাহায্যে এ সময় স্বাভাবিকভাবে রেটিনায় প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এবং মানুষ প্রায় স্বাভাবিকভাবে দেখতে পায়।

মানুষের চোখের সীমাবদ্ধতা : (১) মানুষের চোখের আলোক গ্রহণ ক্ষমতা সীমিত কারণ এর আকৃতি সুনির্দিষ্ট। (২) এটি সুনির্দিষ্ট আলোক তীব্রতায় সাড়া দিয়ে কেবল দৃশ্যমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি দেখতে সহায়তা করে। (৩) প্রতি মুহূর্তে চোখ বস্তুর নতুন প্রতিবিম্ব দেখে। (৪) আলোর তীব্রতা বাড়িয়ে এটি কোনো বস্তুর অস্পষ্ট প্রতিবিম্বকে স্পষ্ট করতে পারে না। (৫) চোখ কোনো বস্তুর প্রতিবিম্বকে ক্যামেরার মতো সংরক্ষণ করতে পারে না।

দ্বিনেত্র দৃষ্টি বা স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি (Binocular or Sterioscopic vision)

যখন একসঙ্গে দুটি চোখ দিয়ে একই বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায় তখন সেই রকম দৃষ্টিকে **দ্বিনেত্র দৃষ্টি** বা **স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি** বলে। যেমন– মানুষ, বানর, বাজপাখির ইত্যাদি প্রাণীদের দৃষ্টি। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি রেটিনায় পড়লে যে স্নায়ু উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে **মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে** (visual cortex) একটি মাত্র প্রতিবিম্বে একীভূত হয়, ফলে দু'চোখে একটি বস্তুকে এককভাবে দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

মানুষসহ কিছু প্রাণীর চোখ মাথার সামনের দিকে অবস্থিত। মানুষের এ চোখ দুটির মধ্যকার দূরত্ব ৩.৬ সেন্টিমিটার। ফলে কোনো বস্তু দেখার সময় প্রতিটি চোখ বস্তুটির একটি করে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। এর ফলে দুচোখে কোনো একটি বস্তুর দু'রকমের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্ক এ দু'রকমের প্রতিবিম্ব মিশিয়ে বস্তুর একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরি করে থাকে। আর এ ধরনের প্রতিবিম্বই হলো দ্বিনেত্র দৃষ্টি বা বাইনোকুলার ভিশন।

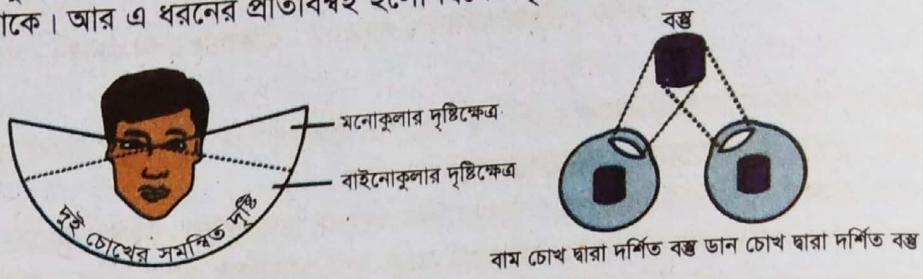

চিত্র ৮.১৮ : মানুষের দ্বিনেত্র দৃষ্টি

দ্বিনেত্র দৃষ্টির সুবিধা : (১) দ্বিনেত্র দৃষ্টি দ্বারা আমরা কোনো একটি বস্তুর আকৃতি ও গভীরতার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারি। (২) কোনো একটি চোখে সমস্যা হলে অন্য চোখ দ্বারা আমরা দেখতে পারি। (৩) কোনো একটি বস্তুর দূরত্ব সঠিকভাবে অনুভব করা যায়। (৪) বস্তুর ত্রিমাত্রিক ছবি অবলোকন করা যায়।

❑ **কাজ :** (i) মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। (ii) পিউপিলের সংকোচন প্রসারণে আইরিশের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। (iii) মানুষের চোখের সাথে ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষির কার্যপদ্ধতি তুলনা কর। (iv) রেটিনা কীভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে– বিশ্লেষণ কর।

[**প্রাসঙ্গিক তথ্য : একনেত্র দৃষ্টি** (Unicular vision) : যখন একসঙ্গে দুটি চোখ দিয়ে আলাদা বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায় তখন সেই রকম দৃষ্টিকে **একনেত্র দৃষ্টি** বলে। যেমন– ব্যাঙ, গরু ইত্যাদি প্রাণীদের দৃষ্টি।

মায়োপিয়া (Myopia): যে দৃষ্টিতে দূরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় তাকে মায়োপিয়া বলে। অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহারে এই রোগ সারে (একে -ve power বলে)।

হাইপারমেট্রোপিয়া (Hypermetropia) : যে দৃষ্টিতে কাছের দৃষ্টি ব্যাহত হয় তাকে হাইপারমেট্রোপিয়া বলে। উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করলে এই রোগ সারে (একে +ve power বলে)।

ছানি বা ক্যাটার‍্যাক্ট (Cataract): বয়সজনিত কারণে, লেন্স বা কর্নিয়া অস্বচ্ছ হলে দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ চলে যায় বা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এ ত্রুটিকে ছানি বা ক্যাটার‍্যাক্ট বলে। লেন্স বা কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করে এ ত্রুটি দূর করা যায়।

গ্লুকোমা (Glaucoma) : চোখের যেসব ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায়, চোখ থেকে মস্তিষ্কে সংবেদ পরিবহনকারী অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের একত্রে গ্লুকোমা বলে। এক্ষেত্রে সাধারণত অক্ষিগোলকের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ-মধ্যস্থ তরলের (অ্যাকুয়াস হিউমার) চাপ অর্থাৎ ইন্ট্রা-আকিউলার চাপ (intraocular pressure-IOP) বৃদ্ধি পায়, যার ফলে অপটিক স্নায়ু বিনষ্ট হয়।]

কান : শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ (EAR : Hearing and Equilibrium Organ)

কান মানুষের **শ্রবণ** ইন্দ্রিয় এবং **ভারসাম্য** রক্ষাকারী অঙ্গ। মানুষের কানের সংখ্যা দুটি।

অবস্থান : মানুষের মস্তিষ্কের প্রতি পার্শ্বে চোখের পেছনে একটি করে কান অবস্থিত। কানের সূক্ষ্ম অঙ্গসমূহ মাথার করোটির **টেম্পোরাল** (temporal) হাড়ের ভেতরে শ্রুতিকোটরের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে।

গঠন : প্রতিটি কান ৩টি প্রধান অংশে বিভক্ত, যথা– (ক) **বহিঃকর্ণ** (external ear), (খ) **মধ্যকর্ণ** (middle ear) ও (গ) **অন্তঃকর্ণ** (internal ear)। কানের বিভিন্ন অংশের বিবরণ :

কানের বিভিন্ন অংশের ছক

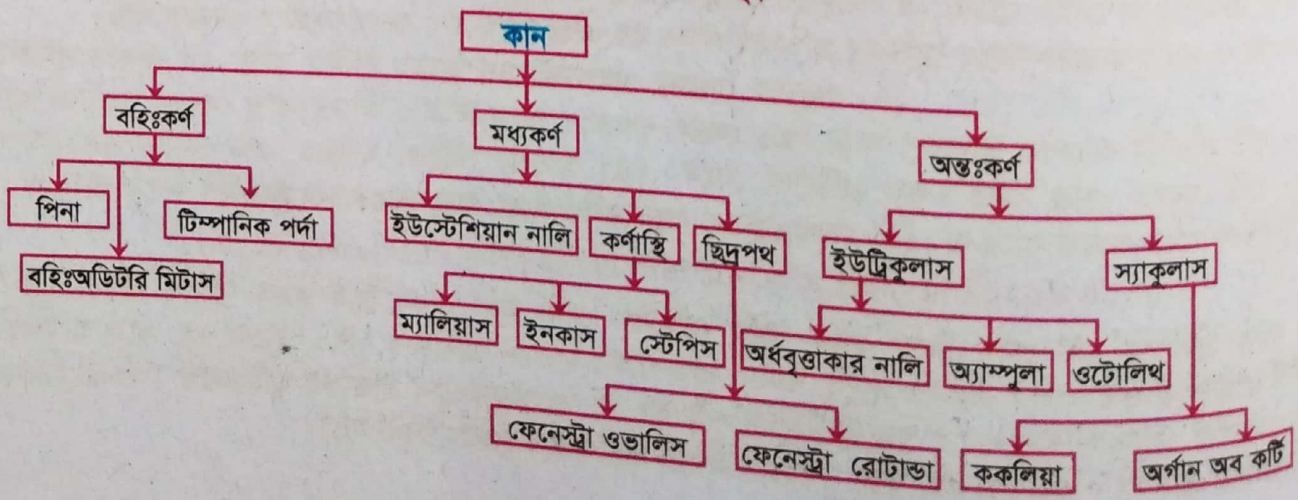

Scanned with CamScanner

(ক) বহিঃকর্ণ (External ear)

এটি কানের প্রধান ও বাইরের অংশ। বহিঃকর্ণ আবার ৩টি অংশে বিভক্ত। যথা : ১. **কর্ণছত্র** বা **পিনা**, ২. **কর্ণকুহর** বা **বহিঃঅডিটরি মিটাস** ও ৩. **কর্ণপটহ** বা **টিম্পানিক পর্দা**।

১। **কর্ণছত্র বা পিনা** (Pinna) : মাথার দু'পাশে অবস্থিত চ্যাপ্টা ও নমনীয় অংশটির নাম পিনা। এটির ত্বক, পেশি ও কোমলাস্থি দ্বারা গঠিত। কর্মক্ষম পেশিতন্তু না থাকায় মানুষ কান নাড়াতে পারে না।

কাজ : পরিবেশ থেকে শব্দ তরঙ্গ সংগ্রহ করে অভ্যন্তরে প্রেরণ করে।

২। **কর্ণকুহর বা বহিঃঅডিটরি মিটাস** (External auditory meatus) : কর্ণছত্রের কেন্দ্রস্থল থেকে কর্ণপটহ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সরু নালিপথকে কর্ণকুহর বলে। এর বাইরের দুই-তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি দিয়ে এবং এক-তৃতীয়াংশ অস্থিতে গঠিত। একটি ত্বক দ্বারা আবৃত এবং ত্বকে **মোমগ্রন্থি** ও **রোম কোষ** থাকে।

কাজ : কর্ণকুহরের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ লম্বভাবে কর্ণপটহে পৌঁছে এবং এতে বিদ্যমান মোম ও রোম বাইরে থেকে আগত ধুলাবালি, জীবাণু ইত্যাদি আটকে দেয়। এটি টিম্পানিক পর্দার অনুকূল উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বজায় রাখে।

৩। **কর্ণপটহ বা টিম্পানিক পর্দা** (Tympanic membrane) : কর্ণকুহরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত পর্দাটিকে কর্ণপটহ বলে। এটি টানটান পাতলা, ডিম্বাকার ও স্থিতিস্থাপক পর্দা। এর বাইরের দিক অবতল এবং ভেতরের দিক উত্তল। এর সাথে মধ্যকর্ণের ম্যালিয়াস অস্থি যুক্ত থাকে।

কাজ : কর্ণকুহরের মাধ্যমে আগত শব্দতরঙ্গ দ্বারা কর্ণপটহ স্পন্দিত হয় এবং এই স্পন্দন অতঃপর মধ্যকর্ণে সঞ্চারিত হয়। বহিঃকর্ণকে মধ্যকর্ণ থেকে পৃথক রাখে।

(খ) মধ্যকর্ণ (Middle ear)

এটি বহিঃকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মধ্যে 'টিম্পানিক বুলা'-র ভেতরে অবস্থিত। এটি ক্ষুদ্র বায়ুপূর্ণ অসম আকৃতির প্রকোষ্ঠ। মধ্যকর্ণে দেখা যায়– ১. ইউস্টেশিয়ান নালি, ২. কর্ণাস্থি ও ৩. ছিদ্রপথ।

১। **ইউস্টেশিয়ান নালি** (Eustachian canal) : মধ্যকর্ণের গহ্বরটির নিচের দিকে ইউস্টেশিয়ান নালি বা শ্রুতিনালি হিসেবে প্রবর্ধিত। মধ্যকর্ণের গহ্বরটি এই নালির মাধ্যমে নাসাগলবিল বা গলবিলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ইতালিয়ান শৈল্যবিদ Bartolommo Eustachio এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

কাজ : কর্ণপটহের উভয় পাশের বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করাই প্রধান কাজ। ইউস্টেশিয়ান নালির মাধ্যমে কানের বাইরে ও ভেতরে বায়ুচাপের সমতা বিরাজমান থাকে বলে **কর্ণপটহ** ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

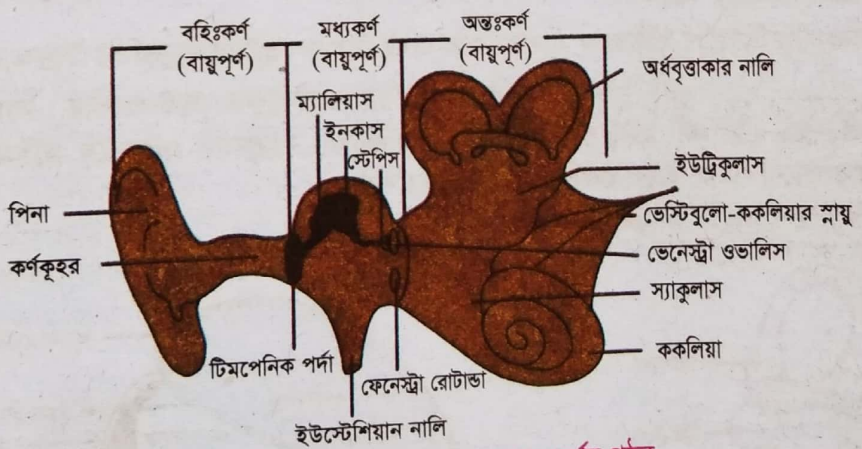

চিত্র ৮.১৯ক : মানুষের কর্ণের গঠন

২। **কর্ণাস্থি** (Ear ossicles) : মধ্যকর্ণের গহ্বরে প্রাণীর কঙ্কালতন্ত্র থেকে তিনটি পরস্পরসংলগ্ন ক্ষুদ্রাস্থি বা কর্ণাস্থি সারিবদ্ধভাবে থাকে। এগুলো হলো– i. **ম্যালিয়াস**, ii. **ইনকাস** ও iii. **স্টেপিস**।

(i) **ম্যালিয়াস** (Malleus) : ম্যালিয়াস দেখতে অনেকটা হাতুড়ির মতো এবং বাইরের প্রান্ত টিম্পানিক পর্দাতে ও অপর প্রান্ত ইনকাসের সঙ্গে আটকানো থাকে।

(ii) **ইনকাস** (Incus) : এটি ম্যালিয়াসের পরের অস্থি। এটির আকার অনেকটা নেহাই-এর মতো। এটি ম্যালিয়াসকে স্টেপিসের সঙ্গে যুক্ত করে। **এটি মানবদেহের সবচেয়ে ছোট ও হালকা অস্থি।**

Scanned with CamScanner

(iii) **স্টেপিস** (Stapes) : এটি দেখতে অনেকটা ঘোড়ার জিনের পাদানির মতো। এর এক প্রান্ত ইনকাসের সাথে এবং অন্য প্রান্ত ফেনেস্ট্রা ওভালিস নামে ছিদ্রের গায়ে বসানো থাকে।

কাজ : অস্থিগুলো বহিঃকর্ণের টিম্পানিক পর্দা থেকে শব্দতরঙ্গ অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফে প্রেরণ করে।

৩। ছিদ্রপথ (Cavity way) : অন্তঃকর্ণের সাথে যোগাযোগের জন্য মধ্যকর্ণের পেরিওটিক অস্থি নির্মিত প্রাচীরে দুটি ছিদ্রপথ থাকে। যথা–

(i) **ফেনেস্ট্রা ওভালিস** (Fenestra ovalis) : এটি উপরের দিকের ডিম্বাকার ছিদ্রপথ। একে **কানের ডিম্বাকৃতির জানালা** (oval window) বলা হয়।

কাজ : এর মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ মধ্যকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে।

(ii) **ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা** (Fenestra rotanda) : এটি নিচের দিকের গোলাকার ছিদ্রপথ। একে **কানের গোলাকৃতির জানালা** (round window) বলা হয়।

কাজ : অন্তঃকর্ণের ককলিয়ায় শ্রবণ অনুভূতি সৃষ্টির পর অতিরিক্ত শব্দতরঙ্গ এ ছিদ্রপথে অন্তঃকর্ণ থেকে মধ্যকর্ণে ফিরে এসে প্রশমিত হয়।

(গ) অন্তঃকর্ণ (Internal ear)

পাতলা পর্দা জাতীয় **মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ** (membranous labyrinth), নামক জটিল অঙ্গ দ্বারা অন্তঃকর্ণ গঠিত। অন্তঃকর্ণ করোটির শ্রুতিকোটরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এটি অডিটরি ক্যাপসুলের মধ্যে **পেরিলিম্ফ** (perilymph) নামক তরল পদার্থপূর্ণ **অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ** (bony labyrinth) দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থের অভ্যন্তরভাগ **এন্ডোলিম্ফে** (endolymph) পূর্ণ থাকে। অন্তঃকর্ণে নিম্নলিখিত ২টি প্রকোষ্ঠ থাকে। যথা: i. ইউট্রিকুলাস ও ii. স্যাকুলাস।

(i) **ইউট্রিকুলাস** (Utriculus) : এটি অন্তঃকর্ণের উপরের দিকের গোলাকার প্রকোষ্ঠ এবং আকারে বড়। ইউট্রিকুলাসের সঙ্গে ৩টি **অর্ধবৃত্তাকার নালি** যুক্ত থাকে। এগুলোর মধ্যে ২টি উল্লম্বভাবে এবং অপরটি আনুভূমিকভাবে অবস্থান করে। প্রতিটি নালির এক প্রান্ত স্ফীত হয়ে **অ্যাম্পুলা** (ampulla) গঠন করে। এদের অন্তঃপ্রাচীরের মধ্যে **সংবেদী কোষ** ও **রোম** (এগুলো ক্রিস্টি নামে পরিচিত) থাকে। রোমগুলো চুনময় **ওটোলিথ** (otolith) দানা সংবলিত জেলির মতো **ক্যুপুলায়** (cupula) আবৃত।

কাজ : দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে মস্তিষ্ককে সাহায্য করে এবং দেহ অবস্থানের অনুভূতির উদ্রেক করে।

(ii) **স্যাকুলাস** (Sacculus) : এটি অন্তঃকর্ণের নিচের দিকের অপেক্ষাকৃত ছোট প্রকোষ্ঠ। **স্যাকুলো-ইউট্রিকুলার** নামক একটি সংক্ষিপ্ত নালি দ্বারা এটি ইউট্রিকুলাসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। স্যাকুলাস থেকে যে অস্থিময় নলটি পেছনের দিকে শামুকের ন্যায় পেঁচানো থাকে, একে **ককলিয়া** (cochlea) বলে।

কাজ : শ্রবণ অনুভূতি জাগানো স্যাকুলাসের কাজ।

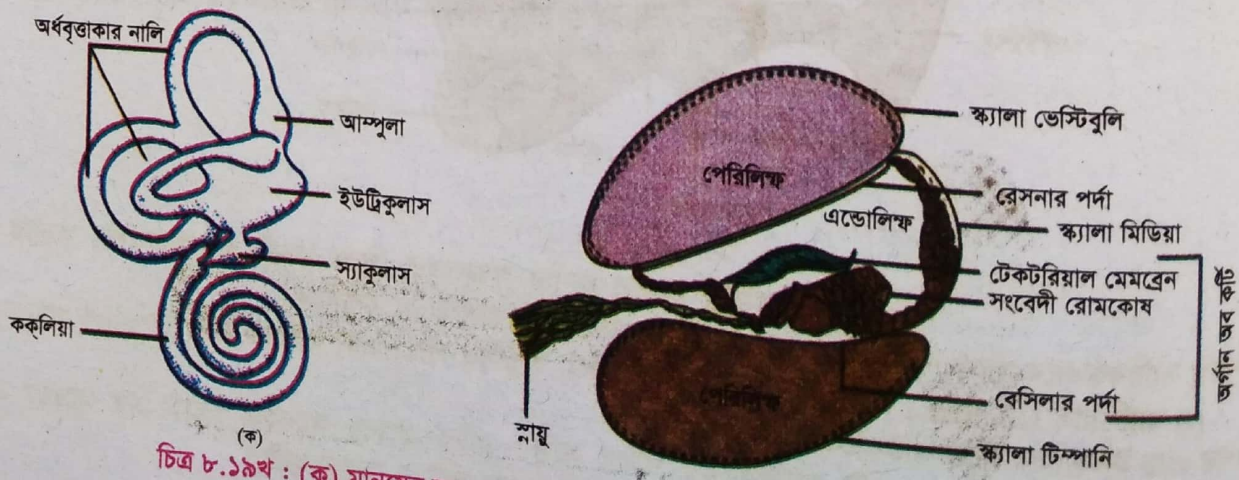

চিত্র ৮.১৯খ : (ক) মানুষের অন্তঃকর্ণ (মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ); (খ) ককলিয়ার প্রস্থচ্ছেদ

Scanned with CamScanner

ককলিয়ার গঠন : অন্তঃকর্ণের বা **মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থের** স্যাকুলাসের পেছনের অংশ নলাকার ধারণ করে ও বিশেষভাবে চক্রাকারে পেঁচিয়ে একটি শামুকের খোলকের মতো পেঁচানো অঙ্গ বা ককলিয়ায় পরিণত হয়। ককলিয়ার গঠন বেশ জটিল। ককলিয়া যে অস্থি গঠিত গহ্বরে অবস্থান করে তাকে **অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ** (bony labyrinth) বলে। এটি পেরিলিম্ফ নামক তরলে পূর্ণ থাকে। ককলিয়ার প্রকোষ্ঠটি **রেসনার** (reissner) **পর্দা** ও **বেসিলার** (basilar) **পর্দা** দিয়ে ৩টি গহ্বরে বিভক্ত থাকে। প্রকোষ্ঠ ৩টি হলো–

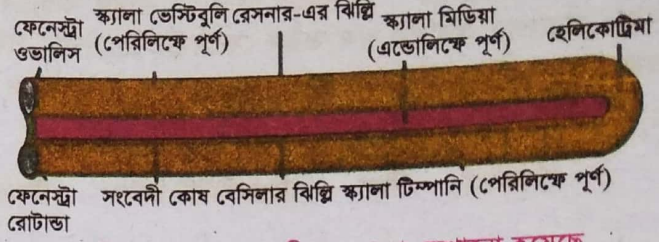

চিত্র ৮.১৯গ : ককলিয়া সোজা দেখানো হয়েছে

(i) স্ক্যালা ভেস্টিবুলি (scala vestibuli) : এটি ককলিয়া নালির উপরের দিকে অবস্থিত এবং **পেরিলিম্ফ** নামক তরলে পূর্ণ থাকে।

(ii) স্ক্যালা মিডিয়া (scala media) : এটি বেসিলার পর্দার নিচের প্রকোষ্ঠ এবং **এন্ডোলিম্ফ** নামক তরলে পূর্ণ থাকে। এটি উপরে রেসনারের ঝিল্লি ও নিচে বেসিলায় ঝিল্লিতে আবদ্ধ।

(iii) স্ক্যালা টিম্পানি (scala tympani) : এই গহ্বর ককলিয়া নালির অঙ্কীয় দিকে অবস্থিত এবং পেরিলিম্ফ নামক তরলে পূর্ণ থাকে। ককলিয়া নালির অভ্যন্তরে বেসিলার পর্দার এপিথেলিয়াম কোষগুলো রূপান্তরিত হয়ে **অর্গান অব কর্টি** (organ of corti) গঠন করে। অর্গান অব কর্টি রোম কোষ বা লোম কোষ (hair cells) গঠন করে, যা শ্রবণ সংবেদী। একেবারে শীর্ষে ককলিয়ার উর্ধ্ব ও নিম্ন প্রকোষ্ঠ একটি সরু নলাকার অংশের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত। এর নাম **হেলিকোট্রিমা** (helicotrema)।

কাজ : শ্রবণের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

স্নায়ু সংযোগ : মস্তিষ্কের অডিটরি স্নায়ুর শাখাসমূহ অর্ধবৃত্তাকার নালিসমূহের অ্যাম্পুলা এবং ককলিয়ার অর্গান অব কর্টিতে বিস্তার লাভ করে।

কাজ : প্রাণীর আপেক্ষিক অবস্থানের বার্তা মস্তিষ্কে প্রেরণপূর্বক ভারসাম্য রক্ষা করে এবং শ্রবণের অনুভূতি মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কানের ভূমিকা (Role of Ear in Hearing and Balancing)

শ্রবণ কৌশল (Hearing Mechanism)

বহিরাগত শব্দতরঙ্গ পিনার দ্বারা সংগৃহীত হয়ে বহিঃঅডিটরিমিটাসে প্রবেশ করে এবং টিম্পানিক পর্দায় ধাক্কা দেয়। ফলে টিম্পানিক পর্দা কম্পিত হয়। এই কম্পন মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয়ের (ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস) মাধ্যমে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দাকে আঘাত করে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। এর ফলে অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফে কম্পন সৃষ্টি হয়। পেরিলিম্ফে শব্দতরঙ্গের শক্তি প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়। এরপর শব্দতরঙ্গ পেরিলিম্ফের মধ্য দিয়ে স্ক্যালা ভেস্টিবুলি ও স্ক্যালা টিম্পানি হয়ে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার এন্ডোলিম্ফে অবস্থিত **শ্রুতিগ্রাহক যন্ত্র** বা **কর্টি যন্ত্রে** যায় এবং সংবেদী কোষগুলোকে উত্তেজিত করে।

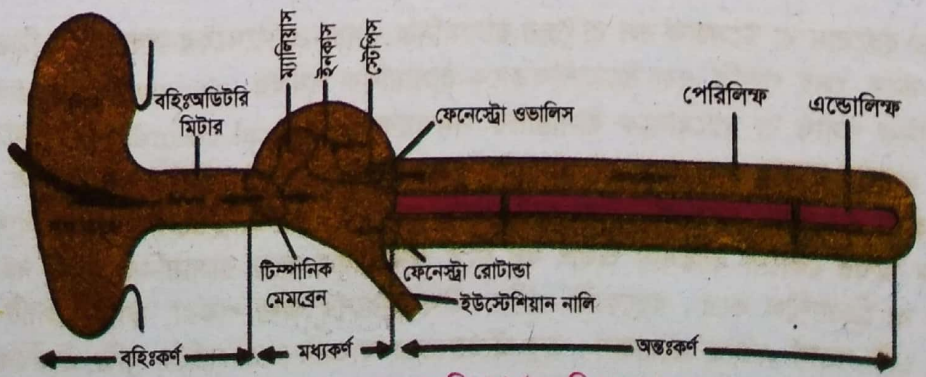

চিত্র ৮.২০ : কানের ভেতরের শব্দতরঙ্গের গতিপথ (ককলিয়া সোজা করে দেখানো হয়েছে)

Scanned with CamScanner

এ উত্তেজনা স্নায়ুর স্পন্দনরূপে অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে পৌছালে ক্রমশ প্রাণী শব্দটি শুনতে পায়। অতঃপর অবশিষ্ট শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডার পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়। এজন্য ফেনেস্ট্রা রোটান্ডাকে **pressure relief valve** বলে।

শ্রবণ কৌশলের রেখাচিত্র :

শব্দতরঙ্গ → পিনা → বহিঃঅডিটরি মিটাস → টিম্পানিক মেমব্রেন → মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয় → ককলিয়া

↓

শ্রবণ ← মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্র ← অডিটরি স্নায়ু ← স্নায়ুস্পন্দন ← সংবেদী কোষের উত্তেজনা সৃষ্টি ← কর্টিযন্ত্র

ভারসাম্য রক্ষায় (Balancing of the body)

অন্তঃকর্ণের অর্ধবৃত্তাকার নালি, ইউট্রিকুলাস এবং স্যাকুলাস (ককলিয়া ব্যতীত) ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কোনো কারণে প্রাণী ব্যালান্স হারালে বা স্থানচ্যুত হলে **ক্রিস্টি** (অন্তঃকর্ণের অ্যাম্পুলার অনুভূতিশীল রোমকোষ, এ কোষের রোমগুলোর সাথে ক্যুপুলা নামক জেলির মতো বস্তু সংযুক্ত থাকে) ও **ম্যাকুলির** (ইউট্রিকুলাস এবং স্যাকুলাসের মধ্যে সেনসরি কোষ ও ধারক কোষ সমন্বিত সেনসরি প্যাঁচ) রোম কোষগুলো উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা আসে এন্ডোলিম্ফ ও অটোলিথের ($CaCO_3$ গঠিত চূর্ণকময় দানা) সঞ্চালন এবং **ক্যুপুলার** (cupula) অবস্থান পরিবর্তনের ফলে। এই উদ্দীপনা অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগাটায় পৌছায়। তখন মস্তিষ্ক থেকে সাড়া (response) বিভিন্ন পেশিতে পাঠায়। পেশিগুলো সংকুচিত হলে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।



চিত্র ৮.২১ : ভারসাম্য রক্ষার কৌশল

❑ **কাজ :** (i) মানব অন্তঃকর্ণের গঠন বর্ণনা কর। (ii) মানব অন্তঃকর্ণের ইউট্রিকুলাস এর গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। (iii) মানব কর্ণ কীভাবে শ্রবণে ভূমিকা পালন করে– বিশ্লেষণ কর। (iv) মানুষের কানের শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় ক্ষুদ্র অস্থিসমূহ কী ভূমিকা পালন করে? যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। (v) মানবকর্ণের গঠনগত প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শব্দ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম– বিশ্লেষণ কর। (vi) মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ কীভাবে শ্রবণে সাহায্য করে– ব্যাখ্যা কর। (vii) অন্তঃকর্ণের কাজ কি শুধুই শ্রবণ? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। (viii) মানবকর্ণের সার্বিক কার্যকলাপ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি– বিশ্লেষণ কর।

৮.৫ রাসায়নিক সমন্বয় (Chemical Co-ordination)

যে পদ্ধতিতে হরমোন বা উত্তেজক রস বা জৈব রাসায়নিক পদার্থ প্রাণিদেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া প্রণালির অখণ্ডতা ও সমন্বয় সাধন করে, সেই পদ্ধতি এবং ক্রিয়াশীলতাকে **রাসায়নিক সমন্বয়** (chemical co-ordination) বলে। আর ওই জৈব রাসায়নিক পদার্থ বা হরমোনকে **রাসায়নিক সমন্বয়ক** (chemical co-ordinator) বলে। কখনো কখনো প্রাণিদেহের এই সমন্বয় সাধন ও অখণ্ডতা রক্ষায় স্নায়ুতন্ত্রেরও সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। দূত যেমন এক দেশের বার্তা বা সংবাদ আর এক দেশে বহন করে নিয়ে যায়, অনুরূপভাবে হরমোনগ্রন্থিগুলো এক জায়গায় উৎপন্ন হয়ে অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল থেকে অপর কোনো জায়গায় অর্থাৎ বহু দূরে পরিবাহিত হয়ে রাসায়নিক বার্তা বহন করে সেখানকার অঙ্গকে উদ্দীপিত বা ক্রিয়াশীল করে। বহুকোষী প্রাণীর জীবনধারণের জন্য শর্করা, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি এ ৬টি পদার্থ একান্ত প্রয়োজন। তবু জীবদেহের স্বাভাবিক ও সার্বিক বৃদ্ধি, জৈবিক কার্যাবলি সুসম্পন্ন হয় না, তার জন্য স্নায়ুজ ও রাসায়নিক সমন্বয় প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া
(Position, Secretion and Action of Endocrine gland)

গ্রন্থি (Gland)

গঠনগত ও কার্যগতভাবে বিশেষিত যে কোষ বা কোষগুচ্ছ যখন শারীরবৃত্তীয় বা জৈবনিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রস বা রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে তখন তাকে **গ্রন্থি** (gland) বলে। ক্ষরণ গুণসম্পন্ন একটি মাত্র কোষ বা কোষগুচ্ছ নিয়ে গ্রন্থি গঠিত হয়। গ্রন্থি এক ধরনের রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু। নিঃসরণ ধরনের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থি তিন প্রকার। যথা- **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও মিশ্র গ্রন্থি**।

১। **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** (Exocrine gland) : প্রাণিদেহের যেসব গ্রন্থির নিজস্ব নালি আছে এবং এদের ক্ষরণ নালির মাধ্যমে গ্রন্থির বাইরে আসে তাদের **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম এনজাইম, লালা, মিউকাস, ঘাম, সেরাম, দুধ ইত্যাদি। উদাহরণ- লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, ঘর্মগ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি, সেবেসিয়াস গ্রন্থি ইত্যাদি।

২। **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (Endocrine gland) : প্রাণিদেহের যেসব গ্রন্থির নিজস্ব নালি নেই এবং এদের ক্ষরিত রস সরাসরি রক্ত বা লসিকায় ক্ষরিত হয়, তাদের **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম **হরমোন** (hormone)। উদাহরণ- পিটুইটারি গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ইত্যাদি।

৩। **মিশ্র গ্রন্থি** (Mixed gland) : প্রাণিদেহের যেসব গ্রন্থি বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার কোষের সমন্বয়ে গঠিত তাদের **মিশ্র গ্রন্থি** বলে। উদাহরণ- অগ্ন্যাশয়, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়।

মানবদেহে উল্লেখযোগ্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ (সিলেবাসভুক্ত)

১। হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus)

মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। হাইপোথ্যালামাস নিঃসৃত হরমোনগুলো পিটুইটারি গ্রন্থির হরমোন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য একে **সুপ্রিম কমান্ডার** (supreme commandar) বা The Bandmaster of Endocrine Orchestra বলে। হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত পদার্থকে **নিউরোহরমোন** (neurohormone) বলে। পূর্বে এসব হরমোনকে **রিলিজিং ফ্যাক্টর** (releasing factors) বলা হতো।

অবস্থান : হাইপোথ্যালামাস অগ্রমস্তিষ্কের অংশ। এটি থ্যালামাসের নিচে অবস্থিত এবং ইনফান্ডিবুলাম দ্বারা পিটুইটারি গ্রন্থির সাথে যুক্ত থাকে।

হাইপোথ্যালামাস ক্ষরিত হরমোনসমূহের নাম ও কাজ

হরমোনের নাম	প্রভাবিত অংশ	কাজ
১। গ্রোথ হরমোন রিলিজিং হরমোন বা সোমাটোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (Growth hormone releasing hormone/ Somatotropin releasing hormone-GHRH/SRH)	অগ্র পিটুইটারি	গ্রোথ হরমোন (GH) বা সোমাটোট্রপিন হরমোন (STH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।
২। গ্রোথ হরমোন ইনহিবিটিং হরমোন বা সোমাটোস্ট্যাটিন (Growth hormone inhibiting hormone/Somatostatin-GHIH/SS)	অগ্র পিটুইটারি	GH বা STH ক্ষরণে বাধা দেয়।
৩। কর্টিকোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (Corticotropin releasing hormone -CRH)	অগ্র পিটুইটারি	অ্যাড্রিনোকরটিকোট্রপিন হরমোন (ACTH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।
৪। থাইরোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (Thyrotropin releasing hormone -TRH)	অগ্র পিটুইটারি	থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (TSH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।
৫। গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (Gonadotropin releasing hormone -GnRH)	অগ্র পিটুইটারি	ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) ও ল্যুটিনাইজিং হরমোন (LH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।

Scanned with CamScanner

হরমোনের নাম	প্রভাবিত অংশ	কাজ
৬। প্রোল্যাকটিন রিলিজিং হরমোন বা ডোপামিন (Prolactin releasing hormone -PRH/Dopamine-DA)	অগ্র পিটুইটারি	প্রোল্যাকটিন বা বা ল্যুটিওট্রপিক হরমোন (LTH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।
৭। প্রোল্যাকটিন ইনহিবিটিং হরমোন বা ডোপামিন (Prolactin inhibiting hormone -PIH/Dopamine-DA)	অগ্র পিটুইটারি	প্রোল্যাকটিন বা LTH ক্ষরণে বাধা দেয়।
৮। মেলানোসাইট রিলিজিং হরমোন (Melanocyte releasing hormone-MRH)	পিটুইটারির মধ্য খণ্ড	মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (MSH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।
৯। মেলানোসাইট ইনহিবিটিং হরমোন (Melanocyte inhibiting hormone-MIH)	পিটুইটারি মধ্য খণ্ড	MSH ক্ষরণে বাধা দেয়।

২। পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)

পিটুইটারি গ্রন্থি দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র এবং শক্তিশালী গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে সর্বাধিক হরমোন নিঃসৃত হয় এবং অন্যান্য গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে একে **গ্রন্থিরাজ** বা **প্রভুগ্রন্থি** (master gland) বলে। **পিটুইটারি গ্রন্থির কার্যকারিতা আবার মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।**

অবস্থান ও আকৃতি : অগ্রমস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগের অঙ্কীয়দেশে অপটিক কায়াজমার পেছনে মটর দানার মতো পিটুইটারি গ্রন্থি অবস্থান করে। এটি ধূসর লাল বর্ণের। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে এর ওজন ০.৫-০.৬ গ্রাম। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে এর ওজন সামান্য বেশি (০.৬-০.৭ গ্রাম)।

শারীরস্থানিকভাবে (anatomically) পিটুইটারি গ্রন্থি দুটি খণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত। যথা– **অগ্র পিটুইটারি** (anterior pituitary) বা **অ্যাডিনোহাইপোফাইসিস** (adenohypophysis) ও **পশ্চাৎ পিটুইটারি** (posterior pituitary) বা **নিউরোহাইপোফাইসিস** (neurohypophysis)। এ দু'খণ্ডের মাঝে **পারস ইন্টারমিডিয়া** (pars-intermedia) বা **মধ্য পিটুইটারি** নামক একটি ক্ষুদ্রাকার অংশ থাকে। ভ্রূণীয় পর্যায়ে এ অংশ থেকে **মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন** (Melanocyte Stimulating Hormone-MSH) নিঃসৃত হয়, যা মেলানোসাইট কোষকে উদ্দীপিত করে ত্বক ও চুলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং আলো প্রতিরোধক (photoprotection) হিসেবে কাজ করে। প্রাপ্তবয়সে এ অংশ ক্ষুদ্রাকার এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।

(ক) অগ্র পিটুইটারি : পিটুইটারি গ্রন্থির এই খণ্ড থেকে ৬টি **ট্রপিক হরমোন** (tropic hormone- যেসব হরমোন অপর অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে তাদের ট্রপিক হরমোন বলে) নিঃসৃত হয়। হরমোনগুলোর নাম ও কাজ নিম্নরূপ :

(i) ফলিকল উদ্দীপক হরমোন (Follicle Stimulating Hormone-FSH) : এ হরমোন প্রধান কাজ হচ্ছে স্ত্রী প্রাণীতে ডিম্বথলির পরিণতি (graafian follicle), ওভুলেশন (ovulatin, ডিম্বথলি থেকে ডিম্বাণু নির্গমন), ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতে ভূমিকা রাখে। পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকার (seminiferous tubule) বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে শুক্রাণুজনন (শুক্রাণু উৎপাদন) ঘটায়। এছাড়া সারটোলির কোষের বৃদ্ধিতে উদ্দীপনা জোগায়।

(ii) ল্যুটিনাইজিং হরমোন (Luteinizing Hormone-LH) : এ হরমোন স্ত্রী প্রাণীতে ফলিকল থেকে পরিপক্ব ডিম্বাণু অবমুক্তিতে, কর্পাস লিউটিয়াম (corpus leutium) তৈরিতে এবং ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন উৎপাদনে সাহায্য করে। পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাশয়ের লেডিগের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষসমূহকে উদ্দীপিত করে এন্ড্রোজেন (টেস্টোস্টেরন) হরমোনের ক্ষরণ ঘটায়।

(iii) প্রোল্যাক্টিন বা ল্যুটিওট্রপিক হরমোন (Prolactin-PRL or Luteotropic Hormone-LTH) : এ হরমোন স্তনগ্রন্থির বিকাশ, দুগ্ধগ্রন্থি থেকে দুগ্ধ তৈরি ও নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে, অনাক্রম্যের প্রতি সাড়াদান, দুগ্ধদানকারী মায়ের ডিম্বনিঃসরণ বন্ধ রাখে এবং গোনাডোট্রফিকের সক্রিয়তায় বাধা দেয়। এছাড়া পরিস্ফুটনের সময় নতুন রক্তকণিকা উৎপাদনে ভূমিকা রাখে এবং পুরুষ ও স্ত্রীদের গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ ঘটায়।

(iv) থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (Thyroid Stimulating Hormone-TSH) : এ হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি থাইরক্সিন হরমোনের সংশ্লেষ ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি কোষ কর্তৃক আয়োডিন গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে।

Scanned with CamScanner

(v) অ্যাড্রিনাল উত্তেজক হরমোন (Adrenocorticotropic Hormone-ACTH) : এটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কর্টেক্সের বৃদ্ধি ঘটিয়ে হরমোন (গ্লুকোকর্টিকয়েড) ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি মেলানোসাইট উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।

(vi) সোমাটোট্রপিন হরমোন বা দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন (Somatotropin Hormone or Growth Hormone-STH/GH) : এ হরমোন সার্বিকভাবে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়, বিশেষ করে অস্থি ও পেশির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে বিভিন্ন খাদ্য বিপাক (বিশেষ করে প্রোটিন সংশ্লেষ) ও কোষের সংখ্যাবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় কিন্তু অস্থি ও হৃৎপেশির সঞ্চিত গ্লাইকোজেন কমায়। দেহের সঞ্চিত ফ্যাটকে কমিয়ে প্লাজমায় এর পরিমাণ বাড়ায়।

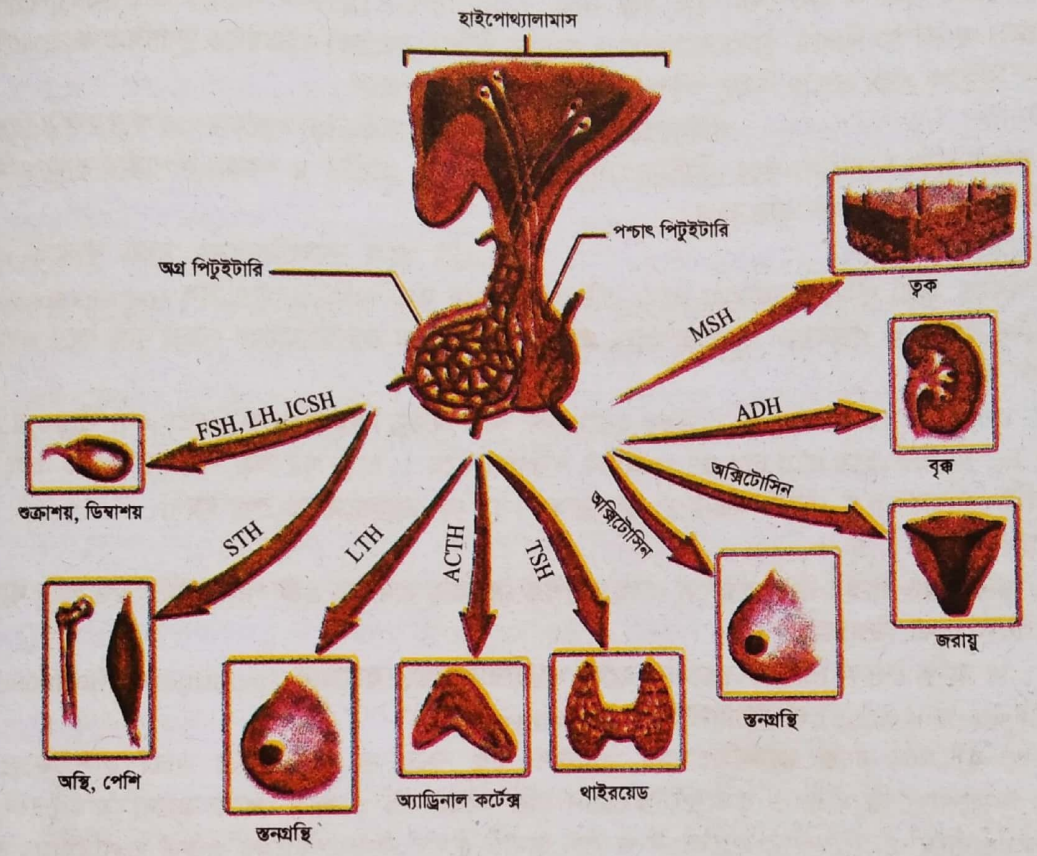

চিত্র ৮.২২ : অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের বিপাকীয় ক্রিয়া

(খ) পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন–

(i) অক্সিটোসিন হরমোন (Oxytocin Hormone) : সন্তান প্রসবকালে জরায়ুর মসৃণ পেশির সংকোচন ত্বরান্বিত করে প্রসব সহজ করে এবং দুগ্ধগ্রন্থি থেকে দুগ্ধ নির্গমনেও সাহায্য করে।

(ii) ভেসোপ্রেসিন বা পিট্রেসিন বা অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (Vesopressin or Pitressin or Anti-diuretic Hormone-ADH) : এ হরমোন রক্তচাপ বৃদ্ধি করে; পানির সমতা বজায় রাখে; মূত্রে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে; বৃক্কের পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মূত্রের উৎপাদন হ্রাস করে; শ্বাসক্রিয়াকে প্রভাবিত করে; ক্লোরাইড বিশোষণ হ্রাস করে ক্লোরাইডের রেচন বৃদ্ধি করে; পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্রমসংকোচন (peristalsis) বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন অনৈচ্ছিক পেশির (যেমন– ধমনি, ক্ষুদ্রান্ত্র, পিত্তাশয়, ইউরেটার, মূত্রনালি ইত্যাদির পেশি) সংকোচন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে।

❑ **কাজ :** (i) পিটুইটারি গ্রন্থি কীভাবে অন্যান্য গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে– ব্যাখ্যা কর। (ii) পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গ্রোথ হরমোন মানুষের উচ্চতা নির্ধারণে ভূমিকা রাখে– ব্যাখ্যা কর। (iii) পিটুইটারি গ্রন্থি কীভাবে থাইরয়েড গ্রন্থির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে– ব্যাখ্যা কর।

Scanned with CamScanner

৩। থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)

অবস্থান : মানবদেহে এ গ্রন্থি গলার শ্বাসনালির অঙ্কীয়দেশে এবং স্বরযন্ত্রের ঠিক নিচে অর্থাৎ শ্বাসনালির দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ তরুণাস্থি বলয়ের সম্মুখে অবস্থিত। এটি দুটি খণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত যারা **ইথমাস** '(isthmus)' নামক একটি পাতলা কলাপাত (tissue band) দ্বারা যুক্ত থাকে। এটি দেখতে প্রজাপ্রতির ন্যায়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থির ওজন ২০-২৫ গ্রাম।

নিঃসরণ : এ গ্রন্থি থেকে নিম্নলিখিত ৩টি সক্রিয় হরমোন ক্ষরিত হয়।

(i) ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন (Triiodothyrorine-T_3) : শর্করার জারণ ঘটিয়ে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে; মৌল (আয়োডিন) বিপাকীয় হার ও হৃৎস্পন্দন হার বৃদ্ধি করে; শর্করা বিপাক (গ্লুকোজ সংশ্লেষ ও শোষণ), প্রোটিন বিপাক (প্রোটিন সংশ্লেষ) ও লিপিড বিপাক (কোলেস্টেরল ও অন্যান্য লিপিড সংশ্লেষ) প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এটি স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিতে এবং ভ্রূণ ও শিশুর পরিস্ফুটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

(ii) থাইরক্সিন (Thyroxine-T_4) : থাইরয়েড গ্রন্থির প্রায় ৯৫%ই থাইরক্সিন হরমোন। এ হরমোন দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও যৌন লক্ষণ প্রকাশে সাহায্য করে। বিভিন্ন পদার্থের (আয়োডিন, প্রোটিন ও শর্করা) বিপাকীয় হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও হৃৎক্রিয়া ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

(iii) থাইরোক্যালসিটোনিন (Thyrocalcitonin-TCT) : এটি রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমাতে এবং অস্থিতে ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে; এটি অস্থির ক্ষয় তথা অস্টিওপোরোসিস (osteoporosis) রোধ করে; দেহে ফসফেটের বিপাক ও পরিবহনে সহায়তা করে; এটি মূত্রের মাধ্যমে ক্যালসিয়ামের রেচন বৃদ্ধি করে এবং ভিটামিন D নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

[**প্রাসঙ্গিক তথ্য :** গুণগতভাবে T_3 ও T_4 উভয় হরমোনের কাজ অভিন্ন কিন্তু কাজের দ্রুততা এবং তীব্রতায় এরা পরস্পর থেকে পৃথক। T_3, T_4-এর চেয়ে প্রায় চার গুণ ও অধিক সক্রিয়। তবে T_3 রক্তে খুব অল্প পরিমাণে থাকে এবং এটি T_4-এর তুলনায় স্বল্পস্থায়ী। সাধারণত T_4 থেকে সক্রিয় T_3 উৎপন্ন হয়। T_4-কে **প্রোহরমোন**ও বলা হয়।]

৪। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland)

অবস্থান : থাইরয়েড গ্রন্থির ঠিক পশ্চাতে এবং অংশিক প্রোথিত অবস্থায় ৪টি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি হলুদ-বাদামি বর্ণের এবং ডিম্বাকৃতির।

নিঃসরণ : এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো **প্যারাথাইরয়েড হরমোন** (parathyroid hormone- PTH) বা **প্যারাথরমোন** (parathormone) বা **প্যারাথাইরিন** (parathyrin)।

কাজ : এ হরমোন রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও ফসফেটের মাত্রা হ্রাস করে; এটি বৃক্কে ক্যালসিয়ামের পুনঃশোষণের মাত্রা ও ফসফেটের রেচন বৃদ্ধি করে; অন্ত্র ও অস্থি থেকে ক্যালসিয়াম (রক্ত, হাড়, পেশি ও স্নায়ু উদ্দীপনা প্রবাহে এবং পেশির সংকোচন ও রক্ত জমাট বাঁধায় ক্যালসিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম) ও ফসফেটের শোষণ ত্বরান্বিত করে। রক্তে ফসফেটের মাত্রা কমাতে এবং ভিটামিন D -কে সক্রিয়করণে ভূমিকা রাখে। ভিটামিন D-এর অভাব হলে বাচ্চাদের **রিকেটস** (rickets) রোগ ও বয়স্কদের **অস্টিওম্যালাসিয়া** (osteomalacia) হয়।

৫। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland or Suprarenal gland)

অবস্থান : দুটি কিডনি বা বৃক্কের অগ্রভাগ বা উপরে টুপির মতো বৃক্কের সাথে এ গ্রন্থি যুক্ত থাকে। যোজক কলায় গঠিত একটি সাধারণ আবরণ **রেনাল ফেসিয়া বা গ্যারোটা ফেসিয়া** (renal fascia or Gerota fascia) দ্বারা বৃক্ক ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি উভয়েই আবৃত থাকে। এটি প্রায় ত্রিকোণাকার এবং বাইরের দিকে হলুদ অথবা বাদামি বর্ণের হয়। প্রতিটি গ্রন্থি দুটি অংশে বিভক্ত। এর বাইরের অংশকে **কর্টেক্স (৮০%)** এবং ভেতরের দিকের অংশকে মেডুলা (২০%) বলে। এদের ওজন ৩-৫ গ্রাম।

নিঃসরণ :

(ক) কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত হরমোন–

(i) গ্লুকোকর্টিকয়েড (Glucocorticoid) : এ হরমোন শর্করা (প্রধানত) ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে এবং যকৃৎ ও পেশিতে গ্লাইকোজেনের মজুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। অন্ত্র থেকে চিনি ও লিপিড শোষণে সহায়তা করে। এটি শ্বেত রক্তকণিকার প্রদাহজনিত কার্যকারিতা হ্রাস করে। অর্থাৎ ফ্যাগোসাইটোসিস, কেমোট্যাক্সিস, অ্যালার্জি ইত্যাদিতে বাধা দেয়। অ্যান্টিবডি উৎপাদন হ্রাস করে। উদাহরণ– কর্টিসল (cortisol), কর্টিসোন (cortison), কর্টিকোস্টেরন (corticosterone) ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(ii) মিনারালোকর্টিকয়েড (Mineralocorticoid) : এ গ্রুপভুক্ত হরমোন খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। রক্ত ও কলাকোষে NaCl-এর পরিমাণ বজায় রাখে। বৃক্কের NaCl ও পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্তের প্লাজমা বৃদ্ধি করে। দেহ থেকে পটাশিয়াম ও ফসফেটের নির্গমনে সাহায্য করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণ– অ্যালডোস্টেরন।

(iii) যৌন হরমোন (Sex hormone) : **অ্যান্ড্রোজেন, ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন** নামক যৌন হরমোনগুলো যৌনাঙ্গের বর্ধন ও যৌন লক্ষণ প্রকাশে সাহায্য করে। ভ্রূণের যৌন বিভেদ নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) মেডুলা থেকে নিঃসৃত হরমোন–

(i) এপিনেফ্রিন (Epinephrine) **বা এড্রেনালিন** (Adrenaline) : যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ অবমুক্ত করে বিপাকের হার বাড়িয়ে দেয়। হৃৎস্পন্দন হার, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া ইত্যাদি বৃদ্ধি করে। হৃৎপিণ্ড ও অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। পেশি, যকৃৎ ও মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ বৃদ্ধি করে। মূত্র তৈরি হ্রাস করে। দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভয়, আনন্দ ও শোক প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একে **সংকটকালীন** বা **আপদকালীন বা জরুরিকালীন হরমোন** (emergency hormone) বলা হয়।

(ii) নর-এপিনেফ্রিন (Nor-epinephrine) **বা নর-এড্রেনালিন** (Nor-adrenaline) : এ হরমোনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব অনেকটা এপিনেফ্রিন-এর মতো। তবে এড্রেনালিন হরমোনের কাজের প্রভাব নর-এড্রেনালিন হরমোনের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি হয়। এটি রক্তচাপ ও হৃৎস্পন্দন সামান্য বৃদ্ধি করে। হৃৎপেশিকে উদ্দীপ্ত করে। যকৃৎ ও পেশিতে গ্লাইকোজেনোলাইসিসের হার বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ দেহের অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে। দেহের বিপাকীয় ক্রিয়ার হার সামান্য বাড়ায়। দেহের প্রায় সকল রক্তনালিকার ও রেচন নালিকার সংকোচন ঘটায়।

৬। জনন গ্রন্থি বা গোনাড (Gonad)

অবস্থান : জননকোষ উৎপাদনকারী অঙ্গকে গোনাড বা জননাঙ্গ বলে। দুটি শ্রোণিচক্রের মধ্যবর্তী স্থানে কটিদেশের নিচে গোনাড বা জননাঙ্গ অবস্থান করে। তবে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীতে সামান্য ব্যবধানে অবস্থান করে। গোনাড পূর্ণাঙ্গ পুরুষ প্রাণীতে শুক্রাশয়ে এবং স্ত্রী প্রাণীতে ডিম্বাশয়ে পরিণত হয়।

নিঃসরণ :

(ক) শুক্রাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন

(i) টেস্টোস্টেরন (Testosterone) : এ হরমোন আনুষঙ্গিক যৌন অঙ্গের বিকাশ এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের (দাড়ি, গোঁফ) প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। শুক্রাণু উৎপাদনে সহায়তা করে। লাল অস্থিমজ্জায় RBC উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে।

(খ) ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন

(i) এস্ট্রোজেন (Oestrogen) : এ হরমোন স্ত্রী প্রাণীর গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য বিকাশে সাহায্য করে।

(ii) প্রোজেস্টেরন (Progesterone) : **মাসিক চক্র** (menstrual cycle) সম্পূর্ণ করার জন্য এ হরমোন খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে। জরায়ুর গাত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে জাইগোটকে জরায়ুর সাথে সংবন্ধনে সাহায্য করে। প্লাসেন্টা গঠনে সাহায্য করে।

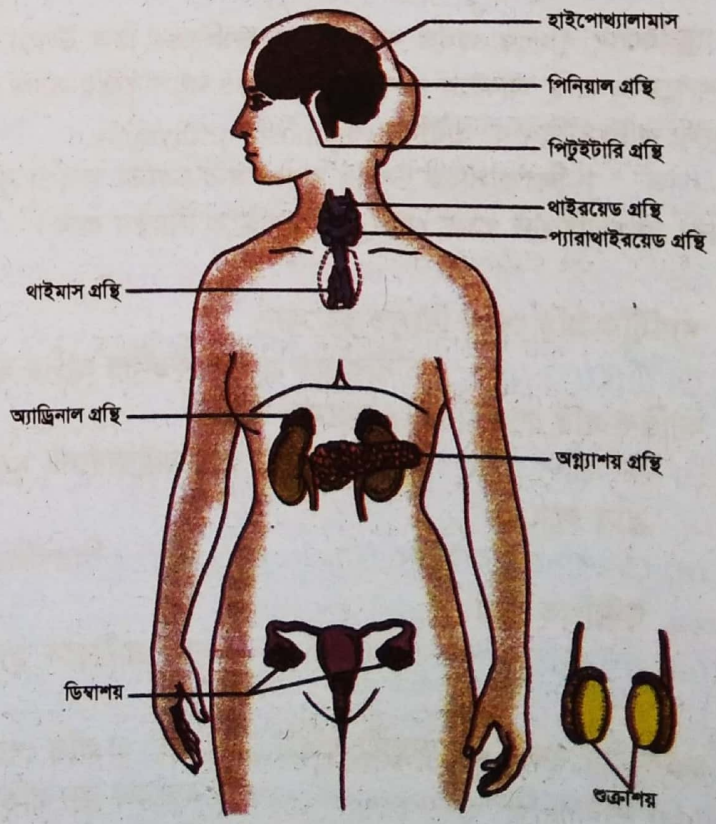

চিত্র ৮.২৩: মানবদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান

Scanned with CamScanner

৭। অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অবস্থান : উদরের মধ্যে ডিওডেনামের দুটি অংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ফ্যাকাসে বাদামি রঙের মিশ্র গ্রন্থিই অগ্ন্যাশয়। অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েক লাখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঞ্জীভূত কোষগুচ্ছ বর্তমান, এদের **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (Islets of Langerhans) বলে। আবিষ্কারক Langerhans (1869) এর নামানুসারে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এখানে আলফা, বিটা, ডেলটা ও গামা নামক কোষগুচ্ছ থাকে।

নিঃসরণ :

(ক) আলফা কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোন

গ্লুকাগন (Glucagon) : এটি রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায়। এছাড়াও পরিপাক রসের ক্ষরণ কমায়।

(খ) বিটা কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোন

ইনসুলিন (Insulin) : এ হরমোন কার্বোহাইড্রেট বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়। যকৃৎ ও পেশির গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে।

(গ) ডেল্টা কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোন

সোমাটোস্টেটিন (Somatostatin) : গ্লুকাগন ও ইনসুলিন হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) গামা কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোন

প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (Pancreatic polypeptide-PP) : পাকঅন্ত্রীয় ক্ষরণ বৃদ্ধি করে ও অগ্ন্যাশয়কে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এছাড়াও এ হরমোন খাদ্য গ্রহণের পর নিঃসৃত হয়ে ক্ষুধা হ্রাস করে।

৮। পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland)

মস্তিষ্কের ডায়েনসেফালনের পৃষ্ঠীয়ভাগে এ গ্রন্থিটি অবস্থিত। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো **মেলাটোনিন** (melatonin)। এ হরমোন ঘুম নিয়ন্ত্রণ করে। এ জন্য একে **'ঘুম হরমোন'** বলে। এ হরমোন আলোক সূচক হিসেবে কাজ করে, তাই একে 'বায়োলজিক্যাল ঘড়ি' বলা হয়। কিছু প্রাণিদেহে এ হরমোন ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে এরা যৌন পরিণতির বাধাদায়ক হিসেবে কাজ করে। পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে সামান্য **সেরোটোনিন** (serotonin) নিঃসৃত হয়।

৯। থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland)

ট্রাকিয়ার দুদিকে অর্থাৎ বক্ষদেশ ও হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরে থাইরয়েড গ্রন্থির নিম্নপ্রান্তে দুটি থাইমাস গ্রন্থি থাকে। শৈশবে এ গ্রন্থি আকারে বেশ বড় থাকলেও বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ছোট হতে থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো **থাইমোসিন বা থাইমিন** (thymosin or thymin) ।

কাজ : T-লিম্ফোসাইট উৎপন্ন করে; অনাক্রম্যতা ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; অস্থিতে খনিজ পদার্থের সঞ্চয়ে সাহায্য করে এবং বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত যৌন গ্রন্থির বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১০। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি (Gastric gland and Intestinal gland)

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন–

গ্যাস্ট্রিন (Gastrin): গ্যাস্ট্রিক রস এবং পাকস্থলীর প্রাচীর হতে HCl নিঃসরণ করে।

আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো–

(i) **সিক্রেটিন** (Secretin) : অগ্ন্যাশয় রসে বাইকার্বনেট মুক্ত করে, পিত্ত ক্ষরণ বৃদ্ধি করে এবং গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ হ্রাস করে।

(ii) **কোলেসিস্টোকাইনিন** (Cholecystokinin) : পিত্তথলিকে পিত্ত ক্ষরণে এবং অগ্ন্যাশয়কে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।

(iii) **এন্টারোক্রিনিন** (Enterocrinin) : অন্ত্রের প্রাচীরকে আন্ত্রিক রস নিঃসরণে উদ্দীপিত করে।

১১। অমরা (Placenta)

গর্ভকালীন সময়ে এই অস্থায়ী গ্রন্থিটি তৈরি হয়। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো–

(i) **প্রোজেস্টেরন** (Progesterone) : এ হরমোন স্তন গ্রন্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

(ii) **রিলাক্সিন** (Relaxin) : এ হরমোন শ্রোণিচক্রের লিগামেন্ট প্রশমিত করে প্রসব সহজতর করার কাজে সাহায্য করে।

Scanned with CamScanner

প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর অবস্থান, নিঃসৃত হরমোন ও কাজ

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	অংশ	নিঃসৃত হরমোন	প্রধান কাজ
১। পিটুইটারি গ্রন্থি [অবস্থান-মস্তিষ্ক]	ক. অগ্র পিটুইটারি	i. ফলিকল উদ্দীপক হরমোন (FSH) ii. লিউটিনাইজিং হরমোন (LH) iii. প্রোল্যাক্টিন বা লুটিওট্রপিক হরমোন (PRL/LTH) iv. থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (TSH) v. অ্যাড্রিনাল উত্তেজক হরমোন (ACTH) vi. সোমাটোট্রপিন বা দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন (STH/ GH)	i. স্ত্রীদেহে ডিম্বথলির পরিণতি, ওভুলেশন, ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ; পুরুষদেহে শুক্রাশয়ে শুক্রাণুজনন ঘটায়। ii. স্ত্রীদেহে ডিম্বপাত, কর্পাস লিউটিয়াম তৈরিতে এবং ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন উৎপাদন; সাহায্য করে। পুরুষদেহে এন্ড্রোজেন (টেস্টোস্টেরন) হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ। iii. নারীদেহে স্তনগ্রন্থির বিকাশ ও দুগ্ধক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ। পরিস্ফুটনের সময় নতুন রক্তকণিকা উৎপাদন। iv. থাইরক্সিন সংশ্লেষ ও থাইরয়েড গ্রন্থি কোষ কর্তৃক আয়োডিন গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ। v. গ্লুকোকর্টিকয়েড ক্ষরণ ও মেলানোসাইট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। vi. দেহের বৃদ্ধি ঘটায়, বিশেষ করে অস্থি ও পেশির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ।
	খ. পশ্চাৎ পিটুইটারি	i. অক্সিটোসিন ii. অ্যান্টিডাই-ইউরেটিক হরমোন (ADH)	i. জরায়ু-সংকোচন ও দুগ্ধক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা। ii. রক্তচাপ বৃদ্ধি করা; পানির সমতা বজায় রাখা; বৃক্কের পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মূত্রের উৎপাদন হ্রাস করা; মূত্রে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করা।
২। থাইরয়েড গ্রন্থি [অবস্থান-শ্বাসনালি]		i. ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (T_3) ii. থাইরক্সিন (T_4) iii. থাইরোক্যালসিটোনিন (TCT)	i. বিপাক হার, হৃৎস্পন্দন, প্রোটিন সংশ্লেষ ও স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ। ii. দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও যৌন লক্ষণ প্রকাশে সাহায্য করে। বিভিন্ন পদার্থের (আয়োডিন, প্রোটিন ও শর্করা) বিপাকীয় হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও হৃৎক্রিয়া ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে। iii. রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং দেহে ফসফেটের বিপাক ও পরিবহনে সহায়তা কর।
৩। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি [অবস্থান-থাইরয়েডের পৃষ্ঠদেশে]		প্যারাথরমোন বা প্যারাথাইরয়েড হরমোন (PTH)	ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের বিপাক নিয়ন্ত্রণ।
৪। থাইমাস গ্রন্থি [অবস্থান-শ্বাসনালির নিচে]		থাইমোসিন বা থাইমিন	T-লিম্ফোসাইট সৃষ্টি এবং অনাক্রম্যতা ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৫। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স [অবস্থান-অগ্ন্যাশয়]		i. গ্লুকাগন ii. ইনসুলিন ii. সোমাটোস্টেটিন	i. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ানো, গ্লাইকোজেনোলাইসিসে সহায়তা এবং পরিপাক রসের ক্ষরণ কমানো। ii. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমানো এবং যকৃৎ ও পেশির গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করা। iii. ইনসুলিন ও গ্লুকাগন হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করা।
৬। এড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি [অবস্থান-প্রতিটি বৃক্কের উর্ধ্ব প্রান্তে]	ক. কর্টেক্স	i. গ্লুকোকর্টিকয়েড ii. মিনারেলোকর্টিকয়েড iii. যৌন হরমোন	i. শর্করা ও আমিষ বিপাক নিয়ন্ত্রণ এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদন হ্রাস করা । ii. খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ, পটাশিয়াম ও ফসফেট নির্গমন এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ। iii. যৌনাঙ্গের বর্ধন ও যৌন লক্ষণ প্রকাশ করা।
	খ. মেডুলা	i. এড্রেনালিন ii. নর-এড্রেনালিন	i. যকৃতের গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ অবমুক্ত করে বিপাকের হার নিয়ন্ত্রণ; হৃৎস্পন্দন হার, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া ইত্যাদি বৃদ্ধি; দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ এবং ভয়, আনন্দ ও শোক প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখা। ii. রক্তচাপ ও হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি, হৃৎপেশি উদ্দীপ্ত করা, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, দেহের অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করা এবং রক্তনালিকার ও রেচননালিকার সংকোচন ঘটানো।

Scanned with CamScanner

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	অংশ	নিঃসৃত হরমোন	প্রধান কাজ
৭। পিনিয়াল গ্রন্থি [অবস্থান-মস্তিষ্কের ডায়েনসেফালনের পৃষ্ঠীয়ভাগে অর্থাৎ ৩য় ভেন্ট্রিকলে]		মেলাটোনিন	ঘুম নিয়ন্ত্রণ করা, ফসফরাস বিপাক দ্রুত করা, আলোক সূচক হিসেবে কাজ করা। ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং যৌন অঙ্গের সক্রিয়তা ঘটানো।
৮। শুক্রাশয় [অবস্থান : পূর্ণাঙ্গ পুরুষদেহের স্ক্রোটামে]		অ্যান্ড্রোজেন (টেস্টোস্টেরন)	পুরুষদেহে আনুষঙ্গিক যৌন অঙ্গের বিকাশ এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের (দাড়ি, গোঁফ) প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করা এবং শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া অব্যাহত রাখা।
৯। ডিম্বাশয় [অবস্থান-স্ত্রীদেহের শ্রোণিগহ্বরের পৃষ্ঠপ্রাচীরের গায়ে জরায়ুর দু'পাশে]		i. এস্ট্রোজেন ii. প্রোজেস্টেরন	i. বয়ঃসন্ধিকালে স্ত্রীদেহের বিভিন্ন গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য বিকাশে সাহায্য করা। ii. স্ত্রীদেহে ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ভ্রূণ, প্লাসেন্টা ইত্যাদির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ।

অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি
১। সংজ্ঞা	যেসব গ্রন্থির নিজস্ব কোনো নালি নেই, তাদের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।	যেসব গ্রন্থির নিজস্ব নালি আছে তাদের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।
২। নিঃসৃত রসের নাম	হরমোন	এনজাইম, ঘাম, দুগ্ধ, অশ্রু ইত্যাদি
৩। ক্ষরিত বস্তুর বাহকের মাধ্যম	সরাসরি রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।	নির্দিষ্ট নালি পথে বাহিত হয়।
৪। ক্ষরিত বস্তুর ক্রিয়া	ক্ষরণ স্থান থেকে দূরবর্তী টার্গেট অঙ্গে ক্রিয়া করে।	সাধারণত ক্ষরণ স্থানের কাছাকাছি ক্রিয়া করে। তবে দূরবর্তী টার্গেট অঙ্গেও ক্রিয়া করে।
৫। উদাহরণ	পিটুইটারি গ্রন্থি, থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ইত্যাদি।	লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, ঘর্মগ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি, অশ্রুগ্রন্থি ইত্যাদি।

হরমোন ও এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	হরমোন	এনজাইম
১। উৎপত্তিস্থল	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে।	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে।
২। পরিবাহিত হওয়ার মাধ্যম	রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়।	নিজস্ব নালিপথে বাহিত হয়।
৩। ক্রিয়ার প্রকৃতি	রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নেয় না এবং কাজের শেষে বিনষ্ট হয় বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।	রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ অংশ নেয় এবং অনুঘটকের মতো বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে।
৪। কার্যপদ্ধতি	ধীর গতিসম্পন্ন, দীর্ঘস্থায়ী এবং ফল সুদূরপ্রসারী।	দ্রুত ও ফল তাৎক্ষণিক।
৫। ক্রিয়াস্থল	উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী অংশ কার্যক্ষম।	সাধারণত উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী কোনো স্থানে সক্রিয়।
৬। রাসায়নিক প্রকৃতি	প্রোটিনধর্মী তবে স্টেরয়েড বা ফেনলিক হতে পারে।	সকল এনজাইমই প্রোটিনধর্মী।
৭। বয়সের সাথে ভিন্নতা	বিভিন্ন বয়সে বা জীবনের বিভিন্ন দশায় হরমোনের ভিন্নতা দেখা যায়।	সব বয়সে একই রকম এনজাইম দেখা যায়।
৮। উদাহরণ	থাইরক্সিন, ইনসুলিন, গ্যাস্ট্রিন ইত্যাদি	পেপসিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ইত্যাদি

৮.৬ হরমোনের প্রভাব ও অনিয়ন্ত্রিত হরমোনের ব্যবহার

(Effects of Hormone and it's uncontrolled uses)

যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ (প্রোটিনধর্মী বা ফেনলিক বা স্টেরয়েড হতে পারে) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয় এবং সাধারণত উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের নানাবিধ বিপাকীয় ক্রিয়া শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাকে **হরমোন** (hormone) বলে। সংক্ষেপে, অন্তঃক্ষরা

Scanned with CamScanner

গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত পদার্থই হলো **হরমোন**। বিজ্ঞানী **বেলিস** (Bayliss) এবং **স্টারলিং** (Starling) 1905 সালে সর্বপ্রথম হরমোন শব্দটি ব্যবহার করেন। Hormone শব্দটি গ্রিক শব্দ *hormao* থেকে উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ হলো **'উত্তেজিত করা'** (to excite) বা **'জাগ্রত করা'**। এর প্রথমে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, সব হরমোনই উত্তেজক পদার্থ কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেছে সব হরমোনই **উত্তেজক** বা **উদ্দীপক** (stimulator) নয়। কোনো কোনো **হরমোন বাধাদানকারী** বা **প্রতিবন্ধক** (inhibitor) হিসেবেও কাজ করে। আবার কোনো কোনো হরমোন দেহের এক অংশের উদ্দীপনা জোগায় এবং অপর অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

হরমোনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Hormone)

১। হরমোন সাধারণত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়।

২। হরমোন জৈব যৌগ বিশেষ যা একটি অঙ্গের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে দূরবর্তী কোনো অঞ্চলের কোষসমূহের কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৩। বেশির ভাগ হরমোনই পানিতে দ্রবণীয় বলে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থানে বাহিত হয়।

৪। বিভিন্ন হরমোনের রাসায়নিক প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এরা প্রাকৃতিক প্রোটিন বা পেপটাইড বা গ্লাইকোপ্রোটিন বা স্টেরয়েড বা একটি বা দুটি অ্যামিনো এসিড ঘটিত জৈব পদার্থ।

৫। হরমোন অত্যন্ত স্বল্পমাত্রায় কার্যক্ষম কিন্তু এই ক্রিয়ার কার্যকাল দীর্ঘদিন পর্যন্ত বজায় থাকে।

৬। ক্ষরণকারী গ্রন্থি ছাড়া হরমোন কখনই দেহের মধ্যে সঞ্চিত থাকে না।

৭। হরমোনের নির্দিষ্ট কাজসম্পন্ন হওয়ার পর এরা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং রেচন প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

৮। কয়েকটি হরমোন প্রাণিদেহে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা রাখে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা, দেহের বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে একাধিক হরমোন অংশগ্রহণ করে।

৯। হরমোনের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভিটামিনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

১০। স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সম্পর্ক রেখে হরমোন বিভিন্ন দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

১১। হরমোন বিভিন্ন কোষে রাসায়নিক বার্তা প্রেরণ করে থাকে, তাই হরমোনকে **রাসায়নিক দূত** (chemical messenger) বলে।

১২। হরমোন সাধারণত ক্ষুদ্রতর অণু, তাই সহজেই এরা কোষঝিল্লি বা রক্তনালির অন্তঃস্থ আবরণী কলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে।

দেহের বৃদ্ধিতে হরমোনের প্রভাব (Effect of hormone in the growth of the body)

মানবদেহের বৃদ্ধিতে সাধারণত দু'ধরনের হরমোন প্রভাব বিস্তার করে থাকে। হরমোন দুটি হলো পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **গ্রোথ হরমোন** (Growth Hormone-GH) ও থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **থাইরক্সিন হরমোন** (Thyroxine Hormone-TH or T4 Hormone)। এছাড়াও আরও কয়েকটি হরমোন দেহের বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। দৈহিক বৃদ্ধিতে হরমোনগুলোর কাজ নিম্নরূপ–

(ক) দৈহিক বৃদ্ধিতে গ্রোথ হরমোনের প্রভাব : মানুষের আকার, আয়তন, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি বৃদ্ধিতে এই হরমোনের ভূমিকা অপরিসীম তাই একে **গ্রোথ হরমোন** বলা হয়। গ্রোথ হরমোনের প্রভাবে দেহের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধিজনিত কার্যাবলি নিম্নরূপ–

১। পেশির বৃদ্ধি : গ্রোথ হরমোনের প্রভাবে প্রোটিন পরিপাকের ফলে সৃষ্ট সরল ও তরল অ্যামাইনো এসিড কোষে গৃহীত হয় ও এদের গ্রহণ মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি পায় ও পেশির বৃদ্ধি সাধন ঘটে।

২। পেশির ক্ষয়রোধ : সাধারণত ক্ষুধার্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজ ও ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ কমে যায়। এ অবস্থায় গ্রোথ হরমোনের প্রভাবে রক্তে গ্লুকোজ ও ফ্যাটি এসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় দেহের ক্ষয়রোধ হয়।

৩। কঙ্কালতন্ত্রের বৃদ্ধি : কোমলাস্থির আয়তন বৃদ্ধি, অস্টিওব্লাস্টের অস্টিওসাইটের পূর্ণতা প্রাপ্তি, অস্থিতে ক্যালসিয়াম আয়ন সঞ্চয় ইত্যাদি সব কার্যক্রম এই হরমোন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪। আয়ন বৃদ্ধি : গ্রোথ হরমানের প্রভাবে খাদ্যবস্তু থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন আয়ন বিশেষ করে ক্যালসিয়াম আয়ন পরিপাক নালি থেকে শোষিত হয় এবং বৃক্ক থেকে বিভিন্ন আয়ন শোষণের মাধ্যমে দেহে আয়ন বৃদ্ধি করে। এসব আয়ন দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

Scanned with CamScanner

৫। **দুগ্ধ উৎপাদন :** গ্রোথ হরমোন স্তনগ্রন্থিকে অধিক দুগ্ধ উৎপাদনে প্রভাবিত করে ফলে শিশু দুগ্ধ পান করে দৈহিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৬। **লোহিত কণিকা সৃষ্টি :** এই হরমোন **এরিথ্রোপোয়েসিস** (erythropoesis) প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। লোহিত কণিকা O_2 পরিবহন করে। বিপাক ক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে দেহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

শিশুকালে গ্রোথ হরমোন কম ক্ষরিত হলে মানুষ **বামন** (dwarf) হয়। কিন্তু শিশুকালে অতিরিক্ত গ্রোথ হরমোন ক্ষরণের কারণে মানুষের আকার **দৈত্যের** (gaint) মতো ধারণ করে এবং বয়স্কদের অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রোথ হরমোন ক্ষরিত হলে হাত ও মুখমণ্ডলের অস্থি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে **গরিলার** (acromegaly) মতো চেহারা হয়।

(খ) দৈহিক বৃদ্ধিতে থাইরক্সিন হরমোনের প্রভাব : থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত **থাইরক্সিন হরমোন** মানবদেহের দৈহিক বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিতভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

১। **পিটুইটারি গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে :** থাইরক্সিন হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থিকে গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।

২। **গাঠনিক প্রোটিন সংশ্লেষণ :** এই হরমোন দেহের গাঠনিক প্রোটিন সংশ্লেষের হার বৃদ্ধি করে থাকে যার ফলে দেহের বৃদ্ধি সাধন হয়।

৩। **কলার বিভেদন :** এ হরমোন বিভিন্ন কলার বিভেদন ও পরিপক্বতায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এর অভাবে অস্থির অসিফিকেশন ঘটে না ফলে দেহের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয় না।

৪। **খাদ্যের বিপাকীয় হার বৃদ্ধি :** থাইরক্সিন হরমোন খাদ্যের বিপাকের হার বৃদ্ধি করে ফলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

৫। **পেশির বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ :** এই হরমোন কঙ্কাল পেশির বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। **দুগ্ধ উৎপাদন :** এই হরমোন মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন ও পৌষ্টিকতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে যা পরোক্ষভাবে দেহের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

থাইরক্সিন হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণ ও অল্পমাত্রায় ক্ষারণ উভয়ই মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ হরমোন অতিরিক্ত ক্ষরণের ফলে **গলগণ্ড** বা **গয়টার** (goitre) রোগ হয় এবং কম ক্ষরণে শিশুদের **ক্রিটিনিজম** (cretinism) ও বয়স্কদের **মিক্সোডেমা** (myxodema) নামক রোগ হয়।

(গ) দৈহিক বৃদ্ধিতে অন্যান্য হরমোনের প্রভাব : মানবদেহের বৃদ্ধিতে গ্রোথ ও থাইরক্সিন হরমোন ছাড়াও অন্যান্য হরমোনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন–

১। **ইনসুলিন হরমোন :** এই হরমোন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় এবং গ্লাইকোজেন আকারে যকৃতে ও পেশিতে জমা রাখতে সাহায্য করে যা বিপাকীয় ক্রিয়ায় তাপশক্তিতে পরিণত হয়ে দৈহিক বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

২। **কর্টিকোস্টেরয়েড হরমোন :** কর্টিকোস্টেরয়েড হরমোন শর্করা, চর্বি ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বিপাকে প্রভাব বিস্তার করে। যা দেহ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। **প্রোল্যাকটিন হরমোন :** প্রোল্যাকটিন হরমোনের প্রভাবে স্তনগ্রন্থির বিকাশ ঘটে ও দুগ্ধক্ষরণ হয়, ফলে শিশুদের দেহ বৃদ্ধির সহায়তা করে।

৪। **সেক্স স্টেরয়েড হরমোন :** এই হরমোনের প্রভাবে আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়।

এছাড়াও গ্রোথরিলিজিং হরমোন, ক্যালসিটোনিন, গ্লুকোকর্টিকয়েড ইত্যাদি হরমোনও দৈহিক বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

শারীরবৃত্তিক কাজে হরমোনের ভূমিকা (Effect of Hormone in the Metabolic work)

বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত ও রক্তে বাহিত হরমোন অতি অল্প পরিমাণেই বিশেষ বিশেষ শারীরবৃত্তিক কাজ বা পদ্ধতিকে সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। শারীরবৃত্তিক কাজে হরমোনের ভূমিকা নিম্নরূপ–

১। **খাদ্য পরিপাকে :** গ্যাসট্রিন, সিক্রেটিন, কোলেসিস্টোকাইনিন, ভিল্লিকাইনিন, এন্টারোগ্যাস্ট্রোন নামক হরমোন পরিপাকনালির অন্তঃক্ষরাধর্মী কোষ থেকে ক্ষরিত হয়ে পরিপাকে অংশ নিয়ে বিভিন্ন এনজাইমের ক্ষরণ উদ্দীপিত করে এবং ভিলাইকে সবল করে শোষণ ক্ষমতা বাড়ায়।

২। **বিপাক নিয়ন্ত্রণে :** থাইরক্সিন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন শর্করা বিপাক; থাইরক্সিন হরমোন প্রোটিন, ফ্যাট ও খনিজ আয়ন বিপাক; টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রোটিন বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

Scanned with CamScanner

৩। **প্রোটিন সংশ্লেষ ও সঞ্চয়ে :** স্টেরয়েডধর্মী টেস্টোস্টেরন, প্রোজেস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন; আয়োডিনধর্মী থাইরক্সিন হরমোন জিন সক্রিয়করণের মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি করে। বৃদ্ধি হরমোন **'প্রোটিন বাঁচোয়া প্রক্রিয়া'**র (Protein Sparing Action) মাধ্যমে ফ্যাটকে ভেঙে শক্তি উৎপাদন উদ্বুদ্ধ করে। হরমোন DNA এবং RNA-কেও নিয়ন্ত্রিত করে প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। **আয়ন সমতা রক্ষায় :** অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত অ্যালডোস্টেরন Na^+, K^+ আয়ন সমতা রক্ষা করে এবং প্যারাথরমোন ও ক্যালসিটোনিন বৃক্কের Ca^{++} শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৫। **পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণে :** গ্লুকোকর্টিকয়েড, ভেসোপ্রেসিন বৃক্ককে অতিরিক্ত পানি শোষণে উদ্দীপিত করে। ফলে দেহের পানি সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। **লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন :** বৃক্ক থেকে ক্ষরিত এরিথ্রোপোয়েটিন লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

৭। **স্নায়বিক উত্তেজনা প্রেরণে :** অ্যাসিটাইল কোলিনের মতো অ্যাড্রেনালিন ও নর-অ্যাড্রেনালিন হরমোন স্নায়বিক উত্তেজনা প্রেরণে সাহায্য করে।

৮। **আপদকালীন অবস্থা নিয়ন্ত্রণে :** অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির মেডুলা থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রেনালিন ও নর-অ্যাড্রেনালিন হরমোন রক্তনালির সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে ঘাম নিঃসরণ বৃদ্ধি করে দেহকে আপদকালীন অবস্থা থেকে রক্ষা করে।

৯। **প্রজননে :** পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গ থেকে ক্ষরিত যথাক্রমে টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন জননকোষ উৎপাদনে ও পরিণতি প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; শুক্রাণুজননে শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে এবং স্ত্রীলোকের প্রোজেস্টেরন হরমোন গর্ভাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।

১০। **বয়োঃসন্ধি :** টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন ও গোনাডোকর্টিকয়েড গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

১১। **দুগ্ধক্ষরণে :** ইস্ট্রোজেন, প্রোল্যাকটিন, গ্রোথ হরমোন ইত্যাদি স্তন্যগ্রন্থির বৃদ্ধি ও দুগ্ধক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

১২। **সন্তান প্রসবে :** পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে ক্ষরিত অক্সিটোসিন জরায়ু-পেশির সংকোচন ঘটিয়ে এবং রিলাক্সিন শ্রোণিদেশীয় লিগামেন্ট ও পেশির প্রসারণ ঘটিয়ে প্রসূতির সন্তান প্রসবে সাহায্য করে।

১৩। **দেহের বর্ণ নিয়ন্ত্রণে :** মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন মেলানোসাইটের পিগমেন্ট সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে গায়ের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে।

১৪। **রোগ প্রতিরোধ :** থাইমোসিন লিম্ফোসাইটের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে দেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে।

❑ **কাজ :** (i) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি দেহের শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশগ্রহণ করে-আলোচনা কর।

মানুষের আচরণের ওপর হরমোনের প্রভাব (Effect of Hormone in Human Behavior)

মানুষের আচরণ অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। বিভিন্ন ধরনের যেসব ফ্যাক্টর দ্বারা এসব আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় হরমোন তার মধ্যে অন্যতম। মানুষের আচরণের ওপর বংশগতি ও হরমোনের প্রভাব নিয়ে বহু বছর ধরে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলছে। আচরণের ওপর হরমোনের প্রভাবে অনেক বেশি, অনেক মতবাদ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের রাগ, অনুরাগ, সতর্কতা, উদ্যমতা, বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, আগ্রাসন প্রভৃতি আচরণ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মানুষের আচরণের ওপর বিভিন্ন হরমোনের প্রভাব নিম্নরূপ–

১। **থাইরক্সিন** (Thyroxin) : অতিমাত্রায় থাইরক্সিন ক্ষরিত হলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, মনোযোগ কমে যায়, কাজের প্রতি আগ্রহ থাকে না, অনিদ্রা, ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

২। **প্যারাথরমোন** (Parathormone) : এই হরমোন প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষরিত হয় যা উত্তেজনার মাত্রাকে প্রভাবিত করে।

৩। **অ্যাডরেনালিন/এপিনেফ্রিন** (Adrenalin/ Epinephrine) : অ্যাডরেনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত এই হরমোন ভয়, ক্রোধ, আতঙ্ক, আনন্দ প্রকাশে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গঠনে এই হরমোন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪। **নর-অ্যাডরেনালিন/নর-এপিনেফ্রিন** (Nor adrenalin/ Nor epinephrine) : অ্যাডরেনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত এই হরমোন মানুষের মানসিক চাপ, আক্রমণ, পলায়ন আচরণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। **মেলাটোনিন** (Melatonin) : মস্তিষ্কের **পিনিয়াল গ্রন্থি** থেকে ক্ষরিত এই হরমোন মানুষের ঘুম, জাগ্রত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোনের ক্ষরণ কম হলে মানুষ অনিদ্রায় ভোগে।

Scanned with CamScanner

৬। টেস্টোস্টেরন (Testosteron) : শুক্রাশয় থেকে অতিমাত্রায় এই হরমোন ক্ষরণের ফলে মানুষের স্বভাবে উগ্রতা সৃষ্টি হয়। যৌন আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। এছাড়া পুরুষে কাজের নৈপুণ্য, কথা বলার দক্ষতা, অনুধাবন ক্ষমতা, পুরুষালি আচরণ ইত্যাদি এ হরমোন ক্ষরণের ফলে হয়ে থাকে। সাধারণত পুরুষে ৪০ বছর বয়স থেকে টেস্টোস্টেরন ক্ষরণ ক্রমশ কমে আসে। ফলে যৌন তাড়না কমে যায়, অবসাদগ্রস্ত ও বিষণ্নতা দেখা দেয়।

৭। ইস্ট্রোজেন (Estrogene) **ও প্রোজেস্টেরন** (Progesteron) : এই ধরনের হরমোন ডিম্বাশয় থেকে কম মাত্রায় ক্ষরিত হলে নারীরা অল্প কিছুতে রেগে যায়, ঘুম ঠিকমতো হয় না, বিষণ্নতায় ভোগে। সন্তান প্রসবের পর এসব হরমোনের ক্ষরণের তারতম্য ঘটলে নারীরা নানান মানসিক রোগে ভোগেন একে **প্রসবোত্তর সাইকোসিস** বলে। এছাড়াও নারীদের কাজের নৈপুণ্যতা, কথা বলায় দক্ষতা ও অনুধাবন ক্ষমতা ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরণের সঙ্গে জড়িত।

৮। অন্যান্য হরমোন (Other hormones) : পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন হরমোন অন্যান্য সব হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ গ্রন্থি ক্ষরিত হরমোনগুলো মানুষের সব ধরনের আচরণের সঙ্গে জড়িত। এ গ্রন্থি থেকে অ্যাডরেনাল, কর্টিকো ট্রফিক হরমোন ক্ষরণের জন্য মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে থাকে।

অনিয়ন্ত্রিত হরমোনের ব্যবহারের ফলাফল (Result of uncontrolled use of Hormone)

হরমোন হচ্ছে শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ যা আমাদের দেহের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখতে সহায়তা করে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ও দৈহিক বৃদ্ধিতে হরমোনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হরমোনের সঠিক মাত্রার উপস্থিতি এসব নিয়ন্ত্রণ করে। বয়সকালে কিছু হরমোন ক্ষরণের মাত্রা কমতে থাকে অথবা দেহ পর্যাপ্ত হরমোন উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়ে। ফলে নানা জটিলতা দেখা দেয় ও জীবন দুর্বিষহ হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে বাইরে থেকে হরমোন প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হরমোন ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম বিঘ্নিত হয় বিভিন্ন ধরনের রোগ ও শারীরিক মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। কয়েকটি হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ফলাফল নিম্নরূপ–

১। বৃদ্ধি হরমোন (Growth hormone) : মানুষের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি হরমোন ভূমিকা রাখে। মানুষের বৃদ্ধিজনিত অধিকাংশ শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ এ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহকে স্থিতিশীল ও সঠিক বৃদ্ধির মাত্রা বজায় রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত বৃদ্ধি হরমোন ব্যবহারের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, গেঁটে বাত, হার্টফেইলিউর, অস্থি ও পেশির রোগ দেখা দিতে পারে।

২। থাইরক্সিন (Thyroxin) : থাইরক্সিন হরমোনের ক্ষরণ কম হলে গলগণ্ড, থাইরয়েডের ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হয়। এসব রোগ প্রতিরোধ করতে থাইরক্সিন হরমোন অতিমাত্রায় ব্যবহার করলে দেহে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়। যেমন– ছদ্ম গলগণ্ড, হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়, পেটে ব্যথা হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়, চিন্তাগ্রস্ত হয়, ওজন কমে যায়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। হার্টফেইলিউর ও রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রার অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। এছাড়াও অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ায় শ্বাসকষ্ট, মুখমণ্ডল ও জিহ্বা ফুলে যায়।

৩। ইনসুলিন (Insuline) : ডায়াবেটিস রোগীরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিয়ে থাকেন। কিন্তু ইনসুলিন গ্রহণের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত না হলে অনেক জটিলতায় ভুগতে হয়। যেমন- বমিভাব, মাথাব্যথা, খিঁচুনি, অবসাদ দেখা দেয়, ঘুম ঘুম ভাব, স্নায়ু দুর্বলতা, ত্বক ফ্যাকাসে হওয়া, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

৪। অ্যাডরেনালিন/ এপিনেফ্রিন (Adrenalin/Epineprine) : বায়ু চলাচলের জন্য শ্বাসনালি খুলতে, রক্তনালি সংকীর্ণ করতে এবং বিভিন্ন রকম মারাত্মক অ্যালার্জিজনিত ক্রিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করতে অ্যাডরেনালিন/এপিনেফ্রিন হরমোন ব্যবহার করা হয়। অতিমাত্রায় এই হরমোন ব্যবহার করলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। মাথা ব্যথা, বুক ব্যথা, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া, দুশ্চিন্তা, শরীর দুর্বল হওয়া, হাঁটা চলা ও কথা বলায় ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

৫। টেস্টোস্টেরন (Testosteron) : টেস্টোস্টেরন হরমোন পুরুষের যৌনাঙ্গকে সুগঠিত রাখে, গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ ঘটিয়ে পৌরুষ প্রদর্শন করে। টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণ কম হলে এর অভাব পূরণ করতে টেস্টোস্টেরনবাহী বড়ি বা ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়। এর অতিমাত্রায় ব্যবহারের কারণে শরীর দুর্বল হয়। ঘুম ঘুম ভাব, গায়ে ব্যথা, ত্বকে জ্বালাপোড়া করা, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসা, অমনোযোগিতা, শুক্রাশয়ে ব্যথা, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, পিঠের দু'পাশে বা মাঝখানে ব্যথা, মূত্রথলিতে ব্যথা, ডায়রিয়া, অপরিণত বয়সে মাথায় টাক প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

Scanned with CamScanner

৬। ইস্ট্রোজেন (Estrogen) : এই হরমোন নারীদেহকে সুস্থ সবল ও সুদর্শন রাখে। এর ক্ষরণ কম হলে ইস্ট্রোজেনবাহী বড়ি বা ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়। এর অতিমাত্রায় ব্যবহারে নারীদেহে নানান জটিলতা সৃষ্টি হয়। যেমন– স্তন দৃঢ় হয় এবং অস্বাভাবিক বড় হয়ে যায়, একে **গাইনেকোমাস্টিয়া** (gynecomastia) বলে; অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়, বমি বমি ভাব, মাথাব্যথা, দেহ ও মুখমণ্ডলের ত্বকে ফুসকড়ি বা বিভিন্ন অংশে **অ্যাকনি** (acne) বা বিশ্রী দাগ পড়ে, মানসিকভাবের পরিবর্তন ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি তাদের নিঃসৃত হরমোনের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। তাই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা দেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্য অপরিহার্য। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় হরমোন খুব সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োজন হয়। তাই দেহে হরমোনের পরিমাণ তারতম্যে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা (disorder) সৃষ্টি হয়, যা পরিশেষে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। উৎস গ্রন্থি ছাড়া দেহের অন্য কোনো স্থানে হরমোন সঞ্চিত থাকতে পারে না। তাই দেহের প্রয়োজন অনুসারে হরমোন ক্ষরিত হয়ে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া গ্রন্থিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ কোনো কারণে দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং যথাসময়ে হরমোন ক্ষরিত না হলে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে যার বহিঃপ্রকাশে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন দেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্য আবশ্যক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি গ্রন্থির নিঃসৃত হরমোন অন্য একটি গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী গ্রন্থির বিশৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রক গ্রন্থির কাজে বিঘ্ন ঘটে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর **অতি সক্রিয়তা** (hyper activity) এবং **স্বল্প সক্রিয়তা** (hypo activity) দেহে সংশ্লিষ্ট হরমোনের পরিমাণের বৃদ্ধি এবং হ্রাস ঘটায়। ফলে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায় এবং বিভিন্ন রোগের উদ্ভব হয়।

হরমোনের অনিয়মিত ক্ষরণজনিত রোগের নাম, কারণ ও লক্ষণের ছক

রোগের নাম	কারণ	রোগ লক্ষণ
১। ডোয়ারফিজম	শৈশবকালে STH-এর **কম** ক্ষরণের ফলে।	বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, উচ্চতা ৩ ফুটের বেশি হয় না।
২। অ্যাক্রোমিক্রিয়া	প্রাপ্তবয়স্কদের পিটুইটারি ক্ষরণ হ্রাস পেলে।	মুখমণ্ডল, হাত-পা, মেরুদণ্ড ইত্যাদির স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না।
৩। জাইগ্যানটিজম	শৈশবকালে STH-এর ক্ষরণ **বেশি** হলে।	অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় (৭-৮ ফুট)।
৪। অ্যাক্রোমেগালি বা মারিজ ব্যাধি	প্রাপ্তবয়স্কদের STH-এর ক্ষরণ **বেশি** হলে।	চোয়াল, হাত-পা, মেরুদণ্ড ইত্যাদির অধিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।
৫। সাইমন্ড ব্যাধি	পিটুইটারি গ্রন্থির কার্যকারিতা **লোপ** পেলে।	দেহের ওজন হ্রাস পায়, খিদে কমে যায়, যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
৬। অ্যাডিসন বর্ণিত ব্যাধি	অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের **স্বল্পক্ষরণের** ফলে।	পেশির দুর্বলতা, রক্তচাপ কমে যাওয়া, ত্বকের বর্ণের পরিবর্তন ইত্যাদি।
৭। কুশিং বর্ণিত ব্যাধি	অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের **অতি** সক্রিয়তার ফলে।	দেহে অতিরিক্ত মেদ সঞ্চিত হয়। বিশেষ করে মুখমণ্ডল গ্রীবা ও নিতম্বদেশে।
৮। ক্রোটিনিজম	শিশুদের থাইরক্সিন **কমে** গেলে।	বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে না। যৌন লক্ষণ প্রকাশ পায় না।
৯। মিক্সিডিমা	প্রাপ্তবয়স্কদের থাইরক্সিন ক্ষরণ **কমে** গেলে।	চোখ-মুখ ফোলা দেখায়, চামড়া পুরু ও খসখসে হয়, জিহ্বা স্থূল, গলার স্বর মোটা হয়ে যায়।
১০। গয়টার বা গ্রেভস বর্ণিত রোগ	থাইরক্সিন ক্ষরণ **বেড়ে** গেলে।	গলগণ্ড বা থাইরয়েড বৃদ্ধি পায়, চক্ষু বিস্ফোরিত হয়।
১১। টিটেনি	প্যারাথরমোন ক্ষরণ **কমে** গেলে।	পেশির খিঁচুনি, তড়কা ইত্যাদি।
১২। ডায়াবেটিস মেলিটাস	ইনসুলিনের **কম** ক্ষরণের ফলে।	রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, মূত্রের সঙ্গে শর্করা নির্গত হওয়া ইত্যাদি।
১৩। ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস	ADH নিঃসরণ **কমে** গেলে।	বেশি পরিমাণে এবং ঘন ঘন মূত্র ত্যাগ, প্রবল তৃষ্ণা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

হরমোনের অনিয়মিত ক্ষরণের প্রভাবজনিত কারণে কতগুলো রোগের বিবরণ

১। বামনত্ব (Dwarfism) : শৈশবে অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থির স্বল্প ক্ষরণে (STH-এর ক্ষরণ হ্রাস পাওয়ায়) সামগ্রিকভাবে দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং বৃদ্ধিজনিত একটি রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাকে বামনত্ব বলে। সাধারণভাবে দেহের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধি সঠিক অনুপাতে হলেও বৃদ্ধির হার মারাত্মকভাবে কমে যায়। যেমন– ১০ বছরের একটি শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ৪ থেকে ৫ বছরের স্বাভাবিক শিশুর সমতুল্য হয়। একই শিশুর ২০ বছর বয়সে যে বৃদ্ধি হয় তা স্বাভাবিক ৭ থেকে ১০ বছরের শিশুর সমতুল্য হয়। বৃদ্ধি হরমোনের স্বল্পতাই এই বৃদ্ধি হ্রাসের মূল কারণ। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হ্রাসজনিত অবস্থাকে বামনত্ব বলে।

২। অতিকায়ত্ব (Gigantism) : পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রখণ্ডের বৃদ্ধি হরমোন (STH) নিঃসরণকারী কোষগ্রন্থিগুলোর সক্রিয়তা বেড়ে যায়, ফলে অতিরিক্ত বৃদ্ধি হরমোন ক্ষরিত হয়। এই অবস্থা যদি বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বে হয় তবে দৈহিক বৃদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উচ্চতা ৮ ফুট পর্যন্ত হয়। এই অবস্থাকে অতিকায়ত্ব বা দৈত্যত্ব বলে।

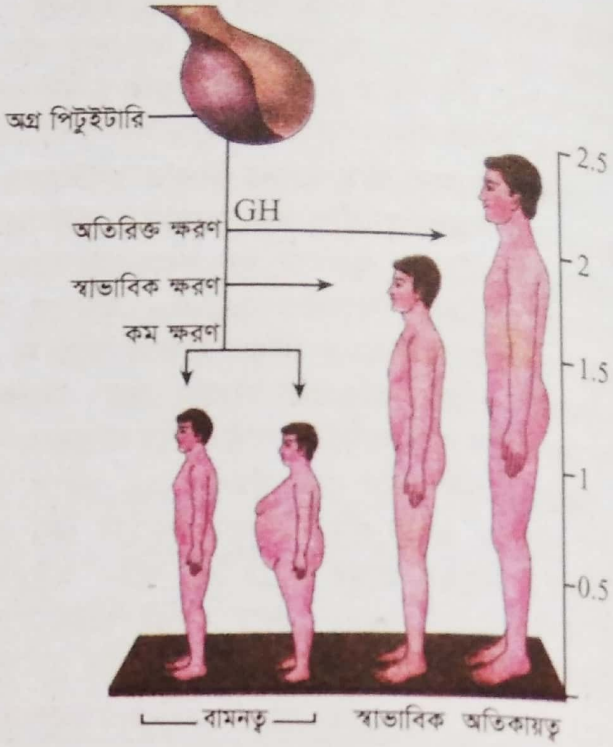

চিত্র ৮. ২৪ক : গ্রোথ হরমোনের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ক্ষরণের প্রভাব

অতিকায় ব্যক্তির রক্তের শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স-এর বিটা কোষগ্রন্থিগুলো অধিক **ইনসুলিন** ক্ষরণজনিত কারণে বিনষ্ট হয়। এর ফলে **ডায়াবেটিস মেলিটাস** রোগের উৎপত্তি হয়।

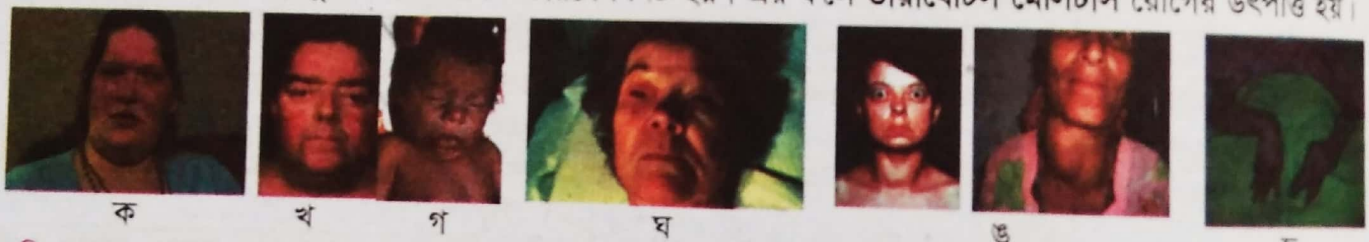

চিত্র ৮.২৪খ : মানুষের হরমোন সংক্রান্ত রোগসমূহ– ক. অ্যাক্রোমেগালি, খ. কুশিং সিনড্রোম, গ. ক্রেটিনিজম, ঘ. মিক্সিডিমা, ঙ. স্ফীত নেত্র, গলগণ্ড, গ্রেভ বর্ণিত রোগ ও চ. টিটেনি রোগ।

৩। গরিলাত্ব (Acromegaly) : প্রাপ্ত বয়স্কদের পিটুইটারি গ্রন্থির বেশি হলে চোয়াল, হাত-পা, মেরুদণ্ড ইত্যাদির অধিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ অস্থিগুলো প্রস্থে বেড়ে যায় কিন্তু দৈর্ঘ্যে বাড়ে না, এ অবস্থাকে গরিলাত্ব বা **অ্যাক্রোমেগালি** বলে। এ রোগের ফলে হাত ও পায়ের অস্থিগুলোর স্থূলতা বাড়ে এবং হাতের আঙুলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য হাতের আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়। পায়ের আকার এমন বেড়ে যায় যে, অনেক বড় সাইজের জুতা পরতে হয়। নিচের চোয়াল সামনের দিকে বেড়ে যায়। করোটি, নাক, মাথার অগ্রভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাকের আকার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সর্বশেষ অবস্থায় অনেক কোমল কলা, অঙ্গ যেমন– জিহ্বা, যকৃৎ এবং বৃক্ক মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়।

৪। কুশিং সিনড্রোম (Cushing syndrome) : অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের অতি সক্রিয়তার ফলে দেহে বিশেষ করে মুখমণ্ডল, গ্রীবা ও নিতম্বদেশে অতিরিক্ত মেদ সঞ্চিত হয়, এ অবস্থাকে **কুশিং সিনড্রোম** বলে। এই রোগের ফলে পেশি ক্ষীণ ও শিথিল হয়। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষীণ ও শিথিল হয়। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং মূত্রে গ্লুকোজ রেচন ঘটে। এ রোগ হলে উদর ঝোলানো হয় এবং ঘা সারতে দেরি হয়।

Scanned with CamScanner

৫। ক্রেটিনিজম (Cretinism) : ভ্রূণাবস্থায়, কৈশোরে কিংবা শৈশবে থাইরয়েড গ্রন্থির চূড়ান্ত স্বল্প ক্রিয়ায় এ রোগ হয়। এ অবস্থাকে দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। ক্রেটিনিজম রোগটি জন্মগত থাইরয়েড গ্রন্থির অনুপস্থিতি অথবা থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন ক্ষরণে ব্যর্থতার কারণে হয়ে থাকে। শিশু স্থূলাকৃতি, খর্বাকৃতি ও বলিষ্ঠ হয়। উদর অঞ্চল বেশি স্ফীত হয়। অন্তঃকঙ্কাল বৃদ্ধির তুলনায় জিহ্বা এত লম্বা হয়ে যায় যে, গলাধঃকরণ ও শ্বাসক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। মুখ থেকে অনবরত লালা নিঃসরণ ও পেট বড় হয়ে যায়। এতে শিশুর দাঁত ওঠা, কথা বলা, দাঁড়ানো সবই বিলম্বিত হয়। মানসিক বিকাশ সঠিক না হওয়ায় শিশু জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং মুখমণ্ডলে বোকা ভাব লক্ষ করা যায়।

৬। মিক্সিডিমা (Myxedema) : প্রাপ্তবয়স্ক লোকের থাইরয়েড গ্রন্থির স্বল্প সক্রিয়তার জন্য যে অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যায় তাকে মিক্সিডিমা বলে। এ রোগে অবসাদ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব দেখা যায়। দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা ঘুম হয়। চুলের বৃদ্ধি কমে যায় এবং ত্বক খসখসে হয়। গলার স্বর **ব্যাঙের মতো কর্কশ** হয়। মুখমণ্ডল ফুলে যায়।

৭। গয়টার (Goitre) বা গ্রেভ বর্ণিত রোগ (Grave's disease) : থাইরয়েড গ্রন্থির অতি সক্রিয়তার ফলে স্ফীত নেত্রসহ যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে **গ্রেভ বর্ণিত রোগ** বলে। থাইরক্সিন হরমোনের অতিক্ষরণের ফলে এ রোগ হয়। এ রোগ হলে ছানাবড়া চক্ষু, থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি, দেহের দ্রুত ক্ষয় অর্থাৎ ওজন কমে যায়। উত্তেজনা, অনিদ্রা, রুক্ষ ও খিটখিটে মেজাজ হয় এবং আবেগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৮। টিটেনি (Tetany) : প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির স্বল্প সক্রিয়তার ফলে ক্যালসিয়াম (Ca^{2+}), সোডিয়াম (Na^{+}) এবং পটাশিয়াম (K^{+}) আয়ন গ্রন্থিগুলোর স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়ে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে ঐচ্ছিক পেশির খিঁচুনি পরিলক্ষিত হয় তাকে টিটেনি বলে। টিটেনি বা ধনুষ্টংকার রোগে মুখমণ্ডলের পেশির দ্রুত সংকোচন ঘটে। হাতের কবজি ও বুড়ো আঙুল বেঁকে যায় এবং আঙুলের বিক্ষেপ ঘটে।

৯। ডায়াবেটিস মেলিটাস বা ডায়াবেটিস (Diabetes mellitus or diabetes) : কোনো কারণে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের বিটা কোষগ্রন্থিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিংবা কোনো কারণে এদের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেলে অর্থাৎ অভাবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে কয়েকটি লক্ষণযুক্ত একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। এটি ইনসুলিনের কম ক্ষরণের ফল। এ রোগকে অনেকে সকল **'জটিল রোগের জননী'** বলে আখ্যায়িত করেছেন। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে আমাদের বৃক্ক, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, চোখ, দাঁত ও স্নায়ুতন্ত্রসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গত ADH হরমোনের অভাবে **ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস** বা বহুমূত্র রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ : (১) প্রস্রাবের সাথে গ্লুকোজ নির্গত হয়, (২) অতি ক্ষুধা এবং অতি তৃষ্ণা, (৩) শরীর রোগা, দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে থাকে।

রোগের চিকিৎসা : ইনসুলিনের সাহায্যেই এ রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে মূত্রের সাথে গ্লুকোজ নির্গত হলে একে **গ্লাইকোসুরিয়া** (gluycosuria) বলে।

অন্যদিকে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধিকে **হাইপারগ্লাইসেমিয়া** (hyperglycemia) বলে। কোনো কারণে ইনসুলিনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস পেয়ে এক বিশেষ লক্ষণযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়, একে **হাইপোগ্লাইসেমিয়া** (hypoglycemia) বলে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে শারীরিক অবসাদ, তড়কা, রুক্ষ মেজাজ এবং চৈতন্য লোপ পায়।

❑ **কাজ :** (i) অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ক্ষরণ হলে যে সকল সমস্যা দেখা দিতে পারে তা বিশ্লেষণ কর। (ii) হরমোনের গুরুত্ব উল্লেখ কর। (iii) দৈহিক বৃদ্ধি সাধনে হরমোনের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর। (iv) হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ভয়াবহ হতে পারে– বিশ্লেষণ কর। (v) একই বয়সের দুই মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক হলেও কী কী গঠনগত পার্থক্য থাকতে পারে বলে তুমি মনে কর? (vi) মানুষের স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক গঠনের জন্য দায়ী হরমোনসমূহের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর।

Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

☑ **স্নায়ুতন্ত্র :** নিউরন সমন্বিত যে তন্ত্রের অঙ্গসমূহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ সাধন করে তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করে এবং বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে বিভিন্ন পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে।

☑ **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র :** স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ দেহের পৃষ্ঠীয় মধ্যরেখায় করোটি ও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত সে অংশকে অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে তৈরি সংগঠনকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে।

☑ **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র :** মানবদেহে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরের করোটিক স্নায়ু ও সুষুম্নাস্নায়ুগুলো একত্রে যে স্নায়ুতন্ত্র গঠন করে তাকে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে।

☑ **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র :** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে সৃষ্ট স্নায়ুসমূহের দ্বারা গঠিত স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ দেহের আন্তরযন্ত্রের (visceral organs) বিভিন্ন কাজ (যেমন– হৃৎস্পন্দনের হার, লালা ক্ষরণ, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলন ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে তাকে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বা আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে।

☑ **স্নায়ুকলা :** ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উৎপন্ন যে কলা কোনো উদ্দীপনা গ্রহণ করে তার উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম তাকে স্নায়ুকলা বলে।

☑ **নিউরন :** কোষদেহ ও সব ধরনের প্রবর্ধক নিয়ে গঠিত স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একককে নিউরন বলে।

☑ **স্নায়ু :** এপিনিউরিয়াম নামক যোজক কলার আবরণী বেষ্টিত রক্তবাহ ও ফ্যাট কোষযুক্ত তন্তুগুচ্ছকে স্নায়ু বলে।

☑ **নিউরোগ্লিয়া :** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যোজক কলাকে নিউরোগ্লিয়া বলে। নিউরনের সুরক্ষাই ইহার প্রধান কাজ।

☑ **নিউরোট্রান্সমিটার :** স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে যেসব রাসায়নিক বস্তু স্নায়ু উদ্দীপনার তথ্যকে এক নিউরন হতে অন্য নিউরন কিংবা পেশি কোষ কিংবা কোনো গ্রন্থিতে পরিবহনে সহায়তা করে তাদের নিউরোট্রান্সমিটার বলে।

☑ **মস্তিষ্ক :** সুষুম্নাকাণ্ডের অগ্রভাগে অবস্থিত ও করোটি দ্বারা সুরক্ষিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্ফীত যে অংশটিতে প্রাণীদের তথা মানুষের চিন্তা, স্মৃতি, বুদ্ধি ইত্যাদি স্নায়বিক আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে মস্তিষ্ক বলে।

☑ **মেনিনজেস :** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্দ্র একটি দৃঢ় ও মজবুত আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে, যা করোটিকা ও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত থাকে। একে মেনিনজেস বলে। মেনিনজেস তিনটি ঝিল্লি নিয়ে গঠিত। বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ঝিল্লি তিনটি যথাক্রমে– ড্যুরা ম্যাটার, অ্যারাকনয়েড ম্যাটার ও পায়া ম্যাটার।

☑ **মেনিনজাইটিস :** মেনিনজেস নামক তিনটি তন্তুময় বিভিন্ন বা পাতলা পর্দা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আবৃত থাকে। মেনিনজেসে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে মেনিনজাইটিস বলে। অথবা, মেনিনজেসের প্রদাহজনিত রোগকে মেনিনজাইটিস বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের জীবাণু (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা অন্যকোন জীবাণু) দ্বারা মেনিনজেস সংক্রমিত হলে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। প্রধানত *Neisseria meningitidis* ব্যাকটেরিয়া দ্বারা মেনিনজেস বেশি আক্রান্ত হয়। এ রোগের প্রধান লক্ষণ হলো মাথা ব্যথা ও গ্রীবা শিথিল হয়ে যাওয়া। এছাড়া মনোযোগ বিঘ্নতা, বমি, আলোক ও শব্দ সহনহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

☑ **করোটিক স্নায়ু :** মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট যে সকল প্রান্তীয় স্নায়ুসমূহ করোটির বিভিন্ন ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তার লাভ করে তাদের করোটিক স্নায়ু বলে।

☑ **সিন্যাপস :** দুটি স্নায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁকযুক্ত সংযোগস্থল যেখানে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের প্রান্ত শেষ হয় এবং অন্য একটি নিউরনের ডেনড্রাইট বা কোষদেহ শুরু হয় তাকে সিন্যাপস বলে। স্পাইনাল কর্ডের একটি মটর নিউরনের ডেনড্রাইট এবং কোষদেহে ১০০০ সিন্যাপস থাকতে পারে। মস্তিষ্কের কিছু কোষ ১০,০০০ সিন্যাপস গ্রহণ করতে পারে।

☑ **সুষুম্নাকাণ্ড :** কশেরুকায় গঠিত মেরুদণ্ডের গহ্বরে সুরক্ষিত মেডুলা অবলংগাটা থেকে আরম্ভ করে সুষুম্নানালির মধ্য দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় কটিদেশীয় কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত ফাঁপা গোলাকার রজ্জুর মতো সরু স্নায়ুদণ্ডকে সুষুম্নাকাণ্ড বলে।

☑ **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড :** নিউরোসিল (মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল ও সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালি) ও সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস যে স্বচ্ছ, বর্ণহীন ও পরিবর্তিত কলারস দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাকে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড বা মস্তিষ্ক-সুষুম্না রস বলে।

☑ **স্পাইনাল নার্ভ :** যেসব স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ড থেকে সৃষ্ট মিশ্র প্রকৃতির সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদের সুষুম্নাস্নায়ু বা স্পাইনাল নার্ভ বলে।

☑ **ফোরমেন অব মনরো :** অগ্রমস্তিষ্কে অবস্থিত পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল (২টি) মধ্যমস্তিষ্কের ৩য় ভেন্ট্রিকলের সাথে যে ছিদ্র দিয়ে যুক্ত থাকে তাকে ফোরমেন অব মনরো বলে।

☑ **সংবেদী অঙ্গ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় :** মানুষের যেসব গ্রাহক অঙ্গ পরিবেশ থেকে বিশেষ উদ্দীপনা গ্রহণ করে নির্দিষ্ট স্নায়ুর মাধ্যমে স্নায়বিক কেন্দ্রে পাঠিয়ে সেখানকার নির্দেশ পালন করে তাদের সংবেদী অঙ্গ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। মানবদেহে প্রায় ১১ ধরনের সংবেদী অঙ্গ আছে, এদের মধ্যে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি হলো বিশেষ সংবেদী অঙ্গ। এদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলে।

☑ **অক্ষিকোটর :** মানুষের করোটির সম্মুখে নাসিকার দু-পাশে অস্থিনির্মিত গহ্বর দুটিকে অক্ষিকোটর বলে।

☑ **দর্শনেন্দ্রিয় :** চোখের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের রূপ অনুভব করি, তাই চোখকে দর্শনেন্দ্রিয় বলে।

☑ **রেটিনা :** অক্ষিগোলকের সবচেয়ে ভেতরের আলোক সংবেদী শেষ স্তরকে রেটিনা বলে। রেটিনায় দুই ধরনের কোষ থাকে। যথা– রড কোষ ও কোন কোষ।

☑ **অন্ধবিন্দু :** চোখের রেটিনার যে স্থানে অপটিক স্নায়ু প্রবেশ করে সেখানে রড বা কোন কোষ থাকে না। ফলে ওই স্থানে কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় না, একে অন্ধবিন্দু বলা হয়।

Scanned with CamScanner

☑ **পীতবিন্দু :** অন্ধবিন্দুর সন্নিকটে রেটিনার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন টোল খাওয়ানো সংক্ষিপ্ত অঞ্চলটিকে পীতবিন্দু বা ফোভিয়া সেন্ট্রালিস বলে। এতে কেবল কোন কোষ থাকে, রড কোষ থাকে না। এটি অতিরিক্ত আলো সংবেদী, তাই এখানে সবচেয়ে ভালো ও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

☑ **উপযোজন :** দর্শনীয় বস্তু ও লেন্সের মধ্যবর্তী দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে সিলিয়ারি পেশি ও সাসপেন্সরি লিগামেন্টের সংকোচন প্রসারণে ও লেন্সের ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে যেকোনো দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য চোখে যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটে তাকে উপযোজন বলে।

☑ **দ্বিনেত্র দৃষ্টি :** দৃশ্যযোগ্য বস্তু একই সাথে দু'চাখের সাহায্যে এককভাবে দেখাকে দ্বিনেত্র দৃষ্টি বলে। মানুষের দৃষ্টি দ্বিনেত্র দৃষ্টি।

☑ **কান :** কান স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ।

☑ **ইউস্টেশিয়ান নালি :** মধ্যকর্ণের গহ্বরের অঙ্কীয় দেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত সরু নালিকে ইউস্টেশিয়ান নালি বলে। এটি টিমপেনিক পর্দার দু'পাশের বায়ু চাপের সমতা বজায় রাখে।

☑ **কর্ণাস্থি :** মধ্যকর্ণে ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস নামক তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি শিকলের মতো বিন্যস্ত থাকে। এদের কর্ণাস্থি বলে। এগুলো মানবদেহের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অস্থি। কর্ণাস্থির মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ কর্ণপটহ থেকে অন্তঃকর্ণে পরিবাহিত হয়।

☑ **মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ :** অন্তঃকর্ণের গঠনকে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ বলে। এটি শ্রবণ অঙ্গ ও ভারসাম্য অঙ্গ নিয়ে গঠিত।

☑ **ক্যুপুলা :** অন্তঃকর্ণের অর্ধবৃত্তাকার নালির প্রতিটি নালির এক প্রান্ত স্ফীত হয়ে অ্যাম্পুলা গঠন করে। এদের অন্তঃপ্রাচীরের মধ্যে সংবেদী কোষ ও রোম থাকে। রোমগুলো চুনময় ওটোলিথ দানা সংবলিত জেলির মতো ক্যুপুলায় আবৃত থাকে।

☑ **ককলিয়া :** অন্তঃকর্ণের বা মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থের স্যাকুলাসের পেছনের অংশ নলাকার ধারণ করে ও বিশেষভাবে চক্রাকারে পেঁচিয়ে একটি শামুকের খোলকের মতো পেঁচানো অঙ্গ গঠন করে একে ককলিয়া বলে।

☑ **অর্গান অব কর্টি :** এটি অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার নালিতে অবস্থিত প্রকৃত শ্রবণ সংবেদী অঙ্গ। এটি বেসিলার পর্দা, সূক্ষ্ম সংবেদী রোম কোষ বা লোম কোষ, সমর্থনকারী কোষ এবং টেকটোরিয়াল মেমব্রেন নিয়ে গঠিত। এতে প্রায় ৫ হাজার রোম কোষ থাকে। এর প্রতিটি রোম কোষের সাথে অডিটরি স্নায়ুর নিউরন যুক্ত থাকে। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শব্দতরঙ্গের প্রভাবে এটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এটি অন্তঃকর্ণের স্যাকুলাসে থাকে।

☑ **অটোকোনিয়াম :** অন্তঃকর্ণের ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাসে অবস্থিত ম্যাকুলা ও অটোলিথিক মেমব্রেনকে অটোকোনিয়াম বলে।

☑ **সমন্বয় :** বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে দেহের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে সমন্বয় বলে। সমন্বয় ব্যবস্থা দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা– স্নায়বিক সমন্বয় ও রাসায়নিক সমন্বয়।

☑ **স্নায়বিক সমন্বয় :** স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ, তন্ত্র, টিস্যু ও কোষের মধ্যে যে সমন্বয় ঘটে তাকে স্নায়বিক সমন্বয় বলে।

☑ **রাসায়নিক সমন্বয় :** যে পদ্ধতিতে হরমোন বা উত্তেজক রস বা জৈব রাসায়নিক পদার্থ প্রাণিদেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া প্রণালির অখণ্ডতা ও সমন্বয় সাধন করে, সেই পদ্ধতি এবং ক্রিয়াশীলতাকে রাসায়নিক সমন্বয় বলে।

☑ **গ্রন্থি :** গঠনগত ও কার্যগতভাবে বিশেষিত যে কোষ বা কোষগুচ্ছ যখন শারীরবৃত্তীয় বা জৈবনিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রস বা রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে তখন তাকে **গ্রন্থি** (gland) বলে। ক্ষরণ গুণসম্পন্ন একটি মাত্র কোষ বা কোষগুচ্ছ নিয়ে গ্রন্থি গঠিত হয়। গ্রন্থি এক ধরনের রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু।

☑ **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি :** নালিযুক্ত গ্রন্থিকে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। যেমন– লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, অশ্রুগ্রন্থি ইত্যাদি।

☑ **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি :** হরমোন নিঃসরণকারী নালিবিহীন গ্রন্থিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড বলে।

☑ **পিটুইটারি গ্রন্থি বা মাস্টার গ্ল্যান্ড :** পিটুইটারি গ্রন্থি কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ হরমোন নিঃসৃত করে, দেহের অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে তাই একে মাস্টার গ্ল্যান্ড বলা হয়।

☑ **হরমোন বা রাসায়নিক দূত :** হরমোন হলো এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা কোনো কোষগুচ্ছ (অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি) হতে ক্ষরিত হয়ে লসিকা বা রক্তস্রোত দ্বারা বাহিত হয়ে দূরবর্তী অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কোষগুচ্ছ বা কোষগুচ্ছসমূহকে প্রভাবিত করে। হরমোন কোষে কোষে রাসায়নিক বার্তা প্রেরণ করে তাই হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলা হয়।

☑ **ট্রপিক হরমোন :** যেসব হরমোন অপর অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে তাদের ট্রপিক হরমোন বলে। যেমন– ACTH, TSH, GTH ইত্যাদি।

☑ **ননট্রপিক হরমোন :** যেসব হরমোন অপর অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে না তাদের ননট্রপিক হরমোন বলে। যেমন–Prolactin, STA ইত্যাদি।

☑ **লোকাল হরমোন :** যেসব হরমোন উৎস্থলে বা উৎস্থলের নিকটে ক্রিয়া করে তাদের লোকাল হরমোন বলে। যেমন– সোমাটোস্টেটিন, গ্যাসট্রিন, সিক্রেটিন, টেস্টোস্টেরন, এরিথ্রোপোয়েটিন, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ইত্যাদি।

☑ **নেগেটিভ ফিড ব্যাক :** রক্তে বিদ্যমান হরমোন ও দেহে হরমোনের চাহিদার এ দু'য়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে হরমোন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে নেগেটিভ ফিড ব্যাক বলা হয়।

☑ **ইনসুলিন :** অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের বিটা কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো ইনসুলিন। এ হরমোন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়। এ হরমোনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়।

☑ **বামনত্ব :** শৈশবে অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থির স্বল্প ক্ষরণে সামগ্রিকভাবে দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং বৃদ্ধিজনিত একটি রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাকে বামনত্ব বলে।

☑ **ক্রেটিনিজম :** থাইরয়েড গ্রন্থির স্বল্প ক্রিয়ায় রোগসম্পন্ন এবং মুখমণ্ডলে বোকা ভাব লক্ষ করা যায়।

☑ **মিক্সিডিমা :** প্রাপ্তবয়স্ক লোকের থাইরয়েড গ্রন্থির স্বল্প সক্রিয়তার জন্য যে অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যায় তাকে মিক্সিডিমা বলে।

☑ **গয়টার :** থাইরয়েড গ্রন্থির অতি সক্রিয়তার ফলে স্ফীত নেত্রসহ যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে গয়টার বলে।

Scanned with CamScanner

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের অক্ষিগোলকের স্তর কয়টি? [সি.,কু.,ব.,চ.,য.,দি.ও রা. বোর্ড-২০১৮]
ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

২. নিচের কোন করোটিকা স্নায়ু মাথা ও কাঁধের সঞ্চালনে ভূমিকা পালন করে? [ঢা. বোর্ড-২০১৭]
ক অকুলোমোটর খ ট্রাইজেমিনাল
গ স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি ঘ হাইপোগ্লোসাল

৩. মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ কোনটি? [ঢা. বোর্ড-২০১৭]
ক সেরেবেলাম খ সেরেব্রাম
গ থ্যালামাস ঘ হাইপোথ্যালামাস

৪. কোন করোটিকা স্নায়ু জিহ্বার সঞ্চালন ঘটায়? [য. বোর্ড-২০১৭]
ক অ্যাবডুসেন্স খ ফ্যাসিয়াল গ ভেগাস ঘ হাইপোগ্লোসাল

৫. কোনটি মানব চোখের প্রতিসরণ মাধ্যম নয়? [সি. বোর্ড-২০১৭]
ক কর্নিয়া খ পিউপিল
গ অ্যাকুয়াস হিউমার ঘ ভিট্রিয়াস হিউমার

৬. থাইরক্সিনে কোন উপাদান বিদ্যমান? [সি. বোর্ড-২০১৭]
ক আয়রন খ পটাসিয়াম গ ক্যালসিয়াম ঘ আয়োডিন

৭. শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে কোন স্নায়ু? [দি. বোর্ড-২০১৭]
ক অপটিক খ অকুলোমোটর গ অডিটরি ঘ ভ্যাগাস

৮. স্বাদ গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত স্নায়ু কোনটি? [রা. বোর্ড-২০১৭]
ক ফেসিয়াল খ ট্রকলিয়ার গ অলফ্যাক্টরি ঘ অপটিক

৯. পরিস্ফুটনের সময় কোন হরমোন ফিটাসের ফুসফুস গঠনে সাহায্য করে? [কু. বোর্ড-২০১৭]
ক প্যারাথরমোন খ থাইমোসিন
গ গ্লুকোকর্টিকয়েড ঘ এড্রেনালিন

১০. কোন র‍্যাক্টাস পেশি অক্ষিগোলককে উপরের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে? [ঢা.বোর্ড-২০১৬]
ক মিডিয়াল খ ল্যাটারাল গ সুপিরিয়র ঘ ইনফিরিয়র

১১. ভিট্রিয়াস হিউমারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [ঢাকা বোর্ড-২০১৬]
ক অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে
খ লেন্স ও কর্নিয়ার পুষ্টি জোগায়
গ আইরশ ও লেন্সের মধ্যবর্তী গহ্বর
ঘ গহ্বরটি পানির মতো তরলে পূর্ণ

১২. V নং করোটিক স্নায়ুর নাম কী? [রা. সি. বোর্ড-২০১৯]
ক ট্রকলিয়ার খ অ্যাবডুসেন্স
গ অডিটরি ঘ ট্রাইজেমিনাল

১৩. রড কোষের অনুপস্থিতিতে চোখে কী ধরনের ত্রুটি দেখা যায়? [ঢা.বোর্ড-২০১৬]
ক অন্ধত্ব খ বর্ণান্ধতা গ রাতকানা ঘ মাইওপিয়া

১৪. মস্তিষ্কে কোন অংশের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি? [ঢা.বোর্ড-২০১৬]
ক সেরেব্রাম খ সেরেবেলাম
গ থ্যালামাস ঘ হাইপোথ্যালামাস

১৫. পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন কোনটি? [রা.বোর্ড-২০১৬]
ক STH খ TSH গ FSH ঘ ADH

১৬. নিচের কোনটি মিশ্র প্রকৃতির করোটিক স্নায়ু? [রা.বোর্ড-২০১৬]
ক অপটিক খ ট্রকলিয়ার গ অডিটরি ঘ ভেগাস

১৭. মানুষের চোখের আনুষঙ্গিক অংশ কোনটি? [চ.বোর্ড-২০১৯]
ক আইরিশ খ সিলিয়ারি বডি
গ কনজাংটিভা ঘ সাসপেন্সারি লিগামেন্ট

১৮. অষ্টম করোটিক স্নায়ুর কাজ কী? [য.বোর্ড-২০১৬]
ক স্বাদ খ দর্শন গ শ্রবণ ঘ ঘ্রাণ

১৯. মস্তিষ্কের কোন অংশ শ্বাস-প্রশ্বাস, স্পন্দনহার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে? [য.বোর্ড-২০১৬]
ক সেরেব্রাম খ সেরেবেলাম গ মেডুলা ঘ পনস

২০. কোন স্নায়ু অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে? [কু.বোর্ড-২০১৬]
ক ভ্যাগাস খ অ্যাবডুসেন্স গ ফ্যাসিয়াল ঘ অলফ্যাক্টরি

২১. মানব মস্তিষ্কে কয়টি ভেন্ট্রিকল আছে? [কু.বোর্ড-২০১৬]
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২২. কোন মেমব্রেন স্কালা ভেস্টিবুলি ও স্কালা মিডিয়াকে পৃথক করেছে? [কু.বোর্ড-২০১৬]
ক রেসনার'স খ টিমপেনিক
গ লোবিওলার ঘ বেসিলার

২৩. নালিবিহীন গ্রন্থি কোনটি? [কু.বোর্ড-২০১৬]
ক থাইমাস খ টনসিল গ ল্যাক্রিমাল ঘ প্যারোটিড

২৪. কোনটি মধ্যকর্ণের অস্থি? [কু.বোর্ড-২০১৬]
ক ইলিয়াম খ ম্যালিয়াস গ ইশ্চিয়াম ঘ পিউবিস

২৫. থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন নয় কোনটি? [চ.বোর্ড-২০১৬]
ক থাইরক্সিন
খ ক্যালসিটোনিন
গ থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন
ঘ ট্রাই আয়োডো থাইরোনিন

২৬. চোখের বাইরের সাদা, অস্বচ্ছ ও তন্তুময় স্তরটির নাম কী? [ব.,দি.বোর্ড-২০১৬]
ক কনজাংটিভা খ স্ক্লেরা গ কোরয়েড ঘ রেটিনা

২৭. নিচের কোনটির গঠন পেঁচানো? [ব.,দি..বোর্ড-২০১৬]
ক কর্ণছত্র খ অ্যাম্পুলা গ ইনকাস ঘ ককলিয়া

২৮. কোনটি ১০ম করোটিক স্নায়ুর শাখা? [ব.দি.বোর্ড-২০১৬]
ক প্যালেটাইন খ পালমোনারি
গ ম্যাক্সিলারি ঘ ম্যান্ডিবুলার

২৯. কোনটি চেষ্টায় স্নায়ু? [সি.বোর্ড-২০১৬]
ক অপটিক খ ভেগাস গ অডিটরি ঘ অ্যাবডুসেন্স

৩০. কোনটি পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ? [য.বোর্ড-২০১৯]
ক সেরেব্রাম খ থ্যালামাস
গ হাইপোথ্যালামাস ঘ সেরেবেলাম

৩১. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি কোন অঙ্গের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত? [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫]
ক মস্তিষ্ক খ ট্রাকিয়া গ যকৃৎ ঘ বৃক্ক

৩২. কোনটি মিশ্র স্নায়ু? [বরিশাল বোর্ড-২০১৬]
ক অকুলোমোটর খ ট্রকলিয়ার গ অডিটরি ঘ ভেগাস

৩৩. কর্পাস ক্যালোসাম যুক্ত থাকে?
ক দুটি গুরুমস্তিষ্কের গোলার্ধে
খ মেডুলা এবং লঘু মস্তিষ্কে
গ দুটি লঘুমস্তিষ্কের গোলার্ধে
ঘ পনস এবং লঘু মস্তিষ্কে

Scanned with CamScanner

৩৪. মানুষের হৃৎস্পন্দন ও রক্তচাপ বৃদ্ধিকারী হরমোন কোনটি? [চ.বোর্ড-২০১৯]
ক গ্লুকোকর্টিকয়েড খ অ্যাড্রেনালিন
গ ইস্ট্রোজেন ঘ ভেসোপ্রেসিন

৩৫. চোখের রেটিনায় কয় ধরনের কোষ থাকে?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৩৬. ককলিয়ার রেসনার ঝিল্লি ও বেসিলার ঝিল্লি দ্বারা আবৃত প্রকোষ্ঠটির নাম কী? [ঢা.বোর্ড-২০১৫]
ক স্ক্যালামিডিয়া খ স্ক্যালাভেস্টিবুলি
গ স্ক্যালাটিম্পেনি ঘ হেলিকোট্রিমা

৩৭. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয়? [ঢা.বোর্ড-২০১৫]
ক হরমোন নিঃসৃত করে খ নিঃসৃত পদার্থটি প্রোটিন
গ কার্যাবলি দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী ঘ কার্যাবলি ধীর ও দীর্ঘস্থায়ী

৩৮. দুইটি চোখের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সাইনাসের নাম কী? [ঢা.বোর্ড-২০১৫]
ক ম্যাক্সিলারি সাইনাস খ ফ্রন্টাল সাইনাস
গ এথময়ডাল সাইনাস ঘ সেফনয়ডাল সাইনাস

৩৯. সিনাপটিক নবে কোন আয়ন প্রবেশ করলে অ্যাসিটাইল কোলিনমুক্ত হয়ে সিনাপটিক ক্লেফট এ বেরিয়ে আসে? [ঢা.বোর্ড-২০১৫]
ক Ca^{2+} খ Na^{+} গ K^{+} ঘ Cl^{-}

৪০. মানুষের জৈব ঘড়ি নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের কোন অংশ? [ঢা.বোর্ড-২০১৫]
ক সেরেব্রাম খ সেরেবেলাম
গ থ্যালামাস ঘ হাইপোথ্যালামাস

৪১. বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি করে কোনটি?
ক রেটিনা খ কর্নিয়া গ স্ক্লেরা ঘ আইরিশ

৪২. কোন হরমোন কম ক্ষরণ হলে গলগণ্ড রোগ হয়? [কু.বোর্ড-২০১৫]
ক ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন খ ক্যালসিটোনিন
গ অক্সিটোসিন ঘ থাইরক্সিন

৪৩. উদ্দীপকের গ্রাহক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সঠিক গতিপথ কোনটি? [কু. বোর্ড-২০১৫]
ক কর্নিয়া → লেন্স → ভিট্রিয়াস হিউমার → অ্যাকুয়াস হিউমার → রেটিনা
খ কর্নিয়া → লেন্স → অ্যাকুয়াস হিউমার → ভিট্রিয়াস হিউমার→রেটিনা
গ কর্নিয়া → অ্যাকুয়াস হিউমার → লেন্স → ভিট্রিয়াস হিউমার → রেটিনা
ঘ কর্নিয়া → ভিট্রিয়াস হিউমার → লেন্স → অ্যাকুয়াস হিউমার → রেটিনা

৪৪. দেহের ভারসাম্য রক্ষার অনুভূতি গ্রহণ করে কত নম্বর স্নায়ুর মাধ্যমে? [রা.বোর্ড-২০১৫]
ক VII খ VIII গ IX ঘ X

৪৫. নিচের কোনটি হরমোন? [রা.বোর্ড-২০১৫]
ক পেপসিন খ ট্রিপসিন গ ইনসুলিন ঘ টায়ালিন

৪৬. দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন কোনটি? [রা.বোর্ড-২০১৫]
ক সোমাটোট্রপিক খ থাইরক্সিন
গ প্রোল্যাকটিন ঘ অ্যাড্রিনালিন

৪৭. রোডোপসিন উপস্থিত থাকে কোন কোষে?
ক শিখা কোষে খ কোন কোষে
গ স্নায়ু কোষে ঘ বড় কোষে

৪৮. মানবদেহে পানি ও লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে কোন হরমোন? [য.বোর্ড-২০১৫]
ক ইনসুলিন খ প্যারাথরমোন
গ অ্যালডোস্টেরন ঘ এপিনেফরিন

৪৯. মানব চোখের অংশ কোনটি? [চ.বোর্ড-২০১৫]
ক হিমোসিল খ র‍্যাবডোম
গ পীতবিন্দু ঘ কর্নিয়াজেন কোষ

৫০. মস্তিষ্কের কোন অংশ পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে? [চ.বোর্ড-২০১৫]
ক হাইপোথ্যালামাস খ পিনিয়াল বডি
গ সেরিব্রাল হেমিস্ফেয়ার ঘ কর্পাস ক্যালোসাম

৫১. ওটিটিস মিডিয়া কোথায় দেখা যায়? [সি.বোর্ড-২০১৫]
ক নাকে খ ফুসফুসে গ চোখে ঘ কানে

৫২. মস্তিষ্কে ঘ্রাণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে কোন স্নায়ু? [ব. বোর্ড-২০১৫]
ক অকুলোমোটর খ ট্রাইজেমিনাল
গ হাইপোগ্লোসাল ঘ অলফ্যাক্টরী

৫৩. নিউরনের কোষদেহকে কী বলে?
ক মায়োলিন শিথ খ র‍্যানভিয়ারের পর্ব
গ সিন্যাপটিক নব ঘ নিউরোসাইটন

৫৪. নিচের কোনটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি? [ব.বোর্ড-২০১৫]
ক স্তনগ্রন্থি খ যকৃৎ
গ পিটুইটারি গ্রন্থি ঘ লালাগ্রন্থি

৫৫. টেস্টোস্টেরন হরমোনের কাজ কোনটি? [সি.বোর্ড-২০১৫]
ক ডিম্বাণু সৃষ্টি খ অ্যান্টিবডি সৃষ্টি
গ শুক্রাণু সৃষ্টি ঘ অমরা সৃষ্টি

৫৬. অষ্টম করোটিক স্নায়ু কোনটি? [সি.বোর্ড-২০১৫]
ক অলফ্যাক্টরি খ অডিটরি
গ ফেসিয়াল ঘ ট্রাইজেমিনাল

৫৭. হাইপো থ্যালামাসের কাজ কোনটি? [সি.বোর্ড-২০১৫]
ক ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ খ লালা ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ
গ হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ ঘ দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ

৫৮. পিউপিলের কাজ নিচের কোনটি? [সি.বোর্ড-২০১৫]
ক অ্যাকুয়াস হিউমার উৎপন্ন করা
খ ধূলিবালি থেকে চোখকে রক্ষা করা
গ চক্ষু গোলকের ভিতর আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা
ঘ লাইসোজাইম এনজাইম ক্ষরণ

৫৯. স্ক্লেয়ার স্বচ্ছ অংশের নাম কী? [দি.বোর্ড-২০১৫]
ক লেন্স খ কর্নিয়া গ আইরিস ঘ পিউপিল

৬০. মানুষের সুষুম্নাস্নায়ুর সংখ্যা কত জোড়া? [দি.বোর্ড-২০১৫]
ক ৩০ খ ৩১ গ ৩২ ঘ ৩৩

৬১. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি কোন অঙ্গের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত? [দি.বোর্ড-২০১৫]
ক মস্তিষ্ক খ ট্রাকিয়া গ যকৃৎ ঘ বৃক্ক



৬২. চিত্রে 'P' চিহ্নিত অংশটির নাম কী? [রা.বোর্ড-২০১৫]
ক পিউপিল খ আইরিশ
গ রেটিনা ঘ ফোবিয়া সেন্ট্রালিস

Scanned with CamScanner

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৩. মিশ্র করোটিক স্নায়ু হচ্ছে– [ঢা.বোর্ড-২০১৮]
i. অপটিক ii. ফেসিয়াল iii. ভেগাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৪. মানুষের চোখের অক্ষিগোলাকের অংশ– [ঢা. বোর্ড-২০১৭]
i. অক্ষিকোটির ii. লেন্স iii. প্রকোষ্ঠ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৫. উপযোজনের সময় চোখের মধ্যে ঘটে– [য. বোর্ড-২০১৭]
i. পিউপিলের হ্রাস ও বৃদ্ধি
ii. লেন্সের আকারে পরিবর্তন
iii. সিলিয়ারি পেশির সংকোচন ও প্রসারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৬. মানুষের মধ্যে কর্ণের অংশ– [দি. বোর্ড-২০১৭]
i. টিসপেনিক পর্দা ii. ইউস্টেশিয়ান নালি iii. কর্ণাস্থি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৭. পিটুইটারি গ্রন্থি নিয়ন্ত্রণ করে– [রা. বোর্ড-২০১৭]
i. সকল গ্রন্থির কর্মকাণ্ড
ii. শর্করা জাতীয় খাদ্যের বিপাক
iii. সোমাটোট্রাফিক হরমোন নিঃসরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৮. 'X' করোটিক স্নায়ু বিস্তৃত হয়– [ঢা. বোর্ড-২০১৯]
i. স্বরযন্ত্রে ii. হৃৎপিণ্ডে iii. জিহ্বাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৯. 'প্রভুগ্রন্থি' থেকে নিঃসৃত হয়– [রা. সি. বোর্ড-২০১৯]
i. ACTH ii. FSH iii. CT
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

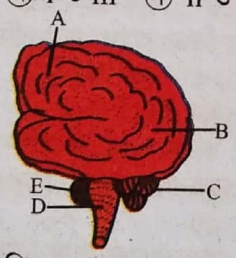

৭০. উদ্দীপকের স্মৃতি ও ভারসাম্য রক্ষায় ব্যবহৃত হয়– [চ.বোর্ড-২০১৫]
i. A ii. C iii. E
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭১. রডকোষ– [য.বোর্ড-২০১৯]
i. রডোপসিন নামক রঞ্জক পদার্থ সমৃদ্ধ
ii. আলোর প্রতি অধিক সংবেদনশীল
iii. রাতের দর্শনে ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭২ ও ৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

হরমোনের নাম	উৎস	কাজ
	বিটা কোষ	
'x'	আলফা কোষ	
পলিপেপটাইড	ডেলটা কোষ	পাক অন্ত্রীয় ক্ষরণ বৃদ্ধি করে

[ঢা.বোর্ড-২০১৬]

৭২. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক কোন গ্রন্থিকে নির্দেশ করে?
ক যকৃৎ খ অগ্ন্যাশয়
গ লালা গ্রন্থি ঘ আন্ত্রিক গ্রন্থি

৭৩. উদ্দীপকে 'x' চিহ্নিত যৌগটির কাজ কী?
ক রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে
খ রক্তে শর্করার পরিমাণ হ্রাস করে
গ ইনসুলিন ও গ্লুকাগন ক্ষরণে বাধা দেয়
ঘ রক্তে pH এর মান নিয়ন্ত্রণ করে

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[ঢা.বোর্ড-২০১৬]

৭৪. চিত্রের 'X' চিহ্নিত অংশটি মাথায় উন্মুক্ত হয়?
ক মুখবিবর খ গলবিল গ অন্ননালি ঘ পাকস্থলী

৭৫. 'X' চিহ্নিত অংশ সংক্রমিত হলে কোন রোগ হয়?
ক সাইনুসাইটিস খ ওটিটিস মিডিয়া
গ এমফাইসেমা ঘ অ্যারিথমিয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৬ ও ৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দীনা অসুস্থবোধ করায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলো। ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে তার দেহের তাপমাত্রা নির্ণয় করে দেখলেন এটি ১০৩°F ছাড়িয়ে গেছে। [চ.বোর্ড-২০১৬]

৭৬. দীনার মস্তিষ্কের কোন অংশ উদ্দীপ্ত হয়েছে?
ক থ্যালামাস খ হাইপোথ্যালমাস
গ সেরেবেলাম ঘ সেরিব্রাল হেমিস্ফেয়ার

৭৭. দীনার দেহের–
i. অতিরিক্ত তাপমাত্রা জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করবে
ii. প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরাস্ত হয়েছে
iii. পাইরোজেন ক্ষরণ বৃদ্ধি পেয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৭৮ ও ৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

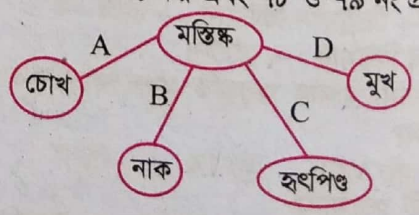

চিত্র : করোটিক স্নায়ু

৭৮. কোন স্নায়ুটি সবচেয়ে লম্বা? [য. বোর্ড-২০১৯]
ক A খ B গ C ঘ D

৭৯. চিত্রে প্রদর্শিত স্নায়ুগুলোর মধ্যে–
i. A হচ্ছে অপটিক স্নায়ু ii. C এর চারটি শাখা রয়েছে
iii. D এর উৎপত্তি মেডুলা অবলংগাটা হতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

Scanned with CamScanner

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮০ ও ৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পলাশ গ্রীষ্মকালে সারাদিন বিভিন্ন কাজে বাইরে ঘোরাফেরা করল। কিন্তু কোনো পানি পান করল না। সন্ধ্যায় দেখল যে তার গাঢ় হলুদ ও কম প্রস্রাব হলো। এক্ষেত্রে পলাশের মস্তিষ্কের একটি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন সহায়তা করল। [সি.বোর্ড-২০১৬]

৮০. উদ্দীপকে আলোচিত হরমোনটির নাম কী?
ক অক্সিটোসিন খ ভ্যাসোপ্রেসিন
গ কর্টিকোস্টেরন ঘ প্রোজেস্টেরন

৮১. উদ্দীপকের হরমোনটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. এটি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালমাস হতে উৎপন্ন হয়
ii. এটি উৎপাদন হ্রাস পেলে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস হয়
iii. এটি রক্ত ও দেহ তরলের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের চিত্রটি দেখে ৮২ ও ৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

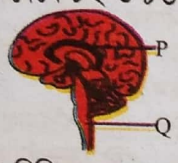

[সি.বোর্ড-২০১৬]

৮২. উদ্দীপকের P চিহ্নিত অংশের নাম কী?
ক কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা খ কর্পাস ক্যালোসাম
গ সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার ঘ সেরেবেলাম

৮৩. উদ্দীপকের Q চিহ্নিত অংশের কাজ হলো–
i. শ্বসন ii. লালাক্ষরণ iii. হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৪ ও ৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিক্ষক বললেন– মানুষের বৃক্কের উপর অবস্থিত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ছাড়াও ADH নামক হরমোন বৃক্কের কাজে সহায়তা করে। [দি.বোর্ড-২০১৬]

৮৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রন্থিটি–
i. দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে
ii. ভয়, আনন্দ ও শোক প্রকাশে ভূমিকা রাখে
iii. দেহরসের অভিস্রবণিক ঘনত্ব বজায় রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৫. উদ্দীপকে উল্লেখিত হরমোন–
i. গ্লোমেরুলাস এ পুনঃশোষণ করে
ii. দেহরসের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে
iii. লবণের মাত্রা বজায় রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৬ ও ৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
A→ নালাবিহীন গ্রন্থির ক্ষরণ যা রক্তে পরিবাহিত হয়
B→ নালিযুক্ত গ্রন্থির ক্ষরণ যা নালির মাধ্যমে পরিবাহিত হয় [য. বোর্ড-২০১৯]

৮৬. উদ্দীপকে 'B' হচ্ছে–
i. হরমোন ii. এনজাইম iii. লসিকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. নিচের কোন তথ্যটি সঠিক?
ক 'A' এর একটি উদাহরণ হলো পেপসিন
খ 'A' দেহের রাসায়নিক দূত হিসেবে সুপরিচিত
গ 'B' দূরবর্তী টার্গেট স্থলে কাজ করে
ঘ 'B' এর কাজের ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৮৮ ও ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিক্ষক মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্র পড়ানোর সময় বললেন– মানবদেহে ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু আছে, যার মধ্যে একজোড়া স্নায়ু আমাদের গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি আরও বললেন– চোখের সঞ্চালনে একাধিক করোটিক স্নায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। [ব. বোর্ড-২০১৯]

৮৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম জোড়া স্নায়ুর নাম কী?
ক ট্রাইজেমিনাল খ ভেগাস
গ স্পাইনাল অ্যাকসেসরি ঘ ট্রকলিয়ার

৮৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষোক্ত অঙ্গ নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুগুলি হলো–
i. অকুলোমোটর ii. ট্রাইজেমিনাল iii. অ্যাবডুসেন্স
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯০ ও ৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানবদেহের গ্রন্থিসমূহ সনালি, অনালি কিংবা মিশ্র প্রকৃতির হতে পারে। এইসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস দেহের বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক কাজে সহায়তা করে থাকে। [ঢা.বোর্ড-২০১৮]

৯০. নিচের কোনটি প্রথমোক্ত ধরনের গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়?
ক অক্সিটোসিন খ রেনিন
গ মেলাটোনিন ঘ অ্যাডরেনালিন

৯১. উদ্দীপকের দ্বিতীয় প্রকার গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত উপাদানের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য–
i. রক্তে প্রবাহিত হয় ii. ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকে না
iii. স্বল্প ঘনত্বে কার্যকর নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯২. স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়– [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক এক্টোডার্ম থেকে খ মেসোডার্ম থেকে
গ এন্ডোডার্ম থেকে ঘ এক্টো ও মেসোডার্ম থেকে

৯৩. নিচের কোনটি মেনিনজেসের অংশ নয়? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক ড্যুরা ম্যাটার খ অ্যারাকনয়েড ম্যাটার
গ পায়া ম্যাটার ঘ হোয়াইট ম্যাটার

৯৪. নিম্নের কোনটি সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের কাজ নয়? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক শরীরের ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রণ করা
খ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরনে পুষ্টি পদার্থ সরবরাহ করা
গ সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা
ঘ শ্বসনিক গ্যাসের বিনিময় ঘটানো

৯৫. যেটি স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত নয়? [মেডিকেল : ১২-১৩]
ক রেটিনা খ এপিনেফ্রিন গ মেলানিন ঘ গ্লাইসিন

৯৬. কোন এনজাইম স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ খ মেটালোপ্রোটিন কাইনেজ
গ ক্ষারীয় ফসফাটেজ ঘ লাইসোজাইম

৯৭. অ্যাসিটাইল কোলিন এস্টারেজ ভূমিকা রাখে– [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে খ সংশ্লেষে
গ স্নায়ু উদ্দীপনা বহনে ঘ ফসফরাস বিপাকে

৯৮. কোনটি মানুষের পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ নয়? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক মেডুলা অবলংগাটা খ পনস্
গ সেরেবেলাম ঘ থ্যালামাস

Scanned with CamScanner

৯৯. কোনটি সেরেব্রামের কাজ নয়? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক বুদ্ধিবৃত্তি খ ইচ্ছাশক্তি
গ স্মৃতিশক্তি ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসের হার

১০০. প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা কত? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক ১০ মিলিয়ন খ ১০ কোটি গ ১০ বিলিয়ন ঘ ১০ লক্ষ
[বি. দ্র. : সঠিক উত্তর : ১০০ বিলিয়ন (১ লক্ষ কোটি)]

১০১. সেরেব্রামের দুটি খণ্ডকে সংযোগকারী স্নায়ু গুচ্ছের নাম– [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক কর্পাস অ্যালবিকান্স খ কর্পাস অ্যাটোটিকাম
গ কর্পাস ক্যালোসাম ঘ কর্পাস লুটিয়াম

১০২. শ্বসন কেন্দ্র অবস্থিত কোথায়? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক সেরিবেলাম খ স্নায়ুরজ্জু
গ পনস্ ঘ মধ্যমস্তিষ্ক

১০৩. মস্তিষ্কের কোন অংশে ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র অবস্থিত? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক সেরেব্রাম খ থ্যালামাস
গ হাইপোথ্যালামাস ঘ সেরেবেলাম

১০৪. ডায়েনসেফালনের মধ্যস্থ গহ্বরটিকে কী বলে? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক প্রথম ভেন্ট্রিকল খ দ্বিতীয় ভেন্ট্রিকল
গ তৃতীয় ভেন্ট্রিকল ঘ চতুর্থ ভেন্ট্রিকল

১০৫. সেরেবেলাম- এর কাজ কোনটি? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ জাগানো
খ দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ
গ দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে
ঘ স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ

১০৬. মস্তিষ্কে সম্পর্কে নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক? [মেডিকেল : ১৩-১৪]
ক হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সেরিবেলাম থাকে
খ পরিপাক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র মেডুলা অবলংগাটায় থাকে
গ স্মৃতিশক্তি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হাইপোথ্যালামাসে থাকে
ঘ চলনে সমন্বয় সাধন করে থ্যালামাস

১০৭. নিম্নের কোনটি দেহের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে না? [মেডিকেল : ১২-১৩]
ক অন্তঃকর্ণ খ সেরিবেলাম
গ হাইপোথ্যালামাস ঘ ভেস্টিব্যুলার স্নায়ু

১০৮. মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য কোনটি একান্ত প্রয়োজন? [মেডিকেল : ১২-১৩]
ক গ্লুকোজ খ মল্টোজ
গ গ্যালাকটোজ ঘ ল্যাকটোজ

১০৯. মল-মূত্র ত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের নিম্নের কোন অংশে? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক পন্স খ থ্যালামাস
গ হাইপোথ্যালামাস ঘ মেডুলা অবলঙ্গাটা

১১০. নিচের কোনটি হাইপোথ্যালামাসের কাজ? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক ঐচ্ছিক চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা
খ অম্ল ও ক্ষারের সাম্যতা রক্ষা করা
গ দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করা
ঘ দেহের ভারসাম্য রক্ষ করা

১১১. মানুষের সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট নিম্নের কত মি.মি. লম্বা? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক 20 খ 10 গ 25 ঘ 15

১১২. নিম্নে উল্লিখিত মস্তিষ্কের কোন অংশে ঐচ্ছিক চলন নিয়ন্ত্রণ করে? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক সেরেব্রাম খ সেরিবেলাম গ পন্স ঘ মেডুলা

১১৩. নিম্নের কোনটি অগ্র মস্তিষ্কের অংশ নয়? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক সেরেব্রাম খ সেরিবেলাম
গ থ্যালামাস ঘ হাইপোথ্যালামাস

১১৪. আবেগ, উদ্বেগ প্রভৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে– [মেডিকেল : ০৬-০৭]
ক হাইপোথ্যালামাস খ সেরেব্রাম
গ কর্পাস ট্রায়েটাম ঘ থ্যালামাস

১১৫. হাইপোথ্যালামাসের কাজ কোনটি? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে
খ ঐচ্ছিক চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে
গ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে
ঘ চলাফেরার দিক নির্ধারণ করে

১১৬. নিম্নের কোনটি সেরিবেলামের কাজ নয়? [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক ঐচ্ছিক চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে
খ ঐচ্ছিক পেশির পেশিটান নিয়ন্ত্রণ করে
গ চলাফেরার দিক নির্ধারণ করে
ঘ স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে

১১৭. মস্তিষ্কের যে অংশে বুদ্ধিমত্তা থাকে– [ডেন্টাল : ০২-০৩]
ক অগ্র করয়েড প্লেক্সাস খ সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার
গ সেরিবেলাম ঘ মেডুলা অবলংগাটা

১১৮. মেডুলা অবলঙ্গাটা মস্তিষ্কের যার অংশ? [মেডিকেল: ০২-০৩]
ক রোম্বেনসেফালন খ ডায়েনসেফালন
গ মেসেনসেফালন ঘ সেরেব্রার পেডাঙ্কল

১১৯. মস্তিষ্কের চতুর্থ গহ্বর যেখানে অবস্থিত– [ডেন্টাল: ০০-০১]
ক ডায়েনসেফালন খ মেসেনসেফালন
গ মেডুলা অবলংগাটা ঘ রোম্বেনসেফালন

১২০. করোটিক স্নায়ুর কাজ সম্পর্কিত নিচের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক ট্রকলিয়ার-অক্ষিগোলকের সঞ্চালন
খ ফ্যাসিয়াল-মুখের অভিব্যক্তি
গ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল-গলবিলের সঞ্চালন
ঘ হাইপোগ্লোসাল-স্বাদ গ্রহণ

১২১. জিহ্বা থেকে স্বাদের অনুভূতি গ্রহণ করে কোন স্নায়ু? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক অকুলোমোটর স্নায়ু খ গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল স্নায়ু
গ অপটিক স্নায়ু ঘ ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু

১২২. পূর্ণ সংবেদী স্নায়ু নয় কোনটি? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক অলফ্যাক্টরি স্নায়ু খ ফেসিয়াল স্নায়ু
গ অডিটরি স্নায়ু ঘ অপটিক স্নায়ু

১২৩. মানুষের জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে কোন করোটিক স্নায়ু? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক ফেসিয়াল স্নায়ু খ হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু
গ অপটিক স্নায়ু ঘ অকুলোমোটর স্নায়ু

১২৪. পাকস্থলীতে কোন করোটিক স্নায়ুর কার্যক্রম বিদ্যমান? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক অপটিক খ অডিটরি
গ ভেগাস ঘ আকুলোমোটর

১২৫. মানুষের নবম জোড়া করোটিক স্নায়ুর নাম কী? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক হাইপোগ্লোসাল খ স্পাইনাল অ্যাকসেসরি
গ অ্যাবডুসেন্স ঘ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল

১২৬. মোটর প্রকৃতির স্নায়ু কোনটি? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক হাইপোগ্লোসাল খ ফেসিয়াল
গ ভেগাস ঘ অপথ্যালমিক

Scanned with CamScanner

১২৭. নিম্নের কোন তথ্যটি হাইপোগ্লোসাল স্নায়ুর জন্য সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক উৎস : মেডুলা অবলাঙ্গাটার অঙ্কীয় দেশ
খ বিস্তার : জিহ্বা
গ প্রকৃতি : সংবেদী
ঘ কাজ : জিহ্বার সঞ্চালন

১২৮. নিম্নের কোনটি দশম করোটিক স্নায়ু? [ডেন্টাল : ০৮-০৯]
ক গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল খ হাইপোগ্লোসাল
গ ট্রাইজেমিনাল ঘ ভেগাস

১২৯. নিম্নের কোন করোটিক স্নায়ু চোয়ালের সঞ্চালনে সাহায্য করে? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক ট্রাইজেমিনাল খ ফেসিয়াল
গ হাইপোগ্লোসাল ঘ গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল

১৩০. নিম্নের কোন করোটিক স্নায়ু ঘ্রাণের সঙ্গে জড়িত? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক অলফ্যাক্টরি খ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল
গ হাইপোগ্লোসাল ঘ ট্রাইজেমিনাল

১৩১. কোন তথ্যটি ফেসিয়াল স্নায়ুর জন্য সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৫-০৬]
ক কাজ : লালাক্ষরণ ও অশ্রুক্ষরণে সহায়তা করে
খ উৎস : মেডুলা অবলঙ্গাটা
গ বিস্তার : মুখমণ্ডল, কর্ণপটহ ও নিম্ন চোয়াল
ঘ প্রকৃতি : চেষ্টীয়

১৩২. নিম্নের কোনটি খাঁটি সংবেদী করোটিক স্নায়ু নয়? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক অপটিক স্নায়ু খ অলফ্যাক্টরি স্নায়ু
গ অকুলোমোটর স্নায়ু ঘ অডিটরি স্নায়ু

১৩৩. দ্বিতীয় করোটিক স্নায়ু কোনটি? [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক ভেগাস খ ট্রাইজেমিনাল
গ অপটিক ঘ ফেসিয়াল

১৩৪. চোখের রেটিনার ভিতর সবচেয়ে আলোক সংবেদী অংশের নাম কী? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক অন্ধ বিন্দু খ আলোক বিন্দু
গ পীত বিন্দু ঘ সাদা বিন্দু

১৩৫. চোখের লেন্স ও রেটিনার মধ্যে অবস্থান করে নিচের কোনটি? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক ভিট্রিয়াস হিউমার খ হিমোসিল
গ কর্ণিয়া ঘ অ্যাকুয়াস হিউমার

১৩৬. চোখের স্ক্লেরার রঙ কী? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক কালো খ সাদা গ হালকা হলুদ ঘ লাল

১৩৭. চোখের রেটিনার যে অংশ আলোক সংবেদী নয়– [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক পীত বিন্দু খ অপটিক বিন্দু
গ ফোবিয়া সেন্ট্রালিস ঘ অন্ধ বিন্দু

১৩৮. পিউপিলের অবস্থান কোথায়? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক আইরিসের মধ্যবর্তী স্থানে খ রেটিনার পশ্চাতে
গ কোরয়েডের নিচে ঘ আইরিসের পশ্চাতে

১৩৯. কোনটি অক্ষি পেশি নয়? [মেডিকেল : ১২-১৩]
ক এক্সটারনাল অবলিক খ সুপিরিয়র রেক্টাস
গ ইন্টারনাল অবলিক ঘ এক্সটারনাল রেক্টাস

১৪০. মেলানিন রঞ্জকে রঞ্জিত স্তর নিম্নের কোনটি? [মেডিকেল: ১০-১১]
ক কোরয়েড খ সিলিয়ারি বডি
গ সাসপেন্সরি লিগামেন্ট ঘ স্ক্লেরা

১৪১. নিম্নের কোনটি চোখের একমাত্র আলোক সংবেদী অংশ? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক পিউপিল খ আইরিশ গ রেটিনা ঘ অন্ধবিন্দু

১৪২. নিম্নের কোনটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে নাইট্রোজেন নিঃসৃত হয়
খ ডিম্বাশয় থেকে কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন নিঃসৃত হয়
গ অ্যামাইনো এসিড আমিষের গঠনমূলক একক
ঘ চোখের অগ্র প্রকোষ্ঠ অ্যাকুয়াস হিউমার দিয়ে পূর্ণ থাকে

১৪৩. নিম্নের কোনটি চোখের কোরয়েড এর অংশ? [ডেন্টাল:০৮-০৯]
ক রেটিনা খ আইরিশ
গ পিউপিল ঘ সিলিয়ারি বডি

১৪৪. নিম্নে উল্লেখিত চোখের কোন অংশ বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক কর্ণিয়া খ পিউপিল গ রেটিনা ঘ লেন্স

১৪৫. কোন উক্তিটি সত্য নয়? [মেডিকেল : ০৬-০৭]
ক তরুণাস্থিতে অবস্থিত ল্যাকুনাগুলো তরলে পূর্ণ থাকে
খ রেটিনার রড কোষগুলি উজ্জ্বল আলোকে সংবেদী
গ হাইড্রার নেমাটোসিস্টের মধ্যে স্টিনোটিল বৃহত্তম
ঘ অলিন্দের ডায়াস্টোল এবং নিলয়ের সিস্টোল এর সময় ট্রাইকাসপিড এবং বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ থাকে

১৪৬. কোনটি অক্ষিপেশি নয়? [মেডিকেল : ০৬-০৭]
ক এক্সটার্নাল অবলিক খ এক্সটার্নাল রেক্টাস
গ সুপিরিয়র রেক্টাস ঘ সুপিরিয়র অবলিক

১৪৭. নিম্নের কোনটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৫-০৬]
ক কনজাংক্টিভা চোখকে ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে
খ করোটিক স্নায়ু ১২ জোড়া
গ অডিটরি স্নায়ু চেষ্টীয়
ঘ কর্নিয়া ও আইরিসের মধ্যবর্তী সম্মুখ প্রাকোষ্ঠ অ্যাকুয়াসে হিউমারে পূর্ণ থাকে

১৪৮. হার্ডেরিয়ান গ্রন্থির অবস্থান যেখানে– [মেডিকেল : ০১-০২]
ক অ্যাড্রেনাল খ ক্ষুদ্রান্ত্র
গ অগ্ন্যাশয় ঘ চক্ষু

১৪৯. মানবদেহের ভারসাম্য নিচের কোনটি রক্ষা করে? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক বহিঃকর্ণ খ অন্তঃকর্ণ
গ মধ্যকর্ণ ঘ নাসাগলবিল

১৫০. নিম্নের কোনটি বহিঃকর্ণে থাকে? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক ককলিয়া খ স্টেপিস গ পিনা ঘ ইনকাস

১৫১. নিম্নের কোনটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক ভেস্টিবুলার স্নায়ু মানুষকে শ্রবণে সাহায্য করে
খ অনালি গ্রন্থির রস রক্ত দ্বারা বাহিত করে
গ গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত হয়
ঘ রেডিয়াস এবং আলনার সন্ধি একটি সাইনোভিয়াল সন্ধি

১৫২. নিম্নের কোনটি শরীরের ভারসাম্য রক্ষ করে? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক অর্গান অব কর্টি খ ভেস্টিবুলার যন্ত্র
গ ককলিয়া ঘ ইনকাস

১৫৩. কোনটি মানুষের কানের ক্যুপুলার কাজ? [মেডিকেল: ০৫-০৬]
ক শব্দ তরঙ্গ প্রেরণ করা খ ভারসাম্য রক্ষা করা
গ ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা ঘ বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করা

১৫৪. কর্ণাস্থি স্টেপিস, অন্তঃকর্ণ ও মধ্যবর্তী প্রাচীরে যে পর্দার সঙ্গে যুক্ত থাকে সেটি হলো– [মেডিকেল : ০০-০১]
ক কর্ণপটহ খ আম্বু
গ ফ্যানেস্ট্রা রোটান্ডা ঘ ফ্যানেস্ট্রা ওভালিস

১৫৫. মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অনাল গ্রন্থি কোনটি? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক থাইরয়েড খ শুক্রাশয় গ পিটুইটারি ঘ সুপ্রারেনাল

Scanned with CamScanner

১৫৬. নিচের কোনটি মিশ্র গ্রন্থির উদাহরণ নয়? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক ডিম্বাশয় খ এড্রেনাল গ্রন্থি
গ অগ্নাশয় ঘ অন্ত্রীয় গ্রন্থি

১৫৭. মানব দেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফসরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে কোন গ্রন্থি? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক থাইমাস খ থাইরয়েড
গ প্যারাথাইরয়েড ঘ অ্যাড্রেনালিন

১৫৮. নিচের কোনটি মিশ্র গ্রন্থি নয়? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক অগ্ন্যাশয় খ শুক্রাশয়
গ ডিম্বাশয় ঘ এড্রেনাল গ্রন্থি

১৫৯. কোনটি মিশ্র গ্রন্থি? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক প্যারোটিডস খ সোয়েট গ অগ্ন্যাশয় ঘ অশ্রু

১৬০. নিম্নের কোনটি মিনারেলোকর্টিকয়েড হরমোন কাজ নয়? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক বৃক্কের NaCl ও পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
খ K^+ রেচন হার বৃদ্ধি করা
গ রক্তের প্লাজমার পরিমাণ বৃদ্ধি করা
ঘ হৃৎক্রিয়া বৃদ্ধি করা

১৬১. কোন গ্রন্থির ক্ষরণকাল আজীবন নয়? [মেডিকেল : ১২-১৩]
ক সুপ্রেনাল খ পিনিয়াল গ থাইমাস ঘ টেসটিস

১৬২. পিটুইটারি গ্রন্থি সম্পর্কে কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ১১-১২]
ক এটি হাইপোথ্যালামাসের সঙ্গে সংযুক্ত
খ এটি তিনদিক থেকে অস্থি দ্বারা আবৃত
গ এটি থেকে স্টেরয়েড হরমোন নিঃসৃত হয়
ঘ এটি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত

১৬৩. নিম্নের কোন গ্রন্থি মোমের মতো আঠালো পদার্থ তৈরি করে? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক সিবেসিয়াস খ সেরুমিনাস
গ লালাগ্রন্থি ঘ মিবোমিয়ান

১৬৪. নিম্নের কোনটি এককোষী গ্রন্থি? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক গবলেট খ অগ্ন্যাশয় গ লালা ঘ যকৃৎ

১৬৫. নিম্নের কোনটি হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের শক্তিকে বাড়ায়? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক ইনস্যুলিন খ ভেগাস
গ এড্রেনালিন ঘ প্যারাথরমোন

১৬৬. পোস্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে নিম্নের কোন হরমোন নিঃসরণ হয়? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক অক্সিটোসিন খ ল্যুটিনাইজিং হরমোন
গ ক্যালসিটোনিন ঘ সোমাটোট্রপিন

১৬৭. নিম্নের কোন হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় না? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক থাইমোক্রাইসিন খ থাইরক্সিন
গ ক্যালসিটোনিন ঘ ট্রাই–আয়োডো–থাইরোনিন

১৬৮. সিবাম নিম্নের কোন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক মিবেমিয়ান খ সিবেসিয়াস
গ সেরুমিনাস ঘ সাবলিঙ্গুয়াল

১৬৯. ইনসুলিন নিঃসৃত হয় নিম্নের কোনটি হতে? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক থাইমাস গ্রন্থি
খ পিনিয়াল গ্রন্থি
গ অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি
ঘ অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স

১৭০. নিচের কোন জোড়াটি লোকাল হরমোনের উদাহরণ? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক ইনসুলিন ও অ্যাড্রেনালিন
খ থাইরক্সিন ও সিক্রিটিন
গ সিক্রিটিন ও এন্টারোগ্যাস্ট্রিন
ঘ ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন

১৭১. রক্তে Na^+ ও K^+ এর সমতা রক্ষা করে কোন হরমোন? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক ইনসুলিন খ গ্লুকাগন
গ এড্রেনালিন ঘ অ্যালডোস্টেরন

১৭২. নিম্নের কোন হরমোন আয়নের সমতা রক্ষায় কাজ করে? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক প্রোজেস্টেরন খ গ্যাস্ট্রিন
গ থাইরক্সিন ঘ আলডোস্টেরন

১৭৩. হরমোনের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক হরমোন অনালি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়
খ হরমোন রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়
গ হরমোন প্রধানত এক প্রকার শর্করা জাতীয় পদার্থ
ঘ হরমোন কার্যের শেষে নষ্ট হয়ে যায়

উত্তরমালা

১.(গ); ২.(গ); ৩.(খ); ৪.(ঘ); ৫.(খ); ৬.(ঘ); ৭.(গ); ৮.(ক); ৯.(গ); ১০.(গ); ১১.(ক); ১২.(ঘ); ১৩.(গ); ১৪.(ক); ১৫.(ঘ); ১৬.(ঘ); ১৭.(গ); ১৮.(গ); ১৯.(গ); ২০.(খ); ২১.(গ); ২২.(ক); ২৩.(ক); ২৪.(খ); ২৫.(গ); ২৬.(খ); ২৭.(ঘ); ২৮.(খ); ২৯.(ঘ); ৩০.(ঘ); ৩১.(ঘ); ৩২.(ঘ); ৩৩.(ক); ৩৪.(খ); ৩৫.(ক); ৩৬.(ক); ৩৭.(গ); ৩৮.(গ); ৩৯.(ক); ৪০.(ঘ); ৪১.(ক); ৪২.(ঘ); ৪৩.(গ); ৪৪.(খ); ৪৫.(গ); ৪৬.(ক); ৪৭.(ঘ); ৪৮.(গ); ৪৯.(গ); ৫০.(ক); ৫১.(ঘ); ৫২.(ঘ); ৫৩.(ঘ); ৫৪.(গ); ৫৫.(গ); ৫৬.(খ); ৫৭.(ঘ); ৫৮.(গ); ৫৯.(খ); ৬০.(খ); ৬১.(ঘ); ৬২.(ক); ৬৩.(গ); ৬৪.(গ); ৬৫.(ঘ); ৬৬.(গ); ৬৭.(খ); ৬৮.(ক); ৬৯.(ক); ৭০.(ক); ৭১.(ঘ); ৭২.(খ); ৭৩.(ক); ৭৪.(খ); ৭৫. (খ); ৭৬.(খ); ৭৭.(ঘ); ৭৮.(গ); ৭৯.(ঘ); ৮০.(খ); ৮১.(ঘ); ৮২.(খ); ৮৩.(ঘ); ৮৪.(ঘ); ৮৫.(ঘ); ৮৬.(খ); ৮৭.(খ); ৮৮. (গ); ৮৯.(খ), ৯০.(খ); ৯১.(ক); ৯২.(ক); ৯৩.(ঘ); ৯৪.(ক); ৯৫.(গ); ৯৬.(ক); ৯৭.(গ); ৯৮.(ঘ); ৯৯.(ঘ); ১০০.(*); ১০১.(গ); ১০২.(গ); ১০৩.(গ); ১০৪.(গ); ১০৫.(গ); ১০৬.(খ); ১০৭.(গ); ১০৮.(গ); ১০৯.(ঘ); ১১০.(গ); ১১১.(গ); ১১২.(খ); ১১৩.(খ); ১১৪.(ক); ১১৫.(ক); ১১৬.(ঘ); ১১৭.(খ); ১১৮.(ক); ১১৯.(গ); ১২০.(ঘ); ১২১.(খ); ১২২.(খ); ১২৩.(খ); ১২৪.(গ); ১২৫.(ঘ); ১২৬.(ক); ১২৭.(গ); ১২৮.(ঘ); ১২৯.(ক); ১৩০.(ক); ১৩১.(ঘ); ১৩২.(গ); ১৩৩.(গ); ১৩৪.(গ); ১৩৫.(ক); ১৩৬.(খ); ১৩৭.(ঘ); ১৩৮.(ক); ১৩৯.(খ,গ,ঘ); ১৪০.(ক); ১৪১.(গ); ১৪২.(খ); ১৪৩.(খ,গ,ঘ); ১৪৪.(গ); ১৪৫.(খ); ১৪৬.(ক,খ); ১৪৭.(গ); ১৪৮.(ঘ); ১৪৯.(খ); ১৫০.(গ); ১৫১.(ক); ১৫২.(খ); ১৫৩.(খ); ১৫৪.(ঘ); ১৫৫.(গ); ১৫৬.(খ); ১৫৭.(গ); ১৫৮.(ঘ); ১৫৯.(গ); ১৬০.(ঘ); ১৬১.(গ); ১৬২.(গ); ১৬৩.(খ); ১৬৪.(ক); ১৬৫.(গ); ১৬৬. (ক); ১৬৭.(ক); ১৬৮.(খ); ১৬৯.(ঘ); ১৭০.(গ); ১৭১.(ঘ); ১৭২.(ঘ); ১৭৩.(গ)।

Scanned with CamScanner

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে?
২. মস্তিষ্ক কী?
৩. মেডুলা অবলংগাটা কী?
৪. স্নায়ুকলা কী?
৫. নিউরন কী?
৬. নিউরোসাইটন কী?
৭. করোটিক স্নায়ু কী? [রা.বোর্ড-১৬, য.বোর্ড-১৭]
৮. সুষুম্না স্নায়ু কী?
৯. মেনিনজেস কী? [ঢা. বোর্ড-১৯]
১০. মেনিনজাইটিস কী?
১১. সুষুম্নাকাণ্ড কী?
১২. সিন্যাপস কী? [চ.বোর্ড-১৭]
১৩. ফোরামেন অব মনরো কী?
১৪. Aquiduct of sylvius কী?
১৫. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র কী?
১৬. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র কী?
১৭. মস্তিষ্কের দেহতাপ নিয়ন্ত্রণকারী অংশের নাম কী?
১৮. সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার কী?
১৯. সংবেদী অঙ্গ কী?
২০. পিউপিল কী?
২১. অন্ধবিন্দু কী? [রা. সি. ব. বো.-১৯; সি.বো.-১৭]
২২. উপযোজন কী? [কু. বো.-১৯; কু.,ঢা. চ. য.বো.-১৭, চ.বো.-১৬]
২৩. দ্বিনেত্র বা স্টেরিওস্কোপিক ও একনেত্র দৃষ্টি কী?
২৪. মায়োপিয়া কী?
২৫. হাইপারমেট্রোপিয়া কী?
২৬. নিকটিটেটিং পর্দা কী?
২৭. রেটিনা কী?
২৮. ইউস্টেশিয়ান নালি কী?
২৯. ককলিয়া কী?
৩০. অর্গান অব কর্টি কী?
৩১. হেলিকোট্রিমা কী?
৩২. গ্রন্থি কী?
৩৩. মিশ্র গ্রন্থি কী?
৩৪. বামনত্ব কী?
৩৫. হরমোন কী? [ব.বোর্ড-১৭]
৩৬. ট্রপিক হরমোন কী?
৩৭. লোকাল হরমোন কী?
৩৮. ইনসুলিন কী?
৩৯. ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভীতি ইত্যাদির স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্র কোনটি?
৪০. অতিকায়ত্ব কী?
৪১. গরিলাত্ব কী?
৪২. কুশিং সিনড্রোম কী?
৪৩. ক্রেটিনিজম কী?
৪৪. মিক্সিডিমা কী?
৪৫. গয়টার বা গ্রেভ বর্ণিত রোগ কী?
৪৬. টিটেনি কী?
৪৭. গ্লাইকোসুরিয়া কী?
৪৮. হাইপারগ্লাইসেমিয়া কী?
৪৯. হাইপোগ্লাইসেমিয়া কী?
৫০. পূর্ণরূপ লিখ : FSH, LH, LTH, TSH, GH, ACTH, ADH. [য.বোর্ড-১৭]

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. স্নায়ুতন্ত্র কী? এর কাজ লিখ।
২. স্নায়ুতন্ত্রের প্রকারভেদ ছকের মাধ্যমে দেখাও।
৩. নিউরোগ্লিয়া কী? এর কাজ লিখ।
৪. মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের নাম ও কাজ লিখ।
৫. মানুষের করোটিক স্নায়ুর নাম ধারাবাহিকভাবে লিখ।
৬. করোটিক স্নায়ুর উৎপত্তি, বিস্তার, প্রকৃতি ও কাজ লিখ।
৭. সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড কী? এর কাজ লিখ।
৮. মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল বলতে কী বুঝ?
৯. মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশের নাম ও কাজ লিখ।
১০. চোখের আনুষঙ্গিক অংশগুলো কী কী?
১১. চোখের পেশির নাম ও কাজ লিখ।
১২. অ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার বলতে কী বুঝ?
১৩. রড কোষ ও কোন কোষ কী?
১৪. অক্ষিগ্রন্থিগুলোর নাম ও কাজ লিখ।
১৫. মানুষের প্রতিবিম্ব গঠন ও দর্শন প্রক্রিয়া লিখ।
১৬. বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টি ক্ষীণ হয় কেন?
১৭. শ্রবণ কৌশলের প্রবাহচিত্র লিখ।
১৮. কানের বিভিন্ন অংশের নাম ও কাজ লিখ।
১৯. প্রভুগ্রন্থি কী?
২০. বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলতে কী বুঝ?
২১. হরমোনকে কেন Biological Catalyst বলা হয়?
২২. পিটুইটারি গ্রন্থিকে কেন প্রভুগ্রন্থি বলা হয়? [কু., ঢা.বোর্ড-১৭]
২৩. পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের নাম ও কাজ লিখ।
২৪. হৃৎস্পন্দনের সাথে জড়িত হরমোনের নাম, উৎপত্তি ও কাজ লিখ।
২৫. বায়োলজিকাল মটর বলতে কী বুঝ?
২৬. এনজাইম ও হরমোন বলতে কী বুঝ?
২৭. দেহের বৃদ্ধিতে হরমোনের প্রভাব লিখ।
২৮. আচরণ পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব লিখ।
২৯. অনিয়ন্ত্রিত হরমোনের ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ কর।
৩০. মেনিনজাইটিস কেন হয়? [সি. বোর্ড-১৭]
৩১. দ্বিনেত্র দৃষ্টি কী? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বোর্ড- ১৯; ব.বোর্ড-১৭; চ.বোর্ড-১৬]
৩২. রাসায়নিক দূত বলতে কী বুঝায়? [রা. সি. বোর্ড-১৯]
৩৩. ট্রপিক হরমোন বলতে কী বুঝায়? [ব. বোর্ড-১৯]

পার্থক্য লিখ/তুলনা কর :

৩৪. সেরেব্রাম ও সেরেবেলাম।
৩৫. করোটিক স্নায়ু ও সুষুম্না স্নায়।
৩৬. গ্রে-ম্যাটার ও হোয়াইট ম্যাটার।
৩৭. রড কোষ ও কোন কোষ।
৩৮. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি।
৩৯. হরমোন ও এনজাইম।

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। মানুষের বারো জোড়া করোটিক স্নায়ুর মধ্যে II (দুই) নং স্নায়ু এক বিশেষ অঙ্গে গমন করেছে। এটি তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত হলেও ভিতরের স্তরটিতে দুটি বিশেষ ধরনের কোষ থাকে। [ঢাকা বোর্ড-২০১৯]

ক. মেনিনজেস কী?
খ. দ্বিনেত্র দৃষ্টি কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ অঙ্গটির লম্বচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোষ দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২। নিচের ছক হতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

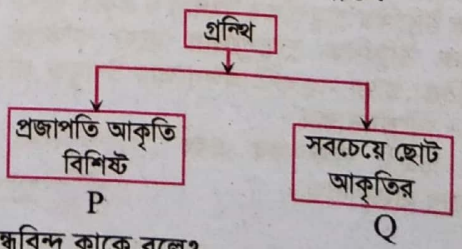

ক. অন্ধবিন্দু কাকে বলে?
খ. রাসায়নিক দূত বলতে কী বুঝায়?

Scanned with CamScanner

গ. উদ্দীপকের 'P' এর অনুপস্থিতিতে কী ঘটবে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ উদ্দীপকের 'Q' মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের জৈবিক কাজের নিয়ন্ত্রক– বিশ্লেষণ কর।

৩। পাশের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



[ঢাকা বোর্ড-২০১৭]

ক. উপযোজন কী?
খ. পিটুইটারি গ্রন্থিকে প্রভু গ্রন্থি বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' অংশটির গঠন বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কীভাবে শ্রবণে ভূমিকা পালন করে– বিশ্লেষণ কর।

৪। মস্তিষ্কে অবস্থিত সবচেয়ে ছোট শক্তিশালী গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থিটি দেহের অন্যান্য অংশে অবস্থিত গ্রন্থিগুলোর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. ককলিয়া কী?
খ. উপযোজন বলতে কী বুঝায়? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছোট গ্রন্থিটি কীভাবে অন্যান্য গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ক্ষরণ অনিয়ন্ত্রিত হলে যে সকল সমস্যা দেখা দিতে পারে তা বিশ্লেষণ কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]

৫। শিক্ষক ক্লাসে জীবকোষে রাসায়নিক বার্তাবাহী জৈব উপাদানের কথা বলেন যা মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এও বলেন এগুলো অনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় ব্যবহৃত হলে নানা জটিল অবস্থা দেখা দিতে পারে। [যশোর বোর্ড-২০১৭]

ক. করোটিকস্নায়ু কী?
খ. উপযোজন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের জৈব উপাদানের গুরুত্ব উল্লেখ কর।
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির যথাযথ বিশ্লেষণ কর।

৬। মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ হতে সৃষ্ট একজোড়া স্নায়ু দেহের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অস্থিসম্পন্ন একটি ইন্দ্রিয়ের অংশবিশেষ হতে উদ্দীপনা বহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে আসে। তখন মস্তিষ্ক বিভিন্ন পেশিকে নির্দেশদানের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়টির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

ক. ব্যারোরিসেপ্টর কী?
খ. মেনিনজাইটিস কেন হয়?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইন্দ্রিয়াংশটির গঠন বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটির উভয় ধরনের কাজেই ক্ষুদ্র অস্থিসমূহ কী ভূমিকা পালন করে? যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখ।

৭। মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হতে জোড়ায় জোড়ায় স্নায়ু উৎপত্তি লাভ করে করোটিকা ভেদ করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে। [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]

ক. হরমোন কী?
খ. 'দ্বিনেত্র দৃষ্টি' বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্নায়ুগুলোর উৎপত্তি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্নায়ুগুলোর মধ্যে কতিপয় স্নায়ুর কার্যকারিতা ছাড়া সংবেদী অঙ্গগুলোর উপযুক্ত প্রতিবেদন অসম্ভব– বিশ্লেষণ কর।

৮। পাশের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. বামনত্ব কী?
খ. বায়োলজিকাল মটর বলতে কী বুঝ?
গ. 'A' চিহ্নিত অংশের সংকোচন-প্রসারণে 'B' এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। [ঢাকা বোর্ড-২০১৬]
ঘ. উদ্দীপকের সাথে ঘাসফড়িং-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গের কার্যপদ্ধতির তুলনা কর। [ঢাকা বোর্ড-২০১৬]

৯। পাশের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

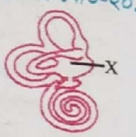

ক. ট্রপিক হরমোন কী?
খ. বায়োলজিকাল মটর বলতে কী বুঝ?
গ. 'X' চিহ্নিত অংশটির কাজ বর্ণনা কর। [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]
ঘ. অঙ্গটির গঠনগত প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শব্দ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম– বিশ্লেষণ কর। [কুমিল্লা বার্ড-২০১৬]

১০। মানবদেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নালিবিহীন কোষ বা কোষগুচ্ছ বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। এ তরল পদার্থ রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের দূরবর্তী স্থানে বিভিন্ন জৈবিক কাজ সম্পন্ন করে।

ক. অর্গান অব কর্টি কী?
খ. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের আলোকে দৈহিক বৃদ্ধি সাধনে ভূমিকা পালনকারী জৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ভয়াবহ হতে পারে– বিশ্লেষণ কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]

১১। পাশের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



[সিলেট বোর্ড-২০১৬]

ক. অন্ধবিন্দু কী?
খ. উপযোজন বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত অংশের গঠন ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের অঙ্গটির সার্বিক কার্যকলাপ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি– বিশ্লেষণ কর।

১২। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

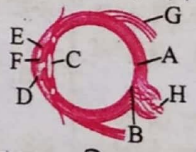

ক. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র কী?
খ. মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল বলতে কী বুঝ?
গ. সঠিক প্রতিবিম্ব সৃষ্টিতে উদ্দীপকের 'A', 'C' ও 'E' এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৫]
ঘ. উদ্দীপকে 'G' এর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে 'H' এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৫]

১৩। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

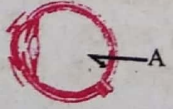

ক. পিউপিল কী?
খ. উপযোজন বলতে কী বুঝ? [যশোর বোর্ড-২০১৫]
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি খাতায় অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর? [যশোর বোর্ড-২০১৫]
ঘ. উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত অংশটি কীভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে– বিশ্লেষণ কর। [যশোর বোর্ড-২০১৫]

Scanned with CamScanner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়
মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

ঐতিহ্যে ৫১ বছর
কাজল প্রাদার্স লিমিটেড

Scanned with CamScanner

মানব জীবনের ধারাবাহিকতা
CONTINUATION OF HUMAN LIFE

অধ্যায় ৯

প্রজনন একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। জীবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রজনন অপরিহার্য। প্রজননের মাধ্যমে একটি জীব তার অনুরূপ এক বা একাধিক প্রজননক্ষম নতুন জীবের জন্ম দেয় এবং প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। যে পদ্ধতিতে জীব নিজের সত্তা ও আকৃতিবিশিষ্ট অপত্য জীব সৃষ্টি করে প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে, তাকে **প্রজনন** (Reproduction) বলে। জননে সাহায্যকারী অঙ্গগুলো মিলিত হয়ে যে তন্ত্র গঠিত হয়, তাকে **প্রজননতন্ত্র** (Reproductive System) বলে।




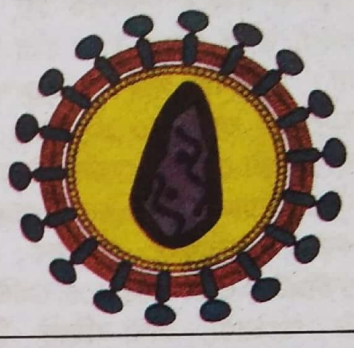

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ১১)
১. পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. গর্ভাবস্থায় করণীয় দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৫. আইভিএফ পদ্ধতির উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. প্রজননজনিত সমস্যাসমূহের প্রতিকার বিশ্লেষণ করতে পারবে। • যৌনবাহিত রোগসমূহের লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবে। • প্রজননজনিত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং এর সুস্থতা রক্ষায় সচেষ্ট হবে।	• পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া • স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া • প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা ○ রজঃচক্র ও বয়সন্ধিকাল ও এ সময়ের পরিবর্তনসমূহ ○ গ্যামেট সৃষ্টি, নিষেক, ইমপ্লান্টেশন ○ ভ্রূণ গঠন ও তিনটি ভ্রূনীয় স্তরের পরিণতি • গর্ভাবস্থা ও পরিচর্যা • গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ও পরিবার পরিকল্পনা • আইভিএফ পদ্ধতি-কৃত্রিম গর্ভধারণ ○ প্রজনন তন্ত্রের সমস্যা ○ পুরুষ ও নারী প্রজনন অক্ষমতা ○ পুরুষ ও নারী জনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা ○ ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় সমস্যা • যৌনবাহিত রোগ (সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস) লক্ষণ ও প্রতিকার

Scanned with CamScanner

৯.১ পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র (Male and Female Reproductive System)

পুরুষ প্রজননতন্ত্র (Male Reproductive System)

যে তন্ত্রের মাধ্যমে পুরুষের দেহে শুক্রাণু উৎপাদন, সঞ্চয়, পরিবহন এবং স্খলন ঘটে তাকে **পুরুষ প্রজননতন্ত্র** বলে। শুক্রাণু উৎপাদনের কাজে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে মুখ্য জননাঙ্গ এবং শুক্রাণু সঞ্চয়, পরিবহন ও স্খলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে **আনুষঙ্গিক** (accessory) জননাঙ্গ বলে। পুরুষের **মুখ্য** (primary) জননাঙ্গের নাম **শুক্রাশয়** (testis)। অন্যান্যগুলো **আনুষঙ্গিক জননাঙ্গ**।

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিম্নরূপ :

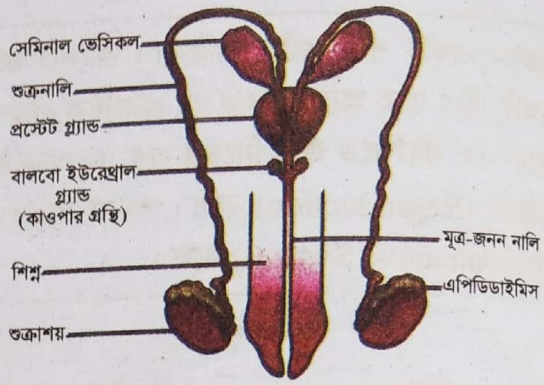

চিত্র ৯.১ক : পুংজননতন্ত্র (সম্মুখ দৃশ্য)

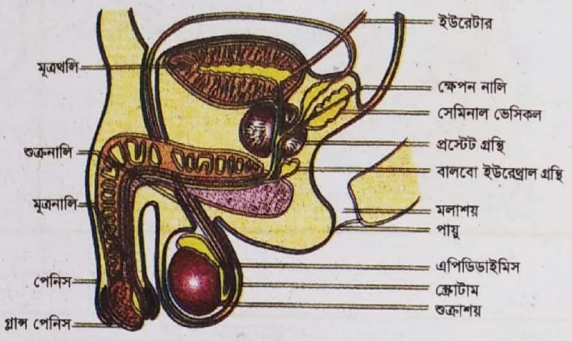

চিত্র ৯.১খ : পুংজননতন্ত্র (পার্শ্বদৃশ্য)

১। শুক্রাশয় (Testis) : পুরুষের দেহগহ্বরের বাইরে দুই উরুর মাঝে শুক্রাশয় দুটি **অণ্ডথলি** বা **স্ক্রোটাম** (scrotum) নামক থলির ভেতরে অবস্থান করে। শুক্রাশয় দুটি স্ক্রোটামে শুক্ররজ্জু দ্বারা একত্রিত অবস্থায় উপাঙ্গের মতো ঝুলে থাকে। ভ্রূণীয় বিকাশের সময় শুক্রাশয় উদরের **পেলভিক গহ্বরে** বিকশিত হয়, কিন্তু শিশু জন্মের সময় এগুলো উদর গহ্বর হতে বের হয়ে অণ্ডথলিতে অবস্থান নেয়। মানুষের পরিণত শুক্রাশয় অনেকটা ডিম্বাকার। শুক্রাশয়ের ওজন ১০-১২ গ্রাম। বাম দিকের স্ক্রোটাম বড় এবং কিছুটা ঝোলা। **মেসোরকিয়াম** (mesorchium) নামক পেরিটোনিয়াল পর্দা দ্বারা শুক্রাশয়দ্বয় আবৃত থাকে। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের শুক্রাশয় দৈর্ঘ্যে ৪-৬ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থে ২.৫ সেন্টিমিটার। প্রতিটি শুক্রাশয় ৩টি আবরণী, যথা-বহিঃস্থ **টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস** (tunica vaginalis), মধ্যস্থ **টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া** (tunica albuginea) ও অন্তঃস্থ **টিউনিকা ভাস্কুলোসা** (tunica vasculosa) দ্বারা আবৃত থাকে। শুক্রাশয়কে **বহিঃউদরীয় অঙ্গ** (extra-abdominal organ) বলা হয়, কারণ এতে দেহ তাপমাত্রার চেয়ে কম তাপমাত্রায় শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। মানুষের অণ্ডথলিতে **হাইড্রোসিলিক তরল** (hydrocoelic fluid) থাকে যা শুক্রাশয় দুটিকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে। অণ্ডথলিতে শুক্রাশয়ের তাপমাত্রা স্বাভাবিক দেহের তাপমাত্রা (37°C) অপেক্ষা 2°-4°C কম থাকে যা শুক্রাণু উৎপাদনের পক্ষে আদর্শ। প্রতিটি শুক্রাশয় অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পিরামিড সদৃশ কতগুলো প্রকোষ্ঠ বা খণ্ডকে বিভক্ত। এই খণ্ডগুলোর নাম **লোবিউলি টেসটিস** (lobules testis)। প্রকোষ্ঠগুলোতে অসংখ্য (প্রতিটি শুক্রাশয়ে প্রায় ১০০০টি) কুণ্ডলীকৃত শুক্র উৎপাদক নালিকা বা **সেমিনিফেরাস নালিকা** (seminiferous tube) থাকে যারা **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** বা **লেডিগ কোষে** (interstitial cells or Leydig cells) ডুবানো থাকে। শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকাগুলো **ভাসা ইফারেনসিয়া** (vasa efferentia) নামক সংগ্রাহক নালিকায় উন্মুক্ত হয়, সেগুলো আবার পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে **রেটিটেস্টিস** (retetestis) নামক শুক্রাশয় জালিকা গঠন করে। ভাসা ইফারেনসিয়াগুলো শুক্রাশয়ের শীর্ষদেশ থেকে বেরিয়ে **এপিডিডাইমিসে** (epididymis) প্রবেশ করে। সেমিনিফেরাস নালিকার অন্তঃপ্রাচীরের জার্মিনাল এপিথেলিয়ামে (germinal epithelium) **শুক্রাণু মাতৃকোষ** (spermatogenic cells) ও **সারটোলি কোষ** (sertoli cells) অবস্থিত। শুক্রাণু মাতৃকোষ থেকে **স্পার্মাটোজেনেসিস** (spermatogenesis) প্রক্রিয়ায় পুংগ্যামিট (শুক্রাণু) সৃষ্টি হয়। **সারটোলি কোষসমূহ বিকাশমান শুক্রাণুর পুষ্টি যোগায়**।এই ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়, যা পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে এবং শুক্রাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়।

কাজ : শুক্রাণু উৎপন্ন করা এবং **টেস্টোস্টেরন** হরমোন ক্ষরণ করা ।

২। এপিডিডাইমিস (Epididymis) : প্রতিটি শুক্রাশয়ের শীর্ষভাগে অবস্থিত পেঁচানো ভাসা ইফারেনসিয়াগুলোর সমন্বয়ে এপিডিডাইমিস গঠিত হয়। কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় টুপির ন্যায় এটি শুক্রাশয়ের উপরাংশে অবস্থান করে। এর শেষ প্রান্ত **শুক্রনালি** বা **ভাস ডিফারেন্স** (vas deferens) এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। পাক খোলা অবস্থায় এটি ৪–৫ মিটার লম্বা হয়।

কাজ : এটি শুক্রাণুকে মাসাধিক কাল সঞ্চিত রাখে। এখানে অবস্থানকালে শুক্রাণু পূর্ণতা লাভের জন্য পুষ্টি লাভ করে।

Scanned with CamScanner

৩। ভাস ডিফারেন্স (Vas deferens) : এপিডিডাইমিসের শেষ প্রান্তটি বড় গহ্বরযুক্ত যে নালিতে উন্মুক্ত হয় তাকে **শুক্রনালি** বা **ভাস ডিফারেন্স** বা **ডাক্টাস ডিফারেন্স** বলে। এই নালির দৈর্ঘ্য ৪০-৫০ সেন্টিমিটার । প্রতিটি শুক্রনালি **ইংগুইনাল** (inguinal) ছিদ্র দিয়ে শ্রোণিগহ্বরে প্রবেশ করে এবং মূত্রথলির উপর বেঁকে অবস্থান করে। প্রোস্টেট গ্রন্থিতে প্রবেশ করার পূর্বেই শুক্রনালির অংশ বিশেষ স্ফীত হয়ে **অ্যাম্পুলা** (ampulla) গঠন করে। অ্যাম্পুলা সেমিনাল ভেসিকলে যুক্ত হয়।

কাজ : এটি সঙ্গমের সময় শুক্রাণু দ্রুত পরিবহন করে এবং অল্প সময়ের জন্য শুক্রাণু জমা রাখে।

৪। সেমিনাল ভেসিকল (Seminal vesicle) : মূত্রথলি ও মলাশয়ের মধ্যস্থলে স্ফীত থলিকাবৎ নালিদ্বয় **সেমিনাল ভেসিকল** নামে পরিচিত। সেমিনাল ভেসিকল নিচের দিকে সরু হয়ে শুক্রনালির সাথে মিলিত হয়ে **ক্ষেপণনালি** বা **ইজাকুলেটরি ডাক্ট** (ejaculatory duct) তৈরি করে।

কাজ : এটি বীর্য বা **সিমেন** (semen) তৈরির জন্য পর্যাপ্ত পিচ্ছিল রস নিঃসৃত করে। ফ্রুক্টোজ সমৃদ্ধ এ রস শুক্রাণুর পুষ্টি যোগায়।

৫। ক্ষেপণনালি (Ejaculatory duct) : সেমিনাল ভেসিকল এবং শুক্রনালির অ্যাম্পুলা একীভূত হয়ে একটি অভিন্ন **ক্ষেপণনালি** গঠন করে। এ নালিটি **প্রস্টেট গ্রন্থির** (prostate gland) ভিতর দিয়ে **মূত্রনালিতে** (urethra) এসে মেলে।

কাজ : এর মাধ্যমে শুক্রাণুসহ ক্ষরণদ্রব্য ইউরেথ্রা বা মূত্রনালিতে আসে।

৬। মূত্রনালি বা ইউরেথ্রা (Urethra) : মূত্রথলি থেকে শিশ্নের (penis) মাথা পর্যন্ত দীর্ঘ নালাটিকে **মূত্রনালি** বলে। এটি প্রায় ২০ সেন্টিমিটার লম্বা। শিশ্নের মাথায় একটি ছিদ্রের মাধ্যমে এই নালিটি বাইরে উন্মুক্ত হয়। এটি রেচনতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্রের একটি সাধারণ নালি।

কাজ : এ নালির মাধ্যমে বীর্য দেহের বাইরে স্খলিত হয় এবং মূত্র নিষ্কাশিত হয়।

৭। প্রস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland) : মূত্রথলির নিচে এই গ্রন্থি অবস্থিত। এটি গ্রন্থিময় পেশি কলা সমৃদ্ধ ও নাসপাতি আকৃতির।

কাজ : এই গ্রন্থি থেকে দুধের ন্যায় ক্ষারীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়, যা বীর্যরসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে শুক্রাণু স্খলনে সহায়তা করে। এই রস pH নিয়ন্ত্রণ করে শুক্রাণুর চলনে সাহায্য এবং যোনির ভেতরের অম্লীয় অবস্থাকে প্রশমিত করে।

৮। কাওপার-এর গ্রন্থি বা বাল্বোইউরেথ্রাল গ্রন্থি (Cowper's gland or Bulbourethral glands) : এরা মূত্রনালি বা **ইউরেথ্রার** দু'পাশে অবস্থিত দুটি মটর দানার মতো ক্ষুদ্র গ্রন্থি। এদের থেকে দুটি খাটো নালিকা বেরিয়ে ইউরেথ্রায় মিলিত হয়।

কাজ : সঙ্গমকালে মিউকাসের মতো পিচ্ছিল পদার্থ ক্ষরণ করে যা যোনিপথকে পিচ্ছিল রাখে।

৯। শিশ্ন (Penis) বা **পুরুষাঙ্গ :** এটি পুরুষের নলাকার পেশিবহুল **বহিঃযৌনাঙ্গ** বা সঙ্গম অঙ্গ। এটি **কর্পোরা ক্যাভারনোসা** (corpora cavernosa) ও **কর্পোরা স্পনজিওসাম** (corpora spongiosum) নামক স্থিতিস্থাপক পেশি দিয়ে গঠিত। সমগ্র শিশ্ন ৩টি অংশে বিভক্ত, যথা– **শিশ্নমূল** (root of penis), **শিশ্নদেহ** (body of penis) এবং **শিশ্নমুণ্ড** বা **গ্লান্স পেনিস** (glans penis)। যে অংশ থেকে শিশ্ন উত্থিত হয় তাকে **শিশ্নমূল** বলে। সেখানে কয়েক গোছা চুল থাকে। উত্থানশীল কলার সমন্বয়ে এ অংশটি (শিশ্নমূল) গঠিত। শিশ্নের যে অংশ ঝুলায়মান এবং নলাকার তাকে **শিশ্নদেহ** বলে। শিশ্নদেহ দু'ধরনের **ইরেকটাইল** (erectile) টিস্যুতে গঠিত। এ টিস্যু দৃঢ় হলে শিশ্ন প্রসারিত হয়। শিশ্নের ডগায় লাল স্ফীত ব্যাঙের ছাতার ন্যায় অংশটির নাম **শিশ্নমুণ্ড**। **এখানে প্রচুর স্নায়ু বিদ্যমান**। শিশ্নমুণ্ড যে চামড়া দিয়ে আবৃত থাকে তাকে **প্রিপিউস** (prepuce) বলে (মুসলমান ও ইহুদী পুরুষের এ অংশটি কেটে ফেলা হয়)।

কাজ : সঙ্গমকালে শিশ্নের মাধ্যমে বীর্য স্ত্রী জননাঙ্গে প্রবিষ্ট হয়।



চিত্র ৯.২ক : শুক্রাশয়ের লম্বচ্ছেদ

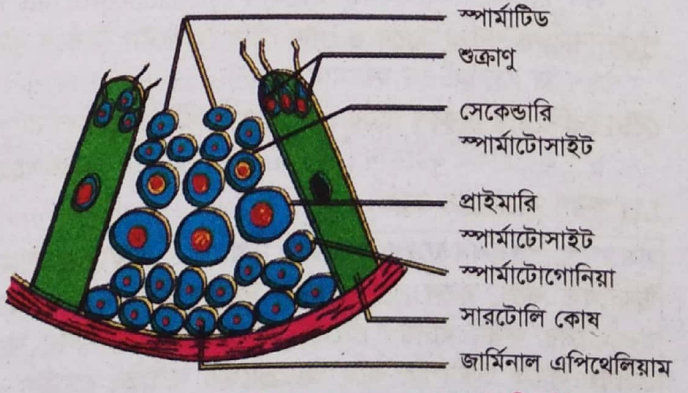

চিত্র ৯.২খ : শুক্রাশয়ের প্রস্থচ্ছেদের একাংশ বিবর্ধিত

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের প্রধান কাজ : (১) স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাশয়ে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। (২) শুক্রাশয়ের লেডিগের আন্তঃকোষ (interstitial cell of Leydig) থেকে পুং হরমোন **টেস্টোস্টেরন** (testosterone) ক্ষরিত হয়। (৩) যৌন মিলনকালে শিশ্নের মাধ্যমে শুক্রাণু স্ত্রীদেহের যোনিতে স্থানান্তরিত হয়।

Scanned with CamScanner

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের অংশসমূহ ও তাদের কাজের ছক

প্রকার	অংশসমূহ	প্রধান কাজ
মুখ্য জননাঙ্গ	শুক্রাশয়	শুক্রাণু উৎপন্ন করা এবং টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণ করা ।
গৌণ বা আনুষঙ্গিক জননাঙ্গ	এপিডিডাইমিস	শুক্রাণু সঞ্চয় করে এবং শুক্রাণুর পুষ্টি জোগায়।
	ভাস ডিফারেন্স	শুক্রাণু পরিবহন করে এবং অল্প সময়ের জন্য শুক্রাণু জমা রাখে।
	সেমিনাল ভেসিকল	শুক্রাণু সৃষ্টির জন্য পিচ্ছিল রস নিঃসৃত করে এবং শুক্রাণুর পুষ্টি যোগায়।
	ক্ষেপণনালি	শুক্রাণুসহ ক্ষরণদ্রব্য মূত্রনালিতে আসে।
	মূত্রনালি	মূত্র ও বীর্য দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত করে।
	প্রস্টেট গ্রন্থি	বীর্যরসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও শুক্রাণুর পুষ্টি জোগায়। যোনির ভেতরের অম্লীয় অবস্থাকে প্রশমিত করে।
	কাওপার-এর গ্রন্থি	সঙ্গমকালে পিচ্ছিল পদার্থ ক্ষরণ করে যোনিপথ পিচ্ছিল করে।
বহিঃজননাঙ্গ	শুক্রাশয় থলি বা স্ক্রোটাম	শুক্রাশয়ের আধার রূপে কাজ করে।
	শিশ্ন বা পুরুষাঙ্গ	সঙ্গমকালে দৃঢ় ও বর্ধিত হয়ে সঙ্গমে সাহায্য করে এবং এর মাধ্যমে বীর্য স্ত্রী জননাঙ্গে প্রবিষ্ট হয়।

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের হরমোনাল ক্রিয়া (Action of hormone on male reproductive system)

১। গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন (Gonadotrophin Releasing Hormone - GnRH) : GnRH মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত হয়ে পিটুইটারির অগ্রভাগকে উদ্দীপিত করে, ফলে FSH ও LH নিঃসৃত হয়। এছাড়া এটি টেস্টোস্টেরনের ক্ষরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে শুক্রাণু উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণ করে।

২। ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (Follicle Stimulating Hormone - FSH) : FSH পিটুইটারির অগ্রভাগ থেকে ক্ষরিত হয়। FSH সেমিনিফেরাস নালিকার বৃদ্ধি উদ্দীপিত করে এবং শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া অব্যাহত রাখে। এ ছাড়া FSH **সারটলি কোষের** (sertoli cell) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৩। লিউটিনাইজিং হরমোন (Luteinizing Hormone - LH) : LH পিটুইটারির অগ্রভাগ থেকে ক্ষরিত হয়। LH শুক্রাশয়ের লেডিগ কোষকে উদ্দীপিত করে টেস্টোস্টেরনের ক্ষরণ ঘটায়।

৪। টেস্টোস্টেরন (Testosterone) : শুক্রাশয়ে অবস্থিত **লেডিগ কোষ** (leydig cell) টেস্টোস্টেরন (testosterone) হরমোন ক্ষরণ করে। এই হরমোন পুরুষদেহে সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য এবং শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য দায়ী।

৫। লুটিওট্রফিক হরমোন (Luteotrophic Hormone - LTH) : পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত এই হরমোন গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ ঘটায়।

৬। গোনাডোকর্টিকয়েড হরমোন (Gonadocorticoid Hormone) : অ্যাডরেনাল গ্রন্থি নিঃসৃত এই হরমোন পুংজননাঙ্গের পূর্ণতা আনে ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

৭। অ্যান্ড্রোস্টেরন হরমোন (Androsteron Hormone) : শুক্রাশয় থেকে ক্ষরিত এই হরমোন পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং শুক্রাণু সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৮। ইনহিবিন হরমোন (Inhibin Hormone) : শুক্রাশয়ের সারটলি কোষ থেকে ক্ষরিত এই হরমোন GnRH ও LH ক্ষরণ মাত্রা হ্রাস করে।

সংক্ষেপে পুংজননতন্ত্রের হরমোন নিয়ন্ত্রণ : হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত GnRH পিটুইটারির অগ্রভাগকে উদ্দীপিত করে, ফলে LH ও FSH নিঃসৃত হয়। LH লেডিগের আন্তঃকোষগুলোকে উদ্দীপিত করে টেস্টোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ ঘটায়। টেস্টোস্টেরন শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে। অপরদিকে FSH সারটোলির কোষগুলোকে উদ্দীপিত করে **অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন** (ABP) ক্ষরণ করায়। ফলে সেমিনিফেরাস নালিকায় টেস্টোস্টেরন ঘনীভূত হয়। সারটোলির কোষ থেকে অপর একটি প্রোটিন হরমোন **ইনহিবিন** (inhibin) ক্ষরিত হয়, যা FSH সংশ্লেষকে অবদমিত করে।

❑ **কাজ :** পুরুষ প্রজননতন্ত্রের হরমোনের প্রভাব আলোচনা কর।

Scanned with CamScanner

ভাস ইফারেনসিয়া ও ভাস ডিফারেনসিয়ার পার্থক্য

ভাস ইফারেনসিয়া (Vas efferentia)	ভাস ডিফারেনসিয়া (Vas deferentia)
১। ভাস ইফারেনসিয়া রেটিটেস্টিস থেকে উৎপন্ন হয়।	১। ভাস ডিফারেনসিয়া কডা এপিডিডাইমিস থেকে উৎপন্ন হয়।
২। এগুলো সংখ্যায় ১৫-২০টি হয় (প্রতি শুক্রাশয়ের সাথে একাধিক থাকে)।	২। এরা সংখ্যায় ২টি হয় (প্রতি শুক্রাশয়ের সাথে ১টি থাকে)।
৩। এরা খুব সূক্ষ্ম।	৩। এরা অপেক্ষাকৃত পুরু।
৪। এগুলো সিলিয়েটেড কোষ পরিবৃত থাকে।	৪। এগুলো স্টিরিওসিলিয়া (stereocilia) পরিবৃত থাকে।
৫। এদের মাধ্যমে রেটিটেস্টিস থেকে অপরিপক্ব শুক্রাণু এপিডিডাইমিসে আসে।	৫। এদের মাধ্যমে পরিপক্ব শুক্রাণু এপিডিডাইমিস থেকে নিক্ষেপণ নালিতে আসে।
৬। রেটিটেস্টিস এবং এপিডিডাইমিসের মধ্যে অবস্থিত।	৬। প্রতিটি ভাস ডিফারেনসিয়া উদরীয় গহ্বরের দিকে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত ইউরেথ্রায় উন্মুক্ত হয়।

[প্রাসঙ্গিক তথ্য : **পুংজননতন্ত্রের ব্যাধি** (Disorders of male reproductive system)

বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারট্রফি (Benign Prostatic Hypertrophy-BPH) : প্রস্টেট গ্রন্থি বড় হয়ে অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। ফলে মূত্রনালির ওপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং মূত্রত্যাগে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। রাত্রিবেলায় ঘন ঘন মূত্রত্যাগ দেখা যায়। সময়মতো চিকিৎসা না হলে বৃক্কের ক্ষতি হতে পারে। অনেক সময় প্রস্টেট ক্যান্সার হতে দেখা যায়।

ক্রিপটরকিডিজম (Cryptorchidism) : শুক্রাশয় দুটি উদর গহ্বর থেকে স্ক্রোটামে নেমে না আসাকে ক্রিপটরকিডিজম বলে। ভ্রূণ অবস্থায় শুক্রাশয় থেকে টেস্টোস্টেরন ক্ষরণ কম হলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। শুক্রাশয় উদর গহ্বরে থেকে গেলে পুরুষ বন্ধ্যা হয়। অস্ত্রোপচার দ্বারা এ ত্রুটি দূর করা যায়।

হাইড্রোসিল (Hydrocoel) : শুক্রাশয়ের টিউনিকা ভ্যাজাইনালিসের মধ্যে অতিরিক্ত তরল সঞ্চিত হলে শুক্রাশয় দুটি স্ফীত হয়। তখন এই অবস্থাকে হাইড্রোসিল বলে। সাধারণত সদ্যোজাত শিশু ও বয়স্ক পুরুষের দেহে এ অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। অস্ত্রোপচার দ্বারা এ ধরনের অস্বাভাবিকতা দূর করা যায়।

ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া (Inguinal hernia) : ক্ষুদ্রান্ত্র ইঙ্গুইনাল অংশের পেশি ছিদ্র করে স্ক্রোটামে বা ইঙ্গুইনাল অংশে প্রবেশ করলে তাকে ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া বলে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এ সমস্যার নিরাময় সম্ভব।

প্রস্টেট ক্যানসার (Prostate cancer) : প্রস্টেট গ্রন্থির অস্বাভাবিক স্ফীতিসহ কোষের ম্যালিগন্যান্সি দেখা দিলে তাকে প্রস্টেট ক্যান্সার বলে।

ইমপোটেন্স (Impotence) : সঙ্গমের সময় বা সঙ্গম চলাকালীন শিশ্নের (penis) উত্থান (erection) না হলে তাকে ইমপোটেন্স বলে। মানসিক কারণ, স্নায়ুরোগ, রক্ত সংবহনতন্ত্রের গোলযোগ, সিফিলিস ইত্যাদি কারণে এই রোগ দেখা দেয়।

বন্ধ্যত্ব বা স্টেরিলিটি (Infertility or Sterility) : পুরুষদের শুক্রাণুর ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে না পারাকে অথবা শুক্রাণু উৎপাদন না হওয়ার অবস্থাকে পুরুষদের বন্ধ্যত্ব বলে।

ভেরিকোসিল (Varicocele) : শুক্রাশয়ে রক্ত সংবহনকারী শিরা যখন ভাঁজ হয়ে ফুলে ওঠে তাকে ভেরিকোসিল বলে। এর ফলে রক্তসংবহন কমে যায় এবং শুক্রথলির পার্শ্বদেশ ফুলে ওঠে দেখতে 'bag of worms'-এর মতো লাগে। এর পাশাপাশি শুক্রাণুর সংখ্যা কমতে থাকে এবং পুরুষের বন্ধ্যত্ব দেখা যায়।

ADAM (Androgen Deficiency in Aging Males) : এটি পুরুষদের যৌন অক্ষমতাকে (menopause) নির্দেশ করে। অ্যান্ড্রোজেন (টেস্টোস্টেরন) ক্ষরণ কমে গেলে পুরুষদের যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়। সাধারণত 40 বছরের পর এরকম ঘটনা ঘটে।

অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিন্ড্রোম (Androgen insensitivity syndrome) : এটি এক ধরনের জিনগত রোগ, যারা জিনগতভাবে পুরুষ অর্থাৎ XY ক্রোমোজোমধারী কিন্তু তারা স্ত্রীলোকের মতো গড়ে ওঠে, ফলে যৌনগতভাবে তারা স্ত্রীলোকের মতোই হয়ে থাকে। সাধারণত অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের ব্যবহার জনিত অক্ষমতার ফলেই এটি ঘটে থাকে।

ইন্টারসেক্সুয়ালিটি (Intersexuality) : যে সমস্ত ব্যক্তি জিনগত রোগের কারণে সম্পূর্ণ পুরুষ বা সম্পূর্ণ মহিলা নন।]

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র (Female Reproductive System)

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিম্নরূপ–

১। ডিম্বাশয় (Ovary) : ডিম্বাশয় দুটি স্ত্রীদেহের শ্রোণিগহ্বরে (pelvic cavity) জরায়ুর দুই পাশে অবস্থিত। **মেসোভেরিয়াম** (mesovarium) নামক পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা ডিম্বাশয় আবৃত থাকে। ডিম্বাশয়ের ঊর্ধ্বপ্রান্তটি গোলাকার এবং ডিম্বনালির দিকে অবস্থান করে। তবে নালিকা প্রান্ত (tubal end) এবং নিচের প্রান্তটি জরায়ুর দিকে অবস্থান করে। একে **জরায়ু প্রান্ত** (uterine end) বলে। জরায়ু প্রান্তটি জরায়ুর সঙ্গে **ওভারিয়ান লিগামেন্ট** বা **ব্রড লিগামেন্ট** (ovarian or broad ligament) দিয়ে যুক্ত থাকে।

ডিম্বাশয়ের সর্বাপেক্ষা বাইরের আবরণী **জার্মিনাল এপিথেলিয়াম** (germinal epithelium) নামক কিউবয়ডাল কোষ দ্বারা গঠিত। জার্মিনাল এপিথেলিয়াম থেকে **গ্রাফিয়ান ফলিকল** (graffian follicle) গঠিত হয় এবং ফলিকলের অভ্যন্তরে ডিম্বাণু পরিবর্ধন ঘটে। প্রত্যেক ডিম্বাশয় ২.৫-৫ সে.মি. লম্বা, ১.৫-৩ সে.মি. চওড়া এবং ০.৬-১.৫ সে.মি.

Scanned with CamScanner

পুরু এবং দেখতে অনেকটা **কাঠ বাদামের মতো**। ডিম্বাণু পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর ফলিকল প্রাচীর বিদারণের মাধ্যমে মুক্ত হয়। ডিম্বাণু নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর গ্রাফিয়ান ফলিকলের যে অংশ ডিম্বাশয়ে থাকে তার নাম **করপাস লিউটিয়াম** (corpus luteum)। করপাস লিউটিয়াম থেকে ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও রিলাক্সেন নামক স্ত্রী যৌন হরমোন নিঃসৃত হয়। ডিম্বাশয়ের সাহায্যকারী কলাকে **স্ট্রোমা** বলে। স্ট্রোমায় যোজক কলা, রক্তনালি ও পূর্ণাঙ্গ ফলিকল থাকে। ডিম্বাশয়ের অবস্থা পরিবর্তনশীল।

কাজ : ডিম্বাশয়ের প্রধান কাজ ডিম্বাণু উৎপন্ন করা। এর প্রাচীর থেকে এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, ও রিলাক্সেন নামক যৌন হরমোন ক্ষরিত হয়। ডিম্বাশয়ে নিষেক সম্পন্ন হয়।

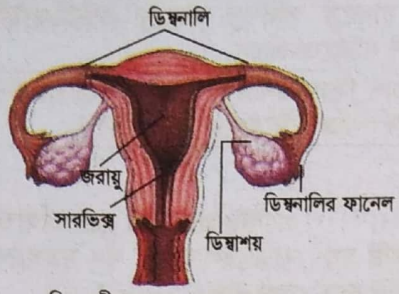

চিত্র : স্ত্রীজননতন্ত্র (সম্মুখ দৃশ্য)

চিত্র ৯.৩ক : স্ত্রী প্রজননতন্ত্র (সম্মুখ দৃশ্য)



চিত্র : স্ত্রীজননতন্ত্র (পার্শ্বদৃশ্য)

চিত্র ৯.৩খ : স্ত্রী প্রজননতন্ত্র (পার্শ্বদৃশ্য)

২। ডিম্বনালি বা ফেলোপিয়ান টিউব (Oviduct or Fallopian Tube) : প্রায় ১২ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ডিম্বনালি ডিম্বাশয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করে। ডিম্বাশয়ের কাছাকাছি ডিম্বনালির অংশটি ফানেলাকৃতি, ছিদ্রযুক্ত এবং অন্য প্রান্তটি জরায়ুর গহ্বরে উন্মুক্ত, ফানেল আকৃতির প্রান্ত একধরনের অভিক্ষেপ ছিদ্রকে ঘিরে ঝালরের মতো অবস্থান করে। অভিক্ষেপগুলোকে **ফিমব্রি** (fimbriae) বলে। এ প্রান্তের ফানেলের ন্যায় অংশকে **ইনফান্ডিবুলাম** (infundibulum) বলে। ডিম্বনালির সর্বাধিক প্রসারিত অংশের নাম অ্যাম্পুলা (ampulla)। ফিমব্রি এবং ডিম্বনালিতে **সিলিয়া** (cilia) থাকে।

কাজ : ডিম্বাশয় থেকে পতিত ডিম্বাণুকে গ্রহণ করে জরায়ুতে পৌঁছানো ডিম্বনালির কাজ। এর প্রাচীর রস ক্ষরণ করে নিষেকের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৩। জরায়ু (Uterus/Womb) : জরায়ু পেলভিস অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত মোটা প্রাচীরযুক্ত পেশিবহুল একটি অঙ্গ। এটি লম্বায় প্রায় ৭.৫ সে. মি, প্রস্থে ৫ সে. মি. এবং আকৃতি অনেকটা উল্টানো নাশপাতির মতো। জরায়ু তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা– উপরের অংশ **ফান্ডাস** (fundus), মাঝের **দেহ** বা **করপাস** (body or corpus) এবং নিচের নলাকৃতির **সারভিক্স** (cervix)। সারভিক্স যোনিতে উন্মুক্ত হয় এবং এর সরু পথে **বীর্যরস** (semen) জরায়ুতে প্রবেশ করে। জরায়ুর প্রাচীর ৩টি স্তরযুক্ত। যথা- মসৃণপেশি দ্বারা গঠিত জরায়ু প্রাচীরের বাইরের স্তরকে **পেরিমেট্রিয়াম** (perimetrium), মাঝের স্তরকে **মায়োমেট্রিয়াম** (myometrium) এবং গ্রন্থি ও রক্তজালক সমৃদ্ধ ভিতরের স্তরকে **এন্ডোমেট্রিয়াম** (endometrium) বলে। বয়ঃসন্ধিকালে জরায়ু পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু গর্ভাবস্থায় এটি প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

কাজ : জরায়ুতে নিষিক্ত জাইগোট সংস্থাপিত হয় এবং ভ্রূণের বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে। এটি প্লাসেন্টা বা অমরা গঠনে অংশগ্রহণ করে যার মাধ্যমে ভ্রূণের পুষ্টি, রেচন ও শ্বসন সম্পন্ন হয়। এর সারভিক্স অংশের নিঃসৃত ক্ষারকীয় রস শুক্রাণুর চলনগতি বৃদ্ধি করে।

৪। যোনি (Vagina) : মূত্রাশয়ের নিচ দিয়ে জরায়ু অভিমুখে ৮–১০ সেন্টিমিটার নলাকার প্রকোষ্ঠকে যোনি বলে। এর উপরের প্রান্ত জরায়ুর সারভিক্সে উন্মুক্ত। যোনির প্রাচীর **রুগী** (rugae) নামক অনেকগুলো ভাঁজযুক্ত। কুমারী নারীর যোনিপথে **হাইমেন** (humen) বা সতীচ্ছেদ নামক একটি যোনিপথ অবরোধকারী পর্দা দেখা যায়। যোনিমুখে দুই জোড়া মাংসল ভাঁজ যোনিপথকে কপাটের মতো ঢেকে রাখে। বাইরের বড় ভাঁজকে **লেবিয়া মেজরা** (labia majora) এবং ভিতরের ছোট ভাঁজকে **লেবিয়া মাইনরা** (labia minora) বলে। দুই লেবিয়ার সংযোগস্থলের উপরের অংশের ভেতর মেদ টিস্যু থাকায় ঐ অংশ বেশ উঁচু দেখায় এবং বয়ঃসন্ধিকাল থেকে এ অংশ চুলে ভরা থাকে। এ উঁচু অংশকে **মন্স ভেনিরিস বা মন্স পিউবিস** (mons veneris or mons pubis) বলে। লেবিয়া মাইনরার অন্তর্তলে ভেস্টিবিউলের মধ্যে **বার্থোলিন এর গ্রন্থি বা ভেস্টিবুলার গ্রন্থি** (Bartholin's or vestibular glands) নামে দুটি বড় গ্রন্থি উন্মুক্ত হয়। লেবিয়া মাইনরার উপরের দিকে উঁচু মাংসপিণ্ড **ভগাঙ্কুর বা ক্লাইটোরিস** (clitioris) নামে পরিচিত। এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

Scanned with CamScanner

কাজ : সঙ্গমের সময় যোনি মাংসল প্রাচীরের সাহায্যে যে কোনো আকারের শিশ্নকে গ্রহণ করে। বীর্য স্খলনের জন্য উত্তেজনা দান করে। জরায়ু অভিমুখে শুক্রাণু ধাবিত করে। বার্থোলিন-এর গ্রন্থিক্ষরণ যৌনমিলনের সময় যোনিপথকে পিচ্ছিল করে তোলে। ক্লাইটোরিস যৌন অনুভূতি বা আনন্দ উপভোগে সহায়তা করে এবং শিশু জন্মদানকালে প্রসারিত হয়ে শিশু প্রসবে সহায়তা করে।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের প্রধান কাজ : (১) ডিম্বাশয়ের জনন টিস্যু থেকে উওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় স্ত্রীগ্যামিট বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। (২) নিষেক (fertilization) ডিম্বনালির উর্ধ্বপ্রান্তে অ্যাম্পুলাতে সম্পন্ন হয়। (৩) বয়ঃসন্ধিকালে জরায়ু ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ করে। (৪) জরায়ুর প্রাচীরে ব্লাস্টোসিস্টের ইমপ্ল্যান্টেশন ঘটে এবং ভ্রূণের বৃদ্ধি ঘটে। (৫) যৌন মিলনকালে যোনি (vagina) পুরুষদের বীর্য (semen) ধারণ করে। (৬) প্রসব ঘটানো স্ত্রীজননতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের অংশসমূহ ও তাদের কাজের ছক

প্রকার	অংশসমূহ	প্রধান কাজ
মুখ্য জননাঙ্গ	ডিম্বাশয়	ডিম্বাণু উৎপন্ন করা এবং এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও রিলাক্সেন নামক হরমোন ক্ষরণ করা।
গৌণ বা আনুষঙ্গিক জননাঙ্গ	ডিম্বনালি	ডিম্বাশয় থেকে পতিত ডিম্বাণুকে গ্রহণ করা, নিষেক স্থান হিসেবে কাজ করা এবং নিষিক্ত ডিম্বাণুকে জরায়ুতে পৌঁছানো।
	জরায়ু	ভ্রূণের রোপণ, বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্লাসেন্টা গঠনে অংশগ্রহণ করা। প্রসবে সাহায্য করা।
	যোনি	যৌন মিলনে সাহায্য করা এবং প্রসব পথ হিসেবে কাজ করা।
	বার্থেলিন গ্রন্থি	যোনিপথকে পিচ্ছিল করে যৌন মিলনে সাহায্য করা।
বহিঃ জননাঙ্গ	ভালভা (লেবিয়া মেজরা, লেবিয়া মাইনরা, ক্লাইটোরিস ও ভেস্টিবিউল)	যৌন মিলনে বিশেষভাবে সাহায্য করে।
	স্তনগ্রন্থি	প্রসবের পর দুগ্ধ ক্ষরণ করে।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের হরমোনাল ক্রিয়া (Action of hormone on female reproductive system)

১। গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন (Gonadotrophin Releasing Hormone - GnRH) : GnRH মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত হয়ে পিটুইটারির অগ্রভাগকে উদ্দীপিত করে, ফলে FSH ও LH নিঃসৃত হয়। এছাড়া এটি ইস্ট্রোজেন মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ডিম্বাণু উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণ করে।

২। ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (Follicle Stimulating Hormone - FSH) : FSH পিটুইটারির অগ্রভাগ থেকে ক্ষরিত হয়। এটি ওভারিয়ান ফলিকলের বৃদ্ধি, ওভোলেশন ও ডিম্বাশয়ের ডিম্বথলিকে ইসট্রোজেন নিঃসরণে উদ্দীপিত করে।

৩। লিউটিনাইজিং হরমোন (Luteinizing Hormone - LH) : LH পিটুইটারির অগ্রভাগ থেকে ক্ষরিত হয়। এটি ডিম্বাশয়ের করপাস লিউটিয়ামকে উদ্দীপিত করে প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণ ঘটায়।

৪। লুটিওট্রফিক হরমোন (Luteotrophic Hormone - LTH) : পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত এই হরমোন স্ত্রীদের স্তনগ্রন্থির বিকাশ ও দুগ্ধ ক্ষরণ ঘটায়।

৫। ইস্ট্রোজেন (Oestrogen) : ডিম্বাশয়ের পরিণত ডিম্বথলি বা গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ইস্ট্রোজেন নিঃসৃত হয়। সাধারণত তিন প্রকার ইস্ট্রোজেন পাওয়া যায়। যথা : **ইস্ট্রাডিওল** (oestradiol), **ইস্ট্রোন** (oestrone) ও **ইস্ট্রিওল** (oestriol)।

কাজ : (১) ইস্ট্রোজেন ঋতুচক্রের আবর্তন ও জনন অঙ্গের পরিবর্তন তথা জরায়ু, ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি ইত্যাদি অঙ্গের বৃদ্ধি ও পরিণতি প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (২) সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে। (৩) এটি স্ত্রীদেহের স্তনগ্রন্থিতে স্নেহদ্রব্যের সঞ্চার ঘটিয়ে স্তনের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। (৪) এই হরমোনের প্রভাবে জরায়ুতে এন্ডোমেট্রিয়াম গঠিত হয়।

৬। গোনাডোকর্টিকয়েড (Gonadocorticoid) : এটি অ্যাডরেনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। এরা ভ্রূণের যৌন গ্রন্থি, যৌন অঙ্গ এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়। তাছাড়া ভ্রূণের যৌন বিভেদ নিয়ন্ত্রণ করে।

৭। প্রোজেস্টেরন (Progesterone) : স্ত্রীদেহে আলফা ও বিটা এই দুই প্রকার প্রোজেস্টেরন হরমোন পাওয়া যায়। এই হরমোন **কর্পাস লিউটিয়াম** থেকে নিঃসৃত হয়।

Scanned with CamScanner

কাজ : (১) গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের পরিস্ফুটনে সহায়তা করে। (২) প্রসবকালে যোনিপথে পেশির প্রসারণ ঘটায়। (৩) এই হরমোন গর্ভকালে ডিম্বাণু উৎপাদন, নিঃসরণ এবং ঋতুচক্রে বাধা দেয়।

৮। **রিলাক্সিন** (Relaxin) : এটি করপাস লিউটিয়াম বা পীতগ্রন্থি ও অমরা থেকে নিঃসৃত হয়। গর্ভাবস্থার ষষ্ঠ সপ্তাহে রক্তে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সন্তান প্রসবের পর পরই এর পরিমাণ আকস্মিকভাবে হ্রাস পায়।

কাজ : এই হরমোন গর্ভাবস্থায় শ্রোণি বন্ধনী শিথিল করে এবং জরায়ু পেশি সংকোচনে বাধা দেয়। এটি ইস্ট্রোজেনের সহায়তায় সার্ভিক্সের প্রসারতা বৃদ্ধি করে।

সংক্ষেপে স্ত্রীজননতন্ত্রের হরমোন নিয়ন্ত্রণ : হাইপোথ্যালামাস থেকে নিঃসৃত হরমোন GnRH অগ্রপিটুইটারিকে উদ্দীপিত করে। ফলে LH ও FSH নিঃসৃত হয়। FSH ডিম্বাশয়ের ডিম্বথলিকে **ইসট্রোজেন** নিঃসরণে উদ্দীপিত করে। LH ডিম্বাশয়ের করপাস লিউটিয়ামকে উদ্দীপিত করে প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণ ঘটায়। রক্তে **প্রোজেস্টেরনের** মাত্রা বেড়ে গেলে GnRH ক্ষরণ হ্রাস পায়, যা FSH ও LH ক্ষরণে বাধা সৃষ্টি করে।

[**প্রাসঙ্গিক তথ্য : স্ত্রীজননতন্ত্রের ব্যাধি** (Disorder of female reproductive system)

মেনস্ট্রুয়াল সমস্যা (Menstrual disorder) : **অ্যামেনোরিয়া** (amenorrhea)- ঋতুস্রাব না হওয়া; **মেনোরেজিয়া** (menorrhagia)- অতিরিক্ত ঋতুস্রাব এবং **ডিসমেনোরিয়া** (dysmenorrhea)- যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাব।

ব্রেস্ট ক্যানসার (Breast cancar) : স্তনগ্রন্থির ক্যানসার। স্তনগ্রান্থিতে লাম্প (lump) বা অতিরিক্ত মাংসপিণ্ড দেখা দেয়, যা ম্যালিগন্যান্ট হলে তাকে ব্রেস্ট ক্যানসার বলে। কেমোথেরাপি ও সার্জারি পদ্ধতি দ্বারা এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সারভাইক্যাল ক্যানসার (Cervical cancer) : জরায়ুর সারভিক্স-এর ক্যানসারকে সারভাইক্যাল ক্যানসার বলে। এ রোগ বয়স্ক মহিলাদের (৩০-৪৫ বছর) মধ্যে বেশি দেখা যায়। রেডিয়েশন পদ্ধতি বা সার্জারি পদ্ধতিতে এর চিকিৎসা করা হয়।

ওভারিয়ান সিস্ট (Ovarian cyst) : অনেক সময় ডিম্বাশয়ের মধ্যে তরলপূর্ণ সিস্ট গঠিত হয়। একে ওভারিয়ান সিস্ট বলে। এগুলো বয়স্ক মহিলাদের (৪৫-৬৫ বছর) বেশি দেখা যায়। হরমোন ক্ষরণের অস্বাভাবিকতা সিস্ট সৃষ্টির প্রধান কারণ। প্রয়োজনে সার্জারি করতে হয়। ওভারিয়ান সিস্ট সংখ্যায় বেশি হলে এক **পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম** (Polycystic ovarian syndrome-PCOS) বলে।

একটোপিক প্রেগন্যান্সি (Ectopic pregnancy) : জরায়ু ছাড়া অন্য কোনো স্থানে বিশেষ করে ডিম্বনালিতে ভ্রূণের রোপণ ঘটলে যে গর্ভসঞ্চার হয় তাকে একটোপিক প্রেগন্যান্সি বলে।

ওফোরাইটিস (Oophoritis) : জীবাণু সংক্রমণের জন্য ডিম্বাশয়ের প্রদাহকে ওফোরাইটিস বলে।

একটোপিক ডিম্বাশয় (Ectopic ovary) : ডিম্বাশয় যখন তার নির্দিষ্ট স্থানে না থেকে ইঙ্গুইনাল ক্যানালে থাকে তখন এই অস্বাভাবিক অবস্থাকে একটোপিক ডিম্বাশয় বলে।

এন্ডোমেট্রিয়োসিস (Endometriosis) : ইউটেরাসের অন্তর্গাত্রে থাকা এন্ডোমেট্রিয়াম যদি ইউটেরাসের বাইরে বৃদ্ধি পায়, সেই অবস্থাকে এন্ডোমেট্রিয়োসিস বলা হয়। সাধারণত এরকম অবস্থায় ঋতুস্রাবের আগে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দেখা দেয়।]

৯.২ প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা (Different Stages and Phases of Reproductions)

(ক) বয়ঃপ্রাপ্তি বা বয়ঃসন্ধিকাল (Puberty/Adolescense)

সাধারণত ১০-১৪ বছরের মধ্যে ডিম্বাশয়ের ডিম্বাণু উৎপাদন এবং শুক্রাশয়ের শুক্রাণু উৎপাদন শুরুসহ দেহে নানা রকম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে। এতে জননাঙ্গের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ছাড়াও সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে। **জীবনের যে পর্যায়ে নারী ও পুরুষের সেকেন্ডারি (গৌণ) যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলো সক্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়, তাকে বয়ঃপ্রাপ্তি বা বয়ঃসন্ধিকাল** (puberty or adolescense) **বলে**। সাধারণত কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল ১০-১২ বছর এবং পুরুষদের বয়ঃসন্ধিকাল ১৩-১৪ বছর। শীতপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের এ ঘটনা আরো ৩-৪ বছর পরে শুরু হয়। এই সময় পুরুষের দাড়ি-গোঁফ গজায়, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ঘটে, লিঙ্গ ও শুক্রাশয় আকারে বৃদ্ধি পায় এবং বীর্যপাত ঘটে। স্ত্রীলোকের দৈহিক গঠন সুস্পষ্ট হয়, দেহ ও মনে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, জরায়ু, ডিম্বাশয়, যোনি ইত্যাদি অঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে, রজঃচক্র শুরু হয় [প্রথম রজঃচক্রকে **মেনারচি** (menarche) বলে] এবং চেহারায় লাবণ্য ফুটে ওঠে।

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন (Change of Puberty or Adolescense) : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে দৈহিক বা শারীরিক পরিবর্তনগুলোই প্রথমে চোখে পড়ে। এই পরিবর্তন দেখলেই বোঝা যায় যে, কারও বয়ঃসন্ধিকাল চলছে। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের দেহে যেসব পরিবর্তন ঘটে তাদের **টিনার দশা** (Tanner stages) বলে। বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো প্রধানত ৩ প্রকার। যথা– (ক) **শারীরিক**, (খ) **মানসিক** ও (গ) **আচরণিক**।

Scanned with CamScanner

(ক) বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন

কিশোরদের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ–

(১) উচ্চতা ও ওজন বাড়ে। (২) শরীরে দৃঢ়তা আসে, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়। (৩) এ বয়সে দাড়ি, গোঁফ, বুকের লোম, বগলের লোম ও পিউবিক লোম উঠে। (৪) স্বরভঙ্গ হয় ও গলার স্বর মোটা হয়। (৫) প্রস্টেট গ্রন্থি, কাওপার গ্রন্থি ও সেমিনাল ভেসিকলের আকার ও আয়তন বেড়ে যায় ও তাদের নিঃসরণের সূচনা ঘটে। (৬) সব স্থায়ী দাঁত উঠতে শুরু করে এবং তৈল গ্রন্থি অধিক ক্ষরণের ফলে মুখমণ্ডল চকচকে হয়। (৭) এ সময় শরীরের আকার আকৃতি বেড়ে যায় এবং নরম চর্বিযুক্ত দেহের পরিবর্তন ঘটে শক্ত, সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়। (৮) লিঙ্গ ও শুক্রাশয় আকারে বৃদ্ধি পায় এবং বীর্যপাত হয়; স্বপ্নদোষ হয়। (৯) এই সময় বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ শুরু হয়। এছাড়া এদের আচরণে রুক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। (১০) সেমিনাল ফ্লুইডে ফ্রুক্টোজের আবির্ভাব ঘটে।

কিশোরীদের পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ–

(১) মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালের প্রথমে স্তন বা ব্রেস্ট বিকশিত হতে শুরু করে যা দেহের প্রথম পরিবর্তন; একে থেলারচি (thelarche) বলে। (২) উচ্চতা ও ওজন বাড়ে। (৩) শরীর ভারী হয়, শরীরের বিভিন্ন হাড় মোটা ও দৃঢ় হয়। (৪) ঋতুস্রাব বা রজঃচক্র (মাসিক) শুরু হয়। (৫) দেহের চামড়া তেলেতেলে হয়। সব স্থায়ী দাঁত উঠতে শুরু করে। (৬) ডিম্বাশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে। (৭) বগলে ও পিউবিক অঞ্চলে লোম গজাতে শুরু করে, একে পিউবারচি (puberche) বলে। (৮) আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন– জননকোষের পরিপক্বতা, জননকোষ সঞ্চয়, অগ্রগমন, লেবিয়া মেজর ও লেবিয়া মাইনর সমৃদ্ধি এবং যোনিপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। (৯) নিতম্ব, উরু ও স্তন অঞ্চলে চর্বি সঞ্চিত হতে থাকে এর ফলে নারীসূলভ কোমনীয়তা আসে। (১০). অ্যাডরেনাল গ্রন্থির এন্ড্রোজেন হরমোন ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।

বয়ঃসন্ধিকালে সবার ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তনগুলো একই সময়ে ও একই রকম নাও হতে পারে। যেমন– কিশোরীদের ক্ষেত্রে কারও আগে বা পরে ঋতুস্রাব শুরু হতে পারে। কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে সকলের উচ্চতা একইভাবে নাও বাড়তে পারে।

(খ) বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি নানা রকম মানসিক পরিবর্তনও হয়। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং সময়ের সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীরা এইসব পরিবর্তনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ–

(১) অজানা বিষয়ে জানার কৌতূহল বাড়ে। (২) শারীরিক পরিবর্তনের ফলে চলাফেরায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লজ্জা কাজ করে। (৩) স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা করে। (৪) নিকটজনের মনোযোগ, যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হয়। (৫) আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। (৬) ছেলে ও মেয়েদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। (৭) মানসিক পরিপক্বতা পর্যায় শুরু হয়। (৮) যৌনতা সম্পর্কে কৌতূহল জাগে, যৌনবিষয়ক চিন্তা করার প্রবণতা বাড়ে। (৯) লজ্জাবোধ জাগে ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। (১০) ঘনঘন মেজাজ পরিবর্তন হয়, কেউ কেউ একা একা থাকতে পছন্দ করে। আবার কারও কারও অনেক বন্ধুবান্ধব হয়। (১১) মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হতাশা, চাঞ্চল্যভাব ও মনে নানা প্রশ্ন জন্মায়।

(গ) আচরণিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে আচরণগত পরিবর্তনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই–

(১) প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করে। (২) বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নিজেকে একজন আলাদা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। (৩) প্রত্যেক বিষয়ে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। (৪) দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপ

ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের কারণে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। কারণ পরিবর্তনগুলো অনেকটা আকস্মিকভাবে শুরু হয়। এর সাথে পরিচিত না থাকার কারণে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের মনে অপরাধবোধ কাজ করে। এ ধরনের অপরাধবোধ ও মানসিক দুশ্চিন্তা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ফলে ছেলেমেয়েদের মনে সর্বক্ষণ একটা অস্বস্তি কাজ করে। তারা মানসিক চাপের সম্মুখীন হয় এবং অনেক সময় পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

Scanned with CamScanner

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে এবং এ সম্বন্ধে করণীয় বিষয়ে পূর্ব ধারণা থাকলে, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক প্রস্তুতি থাকে। ফলে তারা বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারে, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয় না এবং সম্ভাব্য রোগব্যাধিও প্রতিরোধ করা যায়। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন ঘটলে মা-বাবা, বড় ভাই-বোন বা নির্ভরযোগ্য অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে এ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যেতে পারে। ফলে সংকোচ কেটে যাবে এবং একা থাকার প্রবণতা কমে যাবে। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে আবেগিক পরিবর্তনও ঘটে। এ বয়সে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটে তার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সাথে মা-বাবা ও অভিভাবকদের বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। তাদের মানসিক দিকসহ অন্যসব ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান ও সাহস জোগাতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য তাদের নিজেদেরও সচেষ্ট থাকতে হবে। তাদের প্রথম কাজ হবে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা। ভালো গল্পের বই পড়া, সাথীদের সাথে খেলাধুলা করলে মনে প্রফুল্লতা আসবে এবং মানসিক চাপ সামলানো সম্ভব হবে।

(খ) রজঃচক্র (Menstrual cycle)

স্ত্রীদেহের যৌন জীবনকালে (reproductive life) জরায়ু থেকে সাধারণত প্রতি ২৮ দিন (গড়ে; ২৪-৩২ দিন) অন্তর অন্তর ৪-৫ দিন ধরে চক্রাকারে যে পদ্ধতিতে রক্ত, মিউকাস, অনিষিক্ত ডিম্বাণু, এন্ডোমেট্রিয়াম ইত্যাদি নিষ্কাশিত হয়, তাকে **রজঃচক্র** বা **ঋতুচক্র** (menstrual cycle or estrus cycle) বলে।

পিটুইটারি নিঃসৃত GTH (Gonadotrophic Hormone)-এর প্রভাবে ১০-১২ বছর বয়সে স্ত্রীলোকের প্রথম রজঃস্রাব শুরু হয়। রজঃচক্র বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বে, গর্ভাবস্থায়, দুগ্ধক্ষরণকালে (lactation) এবং রজঃনিবৃত্তিকালে (menopose) বন্ধ থাকে। ৪০-৫০ বছর বয়সে পুরোপুরিভাবে এই চক্র বন্ধ হয়ে যায়। রজঃচক্রকে চারটি দশা বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যথা–

১। নিরাময় পর্ব বা রেস্টিং ফেজ বা রিপিয়ারিং ফেজ (Regenerative/Resting/Repairing phase) : বিগত রজঃচক্রের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে পরবর্তী চক্রের প্রারম্ভে জরায়ুর প্রাচীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর্যায়কে **নিরাময় পর্ব** বলে। এ ধাপে এন্ডোমেট্রিয়াম পুনর্গঠিত এবং স্বাভাবিক হয়। এন্ডোমেট্রিয়াম ১ মিমি. পুরু হয়। ডিম্বাশয়ের করপাস লিউটিয়াম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে প্রোজেস্টেরনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ডিম্বনালি বা গ্রাফিয়ান ফলিকল ধীরে ধীরে পরিণত হতে থাকে। এন্ডোমেট্রিয়ামের পুনর্গঠন ইস্ট্রোজেন হরমোন দ্বারা এবং ডিম্বথলির পরিণতি পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) ও লুটিনাইজিং হরমোন (LH) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। **এই দশার স্থায়িত্বকাল রজঃস্রাব শুরুর তিন দিন পর থেকে ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত**।

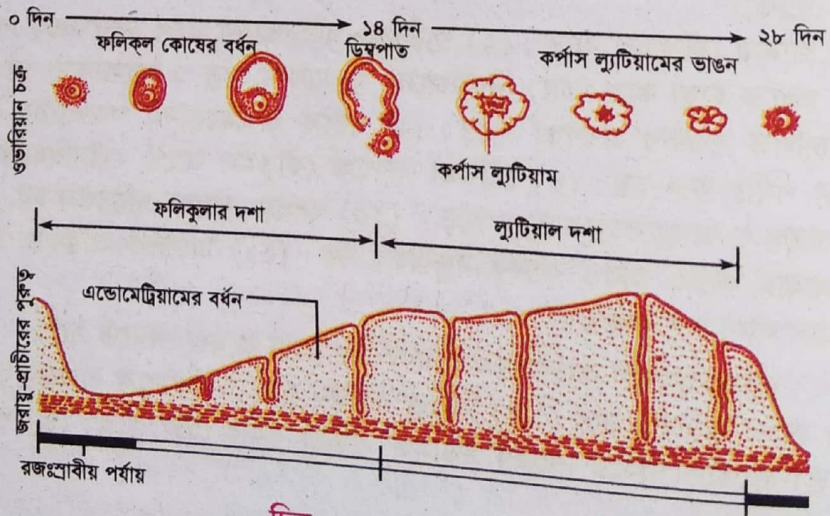

চিত্র : ৯.৪ : রজঃচক্র

২। বৃদ্ধি পর্ব বা প্রোলিফারেটিভ ফেজ (Proleferative phase)**:** এ পর্বে জরায়ুর এন্ড্রোমিট্রিয়াম অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ডিম্বাশয় থেকে সেকেন্ডারি উওসাইট নিষেকের উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ ডিম্বপাত হয়। জরায়ু গাত্রের মিউকাস স্তর পুরু হতে থাকে। ওই স্তরের রক্তবাহ স্ফীত হতে থাকে ও গ্রন্থিগুলো বড় এবং শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট ও কুণ্ডলীকৃত হয়। **এই দশার স্থায়িত্বকাল ৭ম-১৪তম দিন পর্যন্ত**। ডিম্বাশয়ের ফেলোপিয়ান টিউব পরিণত হয় এবং **ইস্ট্রোজেনের** ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। এন্ডোমেট্রিয়াম প্রায় ৩-৪ মি.মি. পুরু হয়। চক্রের ১২তম দিনে LH ক্ষরণ বেড়ে যায়। এ সময় এস্ট্রোজেন ক্ষরণ কমে যায়। ১৪ দিন পর ওভ্যুলেশন হয় এবং **করপাস লিউটিয়াম** (corpus luteum) পুনর্গঠিত হয়। এই দশা এস্ট্রোজেন এবং FSH দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

Scanned with CamScanner

৩। প্রাক-রজঃস্রাবীয় পর্ব বা প্রি-মেনস্ট্রুয়াল ফেজ (Pre-menstrual phase) : রজঃচক্রের যে ফেজে ব্লাস্টোসিস্ট ধারণের জন্য জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম পুনর্গঠিত পর্যায়ে অপেক্ষমান থাকে, তাকে **প্রাক-রজঃস্রাবীয় পর্ব** বলে। এই দশা রজঃচক্রের **১৫-২৮ দিন পর্যন্ত** অর্থাৎ ১৩-১৪ দিন স্থায়ী হয়। এই সময় মিউকাস স্তর আরও বৃদ্ধি পায়। রক্তজালকগুলো আরও স্ফীত হয়। রক্তাভ তরল নিঃসৃত হয়ে জরায়ু গহ্বরে জমা হতে থাকে। করপাস লিউটিয়াম সম্পূর্ণরূপে গঠিত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

পরিশেষে এন্ডোমেট্রিয়াম ৫-৬ মি.মি. পুরু হয়ে ব্লাস্টোসিস্টের ধারণ ও পোষণে সক্ষম হয়। প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। ২৪ দিনের দিন করপাস লিউটিয়াল গ্রন্থি বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রধানত প্রোজেস্টেরন এই দশা নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। রজঃদশা বা মেনস্ট্রুয়াল ফেজ বা ব্লিডিং পর্ব (Menstrual/Destructive/Bleeding phase) : প্রি-মেনস্ট্রুয়াল ফেজ অতিক্রান্ত হলে অর্থাৎ ২৮ দিন পর এই দশা শুরু হয়। **ডিম্বপাতের পর ডিম্বাণু ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে নিষিক্ত না হলে করপাস লুটিয়াম বা পীতগ্রন্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।** চক্রের এ পর্যায়ে এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, FSH ও LH -এর ক্ষরণ মাত্রাই নিম্নতম থাকে। জরায়ুর মিউকাস স্তরে এন্ডোমেট্রিয়াম বিচ্ছিন্ন হয়ে অনিষিক্ত ডিম্বাণুসহ রক্তক্ষরণ হতে থাকে। **এই দশার স্থায়িত্বকাল ৪-৫ দিন।** এ সময় রক্তের সাথে অনিষিক্ত ডিম্বাণু, রক্তবাহিকার ভগ্নাংশ ও এন্ডোমেট্রিয়াম রক্তের সাথে যোনিপথে নিষ্কাশিত হয়। এসব পদার্থকে **রজঃস্রাব** বলে। প্রোজেস্টেরনের অভাবে রজঃস্রাব শুরু হয়। প্রত্যেক রজঃস্রাবের পরিমাণ ৩০-৪০ মিলিলিটার।

এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের নিঃসরণমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কমে গেলে সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থির উপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায়, তখন আবার FSH ও LH ক্ষরণ বাড়ে। সে সাথে নতুন রজঃচক্র সৃষ্টির তৎপরতা শুরু হয়।

রজঃচক্রের তাৎপর্য : (১) রজঃচক্র মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতার সূচনা ঘটায়; (২) স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণক্ষমতা নির্দেশ করে; (৩) এটি প্রতি মাসে একবার গর্ভসঞ্চারণের সুযোগ সৃষ্টি করে; (৪) নিয়মিত রজঃচক্র মেয়েদের প্রজননিক সুস্থতার বহিঃপ্রকাশ এবং (৫) অনিয়মিত রজঃচক্র মেয়েদের বিভিন্ন শারীরিক ও যৌন সমস্যা সৃষ্টি করে।

❑ **কাজ :** (i) রজঃচক্র প্রক্রিয়াটির বর্ণনা দাও। (ii) রজঃচক্র প্রক্রিয়াটি মহিলাদের সুস্থতার বহিঃপ্রকাশ– ব্যাখ্যা কর।

(গ) জননকোষ বা গ্যামিট সৃষ্টি (Formation of Gametes) বা গ্যামিটোজেনেসিস (Gametogenesis)

যৌন প্রজননক্ষম প্রাণীতে জননকোষ তথা গ্যামিট সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **গ্যামিটোজেনেসিস** (gametogenesis) বলে। গ্যামিটোজেনেসিস দুটি পৃথক প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। যে প্রক্রিয়ায় কেবল শুক্রাণু সৃষ্টি হয় তাকে **স্পার্মাটোজোনেসিস** এবং ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **উওজেনেসিস** বলে।

১। শুক্রাণু উৎপাদন বা স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis; Gr. *sperma* = শুক্রাণু + *genesis* = সৃষ্টি বা জনন)

যৌন প্রজননক্ষম পুরুষ প্রাণীর শুক্রাশয় হতে শুক্রাণু উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে **স্পার্মাটোজেনেসিস** বলে। প্রক্রিয়াটি **সেমিনিফেরাস নালিকায়** সংঘটিত হয়। সেমিনিফেরাস নালিকা জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষ (germinal epithelium) দ্বারা আবৃত থাকে। এসব জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষ থেকে শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষের ফাঁকে অবস্থিত **সার্টলি কোষ** (sertoly cell) শুক্রাণুর পুষ্টি যোগায়। প্রক্রিয়াটি দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা– ক. **স্পার্মাটিড সৃষ্টি** ও খ. **স্পার্মিওজেনেসিস**।

(ক) স্পার্মাটিড সৃষ্টি : নিম্নলিখিত ৩টি ধাপে সম্পন্ন হয়।

১। সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication phase) : জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষের মধ্যে যেসব কোষ শুক্রাণু তৈরির জন্য নির্দিষ্ট থাকে, তাকে **শুক্রাণু জনন মাতৃকোষ বা প্রাইমারি জার্মিনাল কোষ বা প্রিমোর্ডিয়াল জননকোষ** (2n) বলে। এগুলো মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় পুনঃপুনঃ বিভাজিত হয়ে অসংখ্য কোষ সৃষ্টি করে, এসব কোষকে **স্পার্মাটোগোনিয়া** (spermatogonia, sing. spermatogonium) বলে। এরা ডিপ্লয়েড (2n) প্রকৃতির।

২। পরিবর্ধন বা বৃদ্ধি পর্যায় (Growth phase) : এই পর্যায়ে স্পার্মাটোগোনিয়া সার্টলি কোষ থেকে বিপুল পরিমাণ পুষ্টিদ্রব্য ও ক্রোমাটিন পদার্থ সঞ্চয় করে আকারে বড় হয়, এদেরকে **প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট** (primary spermatocyte) বলে। প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াস আয়তনে বেশ বড় হয়। এরাও ডিপ্লয়েড (2n) প্রকৃতির।

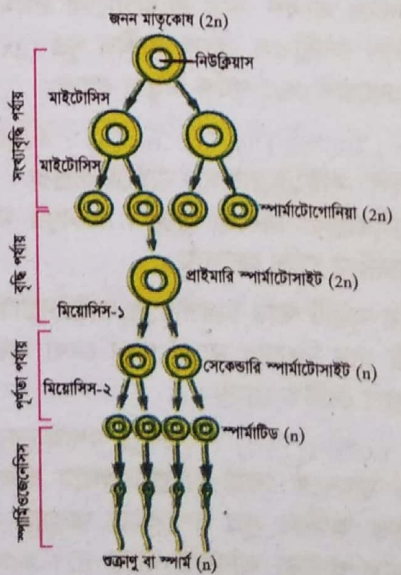

চিত্র ৯.৫ক : স্পার্মাটোজেনেসিসের ধাপসমূহ

Scanned with CamScanner

৩। পূর্ণতা পর্যায় (Maturation phase) : প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটগুলো মিয়োসিস বিভাজনের জন্য প্রস্তুত হয়। এরা মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের ফলে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট **সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট** উৎপন্ন করে। প্রত্যেকটি **সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট** দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন শেষে দুটি করে মোট চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) **স্পার্মাটিড** (spermatid) উৎপন্ন করে।

(খ) স্পার্মিওজেনেসিস (Spermiogenesis) : স্পার্মাটিড থেকে সক্রিয় সচল শুক্রাণু (sperm/spermatozoa) সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে **স্পার্মিওজেনেসিস** বলে। স্পার্মিওজেনেসিসে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো সম্পন্ন হয়।

১। স্পার্মাটিডের নিউক্লিয়াস তার সম্পূর্ণ তরল RNA, নিউক্লিওলাস ও অধিকাংশ প্রোটিন ত্যাগ করে সংকুচিত হয় এবং শুক্রাণুর **মস্তক** গঠন করে।

২। শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের সম্মুখপ্রান্তে গলগিবস্তু হতে **অ্যাক্রোজোম** (acrosome) সৃষ্টি হয়। অ্যাক্রোজোম গলগি বস্তু হতে সৃষ্ট লিপোপ্রোটিন আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে মস্তকের সম্মুখভাগে টুপির মতো গঠন তৈরি করে।

৩। স্পার্মাটিডের মাইটোকন্ড্রিয়া সর্পিলভাবে পেঁচিয়ে **মধ্যাংশ** গঠন করে।

৪। স্পার্মাটিডের সেন্ট্রিওলটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সেন্ট্রিওল গঠন করে। দূরবর্তী সেন্ট্রিওল পরবর্তীতে শুক্রাণুর লেজের **অক্ষীয়সূত্র** বা ফ্ল্যাজেলাম ও লেজ গঠন করে।

শুক্রাণুর গঠন (Structure of Sperm)

বিভিন্ন প্রাণীতে শুক্রাণুর আকার ও আকৃতি বিভিন্ন হয়। শুক্রাণুর আকৃতি প্রজাতি নির্দিষ্ট। প্রায় সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর শুক্রাণু আণুবীক্ষণিক, সরু, দীর্ঘকার ও লম্বা লেজবিশিষ্ট। মানুষের শুক্রাণুর ব্যাস প্রায় ২.৫ মাইক্রন এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ মাইক্রন। মস্তক, গ্রীবা, মধ্যাংশ ও লেজ এই ৪টি অংশ নিয়ে একটি শুক্রাণু গঠিত।

১। মস্তক (Head) : শুক্রাণুর মস্তক স্ফীত ও উপবৃত্তাকার। মস্তকে একটি বড় নিউক্লিয়াস থাকে। এতে ক্রোমোজোম থাকায় পিতার বংশগতি সন্তানে সঞ্চারিত হয়। নিউক্লিয়াসের সম্মুখে একটি টুপির মতো অংশ থাকে। একে **অ্যাক্রোজোম** (acrosome) বলে। অ্যাক্রোজোম একটি ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে এবং এতে **প্রোটিয়েজ** নামক এক প্রকার এনজাইম থাকে। অ্যাক্রোজোম নিষেকের সময় ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর মস্তক অঞ্চল প্রবেশ করতে সহায়তা করে।

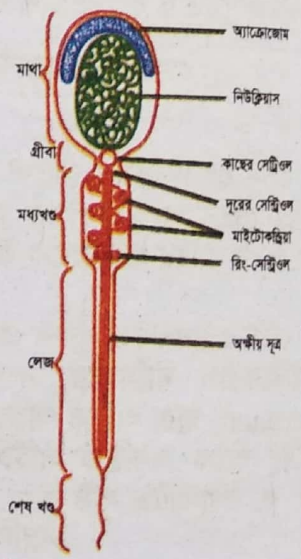

চিত্র ৯.৫খ : মানুষের শুক্রাণু

২। গ্রীবা (Neck) : শুক্রাণুর মস্তক ও মধ্যাংশের সংযোগ স্থলের সরু, স্বচ্ছ অংশকে **গ্রীবা** বলে। এই অংশে পরস্পরের সাথে সমকোণে দুটি সেন্ট্রিওল থাকে। সেন্ট্রিওলের একটিকে **প্রোক্সিমাল সেন্ট্রিওল** ও অন্যটিকে **ডিস্টাল সেন্ট্রিওল** বলে। প্রথমটি থাকে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি এবং তা নিউক্লিয়াসের সাথে ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জাইগোটের প্রথম বিভক্তিকে ত্বরান্বিত করে। অপরদিকে ডিস্টাল সেন্ট্রিওল থেকে **অক্ষীয় সূত্র** (axial filament) উৎপন্ন হয়। এই অক্ষীয় সূত্র লেজের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

৩। মধ্যখণ্ড (Middle piece) : গ্রীবার পর থেকে লেজের সম্মুখ ভাগ পর্যন্ত অংশকে **মধ্যখণ্ড** বা **মধ্যাংশ** বলে। মধ্যাংশ সাইটোপ্লাজম, মাইটোকন্ড্রিয়া ও অক্ষীয় সূত্র নিয়ে গঠিত। মধ্যাংশের অক্ষীয় সূত্রকে ঘিরে অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া বিন্যস্ত থাকে। শুক্রাণুর মধ্যাংশের মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো শুক্রাণুর লেজ দ্রুতগতিতে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়।

অক্ষীয় সূত্রটি তার চারপাশের সাইটোপ্লাজমীয় আবরণ মিলে মধ্যভাগের কেন্দ্রীয় মজ্জা গঠন করে। এর পশ্চাৎ প্রান্তে একটি গাঢ় রিংয়ের মতো গঠন দেখা যায়। একে **রিং সেন্ট্রিওল** (ring centriole) বলে। সমগ্র মজ্জা মাইটোকন্ড্রিয় আবরণে বেষ্টিত থাকে।

৪। লেজ (Tail) : শুক্রাণুর মধ্যভাগের সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়া সমাপ্তির অংশ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে **লেজ** বা **ফ্ল্যাজেলাম** বলে। এই অংশটি আবার **মূলখণ্ড** ও **শেষখণ্ড** এই দুই অংশে বিভক্ত। লেজে অবস্থিত অক্ষীয় সূত্র দশজোড়া অনুসূত্র দ্বারা গঠিত। লেজের মূলখণ্ডটিতে প্লাজমা আবরণী থাকে। কিন্তু লেজের শেষখণ্ডে প্লাজমা আবরণী থাকে না। তরল মাধ্যমে এই লেজের সাহায্যে শুক্রাণু ভেসে বেড়াতে বা সাঁতার কাটতে পারে।

Scanned with CamScanner

স্পার্মাটোজেনেসিস ও স্পার্মিওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য

স্পার্মাটোজেনেসিস	স্পার্মিওজেনেসিস
১। শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু সৃষ্টি হওয়ায় সামগ্রিক প্রক্রিয়া।	১। স্পার্মাটিড রূপান্তরিত হয়ে শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া।
২। এ প্রক্রিয়ায় কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি, বৃদ্ধি, পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও রূপান্তর ঘটে।	২। কেবল কোষের আকারের ব্যাপক রূপান্তর ঘটে।
৩। এটি গ্যামিটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার একটি কৌশল।	৩। এটি স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার একটি কৌশল।
৪। এটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী সংঘটিত হয়।	৪। এটি দ্রুত সময়ে সংঘটিত হয়।

২। ডিম্বাণু উৎপাদন বা উওজেনেসিস (Oogenesis; Gr. *oon* = ডিম্বাণু + *genesis* = সৃষ্টি বা জনন)

বয়ঃসন্ধির পূর্বে ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় না। ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার পর্যায়ক্রমে একটি ডিম্বাশয়ের মধ্যেএকটি করে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে **উওজেনেসিস** বলে। পিটুইটারি নিঃসৃত GTH এই ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। উওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাশয়ের **আদি ডিম্বথলি** (primordial follicle) কেন্দ্রস্থ ডিপ্লয়েড কোষটি মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে একটি হ্যাপ্লয়েড পরিণত ডিম্বাণু ও তিনটি হ্যাপ্লয়েড পোলার বডি গঠন করে। ক্রমবর্ধনের ওপর ভিত্তি করে সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে তিনটি ধাপে ভাগ করা যায়, যথা–

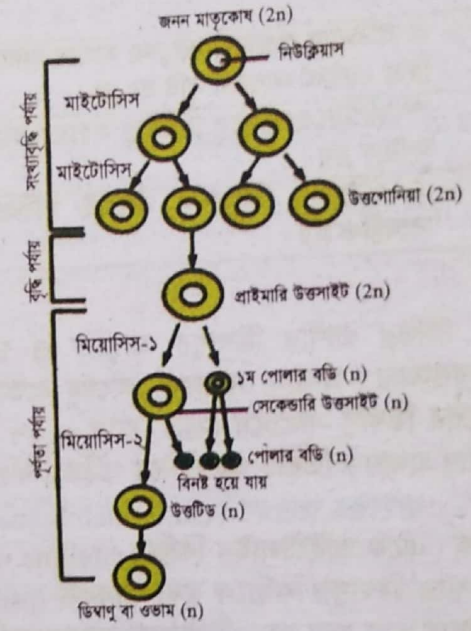

চিত্র ৯.৬ : উওজেনেসিসের ধাপসমূহ

(ক) সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication phase) : ডিম্বাশয়ের জার্মিনাল এপিথেলিয়াম পুনঃপুনঃ মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে **উওগোনিয়া** (oogonia, sing. oogonium) নামক কতগুলো কোষ উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে ভ্রূণের বৃদ্ধিকালে প্রচুর উওগোনিয়া সৃষ্টি হয়। এরা ডিপ্লয়েড (2n) প্রকৃতির।

(খ) পরিবর্ধন বা বৃদ্ধি পর্যায় (Growth phase) : এই পর্যায়ে সাইটোপ্লাজমে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি কুসুম আকারে সঞ্চিত হওয়ার ফলে উওগোনিয়ামের আকার বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই উওগোনিয়ামকে **প্রাথমিক বা প্রাইমারি উওসাইট** (primary oocytes) বলে। এতে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। প্রতিটি প্রাইমারি উওসাইট একস্তরী ফলিকল কোষস্তর দ্বারা আবৃত হয়ে **প্রাথমিক ফলিকলে** (primary follicle) পরিণত হয়।

(গ) পূর্ণতা (Maturation phase) : বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতি মাসে কিছু প্রাথমিক ফলিকল বৃদ্ধি লাভ করে, এদের মধ্যে সাধারণত একটি পরিপক্ব এবং বাকিগুলো বিলুপ্ত হয়, পরিপক্ব প্রাথমিক ফলিকলকে **গ্রাফিয়ান ফলিকল** (graffian follicle) বলে। বৃদ্ধিরত প্রাথমিক ফলিকলের অভ্যন্তরে প্রাইমারি উওসাইট প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের মাধ্যমে দুটি অসম আকৃতির হ্যাপ্লয়েড (n) কোষ উৎপন্ন করে। বড় কোষটিকে **মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি উওসাইট** (secondary oocytes) এবং ছোট কোষটিকে **১ম পোলার বডি** (polar body or polocyte) বলে। ১ম পোলার বডি অতঃপর বিভাজিত হয়ে দুটি পোলার বডি তৈরি করতে পারে, তবে এরা অবলুপ্ত হয়ে যায়। অপরদিকে সেকেন্ডারি উওসাইটটি নিষেকের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

বিভিন্ন স্তন্যপায়ী ও মানুষের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি উওসাইট অবস্থায় ডিম্বাণুর নির্গমন (ovulation) হয়। পরে যখন কোনো শুক্রাণু ডিম্বাণুর **জোনা পেলুসিডা** (zona pellucida) ভেদ করে, তখন সেকেন্ডারি উওসাইটে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন সম্পূর্ণ হয়। ফলে সেকেন্ডারি উওসাইটটি অসমভাবে বিভাজিত হয়ে একটি বড় **উওটিড** (ootid) ও একটি ছোট **পোলার বডি** (দ্বিতীয়) সৃষ্টি করে। এই পোলার বডিও অবলুপ্ত হয়ে যায়। উওটিড ও পোলার বডি হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির। উওটিডটি এটি কার্যক্ষম **পরিণত ডিম্বাণুতে** (mature ovum/egg) পরিণত হয়। নিষিক্ত না হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডিম্বাণু বিনষ্ট হয়। এভাবে উৎপন্ন ডিম্বাণুর মধ্যে ২২টি অটোজোম এবং একটি সেক্স ক্রোমোজোম (X) থাকে।

Scanned with CamScanner

স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য

স্পার্মাটোজেনেসিস	উওজেনেসিস
১। সমগ্র প্রক্রিয়াটি শুক্রাশয়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।	১। প্রক্রিয়াটি প্রাথমিক পর্যায় ডিম্বাশয়ে সম্পন্ন হলেও শেষ পর্যায় ডিম্বাশয়ের বাইরে জনন নালিতে ঘটে।
২। এ প্রক্রিয়ায় পুংগ্যামিট বা শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।	২। এ প্রক্রিয়ায় স্ত্রী গ্যামিট বা ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়।
৩। এ প্রক্রিয়ায় স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের উল্লেখযোগ্য কোনো বৃদ্ধি ঘটে না।	৩। এ প্রক্রিয়ায় উওসাইটের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি ঘটে।
৪। একটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে চারটি সক্রিয় শুক্রাণু সৃষ্টি হয়।	৪। একটি প্রাইমারি উওসাইট থেকে একটি সক্রিয় ডিম্বাণু ও তিনটি নিষেকে ভূমিকাহীন ক্ষুদ্র পোলার বডি সৃষ্টি হয়।
৫। এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শুক্রাণু কুসুমবিহীন এবং গতিক্ষম।	৫। এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ডিম্বাণু কুসুমযুক্ত হতে পারে এবং গতিক্ষমবিহীন।
৬। এ প্রক্রিয়ায় শুক্রাণুর মস্তকের সামনে অ্যাক্রোজোম সৃষ্টি হয় কিন্তু কোনো আবরণী সৃষ্টি হয় না।	৬। এ প্রক্রিয়ায় কোনো অ্যাক্রোজোম সৃষ্টি হয় না কিন্তু ডিম্বাণুর চারদিকে মুখ্য ও গৌণ আবরণী গঠিত হয়।
৭। স্পার্মাটোজেনেসিসে নিষেকে সহায়ক অ্যান্ড্রোগ্যামিক বস্তু ক্ষরিত হয়।	৭। উওজেনেসিসে নিষেকে সহায়ক গাইনোগ্যামিক বস্তু ক্ষরিত হয়।
৮। এ প্রক্রিয়ায় নিষেকের আগেই সক্রিয় বিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়।	৮। এ প্রক্রিয়ায় নিষেকের আগে বিপাক ক্রিয়ার হার স্তিমিত থাকে।

ডিম্বাণুর গঠন (Structure of Ovum)

বিভিন্ন প্রাণীর ডিম্বাণুর আকৃতি ও গঠন বিভিন্ন হলেও সাধারণভাবে সকল প্রাণীর ডিম্বাণুই গোলাকার বা উপবৃত্তাকার। অন্যান্য সাধারণ কোষের মতোই ডিম্বাণুতে নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তু ইত্যাদি থাকে। নেংটি ইঁদুরের ডিম্বাণু সবচেয়ে ছোট (ব্যাস ০.০৭ মিমি.)। মানুষের একটি স্বাভাবিক ডিম্বাণুর আয়তন প্রায় ১৪০ মাইক্রন। ডিম্বাণু প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা– **বাইরের আবরণ, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস**।

১। বাইরের আবরণ (Outer membrane) : কোষের মতো সকল ডিম্বাণুই কোষঝিল্লি বা প্লাজমা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। একে **ভাইটেলাইন ঝিল্লি** (vitelline membrane) বলে। এর বাইরের ও ভেতরের স্তর প্রোটিন নির্মিত। উৎপত্তি অনুসারে ডিম্বাণুর ঝিল্লিকে **মুখ্য আবরণী** (primary membrane) ও **গৌণ আবরণী** (secondary membrane) এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। ডিম্বাশয়ে অবস্থানকালীন সময়ে ডিম্বাণুর আবরণী সৃষ্টি হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মুখ্য আবরণীকে **জোনা পেলুসিডা** (zona pellucida) বলে। এই আবরণ **পাতলা** ও **স্বচ্ছ** হয়। ডিম্বাশয় থেকে মুক্ত হওয়ার পর ডিম্বকনালি অতিক্রম করে বাইরে আসার সময় পর্যন্ত যে সকল ঝিল্লি ডিম্বাণুর সাথে যুক্ত হয় তাদের **গৌণ আবরণী** বলে। তবে ডিম্বনালি থেকে উৎপন্ন আবরণীকে অনেকেই **টারশিয়ারি আবরণী** (tertiary membrane) বলে থাকেন। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু মুক্ত হওয়ার পর পেলুসিডা অঞ্চলের সাথে একস্তর ফলিকল কোষ যুক্ত থাকে। একে **করোনা রেডিয়েটা** (corona radiata) বলে। ডিম্বাণু ডিম্বকনালিতে প্রবেশের পর করোনা রেডিয়েটা খসে পড়ে।

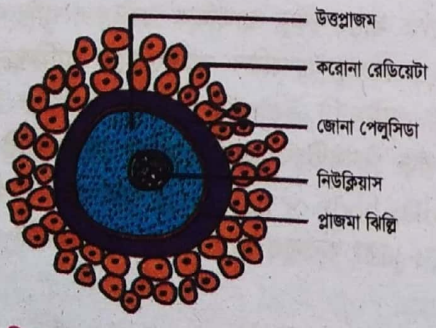

চিত্র ৯.৭ক : একটি ডিম্বাণু (মানুষের)

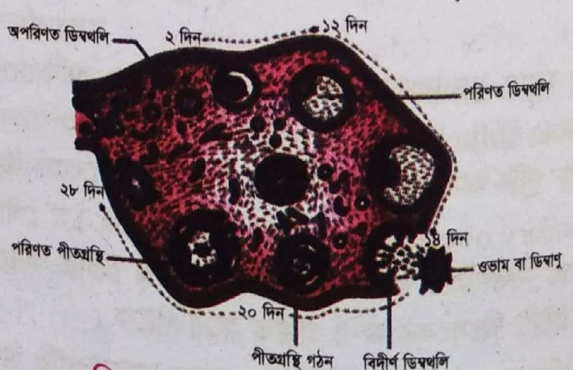

চিত্র ৯.৭খ : ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

২। সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) : ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমকে **উওপ্লাজম** (ooplasm) বলে। সাইটোপ্লাজম সুস্পষ্ট দানাদার; এতে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগিবস্তু, সেন্ট্রিওলসহ সকল ধরনের কোষীয় অঙ্গাণুই থাকে। অধিকাংশ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কুসুম বা **ডিওটেরোপ্লাজম** (deuteroplasm) থাকে যার উপর ডিম্বাণুর আকার নির্ভর করে। মানুষের ডিম্বাণুতে কোনো কুসুম থাকে না অথবা খুবই নগণ্য পরিমাণে থাকে। কুসুম থাকলে সাইটোপ্লাজমে সমানভাবে ছড়ানো থাকে তাই মানুষের ডিম্বাণুকে **মাইক্রোলেসিথাল ডিম্বাণু** (microlecithal egg) বলে। এরা

Scanned with CamScanner

আণুবীক্ষণিক। ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের যেদিকে বেশি কুসুম থাকে, সে অঞ্চলকে **ভেজিটাল পোল** (vegetal pole) বলে। এই অঞ্চল সাধারণত ভারী হয় এবং নিচের দিকে থাকে। অন্যদিকে নিউক্লিয়াস যে দিকে অবস্থান করে সে অঞ্চলকে **অ্যানিম্যাল পোল** (animal pole) বলে। এই অঞ্চল হালকা হওয়ায় উপরের দিকে থাকে। এই অঞ্চলেই প্রথম ক্লিভেজ শুরু হয়।

৩। **নিউক্লিয়াস** (Nucleus) : ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসটি স্বচ্ছ, বড় ও গোলাকার হয়। নিউক্লিয়াসে প্রচুর RNA ও ২৩টি ক্রোমোজোম থাকে।

ডিম্বাণুর প্রকারভেদ : কুসুমের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে প্রাণীদের ডিম্বাণুকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) ম্যাক্রোলেসিথাল : যেসব ডিম্বাণুতে কুসুম বেশি থাকে সেসব ডিম্বাণুকে ম্যাক্রোলেসিথাল বলে। যেমন- হাঁস, মুরগি ও অন্যান্য পাখির ডিম্বাণু।

(খ) মাইক্রোলেসিথাল : এসব ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ কম থাকে। যেমন– অ্যাম্ফিঅক্সাসের ডিম্বাণু।

(গ) অ্যালেসিথাল : এসব ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে বা একেবারেই থাকে না। যেমন– মানুষের ডিম্বাণু।

গ্যামিটোজেনেসিসের গুরুত্ব

(১) গ্যামিটোজেনেসিসের ফলে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় যা মানুষের যৌন জননের জন্য অপরিহার্য। (২) গ্যামিটোজেনেসিসে মিয়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে। এতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু হ্যাপ্লয়েড (n) প্রকৃতির হয়। এদের মিলনে জাইগোটে ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমোজোম সংখ্যা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে গ্যামিটোজেনেসিস দ্বারা জীবদেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে। (৩) গ্যামিটোজেনেসিসের মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় ক্রসিংওভার ঘটে, ফলে নতুন প্রাণীতে প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

মানুষের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে পার্থক্য

শুক্রাণু (sperm)	ডিম্বাণু (ovum/egg)
১। সচল।	১। স্থির বা নিশ্চল।
২। ছোট (ব্যাস প্রায় ২.৫ মাইক্রন)।	২। বড় (ব্যাস প্রায় ১৪০ মাইক্রন)।
৩। শুক্রাশয়ে সৃষ্টি হয়।	৩। ডিম্বাশয়ে সৃষ্টি হয়।
৪। সঞ্চিত খাদ্য থাকে না।	৪। কিছু খাদ্য সঞ্চিত থাকে।
৫। অনবরত তৈরি হয়।	৫। প্রতি রজঃচক্রে একটি করে তৈরি হয়।

(ঘ) নিষেক (Fertilization)

শুক্রাণু নিউক্লিয়াস ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের মিলনের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **নিষেক** বলে। যৌন জননক্ষম সকল জীবেই নিষেক অপরিহার্য। নিষেকের ফলে উৎপন্ন কোষকে **জাইগোট** (zygote) বলে।

নিষেকের প্রকারভেদ

(ক) সংঘটনের স্থান এর উপর ভিত্তি করে নিষেক দু'ধরনের, যথা-

১। **অন্তঃনিষেক** (Internal fertilization) : যে নিষেক প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে জননানালির মধ্যে সংঘটিত হয় তাকে অন্তঃনিষেক বলে। উন্নত শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীসহ (সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী) স্থলে বসবাসকারী অধিকাংশ প্রাণীতে অন্তঃনিষেক হয়।

২। **বহিঃনিষেক** (External fertilization) : যে নিষেক প্রাণিদেহের বাইরে কোনো জলীয় মাধ্যমে সংঘটিত হয় তাকে বহিঃনিষেক বলে। মাছ, উভচরসহ বেশিরভাগ অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও নিম্নশ্রেণির কর্ডাটা প্রাণীদের মধ্যে (অর্থাৎ অধিকাংশ জলচর প্রাণীতে) বহিঃনিষেক ঘটে।

(খ) গ্যামিটের উৎপত্তিগত দিক থেকে নিষেক দুধরনের, যথা-

১। **স্বনিষেক বা আত্মনিষেক** (Self fertilization) : কোনো প্রাণীর নিজ দেহের শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন বা নিষেককে স্বনিষেক বলে। যেমন- Platyhelminthes পর্বের ফিতাকৃমি, যকৃৎকৃমি ইত্যাদির নিষেক।

২। **পরনিষেক** (Cross fertilization) : যে নিষেক বা মিলন একই প্রজাতির দুটি পৃথক প্রাণী বা পুরুষ প্রাণীর শুক্রাণু এবং স্ত্রী প্রাণীর ডিম্বাণুর মধ্যে সম্পন্ন হয় তাকে পরনিষেক বলে। যেমন- হাইড্রা, আরশোলা, ব্যাঙ, মুরগি ও মানুষের নিষেক।

কোনো কোনো প্রাণীতে (যেমন- রটিফার, কীটপতঙ্গ, ক্রাস্টাসিয়া প্রভৃতি) শুক্রাণু দ্বারা নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু পরিস্ফুটিত হয়। এ ধরণের প্রজনন পদ্ধতিকে **পার্থেনোজেনেসিস** (parthenogenesis) বা **অপুংজনি** বলা হয়।

Scanned with CamScanner

মানবদেহে নিষেক প্রক্রিয়া

মানবদেহে যে নিষেক ঘটে তা প্রকৃতপক্ষে **সেকেন্ডারি উওসাইট** ও পরিণত **শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের** মধ্যে ঘটে থাকে এবং প্রক্রিয়াটি জরায়ুর **ফেলোপিয়ান নালির** ঊর্ধ্বাংশে সম্পন্ন হয়। কোনো একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুসংলগ্ন হলে তা ডিম্বাণু প্রাচীর ভেদ করে এবং ডিম্বাণুর প্রোনিউক্লিয়াসের সাথে মিলন ঘটে। প্রতিবার সঙ্গমে ১.৫-৪ মিলিলিটার বীর্যক্ষরিত হয় এবং এতে ৪০-১০০ মিলিয়ন শুক্রাণু থাকে। শুধু একটি শুক্রাণু নিষেক ক্রিয়ায় সফল হয়। তবে যৌন মিলনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিষেক সংঘটিত না হলে শুক্রাণু মারা যায়।

নিষেক প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপে ঘটে :

১। শুক্রাণু ডিম্বাণুর নিকট এলে ডিম্বাণু নিঃসৃত **ফার্টিলাইজিন** (fertilizin) এবং শুক্রাণু নিঃসৃত **অ্যান্টিফার্টিলাইজিন** (antifertilizin) নামক রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়ায় শুক্রাণু ডিম্বাণুর প্রাচীর সংলগ্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে **অ্যাগ্লুটিনেশন** (agglutination) বলে।



চিত্র ৯.৮ : শুক্রাণু কর্তৃক ডিম্বাণুর প্রাচীর ভেদ

২। নিষেকের জন্য শুক্রাণু যে ডিম্বাণুর গাত্রসংলগ্ন হয়, তা প্রকৃতপক্ষে একটি সেকেন্ডারি উওসাইট যা **করোনা রেডিয়েটা** (corona radiata) ও **জোনা পেলুসিডা** (zona pellucida) আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। শুক্রাণু সেকেন্ডারি উওসাইটের গাত্রসংলগ্ন হওয়ার পর শুক্রাণুর **অ্যাক্রোজোম** থেকে **হায়ালুরোনিডেজ** (hyaluronidase) এনজাইম নিঃসৃত করে। এটি করোনা রেডিয়েটার **হায়ালিউরোনিক এসিড** বিনষ্ট করে এবং এ সময় করোনা রেডিয়েটার কিছু কিছু কোষ মুক্ত হয়। তখন শুক্রাণু ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডা স্পর্শ করে।

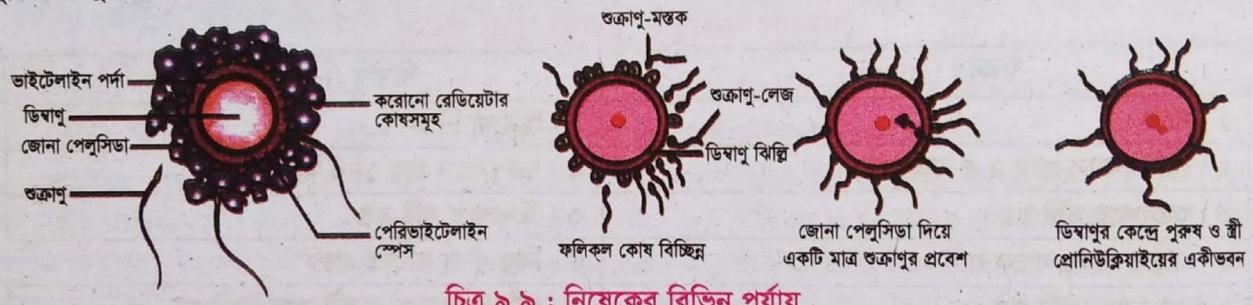

চিত্র ৯.৯ : নিষেকের বিভিন্ন পর্যায়

পরে অ্যাক্রোজোম থেকে নিঃসৃত **অ্যাক্রোসিন** (acrosin) এনজাইমের সহায়তায় শুক্রাণু জোনা পেলুসিডার স্তর ভেদ করে **পেরিভাইটেলিন** (perivitelline) স্পেসে জোনা পেলুসিডা ও ডিম্বাণুর ঝিল্লির মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করে। শুক্রাণু ঝিল্লি ও ডিম্বাণুর ভাইটেলিন পর্দা একত্রীভূত হয়। ফলে শুক্রাণুর চলন বন্ধ হয়ে যায় এবং নিষিক্ত ডিম্বাণু বা **জাইগোট** (2n) উৎপন্ন হয়। কোনো একটি শুক্রাণুর মস্তক ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুর চারদিকে একটি সুদৃঢ় ঝিল্লি গঠিত হয়। ফলে আর কোনো শুক্রাণু ডিম্বাণুতে প্রবেশ করতে পারে না। একে **নিষেক পর্দা** (fertilization membrane) বলে।

৩। ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর মস্তক স্ফীত হয়ে পুং প্রোনিউক্লিয়াস গঠন করে। অপরদিকে শুক্রাণু প্রবেশের সাথে সেকেন্ডারি উওসাইট উদ্দীপ্ত হয়ে মায়োটিক বিভাজন ঘটিয়ে পরিণত ডিম্বাণু এবং ২য় পোলার বডি দ্রুত গঠন করে, ২য় পোলার বডি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সময় শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসকে যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রী **প্রোনিউক্লিয়াস** (pronucleus) বলে। এই সময় শুক্রাণুর সেন্ট্রোজোমটি বিচ্যুত হয়ে পুং ও স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াস দুটির মধ্যে আবির্ভূত হয় এবং দ্রুত বিভক্ত হয়ে বিপরীত মেরুতে সজ্জিত হয়।

প্রোনিউক্লিয়াস দুটি একত্রিত হয়ে নবজাত নিউক্লিয়াস গঠন করে, যার মধ্যে 2n সংখ্যক অর্থাৎ ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে, এভাবে ডিম্বাণুটি ডিপ্লয়েড জাইগোটে পরিণত হয়।

নিষেকের গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Significance of fertilization) : (১) নিষেক জীবের ডিপ্লয়েড সংখ্যাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। (২) নিষেক পিতা ও মাতার বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিত করে। (৩) নিষেকের ফলে ডিম্বাণু পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়। (৪) নিষেক ডিম্বাণুর বিপাক হার ও প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে। (৫) নিষেকের ফলে জাইগোটে জিনের নতুন সমন্বয় ঘটে এবং এতে জীবে প্রকরণের সূচনা হয়। (৬) নিষেক জীবের বংশরক্ষার ও ধারাবাহিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং (৭) নিষেকের মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়।

❑ **কাজ :** (i) শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।/মানুষের শুক্রাণু উৎপাদন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। (ii) সেমিনিফেরাস নালিকায় সংঘটিত প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। (iii) নিষেক প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব উল্লেখ কর।

Scanned with CamScanner

(ঙ) জরায়ুতে ভ্রূণ সংস্থাপন বা ইমপ্ল্যানটেশন (Implantation)

ব্লাস্টোসিস্টের জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোথিত বা রোপিত হওয়ার পদ্ধতিকে **ইমপ্ল্যানটেশন বা রোপণ** বলে। নিষেকের পর ৬-৯ দিনের মধ্যে ব্লাস্টোসিস্টটি **এন্ডোমেট্রিয়ামে** (endometrium) প্রোথিত হয়।

১। নিষেকের পর জাইগোটে দ্রুত কোষ বিভাজন শুরু হয়। জাইগোটের বিভাজনকে **ক্লিভেজ** (clevage) বলে। জাইগোট বিভাজিত হয়ে যে কোষপুঞ্জ গঠন করে তাকে **মরুলা** (morula) বলে।

২। মরুলা ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে এক স্তরবিশিষ্ট **ব্লাস্টুলা** বা **ব্লাস্টোসিস্ট** (blastula or blastocyst) গঠন করে। ব্লাস্টোসিস্টের কোষস্তরকে **ব্লাস্টোডার্ম** (blastoderm), গহ্বরকে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) এবং প্রতিটি কোষকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) বলে।

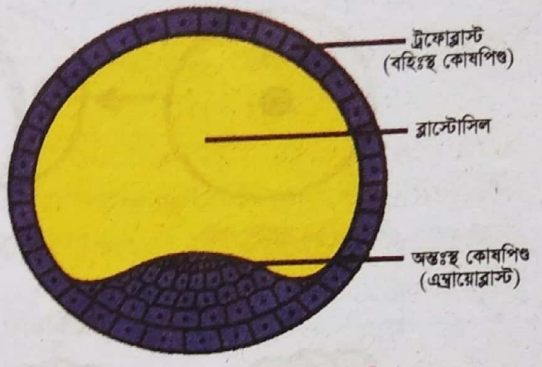

চিত্র ৯.১০ক : একটি ব্লাস্টোসিস্ট

৩। ব্লাস্টোমিয়ারের বাইরের স্তরকে **ট্রফোব্লাস্ট** (trophoblast) বলে। এর এক প্রান্তে কিছু কোষ জমা হয়ে **অন্তঃস্থ কোষপিণ্ড (এম্ব্রায়োব্লাস্ট)** গঠন করে।

৪। নিষিক্ত ডিম্বাণুর চারপাশে যে ট্রফোব্লাস্ট কোষস্তর থাকে তারা আগ্রাসন পদ্ধতিতে নালিগাত্র থেকে ক্ষরণ পদার্থ গ্রহণ করে ব্লাস্টোসিস্টের পুষ্টি সরবরাহ করে।

৫। ফেলোপিয়ান নালি অতিক্রমকালে ব্লাস্টোসিস্ট গঠিত হয়। ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুতে এসে পৌঁছালে জোনা পেলুসিডা অবলুপ্ত হয়। ইমপ্ল্যানটেশন চলাকালীন ব্লাস্টোসিস্টের ভেতরের কোষপিণ্ডে নানা পরিবর্তন ঘটে। ফলে ভেতরের কোষপিণ্ডের উপরিতলে এক স্তর চ্যাপ্টা কোষের আবির্ভাব ঘটে। একে **হাইপোব্লাস্ট** (hypoblast) বলে।

৬। ভেতরের কোষপিণ্ডের অবশিষ্ট কোষগুলো **এপিব্লাস্ট** (epiblast) গঠন করে। নিষেকের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম দিনের মধ্যে ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোথিত হয়।

৭। ইমপ্ল্যানটেশনের পর ট্রফোব্লাস্ট কোষগুলো দুটি স্তরে বিভেদিত হয়। বাইরের স্তরকে **কোরিওন** (chorion) বলে যা থেকে **কোরিওনিক ভিলাই** (chorionic villi) উৎপন্ন হয়ে এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রবেশ করে।

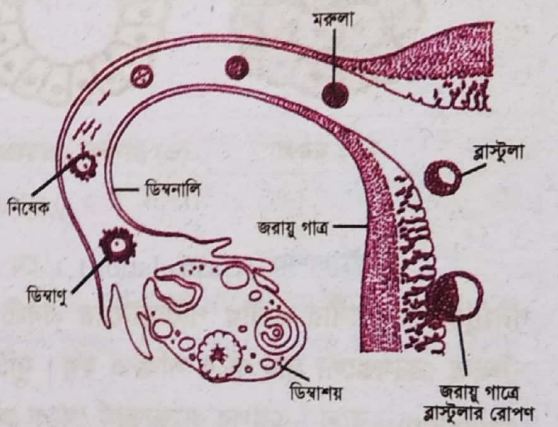

চিত্র ৯.১০খ : জরায়ু গাত্রে ইমপ্ল্যানটেশন বা রোপণ প্রণালি

৮। প্রাথমিক দশায় কোরিওনিক ভিলাইয়ের সাহায্যে ব্লাস্টোসিস্ট কোষ এবং মাতৃকোষের মধ্যে পুষ্টি, অক্সিজেন ও রেচন পদার্থের বিনিময় ঘটে। পরিস্ফুটনের পরবর্তী ধাপগুলোতে প্ল্যাসেন্টা বা অমরা এই দায়িত্ব নেয়।

ভ্রূণের ইমপ্ল্যানটেশনে বা রোপণে হরমোনের প্রভাব : পিটুইটারি নিঃসৃত FSH ও LH-এর প্রভাবে ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন দুটি জরায়ুর অন্তঃপ্রাচীরের এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরের বৃদ্ধি ঘটায় এবং ভ্রূণের ইমপ্ল্যানটেশনের উপযোগী করে তোলে।

(চ) ভ্রূণ গঠন প্রক্রিয়া (Formation of Embryo) বা এমব্রায়োজেনেসিস (Embryogenesis)

যৌন জননক্ষম জীবে নিষেকের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টি হয়। যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশু বা লার্ভায় পরিণত হয় তাকে **পরিস্ফুটন** (development) বলে। আর প্রতিটি সদস্যের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াই হলো **ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন** (ontogenic development)। জাইগোট বৃদ্ধি পেয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। জাইগোট থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **এমব্রায়োজেনেসিস** (embryogenesis) বলে। মানুষের ভ্রূণ গঠন প্রক্রিয়া ক্লিভেজ, গ্যাস্ট্রুলেশন ও অর্গানোজেনেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

১। ক্লিভেজ (Cleavage) : জাইগোট দ্রুত মাইটোসিস প্রক্রিয়া বিভাজিত হতে থাকে। যে পদ্ধতিতে জাইগোট মাইটোসিস বিভাজনের প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে অসংখ্যা ভ্রূণকোষ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা সম্ভেদ বলে। ক্লিভেজে সৃষ্ট ভ্রূণের প্রতিটি কোষকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) বলে। ক্লিভেজ পদ্ধতিতে জাইগোট ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে যে ক্ষুদ্র বহুকোষী নিরেট বলের মতো কোষপুঞ্জ গঠন করে তাকে **মরুলা** (morula) বলে। মরুলা হলো আদি ভ্রূণ। মরুলা

Scanned with CamScanner

ডিম্বনালি বা **ফেলোপিয়ান নালি** (oviduct or fallopian tube) থেকে জরায়ুতে এসে পৌঁছায় এবং পুনরায় বিভাজিত হয়ে একস্তরী তরলপূর্ণ ফাঁপা বলের আকার ধারণ করে, তখন তাকে **ব্লাস্টুলা** (blastula) বা **ব্লাস্টোসিস্ট** (blastocyst) বলে। ব্লাস্টুলার কোষস্তরকে ব্লাস্টোডার্ম (blastoderm) এবং তরলপূর্ণ কেন্দ্রীয় গহ্বরকে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) বলে। ভ্রূণ ব্লাস্টুলায় পরিণত হলেই ক্লিভেজ দশা শেষ হয়।

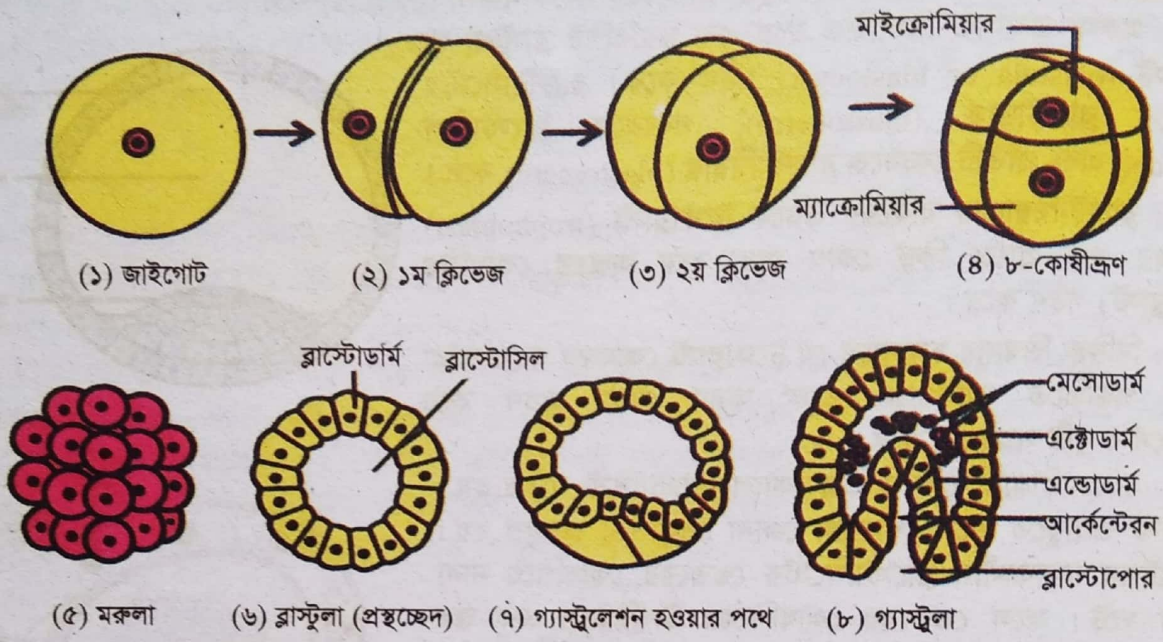

চিত্র ৯.১১ : মানুষের ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের বিভিন্ন দশা

২। গ্যাস্ট্রুলেশন (Gastrulation) : যে প্রক্রিয়ায় ব্লাস্টুলা থেকে গ্যাস্ট্রুলা গঠিত হয় তাকে **গ্যাস্ট্রুলেশন** বলে। গ্যাস্ট্রুলেশন প্রাণীর ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের একটি অতি পরিবর্তনশীল ও গতিশীল দশা। এতে প্রথমে ব্লাস্টুলার একস্তরে সজ্জিত কোষগুলো দুটি স্তরে সজ্জিত হয়। দুটি স্তরের বাইরেরটিকে **এক্টোডার্ম** (ectoderm) ও ভিতরেরটিকে **এন্ডোডার্ম** (endoderm) বলে। এরপর এন্ডোডার্ম থেকে **মেসোডার্ম** (mesoderm) নামক আর একটি স্তর গঠিত হয়। ভ্রূণের গ্যাস্ট্রুলা দশার এই তিনটি স্তরকে **ভ্রূণীয় স্তর** বা **জার্মলেয়ার** (germlayer) বলে। গ্যাস্ট্রুলার ভিতরের গহ্বরকে **আর্কেন্টেরন** (archenteron) বলে। এটি একটি ছিদ্র পথে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এ ছিদ্রকে **ব্লাস্টোপোর** (blastopore) বলে।

৩। অর্গানোজেনেসিস (Organogenesis) : গ্যাস্ট্রুলেশনে সৃষ্ট তিনটি ভ্রূণীয় স্তর থেকে বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্র গঠনের প্রক্রিয়াকে **অর্গানোজেনেসিস** বলে। প্রথমে ভ্রূণীয় স্তর থেকে ছোট ছোট কোষপিণ্ড আলাদা হলে **প্রাথমিক অঙ্গকুঁড়ি** (primary organ rudiment) সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে অঙ্গকুঁড়ি আরও বিকশিত হয়ে প্রাণীর নির্দিষ্ট অঙ্গ গঠন করে।

ভ্রূণ গঠনের প্রবাহচিত্র : মরুলা → ব্লাস্টুলা → গ্যাস্ট্রুলা → ভ্রূণ

মরুলা ও ব্লাস্টুলার পার্থক্য

মরুলা	ব্লাস্টুলা
১। মরুলা জাইগোটের বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয়।	১। ব্লাস্টুলা মরুলার বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয়।
২। এটি নিরেট বলের মতো কোষপুঞ্জবিশেষ।	২। এটি একস্তরবিশিষ্ট ফাঁপা বলের মতো গঠন বিশেষ।
৩। এর কেন্দ্রে কোনো গহ্বর সৃষ্টি হয় না।	৩। এর কেন্দ্রে তরলপূর্ণ ব্লাস্টোসিল নামক গহ্বর থাকে।
৪। পূর্বতন ডিম্বাণুর স্বচ্ছ বলয়টি মরুলার বহিরাবরণ গঠন করে।	৪। প্রথমদিকে স্বচ্ছ বলয় থাকলেও ব্লাস্টোসিস্ট বিদীর্ণ হওয়ার পর এটি বিলুপ্ত হয়।

Scanned with CamScanner

ব্লাস্টুলা ও গ্যাস্ট্রুলার পার্থক্য

ব্লাস্টুলা	গ্যাস্ট্রুলা
১। ব্লাস্টুলা মরুলা থেকে সৃষ্টি হয়।	১। গ্যাস্ট্রুলা ব্লাস্টুলা থেকে সৃষ্টি হয়।
২। এটি এক স্তরবিশিষ্ট।	২। এটি তিন স্তরবিশিষ্ট।
৩। এর গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল বলে।	৩। এর গহ্বরকে আর্কেন্টেরন বলে।
৪। এর কোষস্তরকে ব্লাস্টোডার্ম বলে।	৪। এর কোষস্তরকে এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম বলে।

(ছ) ভ্রূণ ও ফিটাসের বিকাশ (Development of Embryo and Foetus)

জরায়ুতে জাইগোট সংস্থাপিত হওয়ার পর থেকে গর্ভকালীন ৮ম সপ্তাহের শিশুকে **ভ্রূণ** বলে এবং এর পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুকে **ফিটাস** বলে। মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণ ও ফিটাসের বিকাশ ঘটে। জরায়ুতে ফিটাস প্রায় ৩৮ সপ্তাহ বা ৯ মাস অবস্থান করে। এ সময় ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তন ঘটে থাকে। যথা–

সপ্তাহ	পরিবর্তন
১ম সপ্তাহ	নিষেকের ৪-৫ দিন পরে জাইগোট বিভাজিত হয়ে প্রথমে মরুলা ও পরে ব্লাস্টুলা গঠন করে। ব্লাস্টুলা এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরে রোপিত হয়।
২য় সপ্তাহ	ব্লাস্টুলা ত্রিস্তরবিশিষ্ট হয়ে গ্যাস্ট্রুলাতে রূপান্তরিত হয়।
৩য় সপ্তাহ	স্ত্রীলোকের রজঃচক্র বন্ধ হয়ে গর্ভাবস্থা সূচিত হয়। ভ্রূণে নিউর‍্যাল টিউব, মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড গঠিত হয়।
৪র্থ সপ্তাহ	পৌষ্টিকনালি, হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও রক্তবাহ গঠিত হয়। ভ্রূণ লম্বায় প্রায় ৫ মিলিমিটার হয়। অ্যামবিলিকাল কর্ড বা নাভিরজ্জুর বৃদ্ধি ঘটাতে থাকে।
৫ম সপ্তাহ	হাত-পা গঠনের জন্য লিম্ববাড (limbbud) উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্ক বড় হতে থাকে। হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন শুরু হয়, ভ্রূণ লম্বায় প্রায় ৮ মিলিমিটার হয়। এই সময় **আলট্রা সাউন্ড**-এর মাধ্যমে ভ্রূণের হৃদধ্বনি শোনা যায়।
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	নাক, কান, চোখ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।
৭ম সপ্তাহ	ভ্রূণ লম্বায় প্রায় ১৭ মিলিমিটার হয়। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যক আন্তর অঙ্গগুলো গঠিত হয়। মুখমণ্ডল সৃষ্টি হয়। চোখের স্থান গাঢ় বর্ণ ধারণ করে। মুখগহ্বর এবং জিহ্বা গঠিত হয়। হাত এবং পা এর ঠিকমতো সূচনা হয়।
১০-১২ সপ্তাহ	যৌনাঙ্গ ছাড়া ভ্রূণের প্রায় সব অঙ্গ হয়। হাত ও পায়ের আঙুল সুস্পষ্ট হয়। ভ্রূণ নড়াচড়া শুরু করে। ভ্রূণের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬ মিলিমিটার হয়। এই সময় নারীর গর্ভাবস্থা সুস্পষ্ট হয়।
২০ সপ্তাহ	এই সময় ভ্রূণের মাথায় চুল সৃষ্টি হয়। চোখের পাতা ও ভ্রু গঠিত হয়। হাতের মুঠো শক্ত হয়। আঙুলের শেষভাগে নখ সৃষ্টি হয়। ভ্রূণ ভালোমতো নড়াচড়া শুরু করে। ভ্রূণের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০ মিলিমিটার হয়।
২৪ সপ্তাহ	চোখের পাতা উন্মোচিত হয়। এই সপ্তাহই **গর্ভপাতের** ক্ষেত্রে আইনগত শেষ সীমা নির্দেশিত করে।
২৬ সপ্তাহ	অপরিণত বা **সময়ের পূর্বে** (prematurely) জন্মের ক্ষেত্রে এই সময় বাঁচার একটা ভালো সুযোগ থাকে।
২৮ সপ্তাহ	এই সময় ভ্রূণ ব্যাপক নড়াচড়া শুরু করে দেয়। অ্যামনিওটিক তরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। শিশু জোরে হওয়া শব্দ এবং স্পর্শে সাড়া দেয়।
৩০ সপ্তাহ	শিশুর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০ মিলিমিটার হয়। শিশুর পূর্ণ অবয়ব গঠিত হয় এবং মাথা নিচের দিকে চলে যায়।
৪০ সপ্তাহ	স্বাভাবিক শিশুর ওজন প্রায় ৩ কেজির মতো হয়। এই সময় **গর্ভবেদনা** বা প্রসব ব্যথা বা **লেবার পেইন** (labour pain) শুরু হয় এবং শিশু জন্মগ্রহণ করে।

Scanned with CamScanner



চিত্র ৯.১২ : গর্ভাবস্থায় জরায়ুর মধ্যে মানব ভ্রূণ ও ফিটাসের বিকাশ

ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি (Fate of Germ layers)

বহুকোষী প্রাণীর ভ্রূণের পরিস্ফুটন চলাকালে এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক যে সকল কোষস্তর সৃষ্টি হয় তাদের **ভ্রূণীয় স্তর** (germ layers) বলে। এই সকল স্তর থেকে ভ্রূণে বিভিন্ন কলা, অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত হয়। অর্থাৎ এরাই ভ্রূণের গঠন ও বিকাশের যাবতীয় উপাদানের উৎস। তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি উল্লেখ করা হলো।

১। এক্টোডার্মের পরিণতি (Fate of ectoderm) : এক্টোডার্ম কোষের সাহায্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণের সমগ্রদেহের বাইরের আবরণ গঠিত হয়। এক্টোডার্মের এ কোষস্তর মেসোডার্মের মেসেনকাইম কোষের সাথে সম্মিলিতভাবে মিলে দেহের ত্বক গঠন করে। এক্টোডার্মাল কোষস্তর থেকে ত্বকের এপিডার্মিস গঠিত হয়। ত্বক হতে উদ্ভূত বিভিন্ন গ্রন্থি, শিং, চুল, ক্ষুর, নখ, আঁইশ, পালক এবং চোখের লেন্স ইত্যাদি সৃষ্টি হয় এপিডার্মিস থেকে। জিহ্বার আবরণ, ঠোঁট ও মুখবিবরের আবরণ, বিভিন্ন মৌখিকগ্রন্থি, পায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণ, ক্লোয়েকার অংশ ইত্যাদিও এক্টোডার্ম থেকেই সৃষ্টি হয়। পৌষ্টিকনালির অন্তঃপ্রাচীর এক্টোডার্মজাত কোষ দিয়ে আবৃত থাকে। এছাড়াও দাঁতের এনামেল, সকল সংবেদী অঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এক্টোডার্ম থেকে সৃষ্টি হয়।

Scanned with CamScanner

২। মেসোডার্মের পরিণতি (Fate of mesoderm) : ভ্রূণ বিকাশের সময় এন্ডোডার্ম থেকে মেসোডার্ম গঠিত হয় এবং এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মাঝখানে অবস্থান করে। ভ্রূণীয় বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মোসোডার্ম থেকে **এপিমিয়ার, মেসোমিয়ার** এবং **হাইপোমিয়ার** নামক তিনটি অংশের উদ্ভব হয় এবং এরা সুনির্দিষ্ট অঙ্গ গঠন করে থাকে। এপিমিয়ারের কিছু অংশ মেসেনকাইমরূপে ত্বকের ডার্মিস এবং কিছু অংশ নটোকর্ড গঠন করে। এপিমিয়ারের বাকি অংশ মায়োটোম গঠন করে যেগুলো থেকে দেহের অধিকাংশ পেশি গঠিত হয়। মেসোমিয়ার গঠন করে রেচন ও জনন অঙ্গ এবং এদের নালিসমূহ। হাইপোমিয়ার প্রাণীর ঐচ্ছিকপেশি, হৃৎপিণ্ড, পেরিকার্ডিয়াম, দেহগহ্বরের অন্তঃআবরণী ইত্যাদি গঠন করে। যোজক টিস্যু, উপাঙ্গিক কঙ্কাল, রক্তকণিকা, রক্তনালি, লসিকা, লসিকানালি, লসিকাগ্রন্থি, দাঁতের ডেন্টিন, চোখের বিভিন্ন অংশ, বৃক্কের কর্টেক্স ইত্যাদি গঠিত হয় ভ্রূণের মেসোডার্মের মেসেনকাইম থেকে।

৩। এন্ডোডার্মের পরিণতি (Fate of endoderm) : ভ্রূণীয় আর্কেন্টেরনের অন্তঃআবরণী অংশ ছাড়া এর সম্পূর্ণ অংশই গঠিত হয় এন্ডোডার্ম থেকে। এন্ডোডার্ম থেকে গলনালি, গলবিল, অন্ত্র এবং পাকস্থলী গঠনের সাথে সাথে বৃক্ক ও অগ্ন্যাশয়ের আবির্ভাব ঘটে। এসময় গলবিল অঞ্চলে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এর পার্শ্বদেশ থেকে কয়েক জোড়া ক্ষুদ্র থলিকা উদ্ভবের মাধ্যমে গঠিত হয় টনসিল, মধ্যকর্ণ, থাইমাস, থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি। স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে গলবিলের অঙ্কীয়ভাগের একটি উপবৃদ্ধি থেকে ট্রাকিয়া, ল্যারিংক্স ও ফুসফুসের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও মূত্রথলি, মূত্রনালি ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থি সৃষ্টি হয় এন্ডোডার্ম থেকে।

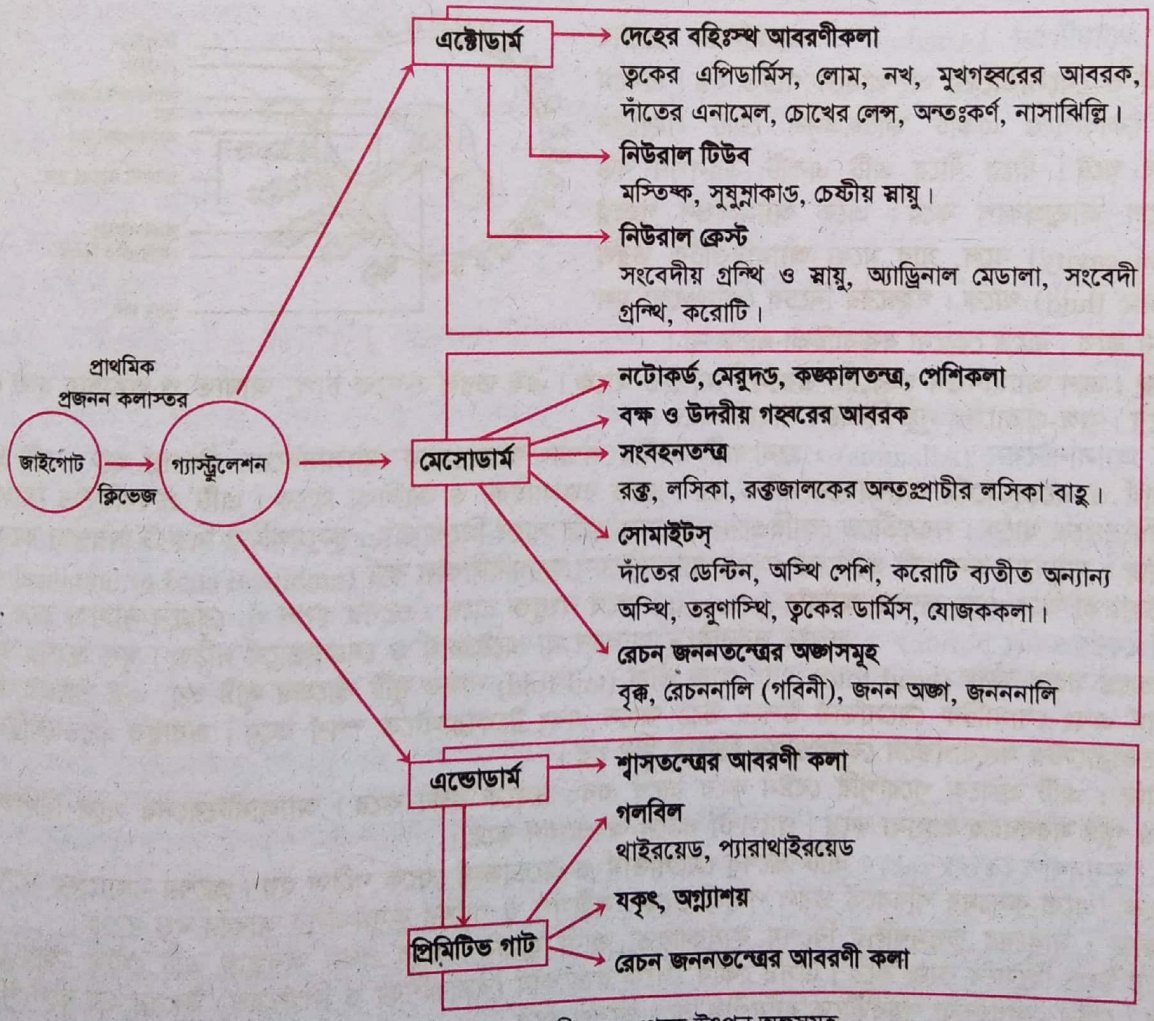

চিত্র ৯.১৩ : মানুষের ভ্রূণীয় স্তর থেকে উৎপন্ন অঙ্গসমূহ

কাজ : (i) ইমপ্ল্যান্টেশন পদ্ধতিটির বিশ্লেষণ পূর্বক মতামত দাও। (ii) ব্লাস্টুলা দশা কীভাবে জরায়ুতে প্রতিস্থাপিত হয়? ব্যাখ্যা কর। (iii) জাইগোট থেকে গ্যাস্ট্রুলা সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। (iv) গ্যাস্ট্রুলা দশার বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন ছাড়া পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠন অসম্ভব– বিশ্লেষণ কর। (v) ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদনে গ্যাস্ট্রুলার বিভিন্ন স্তরের পরিণতি ভিন্ন ভিন্ন– বুঝিয়ে লেখ।

Scanned with CamScanner

সংক্ষেপে পরিস্ফুরণের বিভিন্ন ধাপ ও তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি

পরিস্ফুরণের ধাপ	বৈশিষ্ট্যাবলি
১। জাইগোট	এককোষী নিষিক্ত ডিম্বাণু।
২। মরুলা	বহুকোষী ফাঁপা বলের মতো দশা।
৩। ব্লাস্টুলা	একস্তরবিশিষ্ট ব্লাস্টোসিল গহ্বরযুক্ত দশা।
৪। গ্যাস্ট্রুলা	ত্রিস্তরবিশিষ্ট আর্কেন্টেরন গহ্বরযুক্ত দশা।
৫। ভ্রূণের প্রথম অবস্থা (৩ সপ্তাহ)	ছোট মটরদানার মতো জীবন্ত ভ্রূণ।
৬। ৫ম সপ্তাহের ভ্রূণ	ভ্রূণ আকারে কিছুটা বড় হয়, রক্তবাহ ও হৃৎপিণ্ড গঠিত হয়।
৭। পরিণত অবস্থা (৮সপ্তাহ)	মানুষের ভ্রূণের আকার ধারণ করে, হাত-পা গঠিত হয়।
৮। পরিপূর্ণ ভ্রূণ (শিশু)	৪০ সপ্তাহে ভ্রূণ সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয় এবং জন্মলাভ করে।

ভ্রূণবহির্ভূত আবরণী (Extra Embrayonic Membrane)

ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় আবরণীরূপে যেসব আনুষঙ্গিক গঠন সৃষ্টি হয়ে ভ্রূণ দেহকে ঘিরে রেখে পরিস্ফুটন নির্বিঘ্ন করে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বর্জিত হয়, সেসব আবরণীকে **বহিঃভ্রূণীয় আবরণী** বা **ভ্রূণবহির্ভূত আবরণী** বা **ভ্রূণ পর্দা** বা **ভ্রূণ বহিঃস্থ পর্দা** (foetal membrane or extra embryonic membrane) বলে। মানবভ্রূণে চারটি বহিঃভ্রূণীয় আবরণী রয়েছে, যথা– (১) **অ্যামনিওন**, (২) **অ্যালানটয়েস**, (৩) **কোরিওন** ও (৪) **কুসুম থলি**।

১। অ্যামনিওন (Amnion) : অ্যামনিওন ভ্রূণের **এক্টোডার্ম** ও **মেসোডার্মের** অংশগ্রহণে গঠিত হয়। প্রথমে অন্তঃস্থ কোষপিণ্ডে একটি ফাটলসদৃশ ছোট গহ্বরের আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে এটি একটি তরলপূর্ণ বড় গহ্বররূপে আত্মপ্রকাশ করে। একে **অ্যামনিওন গহ্বর** (amnion cavity) বলে, যার মধ্যে **অ্যামনিওটিক তরল** (amniotic fluid) থাকে। গহ্বরের নিচের কোষগুলো মূল ভ্রূণ গঠন করে। এতে কোনো রক্তবাহিকা থাকে না।



চিত্র ৯.১৪ : বহিঃভ্রূণীয় আবরণী

কাজ : ভ্রূণ অ্যামনিওন গহ্বরের তরলে নিমজ্জিত থাকে। এই তরল ভ্রূণকে চাপ, আঘাত ও শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু বিকাশে সাহায্য করে।

২। অ্যালানটয়েস (Allantois) : স্তন্যপায়ী প্রাণীর পশ্চাৎ অন্ত্র থেকে অ্যালানটয়েস উৎপন্ন হয়। এটি ভ্রূণের **মেসোডার্ম** ও **এন্ডোডার্মের** অংশগ্রহণে গঠিত হয়। এতে রক্তবাহিকা ও জালিকা থাকে। এটি ভ্রূণবহির্ভূত সিলোমের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে কোরিওনের মেসোডার্মের সাথে মিশে যায়। কুসুমথলির নিকটে অবস্থান করে।

কাজ : মানুষসহ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে অ্যালানটয়েস **অ্যামবিলিকাল কর্ড** (umbilical cord or umbilical stalk) গঠনে সহায়তা করে এবং ভ্রূণকে **অমরার** (placenta) সাথে সংযুক্ত রাখে। ভ্রূণের শ্বসন ও রেচনে সাহায্য করে।

৩। কোরিওন (Chorion) : ভ্রূণের সর্ববহিঃস্থ আবরণ যা **এক্টোডার্ম** ও **মেসোডার্মে** গঠিত। মূল ভ্রূণের অগ্র ও পশ্চাৎ প্রান্তে মস্তক ভাঁজ (head fold) এবং লেজ ভাঁজ (tail fold) নামক দুটি ভাঁজের সৃষ্টি হয়, এই ভাঁজের কারণে এন্ডোডার্ম এবং সোমাটিক মেসোডার্ম উপরে উঠে আসে এবং ট্রফোব্লাস্টকে স্পর্শ করে। জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের সাথে ট্রফোব্লাস্টের সংযোগস্থলে **কোরিওনিক ভিলাই** সৃষ্টি হয়।

কাজ : এটি ভ্রূণকে পুরোপুরি বেষ্টন করে রাখে এবং ভ্রূণকে রক্ষা করে। অ্যালানটয়েসের সঙ্গে মিলিতভাবে শ্বসনে ও পুষ্টি সরবরাহে সাহায্য করে। প্লাসেন্টা গঠনে অংশগ্রহণ করে।

৪। কুসুমথলি (Yolk sac) : এটি ভ্রূণের **মেসোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম** থেকে গঠিত হয়। ভ্রূণের মধ্যান্ত্রের সঙ্গে এটি যুক্ত থাকে। এতে কুসুমের পরিবর্তে তরল পদার্থ থাকে। সরীসৃপ ও পাখির কুসুমথলির আকার বড় থাকে।

কাজ : মানুষের কুসুমথলির বিশেষ কার্যকারিতা জানা যায়নি। তবে প্রথম অবস্থায় এটি **স্টেম কোষ** (stem cell)-এর উৎস হিসেবে কাজ করে। এসব কোষ থেকে রক্তকোষ (রক্তকণিকা ও লিম্ফয়েড) উৎপন্ন হয় বলে অনুমান করা হয়। স্টেম কোষগুলো পরবর্তীতে বর্ধনশীল ভ্রূণে প্রবেশ করে।

গর্ভ বা প্রেগন্যান্সি (Pregnancy)

অন্তঃসত্ত্বা (conceive) থেকে শুরু হয়ে শিশুর জন্মদান পর্যন্ত সময়কালকে **গর্ভ** বা **প্রেগন্যান্সি** (pregnancy) বলে। এই সময় স্ত্রীদেহে নানারকম পরিবর্তন দেখা যায়। ৯ মাস ১০ দিন জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণ লালিত-পালিত হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ শিশু প্রসব হয়। প্লাসেন্টা এইসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Scanned with CamScanner

অমরা বা প্লাসেন্টা (Placenta)

ভ্রূণ ও মাতৃদেহে বিভিন্ন বস্তু বিনিময়ের নিমিত্তে ভ্রূণকলা ও মাতৃকলা মিলে যে বিশেষ অঙ্গ গঠন করে তাকে **অমরা বা প্লাসেন্টা** (placenta) বলে। নিষেকের ১২ সপ্তাহ পর (বা প্রায় ৪ মাসে) প্লাসেন্টা গঠিত হয়। নিষেকের ৮ সপ্তাহের (বা ২ মাস) মধ্যে ভ্রূণ মানুষের সকল অবয়ব লাভ করে অর্থাৎ এতে হাত, পা, মাথা গ্রীবা ইত্যাদি সকল কিছুই আবির্ভূত হয়। ভ্রূণের এ অবস্থাকে **ফিটাস** (foetus) বলে।

প্রকৃতপক্ষে অমরা হলো একটি **ফিটোমেটারনাল অঙ্গ** (Foetometernal organ)। এর অধিকাংশই ভ্রূণের কোরিওনিক ভিলাই থেকে গঠিত হয়। মাতৃদেহের জরায়ু প্রাচীরের এন্ডোমেট্রিয়াম অমরার কিছু অংশ গঠন করে। পূর্ণাঙ্গ প্লাসেন্টার ওজন প্রায় ৬০০ গ্রাম, ব্যাস ১৫-২০ সেমি. এবং মাঝখানে ৩ সেমি. পুরু। অমরার মাধ্যমে ভ্রূণ ও মাতৃদেহের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হলেও উভয়ের রক্তের মিশ্রণ ঘটে না। মানুষের অমরা বেশ বড় এবং চাকতি আকৃতির। একটি লম্বা (৪০ সেমি.) **আম্বিলিকাল কর্ড** (umbilical cord) বা **নাভিরজ্জু** দ্বারা অমরা ফিটাসের সাথে যুক্ত থাকে। এই রজ্জুর মধ্যে অবস্থিত শিরা ও ধমনির সাহায্যে মাতৃদেহ ও ভ্রূণ দেহের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর আদান-প্রদান ঘটে। এসব কারণে অমরাকে জৈব সেতু বলা হয়। প্লাসেন্টার মাধ্যমে ফিটাস ও মাতৃদেহের মধ্যে যে সকল বস্তুর আদান-প্রদান ঘটে তা নিম্নরূপ :

প্লাসেন্টার মাধ্যমে আদান-প্রদান

মাতা থেকে ফিটাস	ফিটাস থেকে মাতা
অক্সিজেন, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, লিপিড, ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল, ভিটামিন, বিভিন্ন ধরনের আয়ন (Na, K, Cl, Ca, Fe), অ্যালকোহল, নিকোটিন এবং অনেক ওষুধ, ভাইরাস, অ্যান্টিবডি।	কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া, অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ।

কাজ :

১। **পুষ্টিদ্রব্য সরবরাহ :** মাতৃদেহ থেকে পুষ্টিদ্রব্য প্লাসেন্টার মাধ্যমে ভ্রূণে সরবরাহ হয়।

২। **শ্বাসীয় আদান প্রদান :** মাতার রক্ত থেকে O_2 ভ্রূণের রক্তে এবং ভ্রূণের রক্ত থেকে CO_2 মাতৃরক্তে প্লাসেন্টার মাধ্যমে আদান প্রদান ঘটে।

৩। **উচ্চ রক্তচাপ :** প্লাসেন্টার সাহায্যে মাতার উচ্চ রক্তচাপ থেকে ফিটাস রক্ষা পায়।

৪। **রেচন :** ভ্রূণের দেহ থেকে বিপাকজাত রেচন বস্তুগুলো বা বর্জ্য পদার্থগুলো প্লাসেন্টার মাধ্যমে মায়ের রক্তে আসে।

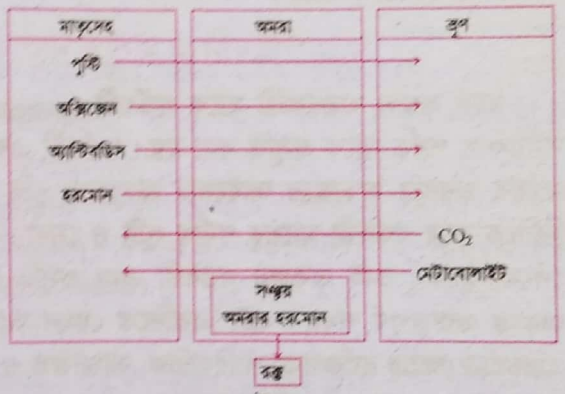

প্লাসেন্টার কাজ

৫। **হরমোন ক্ষরণ :** প্লাসেন্টা থেকে বিভিন্ন রকমের হরমোন ক্ষরিত হয়। এরকম প্রধান কয়েকটি হরমোন হলো– HCG (Human Chorionic Gonadotropin), এসট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, রিলাক্সিন ইত্যাদি।

৬। **রোগজীবাণু প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ :** এটি মাতৃ রক্ত থেকে ভ্রূণে রোগজীবাণু প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। ভাইরাস ও অ্যান্টিজেন প্লাসেন্টার মাধ্যমে ভ্রূণে প্রবেশ করতে পারে। [মা যদি গর্ভকালীন সময়ে যদি হাম, জলবসন্ত, গুটিবসন্ত, সিফিলিস, রুবেলা প্রভৃতি রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে ঐ ভাইরাস ভ্রূণদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি বা অঙ্গহানি ঘটাতে পারে।]

৭। **সঞ্চয় :** প্লাসেন্টায় বিভিন্ন বস্তু সঞ্চিত থাকে, বিশেষ করে গ্লাইকোজেন, প্রোটিন, ফ্যাট, ক্যালসিয়ামসহ কয়েকটি অজৈব লবণ ইত্যাদি।

৮। **ভ্রূণের সুরক্ষা প্রদান:** প্লাসেন্টা ভ্রূণের সুরক্ষা প্রদানসহ কিছু রোগের বিরুদ্ধে ভ্রূণদেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

শিশু প্রসব (Birth of a Baby)

জাইগোটি সৃষ্টির পর থেকে প্রায় ২৮০ দিনের মাথায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সাধারণত শিশুর ভূমিষ্ঠকাল ২৮০ ± ৫/৭ দিন। নিষেকের পর ৯-১০ সপ্তাহের মধ্যে বাহ্যিকভাবে ভ্রূণকে মানুষ হিসেবে শনাক্ত করা যায়। ভ্রূণের এই অবস্থাকে ফিটাস (foetus) বলে। জরায়ুতে ফিটাস প্রায় ৩৮ সপ্তাহ অবস্থান করে। এ সময়কালকে **গর্ভধারণ কাল** (gestation period) বলে। গর্ভধারণ কালের প্রথম ১২ সপ্তাহের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে প্রধান অঙ্গসমূহের অধিকাংশ তৈরি হয়ে যায়। শিশু প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণের জন্য ৩৮ সপ্তাহের সাথে ২ সপ্তাহ যোগ করে অর্থাৎ সর্বশেষ রজঃচক্রের প্রথম দিনের সাথে ৪০ সপ্তাহ যোগ করে সম্ভাব্য প্রসব দিন (Expected Delivery Date = EDD) নির্ধারণ করা হয়। তবে প্রসব ৫/৭ দিন পূর্বে বা পরে হতে পারে।

[কোনো সন্তানসম্ভবা নারীর সর্বশেষ রজঃচক্রের প্রথম দিন ১লা জানুয়ারি হলে তার সম্ভাব্য প্রসব দিন হবে অক্টোবর মাসের ০৭ তারিখ ± ৫/৭ দিন।]

Scanned with CamScanner

মানুষের গর্ভাবস্থা কাল গড়ে ৪০ সপ্তাহ। গর্ভাবস্থায় ১২তম সপ্তাহে প্লাসেন্টা ক্ষরিত **প্রোজেস্টেরন** হরমোনের প্রভাবে জরায়ুর সংকোচন বন্ধ থাকে। গর্ভাবস্থায় রক্তে প্রোজেস্টেরনের মাত্রা বাড়তে থাকে তবে ৩৮তম সপ্তাহে রক্তে প্রোজেস্টেরনের মাত্রা হঠাৎ করেই কমে যাওয়ায় জরায়ু সংকোচনের বাধা মুক্ত হয়। একই সাথে মাতার অগ্রপিটুইটারি গ্রন্থি থেকে **অক্সিটসিন** (oxytocin) এবং প্লাসেন্টা বা অমরা থেকে **প্রোস্টাগ্লান্ডিন** (prostaglandin) হরমোন ক্ষরণ শুরু হয়। ৪০তম সপ্তাহে হরমোন দুটির সক্রিয়তায় জরায়ুর সংকোচন ঘটে ও শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

যমজ শিশু (Twin Babies)

কখনো কখনো একসাথে দুটি বা তার বেশি শিশু জন্মগ্রহণ করে। এদের **যমজ শিশু** বলে। যমজ দু'ধরনের, যথা- **অভিন্ন** ও **ভিন্ন**।

১। অভিন্ন যমজ (Identical twins) : একটি জাইগোট ১ম বিভাজনের সময় দুটি পৃথক কোষে পরিণত হলে পরবর্তীতে উক্ত দুটি কোষ থেকে শিশুর জন্ম হয়। এরা একই লিঙ্গ বিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ে হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি এবং চেহারা প্রায় এক রকম হয়।

২। ভিন্ন যমজ (Non-identical twins) : দুটি পৃথক ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে দুটি জাইগোট উৎপন্ন হলে এই দুটি জাইগোট থেকে দুটি শিশুর জন্ম হয়। এদের বৈশিষ্ট্যাবলি হুবহু একই হয় না। বরং যে কোনো দুই (ছোট-বড়) ভাই-বোনের মতো বৈশিষ্ট্যাবলির মিল থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এরা দুই ভাই, দুই বোন অথবা একটি ভাই ও একটি বোনও হতে পারে।

৯.৩ গর্ভাবস্থা ও প্রসূতি মায়ের পরিচর্যা (Care of Pregnant Mother)

গর্ভে সন্তান ধারণকারী মাকে **গর্ভবতী** (pregnant) বলা হয় এবং সন্তান প্রসবের পর থেকে পরবর্তী ৮ সপ্তাহ সময়কাল পর্যন্ত মাকে প্রসূতি বলা হয়। গর্ভবতী এবং প্রসূতি কালের ব্যাপ্তি প্রায় ১২ মাস (৩৪-৩৮ সপ্তাহ)। গর্ভবতী মায়ের জরায়ুর অভ্যন্তরে জাইগোট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হয়। **শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে গর্ভবতী মায়ের পর্যাপ্ত পুষ্টি ও সেবা**। একইভাবে সন্তান ভূমিষ্ঠের পর স্তননিঃসৃত দুধ খেয়ে সন্তান বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই একজন গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়ের পরিচর্যা অপরিহার্য। গর্ভধারণ একজন মহিলার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এটা একদিকে যেমন আনন্দের অন্যদিকে তেমনি কষ্টেরও বটে। তাই এ সময়ে মায়ের পরিচর্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

গর্ভাবস্থায় পরিচর্যার উদ্দেশ্য

১। গর্ভজনিত কারণে মা বা শিশুর শারীরিক ক্ষতি ও মৃত্যু প্রতিরোধ করা।
২। নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা।
৩। নিজের উপর পূর্ণ আস্থা রাখার জন্য মানসিক অবস্থার উন্নতি করা।
৪। গর্ভবতী নারীকে খাদ্যপুষ্টি, সাধারণ স্বাস্থ্য বিধি ও শিশুর যত্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা।

গর্ভাবস্থায় করণীয় দিকসমূহ

১। খাদ্য : একজন সাধারণ মহিলার যে পরিমাণ ক্যালরি সম্পন্ন খাদ্যের প্রয়োজন, গর্ভবতী মায়ের তার চেয়ে ৫০০-১০০০ অধিক ক্যালরি সম্পন্ন খাদ্যের প্রয়োজন হয়। মায়ের খাদ্য তালিকায় শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, শাকসবজি পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া খাদ্য-লৌহ, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। দিনে ১ লিটার দুধ, ১ বা ২ টুকরা মাছ বা মাংস, ১টি ডিম, ১টি বা ২টি ঋতুকালীন ফল, টাটকা শাকসবজি এবং ভাত ও ডাল খাওয়া উচিত। লৌহের অভাব মিটানোর জন্য অতিরিক্ত আয়রন ট্যাবলেট গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রতিদিন কমপক্ষে ৮-৯ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত।

২। কোষ্ঠকাঠিন্য : কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াবার জন্য প্রতিদিন প্রচুর শাকসবজি এবং শুকনো খেজুর ও বীট খাবার তালিকায় রাখা উচিত।

৩। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : গর্ভবতী মাকে সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। নিয়মিত গোসল করতে হবে। ঢিলেঢালা আরামদায়ক পোশাক পরতে হবে। উঁচু হিলের জুতা পরিহার করতে হবে। দাঁত ও নখের যত্ন নিতে হবে।

Scanned with CamScanner

৪। দাঁত : গর্ভাবস্থায় দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে। তাই এই সময় দাঁত তুলতে গেলে বিপদ হতে পারে। এসব ব্যাপার পরিহার করতে হবে।

৫। স্তন : স্তনবৃন্ত স্তনের মধ্যে ঢুকে থাকলে তা উপরে উঠানোর চেষ্টা করতে হবে যাতে প্রসবের পর শিশুকে স্তন্যদানে কোনো সমস্যা না হয়। এই জন্য কোনো ক্রিম ব্যবহার করা উচিত।

৬। ত্বক : গর্ভাবস্থায় তলপেটের চামড়ায় টান পড়ার জন্য যোজক কলার তন্তুগুলো ছিঁড়ে যায়। ফলে তলপেটে দাগ পড়ে। এই অবস্থা এড়াতে হলে গর্ভাবস্থায় প্রথম মাস থেকে প্রসবের পরেও কয়েক মাস বুকে ও পেটে রোজ তেল মালিশ করতে হবে।



চিত্র : ৯.১৫ গর্ভবতী মায়ের সুরক্ষার চিহ্ন

৭। বিশ্রাম ও কাজকর্ম : গর্ভবতী মায়ের দুপুরে ২ ঘণ্টা এবং রাতে ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়া উচিত। সবসময় বাঁ পাশে কাত হয়ে শোয়া উচিত। এতে শিশুর বিকাশ স্বাভাবিক হয়। স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা নেই তবে ভারী কাজকর্ম না করাই ভালো।

৮। ভ্রমণ : গর্ভাবস্থার প্রথম ৩ মাস এবং শেষের ২ মাস ঝাঁকুনিযুক্ত ক্লান্তিকর ভ্রমণ করা উচিত নয়। এতে সন্তান ও মা উভয়েরই সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

৯। ধূমপান ও মদ্যপান : ধূমপানের ফলে গৃহীত তামাক রক্ত দ্বারা O_2 পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস করে। ফলে ভ্রূণের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত মদ্যপান করলে মাতার রক্তের ঘনত্বের পরিমাণ বেড়ে সাথে ভ্রূণের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে। তা না হলে কম ওজনের শিশু কিংবা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে।

১০। টিকা : প্রত্যেক মাকে গর্ভাবস্থার প্রথম ৫ম ও ৬ষ্ঠ মাসে একটি করে টিটেনাস টিকা নিতে হবে।

১১। যৌন মিলন : গর্ভসঞ্চারণের প্রথম ৩ মাস ও শেষ দেড় মাস যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা উচিত। তা না হলে এতে গর্ভপাত, অকাল প্রসব ও সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

১২। সর্বোপরি চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা : গর্ভাবস্থায় শুরুতে গর্ভবতী মাকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা এবং উপদেশ নেওয়া উচিত। প্রথম পরীক্ষার পর ২৮ সপ্তাহ পর্যন্ত মাসে একবার, ২৯-৩৬ সপ্তাহ পর্যন্ত মাসে দু'বার, ৩৭ সপ্তাহ থেকে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সপ্তাহে একবার পরীক্ষা করানো উচিত।

প্রসূতি মায়ের পরিচর্যা

গর্ভবতী মায়ের মতো প্রসূতি মায়েরও পরিচর্যার প্রয়োজন আছে। প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখতে হবে এবং ক্যালরিসম্পন্ন খাবার খাওয়াতে হবে। এছাড়া প্রচুর শাকসবজি, ফলমূল খাওয়াতে হবে, যাতে মায়ের কোষ্ঠকাঠিন্য না হয়। যেহেতু সন্তান মাতৃদুগ্ধ গ্রহণ করে প্রতিপালিত হয় কাজেই মায়ের স্তনবৃন্ত সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। শিশু সবসময় মায়ের দুধ পাচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখতে হবে। প্রসূতি মাকে কোনো ভারী কাজ দেওয়া যাবে না। মাকে বিশ্রাম নিতে হবে এবং আলো ও মুক্ত বায়ুসমৃদ্ধ স্থানে রাখতে হবে। ফলে প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্য ভালো হবে এবং মা ও শিশুর সম্পর্ক সুন্দর ও নিবিড় হবে।

❑ **কাজ :** (i) "একজন সুস্থ মা-ই কেবল পারেন একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে"– আন্তর্জাতিক নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসে (১১ই এপ্রিল) স্লোগানটি সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় কলেজ বোর্ডে স্থাপন কর। (ii) গর্ভকালীন সময়ে মহিলাদের পালনীয় বিষয়গুলি ব্যাখ্যা কর। (iii) গর্ভবর্তী নারীর ক্ষেত্রে বিশেষ পালনীয় বিষয়গুলো লেখ।

৯.৪ গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ও পরিবার পরিকল্পনা
(Contraceptive measures and Family Planning)

গর্ভনিরোধ পদ্ধতি (Contraceptive measures)

গর্ভনিরোধ হলো গর্ভধারণকে বাধা দেওয়া অর্থাৎ পুরুষের শুক্রাণুর সাথে স্ত্রীর ডিম্বাণুর মিলনে বাধা সৃষ্টি করা। অপরিকল্পিতভাবে সন্তান গ্রহণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বর্তমানে সারাবিশ্ব নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, সুচিকিৎসা, শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, বেকারত্ব বৃদ্ধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি। এজন্য প্রয়োজন পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ।

Scanned with CamScanner

বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি চালু হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনার যেসব গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে সকল ব্যবস্থাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক. **অস্থায়ী পদ্ধতি** ও খ. **স্থায়ী পদ্ধতি**।

(ক) অস্থায়ী পদ্ধতি (Temporary Methods)

১। প্রাকৃতিক পদ্ধতি (Natural Method)

(i) নিরাপদ গর্ভনিরোধক সময় (Safe period) : রজঃচক্রের ৭-২১ দিনের মধ্যবর্তী দিনগুলোকে বাদ দিয়ে সহবাস করলে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা কার্যকর হয়।

(ii) প্রত্যাহার প্রক্রিয়া (Withdrawal process) : বীর্য স্খলনের প্রাক্কালে পুরুষের যৌনাঙ্গকে (লিঙ্গ) যোনি থেকে প্রত্যাহার করে নিলে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা কার্যকর করা যেতে পারে। তবে এ প্রক্রিয়া যেমন কষ্টদায়ক, তেমনি নিরাপদ নয়। কারণ লিঙ্গ বের করতে করতে দু-এক ফোঁটা বীর্য যোনিতে পড়ে যেতে পারে।

(iii) দুগ্ধক্ষরণকালীন সময়ে রজঃস্রাব না হওয়া (Lactation Amenorrhea Method-LAM) : জন্মের পর শিশুর স্তন দুগ্ধ পানকালীন তিন মাস অবধি মায়ের রজঃস্রাব বন্ধ থাকে। এ সময় যৌন মিলনে গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে না।

২। যান্ত্রিক বা বাধাদায়ক পদ্ধতি (Barrier Method)

(i) কনডম ও ডায়াফার্ম (Condom and diaphram) : যৌন মিলনের পূর্বে পুরুষদের যৌনাঙ্গে পাতলা রাবার নির্মিত কনডম এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সারভিক্সে পাতলা রাবার নির্মিত ডায়াফার্ম ব্যবহার করে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কনডম সবচেয়ে নিরাপদ গর্ভনিরোধক এবং STD (Sexually Transmitted Diseases) প্রতিরোধক।

(ii) ফেম সিল্ড (Fem shield) : একে স্ত্রীলোকের কনডম বলা হয়। এটি এক ধরনের পলিইউরেথেন পাউচ বিশেষ। দু'পাশে দুটি রিং বা বলয় থাকে। ছোটটি যোনির ভিতরে এবং বড়টি যোনির বাইরে আটকে থাকে। এটি একাধারে বীর্য ও STD প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

(iii) সারভাইক্যাল ক্যাপ (Cervical cap) : এই ক্যাপ জরায়ুর সারভিক্সে লাগিয়ে দিলে বীর্য জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

(iv) ভল্ট ক্যাপ (Vault cap) : এটি এক ধরনের রাবারের বা ধাতুর তৈরি ক্যাপ। এটি সারভিক্সের মুখে লাগিয়ে দিলে বীর্য জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে না।

(v) স্পঞ্জ (Sponge) : এটি ভিজিয়ে যোনিতে স্থাপন করতে হয় এবং পর মুহূর্ত থেকেই কার্যক্ষম হলে ২৪ ঘণ্টা অনবরত প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে।

(vi) অন্তঃজরায়ুজ ব্যবস্থাপনা (Intra Uterine Device- IUD) : স্ত্রীদেহের জরায়ুর মধ্যে **লুপ** বা **কপার T** (loop or Copper T) প্রতিস্থাপন করে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কপার T একপ্রকারের আয়নযুক্ত তামার তৈরি গর্ভনিরোধক।

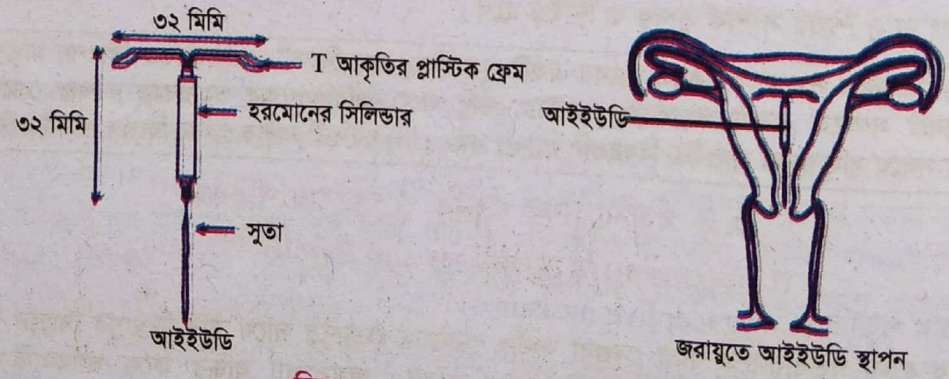

চিত্র ৯.১৬ : আইইউডি (IUD)

৩। রাসায়নিক পদ্ধতি (Chemical Method) : বিভিন্ন রকম গর্ভনিরোধক, শুক্রাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। এসব রাসায়নিক পদার্থ হলো ক্রিম, জেলি, ফোম, বড়ি ইত্যাদি। যৌন মিলনের প্রাক্কালে এ ধরনের ক্রিম যোনির মধ্যে দিয়ে দিলে গর্ভসঞ্চারণ হয় না।

Scanned with CamScanner

৪। শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি (Physiological Method)

(i) ইনজেকশন (Injection) : বেশ কয়েক মাস গর্ভধারণের ঝুঁকিমুক্ত থাকার জন্য DMPA (Depot-Medroxy Progesteron Acetate) ও NETEN (Norethisterone Enantate) নামক প্রোজেস্টেরন সমৃদ্ধ এক ধরনের ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়। প্রতি ৩ মাস ও ২ মাসে একটি করে ডোজ নিতে হয়।



চিত্র ৯.১৭ : গর্ভনিরোধক উপকরণ

(ii) মৌখিক গর্ভনিরোধক বড়ি (Oral Contraceptive Pill) : এই প্রকার বড়ি প্রোজেস্টেরন হরমোনের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ ইস্ট্রোজেন মিলিয়ে প্রস্তুত করা হয়। এই বড়ি স্ত্রীলোকদের রজঃচক্রের ৫-২৫ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন একটি করে খেতে হবে। এই প্রকার বড়ি হাইপোথ্যালমাসের ওপর ক্রিয়া করে LH ক্ষরণের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ফলে ডিম্বাণুর নিঃসরণ ব্যাহত হয়। এ ছাড়া জরায়ুতে ডিম্বাণু প্রোথিত হতে বাধা দেয় এবং সারভিক্সের মিউকাস পর্দাকে শুক্রাণু প্রবেশের বিরোধী করে তোলে। গর্ভনিরোধক বড়ির নিয়মিত ব্যবহার হঠাৎ বন্ধ করে দিলে গোনাডোট্রফিক হরমোনের ধারণ বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

(iii) রোপণ ক্যাপসুল বা হরমোন ইমপ্ল্যান্ট ক্যাপসুল (Hormone Implant Capsule) : এটি এক ধরনের হরমোন ডিভাইস যাতে ২টি ছোট ও চিকন ক্যাপসুল থাকে এবং এটি একজন নারীর বাহুর ত্বকের নিচে বসানো হয়। এটি ৩ বছর গর্ভানিরোধ হিসেবে কাজ করে। যেমন– Norplant ও Implanon.

(iv) এমারজেন্সি গর্ভনিরোধক (Emergency Contraceptive) : হঠাৎ অসুরক্ষিত অবস্থায় যৌন মিলন ঘটলে ১২ ঘণ্টার মধ্যে Ovral দুটি বড়ি খেয়ে নিলে গর্ভরোধ হয়। এ ছাড়া ipil, noval, norgynon, oviclon তাৎক্ষণিক গর্ভনিরোধের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫। গর্ভপাত (Abortion) : গর্ভপাত হলো অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অথবা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে গর্ভের ভ্রূণকে পরিণত হওয়ার পূর্বে বিচ্যুত করিয়ে দেহের বাহিরে বের করে আনা। গর্ভসঞ্চারের ১২ সপ্তাহের মধ্যে এ কাজটি করা দরকার। তা না হলে মায়ের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে।

(খ) স্থায়ী বা সারজিক্যাল পদ্ধতি (Permanent or Surgical Methods)

বন্ধ্যাকরণ (sterilisation) গর্ভনিরোধের স্থায়ী পদ্ধতি। সহজ ও নিরাপদ শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রীদের বন্ধ্যাকরণ অর্থাৎ প্রজনন ক্ষমতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি **ভ্যাসেকটমি** (vasectomy) এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে **টিউবেকটমি** বা **লাইগেশন** (tubectomy or ligation) নামে পরিচিত।

১। ভ্যাসেকটমি (Vasectomy) : পুরুষের উভয় পাশের শুক্রনালির (ভাসডিফারেন্স) অংশ কেটে বেঁধে দিলে শুক্রাণু ডিম্বাণু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। ফলে নিষেক ঘটতে পারে না। এক্ষেত্রে পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা, উত্থান, সঙ্গম, বীর্যপাত সবই স্বাভাবিক থাকে।



চিত্র ৯.১৮ক : ভ্যাসেকটমি



চিত্র ৯.১৮খ : টিউবেকটমি

Scanned with CamScanner

২। টিউবেকটমি বা লাইগেশন (Tubectomy or ligation) : মহিলাদের ক্ষেত্রে দু'পাশের ফেলোপিয়ান নালির অংশ কেটে বেঁধে দিলে শুক্রাণু প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নিষেক ঘটে না। এক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা, রজঃচক্র স্বাভাবিক থাকে। অধিক সন্তানের মা বা যারা একবারেই সন্তান চান না বা গর্ভধারণের জন্য শারীরিকভাবে অসুস্থ মহিলাদের জন্য এটি সবচেয়ে উপযোগী ও কার্যকর পদ্ধতি।

গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Contraceptive measures)

গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য অবাঞ্ছিত জন্ম রোধ করা। অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ মায়ের স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত এবং তা পরিবারের সকলের ওপর প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া নবদম্পতি তাদের পছন্দ সময়ে গর্ভধারণ করতে পারে সেক্ষেত্রে অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। দুটি সন্তান আছে এমন দম্পতি আর সন্তান না নেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে দেশের কাম্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। উন্নয়নশীল বিশ্বও বর্তমানে তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সচেষ্ট শুধুমাত্র দেশের কল্যাণের জন্যই নয়; বরং বিভিন্ন মূল্যবোধকে জাগিয়ে রাখতে গর্ভনিরোধক পদ্ধতি তথা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১। সামাজিক মূল্যবোধ : মানুষ সমাজবদ্ধ এবং বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে তার সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সমাজের বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপ যেমন : **মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, সামাজিক অপরাধ (চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি** ইত্যাদি), একে অপরের প্রতি অসহনশীলতা ও নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি দিন দিন বেড়েই চলেছে। ওইসব কার্যকলাপের পেছনে দায়ী মূলত অধিক জনসংখ্যা। যা দেশের বেকারত্বের হারকে বাড়িয়ে তুলেছে। অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে সমাজ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে। সুতরাং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই **সামাজিক মূল্যবোধ** অক্ষুণ্ন রাখা সহজ হবে।

২। ধর্মীয় মূল্যবোধ : প্রায় সকল ধর্মেই পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু অপরিকল্পিত গর্ভধারণের ফলে গর্ভপাত ঘটনাকে পাপকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি বা দম্পতি যদি তার ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত বা বজায় রাখতে চান তবে তিনি বা তাদের যথাসময়ে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও সঠিক বাস্তবায়ন করা উচিত।

পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning)

পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা নির্ভর করে পরিবার ছোট হলে। তাই একটি বা দুটি সন্তানই যথেষ্ট। অধিক সন্তান জন্ম দিলে তাদের সঠিক লালনপালন, রোগের চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুতেই সমস্যা দেখা দেয়। সেজন্য ছোট পরিবারই কাম্য। ছোট পরিবার অর্থাৎ পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখার ব্যবস্থাই হলো **পরিবার পরিকল্পনা**। সেই জন্য প্রয়োজন গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা। পরিবারের কল্যাণ ও উন্নতির লক্ষ্যে যদি চিন্তাভাবনা করে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে পরিকল্পিতভাবে সন্তান গ্রহণের তথা পরিবার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তবে তাকেই **পরিবার পরিকল্পনা** বলে। গর্ভনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ হলো পরিবার পরিকল্পনার মূলনীতি।

পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য : (১) অনাকাঙ্ক্ষিত জন্ম পরিহার ও কাঙ্ক্ষিত জন্ম নিশ্চিত করা। (২) একাধিক গর্ভধারণের মধ্যবর্তী বিরতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। (৩) মহিলাদের উপযুক্ত বয়সে সন্তান জন্মের নিশ্চয়তা দান করা। (৪) সন্তানের সংখ্যা নির্ধারণ করা। (৫) গর্ভপাত রোধ এবং মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। (৬) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা। (৭) দারিদ্র্য বিমোচন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করে দেশের উন্নয়ন করা।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় (Way of Population Control)

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাংলাদেশে ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত জনসংখ্যা চাপ সৃষ্টি করেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো নিম্নরূপ–

১। বিবাহ বন্ধনের নিয়মকানুন : বিভিন্ন ধর্মমতের বিবাহ পদ্ধতিকে উৎসাহিত করতে হবে। কোথাও বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলে সেক্ষেত্রে সন্তান সংখ্যা সম্পর্কে কঠোর আইন এবং আইন লঙ্ঘনকারীর উপযুক্ত শাস্তির বিধান করতে হবে।

Scanned with CamScanner

২। **শিক্ষা :** প্রাথমিক পর্যায় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেক দম্পতিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য দক্ষ মাঠকর্মী নিয়োগ করতে হবে।

৩। **গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা ও প্রণোদনা :** কাঙ্ক্ষিত সন্তানসংখ্যা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দম্পতিদের স্থায়ী গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করাতে হবে। এ বিষয়ে গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও শহরের ওয়ার্ড কমিশনারের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে। গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণকারী পরিবারকে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।

৪। **বিয়ের বয়স নির্ধারণ :** আইন লঙ্ঘনকারীদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান রেখে নারী ও পুরুষের বিয়ের বয়স রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৫। **সন্তান সংখ্যা নির্ধারণ :** প্রত্যেক দম্পতির ক্ষেত্রে 'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়'। এই স্লোগান কার্যকর করতে হবে।

৬। **চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা :** খেলাধুলা, সিনেমা, নাটক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি ব্যবস্থা মানুষের জন্মহার কমাতে সহায়তা করে। তাই জনগণের জন্য চিত্তবিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭। **সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :** নির্ধারিত সময়ের পর বিয়ে এবং এক সন্তান/ দুই সন্তানবিশিষ্ট পরিবারকে লেখাপড়া, ভ্রমণ ও চাকরিতে বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.৫ আইভিএফ (IVF) পদ্ধতি-কৃত্রিম গর্ভধারণ পদ্ধতির উপযোগিতা

(IVF Process- Usefulness of In Vitro Fertilization Process)

প্রকৃতিগত পদ্ধতি বাদ দিয়ে কৃত্রিম পরিবেশে জরায়ুর বাইরে আবাদ পাত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষকে একত্রে রেখে নিষেক ঘটানোকেই **ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন** (Invitro fertilization) বা **IVF** বলে।

স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সন্তান জন্মদানে ব্যর্থ হলে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে প্রকৃতিগত পদ্ধতি বাদ দিয়ে **ইনভিট্রো** অর্থাৎ গ্লাসের ভেতর (in glass) মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয় অর্থাৎ **মানব ডিম্বাণু-শুক্রাণুর নিষেক ক্রিয়া দেহের বাইরে সম্পন্ন হয়**। গ্লাসে বা টেস্টটিউবে নিষেক সংঘটিত হয়ে ভ্রূণে পরিণত হলে উক্ত ভ্রূণকে স্ত্রী জরায়ুতে স্থাপন করা হয়, যা পরে স্বাভাবিক গর্ভ সঞ্চারণের মতোই বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়।

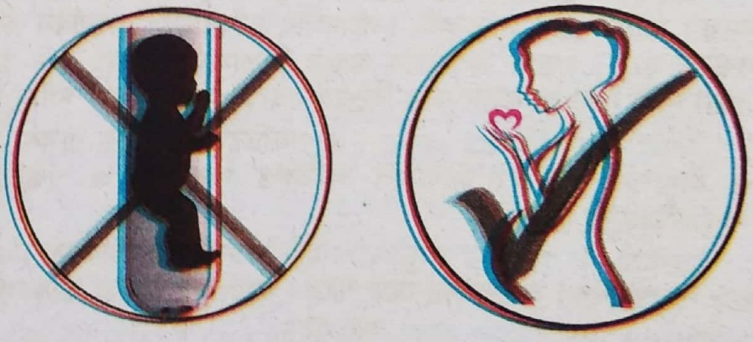

ভিট্রো একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ **বাইরে**। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো **গ্লাস**। গ্লাসের পাত্রে নিষেক সংঘটিত হয় বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে **টেস্ট টিউব পদ্ধতি** বা **অ্যাসিস্টেট রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি** (Assisted Reproductive Technology-ART)। আর এ পদ্ধতিতে ভূমিষ্ট শিশুকে বলা হয় **টেস্টটিউব বেবি**। টেস্টটিউব পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত জীবাণুমুক্ত একটি গবেষণাগার প্রয়োজন, স্বামী বা স্ত্রী যে কারও সমস্যার জন্যই IVF পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে সমস্যা যারই থাকুক না কেন সম্পূর্ণ চিকিৎসা স্ত্রীকে দেওয়া হয়।

আইভিএফ কৌশল : সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্ত ধাপে সম্পন্ন করা হয়।

১। পিরিয়ডের ২১তম দিন থেকে বা প্রথম দিন থেকে একনাগাড়ে ১০-১৫ দিন স্ত্রীকে একটি হরমোন ইনজেকশন দিতে হবে। অতঃপর **আলট্রাসনোগ্রাফি** (Ultrasonography-USG) ও রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

২। দ্বিতীয় ধাপে পূর্বোক্ত পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রথম ইনজেকশনের সাথে অন্য রকম আরেকটি হরমোন ইনজেকশন দিতে হয়। ফলে ডিম্বাণু তৈরি হয়। ডিম্বাণু পরিপক্ব হলে ১ম ও ২য় ইনজেকশন দুটো বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২৪ ঘণ্টা পর তৃতীয় ও অন্য প্রকৃতির আরেকটি হরমোন ইনজেকশন দেওয়া হয়।

৩। তৃতীয় ইনজেকশন দেওয়ার ৩৪-৩৬ ঘণ্টার মধ্যে আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে এবং ল্যাপারোস্কোপির সাহায্যে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়। এই সময় স্ত্রীকে অজ্ঞান করে নেওয়া হয় অথবা ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়। এ পর্বটি ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

Scanned with CamScanner

৪। এবার জীবাণুমুক্ত একটি পাত্রে স্বামীর বা অন্য কোনো দাতা (donor)-এর শুক্রাণু সংগ্রহ করা হয়। গবেষণাগারে শুক্রাণুকে বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে পরিষ্কার করে সুবিধামতো মাধ্যমে (media) সংগৃহীত ডিম্বাণুর সাথে একটি ইনকিউবিটরে (incubator) ৪৮ ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। এ অবস্থায় ইনভিট্রোতে নিষেক ঘটবে এবং ক্লিভেজ চলতে থাকবে এবং প্রাথমিক ভ্রূণে পরিণত হতে থাকবে।

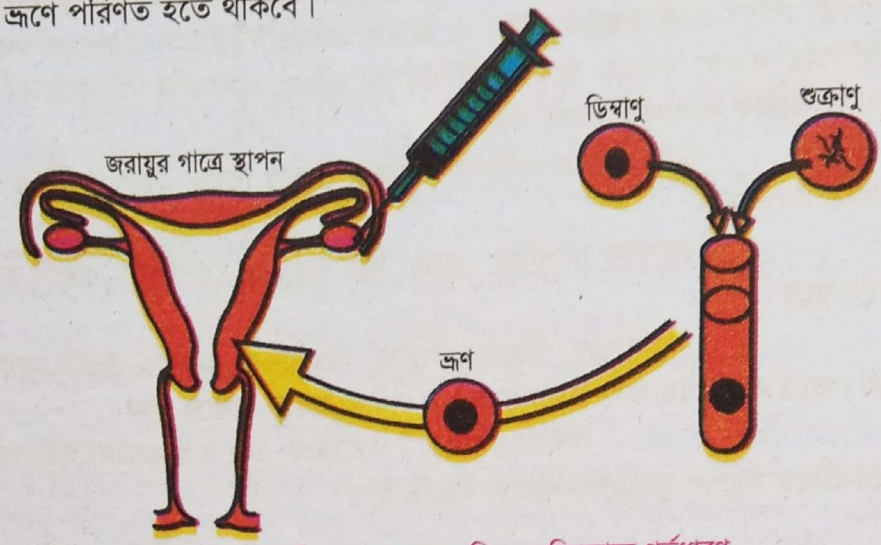

চিত্র ৯.১৯ : আইভিএফ (IVF) পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে গর্ভধারণ

৫। এই পর্যায়ে জরায়ুতে ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করতে হবে। ৪৮ ঘণ্টা পর স্ত্রীর বয়সের অনুপাতে ৪-৮ কোষবিশিষ্ট ২-৩টি সর্বোত্তম ভ্রূণ স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। এটি খুব সহজ ও ব্যথামুক্ত পদ্ধতি। এতে স্ত্রীকে অজ্ঞান বা অচেতন করার প্রয়োজন পড়ে না। সবক'টি ধাপ শেষে ১৫ দিন পর রক্ত পরীক্ষা করা হয়। ফলাফল পজিটিভ হলে আরও ১৫ দিন পর **ইউএসজি** (USG) করে গর্ভধারণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

জরায়ুতে স্থাপনের পর স্বাভাবিক ভ্রূণের মতোই এই ভ্রূণের পরিস্ফুটন ও বৃদ্ধি ঘটে এবং স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসব করে। তবে পুরো প্রক্রিয়াটি চলাকালীন সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং হাসিখুশি ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হবে। সন্তান জন্মদানে অক্ষম পিতামাতার জন্য IVF পদ্ধতি একটি আশীর্বাদস্বরূপ। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বন্ধ্যা নারী শিশু জন্মদান করে নিজের বন্ধ্যত্ব ঘোচায় এবং স্বর্গীয় সুখ লাভ করে।

আইভিএফ পদ্ধতির সুবিধা : এ পদ্ধতিতে মাতৃত্বের বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। ডিম্বনালি ক্ষতিগ্রস্ত থাকলেও এ পদ্ধতিতে গর্ভধারণ সম্ভব এবং এর কোনো দীর্ঘস্থায়ী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

আইভিএফ পদ্ধতির অসুবিধা : এটি ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসা। এর ফলে বেশি বার গর্ভধারণে গর্ভপাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এতে শিশুর অকাল জন্ম হতে পারে। ওষুধের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মানসিক চাপে স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

আইভিএফ পদ্ধতি কেন পছন্দ করা হয়?

নারীর সন্তানধারণের কাজে IVF পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নারী ও পুরুষের প্রজননের অক্ষমতার কারণে IVF চিকিৎসা পদ্ধতি সন্তানহীন দম্পতিদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। যেসব কারণে দম্পতিদের IVF পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সেগুলো হলো - (১) সন্তানহীন দম্পতিদের মধ্যে স্ত্রীর বয়স বেশি হয়ে গেলে। (২) নারীর ডিম্বনালির সমস্যা থাকলে। (৩) স্বামীর কার্যকর শুক্রাণুর সংখ্যা কম থাকলে। (৪) নারীর জরায়ুর মুখ থেকে ডিম্বনালি পযর্ন্ত প্রয়োজনীয় শুক্রানু যেতে অসমর্থ হলে। (৫) এন্ডোমেট্রিওসিস রোগের কারণে (জরায়ুর অন্তঃপ্রাচীরের কোষ প্রজননতন্ত্রের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত থাকলে তাকে এন্ডোমেট্রিওসিস রোগ বলে)। (৬) অব্যাখ্যায়িত প্রজননের অক্ষমতার কারণে।

IVF পদ্ধতি বর্তমানে সন্তানহীন দম্পতিদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এই পদ্ধতিতে টেস্টটিউব বেবি জন্ম দেওয়া আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ১০ ভাগের বেশি দম্পতি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে সন্তান জন্মদানে অক্ষম। The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART, 2013)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৫০ লাখের মতো টেস্টটিউব বেবি রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট : টেস্টটিউব বেবির জন্ম দেওয়া বাংলাদেশে এক সময় কল্পনার বিষয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এটি সফলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. পারভীন ফাতেমার তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে ২০০১ সালের ৩০ মে ফিরোজা বেগম নামের এক প্রসূতি প্রথম টেস্টটিউব বেবির জন্ম দেন। তিনি একসাথে তিন কন্যা শিশুর জন্ম দেন। এদের নাম ছিল হীরা, মনি ও মুক্তা। ঢাকার শ্যামলীতে Centre for Assisted Reproduction (CARe) এবং স্কয়ার হাসপাতালের Fertility Centre-এ বর্তমানে বন্ধ্যত্বের চিকিৎসা করা হচ্ছে।

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট : দু'জন ইংরেজ বিজ্ঞানী **Dr. Patrick Steptoe** এবং **Dr. Robert Edwards**-কে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (Invitro fertilization-IVF)-এর জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তারা IVF পদ্ধতি প্রয়োগ করে ইংল্যান্ডের ওল্ডহাম শহরে **Gilbert Brown**-এর স্ত্রী **Lesley Brown** -এর গর্ভে শিশুকন্যার জন্ম দিতে সক্ষম হন। শিশুকন্যাটির জন্ম হয়েছিল ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই। তার নাম দেওয়া হয়, **Louise Joy Brown**। এটিই পৃথিবীর প্রথম টেস্টটিউব বেবি। সেই **Louise Brown** ২০০৬ সালের ২১ ডিসেম্বর এক সুস্থ ছেলে শিশুর জন্ম দিয়েছেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। উল্লেখ্য যে, IVF-এর এই অবদানের জন্য **Edwards** ২০১০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : আধুনিক জননগত প্রযুক্তির সাহায্যে বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে। বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ সম্পর্কে কয়েকটি প্রযুক্তি হলো–

১। **IVF-ET (Invitro Fertilization and Embryo Transfer) :** টেস্টটিউব বেবি তৈরির প্রযুক্তিতে এই দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। দেহের বাইরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটানোকে invitro নিষেক বলে। নিষেকের পর ৪-৮ কোষবিশিষ্ট ভ্রূণকে মাতৃ জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়।

২। **GIFT (Gamete Intra Fallopian Transfer) :** ল্যাপারোস্কোপির সাহায্যে অসংখ্য চলনশীল শুক্রাণু (২-৫ লক্ষ) এবং দুটি অনিষিক্ত ডিম্বাণুকে ফেলোপিয়ান নালিতে প্রতিস্থাপন করা হয়। ফেলোপিয়ান নালিতে শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে, এই প্রকার নিষেককে invivo নিষেক বলে।

৩। **ZIFT (Zygote Intra Fallopian Transfer) :** এক্ষেত্রে দেহের বাইরে নিষেক ঘটিয়ে নিষিক্ত ডিম্বাণু তথা জাইগোটটিকে ল্যাপারোস্কোপির সাহায্যে ফেলোপিয়ান নালিতে প্রতিস্থাপন করা হয়।

৪। **ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) :** এই পদ্ধতিতে ওভাম-এর মধ্যে সরাসরি স্পার্ম ইনজেক্ট করে ল্যাবরেটরিতে ভ্রূণ উৎপন্ন করা হয়।

৫। **AI (Artificial Insemination) :** এক্ষেত্রে পুরুষ যখন স্ত্রীলোকের জননাঙ্গে রোপণে অক্ষম হয়, তখন হয় স্বামীর অথবা অন্য কোনো সুস্থ স্বাভাবিক দাতার বীর্যকে কৃত্রিম উপায়ে যোনিপথে অথবা জরায়ুতে (IUI – Intra Uterine Insemination) স্ত্রীলোকের দেহে প্রবেশ করানো হয়।]

৯.৬ প্রজননজনিত সমস্যা ও প্রতিকার
(Problems and Control of Reproductive System)

কোনো ধরনের জন্মনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার না করে এক বছর দাম্পত্যজীবন কাটানোর পর গর্ভধারণে ব্যর্থ হলে তাকে **প্রজনন অক্ষমতা** বা **অনুর্বর** বা **বন্ধ্যাত্ব** (infertility) বলে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে দম্পতি উভয়ই অনুর্বর এবং দম্পতির সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম থাকে তবে এই ধরনের দম্পতিকে সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা বা বন্ধ্যা বলা যাবে না। পৃথিবীর ১০%-১৫% দম্পতি প্রজননে অক্ষম। এদের মধ্যে স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের সমস্যার জন্য অক্ষমতা ৪০%, ২০% থেকে ৩০% শুধু পুরুষ বা স্ত্রী দায়ী এবং ১০% কারণ অজানা থেকে যায়। প্রজনন অক্ষমতা বর্তমানে একটি বড় সামাজিক সমস্যা। প্রজননে অক্ষমতাকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. **প্রাথমিক প্রজনন অক্ষমতা :** যারা দাম্পত্য জীবনে একবারও গর্ভধারণে সক্ষম হয়নি।

খ. **মাধ্যমিক প্রজনন অক্ষমতা :** একবার সন্তান জন্ম দিয়ে কোনো দম্পতি পরবর্তীতে সন্তান জন্মদানে অক্ষম হলে তাকে সাময়িক বা মাধ্যমিক প্রজনন অক্ষমতা বলে।

পুরুষ প্রজননের অক্ষমতার কারণ (Causes of Male Infertility)

পুরুষ প্রজননের অক্ষমতার প্রধান কারণ হলো অস্বাভাবিক বীর্য (semen)। অস্বাভাবিক বীর্যকে নিম্নলিখিত ধারায় ভাগ করা যায়। যথা–

১। **বীর্যে শুক্রাণুর অনুপস্থিতি** (Absence of sperm in semen) : পুরুষের বীর্যে শুক্রাণুর অনুপস্থিতিকে এজোসপারমিয়া (azoospermia) বলা হয়। শুক্রাশয়ে শুক্রাণু উৎপাদন না হওয়ার কারণে এটি ঘটে। শুক্রাশয় আঘাতজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে শুক্রাণু উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয় এবং প্রজননে অক্ষমতার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুক্রাশয় যেসব কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তা হলো–

- মাম্পস, যক্ষ্মা, গনোরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদির কারণে শুক্রাশয়ে ইনফেকশন হতে পারে।
- শুক্রাশয়ে ক্যান্সার হলে।
- শুক্রাশয় ফেলে দিলে।
- শুক্রাশয়ে ব্যথা পেলে।

Scanned with CamScanner

২। **জীবিত শুক্রাণুর সংখ্যা কম** (Low motile sperm count) : বীর্যরসে শুক্রাণুর সংখ্যার স্বল্পতাকে **অলিগোস্পার্মিয়া** (oligospermia) বলে। প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটার বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা ২০ মিলিয়ন কম। বীর্যরসে শুক্রাণুর সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম (low count) থাকায় ৯০ ভাগ পুরুষ প্রজননে অক্ষম হয়। দীর্ঘমেয়াদি ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত মোটা, ধূমপান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল আসক্তি, দুশ্চিন্তা, আঁটসাঁট আন্ডারগার্মেন্টস ইত্যাদির কারণে বীর্যরসে শুক্রাণুর পরিমাণ কমে যায়।

৩। **অস্বাভাবিক শুক্রাণু** (Abnormal sperm) : হরমোনের কারণে, তেজস্ক্রিয়াজনিত কারণে বা সংক্রমণের ফলে বীর্যে অস্বাভাবিক শুক্রাণু পরিলক্ষিত হয়। দুই লেজবিশিষ্ট, লেজবিহীন, মস্তকবিহীন বা অস্বাভাবিক আকারের জন্য শুক্রাণু ডিম্বাণুর কাছে পৌছাতে বা নিষেক ঘটাতে পারে না।

৪। **স্বতঃঅনাক্রম্যতা বা অটোইম্যুনিটি** (Autoimmunity) : নিজের শুক্রাণুর প্রতি অনাক্রম্য সাড়াকে পুরুষ প্রজননের অক্ষমতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নিজ দেহ থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি নিজের শুক্রাণুকেই আক্রমণের ফলে শুক্রাণুর সংখ্যা কমে যায়, যার কারণ আজও অজ্ঞাত।

৫। **অকাল বীর্যপাত** (Premature Ejaculation) : নারীর যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরে পুরুষ যৌনাঙ্গ প্রবেশের আগেই শুক্রাণুর পতন ঘটে। অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এ অবস্থা কাটিয়ে উঠা সম্ভব।

৬। **পুরুষত্বহীনতা বা নপুংসকতা** (Impotence) : যৌনাঙ্গের দৃঢ়তা রক্ষায় ব্যর্থতার কারণে যৌন মিলনে অক্ষম হওয়া পুরুষ প্রজননিক সমস্যার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। তবে উপযুক্ত মনোবৈজ্ঞানিক উপদেশ এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হতে পারে।

নারীর প্রজননজনিত অক্ষমতার কারণ (Causes of Female Infertility)

১। **ডিম্বপাতের সমস্যা** (Ovulation disorder) : নারীর প্রজনন অক্ষমতার প্রধান কারণ হরমোনজনিত ভারসাম্যহীনতা। পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) নিঃসরনের অভাবে ওভ্যুলেশন বন্ধ হয়। আবার লিউটিনাইজিং হরমোনের অভাবে ডিম্বাণুমুক্ত হয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। আবার ডিম্বাশয় থেকে এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন ক্ষরণ বিঘ্নিত হলে ওভ্যুলেশন ঘটে না। ৩০% নারীরা এই কারণে বন্ধ্যাত্ববরণ করে।

২। **ফেলোপিয়ান নালির সমস্যা** (Problem of fallopian tube) : ফেলোপিয়ান নালি ডিম্বাশয় থেকে মুক্ত ডিম্বাণুকে গ্রহণ করে জরায়ুতে পৌছে দেয় এবং শুক্রাণুকে ডিম্বাণুতে নিষিক্ত করতে সাহায্য করে ফলে ফেলোপিয়ান নালির সমস্যার কারণে ৩৫% নারীর প্রজনন অক্ষমতা দেখা দেয়। ক্ল্যামাইডিয়া, গনোরিয়া ইত্যাদির কারণে ইনফেকশন হয়ে **এন্ড্রোমেট্রিওসিস** (endometriosis), পেলভিক সার্জারি বা অন্য কোনো কারণে এই নালি নষ্ট হয়ে গেলে প্রজননিক সমস্যা দেখা যায়।

৩। **জরায়ুর ক্ষত** (Uterus damage) : প্রায় ৫-১০% নারীর জরায়ুর ক্ষতজনিত সমস্যার কারণে প্রজননে অক্ষম হয়। জরায়ু ক্ষতের কারণে শুধু গর্ভধারণ নয় বরং গর্ভের ভ্রূণ ধরে রাখা এবং গর্ভপাত থেকে রক্ষা করা কঠিন। জরায়ুতে টিউমার হলে সার্জারির মাধ্যমে অপসারণ করে সমস্যার সমাধান করা হয়। গর্ভনিরোধক দ্রব্যাদি ব্যবহার ভালো কাজ করে। কখনও বা জন্মগতভাবে বিকৃত গড়নের জরায়ু দেখা যায়।

৪। **জরায়ু বা সারভিক্সের মুখের ক্ষত** (Cervix damage) : গর্ভপাতের কারণে বা কষ্টকর প্রসবের কারণে জরায়ু মুখ বা সারভিক্স আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ফলে সারভিক্সে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মিউকাস ক্ষরণ হ্রাস পায়। শুক্রাণু সারভিক্সের মিউকাসের মাধ্যমে জরায়ুতে পৌছাতে পারে না।

৫। **শুক্রাণুর বিপক্ষে অ্যান্টিবডি** (Antibodies to sperm) : কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী তার স্বামীর শুক্রাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে। জরায়ু, সারভিক্স ও ফেলোপিয়ান বা ডিম্বনালিতে এই ধরনের অ্যান্টিবডি শুক্রাণুগুলোকে নষ্ট করে দেয়। ফলে নারীর প্রজননিক অক্ষমতা দেখা দেয়। ওষুধ প্রয়োগে অনাক্রম্যতন্ত্র দমিয়ে রেখে সমস্যার সমাধান করতে পারলেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন IVF সবচেয়ে উত্তম পন্থা।

৬। **অন্যান্য সমস্যা** (Other problem) : অকালে মেনোপোজ, দীর্ঘমেয়াদি ডায়াবেটিস, স্টেরয়েড ওষুধ গ্রহণ, ধূমপান, দেহের অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদির কারণে নারীর প্রজননিক অক্ষমতা দেখা দেয়।

প্রজনন অক্ষমতার কারণ নির্ণয়ে পরীক্ষা

(১) স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের রক্ত পরীক্ষা করানো। (২) স্বামীর বীর্য পরীক্ষা করানো। (৩) স্ত্রীর ডিম্বাণু তৈরি ও নিঃসরণ হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করানো। (৪) জরায়ু ও ডিম্বানালি পরীক্ষা করানো। (৫) জরায়ুর ভেতরের স্তরের ঝিল্লি পরীক্ষা করানো। (৬) স্বামী ও স্ত্রীর হরমোন পরীক্ষা করানো।

Scanned with CamScanner

প্রজনন অক্ষমতার লক্ষণ (Symptoms of Infertility)

ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত কোনো ধরনের গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার ও পরিবার পরিকল্পনা ছাড়া স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন কাটানোর পরও নারীর যদি গর্ভসঞ্চার না হয় তবে বুঝতে হবে তাদের প্রজনন অক্ষমতা রয়েছে। বিভিন্ন লক্ষণের মাধ্যমে নারী পুরুষের প্রজনন অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

নারীতে প্রজনন অক্ষমতার লক্ষণ

রজঃচক্রের সময় স্বাভাবিকের চেয়ে খুব বেশি বা কম রক্তপাত, অনিয়মিত রজঃচক্র বা অস্বাভাবিক রজঃচক্র, প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক রজঃচক্রের মাঝখানে দিনের সংখ্যার তারতম্য হওয়া, কোনো রজঃচক্র না হওয়া, কিংবা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া, অস্বাভাবিক ডিম্বপাত, কষ্টদায়ক রজঃচক্র এবং শ্রোণি, পিঠ ও পেশিতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করা ইত্যাদি। হরমোনজনিত ভারসাম্যহীনতার কারণেও নারীর প্রজনন অক্ষমতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন– (১) ত্বকে পরিবর্তন, ঘন ঘন ব্রণ হওয়া, (২) যৌনতা ও ইচ্ছায় পরিবর্তন, (৩) ঠোঁট, বুক বা থুঁতনিতে পুরুষের মতো গাঢ় লোম গজানো, (৪) চুল পড়া, পাতলা হওয়া এবং (৫) শরীরের ওজন বাড়া।

এছাড়াও অন্যান্য লক্ষণ যেমন– স্তনবৃন্ত থেকে এমনি এমনি সাদাটে পদার্থের ক্ষরণ হওয়া, সহবাসকালে যন্ত্রণা হওয়া এবং ইনসুলিন প্রতিরোধী হওয়া ইত্যাদি নারীর প্রজনন অক্ষমতার লক্ষণ হতে পারে।

পুরুষের প্রজনন অক্ষমতার লক্ষণ : পুরুষে প্রজনন অক্ষমতার বিষয়টি প্রথমে বোঝা যায় না, তবে কিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখলে এটি বোঝা যেতে পারে, যেমন– চুলের বৃদ্ধিতে পরিবর্তন, সহবাসের ইচ্ছায় পরিবর্তন, শুক্রাশয়ে ব্যথা, স্ফীতি বা পিণ্ড, লিঙ্গোত্থান ও বীর্যপাতে সমস্যা, ক্ষুদ্র ও দৃঢ় শুক্রাশয় প্রভৃতি।

প্রজনন অক্ষমতার প্রতিকার : আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে পুরুষ ও নারী উভয়ের বন্ধ্যত্ব দূর করা যায়।

১। চিকিৎসা : হিস্টেরোস্কোপি, মিরেনা, থার্মাল বেলুন, এন্ডোস্কোপিক সার্জারি, ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি এবং হিস্টেরেক্টমির মতো আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে প্রজনন অক্ষমতা বা বন্ধ্যত্ব দূর করা যায়। এছাড়াও যেসব রোগের কারণে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয় সেসব রোগ থাকলে চিকিৎসা করাতে হবে।

২। আই ভি এফ : আই ভি এফ এমন একটি পদ্ধতি যা ২০ বছরের বেশি সময় ধরে সফলতার সাথে প্রচলিত। জরায়ু সুস্থ থাকলে অন্য যেকোনো ধরনের প্রজনন অক্ষমতায় **আই ভি এফ** (In vitro fertilization) বা টেস্টটিউব বেবি পদ্ধতিতে সন্তান নেওয়া যায়।

৩। ওষুধ : যেসব নারীর ডিম্বাণু সৃষ্টিতে সমস্যা তারা ক্লোমপিফেন-সাইট্রেট বা গোনাডোট্রেফিন জাতীয় ওষুধ সেবন করে প্রজনন অক্ষমতা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন।

৪। আই ইউ আই : বন্ধ্যত্ব দূরীকরণে **ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন** (Intra uterine insemination- IUI) পদ্ধতির মাধ্যমে ১৫ থেকে ২০ ভাগ সফলতা আসে।

প্রজনন অক্ষমতায় চিকিৎসা

আধুনিক চিকিৎসা এবং অন্যান্য কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারী ও পুরুষ উভয়ের বন্ধাত্ব দূর করা যায়। যেমন-

১। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি (Modern treatment tecniques) : এন্ডোস্কোপিক সার্জারি, ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি, থার্মাল বেলুন ও হিস্টেরেক্টমি ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে প্রজনন অক্ষমতা দূর করা যায়। যেসব রোগের কারণে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয় সেসব রোগের সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে প্রজনন অক্ষমতা দূর করা যায়।

২। ওষুধ সেবন (Drugs use) : অনিয়মিত রজঃচক্রের সমস্যাযুক্ত মহিলাদের হরমোনযুক্ত কিছু ওষুধ গ্রহনের পরামর্শ দেওয়া হয়। য়েমন- ক্লোমিফেন সাইট্রেট, হিউমেন মেনোপোজাল গোনাডোট্রফিন, ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন জাতীয় ওষুধ সেবন করা হয়।

৩। আইভিএফ পদ্ধতি (IVF tecniques) : প্রকৃতিগত পদ্ধতি বাদ দিয়ে কৃত্রিম পরিবেশে জরায়ুর বাইরে আবাদ মাধ্যমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষকে একত্রে রেখে নিষেক ঘটানোকেই ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা IVF বলে। বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি। এটি টেস্ট টিউব বেবি পদ্ধতি নামে অতি পরিচিত।

৪। ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন (Intra uterine insemination- IUI) : একে কৃত্রিম গর্ভধারণ পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতি অধিক ঘনত্বের সক্রিয় শুক্রাণুযুক্ত বীর্যকে সার্ভিক্সের মধ্য দিয়ে সরাসরি জরায়ুতে প্রবেশ করানো হয়।

৫। ইন্ট্রা সাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন (Intra cytoplasmic sperm injection- ICSI) : এ পদ্ধতি নিষেক ঘটানোর জন্য একটি সক্রিয় শুক্রাণুকে মাইক্রোইনজেকশনের মাধ্যমে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করানো হয়।

❑ **কাজ :** (i) শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু মিলিত হতে না পারলে জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। (ii) নারী ও পুরুষের প্রজননিক সমস্যার কারণে গর্ভধারণে বিলম্ব আসে– বিশ্লেষণ কর। (iii) হরমোনের প্রভাবেই নারী-পুরুষ প্রজনন সক্ষমতা অর্জন করে– বিশ্লেষণ কর। (iv) নারীদের প্রজননতন্ত্রের সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ কর।

Scanned with CamScanner

পুরুষ ও নারীর প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা
(Imbalance of Reproductive Hormones of Male and Female)

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন মানবদেহে বিভিন্ন বিপাকীয় ও শারীরবৃত্তীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। হরমোনের মাত্রা কম বা বেশি হলে দেহে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়। ফলে দেহে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(ক) পুরুষ প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা

পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে পিটুইটারি গ্রন্থি কর্তৃক নিঃসৃত **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন** (FSH) ও **লুটিনাইজিং হরমোনের** (LH) প্রভাবে শুক্রাশয় থেকে এন্ড্রোজেন ও টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসৃত হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে **টেস্টোস্টেরন** হরমোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেস্টোস্টেরন হরমোনের প্রভাবে পুরুষের শুক্রাশয় বৃদ্ধি পায়। পুরুষের সেকেন্ডারি গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যাবলি বিকাশ ঘটায় অর্থাৎ এর প্রভাবে ছেলেদের গলার স্বর ভারী হয়, দাড়ি-গোঁফ ইত্যাদি তৈরি হয়, যৌনাঙ্গ সুগঠিত হয়। এই হরমোন FSH হরমোনের সহযোগিতায় শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু সৃষ্টির উদ্দীপনা জোগায়। সাধারণত পুরুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে টেস্টোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ কমে যায় এবং হরমোনজনিত ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।

টেস্টোস্টেরনের ভারসাম্যহীনতা : যৌন আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাওয়া, অবসাদগ্রস্ত থাকা, ক্লান্তিবোধ করা, চুল পাতলা হয়ে যাওয়া, হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া এবং দেহের ওজন বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। টেস্টোস্টেরনের ভারসাম্যহীনতায় যৌন উত্তেজনা কমতে কমতে একবারে কমে যায়। ফলে যৌন উত্তেজনা হ্রাস, যৌন আকাঙ্ক্ষা অনুপস্থিতি ও পুরুষত্বের প্রকাশহীনতা অর্থাৎ **অ্যান্ড্রোপোজ** (andropause) ঘটে। অ্যান্ড্রোপোজকে নারীর **মেনোপজ** (menopause)-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এছাড়া স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, ঘুম না হওয়া, দুশ্চিন্তা বেড়ে যাওয়া, দৈহিক কর্মশক্তি কমে যাওয়া, অকালে বুড়িয়ে যাওয়া, নিজের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মানবোধ কমে যাওয়া, কোমরে চর্বি জমা, মাথায় টাক পড়া ইত্যাদির লক্ষণ প্রকাশ পায়। পুরুষে টেস্টোস্টেরনের স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ৩৫০-১২৩০ ন্যানোগ্রাম (১ ন্যানোগ্রাম = ১ গ্রামের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ)।

(খ) নারীর প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা

নারীদের ক্ষেত্রে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোনের (FSH) প্রভাবে ডিম্বাশয়ের ফলিকল পরিপক্বতা লাভ করে এবং ডিম্বাশয় থেকে **এস্ট্রোজেন** নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। এস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে ডিম্বাশয়ের ফলিকল পরিপক্ব হয়ে পরিণত ডিম্বাণুর তৈরি হয়। স্তনগ্রন্থি আকারে বৃদ্ধি পায়, মেয়েলি কণ্ঠস্বর প্রকাশ পায়, নারীসুলভ কোমলিয়তা প্রকাশ পায়। লুটিনাইজিং হরমোন (LH) কর্পাসলুটিয়াম সৃষ্টি বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করে এবং এটি থেকে প্রোজেস্টেরন নামক স্ত্রী হরমোন নিঃসৃত হয়। **প্রোজেস্টেরন** জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের পরিবর্তন সাধন করে প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণকে জরায়ুগাত্রে সংলগ্ন হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। এই সমস্ত প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যতা বজায় রাখা খুবই দরকার। এই ধরনের হরমোনের ভারসাম্যহীনতা বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি করে। নারীর জনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতার প্রভাব নিম্নরূপ:

i. উচ্চমাত্রায় এস্ট্রোজেনের ভারসাম্যহীনতা : উচ্চমাত্রার এস্ট্রোজেনের ফলে নারীর স্তন ফুলে যায়, স্তনব্যথা, স্তনবৃন্ত দিয়ে স্রাব নিঃসৃত হয়, মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, পিঠের নিচে ব্যথা হয়, শরীরে পানি জমে, ওজন বেড়ে যায় ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এছাড়া মেজাজ খিটখিটে হওয়া, দুর্বল লাগা, ঘুম কম হওয়া, হতাশা বৃদ্ধি পাওয়া, ক্লান্তি, অনিয়মিত রজঃচক্র ইত্যাদি উচ্চমাত্রার এস্ট্রোজেনের কারণে হয়ে থাকে।

ii. নিম্নমাত্রার এস্ট্রোজেন : নিম্নমাত্রার এস্ট্রোজেনের ফলে স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, অস্থিরতা, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, রাতে ঘাম হওয়া বা অতিরিক্ত ঘাম হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। রজঃনিবৃত্তকালে নিম্নমাত্রার এস্ট্রোজেন থাকা স্বাভাবিক। তবে কেমোথেরাপি বা বিকিরণ থেরাপির সম্মুখীন হলে বা জরায়ু অপসারিত হলে শরীরে এস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যায়। তাছাড়া যেসব মহিলার শরীরে চর্বি কম থাকে কিন্তু অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম করতে হয় তাদেরও এস্ট্রোজেন মাত্রা কম থাকে।

iii. উচ্চমাত্রার প্রোজেস্টেরনের ভারসাম্যহীনতা : রজঃচক্রকালে প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরিত হয়। যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রে এ হরমোনের ক্ষরণের মাত্রা বেড়ে যায়। উচ্চমাত্রার প্রোজেস্টেরনের ফলে রজঃস্রাবের পরিমাণ কমে যায়, বুকে ব্যথা প্রবণতা ও স্ফীত হওয়া, অস্থির মেজাজ, অতিরিক্ত ঘুমভাব, কার্যকর এস্ট্রোজেন হরমোনের স্বল্পতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

নিম্নমাত্রার প্রোজেস্টেরনের ভারসাম্যহীনতা : নারীদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন প্রোজেস্টেরন। নানা কারণে প্রোজেস্টেরনের মাত্রা কমে যেতে পারে। যেমন– দেহে অতিরিক্ত এস্ট্রোজেন, অপর্যাপ্ত ব্যায়াম, দীর্ঘকালীন চাপ, চিনিযুক্ত খাবার এবং কিছু বিশেষ ধরনের ওষুধ সেবন। নিম্নমাত্রার প্রোজেস্টেরন সংক্রান্ত সমস্যায় কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন– অনিয়মিত রজঃচক্র, স্তনব্যথা, পিত্তথলির অসুখ, শুষ্ক যোনিদেশ, অবসাদ প্রভৃতি।

(গ) ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় সমস্যা (Problems during Foetal Development) : মায়ের গর্ভে শিশুর বৃদ্ধির যেকোনো ধরনের অস্বাভাবিকতাকে ভ্রূণের বৃদ্ধির সমস্যা হিসেবে ধরা হয়। জন্মের সময় নবজাতকের স্বাভাবিক ওজন ৬.২-৯.২ পাউন্ড এবং উচ্চতা ১৯-২১ ইঞ্চি হয়ে থাকে। ওজন ও উচ্চতা এর চেয়ে বেশি বা কম হলে ভ্রূণের বৃদ্ধির সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। ভ্রূণের বৃদ্ধিকালীন সমস্যা অন্তহীন। সুবিধার জন্য এ সকল সমস্যাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– (১) **জিনগত ও ক্রোমোজোমগত সমস্যা** ও (২) **টেরাটোজেনজনিত সমস্যা**।

১। জিনগত ও ক্রোমোজোমগত সমস্যা (Genetic and Chromosomal problems) : জিনের কারণে জন্মের শুরুতেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। X-ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর মধ্যে অস্বাভাবিকতার ফলে দেখা দেয় সেক্স লিংকড রোগব্যাধি। আর অটোজোমের মধ্যে অবস্থিত জিনগুলো বিভিন্ন ধরনের অটোজোমাল ব্যাধির সৃষ্টি করে। অধিকাংশ **অটোজোমাল ব্যাধির** (autosomal disorder) বিকাশ ঘটে ভ্রূণে কিন্তু প্রকাশ ঘটে জন্মের পর মুহূর্তে। অটোজোমাল ব্যাধির মধ্যে রয়েছে– (i) **হ্যান্টিংটন-স ব্যাধি** (Huntington's disease- প্রকট জিনের ব্যাধি)- এ রোগে শিশু পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এ রোগের মস্তিষ্কের অবনতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও স্নায়বিক বৈকল্য ত্বরান্বিত হয়। (ii) **ফিনাইলকিটোনিউরিয়া** (Phenylketonuria-PKU- প্রচ্ছন্ন জিনের ব্যাধি)- এ রোগে আক্রান্ত শিশু **ফিনাইলঅ্যালানিন** (অ্যামিনো এসিড) হজম করতে পারে না। এ কারণে মস্তিষ্কে বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়ে শিশুকে মানসিক প্রতিবন্ধিতে পরিণত করে। সেক্স লিংকড ব্যাধির মধ্যে রয়েছে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, **ফ্র্যাজাইল- X সিন্ড্রোম** (Fragile-X Syndrome) ইত্যাদি। প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে এ সমস্ত রোগ হয়ে থাকে। ফ্র্যাজাইল- X সিন্ড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তি X-ক্রোমোজোমে ভঙ্গুর বা ক্ষতিগ্রস্থ একটি জায়গা আছে। এ রোগে শিশুদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে অন্যদের সাথে ক্রমান্বয়ে ঘনিষ্টতার মাত্রা কমে যায়। মানসিক প্রতিবন্ধীগত এবং **অটিজম** (autism)-এর সঙ্গে এ রোগ ঘনিষ্ট সম্পর্কিত। এ রোগে প্রতি ৪ হাজার পুরুষের একজন আর প্রতি ৮ হাজার নারীর একজন ভোগে। এছাড়াও **ট্রাইজোমি** (trisomy) নামক ক্রোমোজোমঘটিত রোগ দেখা যায়, যেমন– **ডাইন সিন্ড্রোম** (Down syndrome-DS/DNS, একে ট্রাইজোমি 21-ও বলা হয়)। এ ক্ষেত্রে শিশুদেহে ক্রোমোজোম 21-এর তিনটি কপি থাকে। এ ধরনের জটিলতা নিয়ে ৮০০-১০০০ শিশুর মধ্যে ১ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে। এ রোগে বিশেষ আকৃতির চোখ, মুখ ও গাল, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, হৃদরোগ প্রভৃতি জটিলতা নিয়ে মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে শিশু জন্ম নেয় এবং বেড়ে উঠে।

২। টেরাটোজেনজনিত সমস্যা (Teratogenal problems): গর্ভধারণের ক্ষেত্রে ভ্রূণের বৃদ্ধি কোন পরিবেশে হচ্ছে সে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দূষিত পরিবেশ, মায়ের অসুস্থতা ও ওষুধ গ্রহণ কিংবা মাদক সেবন সবকিছু ভ্রূণের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। ভ্রূণ বৃদ্ধির শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন পরিবেশিক কারণে অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গহানি ঘটে। এ ধরনের অঙ্গহানি বা বিকৃতির জন্য দায়ী কারণগুলোই হচ্ছে **টেরাটোজেন** (teratogens)। টেরাটোজেনঘটিত কারণে ভ্রূণের বৃদ্ধিতে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো দেখা দেয়–

(i) ভ্রূণের বিকাশ ও শক্তির জন্য গ্লুকোজের প্রয়োজন। মাতৃদেহ হতে গ্লুকোজ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে ভ্রূণের বিকাশ ব্যাহত হয়।

(ii) মাতৃদেহে ক্যালসিয়াম ফসফেট, আয়োডিন, ফলিক এসিড ইত্যাদির অভাব হলে ভ্রূণের অস্থির বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মগ্রহণ করে।

(iii) রুবেলা বা জার্মান হাম (Rubella or German measles) নামক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে মানসিক প্রতিবন্ধী, অন্ধ, বধির, হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুতন্ত্রের ত্রুটি নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে।

(iv) HIV ও হেপাটাইটিস B ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে মাতৃদেহে পরিস্ফুটনরত বা বর্ধনশীল ভ্রূণ জন্মগত অঙ্গবিকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং প্রাণঘাতি সংক্রমণ হিসেবে পরিচিত।

(v) **সাইটোমেগালোভাইরাস** (cytomegalovirus) দ্বারা আক্রান্ত হলে সন্তান জন্মগত পঙ্গু হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষে এ ভাইরাস কোনো লক্ষণ প্রকাশ করে না।

Scanned with CamScanner

(vi) পরিস্ফুটনরত ভ্রূণকে গর্ভে ধারণ করে অবাধে মদপান করলে ভূমিষ্ঠ শিশু **ফিটাল অ্যালকোহল সিন্ড্রোম** (Foetal Alcohol Syndrome-FAS) অসুখে ভোগে। মা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হলে শিশুর স্নায়ুতন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সাধারণত দু'ধরনের ভ্রূণের বৃদ্ধির সমস্যা দেখা যায়। যথা– **ইন্ট্রাইউটেরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশন** (Intrauterine Growth Restriction- IUGR) এবং **ম্যাক্রোসোমিয়া** (macrosomia)। IUGR এর ক্ষেত্রে শিশুর মাতৃগর্ভে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম থাকে এবং ওজনে কম হয়। ম্যাক্রোসোমিয়ার ক্ষেত্রে শিশু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃগর্ভে থাকে কিন্তু ওজন ও আকারে অনেক বড় হয়। এজন্য একে **বিগ বেবি সিনড্রোম** (big baby syndrome) বলে। যেসব গর্ভবতী মহিলাদের ম্যাক্রোসোমিয়া দেখা যায় তাদের প্রায় সকলেরই **সিজারিয়ান প্রসব** (Cesarean delivery) করানো হয়, তা নাহলে স্বাভাবিক প্রসবে জনন নালি কিংবা শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

৯.৭ যৌনবাহিত রোগ (Sexually Transmitted Disease - STD) : লক্ষণ ও প্রতিকার

যেসব রোগব্যাধি যৌন মিলনের মাধ্যমে একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহের মধ্যে সংক্রমিত হয় তাদের **যৌনবাহিত রোগ** (Sexually Transmitted Disease - STD) বা **ভেনারিয়েল ডিজিস** (Venereal Disease-VD) বলে। এদেরকে বর্তমানে যৌনবাহিত সংক্রমণ বা **এসটিআই** (Sexually Transmitted Infections- STI) বলে। কেননা রোগ সৃষ্টি ছাড়াও এরা এক দেহ হতে অন্য দেহে সংক্রমিত হতে পারে। এদের কিছুসংখ্যক সিরিঞ্জ ব্যবহার দ্বারা, জন্মগতভাবে কিংবা মাতৃদুগ্ধ পানের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে। সাধারণত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি অণুজীব এর জন্য দায়ী। কেবল নিরাপদ যৌনমিলনের মাধ্যমেই এসব রোগ ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। যৌনবাহিত রোগগুলোর মধ্যে **সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস** ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. সিফিলিস (Syphilis)

প্যাথোজেন (Pathogen): *Treponema pallidum* নামক ব্যাকটেরিয়াম।
ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation period) : ১০-৯০ দিন।

লক্ষণ (Symptoms) : সিফিলিস একটি জটিল যৌন সংক্রামক ব্যাধি এবং যৌনবাহিত রোগগুলোর মধ্যে এর অবস্থান শীর্ষে। সিফিলিস আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায় ২১ দিন পর এবং কয়েক বছর লেগে যায় শেষ পর্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ পেতে। চারটি পর্যায়ে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।


চিত্র : ৯.২০ *Treponema pallidum*

১। **প্রাথমিক পর্যায়** : সিফিলিস রোগের ১ম ধাপে আক্রান্ত ব্যক্তির **ব্যথাহীন ক্ষত** বা **আলসার ও ঘা** দেখা যায়। তিন থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে আক্রান্ত স্থানগুলো শুকিয়ে যায়।

২। **মাধ্যমিক পর্যায়** : সংক্রমণের ৬ সপ্তাহ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়। এই পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তি গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি বা **র‍্যাশ** (rash) দেখা দেয় এবং জ্বর অনুভূত হয়। পরবর্তীতে র‍্যাশ মিলিয়ে যায়। এরপর হাত ও পায়ের তালুতে লালচে বাদামি ক্ষত দেখা যায়। এছাড়া পেশি ব্যথা, মাথা ব্যথা, বিভিন্ন জায়গায় চুল উঠে যাওয়া, ক্লান্তি, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া, গলা ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

৩। **সুপ্ত পর্যায়** : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের লক্ষণগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সুপ্ত পর্যায় শুরু হয় যা সাধারণত ২ বছর স্থায়ী হয়। তবে বছরের পর বছরও এ পর্যায় অব্যাহত থাকতে পারে।

৪। **শেষ পর্যায়** : সংক্রমিত হওয়ার ১০-২০ বছর পর রোগটি পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ পায়। এই সময় রোগীর হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, মস্তিষ্ক, স্নায়ুরজ্জু, চোখ, রক্তকণিকা, গ্রন্থি ও সন্ধি আক্রান্ত হয়। মুখে ঘা, অন্ধত্ব, অস্থিরচিত্ত দেখা যায়। অস্থি ও লিগামেন্টের ক্ষয় হয়। রোগীর পক্ষঘাতগ্রস্ত হয় এমনকি রোগীর মৃত্যুও ঘটে।

রোগের সংক্রমণ ও বিস্তার (Mode of Transmission) : এটিও এক প্রকারের STD (Sexually Transmitted Disease) বা VD (Venereal Disease)। এই রোগের জীবাণু মুখ, পায়ুপথ ও যৌনাঙ্গে অবস্থান করে। আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে যৌন মিলন, মায়ের থেকে প্লাসেন্টার মাধ্যমে ভ্রূণে বিস্তার লাভ ঘটে। রোগীর রক্ত গ্রহণের মাধ্যমেও এই রোগ ছড়ায়। এছাড়াও চুম্বন, ত্বকের ক্ষতের মাধ্যমে এ রোগের সঞ্চারণ ঘটতে পারে।


চিত্র ৯.২১ : সিফিলিস আক্রান্ত রোগীর ছবি

Scanned with CamScanner

রোগ নির্ণয় (Diagnosis) : ক্লিনিক্যাল সিমটম, আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অ্যান্টিবডি ডিটেকশন [যেমন– VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), TPHA test (*Treponema pallidum* haemagglutination Assay), FTA-Abs test (Fluorescent treponemal antibody absorption),RPR test (Rapid plasma reagn)]-এর দ্বারা এই রোগ নির্ণয় করা যায়।

প্রতিকার ও দমন (Prevention and Control) : (১) স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া যৌন মিলন পরিহার করতে হবে। (২) যৌন মিলনকালে কনডম ব্যবহার করতে হবে। (৩) বহুগামিতা পরিহার করতে হবে। অর্থাৎ স্থায়ী সঙ্গীর সঙ্গে জীবনযাপন করতে হবে। এটাই হচ্ছে এ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। (৪) রক্ত সঞ্চারণের সময় দাতার রক্ত ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। (৫) চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসার সাহায্যে রোগ নিরাময় করতে হবে। (৬) **পেনিসিলিন, এরিথ্রোমাইসিন** ও **টেট্রাসাইক্লিন** ইত্যাদি এই রোগের মহৌষধ। (৭) তাছাড়াও সিফিলিস প্রতিরোধে সিফিলিস রোগী আছে এমন ঘরে যাওয়া আসা পরিহার করতে হবে, মাদক জাতীয় দ্রব্য, অ্যালকোহল গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. গনোরিয়া (Gonorrhoea)

প্যাথোজেন (Pathogen) : *Neisseria gonorrhoeae* নামক ব্যাকটেরিয়াম।

ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation period) : ২-৫ দিন।

লক্ষণ (Symptoms) :

আক্রান্ত পুরুষদের লক্ষণ : মূত্রথলি এবং মূত্রনালিতে প্রদাহ পরিলক্ষিত হয়। বারবার মূত্রের বেগ পায়, মূত্রত্যাগ ভীষণ পীড়াদায়ক হয়, ফোঁটা ফোঁটা করে মূত্র বেরিয়ে আসে। একে **ডাইসুরিয়া** (dysuria) বলে (আক্রান্ত পুরুষের এটাই প্রধান লক্ষণ)। পুরুষদের লিঙ্গ (penis) দিয়ে পুঁজ নিঃসরণ হয়। সমকামী পুরুষের পায়ুতে লক্ষণবিহীন সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। ১০-১৫% আক্রান্ত পুরুষ লক্ষণ বা উপসর্গহীন অবস্থায় থাকে।

আক্রান্ত মহিলাদের লক্ষণ : আক্রান্ত মহিলাদের প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগের লক্ষণ বোঝা যায় না। জরায়ু, সারভিক্স, ফেলোপিয়ান নালি ইত্যাদি অংশে সংক্রমণ ঘটে ও প্রদাহ হয় এবং যোনিপথে পুঁজ ও রক্ত বেরিয়ে আসে। ক্ষেত্রবিশেষে পায়ুতেও এ সংক্রমণ ঘটে। কিছুক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব (sterility)-র সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। মূত্র ত্যাগের সময় জ্বালা, অনিয়মিত রজঃচক্র, জ্বর, গায়ে ফুসকুরি, কষ্টদায়ক যৌনমিলন, হলদে বা হলদে সবুজ যৌনস্রাব, জননেন্দ্রিয়ের চারপাশে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মায়ের এ রোগ থাকলে নবজাতকের চোখে **অপথ্যালমিক নিওন্যাটারাম** (opthalmia neonaterum) প্রদাহ দেখা দিতে পারে। ৫০-৭৫% আক্রান্ত মহিলা লক্ষণ বা উপসর্গহীন অবস্থায় থাকে। গনোরিয়ায় আক্রান্ত **নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে** মলাশয় থেকে স্রাব, পায়ুপথে ক্ষত, রক্তপাত, চুলকানি, মলত্যাগে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। গলবিল সংক্রমিত হলে গলাভাঙার উদ্ভব ঘটে।

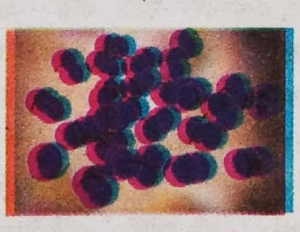



চিত্র ৯.২২ ক : গনোরিয়া জীবাণু (*Neisseria gonorrhoeae*)

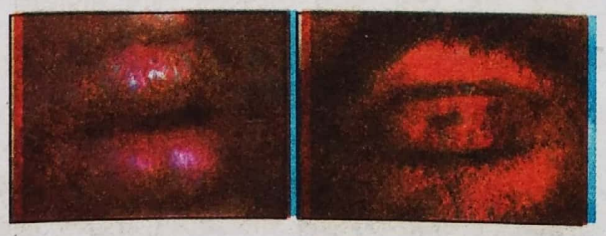

চিত্র ৯.২২ খ : গনোরিয়া আক্রান্ত মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ

রোগের সংক্রমণ ও বিস্তার (Mode of Transmission) : এটি এক ধরনের STD বা VD । আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সংসর্গ, আক্রান্ত রোগীর বাথরুম ব্যবহার, আক্রান্ত রোগীর বিছানা ব্যবহার ইত্যাদি কারণে রোগ বিস্তার লাভ করে। আক্রান্ত মাতৃদেহ থেকে নবজাতকের দেহেও এ রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। তাছাড়া গনোরিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসায় সেরে উঠার পর গনোরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে পুনর্মিলন ঘটলে সে পুনঃসংক্রমিত হতে পারে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis) : নিঃসৃত পদার্থের গ্রাম স্টেনিং এবং কালচার করে রোগ নির্ণয় করা হয়।

প্রতিকার ও দমন (Prevention and Control) : অবাঞ্ছিত যৌন সংসর্গ এড়িয়ে চলা, অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসার দ্বারা রোগ নিরাময় করা। **পেনিসিলিন, অ্যাম্পিসিলিন, সেফট্রিয়াক্সোন, টেট্রাসাইক্লিন** ইত্যাদি এই রোগে অধিক ফলপ্রদ।

Scanned with CamScanner

৩. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

এইডস (AIDS) কথাটি এসেছে চারটি ইংরেজি শব্দের প্রথম অক্ষর থেকে—

A- Acquired (অর্জিত, স্বাভাবিক বংশগত নয়, তবে সংক্রামক)
D- Deficiency (হ্রাস)
I- Immune (রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা)
S- Syndrome (বিবিধ লক্ষণ)

অর্থাৎ অর্জিত **অনাক্রম্যহীনতা রোগ**। কাজেই বলা যায়, **এইডস** (AIDS) **হলো বিশেষ কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া**।

ফরাসি বিজ্ঞানী **Dr. Lue Montagnier** (1983) এবং আমেরিকান বিজ্ঞানী **Dr. Robert Gallo** (1984) পৃথকভাবে এইডস এর ভাইরাস আবিষ্কার করেন। ১৯৭৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত মানবদেহে এ ভাইরাসের সংক্রমণ ছিল না। আফ্রিকায় সর্বপ্রথম বানরের দেহ হতে এ ভাইরাস মানুষের দেহে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বে AIDS- একটি মারাত্মক রোগ। ২০০০ সালে বিশ্বে HIV আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। এদের মধ্যে মারা যায় প্রায় ৩০ লক্ষ। কিন্তু UNAIDS এর এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখের বেশি লোক এইডসের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। যার ৪০ শতাংশ নারী।

প্যাথোজেন (Pathogen) : Human Immuno deficiency Virus (HIV)।

ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation period) : ৬ মাস-১০ বছর।



চিত্র : ৯.২৩ লালফিতা, HIV পজেটিভ ব্যক্তি ও এইডস-এ আক্রান্তদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশের প্রতীক

লক্ষণ (Symptoms) : AIDS রোগের বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ হলো মাঝে মাঝে জ্বর হয়, অবসন্নতা (lethargy), শ্রমবিমুখতা, ফ্যারিনজাইটিস, ওজন কমে যায়, বমি-বমি ভাব (nausea), পেটে ব্যথা, খাবারে অনীহা, মাথাব্যথা (headache), রোগীর জীবনীশক্তি কমে যায়। এর কারণে জীবাণুর আক্রমণে মস্তিষ্ককে **সেরেব্রাল টক্সোপ্লাজমোসিস** (cerebral toxoplasmosis) ঘটে, ফলে চিন্তাশক্তি লোপ পায় অথবা স্ট্রোকের সৃষ্টি হতে পারে। মস্তিষ্কের লসিকা কলায় **লিম্ফোমা** (Lymphoma) ক্যানসার ও ত্বক ও মুখে **কাপোসি সারকোমা** (Kaposi sarcoma) ক্যানসার সৃষ্টি হয়। HIV হেল্পার T-লিম্ফোসাইটকে আক্রমণ করার ফলে অনাক্রম্য তন্ত্র ভেঙে পড়ে অর্থাৎ অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি ক্রিয়া সংঘটিত হতে বাধা দেয়, ফলে যেকোনো রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে রোগী ডায়রিয়া, অন্ধত্ব, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে।

রোগের সংক্রমণ ও বিস্তার (Mode of Transmission) : HIV সাধারণত রক্ত ও বীর্যের (semen) মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। আক্রান্ত রোগীর ব্যবহৃত সুচ, ব্লেড ব্যবহার করলে, আক্রান্ত রোগীর রক্ত দেহে প্রবেশ করলে, আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে অসুরক্ষিত অবস্থায় যৌন মিলন করলে এই রোগ বিস্তার লাভ করে। আক্রান্ত মাতৃদেহ থেকে জন্মগ্রহণকারী শিশুরও এ রোগ দেখা যায়। কৃত্রিম **ইনসেমিনেশনে** (insemination), সংক্রামিত রোগীর অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে। এমনকি সমকামী এবং বহুকামী লোকদের থেকেও এই রোগ বিস্তার করে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র স্পর্শ, একসাথে খাওয়া দাওয়া, খেলাধুলা, হাত মেলানো, এমনকি একই জামা কাপড় পরিধান করলে বা মশার কামড়ে HIV ছড়ায় না। কারণ HIV সংক্রমণ ছোঁয়াচে নয়।

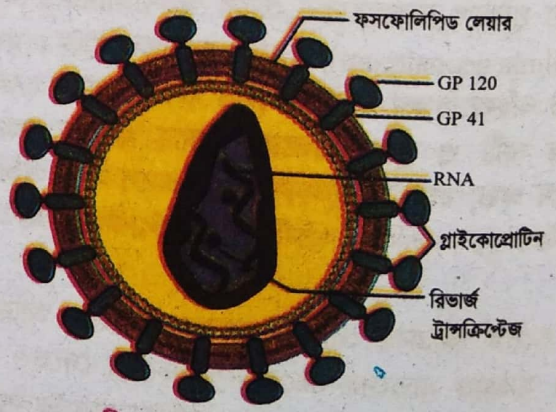

চিত্র ৯.২৪ : HIV এর গঠন

Scanned with CamScanner

রোগ নির্ণয় (Diagnosis) : ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) test, HIV Antibody Test, p24 protein Test, RNA Test এবং Western Blotting Test ইত্যাদির সাহায্যে এ রোগ নির্ণয় করা সম্ভব।

প্রতিকার ও দমন (Prevention and Control) : এই রোগ সংক্রমিত হলে সারানো যায় না। কারণ এই রোগের তেমন কোনো ওষুধ বা ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়নি। সামান্য কয়েকটি ওষুধের সাহায্যে বহুদিন ধরে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। ওষুধ সহযোগে এইডস এর চিকিৎসাকে **অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি বা আর্ট** (antiretroviral therapy-ART) বলা হয়। Zidovudinen (ZDV), Azidothymidinen (AZT) এবং Didanosine (DDI) ওষুধগুলো AIDS রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে গবেষকগণ AIDS সংক্রান্ত অনেক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে FDA (Food and Drug Administration, USA) অনুমোদিত দুটি গ্রুপের ওষুধের ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে। যার একটি **নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ ইনহিবিটরস** (Nucleoside reverse transcriptase inhibitors) যা HIV সংক্রমণকে বিলম্বিত করে। অন্যটি হলো **প্রোটিয়েজ ইনহিবিটরস** (Protease inhibitors) যা HIV-এর প্রতিলিপনে বাঁধা সৃষ্টি করে। এই দুটি গ্রুপের ওষুধ একত্রে সেবন করতে হয়। AIDS- এর এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) বলা হয়।

এই রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধ বেশি উপযোগী, যাতে HIV দেহে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য নিম্নোক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার–

১। নিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে।

২। রোগীর ব্যবহৃত ব্লেড, ক্ষুর, সিরিঞ্জ ব্যবহার করা চলবে না। সব সময় Disposal সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।

৩। অজানা লোকের সঙ্গে বিশেষ করে পতিতাদের সঙ্গে যৌন মিলন পরিহার করতে হবে। যৌন মিলন যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যৌন মিলনের সময় কনডম ব্যবহার করা প্রয়োজন।



HIV-তে আক্রান্ত মানুষ

৪। রক্ত গ্রহণ কালে HIV পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৫। সমকামীদের মধ্যে এই রোগের সহজেই বিস্তার ঘটে, তাই পায়ু ও মৌখিক মৈথুন পরিহার করতে হবে।

৬। HIV আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে বিরত থাকা।

৭। এইডসের ভয়াবহতা সম্পর্কে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা।

৮। পতিতাদের নিরাপদ যৌনতা সম্পর্কে সচেতন করা।

৯.৮ প্রজননজনিত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা

প্রজননের কাজ হলো বংশধরের সংখ্যাবৃদ্ধি। শুধুমাত্র বংশবৃদ্ধিই নয়, প্রজনন বংশগতির বাহক পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটায় এবং নবজাতকের মধ্যে পৃথক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। প্রতিটি প্রজননতন্ত্রে যে জনন কোষ উৎপন্ন হয় তা ব্যক্তিবিশেষের বংশগতির ধারা-বাহক পদার্থকে বহন করে নিয়ে যায়। এছাড়া স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের অতিরিক্ত দায়িত্ব হলো মাতৃগর্ভে ভ্রূণের লালন পালন ও বৃদ্ধি। উপরন্তু নবজাতকের পুষ্টি জোগানোর প্রয়োজনীয় দুগ্ধ প্রদানের জন্য মাতৃদেহকে প্রস্তুতি নিতে হয় এবং পরবর্তীতে মাতৃদুগ্ধে নবজাতক প্রতিপালিত হয়। সুতরাং প্রজননতন্ত্রকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য হলো নিজের বংশগতির ধারা অব্যাহত রাখা। কাজেই জীবনধারার গতিকে সক্রিয় রাখতে হলে অবশ্যই প্রজননজনিত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

পুরুষ ও নারীর প্রজননের অক্ষমতার কারণগুলো বিশেষ করে অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা, ধূমপান, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে হবে। পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট গ্রন্থি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কারণ প্রোস্টেট ক্যান্সারে ২-৩ শতাংশ মারা যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সার, জরায়ু ক্যান্সার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কাজেই ধর্মীয় মূল্যবোধ সামাজিক মূল্যবোধ ও পারিবারিক মূল্যবোধকে ধারণ করে, প্রজননজনিত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর সুস্থতা রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে।

কাজ : (i) ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ধরনের যৌনবাহিত রোগের তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও। (ii) "এইডস একটি ঘাতক ব্যাধি" এই শিরোনামে বিশ্ব এইডস দিবসে (১ ডিসেম্বর) জনসচেতনতামূলক একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় কলেজ বোর্ডে স্থাপন কর।

Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

- **প্রজনন :** যে পদ্ধতিতে জীব নিজের সত্তা ও আকৃতিবিশিষ্ট অপত্য জীব সৃষ্টি করে প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে তাকে প্রজনন বলে। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী অর্থাৎ পুংজননতন্ত্র ও স্ত্রীজননতন্ত্র নিয়ে মানুষের প্রজননতন্ত্র গঠিত।
- **বয়ঃসন্ধিকাল :** জীবনের যে পর্যায়ে নারী ও পুরুষের সেকেন্ডারি (গৌণ) যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলো সক্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়, তাকে বয়ঃপ্রাপ্তি বা বয়ঃসন্ধিকাল বলে।
- **সেকেন্ডারি বা গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য :** যে সকল বৈশিষ্ট্য শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থাকে না কিন্তু পরবর্তীতে যৌবন প্রাপ্তির সময় দেহে পরিলক্ষিত হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য সূচনা করে, সেকল বৈশিষ্ট্যসমূহকে সেকেন্ডারি বা গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন- ছেলেদের দাঁড়ি- গোঁফ, মেয়েদের স্তন ইত্যাদি।
- **রজঃচক্র :** স্ত্রীলোকের সমগ্র যৌনজীবনকালে প্রতি ২৮ দিন অন্তর প্রথম ৩-৫ দিন ধরে জরায়ুর অন্তঃস্থস্তর বা এন্ডোমেট্রিয়ামের অবক্ষয়ের ফলে রজঃস্রাব এবং পরে দেহের অন্যান্য অঙ্গসমূহের যেমন- ডিম্বাশয়, জরায়ু ইত্যাদির পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে তাকে রজঃচক্র বলে।
- **মোনোপোজ :** নারীদের ৪৫-৫০ বছরের মধ্যে ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপাদন ও রজঃস্রাব উভয়ই বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে মেনোপোজ বা রজঃনিবৃত্তি বলে।
- **কর্পাস লুটিয়াম :** ডিম্বপাতের পর লুটিনাইজিং হরমেনের (LH) প্রভাবে গ্রাফিয়ান ফলিকলের অবশিষ্টাংশ সংগঠিত হয়ে হলুদ বর্ণের যে গঠন তৈরি করে তাকে কর্পাস লুটিয়াম বলে। এটি সাময়িকভাবে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে।
- **স্পার্মাটোজেনেসিস :** শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে।
- **স্পার্মিওজেনেসিস :** যে জটিল ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় স্পার্মাটিডগুলো রূপান্তরিত হয়ে শুক্রাণু বা স্পার্ম গঠন করে তাকে স্পার্মিওজেনেসিস বলে।
- **উওজেনেসিস :** ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উওজেনেসিস বলে।
- **নিষেক :** যে প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড (n) শুক্রাণু ও হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু (n) মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট গঠন করে তাকে নিষেক বলে।
- **ইমপ্ল্যানটেশন :** নিষেকের ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জাইগোটটি ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোথিত হয় তাকে ইমপ্ল্যানটেশন বলে। সংক্ষেপে, বর্ধনশীল মানব ভ্রূণ জরায়ুর প্রাচীরে সংস্থাপিত হওয়ার কৌশলকে ইমপ্ল্যানটেশন বলে।
- **পরিস্ফুটন :** নিষেকের পর জাইগোট যে প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিশু বা লার্ভায় পরিণত হয় তাকে পরিস্ফুটন বলে। প্রতিটি সদস্যের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াকে ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন বলে।
- **ক্লিভেজ :** যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য ভ্রূণকোষ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা সম্ভেদ বলে।
- **মরুলা :** ক্লিভেজ পদ্ধতিতে জাইগোট ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে যে ক্ষুদ্র বহুকোষী নিরেট বলের মতো কোষপুঞ্জ গঠন করে তাকে মরুলা বলে। মরুলা হলো আদি ভ্রূণ।
- **ব্লাস্টুলা :** মরুলা বিভাজিত হয়ে একস্তরী তরলপূর্ণ ফাঁপা বলের আকার ধারণ করে, তখন তাকে ব্লাস্টুলা বা ব্লাস্টোসিস্ট বলে। ব্লাস্টুলার প্রাচীরকে ব্লাস্টোডার্ম এবং তরলপূর্ণ গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল বলে।
- **গ্যাস্ট্রুলা :** ব্লাস্টুলার অবিভেদিত কোষগুলো এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম স্তরে বিভেদিত হয়ে যে ভ্রূণ গঠন করে তাকে গ্যাস্ট্রুলা বলে।
- **জার্মলেয়ার :** ভ্রূণের গ্যাস্ট্রুলা দশায় উৎপন্ন এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্ম এই তিনটি স্তরকে ভ্রূণীয় স্তর বা জার্মলেয়ার বলে।
- **অর্গানোজেনেসিস :** গ্যাস্ট্রুলেশনে সৃষ্ট তিনটি ভ্রূণীয় স্তর থেকে বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্র গঠনের প্রক্রিয়াকে অর্গানোজেনেসিস বলে।
- **বহিঃভ্রূণীয় আবরণী :** ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় আবরণীরূপে যেসব আনুষঙ্গিক গঠন সৃষ্টি হয়ে ভ্রূণ দেহকে ঘিরে রেখে পরিস্ফুটন নির্বিঘ্ন করে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বর্জিত হয়, সেসব আবরণীকে বহিঃভ্রূণীয় আবরণী বা ভ্রূণ পর্দা বলে।
- **আইভিএফ (IVF) পদ্ধতি :** প্রকৃতিগত পদ্ধতি বাদ দিয়ে কৃত্রিম পরিবেশে জরায়ুর বাইরে আবাদ মাধ্যমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষকে একত্রে রেখে নিষেক ঘটানোকেই ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা IVF বলে। বন্ধ্যত্বের চিকিৎসায় এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি। এটি টেস্ট টিউব বেবি পদ্ধতি নামে অতি পরিচিত।
- **গর্ভ :** অন্তঃসত্ত্বা থেকে শুরু হয়ে শিশুর জন্মদান পর্যন্ত সময়কালকে গর্ভ বা প্রেগন্যান্সি বলে।
- **ভ্রূণ :** অন্তঃসত্ত্বা অর্থাৎ গর্ভের সূচনাকাল থেকে প্রথম আট সপ্তাহ (দ্বিতীয় মাস) পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে অবস্থিত জীবকে ভ্রূণ বা এমব্রায়ো বলে।
- **ফিটাস :** ৮ সপ্তাহ পর ভ্রূণ যখন প্রায় মানুষের অবয়ব লাভ করে তখন তাকে ফিটাস বলে। অথবা, ভ্রূণ বিকাশের যে পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যে পরিণত অবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা যায়, তাকে ফিটাস বলে।
- **নাভী রজ্জু :** নাভী রজ্জু (umbilical cord) হলো জরায়ুতে বিকাশমান ফিটাস ও প্লাসেন্টার মধ্যে সংযোগকারী লম্বা (প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার) রজ্জু আকৃতির একটি গঠন যাতে দুটি ধমনি ও একটি শিরা থাকে। এর মাধ্যমে মাতৃদেহ ও ভ্রূণ দেহের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর আদান প্রদান ঘটে।

Scanned with CamScanner

☑ **অমরা :** ভ্রূণীয় কলায় ও মাতৃকলায় গঠিত যে চাকতির মতো গঠন ফিটাস ও মাতৃদেহে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে অমরা বা প্লাসেন্টা বলে।

☑ **গর্ভবতী :** গর্ভে সন্তান ধারণকারী মাকে গর্ভবতী বলে। গর্ভবতী মায়ের দেহে সন্তান বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য গর্ভবতী মায়ের পর্যাপ্ত পুষ্টি ও সেবার প্রয়োজন।

☑ **পরিবার পরিকল্পনা :** ছোট পরিবার অর্থাৎ পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখার ব্যবস্থাই হলো পরিবার পরিকল্পনা। সেজন্য প্রয়োজন গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা।

☑ **গর্ভনিরোধ :** গর্ভনিরোধ হলো গর্ভধারণকে বাধা দেওয়া অর্থাৎ স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে পুরুষের শুক্রাণুর মিলনে বাধা সৃষ্টি করা।

☑ **বন্ধ্যাকরণ :** জন্মনিরোধের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করাকে বন্ধ্যাকরণ বলে।

☑ **অ্যান্ড্রোপজ :** টেস্টোস্টেরন হরমোনের অভাবে যৌন উত্তেজনা হ্রাস, যৌনাকাঙ্ক্ষার অনুপস্থিতি ও পৌরষত্বের প্রকাশহীনতাকে অ্যান্ড্রোপজ বলে। অ্যান্ড্রোজপকে নারীর মেনোপজ (শেষ মাসিক চক্রের রজঃস্রাব বন্ধ দশা) এর সঙ্গে তুলনা করা হয়।

☑ **যৌনবাহিত রোগ বা ভেনারিয়েল ডিজিস :** দৈহিক মিলন বা যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে যেসব রোগ ছড়ায় তাদের যৌনবাহিত রোগ বা ভেনারিয়েল ডিজিস বলে। রোগ সৃষ্টি ছাড়াও এরা এক ব্যক্তির দেহ থেকে অন্য ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হতে পারে বলে বর্তমানে এদের যৌনবাহিত সংক্রমণ বলে। সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস হলো উল্লেখযোগ্য যৌনবাহিত রোগ।

☑ **এইডস :** এইডস একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। বিশেষ কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব হওয়াকে এইডস (AIDS) বলে। HIV ভাইরাস দ্বারা এইডস রোগ ছড়ায়। অথবা, HIV সংক্রমণের ফলে রোগীর শরীরের সংক্রমণ উত্তর অবস্থাকেই AIDS বলা হয়।

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি পুরুষের জন্ম নিরোধক পদ্ধতি? *[সি.,কু.,ব.,চ.,য.,দি.,রা.বোর্ড-১৮]*
ক ডায়াফ্রাম খ ইমপ্ল্যান্ট
গ টিউবেকটমি ঘ ভ্যাসেকটমি

২. একটি প্রাইমারি উওসাইট থেকে কয়টি পোলার বডি সৃষ্টি হয়? *[ঢা.বোর্ড-১৮]*
ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

৩. কোনটি এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত? *[ঢা.বোর্ড-১৮]*
ক চোখের লেন্স খ গলবিল গ ট্রাকিয়া ঘ ল্যারিংস

৪. পুং জননতন্ত্রের অংশ কোনটি? *[ঢা. বো. '১৭]*
ক ইপিডিডাইমিস খ ফেলোপিয়ান টিউব
গ ডিম্বাশয় ঘ জরায়ু

৫. কোন ভ্রূণীয় স্তর হতে Spleen সৃষ্টি হয়? *[ব. বো. '১৭]*
ক এপিমিয়ার খ মেসোমিয়ার
গ হাইপোমিয়ার ঘ এক্টোডার্ম

৬. কোন রোগের কারণে মানুষের শ্বেত কণিকার ম্যাক্রোফেজ ও T_4 লিম্ফোসাইট ধ্বংস হয়? *[য. বো. '১৭]*
ক এইডস খ গনোরিয়া গ সিফিলিস ঘ ট্রাইসোমি

৭. কোন রোগে মুখমণ্ডল, মাথা, হাত, পা, বুকের অস্বাভাবিক স্ফীতি ঘটে? *[কু. বো. '১৭]*
ক মারিজ ব্যাধি খ টারনার সিনড্রোম
গ ডাউন সিনপ্রোম ঘ কার্পাল টানেল সিনড্রোম

৮. মানুষের রেচনতন্ত্র ও প্রজনন তন্ত্রের সাধারণ নালিটির নাম কী? *[ঢা. বো. '১৬]*
ক শুক্রনালি খ ক্ষেপণনালি
গ ইউরেথ্রা ঘ সেমিনাল ভেসিকল

৯. মানুষে নিষেক সংঘটিত হয় কোন অঙ্গে? *[কু. বো. '১৬]*
ক ফেলোপিয়ান নালি খ ডিম্বাশয়
গ যোনি ঘ জরায়ু

১০. রজঃচক্রের কততম দিনে ওভ্যুলেশন বা ডিম্বপাত ঘটে? *[চ. বো. '১৬]*
ক ১২ খ ১৪ গ ২৮ ঘ ০৭

১১. নিচের কোনটি শুক্রাণু নির্গমনের সঠিক পথ? *[ব. বো. '১৬]*
ক সেমিনিফেরাস নালিকা → রেটিটেসটিস → ভাসা ইফারেন্সিয়া → ইপিডিডাইমিস
খ ইপিডিডাইমিস → সেমিনিফেরাস নালিকা → রেটিটেসটিস→ ভাসা ইফারেন্সিয়া
গ ভাসা ইফারেন্সিয়া → ইপিডিডাইমিস → সেমিনিফেরাস নালিকা → রেটিটেসটিস
ঘ রেটিটেসটিস → ভাসা ইফারেন্সিয়া → ইপিডিডাইমিস → সেমিনিফেরাস নালিকা

১২. মানব ভ্রূণে কয় সপ্তাহ বয়স থেকে সারফেকটেন্ট ক্ষরণ শুরু হয়? *[ঢাকা বোর্ড-২০১৮]*
ক ২১ খ ২২ গ ২৩ ঘ ২৪

১৩. রজঃচক্রের ৭-১৪তম দিনে কোন হরমোন ক্ষরিত হয়? *[ঢা. বো. '১৫]*
ক ইস্ট্রোজেন খ FSH গ LH ঘ GTH

১৪. IVF পদ্ধতির শুরুতে স্ত্রীর পরিণত ডিম্বাণু কোন পদ্ধতিতে বের করে আনা হয়? *[ঢা. বো. '১৯]*
ক আল্ট্রাসনিক লিথট্রিপসি খ সার্জারি
গ ল্যাপারোস্কোপিক ঘ ইনজেকশন

১৫. অমরা গঠনে অংশগ্রহণকারী বহিঃভ্রূণীয় পর্দা হলো– *[চ. বো. '১৯]*
ক অ্যামনিয়ন ও কুসুম থলি খ অ্যালানটয়েস ও কোরিওন
গ কোরিওন ও কুসুম থলি ঘ অ্যামনিয়ন ও কোরিওন

Scanned with CamScanner

১৬. স্ত্রীজনন তন্ত্রের অংশ কোনটি? [রা. সি. বো. '১৯]
ক স্ক্রোটাম খ প্রোস্টেট গ্রন্থি
গ সারভিক্স ঘ সেমিনাল ভেসিকল

১৭. ভ্রূণের পরিস্ফুটনের জন্য কোনটি সঠিক পর্যায়ক্রম? [য. বো. '১৫]
ক ক্লিভেজ → গ্যাস্ট্রুলেশন → ব্লাস্ট্রুলেশন
খ গ্যাস্ট্রুলেশন → ব্লাস্টুলেশন → ক্লিভেজ
গ ক্লিভেজ → ব্লাস্টুলেশন → গ্যাস্ট্রুলেশন
ঘ ব্লাস্টুলেশন → ক্লিভেজ → গ্যাস্ট্রুলেশন

১৮. কত সপ্তাহ বয়সের মানব ভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয়? [কু. বো. '১৯]
ক ২২ খ ২৩ গ ২৪ ঘ ২৫

১৯. ইমপ্লান্টেশন কোথায় হয়? [রা. বো. '১৬]
ক অমরায় খ ডিম্বনালিতে গ জরায়ুতে ঘ ডিম্বাশয়ে

২০. নিচের কোনটি বহিঃভ্রূণীয় আবরণ? [রা. বো. '১৬]
ক করোনা রেডিয়েটা খ জোনা পেলুসিডা
গ ভাইটেলাইন মেমব্রেন ঘ অ্যালানটয়েস

২১. জরায়ুর সংকোচন ঘটায় কোন হরমোন? [য. বো. '১৬]
ক ইস্ট্রোজেন খ রিলাক্সিন গ প্রজেস্টেরোন ঘ প্রোটিয়েজ

২২. সিমেন তৈরির জন্য পিচ্ছিল পদার্থ ক্ষরণ করে কোন অঙ্গ? [দি. বো. '১৫]
ক ভাস ডিফারেন্স খ শুক্রাশয়
গ সেমিনাল ভেসিকল ঘ এপিডিডাইমিস

২৩. শুক্রাণুর কোন অংশে অ্যাক্রোজোম অবস্থিত? [য. বো. '১৯]
ক মাথা খ গ্রীবা গ মধ্যখণ্ড ঘ লেজ

২৪. নিম্নের কোনটি সিফিলিস রোগের লক্ষণ নয়? [কু. বো. '১৯]
ক অনিয়মিত রজঃচক্র খ ব্যর্থাহীন ক্ষত
গ লালচে বাদামী দাগ ঘ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস কুড়ি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. জরায়ু প্রাচীরের অংশ– [সি. বো. '১৭]
i. এন্ডোমেট্রিয়াম ii. মায়োমেট্রিয়াম iii. পেরিমেট্রিয়াম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. পুংজনন তন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত গ্রন্থি হলো– [ঢা. বো. '১৯]
i. প্রোস্টেট ii. বার্থোলিন iii. কাওপার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. সিফিলস রোগের লক্ষণ হলো– [সি. বো. '১৬]
i. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র র‍্যাশ ii. স্ফীত লসিকা গ্রন্থি
iii. ওজন বেড়ে যাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. অমরার কাজ হচ্ছে– [ঢাকা বোর্ড-২০১৮]
i. ভ্রূণের বর্জ্যপদার্থ অপসারণ ii. হরমোন ক্ষরণ
iii. অ্যান্টিজেন প্রতিহত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. ব্যাকটেরিয়াজনিত যৌনবাহিত রোগ হলো– [কু. বো. '১৫]
i. এইচ ভস ii. সিফিলিস iii. গনোরিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. মহিলাদের অস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ– [কু. বো. '১৫]
i. IUD ii. ডায়াফ্রাম iii. ইমপ্লান্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. AIDS আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ মানুষে HIV সংক্রামিত হতে পারে– [ব. বো. '১৫]
i সংক্রমিক ব্যক্তির ত্বকীয় সংস্পর্শে
ii. সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে
iii. সংক্রমিক মায়ের গর্ভে শিশু জন্মগ্রহণ করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২. AIDS রোগের লক্ষণসমূহ হলো– [সি. বো. '১৫]
i. দ্রুত ওজন কমে যাওয়া ii. দীর্ঘমেয়াদি জ্বর হওয়া
iii. প্রস্রাবে জ্বালা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

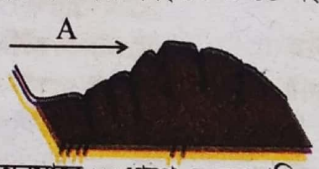

৩৩. উদ্দীপক অনুসারে 'A' ধাপে যেসব পরিবর্তন ঘটে– [চ. বো. '১৬]
i. এন্ডোমেট্রিয়াম ৩-৪ মি.মি. পুরুষ হয়
ii. রক্তনালির দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়
iii. গ্রাফিয়ান ফলিকদের বৃদ্ধি চূড়ান্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪. উদ্দীপকে অনুযায়ী সমগ্র প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী হরমোন– [চ. বো. '১৬]
i. FSH ও LH ii. ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন
iii. অ্যান্ড্রোজেন ও ইস্ট্রোজেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

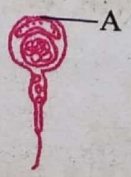

৩৫. চিত্রের 'A' অংশটির নাম কী? [সি., কু., ব., চ., য., দি. ও রা. বো. – ২০১৮]
ক নিউক্লিয়াস খ অ্যাক্রোজোম
গ ক্রোমোজোম ঘ ফ্ল্যাজেলাম

Scanned with CamScanner

৩৬. চিত্রে প্রদর্শিত 'A' অংশটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনটি?
ক মাইটোকন্ড্রিয়া ধারণ করে
খ শুক্রাণুকে গতিশীল করে
গ এটি ডিম্বাণুর পর্দা বিগলনে সক্ষম
ঘ এটিতে n সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

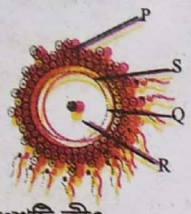

[ঢা. বো. '১৫]

৩৭. 'P' চিহ্নিত অংশটি কী?
ক এন্ডোমেট্রিয়াম খ করোনা রেডিয়াটা
গ জোনা পেলুসিডা ঘ প্লাজমা মেমব্রেন

৩৮. উদ্দীপকের কোন অংশ দ্বারা ইমপ্ল্যানটেশন ঘটে?
ক P খ Q গ R ঘ S

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৯. সিমেন তৈরির জন্য পিচ্ছিল পদার্থ ক্ষরণ করে কোন অঙ্গ? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক এপিডিডাইমিস খ সেমিনাল ভেসিকল
গ মূত্রাশয় ঘ ভাস ডিফারেন্স

৪০. নিম্নের কোনটি পুরুষ প্রজননতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়? [মেডিকেল : ১২-১৩]
ক সেমিনাল ভেসিকল খ প্রস্টেট গ্রন্থি
গ বার্থোলিন এর গ্রন্থি ঘ কাওপার এর গ্রন্থি

৪১. নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক শুক্রাশয়ের সারটলি কোষ টেস্টোস্টেরন নামক গুরুত্বপূর্ণ যৌন হরমোন নিঃসরণ করে
খ এপিডিডাইমিস শুক্রাণুর চলনশক্তি বৃদ্ধি করে
গ প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে অ্যালকালাইন ফসফাটেজ নামক এক রকম ক্ষারকীয় রস নিঃসরণ হয়
ঘ সেমিনাল রস প্রধাণত শুক্রাণুর পুষ্টি জোগায়

৪২. স্ক্রোটামের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা দেহগহ্বর অপেক্ষা কত কম বা বেশি? [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক ২ সেন্টিগ্রেড বেশি খ ৩ সেন্টিগ্রেড বেশি
গ ২ সেন্টিগ্রেড কম ঘ ৩ সেন্টিগ্রেড কম

৪৩. মানবদেহে নিষেক প্রক্রিয়া কোথায় সংঘটিত হয়? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক জরায়ু খ ডিম্বনালি গ ডিম্বাশয় ঘ সারভিক্স

৪৪. মানুষের জরায়ু গর্ভাবস্থায় নিম্নের কতগুণ বৃদ্ধি পায়? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক 30 খ 20 গ 40 ঘ 10

৪৫. নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৯-১০]
ক প্রোল্যাকটিনের প্রভাবে মাতৃদুগ্ধ নিঃসৃত হয়
খ জরায়ু প্রাচীরের এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরে মানব ভ্রূণের ইমপ্ল্যানটেশন হয়
গ প্রথম নিঃসৃত দুগ্ধকে শাল দুধ বলে
ঘ ডিম্বাশয় থেকে রিলাক্সিন নিঃসরণ হয়

৪৬. নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন গুরুত্বপূর্ণ নারী যৌন হরমোন
খ ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে মেয়েদের নারীসুলভ লক্ষণ বিকশিত হয়
গ করপাস লুটিয়াম থেকে লুটিনাইজিং হরমোন নিঃসৃত হয়
ঘ ডিম্বাশয়ের সবচেয়ে পরিপক্ক ফলিকলটিকে গ্রাফিয়ান ফলিকল বলে

৪৭. সাধারণত রজ:চক্র কত দিন স্থায়ী হয়? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক ৩-৪ খ ৮-১০ গ ২-৩ ঘ ৪-৫

৪৮. মানুষের শুক্রাণু প্রতি সেকেন্ডে কত মিলিমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক 1-8 খ 1-4 গ 5-8 ঘ 8-12

৪৯. নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক একটি জনন মাতৃকোষ থেকে একটি সক্রিয় ডিম্বাণু তৈরি হয়
খ DNA হচ্ছে ক্রোমোজোমের একমাত্র স্থায়ী রাসায়নিক পদার্থ
গ RNA শুধুমাত্র নিউক্লিয়াসে থাকে
ঘ প্রতি সেকেন্ডে এক হাজারের বেশি শুক্রাণু তৈরি হয়

৫০. কোনটি উত্তজেনেসিসে ঘটে না? [মেডিকেল : ০৫-০৬]
ক একটি জনন মাতৃকোষ থেকে একটি সক্রিয় ডিম্বাণু এবং তিনটি নিষেক-এ ভূমিকাহীন পোলার বডি সৃষ্টি হয়
খ উত্তজেনেসিসের মাধ্যমে উৎপন্ন ডিম্বাণুর সংখ্যা অনেক কম
গ উৎপন্ন ডিম্বাণু ছোট, সক্রিয় ও চলাচলে সক্ষম
ঘ এ প্রক্রিয়ায় স্ত্রী গ্যামিট বা ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়

৫১. নিম্নের কোনটি গ্যামিটোজেনেসিস এর জন্য সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৫-০৬]
ক শুক্রাণু নিউক্লিয়াসের সম্মুখপ্রান্তে গলজি বডি থেকে অ্যাক্রোজোম সৃষ্টি হয়
খ ব্যাঙের সাইটোপ্লাজমসহ ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসটি কুসুম থেকে পৃথক হয়ে ডিম্বাণুর নিম্নপ্রান্তে জুড়ে থাকে
গ প্রত্যেকটি উত্তগোনিয়াম ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোজোম বহন করে
ঘ স্পার্মাটোজেনেসিসে হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সেটের DNA অপরিবর্তিত থাকে

৫২. জননকোষের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক জাইগোট মাইটোসিস বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয়
খ প্রধানত চার ধরনের
গ ক্রোমোজোমের সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড
ঘ উপরের সব কয়টি

৫৩. কোনটি উত্তজেনেসিসের জন্য প্রযোজ্য নয়? [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম একই সাথে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়
খ মুখ্যঝিল্লি সৃষ্টি করে
গ পূর্ণতা প্রাপ্তির শেষ পর্যায় ডিম্বাশয়ের ভেতর সম্পন্ন হয়
ঘ অ্যানিমেল ও ভেজিটাল মেরুর সৃষ্টি হয়

Scanned with CamScanner

৫৪. কোনটি সত্য নয়? [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক বৃদ্ধি পর্যায়ে স্পার্মাটোগোনিয়া বিপুল পরিমাণ পুষ্টিদ্রব্য ও ক্রোমাটিন পদার্থ সঞ্চয় করে
খ স্পার্মাটোজেনেসিসে মুখ্যঝিল্লি সৃষ্টি হয় না
গ উওজেনেসিসে মুখ্যঝিল্লি সৃষ্টি হয়
ঘ স্পার্মাটোজেনেসিসে পূর্ণতা প্রাপ্তির সমস্ত প্রক্রিয়া শুক্রাশয়ে সম্পন্ন হয় না

৫৫. কোনটি উত্তজেনেসিস এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? [মেডিকেল : ০১-০২]
ক একটি উওগোনিয়াম থেকে চারটি কার্যক্ষম ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়
খ পরিণত ডিম্বাণু সঙ্গে সঙ্গেই নিষিক্ত হওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়
গ জার্মিনাল এপিথেলিয়াম থেকে বিচ্ছিন্ন প্রিমোর্ডিয়াল জননকোষগুলো ডিম্বাণু সৃষ্টি করে
ঘ পরিণত ডিম্বাণু চারদিকে কয়েকটি আবরণ দেখা যায়

৫৬. নিম্নের কোনটি সঠিক নয়? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে নাইট্রোজেন যুক্ত বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হয়
খ ডিম্বাশয় থেকে কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন নিঃসৃত হয়
গ অ্যামাইনো এসিড আমিষের গঠনমূলক একক
ঘ চোখের অগ্র প্রকোষ্ঠ অ্যাকুয়াস হিউমার দিয়ে পূর্ণ থাকে

৫৭. নিম্নের কোন জীবাণু মৃতদেহ থেকে অমরার মাধ্যমে ফিটাসে যায়? [মেডিকেল : ০৫-০৬, ডেন্টাল : ০৯-১০]
ক কলেরা খ রুবেলা গ ডিপথেরিয়া ঘ টিটেনাস

৫৮. কোনটি অ্যালানটয়েসের কাজ নয়? [মেডিকেল : ০৫-০৬]
ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু বিকাশে সাহায্য করে
খ অ্যালানটো কোরিওন প্লাসেন্টা গঠনে সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করে
গ ভ্রূণের শ্বসনে সাহায্য করে
ঘ ভ্রূণের রেচনে সাহায্য করে

৫৯. যেটি গর্ভাবস্থায় অমরার কাজ নয়? [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক লুটিনাইজিং হরমোন নিঃসৃতকরণ
খ রিলাক্সিন হরমোন নিঃসৃতকরণ
গ প্রোজেস্টেরন হরমোন নিঃসৃতকরণ
ঘ এর মাধ্যমেই মাতা ও ভ্রূনের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহ ও বর্জ্য পদার্থের আদান-প্রদান হয়

৬০. নিচের কোনটি ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম স্তর থেকে তৈরি হয়? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র খ লোহিত রক্তকণিকা
গ অস্থি সন্ধি ঘ থাইমাস

৬১. ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটনের দশা নয় কোনটি? [মেডিকেল : ১৩-১৪]
ক ক্লিভেজ খ গ্যাস্ট্রুলেশন
গ ডিম্বক্ষরণ ঘ অর্গানোজেনেসিস

৬২. ভ্রূণীয় স্তর মেসোডার্ম হতে নিচের কোনটি তৈরি হয়? [মেডিকেল : ১৩-১৪]
ক দাঁতের এনোমেল খ দাঁতের ডেন্টিন
গ থাইমাস গ্রন্থি ঘ অন্তঃকর্ণ

৬৩. নিম্নলিখিত কোনটি মেসোডার্ম থেকে গঠিত নয়? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক স্নায়ুতন্ত্র খ রক্তসংবহনতন্ত্র
গ কঙ্কালতন্ত্র ঘ প্রজননতন্ত্র

৬৪. নিম্নের কোনটি ভ্রূণের এক্টোডার্ম থেকে তৈরি হয়? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক শ্বসনতন্ত্র খ কঙ্কালতন্ত্র
গ রক্তসংবহনতন্ত্র ঘ স্নায়ুতন্ত্র

৬৫. কোনটি মেসোডার্ম (মধ্যত্বক) থেকে তৈরি হয়? [মেডিকেল : ০৪-০৫]
ক কঙ্কালতন্ত্র খ শ্বসনতন্ত্র
গ মুখ গহ্বর ঘ ত্বকীয় গ্রন্থি

৬৬. যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় সৃষ্টি হয় কোনটি থেকে? [মেডিকেল : ০৩-০৪]
ক এন্ডোডার্ম খ মেসোডার্ম গ এক্টোডার্ম ঘ এপিডার্ম

৬৭. স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়– [মেডিকেল : ০২-০৩]
ক এক্টোডার্ম থেকে খ মেসোডার্ম থেকে
গ এন্ডোডার্ম থেকে ঘ এক্টোডার্ম ও মেসোডার্ম থেকে

৬৮. ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম স্তর থেকে যেটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণিদেহে গঠিত হয় না– [মেডিকেল : ০০-০১]
ক সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র খ দাঁতের ডেন্টিন
গ দাঁতের এনামেল ঘ চোখ

৬৯. প্রথম টেস্টটিউব বেবির নাম কী? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক লুইস ব্রাউন খ প্যাট্রিক স্ট্রেপটো
গ রবার্ট এডোয়ার্ড ঘ হেনরি ওয়ার্টসন

৭০. সিফিলিস রোগের জন্য দায়ী নিচের কোনটি? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক *Treponema pallidum* খ *Neisseria gonorrhoeae*
গ *Treponema vaginalis* ঘ *Trichomonas vaginalis*

৭১. নিচের কোনটির দ্বারা গনোরিয়া রোগ হয়? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক ব্যাকটেরিয়া খ ছত্রাক
গ প্রোটোজোয়া ঘ ভাইরাস

উত্তরমালা

১. (ঘ); ২. (গ); ৩. (ক); ৪. (ক); ৫. (গ); ৬. (ক); ৭. (গ); ৮. (গ), ৯. (ক); ১০. (খ); ১১. (ক); ১২. (গ); ১৩. (ক); ১৪. (ক); ১৫. (ঘ); ১৬. (গ); ১৭. (গ); ১৮. (গ); ১৯. (গ); ২০. (ঘ); ২১. (ক); ২২. (গ); ২৩. (ক); ২৪. (খ); ২৫. (ঘ); ২৬. (খ); ২৭. (ক); ২৮. (ঘ); ২৯. (খ); ৩০. (খ); ৩১. (গ). ৩২. (ক); ৩৩. (খ); ৩৪. (ক); ৩৫. (খ); ৩৬. (গ); ৩৭. (খ); ৩৮. (ঘ); ৩৯. (খ); ৪০. (গ); ৪১. (ক); ৪২. (গ); ৪৩. (খ); ৪৪. (খ); ৪৫. (ক); ৪৬. (গ), ৪৭. (ঘ); ৪৮. (খ); ৪৯. (গ); ৫০. (গ); ৫১. (খ); ৫২. (গ); ৫৩. (গ); ৫৪. (ঘ); ৫৫. (ক); ৫৬. (খ); ৫৭. (খ); ৫৮. (ক); ৫৯. (ক); ৬০. (ক); ৬১. (গ); ৬২. (খ); ৬৩. (ক); ৬৪. (ঘ); ৬৫. (ক); ৬৬. (ক); ৬৭. (ক); ৬৮. (খ); ৬৯. (ক). ৭০. (ক); ৭১. (ক)।

Scanned with CamScanner

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. প্রজনন কাকে বলে?
২. প্রজননতন্ত্র কাকে বলে?
৩. ভাস ইফারেনসিয়া কাকে বলে?
৪. সারটোলি কোষ কী?
৫. এপিডিডাইমিস কী?
৬. বয়ঃসন্ধিকাল কী? [ব. বো. '১৬]
৭. রজঃচক্র কী? [য. বো. '১৬]
৮. মোনোপোজ কী?
৯. গ্রাফিয়ান ফলিকল কী?
১০. গ্যামিটোজেনেসিস কী?
১১. স্পার্মাটোজেনেসিস কী?
১২. স্পার্মিওজেনেসিস কী? [ঢা. বো. '১৬]
১৩. উওজেনেসিস কী?
১৪. নিষেক কী? [চ. বো. '১৬, ঢা.সি.বোর্ড-১৫]
১৫. ইমপ্ল্যানটেশন কাকে বলে? [চ. বো. '১৭]
১৬. এমব্রায়োজেনেসিস কাকে বলে?
১৭. মরুলা কী?
১৮. ব্লাস্টুলা কী?
১৯. গ্যাস্ট্রুলা কী?
২০. জার্মলেয়ার কী?
২১. অর্গানোজেনেসিস কী?
২২. বহিঃভ্রূণীয় আবরণী কী?
২৩. আইভিএফ পদ্ধতি কী?
২৪. IVF এর পূর্ণরূপ কী? [ব. বো. '১৭]
২৫. গর্ভ কী?
২৬. ভ্রূণ কী?
২৭. ফিটাস কী?
২৮. গর্ভনিরোধ কী?
২৯. বন্ধ্যাকরণ কী?
৩০. যৌনবাহিত রোগ কী?
৩১. এইডস কী?
৩২. ভ্যাসেকটমি কী?
৩৩. টিউবেকটমি বা লাইগেশন কী?
৩৪. অ্যাক্রোজোম কী?
৩৫. বিগ বেবি সিনড্রোম কী?
৩৬. করোনা রেডিয়েটা কী? [ঢা. বো. '১৯]

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. বয়ঃসন্ধিকাল বলতে কী বুঝ?
২. মানুষের পুরুষ জননতন্ত্রের অংশগুলোর নাম লিখ।
৩. মানুষের স্ত্রীজননতন্ত্রের অংশগুলোর নাম লিখ।
৪. ইমপ্লান্টেশন বলতে কী বোঝ? [কু. বো. '১৭]
৫. ডিম্বাশয় চক্র বলতে কী বোঝ? [কু. বো. '১৭]
৬. পুরুষ ও নারীর দেহে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো লিখ।
৭. গ্যামিটোজেনেসিসের গুরুত্ব বা তাৎপর্য লিখ।
৮. মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮-২০ নির্ধারণ করা হয় কেন? [সি. বো. '১৭]
৯. ডিম্বাণুর গঠন লিখ ও চিহ্নিত চিত্র আঁক।
১০. নিষেকের গুরুত্ব বা তাৎপর্য লিখ।
১১. গ্যামেটোজেনেসিস বলতে কী বোঝ? [চ. বো. '১৬]
১২. বহিঃভ্রূণীয় আবরণগুলোর নাম ও কাজ লিখ।
১৩. গর্ভবতী বলতে কী বুঝ?
১৪. অমরা বলতে কী বুঝ?
১৫. অমরার কাজ লিখ।
১৬. 'অমরা একটি ভ্রূণকে বাঁচিয়ে রাখে কীভাবে' ব্যাখ্যা কর।
১৭. প্লাসেন্টা ভ্রূণের পরিস্ফুরণে গুরুত্বপূর্ণ কেন?
১৮. শিশুকে কেন শালদুধ খাওয়ানো হয়।
১৯. পরিবার পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?
২০. সিফিলিসের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ।
২১. লাইগেশন বলতে কী বোঝ? [ব. বো. '১৬]
২২. এইডসের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ।
২৩. এইডসকে ঘাতক রোগ বলা হয় কেন?
২৪. দম্পতি কেন IVF পদ্ধতি গ্রহণ করে? [সি. বো. '১৬]
২৫. বিগ বেবি সিনড্রোম বলতে কী বুঝ? [য. বো. '১৬]
২৬. অমরাকে জৈব সেতু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '১৯]
২৭. লাইগেশন কেন করা হয়? [কু. বো. '১৯]

পার্থক্য লিখ/তুলনা কর

২৮. ভাস ইফারেনসিয়া ও ভাস ডিফারেনসিয়া
২৯. স্পার্মাটোজেনেসিস ও স্পার্মিওজেনেসিস
৩০. স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিস
৩১. মানুষের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য
৩২. মরুলা ও ব্লাস্টুলা
৩৩. ব্লাস্টুলা ও গ্যাস্ট্রুলা।

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

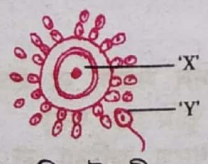

[ঢাকা বোর্ড-২০১৯]

ক. করোনা রেডিয়েটা কী?
খ. অমরাকে জৈব সেতু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. চিত্র-'Y' এর গঠন রূপ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জীবজগতে 'X' ও 'Y' এর মিলন প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২। নিচের প্রক্রিয়াটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

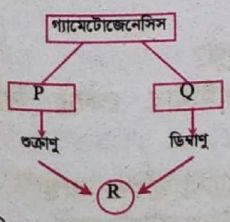

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৯]

ক. ফিটাস কী?
খ. লাইগেশন কেন করা হয়?
গ. 'Q' প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।
ঘ R এর পরিস্ফুটনে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী সৃষ্টি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া– বিশ্লেষণ কর।

৩। পাশের চিত্র দুটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. যৌনবাহিত রোগ কী?
খ. অমরা বলতে কী বুঝায়?
গ. 'A' হতে 'B' সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

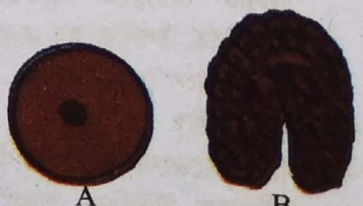

[সিলেট বোর্ড-২০১৭]

ঘ. ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য 'B' এর বিভিন্ন স্তরের পরিণতি ভিন্ন ভিন্ন– বুঝিয়ে লিখ। [সিলেট বোর্ড-২০১৭]

Scanned with CamScanner

৪। মিসেস রেবা বিয়ের ১১ বছর পর প্রথম মা হতে চলেছেন। ডাক্তার বললেন নারী ও পুরুষের প্রজননিক সমস্যার কারণে গর্ভধারণে এ ধরনের বিলম্ব বা বাধা আসে। ডাক্তার রেবাকে গর্ভকালীন সময়ে সুষম খাবার গ্রহণের পাশাপাশি অন্যান্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে বললেন।

ক. IVF-এর পূর্ণ অর্থ কী? *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*

খ. লাইগেশন বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপক অনুসারে মিসেস রেবার পালনীয় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা কর। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*

ঘ. উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের প্রথম উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]*

৫। নিষেক একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। নিষেকে, সৃষ্ট জাইগোট ভ্রূণে পরিণত হয়। মানব ভ্রূণ এক বিশেষ পদ্ধতিতে জরায়ুর প্রাচীরে সংস্থাপিত হয়।

ক. রজঃচক্র কী? *[যশোর বোর্ড-২০১৬]*

খ. শিশুকে কেন শালদুধ খাওয়ানো হয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জৈবিক প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব উল্লেখ কর। *[যশোর বোর্ড-২০১৬]*

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ পদ্ধতিটির বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। *[যশোর বোর্ড-২০১৬]*

৬। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র-ক চিত্র-খ

ক. ফিটাস কী?

খ. বয়ঃসন্ধিকাল বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকের 'ক' চিত্রে 'X' সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[কুমিল্লা বোর্ড- '১৬]*

ঘ. স্বাভাবিকভাবে 'X' ও 'Y' মিলিত হতে না পারলে জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। *[কুমিল্লা বোর্ড- '১৬]*

৭। মানব ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের ভিডিও ক্লিপে ব্লাস্টুলা ও গ্যাস্ট্রুলা দশার ছবি দেখিয়ে শিক্ষক বললেন, প্রথম গঠনটি জরায়ুতে প্রতিস্থাপন হওয়ার পর পরবর্তী গঠনটিতে উপনীত হয় এবং এর স্তরগুলোই মানবদেহের বিভিন্ন অংশ তৈরি করে। *[চ. বো. '১৬]*

ক. নিষেক কী?

খ. গ্যামিটোজেনেসিস বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম গঠনটি কীভাবে জরায়ুতে প্রতিস্থাপিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় গঠনটির বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তন ছাড়া পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠন অসম্ভব– বিশ্লেষণ কর।

৮। আরিফ সাহেবের স্ত্রী দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকার পর ঢাকাস্থ ফার্টিলিটি সেন্টারে চিকিৎসার জন্য গেলেন। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন তার স্ত্রী প্রজননগত সমস্যার কারণে স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণে অক্ষম। তবে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাপগুলো মাতৃদেহে সংঘটিত হয়। *[ব. বো. '১৬]*

ক. বয়ঃসন্ধিকাল কী?

খ. লাইগেশন বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আরিফ সাহেবের স্ত্রী সমস্যাটির কারণ চিহ্নিত কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ প্রক্রিয়াটির ধাপ বর্ণনাপূর্বক উপযোগিতা বিশ্লেষণ কর।

৯। শিক্ষক বললেন শুক্রাশয়ের অতিসূক্ষ্ম সেমিনিফেরাস নালিকা থেকে সৃষ্ট জননকোষ ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলে জীবনের সূচনা হয়। আর হরমোনের প্রভাবেই নারী-পুরুষ প্রজনন সক্ষমতা অর্জন করে। *[সি.বো.'১৬]*

ক. এপিডিডাইমিস কী?

খ. দম্পতি কেন IVF পদ্ধতি গ্রহণ করে?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নালিকায় সংঘটিত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

১০। রহমান দম্পতির দুই সন্তান। ছেলেটির বয়স ১৪ এবং মেয়েটির বয়স ১২। উক্ত দম্পতি আর কোনো সন্তানে-সন্ততি গ্রহণে আগ্রহী নয়।

ক. মোনোপোজ কী?

খ. এইডসকে ঘাতক রোগ বলা হয় কেন?

গ. রহমান সাহেবের ১ম সন্তানে হরমোনের প্রভাব আলোচনা কর। *[কু. বো. '১৫]*

ঘ. উক্ত দম্পতির ইচ্ছা পূরণে কোন পদ্ধতি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য?– যুক্তিসহ মতামত দাও। *[কু. বো. '১৫]*

১১। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে জমিলার কোনো সন্তান না হওয়ায় গ্রাম্য চিকিৎসা বাদ দিয়ে এবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার স্বামী-স্ত্রী উভয়কে পরীক্ষা করে জমিলার প্রাজননিক অক্ষমতার বিষয়টি চিহ্নিত করেন এবং গবেষণাগারে কৃত্রিম পদ্ধতিতে জমিলা সন্তানের মা হন।

ক. ভ্রূণ কী?

খ. নিষেকের তাৎপর্য লিখ।

গ. উদ্দীপকে জমিলার দীর্ঘদিন সন্তান না হওয়ার কী কী কারণ থাকতে পারে বলে তুমি মনে কর? *[রা. বো. '১৫]*

ঘ. যে বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে জমিলা মা হলেন তার কৌশল ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর। *[রা. বো. '১৫]*

১২। স্বাস্থ্যকর্মী নাদিরা এক গর্ভবতী মা ও তার সাথে বেশ কয়েকজন বাচ্চাসহ একটা ছবি দেখিয়ে গর্ভবতী শামীমাকে কিছু বোঝালেন। *[দি. বো. '১৫]*

ক. প্রজনন কী?

খ. রজঃচক্র বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শামীমার ক্ষেত্রে বিশেষ পালনীয় বিষয়গুলো লিখ।

ঘ. স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক দেখানো ছবির অবস্থাটি এড়ানোর জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? ব্যাখ্যা কর।

Scanned with CamScanner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়
মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

ঐতিহ্যে ৫১ বছর
কাজল প্রাদার্স লিমিটেড

Scanned with CamScanner

মানবদেহের প্রতিরক্ষা (ইমিউনিটি)
PROTECTION OF HUMAN BODY (IMMUNITY)

অধ্যায় ১০

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বা মানিয়ে চলতে হয়। পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের আণুবীক্ষণিক জীব এবং তাদের দেহজাত পদার্থ (যেমন– ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, তাদের প্রতিবিষ এবং নানা প্রকার বিজাতীয় প্রোটিন) মানুষের দেহে অনেকভাবে প্রবেশ করে এবং মানুষের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে কখনো কখনো বিপর্যস্ত করে তোলে বা তোলার চেষ্টা করে। এসব বিজাতীয় বস্তুর বিরুদ্ধে মানবদেহ যে বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাই অনাক্রম্যতা (Immunity)। অনাক্রম্যতা বা Immunity ল্যাটিন শব্দ *immunis* থেকে উদ্ভূত। *immunis* অর্থ exempt, যার অর্থ দায়মুক্ত বা অব্যাহতি প্রাপ্ত। **বিজ্ঞানের যে বিভাগে অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি এবং অনাক্রম্যতা বিষয়ে জানা যায় তাকে অনাক্রম্যবিদ্যা বা ইমিউনোলজি** (Immunology) **বলে**। **ড. এডওয়ার্ড জেনার** (Dr. Edward Jenner) নামক ইংরেজ বিজ্ঞানী ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে গুটি বসন্তের (Small Pox) ভ্যাকসিন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রথম Immunology সম্পর্কে ধারণা দেন। এজন্য তাঁকে Father of Immunology বলা হয়। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী লুইস পাস্তুর (Louis Pasteur) প্রথম প্রমাণ করেন যে, ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আক্রান্ত দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এজন্য তাকে Founder of microbiology বলা হয়। দেহের আগ্রাসী কোষ (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল ইত্যাদি) এবং লসিকা গ্রন্থি, প্লিহা প্রভৃতি নিহিত কলাকোষ দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে কাজ করে এবং পরিবেশীয় অদৃশ্য জগতের আক্রমণের বিরুদ্ধে দেহকে সুরক্ষা করে। এ অধ্যায়ে মানবদেহের অনাক্রম্য বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে।

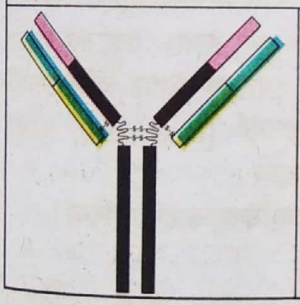
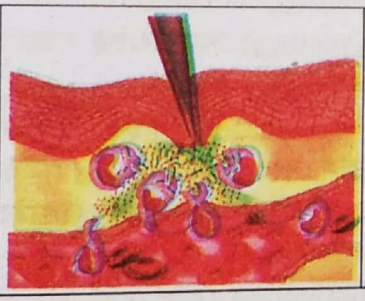

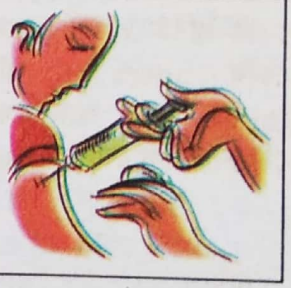

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ৯)
১. মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে ত্বকের কাজ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার ক্ষেত্রে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ (Macrophases) ও নিউট্রোফিলসের (Neutrophils) এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. মানবদেহের সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. মানবদেহের প্রতিরক্ষায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • মানবদেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে টিকার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। • দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরক্ষা তৈরিতে মেমোরি কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• মানবদেহের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা • প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর ○ প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা ○ খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাক নালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা • দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ○ ব্যাটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলস • তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ○ সহজাত (Inborn) ○ অর্জিত (Acquired) • প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার অ্যান্টিবডির ভূমিকা • প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার টিকার ভূমিকা • দেহের প্রতিরক্ষার ভূমিকা (Memory)

Scanned with CamScanner

১০.১ মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা
(Concept of Defence mechanism of Human body)

একটি প্রাণিসত্তার জীবদেহ পরিবেষ্টিত থাকে এমন একটা পরিবেশ দ্বারা, যা বিপুল সংখ্যক রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু বহন করে। জীবদেহের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এসব জীবাণুর বিভিন্ন পর্যায়ের আক্রমণের মাধ্যমে জীবদেহে প্রবেশকে প্রতিহত করে। সামগ্রিকভাবে সব রকম ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় প্রতিরক্ষা (defence)। ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী ও অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলোকে সাধারণভাবে বলা হয় **অনাক্রম্যতা** বা **ইমিউনিটি** (immunity)। আর **বিভিন্ন কোষ ও তাদের সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহকে রোগাক্রমণের হাত থেকে এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে তাকে অনাক্রম্য তন্ত্র** বা **ইমিউনতন্ত্র** (immune system) বা **মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা** (human defence system) **বলা হয়**।

অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটির প্রধান উদ্দেশ্য (Major objectives of Immunity)

১। অণুজীবদের (micro-organisms) বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
২। দেহের ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলোকে প্রতিস্থাপিত করা, দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করা এবং
৩। পরিত্যক্ত কোষগুলোকে শনাক্ত করা এবং তাদের ধ্বংস করা।

অনাক্রম্য তন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন কোষ (Different Cells of Immune System)

১। **লিম্ফোসাইট** (Lymphocyte) : T-লিম্ফোসাইট (T-lymphocyte) ও B-লিম্ফোসাইট (B-lymphocyte)।

২। **কিলার কোষ** (Killer cell) : বিশেষ ধরনের **লিম্ফোসাইট** যা **কিলার সেল** বা **ন্যাচারাল কিলার সেল** (Natural killer cells or NK Cells) বা নাল কোষ (Null Cell) নামে পরিচিত।

৩। **মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইট** (Mononuclear phagocytes) : এরা দু'রকমের, যথা– **মনোসাইট** (monocyte) এবং **ম্যাক্রোফেজ** (macrophage)। মনোসাইট রক্তে অবস্থিত এক প্রকার শ্বেতকণিকা। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে দেহে প্রবিষ্ট রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে। ম্যাক্রোফেজ (macrophage) কোষ বিভিন্ন রকমের হয়, যথা– যকৃতের **কুফার কোষ** (kuffer's cell), অস্থিমজ্জা, প্লিহা ও লসিকা গ্রন্থির জালক কোষ (Raticulum cells), যোজক কলার **হিস্টিওসাইট** (histiocytes), **অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ** (alveolar macrophage), অস্থির **অস্টিওক্লাস্ট** (osteoclast), বৃক্কের **মেসানজিয়াল কোষ** (mesangial cell), মস্তিষ্কের **মাইক্রোগ্লিয়াল কোষ** (microglial cell) ইত্যাদি।

৪। **গ্রানুলার লিউকোসাইট** (Granular lucocyte) : রক্তে অবস্থিত **নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল** ও **বেসোফিল**।

৫। **মাস্ট কোষ** (Mast cells) : অ্যারিওলার যোজক কলায় থাকে।

৬। **ডেনড্রাইটিক কোষ** (Dendritic cells) : যেমন– **ল্যাঙ্গারহ্যানস কোষ** (Langerhans cells): ত্বকে ও মিউকাস পর্দায় বা শ্লেষ্মাঝিল্লিতে থাকে; **ইন্টারডিজিটেটিং ডেনড্রাইটিক কোষ** (Interdigitating dendritic cell): থাইমাস গ্রন্থিতে থাকে এবং **ইন্টারস্টিশিয়াল ডেনড্রাইটিক কোষ** (Interstitial dendritic cells): ফুসফুস, যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি অঙ্গে থাকে।

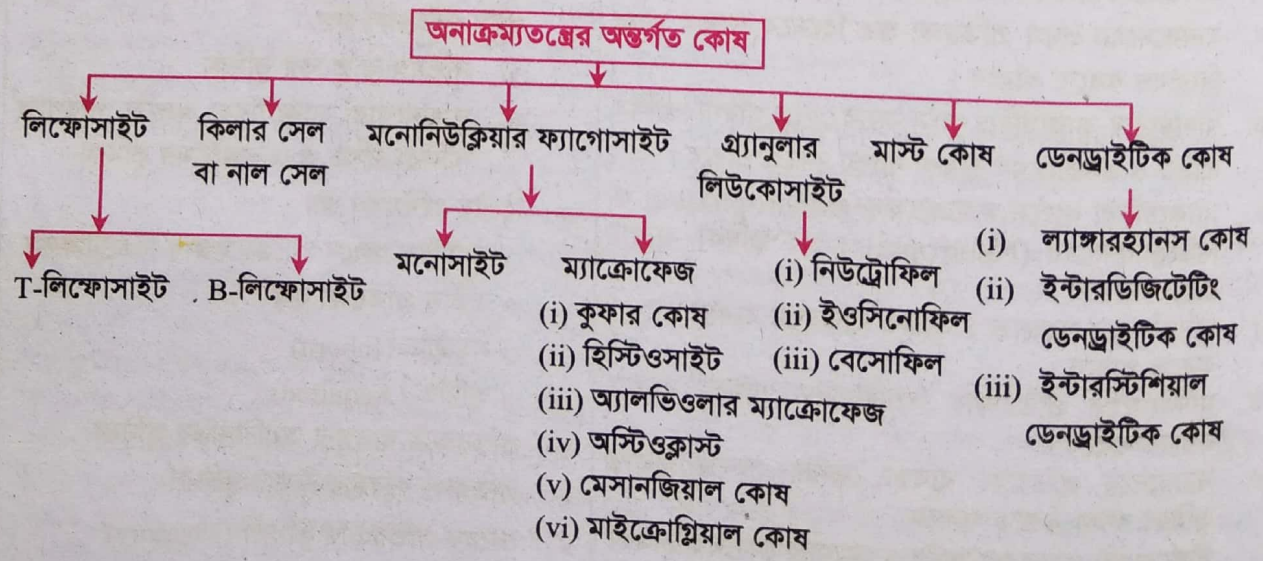

Scanned with CamScanner

অনাক্রম্যতন্ত্রের অন্তর্গত অঙ্গ (Organs of Immune System)

মানবদেহের অনাক্রম্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব অঙ্গ তাদেরকে লিম্ফয়েড অঙ্গ বলা হয়। মানবদেহের প্রায় সর্বত্র এ অঙ্গসমূহ বিদ্যমান। অনাক্রম্যতন্ত্রের অন্তর্গত অঙ্গ দু'রকমের, যথা–

(ক) **প্রাথমিক লিম্ফয়েড অঙ্গ** (Primary lymphoid organs) : থাইমাস গ্রন্থি, অস্থিমজ্জা, লসিকা ও লসিকাবাহ।

(খ) **গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গ** (Secondary lymphoid organs) : প্লিহা, লসিকা গ্রন্থি, অ্যাডিনয়েড গ্রন্থি, টনসিল, অ্যাপেনডিক্স ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার লিম্ফয়েড অঙ্গগুলোর অবস্থান নিম্নরূপ :

১। **থাইমাস গ্রন্থি** (Thymus gland) : এটি শৈশবকালের গ্রন্থি। হৃৎপিন্ডের উপরে শ্বাসনালির পেছনে অবস্থিত গ্রন্থি। অস্থিমজ্জায় উৎপন্ন Pre T-cell এই গ্রন্থিতে আসে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত **থাইমোসিন** (thymosin) হরমোনের প্রভাবে T-lymphocyte-এ পরিণত হয়। ফলে অনাক্রম্যযোগ্য হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থিতে উপস্থিত ম্যাক্রোফেজ, প্লাজমা কোষ, মাস্ট কোষ দেহে অনাক্রম্যতা গঠনে সাহায্য করে।

২। **অস্থিমজ্জা** (Bone marrow) : অস্থি গহ্বরে অবস্থিত লোহিত শ্বেত বর্ণের নরম ও চর্বিযুক্ত কলা। এখান থেকে সবরকম রক্ত কোষ সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে শ্বেত রক্তকণিকা অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে।

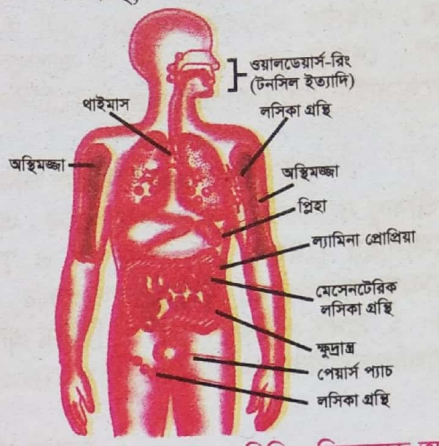

চিত্র ১০.১ (ক) : মানবদেহের বিভিন্ন লিম্ফয়েড অঙ্গ

৩। **লসিকা** (Lymph) : লসিকানালি বা লসিকাবাহের মধ্য দিয়ে ঈষৎ ক্ষারধর্মী যে তরল যোজক কলা প্রবাহিত হয় তাকে লসিকা বলে। লসিকা বর্ণহীন ও রক্তের ন্যায় এক ধরনের যোজক কলাবিশেষ।

৪। **লসিকানালি** (Lymphatic vessels) : দেহের সর্বত্র বিস্তৃত নালিকা যেগুলো লসিকা পরিবহন করে।

৫। **লসিকা গ্রন্থি** (Lymph nodes) : লসিকা বহনকারী লসিকানালির স্বল্প ব্যবধানে বহু গোলাকার বা ডিম্বাকার স্ফীত অংশ থাকে, এদের লসিকা গ্রন্থি বা লসিকা পর্ব বলে। দেহের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত, তবে ঘাড়ে, বগলে, কুঁচকিতে লসিকা গ্রন্থির পরিমাণ বেশি। লসিকা গ্রন্থিতে অবস্থিত T-lymphocyte এবং B-lymphocyte কোষে অ্যান্টিবডি তৈরি করে দেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে।

৬। **প্লিহা** (Spleen) : উদর গহ্বরে পাকস্থলীর পাশে অবস্থিত লালচে বর্ণের মুষ্ঠি আকারের গঠন। এটি দেহের সবচেয়ে বড় লসিকা গ্রন্থি। প্লিহা প্লাজমা কোষ গঠন করে, যারা রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে। এছাড়া প্লিহার Reticuloendothelial (RE) কোষ ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য বহিরাগত অ্যান্টিজেনদের ধ্বংস করে।

৭। **অ্যাডিনয়েড গ্রন্থি** (Adenoids gland) : নাসিকা নালির পেছনে অবস্থিত দুটি বিশেষ গ্রন্থি।

৮। **টনসিল** (Tonsils) : গলার পেছনের দিকে অবস্থিত দুটি ডিম্বাকার গঠন। এর প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন রোগজীবাণুদের (অ্যান্টিজেন) ধ্বংস করা। টনসিলে রোগজীবাণু প্রবেশ করলে এটি ফুলে ওঠে এবং ব্যথা হয়। কয়েকদিন পর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় তা ফিরে আসে।

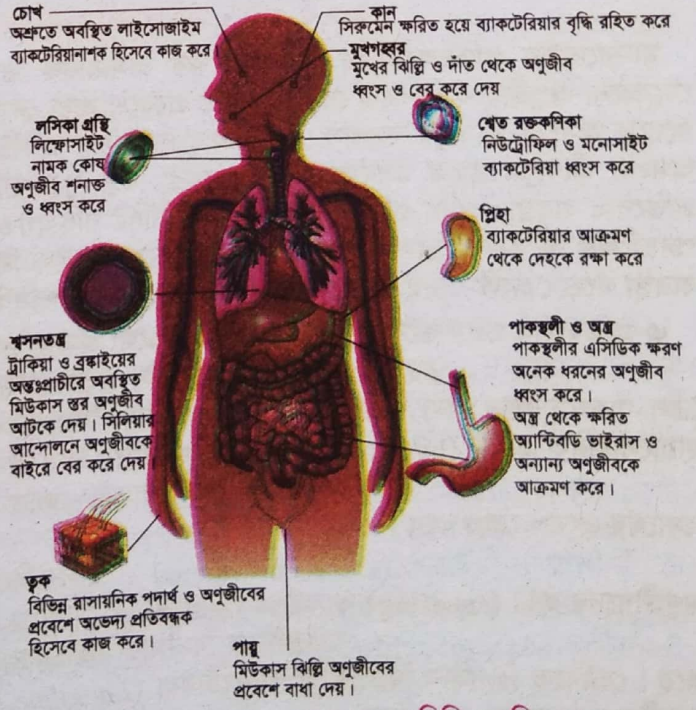

চিত্র ১০.১ (খ) : মানবদেহের বিভিন্ন প্রতিরক্ষা স্তর

৯। **অ্যাপেনডিক্স** (Appendix) : বৃহদন্ত্রের সিকামের সঙ্গে যুক্ত নলাকার গঠন বিশেষ।

১০। **রক্তনালিসমূহ** (Blood vessels) : দেহের সর্বত্র বিস্তৃত ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকাসমূহ।

১১। **পেয়ার প্যাচ** (Peyer's patches) : ক্ষুদ্রান্ত্রে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের লসিকা কলা।

Scanned with CamScanner

জীবদেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
(Normal Disease defence mechanism of animal body)

মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। যথা–

(ক) সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা অনির্দেশিত অনাক্রম্যতা (Non specific defence mechanism/Non specific immunity) : এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জীবদেহে যেকোনো রকম অণুজীবের বা জীবাণুর বা পরজীবীর প্রবেশকে প্রতিরোধ করে। সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দেহ একটি আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত পন্থাগুলো হলো– দেহের ত্বক, শ্বাসনালি বা অন্ত্রনালির মিউকাস পর্দা, পাকস্থলীর ভেতর আম্লিক pH, প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাড়া, ফ্যাগোসাইট দ্বারা (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল ইত্যাদি) জীবাণু ভক্ষণ, দেহের তাপমাত্রা দ্বারা জীবাণু দমন প্রভৃতি।

(খ) সুনির্দিষ্ট বা নির্দেশিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা নির্দেশিত অনাক্রম্যতা (Specific defence mechanism/Specific immunity) : এটি এমন একটি সক্রিয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যার মধ্যমে নির্দিষ্টভাবে দেহে প্রবেশকৃত বিশেষ বিশেষ অণুজীব বা জীবাণু বা পরজীবী ধ্বংস হয়ে থাকে। একে **রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা** বা Immune System বলে। এই ব্যবস্থায় দেহের **লিম্ফোসাইট** (যেমন, B-লিম্ফোসাইট ও T-লিম্ফোসাইট) রোগজীবাণু প্রতিরোধ করে। রোগজীবাণু কিংবা পরজীবীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পোষকদেহে (মানবদেহে) সাধারণভাবে তিন ধরনের প্রতিরক্ষা স্তর লক্ষ করা যায়, যথা– **১. প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর, ২. দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর** ও **৩. তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর**। মানবদেহে এ সকল ব্যবস্থা ভৌত, রাসায়নিক প্রতিবন্ধক ও প্রতিরক্ষা স্তর (Step of defence) হিসেবে সদা সতর্ক রয়েছে।

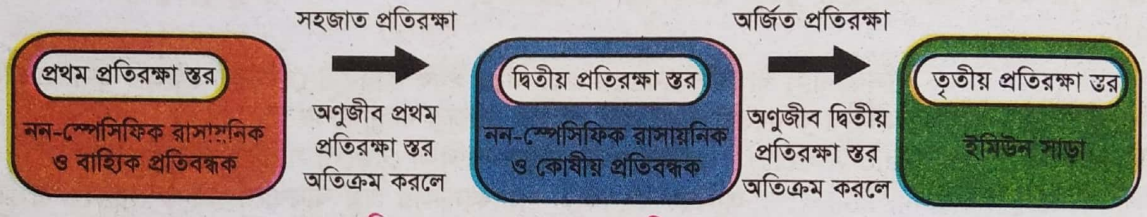

চিত্র ১০.২ : মানবদেহের প্রতিরক্ষা স্তর

❑ **কাজ:** (i) ইমিউন সিস্টেমের ধারণার শ্রেণিবিন্যাস কর। (ii) মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ইমিউনতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

১০.২ প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর (First Step of Defence)

মানবদেহের প্রতিরক্ষায় যে প্রতিরক্ষা স্তর রাসায়নিক ও ভৌত বাহ্যিক তলীয় প্রতিবন্ধক হিসেবে বহিরাগত যেকোনো অণুজীব বা কণাকে দেহের ভেতর প্রবেশে বাধা দেয় তাকে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর বলে। আমাদের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য জীবাণুর বসবাস। এ জীবাণুদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। অসংখ্য জীবাণুর মাঝে বসবাস করেও আমরা কিন্তু সুস্থ থাকি। কারণ আমাদের দেহে রয়েছে তিন স্তরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর কোনো নির্দিষ্ট বহিরাগত বস্তুকে ক্ষতিকর হিসেবে টার্গেট না করে সব বহিরাগত পদার্থকেই ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করে দেহে প্রবেশে নিম্নোক্ত ভৌত রাসায়নিক প্রতিবন্ধকের মিলিত কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাই এ স্তরটিকে **অনির্দিষ্ট** বা **নন-স্পেসিফিক** স্তরও বলা হয়।

এ প্রতিরক্ষার প্রথম স্তরে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো জীবাণু প্রতিরোধ করে থাকে।

১। ত্বক (Skin) : ত্বক দেহে অণুজীব প্রবেশের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। ত্বকীয় গ্রন্থি নিঃসৃত ঘাম ও তৈল ব্যাকটেরিয়ার জন্য বিষস্বরূপ। ত্বকে বিদ্যমান মিথোজীবী অণুজীব সংক্রমক অণুজীব প্রতিরোধ করে। ত্বকের **হায়ালোরনিক এসিড** (hyaluronic acid) অণুজীবদের জন্য অতি অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে যা এদের ধ্বংস করে।

২। লোম (Hairs) : নাকের মধ্যকার লোম বাতাস থেকে আসা ধূলা-ময়লা আটকে দেহের অভ্যন্তরের ক্ষতিকর পদার্থের প্রবেশ রোধ করে।

৩। সিলিয়া ও মিউকাস (Cilia and Mucus) : শ্বাসনালিতে বিদ্যমান সিলিয়া ও মিউকাস অবিরাম ধূলিকণা ও অণুজীবদের হাঁচি (sneezing) ও কাশির (coughing) মাধ্যমে বের করে দেয়।

৪। এসিড (Acid- HCl) : পাকস্থলীতে বিদ্যমান হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাদ্যের সঙ্গে আগত বিভিন্ন অণুজীব ধ্বংস করে। যোনিতে বিদ্যমান মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া (*Lactobacillus* sp.) **ল্যাকটিক এসিড** (lactic acid) উৎপন্ন করে অণুজীবের সংক্রমণ রোধ করে।

৫। এনজাইম (Lysozyme enzyme) : লালা, অশ্রু, মূত্র ও ঘামে বিদ্যমান লাইসোজাইম এনজাইম দেহে আগত অধিকাংশ ক্ষতিকর অণুজীব ধ্বংস করে। এছাড়াও পাকস্থলীতে বিদ্যমান প্রোটিওলাইটিক এনজাইম খাদ্যের সাথে আগত বিভিন্ন অণুজীব ধ্বংস করে।

Scanned with CamScanner

৬। **সিরুমেন** (Cerumen) : শ্রবণ অঙ্গের বহিঃকর্ণের কর্ণকূহর নামক অংশের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হলদে বাদামি রংয়ের মোমের মতো পদার্থকে সিরুমেন বলে। কানের পর্দার যেন ময়লা ও অণুজীবের সংক্রমণে শ্রবণে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য সিরুমেনে আটকে শক্ত দলায় অর্থাৎ **কানের খইল** (earwax) এ পরিণত হয়।

৭। **রক্ত তঞ্চন** (Blood clotting) : ক্ষতস্থানে দ্রুত রক্ত তঞ্চন ঘটে দেহে অণুজীব প্রবেশ রোধ করে।

৮। **মলত্যাগ ও বমি** (Defecation and vomiting) : দেহ হতে অনেক ক্ষতিকর অণুজীব মলত্যাগ ও বমির মাধ্যমে বের হয়ে যায়।

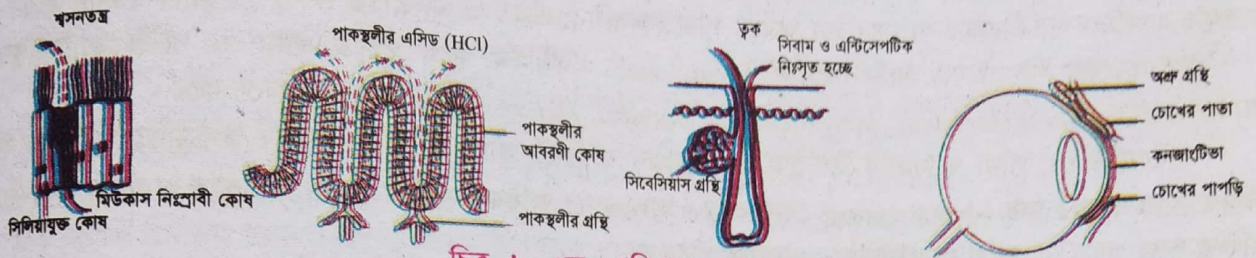

চিত্র- ১০.৩ক : প্রতিরক্ষার প্রথম স্তর

১০.২.১ দেহ প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা (Role of Skin in defence of the body)

মানবদেহের বাহিরের আবরণী হলো ত্বক। এটি মানবদেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ। এপিডার্মিস ও ডার্মিস নামক দুটি স্তর নিয়ে ত্বক গঠিত। ত্বকের অন্যতম কাজ হলো দেহের অন্তঃস্থ অঙ্গসমূহকে সংরক্ষণ করা ও দেহে জীবাণু সংক্রমণে বাধা দান করা। দেহে ত্বক প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

- ত্বক দেহকে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং এর প্রভাবে সৃষ্ট রোগ (ক্যান্সার) হতে দেহকে রক্ষা করে। ত্বকের এপিডার্মিসের কোষে **মেলানিন** (melanin) জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় যা অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে।
- ত্বক দেহের বাইরের স্তরে দৃঢ় ও **ক্যারাটিনাইজড** (keratinized) আবরণী তৈরি করে, যা দেহের সকল ব্যাহ্যিক অংশকে আচ্ছাদিত করে এবং ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে একটি ফলপ্রসূ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।



চিত্র- ১০.৩খ : মানুষের ত্বকের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)

- দেহত্বক ছিঁড়ে বা কেটে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হলে সেখানে দ্রুত জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। ত্বকের কাটা স্থান থেকে নির্গত রক্তপ্রবাহ জীবাণুর অপসারণ ঘটায় এবং ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধায় ফলে বাইরে থেকে অণুজীব দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। এছাড়াও ত্বকে অবস্থিত **হিস্টিওসাইট** (ম্যাক্রোফেজ) জীবাণু ধ্বংস করে দেহকে প্রতিরক্ষা দান করে।
- **ঘাম গ্রন্থি** (sweat gland) ও তৈল বা **স্বেদ গ্রন্থির** (sebaceous gland) নিঃসরণ (ঘাম ও তেল বা স্বেদ) ত্বকের উপরিভাগের pH-কে অম্লীয় (pH ৩.০-৫.০) করে তোলে, ফলে অণুজীবসমূহ বেশি সময় ত্বকে বেঁচে থাকতে পারে না। এছাড়া ঘাম গ্রন্থি ও স্বেদ গ্রন্থির নিঃসরণেও জীবাণুনাশক (অ্যান্টিবায়োটিক) বস্তু থাকে (ডার্মিসাইডিন নামে পেপটাইড), যার কারণে মানুষের ত্বক **আত্ম-রোগজীবাণুনাশক অঙ্গ** (self-disinfecting organ) হিসেবে কাজ করতে পারে। কিছু সংখ্যক উপকারী ব্যাকটেরিয়া ত্বকে অবস্থানকালে এসিড ও বিপাকীয় বর্জ্য নিঃসরণ করে, যা অণুজীবের সংখ্যাবৃদ্ধিকে বাধা দেয়।
- ঘাম নিঃসৃত লবণ ও ফ্যাটি এসিডে অবস্থিত **লাইসোজাইম** (lysozyme) ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরকে ধ্বংস করে।
- ত্বকের কেরাটিনোসাইটস থেকে সাইটোকাইন, নিউরোপেপটাইড ও ইকোসানয়েড ক্ষরিত হয় যেগুলো বিভিন্ন জীবাণুর বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান করে।
- কানের ভিতরে **সিরুমিনাস গ্রন্থি** (ceruminous gland, ত্বকীয় গ্রন্থি) থেকে নিঃসৃত **সিরুমেন** (cerumen) নামক মোমের মতো পদার্থ কানের ভেতর ধুলাবালি, ব্যাকটেরিয়া, ছোট পোকামাকড়ের প্রবেশ ও আক্রমণ থেকে কানের পর্দাকে রক্ষা করে।
- **অশ্রুগ্রন্থি** (lacrimal gland) নিঃসৃত অশ্রুতেও (tear) লাইসোজাইম থাকে যা চোখে জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিহত করে।

❑ **কাজ :** দেহের বাইরের বিশেষ কিছু অঙ্গের দেহ রক্ষায় ভূমিকা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

Scanned with CamScanner

১০.২.২ খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা
(Role of Digestive Acid and Enzyme in killing Food Bacteria)

আমরা খাদ্যের সাথে প্রতিনিয়ত অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অনেক অণুজীব গলাধঃকরণ করে থাকি। আমাদের দেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এসব ব্যাকটেরিয়া ও অণুজীবকে ধ্বংস করে আমাদের দেহকে সুস্থ রাখে। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর হিসেবে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- মুখগহ্বরের লালারসের **লাইসোজাইম** (lysozyme) এনজাইম মুখে গৃহীত খাদ্য ও পানীয়তে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়াকে (*Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Enterococcus* ইত্যাদি) ধ্বংস করে।
- লাইসোজাইম, লালা ও লালায় উপস্থিত হাইড্রোজেন কার্বনেট আয়ন দাঁতের এসিডের উপস্থিতিকে প্রশমিত বা নিষ্ক্রিয় করে দাঁতের ক্ষয় (dental caries) রোধ করে। লালারসের অবিরাম ক্ষরণে মুখের অভ্যন্তরে বা দাঁতে খাদ্যকণা সঞ্চিত হতে পারে না, ফলে ব্যাকটেরিয়াও জন্মাতে পারে না।
- আর যেসব ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীব লালারস দ্বারা ধ্বংস হয় না তারা পাকস্থলীর প্রাচীরের প্যারাইটাল কোষ থেকে নিঃসৃত HCl এসিড দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পাকস্থলীরসে অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান লাইসোজাইমও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে থাকে।
- ক্ষুদ্রান্ত্রের হাইড্রোলাইটিক এনজাইম খাদ্যের ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবদের ধ্বংস করে।
- পাকস্থলী, ডিওডেনাম ও ইলিয়ামে উপস্থিত **প্রোটিয়েজ এনজাইম** খাদ্যের সাথে আগত ব্যাকটেরিয়ার দেহের প্রোটিন অংশকে ভেঙে ফেলে, ফলে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়।
- পিত্তাশয়ের **পিত্ত** (bile, pH 8.0) অন্ত্রের **কাইমে** (chyme) অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যম ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।



চিত্র ১০.৪ : প্রতিরক্ষায় পরিপাকনালির ভূমিকা

- সমগ্র পরিপাকনালির অন্তঃপ্রাচীর মিউকাস দিয়ে আবৃত থাকে। এই মিউকাস পরজীবী বিধ্বংসী বস্তু, কারণ এতে Immunoglobulin G (Ig-G) এবং লাইসোজোম উপস্থিত থাকে। IgG-একটি বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডি। এরা অন্ত্রের কোষীয় আবরণের উপর রক্ষণাত্মক স্তর সৃষ্টি করে এবং পরজীবীর আক্রমণ রোধ করে।

১০.৩ দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Second Step of Defence)

বাহ্যিকতলীয় প্রতিরক্ষা স্তর ভেদ করে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশকারী যেকোনো অণুজীব বা অণুকণার বিরুদ্ধে দেহাভ্যন্তরীণ কোষীয় ও রাসায়নিক প্রতিরক্ষা নিয়ে গঠিত যে স্তর সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাকে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর বলে। এটিও একটি **নন-স্পেসিফিক** প্রতিরক্ষা স্তর। শ্বেত রক্তকণিকা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের **ফ্যাগোসাইটিক কোষ** (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল ইত্যাদি), **প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাড়া** (inflammatory response) ও **দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি** প্রভৃতি দেহে দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

ফ্যাগোসাইটিক কোষ : দেহের প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোনো কারণে অকার্যকর হয়ে পড়লে ব্যাকটেরিয়া ত্বকের ক্ষতস্থান দিয়ে দেহে প্রবেশের সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে ক্ষতস্থানের সূক্ষ্ম রক্তনালিকাগুলোর প্রসারণের ফলে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। কৈশিক জালিকার ভেদ্যতা বৃদ্ধির ফলে **ফ্যাগোসাইটগুলো** (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল, মনোসাইট ইত্যাদি) আন্তঃকোষীয় ফাঁকে বের হয়ে আসে এবং অনুপ্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়াকে গলাঃধকরণ করে।

কোনো কোনো ফ্যাগোসাইটের লাইসোজোমে বিদ্যমান এনজাইম দুরকমের **কোষবিষ** (cytotoxin) তৈরি করে, যথা- **রিঅ্যাকটিভ অক্সিজেন ইন্টারমেডিয়েট** (ROIs) ও **রিঅ্যাকটিভ নাইট্রোজেন ইন্টারমেডিয়েট** (RNIs)। এদের ক্রিয়ায় দেহে প্রবেশকৃত অণুজীব বা পরজীবীকে ধ্বংস হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাড়া : সংক্রমিত স্থানে উৎপন্ন **পুঁজ** (pus) হচ্ছে রক্তরসে অবস্থিত মৃত কোষ, নিষ্ক্রিয় ব্যাকটেরিয়া ও ফ্যাগোসাইটের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষ। **ফ্যাগোসাইটোসিসের** (phagocytosis) পরিণতি প্রকাশ পায় যখন সংক্রমণের স্থানটি গাঢ় লাল বর্ণের হয়ে স্ফীত হয়। রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ত্বকের ওই অঞ্চলে লালচে ভাব ফুটে ওঠে। লসিকাবাহিত ব্যাকটেরিয়া ও ফ্যাগোসাইট লসিকা গ্রন্থিতে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে গলাধঃকরণের মাধ্যমে নিষ্কাশিত করে। লিম্ফোসাইট ও ক্ষতিগ্রস্ত কলা নিঃসৃত **হিস্টামিন** (histamin) এর প্রভাবে রক্তের কৈশিক জালিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রদাহ সৃজনক্ষম প্রতিক্রিয়া (inflamentory response) দেখা যায়।

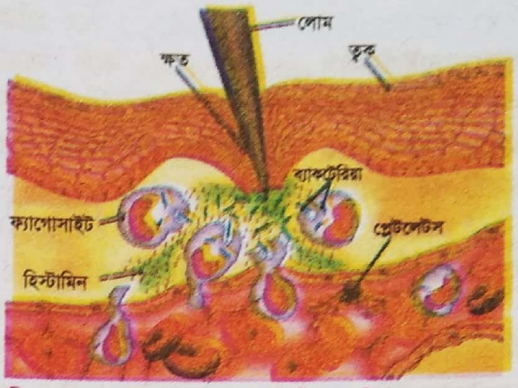

চিত্র ১০.৫ : মানবদেহের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর

দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি : বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেহের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তাপমাত্রা হচ্ছে অণুজীব ও শ্বেতকণিকার মধ্যকার সংঘর্ষের বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের প্রদাহ অধিকতর বিস্তৃত এবং একে **Systemic reaction** বলে।

উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর শুধু জীবাণুর বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে তা নয়, কখনো কখনো এরা আসলে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও ক্রিয়াশীল করে তোলে বটে, অবশ্য যদি না তা অতিরিক্ত পর্যায়ের অসুবিধা ঘটায়। এক্ষেত্রে দুটি কারণে জ্বর হয়ে থাকে, প্রথমত রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব দ্বারা নিঃসৃত বিষক্রিয়া, দ্বিতীয়ত **পাইরোজেন** *(pyrogen)* নামক রাসায়নিক পদার্থ *(fever producing substance)* যা শ্বেতকণিকা থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে।

ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলসের ভূমিকা

(Role of Macrophage and Neutrophils in killing Bacteria)

মাক্রোফেজ (Macrophage, Gr. *makros* = large ; *phagein* = eat, i.e. big eaters)

মনোসাইট বৃহৎ আকৃতির শ্বেত রক্তকণিকা। এদের ব্যাস ১০μm-২০μm। এদের নিউক্লিয়াস অপেক্ষাকৃত ছোট, ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার এবং সাইটোপ্লাজম বেশি, স্বচ্ছ ও দানাহীন। এরা দেহের মোট শ্বেত রক্তকণিকার প্রায় ৫%। এরা চলমান ফ্যাগোসাইট (mobile phagocyte) এবং ক্ষণপদ গঠনে সক্ষম। এরা অস্থিমজ্জায় বৃদ্ধি লাভ করে এবং রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। রক্তে মাত্র ১০-২০ ঘণ্টা থাকার পর এরা ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়।


ম্যাক্রোফেজ

ম্যাক্রোফেজ বিশেষ প্রকার শ্বেতকণিকা, যা **মনোসাইট** (monocyte) থেকে উৎপন্ন হয়। মনোসাইট রক্তের বাইরে বৃহদাকার (ব্যাস ৬০μm-৮০μm) ধারণ করে ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়। **রেটিকিউলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম** (Reticulo-endothelial System) বা **মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইট সিস্টেমের** (Mononuclear phagocyte system) ভেতর (যেমন– অস্থিমজ্জা, যকৃৎ, প্লিহা, লিম্ফ নোড ও সাইনাস ইত্যাদির ভেতর) ম্যাক্রোফেজ ঘুরে বেড়ায়। এমনকি **ভ্রাম্যমাণ কোষ** (wandering cells) হিসেবেও এরা কলার ভেতর বিচরণ করতে পারে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভেতর **মাইক্রোগ্লিয়া** (microglia), যকৃৎ রক্তনালির ভেতর **কুফার কোষ** (kuffer cell), যোজক কলার মধ্যে আবদ্ধ **হিস্টিওসাইট** (histiocytes) বিভিন্ন প্রকার ম্যাক্রোফেজ।

এ ধরনের কোষ, জীবাণুকে **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) পদ্ধতিতে আত্মসাৎ করে জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। এটা ছাড়াও B ও T লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করে অনাক্রম্যতামূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এ কারণে ম্যাক্রোফেজকে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। ম্যাক্রোফেজগুলো প্রাথমিকভাবে দেহে প্রবিষ্ট জীবাণুকে ভক্ষণ করে ধ্বংস করে। তা ছাড়াও অনাক্রম্যতা সৃষ্টিতে এরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

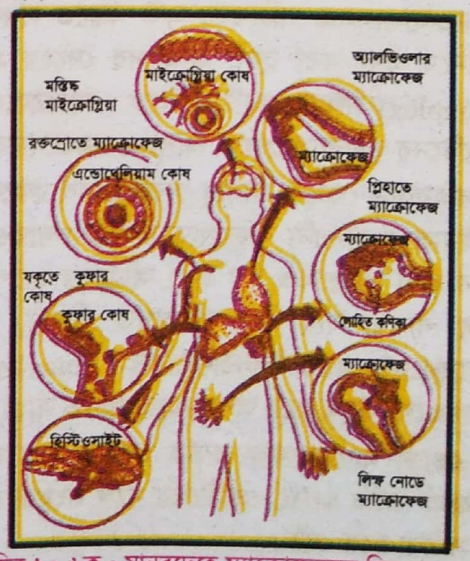

চিত্র ১০.৬ক : মানবদেহে ম্যাক্রোফেজের বিচরণক্ষেত্র

দেহত্বক ভেদ করে রোগজীবাণু কোষকলায় পৌঁছানো মাত্রই প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেখানে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। ফলে দেহের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধীরে ধীরে উক্ত প্রদাহস্থলে ম্যাক্রোফেজ এসে জড়ো হতে থাকে।

ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক জীবাণু ধ্বংসের প্রক্রিয়া : ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক উৎপাদিত প্রোটিন দু'ভাবে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করে। যেমন–

(ক) ভৌত পদ্ধতিতে : ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়ার দেহ প্রাচীরে গর্ত বা ছিদ্র করে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে।

Scanned with CamScanner

(খ) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় : যে প্রক্রিয়ায় ফ্যাগোসাইটসমূহ ভক্ষণের মাধ্যমে অণুজীব ধ্বংস করে তাকে **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) বলে। ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়ার দেহের বাইরের দিকে আঠার মতো লেগে থেকে অন্যান্য ম্যাক্রোফেজকে ফ্যাগোসাইটোসিসের জন্য আহ্বান জানাতে থাকে। ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক **ফ্যাগোসাইটোসিস** প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু নিধন চারটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে সম্পন্ন হয়।

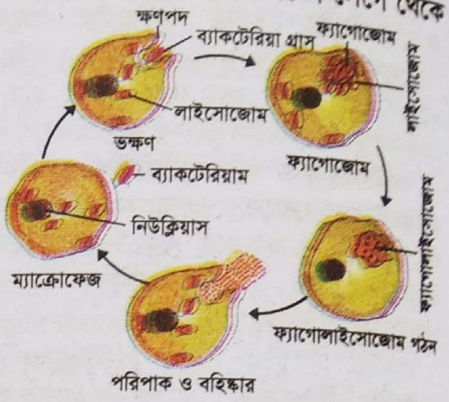

চিত্র ১০.৬খ : ম্যাক্রোফেজের ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া

১। **কেমোট্যাক্সিস** (Chemotaxis) : প্রথমে ম্যাক্রোফেজ কেমোট্যাক্সিস প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে আক্রান্ত স্থানে উপস্থিত হয়।

২। **সংলগ্নীকরণ** (Attachment) : অতঃপর ব্যাকটেরিয়া ও ম্যাক্রোফেজ নিকটবর্তী হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে। একে **সংলগ্নীকরণ** বলা হয়। ম্যাক্রোফেজের প্লাজমা আবরণীর কিছু রাসায়নিক গ্রাহক পদার্থ অণুজীবদের সাথে সংযুক্ত হয়ে ফ্যাগোসাইটিক প্রক্রিয়া শুরু করে।

৩। **গ্রাসকরণ** (Ingestion) : ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য রোগজীবাণুকে দেহাভ্যন্তরে টেনে নেয় বা গ্রাস করে। অর্থাৎ এ সময়ে ম্যাক্রোফেজ অণুজীবের চারদিকে ক্ষণপদ সৃষ্টি করে এটিকে ঘিরে ফেলে এবং পরিশেষে ইনভ্যাজিনেশন (invagination) প্রক্রিয়ায় সাইটোপ্লাজমের ভেতরে নিয়ে আসে। এ প্রক্রিয়াকে **ইনজেশন** বা **গ্রাসকরণ** বা **ভক্ষণ** বলে। ভক্ষণের পর দু'পাশ থেকে আগত ক্ষণপদের অগ্রভাগ একীভূত হয়ে কোষঝিল্লিবেষ্টিত থলিকার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াকে আবদ্ধ করে। এভাবে সৃষ্ট ঝিল্লিবেষ্টিত খাদ্যগহ্বরকে **ফ্যাগোসোম** (phagosome) বলে।

৪। **হত্যা ও পরিপাককরণ** (Killing and Digestion) : ফ্যাগোসোম ম্যাক্রোফেজের সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত **লাইসোজোম** (lysosome)-এর সাথে যুক্ত হয়ে **ফ্যাগোলাইসোজোম** (phagolysosome) তৈরি করে। ফ্যাগোলাইসোজোম তৈরি হওয়ায় ১০-৩০ মিনিটের মধ্যে লাইসোজোমাল এনজাইমের প্রভাবে ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর মৃত ব্যাকটেরিয়ার অন্তঃকোষীয় পরিপাক (যেমন– লাইসোজাইম, লাইপেজ, নিউক্লিয়েজ ও গ্লাইকোলাইজ প্রভৃতির ক্রিয়ায় পরিপাক) সম্পন্ন হয় এবং অপাচ্য অংশ বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়।

পরিপাকের পর বর্জিত বিষাক্ত পদার্থ লাইসোজোমের ধ্বংসাত্মক রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ায় নিউট্রোফিল জাতীয় ফ্যাগোসাইট মারা যায় ও পুঁজ কোষরূপে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। অপরপক্ষে, পরিপাকের পর ম্যাক্রোফেজ জাতীয় ফ্যাগোসাইট উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ ও অপাচ্য অংশ ত্যাগ করে নতুন ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হয়।

ম্যাক্রোফেজের অনাক্রম্যতায় সাড়াদান (Response of Macrophage Immunity)

ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ ছাড়াও ম্যাক্রোফেজ B ও T-লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করে অনাক্রম্যতামূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ কারণে ম্যাক্রোফেজকে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। আমাদের দেহের প্রতিটি কোষের প্লাজমা পর্দায় **MHC** (Major Histocompatibility Complex) নামক প্রোটিন থাকে। ম্যাক্রোফেজ নিজের MHC প্রোটিনের সঙ্গে দেহের অন্যান্য কোষের MHC প্রোটিনের তুলনা সাপেক্ষে আপন কোষগুলোকে শনাক্ত করতে পারে।

বহিরাগত কোনো জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে MHC প্রোটিনের তুলনা সাপেক্ষে ম্যাক্রোফেজ তাদের চিনতে পারে। ভাইরাস ও অন্যান্য বহিরাগত বিষাক্ত পদার্থও এদের দ্বারা চিহ্নিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, MHC প্রোটিন MHC জিন দ্বারা সংশ্লেষিত হয় এবং আঙুলের ছাপের মতো একজনের MHC প্রোটিনের সঙ্গে অপরের প্রোটিনের কোনো মিল পাওয়া যায় না। বহিরাগত জীবাণু, পরজীবী কোষ বা ভাইরাস প্রভৃতি ম্যাক্রোফেজের সংস্পর্শে এলে ম্যাক্রোফেজ হতে **ইন্টারলিউকিন-1** (interleukin-1) নামক প্রোটিন নিঃসৃত হয় এবং উহার প্রভাবে লিম্ফোসাইট কোষগুলো উদ্বুদ্ধ হয়ে অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া জাগায়।

এছাড়া ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে জীবাণু পাচিত হলে উহার কিছু প্রোটিন (অ্যান্টিজেন) ম্যাক্রোফেজের প্লাজমা পর্দায় MHC প্রোটিনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এ অবস্থায় এটি লিম্ফোসাইট কর্তৃক চিহ্নিত হয় ও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

নিউট্রোফিলস (Neutrophils)

নিউট্রোফিল মানবদেহের সহজাত রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক অত্যাবশ্যকীয় অংশ। মানুষের রক্তে যে শ্বেত রক্তকণিকা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তা হলো নিউট্রোফিল (৬০-৭০%) অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা ৩-৬ হাজার। এদের নিউক্লিয়াস ২-৭ খণ্ডকবিশিষ্ট এবং এর সাইটোপ্লাজম বর্ণ-নিরপেক্ষ দানাযুক্ত, যেগুলো ইওসিন রঞ্জককে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। এরা ক্ষুদ্র সক্রিয় ফ্যাগোসাইট। যার জন্য এদেরকে কখনো **মাইক্রোফাজ** (microphage) বলা হয়। এদের ব্যাস ১০μm -১৪μm। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে দৈনিক প্রায় ১০ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) নিউট্রোফিল উৎপন্ন হয়। এরা বহিরাগত বিভিন্ন অণুজীবদের প্রধানত **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় গ্রাস করে এবং ধ্বংস করে। মৃত অণুজীব এবং নিউট্রোফিল একত্রে **পুঁজ** গঠন করে। এদের জীবনকাল ২-৪ দিন।

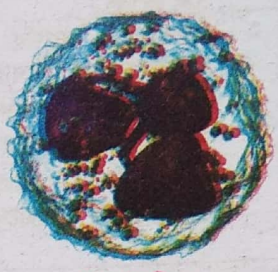

নিউট্রোফিল

নিউট্রোফিল কর্তৃক জীবাণু ধ্বংসের প্রক্রিয়া : নিউট্রোফিল প্রধানত তিন ধরনের প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবদের নিধন করে। যথা–

১। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় : ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ফ্যাগোসাইটিক নিউট্রোফিলস কলাকোষের মধ্য দিয়ে দেহের যেকোনো অংশে প্রবেশ করতে পারে এবং ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। এ কাজে T-লিম্ফোসাইট থেকে নিঃসৃত হরমোনসদৃশ রাসায়নিক পদার্থ, যেমন– ইন্টারলিউকিন, লিউকোট্রিন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব রাসায়নিক পদার্থকে **সাইটোকাইনস** (cytokines) বলে। সাইটোকাইনসের প্রভাবে রক্তনালিকা প্রসারিত ও ছিদ্রময় হয়ে ওঠে। ফলে নিউট্রোফিল এসব ছিদ্র দিয়ে রক্তজালিকায় অন্তরাবরণী আস্তরণের যেকোনো একটি সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে এ কোষগুলো মুহূর্তে তাদের **প্রোটোপ্লাজমীয় ক্ষণপদ** (pseudopodium) প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং প্রোটোপ্লাজমের অর্ধতরল পদার্থকে ক্ষণপদের দিকে ঠেলে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়। এ পদ্ধতিতে খুব কম সময়ের (প্রায় ১ মিনিট) মধ্যেই অসংখ্য রক্তকণিকা রক্তপ্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। দেহের যে অংশে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে সেখানে পৌঁছেই তারা বিপদাপন্ন অঞ্চলকে ঘিরে ফেলে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে শুরু করে। প্রতিটি কোষ প্রায় ৩-২০টি রোগজীবাণুকে গ্রাস করতে সক্ষম। এদের জীবন্ত অবস্থায়ই তারা গ্রাস করে। এরপর সেটি নিজেই নিষ্ক্রিয় হয়ে মৃত্যুবরণ করে।



চিত্র ১০.৭ : ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে শ্বেত রক্তকণিকা (নিউট্রোফিল) দ্বারা জীবাণু ভক্ষণ

২। প্রোটিওলাইটিক এনজাইম দ্বারা : ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও নিউট্রোফিল প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (যেমন– লেকটোফেরিন, লাইসোজাইম, কোলাজিনেজ, ক্যাথিলিসিডিন ইত্যাদি) নিঃসরণ করে যা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গিলে ফেলা জীবাণুর (ফ্যাগোজোম) সঙ্গে মিশে গিয়ে **ফ্যাগোলাইসোজোম** তৈরি হয়, যেখানে রোগজীবাণু মারা পড়ে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৩। ভৌত পদ্ধতিতে : এ পদ্ধতিতে নিউট্রোফিল রক্তনালির মধ্যে DNA গঠনের অনুরূপ জালকাকৃতির এক ধরনের বহিঃকোষীয় ফাঁদ (Neutrophil Extracellular Traps- NETs) তৈরি করে ব্যাকটেরিয়াকে নিধন করে। **নিউট্রোফিল, প্রোটিন** (সিরাইন প্রোটিয়েজ) ও **ক্রোমাটিনের** সমন্বয়ে গঠিত উক্ত জালে ব্যাকটেরিয়া আটকা পড়ার পর সেখানেই তাদের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ এ পদ্ধতি ভৌত উপায়ে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করে।

Scanned with CamScanner

ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলের মধ্যে পার্থক্য

ম্যাক্রোফেজ	নিউট্রোফিল
১। ম্যাক্রোফেজ বিশেষ ধরনের অদানাদার শ্বেত রক্তকণিকা।	১। নিউট্রোফিল দানাদার শ্বেত রক্তকণিকা।
২। মনোসাইট রক্তের বাইরে বৃহদাকার ধারণ করে ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়।	২। নিউট্রোফিল কোনো রক্তকণিকার পরিবর্তিত রূপ নয়।
৩। এরা B ও T-লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করে অনাক্রম্যতামূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম।	৩। এরা সক্ষম নয়।
৪। এরা সাধারণত ২টি প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে থাকে। যথা– ভৌত ও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায়।	৪। এরা সাধারণত ৩টি প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে থাকে। যথা– ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায়, প্রোটিওলাইটিক এনজাইম দ্বারা এবং ভৌত প্রক্রিয়ায়।

❑ কাজ : (i) ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে এনজাইম, এসিড, ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল বিশেষ ভূমিকা রাখে– উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। (ii) মানবদেহের সুস্থতার জন্য দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরটি অপরিহার্য– বিশ্লেষণ কর।

১০.৪ তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Third Step of defence)

যে প্রতিরক্ষা স্তর দেহে অনুপ্রবেশকারী সুনির্দিষ্ট ধরনের বহিরাগত রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব বা কণা বা ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে এবং প্রথমবার আক্রান্ত হওয়ার পর এসব নির্দিষ্ট ক্ষতিকর টার্গেটকে আজীবন মনে রেখে পরবর্তী যেকোনো আক্রমণের সময় দ্রুত ও কার্যকর সাড়া দেয় তাকে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর বলে। এই স্তরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডটি ইমিউন সাড়া নামে পরিচিত। **অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া** (immune response) তৃতীয় স্তরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত এবং এটি নির্দিষ্টভাবে (In specific way) প্রতিরক্ষা প্রদান করতে পারে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জীবাণু বা পরজীবীর বিরুদ্ধে কিংবা বিশেষ কোনো অ্যান্টিজেন প্রতিরোধের জন্য এই ব্যবস্থায় ভিন্ন রকমের প্রতিহত পন্থা দেখা যায়।

অনাক্রম্যতার (Immunity) শ্রেণিবিভাগের ছক
(তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর)

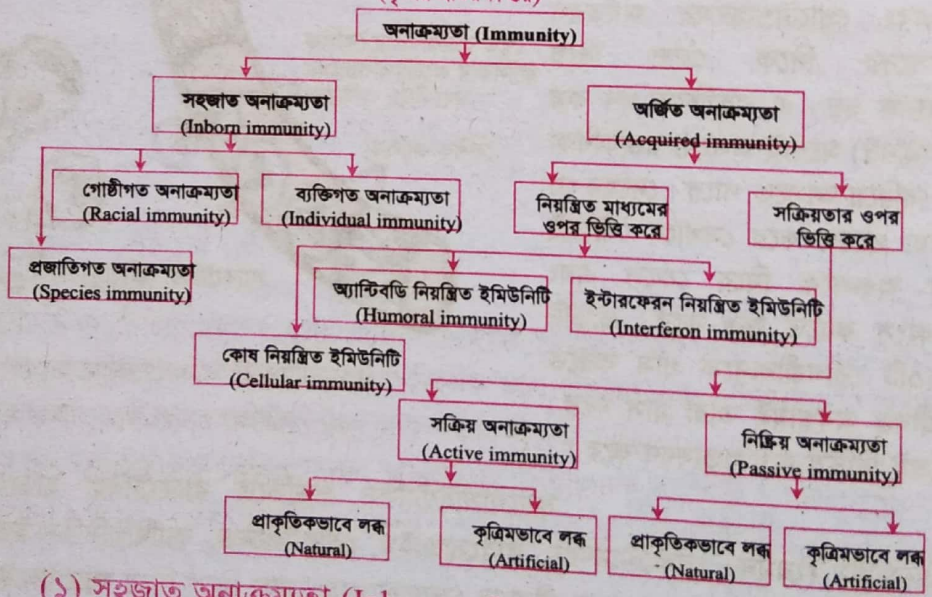

(১) সহজাত অনাক্রম্যতা (Inborn or Innate or Natural Immunity)

যে অনাক্রম্যতা জন্মের সময় থেকে বংশপরম্পরায় সঞ্চালিত হয় এবং দেহের সাধারণ ও স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম, তাকে সহজাত অনাক্রম্যতা বলে। এ রকম অনাক্রম্যতা জন্মগত। এটি বিশেষ কোনো রোগজীবাণুর (অ্যান্টিজেন) বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট নয়। এটি দেহের সাধারণ ও স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যা জন্ম থেকেই রোগ বা জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী। এজন্য একে **বস্তু নিরপেক্ষ বা নন-স্পেসিফিক অনাক্রম্যতাও** (non-specific immunity) বলে।

উদাহরণ– ত্বক, মিউকাস পর্দা, পাকস্থলীর আম্লিক pH, ক্ষরিত লালারস, চোখের পানি, শ্বসনতন্ত্রের সিলিয়া, রক্তকণিকা (ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল) প্রভৃতি দ্বারা এই অনাক্রম্যতা রোগ বা জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

Scanned with CamScanner

জিনগত গঠনের ভিত্তিতে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় বলে এটিকে **বংশগত** বা **জিনগত অনাক্রম্যতাও** (genetic immunity) বলা হয়। এই অনাক্রম্যতা বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে পোলিও, হাম, কলেরা, আমাশয়, ভাইরাসজনিত পক্ষাঘাত, মাম্পস, সিফিলিস প্রভৃতিকে রোধ করতে পারে।

এটি নিম্নে বর্ণিত ধরনের হতে পারে, যেমন–

১। প্রজাতিগত অনাক্রম্যতা (Speices immunity) : বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরজীবী বা জীবাণুর আক্রমণ বিশেষ প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ ধরনের অনাক্রম্যতাকে প্রজাতিগত অনাক্রম্যতা বলে। উদাহরণ : ম্যালেরিয়ার পরজীবী (*Plasmodium vivax*) মানুষ ও মশকীর (*Anopheles* sp.) উপর পরজীবী, কিন্তু অন্য কোনো প্রজাতির উপর বাঁচতে পারে না।

২। গোষ্ঠীগত অনাক্রম্যতা (Racial immunity) : কোনো বিশেষ পরজীবীর মাধ্যমে মানুষের কোনো কোনো গোষ্ঠী আক্রান্ত হয়ে থাকে। আবার অপর গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ পরজীবীটির আক্রমণ সহজেই প্রতিরোধ করে। উদাহরণ : কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা শ্বেতাঙ্গ মানুষের চেয়ে বেশি যক্ষ্মার শিকার হয়। এ ধরনের অনাক্রম্যতা গোষ্ঠীগত অনাক্রম্যতার অন্তর্ভুক্ত।

৩। ব্যক্তিগত অনাক্রম্যতা (Individual immunity) : কোনো কোনো মানুষ নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য পরজীবীর সংক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। এ ধরনের অনাক্রম্যতা ব্যক্তিগত অনাক্রম্যতার অন্তর্ভুক্ত।

সহজাত অনাক্রম্যতার প্রতিরোধ গড়ার পদ্ধতি

১। আগ্রাসন (Phagocytosis) : রেটিকিউলো এন্ডোথেলিয়াল তন্ত্রের আগ্রাসন কোষ, রক্তের মনোসাইট, নিউট্রোফিল, যকৃতের কুফার কোষ, সংযোগী কলার হিস্টিওসাইট, প্লিহা, লসিকাগ্রন্থি, থাইমাস গ্রন্থির জালককোষ সক্রিয় আগ্রাসন পদ্ধতিতে রোগজীবাণু ধ্বংস করে। এ ছাড়া প্রদাহ স্থানে আগ্রাসক কোষ প্রবেশ করে স্বাভাবিক অনাক্রম্যতায় অংশগ্রহণ করে।

২। এসিড ও উৎসেচক (Acid and enzyme) : পাকস্থলীতে গৃহীত জীবাণু পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও পাচক উৎসেচক দ্বারা বিনষ্ট হয়।

৩। ত্বক ও শ্লেষ্মা ঝিল্লি (Skin and mucus membrane) : ত্বক তার কঠিন বহিঃস্তরের মাধ্যমে দেহে রোগজীবাণু প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। নাসিকার মিউকাস স্তর রোগজীবাণুকে মুখবিবরে লালার মধ্যে ঠেলে দেয়। তখন রোগজীবাণু গলাধঃকৃত হয়ে পাকস্থলীতে আসে এবং এসিডের সংস্পর্শে বিনষ্ট হয়।

৪। রক্তস্থিত রাসায়নিক পদার্থ (Chemical compound of blood) : রক্তের কিছু রাসায়নিক পদার্থ জীবাণু বিনাশে অংশগ্রহণ করে, যেমন–

(১) **লাইসোজাইম** : এটি একরকম মিউকোলাইটিক পলিস্যাকারাইড জাতীয় পদার্থ, যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। (২) **বেসিক পলিপেপটাইড** : এই পদার্থটি কোনো কোনো গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করে ও তাদের নিষ্ক্রিয় ও বিনষ্ট করে। (৩) **প্রোপারডিন** : এটি একটি বৃহদাকার প্রোটিন, যা গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলো বিনষ্ট করে। (৪) **অ্যান্টিবডি** : এরা রক্তের স্বাভাবিক অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে এরা উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও প্রতিবিষকে ধ্বংস করে। (৫) **স্বাভাবিক কিলার সেল** : এরা এক ধরনের লিম্ফোসাইট, এরা বিভিন্ন বিজাতীয় কোষ, টিউমার কোষ প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে।

সহজাত অনাক্রম্যতন্ত্রের প্রধান কাজ

(১) সংক্রমণ-স্থানে অনাক্রম্য কোষগুলোকে নিযুক্ত করে **সাইটোকাইনস** (cytokines)-এর মতো রাসায়নিক দূত উৎপাদন করা। (২) কমপ্লিমেন্ট তন্ত্রকে সক্রিয় করে ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করা এবং মৃত কোষ পরিষ্কার করা। (৩) অঙ্গ, কলা, রক্ত বা লসিকাতে উপস্থিত বহিরাগত বস্তুগুলোকে বিশেষ শ্বেত রক্তকণিকা দিয়ে শনাক্ত করা ও বর্জন করা। (৪) অর্জিত অনাক্রম্যতন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলা।

Scanned with CamScanner

(২) অর্জিত অনাক্রম্যতা বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Acquired Immunity)

যেসব অনাক্রম্যতা সহজাত নয়, জন্মের পর দেহে রোগজীবাণু প্রবেশের ফলে সৃষ্টি হয় তাদের অর্জিত অনাক্রম্যতা বলে। এই রকম অনাক্রম্যতা প্রাণীর জন্মের পর অর্থাৎ প্রাণীর জীবদ্দশায় অর্জিত হয়। কোনো ক্ষতিকর অণুজীব কিংবা ক্ষতিকর পদার্থের প্রভাবে বা অন্য কোনো কারণে দেহে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ দেহের প্রয়োজনে যে অনাক্রম্যতার আবির্ভাব ঘটে সেটাই হচ্ছে অর্জিত অনাক্রম্যতা বা **স্পেসিফিক অনাক্রম্যতা**। অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আবার নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়–

১। নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে অর্জিত অনাক্রম্যতা :

(ক) কোষনির্ভর অনাক্রম্যতা বা কোষ নিয়ন্ত্রিত অনাক্রম্যতা (Cellular Immunity or Cell Mediated Immunity) : **দেহে যে অনাক্রম্যতা T-লিম্ফোসাইট বা T-কোষের সাহায্যে ঘটে তাকে কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা বলে।** এ ধরনের অর্জিত অনাক্রম্যতায় T-শ্রেণির লিম্ফোসাইট সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অনুপ্রবিষ্ট রোগজীবাণু ধ্বংস করে। লোহিত মজ্জা থেকে T-লিম্ফোসাইট সৃষ্টিকারী কোষ থাইমাস গ্রন্থিতে প্রবেশ করে T-লিম্ফোসাইটে পরিণত হয় এবং লসিকা গ্রন্থিতে আশ্রয় লাভ করে। দেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলে তাকে ম্যাক্রোফেজ গ্রাস করে। T-লিম্ফোসাইট ম্যাক্রোফেজযুক্ত অ্যান্টিজেনকে গ্রহণ করে এবং **লিম্ফোকাইনিন** এনজাইমের সাহায্যে তাদের ধ্বংস করে।

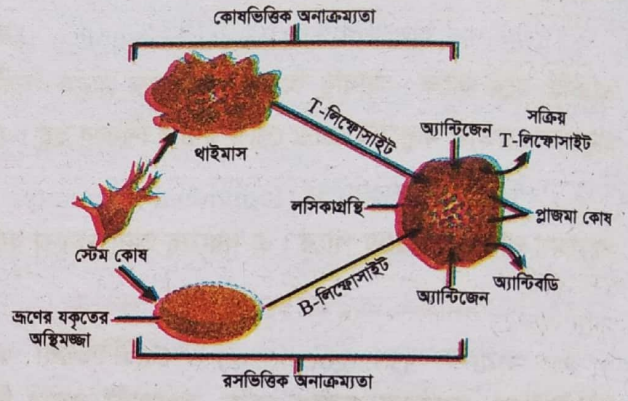

চিত্র ১০.৮: কোষনির্ভর অনাক্রম্যতা ও হিউমোরাল অনাক্রম্যতা চিত্ররূপ

(খ) রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা বা হিউমোরাল অনাক্রম্যতা বা অ্যান্টিবডি নিয়ন্ত্রিত অনাক্রম্যতা (Humoral immunity or Antibody mediated immunity) : **দেহে যে অনাক্রম্যতা B-লিম্ফোসাইটের বা B-কোষ এর সাহায্যে ঘটে তাকে রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা বলে।** B-লিম্ফোসাইট এ ধরনের অনাক্রম্যতার সঙ্গে যুক্ত। রক্তে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করার পর B-লিম্ফোসাইট তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়। অ্যান্টিজেনের প্রভাবে B-লিম্ফোসাইট কোষ ব্লাস্ট কোষে পরিণত হয় এবং ব্লাস্ট কোষ থেকে **প্লাজমা কোষ** (plasma cell) তৈরি হয়। প্লাজমা কোষ অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন সৃষ্টি করে এবং জীবাণুকে ধ্বংস করে।

T-লিম্ফোসাইট ও B-লিম্ফোসাইটের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	T-লিম্ফোসাইট	B-লিম্ফোসাইট
১। উৎপত্তি স্থান	এরা অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাইমাস গ্রন্থিতে পরিণতি লাভ করে।	এরা স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্থিমজ্জায় উৎপন্ন হয় এবং সেখানেই পরিণতি লাভ করে এবং পরে লসিকা গ্রন্থিতে অবস্থান করে।
২। প্রদত্ত ইমিউনিটি	কোষনির্ভর অনাক্রম্যতা।	রসনির্ভর অনাক্রম্যতা।
৩। কোষ উপরিতলে	অ্যান্টিবডি থাকে না।	অ্যান্টিবডি থাকে।
৪। ক্ষরিত বস্তু	সাইটোকাইনস (লিম্ফোকাইনিন)।	অ্যান্টিবডি।
৫। উপজাত কোষগোষ্ঠী	সাইটোটক্সিক T-লিম্ফোসাইট, সাহায্যকারী T-লিম্ফোসাইট, সাপ্রেসর T-লিম্ফোসাইট, স্মৃতি T-কোষ প্রভৃতি।	প্লাজমা কোষ এবং মেমোরি কোষ (স্মৃতি B-কোষ)।
৬। কাজ	সরাসরি জীবাণুকে ধ্বংস করে।	অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে ধ্বংস করে।

Scanned with CamScanner

কোষভিত্তিক ও রসভিত্তিক অনাক্রম্যতার মধ্যে পার্থক্য

কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা	রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা
১। এ প্রকার অনাক্রম্যতায় T-লিম্ফোসাইট ও ম্যাক্রোফেজ প্রধান ভূমিকা পালন করে।	১। এ প্রকার অনাক্রম্যতায় B-লিম্ফোসাইট প্রধান ভূমিকা পালন করে।
২। মুখ্যত লিম্ফোকাইনিন, ইন্টারফেরন ও অ্যান্টিবডি সংশ্লেষের মাধ্যমে অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে এইরকম অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে।	২। মুখ্যত অ্যান্টিবডি সংশ্লেষ ও ক্ষরণের মাধ্যমে অ্যান্টিজেনের (জীবাণু) বিরুদ্ধে এইরকম অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে।
৩। বিশেষ কয়েক ধরনের অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে এ রকম অনাক্রম্যতা পরিলক্ষিত হয়।	৩। সাধারণত সব ধরনের অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অনাক্রম্যতা দেখা যায়।
৪। এ ধরনের অনাক্রম্যতা মুখ্যত কোষের মাধ্যমে এবং কিছুটা দেহতরলের মাধ্যমে ঘটে।	৪। এ ধরনের অনাক্রম্যতা দেহরস, রক্তরস, লসিকা ও কলারসের মাধ্যমে ঘটে।
৫। ক্যান্সারে এ অনাক্রম্যতা সুরক্ষা প্রদান করে।	৫। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এ অনাক্রম্যতা কার্যকরী হয় না অর্থাৎ সুরক্ষা প্রদান করে না।
৬। এ অনাক্রম্যতা ট্রান্সপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সাড়া দেয় অর্থাৎ কাজ করে।	৬। এ অনাক্রম্যতা ট্রান্সপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সাড়া দেয় না।

(গ) ইন্টারফেরন নিয়ন্ত্রিত অনাক্রম্যতা (Interferon mediated immunity) : **যে অনাক্রম্যতায় ভাইরাস আক্রান্ত কোষ থেকে ইন্টারফেরন নিঃসৃত হয়ে ভাইরাসের বিভাজনকে রোধ করে তাকে ইন্টারফেরন অনাক্রম্যতা বলে।** এ ধরনের অনাক্রম্যতা প্রধানত ভাইরাস প্রতিরোধ করে, তবে ক্যান্সার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিতেও বাধা দেয়। ইন্টারফেরন হলো এক ধরনের উচ্চ আণবিক ওজনসম্পন্ন (প্রায় ২০-৩০ হাজার ডাল্টন) প্রোটিন, যা T-লিম্ফোসাইট, শ্বেত রক্তকণিকা এবং ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থেকে উৎপন্ন হয়।

দেহে ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ঘটলে ভাইরাস আক্রান্ত দেহকোষ থেকে দ্রুত **ইন্টারফেরন** নিঃসৃত হয়ে ভাইরাসের বিভাজনকে রোধ করে। বর্তমানে *E. coli* ও ইস্ট থেকে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে ইন্টারফেরন উৎপাদন হচ্ছে, যা হেপাটাইটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

২। সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে অনাক্রম্যতা :

(ক) সক্রিয় বা প্রত্যক্ষ অনাক্রম্যতা (Active immunity) : মেরুদণ্ডী প্রাণিদেহে (যেমন– মানুষ) এমন কিছু ব্যবস্থা থাকে, যা দেহে জীবাণু অনুপ্রবেশের পরে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে রোগের জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় অনাক্রম্যতার অন্তর্ভুক্ত। এই অনাক্রম্যতার পরিচায়ক হচ্ছে T-লিম্ফোসাইট দ্বারা জীবাণু দমন কিংবা B-লিম্ফোসাইট কর্তৃক অ্যান্টিবডি ক্ষরণের মাধ্যমে জীবাণু দমন।



চিত্র ১০.৯ : বিভিন্ন প্রকার লিম্ফোসাইটের উৎপত্তিস্থল ও পরিণতি

সক্রিয় অনাক্রম্যতার প্রধানত বৈশিষ্ট্য

১। যে অনাক্রম্যতা দেহে সরাসরি সক্রিয়ভাবে উৎপন্ন হয় তাকে সক্রিয় অনাক্রম্যতা বলে।

২। সক্রিয় অনাক্রম্যতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

৩। এ ধরনের অনাক্রম্যতায় নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় পরে উপশম ঘটে।

৪। এ ধরনের অনাক্রম্যতায় কোনো পার্শ্বীয় প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

প্রকারভেদ (Types) : সক্রিয় অনাক্রম্যতাকে আবার দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা–

(১) প্রাকৃতিকভাবে লব্ধ সক্রিয় অনাক্রম্যতা (Naturally acquired active immunity) : আমাদের দেহে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশ করলে তার অ্যান্টিজেন নামক পদার্থের প্রভাবে রক্তের T ও B লিম্ফোসাইট সক্রিয় হয়ে ওঠে। সক্রিয় লিম্ফোসাইটগুলোর প্রভাবে ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিহত হয়। তা ছাড়াও সক্রিয় লিম্ফোসাইটগুলো সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে **স্মৃতিকোষ** (memory cell) সৃষ্টি করে, যেগুলো রক্তের মধ্যে দীর্ঘদিন মজুদ থাকে ও ভবিষ্যতে আগের মতো জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে তাদের সহজে ও দ্রুত দমন করে ফেলে।

Scanned with CamScanner

(২) কৃত্রিম উপায়ে লব্ধ সক্রিয় অনাক্রম্যতা (Artificially acquired active immunity) : এ রকম অনাক্রম্যতা প্রতিষেধক প্রয়োগ দ্বারা (vaccination) সৃষ্টি করা যায়। ভ্যাক্সিন (vaccine) বা টিকা হলো নিষ্ক্রিয় জীবাণু বা অ্যান্টিজেন (attenuated antigens)। দেহে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করলে, নিষ্ক্রিয় জীবাণু বা অ্যান্টিজেন কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে দেহের T ও B-লিম্ফোসাইট সক্রিয় হয়ে ওঠে ও বিশেষ জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক সব ব্যবস্থাই জেগে ওঠে।

(খ) নিষ্ক্রিয় বা পরোক্ষ অনাক্রম্যতা (Passive immunity) : এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রাণী নিজ দেহে সক্রিয়ভাবে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি না করে জীবাণু দমনের জন্য অন্য কোনো প্রাণী থেকে অ্যান্টিবডি লাভ করে।

নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১) যে অনাক্রম্যতা দেহের বাইরে থেকে কোনো উপাদান দেহে প্রবেশ করিয়ে সৃষ্টি করা হয়, তাকে নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা বলে। (২) নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার প্রভাব স্বল্পস্থায়ী। (৩) এ ধরনের অনাক্রম্যতায় রোগ সংক্রামণ থেকে দ্রুত উপশম ঘটে। (৪) এ ধরনের অনাক্রম্যতায় পার্শ্বীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

প্রকারভেদ (Types) : নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতাকেও দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা–

(১) প্রাকৃতিগতভাবে লব্ধ পরোক্ষ/নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা (Naturally acquired passive immunity) : মাতৃগর্ভে শিশু **অমরার** (placenta) মাধ্যমে মাতৃদেহ থেকে অ্যান্টিবডি (IgG) অর্জন করতে পারে ও এর সাহায্যে অপরিণত শিশু জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম হয়। এটা ছাড়াও শিশু মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে (বিশেষত **কলোস্ট্রামের** মাধ্যমে) IgA জাতীয় অ্যান্টিবডি প্রাপ্ত হয়। এটা শিশুর দেহে জীবাণু দমনে সহায়তা করে।

(২) কৃত্রিম উপায়ে লব্ধ পরোক্ষ অনাক্রম্যতা (Artificially acquired passive immunity) : এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে অন্য প্রাণীর দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়ে অনেক ক্ষেত্রে রোগজীবাণু প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক (vaccine) তৈরি করা হয়। এই প্রতিষেধক দ্বারা মানবদেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

এ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জলাতঙ্ক প্রতিরোধের জন্য **অ্যান্টির‍্যাবিজ** (antirabies) প্রতিষেধকের ব্যবহার। অথবা, সাপের বিষ (অ্যান্টিজেন) প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় **অ্যান্টিভেনাম** (অ্যান্টিবডি) প্রয়োগ করে রোগীর দেহে কৃত্রিমভাবে লব্ধ পরোক্ষ বা নিষ্ক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে অধিক শক্তিশালী, নিরাপদ ও উন্নত প্রতিষেধক (vaccine) তৈরির চেষ্টা চলছে। যার একটি সাফল্য হচ্ছে– DNA কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে হেপাটাইটিস ভাইরাসের (hepatitis virus) সফল ভ্যাকসিন প্রস্তুত।

অর্জিত অনাক্রম্যতন্ত্রের প্রধান কাজ

(১) বিশেষ কোষের মাধ্যমে জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করা। (২) একদা সংক্রমিত নির্দিষ্ট জীবাণুকে মনে রাখা ও পরবর্তীকালে সেই জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করা। (৩) জীবাণুর ভবিষ্যৎ আক্রমণের জন্য দেহকে প্রস্তুত রাখা।

সহজাত অনাক্রম্যতা ও অর্জিত অনাক্রম্যতার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সহজাত অনাক্রম্যতা	অর্জিত অনাক্রম্যতা
১। অনাক্রম্যতা সৃষ্টির সময়	জন্ম থেকেই এ অনাক্রম্যতা কাজ করে।	এ অনাক্রম্যতা জন্মের পরে অর্জিত হয়।
২। বংশপরম্পরা	এ অনাক্রম্যতা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ বংশগত।	এ অনাক্রম্যতা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না অর্থাৎ বংশগত নয়।
৩। গড়ে ওঠা	রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগেই গড়ে ওঠে।	রোগভোগ অথবা ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে গড়ে ওঠে।
৪। অনাক্রম্যতা সৃষ্টি	বহিরাগত বস্তু বা জীবাণু বা অ্যান্টিজেন প্রবেশের মাধ্যমে এ অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয় না।	বিজাতীয় বস্তু বা জীবাণু বা অ্যান্টিজেন প্রবেশের ফলে এ অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয়।
৫। অনাক্রম্যতার ধরন	এটি দেহের সাধারণ প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা নির্দিষ্ট কোনো রোগ সৃষ্টিকারী বস্তুর বিরুদ্ধে কাজ করে না।	এটি নির্দিষ্ট রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যেমন– পোলিও, হাম, গুটিবসন্ত ইত্যাদি।
৬। অনাক্রম্যতাজনিত স্মৃতি	থাকে না।	থাকে।
৭। সাড়াদানের সময়কাল	বহিরাগত বস্তু বা জীবাণু প্রবেশের কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।	বহিরাগত বস্তু বা জীবাণু বা অ্যান্টিবডি পাওয়ার কয়েক দিন (৫-১৪ দিন) পর।
৮। অনাক্রম্যতার স্থায়ীকাল	সারাজীবন।	কয়েকদিন থেকে সারাজীবন।
৯। কোষীয় উপাদান	ফ্যাগোসাইটস (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল), কিলার কোষ, ডেনড্রাইটিক কোষ প্রভৃতি।	T-লিম্ফোসাইট এবং B-লিম্ফোসাইট।
১০। যাদের দেখা যায়	সব জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায়।	শুধু চোয়ালযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

সক্রিয় অনাক্রম্যতা ও নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সক্রিয় অনাক্রম্যতা	নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা
১। উৎস	এটি ব্যক্তির দেহে সরাসরি সক্রিয়ভাবে উৎপন্ন হয়।	এই প্রকার অনাক্রম্যতা দেহের বাইরে থেকে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উৎপন্ন হয়।
২। প্রভাব	এই ধরনের অনাক্রম্যতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।	এই ধরনের অনাক্রম্যতার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।
৩। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া	নেই।	প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।
৪। উপশমের কাল	দীর্ঘ সময় পর (অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে)।	দ্রুত।

❑ কাজ : (i) সহজাত প্রতিরক্ষা এবং অর্জিত প্রতিরক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। (ii) সহজাত প্রতিরক্ষা এবং অর্জিত প্রতিরক্ষার ভিন্নতা তুলে ধরো।

১০.৫ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা
(Role of Antibody in Defence Mechanism or Immunity)

অ্যান্টিবডি (Antibody)

অ্যান্টিবডি (Antibody; GK. *Anti = against, body = body*) অ্যান্টিজেনের বিপরীত বস্তু অর্থাৎ *self* বা নিজস্ব বস্তু। অ্যান্টিবডি প্রধানত অ্যান্টিজেনের সাড়ায় দেহের B-লিম্ফোসাইট থেকে উৎপাদিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। এরা রক্তের প্লাজমা ও কলারসে বর্তমান থাকে। এরা অ্যান্টিজেনের সাথে যুক্ত (combine) হতে পারে এবং **ক্লোনাল নির্বাচন** (clonal selection) দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং দেহের প্রধান সৈনিক বা রক্ষণাবেক্ষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। অ্যান্টিবডিগুলো অনুপ্রবেশকারী বা বহিরাগত অ্যান্টিজেনকে ভক্ষণ করে, কখনো বিনষ্ট করে, কখনো মেরে ফেলে, কখনো বাইরে নিক্ষেপ করে। অ্যান্টিজেন হচ্ছে non-self এবং অ্যান্টিবডি হচ্ছে self বস্তু।

অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে যে প্রোটিনধর্মী বস্তু সংশ্লেষিত হয়ে উক্ত অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাণিদেহে অনাক্রম্যতা গড়ে তোলে তাকে **অ্যান্টিবডি** (Antibody) বা **ইমিউনোগ্লোবিউলিন** (Immunoglobulin) বলে।

দেহের সব অ্যান্টিবডিই **গামা-গ্লোবিউলিন** (γ-globulin) নামে পরিচিত। আর যেহেতু অ্যান্টিবডিসমূহ দেহের সুরক্ষার (immunity) কাজ করে তাই এদেরকে **ইমিউনোগ্লোবিউলিন** (Immunoglobulin, সংক্ষেপে– Ig) বলা হয়। এদের আণবিক ওজন ১,৫০,০০০-৯,০০,০০০ ডাল্টনের মধ্যে সীমিত। প্লাজমা প্রোটিনের প্রায় ২০% ইমিউনোগ্লোবিউলিন। মানুষের দেহে প্রায় ১০ কোটি (১০০ মিলিয়ন) ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে।

অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিউলিনের গঠন (Structure of Antibody or Immunoglobulin)

সকল প্রকার অ্যান্টিবডির একটি সাধারণ গঠন লক্ষ করা যায়। যেমন–

১। হালকা চেইন ও ভারী চেইন (Light and Heavy chains) : প্রতিটি অ্যান্টিবডি প্রধানত চারটি পলিপেপটাইড চেইন দ্বারা গঠিত। এদের মধ্যে দুটো দৈর্ঘ্যে ছোট (যাদের প্রতিটিতে প্রায় ২০০-২২০টি অ্যামিনো এসিড থাকে) ও অপর দুটি আকারে বড় (যাদের প্রতিটিতে প্রায় ৪০০-৪৫০টি অ্যামিনো এসিড থাকে)। ছোট পলিপেপটাইড চেইন দুটিকে **হালকা চেইন** ও বড় পলিপেপটাইড চেইন দুটিকে **ভারী চেইন** নামে অভিহিত করা হয়। হালকা ও ভারী চেইনের আণবিক ওজন যথাক্রমে 23 kD ও 50-70 kD (kiloDaltons)।

কোনো কোনো অ্যান্টিবডির চারটির বেশি পলিপেপটাইড শৃঙ্খলও থাকতে পারে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারী চেইনের প্রান্তে একটি হালকা চেইন সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং এভাবে প্রান্তদেশে অন্তত দুটি হালকা ও ভারী উভয় ধরনের জোড়া তৈরি হয়।

২। ডাইসালফাইড বন্ধন (Disulfide bonds) : প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে অন্তত ৩টি আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন্ধন রয়েছে। পলিপেপটাইড চেইন বা শৃঙ্খলগুলো পরস্পরের সাথে **ডাইসালফাইড বন্ধন** (s – s) দ্বারা যুক্ত হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে Y-আকৃতির অ্যান্টিবডি গঠন সৃষ্টি করে। কখনো কখনো এই আকৃতি T-এর মতোও দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

৩। **স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল অংশ** (Constant and Variable regions) : প্রতিটি ভারী চেইন ও হালকা চেইনের দুটি অংশ থাকে– একটি **অপরিবর্তনশীল অংশ** বা **স্থায়ী অংশ** এবং অপরটি **পরিবর্তনশীল অংশ**। পরিবর্তনশীল অংশ প্রতিটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডির ক্ষেত্রে আলাদা হয় এবং এ অংশেই অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অ্যান্টিবডির সংযুক্তি ঘটে। অ্যান্টিজেন (জীবাণু) ধরার এ অংশটির নাম **প্যারাটপ** (paratope)। এটি **তালা-চাবি** (lock and key) পদ্ধতিতে কাজ করে। এক্ষেত্রে চাবি হচ্ছে প্যারাটপ, আর তালা অ্যান্টিজেন (জীবাণু)।

যেহেতু অধিকাংশ অ্যান্টিবডির অ্যান্টিজেনকে আবদ্ধ করার জন্য দুটি পরিবর্তনশীল অংশ আছে তাই তাদের **বাইভ্যালেন্ট** (bivalent) বলে।

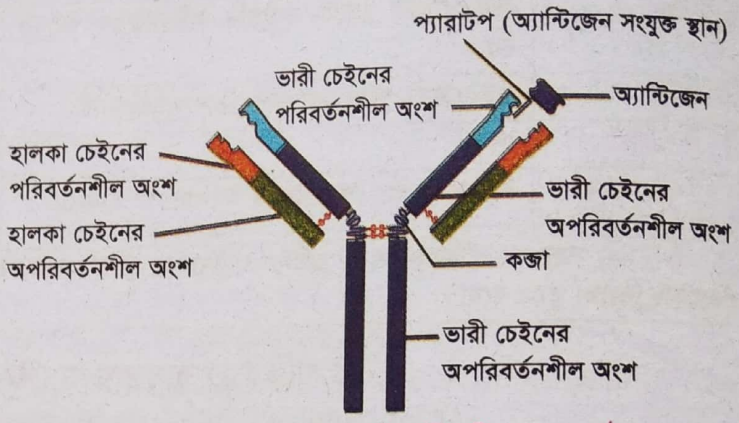

চিত্র ১০.১০ : একটি আদর্শ অ্যান্টিবডির (IgG) গঠন

৪। **কব্জা অঞ্চল** (Hinge region) : Y-আকৃতি বিশিষ্ট অ্যান্টিবডির প্রতিটি ভারী চেইনের একটি নমনীয় কব্জা অঞ্চল রয়েছে। এ অঞ্চল থেকেই অ্যান্টিবডির প্রতিটি বাহু দু'ভাগ হয়। বাহুদুটির দু'প্রান্তে অবস্থিত একটি করে মোট দুটি প্যারাটপে দুটি অ্যান্টিজেন আটক করা যায়। কব্জা অঞ্চলের নমনীয়তার জন্য অ্যান্টিবডি প্রয়োজন মতো আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে।

Y-আকৃতি বিশিষ্ট অ্যান্টিবডি অণুর দীর্ঘ দণ্ডবৎ অংশটি কেবল ভারী চেইনের অপরিবর্তনশীল অংশ দ্বারা গঠিত ও এই অংশটি কেলাসিত হতে পারে। অপরিবর্তনশীল অংশ অ্যান্টিবডির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের নির্ণায়ক এবং কোষ ও কলা তথা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে সংযুক্তির সহায়ক। একটি আদর্শ অ্যান্টিবডি (IgG) **মনোমার** প্রকৃতির।

বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবডি (Different Type of Antibody)

(ক) ভারী চেইনের স্থায়ী অঞ্চলের অ্যামিনো এসিডের সজ্জারীতির পার্থক্যের ভিত্তিতে- মানবদেহের রক্তে পাঁচ রকমের ইমিউনোগ্লোবিউলিন অর্থাৎ অ্যান্টিবডি দেখা যায়, যথা– IgG, IgA, IgM, IgD ও IgE। এগুলো মানবদেহের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাঁচ প্রকার অ্যান্টিবডির মধ্যে IgG রক্তরসে সর্বাধিক মাত্রায় থাকে এবং IgD ও IgE সবচেয়ে কম পরিমাণে থাকে।

(a) IgG (Immunoglobulin-G) : এ ধরনের অ্যান্টিবডি রক্তেই বেশি থাকে, তবে লসিকা ও অন্ত্রেও পাওয়া যায়। মানুষের রক্তের সব ধরনের অ্যান্টিবডির প্রায় ৭৫-৮০% IgG। এরা **মনোমার** হিসেবে থাকে। এর চারটি প্রকারভেদ আছে, যথা– IgG_1, IgG_2, IgG_3 ও IgG_4। এরা সহজেই **অমরাকে** (placenta) অতিক্রম করতে পারে, ফলে মায়ের রক্ত থেকে ভ্রূণের রক্তে স্থানান্তরিত হয়। এই কারণে একে **ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডিও** (maternal antibody) বলে।

কাজ : ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে **অপসোনাইজেশন** (opsonisation) মাধ্যমে ধ্বংস করে। এগুলো বিষাক্ত পদার্থ (toxin) **প্রশমনেও** কাজ করে এবং **অনুপূরকতন্ত্রকে** (complement system) উদ্দীপিত করে দেহকে সুরক্ষিত রাখে।

(b) IgM (Immunoglobulin-M) : এরা সবচেয়ে বড় আকারের অ্যান্টিবডি এবং ভ্রূণের দেহে প্রথম সংশ্লেষিত হয়। রক্তে এরা **পেন্টামার** হিসেবে থাকে। এছাড়া এরা লসিকা এবং B-লিম্ফোসাইটের উপরিতলে অবস্থান করে। রক্তরসে এদের পরিমাণ প্রায় ৫-১০%। এর ২টি প্রকারভেদ আছে, যেমন– IgM_1 ও IgM_2।

কাজ : এ ধরনের **অ্যান্টিবডি অ্যাগ্লুটিনেশন, ব্যাকটেরিওলাইসিস** (bacteriolysis), **কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন** (complement fixation) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করে। এমনকি এরা ফ্যাগোসাইটোসিস ত্বরান্বিত করে এবং সব ধরনের অ্যান্টিবডির তুলনায় পরজীবী দমনে এরা অধিক কার্যকরী। অণুজীবের পলিস্যাকারাইড জাতীয় অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে বিশেষ কার্যকরী। রক্তের ABO-গ্রুপের স্বাভাবিক অ্যান্টি-A ও অ্যান্টি-B এবং জীবাণু প্রতিরোধে সংশ্লেষিত অ্যান্টিবডি হলো IgM।

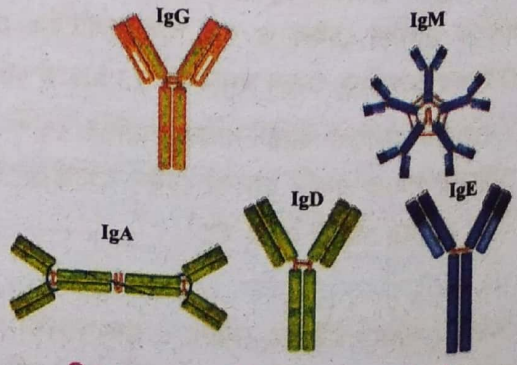

চিত্র ১০.১১ : বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবডি

Scanned with CamScanner

(c) **IgA** (Immunoglobulin-A): এ ধরনের অ্যান্টিবডি রক্তে বেশি থাকে। এ ছাড়া ঘাম, অশ্রু, লালা ইত্যাদিতেও এদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এরা **মনোমার** ও **ডাইমার** হিসেবে থাকে। অ্যান্টিবডির প্রায় ১০-১৫% এই প্রকার। মিউকাস স্তরে এর ক্ষরণ ঘটে। সব ক্ষরিত দেহতরলে এটি থাকে। তাই একে **ক্ষরণকারী অ্যান্টিবডি** (secretory antibody) বলে। এর ২টি প্রকারভেদ আছে, যেমন– IgA_1 ও IgA_2। মায়েদের বুকের দুধে IgA পাওয়া যায়। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় এটি শিশুর দেহে স্থানান্তরিত হয়। অন্ত্রে ও মলে যে IgA পাওয়া যায় তাকে **ক্যাপ্রোঅ্যান্টিবডি** (coproantibody) বলে।

কাজ : মিউকাস স্তরে ক্ষরিত IgA দেহের অনাবৃত তলকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং জীবাণুকে পোষক দেহে প্রবেশে বাধা দেয়।

(d) **IgD** (Immunoglobulin-D) : রক্তে এ জাতীয় অ্যান্টিবডি খুব কম পরিমাণে (০.২%) থাকে। এরা **মনোমার** হিসেবে B-লিম্ফোসাইটের উপরিতলে সংলগ্ন থাকে। রক্ত, লসিকা ও লিম্ফোসাইট B কোষে এ I_gD পাওয়া যায়।

কাজ : এরা B-লিম্ফোসাইটের অ্যান্টিজেন গ্রাহক হিসেবে কাজ করে এবং B-লিম্ফোসাইটকে অ্যান্টিবডি প্রস্তুতিতে উদ্বুদ্ধ করে। এরা সম্ভবত B-লিম্ফোসাইটের পরিণতির শেষ দশাকেও উদ্দীপিত করে।

(e) **IgE** (Immunoglobulin-E) : রক্তরসে বেশ অল্প পরিমাণে (০.১%) থাকে। এরা **মনোমার** অবস্থায় মাস্ট কোষ ও বেসোফিল শ্বেতকণিকার পর্দার ওপর সংলগ্ন থাকে।

কাজ : মাস্ট কোষ বা বেসোফিল হতে **হিস্টামিন** ক্ষরণ ত্বরান্বিত করে। কৃমিজাতীয় পরজীবী নিষ্কাশনে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জির হাত থেকে দেহকে রক্ষা করে।

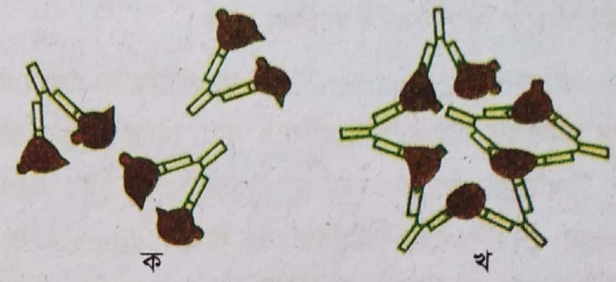

চিত্র ১০.১২ : ক. মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি; খ. পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি

(খ) উৎপত্তিগতভাবে- অ্যান্টিবডি দু'প্রকারের হয়। যথা–

(a) **মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি** (Monoclonal antibodies) : যেসব অ্যান্টিবডি এক প্রকার প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন হয়, তাদের **মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি** বলে।

(b) **পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি** (Polyclonal antibodies) : যেসব অ্যান্টিবডি বহু প্রকার প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন হয়, তাদের **পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি** বলে।

অ্যান্টিবডির কার্যপদ্ধতি (Function of Antibody or Immunoglobulin)

অ্যান্টিবডির প্রতিরক্ষা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। একটি অ্যান্টিবডি একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন বা নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেই শুধুমাত্র কাজ করে থাকে।

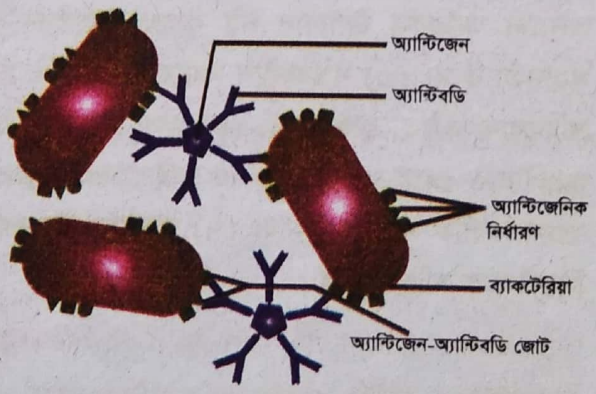

চিত্র ১০.১৩ : অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া (অ্যাগ্লুটিনেশন)

একটি অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) অনেক সময় একই সঙ্গে দুটি বা তারও বেশি অ্যান্টিজেন (অ্যাগ্লুটিনোজেন) বা অন্য কোনো বহিরাগত জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে আবদ্ধ হতে পারে। তবে অ্যান্টিবডি যখন কোনো অ্যান্টিজেনকে আবদ্ধ করে, সেই অ্যান্টিজেনকে সরাসরি ধ্বংস করতে পারে না। অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করার জন্য নিম্নলিখিত কতগুলো কার্যকরী পদ্ধতিকে (effector mechanisms) উদ্দীপিত করে, যাতে নির্দিষ্টভাবে অ্যান্টিজেনগুলো নিষ্ক্রিয় হতে পারে।

অ্যান্টিবডি নিম্নলিখিত যেকোনো একটি পদ্ধতির সাহায্যে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু বা তার প্রতিবিষকে (অ্যান্টিজেন) নিষ্ক্রিয় করতে পারে।

১। **দলবদ্ধকরণ বা স্তূপীভবন** (Agglutination) : এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি একাধিক অ্যান্টিজেনসম্পন্ন জীবাণুর অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের দলবদ্ধ করে। এই প্রক্রিয়াটি **অ্যাগ্লুটিনেশন**। যে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন যুক্ত কোষগুলোকে দানা বাঁধতে সাহায্য করে তাদের **অ্যাগ্লুটিনিন** (agglutinin) বলে। মূলত IgM ও IgG অ্যান্টিবডি এ কাজের সাথে যুক্ত।

Scanned with CamScanner

২। **অধঃক্ষেপণ** (Precipitation) : এক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত হয়। যে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনকে অধঃক্ষিপ্ত করে, তাকে **প্রেসিপিটিন** (precipitine) বলে। মূলত IgA ও IgM অ্যান্টিবডি এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩। **অপসোনাইজেশন** (Opsonization) : অ্যাগ্লুটিনেশনের মাধ্যমে অ্যান্টিবডি অণুজীবগুলোর ফ্যাগোসাইটোসিসকে আরও ত্বরান্বিত করে। ফ্যাগোসাইটোসিসের জন্য অণুজীবগুলোকে অ্যান্টিবডি যেভাবে সমর্থ বা যোগ্য করে তোলে তাকে **অপসোনাইজেশন** বলে। এসব অ্যান্টিবডিকে **অপসোনিন** (opsonin) বলে। মূলত IgG ও IgM অ্যান্টিবডি এ কাজের সাথে যুক্ত থাকে।

৪। **কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের সক্রিয়করণ** (Activation of complement system) : প্রায় ২০ ধরনের প্লাজমা প্রোটিনে গঠিত এমন একটি আন্তঃসম্পর্কিত গ্রুপ যা নিষ্ক্রিয়ভাবে রক্তে সংবহিত হয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সাহায্য করে তাকে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বা কমপ্লিমেন্ট বলে। অ্যান্টিবডি IgG ও IgM কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের বেশ প্রভাবশালী উদ্বুদ্ধক। কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম উদ্বুদ্ধ হলে উহার প্রোটিন উপাদানসমূহ সংক্রামক জীবাণুকে ধ্বংস অথবা নিষ্ক্রিয় করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৫। **প্রশমন** (Neutralization) : যে প্রক্রিয়ায় একটি অ্যান্টিবডি কোনো অ্যান্টিজেনের ক্ষতিকর অংশগুলোকে ঢেকে রেখে ক্ষতিকর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে বাধা দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেয় কিংবা অ্যান্টিজেন ক্ষরিত টক্সিনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে তার বিষক্রিয়া থেকে অন্যান্য দেহকোষকে রক্ষা করে তাকে প্রশমন বলে। এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনধর্মী জীবাণুর দেহনিঃসৃত অধিবিষ বা **টক্সিন** (toxin)-কে আবৃত ও প্রশমিত করে এবং নিষ্ক্রিয় করে। এ প্রকার অ্যান্টিবডিকে **প্রতিবিষ** বা **অ্যান্টিটক্সিন** (antitoxin) বলে। IgG ব্যাকটেরিয়াজাত টক্সিন প্রশমনে বিশেষ উপযোগী।

৬। **বিশ্লিষ্টকরণ** (Lysis) : এক্ষেত্রে কিছু শক্তিশালী অ্যান্টিবডি সরাসরি বহিরাগত জীবাণুর ঝিল্লিকে আক্রমণ করে এবং তাকে ছিন্ন করে ফেলে। এ প্রকার অ্যান্টিবডিকে বিশ্লিষ্টকরণ বলে। অনেক সময় IgM অ্যান্টিবডি এ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

সংক্ষেপে অ্যান্টিবডির প্রধান কাজ (Major Functions of Antibodies) : (১) দেহে অনুপ্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান নষ্ট করতে সহায়তা করে; (২) ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করতে সহায়তা করে; (৩) গর্ভকালীন সময়ে অ্যান্টিবডি মায়ের শরীর থেকে বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করে বাচ্চার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; (৪) কিছু কিছু অ্যান্টিবডি সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; (৫) কিছু অ্যান্টিবডি দেহে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের অনুপ্রবেশে বাধা দান করে; (৬) অনেক অ্যান্টিবডি আছে যেগুলো কৃমি ধ্বংস করতে সহায়তা করে; (৭) **অপসোনাইজেশনের** মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং (৮) এরা **কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমকে** সক্রিয় করে।

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির আন্তঃক্রিয়া (Antigen-Antibody Interaction)

অ্যান্টিবডি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অ্যান্টিজেনদের ধ্বংস করে এদের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে দেহকে রক্ষা করে। যেমন– প্রশমন, দলবদ্ধকরণ, অধঃক্ষেপণ, বিশ্লিষ্টকরণ, অপসোনাইজেশন ইত্যাদি।

বহিরাগত কোনো জীবাণু বা অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশ করলে দেহে প্রোটিনধর্মী বস্তু অ্যান্টিবডি গঠিত হয়। এরপর অ্যান্টিবডির নির্দিষ্ট অংশে (অ্যান্টিজেন আবদ্ধকারী অংশ) অ্যান্টিজেন যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি যৌগ (antigen-antibody complex) গঠিত হয়। এটিই **অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়া** (Antigen- antibody interaction) অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে দেহের মধ্যে অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেনের রাসায়নিক সংযুক্তির মাধ্যমে অদ্রবণীয় জটিল যৌগ গঠিত হয় তাকে **অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়া** বলে।

Scanned with CamScanner

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়ার ধাপ (Steps of Antigen-Antibody interaction)

১. **অ্যান্টিবডি গঠন :** নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে দেহে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি গঠিত হয়।

২. **অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগ গঠন :** অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি কাছাকাছি এলে এদের মধ্যে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগ (Ag-Ab complex) গঠিত হয়। অ্যান্টিবডির অ্যান্টিজেন আবদ্ধকারী অংশে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন সংযুক্ত হয়।

৩. **অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিজেন নিঃসৃত টক্সিন পদার্থের নিষ্ক্রিয়করণ :** দলবদ্ধকরণ (agglutination), অধঃক্ষেপণ (precipitation), অপসোনাইজেশন (opsonization), কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের সক্রিয়করণ (activation of complement system), প্রশমন (neutralization), বিশ্লিষ্টকরণ (lysis) প্রভৃতি কয়েকটি পদ্ধতিতে অ্যান্টিবডির দ্বারা পোষকদেহে অ্যান্টিজেন তথা অ্যান্টিজেন নিঃসৃত টক্সিক জাতীয় বস্তুকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

জীবাণু বা অ্যান্টিজেন ধ্বংসের প্রক্রিয়া

বিশেষ দুটি পদ্ধতিতে জীবাণু তথা অ্যান্টিজেন ধ্বংস হয়, সেগুলো হলো – **১. ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) ও **২. ডায়াপেডেসিস** (diapedesis)।

১. ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) : এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্বেতকণিকা (মনোসাইট, নিউট্রোফিল), ম্যাক্রোফাজ ইত্যাদি জীবাণুদের আত্মসাৎ করে। যখন কোনো জীবাণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ফ্যাগোসাইটিক কোষগুলো ক্ষণপদ বিস্তার করে জীবাণুকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে **ফ্যাগোজোম** (phagosome) গঠন করে। ফ্যাগোজোম নিঃসৃত এনজাইমের সাহায্যে জীবাণু পাচিত হয়ে যায়।

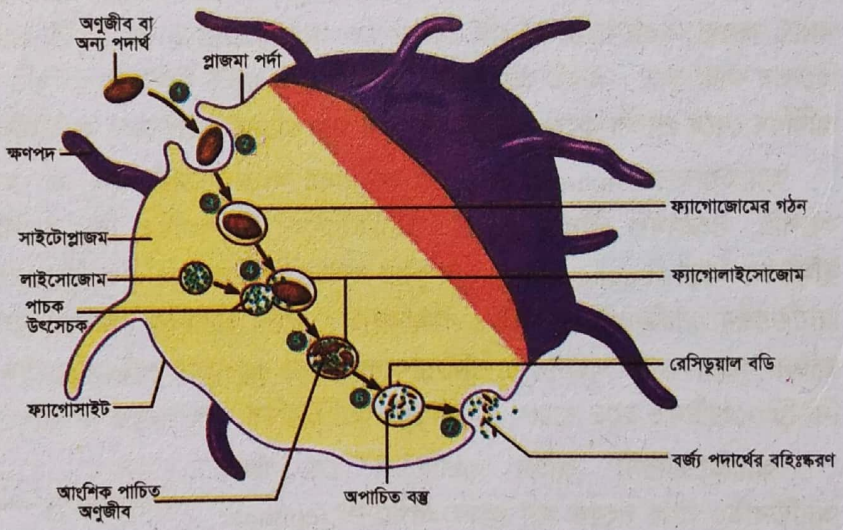

চিত্র ১০.১৪ : ফ্যাগোসাইটোসিস

২. ডায়াপেডেসিস (Diapedesis) : এই প্রক্রিয়ায় দেহের কোনো স্থান জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে সেই স্থানের শ্বেত রক্তকণিকাগুলো, বিশেষ করে মনোসাইট ও নিউট্রোফিল রক্তবাহের প্রাচীর ভেদ করে আক্রান্ত স্থানে জড়ো হয় এবং জীবাণুগুলোকে ঘিরে ফেলে এবং ধ্বংস করে। শ্বেত রক্তকণিকাগুলো রক্তজালকের এন্ডোথেলিয়াম কোষস্তরের কোনো সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে একটি ক্ষণপদ প্রবেশ করায় এবং সমগ্র শ্বেত রক্তকণিকাটি বেরিয়ে আসে। এই পথে অন্যান্য শ্বেত রক্তকণিকাগুলো বেরিয়ে এসে জীবাণুদের ক্ষণপদ বেষ্টন করে ঘিরে ফেলে এবং এনজাইমের ক্রিয়ায় জীবাণুদের ধ্বংস করে। এই প্রক্রিয়াটিই **ডায়াপেডেসিস** অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় দেহের কোনো আক্রান্ত স্থানের রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে শ্বেত রক্তকণিকাগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে এবং বহিরাগত জীবাণুদের ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করে তাকে ডায়াপেডেসিস বলে। এভাবেই অ্যান্টিবডির দ্বারা অ্যান্টিজেন বা বহিরাগত জীবাণুর হাত থেকে পোষক কোষ তথা পোষকদেহ রক্ষা পায়। অনাক্রম্য সাড়া দিতে পারে এমন প্রাণিদেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করালে রক্তে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হতে ৩-৪ দিন সময় লাগে।

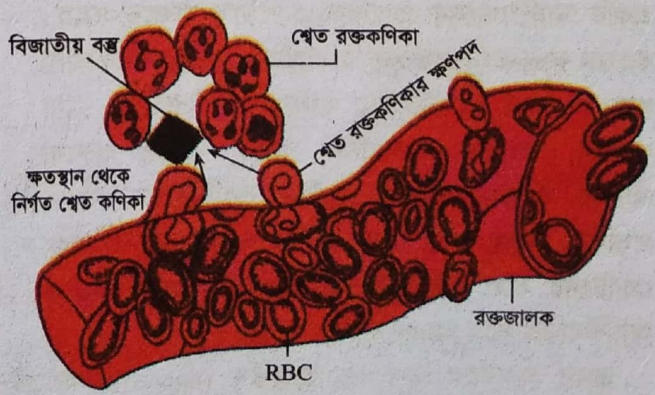

চিত্র ১০.১৫ : ডায়াপেডেসিস

Scanned with CamScanner

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়াজনিত সমস্যা (Reaction problems of Antigen and Antibody)

১। এইডস (AIDS) এর কারণে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া সংঘটিত হয় না।

২। দেহ কখনো কখনো নিজের দেহকোষের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে। তখন **অটোইমিউন** রোগ (autoimmune diseases, যেমন- ডায়াবেটিস মেলিটাস) সৃষ্টি হয়।

৩। দেহে অনেকসময় অ্যান্টিজেন নয় এমন বস্তুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে। তখন **অ্যালার্জি** (allergies) দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ **হিস্টামিন** (histamine) জাতীয় অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়।

❑ **কাজ :** (i) অ্যান্টিবডির চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর। (ii) দেহের লাল তরলের Y আকৃতির রোগ প্রতিরোধী উপাদানের কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ কর।/অ্যান্টিবডি মানবদেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় – কীভাবে ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ কর।/দেহ প্রতিরক্ষায় অ্যান্টিবডি কিভাবে অণুজীব ধ্বংস করে– তা বিশ্লেষণ কর।/অ্যান্টিবডি কীভাবে অণুজীবের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হয়– ব্যাখ্যা কর।/'প্রোটিন জাতীয় পদার্থ' জীবাণু ধ্বংসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কীভাবে?

[প্রাসঙ্গিক তথ্য : অ্যান্টিজেন (Antigen)

অ্যান্টিজেন (Antigen; GK. *Anti = against, genos = birth)* শব্দটি Antibody generating এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অ্যান্টিজেন হচ্ছে যেকোনো বিজাতীয় প্রোটিন বা পলিস্যাকারাইড, যা প্রাণিদেহে থাকে না। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা এদের নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ অথবা অন্যদেহের প্রতিটি কোষে যে প্রোটিন রয়েছে তা নির্দিষ্ট প্রাণিদেহের জন্য অপরিচিত এবং এটিই অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে। একটি অ্যান্টিজেন প্রাণিদেহকে একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদনে উদ্দীপ্ত করে। **যেসব বিজাতীয় জীবাণু বা অধিবিষ দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বা ইমিউনোজেন** (immunogen) **বলে।**

অ্যান্টিজেনকে non-self body বা অনুপ্রবিষ্ট সংক্রমণকারী বলে, যা দেহের নয়, যেমন– ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, টিউমার, ক্যান্সার, সংক্রামক জীবাণু প্রভৃতি। অ্যান্টিজেনের বিশেষায়িত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে **'অনাক্রম্যতায় ইমিউনো সাড়া** (immunogenicity) সৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে হবে এবং এরা অবশ্যই *non-self* বা বহিরাগত বস্তু হবে'। অধিকাংশ অ্যান্টিজেন প্রোটিনধর্মী ও জটিল গঠনবিশিষ্ট। এদের আণবিক ওজন সাধারণত ১০,০০০ ডাল্টনের অধিক। তবে অ্যান্টিজেন জটিল শর্করা অর্থাৎ বৃহদাকার পলিস্যাকারাইড বা বৃহদাকার লাইপোপ্রোটিন বা মিউকোপলিস্যাকারাইড বা গ্লাইকোপ্রোটিন বা নিউক্লিওপ্রোটিনও হতে পারে। অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডির সঙ্গে সংযুক্ত বা আবদ্ধ হতে পারে।

অ্যান্টিজেনধর্মী জটিল প্রোটিনের যে অংশ অ্যান্টিবডির সঙ্গে সংযুক্ত হয় তাকে **এপিটোপ** (epitope; epi = upon, topos = place) বা **অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিন্যান্ট** (antigenic determinant) বা **নির্ধারক** বলে। কোনো কোনো অ্যান্টিজেনধর্মী প্রোটিনের বা একটি অ্যান্টিজেনের একাধিক এপিটোপ থাকতে পারে। কখনো কখনো বিশেষ ক্ষুদ্র রাসায়নিক অণু (যেমন– নানা ধরনের ওষুধ, ধুলোবালির রাসায়নিক উপাদান, নানা ধরনের শিল্পজাত রাসায়নিক পদার্থ, ত্বকের শুকনো আঁশের অপজাত পদার্থ, প্রাণীর খুশকিজাত পদার্থ প্রভৃতি) নিজে অ্যান্টিজেন না হলেও কোনো বৃহৎ প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেনধর্মী হয়ে পড়ে ও অ্যান্টিবডির সঙ্গে আবদ্ধ হয়।



চিত্র ১০.১৬ : ব্যাকটেরিয়া (অ্যান্টিজেন) কোষের অ্যান্টিজেনিক নির্ধারক অঞ্চলে অ্যান্টিবডির বন্ধন।

এমন পদার্থকে বলা হয় **হ্যাপ্টেন** (hapten)। হ্যাপ্টেনগুলো বিশেষ প্রোটিনের ওপর এপিটোপ হিসেবে কাজ করে। **[বিঃদ্রঃ** রক্ত গ্রুপের (blood group) ক্ষেত্রে, লোহিত রক্তকণিকার আবরণীতে বিদ্যমান বংশগতভাবে উৎপন্ন অ্যান্টিজেন পদার্থ, যা জেনেটিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ভ্রূণ অবস্থায় উৎপন্ন হয়ে আজীবন অপরিবর্তিত থাকে। মানুষের রক্তে প্রধান তিন ধরনের অ্যান্টিজেন থাকে, যথা– A, B ও Rh]

Scanned with CamScanner

অ্যান্টিজেনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Antigen)

১। অ্যান্টিজেনের যে বিশেষ স্থানে অ্যান্টিবডি যুক্ত হয় তাকে **অ্যান্টিজেনিক নির্ধারক স্থান** (antigenic determinant site) অথবা **এপিটোপ** (epitope) বলে। এপিটোপে নির্দিষ্ট রাসায়নিক গ্রুপ থাকে যার সঙ্গে অ্যান্টিবডির **অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট** (antigen binding site) বা **প্যারাটোপ** (paratops) যুক্ত হয়।

২। অ্যান্টিজেন নির্ধারক স্থানগুলোকে অন্য কথায় **ভ্যালেন্স** (valence) বলে; বেশিরভাগ অ্যান্টিজেনের অনেকগুলো অ্যান্টিজেন নির্ধারক স্থান থাকে বলে এগুলোকে **মালটিভ্যালেন্ট** (multivallent) বলে।

৩। অ্যান্টিজেনের দুটি বিশেষ ক্ষমতা থাকে, যেমন– (i) **অনাক্রম্যতাকরণ** (immunogenecity)– নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদনের ক্ষমতা; ও (ii) **বিক্রিয়াকরণ** (reactivity)– উৎপন্ন অ্যান্টিবডির সঙ্গে অ্যান্টিজেনের বিক্রিয়া করার ক্ষমতা। যেসব অ্যান্টিজেনের এই দুটি ক্ষমতা থাকে তাদের **সম্পূর্ণ অ্যান্টিজেন** (complete antigen) বলে।



চিত্র ১০.১৭ : ক্ষুদ্র হ্যাপ্টেন অণু ও সম্পূর্ণ অ্যান্টিজেন গঠন

অ্যান্টিজেনের প্রকারভেদ (Types of Antigen) : অ্যান্টিজেন দু'রকমের হয়, যথা–

১। **এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন (Exogenous antigen) :** যেসব অ্যান্টিজেন প্রাণিদেহের বাইরে উৎপন্ন হয় তাদের এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে। যেমন– পরাগরেণু, দূষক পদার্থ, ভেষজ পদার্থ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ইত্যাদি।

২। **এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন (Enodogenous antigen) :** যেসব অ্যান্টিজেন প্রাণিদেহের ভেতরে উৎপন্ন হয় তাদের এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে। যেমন– ইঁদুর, বিড়াল, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতির লোহিত কণিকায় অবস্থিত **ফরসম্যান অ্যান্টিজেন** (forssman antigen), স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত **কার্ডিওলিপিন** (cardiolipin) অ্যান্টিজেন এই রকমের অ্যান্টিজেন।

অ্যান্টিজেনের উদাহরণ (Example of Antigen)

সমগ্র অণুজীব (microbs), যেমন– ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে; আবার **অণুজীবের কয়েকটি উপাংশও** অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে। ব্যাকটেরিয়ার কোনো অংশ, যেমন– ফ্ল্যাজেলা, ক্যাপসিউল ও কোষপ্রাচীর অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ অ্যান্টিজেনধর্মী (antigenic)। **ব্যাকটেরিয়াঘটিত অধিবিষ** (bacterial toxins) তীব্র অ্যান্টিজেনধর্মী। অণুজীব ছাড়া অন্যান্য পদার্থ, যেমন– ডিমের সাদা অংশ, ফুলের রেণু, গ্রহণ-অযোগ্য রক্তকণিকা (incompatible blood cells), কলাকোষের এবং আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের প্রতিস্থাপন (transplantation) ইত্যাদি অ্যান্টিজেনের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।]

অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির মধ্যে পার্থক্য

অ্যান্টিজেন	অ্যান্টিবডি
১। অ্যান্টিজেন হলো দেহে অনুপ্রবিষ্টকারী বহিরাগত বস্তু বা প্যাথোজেন।	১। অ্যান্টিবডি হলো অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে উৎপন্ন অ্যান্টিজেন প্রতিরোধী বস্তু।
২। রাসায়নিক প্রকৃতিতে এরা প্রোটিন বা জটিল কার্বোহাইড্রেট জাতীয়।	২। রাসায়নিক প্রকৃতিতে এরা সবসময় প্রোটিন জাতীয়।
৩। এরা সাধারণত লোহিত কণিকার প্লাজমামেমব্রেনের উপরিতলে বা জীবাণুর উপরিতলে বা দেহতরলে অবস্থান করে।	৩। এরা সাধারণত রক্তরস বা প্লাজমায় থাকে। এ ছাড়া দেহতরলে, নির্দিষ্ট প্লাজমামেমব্রেনে থাকে।
৪। অ্যান্টিজেনের প্রভাবে অ্যান্টিবডির সৃষ্টি হয়।	৪। অ্যান্টিবডির প্রভাবে অ্যান্টিজেন সৃষ্টি হয় না।
৫। এরা অনাক্রম্যতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে।	৫। এরা দেহ প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে।
৬। এরা ধ্বংসাত্মক।	৬। এরা রক্ষণাত্মক।

অ্যান্টিবডি ও ইন্টারফেরনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অ্যান্টিবডি	ইন্টারফেরন
১। কাজের প্রকৃতি	মন্থর।	দ্রুত।
২। কার বিরুদ্ধে	ব্যাকটেরীয় ও ভাইরাল সংক্রমণ।	ভাইরাল সংক্রমণ।
৩। কার্যকাল	দীর্ঘস্থায়ী।	স্বল্পস্থায়ী।
৪। ক্রিয়াস্থল	কোষের বাইরে।	কোষের ভেতর।

Scanned with CamScanner

১০.৬ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার ভূমিকা
(Role of Vaccine in Defence mechanism/Immunity)

ভ্যাকসিন শব্দটি ল্যাটিন শব্দ **ভ্যাকসিনাস** (vaccinus) থেকে এসেছে যার আক্ষরিক অর্থ হলো **'ফ্রম কাউ'** (from cow) বা 'গরু থেকে প্রাপ্ত'। ইংরেজ চিকিৎসক **ড. এডওয়ার্ড জেনার** (Dr. Edward Janner, 1796) প্রথম গরুর পুঁজ বা রস (scab) থেকে **গুটিবসন্তের** (small pox) টিকা আবিষ্কার করেন। এর অনেক বছর পর ফরাসি বিজ্ঞানী **লুই পাস্তুর** (Louis Pasteur) **কলেরা** (1879 সালে) রোগের এবং **জলাতঙ্ক রোগের টিকা** (1885 সালে, antirabies vaccine) আবিষ্কার করেন। **এমিল অ্যাডলফ ভন বেইরিং** (Emil Adolf Von Behring) ডিপথেরিয়া ও টিটেনাস রোগের অনাক্রম্যতার টিকা আবিষ্কার করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রোগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে ও টিকা প্রস্তুতিকরণ পদ্ধতির ক্রমোন্নতি ঘটেছে। **টিকা বা ভ্যাকসিন** (vaccine) **হলো প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের নিষ্ক্রিয় পরিস্রুত সাসপেনশন। টিকায় বিদ্যমান অণুজীবগুলো (ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া) জীবিত, অর্ধমৃত বা মৃত হতে পারে।** অর্থাৎ কোনো রোগ-প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোনো রোগজীবাণু থেকে প্রস্তুত যে উপাদান মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে সেই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জন্মায় তাকে অথবা, নিষ্ক্রিয় জীবাণুমাত্রা দেহে প্রবেশ করিয়ে যে অনাক্রম্যতা জাগানো হয় তাকে **ভ্যাকসিন** (vaccine) বা **টিকা** বলে।

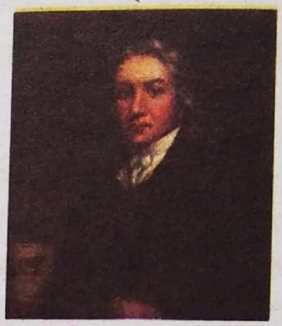
Dr. Edward Jenner
(1749-1823)

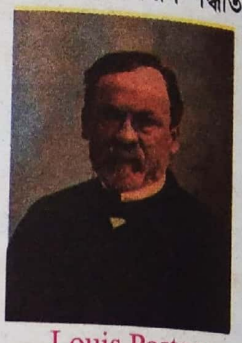
Louis Pasteur
(1822-1895)

সাধারণত কোনো রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব দিয়েই ওই রোগের টিকা তৈরি করা হয়। টিকা প্রবেশ করালে প্রাণিদেহে ওই একই জীবাণু বা নিকট সম্পর্কিত রোগজীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম হয়ে ওঠে। দেহে টিকা দেওয়া মানে হলো ওই রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করানো। কিন্তু যেহেতু এ জীবাণুগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় থাকে সেহেতু এরা জীবদেহে কোনো রোগ সৃষ্টি না করে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে বর্তমানে পোলিও, টিটেনাস, হাম, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা, হুপিংকাশি, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু মরণব্যাধি এইডস (AIDS)-এর ভাইরাস HIV কিংবা হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসের প্রতিষেধক কোনো টিকা আজও আবিষ্কার হয়নি।



চিত্র ১০.১৮ : টিকা দান কর্মসূচি

একটি আদর্শ টিকার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a ideal vaccine) : (১) সারাজীবনের জন্য দেহকে অনাক্রম্য করে। (২) সুনির্দিষ্ট জীবাণু থেকে দেহকে সুরক্ষা দেয়। (৩) রোগের সংক্রমণ রোধ করে। (৪) খুব দ্রুত অনাক্রম্যতার সূচনা ঘটায়। (৫) মায়ের অনাক্রম্যতাকে সন্তানে পরিবাহিত করে। (৬) সুস্থিত, সস্তা এবং নিরাপদ।

টিকার প্রকারভেদ (Type of Vaccines)

মানবদেহের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে দমন করতে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের টিকা আবিষ্কার করেছেন। যেমন–

১। জীবন্মৃত জীবন্ত বা শক্তি হ্রাস টিকা (Attenuated live vaccine) : কালচার করা, ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল করে দেওয়া জীবিত জীবাণু নিয়ে তৈরি। উদাহরণ– হাম (মিজলজ), মাম্পস, পোলিও, জলাতঙ্ক, যক্ষ্মা, পানিবসন্ত (চিকেন পক্স), প্লেগ, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের ভ্যাকসিন।

Scanned with CamScanner

২। **মৃত বা নিষ্ক্রিয় টিকা** (Killed or inactivated vaccine) : এ ধরনের টিকা মৃত জীবাণু দিয়ে তৈরি। উদাহরণ–ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, পোলিও, হেপাটাইটিস A, র‍্যাবিস প্রভৃতি ভ্যাকসিন।

৩। **বিষভিত্তিক বা টক্সয়েড টিকা** (Toxoid vaccine) : এ ধরনের টিকা জীবাণু নিঃসৃত টক্সয়েড দিয়ে তৈরি। উদাহরণ– ডিপথেরিয়া, টিটেনাস (ধনুষ্টংকার) প্রভৃতি রোগের ভ্যাকসিন।

৪। **উপএকক বা সাবইউনিট টিকা** (Subunit vaccine) : অনেক ক্ষেত্রে সংক্রমণকারী জীবাণুর দেহতল থেকে রাসায়নিক উপাদান (নির্দিষ্ট প্রোটিনের অংশ) আলাদা করে ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। উদাহরণ– হেপাটাইটিস-B ভ্যাকসিন, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ভ্যাকসিন প্রভৃতি।

৫। **অনুবন্ধী বা কনজুগেট টিকা** (Conjugate vaccine) : এ ধরনের টিকা দুটি ভিন্ন ধরনের উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার আবরণের সাথে একটি বাহক প্রোটিন যুক্ত করা হয়। উদাহরণ–হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-B (Hib) ভ্যাকসিন, নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন প্রভৃতি।

৬। **ডিএনএ টিকা** (DNA vaccine) : রিকম্বিনেন্ট DNA পদ্ধতিতে DNA ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়।

জীবাণুঘটিত রোগের ভ্যাকসিন, তাদের জীবাণু ও প্রকৃতি

জীবাণুঘটিত রোগ	জীবাণুর ধরন	ভ্যাকসিনের প্রকৃতি
১। যক্ষ্মা (Tuberculosis)	ব্যাকটেরিয়া	BCG- শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত জীবাণু
২। টাইফয়েড (Typhoid)	ব্যাকটেরিয়া	টাইফয়েড ভ্যাকসিন-হ্রাসপ্রাপ্ত জীবাণু
৩। প্লেগ (Plage)	ব্যাকটেরিয়া	প্লেগ ভ্যাকসিন-হ্রাসপ্রাপ্ত জীবাণু
৪। পোলিও মায়েলেটিস (Polio)	ভাইরাস	পোলিও ভ্যাকসিন নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৫। হাম (Measles)	ভাইরাস	মিজলস্ ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৬। রুবেলা (Rubella)	ভাইরাস	রুবেলা ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৭। মাম্পস (Mamps)	ভাইরাস	মাম্পস ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৮। ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)	ভাইরাস	ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৯। পীতজ্বর (Yellow Fever)	ভাইরাস	পীতজ্বর ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
১০। জলাতঙ্ক (Rabbies)	ভাইরাস	জলাতঙ্ক ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
১১। ডিপথেরিয়া (Diptheria)	ব্যাকটেরিয়া	টক্সয়েড
১২। টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার (Tetanus)	ব্যাকটেরিয়া	টক্সয়েড
১৩। কলেরা (Cholera)	ব্যাকটেরিয়া	কলেরা ভ্যাকসিন-মৃত অণুজীব

টিকা তৈরির পদ্ধতি (Method of Vaccine Preparation) : রোগ প্রতিরোধকারী অণুজীবকে কোনো নির্ধারিত জীবকোষে কালচার করে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। কালচারকৃত এসব অণুজীবকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে সংরক্ষণ করা হয়। এরপর অণুজীবগুলোকে বিশেষ পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় বা নিষ্প্রাণ করে টিকা তৈরি করা হয়। বিভিন্ন প্রকার টিকা বিভিন্ন উৎস থেকে তৈরি করা হয়। অনেক সময় জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়ায় জিন ক্লোনিং করে অথবা জিন সংশ্লেষ করে টিকা তৈরি করা হয়। টাইফয়েড জ্বরের টিকা *Salmonella typhi* নামক ব্যাকটেরিয়ার মৃতকোষ দিয়ে তৈরি করা হয়। র‍্যাবিস রোগের টিকা *Rabies* ভাইরাসের অর্ধমৃত দেহ হতে তৈরি করা হয়। গুটি বসন্তের জীবাণু *Variola* ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার জন্য *Vaccina* ভাইরাস দিয়ে তৈরি টিকা প্রদান করা হয়। আধুনিক জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে বর্তমানে পোলিও, টিটেনাস, হাম, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা, হুপিংকাশি, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস-B ইত্যাদি রোগের টিকা তৈরি করা হয়। ডিপথেরিয়ার টিকা জিন সংশ্লেষের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

টিকাকরণ বা ভ্যাক্সিনেশন (Vaccination) : অনাক্রম্যতা অর্জনের জন্য দেহের মধ্যে টিকা বা ভ্যাকসিন দেওয়ার পদ্ধতিকে টিকাকরণ বা ভ্যাক্সিনেশন বলে।

Scanned with CamScanner

টিকাকরণের নীতি (Principles of Vaccination)



চিত্র ১০.১৯ : টিকাকরণ বা ভ্যাক্সিনেশন

রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেহে প্রবেশ করিয়ে অনাক্রম্যতা গড়ে তোলা হয়। এই পদ্ধতিতে সক্রিয় অনাক্রমীকরণের মাধ্যমে **ইমিউনোলজিকাল মেমোরির** (immunological memory) সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে রোগ সংক্রামক জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে দেহ দ্রুততার সঙ্গে প্রবিষ্ট জীবাণুকে ধ্বংস করে। প্রকৃতপক্ষে, দেহে প্রবিষ্ট ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিজেন নির্দিষ্ট T ও B-লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং **মেমোরি সেল** (memory cell) উৎপন্ন হয়। ভ্যাকসিনেশন প্রধানত অণুজীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও বিভিন্ন অধিবিষ (toxins), যেমন– সাপের বিষ (snake venoum), মাকড়সার বিষ প্রভৃতির বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়। জীবাণু বা পরজীবীর আক্রমণে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে ভ্যাকসিনেশন আর কোনো কাজে আসে না। এসব দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ভ্যাকসিনেশন কতগুলো নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা–

১। ভ্যাকসিন বা টিকা মৃত বা নির্জীব জীবাণু অথবা তাদের নিষ্ক্রিয় উপজাত সমন্বয়ে গঠিত।

২। নির্জীব জীবাণু ভ্যাকসিন হিসেবে শরীরে প্রবেশ করানো হলে এটি বংশবৃদ্ধি করলেও কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। নিষ্ক্রিয় টক্সয়েড টিকা হিসেবে ব্যবহৃত হলে এটি শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

৩। ভ্যাকসিন প্রয়োগে যে অনাক্রম্যতা জাগে তা জীবনব্যাপী স্থায়িত্ব পায় না। তবে বুস্টার ডোজ প্রয়োগ দ্বারা এর স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তোলা যায়। বুস্টার ডোজগুলো দীর্ঘস্থায়ী অনাক্রম্যতা বজায় রাখে।

৪। কোন পথে ভ্যাকসিন প্রয়োগ হচ্ছে তার ওপর অনেক সময় অনাক্রম্যতা স্থায়ী হয়। যেমন– খাদ্যনালি সংক্রমণের ক্ষেত্রে খাদ্যনালির মাধ্যমে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে স্থায়ী ফল প্রদান করে।

৫। অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া জাগাতে যে সময় লাগে তা কোনো জীবাণুর ইনকিউবেশন সময়কালের চাইতে অনেক বেশি। এ কারণে দেহে রোগজীবাণু সংক্রমণের পর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তবে জলাতঙ্কের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন প্রয়োগে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কারণ জলাতঙ্কের বেলায় ইনকিউবেশনকাল অতিশয় দীর্ঘ।

টিকাকরণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা (Importance of Vaccination)

১। টিকাকরণের ফলে দেহে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়।

২। ভ্যাকসিন দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াদের প্রজনন ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়।

৩। টিকার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ করা হয় সে রকম কয়েকটি হলো– যক্ষ্মা, টিটেনাস, কলেরা, জলাতঙ্ক, হুপিংকাশি, গুটি বসন্ত, ডিপথেরিয়া, পোলিও, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস-B ইত্যাদি।

৪। টিকাকরণের ফলে কৃত্রিম শক্তির অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা হয়।

বুস্টার ডোজ (Booster dose)

দেহে অধিক মাত্রায় অ্যান্টিবডি সৃষ্টি এবং অনাক্রম্যতা সাধনের জন্য প্রাথমিক ভ্যাকসিন দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয় তাকে **বুস্টার ডোজ** বলে।

সংযুক্ত টিকা বা যৌথ টিকা (Combined Vaccine) : একাধিক রোগের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে যদি একটি মাত্র টিকা প্রদান করা হয়, তবে সেই প্রকার টিকাকে সংযুক্ত বা যৌথ টিকা বলে। যেমন– DPT। এই টিকা প্রদানে ডিপথেরিয়া (Diptheria), এছাড়াও কয়েকটি সংযুক্তি টিকা হলো– হুপিংকাশি বা পারটুসিস (Pertussis) ও টিটেনাস (Tetanus) এই তিনটি রোগের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা যায়।

১। DT : ডিপথেরিয়া ও টিটেনাসের প্রতিষেধক,

২। MMR : মাম্পস, মিজলস ও রুবেলা রোগের প্রতিষেধক।

৩। DP : ডিপথেরিয়া ও হুপিংকাশির প্রতিষেধক টিকা।

৪। DPT ও হেপাটাইটিস-B। ৫। DPT ও HIB টিকা।

৬। DPT ও টাইফয়েড টিকা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচি বা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম (Vaccination Programme in Bangladesh)

রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে টিকার আবিষ্কার এবং এর প্রচলন মানুষের জন্য আশীর্বাদ। টিকার মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে চূড়ান্তভাবে নির্মূলের পূর্বে গুটিবসন্ত এককভাবে পৃথিবীর প্রায় ৩০-৪০ কোটি মানুষের প্রাণ হরণ করেছে। ১৯৫০ সালে আবিষ্কৃত পোলিও ভ্যাকসিন এবং এর ব্যবহার দ্বারা বাংলাদেশ বর্তমানে পোলিও রোগমুক্ত। এই টিকা বা ভ্যাকসিনের জন্যই রুবেলা, হাম, মাম্পস, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, পারটুসিস, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যগুলো হলো- সুপ্ত অনাক্রম্যতাকে উদ্বুদ্ধ করা, সুস্থ ও সবল বংশধর গঠনে সহায়তা করা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো।

বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO)-এর Expanded Programme on Immunization (EPI) কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের প্রাণঘাতী ৬টি রোগ, যথা– যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, টিটেনাস, পোলিও এবং হাম-এর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এছাড়াও হেপাটাইটিস-বি এবং হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি-এর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। মা এবং শিশুকে টিটেনাস থেকে রক্ষার জন্য **টিটেনাস টক্সয়েড** (tetanus toxoid) ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। জাতীয় ভ্যাকসিনেশনের কর্মসূচিতে (National vaccination programme) নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী টিকা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

বয়সকাল	সুপারিশকৃত টিকা
জন্মের এক মাসের মধ্যে	BCG ও OPV-O
৬ সপ্তাহ বয়সে	DPT- I ও OPV- I
১০ সপ্তাহ বয়সে	DPT- II ও OPV- II
১৪ সপ্তাহ বয়সে	DPT- III ও OPV- III
৯ মাস বয়সে	Measles vaccine
১৮ মাস বয়সে	DPT ও OPV (Booster dose)
৫-৬ বছর	DT vaccine
১০-১৬ বছর	TT vaccine

OPV = Oral Polio Vaccine
BCG = Bacille Calmette Guerin
DPT = Diphtheria, Pertussis and Tetanus
DT = Diphtheria and Tetanus
OPV-O = Zero dose
OPV-1 = 1st dose
BCG-1 = 1st dose
TT = Tetanus Toxoid

১০.৭ দেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতি কোষ বা মেমোরি কোষের ভূমিকা (Role of Memory cell in Defence mechanism/Immunity)

কোনো জীবাণুর বিরুদ্ধে একবার প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর B-লিম্ফোসাইট এবং T-লিম্ফোসাইট উভয়েই **স্মৃতিকোষ বা মেমোরি কোষ** (memory cell) হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এসব মেমোরি কোষ (মেমোরি B-কোষ ও মেমোরি T-কোষ) শরীরকে একবার প্রতিহত করা জীবাণুকে চিনতে সাহায্য করে ফলে একই জীবাণু পুনরাক্রমণ ঘটলে অতি দ্রুততার সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারে। দেহে একই জীবাণু পুনরাক্রমণ ঘটলে মেমোরি T-কোষ অতিদ্রুত বিপুল সংখ্যক ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের T-লিম্ফোসাইট সৃষ্টি করে অনাক্রম্যতন্ত্রকে সক্রিয় করে এবং জীবাণুকে সরাসরি আক্রমণ করে ধ্বংস করে। অন্যদিকে, মেমোরি B-কোষ বিপুল সংখ্যক বিশেষ ধরনের কোষ সৃষ্টি করে যারা অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করে। এ কোষ স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে না।

B-লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে মেমোরি কোষের ভূমিকা সবচেয়ে ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে শরীরে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এটি **হিউমোরাল ইমিউনিটির** সঙ্গে জড়িত। T-লিম্ফোসাইটের মতো বহু রকমের B-লিম্ফোসাইট দেখা যায় এবং এদের মধ্যে প্রতিটি কোষই বিশেষ বিশেষ অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে সাড়া দিতে পারে। B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং উপর্যুপরি বিভাজিত হয়ে একই রকমের অনেকগুলো লিম্ফোসাইট তৈরি করে। উপজাত কোষগুলোর বেশিরভাগই **প্লাজমা কোষে** (plasma cell) রূপান্তরিত হয় এবং অবশিষ্ট কোষগুলো **মেমোরি কোষে** (memory cell) রূপান্তরিত হয়।

Scanned with CamScanner

মেমোরি কোষ অল্পমাত্রায় অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করতে পারে। প্লাজমা কোষই অ্যান্টিবডির প্রধান উৎস। প্লাজমা কোষ প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করে। দেখা গেছে, একটি সক্রিয় প্লাজমা কোষ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০০০ অ্যান্টিবডি

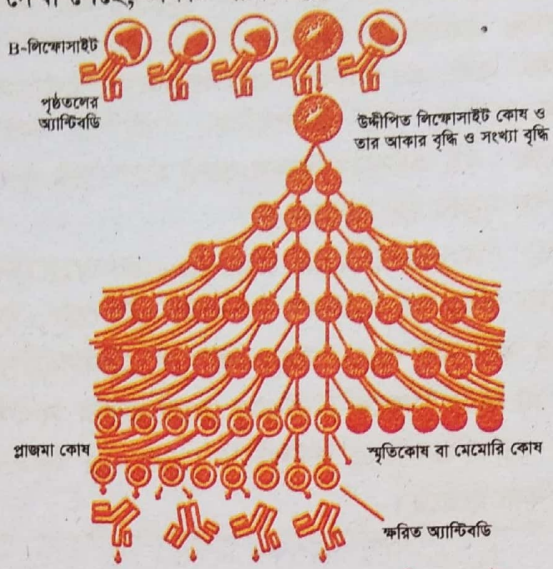

চিত্র ১০.২০ : B-লিম্ফোসাইটের বিভাজন ও স্মৃতিকোষ উৎপাদন

প্রস্তুত করতে পারে। মেমোরি কোষগুলো রক্তের মধ্যে দীর্ঘদিন, এমনকি সারাজীবন ধরে থাকতে পারে। এই কোষের উপরিভাগে IgG অথবা IgA জাতীয় অ্যান্টিবডি থাকে। কখনো অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে তা দ্রুত সাড়া জাগাতে পারে। এই সাড়া জাগানো প্রাথমিক অবস্থায় যেমন থাকে তা হতে অনেকগুণ বেশি হয়। এ কারণে কেউ যদি একবার কোনো ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে পরবর্তীকালে ওই ভাইরাসের আক্রমণের হাত থেকে সে খুব সহজেই রক্ষা পায়। এ কারণেই শিশুকালের কিছু রোগ যেমন– হাম, মাম্পস, চিকেন পক্স ইত্যাদি জীবনে একবারই হয়। **ভ্যাক্সিনেশন** (vaccination) এই নীতির ভিত্তিতেই উদ্ভব হয়েছে।

মানবদেহের স্থায়ী সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণকে সুরক্ষা প্রদান এবং শিশুকে জীবাণুর সংক্রমণ হতে রক্ষার ক্ষেত্রে মেমোরি কোষের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ভ্রূণ ও শিশু মায়ের দেহ থেকে পরোক্ষভাবে মেমোরি কোষ পেয়ে থাকে।

❑ **কাজ :** (i) ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে অ্যান্টিবডি তৈরি করে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। (ii) স্মৃতিকোষ অ্যান্টিবডিকে আরও ক্রিয়াশীল হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে– সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

কয়েকটি পরজীবীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা

১। ব্যাকটেরিয়া : শরীরে ব্যাকটেরিয়া জাতীয় পরজীবী সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে প্লাজমা কোষ নিঃসৃত অ্যান্টিবডি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২। ভাইরাস : ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে কোষনির্ভর (cell mediated) অনাক্রম্যতাই বেশি কার্যকরী। সাধারণত T-কোষ ও প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ (NK cell) সংক্রামক ভাইরাসকে নষ্ট করে। তবে অনেক সময় অ্যান্টিবডি দ্বারা কিংবা ইন্টারফেরন সৃষ্টি করে পোষক ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

৩। ছত্রাক : ছত্রাকের সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রধানত কোষনির্ভর অনাক্রম্যতাই বেশি কাজে লাগে। তবে অ্যান্টিবডি IgA দ্বারা ছত্রাকের সংক্রমণ প্রতিহত হতে পারে।

৪। প্রোটোজোয়া ও কৃমি : মানবদেহে প্রোটোজোয়া বা কৃমির সংক্রমণ প্রতিরোধ খুব সহজ কাজ নয়। তবে সাধারণভাবে এসব পরজীবী প্রতিরোধ কোষনির্ভর অনাক্রম্যতাই বেশি কাজ করে। ঘাতক T-কোষের ক্রিয়া এ জাতীয় পরজীবীর উপর কাজ করে না বললেই চলে। তবে কিছু T-কোষ সাইটোকাইন ক্ষরণ করে ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয় করতে পারে। ম্যাক্রোফেজ ম্যালেরিয়ার জীবাণু ও কতিপয় কৃমির আক্রমণ ভালোভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। তবে অনেকক্ষেত্রে প্রোটোজোয়া ও কৃমি জাতীয় পরজীবীরা বিশেষ ক্ষমতাবলে অনাক্রম্যতা সাড়া প্রতিহত করতে সক্ষম। কোনো কোনো পরজীবী বিষাক্ত টক্সিন ক্ষরণ করে ম্যাক্রাফেজকে নষ্ট করে। এছাড়া এ ধরনের টক্সিন IgG বা অপর দ্রবণীয় অ্যান্টিবডিকেও নষ্ট করে।

Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

- **অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি :** প্রাণিদেহে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু, ভাইরাস ইত্যাদি বিজাতীয় পদার্থের বিরুদ্ধে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি বলে।
- **অনাক্রম্যবিদ্যা বা ইমিউনোলজি :** বিজ্ঞানের যে বিভাগে অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি এবং অনাক্রম্যতা বিষয়ে জানা যায় তাকে অনাক্রম্যবিদ্যা বা ইমিউনোলজি বলে। অথবা, জীববিজ্ঞানের যে শাখায় মানবদেহের প্রতিরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাকে অনাক্রম্যবিদ্যা বা ইমিউনোলজি বলে।
- **ইমিউনতন্ত্র :** যে তন্ত্র প্রাণিদেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে তাকে ইমিউনতন্ত্র বলা হয়।
- **ম্যাক্রোফেজ :** এটি রক্তের মনোসাইট থেকে উৎপন্ন হয়ে কলাকোষে অবস্থান করে। দেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলে সরাসরি তাদের গ্রাস করে। এ ছাড়া অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগকেও বিনাশ করে।
- **প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ :** এটি বিশেষ প্রকার লিম্ফোসাইট। IgG আচ্ছাদিত রোগজীবাণুকে (যেমন– ভাইরাস, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ও কৃমি) ও টিউমার কোষকে এই প্রকার ঘাতক কোষ বিনষ্ট করতে পারে।
- **লিম্ফয়েড অঙ্গ :** যেসব অঙ্গ মানবদেহের অনাক্রম্য ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত তাদের লিম্ফয়েড অঙ্গ বলে। কারণ এগুলো শ্বেত রক্তকণিকা লিম্ফোসাইটস উৎপাদন ও সঞ্চয় করে যারা অনাক্রম্য ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। রক্তনালি ও লসিকানালি।
- **ফ্যাগোসাইটস :** দেহের বিশেষ কিছু কোষ বিভিন্ন অণুজীব ও ভাইরাসকে ভক্ষণের মাধ্যমে ধ্বংস করে তাদের ফ্যাগোসাইটস বলে।
- **ফ্যাগোসাইটোসিস :** যে প্রক্রিয়ায় ফ্যাগোসাইটসমূহ ভক্ষণের মাধ্যমে অণুজীব ধ্বংস করে তাকে ফ্যাগোসাইটোসিস বলে। অথবা, যে প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ফ্যাগোসাইটিক কোষের কোষপর্দা দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ফ্যাগোজোম গঠনের মাধ্যমে ধ্বংস হয় তাকে ফ্যাগোসাইটোসিস বলে।
- **ডায়াপেডেসিস :** যে প্রক্রিয়ায় দেহের কোনো আক্রান্ত স্থানের রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে শ্বেত রক্তকণিকাগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে এবং বহিরাগত জীবাণুদের ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করে, তাকে ডায়াপেডেসিস (diapedesis) বলে।
- **সাইটোকাইনস :** যেসব বিশেষ ধরনের প্রোটিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের মাধ্যমে অনাক্রম্যতন্ত্রের কোষসমূহ একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের সাইটোকাইনস বলে। যেমন– ইন্টারলিউকাইন, ইন্টারফেরন, গ্রোথ ফ্যাক্টর প্রভৃতি।
- **কেমোট্যাক্সিস বা রসায়ন গতি :** পরিপূরক সংস্থার এক বা একাধিক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ (যেমন– হিস্টামিন, সাইটোকাইনিন ইত্যাদি) নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজের গতি বৃদ্ধি করে। ফলে জীবাণুর চারদিকে এসব কোষ অধিক সংখ্যায় জমা হয়ে আগ্রাসী হয়ে ওঠে। পদার্থগুলোর প্রতি এরূপ আসক্তিকে কেমোট্যাক্সিস বা রসায়ন গতি বলে।
- **প্রদাহ প্রতিক্রিয়া :** পরিপূরক সংস্থার কোনো কোনো এনজাইম কখনো কখনো স্থানীয়ভাবে এমন প্রদাহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, প্রদাহ স্থানটি লাল হয়, তাপমাত্রা বেড়ে যায়, স্থানটি ফুলে উঠে এবং তার মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। এসব পরিবর্তনের ফলে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু কলাকোষের মধ্যে দিয়ে আর অধিক অগ্রসর হতে পারে না। এ অবস্থাই হলো প্রদাহ প্রতিক্রিয়া।
- **কোষীয় অনাক্রম্যতা :** এ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের কতিপয় কোষ (যারা ইমিউনতন্ত্রের অংশ বিশেষ) দেহের ভেতর অণুজীব তথা পরজীবীর আক্রমণ প্রতিহত করে। T-লিম্ফোসাইটগুলো এ ধরনের অনাক্রম্যতা প্রদান করে।
- **হিউমোরাল ইমিউনিটি :** এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি প্রস্তুতির মাধ্যমে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত হয়। অ্যান্টিবডি রক্তরস, লসিকা বা কলারসের মধ্যে মিশ্রিত থেকে অ্যান্টিজেনকে শনাক্ত করে ও তাহার বিনষ্টিকরণ ত্বরান্বিত করে। ইমিউনতন্ত্রের B-লিম্ফোসাইট কর্তৃক হিউমোরাল ইমিউনিটি সাধিত হয়।
- **সহজাত অনাক্রম্যতা :** যে অনাক্রম্যতা জন্মগত এবং বিশেষ কোনো রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট নয় তাকে সহজাত অনাক্রম্যতা বলে। এটি দেহের সাধারণ ও স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যা জন্ম থেকেই রোগ বা জীবাণুর বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল থাকে।
- **অর্জিত অনাক্রম্যতা :** যে অনাক্রম্যতা দেহে প্রবিষ্ট কোনো জীবাণু বা বিজাতীয় প্রোটিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাকে অর্জিত অনাক্রম্যতা বলে। অনাক্রম্যতা তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত শ্বেতকণিকাগুলো হলো– B-লিম্ফোসাইট, T-লিম্ফোসাইট এবং ম্যাক্রোফেজ।
- **লিম্ফোসাইট :** রক্তের ভেতর অদানাদার শ্বেত কণিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো লিম্ফোসাইট। এ কোষগুলো অনাক্রম্যতা সৃষ্টির জন্য সরাসরি দায়ী। লিম্ফোসাইটগুলোর আবার শ্রেণিবিভাগ আছে। সাধারণভাবে এদের তিনটি শ্রেণিবিভাগ করা যায়, যেমন– T-লিম্ফোসাইট, B-লিম্ফোসাইট ও প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ (Natural killer cell)। সব ধরনের লিম্ফোসাইট ও ফ্যাগোসাইট অস্থিমজ্জায় উৎপন্ন হয়।
- **T-লিম্ফোসাইট :** কোষীয় অনাক্রম্যতা সৃষ্টির জন্য দায়ী এ জাতীয় লিম্ফোসাইট অস্থিমজ্জায় স্টেম কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাইমাস গ্রন্থিতে পরিণতি লাভ করে বলে, এদের T-লিম্ফোসাইট বলা হয়। এরা ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইট নামেও পরিচিত। রক্তের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইট পাওয়া যায়, যেমন– (i) **সাইটোটক্সিক T-লিম্ফোসাইট বা ইফেক্টর কোষ :** সরাসরি শত্রুকোষকে বিনষ্ট করে; (ii) **সাহায্যকারী T-লিম্ফোসাইট :** B-লিম্ফোসাইটকে অ্যান্টিবডি সৃষ্টিতে সাহায্য করে; এবং (iii) **সাপ্রেসর T-লিম্ফোসাইট :** প্রাণীর নিজস্ব অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া হতে বাধা দেয়। সাহায্যকারী T-লিম্ফোসাইট ও সাপ্রেসর T-লিম্ফোসাইটকে **রেগুলেটর কোষও** বলা হয়।

Scanned with CamScanner

☑ **B-লিম্ফোসাইট :** এরা স্টেম কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে অস্থিমজ্জায় পরিণতি লাভ করে এবং লসিকা গ্রন্থিতে অবস্থান করে। এরা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে এরা সক্রিয় হয় এবং অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। অর্থাৎ এটা হিউমোরাল ইমিউনিটির সঙ্গে জড়িত। বিশ্রামরত অবস্থায় B ও T-লিম্ফোসাইট একই রকম দেখায়, তবে কোষ সক্রিয় হলে T ও B-কোষ শনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না। সক্রিয় অবস্থায় পরিণত B-লিম্ফোসাইটকে প্লাজমা কোষও বলে। পরিণত অবস্থায় এই কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রভূত পরিমাণে অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে সক্রিয় T-কোষ বেশ অল্পমাত্রায় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেখায়। পাখিদের ক্ষেত্রে **বার্সা ফ্যাব্রিসিয়াস** নামক লিম্ফাটিক অঙ্গ (যাহা ক্লোয়েকার কাছে অবস্থিত) হতে B-লিম্ফোসাইট উৎপন্ন হয় বলে এদের এমন নামকরণ হয়েছে। অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীতে বার্সা নামক অঙ্গের উপস্থিতি দেখা যায় না। তবে সমতুল কোনো অঙ্গে এদের B-লিম্ফোসাইট প্রস্তুত হয় বলে মনে করা হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহে এই কোষ অস্থিমজ্জায় সৃষ্টি হলেও শৈশবে যকৃৎ কিংবা প্লিহাতে এদের পরিণতি ঘটে।

☑ **স্টেমকোষ :** স্টেমকোষ হলো অবিভেদিত ও আজীবন বিভাজনক্ষম কোষ যা মানবদেহের প্রায় ২০০ ধরনের বিশেষায়িত কোষে (যেমন– T-কোষ, B-কোষ ইত্যাদি) রূপান্তরিত হতে পারে। এ কোষ দু'ধরনের, যথা– (ক) **ভ্রূণীয় স্টেমকোষ–** এর অবস্থান হচ্ছে ভ্রূণের **ব্লাস্টোসিস্ট** দশায় অন্তঃস্থ কোষপিণ্ডে এবং (খ) **পরিণত স্টেমকোষ–** এর অবস্থান হচ্ছে অস্থিমজ্জা, চর্বিকোষ ও রক্তে।

☑ **অ্যান্টিজেন :** যেসব ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, আদ্যপ্রাণী বা কোনো বিজাতীয় প্রোটিন আমাদের দেহে প্রবেশ করে দেহকে অসুস্থ করে তোলে তাদের অ্যান্টিজেন বলে। এরা অবশ্যই non-self বা বহিরাগত বস্তু হবে। অধিকাংশ অ্যান্টিজেন প্রোটিনধর্মী ও জটিল শর্করা এবং জটিল গঠনবিশিষ্ট। এরা দেহে প্রবেশ করে অ্যান্টিবডি সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

☑ **অ্যান্টিবডি :** প্রতিবিষ বা জীবাণুনিহিত অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে যেসব প্রোটিনের আবির্ভাব ঘটে এবং যারা জীবাণু বা তাদের থেকে নিঃসৃত প্রতিবিষকে বিনষ্ট করে তাদের অ্যান্টিবডি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, দেহে প্রবিষ্ট অ্যান্টিজেনকে প্রতিহত করার জন্য দেহে যে প্রোটিন তৈরি হয় তাদের অ্যান্টিবডি বলে।

☑ **প্যাথোজেন :** রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে প্যাথোজেন বলে। যেমন– ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফানজাই, ইত্যাদি। এদের দ্বারা সৃষ্ট রোগকে সংক্রামক রোগ বলে।

☑ **ইমিউনোগ্লোবিউলিন :** রক্তরসের গ্লোবিউলিন যার মধ্যে অ্যান্টিবডির ধর্ম আছে। প্রোটিনধর্মী; লিম্ফোসাইট-প্লাজমা বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, অ্যান্টিবডির অপর নাম হলো ইমিউনোগ্লোবিউলিন।

☑ **এপিটোপ :** অ্যান্টিজেনের যে বিশেষ স্থানে অ্যান্টিবডি যুক্ত হয় তাকে অ্যান্টিজেনিক নির্ধারক স্থান বা এপিটোপ বলে।

☑ **প্যারাটোপ :** অ্যান্টিবডির যে বিশেষ স্থানে অ্যান্টিজেন যুক্ত হয় তাকে অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট বা প্যারাটোপ বলে। অথবা কোনো অ্যান্টিবডিতে অ্যান্টিজেন ধরার অংশটিই হচ্ছে প্যারাটোপ।

☑ **ইমিউনাইজেশন :** কোনো নির্দিষ্ট রোগের বিপরীতে ইনজেকশনের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে দেহে ভ্যাকসিন প্রবেশ করিয়ে ইমিউনিটি তৈরির কৌশলকে ইমিউনাইজেশন বলে।

☑ **কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম :** দেহের অনাক্রম্যতন্ত্রে প্রায় ২০টি প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র বা সিস্টেম ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে অ্যান্টিবডিকে সহায়তা করে তাকে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বলে। অথবা, রক্তের প্লাজমা মধ্যস্থ অসংখ্য সিরাম প্রোটিন (২০-৩০টির বেশি) উদ্দীপিত হলে রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে যে অনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা গড়ে ওঠে তাদের একত্রে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বলে। যকৃৎ থেকে উৎপন্ন এ প্রোটিনগুলো রক্তরসে বা প্লাজমায় ঘুরে বেড়ায়। প্লাজমা প্রোটিনের প্রায় ১০% কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের অন্তর্গত। এ সিস্টেম অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া জাগানোর জন্য বিশেষভাবে কাজ করে। তবে এদের ক্রিয়া অনির্দেশিত ধরনের।

☑ **ভ্যাকসিন :** ভ্যাকসিন বা টিকা হলো কতক রোগ সৃষ্টিকারী জীবিত, অর্ধমৃত বা মৃত অণুজীবের (ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া) সাসপেনশন, যা প্রাণিদেহে প্রবেশ করালে প্রাণিদেহ ওই একই জীবাণু বা নিকট সম্পর্কিত রোগজীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম হয়ে ওঠে। টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা হয়, ফলে দেহে আর ওই রোগ সৃষ্টি হয় না।

☑ **ভ্যাক্সিনেশন :** অনাক্রম্যতা অর্জনের জন্য দেহের মধ্যে টিকা বা ভ্যাকসিন দেওয়ার পদ্ধতিকে টিকাকরণ বা ভ্যাক্সিনেশন বলে।

☑ **অপসোনিন :** যেসব পদার্থ দ্বারা নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ অণুজীবকে শনাক্ত করে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় সাধারণত সেসব পদার্থকে অপসোনিন বলা হয়। যেমন– অ্যান্টিবডি।

☑ **অপসোনাইজেশন :** দেহের অ্যান্টিবডি যে প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যাকটেরিয়া বা অন্য কোনো জীবাণু ধ্বংস করে। অর্থাৎ অ্যান্টিবডির প্রভাবে অ্যান্টিজেনকে আগ্রাসী কোষের কাছে উপাদেয় করে তোলার প্রণালিকে অপসোনাইজেশন বলে। অথবা, অ্যান্টিজেনের চারদিকে অ্যান্টিবডির আবরণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অপসোনাইজেশন বলে। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়।

☑ **মেমোরি কোষ :** মেমোরি কোষ হলো কতগুলো বিশেষ ধরনের লিম্ফোসাইট নামক দানাদার শ্বেত রক্তকণিকা অর্থাৎ B-লিম্ফোসাইট ও T-লিম্ফোসাইটের সক্রিয়তায় উৎপন্ন বিশেষ ধরনের লিম্ফোসাইট (মেমোরি B-কোষ ও মেমোরি T-কোষ) যারা মানুষের অনাক্রম্যতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে।

Scanned with CamScanner

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গুটি বসন্তের ভ্যাকসিন কে আবিষ্কার করেন? [ঢা. বোর্ড-১৮]
ক এডওয়ার্ড জেনার খ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং
গ লুই পাস্তুর ঘ রবার্ট হুক

২. অ্যান্টিজেন নয় কোনটি? [ব. বোর্ড-১৭]
ক পলিস্যাকারাইড খ লিপিড গ প্রোটিন ঘ লিপোপ্রোটিন

৩. জীবাণু ভক্ষণ করে দেহের প্রতিরক্ষায় অংশ নেয় কোনটি? [চ. বোর্ড-১৭]
ক নিউট্রোফিল খ বেসোফিল
গ লিম্ফোসাইট ঘ লাইসোজোম

৪. সর্বপ্রথম গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন কোন বিজ্ঞানী? [ঢা.বোর্ড-১৭]
ক লুই পাস্তুর খ ইউলিয়াম বেটসন
গ এডওয়ার্ড জেনার ঘ রবার্ট এডওয়ার্ডস

৫. নিচের কোনটি মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের সাথে সম্পর্কিত? [সি.বোর্ড-১৭]
ক প্রদাহ খ ইন্টারফেরন গ জ্বর ঘ রক্তজমাট

৬. অ্যালার্জির সাথে জড়িত কোন অ্যান্টিবডি? [সি.বোর্ড-১৭]
ক IgA খ IgD গ IgE ঘ IgM

৭. মানবদেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্তর কয়টি? [দি.বোর্ড-১৭]
ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

৮. কোনটি দেহে অনুপ্রবেশিত ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করে? [কু.বোর্ড-১৭]
ক ইন্টারফেরন খ অপসোনিন
গ কাইনিন ঘ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস

৯. ম্যাক্রোফেজের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক? [ঢা.বোর্ড-১৬]
ক কলায় অবস্থান করে খ পরিণত নিউট্রোফিল
গ পুঁজ হিসেবে দেহের বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হয়
ঘ সাইটোপ্লাজম বর্ণ নিরপেক্ষ দানাযুক্ত

১০. মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায় কোন এন্টিবডি? [ঢা.বোর্ড-১৯; রা.বোর্ড-১৬]
ক IgG খ IgM গ IgE ঘ IgA

১১. পাইরোজেন কী জাতীয় পদার্থ? [রা.বোর্ড-১৬]
ক প্রোটিন খ শর্করা গ লিপিড ঘ ফেনল

১২. কোনটি মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের অন্তর্গত? [রা.বোর্ড-১৬]
ক সিরুমিন খ ফ্যাগোসাইট গ ইন্টারফেরন ঘ কমপ্লিমেন্ট

১৩. গুটি বসন্তের টিকা কে আবিষ্কার করেন? [য.বোর্ড-১৬]
ক ড.এডওয়ার্ড জেনার খ লুই পাস্তুর
গ আলবার্ট ক্যালমিটি ঘ ক্যামিলি গুইরিন

১৪. হিস্টামিন ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে কোন অ্যান্টিবডি? [কু.বোর্ড-১৬]
ক IgG খ IgD গ IgA ঘ IgE

১৫. γ-(গামা) ইম্যুনোগ্লোবিউলিন কোনটি? [ব.বোর্ড-১৬]
ক IgG খ IgA গ IgD ঘ IgE

১৬. কোন প্রতিরক্ষা স্তরের মাধ্যমে কলোস্টাম (শালদুধ) মায়ের দেহ হতে শিশুর দেহে প্রবেশ করে? [ব.বোর্ড-১৬]
ক প্রাকৃতিক সক্রিয় প্রতিরক্ষা খ কৃত্রিম সক্রিয় প্রতিরক্ষা
গ প্রাকৃতিক অসক্রিয় প্রতিরক্ষা ঘ কৃত্রিম অসক্রিয় প্রতিরক্ষা

১৭. বমি কোন ধরনের অনাক্রম্যতা? [ব.বোর্ড-১৬]
ক বংশগতীয় খ যান্ত্রিক গ রস সংশ্লিষ্ট ঘ কোষভিত্তিক

১৮. কোন অ্যান্টিবডি গর্ভাবস্থায় অমরা অতিক্রম করে মায়ের অর্জিত প্রতিরক্ষাকে ভ্রূণদেহে বহন করে? [সি.বোর্ড-১৬]
ক IgA খ IgD গ IgG ঘ IgM

১৯. কোন অঙ্গটি মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের অন্তর্ভুক্ত? [চ.বোর্ড-১৫]
ক ত্বক খ পরিপাক গ্রন্থি গ রক্ত ঘ অ্যান্টিবডি

২০. মানবদেহের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর কী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? [দি.বোর্ড-১৬]
ক রক্ত খ ত্বক গ শ্লেষ্মা ঘ অ্যান্টিবডি

২১. প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের উদাহরণ নিচের কোনটি? [ঢা.বোর্ড-১৯]
ক ইন্টারফেরন খ সহজাত মারন কোষ
গ সিরুমেন ঘ ম্যাক্রোফেজ

২২. দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে ভূমিকা রাখে কোনটি? [রা. সি. বোর্ড-১৯]
ক নিউট্রোফিল খ লাইসোজাইম গ স্পার্মিন ঘ সিরুমেন

২৩. ইন্টারফেরনের ক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি সঠিক? [কু. বোর্ড-১৯]
ক অনাক্রম্যতা স্পেসিফিক
খ গাঠনিক উপাদান লিপোপ্রোটিন
গ T-লিম্ফোসাইট হতে উৎপন্ন হয়
ঘ ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়

২৪. WHO যে ছয়টি রোগের টিকা দেয় তা হলো– [চ.বোর্ড-১৫]
ক যক্ষ্মা, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশ, পোলিও, হাম
খ কলেরা, যক্ষ্মা, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, পোলিও, হাম
গ টিটেনাস, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, পোলিও, হাম
ঘ হেপাটাইটিস-বি, কলেরা, যক্ষ্মা, টিটেনাস, পোলিও, হাম

২৫. দেহের প্রধান সৈনিক হিসেবে কাজ করে কোনটি? [ব.বোর্ড-১৫]
ক অ্যান্টিজেন খ অ্যান্টিবডি গ প্রোটিন ঘ গ্লোবিউলিন

২৬. মানবদেহের প্রতিরক্ষা স্তর কয়টি? [সি.বোর্ড-১৫]
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২৭. কোনটি মানবদেহের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে কাজ করে? [চ. বোর্ড-১৯]
ক ফ্যাগোসাইট খ ত্বক গ সিরুমেন ঘ লালা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮. কোনটি ভ্যাকসিন প্রয়োগে প্রতিরোধ করা যায়– [রা.বোর্ড-১৫]
i. এইডস ii. সিফিলিস iii. গনোরিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. মানুষের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর– [রা.বোর্ড-১৭]
i. দেহত্বক ii. পাকস্থলী এসিড iii. নিউট্রোফিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. ম্যাক্রোফেজের বৈশিষ্ট্য– [সি. বোর্ড-১৬]
i. এটি অ্যান্টিজেন উপস্থাপক কোষ
ii. এটি ফ্যাগোসাইটোসিস সম্পন্ন কোষ
iii. এটি সাইটোকাইন নিঃসৃত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. ম্যাক্রোফেজ ও সহজাত মারণ কোষ মানবদেহের– [য. বোর্ড-১৬]
i. প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর ii. দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর
iii. তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

Scanned with CamScanner

৩২. অ্যান্টিবডি জীবাণুকে ধ্বংস করে–
i. দলবদ্ধকরণ করে ii. ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায়
iii. বিশ্লিষ্টকরণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ–
i. জীবাণুর জন্য ফাঁদ তৈরি করে
ii. ফ্যাগোসাইটোসিস ঘটায় iii. সতর্ক বার্তা প্রদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের পোলিও, ডিপথেরিয়া ও কলেরাসহ বেশ কিছু রোগের জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এই টিকার মাধ্যমে শিশুর দেহ বিশেষ একটি প্রতিরক্ষা স্তরকে সক্রিয় করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। [ব. বোর্ড-১৯]

৩৪. উদ্দীপকে বিশেষ স্তরটিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে কোনটি?
ক ম্যাক্রোফেজ খ NK Cell
গ লাইসোজাইম ঘ B -লিম্ফোসাইট

৩৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো–
i. সুপ্ত অনাক্রম্যতাকে উদ্বুদ্ধ করা
ii. সুস্থ ও সবল বংশধর গঠনে সহায়তা করা
iii. শিশু মৃত্যুর হার কমানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জীববিজ্ঞান শিক্ষক ক্লাসে দেহের প্রতিরক্ষায় রক্তের ভূমিকা বোঝালেন।

৩৬. নিচের কোনটি উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট? [রা.বোর্ড-১৫]
ক প্লাজমা খ R.B.C গ W.B.C ঘ অনুচক্রিকা

৩৭. উদ্দীপকের আলোকে প্রতিরক্ষার উপায়গুলো হচ্ছে– [রা.বোর্ড-১৫]
i. জীবাণুকে সক্রিয় করে ii. জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে
iii. অ্যান্টিবডি তৈরি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

P	Q	রক্তের গ্রুপ
A	β	
B	α	
A.B	X	
X	α.β	

৩৮. উদ্দীপকের 'P' চিহ্নিত পদার্থটির অবস্থান কোথায়?
ক প্লাজমা মেমব্রেন খ লসিকায় গ সিরামে ঘ প্লাজমায়

৩৯. 'Q' চিহ্নিত পদার্থটি–
i. প্লাজমা কোষ হতে সৃষ্টি হয়
ii. প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে iii. পলিমার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪০. নিচের কোনটি মানুষের প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নয়? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক লোম খ লালা গ ইন্টারফেরন ঘ সিরুমেন

৪১. মানব দেহে সর্ব বৃহৎ অঙ্গ কোনটি? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক যকৃৎ খ ত্বক গ মস্তিষ্ক ঘ প্লীহা

৪২. ভাইরাসের আক্রমনে শরীরের ভিতরে স্বতঃস্ফুর্তভাবে নিচের কোনটি তৈরি হয়? [ডেন্টাল : ১৭-১৮]
ক এন্টিবডি খ ইন্টারফেরন গ নিউট্রোফিল ঘ মনোসাইট

৪৩. ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে অ্যান্টিবডিকে সহায়তা করে কোনটি? [মেডিকেল : ১৫-১৬]
ক ইন্টারফেরন খ ভ্যাক্সিন
গ কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম ঘ অনুচক্রিকা

৪৪. ইন্টারফেরনের কাজ নয় কোনটি? [ডেন্টাল : ০৬ -০৭]
ক অনাক্রমতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা
খ অ্যান্টিবডি উৎপাদনে বাধা দেওয়া
গ হরমোন উৎপাদনে সাহায্য করা
ঘ NK কোষের ক্ষমতা ও বংশবৃদ্ধি করা

৪৫. নিচের কোনটি সহজাত প্রতিরক্ষার উদাহরণ নয়? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক প্রজাতিগত প্রতিরক্ষা খ গোষ্ঠীগত প্রতিরক্ষা
গ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষণ ঘ সক্রিয়া প্রতিরক্ষা

৪৬. বুকের দুধে কোন ধরনের ইমিউনোগ্লোবিউলিন থাকে (Ig)? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক IgE খ IgM গ IgG ঘ IgA

৪৭. নিষ্ক্রিয় ভ্যাক্সিন কোনটি? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক পোলিও ভ্যাক্সিন
খ টিটেনাস ভ্যাক্সিন
গ হেপাটাইটিস ই ভ্যাক্সিন
ঘ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ভ্যাক্সিন

৪৮. জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক কে আবিস্কার করেন? [মেডিকেল : ১৪-১৫]
ক এডওয়ার্ড জেনার খ লুইপাস্তুর
গ ইবনে সিনা ঘ আলেকজেন্ডার ফ্লেমিং

উত্তরমালা

১.(ক); ২.(খ); ৩.(ক); ৪.(গ); ৫.(ঘ); ৬.(গ); ৭.(ক); ৮.(খ); ৯.(ক); ১০.(ঘ); ১১.(ক); ১২.(ক); ১৩.(ক); ১৪.(ঘ); ১৫.(ক); ১৬.(গ); ১৭.(খ); ১৮.(গ); ১৯.(ক); ২০.(ক); ২১.(গ); ২২.(ক); ২৩.(ঘ); ২৪.(ক); ২৫.(খ); ২৬.(খ); ২৭.(ক); ২৮.(গ); ২৯.(ক); ৩০.(ক); ৩১.(খ); ৩২.(খ); ৩৩.(গ); ৩৪.(ঘ); ৩৫.(ঘ); ৩৬.(গ); ৩৭.(গ); ৩৮.(ক); ৩৯.(ক); ৪০.(গ); ৪১.(খ); ৪২.(খ); ৪৩.(গ); ৪৪.(গ); ৪৫.(ঘ); ৪৬.(ঘ); ৪৭.(ক); ৪৮.(খ)।

Scanned with CamScanner

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. Immunity কাকে বলে? [সি.বোর্ড-১৬]
২. Immunology কী?
৩. ইমিউনতন্ত্র কী? [ঢা.বো-১৭,সি.বো-১৬]
৪. ফ্যাগোসাইটোসিস কী?
৫. ফ্যাগোজোম কী? [কু. বোর্ড-১৯]
৬. ম্যাক্রোফেজ কী?
৭. প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ কী?
৮. লিম্ফয়েড অঙ্গ কী?
৯. NK cell কী?
১০. কুফার কোষ কী?
১১. মাস্ট কোষ কী?
১২. সাইটোকাইনস কী?
১৩. কেমোট্যাক্সিস বা রসায়ন গতি কী?
১৪. ইন্টারফেরন কী? [সকল বোর্ড-১৮]
১৫. লাইসোজাইম কী?
১৬. প্রদাহ প্রতিক্রিয়া কী?
১৭. কোষীয় অনাক্রম্যতা কী?
১৮. হিউমোরাল ইমিউনিটি কী?
১৯. সহজাত অনাক্রম্যতা কী?
২০. অর্জিত অনাক্রম্যতা কী?
২১. লিম্ফোসাইট কী?
২২. স্টেমকোষ কী?
২৩. অ্যান্টিজেন কাকে বলে? [রা.,চ.,য.,ব.বোর্ড-১৭, রা.বোর্ড-১৬]
২৪. অ্যান্টিবডি কী? [চ.বোর্ড-১৬]
২৫. অ্যাগ্লুটিনেশন কী?
২৬. মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি কী?
২৭. পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি কী?
২৮. প্যাথোজেন কী?
২৯. ইমিউনোগ্লোবিউলিন কী?
৩০. এপিটোপ বা অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিন্যান্ট বা নির্ধারক কী?
৩১. প্যারাটোপ কী?
৩২. ইমিউনাইজেশন কী?
৩৩. টিকা বা ভ্যাকসিন কী? [ঢা. বোর্ড.-১৯; য.বোর্ড-১৬]
৩৪. ভ্যাক্সিনেশন কী?
৩৫. অপসোনিন কী?
৩৬. অপসোনাইজেশন কী?
৩৭. মেমোরি কোষ বা স্মৃতি কোষ কী? [রা.বোর্ড-১৬]
৩৮. আত্ম-রোগজীবাণুনাশকঅঙ্গ কোনটি?
৩৯. সেরুমেন কী?
৪০. সিবেসাস গ্রন্থি কী? [চ. বোর্ড-১৯]

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. সাধারণপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা অনির্দেশিত অনাক্রম্যতা বলতে কী বুঝ?
২. সুনির্দিষ্ট বা নির্দেশিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা নির্দেশিত অনাক্রম্যতা বলতে কী বুঝ?
৩. ইমিউনিটি বলতে কী বোঝ? [য. বোর্ড-১৭]
৪. ইমিউনিটির প্রধান উদ্দেশ্য লিখ।
৫. প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা লিখ।
৬. ঘর্মাক্ত মানুষ কীভাবে অনাক্রম্য হয়?
৭. ম্যাক্রোফেজের ভূমিকা লিখ।
৮. নিউট্রোফিলসের ভূমিকা লিখ।
৯. ফ্যাগোসাইট কোষের কার্যপদ্ধতি লিখ।
১০. T-লিম্ফোসাইট বলতে কী বুঝ?
১১. লিম্ফোসাইটকে স্মৃতি কোষ বলা হয় কেন? [কু.বোর্ড-১৬]
১২. অ্যান্টিবডি বলতে কী বুঝ? [ব.বোর্ড-১৬]
১৩. রোগ প্রতিরোধ বলতে কী বুঝ? [য. বোর্ড-১৬]
১৪. সহজাত প্রতিরক্ষা অর্জিত প্রতিরক্ষা হতে আলাদা কেন?
১৫. B-লিম্ফোসাইট বলতে কী বুঝ?
১৬. কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বলতে কী বুঝ?
১৭. ইন্টারফেরন অনাক্রম্যতা বলতে কী বুঝ?
১৮. অ্যান্টিজেনের প্রকারভেদ ও ধর্ম লিখ।
১৯. অ্যান্টিবডির গঠন লিখ।
২০. অ্যান্টিবডির প্রকারভেদে নাম ও কাজ লিখ।
২১. অ্যান্টিবডি প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ কেন?
২২. টিকার ভূমিকা লিখ।
২৩. মেমোরি কোষ বলতে কী বোঝ? [রা.বোর্ড-১৬]
২৪. ভ্যাকসিনে বুস্টার ডোজ দেওয়া হয় কেন? [কু. বোর্ড-১৯]
২৫. কোনো কোনো রোগ জীবনে দ্বিতীয় বার ঘটে না কেন?
২৬. নন-স্পেসিফিক স্তর বলতে কী বুঝ? [চ. বোর্ড-১৯]
২৭. **পার্থক্য লিখ/তুলনা কর :** ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল, T-লিম্ফোসাইট ও B-লিম্ফোসাইট, কোষভিত্তিক ও রসভিত্তিক অনাক্রমাত্য, বিভিন্ন প্রকার অনাক্রম্যতার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য, সহজাত ও অর্জিত অনাক্রম্যতা, সক্রিয় অনাক্রম্যতা ও নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা, বিভিন্ন প্রকার ইমিউনোগ্লোবিউলিনের বা অ্যান্টিবডির মধ্যে তুলনা, অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি [ঢা.বোর্ড-১৯], অ্যান্টিবডি ও ইন্টারফেরন।

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। দেহ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে ত্বক সর্বপ্রথম তাকে প্রতিহত করে। ত্বক পরাস্ত হলে একটি বিশেষ রক্ত কণিকা জীবাণুকে ভক্ষণ করে। [ঢা. বো.-২০১৯]

ক. টিকা কী?
খ. এন্টিজেন ও এন্টিবডির মধ্যে পার্থক্য কর।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কণিকার ভক্ষণ কৌশল বর্ণনা কর।
ঘ. প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষায় উদ্দীপকের অঙ্গটি ছাড়া অন্য উপায় আছে কী? বিশ্লেষণ কর।

২। আমাদের দেহ ত্বক দ্বারা আবৃত। ভৌত প্রতিবান্ধব হিসেবে এটি যেমন অনাক্রম্যতায় অংশ গ্রহণ করে তেমনি লিম্ফোসাইট রস ক্ষরণের মাধ্যমে অনাক্রম্যতায় অংশ নেয়। [কু. বো.-২০১৯]

ক. ফ্যাগোজোম কী?
খ. ভ্যাক্সিনে বুস্টার ডোজ দেয়া হয় কেন?
গ. প্রতিরক্ষায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আবরণটির ভূমিকা লিখ।
ঘ উল্লিখিত ক্ষরিত রসের কার্যকলাপ কি স্পেসিফিক?

Scanned with CamScanner

৩। ফারিনের হাত আপেল কাটতে গিয়ে কেটে গেল। এর ফলে সেখান থেকে লাল তরল পদার্থ বের হলো। এতে এক ধরনের Y আকৃতির জৈব রাসায়নিক পদার্থ আছে যা তার দেহের রোগ প্রতিরোধ করে।

ক. ইন্টারফেরন কী? *[সকল বোর্ড-২০১৮]*

খ. ম্যাক্রোফেজের ভূমিকা লিখ।

গ. উদ্দীপকে ফারিনের লাল তরল পদার্থ বন্ধ হওয়ার কৌশল ব্যাখ্যা কর। *[সকল বোর্ড-২০১৮]*

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগ প্রতিরোধী উপাদানের কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ কর। *[সকল বোর্ড-২০১৮]*

৪। নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র : A চিত্র : B *[ঢা. বো.-২০১৭]*

ক. ইমিউনতন্ত্র কী?

খ. অর্জিত প্রতিরক্ষা বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' চিত্রটি যে প্রতিরক্ষা স্তর নির্দেশ করে সেই স্তরের বর্ণনা দাও।

ঘ. 'B' চিত্রটি মানবদেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কীভাবে ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ কর।

৫। শিক্ষক ক্লাসে বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণ হতে দেহ রক্ষায় ধারণা দিতে গিয়ে বললেন, দেহের বাইরের বিশেষ কিছু অঙ্গ এই ব্যবস্থায় প্রাথমিক ভূমিকা রাখে। *[রা.,য. বো.-২০১৭]*

ক. অ্যান্টিজেন কী?

খ. ইমিউনিটি বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ধারণার শ্রেণিবিন্যাস কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিশেষ অঙ্গের ভূমিকার সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

৬। শিক্ষক মানবদেহের প্রতিরক্ষা নিয়ে আলোচনায় বললেন– আমাদের দেহে নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা স্তরে ই-লিম্ফোসাইট থেকে এক ধরনের প্রোটিন অণু উৎপন্ন হয় যা অনুপ্রবেশকারী বস্তু বা অণুজীবকে ধ্বংস করে। দেহ প্রতিরক্ষায় উক্ত প্রোটিন অণু বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ক. মেমোরি কোষ কাকে বলে?

খ. নিউট্রোফিলকে ফ্যাগোসাইট বলা হয় কেন? *[কু. বোর্ড-২০১৭]*

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রোটিন অণুর চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর। *[কু. বোর্ড-২০১৭]*

ঘ. দেহ প্রতিরক্ষায় উদ্দীপকে উল্লিখিত অণু কীভাবে অণুজীব ধ্বংস করে– তা বিশ্লেষণ কর। *[কু. বোর্ড-২০১৭]*

৭। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. টিকা বা ভ্যাকসিন কী?

খ. সহজাত প্রতিরক্ষা অর্জিত প্রতিরক্ষা থেকে আলাদা কেন?

গ. উদ্দীপকের গঠনটি কীভাবে অণুজীবের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হয়– ব্যাখ্যা কর। *[ব. বো.-২০১৭]*

ঘ. স্মৃতিকোষ উদ্দীপকের গঠনটিকে আরও ক্রিয়াশীল হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে– সপক্ষে যুক্তি দেখাও। *[ব. বো.-২০১৭]*

৮। জীবমণ্ডল থেকে বহু জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু অধিকাংশ জীবাণু ত্বক বা পরিপাকনালির মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এছাড়া দেহে বিশেষ কিছু কোষ দ্বারা প্রোটিন জাতীয় পদার্থ উৎপাদনের মাধ্যমে জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়।

ক. অ্যান্টিজেন কী? *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*

খ. T লিম্ফোসাইট বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিসমূহের মধ্যে যে কোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'প্রোটিন জাতীয় পদার্থ' জীবাণু ধ্বংসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*

৯। জন্মের পর বিভিন্ন রোগের টিকার জন্য যেমন আমাদের দেহে এক ধরনের অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয়; তেমনি জন্মের সময়ও আমাদের দেহে প্রাকৃতিকভাবে এক ধরনের অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয়।

ক. NK Cell কী?

খ. রোগ প্রতিরোধ বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা সৃষ্টিকারী পদার্থটির গঠন বর্ণনা কর। *[সিলেট বোর্ড ২০১৭]*

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনাক্রম্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। *[সিলেট বোর্ড ২০১৭]*

১০। ডাক্তার সাহেব রোগীদের বললেন যে, দেহে প্রবেশ করা জীবাণুগুলোর বিরুদ্ধে দুইভাবে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। যার একটি জন্মগত এবং অপরটি অর্জিত। এই দুই ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থাই হলো ইমিউনতন্ত্র।

ক. সেরুমেন কী?

খ. মেমোরি কোষ বলতে কী বুঝ? *[রা. বো. '১৬]*

গ. উদ্দীপকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুটির ভিন্নতা তুলে ধর। *[রা. বো. '১৬]*

ঘ. মানুষের বেঁচে থাকার জন্য উদ্দীপকের তন্ত্রটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। *[রা. বো. '১৬]*

১১। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি কী?

খ. ইন্টারফেরন অনাক্রম্যতা বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের গঠনটি বর্ণনা কর। *[চ. বো. '১৫]*

ঘ. ভ্যাক্সিন প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দীপকের গঠনটি তৈরি করে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব –উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। *[চ. বো. '১৫]*

Scanned with CamScanner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়
মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

ঐতিহ্যে ৫১ বছর
কাজল প্রাদার্স লিমিটেড

Scanned with CamScanner

জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন
GENETICS AND EVOLUTION

অধ্যায় ১১

জীবের অন্যতম সহজাত ধর্ম হলো জনন। যার সাহায্যে জীব তার অপত্য সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। জননের মাধ্যমে সৃষ্ট অপত্য জীবে তার পিতামাতা বা জনিতৃ জীবের বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার আকার, আকৃতি, চেহারা, দেহের গঠন-প্রকৃতি, শারীরবৃত্ত, আচরণ ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে **বংশগতি** বা **উত্তরাধিকার** (heredity or inheritance) বলে। অপত্য জীবে পিতামাতার কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেলেও কখনই পিতামাতার মতো হুবহু সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ হলো **প্রকরণ** বা **বিভেদ** (variation)। প্রকরণের কারণেই একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে কিংবা একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। জীবের নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে বংশগতি ও প্রকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ঘটনা বিবর্তন বা অভিব্যক্তির (evolution) সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ অধ্যায়ে জীবের জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।



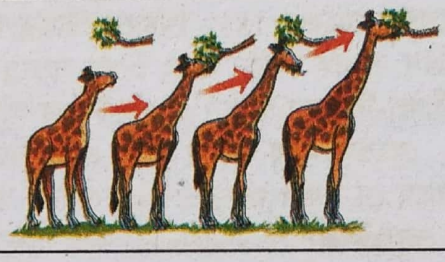

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ১৫)
১. মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স সূত্রাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স ○ মেন্ডেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র।
২. ইনহেরিট্যান্স-এর ক্রোমোজোম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● ইনহেরিট্যান্স এর ক্রোমোজোম তত্ত্ব
৩. মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মেন্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম ○ অসম্পূর্ণ প্রকটতা, ○ সমপ্রকটতা ○ লিথাল জিন, ○ পরিপূরকজিন, ○ এপিস্ট্যাসিস
৪. পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্টস
৫. লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● লিঙ্গ নির্ধারণ (XX-XY-, XX-XO) নীতি
৬. সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার-এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার- ○ বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া
৭. রক্তের বংশগতিজনিত সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● ABO রক্তগ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা ○ রক্ত সঞ্চালনে জটিলতা ○ গর্ভধারণজনিত জটিলতা
৮. বিবর্তনতত্ত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● বিবর্তনতত্ত্বের ধারণা ● বিবর্তনের মতবাদ ○ ল্যামার্কিজম, ○ ডারউইনিজম, ○ নব্য ডারউইনবাদ
৯. বিবর্তনের মতবাদসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবে।	
১০. বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● বিবর্তনের প্রমাণাদি
১১. প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিবর্তনের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।	

Scanned with CamScanner

মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স (Mendelian Inheritance)

জিন ও জিনতত্ত্ব (Gene and Genetics)

চরিত্র নির্ধারক যে সত্তা বংশগতির ভিত্তি তৈরি করে তাকে আমরা বলি **জিন** (Gene)। **W.L Johansen** (1909) এই সত্তাকে জিন নামে অভিহিত করেন। **William Bateson** (1905) Genetics কথাটি প্রবর্তন করেন। গ্রিক *genesis* শব্দ হতে Genetics এর উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ হলো প্রকাশ পাওয়া (to become) বা উদ্ভূত হওয়া (to grow into)। তাই জিনতত্ত্বের একটি সার্বিক সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয় 'জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জিনের গঠন, কার্যপদ্ধতি ও তার বংশানুক্রমিক পদ্ধতি ও ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে **বংশগতিবিদ্যা** বা **জিনতত্ত্ব** (Genetics) বা **সুপ্রজননবিদ্যা** বা **কৌলিতত্ত্ব** বলে'। এই বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর যিনি স্থাপন করেছেন তিনি হলেন **গ্রেগর জোহান মেন্ডেল** (Gregor Johann Mendel, 1822-1884)।

মেন্ডেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী (Short life history of Mendel)

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (22 July, 1822) অস্ট্রিয়ায় এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের কারণে যৌবনে তিনি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত ও কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করেন। 1840 খ্রিস্টাব্দে তিনি Gymnasium থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। 1843 খ্রিষ্টাব্দে **অস্ট্রিয়ার ব্রুন** শহরে এক সন্ন্যাস আশ্রমে তিনি শিক্ষানবিশ হিসেবে ভর্তি হন এবং গ্রেগর উপাধিতে ভূষিত হন।

অতঃপর প্রকৃতিবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য তাঁকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে সন্তোষজনক ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হন। 1854 খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্রুনে ফিরে আসেন এবং বিকল্প বিজ্ঞান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। মেন্ডেল 1857 খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন জাতের **মটরশুঁটি** (Pea, *Pisum sativum*) উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন এবং গির্জা সংলগ্ন বাগানে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং দুটি সূত্র আবিষ্কার করেন।


Gregor Johann Mendel
(1822-1884)

মেন্ডেল মটর গাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জীবের বংশগতির কোষীয় পদ্ধতি বিষয়ে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রণয়ন করেন সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে **মেন্ডেলবাদ** বা **মেন্ডেলিজম** (mendelism) বলে। মেন্ডেলের বংশগতির তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জিনতত্ত্ব বা সুপ্রজননবিদ্যা হলো **মেন্ডেলীয় সুপ্রজননবিদ্যা** বা **ট্রান্সমিশন জেনেটিক্স** (Mendelian or Transmission Genetics)। 1866 খ্রিষ্টাব্দে মেন্ডেল প্রকাশিত বংশগতি নির্ধারক সূত্রাবলি বংশগতি বিজ্ঞানের সূচনা করে।

বাগানের মিষ্টি মটরশুঁটি গাছের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তার আবিষ্কৃত মৌলিক সূত্রগুলো **'Journal of Natural History Society'** পত্রিকায় 1866 খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও তদানীন্তনকালের বিজ্ঞানীরা তাঁর আবিষ্কারকে কোনো গুরুত্ব দেননি। ফলে প্রায় ৩৪ বছর মেন্ডেলের বংশগতিসংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা গুরুত্ব পায়নি। মেন্ডেল 1884 খ্রিস্টাব্দে 5 January মৃত্যুবরণ করেন।

মেন্ডেল মারা যাওয়ার ১৬ বছর পরে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে নেদারল্যান্ডসের উদ্ভিদবিজ্ঞানী **হিউগো দ্য ভ্রিস** (Hugo de Vries, 1848-1935), জার্মানির উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক **কার্ল কোরেন্স** (Carl Correns, 1864-1933) ও অস্ট্রিয়ার কৃষিবিজ্ঞানী **এরিখ ভন চেরম্যার্ক** (Erich von Tschermak, 1871-1962) পৃথকভাবে গবেষণা করে মেন্ডেল বর্ণিত বংশগতির সূত্রগুলোর সত্যতা উপলব্ধি করেন। তাঁদের গবেষণা যেন মেন্ডেলের আবিষ্কারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটালো। এ কারণে হিউগো দ্য ভ্রিস, কার্ল কোরেন্স ও এরিখ ভন চেরম্যাকের আবিষ্কারকে **মেন্ডেলের পুনরাবিষ্কার** (Redicovery of Mendel) বলে। অতঃপর 1901 খ্রিষ্টাব্দে মেন্ডেলের মূল গবেষণাপত্রটি **'Flora'** জার্নালে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

এরপর মেন্ডেলের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলো বিশেষ গুরুত্ব পায় ও ক্রমে ক্রমে বংশগতি বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়। মেন্ডেলের অবদানে বংশগতি বিজ্ঞান দিগন্তে প্রসারিত হওয়ায় তাঁকে **বংশগতিবিদ্যার জনক** (Father of Genetics) বলা হয়।

জিনতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Genetics)

১। উন্নত প্রজন্ম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের জন্য মানুষ বংশগতিবিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছে।

২। বর্তমানে উদ্যানবিদ্যা, প্রাণী-সংরক্ষণ প্রকল্প এবং কৃষিকাজে বংশগতিবিদ্যা বিপ্লব সাধন করেছে।

Scanned with CamScanner

৩। মানুষের ক্ষেত্রেও বংশগতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বংশগতিবিদ্যা অনেকাংশে সাহায্য করেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

৪। বংশগতি সম্বন্ধে যেসব অলীক ও ভ্রান্ত ধারণা এতকাল মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার অবসান সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে **জিন প্রযুক্তিবিদ্যা** (Genetic engineering) মানুষের একাধিক সমস্যা সমাধানে হাতিয়ার রূপে কাজ করবে।

মানব কল্যাণে জিনতত্ত্বের ভূমিকা (Roles of Genetics in Human Welfare)

জিনতত্ত্ব জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক ও প্রয়োগিক শাখা। মানব কল্যাণে এর গুরুত্ব অনেক। যেমন–

১। জীবদেহে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ পদ্ধতি, প্রকরণ ও বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জিনতত্ত্বের মাধ্যমে জানা যায়।

২। জিনতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োগ করে হাইব্রিডাইজেশন (hybridization) পদ্ধতিতে অধিক ফলনশীল উদ্ভিদ ও উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু ও মাছ সৃষ্টি করা যায়।

৩। জিনতত্ত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল রোগ যেমন– বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, অ্যালবিনিজম ইত্যাদির প্রকৃত কারণ জানা ও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

৪। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধক্ষম ফসলের জাত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

৫। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মানুষের জীবনরক্ষাকারী ওষুধ, ভ্যাকসিন, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়।

৬। অপরাধী শনাক্তকরণ ও পিতৃমাতৃ সম্পর্ক যাচাইয়ের জন্য জিন প্রযুক্তির ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়।

৭। জিনতত্ত্বের জ্ঞানের আলোকে উচ্চশ্রেণির প্রাণীর ডিপ্লয়েড দেহকোষ থেকে ক্লোনিং পদ্ধতিতে প্রাণী সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

বংশগতিসংক্রান্ত কতগুলো পরিভাষা (Several Terminology of Heredity)

১। **জিন বা ফ্যাক্টর** (Gene or Factor) : জিন হলো জীবকোষে বিদ্যমান বংশগতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী মৌলিক, ভৌত ও কার্যিক একক যা বংশ থেকে বংশান্তরে স্থানান্তরিত হয়। সংক্ষেপে, একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির নির্দেশ প্রদানকারী DNA-এর অংশবিশেষই জিন। মেন্ডেল এদেরকে ফ্যাক্টর (factor) নামকরণ করেছিলেন।

২। **লোকাস** (Locus) : হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের যে অবস্থানে বা বিন্দুতে জিন অবস্থান করে, ওই অবস্থানকে বা বিন্দুকে ওই জিনের লোকাস বা **জিন লোকাস** বলে।

৩। **হোমোলোগাস ক্রোমোজোম** : একই আকৃতি ও একই জিনের সজ্জারীতি সম্পন্ন দুটি ক্রোমোজোম যাদের একটি পিতা ও অন্যটি মাতা হতে আগত তাদের হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোজোম বলে।

৪। **অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ** (Allele/Allelomorph) : হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত এক জোড়া জিন যদি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে তাদের পরস্পরের অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ বলে। অ্যালিলদ্বয় একইধর্মী (যেমন– TT) অথবা একে অপরের বিপরীতধর্মী (যেমন– Tt) হতে পারে। অনেকের মতে, জিনদ্বয়ের একত্রে থাকার অবস্থাকে অ্যালিলোমর্ফ বলে।

৫। **নন-অ্যালিল** (Non-alleles) : পৃথক জিন লোকাস বা লোকাসে (বহুবচনে-লোসাই) অবস্থিত জিন বা ফ্যাক্টর বা অ্যালিল সমূহকে নন-অ্যালিল বলে।

৬। **হোমোজাইগাস** (Homozygous) : কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন দুটি (অ্যালিল) সমপ্রকৃতির হলে সে বৈশিষ্ট্যের জন্য ওই জীবকে হোমোজাইগাস বা বিশুদ্ধ বলে। যেমন– মটরশুঁটি গাছের লম্বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী দুটি জিনই যদি TT হয় তবে ওই বৈশিষ্ট্যের জন্য ওই জীবকে হোমোজাইগাস লম্বা বলা হয়।

৭। **হেটারোজাইগাস** (Heterozygous) : কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন দুটি অসম প্রকৃতির হলে সে বৈশিষ্ট্যের জন্য ওই জীবকে হেটারোজাইগাস বলে। মেন্ডেলের সূত্রানুসারে হেটারোজাইগাস অবস্থায় কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় কিন্তু প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত থাকে। যেমন, Tt লম্বা বৈশিষ্ট্যের জন্য হেটারোজাইগাস।

৮। **হেমিজাইগাস** (Hemizygous) : যদি কোনো জীবের কোনো বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে একটি মাত্র জিন থাকে তবে তাকে হেমিজাইগাস অবস্থা বলা হয়।

৯। **পানেট স্কয়ার** (Punnet square) : বংশগতির পরীক্ষা ও গবেষণা করার সময় ফলাফল রেকর্ড করার জন্য যে ছকের ব্যবহার করা হয় তাকে পানেট স্কয়ার বা **চেকার বোর্ড** বলে।

Scanned with CamScanner

১০। প্রকট বৈশিষ্ট্য (Dominant character) : এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটো জীবের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে যে বৈশিষ্ট্যটি বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন– হোমোজাইগাস লম্বা ও খাটো মটরশুঁটি গাছের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে (F_1) সব গাছ লম্বা হয়। এখানে লম্বা বৈশিষ্ট্যটি খাটো বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রকট।

১১। প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive character) : এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটো জীবের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে (F_1) যে বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন– হোমোজাইগাস লম্বা ও খাটো মটরশুঁটি গাছের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে (F_1) শুধুমাত্র লম্বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়; কিন্তু খাটো বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত থাকে। এখানে খাটো বৈশিষ্ট্যটি লম্বা বৈশিষ্ট্যের নিকট প্রচ্ছন্ন।

১২। ফিনোটাইপ (Phenotype) : জীবের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণই হলো তার ফিনোটাইপ। যেমন– মটরশুঁটি গাছ লম্বা বা খাটো হতে পারে যা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়; এ লম্বা বা খাটো বৈশিষ্ট্যই হলো তার ফিনোটাইপ।

১৩। জিনোটাইপ (Genotype) : কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন সমষ্টিকে ওই জীবের ওই বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ বলে। মেন্ডেলের মতে, জীবের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য এক জোড়া জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিককালে প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি বৈশিষ্ট্য একাধিক জোড়া জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যেমন– মটরশুঁটি গাছের খাটো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন হলো t। সুতরাং বিশুদ্ধ মটরশুঁটি গাছের খাটো বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ হলো tt।

১৪। চরিত্র বা ট্রেইট (Trait) : দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যকে একত্রে একটি চরিত্র বা ট্রেইট বলা হয়। চরিত্র বংশগতভাবে সঞ্চারিত হয়। যেমন- মটর গাছের কাণ্ড লম্বা হওয়া ও খাটো হওয়া বৈশিষ্ট্য দুটি কাণ্ডের দৈর্ঘ্য চরিত্রটির অন্তর্গত।

১৫। একসংকর বা মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid cross) : এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যকার ক্রস হলো **একসংকর ক্রস** বা **মনোহাইব্রিড ক্রস**। যেমন– লম্বা ও খাটো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি মটরশুঁটি গাছের মধ্যকার ক্রস হলো মনোহাইব্রিড ক্রস।

১৬। দ্বিসংকর বা ডাইহাইব্রিড ক্রস (Dihybrid cross) : দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যকার ক্রস হলো **দ্বিসংকর ক্রস** বা **ডাইহাইব্রিড ক্রস** । যেমন– গোলাকার ও হলুদ বর্ণের বীজ বিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সাথে কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজ উৎপাদনকারী মটরশুঁটি গাছের মধ্যকার ক্রস হলো ডাইহাইব্রিড ক্রস।

১৭। সংকর জীব (Hybrid) : দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিশুদ্ধ জীবের মধ্যে প্রজননে সৃষ্ট সন্তানদের সংকর জীব বলে। অথবা দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মিলনের ফলে মিশ্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত যে জীবের সৃষ্টি হয় তাকে সংকর বা সংকর জীব বলে। সংকর জীব সর্বদা হেটারোজাইগাস প্রকৃতির। বিশুদ্ধ বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জীবদের সংকরায়ণে সৃষ্ট প্রথম সন্তানদের F_1 জনু বা **প্রথম সংকর পুরুষ** (First filial generation) বলে। F_1 জনুর সংকর জীবদের মধ্যে অন্তঃপ্রজননে সৃষ্ট জীবদের F_2 জনু বা **দ্বিতীয় সংকর পুরুষ** (Second filial generation) বলে।

১৮। জনিতৃ জনু বা P জনু (Parental generation or P generation) : একসংকর বা দ্বিসংকর জনন পরীক্ষার শুরুতে যে দুটি জীবের মধ্যে প্রজনন ঘটানো হয়, তাদের জনিতৃ জনু বা P জনু বলে।

১৯। সংকরায়ণ (Hybridization) : সাধারণভাবে কোনো চরিত্র সাপেক্ষে বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুটি জীবের মিলনকে সংকরায়ণ বলে। একটি চরিত্রের জন্য বিপরীতধর্মী দুটি জীবের মিলনকে একসংকরায়ণ বলে। আবার দুটি চরিত্রের জন্য বিপরীতধর্মী দুটি জীবের মিলনকে দ্বিসংকরায়ণ বলা হয়।

২০। ক্রস (Cross) : বিপরীত লিঙ্গধারী দুটি জীবের মিলনকে ক্রস বলে।

২১। ব্যাক ক্রস (Back cross) : অপত্য বংশের জীবের সাথে পিতামাতার যেকোনো বৈশিষ্ট্যের ক্রসকে ব্যাক ক্রস বলা হয়। যেমন- $Tt \times TT$ অথবা $Tt \times tt$।

২২। টেস্ট ক্রস (Test cross) : অপত্য বংশের জীবের সাথে (F_1 বা F_2 বা F_3 ইত্যাদি) তার প্রচ্ছন্ন পিতামাতার ক্রসকে টেস্ট ক্রস বলে। যেমন– $Tt \times tt$। কোনো জীব হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য এ পরীক্ষা করা হয়।

২৩। জিনোম (Genome) : কোনো প্রজাতির জীবের এক সেট হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোজোমে বিদ্যমান জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে। অথবা ডিপ্লয়েড জীবের হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সেটে যেসব জিন থাকে তাদের একত্রে জিনোম বলা হয়। অথবা জীবের একটি জননকোষের ক্রোমোজোমে বিদ্যমান জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে।

২৪। সেক্স ক্রোমোজোম (Sex chromosome) : যেসব ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে অর্থাৎ জীবের পুরুষ কিংবা স্ত্রী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের সেক্স ক্রোমোজোম বলে। যেমন– মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে মাত্র এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম। এদের X ও Y দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মানুষের কোন জাইগোটে (ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে সৃষ্ট ভ্রূণকোষ) XY থাকলে পুত্র সন্তান এবং XX থাকলে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়।

২৫। অটোজোম (Autosome) : যেসব ক্রোমোজোম জীবের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তাদের অটোজোম বলে। যেমন, মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে ২২ জোড়াই অটোজোম। এদের A দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Scanned with CamScanner

মেন্ডেলের পরীক্ষা (Experiment of Mendel)

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল মটর গাছের ৭ জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করে তার ভিত্তিতে বংশগতি সম্পর্কিত একসংকর ও দ্বিসংকর প্রজনন পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করেন। সেইসব পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি যথাক্রমে **পৃথকীকরণের সূত্র** (Law of Segregation) ও **স্বাধীন বিন্যাস** বা **স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র** (Law of Independent Assortment) প্রণয়ন করেন। এ সূত্র দুটি বর্তমানে **মেন্ডেলের বংশগতির সূত্র** (Mendel's Law of Heredity) নামে পরিচিত।

মেন্ডেলের মটরশুঁটি গাছ নির্বাচনের কারণ

মেন্ডেল তাঁর বংশগতির পরীক্ষার জন্য বাগানের মিষ্টি মটরশুঁটি গাছে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য মটরশুঁটি উদ্ভিদকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১। মটরশুঁটি গাছ দ্রুত বংশবিস্তারে সক্ষম, তাই অল্প সময়ের মধ্যে বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব।
২। মটরশুঁটি গাছ সহজে বাগানে ও টবে চাষ করা যায়।
৩। মটরশুঁটি গাছে অনেক বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকে।
৪। মটরশুঁটি গাছ বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশুদ্ধ অপত্য উদ্ভিদ উৎপাদনে সক্ষম হয়।
৫। মটরশুঁটি গাছের ফুল উভলিঙ্গ হওয়ায় স্বপরাগযোগ ঘটে।
৬। মটরশুঁটি ফুল স্বপরাগী হওয়ায় বাইরের কোনো অবাঞ্ছিত চরিত্র মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
৭। এর আয়ুষ্কাল স্বল্প হওয়ায় খুব দ্রুত সংকরায়ণের ফল লাভ করা যায়।
৮। সংকর গাছগুলো পুরোপুরি জননে সক্ষম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

মেন্ডেলের গবেষণায় মটরশুঁটি গাছের সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য

চরিত্র (Characters)	বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য	
	প্রকট (Dominant)	প্রচ্ছন্ন (Recessive)
১. বীজের আকার (Seed shape)	 গোল (Round)	 কুঞ্চিত (Wrinkled)
২. বীজের রং (Seed colour)	 হলুদ (Yellow)	 সবুজ (Green)
৩. মটরশুঁটির আকার (Pod shape)	 স্ফীত (Inflated)	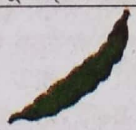 সংকুচিত (Constricted)
৪. কাঁচা মটরশুঁটির রং (Pod colour)	 সবুজ (Green)	 হলুদ (Yellow)
৫. ফুলের রং (Flower colour)	 বেগুনি (Violet)	 সাদা (White)
৬. ফুলের অবস্থান (Flower position)	 পার্শ্বস্থ (Axial)	 শীর্ষস্থ (Terminal)
৭. কাণ্ডের দৈর্ঘ্য (Length of stem)	 লম্বা (Tall)	 খাটো (Dwarf)

Scanned with CamScanner

মেন্ডেলের পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল

সংখ্যা	ক্রসের ধরন	প্রথম বংশধর (F_1 জন্য)	দ্বিতীয় বংশধর (F_2 জন্য)	প্রকৃত অনুপাত
১.	গোলাকার বীজ × কুঞ্চিত বীজ	গোলাকার বীজ	৫,৪৭৪ গোলাকার, ১৮৫০ কুঞ্চিত	২.৩৬ : ১
২.	হলুদ বীজপত্র × সবুজ বীজপত্র	হলুদ বীজপত্র	৬,০২২ গোলাকার, ২,০০১ সবুজ বীজপত্র	৩.০১ : ১
৩.	রঙিন বীজাবরণ × সাদা বীজাবরণ	রঙিন বীজাবরণ	৭০৫ রঙিন, ২২৪ সাদা	৩.১৫ : ১
৪.	স্ফীত ফল × খাঁজযুক্ত ফল	স্ফীত ফল	৮৮২ স্ফীত, ২২৯ খাঁজযুক্ত	২.৯৫ : ১
৫.	সবুজ ফল × হলুদ ফল	সবুজ ফল	৪২৮ সবুজ, ১৫২ হলুদ	২.৮২ : ১
৬.	কাক্ষিক পুষ্প × শীর্ষক পুষ্প	কাক্ষিক পুষ্প	৬৫১ কাক্ষিক, ২০৭ শীর্ষক	৩.১৪ : ১
৭.	দীর্ঘকাণ্ড × খাটো কাণ্ড	দীর্ঘকাণ্ড	৭৮৭ দীর্ঘকাণ্ড, ২৭৭ খাটো কাণ্ড	২.৮৪ : ১

মেন্ডেলের গবেষণায় সফলতার কারণ

মেন্ডেলের পূর্বে বংশগতি বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা সম্পাদিত হলেও মেন্ডেলই সর্বপ্রথম সাফল্য অর্জন করেন এবং বংশগতি বিষয়ক তত্ত্ব প্রবর্তনে সক্ষম হন। মেন্ডেলের উক্ত সাফল্য অর্জনের প্রধান কারণসমূহ হলো–

১। সৌভাগ্যক্রমে মেন্ডেলের পরীক্ষায় ব্যবহৃত উদ্ভিদগুলো ছিল বিশুদ্ধ অর্থাৎ হেমোজাইগাস।

২। সংকরায়ণের পূর্বে উদ্ভিদগুলোর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করেছিলেন।

৩। মেন্ডেল গবেষণা কাজে যেসব উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল বংশগতীয় গবেষণা কাজের জন্য অতি উত্তম ও আদর্শ।

৪। মেন্ডেলের নির্বাচিত মটরশুঁটি উদ্ভিদ একটি স্বনিষিক্ত বর্ষজীবী এবং প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই এর ফুলে পরাগমুক্তি ঘটায় কোনোরূপ পরপরাগায়িত না হয়ে স্বনিষেক ঘটে।

৫। তিনি বেশ কয়েক বছর যাবৎ একাধারে তাঁর ফলাফল বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

৬। তিনি স্বপরাগী ফুল, মটরশুঁটি গাছের বাইরের কোনো বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ না ঘটানোর জন্য পরীক্ষায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল।

৭। তিনি প্রথমে একজোড়া বৈসাদৃশ্য গুণসম্পন্ন লক্ষণ নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে দুই জোড়া লক্ষণ নিয়ে কাজ করেছিলেন।

৮। ধারণা করা হয়, মেন্ডেলের পূর্বসূরিরা একসাথে অনেকগুলো লক্ষণ নিয়ে গবেষণা করাতে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি।

৯। তিনি যে সাত জোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করেছিলেন তার প্রত্যেকটির জন্য দায়ী উপাদানটি অন্যটির উপর সম্পূর্ণরূপে প্রকট ছিল এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী উপাদানদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে অবস্থিত ছিল।

১০। মেন্ডেল তাঁর লব্ধ ফলাফলকে দুটি অর্থপূর্ণ গাণিতিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিলেন। এর পূর্বে কোনো বিজ্ঞানীই সংকরায়ণের ফলাফলের গাণিতিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেননি।

১১। মেন্ডেল অত্যন্ত সতর্কতা ও সততার সাথে পরীক্ষার ফলাফল রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন।

১২। গাণিতিক ও পরিসংখ্যানিক ভিত্তিতে মেন্ডেল তার ফলাফলের অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

১১.১ মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স সূত্রাবলি (Laws of Mendelian Inheritance)

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণের সূত্র (Law of Segregation)

মনোহাইব্রিড ক্রসে পিতামাতা থেকে আগত ফ্যাক্টর বা জিনগুলো মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং পরবর্তীতে জননকোষ বা গ্যামিট সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়।

একে **জননকোষ বিশুদ্ধতার সূত্র** (Law of Purity of Gametes) বা **মনোহাইব্রিড ক্রসের** (Law of Monohybrid Cross) **সূত্রও বলা হয়।**

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মেন্ডেল তাঁর সকল পরীক্ষার ক্ষেত্রেই মটরশুঁটি উদ্ভিদ নির্বাচন করেছিলেন। এ সূত্রটি আরও অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। এখানে মটরশুঁটি উদ্ভিদ দিয়ে সূত্রটি ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রথম সূত্র ব্যাখ্যা করার জন্য মেন্ডেল মটরশুঁটি উদ্ভিদের ওপর বেশ কয়েকটি পরীক্ষা পরিচালনা করেন। এসব পরীক্ষায় তিনি একসঙ্গে মাত্র এক জোড়া পরস্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ করেন। মেন্ডেল এ ধরনের এক পরীক্ষায় একটি **বিশুদ্ধ লম্বা** (TT) মটরশুঁটি গাছের সঙ্গে একটি **বিশুদ্ধ খাটো** (tt)

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মটরশুঁটি গাছের সংকরায়ণ ঘটান। এখানে উল্লেখ্য যে, লম্বা বৈশিষ্ট্যটি খাটো বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রকট। বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মটরশুঁটি গাছদ্বয়ের মধ্যে ক্রস বা প্রজনন ঘটানোর ফলে প্রথম অপত্য বংশে বা সংকর পুরুষে (F_1 জনু) যেসব গাছ উৎপন্ন হয়েছিল তার সবক'টিই ছিল **সংকর লম্বা বৈশিষ্ট্যের** (Tt)। F_1 জনুতে উৎপন্ন মটরশুঁটি গাছগুলোর মধ্যে স্বনিষেক ঘটিয়ে তিনি দ্বিতীয় সংকর পুরুষে (F_2 জনু) ৭৫% (৩ ভাগ) লম্বা বৈশিষ্ট্যের এবং ২৫% (১ ভাগ) খাটো বৈশিষ্ট্যের মটরশুঁটি গাছ পান। সুতরাং F_2 জনুর ফিনোটাইপ অনুপাত হয়। ৩ : ১ এবং জিনোটাইপ অনুপাত হয় ১ : ২ : ১ [বিশুদ্ধ লম্বা (TT) ২৫% ঃ সংকর লম্বা (Tt) ৫০% ঃ বিশুদ্ধ খাটো (tt) ২৫%]।

মনে করি, লম্বা বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টর বা জিন = T

∴ বিশুদ্ধ লম্বা মটরশুঁটি গাছের জিনোটাইপ = TT

আবার, খাটো বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টর বা জিন = t

∴ বিশুদ্ধ খাটো মটরশুঁটি গাছের জিনোটাইপ = tt

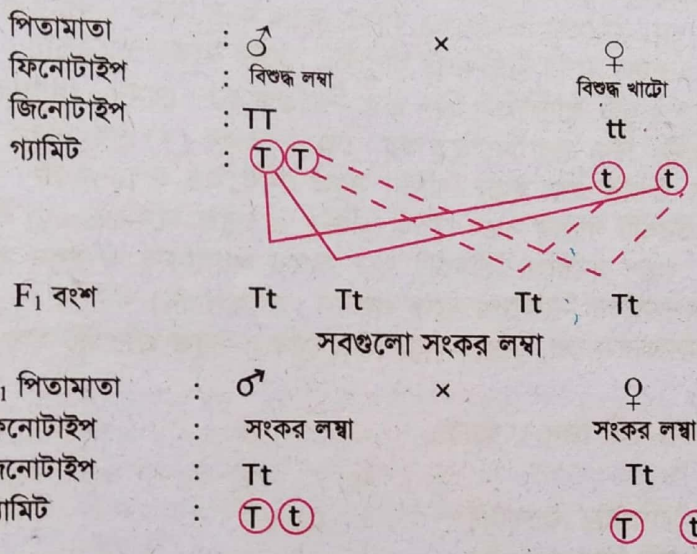

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	T	t
T	TT লম্বা	Tt লম্বা
t	Tt লম্বা	tt খাটো

নিচে ছকে মনোহাইব্রিড ক্রস-এ F_2 বংশধরে উদ্ভিদগুলোর ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক অনুপাত দেখানো হলো–

ফিনোটাইপ	জিনোটাইপ	জিনোটাইপিক অনুপাত	ফিনোটাইপিক অনুপাত
লম্বা	TT	১	৩
	Tt	২	
খাটো	t t	১	১

মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে ৭৫% লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট এবং ২৫% খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ অর্থাৎ লম্বা ও খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের ফিনোটাইপিক অনুপাত = ৩ : ১

এবং জিনোটাইপিক অনুপাত = T T : T t : t t = ১ : ২ : ১

F_2 বংশধরের জিনোটাইপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনটি বৈশিষ্ট্যধারী (লম্বা) গাছের মধ্যে মাত্র একটি বিশুদ্ধ লম্বা (TT), বাকি দুটি সংকর লম্বা (Tt)। যে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি F_1 বংশধরে চাপা পড়েছিল F_2 বংশধরে তার (tt) পুনরায় আবির্ভাব ঘটেছে।

Scanned with CamScanner

পৃথকীকরণের সূত্রের সীমাবদ্ধতা

১। একাধিক জিন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এ সূত্র সর্বাত্মকরূপে প্রযোজ্য নয়।
২। এপিস্ট্যাটিক জিন ও কমপ্লিমেন্টারি জিনের ক্ষেত্রে এ সূত্র সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নয়।
৩। একসঙ্গে কার্য সম্পন্নকারী জিনের ক্ষেত্রে এ সূত্র প্রয়োগ করা যায় না।

❑ **কাজ :** প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে প্রথম সূত্রের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর।
তথ্য : গিনিপিগ- কালো বর্ণ = B এবং বাদামি বর্ণ = b এবং কালো বৈশিষ্ট্যটি বাদামি বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রকট।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্র (Law of Independent Assortment)

দুই (বা ততোধিক) জোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে (F_1 জন) শুধু প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী সময় গ্যামিটগুলো জোড়া ভেঙে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়। একে **ডাইহাইব্রিড ক্রসের** (law of dihybrid cross) **সূত্রও বলা হয়।**

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মেন্ডেল দ্বিতীয় সূত্র ব্যাখ্যা করার জন্য বিশুদ্ধ গোলাকার ও হলুদ বর্ণের বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সঙ্গে কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সংকরায়ণ করেন।

মটরশুঁটি গাছের বীজের আকার দুটি অ্যালিলিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন– গোলাকার (R) এবং কুঞ্চিত (r)। আবার বীজের বর্ণ দুটি অ্যালিলিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন– হলুদ (Y) এবং সবুজ (y)। এখানে উল্লেখ্য যে, গোলাকার বৈশিষ্ট্যটি কুঞ্চিতের ওপরে এবং হলুদ বৈশিষ্ট্য সবুজ বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রকট। বিশুদ্ধ গোলাকার ও হলুদ বর্ণের (RRYY) বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সাথে বিশুদ্ধ কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের (rryy) বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সংকরায়ণ ঘটানো হলো। F_1 বংশে সবগুলো মটরশুঁটি গাছ সংকর গোলাকার ও হলুদ বর্ণের (RrYy) বীজবিশিষ্ট হলো। অতঃপর F_1 বংশের অপত্যদের নিজেদের মধ্যে প্রজনন (স্বপরাগায়ন) ঘটালে F_2 বংশে ৯:৩:৩:১ অনুপাতে যথাক্রমে গোলাকার-হলুদ, গোলাকার-সবুজ, কুঞ্চিত-হলুদ এবং কুঞ্চিত-সবুজ মটরশুঁটি গাছ পাওয়া গেল।

মনে করি,

গোলাকার বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন বা ফ্যাক্টর = R
হলুদ " " " " " " = Y
∴ বিশুদ্ধ গোলাকার-হলুদ বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ = RRYY
কুঞ্চিত বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন বা ফ্যাক্টর = r
সবুজ " " " " " " = y
∴ বিশুদ্ধ কুঞ্চিত-সবুজ বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ = rryy

বিশুদ্ধ গোলাকার এবং হলুদ বীজ উৎপাদনকারী মটরশুঁটি গাছের সাথে কুঞ্চিত ও সবুজ বীজ উৎপাদনকারী মটরশুঁটি গাছের সংকরায়ণ এবং এর ফলাফল নিচে দেওয়া হলো–

পিতামাতা : ♂ × ♀
ফিনোটাইপ : বিশুদ্ধ গোলাকার হলুদ — বিশুদ্ধ গোলাকার সবুজ
জিনোটাইপ : RRYY — rryy
গ্যামিট : (RY) (RY) — (ry) (ry)

F_1 বংশ : RrYy RrYy RrYy RrYy

সবগুলো সংকর গোলাকার হলুদ বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদ

F_1 পিতামাতা : ♂ × ♀
ফিনোটাইপ : সংকর গোলাকার হলুদ — সংকর গোলাকার হলুদ
জিনোটাইপ : RrYy — RrYy
গ্যামিট : (RY) (Ry) (rY) (ry) — (RY) (Ry) (rY) (ry)

Scanned with CamScanner

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	(RY)	(Ry)	(rY)	(ry)
(RY)	RRYY গোলাকার হলুদ	RRYy গোলাকার হলুদ	RrYY গোলাকার হলুদ	RrYy গোলাকার হলুদ
(Ry)	RRYy গোলাকার হলুদ	RRyy গোলাকার সবুজ	RrYy গোলাকার হলুদ	RrYY গোলাকার সবুজ
(rY)	RrYY গোলাকার হলুদ	RrYy গোলাকার হলুদ	rrYY কুঞ্চিত হলুদ	rrYy কুঞ্চিত হলুদ
(ry)	RrYy গোলাকার হলুদ	Rryy গোলাকার সবুজ	rrYy কুঞ্চিত হলুদ	rryy কুঞ্চিত সবুজ

নিচে ছকে F_2 বংশধরের ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক অনুপাত দেখানো হলো–

ফিনোটাইপ	জিনোটাইপ	জিনোটাইপিক অনুপাত	ফিনোটাইপিক অনুপাত
গোলাকার-হলুদ	RRYY	১	৯
	RrYY	২	
	RRYy	২	
	RrYy	৪	
গোলাকার-সবুজ	RRyy	১	৩
	Rryy	২	
কুঞ্চিত-হলুদ	rrYY	১	৩
	rrYy	২	
কুঞ্চিত-সবুজ	rryy	১	১

ফিনোটাইপিক অনুপাত = গোলাকার হলুদ : গোলাকার সবুজ : কুঞ্চিত হলুদ : কুঞ্চিত সবুজ =৯ : ৩ : ৩ : ১
এবং জিনোটাইপিক অনুপাত = ১ : ২ : ২ : ৪ : ১ : ২ : ১ : ২ : ১

উপরের পরীক্ষা থেকে মেন্ডেল দেখান যে, দুই জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে F_1 বংশে প্রকট বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গোলাকার-হলুদ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং F_2 বংশে গ্যামিটগুলো স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হওয়ার কারণে গোলাকার-হলুদ ও কুঞ্চিত-সবুজ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ ছাড়া আরও দুটি নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে। নতুন দুই জোড়া বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোলাকার-সবুজ ও কুঞ্চিত-হলুদ।

স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্রের সীমাবদ্ধতা

১। মেন্ডেল-পরবর্তী সময়কালে সাইটোজেনেটিক্স-এর নানাবিধ গবেষণা থেকে জানা যায় যে, স্বাধীন মিলন বা স্বাধীন বণ্টনের সূত্র তখনই প্রযোজ্য হয় যখন ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অ্যালিলগুলো পৃথক পৃথক হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে অবস্থান করে।

২। পৃথক বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী অ্যালিলগুলো একই হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়ার পৃথক লোকাসে অবস্থান করলে **লিংকেজের** (linkage; একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো মাতৃজনু থেকে অপত্য জনুতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় সেই ক্রোমোজোমে একই সঙ্গে অবস্থান করার প্রবণতা দেখায়, একে লিংকেজ বলে) কারণে অ্যালিলগুলো একত্রে একই গ্যামিটে সঞ্চারণের প্রবণতা দেখায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, **মেন্ডেল নির্বাচিত মটরশুঁটি গাছের সাত জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী অ্যালিলগুলো পৃথক ক্রোমোজোমে অবস্থিত ছিল।**

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র ও দ্বিতীয় সূত্রের মধ্যে পার্থক্য

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র	মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র
১। এটি পৃথকীকরণ সূত্র নামে পরিচিত।	১। এটি স্বাধীন সঞ্চারণের সূত্র নামে পরিচিত।
২। এটি মনোহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	২। এটি ডাই বা পলিহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৩। এক্ষেত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ ঃ ১।	৩। এক্ষেত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১।
৪। এক্ষেত্রে শুধু জিনের পৃথকীকরণ হয়।	৪। এক্ষেত্রে জিনের পৃথকীকরণ ছাড়াও জিনের স্বাধীন সঞ্চারণ হয়।
৫। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অপত্য বংশে শুধু প্যারেন্টাল টাইপের বংশধর উৎপন্ন হয়।	৫। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অপত্য বংশে শুধু প্যারেন্টাল ছাড়াও রিকম্বিনেন্ট টাইপের বংশধর উৎপন্ন হয়।
৬। প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্রকে অনুসরণ করে না।	৬। দ্বিতীয় সূত্র প্রথম সূত্রকে অনুসরণ করে।

❑ **কাজ :** (i) প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে দ্বিতীয় সূত্রের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর।
তথ্য : গিনিপিগ- কালো-খাটো = BS এবং বাদামি-লম্বা বর্ণ = bs এবং কালো-খাটো বৈশিষ্ট্যটি বাদামি-লম্বা বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রকট।
(ii) মেন্ডেলের ১ম সূত্র ও ২য় সূত্রের মধ্যে তুলনা লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর।

Scanned with CamScanner

সকল টেস্ট ক্রসই ব্যাক ক্রস কিন্তু সকল ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নয়

ব্যাক ক্রস (Back cross) : অপত্য বংশীয় (F_1 জনু) কোনো জীবের সঙ্গে জনিতৃ জনুর কোনো জীবের অথবা জনিতৃর সদৃশ জিনোটাইপযুক্ত কোনো জীবের সংকরায়ণের পদ্ধতিকে **ব্যাক ক্রস** (back cross) বলে। সংক্ষেপে, F_1 বংশের জীবের সঙ্গে পিতামাতার যেকোনো বৈশিষ্ট্যের ক্রসকে ব্যাক ক্রস বলে। পরবর্তী প্রজন্মের ফিনোটাইপ বা তাদের অনুপাত বিশ্লেষণ করেই এই পরীক্ষার ফল পাওয়া যায়।

অর্থাৎ ব্যাক ক্রস = Tt × TT অথবা Tt × tt (মনোহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে)

টেস্ট ক্রস (Test cross) : কোনো জীবের জিনোটাইপ (হোমোজাইগাস না হেটেরোজাইগাস) নির্ণয়ের জন্য ওই জীবের সঙ্গে হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন (বিশুদ্ধ প্রছন্ন) জিনোটাইপযুক্ত জীবের যে সংকরায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয় তাকে **টেস্ট ক্রস** (test cross) বলে। এই ক্রসে অপত্য বংশীয় জীবের সাথে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্নধর্মী পিতৃবংশীয় জীবের ক্রস ঘটানো হয়। টেস্ট ক্রসের ফলে উদ্ভূত পরবর্তী প্রজন্মের বংশধরদের ফিনোটাইপ লক্ষ করে ওই অজানা জিনোটাইপ হিসেব করা হয়।

অর্থাৎ টেস্ট ক্রস = Tt × tt (মনোহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে)

তাই পরিশেষে বলা যায় যে, **'সকল টেস্ট ক্রসই ব্যাক ক্রস কিন্তু সকল ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নয়'**।

ব্যাক ক্রস ও টেস্ট ক্রস-এর পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ব্যাক ক্রস	টেস্ট ক্রস
১। সংকরায়ণ	এক্ষেত্রে কোনো জীবের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী কোনো জনুর জীবের ক্রস করা হয়।	এক্ষেত্রে একটি জীবের সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন গুণসম্পন্ন জীবের ক্রস করা হয়।
২। প্রকৃতি	সকল ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নয়।	টেস্ট ক্রস মাত্রই ব্যাক ক্রস।
৩। গুরুত্ব	এর মাধ্যমে জীবে আকাঙ্ক্ষিত কোনো বৈশিষ্ট্য আনা সম্ভব হয়।	এর মাধ্যমে কোনো জীব সংকর কিনা তা নির্ধারণ করা সম্ভব।
৪। উদাহরণ	Tt × TT অথবা Tt × tt	Tt × tt

বিশেষ তথ্য- ব্যাক ক্রস (Back cross) **: উদাহরণ :** মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড বা এক সংকরায়ণ পরীক্ষার ফলে F_1 জনুতে যে সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় (Tt) তার ফিনোটাইপ লম্বা হয়। এ ধরনের সংকর উদ্ভিদের সঙ্গে জনিতৃ জনুর যে কোনো উদ্ভিদের (TT অথবা tt) সংকরায়ণ ঘটানোর প্রক্রিয়াকে **ব্যাক ক্রস** বলা হয়।

(i) F_1 জনুর Tt লম্বা উদ্ভিদের সঙ্গে জনিতৃ জনুর বিশুদ্ধ লম্বা উদ্ভিদের (TT) মিলন ঘটলে কেবল লম্বা উদ্ভিদই জন্মে। তবে এদের মধ্যে TT বিশুদ্ধ লম্বা উদ্ভিদ হয় ৫০% ও Tt সংকর লম্বা উদ্ভিদ হয় ৫০%। এক্ষেত্রে, জিনোটাইপিক অনুপাত = TT : Tt = ১ : ১ ও ফিনোটাইপিক অনুপাত = বিশুদ্ধ লম্বা : সংকর লম্বা = ১ : ১।

জনিতৃ জনু (P) → ♂ বিশুদ্ধ লম্বা × ♀ বিশুদ্ধ খাটো

জিনোটাইপ → TT tt

জিনোটাইপ → T t

F_1 জনু (প্রথম অপত্য বংশ) → Tt

সংকর লম্বা

ব্যাক ক্রস → Tt (F_1 জনু) × TT (জনিতৃ জনু)

গ্যামিট → T t T T

ফলাফল (অপত্য বংশ) :

♀ \ ♂	T	t
T	TT বিশুদ্ধ লম্বা	Tt সংকর লম্বা
T	TT বিশুদ্ধ লম্বা	Tt সংকর লম্বা

সুতরাং জিনোটাইপিক অনুপাত = TT : Tt = ১ : ১ ও ফিনোটাইপিক অনুপাত = বিশুদ্ধ লম্বা : সংকর লম্বা = ১ : ১

Scanned with CamScanner

(ii) F_1 জনুর Tt লম্বা উদ্ভিদের সঙ্গে জনিতৃ জনুর বিশুদ্ধ খাটো উদ্ভিদের (tt) সংকরায়ণ ঘটালেও ব্যাক ক্রস সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে, জিনোটাইপিক অনুপাত = Tt : tt = ১ : ১ ও ফিনোটাইপিক অনুপাত = সংকর লম্বা: বিশুদ্ধ খাটো = ১ : ১।

ব্যাক ক্রস ⟶ Tt (F_1 জনু) × tt (জনিতৃ জনু)

গ্যামিট ⟶ (T) (t) (t) (t)

ফলাফল (অপত্য বংশ) :

♀ \ ♂	(T)	(t)
(t)	Tt সংকর লম্বা	tt বিশুদ্ধ খাটো
(t)	Tt সংকর লম্বা	tt বিশুদ্ধ খাটো

সুতরাং জিনোটাইপিক অনুপাত = Tt : tt = ১ : ১ ও ফিনোটাইপিক অনুপাত = সংকর লম্বা: বিশুদ্ধ খাটো = ১ : ১

প্রয়োগ বা গুরুত্ব : (১) জনিতৃ জনুর (P) আকাঙ্ক্ষিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে সংকর উদ্ভিদে আনার জন্য ব্যাক ক্রস করা হয়। (২) সংকরায়ণ পদ্ধতিতে বারবার ব্যাক ক্রস করে আকাঙ্ক্ষিত জিনকে সংকর উদ্ভিদে সঞ্চারিত করা যায়। এইভাবে বিশুদ্ধ জীব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

টেস্ট ক্রস (Test cross) : মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড বা এক সংকরায়ণ পরীক্ষার ফলে F_1 জনুতে যে সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় (Tt) তার ফিনোটাইপ লম্বা হয়। এ ধরনের সংকর উদ্ভিদের সঙ্গে জনিতৃ জনুর হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন (বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন-tt) জিনোটাইপযুক্ত জীবের যে সংকরায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয় তাকে **টেস্ট ক্রস** (test cross) বলা হয়।

উদাহরণ : মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড বা এক সংকরায়ণ পরীক্ষায় একটি লম্বা (TT অথবা Tt) গাছের জিনোটাইপ নির্ণয়ের জন্য তাকে একটি বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন খাটো গাছের (tt) সঙ্গে ক্রস করতে হয়। মিলনে উৎপন্ন সব অপত্য গাছই যদি সংকর লম্বা হয়, তাহলে জনিতৃ গাছটি বিশুদ্ধ লম্বা (TT) ছিল (TT × tt = Tt)। অপরপক্ষে, যদি অপত্য গাছগুলো ৫০% লম্বা এবং ৫০% খাটো জন্মায় তাহলে জনিতৃ গাছটি সংকর লম্বা (Tt) ছিল (Tt × tt = Tt : tt)। নিম্নে মেন্ডেলের **এক সংকর** টেস্ট ক্রসের পরীক্ষা বর্ণনা করা হলো :

F_1 জনুতে প্রাপ্ত সংকর লম্বা (Tt) মটরশুঁটি গাছের টেস্ট ক্রস ঘটালে F_2 বংশে অর্ধেক সংকর লম্বা (Tt) এবং অর্ধেক বিশুদ্ধ খাটো (tt) গাছ জন্মাবে। অর্থাৎ F_2 জনুতে সৃষ্ট অপত্যদের জিনোটাইপিক ও ফিনোটাইপিক উভয়েরই অনুপাত ১ : ১ হবে।

টেস্ট ক্রস ⟶ Tt (F_1 জনু) × tt (জনিতৃ জনু)

গ্যামিট ⟶ (T) (t) (t) (t)

ফলাফল (অপত্য বংশ) :

♀ \ ♂	(T)	(t)
(t)	Tt সংকর লম্বা	tt বিশুদ্ধ খাটো
(t)	Tt সংকর লম্বা	tt বিশুদ্ধ খাটো

সুতরাং জিনোটাইপিক অনুপাত = Tt : tt = ১ : ১ ও ফিনোটাইপিক অনুপাত = সংকর লম্বা: বিশুদ্ধ খাটো = ১ : ১

প্রয়োগ বা গুরুত্ব : (১) টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে কোনো জীবের জিনোটাইপ নির্ধারণ করা যায়। (২) টেস্ট ক্রস দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, F_2 জনুতে প্রচ্ছন্ন গুণের পুনরাবির্ভাবের জন্য দায়ী F_1 জনুর জীবের হেটেরোজাইগাস অবস্থা। (৩) টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে জানা যায় যে, কোনো একজোড়া বৈশিষ্ট্য পরস্পরের অ্যালিল কিনা। (৪) টেস্ট ক্রসের যে জীবের ফিনোটাইপ নির্ধারণ করতে হবে তার সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন জনিতৃর ব্যাক ক্রস করা হয়। (৫) মূলত টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় যে, কোনো জীব সংকর, না বিশুদ্ধ।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, মেন্ডেলের **ডাইহাইব্রিড বা দ্বি-সংকরায়ণ** টেস্ট ক্রসে অর্থাৎ F_1 জনুতে প্রাপ্ত সংকর গোলাকার-হলুদ (RrYy) মটরশুঁটি গাছের সাথে জনিতৃ জনুর হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন বা বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন (rryy) মটরশুঁটি গাছের ক্রস ঘটালে F_2 জনুতে প্রাপ্ত অপত্যের ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক উভয়ের অনুপাতই ১ : ১ : ১ : ১ হয়।]

Scanned with CamScanner

১১.২ বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব (Chromosomal Theory of Inheritance)



W.S.Sutton (1877-1916) T.Boveri (1862-1915)

মেন্ডেলবাদ পুনরাবিষ্কারের (1900 খ্রিঃ) পরবর্তী সময়কালে **Winiwarter, Montogomery** প্রমুখ বিজ্ঞানীর এবং তাঁদের নিজেদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে **সাটন** (W. S. Sutton) ও **বোভারি** (T. Boveri) 1902 খ্রিষ্টাব্দে পৃথকভাবে ক্রোমোজোম ও মেন্ডেলীয় ফ্যাক্টরের (জিন) সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেন। এ সাদৃশ্যর ভিত্তিতে বংশগতি বিষয়ে সাটন ও বোভারি প্রবর্তিত তত্ত্বই হলো বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব বা **ইনহেরিট্যান্স-এর ক্রোমোজোম তত্ত্ব** (chromosomal theory of inheritance)। এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো– মেন্ডেলীয় ফ্যাক্টর বা জিনগুলো ক্রোমোজোমে অবস্থান করে এবং মিয়োসিস কোষ বিভাজন কালে ক্রোমোজোমের (একই সঙ্গে জিনের) পৃথকীকরণ ও স্বাধীন বণ্টন ঘটে অর্থাৎ মেন্ডেলের বংশগতির সূত্রসমূহ ক্রোমোজোম ও একই সঙ্গে জিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমানে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্রোমোজোমগুলোই বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক বা জিনের বাহক। মেন্ডেলের জিনগুলো ক্রোমোজোমের ওপর বসিয়ে এদের সঞ্চারণরীতি ব্যাখ্যা করা যায়। মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ও ডাইহাইব্রিড সংকরায়ণ পরীক্ষার উপাদানগুলো যথাক্রমে এক জোড়া এবং দু'জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমের ওপর বসিয়ে এদের পৃথকীকরণ এবং স্বাধীন বিন্যাস বা মিলনের রূপরেখা পাওয়া যায়।

সাটন ও **বোভারি** প্রবর্তিত ইনহেরিট্যান্স-এর ক্রোমোজোম তত্ত্ব বা বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্বের মূল ভিত্তিগুলো (অর্থাৎ জিন ও ক্রোমোজোমের সাদৃশ্য বা সমান্তরাল) নিম্নরূপ :

- ক্রোমোজোমের আচরণের সঙ্গে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক উপাদান বা জিনের আচরণের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।
- মেন্ডেলের পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক উপাদানগুলো অর্থাৎ জিনগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে। প্রতিটি উপাদান জোড়া জননকোষ (gamete) উৎপন্ন হওয়ার সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়।
- জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার সময় প্রতি জোড়া উপাদানের একটি পুং জননকোষ (শুক্রাণু) হতে এবং অপরটি স্ত্রী জননকোষ (ডিম্বাণু) হতে এসে পুনরায় মিলিত হয়।
- মিয়োসিস ও নিষিক্তকরণ ঘটনায় দেখা যায় যে, ক্রোমোজোমগুলোও জোড়ায় জোড়ায় থাকে, অর্থাৎ কয়েক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোম (homologous chromosome) থাকে। প্রতি জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোম জননকোষ উৎপন্ন হওয়ার সময় মিয়োসিস বিভাজনের ফলে পরস্পর পৃথক হয়ে যায়।
- নিষিক্তকরণের ফলে জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার সময় প্রতি জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একটি পুং জননকোষ মারফত এবং অপরটি স্ত্রী জননকোষ হতে এসে পুনরায় মিলিত হয়।
- মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, কোনো এক জোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক উপাদানের পৃথকীকরণ ও মিলন অন্য জোড়া উপাদানের ওপর নির্ভরশীল নয়।
- মিয়োসিস এবং নিষিক্তকরণের সময়ও দেখা যায়, কোনো এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণ এবং মিলন অন্য কোনো জোড়া ক্রোমোজোমের আচরণ এবং জিনের আচরণ সমান।

Scanned with CamScanner

- সমসংস্থ ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণ ও মিলনের সাথে জিনের পৃথকীকরণ ও মিলনের অবিকল সাদৃশ্য রয়েছে।

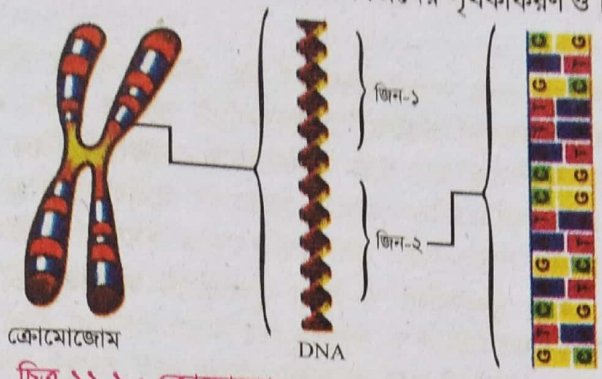

চিত্র ১১.১ : ক্রোমোজোম, DNA ও জিনের মধ্যে সম্পর্ক

বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্বের বা উত্তরাধিকারের ক্রোমোজোম তত্ত্বের প্রধান যুক্তিসমূহ

- মিয়োসিসের অ্যানাফেজ দশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয়ের পৃথকীকরণ এবং গ্যামিট সৃষ্টিকালে মেন্ডেলীয় ফ্যাক্টর (জিন) বা অ্যালিলদ্বয়ের পৃথকীকরণ যথেষ্ট সাদৃশ্য যুক্ত।
- মেন্ডেলীয় ফ্যাক্টরের ন্যায় ক্রোমোজোমও জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে।
- অ্যানাফেজ দশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণকালে একটি ক্রোমোজোমের সাথে অন্যান্য প্রতিটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়গুলোর মধ্যে যে কোনো ক্রোমোজোমে সঞ্চারিত হতে পারে। অর্থাৎ 2^n সংখ্যক ক্রোমোজোম বিন্যাস ঘটতে পারে। যেমন : সি আরচিনের $n = 18$, সুতরাং এ ক্ষেত্রে $2^{18} = 262,144$টি ক্রোমোজোম বিন্যাস সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং মেন্ডেলীয় ফ্যাক্টরের (জিন) স্বাধীন বণ্টনের সাথে ক্রোমোজোমের স্বাধীন বণ্টনের সাদৃশ্য বা সমান্তরলতা বিদ্যমান।
- দুটি গ্যামিটের মিলনের ফলে অ্যালিলদ্বয় যেভাবে জোড়বদ্ধ হয়, ঠিক একইভাবে ক্রোমোজোমদ্বয়ের সংযুক্তির মাধ্যমে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট সৃষ্টি হয়।

১১.৩ মেন্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম (Modification or Deviations of Mendel's Laws)

১৯০০ সালে মেন্ডেলের সূত্র পুনরাবিষ্কৃত হবার কিছুকাল পর হতেই বিভিন্ন বংশগতিক পরীক্ষায় মেন্ডেলীয় অনুপাতের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যতিক্রমগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) **আপাত ব্যতিক্রম** (Apparent Exceptions) : মেন্ডেলিয়ান অনুপাতের যেসব ব্যতিক্রম কিছু শর্ত সাপেক্ষে মেন্ডেলবাদের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করা যায়, সেগুলোকে **আপাত ব্যতিক্রম** বলে। যেমন– অসম্পূর্ণ প্রকটতা, সমপ্রকটতা, লিথাল জিন, এপিস্ট্যাসিস ইত্যাদি কারণে ব্যতিক্রম। এগুলোকে মেন্ডেলবাদের রূপান্তরও (modification) বলা যায়।

(খ) **প্রকৃত ব্যতিক্রম** (Real Exceptions) : মেন্ডেলিয়ান অনুপাতের যেসব ব্যতিক্রম মেন্ডেলবাদের ভিত্তিতে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না, সেগুলোকে **প্রকৃত ব্যতিক্রম** বলে। যেমন– লিংকেজ, মাল্টিপল অ্যালিল, পলিজিন, প্লিওট্রপি ইত্যাদি কারণে ব্যতিক্রম।

মেন্ডেল তাঁর পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে বংশগতি সম্পর্কিত ১ম সূত্র ও ২য় সূত্র উপস্থাপন করেন। এতে জীবের বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ, নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যে সকল মতামত প্রকাশ করা যায় তা নিম্নরূপ–

১। একজোড়া জিন এক লোকাস থেকে কেবল একটি বৈশিষ্ট্যের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে।
২। প্রকট জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থায় তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।
৩। প্রচ্ছন্ন জিন কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে সক্ষম।
৪। সংকর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জিনগুলো সম্মিলিতভাবে মাঝামাঝি কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না করে পাশাপাশি অবস্থান করে।
৫। ক্রোমোজোমের এক লোকাসের জিন অন্য লোকাসের জিনের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।
৬। গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টির সময় প্রতিটি জিন স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়।

কিন্তু মেন্ডেল পরবর্তী বিভিন্ন বংশগতীয় পরীক্ষায় দেখা গেছে, শুধুমাত্র প্রকৃত মেন্ডেলবাদের (১ম সূত্র ও ২য় সূত্র) ভিত্তিতে সর্বপ্রকারের উত্তরাধিকার এবং বংশগতি সংক্রান্ত জটিলতা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সব ধরনের জিনতাত্ত্বিক পরীক্ষায় মেন্ডেলিয়ান অনুপাত ৩ : ১ এবং ৯ : ৩ : ৩ : ১ পাওয়া না, এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের বংশগতীয় ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলোকে **নন-মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিটেন্স** (Non-mendelian inheritance) বা **ব্লেন্ডিং ইনহেরিটেন্স** (blending inheritance) বলা হয়।

Scanned with CamScanner

মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম

১. অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete Dominance)– ফলাফল ১ : ২ : ১

একটি বৈশিষ্ট্য যদি আরেকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর সম্পূর্ণ প্রকট না হয়, তাহলে সংকর জীবে উভয়ের মাঝামাঝি একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, এ ধরনের ঘটনাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স বলে। কার্ল করেন্স (Carl Correns, 1903) এটি আবিষ্কার করেন। অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনগুলোকে সেকেন্ডারি জিন (intermediate gene) বলে। ইহা মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম। অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ক্রসের F_2 বংশের ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ১ : ২ : ১ হয়। সন্ধ্যামালতী, তুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখা যায়।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : লাল ফুলবিশিষ্ট ও সাদা ফুলবিশিষ্ট সন্ধ্যামালতী (four O' clock flower, *Mirabilis jalapa*) উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে F_1 বংশের সব উদ্ভিদ লাল বা সাদা ফুলবিশিষ্ট না হয়ে গোলাপি (pink) বর্ণের ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে লাল বা সাদা কোনো রংই সম্পূর্ণ প্রকট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে না। F_2 বংশে ১ : ২ : ১ অনুপাতে যথাক্রমে লাল, গোলাপি এবং সাদা ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

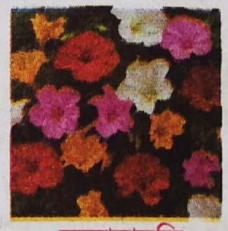
সন্ধ্যামালতি

মনে করি,
সন্ধ্যামালতীর লাল রঙের জন্য দায়ী জিন = R
" " " " " জিনোটাইপ = RR
আবার,
সন্ধ্যামালতীর সাদা রঙের জন্য দায়ী জিন = r
∴ " " " " " জিনোটাইপ = rr

পিতামাতা	: ♂	×	♀	
ফিনোটাইপ	: লাল ফুল		সাদা ফুল	
জিনোটাইপ	: RR		rr	
গ্যামিট	: (R) (R)		(r) (r)	
F_1 বিংশ	Rr	Rr	Rr	Rr

সবগুলো গোলাপি ফুল

F_1 পিতামাতা	: ♂	×	♀
ফিনোটাইপ	: গোলাপি ফুল		গোলাপি ফুল
জিনোটাইপ	: Rr		Rr
গ্যামিট	: (R) (r)		(R) (r)

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	(R)	(r)
(R)	RR লাল	Rr গোলাপি
(r)	Rr গোলাপি	rr ~~গোলাপি~~ সাদা

F_2 বংশে ফিনোটাইপিক অনুপাত = লাল (RR) : গোলাপি (Rr) : সাদা (rr) = ১ : ২ : ১

অর্থাৎ মনোহাইব্রিড ক্রসের জিনোটাইপিক অনুপাতের সমান।

ব্যাখ্যা : এখানে লাল ফুলের জন্য RR এবং সাদা ফুলের জন্য rr জিন দেখানো হয়েছে। R-এর সম্পূর্ণ প্রকটতা থাকলে F_1-উদ্ভিদের ফুল লাল রং-এর হতো এবং F_2 বংশধরের ফিনোটাইপিক অনুপাত হতো ৩ : ১। কিন্তু R-এর অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণেই F_1 হেটারোজাইগাস (Rr)-এর বর্ণ গোলাপি বা পিংক এবং F_2 বংশধরে ১ : ২ : ১ ফিনোটাইপিক অনুপাতের (লাল, গোলাপি, সাদা) সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সন্ধ্যামালতী উদ্ভিদের ফুলের রঙের বংশগতির ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

২. সমপ্রকটতা (Co-dominance)– ফলাফল ১ : ২ : ১

পরস্পর বিপরীতধর্মী গুণাবলি নির্ধারক জিনের মধ্যে যেমন অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখা যায় তেমনি দুই অ্যালিলের মধ্যে অপর একটি সম্পর্ক হলো **সমপ্রকটতা** (co-dominance)। হেটারোজাইগাস অবস্থায় কোনো অ্যালিল প্রকট না হওয়ার কারণে দুই বা ততোধিক অ্যালিল সম্পূর্ণ প্রকটতা বা প্রচ্ছন্নতা প্রদর্শন করে না। এ অবস্থায় উভয় অ্যালিলে নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য সংকর জীবে (F_1) সমভাবে প্রকাশিত হয়, এ ধরনের ঘটনাকে সমপ্রকটতা বা সহপ্রকটতা বলে। অথবা সংকর জীবে যখন দুটি বিপরীতধর্মী প্রকট জিনের দুটি বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে প্রকাশিত হয় তখন তাকে সমপ্রকটতা বা সহপ্রকটতা বলে। এতে মেন্ডেলিয়ান ৩ : ১ অনুপাতটি পরিবর্তিত হয়ে ১ : ২ : ১ রূপে প্রকাশ পায়।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : খাটো শিংওয়ালা জাতের গরুর রং, আন্দালুসিয়ান মোরগ-মুরগির পালকের রং, মানুষের রক্ত গ্রুপের অ্যালিল, মসুর ডাল ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমপ্রকটতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ খাটো শিংওয়ালা জাতের গরুর গায়ের রং-এর বংশগতি ব্যাখ্যা করা হলো– খাটো শিংওয়ালা জাতের গরুর গায়ের বর্ণ **লাল, সাদা** ও রোয়ান (roan) হয়ে থাকে। প্রতিটি লোম রোয়ান নয়, কিছু লোম সাদা এবং কিছু লোম লাল। এই **লাল** এবং **সাদা** রঙের লোমের মিশ্রণে রোয়ান রঙের আবির্ভাব ঘটে। প্রকৃতপক্ষে লাল ও সাদা বর্ণ নির্ধারক অ্যালিলদ্বয় সমপ্রকট বা **কোডমিন্যান্ট** (codominant) হওয়ার কারণে এদের সংকরায়ণে F_1 বংশের সকল গরু রোয়ান বর্ণ হয় এবং F_2 বংশে ১ : ২ : ১ অনুপাতে লাল, রোয়ান ও সাদা রঙের হয়।

মনে করি, লাল লোমের জন্য নির্ধারক জিন = C^R

∴ " " " " জিনোটাইপ = $C^R C^R$

আবার, সাদা লোমের জন্য নির্ধারক জিন = C^W

" " " " জিনোটাইপ = $C^W C^W$



রোয়ান গরু

পিতামাতা	: ♂	×	♀
ফিনোটাইপ	: লাল		সাদা
জিনোটাইপ	: $C^R C^R$		$C^W C^W$
গ্যামিট	: C^R C^R		C^W C^W
F_1 বংশ	: $C^R C^W$	$C^R C^W$	$C^R C^W$ $C^R C^W$

সবগুলো রোয়ান

F_1 পিতামাতা	: ♂	×	♀
ফিনোটাইপ	: রোয়ান		রোয়ান
জিনোটাইপ	: $C^R C^W$		$C^R C^W$
গ্যামিট	: C^R C^W		C^R C^W

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	C^R	C^W
C^R	$C^R C^R$ লাল	$C^R C^W$ রোয়ান
C^W	$C^R C^W$ রোয়ান	$C^W C^W$ সাদা

F_2 বংশে ফিনোটাইপিক অনুপাত : লাল ($C^R C^R$) : রোয়ান ($C^R C^W$) : সাদা ($C^W C^W$) = ১ : ২ : ১

অর্থাৎ মনোহাইব্রিড ক্রসের জিনোটাইপিক অনুপাতের সমান।

সুতরাং খাটো শিংওয়ালা জাতের গরুর গায়ের বর্ণের ক্ষেত্রে সমপ্রকটতা দেখা যায়।

❑ **কাজ :** প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে সমপ্রকটতার জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর।

তথ্য : আন্দালুসিয়ান মোরগ-মুরগি: কালো পালক = BB এবং সাদা পালক = WW এবং কালো ও সাদা বৈশিষ্ট্যদ্বয় পরস্পরের ওপর সমপ্রকট। F_1 জনু (BW): কালোর মাঝে সাদা ছোপযুক্ত মোরগ-মুরগি (নীল)। F_2 জনু ব্যাখ্যা কর।

Scanned with CamScanner

অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সমপ্রকটতার মধ্যে পার্থক্য

অসম্পূর্ণ প্রকটতা (incomplete dominance)	সমপ্রকটতা (co-dominance)
১। এক্ষেত্রে প্রকট অ্যালিলটি আংশিক প্রকটতা দেখায়।	১। এক্ষেত্রে উভয় অ্যালিল সম্পূর্ণ প্রকটতা দেখায়।
২। F_1 বংশে বা হেটারোজাইগাস জীবে উভয় খাঁটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনোটিরই প্রকাশ ঘটে না। অর্থাৎ ভিন্ন ধরনের মধ্যবর্তী ফিনোটাইপ পরিলক্ষিত হয়।	২। F_1 বংশে বা হেটারোজাইগাস জীবে একই সাথে উভয় খাঁটি বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে।
৩। কোনো অ্যালিলই স্বাধীন ও সর্বাত্মক প্রভাব ঘটায় না।	৩। উভয় অ্যালিলই স্বাধীন ও সর্বাত্মক প্রভাব ঘটায়।
৪। হোমোজাইগাস অবস্থায় আলাদা বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পায়।	৪। হোমোজাইগাস অবস্থায় দুটি বৈশিষ্ট্যের যে কোনো একটি প্রকাশ পায়।

৩. লিথাল জিন বা ঘাতক জিন বা মারণ জিন (Lethal Gene)– ফলাফল ২ : ১

যেসব জিন কোনো জীবের মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যুর কারণ হয়, তাদের লিথাল জিন বলে। এটি জীবের জিন বা DNA এর কোনো অংশের **মিউটেশনের** (mutation; বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক ও স্থায়ী পরিবর্তন) কারণে ঘটে থাকে। একে **লিথাল মিউটেশন** (lethal mutation) বলে। মিউটেশনের ফলে যদি কোনো জীবের জীবন ধারণের জন্য তার দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রোটিন (এনজাইম) নিষ্ক্রিয় হয়, তাহলে জীব মারা যায়। মানুষসহ বিভিন্ন জীবদেহে এক বা একাধিক লিথাল জিন থাকতে পারে।

লিথাল জিনের বৈশিষ্ট্য

- লিথাল জিন এক প্রকার **মিউট্যান্ট জিন** (mutant gene) যা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।
- প্রকট লিথাল জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থাতেই জীবের মৃত্যু ঘটাতে পারে কিংবা জীবের আঙ্গিক বৈকল্য ঘটাতে পারে।
- প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায়।
- জীব জাইগোট বা ভ্রূণ অবস্থায় মারা যায় বলে লিথাল জিনের প্রভাব চোখে পড়ে না, তবে কোনো ক্ষেত্রে জীবের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রকাশ ঘটে।
- লিথাল জিনের প্রভাবে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ক্রসের F_2 বংশের **ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ২ : ১ হয়**।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : ফরাসি জিনতত্ত্ববিদ **লুসিয়েন ক্যুঁয়েনো** (Lucien Cuénot, 1905) সর্বপ্রথম ইঁদুরের মধ্যে এ মারণ জিনের উপস্থিতি লক্ষ করেন। ইঁদুরের **হলুদ** বর্ণের লোমের জন্য দায়ী জিন (Y) যখন হোমোজাইগাস অবস্থায় (YY) থাকে ইঁদুরের মৃত্যু ঘটায়।

দুটি হলুদাভ (yellowish) রঙের ইঁদুরের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়ে ২ : ১ অনুপাতে হলুদাভ এবং হলুদবিহীন (non-yellowish) রঙের ইঁদুর পাওয়া যায়। অন্যান্য গবেষকের গবেষণায় দেখা যায় যে, হলুদাভ দুটি ইঁদুরের সংকরায়ণে প্রাপ্ত শাবক সংখ্যার তুলনায় প্রায় $\frac{১}{৪}$ অংশ (২৫%) কম। এসব পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, হলুদ রঙের জন্য দায়ী জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় উপস্থিত থাকলে সে জাইগোট বেঁচে থাকতে পারে না, জন্মের পূর্বেই ভ্রূণীয় অবস্থায় মারা যায়। হলুদাভ স্ত্রী ইঁদুরের গর্ভে মৃত ভ্রূণ পাওয়ার মধ্যে উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনে করি,

হলুদাভ রঙের জন্য দায়ী জিন = Y (লিথাল জিন, হোমোজাইগাস অবস্থায় ভ্রূণের মৃত্যু ঘটায়)

হলুদবিহীন (বা মেটে বা অ্যাগাউটি) রঙের জন্য দায়ী জিন = y

∴ হলুদাভ রঙের জন্য দায়ী জিনোটাইপ = Yy

পিতামাতা	: ♂	×	♀
ফিনোটাইপ	: হলুদাভ ইঁদুর		হলুদাভ ইঁদুর
জিনোটাইপ	: Yy		Yy
গ্যামিট	: (Y) (y)		(Y) (y)

Scanned with CamScanner

ফলাফল চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	Ⓨ	ⓨ
Ⓨ	YY মৃত	Yy হলুদাভ
ⓨ	Yy হলুদাভ	yy হলুদবিহীন

ফিনোটাইপিক অনুপাত = হলুদাভ : হলুদবিহীন = ২ : ১

ক্যুঁয়েনোর উল্লেখিত বিশ্লেষণে জানা যায় যে, হোমোজাইগাস প্রকট জিনোটাইপধারী (YY) শাবকগুলো ভ্রূণাবস্থায় মারা যায়। ফলে অপত্য বংশে হলুদাভ ও হলুদবিহীন ইঁদুরের অনুপাত ৩ : ১ না হয়ে ২ : ১ হয়।

লিথাল জিনের প্রভাব

লিথাল জিনের প্রভাবে ক্রিপার (Creeper) মুরগি, পা-বিহীন (Amputed) বাছুর এবং মানুষে ব্র্যাকিফ্যালাঞ্জি (Brachyphalangy), হিমোফিলিয়া (Haemophilia), জন্মগত ইকথিওসিস (Congenital Ichthyosis), ইনফ্যান্টাইল অ্যামারটিক ইডিওসি (Infantile Amaurotic Idiocy) এবং থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia) হতে দেখা যায়।

প্রকৃতিতে এমন কিছু লিথাল জিনও রয়েছে যাদের প্রভাবে বাহক জীব ছোট অবস্থায় মারা যায় না বরং বাহক বড় হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে এরা বংশবৃদ্ধিও ঘটাতে পারে। এছাড়াও সেমিলিথাল জিন (semilethal gene; ৫০% এর বেশি জীব মারা যায়) ও সাবভাইটাল জিন (subvital gene; ৫০% এর কম জীব মারা যায়) নামক দু'ধরনের লিথাল জিন পাওয়া যায়। মানুষের **হিমোফিলিয়া** হয় সেমিলিথাল জিনের কারণে ও **ড্রসোফিলা** মাছির লুপ্তপ্রায় ডানা সৃষ্টি হয়, সাবভাইটাল জিনের কারণে।

❑ **কাজ :** (i) লাল ফুল এবং সাদা ফুলের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_1 জনুতে লাল বা সাদা ফুল পাওয়া যায় না কেন– ব্যাখ্যা কর।/লাল ফুল এবং সাদা ফুলের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_1 জনুতে সব ফুল লাল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। (ii) লাল ফুল এবং সাদা ফুলের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_2 জনুতে কী ঘটবে চেকার বোর্ডের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। (iii) সাদা ও লাল ফুলের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_1 এর গোলাপি ফুলের সাথে মাতৃবংশের একটি লাল ফুলের ক্রসে কী ঘটবে? জিনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কর। (iv) কালো বর্ণের এবং সাদা বর্ণের প্রাণীর মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে F_1 জনুর ফলাফল ব্যাখ্যা কর। (v) সাদা ছোপযুক্ত দুটি প্রাণীর মধ্যে ক্রসের ফলাফলের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাও। (vi) ১ : ২ : ১ ব্যাখ্যা করে মেন্ডেলের সূত্রের সাথে এর সম্পর্কের বিষয়ে মতামত দাও। (vii) ১:২:১ মোতাবেক F_1 জনু বিশ্লেষণ কর। (viii) লিথাল জিন না থাকলে কালো ও সাদা ইঁদুরের মধ্যে ক্রস ঘটানোর পর F_2 জনুর ফলাফল কী হবে– ব্যাখ্যা কর। (ix) লিথাল জিনযুক্ত কালো ও সাদা ইঁদুরের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_2 জনুর অনুপাত ব্যাখ্যা কর। (x) কখনও কখনও অপত্য বংশধরের মৃত্যুর কারণে ৩:১ অনুপাতের পরিবর্তন হয়- উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম

১. পরিপূরক জিন (Complementary Gene)– ফলাফল ৯ : ৭

একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যখন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিন সমান কার্যকর ভূমিকা পালন করে তখন জিন দুটিকে একে অপরের পরিপূরক জিন বলে। এক্ষেত্রে মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের F_2 জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ এর পরিবর্তে ৯ : ৭ হয়।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মিষ্টি মটরশুঁটি উদ্ভিদে (*Lathyrus odoratus*) সাদা ফুলবিশিষ্ট দুটি আলাদা স্ট্রেইন (strain) পাওয়া যায়। উক্ত স্ট্রেইন দুটির মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশধরের (F_1) সব উদ্ভিদের ফুল বেগুনি (violet) হয়। কিন্তু F_2 বংশধরে বেগুনি ও সাদা ফুলের অনুপাত ৯ : ৭ হয়। 1904 সালে বেটসন এবং পানেট (Bateson & Punnett) এ পরীক্ষা করেন। মূলত মটরশুঁটির বেগুনি রঙের জন্য হলো অ্যান্থোসায়ানিন (anthocyanin) নামক রাসায়নিক পদার্থ।

Scanned with CamScanner

মনে করি, সাদা ফুলবিশিষ্ট স্ট্রেইন দুটির জিনোটাইপ যথাক্রমে AAbb ও aaBB.

পিতামাতা	ঃ	♂	×	♀
ফিনোটাইপ	ঃ	সাদা ফুলবিশিষ্ট মটরশুঁটি		সাদা ফুল বিশিষ্ট মটরশুঁটি
জিনোটাইপ	ঃ	AAbb		aaBB
গ্যামিট		Ab Ab		aB aB
F_1 বংশ	ঃ	AaBb AaBb		AaBb AaBb

সবগুলো বেগুনি ফুলবিশিষ্ট মটরশুঁটি

F_1 পিতামাতা	: ♂	×	♀
ফিনোটাইপ	: বেগুনি ফুল		বেগুনি ফুল
জিনোটাইপ	: AaBb		AaBb
গ্যামিট	: AB Ab		AB Ab
	aB ab		aB ab

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB বেগুনি ফুল	AABb বেগুনি ফুল	AaBB বেগুনি ফুল	AaBb বেগুনি ফুল
Ab	AABb বেগুনি ফুল	AAbb সাদা ফুল	AaBb বেগুনি ফুল	Aabb সাদা ফুল
aB	AaBB বেগুনি ফুল	AaBb বেগুনি ফুল	aaBB সাদা ফুল	aaBb সাদা ফুল
ab	AaBb বেগুনি ফুল	Aabb সাদা ফুল	aaBb সাদা ফুল	aabb সাদা ফুল

F_2 বংশের ফিনোটাইপিক অনুপাত = বেগুনি ফুল : সাদা ফুল = ৯ : ৭

উপরের চেকার বোর্ডে দেখা যায়, যেসব জিনোটাইপে A ও B একত্রে আছে সেসব ক্ষেত্রেই ফিনোটাইপ বেগুনি হয়েছে এবং যেসব জিনোটাইপে A অথবা B জিনের যেকোনো একটি আছে বা দুটির একটিও নেই সেসব ক্ষেত্রে সাদা হয়েছে।

২. এপিস্ট্যাসিস (Epistasis)

একটি জিনের বাহ্যিক প্রকাশ অপর আরেকটি নন-অ্যালিলিক (non-allelic) **জিন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে এ ধরনের ঘটনাকে এপিস্ট্যাসিস** (epistasis) **বা নিরোধন বলে।** যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দান করে তাকে **বাধক জিন** বা **এপিস্ট্যাটিক জিন** (epistatic gene) এবং যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে **হাইপোস্ট্যাটিক জিন** (hypostatic gene) বলে।

(ক) প্রকট এপিস্ট্যাসিস (Dominant epistasis)– ফলাফল ১৩ : ৩

যে প্রক্রিয়ায় একটি প্রকট জিন অন্য একটি নন-অ্যালিলিক প্রকট জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন তাকে প্রকট এপিস্ট্যাসিস বলে।

সাদা **লেগহর্ন** (Leghorns) গোষ্ঠীর মোরগ-মুরগির পালকের সাদা রং অন্যান্য রঙের ওপর প্রকট। লেগহর্ন ছাড়াও **ওয়াইন ডটস** (Wyandotte), **প্লাইমাউথ রক্স** (Plymouth rocks) ইত্যাদির অন্যান্য গোষ্ঠীতে সাদা রঙের পালক দেখা গেলেও সেখানে এ রং প্রচ্ছন্ন। এসব মোরগ-মুরগিতে সাদা রঙের জন্য দায়ী জিন লেগহর্নের সাদা জিনের

Scanned with CamScanner

তুলনায় পৃথক ধরনের। পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, সাদা লেগহর্ন জাতের মোরগ-মুরগি আসলে রঙিন পালকের জিন বহন করে। কিন্তু এ জিনের সাথে অন্য একটি জিনের সংযুক্তি থাকায় সেটি পালকের রঙের প্রকাশকে দমিয়ে রাখে। ফলে সাদা লেগহর্ন মূলত রঙিন মোরগ-মুরগি হওয়া সত্ত্বেও আসল রং প্রকাশে ব্যর্থ হওয়ায় এদের বাহ্যিক রূপ সাদা হয়। এক্ষেত্রে মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের F_2 জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ এর পরিবর্তে ১৩ : ৩ হয়।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : সাদা লেগহর্ন ও সাদা ওয়াইন ডটসের মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে বিস্ময়কর ফলাফল লক্ষ করা গেছে। একটি সাদা পালকযুক্ত লেগহর্নের সাথে সাদা পালকযুক্ত ওয়াইন ডটসের ক্রস ঘটালে প্রথম অপত্য বংশে **সবগুলো সাদা পালকযুক্ত** হয়। F_1 বংশের মোরগ-মুরগির মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে দেখা গেছে F_2 বংশে সাদা ও রঙিন উভয় ধরনের মোরগ-মুরগিরই আবির্ভাব ঘটে এবং এদের অনুপাত হয় ১৩ : ৩। 1908 সালে **বেটসন** এবং **পানেট** (Bateson & Punnett) এ পরীক্ষা করেন।

মনে করি,

সাদা লেগহর্নের রঙিন পালকের জন্য দায়ী প্রকট **হাইপোস্ট্যাটিক জিন** = C

" " " " বাধাদানকারী প্রকট **এপিস্ট্যাটিক জিন** = I

সুতরাং সাদা লেগহর্নের জিনোটাইপ = IICC

এবং " ওয়াইন ডটসের " = iicc

পিতামাতা ঃ ♂ × ♀

ফিনোটাইপ ঃ সাদা লেগহর্ন — সাদা ওয়াইন ডট্স

জিনোটাইপ ঃ IICC — iicc

গ্যামিট ঃ IC IC — ic ic

F_1 বংশ : IiCc IiCc IiCc IiCc

সবগুলো সাদা

F_1 পিতামাতা : ♂ × ♀

ফিনোটাইপ : সাদা — সাদা

জিনোটাইপ : IiCc — IiCc

গ্যামিট : IC Ic iC ic — IC Ic iC ic

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	IC	Ic	iC	ic
IC	IICC সাদা	IICc সাদা	IiCC সাদা	IiCc সাদা
Ic	IICc সাদা	Iicc সাদা	IiCc সাদা	Iicc সাদা
iC	IiCC সাদা	IiCc সাদা	iiCC রঙিন	iiCc রঙিন
ic	IiCc সাদা	Iicc সাদা	iiCc রঙিন	iicc সাদা

F_2 বংশের ফিনোটাইপিক অনুপাত = সাদা : রঙিন = ১৩ : ৩

Scanned with CamScanner

চেকার বোর্ডে দেখানো সাদা ও রঙিন পালকের জন্য দায়ী জিনসমূহের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জিন I এর উপস্থিতি C জিন কর্তৃক রঙিন পালক প্রকাশে সবসময় বাধাদান করে। কেবল I এর অনুপস্থিতিতেই C জিনের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে।

❑ **কাজ :** (i) সাদা লেগহর্ন এবং সাদা ওয়াইন ডটসের মধ্যে ক্রস ঘটালে কী ঘটবে তার জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা চেকার বোর্ডে দেখাও।/সাদা লেগহর্ন এবং সাদা ওয়াইন ডটসের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_1 ও F_2 জনুর ফলাফল প্লানেটের চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখাও।/১৩:৩ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর। (ii) এপিস্ট্যাটিসের সাথে বংশগতির কোনো সম্পর্ক আছে কি? ব্যাখ্যা কর।

(খ) দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস (Duplicate Recessive Epistasis) - ফলাফল ৯ : ৭

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন জিন একে অপরের প্রকট অ্যালিলকে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করলে তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। মানুষের জন্মগত **মূক-বধিরতা** দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের একটি অন্যতম উদাহরণ। দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের কারণে মেন্ডেলের ২য় সূত্রের F_2 জনুতে **ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ পরিবর্তিত হয়ে ৯ : ৭ অনুপাতে প্রকাশ পায়।**

দুইটি ভিন্ন ভিন্ন এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে মানুষ জন্মগত মূক-বধির (deaf-mute) হয় এবং এ দুটি এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন এমনভাবে ইন্টারঅ্যাকশন ঘটায় যে, একটির হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন অবস্থা অপরটির প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করে অর্থাৎ উক্ত দুই জোড়া প্রচ্ছন্ন জিনের যেকোনো এক জোড়া থাকলে (অন্য জোড়ার প্রকট জিন থাকলেও) কোনো ব্যক্তি জন্মকালে বধির হবে এবং এই বধিরতার কারণে সে মূকও হবে। কোনো হেটারোজাইগাস ব্যক্তি এ দুটি এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন বহন করলে সে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি লাভ করে। কিন্তু দু'জন স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হেটারোজাইগাস পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিবাহ হলে তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যথাক্রমে ৯ : ৭ অনুপাতে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম ও মূক-বধির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মনে করি, a ও b দুটি এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন। অতএব, সূত্রানুযায়ী aaBB জিনোটাইপ সম্পন্ন ব্যক্তি মূক-বধির হবে। কারণ এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন a স্বাভাবিক শ্রবণের জন্য দায়ী প্রকট B জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করে।

অনুরূপভাবে, AAbb জিনোটাইপ সম্পন্ন ব্যক্তি ও মূক-বধির হবে। কেননা এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন b স্বাভাবিক শ্রবণের জন্য দায়ী প্রকট A জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করে। উল্লিখিত দুটি জিনোটাইপের দু'জন মূক-বধির পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিবাহ হলে তাদের সকল সন্তান-সন্ততি স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হবে। কারণ বধিরতার জন্য দুটি জিনই প্রচ্ছন্ন।

সভ্য মানব সমাজে সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীতে বিবাহ সম্পর্ক প্রচলিত না থাকায় দু'জন হেটারোজাইগাস পুরুষ ও মহিলার বিবাহঘটিত সন্তান-সন্ততিতে এ বৈশিষ্ট্যের অনুপাত প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারি না। তবে ইঁদুর, গিনিপিগ ও অন্যান্য প্রাণীতে অনুরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বংশগতি পরীক্ষা করে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, দু'জন হেটারোজাইগাস স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম পুরুষ ও মহিলার সন্তান-সন্ততির মধ্যে ৯ : ৭ অনুপাতে যথাক্রমে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম এবং মূক-বধির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে।

F_1 ও F_2 বংশের ফলাফল নিম্নরূপ :

পিতামাতা (P_1)- ফিনোটাইপ : ♂ মূক-বধির × ♀ মূক-বধির

জিনোটাইপ : aaBB × AAbb

গ্যামিট : (aB) (Ab)

F_1 জনু : জিনোটাইপ : AaBb

ফিনোটাইপ : সকলেই স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম

F_2 জনু

পিতামাতা (P_2)- ফিনোটাইপ : ♂ স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম × ♀ স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম

জিনোটাইপ : AaBb × AaBb

গ্যামিট : (AB) (Ab) (aB) (ab) (AB) (Ab) (aB) (ab)

Scanned with CamScanner

♀ \ ♂	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB ✶	AABb ✶	AaBB ✶	AaBb ✶
Ab	AABb ✶	AAbb √	AaBb ✶	Aabb √.
aB	AaBB ✶	AaBb ✶	aaBB √	aaBb √
ab	AaBb ✶	Aabb √	aaBb √	aabb √

[✶= স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন এবং √ = মূক-বধির]

F_2 জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত = স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন : মূক-বধির = ৯ : ৭

ব্যাখ্যা : একজন মূক-বধির পুরুষের সাথে একজন মূক-বধির মহিলার বিয়ে হলে তাদের সকল সন্তান স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হবে। তবে ঐ সন্তানদের জিনোটাইপ অনুরূপ জিনোটাইপধারী পুরুষ ও মহিলার বিয়ে হলে তাদের পরবর্তী বংশধরে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম ও মূক-বধির সন্তান ৯:৭ অনুপাতে প্রকাশ পাবে।

❑ **কাজ :** (i) মূক-বধির ও মূক-বধিরের (দুই জন মূক-বধির ব্যাক্তির) মধ্যে ক্রস ঘটালে F_1 জনু স্বাভাবিক হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর এবং F_2 জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর। (ii) জন্মগতভাবে মূক-বধির পুরুষ এবং মহিলা দম্পতির F_2 জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত বিশ্লেষণ কর। (iii) স্বাভাবিক মা-বাবার সন্তান মূক-বধির হওয়ার ঘটনার জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাও।/কোনো দম্পতির দুইজনই স্বাভাবিক হলে তাদের সন্তানদের ফিনোটাইপের সংখ্যা ছকের সাহায্যে নির্ণয় কর। (iv) কোনো দম্পতির দুইজনই স্বাভাবিক হলে তাদের মূক-বধির সন্তান হওয়ার ঘটনা মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম- বিশ্লেষণ কর। (v) স্বাভাবিক মা-বাবার সন্তান মূক-বধির হওয়ার ঘটনা মেন্ডেলের কোন সূত্রের ব্যতিক্রম বলে মনে কর? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। (vi) দ্বৈত প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের ক্রিয়ায় F_2 তে ফিনোটাইপ কেমন হবে- বিশ্লেষণ কর। (vii) ১৩:৩ এর সাথে ৯:৭ এর F_2 জনুর তুলনামূলক আলোচনা কর।

১১.৪ পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স (Polygenic Inheritance)

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত অনেকগুলো নন-অ্যালিলিক জিন সম্মিলিতভাবে যদি কোনো জীবের একটি পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তখন তাদের **পলিজিন** বা **মাল্টিপল জিন** (polygene or multiple gene) বলে। এই পলিজিনের বংশানুক্রমিক সঞ্চারণকে **বহুজিনীয় বংশগতি** বা **পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স** বা **পরিমাণগত উত্তরাধিকার** (polygenic inheritance or quantitative inheritance) বলে। পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ফিনোটাইপের ক্রমাগত ভিন্নতা প্রদান করে। জিনতত্ত্ববিদ K. Mather (1954) পলিজিন নামকরণ করেন।

মানুষের ত্বকের রং, উচ্চতা, ওজন, চোখের রং, বুদ্ধিমত্তা, আচরণ, হৃদরোগ, কতিপয় ক্যান্সার, মানসিক অসুস্থতা, গাভীর দুধ, ভুট্টা বা গমের দানার রং ইত্যাদি পলিজিন জিন বা পলিজেনিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পলিজেনিক জিনের অস্বাভাবিকতার কারণে মানুষের কিছু বংশগতীয় রোগ দেখা যায়, যেমন- ক্যান্সার (cancer), অটিজম (autism), ডায়াবেটিস টাইপ ২ (diabetes type 2) প্রভৃতি।

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্সের বৈশিষ্ট্য

- এক্ষেত্রে কোনো জীবের ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য দুই বা ততোধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- এদের মাত্রা গণনার চেয়ে পরিমাপ দ্বারা নির্ণয় করা হয়।
- জীবের এ ধরনের বৈশিষ্ট্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মানুষের ত্বকের রং-এর ভিন্নতা আমরা সচরাচরই লক্ষ করে থাকি। এটি একটি পলিজেনিক বংশগতির উদাহরণ। ত্বকের রং রঞ্জক পদার্থের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল। এই রঞ্জক পদার্থটির নাম মেলানিন। সমগ্র পরিমাণ রঞ্জক (মেলানিন) সঞ্চিত হওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে জিনের ওপর এবং চর্মদ্বারা গৃহীত সূর্যালোকের ওপর। এই মেলানিন সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে রক্ষা করে।

C.B. Devenport (1913) বলেন নিগ্রো এবং শ্বেতকায় ব্যক্তিদের রঞ্জকের পার্থক্যের জন্য দু-জোড়া জিন দায়ী। এ জিনগুলো ভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থান করে। এ জিনগুলোতে কোনো প্রকটতা দেখা যায় না,



চিত্র ১১.২ : পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স

Scanned with CamScanner

তবে এদের সমপরিমাণ ও **ক্রমবর্ধিষ্ণু** (cumulative) প্রভাব থাকে। নিগ্রোদের এই জিনগুলো অতিরিক্ত মেলানিন সঞ্চয়ে সাহায্য করে।

মনে করি, A ও B দুটি মেলানিনযুক্ত জিন এবং a ও b দুটি মেলানিনমুক্ত জিন।

সুতরাং নিগ্রোদের বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনোটাইপ AABB এবং শ্বেতকায়দের বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনোটাইপ aabb হবে। নিগ্রো পুরুষ (AABB) ও শ্বেতকায় স্ত্রীর (aabb) মধ্যে আন্তঃবিবাহ হলে F_1 বংশের সকল সন্তান মিউল্যাটো বা মাঝারি বর্ণের (AaBb) হয়। F_1 জনুর মিউল্যাটোদের মধ্যে বিয়ে হলে F_2 জনুতে ১/১৬ নিগ্রো (AABB) এবং ১/১৬ শ্বেতকায় (aabb) হয়। অবশিষ্টগুলো নানা রঙের বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং তা বর্ণসৃষ্টিকারী জিনগুলোর ওপর নির্ভর করে। ফলাফলটি নিচে ছক ও চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো–

পিতামাতা (P_1): ফিনোটাইপ ⟶ ♂ নিগ্রো × ♀ শ্বেতকায়

জিনোটাইপ ⟶ AABB aabb

গ্যামিট ⟶ (AB) (ab)

F_1 জনু : জিনোটাইপ ⟶ AaBb

ফিনোটাইপ ⟶ সবাই মিউল্যাটো (অন্তর্বর্তী রং বা মাঝারি বর্ণ)

F_2 জনু

পিতামাতা (P_2) : ফিনোটাইপ ⟶ ♂ মিউল্যাটো × ♀ মিউল্যাটো

জিনোটাইপ ⟶ AaBb AaBb

গ্যামিট ⟶ (AB) (Ab) (aB) (ab) (AB) (Ab) (aB) (ab)

♀ গ্যামিট \ ♂ গ্যামিট	(AB)	(Ab)	(aB)	(ab)
(AB)	AABB নিগ্রো	AABb কালো	AaBB কালো	AaBb মিউল্যাটো
(Ab)	AABb কালো	AAbb মিউল্যাটো	AaBb মিউল্যাটো	Aabb হালকা রং
(aB)	AaBB কালো	AaBb মিউল্যাটো	aaBB মিউল্যাটো	aaBb হালকা রং
(ab)	AaBb মিউল্যাটো	Aabb হালকা রং	aaBb হালকা রং	aabb শ্বেতকায়

ফলাফল : নিগ্রো (কুচকুচে কালো) = $^{১}/_{১৬}$, কালো (মিউল্যাটোদের চেয়ে কালো) = $^{৪}/_{১৬}$, মিউল্যাটো (অন্তর্বর্তী রং বা মাঝারি বর্ণ) = $^{৬}/_{১৬}$, হালকা রং (মিউল্যাটোদের চেয়ে ফর্সা) = $^{৪}/_{১৬}$ ও শ্বেতকায় (ফর্সা) = $^{১}/_{১৬}$

সুতরাং অপত্যদের মধ্যে রঙের বিভিন্ন মাত্রার অনুপাত = নিগ্রো : কালো : মিউল্যাটো : হালকা রং : শ্বেতকায় = ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১।

১১.৫ লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি (Principle of Sex determination, XX-XY, XX-XO)

সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা জানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের আদিকাল থেকেই। আজ পর্যন্ত কোনো পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি, যা দ্বারা এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব। মানুষের এই জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব না পাওয়া গেলেও মানুষসহ অন্যান্য এক লিঙ্গিক প্রাণীদের লিঙ্গ নির্ধারণ কৌশল জানা গেছে। যে জীবতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীবের লিঙ্গ সংক্রান্ত

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্যাবলী অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ নির্ধারিত হয় তাকে **লিঙ্গ নির্ধারণ** (sex determination) বলে। যেসব ক্রোমোজোম জীবের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তাদের অটোজোম বলে। যেমন, মানুষের প্রতিকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে ২২ জোড়াই উভয় লিঙ্গে একই রকম এবং সেগুলোকে অটোজোম বলে। এদের A দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেসব ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে অর্থাৎ জীবের পুরুষ কিংবা স্ত্রী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের **সেক্স ক্রোমোজোম** বা **হেটারোজোম** (sex chromosome or heterosome) বা **অ্যালোজোম** বলে। যেমন– মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে মাত্র এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম। এদের X ও Y বা O দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মানুষের কোনো জাইগোটে (ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে সৃষ্ট ভ্রূণকোষ) XY থাকলে পুত্র সন্তান এবং XX থাকলে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। স্ত্রী সদস্যে যেসব গ্যামিট সৃষ্টি হয় তাতে শুধু একই রকম X ক্রোমোজোম থাকে বিধায় তাদেরকে **হোমোগ্যামিটিক সেক্স** (homogametic sex) এবং এসব গ্যামিটকে **হোমোগ্যামিট** (homogamete) বলে। অপরদিকে, পুরুষ সদস্যে দু'ধরনের গ্যামিট সৃষ্টি হয়। এক ধরনের গ্যামিটে X ক্রোমোজোম এবং অন্য ধরনের গ্যামিটে Y ক্রোমোজোম থাকে। গ্যামিটের ভিন্নতার কারণে পুরুষরা **হেটারোগ্যামিটিক সেক্সের** (heterogametic sex) অধিকারী হয় এবং এসব গ্যামিটকে **হেটারোগ্যামিট** (heterogamete) বলে।

Stevens, Wilson, Morgan প্রমুখ বিজ্ঞানী প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণে সেক্স ক্রোমোজোমের ভূমিকার গবেষণালব্ধ বিভিন্ন কৌশলের বিবরণ উপস্থাপন করেন। নিম্নলিখিত উপায়ে সেক্স ক্রোমোজোম পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারিত হয় :

ধরন	হেটারোজাইগাস	শুক্রাণু	ডিম্বাণু	স্ত্রী	পুরুষ	যেসব প্রাণীতে ঘটে
XX-XY	পুরুষ	X ও Y	X	XX	XY	*Drosophila*-সহ বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ এবং মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী।
XX-XO	পুরুষ	X ও O	X	XX	XO	ঘাসফড়িং, গান্ধিপোকা, আরশোলা, ছারপোকা, অর্থোপ্টেরা ও হেটারোপ্টেরা শ্রেণিভুক্ত প্রাণী ইত্যাদি পতঙ্গ।
ZZ-ZW	স্ত্রী	Z	Z ও W	ZW	ZZ	পাখি, প্রজাপতি ও কিছু মাছ।
ZZ-ZO	স্ত্রী	Z	Z ও O	ZO	ZZ	কিছু মথ ও প্রজাপতি।

সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত লিঙ্গ নির্ধারণের দুটি নীতি আলোচনা করা হলো :

১। XX-XY নীতি : মানুষসহ প্রায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী ও অনেক নিম্ন শ্রেণির প্রাণী (যেমন– ড্রসোফিলা, বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ ইত্যাদি) এবং কিছু উদ্ভিদেও (যেমন– গাঁজা, তেলাকুচা, ইলোডিয়া ইত্যাদি) এই প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। **N. Stevens** এবং **E. B. Wilson** (1905) প্রথম এ পদ্ধতি বর্ণনা করেন। এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রাণীরা কোষে দুটি X-ক্রোমোজোম বহন করে। কিন্তু পুরুষ প্রাণীরা কোষে একটি X ক্রোমোজোম ও একটি Y ক্রোমোজোম বহন করে। ফলে XX ক্রোমোজোম সমন্বয়ের জন্য কন্যা এবং XY সমন্বয়ের জন্য পুত্র সন্তান সৃষ্টি হয়। এ কারণে স্ত্রী প্রাণীদের হোমোগ্যামিটিক অর্থাৎ গ্যামিট তৈরির সময় একই রকমের (শুধু X ক্রোমোজোমযুক্ত) গ্যামিট উৎপন্ন করে। অপরদিকে পুরুষদের হেটারোগ্যামিটিক বলা হয় কারণ তারা X ও Y ক্রোমোজোমযুক্ত দু'ধরনের গ্যামিট উৎপন্ন করে।

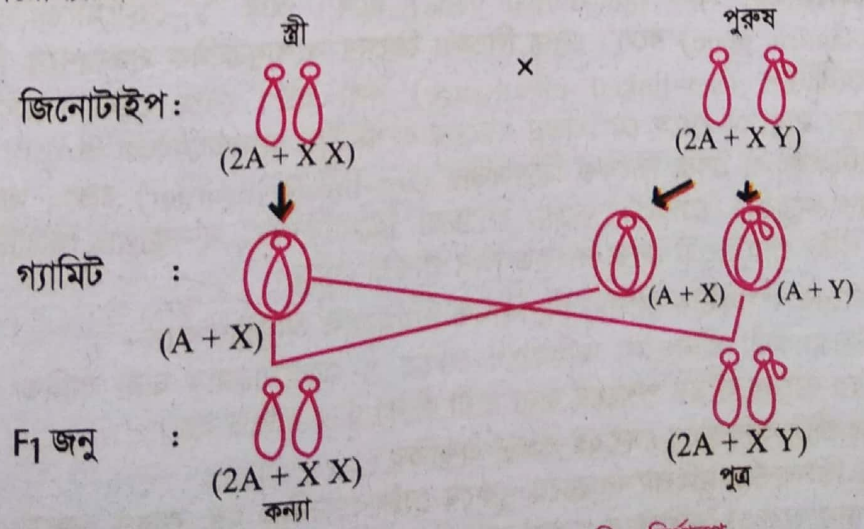

চিত্র ১১.৩ক : XX-XY পদ্ধতি দ্বারা মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ

Scanned with CamScanner

২। XX-XO নীতি : ঘাসফড়িং, গান্ধি পোকা, আরশোলা, ছারপোকা, অর্থোপ্টেরা ও হেটারোপ্টেরা ইত্যাদি পতঙ্গ শ্রেণিভুক্ত প্রাণীদের স্ত্রী হোমোগ্যামিটিক। এদের দুটি XX ক্রোমোজোম থাকায় প্রতিটি ডিম্বাণু একটি 'X' ক্রোমোজোম বহন করে। অপরদিকে পুরুষ প্রাণীদের মাত্র একটি X ক্রোমোজোম থাকে, কোনো Y ক্রোমোজোম থাকে না। অর্থাৎ স্ত্রী ক্রোমোজোম 2A + XX এবং পুরুষের ক্রোমোজোম 2A + XO (Y না থাকায় 'O' শূন্য লেখা হয়।) স্ত্রী হোমোগ্যামিটিক, ফলে সমস্ত ডিম্বাণু একই ধরনের (A+X)। কিন্তু পুরুষে দু'ধরনের গ্যামিট (A + X) ও (A + O) উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রকারের শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনে অপত্য স্ত্রী (2A+XX), অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকার শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনে অপত্য পুরুষ (2A+XO) সৃষ্টি হয়।

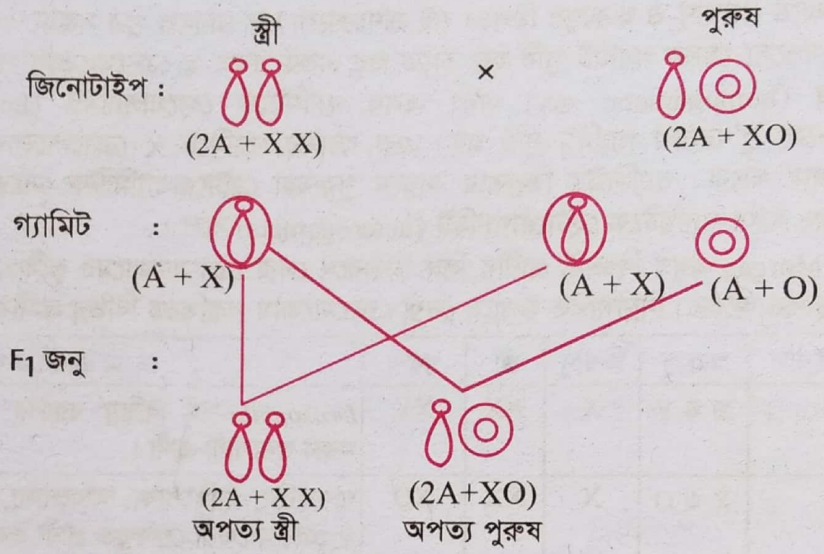

চিত্র ১১.৩খ : XX-XO পদ্ধতি দ্বারা পতঙ্গের লিঙ্গ নির্ধারণ

১১.৬ সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (Sex Linked Disorder)

মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম আছে। এর মধ্যে ২২ জোড়া ক্রোমোজোম দেহ গঠন করে, এদের **অটোজোম** (autosome) বলে। বাকি ১ জোড়া ক্রোমোজোম লিঙ্গ নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে, এদের **সেক্স ক্রোমোজোম** (sex-chromosome) বলে। সেক্স ক্রোমোজোমকে **আলোজোমও** (allosome) বলে। এদের X ও Y দ্বারা প্রকাশ করা হয়। লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোমকে XY এবং মহিলাদের লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোমকে XX রূপে চিহ্নিত করা হয়। কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন সেক্স ক্রোমোজোমের ওপর অবস্থান করে। যেসব জিন সেক্স ক্রোমোজোমে অবস্থান করে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাদের **সেক্স লিংকড জিন** (sex-linked gene) বলে।

সাধারণত 'X'-ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোকে **সেক্স লিংকড জিন** (sex-linked gene) **বলে**। অটোজোম বাহিত জিনকে **অটোজোমাল জিন** (autosomal gene) বলে। আর 'Y'-ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোকে **হোলান্ড্রিক জিন** (holandric gene) বলে। **সেক্স লিংকড জিনের বংশানুক্রমিক সঞ্চারণকে লিঙ্গ জড়িত বংশগতি** বা **সেক্স লিংকড ইনহেরিট্যান্স** (sex-linked inheritance) বলা হয়। সেক্স ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর অস্বাভাবিকতার কারণে মানুষের দেহে যে বিভিন্ন ধরনের বংশগতীয় অস্বাভাবিকতা ও রোগ সৃষ্টি হয় তাদের একত্রে **লিঙ্গ জড়িত অস্বাভাবিকতা** বা **সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার** (sex-linked disorder) বলে। মানুষের 'X'-ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিন নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি ডিসঅর্ডার হলো- বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি, মায়োপিয়া, রাতকানা ইত্যাদি। মানুষে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০টি সেক্স-লিংকড জিন পাওয়া গেছে।

সেক্সলিংকড ডিসঅর্ডারের বংশগতীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলি অনুসরণ করে–

১। বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জীনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে X ক্রোমোজোম দ্বারা বাহিত হয়, তবে কিছুক্ষেত্রে Y ক্রোমোজোম (মানুষের কানের লতির পশমের জন্য দায়ী জীন) দ্বারা বাহিত হয়।

২। এসব রোগের জীন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির।

৩। সেক্স-লিংকড ডিসঅর্ডার মহিলাদের চেয়ে পুরুষে বেশি প্রকাশিত হয়, কারণ পুরুষে এ জীন উপস্থিত থাকলেই (অর্থাৎ হেটারোজাইগাস হলেও) বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে কিন্তু স্ত্রীদের হোমোজাইগাস অবস্থায় প্রকাশ ঘটে।

Scanned with CamScanner

৪। সেক্স-লিংকড ডিসঅর্ডার বৈশিষ্ট্যধারী পুরুষের সকল কন্যা সন্তানই এই বৈশিষ্ট্যের বাহক হবে, কোন পুত্র সন্তানে এ জিন সঞ্চারিত হয় না।

৫। সেক্স-লিংকড ডিসঅর্ডার বৈশিষ্ট্যধারী স্ত্রীর সকল পুত্র সন্তানে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে, কিন্তু কন্যারা বাহক হয়।

৬। সাধারণত বৈশিষ্ট্যটি একটি generation skip করে। কারণ জিনটি দাদা থেকে বাহক কন্যার মাধ্যমে নাতিতে সঞ্চারিত হয়।

৭। পিতার সেক্স-লিংকড ডিসঅর্ডার কন্যার মধ্য দিয়ে দৌহিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, একে **ক্রিস-ক্রস ইনহেরিট্যান্স** (criss-cross inheritance) বলে।

[প্রাসঙ্গিক তথ্য : ক্রিস-ক্রস বংশানুক্রম (Criss-cross inheritance) : X ক্রোমোজোম সংশ্লিষ্ট বংশগতির ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যটি পুরুষে প্রকাশিত হলে পরবর্তী ক্ষেত্রে তা কন্যা (F_1 জনু) → নাতি (F_2 জনু) → প্রপৌত্রী → (F_3 জনু)-এই অনুক্রমে সঞ্চারিত হয়। এভাবে সঞ্চারণের সময় পুরুষে ওই জিনের (বা রোগের) বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে, কিন্তু মহিলারা কেবল রোগটির বাহক হয়। এই ধরনের বংশগতির ধারাকে ক্রিস-ক্রস বংশানুক্রম বলে। যেমন– লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রিস-ক্রস বংশানুক্রম দেখা যায়।]

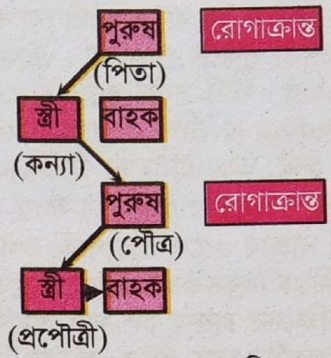

বংশানুক্রমের প্রকৃতি

মানুষের কয়েকটি সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (লিঙ্গ জড়িত অস্বাভাবিকতা)

সেক্স লিংকড	বিবরণ
১। লাল বর্ণান্ধতা (Red colour blindness)	রেটিনায় অস্বাভাবিক লাল কোণ (cone) পিগমেন্টের উপস্থিতির কারণে লাল বর্ণ অনুধাবনে অক্ষমতা।
২। সবুজ বর্ণান্ধতা (Green colour blindness)	রেটিনায় অস্বাভাবিক সবুজ কোণ পিগমেন্টের উপস্থিতির কারণে সবুজ বর্ণ অনুধাবনে অক্ষমতা।
৩। হিমোফিলিয়া-A (Haemophilia -A)	Clotting factor VIII এর অনুপস্থিতির জন্য রক্ত তঞ্চনে (blood clotting) অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ।
৪। হিমোফিলিয়া-B (Haemophilia- B)	Clotting factor XI এর অনুপস্থিতির জন্য রক্ত তঞ্চনে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ।
৫। এনহাইড্রোটিক এক্টোডার্মাল ডিসপ্লাসিয়া (Anhidrotic ectodermal dysplasia)	দাঁত, লোম এবং ঘর্মগ্রন্থির অনুপস্থিত।
৬। রাতকানা (Night blindness)	রাতে কোনো জিনিস দেখতে অসুবিধা বোধ করা।
৭। মায়োপিয়া (Myopia)	দৃষ্টিক্ষীণতা, নিকটের জিনিস ভালোভাবে দেখতে না পারা।
৮। অপটিক এট্রফি (Optic atrophy)	অপটিক নার্ভের ক্ষয়িষ্ণুতা।
৯। হোয়াইট ফোরলক (White forelock)	মাথার চুল আংশিক সাদা হওয়া।
১০। ডুশিনি মাসকুলার ডিস্ট্রপি (Duchenee Muscular dystrophy- DMD)	পেশির জটিলতায় ১০ বছরের মধ্যেই চলনশক্তি লোপ পায় এবং কদাচিৎ ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।
১১। জুভেনাইল গ্লুকোমা (Juvenile glucoma)	চক্ষুগোলকের কাঠিন্য এবং ছানি পড়া।
১২। টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন (Testicular feminization)	পুরুষ ধীরে ধীরে স্ত্রীতে পরিণত হয়।
১৩। ফ্রাজাইল X সিন্ড্রোম (Fragile X syndrome)	অটিজম ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা।
১৪। স্প্যাজটিক প্যারাপেলাজিয়া (Spastic paraplegia)	মাংসপেশির আংশিক অবশতা ও অনিয়ত কাঠিন্য।
১৫। হাইপারট্রাইকোসিস (hipertricosis)	সমগ্র দেহে ঘন লোমের উপস্থিতি।
১৬। ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (Diabetes Insupidus)	অধিক মূত্রত্যাগ (copious urination), শারীরিক অক্ষমতা।

Scanned with CamScanner

নিচে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (**বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া** এবং **মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি**) নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. বর্ণান্ধতা (Colour Blindness)

লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (Red Green Colour Blindness) : **যে বংশগত রোগে, কোনো মানুষ বিভিন্ন বর্ণের বিশেষত লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য করতে পারে না বা চিনতে পারে না, সেই প্রকার অস্বাভাবিকতাকে বর্ণান্ধতা (colour blindness) বলে**। মানুষের 'X' ক্রোমোজোমে বিদ্যমান প্রকট জিন চোখের রেটিনার বর্ণ শনাক্তকারী কোণ কোষগুলোর স্বাভাবিক গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মিউটেশনের কারণে এই জিনের একটি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল সৃষ্টি হয়, যেটি রেটিনার লাল-সবুজ বর্ণ সংবেদী কোণ কোষগুলোর গঠন ব্যাহত করে। ফলে এই প্রচ্ছন্ন জিনধারী মানুষ লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না। একে **লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা** (red-green colour blindness) বলে। এটি একটি লিঙ্গ জড়িত রোগ। লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা রোগটিই বর্ণান্ধ মানুষের মাঝে সর্বাধিক (প্রায় ৯৫%) পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানী **John Dalton** এ রোগ সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশ করেন। এ জন্য রোগটিকে **Daltonism** বলে। **এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই**, তবে **ইসিহারা টেস্ট** (ishihara colour test)-এর মাধ্যমে বর্ণান্ধতা পরীক্ষা করা হয়।

লাল-সবুজ বর্ণান্ধতার রোগী যে সমস্ত সমস্যায় পড়তে পারে :

(১) বাজার থেকে কাঁচাপাকা ফল ও শাকসবজি কেনাকাটায় সমস্যা হতে পারে। (২) পছন্দের রঙিন ফুল কিনে উপহার দিতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে পারে। (৩) ট্রাফিক সংকেত হিসেবে লাল ও সবুজ আলো ব্যবহৃত হয়। তাই বর্ণান্ধ ব্যক্তিদের রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা হতে পারে। (৪) রঙিন জামা-কাপড় কেনার ক্ষেত্রে বর্ণান্ধ মানুষ বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। সুতরাং বিয়ের আগে বর্ণান্ধতার বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা :

মনে করি, দৃষ্টির স্বাভাবিক জিন = X^+
বর্ণান্ধতা নিয়ন্ত্রণকারী জিন = X^C
∴ স্বাভাবিক দৃষ্টির পুরুষের জিনোটাইপ = X^+Y
স্বাভাবিক দৃষ্টির মহিলার জিনোটাইপ = X^+X^+
বর্ণান্ধ পুরুষের জিনোটাইপ = X^cY
বর্ণান্ধ মহিলার জিনোটাইপ = X^cX^c
এবং বাহক মহিলার জিনোটাইপ = X^+X^c



বর্ণান্ধতার পরীক্ষা (ইশিহারা টেস্ট)



স্বাভাবিক ও বর্ণান্ধ মানুষ যেভাবে আপেলের রঙ দেখতে পান

(ক) বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহিলার মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে

বর্ণান্ধ পুরুষ ও **স্বাভাবিক** দৃষ্টিসম্পন্ন মহিলার সঙ্গে বিয়ে হলে F_1 বংশের সকল সন্তান স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন (এদের মধ্যে কন্যারা বর্ণান্ধতার বাহক হয়) হবে এবং পরবর্তী বংশের অর্ধেকে এ জিন সঞ্চারিত হয়।

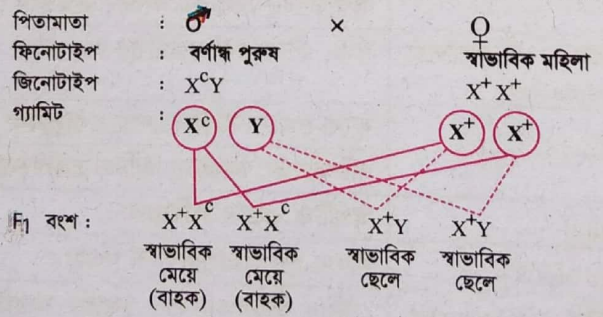

F_1 বংশের ফলাফল : স্বাভাবিক মেয়ে কিন্তু বর্ণান্ধতার বাহক (X^+X^C) = ৫০% এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছেলে (X^+Y) = ৫০%

F_1 বংশের **স্বাভাবিক** দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে **বর্ণান্ধবাহক** মহিলার বিয়ে হলে F_2 বংশে চার সন্তানের মধ্যে দু'জন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন কন্যা (এদের মধ্যে এক কন্যা বর্ণান্ধতার বাহক), একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুত্র এবং একজন বর্ণান্ধ পুত্র জন্মলাভ করে।

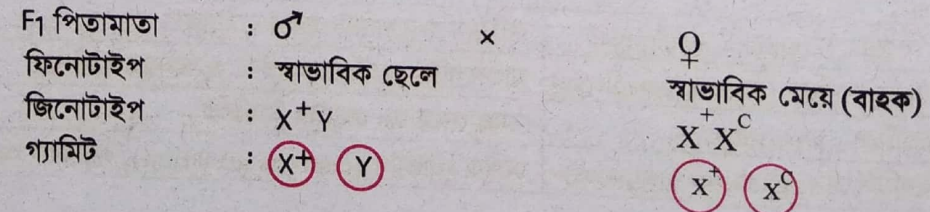

Scanned with CamScanner

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	X^+	Y
X^+	X^+X^+ স্বাভাবিক মেয়ে	X^+Y স্বাভাবিক ছেলে
X^C	X^+X^C স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)	X^CY বর্ণান্ধ ছেলে

এ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বর্ণান্ধ পিতার স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন কন্যার অর্ধেক পুত্র হবে বর্ণান্ধ ও অপর অর্ধেক পুত্র হবে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন। এভাবে বৈশিষ্ট্যটি কন্যার মাধ্যমে বাহিত হয়ে নাতির মধ্যে প্রকাশিত হয়।

F_2 বংশের ফলাফল : স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মেয়ে $(X^+X^+) = ২৫\%$, স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছেলে, $(X^+Y) = ২৫\%$, স্বাভাবিক মেয়ে কিন্তু বর্ণান্ধতার বাহক $(X^+X^C) = ২৫\%$ এবং বর্ণান্ধ ছেলে $(X^CY) = ২৫\%$

(খ) স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ ও বর্ণান্ধ মহিলার মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে

স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো পুরুষের সঙ্গে **বর্ণান্ধ** মহিলার বিয়ে হলে F_1 বংশের সকল পুত্রসন্তানই বর্ণান্ধ এবং কন্যাসন্তান স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন (সকলেই বর্ণান্ধতার বাহক) হবে।

পিতামাতা : ♂ × ♀
ফিনোটাইপ : স্বাভাবিক পুরুষ — বর্ণান্ধ মহিলা
জিনোটাইপ : X^+Y — X^CX^C
গ্যামিট : X^+, Y — X^C, X^C

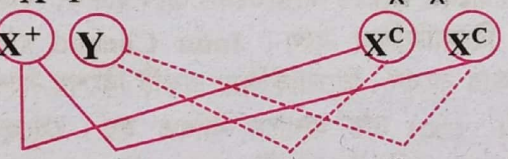

F_1 বংশ : X^+X^C (স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)), X^+X^C (স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)), X^CY (বর্ণান্ধ ছেলে), X^CY (বর্ণান্ধ ছেলে)

F_1 বংশের ফলাফল : স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মেয়ে কিন্তু বর্ণান্ধতার বাহক $(X^+X^C) = ৫০\%$ এবং বর্ণান্ধ ছেলে $(X^CY) = ৫০\%$।

F_1 বংশের জিনোটাইপধারী পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে F_2 বংশে ১টি করে বর্ণান্ধ পুত্র ও কন্যা এবং ১টি করে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুত্র ও কন্যা (বর্ণান্ধতার বাহক) পাওয়া যাবে।

F_1 পিতামাতা : ♂ × ♀ স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)
ফিনোটাইপ : বর্ণান্ধ ছেলে — X^+X^C
জিনোটাইপ : X^CY
গ্যামিট : X^C, Y — X^+, X^C

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	X^C	Y
X^+	X^+X^C স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)	X^+Y স্বাভাবিক ছেলে
X^C	X^CX^C বর্ণান্ধ মেয়ে	X^CY বর্ণান্ধ ছেলে

F_2 বংশের ফলাফল : স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মেয়ে কিন্তু বর্ণান্ধতার বাহক $(X^+X^C) = ২৫\%$, স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছেলে $(X^+Y) = ২৫\%$, বর্ণান্ধ মেয়ে $(X^CY^C) = ২৫\%$ এবং বর্ণান্ধ ছেলে $(X^CY) = ২৫\%$।

উল্লেখিত পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বর্ণান্ধ মহিলার সকল পুত্রই বর্ণান্ধ ও কন্যারা স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন (সকলেই বর্ণান্ধতার বাহক) এবং একজন বর্ণান্ধ মহিলার পিতা সবসময়ই বর্ণান্ধ আর মাতা হবে একজন বাহক।

Scanned with CamScanner

মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা বেশি বর্ণান্ধ হয় : কারণ–

১। বর্ণান্ধতার জিনটি X-ক্রোমোজোমে অবস্থিত ও এটি প্রচ্ছন্নধর্মী হওয়ায় পুরুষে এই বৈশিষ্ট্য হেমিজাইগাস অবস্থায় অর্থাৎ পুরুষে X-ক্রোমোজোমে বর্ণান্ধের জিন থাকলেই (X^CY) প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু মহিলাদের এই বৈশিষ্ট্য হোমোজাইগাস অবস্থা (X^CX^C) ছাড়া প্রকাশ পায় না।

২। কোনো মহিলা যদি তার পিতা অথবা মাতা যেকোনো একজনের নিকট থেকে বর্ণান্ধতার প্রচ্ছন্ন জিন (X^C) এবং অন্যজনের নিকট থেকে স্বাভাবিক প্রকট জিন (X^+) পায় তাহলে সে হেটারোজাইগাস অবস্থা (X^+X^C) প্রাপ্ত হয়। ফলে এ অবস্থায় মহিলা বর্ণান্ধতা জিনের বাহক হয় এবং বাহক মহিলারা কখনো বর্ণান্ধ হয় না। আবার পুরুষ কখনো বাহক হতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, বর্ণান্ধতা মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরই বেশি হয়।

বিভিন্ন ধরনের পিতামাতার পুত্র ও কন্যার বর্ণান্ধতার তালিকা নিম্নরূপ–

মাতা × পিতা		কন্যা			পুত্র	
		স্বাভাবিক	বাহক	বর্ণান্ধ	স্বাভাবিক	বর্ণান্ধ
(১) স্বাভাবিক	বর্ণান্ধ	–	১০০%	–	১০০%	–
(২) বাহক	স্বাভাবিক	৫০%	৫০%	–	৫০%	৫০%
(৩) বর্ণান্ধ	স্বাভাবিক	–	১০০%	–	–	১০০%
(৪) বাহক	বর্ণান্ধ	–	৫০%	৫০%	৫০%	৫০%

তালিকার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে বর্ণান্ধতার মাত্রা বেশি।

২. হিমোফিলিয়া (Haemophilia) বা ব্লিডার্স ডিজিস (Bleeder's Disease)

মানুষের যে বংশগত রোগের কারণে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান (ক্ষত, কাটা স্থান) থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না অর্থাৎ রক্ত জমাট বাঁধে না তাকে হিমোফিলিয়া বলে। **John Conrad Otto** (1803; Philadelphia physician) প্রথম হিমোফিলিয়া রোগ আবিষ্কার করেন। হিমোফিলিয়া একটি বিশেষ বংশগত রোগ যা 'X' ক্রোমোজোমের একটি প্রচ্ছন্ন **মিউট্যান্ট জিন** (mutant gene) এর মাধ্যমে বাহিত হয়। যেহেতু হিমোফিলিয়া প্রচ্ছন্ন জিন, তাই এই রোগ স্ত্রীলোকদের সাধারণত হয় না। যদি কোনো স্ত্রী লোকের উভয় 'X' ক্রোমোজোমই এই প্রকার জিন বহন করে কেবল সে ক্ষেত্রেই স্ত্রীলোকদের হিমোফিলিয়া হতে পারে। স্ত্রীলোক এই রোগের বাহক। কেবল পুত্রসন্তানদের ক্ষেত্রেই এই রোগ প্রকাশ পায়। হিমোফিলিয়ায় মহিলা অপেক্ষা পুরুষরাই বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। সাধারণত হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত পুরুষ এবং মহিলারা ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই রক্তক্ষরণজনিত কারণে মারা যায়।

হিমোফিলিয়ার প্রকারভেদ : হিমোফিলিয়া প্রধানত দু-প্রকারের হয়ে থাকে। যথা–

(ক) হিমোফিলিয়া A বা ক্ল্যাসিক্যাল হিমোফিলিয়া (Classical Haemophilia) **বা রয়্যাল হিমোফিলিয়া** (Royal haemophilia) **:** এইরূপ হিমোফিলিয়া রক্তের প্লাজমার **অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর** (Antihilic factor-AHF) বা **ফ্যাক্টর VIII**-এর অভাবের জন্য ঘটে। এই ফ্যাক্টরটি 'HEM-A' জিনের সাহায্যে উৎপাদিত হয়। প্রায় ৮০% হিমোফিলিয়া এই প্রকারের হয়। এ রকম হিমোফিলিয়ায় প্রায় ১০,০০০ জন পুরুষে একজন আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) হিমোফিলিয়া B বা খ্রিষ্টমাস রোগ (Christmas disease) **:** স্ফিফেন খ্রিষ্টমাস নামে একজন রোগীর দেহে এই রোগ প্রথম ধরা পড়ে বলে একে খ্রিষ্টমাস রোগও বলে। এইরূপ হিমোফিলিয়া মানুষের রক্তে **প্লাজমা থ্রোম্বোপ্লাসটিন** (Plasma thromboplastin) বা ক্রিসমাস ফ্যাক্টর বা **ফ্যাক্টর IX**-এর অভাবে ঘটে। এই ফ্যাক্টর **'HEM-B'** জিনের সাহায্য উৎপাদিত হয়। প্রায় ২০% হিমোফিলিয়া এই প্রকারের হয়।

HEM-A ও HEM-B জিন দুটি মানুষের ক্রোমোজোমে বেশ খানিকটা ব্যবধানে অবস্থান করে। X ক্রোমোজোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন জিনের বহিঃপ্রকাশে এই রোগ ঘটে। হিমোফিলিয়া-A রাজকীয় হিমোফিলিয়া (royal haemophilia) নামেও পরিচিত। কারণ, এই রোগ ইউরোপের রাজপরিবারে খুব বেশি মাত্রায় ঘটেছিল। ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়া সর্বপ্রথম এই রোগের প্রচ্ছন্ন জিনটির ধারণ করেন (বাহক) ও পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করেন। উল্লেখ্য যে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার চার কন্যার মধ্যে দুই কন্যা (**অ্যালিস ও বিয়াট্রিশ**) হিমোফিলিয়া রোগের বাহক ছিলেন।

এছাড়াও **হিমোফিলিয়া C** (Haemophilia C) নামক অটোজোমাল রোগ দেখা যায়। এটি লিঙ্গ সংশ্লিষ্ট রোগ নয়। অটোজোমে অবস্থিত একটি প্রচ্ছন্ন জিন যা XI নম্বর ফ্যাক্টর বা Plasma thromboplastin antecedent (PTA) এর অস্বাভাবিক সংশ্লেষ ঘটায়। ফলে রক্তজমাট বাধাপ্রাপ্ত হয়। হিমোফিলিয়া 'C' আক্রান্ত ব্যক্তিরা মোট হিমোফিলিয়া আক্রান্তদের ১%-এরও কম।

Scanned with CamScanner

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা :

মনে করি, হিমোফিলিয়া নিয়ন্ত্রণকারী জিন = X^h এবং স্বাভাবিক (প্রকট জিন) জিন = X^H
সুতরাং হিমোফিলিয়াক পুরুষের জিনোটাইপ = X^hY; হিমোফিলিয়াক স্ত্রীলোকের জিনোটাইপ = $X^h X^h$
স্বাভাবিক পুরুষের জিনোটাইপ = $X^H Y$; স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের জিনোটাইপ = $X^H X^H$ এবং হিমোফিলিয়ার বাহক কিন্তু স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের জিনোটাইপ = $X^H X^h$

(ক) হিমোফিলিয়া পুরুষ ও স্বাভাবিক মহিলার মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে

একজন হিমোফিলিয়া পুরুষের সঙ্গে একজন স্বাভাবিক মহিলার বিয়ে হলে কেমনভাবে সন্তান-সন্ততিতে হিমোফিলিয়ার সঞ্চারণ ঘটবে তা নিচে দেখানো হলো–

পিতামাতা : ♂ × ♀
ফিনোটাইপ : হিমোফিলিয়াক পুরুষ — স্বাভাবিক মহিলা
জিনোটাইপ : $X^h Y$ — $X^H X^H$
গ্যামিট : X^h, Y — X^H, X^H

F_1 বংশ : X^HX^h (স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)), X^HX^h (স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)), X^HY (স্বাভাবিক ছেলে), X^HY (স্বাভাবিক ছেলে)

F_1 বংশের ফলাফল : হিমোফিলিয়ার বাহক কিন্তু স্বাভাবিক কন্যা $(X^H X^h) = ৫০\%$ এবং স্বাভাবিক পুত্র $(X^H Y) = ৫০\%$

F_2 বংশের ফলাফল (চেকার বোর্ডের সাহায্যেও দেখানো যায়) :

F_1 পিতামাতা : ♂ × ♀
ফিনোটাইপ : স্বাভাবিক ছেলে — স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)
জিনোটাইপ : $X^H Y$ — X^HX^h
গ্যামিট : X^H, Y — X^H, X^h

F_2 বংশ : X^HX^H (স্বাভাবিক মেয়ে), X^HX^h (স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)), X^HY (স্বাভাবিক পুরুষ), X^hY (হিমোফিলিয়াক পুরুষ)

ফলাফল : স্বাভাবিক কন্যা $(X_H X_H) = ২৫\%$, হিমোফিলিয়ার বাহক কিন্তু স্বাভাবিক কন্যা $(X_H X_h) = ২৫\%$, স্বাভাবিক পুত্র $(X_H Y) = ২৫\%$ এবং হিমোফিলিয়াক পুত্র $(X_h Y) = ২৫\%$।

(খ) স্বাভাবিক পুরুষ ও হিমোফিলিয়া মহিলার মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে

স্বাভাবিক পুরুষ ও হিমোফিলিয়াক মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে কেমনভাবে সন্তান-সন্ততিতে হিমোফিলিয়ার সঞ্চারণ ঘটবে তা নিচে দেখানো হলো :

F_1 পিতামাতা : ♂ × ♀
ফিনোটাইপ : স্বাভাবিক পুরুষ — হিমোফিলিয়াক মহিলা
জিনোটাইপ : X^HY — X^hX^h
গ্যামিট : X^H, Y — X^h, X^h

F_2 বংশ : X^HX^h (স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)), X^HX^h (স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)), X^hY (হিমোফিলিয়াক ছেলে), X^hY (হিমোফিলিয়াক ছেলে)

Scanned with CamScanner

F_1 বংশের ফলাফল : হিমোফিলিয়ার বাহক কিন্তু স্বাভাবিক কন্যা $(X^HX^h) = ৫০\%$ এবং হিমোফিলিয়াক পুত্র $(X^hY) = ৫০\%$

F_2 বংশের ফলাফল (চেকার বোর্ডের সাহায্যেও দেখানো যায়) :

F_1 পিতামাতা : ♂ × ♀

ফিনোটাইপ : হিমোফিলিয়াক পুরুষ — স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)

জিনোটাইপ : X^hY — X^HX^h

গ্যামিট : X^h, Y — X^H, X^h

F_2 বংশ : X^hX^H (স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)), X^hX^h (স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)), X^HY (হিমোফিলিয়াক ছেলে), X^hY (হিমোফিলিয়াক ছেলে)

ফলাফল : হিমোফিলিয়ার বাহক কিন্তু স্বাভাবিক কন্যা $(X^HX^h) = ২৫\%$, হিমোফিলিয়াক কন্যা $(X^hX^h) = ২৫\%$, স্বাভাবিক পুত্র $(X^HY) = ২৫\%$ এবং হিমোফিলিয়াক পুত্র $(X^hY) = ২৫\%$।

৩. মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি (Muscular Dystrophy)

মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি একটি সেক্স লিংকড বৈশিষ্ট্য। ইহা বর্ণান্ধতা ও হিমোফিলিয়ার মতো প্রচ্ছন্ন জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জিন শুধু 'X' ক্রোমোজোমে পাওয়া যায় এবং এটি **ডিস্ট্রফিন** (dystrophin) নামক এক ধরনের প্রোটিন (এনজাইম) তৈরি করে যা ফাইব্রাস টিস্যু দ্বারা পেশির প্রতিস্থাপন ঘটায়। মানবদেহে ত্রিশের অধিক মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি রয়েছে। এদের মধ্যে **ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি** (Duchenne Muscular Dystrophy-DMD) সবচেয়ে জটিল। ফরাসি স্নায়ুবিশেষজ্ঞ **G. B. A. Duchenne** (1806-1875) এর নামানুসারে এই রোগের নামকরণ করা হয়েছে। মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি একটি দুর্লভ জিনঘটিত রোগ, যাকে শিশুদের পেশি ক্ষয়ে যাওয়া রোগও বলা হয়। ছেলে শিশুরাই এ রোগ দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত শিশুর শারীরিক কর্মকাণ্ডে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় শৈশবকাল থেকেই। ফাইব্রাস টিস্যু দ্বারা পেশি প্রতিস্থাপিত হওয়ার কারণে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সাধারণত ১০-১২ বছর বয়সেই একটি শিশুর দুটি চেয়ার সঙ্গী হয়ে যায়। পেশিক্ষয় বহাল থাকার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণত ২০ বছরের বেশি বাঁচে না। এ রোগটি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)-এ মাত্র একজনে পরিলক্ষিত হতে পারে। মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি রোগের জন্য দায়ী জিনটি X-ক্রোমোজোমে হেমিজাইগাস অবস্থায় পুরুষে রোগের প্রকাশ ঘটায় এবং হোমোজাইগাস অবস্থায় মহিলাদের ক্ষেত্রে এ রোগটি প্রকাশ পায়।


DMD আক্রান্ত বালক

কিন্তু বাস্তবে এটা প্রায় অসম্ভব হয়। কেননা কোনো মহিলার মাসক্যুলার ডিস্ট্রফির একটি জিন অবশ্যই পিতার X-ক্রোমোজোম থেকে আসতে হয়। কিন্তু পুরুষ যৌন পরিপক্বতা লাভের পূর্বেই পুরোপুরি বিকলাঙ্গ হয়, এমনকি ২০ বছরের মধ্যে মারা যায়। তবে মিউটেশনের ফলে জিনটির প্রকাশ ঘটতে পারে।

মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে জিনের ভূমিকা : লিঙ্গ জড়িত বংশগতীয় যত রোগ আছে তার মধ্যে ডুশেন মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি X ক্রোমোজোম বাহিত রোগ। **ডিস্ট্রফিন** প্রোটিন উৎপন্নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জিনে কিছু বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটার ফলে তীব্র পেশি ক্ষয়িষ্ণুতার প্রকাশ ঘটে। এ ধরনের অবস্থাকে ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি বলে। পুরুষ ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি দ্বারা আক্রান্ত হয়। নারীদের এরোগ দেখা যায় না বললেই চলে। নারীরা এ রোগের বাহক হয়।

একজন স্বাভাবিক পুরুষের সাথে একজন বাহক ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিক মহিলার বিয়ে হলে– নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া যাবে :

মনে করি, ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি (DMD) নিয়ন্ত্রণকারী জিন = X^d

এবং স্বাভাবিক (প্রকট জিন) জিন = X^D

Scanned with CamScanner

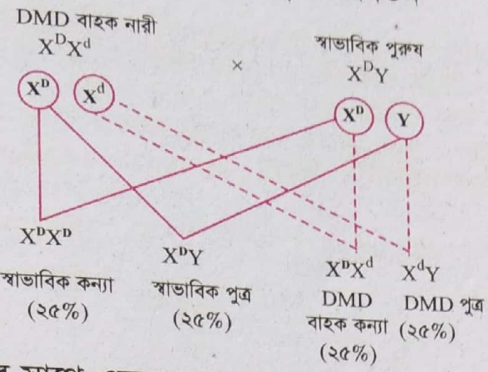

অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক পুরুষের সাথে একজন বাহক ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিক মহিলার বিয়ে হলে ৫০% পুত্রের মধ্যে এ রোগ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ৫০% কন্যা সন্তান পুনরায় বাহক হয়।

❑ **কাজ :** (i) স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন বর্ণান্ধতা বাহক কন্যা ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের বিয়ে হলে তাদের সন্তানের জিনোটাইপ বিশ্লেষণ কর।/স্বাভাবিক ছেলের সাথে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণান্ধ বাহক মেয়ের বিয়ে হলে কী অনুপাতে ঘটনাটি প্রকাশ পাবে? চেকার বোর্ডের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। (ii) স্বাভাবিক পুরুষ কিন্তু বর্ণান্ধ স্ত্রীর জিনোটাইপ ব্যাখ্যা কর। (iii) বর্ণান্ধ দম্পতির সন্তানেরা কীরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে– বিশ্লেষণ কর। (iv) স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং বর্ণান্ধ চার ভাই-বোনের জিনোটাইপ উল্লেখ কর। (v) স্বাভাবিক পুরুষ ও স্বাভাবিক (হিমোফিলিয়া বাহক) মহিলা দম্পতির প্রথম বংশধরে ফিনোটাইপ অনুপাত ব্যাখ্যা কর। (vi) একজন DMD পুরুষের সাথে একজন বাহক DMD মহিলার বিয়ে হলে তাদের সন্তান-সন্ততিদের মাঝে কী অনুপাতে DMD প্রকাশ পাবে? **তথ্য :** মনে কর, স্বাভাবিক (প্রকট জিন) জিন = X^D এবং ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি (DMD) নিয়ন্ত্রণকারী জিন = X^d।

১১.৭ রক্তের বংশগতিজনিত সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ

ABO রক্ত গ্রুপ (ABO-Blood group)

একজন মানুষের রক্ত আরেকজন মানুষের দেহে সঞ্চারণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইচ্ছামতো কোনো মানুষকে রক্ত দেওয়া যায় না। কারণ সব মানুষের রক্তের বৈশিষ্ট্য এক রকম নয়। লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমামেমব্রেনে কতগুলো অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে **ABO রক্ত গ্রুপ** বা সংক্ষেপে **রক্ত গ্রুপ** (blood group) বলা হয়। 1901 সালে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী **Karl Landsteiner** রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করেন। এজন্য **Landsteiner**-এর নামানুসারে অনেক সময় এ ব্লাড গ্রুপকে **Landsteiner-এর blood group** বলে। মানবদেহে প্রায় ৪০০ ধরনের অ্যান্টিজেন রয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র ৩০টি সম্মন্ধে ভালোভাবে জানা গেছে। 1965 সাল পর্যন্ত আরও ১৩টি ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কৃত হয়েছে। মানুষের প্রধান রক্ত গ্রুপ হলো **ABO রক্ত গ্রুপ** ও **Rh রক্ত গ্রুপ**। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রক্ত গ্রুপ হলো– MN রক্ত গ্রুপ, কেলি রক্ত গ্রুপ, লুইস রক্ত গ্রুপ, ডাফি রক্ত গ্রুপ ইত্যাদি।

অ্যান্টিজেন (antigen) এক ধরনের **প্রোটিন** বা **গ্লাইকোপ্রোটিন** জাতীয় পদার্থ যা অ্যান্টিবডি উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগায়। অ্যান্টিজেনকে **অ্যাগ্লুটিনোজেন** (agglutinogen) বা **আইসোঅ্যাগ্লুটিনোজেন**ও (isoagglutinogen) বলা হয়। এটি জেনেটিকভাবে নিয়ন্ত্রত হয় এবং ভ্রূণ অবস্থায় উৎপন্ন হয়ে আজীবন অপরিবর্তিত থাকে।

বিজ্ঞানী **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করে তা A, B, AB এবং O-এ চারটি গ্রুপের নামকরণ করেন। অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে এসকল ব্লাড গ্রুপকে এভাবে বর্ণনা করা যায়–

গ্রুপ-A : এ শ্রেণির রক্তে A অ্যান্টিজেন ও b অ্যান্টিবডি থাকে।

গ্রুপ-B : এ শ্রেণির রক্তে B অ্যান্টিজেন ও a অ্যান্টিবডি থাকে।

গ্রুপ-AB : এ শ্রেণির রক্তে A ও B অ্যান্টিজেন থাকে এবং কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না।

গ্রুপ-O : এ শ্রেণির রক্তে কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না কিন্তু a ও b অ্যান্টিবডি থাকে।

কোনো মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় যে অ্যান্টিজেন থাকে তার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে ওই মানুষের রক্তের রক্তরসে (plasma) একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। রক্তরসের ওই বিশেষ ধরনের প্রোটিনকে **অ্যান্টিবডি** (antibody) বা **অ্যাগ্লুটিনিন** (agglutinin) বলে। অ্যান্টিবডি থাকে ইম্যুনোগ্লোবিউলিনের (প্লাজমা প্রোটিন) অংশরূপে। অধিকাংশ ব্লাডগ্রুপ অ্যান্টিবডি হচ্ছে **ইম্যুনোগ্লোবিউলিন G** (Immunoglobulin G- IgG) বা **M** (IgM), কখনও কখনও **A** (IgA)। মানুষের রক্তের অ্যান্টিবডিও দুই প্রকার। যথা: anti-a, anti-b অ্যান্টিবডি। লোহিত কণিকায় A অ্যান্টিজেন যুক্ত রক্তের প্লাজমায় anti-b এবং B অ্যান্টিজেনযুক্ত রক্তের প্লাজমায় anti-a অ্যান্টিবডি থাকে। লোহিত কণিকায় A এবং B উভয় অ্যান্টিজেন থাকলে কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না। লোহিত কণিকায় কোনো অ্যান্টিজেন না থাকলে anti-a এবং anti-b উভয় অ্যান্টিবডি থাকে।

Scanned with CamScanner

কোনো রক্তগ্রুপের কণিকায় অ্যান্টিজেন এবং তার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যান্টিবডিযুক্ত প্লাজমার মধ্যে বিক্রিয়া ঘটলে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো জমাট বেঁধে যায়। ফলে রক্তগ্রহীতার মৃত্যু ঘটে। O গ্রুপ সকল গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে কিন্তু নিজ গ্রুপ ছাড়া অন্য কোনো গ্রুপের কাছ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে না। তাই O গ্রুপকে **সর্বজনীন দাতা** (universal donor) বলে। AB গ্রুপ সব গ্রুপের কাছ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে কিন্তু নিজ গ্রুপ ছাড়া অন্য কোনো গ্রুপকে দান করতে পারে না। তাই AB গ্রুপকে **সর্বজনীন গ্রহীতা** (universal recepient) বলে।

ABO রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য নিচে ছকে উপস্থাপন করা হলো :

জিনোটাইপ	ফিনোটাইপ	অ্যান্টিজেন	অ্যান্টিবডি	রক্ত দিতে পারে	রক্ত নিতে পারে
I^AI^A বা I^AI^O	গ্রুপ- A (23%)	A	anti-b	A, AB	A, O
I^BI^B বা I^BI^O	গ্রুপ- B (35%)	B	anti- a	B, AB	B, O
I^AI^B	গ্রুপ- AB (8%)	A ও B	নেই	AB	A, B, AB, O
I^OI^O	গ্রুপ- O (34%)	নেই	anti- a, anti-b	A, B, AB, O	O

[অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি সম্পর্কে অধ্যায়-১০ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে]

ABO রক্ত গ্রুপের বংশগতি

বার্নস্টেইন (Bernstein, 1925) প্রস্তাব করেন যে, মানুষের ABO রক্তগ্রুপ (A, B, AB এবং O) সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থিত তিনটি অ্যালিলোমর্ফিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রোমোজোমে জিনের এরূপ অবস্থাকে **মালটিপল অ্যালিল** (multiple allele) বলে। এই জিনকে I (রক্তগ্রুপ নিয়ন্ত্রণকারী জিন isoagglutinogen অনুসারে) অথবা L (রক্তগ্রুপ আবিষ্কারক Landsteiner নাম অনুসারে) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। I জিনের তিনটি অ্যালিল আছে, যেমন– I^A, I^B এবং I^O। এদের মধ্যে I^A অ্যালিল লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন-A এবং I^B অ্যালিল অ্যান্টিজেন -B সৃষ্টি করে। কিন্তু I^O অ্যালিল কোনো অ্যান্টিজেন সৃষ্টি করে না। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, I^A ও I^B পরস্পর সহপ্রকটতা (codominance) প্রদর্শন করে এবং I^A ও I^B উভয়ই I^O অ্যালিলের উপর প্রকট। অর্থাৎ $I^A = I^B > I^O$।

ABO রক্ত গ্রুপে জিনের তিনটি অ্যালিল উপস্থিতি থাকলেও কোন ব্যক্তিতে যেকোনো দুটি উপস্থিত থাকতে পারে। গবেষণায় আরও জানা গেছে যে, এই জিন তিনটির লোকাস ৯নং ক্রোমোজোমের লম্বা বাহুতে (q arm) অবস্থিত। মানুষ ডিপ্লয়েড হওয়ায় প্রত্যেকের একজোড়া করে জিন থাকবে ফলে ছয়টি জিনোটাইপ তৈরি হবে। অ্যালিলগুলো দ্বারা সম্ভাব্য ছয় ধরনের জিনোটাইপ চার ধরনের ফিনোটাইপ বা রক্তগ্রুপ A, B, AB ও O উৎপন্ন করে (উপরের ছকে উল্লেখ করা হয়েছে)।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ABO রক্ত শ্রেণিগুলোর প্রকৃতি মানুষের পপুলেশন শুধু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে না, রক্ত শ্রেণিগুলোর পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের প্রকৃতি অনুসারে কোনো দম্পতি কেমন সন্তান জন্ম দিতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়। সে কারণে সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে কোনো বিতর্ক নিরসনেরও পিতামাতা ও সন্তানের রক্ত প্রকৃতি বিচার্য হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানুষের পপুলেশনে এমন 'O' শ্রেণির রক্তের সন্ধান পাওয়া যায় যে ক্ষেত্রে 'O' রক্তের মানুষটির জিনোটাইপ I^OI^O নয়। বিরল এই 'O' রক্তের মানুষদের **Bombay phenotype** বলে। পিতা ও মাতার মধ্যে কোনো একজন বোম্বে ফিনোটাইপের হলে সন্তান জন্মানোর ক্ষেত্রে তারতম্য দেখা যায়।

[**বিশেষ তথ্য : বম্বে ব্লাড গ্রুপ বা বম্বে ফিনোটাইপ** (Bombay Blood Group or Bombay Phenotype) : রক্তের শ্রেণি A, B, AB ও O ছাড়াও আরো একটি শ্রেণি আছে, যার নাম বম্বে ব্লাড গ্রুপ বা বম্বে ফিনোটাইপ। সর্বপ্রথম (১৯৫২) ভারতের বম্বে (মুম্বাই) শহরে এই রক্তশ্রেণির সন্ধান পাওয়া যায় বলে একে বম্বে ব্লাড গ্রুপ বা বম্বে ফিনোটাইপ বলা হয়। এই গ্রুপধারী মানুষের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণত সমগ্র পৃথিবীর মাত্র ০.০০০৪% জনসংখ্যার মানুষ এই গ্রুপধারীর। সাধারণত যে H অ্যান্টিজেন বা H substance থেকে A ও B উভয় অ্যান্টিজেনই তৈরি হয়, এই বম্বে ব্লাড গ্রুপ-এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিটির এই H অ্যান্টিজেনটিই তৈরি হয় না। এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রক্তের জিনোটাইপ A বা B বা AB রক্তশ্রেণির মতো হলেও কার্যগতভাবে তার রক্তশ্রেণি হয় O। মানবদেহের রক্তে H অ্যান্টিজেন বা H substance বর্তমান, যা প্রকৃতপক্ষে A ও B অ্যান্টিজেনের পূর্বসূরী, অর্থাৎ H অ্যান্টিজেনের উপর A ও B অ্যান্টিজেনের উৎপত্তি নির্ভরশীল। H জিন দ্বারা H অ্যান্টিজেনের সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রিত হয়। H জিনের পরিব্যক্তি (mutation) ঘটলে তথা পরিব্যক্ত প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (h) দুটি হোমোজাইগাস (hh) অবস্থায় থাকলে H অ্যান্টিজেন সংশ্লেষ ব্যাহত হয়। ফলে A ও B অ্যান্টিজেন উৎপন্ন হয় না এবং জিনোটাইপ I^OI^O না হওয়া সত্ত্বেও কার্যগত রক্তশ্রেণি হয় O।]

রক্ত গ্রুপ আবিষ্কারের অবদান রাখায় ল্যান্ডস্টেইনার 1930 সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। কোনো রক্তগ্রুপের কণিকায় অ্যান্টিজেন এবং তার সঙ্গে অসামঞ্জস্য পূর্ণ অ্যান্টিবডিযুক্ত প্লাজমার মধ্যে বিক্রিয়া ঘটলে লোহিত রক্তকণিকাগুলো জমাট বেঁধে যায়। ফলে রক্তগ্রহীতার মৃত্যু ঘটে। বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত রক্তের বিক্রিয়া।

দাতা ↓ / গ্রহীতা →	O	A	B	AB
O	–	+	+	+
A	+	–	++	+
B	+	++	–	+
AB	+	+	+	–

('–' = কোনো বিক্রিয়া ঘটে না, '+' সামান্য বিক্রিয়া ঘটে, ++ = সাংঘাতিক বিক্রিয়া ঘটে।)

Scanned with CamScanner

দাতার সিরামের অ্যান্টিবডির প্রভাবে গ্রহীতার রক্তে যে সামান্য (+) বিক্রিয়া ঘটে তা ক্ষতিকর নয়। এরূপ ক্ষেত্রে রক্তের আদান-প্রদান নিরাপদ। বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণত একই গ্রুপের রক্ত পরস্পর মিলিয়ে নিয়ে (**ক্রস ম্যাচিং**) আদান-প্রদান করা হয়। কাজেই রক্ত সঞ্চালনের জন্য রক্তের গ্রুপ জানা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া ফরেনসিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে, সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয়ে এবং জাতিতত্ত্ব ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য রক্তের গ্রুপ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

সার্বজনীন দাতা ও সার্বজনীন গ্রহীতার মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	সার্বজনীন দাতা	সার্বজনীন গ্রহীতা
১। রক্ত দানে সামর্থ্য	সব ব্লাড গ্রুপভুক্তকে।	কেবল নিজ ব্লাড গ্রুপভুক্তকে।
২। রক্ত গ্রহণে সামর্থ্য	কেবল নিজ ব্লাড গ্রুপভুক্ত থেকে।	সব ব্লাড গ্রুপভুক্ত দাতা থেকে।
৩। অ্যান্টিজেন	নেই।	A ও B উভয় অ্যান্টিজেন থেকে।
৪। অ্যান্টিবডি	দু'রকম থাকে। যথা– a ও b।	নেই।
৫। কোন ব্লাড গ্রুপ	O ব্লাড গ্রুপ।	AB ব্লাড গ্রুপ।

Rh ফ্যাক্টর (Rh Factor)

রেসাস বানরের (*Macaca mulatta*) রক্ত গিনিপিগের দেহে প্রবেশ করালে এক ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। উক্ত অ্যান্টিবডিযুক্ত রক্ত পুনরায় রেসাস বানরের দেহে প্রবেশ করালে বানরগুলো মারা যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রেসাস বানরের রক্তে এক ধরনের অ্যান্টিজেন আছে, ওই অ্যান্টিজেনকে রেসাস বানরের নাম অনুসারে **রেসাস অ্যান্টিজেন** বা **রেসাস ফ্যাক্টর** বা **Rh ফ্যাক্টর** বলে। 1940 সালে **Karl Landsteiner** এবং **A.S. Wiener** সর্বপ্রথম এই অ্যান্টিজেন আবিষ্কার করেন।

গিনিপিগের দেহে সৃষ্ট অ্যান্টিবডি মানুষের রক্তের সঙ্গে মেশালে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষের লোহিত রক্তকণিকা জমাট বেঁধে যায় এবং কিছু মানুষের লোহিত কণিকা জমাট বাঁধে না। যেসব মানুষের লোহিত কণিকা জমাট বাঁধে তাদের Rh পজিটিভ (**Rh^+ ve**) এবং যেসব মানুষের লোহিত কণিকা জমাট বাঁধে না তাদের Rh নেগেটিভ (**Rh^- ve**) বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য, Rh পজিটিভ রক্ত Rh নেগেটিভ রক্তের ওপর প্রকট। ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শ্বেতকায় ব্যক্তিদের প্রায় ৮৫% এবং ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, জাপান ও আফ্রিকায় ৯৫% ব্যক্তির লোহিত কণিকায় এ জাতীয় অ্যান্টিজেন (Rh ফ্যাক্টর) রয়েছে।

লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে Rh ফ্যাক্টরের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে Rh ব্লাড গ্রুপ (Rh blood group) বলে। Rh ফ্যাক্টরবিশিষ্ট রক্তকে Rh^+ ve (**Rh** পজিটিভ) এবং Rh ফ্যাক্টরবিহীন রক্তকে Rh^- ve (**Rh** নেগেটিভ) রক্ত বলে। অন্যান্য রক্ত গ্রুপের সাথে সমন্বয় করে Rh ফ্যাক্টর প্রকাশ করা হয়। যেমন– A+ve, A-ve, B+ve, B-ve, O+ve, AB+ve ইত্যাদি।

রেসাস ফ্যাক্টর অনুসারে দাতার রক্তে যে অ্যান্টিজেন থাকে তার সাথে মিলিয়ে এমনভাবে গ্রহীতা নির্বাচন করতে হবে যেন তার রক্তে দাতার অ্যান্টিজেনের সাথে সম্পর্কিত অ্যান্টিবডিটি না থাকে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কোন গ্রুপ কাকে রক্ত দিতে পারবে বা পারবে না, তার একটা ছক নিচে দেওয়া হলো–

দাতা

গ্রহীতা	O–	O+	B–	B+	A–	A+	AB–	AB+
AB+	●	●	●	●	●	●	●	●
AB–	●		●	●	●		●	
A+	●	●			●	●		
A–	●				●			
B+	●	●	●	●				
B–	●		●					
O+	●	●						
O–	●							

কোন গ্রুপের রক্ত কাকে দেওয়া যাবে তার ছক

Rh ফ্যাক্টর-এর জিনগত ব্যাখ্যা

বিজ্ঞানী Fisher মতপ্রকাশ করেন যে, Rh ফ্যাক্টর মূলত ৬টি অ্যান্টিজেনের সমষ্টি। এদের ৩ জোড়ায় ভাগ করা যায়, যেমন– C, c; D, d ও E, e। এদের মধ্যে C, D, E হচ্ছে মেন্ডেলীয় **প্রকট** (Mendelian dominant) এবং c, d, e হচ্ছে মেন্ডেলীয় **প্রচ্ছন্ন** (Mendelian recessive)। মানুষের লোহিত কণিকায় একসঙ্গে ৩টি অ্যান্টিজেন থাকে কিন্তু প্রতি জোড়ার দুটি উপাদান কখনও একসাথে থাকে না, যেমন– CDE, CDe, cDE এমন সন্নিবেশ সম্ভব, কিন্তু CcD ও CDd অসম্ভব। মেন্ডেলীয় প্রকট অ্যান্টিজেন (CDE) যে রক্তে থাকে তাকে **Rh^+ ve** রক্ত বলে। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh (Rh^+)-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে, যে রক্তে মেন্ডেলীয় প্রচ্ছন্ন অ্যান্টিজেন (cde) থাকে তাকে **Rh^- ve** রক্ত বলে। পরবর্তীকালে **Fisher-Race**,

Scanned with CamScanner

জিন কমপ্লেক্স তত্ত্ব উল্লেখ করেন। এই তত্ত্বানুসারে অন্তত তিন জোড়া অ্যালিল (Cc, Dd ও Ee) Rh রক্তশ্রেণি নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত D জিনটি Rh^+ রক্ত সৃষ্টির জন্য দায়ী। Fisher-Race তত্ত্বানুসারে Rh^+ রক্তের ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেনের সন্নিবেশ হবে- CDE, CDe, cDE, cDe এবং Rh^- রক্তের ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেনের সন্নিবেশ হবে- CdE, Cde, cdE, cde।

Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট জটিলতা (Problems due to Rh Factor)

১. রক্ত সঞ্চারণে জটিলতা (Complexity in Blood Transfusion) : Rh^- (Rh নেগেটিভ) লোকের দেহে Rh^+ (Rh পজিটিভ) রক্ত প্রবেশ করানো হলে গ্রহীতার রক্তের প্লাজমায় দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই Rh-অ্যান্টিবডি (অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর) তৈরি হয়। পরে যদি কোনো সময় ওই একই গ্রহীতার (Rh^-) দেহে Rh^+ রক্ত প্রবেশ করানো হয় তবে Rh-অ্যান্টিবডি প্রভাবে গৃহীত রক্তের (দাতার) লোহিত কণিকাগুলো গ্রহীতার দেহে জমাট বেঁধে যায় এবং রক্তগ্রহীতার মৃত্যু ঘটে। তবে একবার রক্তগ্রহণের পর যদি গ্রহীতা (Rh^-) আর ঐ রক্ত (Rh^+) গ্রহণ না করে তাহলে ধীরে ধীরে তার রক্তে উৎপন্ন সমস্ত Rh-অ্যান্টিবডি নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রহীতা স্বাভাবিক রক্ত ফিরে পায়। কোনো ব্যক্তির দেহে রক্ত সঞ্চারণের সময় দাতা-গ্রহীতা উভয়ের Rh ফ্যাক্টর পরীক্ষা করে দেখা বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই Rh^+ কিংবা Rh^- হওয়া উচিত, অবশ্য Rh^- রক্ত Rh^+ রক্তের কোনো ক্ষতি করে না। এ কারণে সঙ্কটকালে রক্ত সঞ্চারণের প্রয়োজন হলে এবং দাতা ও গ্রহীতার রক্তগ্রুপ জানা না থাকলে গ্রহীতার দেহে 'O' গ্রুপের Rh- রক্ত সঞ্চারণ করাই শ্রেয়।

২. গর্ভধারণজনিত জটিলতা (Complexity in Pregnancy): Rh^+ (Rh পজিটিভ) ফ্যাক্টরের জন্য দায়ী জিন প্রকট হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাই Rh^- (Rh নেগেটিভ) প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। মাতা যদি Rh^- এবং পিতা যদি Rh^+ হয় তাহলে তাদের প্রথম সন্তান Rh^+ হবে। এ শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে মায়ের রক্তে Rh-অ্যান্টিবডি (**অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর**) সৃষ্টি হবে। প্রথমবার গর্ভধারণে যথেষ্ট মাত্রায় Rh-অ্যান্টিবডি উৎপন্ন না হওয়ায় শিশুর কোনো ক্ষতি হয় না এবং এ শিশু জীবিত থাকে। মাতার এ অ্যান্টিবডি পরবর্তী গর্ভস্থ সন্তানের (বিশেষ করে দ্বিতীয় সন্তান) দেহে অমরার মাধ্যমে প্রবেশ করে ভ্রূণের লোহিত কণিকা নষ্ট করে দেয়। সাধারণত গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে অধিক লোহিত কণিকার হিমোলাইসিসজনিত এই রক্তস্বল্পতার রোগকে **এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস** (erythroblastosis fetalis) বা **হিমোলাইটিক ডিজিস অব নিউবর্ন** (Haemolytic Disease of the New born-HDN) বা **ইকটেরাস গ্র্যাভিস নিওনেটোরাম** (icterus gravis neonatorum) নামে অভিহিত করা হয়। এর ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত কণিকাগুলো দ্বারা যকৃতের রক্তবাহিকাগুলো অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং রক্তে প্রচুর পরিমাণ পিত্ত অনুপ্রবেশ করে, ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় ও **জন্ডিস** (jaundice) এবং **তীব্র ইডিমা** (edema) দেখা দেয়। এ রোগ অত্যন্ত গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করলে জন্মের পূর্বে অর্থাৎ শিশুটি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মারা যায়, তখন সেই অবস্থাকে **হাইড্রপস ফিটালিস** (hydrops fetalis) বলা হয় অথবা জন্মের কয়েক ঘণ্টা হতে কয়েক দিনের মধ্যে নবজাতকের মৃত্যু ঘটতে পারে। হাইড্রপস ফিটালিস এর প্রধান বৈশিষ্ট্য জন্ডিস এবং তীব্র ইডিমা। Rh^+ ও Rh^- রক্তের গ্রুপের পিতামাতার সন্তানাদির রক্তের গ্রুপের বিশ্লেষণের ছক নিম্নরূপ:

মাতা	পিতা	সন্তানাদি
Rh^+ / Rh^+	Rh^+ / Rh^+	১০০% Rh^+
Rh^- / Rh^-	Rh^+ / Rh^+	১০০% Rh^+ / Rh^-
Rh^- / Rh^-	Rh^- / Rh^-	১০০% Rh^- / Rh^-
Rh^+ / Rh^-	Rh^+ / Rh^+	৫০% Rh^+ / Rh^+ ৫০% Rh^+ / Rh^-
Rh^+ / Rh^-	Rh^+ / Rh^-	৫০% Rh^+ / Rh^+ ২৫% Rh^+ / Rh^- ২৫% Rh^+ / Rh^+
Rh^- / Rh^-	Rh^+ / Rh^-	৫০% Rh^+ / Rh^- ৫০% Rh^- / Rh^-

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের আগে তাই বর ও কনের Rh ফ্যাক্টর পরীক্ষা করে দেখা দরকার। দম্পতিদের একই Rh ফ্যাক্টরভুক্ত (হয় Rh^+ নতুবা, Rh^-) হওয়া উচিত। তবে সুখের কথা এই যে, পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশে Rh^- বৈশিষ্ট্য দুর্লভ।



চিত্র ১১.৪ : গর্ভাবস্থায় Rh ফ্যাক্টরের প্রভাব

Scanned with CamScanner

উল্লেখ্য শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে প্রায় ৮৫% বা তার অধিক Rh^+ বৈশিষ্ট্য বহন করে। আর ভারতীয় ও সিংহলীয়দের মধ্যে প্রায় ৯৫% বা তার অধিক Rh^+ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অপরপক্ষে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ককেশিয়ানদের ১৫% Rh^- বৈশিষ্ট্য বহন করে। তবে যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তারা হচ্ছে পাইরেনীজ-এর বাস্ক (২৫-৩৫%), আফ্রিকার বার্বার এবং সাইনাই-উপদ্বীপের বেদুইন (১৮-৩০%)। এছাড়া ভারত, শ্রীলংকা, চীন, জাপান ও আফ্রিকায় ৫% Rh^- বৈশিষ্ট্য বহন করে।

রেসাস ফ্যাক্টরজনিত জটিলতা প্রতিরোধের উপায় : তবে বর্তমানে অ্যান্টি-D অ্যান্টিরেসাস অ্যাগ্লুটিনিন আবিষ্কার হয়েছে যা Rh^- মাতার দেহে সন্তান জন্মাবার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা করা হয়। তাছাড়া আক্রান্ত শিশুটির দেহ থেকে Rh^+ রক্ত ধীরে ধীরে বের করে নিতে হয় এবং একই সাথে Rh^- রক্ত (যাতে কোনোদিন Rh^+ রক্ত মেশেনি) প্রবেশ করাতে হয়। এইভাবে ধ্বংসের মুখে পড়া লোহিত কণিকা শিশুর দেহ থেকে অপসারিত হবে এবং স্বাভাবিক লোহিত কণিকা থেকে যাবে।

পিতা-মাতার ব্লাড গ্রুপের ভিত্তিতে সন্তানের (অপত্যের) সম্ভাব্য ব্লাড গ্রুপ

পিতা-মাতার ফিনোটাইপ (ব্লাড গ্রুপ)	পিতা-মাতার জিনোটাইপ	সন্তানের জিনোটাইপ	সন্তানের ব্লাড গ্রুপ
A × A	$I^AI^A/I^AI^O \times I^AI^A/I^AI^O$	$I^AI^A/I^AI^O/I^OI^O$	A/O
B × B	$I^BI^B/I^BI^O \times I^BI^B/I^BI^O$	$I^BI^B/I^BI^O/I^OI^O$	B/O
O × O	$I^OI^O \times I^OI^O$	I^OI^O	O
A × B	$I^AI^A/I^AI^O \times I^BI^B/I^BI^O$	$I^AI^O/I^BI^O/I^AI^B/I^OI^O$	A/B/AB/O
A × AB	$I^AI^A/I^AI^O \times I^AI^B$	$I^AI^A/I^AI^O/I^BI^O/I^AI^B$	A/B/AB
A × O	$I^AI^A/I^AI^O \times I^OI^O$	I^AI^O/I^OI^O	A/O
B × AB	$I^BI^B/I^BI^O \times I^AI^B$	$I^BI^B/I^AI^B/I^BI^O/I^AI^O$	A/B/AB
B × O	$I^BI^B/I^BI^O \times I^OI^O$	I^BI^O/I^OI^O	B/O
AB × O	$I^AI^B \times I^OI^O$	$I^AI^O \times I^BI^O$	A/B
AB × AB	$I^AI^B \times I^AI^B$	$I^AI^A/I^BI^B/I^AI^B$	A/B/AB

প্রাসঙ্গিক তথ্য : A ব্লাড গ্রুপযুক্ত একজন পুরুষের সাথে B ব্লাড গ্রুপযুক্ত একজন মহিলার বিবাহ হলে তাদের সন্তানদের সম্ভাব্য ব্লাডগ্রুপ কি হবে?

সমাধান :

পিতামাতা (P_1) : ফিনোটাইপ ⟶ ♂ A ব্লাড গ্রুপযুক্ত × ♀ B ব্লাড গ্রুপযুক্ত

জিনোটাইপ ⟶ I^AI^A/I^AI^O I^BI^B/I^BI^O

গ্যামিট ⟶ I^A I^O I^B I^O

F_1 জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডে দেখানো হলো :

♀ \ ♂	I^A	I^O
I^B	I^AI^B (AB)	I^BI^O (B)
I^O	I^AI^O (A)	I^OI^O (O)

সন্তানদের সম্ভাব্য ব্লাড গ্রুপ ২৫% A, ২৫% B, ২৫% AB এবং ২৫% O ।]

❑ **কাজ :** (i) রক্তদান করলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। বিশ্ব রক্তদান দিবসে (১৪ জুন) এ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক একটি তথ্যবহুল পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় কলেজ বোর্ডে স্থাপন কর। (ii) রক্তের গ্রুপের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। (iii) গ্রুপ না মিলিয়ে রক্ত নিলে গ্রহীতা মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে– বিশ্লেষণ কর। (iv) রক্তের ধনাত্মক টাইপ অথবা ঋণাত্মক টাইপ বিষয়টি বিবাহ সম্পর্কে স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখে– আলোচনা কর। (v) রক্তের গ্রুপ AB এবং O এর মধ্যে ক্রস ঘটালে তাদের সন্তানদের রক্তগ্রুপ বাবা-মায়ের চেয়ে ভিন্ন হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। (vi) A এবং B রক্তের গ্রুপের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ক্রস ঘটালে কত অনুপাতে AB এবং O রক্তগ্রুপ ধারী সন্তান হবে তা চেকার বোর্ডের মাধ্যমে উপস্থাপন কর। (vii) A ব্লাড গ্রুপযুক্ত একজন পুরুষের সাথে B ব্লাড গ্রুপযুক্ত একজন মহিলার বিবাহ হলে তাদের সন্তানদের সম্ভাব্য ব্লাড গ্রুপ কী হবে? ব্যাখ্যা করে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাও। (viii) একজন A ব্লাড গ্রুপযুক্ত মাতার সন্তানের ব্লাড গ্রুপ AB হলে সন্তানটির পিতার সম্ভাব্য ব্লাড গ্রুপ কী? ব্যাখ্যা করে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাও।

Scanned with CamScanner

১১.৮ বিবর্তন তত্ত্বের ধারণা ব্যাখ্যা (Concept of Theory of Evolution)

পৃথিবীতে কোনো কিছুই সুস্থিত (stable) নয়। অতীতকালে মানুষের ধারণা ছিল, সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর যে আকার ও আয়তন ছিল তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আদি জীবজগতের সঙ্গে বর্তমানকালের জীবজগতের কোনো পার্থক্য নেই। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (Aristotle) প্রমাণ করেন যে, জীবজগতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি বর্তমান এবং একটি শ্রেণির জীব অপর একটি শ্রেণির জীব থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত। জীবগুলো তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভব হয়ে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। তাই বিবর্তন হলো একটি মন্থর ও গতিশীল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে গঠনগতভাবে সরল জীব থেকে জটিল জীবের উদ্ভব হয়েছে। বিখ্যাত বিবর্তনবিদ চার্লস রবার্ট ডারউইন বিবর্তনকে **পরিবর্তনসহ উত্তরণ** (descent with modification) বলে উল্লেখ করেছেন। Evolution শব্দটি বাস্তবিক পক্ষে ল্যাটিন শব্দ, *e* = from; *volvere* = to roll থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো **বিকশিত হওয়া** (unrolling) বা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হওয়া। **হার্বার্ট স্পেন্সার** (Herbert Spencer, 1952) সর্বপ্রথম Evolution শব্দটি ব্যবহার করেন।

বিবর্তন (Evolution) : কোনো জীবের সরল অবস্থা থেকে জটিলতার দিকে পর্যায়ক্রমিক অতি ধীর ও ধারাবাহিক পরিবর্তনকে **বিবর্তন** বা **অভিব্যক্তি** বলে। বিবর্তনের ফলে অধিকতর জটিল জীবের সৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশ ঘটে।

জৈব বিবর্তন (Organic evolution) : জীবে ধারাবাহিক ও বংশানুসরণযোগ্য যে জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমশ উদ্‌বংশীয় জীব থেকে জিনগতভাবে ভিন্ন প্রকৃতির নতুন প্রকারের জীবের উদ্ভব ঘটে তাকে জৈব বা জৈবিক বিবর্তন (organic or biological evolution) বলে।

বিবর্তনের ধারণা (Concept of Evolution) : বিবর্তন সম্বন্ধীয় যেকোনো আলোচনায় **চার্লস ডারউইন** (Charles Darwin) এর নাম সবার আগে আসে। বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইন যে মতবাদ প্রদান করেছেন তা চিন্তাবিদদের এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, ডারউইনের মতবাদ ও বিবর্তন এ দুটো প্রায় একীভূত হয়ে যায়। বিবর্তন সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অনেক প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ দশকে গ্রিক দার্শনিক **অ্যানাক্সিম্যান্ডার** (Aneximander) এর ধারণা ছিল মাছ থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম দশকে **জেনোফেনিস** (Xenophanes) জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, স্থলে যে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা একদিন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। গ্রিক দার্শনিক **এমপেডোক্লিস** (Empedocles, 495-435 B.C) এর ধারণা ছিল, মাটি বা অজৈব পদার্থ থেকে প্রথম উদ্ভিদ ও পরে প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। এমপেডোক্লিসকে **বিবর্তনের জনক** (father of evolution) বলে অভিহিত করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ দশকে সর্বকালের বরেণ্য **অ্যারিস্টটল** (Aristotle) এর ধারণা ছিল যে, অজৈব বস্তুর রূপান্তরের মাধ্যমে পৃথিবীতে জৈব বস্তুর উদ্ভব ঘটেছে। তাঁর মতে, প্রকৃতি নির্ভুল নীতিতে প্রতিটি জীবের পরিবর্তন সাধন করে থাকে। কালক্রমে বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়া পরম্পরায় জটিল জৈবিক পদার্থ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো সরলতর সজীব পদার্থ **প্রোটোপ্লাজম** তথা জীবকোষ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন জটিল অজৈব এবং জৈব পদার্থের সংযুক্তির ফলে একদিন যে প্রোটোপ্লাজম আত্মপ্রকাশ করেছিল সে আদি প্রোটোপ্লাজমই বিভিন্ন পরিবেশে পরিবর্তন হতে হতে বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে রূপ নিয়েছে। প্রথমদিকে পৃথিবীর উত্তাপ ছিল অত্যন্ত বেশি। ঠাণ্ডা পরিবেশের প্রভাবে পৃথিবী ক্রমশ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে বিভিন্ন পরমাণু যুক্ত হয়ে স্থায়ী যৌগিক পদার্থ গঠনের মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হতে থাকে। সব পরমাণু কারও না কারও সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ গঠন করে ফেলে। এভাবে পৃথিবীর রাসায়নিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।


Aristotle(384-322 B.C)

বিবর্তনের প্রকারভেদ (Types of evolution)

১। **মাইক্রো বিবর্তন** (Microevolution) : পরিব্যক্তি (mutation), প্রকরণ (variation) ইত্যাদির ফলে জিনে সংঘটিত ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলো এই প্রকার বিবর্তন সৃষ্টি করে। এর ফলে বিভিন্ন জাত (race), ভ্যারাইটি বা উপপ্রজাতির (variety or sub species) সৃষ্টি হয়।

২। **ম্যাক্রো বিবর্তন** (Macroevolution) : এই প্রকার বিবর্তনের ফলে উপপ্রজাতি থেকে প্রজাতির উৎপত্তি হয়।

৩। **মেগা বিবর্তন** (Megaevolution) : পরিব্যক্তির ফলে অনেকে সময় ধরে, বৃহৎ পরিসরে সংঘটিত পরিবর্তন, যার ফলে মেজর ট্যাক্সাগুলো (গোত্র, বর্গ, শ্রেণি ইত্যাদির) সৃষ্টি হয়।

৪। **প্রোগ্রেসিভ বা অগ্রগামী বিবর্তন** (Progressive evolution) : এই প্রকার বিবর্তনে সরল গঠন থেকে জটিল ও উন্নত গঠন সৃষ্টি হয়। যেমন– মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে পাখি ইত্যাদির সৃষ্টি।

৫। **রেট্রোগ্রেসিভ বা অবনয়নশীল বিবর্তন** (Retrogressive evolution) : এই প্রকার বিবর্তনে বিভিন্ন জটিল গঠন থেকে অপেক্ষাকৃত সরল গঠন সৃষ্টি হয়। যেমন– লুপ্তপ্রায় অঙ্গের সৃষ্টি।

Scanned with CamScanner

৬। **অভিসারী বিবর্তন** (Convergent evolution) : এই প্রকার বিবর্তনে একই পরিবেশে অভিযোজনের জন্য উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে ভিন্ন দুটি জীবদেহে বাহ্যিক গঠন ও কার্যগতভাবে একই প্রকার অঙ্গের সৃষ্টি হয়। যেমন– মৌমাছি ও কাঁকড়াবিছের হুল।

৭। **অপসারী বিবর্তন** (Divergent evolution) : এই প্রকার বিবর্তনে বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজনের জন্য উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে একই দুটি জীবদেহে বাহ্যিক গঠন ও কার্যগতভাবে ভিন্ন প্রকার অঙ্গের সৃষ্টি হয়। যেমন– পাখির ডানা ও মানুষের হাত।

৮। **সহবিবর্তন** (Coevolution) : বাস্তুতান্ত্রিক সম্বন্ধযুক্ত একাধিক প্রজাতির একটির বিবর্তন এবং অপর প্রজাতি বা প্রজাতিগুলোর বিবর্তন ঘটলে তাকে সহবিবর্তন বলা হয়। যেমন– পোষকের (host) বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্যাথোজেনের (pathogen) বিবর্তন।

১১.৯ বিবর্তনের মতবাদসমূহ (Theories of Evolution)

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়। পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সরলতম জীব থেকে জটিল জীবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইহাই বিবর্তনের মূল বক্তব্য। এই বক্তব্যের সমর্থনে অনেক তথ্য ও প্রমাণাদি আছে। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় কীভাবে এই বিবর্তন ঘটেছে, তা কঠিন ও বিতর্কিত প্রশ্ন। বিবর্তন প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেন। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা বিবর্তন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– Robert Hook (1635-1703), Jon Ray (1627-1705), Buffon (1707-1788), Lamarck (1744-1829), Charles Darwin (1809-1882), August Weismann (1834-1914), Hugo de Vries (1848-1935), J.B.S. Haldane (1892-1964) এবং Alexander Oparin (1894-1980) প্রমুখ।

বিবর্তনের আধুনিক মতবাদসমূহ :

- ল্যামার্কিজম বা ল্যামার্কের **'অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার মতবাদ'** (Theory of inheritance of acquired characters)
- ডারউইনিজম বা ডারউইনের **'প্রাকৃতিক নির্বাচন'** মতবাদ (Theory of natural selection)
- **'নিওডারউইনিজম'** বা আধুনিক সংশ্লেষ মতবাদ (Modern synthesis theory of Neodarwinism)
- অগাস্ট ভাইজম্যানের **'জার্মপ্লাজম'** মতবাদ (Germplasm theory of August Weismann) এবং
- ভ্রিসের **'পরিব্যক্তি'** মতবাদ (Mutation theory of de Vries)।

ল্যামার্কের মতবাদ বা ল্যামার্কিজম বা অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ

(Lamarckism or Theory of Inheritance of Acquired Characters)

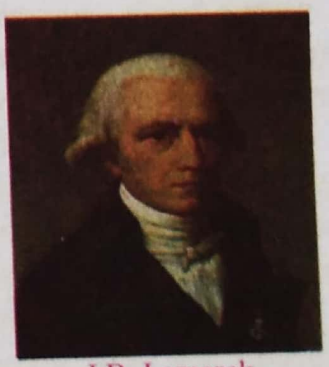

J.B. Lamarck (1744-1829)

ল্যামার্ক একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর পুরো নাম ছিল **জ্যাঁ ব্যাপাটিস্ট অ্যান্টিয়নি দ্য মনোট ল্যামার্ক** (Jean Baptiste Antiony De Monet Lamarck)। তিনি একজন দার্শনিক ছিলেন। 1744 খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। এই ফরাসি বিজ্ঞানী 1809 খ্রিষ্টাব্দে অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর মতবাদ **ফিলোসফিক জুলোজিক** (Philosophic Zoologic) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি দুটি সূত্রের অবতারণা করেন এবং পরে ইনভার্টিব্রেট জুলজি' নামক পুস্তকে আরও দুটি মতবাদ সংযোজন করেন। তাঁর এই সূত্রগুলো একত্রে **অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার মতবাদ** (Theory of inheritance of acquired characters) নামেও খ্যাত।

অর্থাৎ কোনো জীব উহার জীবনে যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই মতবাদ ল্যামার্কিজম নামে খ্যাত। ল্যামার্কই প্রথম **বায়োলোজি** (Biology) শব্দটি প্রবর্তন করেন এবং প্রাণিজগৎকে **অমেরুদণ্ডী** ও **মেরুদণ্ডী** এ দুটি গ্রুপে বিভক্ত করেন। তিনি 1829 খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ল্যামার্ক-এর সূত্রসমূহ

1960 সালে বিজ্ঞানী **ডডসন ল্যামার্ক** মতবাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেন এবং চারটি সূত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

১। প্রথম সূত্র- অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি জীবের আকার বৃদ্ধি করতে চায় : প্রতিটি জীবের একটি নিজস্ব অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি আছে এবং সেই প্রাণশক্তি ইহার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির আকার-আকৃতি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রয়াস পায়। এই প্রয়াস পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা : সূত্রে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি জীব তার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারে। তবুও জীব মাত্রই পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। একই প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ দুটি ভিন্ন পরিবেশে থাকলে তাদের বৃদ্ধি ভিন্নতর হয় অর্থাৎ আকৃতিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জীবের এই দৈহিক বৃদ্ধি পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

Scanned with CamScanner

২। দ্বিতীয় সূত্র- পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন : জীবনধারণ প্রক্রিয়ায় যে নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং তা মেটানোর জন্য যে তাগিদ জীব অনুভব করে তার ফলে দেহে কোনো অঙ্গের বৃদ্ধি বা নতুন অঙ্গের সংযোজন ঘটে (new organs results from new needs)। এই সংযোজন জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

ব্যাখ্যা : জীবনধারণের জন্য যে নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয় তা মেটানোর জন্য জীব সক্রিয় প্রচেষ্টা করে তাহলে দেহের কোনো অঙ্গকে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত করতে পারে। এই বর্ধিত অঙ্গ জীবকে প্রতিকূল পরিবেশে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহযোগিতা করে।

যেমন– জিরাফের পূর্বপুরুষেরা আকারে ছোট ও শাকাসী প্রাণী ছিল। তাদের অগ্রপদ ও গ্রীবা বেশ ছোট ছিল। স্থলভাগে চারণযোগ্য ভূমির অভাব হলে জিরাফের পূর্বপুরুষরা গাছের পাতা ভক্ষণ করতে শুরু করে। এভাবে নিচের পাতা শেষ হয়ে যায় এবং উপরের কচিপাতা ভক্ষণের জন্য গ্রীবা উত্তোলন করে। গাছের শীর্ষের কচি পাতার নাগাল পাওয়ার জন্য ক্রমাগত গ্রীবা উত্তোলন ও প্রসারণের ফলে ইহা বৃদ্ধি পায় এবং বংশপরম্পরায় চলতে থাকায় গ্রীবা ও অগ্রপদ লম্বা হয়ে বর্তমান আকৃতি ধারণ করে। ল্যামার্কের মতে, ক্রমাগত সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান জিরাফের গ্রীবা ও অগ্রপদ দীর্ঘ হয়েছে।



চিত্র ১১.৫ : জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার ল্যামার্কীয় ব্যাখ্যা

৩। তৃতীয় সূত্র- ব্যবহার ও অব্যবহার : জীবদেহের কোনো অঙ্গের উন্নয়ন ও কর্মক্ষমতা তার ব্যবহারের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা : কোনো একটি বিশেষ অঙ্গ ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে তা বৃহৎ, সুগঠিত ও কার্যক্ষম হতে পারে, আবার অব্যবহারের ফলে তা ক্রমশ ক্ষুদ্র বা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অঙ্গের ব্যবহার : ল্যামার্কের মতে জিরাফের পূর্বপুরুষের গ্রীবা বর্তমানে ঘোড়ার, গ্রীবার মতোই ছোট ছিল। কিন্তু আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলে ঐ সকল প্রাণীদের লম্বা গাছের পাতা খাওয়ার জন্য গলা প্রসারিত করতে হতো। এভাবে বহু বংশধরে গলার অত্যধিক ব্যবহারের ফলে আধুনিক জিরাফের গলা লম্বা হয়েছে।

কর্মকার, নৌচালক, ব্যায়ামবিদ, কুস্তিগীর, মুষ্টিযোদ্ধা ইত্যাদি মানুষের পেশি প্রতিনিয়ত ব্যবহারের ফলে অত্যন্ত সুগঠিত হয়। ল্যামার্ক উদাহরণ দিতে গিয়ে আরও বলেছেন যে, বালিহাঁস, পেলিকান, হাড়গিলা ইত্যাদি পাখি আদিকালে স্থলচর ছিল। খাদ্যের অভাব ঘটলে কিছু পাখি পানিতে আসে এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য পায়ের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে পায়ের আঙুলের পাশ হতে চামড়া বৃদ্ধি পেয়ে লিপ্তপদ (webbed feet) বিশিষ্ট পাখির উদ্ভব ঘটায়।

অঙ্গের অব্যবহার : অব্যবহারের ফলে যে অঙ্গ ক্রমশ ক্ষুদ্র হয় বা অঙ্গের বিলুপ্তি ঘটে ল্যামার্ক তাও ব্যাখ্যা করেন। ল্যামার্কের মতে, সাপের একসময় পা ছিল। পরবর্তীতে সাপ বুকের ওপর ভর করে চলত ও সরু গর্তে বাস করতে শুরু করে। এই দুই অবস্থায় পায়ের কোনো ব্যবহার হয় না বরং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই সাপের পূর্বপুরুষেরা ধীরে ধীরে পায়ের ব্যবহার বর্জন করে। দীর্ঘদিন ধরে পায়ের অব্যবহারের ফলে পা একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তাঁর মতে, নিউজিল্যান্ডের কিউই পাখি ও আফ্রিকার উট পাখির ডানা দীর্ঘকাল ধরে অব্যবহারের ফলে তা ক্রমশ ছোট ও এত দুর্বল হয়েছে যে ঐ সকল পাখি আর উড়তে পারে না।

মানুষের পূর্বপুরুষের লেজ ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে কক্সিক্সে রূপান্তরিত হয়েছে। গুহাবাসী প্রাণীরা অন্ধকারে বাস করে। এজন্য তাদের চোখ কোনো কাজে লাগে না। চোখের অব্যবহারের ফলে এদের চোখ থাকে না।

৪। চতুর্থ সূত্র- অর্জিত গুণাবলির উত্তরাধিকার : কোনো জীবের জীবনকালে অর্জিত গুণাবলি (বৈশিষ্ট্য) তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে সংরক্ষিত হয়।

ব্যাখ্যা : কোনো জীবের জীবনকালে যে নতুন গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয় তা সেই জীবের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই অর্জিত গুণাবলি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় বলে কয়েক পুরুষের ব্যবধানে পূর্বপুরুষ ও দূরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্যের কারণেই প্রকরণ দেখা দেয় এবং প্রকরণ থেকে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। নতুন প্রজাতি সৃষ্টির কলাকৌশলই হচ্ছে জৈব অভিব্যক্তির মূলমন্ত্র।

Scanned with CamScanner

ল্যামার্কিজমের সমালোচনা (Criticism of Lamarckism)

ল্যামার্কিজম অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ–

- August Weismann পর পর ২২ প্রজন্ম (generation) ধরে পুরুষ ও স্ত্রী ইঁদুরের লেজ কেটে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, জন্মসূত্রে কোনো লেজবিহীন ইঁদুর জন্মায়নি। এ থেকে বলা যায়, অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশগত নয়।
- কর্মকার, দৌড়বিদ, শ্রমিক, কুস্তিগীর ইত্যাদির পেশি শক্তিশালী ও সুগঠিত হলেও তা তাদের পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হয় না।
- শিরা ও ধমনি ক্রমাগত ব্যবহৃত হলেও এদের আকার ও আয়তন কখনো বৃদ্ধি পায় না। এ থেকে বলা যায় ল্যামার্কের ব্যবহার ও অব্যবহার তত্ত্বটি সত্য নয়।
- বিজ্ঞানী পেইন (Payne) বহু প্রজন্ম ধরে (69 generation) ফলের মাছিকে (*Drosophila*) অন্ধকারে রেখেও জন্মসূত্রে কোনো অন্ধ মাছি পাননি।
- মুসলমান ও ইহুদি বালকদের লিঙ্গের অগ্রভাগের পিপিউস নামক চামড়া কেটে ফেলা হয়, কিন্তু এটি জন্মসূত্রে কোনো বংশে সঞ্চারিত হয় না।

ল্যামার্কের মতবাদ অবৈজ্ঞানিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলে প্রমাণিত হলেও এটিই বিবর্তন সম্বন্ধীয় প্রথম মতবাদ। এ মতবাদ নিঃসন্দেহে বিভিন্ন পরিবেশে অনেক জীবের অভিযোজনের চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করে। তবে এ মতবাদের সপক্ষে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি না থাকায় হাক্সলে, পাভলভ, লয়েল, ভাইজম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানী এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। বর্তমানকালে জিনতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অর্জিত গুণাবলি কখনো বংশগত হয় না।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বা ডারউইনিজম (Darwinism)

ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন বিবর্তনের ওপর যে মতবাদ ব্যক্ত করেন, তা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ লাভ করে। তিনি 1831 খ্রিষ্টাব্দে ১৭ ডিসেম্বর **'এইচ. এম. এস. বিগল** (Her Majestic Service Beagle)' নামক সমুদ্র জাহাজে বিশ্বভ্রমণের সুযোগ লাভ করেন। একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসেবে চাকরির সুবাদে এই জাহাজে করে পাঁচ বছরের বেশি সময় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জীবজন্তু সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। এ জাহাজে চড়ে তিনি নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মরিসাস, আটলান্টিক দ্বীপপুঞ্জ, গ্যালোপ্যাগোজ দ্বীপপুঞ্জ, ব্রাজিল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের **ডেভেনপোর্ট** (Devenport) থেকে যাত্রা শুরু করেন।

এই সময়ে বিবর্তন সম্পর্কে তার ধারণা জন্মে এবং তা বিখ্যাত গ্রন্থ রূপে প্রকাশ করেন। 1859 খ্রিষ্টাব্দে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'On the Origin of Species by Means of Natural Selection' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রকাশিত মতবাদই **'ডারউইনিজম'** (Darwinism) নামে খ্যাত। অনেকে গ্রন্থটিকে বিবর্তনের বাইবেল আখ্যা দেন। ডারউইন 1809 খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 1836 খ্রিষ্টাব্দে বিবর্তন ও প্রাণীদের সাদৃশ্য নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। সুদীর্ঘ ২২ বছর ধরে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার ফলে প্রাণীর বিবর্তন সম্পর্কে বিশ্ব তোলপাড় করা এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি 1882 খ্রিষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল ৭১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে (Westminster Abbey) নিউটনের কবরের নিকট তাঁকে সমাহিত করা হয়। প্রকৃতিকে ডারউইন তাঁর মতবাদের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, প্রকৃতি তার নিজস্ব নির্বাচন ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপযুক্ত জীবগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচন করে এবং অনুপযুক্ত জীবগুলোকে নির্মূল করে দেয়। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা বা না থাকা প্রকৃতির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক নির্বাচনই নতুন প্রজাতি সৃষ্টির মাধ্যমে অভিব্যক্তির ধারাকে অব্যাহত রাখে। তাই ডারউইনের মতবাদ **প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব** (Theory of Natural Selection) নামে পরিচিত। তিনি দেখতে পান যে, তাঁর সমসাময়িক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী **এ. আর. ওয়ালেস** (A.R. Wallace, 1823-1913) ইতিমধ্যে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর ন্যায় প্রাকৃতিক নির্বাচন সংক্রান্ত অভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেন। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ **ডারউইন-ওয়ালেস** (Darwin-Wallace) যৌথ মতবাদ হিসেবে অভিহিত। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ ৬টি তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা– **(১) বংশবৃদ্ধির উচ্চহার; (২) খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা; (৩) জীবন সংগ্রাম; (৪) প্রকরণ বা পরিবৃত্তি; (৫) যোগ্যতমের বিজয় এবং (৬) প্রাকৃতিক নির্বাচন ও নতুন প্রজাতির সৃষ্টি।**



H.M.S. BEAGLE

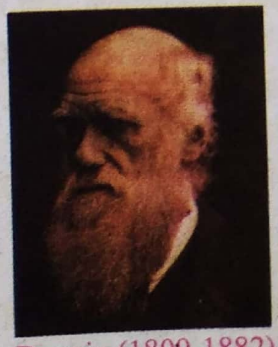

Darwin (1809-1882)

Scanned with CamScanner

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহের ছক

পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১। বংশবৃদ্ধির উচ্চহার ২। খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা	জীবন সংগ্রাম (অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম)
৩। জীবন সংগ্রাম ৪। প্রকরণ বা পরিবৃত্তি	যোগ্যতমের জয় (প্রাকৃতিক নির্বাচন)
৫। যোগ্যতমের জয় ৬। প্রাকৃতিক নির্বাচন	নতুন প্রজাতি সৃষ্টি (জৈবিক বিবর্তন)

ডারউইন-এর মতবাদের ব্যাখ্যা (Explanation of Darwin Theory)

১। বংশবৃদ্ধির উচ্চহার (Prodigality of Reproduction) : প্রতিটি জীব প্রজননের সময় যে অগণিত সংখ্যায় সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে তা ডারউইনের মনে দাগ কাটে। কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে জনন হারকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। একটি স্ত্রী **স্যালমন মাছ** (Salmon fish) একটি ঋতুতে প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ ডিম পাড়ে। একটি **ঝিনুক** প্রায় ১১ কোটি ৪০ লাখ ডিম ছাড়ে। এককোষী প্রাণী **প্যারামেসিয়াম** (*Paramecium*) বছরে ৬০০ বার প্রজনন ঘটাতে সক্ষম। এসব প্রাণীর যেকোনো একটির সব বংশধর বেঁচে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবী ভরে যেত। প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সন্তান উৎপন্ন করাই প্রকৃতির ধর্ম।

২। খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of food and space) : বংশবৃদ্ধির উচ্চ হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্য ও বাসস্থানের সংকুলান করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে স্থানের পরিমাণ অপরিবর্তনীয় হওয়ায় খাদ্য উৎপাদনের হার কখনোই বংশ বৃদ্ধির হারকে ছুঁতে পারে না। জীবের বংশ বৃদ্ধি ঘটে জ্যামিতিক হারে; কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে। ফলে অধিক সন্তান-সন্ততির জন্ম হলেও প্রকৃতির নিয়মে বাসস্থান ও খাদ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে এদের অধিকাংশই অচিরে বিলীন হয়ে যায়।

৩। জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence) : প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার জন্য অকুণ্ঠ প্রয়াস থাকে। সুতরাং প্রজননের ফলে সৃষ্ট অগণিত অপত্য জীব সীমিত খাদ্য ও বাসস্থানের সম্মুখীন হয়ে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে ও প্রত্যেকে পর্যাপ্ত খাদ্য ও বাসস্থান পায় না। ফলে জীবেরা এই উপকরণ দুটি লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। তবে এই প্রতিযোগিতা নিম্নলিখিত তিন ধরনের হতে পারে। যথা:

(ক) অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (Intra-specific struggle) : যখন একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন সদস্য খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করে তখন তাকে **অন্তঃপ্রজাতিক** সংগ্রাম বা **স্বপ্রজাতির** সঙ্গে সংগ্রাম বলে। অপরিমিত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এ ধরনের সংগ্রামের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি উদ্ভিদের নিচে যখন একই প্রজাতির অসংখ্য চারাগাছ জন্মায় তখন আলো, বায়ু ও খাদ্যের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় ফলে অধিকাংশ চারা গাছ মরে যায়। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, কতিপয় চারাগাছ যথাযথভাবে বৃদ্ধি পেয়ে অপত্য গাছ সৃষ্টি হয়। সীমিত জায়গায় কেবল অল্প সংখ্যক চারাগাছেই বেঁচে থাকা সম্ভব। এটি একটি অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম। এছাড়াও মানুষে-মানুষে, বাঘে-বাঘে, হরিণে-হরিণে, কুকুরে-কুকুরে অর্থাৎ একই প্রজাতির জীবের মধ্যে বাঁচার জন্য যে সংগ্রাম তাই অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম। অবশেষে এই সংগ্রামে যারা সফল হয়, তারাই টিকে থাকে।

(খ) আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (Inter-specific struggle) : যখন ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীবদের মধ্যে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য প্রতিযোগিতা দেখা যায় তখন তাকে **আন্তঃপ্রজাতিক** সংগ্রাম বা **বিষম প্রজাতির** সঙ্গে সংগ্রাম বলে। এই সংগ্রামে যারা জয়ী হয়, তারাই টিকে থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংগ্রাম প্রধানত **খাদ্যভিত্তিক**। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কীটপতঙ্গে-ব্যাঙে, ব্যাঙে-সাপে এবং ময়ুর কর্তৃক ব্যাঙ ও সাপ দুটোই ভক্ষণ একটি **খাদ্য-খাদক** সম্পর্কযুক্ত আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম। এছাড়াও সিংহে-হায়নায়, বাঘে-হরিণে, শৃগাল-মুরগিতে, গজার মাছ ও পুঁটি মাছের যে প্রতিযোগিতা তা আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রামের উদাহরণ।

(গ) পরিবেশগত সংগ্রাম (Environmental struggle) : প্রতিটি জীবকে তার পরিবেশের সঙ্গেও সংগ্রাম করতে হয়। জীব যে পরিবেশে বাস করে সে পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার সাথে জীবের যে সংগ্রাম তাকে **পরিবেশগত সংগ্রাম** বলে। খরা, বন্যা, অধিক তাপ ও শৈত্য, ঝড়, ভূমিকম্প, মহামারী, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে জীবকে বাঁচবার জন্য লড়াই করতে হয়। অভিযোজ্যতা লাভের মধ্য দিয়ে জীব এই সংগ্রামে জয়ী হয়।

Scanned with CamScanner

৪। **প্রকরণ বা পরিবৃত্তি (Variation) :** প্রকরণ বা পরিবৃত্তি জীবজগতের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। কোনো দুটি জীবই হুবহু এক রূপ নয়। এমনকি একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যেও কিছু না কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই পার্থক্যেই প্রকরণ। এই প্রকরণ বিভিন্ন কারণে হতে পারে।

ডারউইনের মতে, জীব প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ফলে যে দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হয় তা পরবর্তীকালে সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় এবং কালক্রমে নতুন বৈশিষ্ট্য রূপে দেখা দেয়। এ পরিবর্তনই পরিবৃত্তি বা প্রকরণ। এই প্রকরণ দুই ধরনের হতে পারে, যথা : অনুকূল প্রকরণ ও প্রতিকূল প্রকরণ। অনুকূল বা সুবিধাজনক প্রকরণই জীবের বেঁচে থাকার জন্য সহায়ক।

৫। **যোগ্যতমের বিজয় (Survival of the fittest) :** প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে সাফল্য আসে যোগ্যতমের জন্য। খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য এই প্রতিযোগিতায় সব প্রজাতির সদস্য বেঁচে থাকার সুযোগ লাভ করে। সুতরাং এ সদস্যই সুবিধাজনক প্রকরণের ফলে যোগ্যতম বলে বিবেচিত হয়। এসব প্রকরণ সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমশ সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। ফলে তারা জীবন সংগ্রামে টিকে থাকে। যেসব জীবে সুবিধাজনক পরিবৃত্তি ঘটে না তারা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায় বলে ধারণা করা হয়। ডাইনোসর ও অন্যান্য প্রাণী এ কারণেই জীবনযুদ্ধে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৬। **প্রাকৃতিক নির্বাচন ও নতুন প্রজাতির সৃষ্টি (Natural Selection and origin of new species) :** প্রকৃতি যে প্রক্রিয়ায় জীবন সংগ্রামে প্রার্থী নির্বাচন করে তাকেই **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (natural selection) বলে। ডারউইনের মতে, জীবন সংগ্রামে যারা টিকে থাকে তারা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত। অন্য কথায় প্রকৃতি দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট বা নির্বাচিত দলই শুধু জীবন সংগ্রামে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এই নির্বাচিত ও যোগ্য দলসংগ্রামে টিকে থাকার মতো অনুকূল ও সহায়ক প্রকরণপ্রাপ্ত হয়।

সুবিধাজনক পরিবৃত্তিসম্পন্ন জীব পরিবেশের সাথে সুন্দরভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং বংশ বিস্তারের অধিক সুযোগ পায়। অপরদিকে দুর্বল (অযোগ্য) জীব পরিবেশের সাথে খাপ খাইতে পারে না। যেহেতু বংশ বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না তাই টিকে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ দেখা দেয় ও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা জীবগুলোর যোগ্য প্রকরণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো যৌন প্রজননের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে বংশধরদের মধ্যে পরিবাহিত হয়। তাই দেখা যায়, শুধু সুবিধাজনক গুণগুলো বংশপরম্পরায় উত্তরসূরিদের মধ্যে সঞ্চারিত ও সংরক্ষিত হয়। এভাবে সুদীর্ঘ বহু বছর ধরে পরের বংশধরদের কতিপয় জীব তাদের পূর্বপুরুষ থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে নতুন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হবে। নতুন প্রজাতি সৃষ্টিই অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের মূল বক্তব্য। বর্তমানে বংশগতিবিদ, কোষতত্ত্ববিদ এবং শ্রেণিবিদগণ নতুন প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়ে বংশগতিবিদ্যা মতবাদের এবং বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেন, তিনটি ভিন্ন উপায়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে। যেমন– দুটি জীবের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্রমচিত্র। সবুজ বিটল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলে সহজে পাখিদের বেশি চোখে পড়েছে এবং তাদের খাদ্য হিসেবে নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং বাদামি বিটল টিকে গেছে।



চিত্র ১১.৬ : নতুন প্রজাতির উৎপত্তি

Scanned with CamScanner

ডারউইনবাদের সমালোচনা (Criticism of Darwinism)

বিবর্তনে ডারউইনের মতবাদের গুরুত্ব অনেক। কিন্তু এ মতবাদ কোনো দিনই সর্বজনস্বীকৃত হয়নি। ডারউইনের মতবাদের বিপক্ষে বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছেন। যেমন–

- ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী অভিযোজন ও প্রকরণই বিবর্তনের জন্য দায়ী। কিন্তু এ অভিযোজন বা প্রকরণ কীভাবে সংঘটিত হয়, ডারউইন তার ব্যাখ্যা করতে পারেননি।
- ডারউইন যোগ্যতমের জয়ের কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি যোগ্যতমের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।
- ল্যামার্কের মতো ডারউইনও অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন।
- ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের (vestigial organ) উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা যায় না।
- ডারউইন বৃহৎ এবং আমুল পরিবর্তন বা মিউটেশন লক্ষ করেছিলেন। তিনি এগুলোকে প্রকৃতির খেলা বা তামাশা (sports or jokes of nature) বলে উপেক্ষা করেছিলেন।
- প্রাকৃতিক নির্বাচন সবসময় সুবিধাজনক (favourable) হয় না। অনেক সময় কোনো বৈশিষ্ট্যের অত্যধিক বৃদ্ধির কারণে (over specialization) জীব অবলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন– দীর্ঘ দাঁতওয়ালা বাঘ (sabre toothed tiger) পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
- প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে নতুন প্রজাতি হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায় এমন একটি জীবও বংশগতিবিদরা সৃষ্টি করতে পারেননি।
- কখনও কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমন– বন্যা, খরা, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি) ফলে অনেক জীব মারা যায়, কেবল ভাগ্যবান জীবগুলো বেঁচে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে যোগ্যতমের বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।
- বংশগত ও বংশগত নয় এ দু'রকম প্রকরণের পার্থক্য ডারউইন বুঝতে পারেননি। তাঁর মতে, সব রকম প্রকরণই বংশগত কিন্তু সকল প্রকরণ বংশগত নয়।
- ডারউইন প্রকরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন যা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ অত্যধিক জটিল ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।
- নির্বাচন কেবল একটি চরিত্রে হয় না। নির্বাচন সমগ্র জীবের উপর কার্যকর। একই জীবে ভালো ও মন্দ চরিত্রের সমাবেশ থাকে। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের ফল অনুমান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।
- ডারউইন **প্যানজেনেসিস মতবাদের** (Theory of Pangenesis) মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ ধারণা এখন আর সমর্থিত নয়।

ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদের পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ল্যামার্কবাদ (Lamarckism)	ডারউইনবাদ (Darwinism)
১। মতবাদের নাম	অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার মতবাদ (Theory of inheritance of acquired characters)।	প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ (Theory of natural selection)।
২। প্রবর্তনকাল	1809 খ্রিষ্টাব্দ।	1859 খ্রিস্টাব্দ।
৩। যে গ্রন্থে প্রকাশিত	Philosophic Zoologic	On the Origin of Species by Means of Natural Selection
৪। মূল প্রতিপাদ্য	অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন, অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার এবং অর্জিত গুণাবলির উত্তরাধিকার প্রভৃতি।	বংশবৃদ্ধির উচ্চহার, খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা, জীবন সংগ্রাম, প্রকরণ, যোগ্যতমের বিজয় এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন ও নতুন প্রজাতির সৃষ্টি প্রভৃতি।
৫। বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির কারণ	প্রচেষ্টা, ব্যবহার ও অব্যবহার।	প্রকরণ।
৬। বৈশিষ্ট্য নির্বাচনের জন্য দায়ী	জীবসত্ত্বা।	প্রকৃতি।
৭। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম	মান্য করা হয় না।	মান্য করা হয়।
৮। গ্রহণযোগ্যতা	কম (অনাদৃত ও পরিত্যক্ত)।	অধিক (সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য)।

Scanned with CamScanner

নব্য/নয়া-ডারউইনবাদ (Neo-Darwinism)

ডারউইন যখন তাঁর বিবর্তনের মতবাদ প্রকাশ করেন তখন জিনতত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণা ছিল না। পরে জিনতত্ত্বের আলোকে এই মতবাদকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলে। ফলে ডারউইন মতবাদ অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রকরণ কীভাবে হয় ডারউইন তা বলতে পারেননি; কিন্তু জিনতত্ত্ব এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। তাই ডারউইন মতবাদ নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, ইহাই **নয়া-ডারউইনবাদ** (Neo-Darwinism)।

'Neo' শব্দের অর্থ নয়া বা নতুন (new)। Alfred Russel Wallace এবং August Weismann-এর বিবর্তনগত ধারণা এবং মেন্ডেলীয় জিনতত্ত্বের আলোকে পরিবর্তিত ডারউইনবাদ বোঝাতে 1885 খ্রিষ্টাব্দে George Romanes **'নিও-ডারউইনিজম'** শব্দটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন।

মেন্ডেলীয় জিনতত্ত্বের (Mendelian Genetics) সাপেক্ষে রূপান্তরিত ডারউইনবাদ যা Darwin-এর প্যানজেনেসিস তত্ত্ব (মিক্স উত্তরাধিকার ধারণা) থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে পৃথক করে তাকে **নয়া-ডারউইনবাদ** বলা হয়।

নয়া-ডারউইনবাদের প্রস্তাবনায় বিজ্ঞানীরা প্রধানত যে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, সেগুলো হলো–

জিনগত

প্রকরণ, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং **জননগত পৃথক্করণ**। নয়া-ডারউইনবাদের প্রধান প্রবক্তা **অগাস্ট ভাইজম্যান** (August Weismann)। তিনি 1895 খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জার্মপ্লাজম মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ল্যামার্কের 'অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার' তত্ত্বের বিরোধিতা করেন এবং প্রকরণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেন। তিনি তাঁর **জার্মপ্লাজম-সোমাটোপ্লাজম** (Germplasm-Somatoplasm) তত্ত্বে উল্লেখ করেন যে, জীবদেহের প্রোটোপ্লাজম দুই ধরনের যথা–**সোমাটোপ্লাজম** ও **জার্মপ্লাজম**। সোমাটোপ্লাজম দেহকোষে এবং জার্মপ্লাজম জননকোষে অবস্থান করে। জার্মপ্লাজমে যৌন জননের মাধ্যমে জীবদেহের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী বংশধরে স্থানান্তরিত করে কিন্তু সোমাটোপ্লাজম তা পারে না। তাই সোমাটোপ্লাজমবাহী দেহকোষে পরিবর্তন ঘটলেও তা সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় না। তিনি প্রকরণ বা পরিবৃত্তির ব্যাখ্যায় বলেন যে, জননকোষের অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার ফলেই পরবর্তী বংশধরে প্রকরণের উদ্ভব ঘটে।

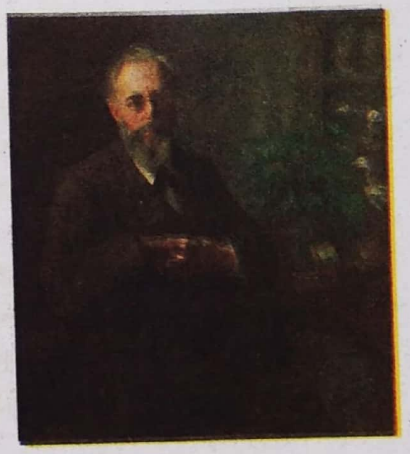

August Weismann
(1834-1914)

নয়া-ডারউইনবাদের মূল প্রতিপাদ্য

- নয়া-ডারউইনবাদে প্রকরণের জিনতাত্ত্বিক ভিত্তি নির্দেশিত হয় এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণরূপে জিনগত প্রকরণকে দায়ী করা হয়। কারণ জিনগত প্রকরণের বংশপরম্পরায় সঞ্চারণ ঘটে।
- নয়া-ডারউইনবাদ অনুসারে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক হলো জিনতাত্ত্বিক উপাদান এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ।
- নয়া-ডারউইনবাদ অনুসারে বিচ্ছিন্নতার (isolation) কারণেও নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে পারে।

ডারউইনবাদ ও নয়া-ডারউইনবাদের পার্থক্য

ডারউইনবাদ (Darwinism)	নয়া-ডারউইনবাদ (Neo-Darwinism)
১। Darwin প্রবর্তিত তত্ত্ব।	১। মেন্ডেলীয় জিনতত্ত্ব, Weismann প্রমুখ বিজ্ঞানীর বিবর্তন সম্বন্ধীয় ধারণার সাপেক্ষে রূপান্তরিত ডারউইনবাদ।
২। প্রকরণ বা ভ্যারিয়েশনের উৎস ও উত্তরাধিকারের ধারণা পাওয়া যায় না।	২। প্রকরণ বা ভ্যারিয়েশনের উৎস ও উত্তরাধিকারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।
৩। ডারউইনবাদ অনুসারে সকল প্রকরণের উত্তরাধিকার ঘটে।	৩। নয়া-ডারউইনবাদ অনুসারে শুধুমাত্র জিনগত প্রকরণের উত্তরাধিকার ঘটে।
৪। প্রাকৃতিক নির্বাচনের একক ব্যক্তিসত্ত্বা বা জীবসত্ত্বা (individual)।	৪। প্রাকৃতিক নির্বাচনের একক জনগোষ্ঠী (population)।
৫। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে।	৫। প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়াও বিচ্ছিন্নতার (isolation) মাধ্যমেও নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটাতে পারে।
৬। নিষ্ক্রিয় অঙ্গ, অপরিবর্তিত জীব, নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি ইত্যাদির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।	৬। নিষ্ক্রিয় অঙ্গ, অপরিবর্তিত জীব, নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি ইত্যাদির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner

বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণাদি (Evidences of Evolution)

বিবর্তন সংঘটিত হওয়ার সপক্ষে বিজ্ঞানীরা কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন–

১। জীবাশ্মগত ও ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণ (Palaeontological and Geological Evidences)

পাললিক শিলার স্তরে স্তরে যুগ যুগ ধরে যেসব জীবাশ্ম জমা হয়েছে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিবর্তনের অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। শিলাস্তরে সংরক্ষিত এমন কোনো নিদর্শন যা প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো জীবের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে তাই **জীবাশ্ম** (fossil) বলে। অর্থাৎ অদূরে বিলুপ্ত কোনো জীবের দেহ বা দেহাংশ বা কোনো চিহ্ন প্রাকৃতিক উপায়ে পাললিক শিলায় প্রস্তরীভূত হয়ে সংরক্ষিত থাকলে তাকে জীবাশ্ম (fossil) বলে। (fossil : ল্যাটিন শব্দ fossilum মাটির নিচ থেকে খনন করে পাওয়া কোন বস্তু)। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবাশ্ম নিয়ে গবেষণা ও বিশদ আলোচনা করা হয় তাকে জীবাশ্মবিজ্ঞান বা প্যালিওন্টোলজি (plantology) বলে।

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিশাল জলাধারগুলোর তলায় যে পাললিক শিলাস্তর সৃষ্টি হয়েছে তাতে সেকালের জীবজন্তুর দেহাবশেষ সংরক্ষিত হয়েছে। ১৫০ কোটি বছর পূর্বে সৃষ্ট শিলাস্তরে সর্বপ্রথম আদি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে সরল থেকে জটিল জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে। জীবাশ্ম যে বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে তা বিভিন্ন যুগে কোনো বিশেষ একটি জীবের জীবাশ্ম পরীক্ষা করলে যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি কখনো কোনো জীবাশ্ম দুটি ভিন্ন জীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ইঙ্গিতও বহন করে। এ ধরনের জীবাশ্মকে **সংযোগকারী জীবাশ্ম** (connecting fossil) বলে। ৩৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে কোনো প্রাণী ছিল এমন প্রমাণ নেই। তবে ১৫০ কোটি বছর পূর্বের শিলাস্তর অর্থাৎ **প্রোটেরোজয়িক** মহাযুগে আদি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়।

প্যালিওজয়িক মহাযুগে প্রায় সাড়ে সাঁইত্রিশ কোটি বছর পূর্বে সর্বপ্রথম উভচর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। মেসোজয়িক মহাযুগে প্রথম স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ দেখা যায়। সাড়ে ষোলো কোটি বছর পূর্বে দাঁতযুক্ত পাখির ন্যায় জীব ছিল। এদের সরীসৃপ ও পাখির মধ্যে সংযোগকারী প্রাণী বলে চিহ্নিত করা হয়। মাত্র দুই কোটি বছর পূর্বে সর্বপ্রথম মানুষের আগমন ঘটে। কোটি কোটি বছর ধরে বিভিন্ন শিলাস্তরে যে জীবাশ্ম জমা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বিবর্তনের সপক্ষে একটি জোরালো প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত।

(ক) ঘোড়ার বিবর্তন (Evolution of horse) : ছয় কোটি বছর পূর্বে ঘোড়ার (*Equus equus*) আদি পূর্বপুরুষ ইওহিপ্পাস (*Eohippus*) প্রায় 0.4m উঁচু ছিল। এর সামনের পায়ে ৪টি এবং পিছনের পায়ে ৩টি নখযুক্ত আঙুল ছিল। ইওহিপ্পাসের পরবর্তীধারা মেজোহিপ্পাসের (*Mesohippus*) উচ্চতা ছিল 0.6m এবং এর পায়ে তিনটি করে আঙুল ছিল। পরবর্তী স্তরে 1.0m উঁচু মেরিচিপ্পাসের (*Merychippus*) ৩টি আঙুলের মধ্যে ১টি কর্মক্ষম ছিল। এর পরে আগমন ঘটে 1.2m উঁচু প্লায়োহিপ্পাস (*Pliohippus*) জাতীয় ঘোড়ার। এর সামনের ও পিছনের পায়ে ১টি মাত্র আঙুল দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক কালের 1.6m উঁচু ইকুয়াস (*Equus*) ঘোড়া এই প্লায়োহিপ্পাসের বংশধর। ঘোড়াদের বিবর্তনিক পথ হলো:

ইওহিপ্পাস ⟶ মেজোহিপ্পাস ⟶ মেরিচিপ্পাস ⟶ প্লায়োহিপ্পাস ⟶ ইকুয়াস



চিত্র ১১.৭ : ঘোড়ার বিবর্তনের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ

ঘোড়ার বিবর্তনের পথে ক্রমান্বয়ে সাধারণ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যথা–

i. ক্রমান্বয়ে পায়ের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি,
ii. পায়ের আঙুলের সংখ্যার ক্রমিক হ্রাস,
iii. শক্ত মাটিতে দ্রুত চলাফেরার জন্য খুরের উৎপত্তি,
iv. প্রিমোলার ও মোলার দাঁতের পুরু মুকুট সৃষ্টি এবং
v. সুগঠিত পেশিসহ ক্রমান্বয়ে দেহের আয়তন বৃদ্ধি।

Scanned with CamScanner

(খ) লুপ্ত সংযোজক বা মিসিং লিংক বা সংযোগকারী জীবাশ্ম (Missing link or Connecting fossil) : বিবর্তনগতভাবে নিকট সম্পর্কযুক্ত দুটি ভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী জীবগোষ্ঠী যারা বর্তমানে বিলুপ্ত এবং যাদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর জীবেরই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে, তাদের লুপ্ত সংযোজক বা মিসিং লিংক বা সংযোগকারী জীবাশ্ম বলা হয়। সংক্ষেপে, যে জীবাশ্মের মাধ্যমে দুটি পর্ব বা গ্রুপের প্রাণীর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে মিসিং লিংক বা সংযোগকারী জীবাশ্ম বলে। এরা **ট্রানজিশনাল ফসিল** (transitional fossil) হিসেবেও পরিচিত। **আর্কিওপটেরিক্স** (*Archaeopteryx*)-কে মিসিং লিংক বা সংযোগকারী জীবাশ্ম বা বিবর্তনিক সংযোগকারী প্রাণী বলে। কারণ এটি সরীসৃপ ও পাখির মধ্যবর্তী প্রাণী এবং এতে সরীসৃপ ও পাখি জাতীয় প্রাণীর বৈশিষ্ট্যাবলি দেখা যায়। আজ থেকে ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ বছর আগে জুরাসিক যুগে এর আবির্ভাব হয়েছিল। **Andreas Wagner** (1861) জার্মানির ব্যাভেরিয়ার বিখ্যাত সোলেন হোপেন অঞ্চল থেকে এর জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। এরপর এর আরও দশটি জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া যায়।

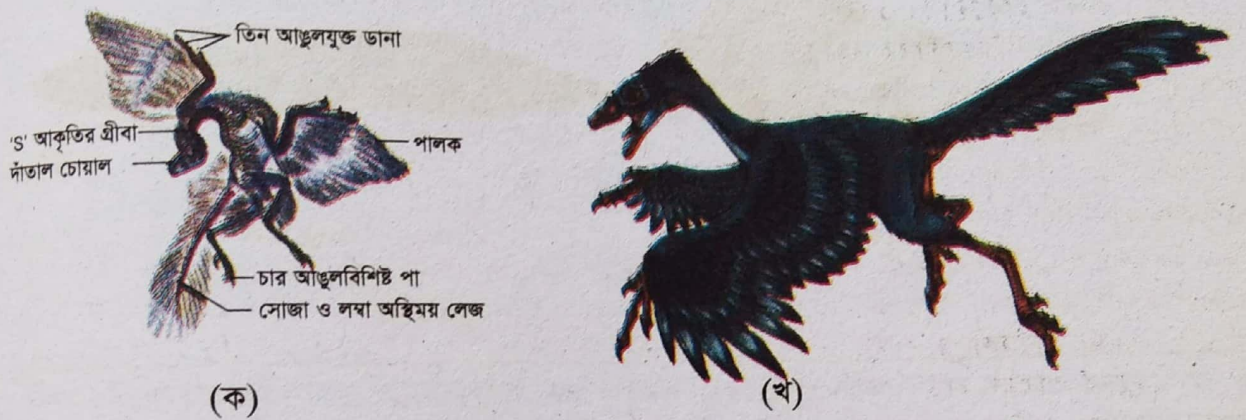

চিত্র-১১.৮ক : *Archaeopteryx* এর (ক) জীবাশ্মের ছাপ, (খ) কাল্পনিক আকৃতি।

আর্কিওপটেরিক্সের সরীসৃপ বৈশিষ্ট্য :

১। দেহ সরীসৃপের ন্যায় লম্বা ও ২০টি কশেরুকাযুক্ত লম্বা লেজ ছিল।

২। দেহকঙ্কাল পুরু ও ভারী হাড় দ্বারা গঠিত।

৩। নখরযুক্ত আঙুলি বিদ্যমান।

৪। দাঁতযুক্ত চোয়াল এবং শুষ্ক আঁইশ দ্বারা দেহ আবৃত।



চিত্র-১১.৮খ : সরীসৃপ ও পাখির বৈশিষ্ট্যের চিত্ররূপ

আর্কিওপটেরিক্স-এর পাখির বৈশিষ্ট্য :

১। দেহের গঠন পাখির ন্যায়।

২। ডানা আকৃতির অগ্রপদ এবং অগ্রপদে ৩টি আঙুলের উপস্থিতি।

৩। হাড় পাখির মতো হালকা এবং লেজ ও ডানায় পালক বিদ্যমান।

৪। ঠোঁট চঞ্চুতে রূপান্তরিত।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে বিবর্তনবিদরা ধারণা করেন যে, সরীসৃপ থেকে পাখিজাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। এজন্য বিজ্ঞানী **জুলিয়ান হাক্সলে** (Julian Huxley) পাখিদের **গ্লোরিফায়েড রেপ্টাইল** (Birds are glorified reptiles) বা মহিমান্বিত সরীসৃপ বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই আর্কিওপটেরিক্স বিবর্তনের সপক্ষে একটি জোরালো প্রমাণ। পাখিদের বিবর্তনিক পথ হলো :

সরীসৃপ ⟶ আর্কিওপটেরিক্স ⟶ পাখি

(গ) সংযোগকারী যোগসূত্র বা কানেকটিং লিংক (Connecting link) : দুটি পৃথক জীবগোষ্ঠীর (প্রজাতি, শ্রেণি, পর্ব ইত্যাদি ট্যাক্সা) বৈশিষ্ট্য সমন্বিত মধ্যবর্তী বা সংযোগসাধনকারী জীবদের (বর্তমানে অস্তিত্ব রয়েছে এরূপ) সংযোগকারী যোগসূত্র বা **সংযোগকারী জীব** বা কানেকটিং লিংক বলে। এদেরকে **জীবন্ত জীবাশ্ম** বা লিভিং ফসিলও

Scanned with CamScanner

(living fossil) বলা যায়। উদাহরণ হিসেবে Platypus (*Ornithorhynchus*) ও Lung fish (*Protopterus*) উল্লেখ করা হলো।

প্লাটিপাস (Platypus) : সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর মধ্যবর্তী কানেকটিং লিংক।

সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য : করোটি, পেক্টোরাল গার্ডল, ওভিপেরাস ও রেচন-জননতন্ত্র ইত্যাদি।

স্তন্যপায়ীর বৈশিষ্ট্য : স্তনগ্রন্থি (বৃন্তহীন), দেহ লোমাবৃত, ডায়াফ্রাম ইত্যাদি।

লাং ফিস (Lung fish- *Protopterus*) : মৎস্য ও উভচরের মধ্যবর্তী কানেকটিং লিংক।

মৎস্যের বৈশিষ্ট্য : পাখনা, আঁইশ, পার্শ্বরেখা ইত্যাদি।

উভচরের বৈশিষ্ট্য : ফুসফুস, তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি। এ ছাড়াও *Limulus, Chimaera, Peripatus, Sphenodon, Latimaria* প্রভৃতিও সংযোগকারী জীব বা জীবন্ত জীবাশ্ম।

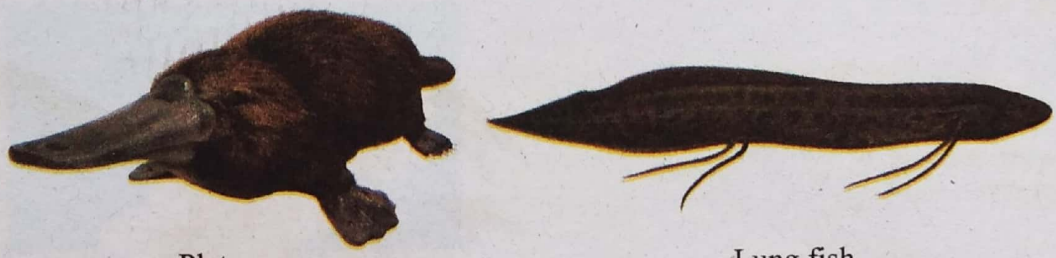

Platypus Lung fish

চিত্র-১১.৯ : সংযোগকারী যোগসূত্র বা কানেকটিং লিংক (জীবন্ত জীবাশ্ম)

মিসিং লিংক ও কানেকটিং লিংক-এর পার্থক্য

মিসিং লিংক বা সংযোগকারী জীবাশ্ম (Missing link or Connecting fossil)	সংযোগকারী যোগসূত্র বা কানেকটিং লিংক (Connecting link)
১। বর্তমানে এরা বিলুপ্ত।	১। বর্তমানে এদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ।
২। এরা একগোষ্ঠী থেকে অপর গোষ্ঠীতে রূপান্তরের ক্ষণস্থায়ী জীব।	২। এরা দুটি জীবগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী জীব।
৩। এরা অপেক্ষাকৃত কম অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন। এজন্য এরা বিলুপ্ত।	৩। এরা অধিক অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারে (যেমন– প্লাটিপাস দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত অবস্থায় বেঁচে রয়েছে)। এরা জীবন্ত জীবাশ্ম নামেও পরিচিত।

২। শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ (Taxonomic Evidences)

জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের দিকে লক্ষ করলে বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ মেলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস পর্ব, শ্রেণি, বর্গ, গোত্র, গণ, প্রজাতি ইত্যাদি ধাপে বিভক্ত। শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে **প্রজাতি** (species)। যেসব প্রাণী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যে সাদৃশ্যযুক্ত এবং নিজেদের মিলনে উর্বর বংশধর তৈরিতে সক্ষম তারা একই প্রজাতিভুক্ত। পৃথিবীর সকল মানুষ একটি প্রজাতি; এর নাম *Homo sapiens*। এভাবে কতগুলো একই ধরনের প্রজাতি মিলে 'গণে' এবং ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে গোত্র, বর্গ, শ্রেণি, পর্ব এবং সর্বোপরি প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ গঠন করা হয়েছে। পর্ব থেকে ধাপে ধাপে প্রজাতি পর্যন্ত যতই অগ্রসর হওয়া যায় প্রাণীদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ততই অধিক হয়। একই প্রজাতিভুক্ত প্রাণীগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে যে, তারা একই পূর্বপুরুষের বংশধর।

শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায়, কোনো কোনো প্রাণী যেমন পিঁপড়ে দুটি ভিন্ন শ্রেণির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং তাদেরকে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। মধ্যবর্তী প্রাণী হিসেবে এরা বিবর্তনের প্রমাণ ও গতিপথ নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, শ্রেণিবিন্যাস বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে।

Scanned with CamScanner

৩। জীব-ভৌগোলিক প্রমাণ (Biogeographical Evidences)

সাগর, মহাসাগর, পর্বতমালা ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠকে কতগুলো ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। এসব অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যেমন পার্থক্য তেমনি সাদৃশ্যও রয়েছে, ইহাই অভিব্যক্তির নির্দেশক। প্রাণিকুলের বিস্তারের ভিত্তিতে **A.R. Wallace** 1870 খ্রিষ্টাব্দে ভূপৃষ্ঠকে মোট ৬টি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। এসব অঞ্চলের পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রজাতিরও পার্থক্য দেখা যায়। এমনকি একই প্রজাতির জীবের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার **মারসুপিয়াল** (marsupial) এ কারণেই কিছুটা ভিন্ন ধরনের। একিডনা, প্লাটিপাস, ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি প্রাণী অস্ট্রেলিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় না। ক্যাঙ্গারু এক প্রকার থলিবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী। কিন্তু উন্নত ধরনের অমরাবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী সৃষ্টি হওয়ার পর পরাজিত হয়ে থলিবিশিষ্ট স্তন্যপায়ীরা লোপ পায়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে এখানে এরা আজও টিকে আছে। দক্ষিণ আমেরিকা অন্যান্য মহাদেশ থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও দুর্গম বলে সেখানে কিছু কিছু থলিবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী আধুনিককাল পর্যন্ত টিকে আছে।



চিত্র ১১.১০ : অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্যাঙ্গারু

ফ্লোরিডা ও বাহামাস দুটি পাশাপাশি অঞ্চল। কিন্তু এখানকার জীবজন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। আবার আমেরিকা থেকে ইউরেশিয়া যদিও বহুদূরে অবস্থিত তথাপি এদের জীবজন্তুর মধ্যে বেশ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। জীবজন্তুর বিস্তৃতির পর্যালোচনাকালে যে প্রশ্ন মনে আসে তা একমাত্র বিবর্তন দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়।

৪। অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ (Morphological Evidences)

অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (morphology) জীবের আকার, আকৃতি ও গঠন (বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। বিভিন্ন গ্রুপের অন্তর্গত প্রাণীদের অঙ্গের গঠন তুলনা করলে বিবর্তন সম্পর্কে প্রমাণ মেলে।

(ক) তুলনামূলক শারীরস্থান (Comparative Anatomy) : অঙ্গসংস্থানিক গঠনে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত থেকে উন্নততর জীবে বৃদ্ধি ও জটিলতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের ক্রমপরিবর্তন উল্লেখ করা যেতে পারে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড : মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের গঠনের তুলনা করলে দেখা যায়, মাছের হৃৎপিণ্ড দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, সরীসৃপের হৃৎপিণ্ড আংশিক চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (কুমির চার প্রকোষ্ঠ) এবং পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড **সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠ** বিশিষ্ট। কাজেই সরলতম হৃৎপিণ্ড থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল হৃৎপিণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সরল প্রাণী থেকে ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে জটিল প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।



চিত্র ১১.১১ : মাছ, উভচর, সরীসৃপ এবং পাখি ও স্তন্যপায়ীর হৃৎপিণ্ডের ক্রমশ বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের তুলনা

Scanned with CamScanner

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক : সাধারণভাবে বিভিন্ন শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীর অর্থাৎ মাছ থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত সকলের মস্তিষ্কের মৌলিক গঠন একই রকম (অর্থাৎ ৫টি ভাগে বিভক্ত)। কিন্তু বিবর্তনের ফলে মস্তিষ্কের মৌলিক গঠন ব্যতিরেকে **সেরিব্রাম** (cerebrum) বা গুরুমস্তিষ্ক ও **সেরিবেলাম** (cerebellum) বা লঘুমস্তিষ্কের আকৃতি ও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর সেরিব্রাম সবচেয়ে উন্নত। মানুষের সেরিব্রাম মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে আবৃত করে রাখে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সরল প্রাণী থেকে ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে জটিল প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।



চিত্র ১১.১২ : মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের ধারাবাহিক বিবর্তন

(খ) সমসংস্থ অঙ্গ (Homologous Organs) : যেসব অঙ্গ **উৎপত্তি** ও **অন্তর্গঠনের** দিক থেকে এক হলেও, বাহ্যিক গঠন এবং কাজের ধরনের দিক থেকে আলাদা (কখনো কখনো কাজের দিক থেকে অনুরূপ হতে পারে), তাদের **সমসংস্থ অঙ্গ** বলে। **অপসারী বিবর্তনের** (divergent evolution) ফলে সমসংস্থ অঙ্গ গঠিত হয়। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণিদের অগ্রপদ, যেমন- ব্যাঙের অগ্রপদ, গোসাপের পা, গিরগিটির অগ্রপদ, গিনিপিগের অগ্রপদ, ঘোড়ার অগ্রপদ, পাখির ডানা, বাদুড়ের ডানা, মানুষের হাত, সীল বা তিমির ফ্লিপার ইত্যাদি। তবে এদের গঠন ও আকৃতি জীবন পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রগতিশীল অঙ্গে রূপ নিয়েছে।



চিত্র ১১.১৩ : প্রাণীর সমসংস্থ অঙ্গ

(গ) সমবৃত্তি অঙ্গ (Analogous Organs) : যেসব অঙ্গ **কার্যগতভাবে** একই ধরনের কিন্তু উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে পৃথক, তাদের **সমবৃত্তি অঙ্গ** বলে। **অভিসারী বিবর্তনের** (convergent evolution) ফলে সমবৃত্তি অঙ্গ গঠিত হয়। যেমন– পতঙ্গের ডানা, বাদুড়ের ডানা ও পাখির ডানা, মৌমাছি ও কাঁকড়াবিছার হুল, মাছের পাখনা ও তিমি মাছের ফ্লিপার, অক্টোপাসের চোখ ও মানুষের চোখ ইত্যাদি। বাদুড়, আরশোলা অথবা প্রজাপতি ডানার সাহায্যে উড়ে থাকে। আরশোলা অথবা প্রজাপতি ডানার অভ্যন্তরীণ গঠন এবং এদের উৎপত্তির সাথে বাদুড় অথবা পাখির ডানার কোনো সাদৃশ্য নেই।



চিত্র ১১.১৪ : (ক) প্রাণীর সমবৃত্তি অঙ্গ ও (খ) বিভিন্ন প্রাণীর অগ্রপদের কঙ্কালের বৃদ্ধি ও বিকাশলাভের তুলনা

কতগুলো অঙ্গ পরস্পরের সমসংস্থ এবং সমবৃত্তি উভয়ই হতে পারে। সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গ বিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। আদি জীবনের সৃষ্টির পর এ প্রাণস্রোত পরিবেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অভিব্যক্তির এ প্রবাহ স্রোত এনেছে অপরূপ রূপান্তরের ঢেউ। সমসংস্থ অঙ্গ পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্দেশ করে। সমবৃত্তি অঙ্গগুলো একই রকম জীবনধারার ইঙ্গিত দেয়। সমসংস্থ এবং সমবৃত্তি অঙ্গের ব্যাখ্যা একমাত্র অভিব্যক্তির মাধ্যমেই করা যায়। তাই বলা যায়, সৃষ্টি একবারই হয়েছে, বিবর্তনের মাধ্যমে এদের বিকাশ ঘটেছে বারে বারে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে।

Scanned with CamScanner

(ঘ) নিষ্ক্রিয় অঙ্গ (Vestigial Organs) : প্রাণিদেহে এমন কতকগুলো বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গ দেখা যায় যেগুলো বিশেষ কোনো প্রাণীতে অকেজো বা নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্য প্রাণীতে সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। এ সকল অঙ্গগুলোকে **নিষ্ক্রিয় অঙ্গ** বলে। এসব অঙ্গ বিবর্তন সম্পর্কিত প্রমাণ বহন করে। উক্ত অঙ্গগুলো অতীতে জীবের পূর্বসূরিতে যথেষ্ট কার্যগত গুরুত্বসম্পন্ন হলেও বর্তমানে কার্যহীন। সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য জীবে সমরূপ অঙ্গ যথেষ্ট কার্যকারিতাযুক্ত হতে পারে। মানবদেহে প্রায় ১০০টি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বিদ্যমান। যেমন– মানুষের কানের পেশি, ছেদন দাঁত, আক্কেল দাঁত, অ্যাপেন্ডিক্স, পুচ্ছাস্থি, কক্কিক্স, গায়ের লোম, উপপল্লব, পুরুষের স্তনগ্রন্থির বৃন্ত ইত্যাদি।



চিত্র ১১.১৫ : মানুষের কিছু নিষ্ক্রিয় অঙ্গ

সমসংস্থ অঙ্গ ও সমবৃত্তি অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য

সমসংস্থ অঙ্গ	সমবৃত্তি অঙ্গ
১। এরা অভ্যন্তরীণ গঠনে সাদৃশ্যযুক্ত।	১। এরা অভ্যন্তরীণ গঠনে যথেষ্ট সাদৃশ্যযুক্ত নয়।
২। এরা উৎপত্তি ও বিবর্তনগত বিকাশমূলক ভাবে সদৃশ।	২। এরা উৎপত্তি ও বিবর্তনগত বিকাশমূলক ভাবে বিসদৃশ।
৩। কার্যগতভাবে এরা এক বা ভিন্ন।	৩। কার্যগত ভাবে এরা সর্বদা এক।
৪। অপসারী বিবর্তনের (divergent evolution) ফলে গঠিত হয়।	৪। অভিসারী বিবর্তনের (convergent evolution) ফলে গঠিত হয়।
৫। ভিন্নরূপ পরিবেশে অভিযোজিত।	৫। সমরূপ পরিবেশে অভিযোজিত।
৬। জাতিজনিগত সম্বন্ধযুক্ত।	৬। জাতিজনিগত সম্বন্ধযুক্ত নয়।
৭। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণিদের অগ্রপদ, যেমন- ব্যাঙের অগ্রপদ, গোসাপের পা, গিরগিটির অগ্রপদ, গিনিপিগের অগ্রপদ, ঘোড়ার অগ্রপদ, পাখির ডানা, বাদুড়ের ডানা, মানুষের হাত, সীল এর ফ্লিপার ইত্যাদি সমসংস্থ অঙ্গ।	৭। পতঙ্গের ডানা, বাদুড়ের ডানা ও পাখির ডানা, মৌমাছি ও কাঁকড়াবিছার হুল, মাছের পাখনা ও তিমি মাছের ফ্লিপার, অক্টোপাসের চোখ ও মানুষের চোখ ইত্যাদি সমবৃত্তি অঙ্গ।

৫। ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ (Embryological Evidences)

ভ্রূণবিজ্ঞান অভিব্যক্তির ওপর প্রত্যক্ষ আলোকপাত করে। প্রত্যেক জীব নিষিক্ত ডিম্ব তথা জাইগোট থেকে জীবনযাত্রা শুরু করে। পুরুষ প্রাণীর শুক্রাণু ও স্ত্রী প্রাণীর ডিম্বাণু মিলিত হয়ে যে জাইগোট সৃষ্টি করে তা স্ত্রী প্রাণীর গর্ভে বিভাজিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি করে এবং এই ভ্রূণ থেকেই পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণ পরীক্ষা করলে বিবর্তনের সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

পরিণত অবস্থায় প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেলেও ভ্রূণাবস্থায় কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, মুরগি, গরু, মানুষ প্রভৃতি প্রাণীর ভ্রূণ প্রায় হুবহু একই রকম। এসব প্রাণী যে একই পূর্বপুরুষের বংশধর ভ্রূণের গঠনগত মিল তাই প্রমাণ করে। বানর ও মানুষের ভ্রূণ একেবারে হুবহু একই রূপ। এ থেকে অনুমান করা হয় যে বানর ও মানুষের পূর্বপুরুষ একই ছিল। ভ্রূণের এই সাদৃশ্য লক্ষ করে **ভন বেয়ার** (Von Bear, 1818) বলেছেন যে, **ভ্রূণের প্রথম অবস্থায় সাধারণ লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয়। অতঃপর ভ্রূণের বৃদ্ধির সাথে অন্যান্য লক্ষণগুলোর দেখা যায়, পরিশেষে প্রজাতির লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয়।** ভ্রূণের মিলের ওপর ভিত্তি করে জার্মান বিজ্ঞানী **হেকেল** (Haeckel,1866) **'পুনরাবৃত্তি মতবাদ'** (Theory of recapitulation) বা Biogenic Law প্রচার করেন। তাঁর মতে, **ব্যক্তিজনিতে জাতিজনির পুনরাবৃত্তি** (Ontogeny Recapitulates Phylogeny) ঘটে। **অর্থাৎ কোনো একটি প্রাণীর জীবন ইতিহাসে (ভ্রূণাবস্থায়) তার পূর্বপুরুষের জীবন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।** মেরুদণ্ডী (মাছ থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত) প্রাণীর ভ্রূণাবস্থায় ফুলকাছিদ্র, দ্বি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড ও অনেক আওর্টিক আর্চ থাকে। ভ্রূণের এই মিল থেকে অনুমান করা হয় যে, মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, মুরগি, মানুষ একই পূর্বপুরুষের বংশধর।

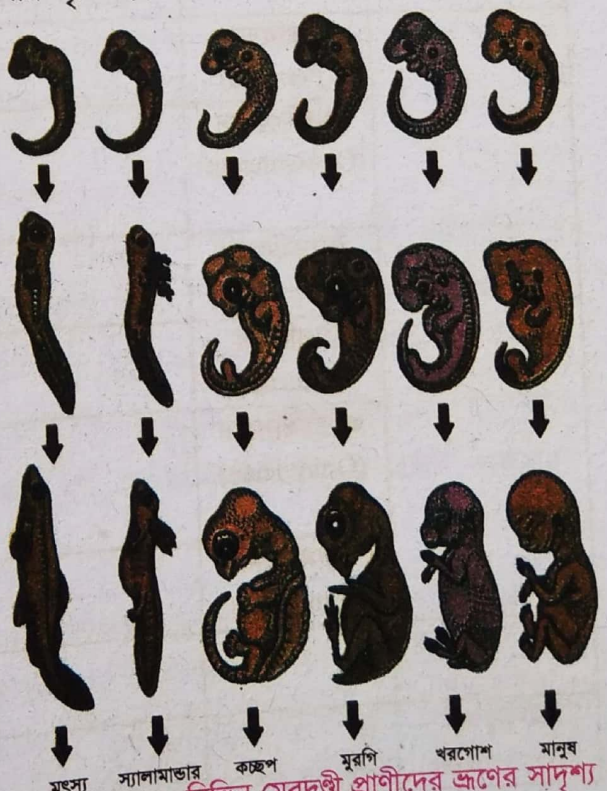

চিত্র ১১.১৬ : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের সাদৃশ্য

Scanned with CamScanner

ভূতাত্ত্বিক কালক্রম (Geological Time Scale)

মহাকাল (Eras)	কাল (Period)	যুগ (Epoch)	বছর আগে (মিলিয়ন)	প্রধান প্রাণী (Dominant Animals)	মন্তব্য (Remarks)
সিনোজয়িক (Cenozoic)	কোয়াটারনারি (Quaternary)	রিসেন্ট (Recent/Holocene)	০.০২	আধুনিক মানুষ, বিভিন্ন স্তন্যপায়ী, পাখি, মাছ ও সভ্যতার উদ্ভব।	আধুনিক যুগ (Age of Modern life)
		প্লিস্টোসিন (Pleistocene)	১.৮	মানুষের আবির্ভাব; বৃহদাকার স্তন্যপায়ীর অবলুপ্তি।	
	টারশিয়ারি (Tertiary)	প্লিওসিন (Pliocene)	৫	আধুনিক স্তন্যপায়ীর উদ্ভব এবং আদি মানবের আবির্ভাব ও বিচরণ।	স্তন্যপায়ীদের যুগ (Age of Mammals)
		মায়োসিন (Miocene)	২৬	স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য (বিশেষ করে মানুষ সদৃশ এপ্ এর আবির্ভাব)।	
		ওলিগোসিন (Oligocene)	৩৮	নানা প্রকার স্তন্যপায়ী।	
		ইওসিন (Eocene)	৫৭	আদি স্তন্যপায়ীদের অবলুপ্তি; প্লাসেন্টাযুক্ত স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
		প্যালিওসিন (Paleocene)	৬৮	স্তন্যপায়ীদের সর্বাধিক বিবর্তন (আদিম স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য)	
মেসোজয়িক (Mesozoic)	ক্রিটেসিয়াস (Cretaceous)		১৩৫	ডাইনোসরদের প্রাধান্য ও বিলুপ্তি, আধুনিক পাখির উদ্ভব; আদি স্তন্যপায়ী।	সরীসৃপদের যুগ (Age of Reptiles)
	জুরাসিক (Jurassic)		১৮৫	ডাইনোসরদের প্রাচুর্য ও প্রাধান্য, দাঁতযুক্ত পাখির উদ্ভব। সরীসৃপদের বিস্তার।	
	ট্রায়াসিক (Triassic)		২২৫	ডাইনোসরের উদ্ভব; স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপের প্রাচুর্য ও প্রাধান্য। আদি উভচরদের অবলুপ্তি।	
প্যালিওজয়িক (Paleozoic)	পারমিয়ান (Permian)		২৮৫	আধুনিক কীটপতঙ্গ উৎপত্তি; বহু আদি প্রাণী লুপ্ত; স্থলে প্রাণীর আবির্ভাব।	উভচরদের যুগ (Age of Amphibians)
	কার্বনিফেরাস (Carboniferous)		৩৬০	উভচরদের প্রাচুর্য ও প্রাধান্য; পতঙ্গদের প্রাচুর্য, কন্টকত্বক প্রাণী, হাঙ্গর, সরীসৃপের প্রথম উদ্ভব।	
	ডেভোনিয়ান (Devonian)		৪০০	নানা রকম মাছের প্রাধান্য; উভচরের উৎপত্তি।	মাছেদের যুগ (Age of Fishes)
	সিলুরিয়ান (Silurian)		৪৪০	মাছের উদ্ভব ও বিকাশ; পতঙ্গে উদ্ভব; অনেক অমেরুদণ্ডীর অবলুপ্তি।	
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)		৫১০	অমেরুদণ্ডীদের প্রাধান্য; প্রবাল, চোয়ালবিহীন কর্ডাটা এবং মাছের উদ্ভব।	অমেরুদণ্ডীদের যুগ (Age of Invertebrates)
	ক্যামব্রিয়ান (Cambrian)		৫৫০	বিভিন্ন অমেরুদণ্ডীদের উদ্ভব ও প্রাধান্য। ট্রাইলোবাইটের উদ্ভব।	
প্রোটেরোজয়িক (Proterozoic)			১৫০০	প্রথম প্রাণীর উৎপত্তি (আদ্যপ্রাণী)।	Age of Early life
আরকিওজয়িক (Archeozoic)			৩৫০০	জীবনের আবির্ভাব (কোনো জীবাশ্ম নেই)।	Age of Origin life

Scanned with CamScanner

৬। শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ (Physiological Evidences)

বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে রাসায়নিক ও জৈবসাদৃশ্যে জৈব রাসায়নিক মিল দেখা যায়। যেসব প্রাণী নিকটতম আত্মীয় তাদের মধ্যেই রাসায়নিক সাদৃশ্য বেশি। নিকটতম আত্মীয়ের রক্তে রাসায়নিক মিল রয়েছে। আবার আত্মীয় জীবের মধ্যে রক্তের গরমিল দেখা যায়। নিকটতম আত্মীয়ের হিমোগ্লোবিন স্ফটিক, প্লাজমা প্রোটিন, এনজাইম ও হরমোন সাক্ষ্য বহন করে যে, তাদের পূর্বপুরুষ এক ছিল। ট্রিপসিন প্রোটিনজাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে সাহায্য করে। বানর, নরবানর এবং মানুষের শরীরে ট্রিপসিন পরীক্ষা করলে দেখা যায়, এদের রাসায়নিক উপাদান ও কর্মপদ্ধতি এক প্রকার। বানরের রক্তের সঙ্গে গ্লাসিয়াল অ্যাসিটিক এসিড মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করলে এটি স্ফটিকাকারে পরিণত হয়, এ স্ফটিকগুলোকে হিমোগ্লোবিন স্ফটিক বলে। দেখা গেছে যে, মানুষের হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের আকার এবং বানরের হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের মতো। ঘোড়া ও কুকুরের হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের আকার আবার ভিন্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ও বানর নিকট আত্মীয়। বানরের পূর্বপুরুষ থেকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

৭। জীবরসায়নঘটিত প্রমাণ (Biochemical Evidences)

জীব রসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সকল প্রাণীতে মোটামুটি কতগুলো জৈবিক উপাদান বিদ্যমান। যেমন– আমিষ, নিউক্লিক এসিড, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি। এসব উপাদানের আণবিক গঠনগত মিলও লক্ষণীয়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, সকল জীবই একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্টি। আদি জীব থেকে জটিলতম জীবে এসব উপাদানের উপস্থিতিই বিবর্তনের প্রমাণ বহন করে।

৮। কোষতাত্ত্বিক প্রমাণ (Cytological Evidences)

অ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত যেকোনো জীব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এদের দেহ একই উপাদানে গঠিত। এদের কোষের গঠন পদ্ধতিতে কোনো পার্থক্য নেই। সকল জীবের প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক উপাদান মূলত এক। কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন একই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। সুতরাং দুটি প্রাণীর মধ্যে যতই বৈসাদৃশ্য থাকুক না কেন এদের ভিত্তি এক। পরে জীবকোষের বিভিন্ন রকম গঠন ও পরিবর্তনই তাদের ক্রমবিকাশকে সম্ভব করেছে।

৯। জিনতাত্ত্বিক প্রমাণ (Genetical Evidences)

জীবদেহের বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক **জিন** (gene)। জিনের সঞ্চারণক্ষম স্থায়ী পরিবর্তনই **পরিব্যক্তি** বা **মিউটেশন** (mutation)। এই জিনের পার্থক্যজনিত কারণে একটি প্রজাতি অন্য একটি প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কৃত্রিম উপায়ে জিনের পরিবর্তন সাধন সম্ভব। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মেও এই জিনের পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক। ফলে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়ে বিবর্তনের ধারাকে এগিয়ে নিয়েছে। সংকরায়ণ প্রক্রিয়ায় নতুন ধরনের জীব সৃষ্টি সম্ভব। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, প্রাকৃতিক উপায়ে এরূপ সংকরায়ণ ব্যাপকভাবে ঘটবে এবং ফলে নতুন নতুন প্রাণী সৃষ্টি সম্ভব হবে।

❑ **কাজ :** (i) বিবর্তনের ধারায় প্রতিটি জীবই নতুন পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করে– ব্যাখ্যা কর। (ii) জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ, বিবর্তন মতবাদের আলোকে বিশ্লেষণ কর।/জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। (iii) লম্বা গলাবিশিষ্ট প্রাণীর বিবর্তনের যে তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায়, তার বর্ণনা দাও। (iv) বাঘ সুন্দরবনে টিকে থাকার কারণগুলো বিবর্তনের আলোকে ব্যাখ্যা কর। (v) ডাইনোসরের অস্তিত্বের প্রমাণ কীভাবে পাওয়া সম্ভব ব্যাখ্যা কর।

Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

- ☑ **বংশগতি :** প্রজননের মাধ্যমে মাতাপিতার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতির মাধ্যমে মাতাপিতার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকেই বংশগতি বা হেরিডিটি বলে। সংক্ষেপে, যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি বংশানুক্রমে তাদের সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে বংশগতি বা হেরিডিটি বলে।
- ☑ **জিনতত্ত্ব বা জেনেটিক্স :** জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জিনের গঠন, কার্যপদ্ধতি ও তার বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ পদ্ধতি ও ফলাফল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে জিনতত্ত্ব বা জেনেটিক্স বলে।
- ☑ **জিন :** জীবের বংশগতিয় বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদ্রতম একককে জিন বলে। প্রকৃতপক্ষে, জিন হলো ক্রোমোজোমে বিদ্যমান DNA অণুর এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ যা কোষের প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে সক্ষম।
- ☑ **জেনেটিক কোড :** জেনেটিক কোড হলো DNA-এর সিকোয়েন্স অনুযায়ী সৃষ্ট mRNA এর নিউক্লিওটাইড অণুর এমন সজ্জা বা ক্রম, যা একটি কার্যকরী অ্যামিনো এসিডকে নির্দেশ করে।
- ☑ **হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোজোম :** একই আকৃতি একই জিনের সজ্জারীতি সম্পন্ন দুটি ক্রোমোজোম যাদের একটি পিতা ও অন্যটি মাতা হতে আগত তাদের সমসংস্থ বা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম বলে। অথবা, ডিপ্লয়েড জীবে আকার, আকৃতি, ক্রোমোমিয়ারের অবস্থান ও সংখ্যা ইত্যাদি দিক হতে দুটি ক্রোমোজোম এক রকম থাকে, এদের একটিকে অপরটির হোমোলগ (সমসংস্থ) বলা হয় এবং দুটিকে একত্রে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম বলে।
- ☑ **অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ :** হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত এক জোড়া জিন যদি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে তাদের পরস্পরের অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ বলে। অ্যালিলদ্বয় একইধর্মী (যেমন– TT) অথবা একে অপরের বিপরীতধর্মী (যেমন– Tt) হতে পারে।
- ☑ **হোমোজাইগাস :** কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বা অ্যালিলদুটি সমপ্রকৃতির হলে, তাকে হোমোজাইগাস বলে। যেমন- TT মটরশুঁটি উদ্ভিদের লম্বা বৈশিষ্ট্যের জন্য কিংবা tt মটরশুঁটি উদ্ভিদের খাটো বৈশিষ্ট্যের জন্য হোমোজাইগাস।
- ☑ **হেটারোজাইগাস :** কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বা অ্যালিলদুটি অসমপ্রকৃতির হলে, তাকে হেটারোজাইগাস বলে। যেমন- Tt মটরশুঁটি উদ্ভিদের লম্বা বৈশিষ্ট্যের জন্য হেটারোজাইগাস।
- ☑ **ফিনোটাইপ :** কোনো জীবের প্রকাশিত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে ফিনোটাইপ বলে। অথবা, জিনোটাইপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণকে ফিনোটাইপ বলে। জীবের আকার, আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতি ফিনোটাইপ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যেমন- লম্বা, খাটো, হলুদ, সবুজ, গোলাকার ইত্যাদি।
- ☑ **জিনোটাইপ :** কোনো জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনদ্বয়ের গঠনকে জিনোটাইপ বলে। অথবা, কোনো জীবের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিনযুগলের গঠনকে জিনোটাইপ বলে। উদাহরণ- একটি হোমোজাইগাস লম্বা গাছের জিনোটাইপ TT ও হেটারোজাইগাস লম্বা গাছের জিনোটাইপ Tt।
- ☑ **একসংকর বা মনোহাইব্রিড ক্রস :** মেন্ডেলের প্রথম সূত্রকে পৃথকীকরণ সূত্র বা মনোহাইব্রিড ক্রস বলে। এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যকার ক্রস হলো একসংকর ক্রস বা মনোহাইব্রিড ক্রস। যেমন– লম্বা ও খাটো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি মটরশুঁটি গাছের মধ্যকার ক্রস হলো মনোহাইব্রিড ক্রস।
- ☑ **দ্বিসংকর বা ডাইহাইব্রিড ক্রস :** মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রকে স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র বা ডাইহাইব্রিড ক্রস বলে। দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যকার ক্রস হলো দ্বিসংকর ক্রস বা ডাইহাইব্রিড ক্রস। যেমন– গোলাকার ও হলুদ বর্ণের বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সাথে কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজ উৎপাদনকারী মটরশুঁটি গাছের মধ্যকার ক্রস হলো ডাইহাইব্রিড ক্রস।
- ☑ **ব্যাক ক্রস :** অপত্য বংশীয় (F_1 জনু) কোনো জীবের সঙ্গে জনিতৃ জনুর কোনো জীবের অথবা জনিতৃর সদৃশ জিনোটাইপযুক্ত কোনো জীবের সংকরায়ণের পদ্ধতিকে ব্যাক ক্রস বলে। সংক্ষেপে, F_1 বংশের জীবের সঙ্গে পিতামাতার যেকোনো বৈশিষ্ট্যের ক্রসকে ব্যাক ক্রস বলে।
- ☑ **টেস্ট ক্রস :** কোনো জীবের জিনোটাইপ (হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস) নির্ণয়ের জন্য ওই জীবের সঙ্গে হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন (বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন) জিনোটাইপযুক্ত জীবের যে সংকরায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয় তাকে টেস্ট ক্রস বলে।
- ☑ **পৃথকীকরণের সূত্র :** মনোহাইব্রিড ক্রসে পিতামাতা থেকে আগত ফ্যাক্টর বা জিনগুলো মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং পরে জনন কোষ সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়।
- ☑ **স্বাধীন বিন্যাস সূত্র :** দুই (বা ততোধিক) জোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে (F_1 জনু) শুধু প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং পরবর্তীতে গ্যামিটগুলো জোড়া ভেঙে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়।
- ☑ **মেন্ডেলবাদ :** গ্রেগর জোহান মেন্ডেল 1866 সালে বংশগতি নিয়ে গবেষণাকালে দুটি সূত্র আবিষ্কার করেন। এ সূত্র দুটি মেন্ডেলবাদ নামে পরিচিত। অথবা, মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বংশগতিতে সঞ্চারণের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাকে মেন্ডেলবাদ বা মেন্ডেলিজম বা মেন্ডেল তত্ত্ব বলা হয়।
- ☑ **মেন্ডেলিয়ান ইনহ্যারিট্যান্স :** মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বংশগতিতে সঞ্চারণের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাকে মেন্ডেলিজম বা মেন্ডেলিয়ান ইনহ্যারিট্যান্স বা মেন্ডেলের বংশগতি সূত্র বলা হয়।
- ☑ **সাটন ও বোভারি :** বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। তাদের মতে বিভিন্ন নির্ধারক জিনগুলো ক্রোমোজোমের উপরে অবস্থান করে এবং ক্রোমোজোমের মাধ্যমে জিনগুলো পরবর্তী জনুতে সঞ্চারণ ঘটার দরুন বংশ পরম্পরায় পিতামাতায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

Scanned with CamScanner

অসম্পূর্ণ প্রকটতা : একটি বৈশিষ্ট্য যদি আরেকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর সম্পূর্ণ প্রকট না হয় তাহলে সংকর জীবে উভয়ের মাঝামাঝি একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এ ধরনের ঘটনাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে। অথবা পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবের সংকরায়ণে যখন প্রথম অপত্য জনুতে প্রকট জিনটি তার ফিনোটাইপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না, ফলে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যবর্তী একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে, তখন তাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে।

সমপ্রকটতা : সংকর জীবে যখন দুটি বিপরীতধর্মী প্রকট জিনের দুটি বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে প্রকাশিত হয় তখন তাকে সমপ্রকটতা বা সহপ্রকটতা বলে। অথবা, সংকর জীবে (হেটেরোজাইগাস অবস্থায়) উভয় জিনের বৈশিষ্ট্য যখন একই সঙ্গে প্রকাশ লাভ করে তখন জিনের এই বিশেষ ধর্মকে সমপ্রকটতা বা সহপ্রকটতা বলে।

লিথাল জিন : যেসব জিন কোনো জীবের মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যুর কারণ হয়, তাদের লিথাল জিন বলে। অথবা, হোমোজাইগাস অবস্থায় কোনো জিন বহনকারী জীবের মৃত্যু হলে সে জিনকে লিথাল জিন বলে।

পরিপূরক জিন: একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যখন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিন সমান কার্যকর ভূমিকা পালন করে তখন জিন দুটিকে একে অপরের পরিপূরক জিন বলে।

এপিস্ট্যাসিস : একটি জিনের বাহ্যিক প্রকাশ অন্য আরেকটি নন-অ্যালিলিক জিন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে এ ধরনের ঘটনাকে এপিস্ট্যাসিস বা নিরোধন বলে। অথবা যে জিন আন্তঃক্রিয়ায় একটি জিন অ্যালিল নয় এমন অপর একটি জিনকে প্রকাশ পেতে বাধা দেয় তাকে এপিস্ট্যাসিস বা নিরোধন বলে।

দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস : ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন জিন একে অপরের প্রকট অ্যালিলকে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করলে তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে। অথবা যখন দুটি ভিন্ন জিনের প্রচ্ছন্নধর্মী অ্যালিল একে অপরের প্রকটধর্মী অ্যালিলের প্রকাশে বাধা দান করে তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে।

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স : একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনেকগুলো জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে পলিজেনিক জিন বলে। এই পলিজেনিক জিনের বংশানুক্রমিক সঞ্চারণকে পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স বলে। অথবা ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত বহুসংখ্যক জিন যদি কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট ফিনোটাইপের তারতম্য নির্ধারণ করে, তবে সে ক্ষেত্রে জিনগুলোর বংশানুক্রমিক সঞ্চারণকে পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স বলে। এই প্রকার জিনগুলোকে একত্রে মাল্টিপল জিন বা পলিজিন বলে।

লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি : ক্রোমোজোম নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে জীবের লিঙ্গ নির্ধারণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া হলো লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি। আর যে জীবতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীবের লিঙ্গ সংক্রান্ত বৈশিষ্টাবলী অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ নির্ধারিত হয় তাকে লিঙ্গ নির্ধারণ বলে।

লিংকেজ : একই ক্রমোজোমে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিত দুই বা ততোধিক জিনের একই সঙ্গে একই গ্যামিটে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতাকে লিংকেজ বলে।

প্লিওট্রপি : একটি জিন যখন একাধিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে,তখন এ বিষয়টিকে প্লিওট্রপি বা প্লিওট্রপিজম বলে এবং জিনটিকে প্লিওট্রপিক জিন বলে। মানুষের সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জিন প্লিওট্রপিক জিনের উদাহারণ।

সেক্স লিংকড জিন : সেক্স ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোকে সেক্স লিংকড জিন বলে, যা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

সেক্স লিংকড ইনহ্যারিট্যান্স : সেক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে সেক্সলিংকড বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হওয়াকে সেক্স লিংকড ইনহ্যারিট্যান্স বা লিঙ্গ জড়িত বংশগতি বলে। কয়েকটি সেক্সলিংকড বৈশিষ্ট্য হলো বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, মাস্কুলার ডিস্ট্রফি ইত্যাদি।

সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার : মানুষের যেসব জিন নিয়ন্ত্রিত বংশগতির রোগ সেক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাদের সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার বা লিঙ্গ জড়িত অস্বাভাবিকতা বলে। লাল সবুজ বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি ইত্যাদি মানুষের X জিন নিয়ন্ত্রিত রোগ।

বর্ণান্ধতা : যে বংশগত রোগে, কোনো মানুষ বিভিন্ন বর্ণের বিশেষত লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য করতে পারে না বা চিনতে পারে না, সেই প্রকার অস্বাভাবিকতাকে বর্ণান্ধতা বলে।

ইসিহারা টেস্ট : এক বিশেষ ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে মানুষের লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় বর্ণান্ধ ব্যক্তি বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা চিত্রের মাধ্যমে সব রং দেখতে পায় কিন্তু লাল আর সবুজ রঙের পার্থক্য বুঝতে পারে না। এ বিশেষ ধরনের পরীক্ষাকেই ইসিহারা টেস্ট বলে।

প্রোটানোপিয়া : লাল বর্ণের পার্থক্য নিরূপণে অসমর্থ; সবগুলোকে সাদা মনে হয়। লাল বর্ণান্ধতার অপর নাম।

ডিউটেরানোপিয়া : সবুজ বর্ণের পার্থক্য নিরূপণে অসমর্থ। সবুজ বর্ণান্ধতার অপর নাম।

হিমোফিলিয়া : মানুষের যে বংশগত রোগের কারণে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না অর্থাৎ রক্ত জমাট বাঁধে না তাকে হিমোফিলিয়া বলে।

রক্ত গ্রুপ : লোহিত রক্তকণিকায় কতগুলো অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে ABO রক্তগ্রুপ বা রক্তগ্রুপ বলে।

Rh ফ্যাক্টর : Landsteiner ও Wiener (1940) মানুষের রক্তে একপ্রকার অ্যান্টিজেন (অ্যাগ্লুটিনোজেন)-এর উপস্থিতি লক্ষ করেন, যা রেসাস বানরের রক্তে পাওয়া যায়। মানুষের রক্তে বর্তমান এই প্রকার অ্যান্টিজেনকে **Rhesus ফ্যাক্টর,** সংক্ষেপে Rh **ফ্যাক্টর** বলে।

এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস : Rh^- মাতার প্রথম সন্তান Rh^+ হলে প্রসবকালে সন্তানের Rh অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে মাতার রক্তে অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর গঠিত হয়। উক্ত মাতার পরবর্তী সন্তান Rh^+ হলে মাতার পূর্বগঠিত অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর দ্বিতীয় সন্তানের Rh অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে রক্তক্ষয় সৃষ্টি করে– এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সন্তানের যে রোগজনিত লক্ষণ সৃষ্টি হয় তাকে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস (erythroblastosis fetalis) বা HDN (hemolytic disease of the new born) বলা হয়।

মাল্টিপল অ্যালিল : কোনো একটি জিনের বহিঃপ্রকাশ যখন দুটির বেশি অ্যালিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন এই অ্যালিলগুলোকে একত্রে মাল্টিপল অ্যালিল বলে। যেমন– মানুষের ABO ব্লাড গ্রুপ মাল্টিপল অ্যালিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

Scanned with CamScanner

☑ **বিবর্তন :** প্রকৃতিতে যে মন্থর ও ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অতীতে উদ্ভূত কোনো সরল জীব থেকে জটিলতর ও উন্নত জীবের উদ্ভব ঘটে তাকে বিবর্তন বা জৈব বিবর্তন বলে। অথবা, কোনো জীবের সরল অবস্থা হতে জটিলতার দিকে পর্যায়ক্রমিক অতি ধীর ও ধারাবাহিক পরিবর্তনকে বিবর্তন বা জৈব বিবর্তন বলে। বিবর্তনের উল্লেখযোগ্য মতবাদগুলো হলো ল্যামার্কিজম, ডারউইনিজম এবং নিউডারউইনিজম।

☑ **অপসারী বিবর্তন :** বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজনের জন্য উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে একই অঙ্গের বিভিন্ন আকার হয়। এই প্রকার অভিযোজনকে অপসারী অভিযোজন (divergent adaptation) বলে। এর ফলে জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গের যে বিবর্তন ঘটে, তাকে অপসারী বিবর্তন (divergent evolution) বলে। এ ধরনের বিবর্তনে জীবদেহের সমসংস্থ অঙ্গ গঠিত হয়।

☑ **অভিসারী বিবর্তন :** উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে ভিন্ন অঙ্গ যখন একই পরিবেশে অভিযোজনের জন্য একই বাহ্যিক আকারযুক্ত হয়, তখন ঐ প্রকার অভিযোজনকে অভিসারী অভিযোজন (convergent adaptation) বলে। এইরূপ অভিযোজনের জন্য সংঘটিত বিবর্তনকে অভিসারী বিবর্তন (convergent evolution) বলে। এ ধরনের বিবর্তনে জীবদেহের সমবৃত্তি অঙ্গ গঠিত হয়।

☑ **প্রকরণ :** প্রকৃতিতে দুটি জীব কখনও হুবহু এক রকম হয় না। বিভিন্ন কারণে জিন ও ক্রোমোজোমের পুনর্বিন্যাসের ফলে একই প্রজাতিভুক্ত প্রতিটি জীবের মধ্যে অঙ্গসংস্থানিক, শারীরবৃত্তীয়, কোষীয় এবং আচরণগত যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ বা বিভেদ বলে।

☑ **স্ট্রেইন :** নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে গঠিত একই প্রজাতির নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ লক্ষণ বা ট্রেইটযুক্ত (traits) বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস জীবদের স্ট্রেইন (strain) বলে।

☑ **মিউটেশন বা পরিব্যাক্তি :** কোনো প্রজাতির জীবে ক্রোমোজোম ও জিনের আকস্মিক, স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিকভাবে জীবের ফিনোটাইপের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে মিউটেশন (mutation) বা পরিব্যক্তি বলে।

☑ **ল্যামার্ক :** জৈব বিবর্তনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রকাশ করেন। ল্যামার্কের মতবাদ বা ল্যামার্কিজম অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম নামে প্রসিদ্ধ। 1809 সালে ফিলোসফিক জুওলজিক নামক পুস্তকে তিনি বিবর্তন সম্বন্ধে মতবাদটি প্রকাশ করেন।

☑ **ল্যামার্কের মতবাদ :** কোনো জীবের জীবনে যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। একেই ল্যামার্কের মতবাদ বলা হয়। তাঁর মতবাদ অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার সূত্র নামে পরিচিত।

☑ **ডারউইনের মতবাদ :** প্রকৃতি তার নিজস্ব নির্বাচনক্ষমতা প্রয়োগ করে উপযুক্ত জীবগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচন করে এবং অনুপযুক্ত জীবগুলোকে নির্মূল করে দেয়। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা বা না থাকা প্রকৃতির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক নির্বাচনই নতুন প্রজাতি সৃষ্টির মাধ্যমে অভিব্যক্তির ধারাকে অব্যাহত রাখে। তাই ডারউইনের মতবাদ প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব নামে পরিচিত।

☑ **সমসংস্থ অঙ্গ :** যেসব অঙ্গ উৎপত্তি ও অন্তর্গঠনের দিক থেকে এক হলেও, বাহ্যিক গঠন এবং কাজের ধরনের দিক থেকে আলাদা, তাদের সমসংস্থ অঙ্গ বলে। যেমন– ব্যাঙের অগ্রপদ, গিরগিটির অগ্রপদ, তিমির অগ্রপদ বা ফ্লিপার, কুকুরের অগ্রপদ, মানুষের হাত, বাদুড় ও পাখির ডানা ইত্যাদি।

☑ **সমবৃত্তি অঙ্গ :** যেসব অঙ্গ কার্যগতভাবে একই ধরনের কিন্তু উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে পৃথক, তাদের সমবৃত্তি অঙ্গ বলে। যেমন– পতঙ্গ, পাখি ও বাদুড়ের ডানা, মৌমাছি ও কাঁকড়া, বিছার হুল, মাছের পাখনা ও তিমি মাছের ফ্লিপার, অক্টোপাসের চোখ ও মানুষের চোখ ইত্যাদি।

☑ **নিষ্ক্রিয় অঙ্গ :** প্রাণিদেহে এমন কতকগুলো বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গ দেখা যায় যেগুলো বিশেষ কোনো প্রাণীতে অকেজো বা নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্য প্রাণীতে সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। এ সকল অঙ্গগুলোকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে। যেমন- মানুষের কানের পেশি, ছেদন দাঁত, আক্কেল দাঁত, অ্যাপেন্ডিক্স, পুচ্ছাস্থি, কক্কিক্স, গায়ের লোম, উপপল্লব, পুরুষের স্তনগ্রন্থির বৃন্ত ইত্যাদি।

☑ **জীবাশ্ম :** শিলাস্তরে সংরক্ষিত এমন কোনো নিদর্শন যা প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো জীবের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে তাকে জীবাশ্ম বলে। অথবা প্রস্তরীভূত জীবদেহ বা তার অংশ কিংবা জীব অস্তিতে কোনো প্রস্তরীভূত চিহ্ন। জীবাশ্ম বলতে সাধারণত পুরাকালের জীবের বিভিন্ন শিলাস্তরে সংরক্ষিত দেহ বা দেহাংশের ছাপ বা ছাঁচ ইত্যাদি বোঝায়।

☑ **জীবন্ত জীবাশ্ম :** জীবাশ্ম জীবের সাথে মিলসম্পন্ন জীবিত জীব প্রজাতিকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। অথবা, অতীতকালে বিলুপ্ত কোনো জীবের জীবাশ্মের বৈশিষ্ট্য বর্তমানকালে জীবিত কোনো প্রজাতির মধ্যে লক্ষ করা গেলে বর্তমানকালের এসব প্রজাতিকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। যেমন– Platypus (*Ornithorhynchus*), *Limulus, Peripatus, Sphenodon, Latimaria* প্রভৃতি জীবন্ত জীবাশ্ম।

☑ **জীবাশ্মবিজ্ঞান বা প্যালিওন্টোলজি :** জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবাশ্ম নিয়ে গবেষণা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয় তাকে জীবাশ্মবিজ্ঞান বা প্যালিওন্টোলজি বলে।

☑ **মিসিং লিংক :** বিবর্তনগতভাবে নিকট সম্পর্কযুক্ত দুটি ভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী জীবগোষ্ঠী যারা বর্তমানে বিলুপ্ত এবং যাদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর জীবেরই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে, তাদের মিসিং লিংক বা লুপ্ত সংযোজক বলা হয়। এরা ট্রানজিশনাল ফসিল হিসেবেও পরিচিত। যেমন– *Archaeopteryx*-এ ধরনের জীবাশ্ম।

☑ **সংযোগকারী যোগসূত্র :** দুটি পৃথক জীবগোষ্ঠীর (প্রজাতি, শ্রেণি, পর্ব ইত্যাদি ট্যাক্সা) বৈশিষ্ট্য সমন্বিত মধ্যবর্তী বা সংযোগসাধনকারী জীবদের (বর্তমানে অস্তিত্ব রয়েছে এরূপ) সংযোগকারী যোগসূত্র বা সংযোগকারী জীব বা কানেকটিং লিংক বলে। যেমন– *Peripatus, Neopilina, Chimaera, Protopterus, Balanoglossus,* Platypus প্রভৃতি।

☑ **Biogenetic Law :** ভ্রূণ পরিস্ফুটনের বিভিন্ন পর্যায়ে এর সব পূর্বপুরুষের পূর্ণাঙ্গ অবস্থাকে স্মরণ করে অর্থাৎ ব্যক্তিজনি, জাতিজনির পুনরাবৃদ্ধি ঘটায়। এটাই Biogenetic Law বা পুনরাবৃদ্ধি মতবাদ। E. Haeckel এর মতবাদের প্রবক্তা।

☑ **অভিযোজন :** পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য জীবের মধ্যে যে গঠনগত, শারীরবৃত্তীয়, স্বভাব বা আচরণগত পরিবর্তন দেখা যায় তাকে অভিযোজন বলে।

Scanned with CamScanner

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সমপ্রকটতার ক্রিয়ায় F_2 জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত কত? [ঢা. বো.-১৯; সি. কু. ব. চ. য. দি. রা. বো-১৮]
ক ১ : ২ : ১ খ ২ : ১ গ ১ : ১ ঘ ৩ : ১

২. *Archaeopteryx* কে কোন কোন শ্রেণির সংযোগকারী যোগসূত্র বলা হয়? [সি. কু. ব. চ. য. দি. রা. বো-১৮]
ক উভচর ও পাখি খ উভচর ও সরীসৃপ
গ সরীসৃপ ও পাখি ঘ পাখি ও স্তন্যপায়ী

৩. কোনটি মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রমের উদাহরণ? [ঢা. বো. '১৭]
ক অসম্পূর্ণ প্রকটতা খ প্রকট এপিস্ট্যাসিস
গ এপিস্ট্যাসিস ঘ পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স

৪. মানুষের লাল সবুজ বর্ণান্ধতার জিন হলো– [রা. বো. '১৭]
ক লিথাল খ এপিস্টাটিক গ সেক্সলিংকেড ঘ সহ-প্রকট

৫. প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের প্রবর্তক কে? [রা. বো. '১৭]
ক জাঁ ব্যাপটিস্ট ল্যামার্ক খ চার্লস রবার্ট ডারউইন
গ নিকোলাস টিনবার্জেন ঘ আইভান প্যাভলভ

৬. দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্টাসিস এর ফিনোটাইপিক অনুপাত হলো– [য. বো.-১৭, সি. বো.-১৬]
ক ৯ ঃ ৭ খ ১৩ ঃ ৩ গ ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ ঘ ১ ঃ ২ ঃ ১

৭. নিলা বর্ণান্ধ (X^cX^c) তার বাবা ও মায়ের জেনোটাইপ কী হবে? [সি. বো. '১৭]
ক XY এবং X^cX খ XY এবং X^cX^c
গ X^cY এবং X^cX^c ঘ X^cY এবং XX

৮. বাবা ও মা উভয়ের রক্তগ্রুপ AB হলে সন্তানের রক্তগ্রুপ AB হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? [সি. বো. '১৭]
ক ২৫% খ ৫০% গ ৭৫% ঘ ১০০%

৯. সহপ্রকটতায় মেন্ডেলিয়ান অনুপাতের পরিবর্তিত রূপ কোনটি? [দি. ব. বো.-১৬]
ক ১৩ ঃ ৩ খ ১ ঃ ২ ঃ ১
গ ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ ঘ ১ ঃ ৪ ঃ ৬ ঃ ৪ ঃ ১

১০. হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত মহিলার সম্ভাব্য পিতামাতা কে? [দি. ব. বো. '১৬]
ক বাহক মা ও হিমোফিলিক বাবা
খ সুস্থ মা ও হিমোফিলিক বাবা
গ বাহক মা ও সুস্থ বাবা
ঘ হিমোফিলিক মা ও সুস্থ বাবা

১১. কোনটি পাখি ও সরীসৃপের বিবর্তনসূচক সংযোগকারী প্রাণী? [সি. বো. '১৬]
ক *Seymouria* খ *Diplovertebran*
গ *Archaeopteryx* ঘ *Cynagnathus*

১২. সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড কোন প্রাণীতে দেখা যায়? [ঢা. বো. '১৯]
ক টিকটিকি খ কুমির গ কচ্ছপ ঘ সাপ

১৩. কোনটি সংযোগকারী যোগসূত্র রক্ষাকারী প্রাণী? [ঢা. বো. '১৯]
ক ক্যাঙ্গারু খ প্লাটিপাস গ ল্যাম্প্রে ঘ হ্যাগফিশ

১৪. কোন গ্রুপের রক্তে a ও b উভয় অ্যান্টিবডি থাকে? [ঢা. বো. '১৯]
ক A খ B গ AB ঘ O

১৫. একটি হোমোজাইগাস প্রকট লাল ফুলের গাছের সঙ্গে একটি প্রচ্ছন্ন সাদা ফুলের গাছের ক্রস করালে F_1 জনুতে প্রাপ্ত ফলাফল কী?
ক সমস্ত লাল ফুলের গাছ খ সমস্ত সাদা ফুলের গাছ
গ ৫০% লাল ও ৫০% সাদা ঘ সব গোলাপি

১৬. AB রক্ত গ্রুপের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য? [ব. বো. '১৯]
ক 'O' গ্রুপের রক্ত নিতে পারে
খ উভয় অ্যান্টিবডি a ও b বিদ্যমান
গ 'A' গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে
ঘ লোহিত কণিকায় এন্টিজেন 'B' বিদ্যমান

১৭. সমবৃত্তীয় অঙ্গ হলো– [চ. বো. '১৯]
ক বাদুড়ের ডানা–পাখির ডানা
খ পাখির ডানা–মানুষের হাত
গ মানুষের হাত–বাদুড়ের ডানা
ঘ পাখির ডানা–পতঙ্গের ডানা

১৮. সরীসৃপ ও পাখির মধ্যে সংযোগকারী প্রাণীটি কোনটি?
ক জাভা মানুষ খ তিমি
গ প্লাটিপাস ঘ আর্কিওপটেরিক্স

১৯. লিথাল জিনের কারণে কোন রোগ হয়?
ক হিমোফিলিয়া ও থ্যালাসেমিয়া
খ থ্যালাসেমিয়া ও বর্ণান্ধতা
গ বর্ণান্ধতা ও রাতকানা
ঘ রাতকানা ও হিমোফিলিয়া

২০. কোন মহাকালকে সরীসৃপের যুগ বলে? [ঢা.বো-১৫]
ক আর্কিওজয়িক খ প্রোটেরোজয়িক
গ প্যালিওজয়িক ঘ মেসোজয়িক

২১. 'ব্যক্তিজনি জাতিজনির পুনরাবৃত্তি ঘটায়' তত্ত্বটির প্রবক্তা কে? [ঢা.বো-১৫]
ক ল্যামার্ক খ ডারউইন গ হেকেল ঘ ভাইসম্যান

২২. 'Theory of Natural Selection'– মতবাদটি কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয়? [কু.বো-১৫]
ক Origin of life
খ Origin of Species
গ Origin of Organic Evolution
ঘ Philosophic Zoologique

২৩. ডাই-হাইব্রিড ক্রসের মেন্ডেলীয় অনুপাত কোনটি? [কু.বো-১৫]
ক ১ ঃ ২ ঃ ১ খ ১৩ ঃ ৩ গ ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ ঘ ৩ ঃ ১

২৪. 'Survival of the fittest' কোন মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব?
ক ল্যামার্কিজম খ ডারউইনবাদ
গ নব্য ডারউইন ঘ জার্মপ্লাজম তত্ত্ব

২৫. স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন (বাহক নয়) স্ত্রী এবং বর্ণান্ধ পুরুষের মধ্যে বিয়ে হলে তাদের কন্যা সন্তানদের স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনার হার কত? [কু.বো-১৫]
ক ১০০% খ ৫০% গ ২৫% ঘ ০০%

Scanned with CamScanner

২৬. রেসাস বানরের বৈজ্ঞানিক নাম কী? [কু.বো-১৫]
ক *Nycticebus coucang* খ *Rhinoceros unicornis*
গ *Panthera leo* ঘ *Macaca mulatta*

২৭. কোনটি জীবিত? [রা.বো-১৫]
ক মেরিকহিপ্পাস খ মেসোহিপ্পাস গ ইকুয়াস ঘ ইয়োহিপ্পাস

২৮. রক্ত দানে Blood Group– 'B' এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিচের কোনটি? [রা.বো-১৫]
ক B → A, B খ B →AB, O গ B→A, O ঘ B→AB, B

২৯. কোন কারণে ১৩ ঃ ৩ অনুপাত হয়? [রা.বো-১৫]
ক লিথান জিন খ পরিপূরক জিন
গ সেক্স লিংকড জিন ঘ এপিস্ট্যাটিক জিন

৩০. 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার' মতবাদটি প্রবর্তন করেন কোন বিজ্ঞানী? [রা.বো-১৫]
ক হুগো দ্য ভ্রিস খ চার্লস ডারউইন
গ ল্যামার্ক ঘ আর্নস্ট হেকেল

৩১. ডারউইনবাদের সব থেকে বড় দুর্বলতা কোনটি? [য.বো-১৫]
ক অত্যধিক হারে বংশবিস্তার খ জীবন সংগ্রাম
গ যোগ্যতমের জয় ঘ প্রকরণ (প্রাকৃতিক)

⏭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

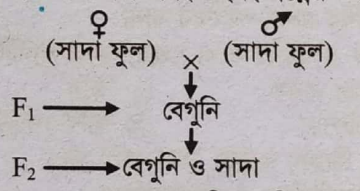

৩২. উদ্দীপক অনুসারে কোন ধরনের জিনের ক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে? [চ. বো-১৬]
ক লিথ্যাল খ ইন্টারমিডিয়েট গ পরিপূরক ঘ সেমিলিথ্যাল

⏭ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$X^cY \times X^+X^c$

(♂) (♀)

[য. বো. '১৯]

৩৩. উদ্দীপকের আলোকে সন্তানদের ক্ষেত্রে কোন ফলাফলটি সঠিক হবে?
ক ৫০% মেয়ে স্বাভাবিক
খ ৫০% মেয়ে বর্ণান্ধ
গ ৫০% ছেলে বর্ণান্ধ জিন বাহক
ঘ ১০০% ছেলে স্বাভাবিক

৩৪. একটি দম্পতির সমস্ত সন্তান-সন্ততির অর্ধেক সংখ্যক পুত্র হিমোফিলিক এবং বাকি সংখ্যক কন্যা রোগটির বাহক। এই রোগটির জিন উক্ত দম্পতির দেহের কোথায় অবস্থিত?
ক মায়ের উভয় X ক্রোমোজোমে
খ মায়ের একটি X ক্রোমোজোমে
গ পিতার X ক্রোমোজোমে
ঘ পিতার X ও Y ক্রোমোজোমে

৩৫. দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্টাসিসে 'পিতা মাতায়' কোন জিনোটাইপটি বিদ্যমান?
ক BBRR × bbrr খ BBrr × bbRR
গ BrRb × BrRb ঘ BbRR × BbRR

৩৬. কোনটি ডারউইনবাদের অন্তর্গত? [চ.বো-১৫]
ক পরিবেশ জীবের গঠনকে প্রভাবিত করে
খ ক্রমাগত প্রয়োজনে নতুন অঙ্গের উদ্ভব ঘটে
গ যোগ্যতমের জয় ও প্রাকৃতিক নির্বাচন
ঘ অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার

৩৭. রহিম সাহেবের দুই পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে এক পুত্র ও এক কন্যা বর্ণান্ধ, তাদের বাবা-মা কেমন? [ব.বো-১৫]
ক বাবা বর্ণান্ধ, মা স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন
খ মা বর্ণান্ধ, বাবা স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন
গ বাবা বর্ণান্ধ, মা বর্ণান্ধের বাহক
ঘ বাবা-মা উভয়েই বর্ণান্ধ

৩৮. কোন শ্রেণি থেকে Archaeopteryx এর উৎপত্তি হয়েছে? [ব.বো-১৫]
ক Amphibia খ Reptilia গ Aves ঘ Mammalia

৩৯. কোন যুগে মানুষের উদ্ভব হয়েছে? [ব.বো-১৫]
ক ইওসিন খ অলিগোসিন গ মায়োসিন ঘ প্লিওসিন

৪০. স্বাভাবিক পুরুষের সাথে হিমোফিলিক বাহক মহিলার বিয়ে হলে তাদের পুত্র সন্তানের হিমোফিলিক হওয়ার সম্ভাবনার হার কত? [সি.বো-১৫]
ক ২৫% খ ০% গ ৫০% ঘ ১০০%

৪১. হিমোফিলিয়া বাহক মা (X^HX^h) এবং স্বাভাবিক বাবা (X^HY) এর কোন সন্তানটি হবে হিমোফিলিয়া আক্রান্ত? [দি.বো-১৫]
ক X^hY খ X^HY গ X^HX^h ঘ X^HX^H

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪২. হিমোফিলিক পুরুষ ও স্বাভাবিক মহিলার প্রজননে সন্তান হবে– [সি. কু. ব. চ. য. দি. রা. বো-১৮]
i. হিমোফিলিক বাহক কন্যা ii. স্বাভাবিক পুত্র
iii. হিমোফিলিক পুত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৩. AB রক্তের গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– [সি. বো-১৬]
i. A ও B উভয় অ্যান্টিজেন আছে
ii. a ও b উভয় অ্যান্টিবডি নেই
iii. সার্বজনীন গ্রহীতা গ্রুপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৪. জিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. অসংখ্য নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত
ii. হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত
iii. বংশগতির বাহক হিসেবে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

Scanned with CamScanner

৪৫. $X^cX^c \times X^+Y$ দম্পতির সন্তানের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. সকল পুত্র বর্ণান্ধ ii. সকল কন্যা বাহক
iii. সকল কন্যা স্বাভাবিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ উদ্দীপকটির সাহায্যে নিচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

অত্যধিক বংশবৃদ্ধির হার	→	Q	→	যোগ্যতমের উর্ধ্বতন

৪৬. 'Q' অংশে সংঘটিত হয়– [দি.বো-১৫]
i. অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম ii. আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম
iii. পরিবেশগত সংগ্রাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিশুদ্ধ লাল ফুল ♂ × বিশুদ্ধ সাদা ফুল ♀ (কোনো বৈশিষ্ট্যের জিনই একে অন্যের উপর প্রকট নয়)

৪৭. F_1 জনুর ফিনোটাইপ কী হবে? [ঢা.বো-১৮]
ক লাল খ গোলাপী গ সাদা ঘ হলুদ

৪৮. F_2 জনুর ফুলের ফিনোটাইপিক অনুপাত কী হবে? [ঢা.বো-১৮]
ক ৩ : ১ খ ১ : ১ (গ) ১ : ২ : ১ ঘ ২ : ১

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ব্যক্তির নাম	রক্তের গ্রুপ
V	B^+
W	O^+
X	AB^+
Y	A^+
Z	B^-

৪৯. উদ্দীপকের ব্যক্তি 'V' জরুরি প্রয়োজনে কার নিকট থেকে রক্ত নিতে পারবে? [সি,কু,ব,চ,য,দি,রা. বো-১৮]
ক W খ X গ Y ঘ Z

৫০. X(♂) এবং V(♀) এর মধ্যে বিয়ে হলে তাদের সন্তানদের সম্ভাব্য রক্তগ্রুপ হবে– [সি,কু,ব,চ,য,দি,রা.বো-১৮]
i. A^+ ii. B^+ iii. AB^+
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৫১ ও ৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সোহান স্বাভাবিক পুরুষ। সম্প্রতি সে সুমি নামের একজন স্বাভাবিক কিন্তু বর্ণান্ধ বাহক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। [ঢা. বো. '১৭]

৫১. উদ্দীপকের আলোকে সুমির জেনোটাইপ কী হবে?
ক X^cX খ X^cX^c গ XY ঘ XX

৫২. তাদের প্রথম বংশধরের ছেলে সন্তানগুলো কী হবে?
i. সকলেই বর্ণান্ধ ii. ৫০% বর্ণান্ধ iii. ৫০% স্বাভাবিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৩ ও ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কালো (BB) ♂ ও সাদা (bb) ♀ পালকযুক্ত মোরগ-মুরগির ক্রস ঘটিয়ে F_1 জনুতে আন্দালুসিয়ান ব্লু (Bb) রং এর ছানা পাওয়া যায়।

৫৩. উদ্দীপক অনুযায়ী F_2 জনুর অনুপাত কী হবে? [কু. বো. '১৬]
ক ৩ ঃ ১ খ ৯ ঃ ৭ গ ১ ঃ ২ ঃ ১ ঘ ২ ঃ ১

৫৪. উদ্দীপক অনুযায়ী F_2 জনুতে বেগুনি ও সাদা রঙের বহিঃপ্রকাশের অনুপাত হলো– [চ. বো. '১৬]
ক ১৩ ঃ ৭ খ ৯ ঃ ৭ গ ৩ ঃ ১ ঘ ২ ঃ ১

⏭ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৫৫ ও ৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দুটি কালো গিনিপিগের মধ্যে ক্রস ঘটানোর ফলে সাদা ও কালো উভয় ধরনেরই অপত্য জন্ম নিল। [রা. সি. বো. '১৯]

৫৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত গিনিপিগের পিতামাতার জিনোটাইপ কী ধরনের?
ক Bb, Bb খ BB, Bb গ Bb, bb ঘ BB, bb

৫৬. উদ্দীপকের আলোকে কালো ও সাদা অপত্যের অনুপাত কত?
ক ১ : ১ খ ২ : ১ গ ৩ : ১ ঘ ১ : ২

⏭ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৫৭ ও ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রনির রক্তগ্রুপ A^+। তার ভাইয়ের রক্তগ্রুপ AB^+। [য. বো. '১৯]

৫৭. রনির রক্তে–
i. Rh factor উপস্থিত
ii. এন্টিজেন A উপস্থিত
iii. এন্টিবডি a উপস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৮. রনির ভাইয়ের রক্তের ক্ষেত্রে নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক?
ক সার্বজনিন দাতা গ্রুপ
খ শুধু এন্টিজেন 'A' উপস্থিত
গ এন্টিবডি 'b' উপস্থিত
ঘ রনির কাছ থেকে রক্ত নিতে পারবে

⏭ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিঃ কবির বিশুদ্ধ খাটো লোম ও বিশুদ্ধ লম্বা লোমবিশিষ্ট গিনিপিগের মধ্যে সংকরায়ণের ফলে F_1 জনুতে শুধুমাত্র খাটো লোমবিশিষ্ট গিনিপিগ পেলেও F_2 জনুতে লম্বা ও খাটো লোমবিশিষ্ট গিনিপিগ পেলেন। [ব. বো. '১৯]

৫৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত জীনতাত্ত্বিক ক্রসে F_2 জনুর জিনোটাইপিক অনুপাত কত?
ক ৩ : ১ খ ২ : ১ গ ১ : ২ : ১ ঘ ১ : ১

৬০. উদ্দীপকে F_1 প্রাপ্ত গিনিপিগ ও প্রচ্ছন্ন প্যারেন্টের ক্রসে প্রাপ্ত গিনিপিগের লোমের বৈশিষ্ট্য হবে–
i. বিশুদ্ধ খাটো ii. সংকর খাটো iii. বিশুদ্ধ লম্বা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

Scanned with CamScanner

⏭ উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৬১ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সোহাগের বাবা হিমোফিলিক হলেও তার একমাত্র বোন সুমি ও তার মা স্বাভাবিক। *[চ. বো. '১৯]*

৬১. উদ্দীপকে উল্লিখিত সোহাগ ও সুমির পিতা-মাতার জিনোটাইপ হবে-
ক X^HY ও X^HX^h খ X^hY ও X^HX^h
গ X^HY ও X^hX^h ঘ X^hY ও X^HX^H

৬২. উদ্দীপকে উল্লিখিত কন্যা সুমির সাথে স্বাভাবিক পুত্রের বিবাহ বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তী বংশধরে প্রকাশ পাবে–
i. সকল কন্যা সন্তানই স্বাভাবিক
ii. ৫০% পুত্র সন্তান হিমোফিলিয়াক
iii. ৫০% পুত্র সন্তান স্বাভাবিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি বিশুদ্ধ কালো গিনিপিগ (BB)♂ এবং একটি বিশুদ্ধ সাদা গিনিপিগের (bb)♀ মধ্যে ক্রস করলে F_1 জনুতে সকল সন্তান কালো হয়। আবার F_2 জনুতে ৩টি কালো ও ১টি সাদা সন্তান জন্ম নেয়।

৬৩. উদ্দীপক অনুযায়ী F_2 জনুতে কয়টি গিনিপিগের জিনোটাইপ হোমোজাইগাস?
ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

৬৪. উদ্দীপক অনুযায়ী কোন সংকরায়নকে টেস্টক্রস বলা যায়?
ক BB × BB খ BB × Bb
গ Bb × Bb ঘ bb × Bb

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৫. হোমোলোগ্যাস ক্রোমোজোমের একটি লোকাসে জিনের একত্রে থাকাকে কী বলে? *[মেডিকেল : ১৫-১৬]*
ক জিনোম খ অ্যালিলোমর্ফ
গ ফিনোটাইপ ঘ জিনোটাইপ

৬৬. জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে নিম্নের কোনটি বলা হয়? *[মেডিকেল : ০৯-১০]*
ক জিনোটাইপ খ প্রকট বৈশিষ্ট্য
গ ফিনোটাইপ ঘ প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য

৬৭. জীবের প্রকাশ লক্ষণকে বলা হয়– *[ডেন্টাল : ০৬-০৭]*
ক এক্সিবিশিনিজম খ অ্যালীল
গ ফিনোটাইপ ঘ জিনোটাইপ

৬৮. বংশগতি বিদ্যার জনক গ্রেগর জোহান মেন্ডেল কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন? *[মেডিকেল : ০৩-০৪]*
ক অষ্ট্রিয়া খ ইতালি গ জার্মানি ঘ সুইডেন

৬৯. মটর উদ্ভিদে প্রকট বৈশিষ্ট্য কোনটি? *[ডেন্টাল : ০৩-০৪]*
ক সবুজ ফল খ হলুদ বীজ গ সাদা বীজ ঘ রঙিন ফুল

৭০. বংশগতিবিদ্যার জনক কে? *[ডেন্টাল : ০৩-০৪]*
ক নিউটন খ অ্যাডাম স্মিথ গ মেন্ডেল ঘ ডারউইন

৭১. নিচের কোন বৈশিষ্ট্য পলিজিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না? *[ডেন্টাল : ১৮-১৯]*
ক উচ্চতা খ আকৃতি গ ত্বকের বর্ণ ঘ বুদ্ধিমত্তা

৭২. লিথাল জিনের প্রভাব নেই কোন রোগে? *[মেডিকেল : ১৩-১৪]*
ক হিমোফিলিয়া খ জন্মগত ইকথিয়োসিস
গ অসটিওপোরোসিস ঘ থ্যালাসেমিয়া

৭৩. লিথাল জিন সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন নিম্নের কোন বিজ্ঞানী? *[মেডিকেল : ১২-১৩]*
ক ক্যুনো খ চেরমাক গ ম্যান্ডেল ঘ ব্রিস

৭৪. নিম্নের কোনটি দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস অনুপাত? *[মেডিকেল : ০৮-০৯]*
ক 7 : 9 খ 9 : 7 গ 13 : 3 ঘ 13 : 7

৭৫. যে জিনটি অপর জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় সে জিনকে বলে– *[ডেন্টাল : ০৩-০৪]*
ক এপিস্ট্যাটিক জিন খ পরিপূরক জিন
গ লিথাল জিন ঘ হাইপোস্ট্যাটিক জিন

৭৬. মানুষের দেহকোষে কতটি অটোজোম থাকে? *[মেডিকেল : ১৪-১৫]*
ক ২২টি খ ৪৪টি গ ৪৬টি ঘ ২৩টি

৭৭. নিচের কোনটি সেক্সলিংকড ডিসঅর্ডার নয়? *[মেডিকেল : ১৭-১৮]*
ক লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা খ থ্যালাসেমিয়া
গ হিমোফিলিয়া ঘ ডুসেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি

৭৮. কনে হিমোফিলিয়া বাহক, বর সুস্থ, এদের সন্তানদের ক্ষেত্রে কোনটি মিথ্যা? *[মেডিকেল : ১৬-১৭]*
ক পুত্রদের অর্ধেক সুস্থ হবে
খ পুত্রদের সবাই সুস্থ হবে
গ পুত্রদের অর্ধেক হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হবে
ঘ কন্যাদের অর্ধেক বাহক হবে

৭৯. পুরুষ স্বাভাবিক ও স্ত্রী বর্ণান্ধ হোমোজাইগাস হলে ছেলেটি কী হবে? *[মেডিকেল : ১৩-১৪]*
ক স্বাভাবিক খ বর্ণান্ধ
গ ৫০% বর্ণান্ধ হবার সম্ভাবনা
ঘ ৫০% স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা

৮০. নিম্নের কোনটি সেক্স লিংকড অসুখ নয়? *[মেডিকেল : ০৮-০৯]*
ক বর্ণান্ধতা খ মায়োপিয়া
গ রক্তস্বল্পতা ঘ হিমোফিলিয়া

৮১. বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে তাদের সন্তান হতে পারে– *[ডেন্টাল : ০৬-০৭]*
ক পুত্র হোক, কন্যা হোক, স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন
খ কন্যা বর্ণান্ধ বাহক
গ পুত্র বর্ণান্ধ
ঘ পুত্র 50% বর্ণান্ধ

Scanned with CamScanner

৮২. কোনটি সেক্স লিংকড বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ নয়? [মেডিকেল : ০২-০৩, ডেন্টাল : ০২-০৩]
ক বর্ণান্ধতা খ হাইপার মেট্রোপিয়া
গ জুভেনাইল গ্লুকোমা ঘ হিমোফিলিয়া

৮৩. নিম্নের কোনটি সেক্স লিংকড বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ নয়? [ডেন্টাল : ০৩-০৪]
ক রাতকানা খ বহুমূত্র গ বর্ণান্ধতা ঘ হিমোফিলিয়া

৮৪. মানুষের সংখ্যা কোন রক্তগ্রুপে সবচেয়ে বেশি? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক A খ AB গ B ঘ O

৮৫. AB ব্লাড গ্রুপের দাতা কোন গ্রুপকে রক্ত দিতে পারবে? [ডেন্টাল : ১৬-১৭]
ক O গ্রুপ খ B গ্রুপ গ AB গ্রুপ ঘ A গ্রুপ

৮৬. Rh negative রক্তের গ্রুপ নিম্নের কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়? [মেডিকেল : ১০-১১]
ক চাইনিজ খ কানাডিয়ান
গ পাইরেনিজের বাস্ক ঘ ফিলিপিনো

৮৭. নিম্নের কোনটি ব্লাড গ্রুপের নির্দিষ্ট কোন এন্টিজেন নাই? [মেডিকেল : ০৮-০৯]
ক A খ B গ A ও B ঘ O

৮৮. নিম্নে উল্লেখিত কোন বিজ্ঞানী মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করেন? [মেডিকেল : ০৭-০৮]
ক থিওডোর সোয়ান খ ইউরিয়াম হার্ভে
গ কাল ল্যান্ডস্টেইনার ঘ ক্যারোলাস লিনিয়াস

৮৯. মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ী প্রাণী কোন মহাদেশে পাওয়া যায়? [মেডিকেল : ১৭-১৮]
ক এশিয়া খ ইউরোপ গ অস্ট্রেলিয়া ঘ আফ্রিকা

৯০. জুরাসিক সময়কাল বলা হয় কত আগের সময়কে? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক 16 কোটি বছর খ সাড়ে 16 কোটি বছর
গ সাড়ে 13 কোটি বছর ঘ 25 কোটি বছর

৯১. ফিলোসফিক গ্রন্থের রচয়িতা কে? [মেডিকেল : ১৬-১৭]
ক ডারউইন খ ল্যামার্ক গ দ্যা ভ্রিস ঘ ভাইজম্যান

উত্তরমালা

১. (ক); ২. (গ); ৩. (ক); ৪. (গ); ৫. (খ); ৬. (ক); ৭. (গ); ৮. (খ); ৯. (খ); ১০. (ক); ১১. (গ); ১২. (খ); ১৩. (খ); ১৪. (ঘ); ১৫. (ঘ); ১৬. (ক); ১৭. (ঘ); ১৮. (ঘ); ১৯. (ক); ২০. (ঘ); ২১. (গ); ২২. (খ); ২৩. (গ); ২৪. (খ); ২৫. (ক); ২৬. (ঘ); ২৭. (গ); ২৮. (ঘ); ২৯. (ঘ); ৩০. (গ); ৩১. (ঘ); ৩২. (গ); ৩৩. (খ); ৩৪. (ক); ৩৫. (খ); ৩৬. (গ); ৩৭. (গ); ৩৮. (খ); ৩৯. (ঘ); ৪০. (গ); ৪১. (ক); ৪২. (ক); ৪৩. (ঘ); ৪৪. (ঘ); ৪৫. (ঘ); ৪৬. (ঘ); ৪৭. (খ); ৪৮. (গ); ৪৯. (ক); ৫০. (ঘ); ৫১. (ক); ৫২. (গ); ৫৩. (গ); ৫৪. (খ); ৫৫. (ক); ৫৬. (গ); ৫৭. (ক); ৫৮. (ঘ); ৫৯. (গ); ৬০. (গ); ৬১. (ঘ); ৬২. (ঘ); ৬৩. (খ); ৬৪. (ঘ); ৬৫. (খ); ৬৬. (গ); ৬৭. (গ); ৬৮. (ক); ৬৯. (ক,খ); ৭০. (গ); ৭১. (খ); ৭২. (গ); ৭৩. (ক); ৭৪. (খ); ৭৫. (ক); ৭৬. (খ); ৭৭. (খ); ৭৮. (খ); ৭৯. (খ); ৮০. (গ); ৮১. (ক,খ); ৮২. (খ); ৮৩. (খ); ৮৪. (গ); ৮৫. (গ); ৮৬. (গ); ৮৭. (ঘ); ৮৮. (গ); ৮৯. (গ); ৯০. (খ); ৯১. (খ)।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. বংশগতি কী?
২. জিন কী? [রা. সি. ব. বো.-১৯]
৩. জিনতত্ত্ব কী?
৪. মেন্ডেলবাদ কী?
৫. লোকাস কী?
৬. অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ কী? [চ. বো ১৭; সি. বো.-১৬; রা. ব. য. বো.-১৫]
৭. ফিনোটাইপ কী? [য.বো.- ১৯; সি. বো.-১৫]
৮. জিনোটাইপ কী? [রা. বো.-১৫]
৯. হেটারোজাইগাস কী?
১০. হোমোজাইগাস কী?
১১. প্রকট বৈশিষ্ট্য কী? [ব. বো.-১৬]
১২. প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কী?
১৩. ব্যাকক্রস কী? [চ. বো.-১৬]
১৪. টেস্টক্রস কী?
১৫. মনোহাইব্রিডক্রস কী?
১৬. ডাইহাইব্রিডক্রস কী?
১৭. সংকর জীব?
১৮. অটোজোম কী?
১৯. সেক্স ক্রোমোজোম কী?
২০. জিনোম কী?
২১. জিন লিংকেজ কী?
২২. হোমোগ্যামেটিক সেক্স কী?
২৩. এপিস্ট্যাসিস কী? [ঢা. য. বো.-১৭, চ. বো.-১৫]
২৪. হাইপোস্ট্যাটিক জিন কী?
২৫. পলিজিন কী?
২৬. বর্ণান্ধতা কী?
২৭. মাল্টিপল অ্যালিল কী?
২৮. ABO রক্তের গ্রুপ বা ব্লাডগ্রুপ কাকে বলে?
২৯. Rh- ফ্যাক্টর কী? [কু. বো.-১৯]
৩০. Rh ব্লাড গ্রুপ কী?
৩১. ইসিহারা টেস্ট কী?
৩২. বিবর্তন কী? [রা. বো.-১৭;দি. বো. ১৫]
৩৩. জীবাশ্ম কী? [সকল বোর্ড-১৮]
৩৪. সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গ কী?
৩৫. জীবন সংগ্রাম কী?
৩৬. পরিব্যক্তি বা মিউটেশন কী?
৩৭. ডারউইন কে ছিলেন? [রা. বো.-১৮]
৩৮. জৈব অভিব্যক্তি কী?
৩৯. মেন্ডেলের প্রথমসূত্র লিখ। [ঢা.বো.-১৯]
৪০. মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি কী? [চ.বো.-১৯]

Scanned with CamScanner

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. মানব কল্যাণে জিনতত্ত্বের ভূমিকা লিখ।
২. জিনকে বংশগতির মৌলিক একক বলা হয় কেন?
৩. মেন্ডেলের সূত্র ২টি লিখ।
৪. ১ম সূত্রকে পৃথকীকরণের ও ২য় সূত্রকে স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র বলা হয় কেন?
৫. মেন্ডেলের ১ম সূত্রটি লিখ ও ব্যাখ্যা কর।
৬. মেন্ডেলের ২য় সূত্রটি লিখ ও ব্যাখ্যা কর।
৭. সকল টেস্ট ক্রসই ব্যাকক্রস কিন্তু সকল ব্যাকক্রস টেস্ট ক্রস নয়– ব্যাখ্যা কর।
৮. টেস্ট ক্রসে অনুপাত ১:১ হয় কেন?
৯. ট্রেস ক্রস ও ব্যাক ক্রস বলতে কী বুঝ? *[কু. বো.- ১৯; ঢা. বো.-১৭]*
১০. জিনোটাইপ বলতে কী বুঝ? *[ব. বো.-১৬]*
১১. ফিনোটাইপ বলতে কী বুঝ? *[চ. বো.-১৭]*
১২. কোনো জীবের জিনোটাইপ জানতে হলে তুমি কী করবে?
১৩. অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বুঝ? *[চ. বো. ১৬]*
১৪. সমপ্রকটতা বলতে কী বুঝ?
১৫. লিথাল জিন বা মারণ জিন বলতে কী বুঝ? *[রা. সি. বো. ১৯]*
১৬. পরিপূরক জিন বলতে কী বুঝ?
১৭. এপিস্ট্যাসিস বলতে কী বুঝ? *[ব. বো.-১৭, য. বো.-১৫]*
১৮. দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলতে কী বুঝ?
১৯. সেক্স লিংকড ইনহেরিটেন্স/লিঙ্গ সংশ্লিষ্ট বংশগতি বলতে কী বুঝ?
২০. মানুষে বর্ণান্ধতা দেখা যায় কেন? *[ঢা. বো.-১৬]*
২১. বর্ণান্ধতা নারীর চেয়ে পুরুষে বেশি দেখা যায় কেন?
২২. বিয়ের আগে পুরুষের বর্ণান্ধতা বিবেচনা করা প্রয়োজন কেন?
২৩. সেক্স লিংকড ডিস-অর্ডার বলতে কী বোঝ?
২৪. হিমোফিলিয়া বলতে কী বুঝ?
২৫. মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি বলতে কী বুঝ?
২৬. মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি কেন হয়?
২৭. পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স বলতে কী বুঝ?
২৮. লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি বলতে কী বুঝ?
২৯. রেসাস ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝ.? *[রা. বো.-১৭]*
৩০. ABO ব্লাড গ্রুপ বলতে কী বুঝ? *[য. বো. ১৯]*
৩১. সর্বজনীন দাতা বলতে কী বুঝ?
৩২. সেক্স লিঙ্কড ইনহেরিট্যান্স– বলতে কী বোঝ?
৩৩. প্রকরণ বলতে কী বুঝ? *[চ. বো.-১৭]*
৩৪. এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস বলতে কী বুঝ? *[য. বো.-১৭, কু. বো.-১৬]*
৩৫. গর্ভধারণে Rh-ফ্যাক্টর কী জটিলতা সৃষ্টি করে?
৩৬. পজিটিভ ব্লাডগ্রুপযুক্ত বাবা-মায়ের সন্তানের ব্লাডগ্রুপ কী নেগেটিভ হতে পারে? বুঝিয়ে লিখ।
৩৭. ল্যামার্কিজম বলতে কী বুঝ? *[য. বো. ১৯]*
৩৮. অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার সূত্র বলতে কী বুঝ?
৩৯. ল্যামার্ক এর মতবাদ বিজ্ঞানী মহলে গ্রহণযোগ্য হয়নি কেন? *[সি. বো.-১৭]*
৪০. ডারউইনিজম বলতে কী বুঝ?
৪১. নব্য ডারউইনবাদ বলতে কী বুঝ?
৪২. সংযোগকারী প্রাণী বলতে কী বোঝ?
৪৩. সংযোগকারী যোগসূত্র বলতে কী বোঝ? *[সকল বোর্ড-১৮]*
৪৪. আর্কিওপটেরিক্স বলতে কী বুঝ?
৪৫. আর্কিওপটেরিক্স ও প্লাটিপাসকে সংযোগকারী জীবাশ্ম বলা হয় কেন?
৪৬. নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলতে কী বুঝ?

পার্থক্য লিখ/তুলনা কর :

৪৭. প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য।
৪৮. ব্যাকক্রস ও টেস্টক্রস।
৪৯. অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সমপ্রকটতা।
৫০. সার্বজনীন দাতা ও সার্বজনীন গ্রহীতা।
৫১. ডারউইনিজম ও ল্যামার্কিজমের মধ্যে তুলনা কর।
৫২. সমসংস্থ অঙ্গ ও সমবৃত্তি অঙ্গ। *[ঢা. বো. ১৯]*

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। কবির সাহেব রাস্তা পারাপারের সময় সিগনাল বাতি বুঝতে পারেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মিতা ও তাঁর বান্ধবী লুনা তা পারে না। পরবর্তীতে লুনার ছেলের সাথে কবির সাহেব তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন। *[ঢাকা বোর্ড-২০১৯]*

ক. মেন্ডেলের প্রথম সূত্র লিখ।
খ. সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
গ. উদ্দীপকের কবির সাহেবের সন্তানদের জেনোটাইপ চেকার বোর্ডের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি লুনার নাতী-নাতনীদের মধ্যে কী অনুপাতে প্রকাশ পাবে? বিশ্লেষণ কর।

২। রীনা ও তার স্বামী স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হলেও তাদের ছেলে বর্ণান্ধ। *[রাজশাহী ও সিলেট বোর্ড-২০১৯]*

ক. জিন কাকে বলে?
খ. লিথাল জিন বলতে কী বুঝায়?
গ. রীনার ছেলে বর্ণান্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ রীনার মেয়েদের ভাগ্যে কী ঘটবে বিশ্লেষণ করে দেখাও।

৩। কিছু ক্ষেত্রে দুটি সাদা ফুলবিশিষ্ট মটর শুটির ক্রসে যেমন বেগুনি বর্ণের ফুল পাওয়া যায় তেমনি স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন দম্পতির সন্তানও বর্ণান্ধ হতে পারে। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৯]*

ক. Rh-ফ্যাক্টর কী?
খ. টেস্ট ক্রস বলতে কী বুঝ?
গ. উল্লিখিত ভিন্ন বর্ণের ফুল পাওয়ার ঘটনার জীনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাও।
ঘ সন্তানের উল্লিখিত সমস্যা ছেলে সন্তানদেরই বেশি হয়।– বিশ্লেষণ কর।

৪। নিচের প্রক্রিয়াটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

P– মূক-বধির × মূক-বধির

F_1– স্বাভাবিক

[সকল বোর্ড-১৮]

ক. জীবাশ্ম কী?
খ. সংযোগকারী যোগসূত্র বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী F_1 জনুর সবাই স্বাভাবিক হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে F_2 জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর।

Scanned with CamScanner

৫। মি. সোহেল একজন স্বাভাবিক পুরুষ। তিনি সম্প্রতি স্বাভাবিক (হিমোফিলিয়া বাহক) শীলা নামের মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। অপরদিকে মি. রবিন ও মিসেস ফাতেমা উভয়ই জন্মগতভাবে মূক ও বধির। [ঢাকা বোর্ড-২০১৭]

ক. এপিস্ট্যাসিস কী?
খ. টেস্ট ক্রস ও ব্যাক ক্রস বলতে কী বুঝ?
গ. মি. সোহেল ও মিসেস শীলা দম্পতির প্রথম বংশধরে ফিনোটাইপ অনুপাত ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় দম্পতির F_2 জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত বিশ্লেষণ কর।

৬। রহিম তার বাবার খামারে মুরগির বাচ্চাগুলো লক্ষ করে দেখলেন– সাদা পালকের মাঝে কয়েকটি রঙিন পালকের বাচ্চা ১৩:৩ অনুপাতে রয়েছে। তিনি ভাবছেন, খামারের সব মোরগ-মুরগি সাদা পালকের কিন্তু কয়েকটি রঙিন বাচ্চা হলো কীভাবে? [রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]

ক. বিবর্তন কী?
খ. রেসাস ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের এই ঘটনাটির সাথে বংশগতির কোনো সম্পর্ক আছে কি? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে এই ঘটনার জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা চেকারবোর্ডে দেখাও।

৭। শরীফ সাহেবের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বয়স বাড়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার দুই ছেলে বর্ণান্ধ হলেও মেয়েটি স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন।

ক. হোমোজাইগাস কী?
খ. এপিস্ট্যাসিস বলতে কী বুঝ? [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
গ. শরীফ সাহেব ও তার স্ত্রীর জেনোটাইপ ক্রসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]
ঘ. শরীফ সাহেবের মেয়ের সাথে স্বাভাবিক ছেলের বিয়ে হলে কী অনুপাতে উদ্দীপকের ঘটনাটি প্রকাশ পাবে? চেকার বোর্ডের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]

৮। চার ভাইবোনের মধ্যে ইকবাল ও স্বপ্না লাল-সবুজ বর্ণ পৃথক করতে পারলেও করিম ও মিলা লাল-সবুজ বর্ণ পৃথক করতে পারে না। করিমের মতো তার স্ত্রী লাল-সবুজ বর্ণ পৃথক করতে পারে না। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]

ক. অ্যালিল কাকে বলে?
খ. ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চার ভাইবোনের জিনোটাইপ উল্লেখ কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে করিমের সন্তানেরা কিরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে– বিশ্লেষণ কর।

৯। নিচে একটি জিনতাত্ত্বিক পরীক্ষণের ফলাফল দেখানো হলো–

পিতা-মাতা – ♂ সাদা লেগহর্ন × ♀ সাদা ওয়াইনডটস

F_1 জনু : সকল মোরগ – মুরগিই সাদা

F_2 জনু : সাদা ঃ রঙিন = ১৩ ঃ ৩ [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]

ক. নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কী?
খ. সমপ্রকটতা বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের F_1 ও F_2 জনুর ফলাফল পানেটের চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখাও। [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম– বিশ্লেষণ [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]

১০। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লাল ফুল (♂) × সাদা ফুল (♀)

↓

F_1 → গোলাপি ফুল

↓

F_2 বংশধর

ক. মাল্টিপল অ্যালিল কী?
খ. কুশিং সিনড্রোম বলতে কী বুঝ?
গ. F_1 জনুতে লাল বা সাদা ফুল পাওয়া গেল না– ব্যাখ্যা কর। [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]
ঘ. F_2 জনুতে কী ঘটবে চেকার বোর্ডের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]

১১। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কালো বর্ণের ♂ × সাদা বর্ণের ♀

↓

F_1 ⟶ সবকটি প্রাণী সাদা ছোপযুক্ত [যশোর বোর্ড-২০১৭]

ক. এপিস্ট্যাসিস কী?
খ. এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস বলতে কী বুঝ?
গ. F_1 জনুর ফলাফল ব্যাখ্যা কর।
ঘ. F_1 জনুর দুটি প্রাণীর মধ্যে ক্রসের ফলাফলের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাও।

১২। এক দম্পতির দুইজনই স্বাভাবিক (♂ DdEe. ♀DdEe) তাদের সন্তানদের কেউ কেউ মূক ও বধির। জেনেটিক সমস্যার কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

ক. অটোজম কী?
খ. অগ্ন্যাশয়কে মিশ্রগ্রন্থি বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সন্তানদের ফেনোটাইপের সংখ্যা ছকের সাহায্যে নির্ণয় কর। [ঢাকা বোর্ড-২০১৬]
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম– বিশ্লেষণ কর। [ঢাকা বোর্ড-২০১৬]

১৩। নিচের সারণিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

♂AABB × ♀aabb

↓

F_1

↓

F_2

ক. ইসিহারা টেস্ট কী?
খ. এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস বলতে কী বুঝায়? [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]
গ. উদ্দীপকটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা কর। [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]
ঘ. উদ্দীপকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন অ্যালিল ক্রিয়া করলে F_2 তে ফিনোটাইপ কেমন হতে পারে দেখাও। [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]

Scanned with CamScanner

১৪। দুর্ঘটনায় পড়ে মঈনের দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে তরল যোজক কলা বের হলো। বিশেষ গ্রুপের ঐ তরলের একটি ব্যাগ দেখিয়ে ডাক্তার বললেন তার জন্য এই বিশেষ তরলের ধনাত্মক টাইপ প্রয়োজন। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]*

ক. ব্যাক ক্রস কী?
খ. অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের তরলের গ্রুপের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টি বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখে– আলোচনা কর।

১৫। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সাদা ফুল ♀ × ♂ লাল ফুল
F_1 ⟶ গোলাপি ফুল *[বরিশাল বোর্ড-২০১৬]*

ক. প্রকট বৈশিষ্ট্য কী?
খ. জিনোটাইপ বলতে কী বুঝ?
গ. F_1 জনুতে সাদা বা লাল ফুল না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপক অনুসারে F_1 এর একটি গোলাপি ফুলের সাথে মাতৃবংশের একটি লাল ফুলের ক্রসে কী ঘটবে? জিনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কর।

১৬। একজন মূক ও বধির ছেলের সাথে একজন মূক ও বধির মেয়ের বিয়ে হলে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের নিয়ম অনুসারে F_2 জনুতে ৭ জন সন্তান মূক ও বধির হবে।

ক. সেক্স ক্রোমোজোম কী?
খ. হিমোফিলিয়া বলতে কী বুঝ?
গ. ১৩:৩ এর সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত এপিস্ট্যাসিসের F_2 জনুর তুলনামূলক আলোচনা কর। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬]*
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সংখ্যক মূক ও বধির সন্তানের আবির্ভাব চেকার বোর্ডের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬]*

১৭। চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে জিরাফের খাঁচার সামনে এসে প্রাণীটির লম্বা গলা দেখে তানিম বিস্ময়াভিভূত হলো। তানিম এ ব্যাপারে তার বাবাকে প্রশ্ন করলে, বাবা বললেন, "বিবর্তনের ধারায় প্রতিটি জীবই নতুন পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করে।"

ক. প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কী?
খ. নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের প্রাণীটির আলোকে তানিমের বাবার উক্তি ব্যাখ্যা কর। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬]*
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির গলা লম্বা হওয়ার কারণ, বিবর্তন মতবাদের আলোকে বিশ্লেষণ কর। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬]*

১৮। নন-অ্যালিলিক জিনের আন্তঃক্রিয়ায় মেন্ডেলের ২য় সূত্রের অনুপাতের ব্যতিক্রম ঘটে, যেমন– ১৩ ঃ ৩। কখনও কখনও অপত্য বংশধরের মৃত্যুর কারণে ৩ ঃ ১ অনুপাতের পরিবর্তন হয়। *[সি.বো.-২০১৬]*

ক. অ্যালিল কী?
খ. সেক্স লিঙ্কড ইনহেরিট্যান্স– প্রপঞ্চটি বুঝিয়ে লিখ।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ১ম অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি উপযুক্ত উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।

১৯। রফিক সাহেবের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে বিদ্যমান। বয়স বাড়ার পর তিনি লক্ষ করলেন যে, তার দুই ছেলেই লাল ও সবুজ বর্ণ পৃথক করতে পারে না। *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৬]*

ক. অ্যান্টিজেন কী?
খ. সর্বজনীন দাতা বলতে কী বুঝ?
গ. রফিক সাহেব ও তার স্ত্রী জেনোটাইপ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রফিক সাহেবের মেয়েদের স্বাভাবিক পুরুষের সাথে বিয়ে হলে তাদের সন্তানের জেনোটাইপ বিশ্লেষণ কর।

২০। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লাল ফুল × সাদা ফুল
F_1 ⟶ লাল ফুল
F_2 ⟶ ?

ক. লোকাস কী?
খ. আর্কিওপটেরিক্স বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের F_1 জনুতে সব ফুল লাল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। *[ঢাকা বোর্ড–২০১৫]*
ঘ. উদ্দীপকের F_2 জনুর ফলাফল অনুপাতসহ ব্যাখ্যা কর। *[ঢাকা বোর্ড–২০১৫]*

২১। স্বাভাবিক মা-বাবার সন্তান 'বিপুল' মূক ও বধির।

ক. পরিব্যক্তি কী?
খ. নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উলেণ্ডখিত ঘটনার জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনা মেন্ডেলের কোন সূত্রের ব্যতিক্রম বলে মনে কর?– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

২২। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নের উত্তর দাও :

♂ গ্যামেট / ♀ গ্যামেট	B	b
B	BB কালো	Bb নীলাভ ধুসর
b	Bb নীলাভ ধুসর	bb সাদা

B = কালো জিন, b = সাদা জিন

উপরের ছকটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. জিনোটাইপ কী?
খ. অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকটির তথ্য মোতাবেক F_1 জনু বিশ্লেষণ কর।
ঘ. উদ্দীপকের ছকটি ব্যাখ্যা করে মেন্ডেলের সূত্রের সাথে এর সম্পর্কের বিষয়ে মতামত দাও।

২৩। করিম সাহেবের রক্তের গ্রুপ 'AB' এবং তার স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ 'O'। তাদের সন্তানদের কেউ বাবা-মায়ের রক্ত গ্রুপ পায়নি, কিন্তু নাতী-নাতনিরা পেয়েছে। *[যশোর বোর্ড–২০১৫]*

ক. অ্যালিল কী?
খ. এপিস্ট্যাসিস বলতে কী বুঝায়?
গ. করিম সাহেবের সন্তানদের রক্তগ্রুপ বাবা-মায়ের চেয়ে ভিন্ন হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. করিম সাহেবের নাতি-নাতনিদের মধ্যে কত অনুপাতে 'AB' এবং 'O' রক্তগ্রুপধারী হবে? চেকার বোর্ডের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

Scanned with CamScanner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়
মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

ঐতিহ্যে ৫১ বছর
কাজল প্রাদার্স লিমিটেড

Scanned with CamScanner

প্রাণীর আচরণ
ANIMAL BEHAVIOUR

অধ্যায় ১২

বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের আচরণ সৃষ্টি একটি অপার রহস্য। তাই অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে প্রাণীদের আচরণ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই কৌতূহলের শেষ নেই। আর এই অনুসন্ধিৎসু মনের কৌতূহল থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফসল ও প্রাণীদের আচরণ সম্পর্কিত বিষয় প্রাণীর আচরণ (animal behaviour)। সহজ কথায়, একটি প্রাণী যা করে বা যেভাবে করে তাই তার আচরণ। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রাণীর বৈচিত্র্যময় আচরণ এবং ইথোলজির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।






এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ৮)
১. আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২. সহজাত আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. প্রত্যেক প্রাণীর সহজাত আচরণ যাচাই করতে পারবে। ৪. শিখন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার (Reflexes) উপর Pavlov এর তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৬. মৌমাছির সামাজিক সংগঠনের আলোকে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা (Altruism) ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● আচরণের প্রকৃতি (The nature of Behaviour) ○ উদ্দিপনার আচরণগত পরিবর্তন ○ আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্ক ● সহজাত (Innate) আচরণ ○ ট্যাক্সিস (Taxes) ○ রিফ্লেক্সেস (Reflexcs) ○ ইনসটিঙ্কস (Intincts) ● সহজাত আচরণ যাচাই– ○ শীতের পাখির মাইগ্রেশন ○ মাকড়শার জাল ○ অপত্যের প্রতি যত্ন-মাছ, ব্যাঙ, পাখি ● শিখন (Learning) ○ অভ্যাসগত (Habituation) ○ অনুকরণ (Imprinting) ● Pavlov এর কাজ ○ কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়া ● সামাজিক আচরণ ○ পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা (Altruism) মৌমাছির সামাজিক সংগঠন

১২.১ আচরণের প্রকৃতি (The Nature of Behaviour)

প্রাণীদের আচরণের প্রকৃতিতে রয়েছে বৈচিত্র্যময়তা। জন্মগতভাবেই বিভিন্ন প্রাণীর মাঝে আচরণগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এটি ছাড়াও পরিবেশগত কারণে (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা) প্রাণীরা বিভিন্ন সময়ে তাদের আচরণে পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। **প্রাণিবিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণীদের আচরণ (animal behaviour) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে ইথোলজি বা আচরণ বিদ্যা** (Ethology, Gr, *ethos* = behaviours + *logos* = knowledge) **বলে। নিকোলাস টিনবার্জেন** (Nikolas Tinbergen)**-কে ইথোলোজির জনক বলা হয়।**

Scanned with CamScanner

কার্ল ভন ফ্রিশ (Karl von Frisch, 1886-1982), কোনরাড লরেঞ্জ (Konrad Lorenz, 1903-1989) ও **নিকোলাস টিনবার্জেন** (Nikolas Tinbergen, 1907-1988) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাণীর আচরণবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁরা 1973 সালে শারীরবিজ্ঞান ও মেডিসিনের ওপর নোবেল পুরস্কার পান। বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার

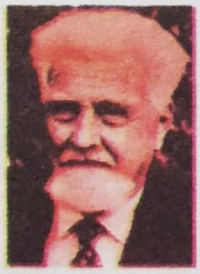
Konrad Lorenz (1903-1989)


Karl von Frisch (1886-1982)


Nikolas Tinbergen (1907-1988)

পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণীর আচরণগত পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাণীর সাড়া দানের বিষয়টি পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বহিঃস্থ বা অন্তঃস্থ উদ্দীপনার কারণে ঘটে থাকে। যেমন– একটি ক্ষুধার্ত প্রাণীর সামনে প্লেটভর্তি খাবার যে প্রেরণার সৃষ্টি করবে তা ভরপেট প্রাণীতে করবে না।

উদ্দীপনায় আচরণগত পরিবর্তন (Changes of Behaviour by Stimulation)

উদ্দীপকের (stimulus) প্রতি প্রাণীরা প্রতিক্রিয়া (response) প্রদর্শনের মাধ্যমেই তার আচরণের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। উদ্দীপনার (stimulation) উৎপত্তি প্রাণীর ভেতর থেকে হতে পারে অথবা পরিবেশ (বাহির) থেকে আসতে পারে। বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণীতে যে পরিবর্তন সাধিত হয় বা প্রাণী যে সাড়া প্রদান করে তাই **প্রাণীর আচরণ**। তাই বলা যায়, উদ্দীপনার দ্বারাই প্রাণীর আচরণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন– রেসাস বানর (*Macaca mulatta*) প্রজাতির সদস্যরা সাধারণভাবে পরস্পর থেকে একটু আলাদা থাকলেও প্রচণ্ড শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য পরস্পর জড়াজড়ি করে অবস্থান করে। তাদের এ আচরণ দেহের উষ্ণতা বাড়াতে সহায়তা করে। বাহ্যিক পরিবেশের তাপমাত্রার পরিবর্তনের জন্য এরূপ হয়। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাহ্যিক উদ্দীপক (external stimuli) হিসেবে কাজ করে। বস্তুত প্রাণীর স্নায়ু, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও পেশিতন্ত্রের সমন্বিত কার্যকারিতায় উদ্দীপনা সংঘটিত হয়। সমগ্র দেহ বা দেহাংশ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন, কণ্ঠস্বর বা ধ্বনি উচ্চারণ, গন্ধ ছড়ানো, আতঙ্কিত হওয়া, বর্ণ পরিবর্তন, অপত্য লালন, রাগ-বিরাগ, অভিপ্রয়াণ, লোম খাড়া হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ক্রিয়াকে আচরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রখ্যাত প্রাণী আচরণবিদ **ম্যানিং** (Manning, 1972) মনে করেন, **জীব তার বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার পর তার দেহাভ্যন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া করে থাকে।**


চিত্র ১২.১ : শীতের প্রভাবে রেসাস বানরেরা একত্রে জড় হয়

প্রতিক্রিয়া বলতে উদ্দীপনাহেতু দেহে কতিপয় পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। আর উদ্দীপনা (stimulus) ও প্রতিক্রিয়ার (response) ফলই হলো আচরণ। তবে প্রতিটি আচরণের পেছনে থাকে সংবেদনের ভূমিকা। আর সংবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই সৃষ্টি হয় প্রতিক্রিয়া। যার ফলে **উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার** (stimulus-response) মাধ্যমেই আচরণের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা যায়। তবে উক্ত বিষয়টি প্রাণীর আচরণের সরলতম ব্যাখ্যা। যেকোনো উদ্দীপক সরাসরি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র (nervous system) এবং দৈহিক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং পরিপূর্ণ ব্যাখ্যায় আচরণকে শুধু উদ্দীপকের ফলাফল হিসেবে গণ্য না করে, প্রাণিদেহের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল হিসেবে গণ্য করা হয়।

তাই আচরণের আধুনিক ব্যাখ্যায়, উদ্দীপক-প্রাণী-প্রতিক্রিয়া (Stimulus-Organism-Response) ধারণাটি বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে আরও সহজে বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের ব্যাপারে সংগ্রাহক (receptor) উদ্দীপককে শনাক্ত করে, সঞ্চালক (conductor) উদ্দীপনাকে সমন্বিত করে এবং কার্যকারক (effector) প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দিয়ে আচরণের প্রকাশ ঘটায়। রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ–

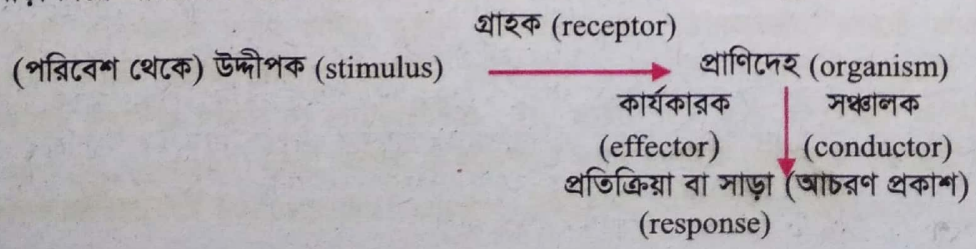

Scanned with CamScanner

উদ্দীপকের ধরন (Types of Stimulus)

অধিকাংশ প্রাণী একাধিক ধরনের উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়। প্রাণী প্রধানত চার ধরনের উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিয়ে আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। এগুলো হলো–

১। **রাসায়নিক উদ্দীপক (Chemical stimuli) :** বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রাণীরা বায়ুতে বা পানিতে খুব অল্প পরিমাণে রাসায়নিক উদ্দীপকের নিঃসরণ ঘটায়। এগুলো প্রজাতি নির্দিষ্ট। প্রাণীর যৌন মিলন, সীমানা নির্ধারণ, গমন পথ চিহ্নিতকরণ, শাবক শনাক্তকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন আচরণে রাসায়নিক উদ্দীপক ব্যবহৃত হয়।

২। **শব্দ উদ্দীপক (Sound stimuli) :** শব্দ প্রাণীর অন্যতম প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম। এ উদ্দীপনায় প্রাণীর আচরণের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। সাধারণত দূরে অবস্থানকারী সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য শব্দ উদ্দীপক ব্যবহৃত হয়। প্রাণীর যৌন মিলন, শিকারি হতে সতর্ক করা, স্বজাতি শনাক্তকরণ, খাদ্যের প্রাচুর্যের সংবাদ দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন আচরণে শব্দ উদ্দীপক ব্যবহৃত হয়।

৩। **দর্শন উদ্দীপক (Visual stimuli) :** দেখতে সক্ষম প্রাণীর ক্ষেত্রে আলোক একটি উত্তম যোগাযোগ মাধ্যম। নিশাচর প্রাণীরা সাধারণ আলোতে দেখে না কিন্তু তারা আলোর অবলোহিত (infrared) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু শনাক্ত করে। মরুভূমির সাপ রাতের বেলায় এ পদ্ধতিতে উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণী শিকার করে। গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী অনেক মাছ ও অনেক পতঙ্গের আলোক উৎপাদনকারী অঙ্গ আছে যা তাদের চলাচল, শিকার ধরা ও প্রজননের কাজে ব্যবহৃত হয়। অনেক প্রাণী যেমন– বানর, হাতি, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি তাদের অঙ্গভঙ্গি দ্বারা বিভিন্ন রকম আচরণ প্রদর্শন করে সমগোত্রীয় কিংবা অন্য প্রজাতির সদস্যদের আকর্ষণ করে। পাখি তার বাচ্চার হা করা মুখ দেখে দ্রুত সাড়া দিয়ে মুখে খাবার ফেলে।

৪। **স্পর্শ উদ্দীপক (Touch stimuli) :** প্রাণিজগতের বিভিন্ন প্রজাতিতে স্পর্শ উদ্দীপকের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। শারীরিক সংযোগের দ্বারা স্পর্শ উদ্দীপক প্রাণীর আচরণে পরিবর্তন ঘটায়। কিছু পতঙ্গভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং জেলিফিশ স্পর্শ উদ্দীপক দ্বারা তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। অনেক পতঙ্গভোজী স্তন্যপায়ীর (যেমন– চিকা) তুণ্ডে এমন লোম থাকে যা দ্বারা এরা ০.১ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের খাদ্যকেও শনাক্ত করতে পারে। সামাজিক পতঙ্গ মৌমাছির কর্মীগুলো তরুণ মৌমাছির অ্যান্টেনার সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রাণীর আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Animal behaviour)

(১) প্রাণীর আচরণ সহজাত ও শিখন উভয় ধরনেরই হয়ে থাকে। (২) প্রাণীর আচরণ অভিযোজনিক। উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিয়ে প্রতিটি প্রাণী প্রকৃতিতে টিকে থাকে। (৩) জিন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা উভয়ের দ্বারাই প্রাণীর আচরণ প্রভাবিত হয়। (৪) প্রাণীর কিছু আচরণ চক্রাকারে সংঘটিত হয়। (৫) আচরণের দ্বারা প্রাণী দ্রুত ও সুবিধাজনক উপায়ে তার পরিবেশের প্রতি সাড়া প্রদান করে। (৬) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক সম্মিলিতভাবে বিশেষ আচরণকে সক্রিয় করে। (৭) প্রাণীর আচরণে সহজাত এবং শিখন উভয় ধরনের উপাদান থাকে।

আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Behaviour and Heredity)

আচরণ নিয়ন্ত্রণে বংশগতি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আচরণ ও বংশগতির মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যাবলি সাধারণত সন্তান-সন্ততি পেয়ে থাকে। পৃথিবীর সব জীবের ক্ষেত্রেই এ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযোজ্য। তাই বলা যায়, পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যাবলি, বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারণের প্রক্রিয়াই হলো **বংশগতি** (heredity)। বংশগতি বস্তুর (hereditary material) মাধ্যমেই পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য তার সন্তান-সন্ততিতে বাহিত হয়। **ক্রোমোজোম** হলো বংশগতি বস্তুর মুখ্য উপাদান। এ ক্রোমোজোমে রয়েছে DNA (Deoxyribonucleic acid) যেখানে জিনগুলো সুসজ্জিত থাকে। জিনই হচ্ছে বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ জিনই জীবের বাহ্যিক চরিত্রসমূহ ফুটিয়ে তোলে। জিনগুলো শিখন, স্মৃতি ও জ্ঞানের এক অস্থায়ী তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলে। প্রাণী তার পরিবেশ উপযোগী আচরণে প্রয়োজনীয় তথ্য এ ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ ও সঞ্চয় করে থাকে। মানুষ শিখন আচরণের মাধ্যমে অনেক কিছু অভিজ্ঞতার আলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক প্রাণিপ্রজাতির আচরণ দেখলে মনে হয় স্বয়ংক্রিয়। যেমন– অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো জ্বললে তেলাপোকা দ্রুত অন্ধকার কোণে দৌড়ায়। এ ঘটনায় শিখনের কিছু নেই; সম্পূর্ণ জিনগত বিষয় জড়িত। বংশপরম্পরায় এ আচরণের পরিবর্তনও হয় না।

Scanned with CamScanner

প্রাণী তাদের সহজাত (innate) আচরণগুলো জন্মগতভাবে অর্থাৎ বংশগতির মাধ্যমে পেয়ে থাকে। প্রাণীর আচরণ কোনো একক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বিভিন্ন লোকাসে অবস্থিত একাধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে আচরণ প্রাণীর একটি জটিল বৈশিষ্ট্য। জিন নির্ধারিত প্রাণীদের যেসব আচরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদর্শিত হয় এবং প্রজাতির অন্য কোনো সদস্যকে (conspecifics) না দেখেই বা অন্যের কাছ থেকে না শিখেই প্রকাশিত হয় তাকে **নির্ধারিত ক্রিয়াধারা** (Fixed Action Pattern, সংক্ষেপে-FAP) বলা হয়। অনুরূপ পরিস্থিতিতে কোনো প্রাণীকে (একই বয়স ও একই লিঙ্গ) স্বগোত্রীয় অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখলেও অজান্তেই এরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত এ ধরনের আচরণ সহজাত আচরণের (innate behaviour) অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র প্রাণিজগতে বংশগতির মাধ্যমে সঞ্চারিত আচরণের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এই আচরণগুলো জেনেটিক বস্তুর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে **প্রিপ্রোগ্রামড** বা **প্রিউয়ারড** (Preprogrammed or prewired) অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। FAP-এর অন্তর্গত জিন নিয়ন্ত্রিত প্রাণীর আচরণগুলো হলো– প্রাণীদের প্রণয় ও সঙ্গম আচরণ, খাদ্যান্বেষণ, অভিপ্রয়াণ, বাসা তৈরি করা, খাদ্য মজুদ করা, নৃত্য করা, মৌমাছির চাক তৈরি, মাকড়সার জাল বুনন, কুকুর ও নেকড়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের লেজের অবস্থান ও মুখোভঙ্গির প্রদর্শন, মানুষের ক্ষেত্রে শৈশবে হামাগুড়ি দেওয়া, হাসা, কান্না করা ইত্যাদি।



চিত্র ১২.২ : নেকড়ের লেজ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আচরণ প্রদর্শন

আচরণের জীবতাত্ত্বিক ভিত্তি (Biological basis of behaviour)

(১) প্রাণীর আচরণ বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত অবস্থায় সঞ্চারিত হয়। (২) প্রাণীর আচরণ প্রজাতি নির্দিষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর আচরণও ভিন্ন ভিন্ন। (৩) জৈবিক পরিবর্তন দ্বারা প্রাণীর আচরণের পরিবর্তন ঘটে। যেমন– মানসিক রোগীকে ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা। (৪) প্রতিটি প্রাণীর আচরণের একটি বিবর্তনিক ইতিহাস থাকে। ফলে নিকটতম কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে অনেক আচরণে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন– জিনের গঠন অনুযায়ী শিম্পাঞ্জি ও মানুষ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শুধুমাত্র ২% জিন দ্বারা শিম্পাঞ্জি মানুষ থেকে আলাদা। (৫) কিছু কিছু আচরণ পরিবারের মধ্যে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

১২.২ সহজাত আচরণ (Innate Behaviour)

প্রত্যেক প্রাণীই জন্মের পরপরই বিশেষ কিছু আচরণ প্রদর্শন করতে থাকে যেগুলো বাহ্যিক পরিবেশ থেকে কেউ কখনো শিখিয়ে দেয়নি। এরূপ 'জীবদ্দশায় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো প্রজাতির প্রতিটি প্রাণী পূর্বের অভিজ্ঞতা বা শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ছাড়া বংশানুক্রমে একইভাবে যেসব জন্মগত আচরণ বা কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করে তাকে **সহজাত আচরণ** (innate behaviour) বলা হয়।' অন্যভাবে বলা যায়, **অনেকগুলো প্রতিবর্তী ক্রিয়ায়** (reflex action) **সৃষ্ট সরল, পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত, প্রজাতি সুনির্দিষ্ট** (species specific), **শিক্ষণবিহীন ও বংশগত আচরণই হলো সহজাত আচরণ**। যেমন– পাখির বাসা বাঁধা, মাকড়সার জাল বোনা, মৌমাছির চাক তৈরি, শিশুর স্তনপান, ছাগল বা গরুর বাচ্চা জন্মের পরপরই ছোটাছুটি ইত্যাদি। এসব আচরণ সহজাতভাবে একই প্রজাতির প্রত্যেক প্রাণীতে একইভাবে বিরাজমান থাকে। **কনরাড লরেঞ্জ**-এর মতে, 'সহজাত আচরণ হলো– Unlearned species specific motor pattern.'



চিত্র ১২.৩ : মৌমাছির মৌচাক তৈরি

সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Innate behaviour)

(১) সহজাত আচরণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থাৎ বংশগত এবং জিন নিয়ন্ত্রিত। (২) এই আচরণ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রাণীর জন্য সুনির্দিষ্ট। এটি কোনো ব্যক্তিবিশেষের আচরণ নয়। (৩) জন্মগত হলেও সব সহজাত আচরণ জন্মের সময় থেকে আত্মপ্রকাশ করে না। পরিপক্বতার মধ্য দিয়ে উপযুক্ত সময়ে এসব আচরণের বিকাশ ঘটে। যেমন– পাখির বাসা বাঁধার প্রবৃত্তি বা ডিমে তা দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্মের পরপরই আত্মপ্রকাশ করে না। কিন্তু শিশুর স্তনপানের প্রবৃত্তি জন্মের সময় থেকে প্রকাশিত হয়। (৪) এই আচরণ পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হয় না অর্থাৎ শিক্ষালব্ধ আচরণ নয়। এটা জন্মগত অর্জিত আচরণ। (৫) সহজাত আচরণ বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে। তবে

Scanned with CamScanner

প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সহজাত আচরণকে প্রভাবিত করে। (৬) এই আচরণ প্রাণীর কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে, যদিও সে এর ফলাফল সম্পর্কে পূর্বে জ্ঞাত নয়। (৭) প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজন (যেমন– খাদ্য গ্রহণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন ইত্যাদি) মেটাতে এই আচরণ সহায়তা করে, যা অপেক্ষাকৃত জটিল ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটায়। (৮) এই আচরণের একটি নির্দিষ্ট পরম্পরা বিদ্যমান।

সহজাত আচরণের প্রকারভেদ (Types of Innate behaviour) : সহজাত আচরণের সুনির্দিষ্ট শ্রেণিবিন্যাস করা বেশ জটিল। কারণ বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন ধরনের সহজাত আচরণ পরিলক্ষিত হয়। তবে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে প্রাণীতে নিম্নলিখিত ধরনের সহজাত আচরণ শনাক্ত করেছেন।

১। বিবাদসুলভ (বিগ্রহ) আচরণ (Fighting behaviour) : প্রজনন ঋতুতে জননক্ষেত্র (sexual territory) নির্বাচন ও সঙ্গী নির্বাচনের জন্য একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বিগ্রহ আচরণ দেখা যায়। **মাছ, পাখি ও স্তন্যপায়ী** প্রাণীদের মধ্যে এই আচরণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত পুরুষেরা বিগ্রহে লিপ্ত হয়। তবে অনেক সময় পুরুষ ও স্ত্রী যুগল প্রতিদ্বন্দ্বী যুগলের সঙ্গে বিগ্রহে লিপ্ত হতে দেখা যায়। যেমন– **তিন কাঁটা স্টিকল ব্যাক** মাছ (three spined stickle back fish), গায়ক পাখি (song bird), **সি-গাল** (sea gull), **এন্টিলোপ** (antelope) ইত্যাদি।



স্ত্রী এন্টিলোপের বিগ্রহ আচরণ



পুরুষ *Oryx gazella*-র বিগ্রহ আচরণ

চিত্র ১২.৪ : বিগ্রহ আচরণ



(ক) *Petromyzon*



(খ) ব্যাঙ



(গ) ডুবুরি মাছরাঙা পাখি

চিত্র ১২.৫ : যুগলবন্দি ও মৈথুন আচরণ

২। যুগলবন্দি (প্রণয়) ও সঙ্গম আচরণ (Courtship and mating behaviour) : যৌন প্রজননের মুখ্য শর্ত হলো সঙ্গম। অনেকে সঙ্গমের পূর্বে একই প্রজাতির এক লিঙ্গের প্রাণী অন্য লিঙ্গের প্রাণীকে আকৃষ্ট করার জন্য কিছু আচরণ প্রদর্শন করে, এটাই যুগলবন্দি বা প্রণয় আচরণ (courtship behaviour)। বিভিন্ন প্রাণীতে আকৃষ্ট করার কাজ ভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়। অনেক পুরুষ পাখি স্ত্রীকে আকৃষ্ট করার জন্য সঙ্গম বা **মৈথুন ডাক** (mating call) এর আশ্রয় নেয়। সিগালের নৃত্য, তিন কাঁটা মাছের জিগজাগ নৃত্য (Zig Zag dance), গায়ক পাখির মধুর গান, বকের প্রণয় ডাক (love call), কাঠঠোকরার ঢোলপেটানো ধ্বনি (drumming sound), মাছরাঙার বাসা তৈরির আবর্জনা ঠোঁটে নিয়ে প্রদর্শন ইত্যাদি দূরবর্তী স্ত্রীকে আকৃষ্ট করে। Lepidoptera বর্গের কীটপতঙ্গের স্ত্রী সদস্যের **ঘ্রাণগ্রন্থি** (scent gland) থেকে নিঃসৃত **ফেরোমনের** ঘ্রাণ পুরুষকে আকৃষ্ট করে। প্রণয়ের পর প্রাণীরা সঙ্গমে বা যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। পাখিরা দিনে কয়েকবার সঙ্গম করে, তবে এদের সঙ্গমকাল স্বল্পস্থায়ী। স্তন্যপায়ীদের সঙ্গমের হার কম তবে সঙ্গমকাল দীর্ঘস্থায়ী।

৩। বাৎসল্য আচরণ বা অপত্যের প্রতি যত্ন (Parental care behaviour) : ডিম ও সন্তানদের লালন-পালনের জন্য পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ই যে আচরণ প্রদর্শন করে সেগুলোই বাৎসল্য আচরণ। বিভিন্ন **মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী** প্রাণীতে বিভিন্নভাবে এই আচরণ প্রদর্শিত হয়। এই আচরণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো– বাসা তৈরি, ডিমে তা দেওয়া, ডিম বা সন্তানদের দেহে ধারণ করা, বাচ্চা বা ছানার স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত তাদের লালন-পালন করা।



(ক) *Tilapia*



(খ) *Galeichthys*

চিত্র ১২.৬ : মাছের মুখগহ্বরে ডিম সংরক্ষণ (বাৎসল্য আচরণ)

Scanned with CamScanner

৪। অভিপ্রয়াণ আচরণ (Migration/Migratory behaviour) : জৈবিক প্রয়োজনে (যেমন– খাদ্যের জন্য, প্রজননের জন্য ইত্যাদি) প্রাণীর এক স্থান থেকে অন্যত্র গমনকেই অভিপ্রয়াণ আচরণ বলা হয়। মাছ ও **পাখির** মধ্যে এ জাতীয় আচরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। **স্যামন, ঈল, হেরিং, ইলিশ** প্রভৃতি মাছ ডিম ছাড়ার জন্য এক স্থান থেকে বহুদূর গমন করে। বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু মাছ, যেমন– ইলিশ, স্যামন ইত্যাদি লোনা পানি থেকে স্বাদু পানি (anadromus) এবং ঈল স্বাদু পানি থেকে লোনা পানিতে (catadromous) গমনাগমন করে। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে, পাখির মধ্যে Golden Plover, Storks ইত্যাদি তাদের প্রজনন ঋতুতে ৬,০০০ মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করে থাকে।

৫। খাদ্যান্বেষণ আচরণ (Food seeking behaviour or Foraging behaviour) : খাদ্যান্বেষণ প্রাণীদের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কোনো একটি প্রাণী সব ধরনের খাবার খায় না, বরং খাবারের ব্যাপারে প্রতিটি প্রাণীর একটি নির্দিষ্ট পছন্দ আছে। একই পরিবেশে বসবাসকারী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অনেক প্রজাতির খাদ্যের প্রকৃতিও ভিন্ন হতে পারে। যেমন– একই গাছে বসে থাকা কাক আবর্জনা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে; টিয়া পাখি ফল খায়। আবার শালিক মাটি থেকে পোকা খেয়ে জীবন ধারণ করে। পরিবেশে পছন্দনীয় খাদ্যের অভাব ঘটলে প্রাণীরা তার কাঙ্ক্ষিত খাদ্য অন্বেষণ করে বেড়ায়। পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই আচরণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

৬। পলায়ন আচরণ (Escape behaviour) : শিকারজীবী (predator) প্রাণীদের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক প্রাণীর মধ্যে পলায়ন প্রবৃত্তি বা আচরণ দেখা যায়। আত্মগোপন (কাঠঠোকরা), দ্রুত দৌড়ে পলায়ন, বর্ণের পরিবর্তন (mimicry, গিরগিটি) ইত্যাদি আচরণ প্রদর্শন করে প্রাণীরা আত্মরক্ষা করে থাকে।

৭। নিদ্রামগ্ন আচরণ (Sleeping behaviour) : প্রাণীরা সর্বদা সক্রিয় থাকে না, তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। এ জন্য অনেক প্রাণীকে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। আবার অনেক প্রাণী প্রতিকূল আবহাওয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রায় যায়। যেমন– শীতকালে অনেক উভচর, সরীসৃপ **শীতনিদ্রায়** (hibernation) যায়। আবার গ্রীষ্মকালে অনেক প্রাণী, যেমন– লাংফিস (lung fish), কীটপতঙ্গ, কেঁচো **গ্রীষ্মনিদ্রায়** (aestivation) সময় কাটায়।

৮। সঞ্চয়ী আচরণ বা সঞ্চয় স্বভাব (Hoarding behaviour) : অনেক প্রাণীকে ভবিষ্যতের জন্য তাদের আবাসস্থলে বা অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে খাদ্যসামগ্রী মজুদ বা সঞ্চয় করতে দেখা যায়। এই স্বভাবকেই সঞ্চয়ী আচরণ বলা হয়। যেমন– পিঁপড়া, মৌমাছি ও অন্যান্য কিছু প্রজাতির কীটপতঙ্গ, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি ইত্যাদির মধ্যে এই আচরণ পরিলক্ষিত হয়। অনেক বিজ্ঞানী এ ধরনের আচরণকে শিক্ষালব্ধ আচরণ (learned behaviour) বলে মনে করেন। কিন্তু Morgan *et al.* (১৯৪৭) একে সহজাত আচরণ (instinctive behaviour) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

❐ **কাজ :** তোমাদের আশপাশের বিভিন্ন প্রাণীর আচরণ গভীরভাবে লক্ষ কর এবং প্রাণীদের আচরণের একটি ছক তৈরি করে শিক্ষককে দেখাও।

সহজাত আচরণের উদাহরণ (ট্যাক্সিস, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, সহজাত আবেগ)

চলন আচরণ বা ট্যাক্সিস (Taxis)

ট্যাক্সিস (বহুবচনে, Taxes) এক ধরনের **ওরিয়েন্টেশন** (orientation), যা উদ্দীপকের (stimulus) নির্দেশ অনুযায়ী ঘটে। **অর্থাৎ উদ্দীপকের উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দেহের অক্ষের অবস্থানগত পরিবর্তনই হলো ট্যাক্সিস বা চলন।** প্রাণীদের চলাচলজনিত আচরণকেই ট্যাক্সিস বলা হয়। কিছু উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে প্রাণীদের ট্যাক্সিস ঘটে। যেমন- Beach fleas নামক Amphipod Crustacea দের সমুদ্র থেকে শুষ্কস্থানে নিয়ে এলে এরা এদের মাথা সরাসরি সাগরের দিকে মুখ করে অবস্থান নেয়। আর্দ্রতা ও সূর্যের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এগুলো সমুদ্রাভিমুখে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করে।

অন্যভাবে বলা যায়, **উদ্দীপনার প্রভাবে কোনো বাহ্যিক লক্ষ সংক্রান্ত বা গতিপথ সংক্রান্ত** (directional) **জীবদেহের সামগ্রিক চলনই হলো ট্যাক্সিস।** অর্থাৎ ট্যাক্সিস হলো উদ্দীপকের প্রভাবে জীবের অবিরত সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত স্থানিক চলন বা ওরিয়েন্টেশন। ট্যাক্সিসের প্রধান শর্ত হলো **প্রাণীর স্থান পরিবর্তন**। Tinbergen (1951), Herter (1927), Cellyot (1936) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ প্রাণীর ট্যাক্সিস নিয়ে গবেষণা করেছেন।

ট্যাক্সিসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Taxis)

(১) ট্যাক্সিস সর্বদা বাহ্যিক উদ্দীপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। (২) এটি সহজাত আচরণ। (৩) জীব অপরিবর্তনীয় সাড়া প্রদান করে। (৪) প্রাণীর দেহের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে শুধু উদ্দীপকের উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে। (৫) প্রাণীর সমগ্র দেহের ওরিয়েন্টেশন ঘটে। (৬) উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া পজেটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে। (৭) শুধু চলনশীল জীবের ক্ষেত্রে এটি ঘটে থাকে এবং জীব নিজে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

Scanned with CamScanner

ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ (Kinds of Taxis)

(ক) উদ্দীপক ও গ্রাহক অঙ্গের (receptors) সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে ট্যাক্সিসকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়–

১। ট্রোপোট্যাক্সিস (Tropotaxis) : কোনো প্রাণীর একাধিক রিসেপ্টর যখন কোনো উদ্দীপকের উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং একই সঙ্গে ভারসাম্যমূলক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে **ট্রোপোট্যাক্সিস** বলে।

যেমন– Crustacea শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত *Armadillium* নামক পোকার ওপর ফটোট্রোপোট্যাকটিক (phototropotactic) গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, এদের যেকোনো একপাশের চোখ অন্ধ করে দিলে এরা ভারসাম্য হারিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। অথবা, ক্ষুধার্ত *Planaria* খাদ্যের ঘ্রাণবাহী পানি স্রোতের প্রতি ধনাত্মক ট্রোপোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে। অপরপক্ষে, পরিতৃপ্ত অবস্থায় এরা আলোক উৎস থেকে পালিয়ে পাথরের নিচে বা গাছের গুঁড়ির নিচে লুকায়, অর্থাৎ ঋণাত্মক ট্রোপোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

২। টেলোট্যাক্সিস (Telotaxis) : যখন কোনো প্রাণী তার গ্রাহক অঙ্গের (receptor) মাধ্যমে একাধিক উদ্দীপকের মধ্য থেকে যেকোনো একটির দিকে ধাবিত হয় তখন তাকে **টেলোট্যাক্সিস** বলে।

যেমন– সন্ন্যাসী কাঁকড়াকে (Hermit crab) দুটি আলোক উৎস (মৃদু ও উজ্জ্বল) দ্বারা উদ্দীপিত করলে এরা সর্বদাই একটি উৎসের দিকে অর্থাৎ উজ্জ্বল আলোর দিকে গমন করে। কখনো মধ্যবর্তী পথে অগ্রসর হয় না।

৩। ক্লিনোট্যাক্সিস (Klinotaxis) : কোনো প্রাণী যখন একটি বিশেষ গ্রাহক অঙ্গের (receptor organ) দ্বারা একাধিক উদ্দীপকের তীব্রতার তুলনা করে উদ্দীপ্ত হয় এবং গমন করে তখন তাকে ক্লিনোট্যাক্সিস বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রাণী তার সংবেদী অঙ্গের (receptor) দ্বারা সবদিকের উদ্দীপনা সমানভাবে গ্রহণ না করে গ্রাহক অঙ্গ এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে তীব্রতার মধ্যে তুলনা করে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে এই তুলনার মাধ্যমেই প্রাণী স্থানান্তরিত হতে থাকে। যেমন– *Musca, Calliphora, Lucilia* ইত্যাদি মাছির ম্যাগোট (Maggot) পিউপা দশায় পদার্পণের পূর্বে আলোর প্রতি এরূপ ওরিয়েন্টেশন দেখায়।

৪। মেনোট্যাক্সিস (Menotaxis) : উদ্দীপকের উৎসের গতিপথের সাথে নির্দিষ্ট কৌণিক দূরত্ব বজায় রেখে যখন প্রাণী উৎসের দিকে এগিয়ে চলে, তখন তাকে **মেনোট্যাক্সিস** বলে। যেমন– মৌমাছি, পিঁপড়া ইত্যাদি পতঙ্গের গৃহে প্রত্যাবর্তনের (home ward) জন্য আলোর দিকদর্শন প্রতিক্রিয়া (light compass reaction)।

৫। নেমোট্যাক্সিস (Nemotaxis) : প্রাণীরা অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে স্মৃতির ওপর নির্ভর করে যে ওরিয়েন্টেশন ঘটায় তাকে **নেমোট্যাক্সিস** বলে। যেমন– পিপীলিকা, *Neomys fodiens* নামক জলজ প্রাণী ইত্যাদির বাসায় ফেরা। উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যায়, শিশুরা কবিতা বা ছড়া আবৃতির সময় হঠাৎ কোনো অংশ ভুলে গেলে কয়েক লাইন পূর্ব থেকে শুরু করে ভুলে যাওয়া অংশ স্মৃতিতে নিয়ে আবৃতি শেষ করে।

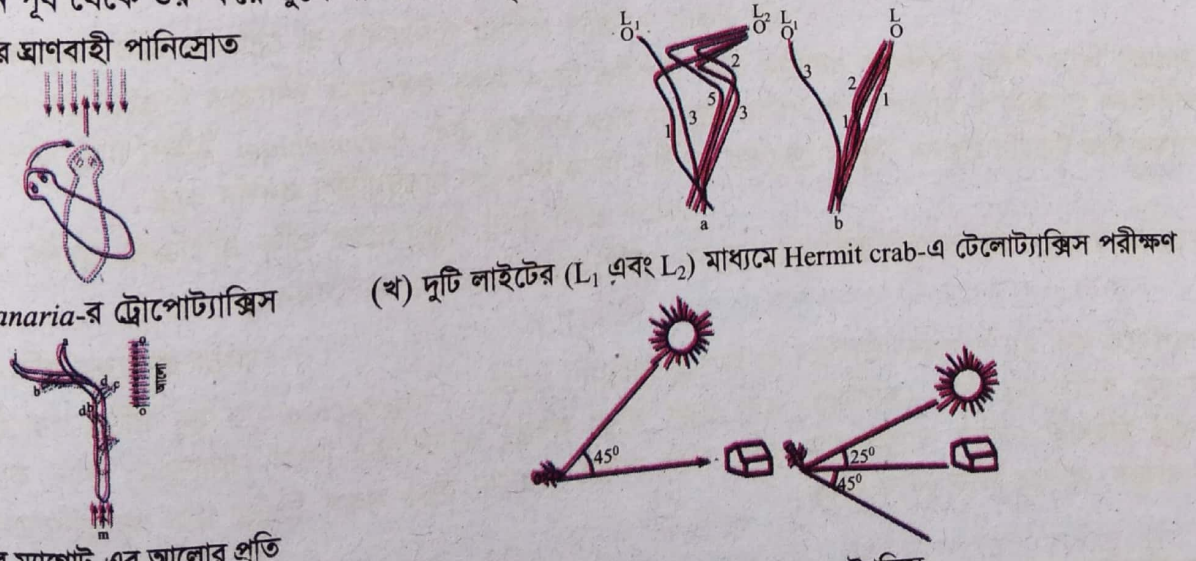

চিত্র ১২.৭ : বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সিস

Scanned with CamScanner

(খ) উদ্দীপকের ধরন বা উদ্দীপনার উৎসের ওপর নির্ভর করে ট্যাক্সিসকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়–

১। **ফটোট্যাক্সিস** (Phototaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা আলোক উৎসের প্রতি সাড়া প্রদর্শন করে। অর্থাৎ আলোক উৎসের প্রতি প্রাণীর আকর্ষণ (ধনাত্মক) বা বিকর্ষণকে (ঋণাত্মক) বোঝায়। যেমন– *Paramecium*, মাছি, উইপোকা, *Euglena* ইত্যাদিতে ধনাত্মক ফটোট্যাক্সিস এবং কেঁচো, তেলাপোকা, *Planaria*, ইত্যাদিতে ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিস লক্ষ করা যায়।

২। **থার্মোট্যাক্সিস** (Thermotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা তাপীয় উদ্দীপনার প্রতি সাড়া প্রদর্শন করে থাকে। যেমন– *Amoeba, Euglena, Paramecium* ইত্যাদি প্রাণী অধিক তাপমাত্রায় (২০-২৮°C-এর বেশি) ঋণাত্মক থার্মোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে। এটি ছাড়াও মানুষের দিকে ছারপোকার গমন ধনাত্মক থার্মোট্যাক্সিস এবং কুনোব্যাঙের শীতনিদ্রায় গমন ঋণাত্মক থার্মোট্যাক্সিসের অন্তর্ভুক্ত।

৩। **কেমোট্যাক্সিস** (Chemotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি সাড়া প্রদর্শন করে থাকে। যেমন– *Amoeba* গাঢ় ক্ষার দ্রবণ ও চিনি দ্রবণে এবং *Paramecium* বেশিরভাগ রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি ঋণাত্মক কেমোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে, কিন্তু হালকা অম্ল স্বাদযুক্ত পদার্থের প্রতি ধনাত্মক কেমোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

৪। **অ্যারোট্যাক্সিস** (Aerotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা অক্সিজেনের ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে সাড়া দেয়।

৫। **এনার্জি ট্যাক্সিস** (Energy taxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা কোষের অন্তঃস্থ শক্তির অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ বিপাকীয় কাজের দিকে সাড়া দেয়।

৬। **থিগমোট্যাক্সিস** (Thigmotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে কোনো প্রাণী তার স্বাভাবিক চলার পথে স্পর্শ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় অর্থাৎ স্পর্শানুভূতির প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। যেমন– *Paramecium* চলার পথে কোনো কঠিন বস্তুর সংস্পর্শে এলে সে প্রথমে থেমে যায় তারপর গতিপথ পরিবর্তন করে ঋণাত্মক থিগমোট্যাক্সিস দেখায়। মানুষের ক্ষেত্রে নারী পুরুষকে স্পর্শ করলে ধনাত্মক এবং বিদ্যুৎ স্পর্শ করলে ঋণাত্মক থিগমোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

৭। **হাইড্রোট্যাক্সিস** (Hydrotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণী পানি বা আর্দ্রতার প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। যেমন– কেঁচো সর্বদা আর্দ্র মাটির দিকে গমন করে।

৮। **জিওট্যাক্সিস বা গ্র্যাভিট্যাক্সিস** (Geotaxis or Gravitaxis) : কোনো প্রাণীর মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রতি সাড়া প্রদর্শনকে জিওট্যাক্সিস বা গ্র্যাভিট্যাক্সিস বলা হয়। এই বলের দিকে ও বিপরীতের ট্যাক্সিসকে যথাক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক জিওট্যাক্সিস বলা হয়। যেমন– Catterpilar-এর লার্ভা খাদ্যের সন্ধানে গাছের উপরের দিকে এবং পিউপা তৈরির প্রাক্কালে নিচের দিকে নেমে যথাক্রমে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক জিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে। *Paramecium* ও জিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

৯। **রিওট্যাক্সিস** (Rheotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা পানিপ্রবাহ বা স্রোতের প্রতি সাড়া প্রদর্শন করে। স্রোতের দিকে সাড়া প্রদর্শনকে ধনাত্মক এবং বিপরীত দিকে সাড়া প্রদর্শনকে ঋণাত্মক রিওট্যাক্সিস বলে। যেমন– অধিকাংশ প্ল্যাঙ্কটন ও মাছের পোনা পানির স্রোতের সঙ্গে ধনাত্মক এবং *Paramecium*, ইলিশ মাছ, কার্পজাতীয় মাছ, স্যামন মাছ ইত্যাদি প্রজনন ঋতুতে স্রোতের বিপরীত দিকে ঋণাত্মক রিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

১০। **অ্যানিমোট্যাক্সিস** (Anemotaxis) : কোনো প্রাণী যখন বায়ুপ্রবাহের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে চলাচল করে তখন তাকে **অ্যানিমোট্যাক্সিস** বলে। যেমন– পাখি, পতঙ্গ ইত্যাদির গমনাগমন।

১১। **গ্যালভানোট্যাক্সিস বা ইলেক্ট্রোট্যাক্সিস** (Galvanotaxis or Electrotaxix) : তড়িৎ প্রবাহের প্রতি প্রাণীর সাড়া প্রদর্শনকে বলা হয় গ্যালভানোট্যাক্সিস বা ইলেক্ট্রোট্যাক্সিস। যেমন– *Paramecium*-কে মৃদু তড়িৎ প্রবাহের আওতায় আনলে ক্যাথোডের দিকে (ঋণাত্মক) এবং প্রবল তড়িৎ প্রবাহে অ্যানোডের দিকে (ধনাত্মক) গমন করে। আবার, চিংড়ি মাছধারী কোনো অ্যাকুরিয়ামে দুর্বল তড়িৎ প্রবাহ চালানো হলে সকল চিংড়ি মাছ অ্যাকুরিয়ামের অ্যানোড (ধনাত্মক) প্রান্তের দিকে ছুটতে থাকে।

১২। **জিওম্যাগনোট্যাক্সিস** (Geomagnotaxis) : যখন কোনো প্রাণী পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে চলাচল করে তখন তাকে **জিওম্যাগনোট্যাক্সিস** বলা হয়। যেমন– পাখির **অভিপ্রয়াণ** (migration) সঠিক পথে চলতে এই উদ্দীপনা কাজ করে থাকে।

Scanned with CamScanner

১৩। ফনোট্যাক্সিস (Phonotaxis) : যখন কোনো প্রাণী শব্দের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে চলাচল করে তখন তাকে ফনোট্যাক্সিস বলে। পানিতে শব্দ সৃষ্টি করলে কিছু মাছ ধনাত্মক আবার কিছু মাছ ঋণাত্মক ফনোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

১৪। স্টেরোট্যাক্সিস (Sterotaxis) : কোনো প্রাণীর সমতল ও মসৃণতলে সাড়া প্রদান করে চলাচলকে বলা হয় স্টেরোট্যাক্সিস। যেমন– ইঁদুর, টিকটিকি ইত্যাদি প্রাণী মসৃণ প্রাচীরের কিংবা ছাদের সিলিং বেয়ে চলতে পারে। এরূপ চলাচলকে ধনাত্মক স্টেরোট্যাক্সিস বলে।

১৫। সাপেক্ষ ট্যাক্সিস (Conditional taxis) : একই সময়ে যখন কোনো প্রাণী দুই বা ততোধিক ট্যাক্সিস প্রদর্শন করে তখন তাকে **সাপেক্ষ ট্যাক্সিস** বলে। যেমন– কিছু প্রজাপতি ডিম পাড়ার জন্য বিশেষ উদ্ভিদের গন্ধ ও সবুজ পাতার দিকে গমন করে।

১৬। হেলিওট্যাক্সিস (Heliotaxis) : যখন কোনো প্রাণী আলোর উৎস হতে দূরে যায় না কিন্তু ছায়া পছন্দ করে, তখন তাদের এরূপ আচরণকে **হেলিওট্যাক্সিস** বলে।

ট্যাক্সিসের গুরুত্ব (Importance of Taxis) : ট্যাক্সিস প্রাণীদের এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় এবং সরল অভিযোজনিক আচরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ট্যাক্সিস **পজেটিভ** (ধনাত্মক) বা নেগেটিভ (ঋণাত্মক) হতে পারে। যেমন– প্রজাপতির দিকমুখিতা ও চলন শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। পিঁপড়া ও পাখির বাসায় ফেরার বিষয়টি ট্যাক্সিসের নিয়মে পরিচালিত হয় এবং ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিসের ফলে মাছির লার্ভা অন্ধকার কোণে পিউপায় রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায়। এক কথায় বলতে গেলে, উদ্দীপনায় যথাসময়ে সঠিক সাড়া দিয়ে প্রাণী বংশবৃদ্ধি থেকে শুরু করে নীড় নির্মাণ, অপত্য যত্ন, আহার সংগ্রহ, শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে নির্বংশ হওয়া থেকে টিকে থাকে। অর্থাৎ এ ধরনের আচরণ প্রাণীদের টিকে থাকতে বা অভিযোজিত হতে সহায়তা করে।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflexes)

বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ আকস্মিক উদ্দীপনায় (সংজ্ঞাবহ) প্রাণিদেহে যে দ্রুত, স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) **ও অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (reflexes) **বলা হয়**। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয় এমন স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংক্রিয় ও যান্ত্রিক সাড়া প্রদানকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে। বিজ্ঞানী **Sherrington** (১৭৮৯) সর্বপ্রথম প্রতিবর্তী ক্রিয়া নামটি প্রবর্তন করেন। স্নায়ুতন্ত্রের অধিকাংশ কর্মকাণ্ডই সাধারণত **মস্তিষ্ক** (brain) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে এ ধরনের ক্রিয়া মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণ–

১। চোখে কোনো কিছু পড়লে আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া।
২। খাদ্যদ্রব্যের ঘ্রাণে লালা ক্ষরণ হওয়া।
৩। হঠাৎ তীব্র আলোয় চোখের পিউপিল ছোট হয়ে আসা।
৪। হঠাৎ পায়ে কাঁটা ফুটলে পা-টি তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নেওয়া।
৫। দেহের কোন অংশ কোনো গরম বস্তুর নিকটে গেলে যেমন– জ্বলন্ত আগুনের নিকটে হাত বা পা চলে গেলে হাত বা পা টি তাৎক্ষণিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগুনের শিখা থেকে দূরে সরে যায়।
৬। ঘুমন্ত অবস্থায় হাতের ওপর মশা কামড়ালে হাত সরে আসা ইত্যাদি।



চিত্র ১২.৮ : হঠাৎ তাপের সংস্পর্শে পা সরানোর দৃশ্য

উল্লেখ্য যে, বেশিরভাগ প্রতিবর্তী ক্রিয়া সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও, কিছু কিছু জটিল প্রতিবর্তী ক্রিয়া কেবল **সুষুম্নাকাণ্ড** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে **মস্তিষ্কের** সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন– সাইকেল চালানো, সার্কাসে দড়ির উপর খেলা দেখানো ইত্যাদি।

প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Reflexes)

(১) সাধারণত অধিকাংশ প্রতিবর্তী ক্রিয়াই সরল প্রকৃতির কারণ একটি উদ্দীপকের প্রয়োগ দ্বারা মাত্র একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে। (২) সংবেদনমূলক উদ্দীপকের মাধ্যমে এ ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। (৩) এই ক্রিয়া অনৈচ্ছিক, **স্বয়ংক্রিয়** (automatic), **স্বতঃস্ফূর্ত** এবং **সহজাত** (innate) বা জন্মগত, শিক্ষালব্ধ (instactive) নয়। (৪) এই ক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হয় অর্থাৎ সংবেদনের সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়া বা দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (৫) এই ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষাসহ অন্যান্য কাজে (আকস্মিক দুর্ঘটনা, মস্তিষ্কের অতিরিক্ত কাজের চাপ ইত্যাদি) সহায়ক ভূমিকা পালন করে। (৬) উদ্দীপক দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। (৭) এই ক্রিয়া সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না। (৮) এর পিছনে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না।

Scanned with CamScanner

প্রতিবর্তী ক্রিয়া সংঘটন প্রক্রিয়া (Process of Reflexes)

যে স্নায়ুপথে প্রতিবর্তী ক্রিয়ার স্নায়ুর উদ্দীপনা আবর্তিত হয় বা ঘটে তাকে **প্রতিবর্ত চক্র** বা **প্রতিবর্ত চাপ** (reflex arc) বলে। প্রতিবর্তী চক্রের অংশগুলো হলো–

১। **গ্রাহক** (Receptor) : এটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার জন্য পরিবেশ হতে আগত সংবেদী উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এর সঙ্গে একটি সংবেদী স্নায়ু যুক্ত থাকে।

২। **অন্তর্বাহী পথ** (Afferent path) : এটি একটি সংবেদী স্নায়ু (sensory nerve) এর মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রাহক অঙ্গ (receptor) থেকে **স্নায়ুকেন্দ্রে** বা **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে** (central nervous system) পৌঁছায়।

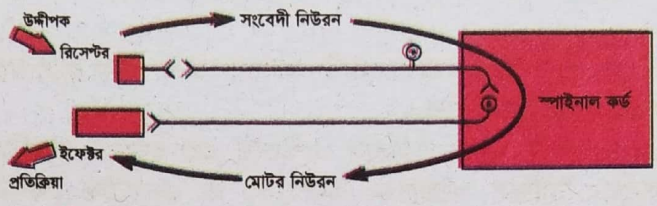

চিত্র ১২.৯ : মনোসিনাপটিক প্রতিবর্ত চক্রের উপাদান

৩। **স্নায়ুকেন্দ্র** (Nerve center) : এটি প্রকৃতপক্ষে সুষুম্নাকাণ্ডের **গ্রে-ম্যাটারে** অবস্থিত একটি সাইন্যাপস (synaps) যার মাধ্যমে অন্তর্বাহী স্নায়ু উদ্দীপনা (অর্থাৎ সংবেদী উদ্দীপনা) মোটর নিউরনে পরিবাহিত হয়ে চেষ্টীয় (motor) উদ্দীপনায় রূপান্তরিত হয়।

৪। **বহির্বাহী পথ** (Efferent path) : এটি একটি চেষ্টীয় স্নায়ু (motor nerve)। এর মাধ্যমে বহির্গামী স্নায়ু উদ্দীপনা (চেষ্টীয় উদ্দীপনা) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে **প্রভাবিত অঙ্গে** (effector) প্রেরিত হয় বা পৌঁছায়।

৫। **প্রভাবিত অঙ্গ** (Effector) : এই স্থানে স্নায়ু-উদ্দীপনা সমাপ্ত হয়। এটি একটি পেশি বা গ্রন্থি হতে পারে, যা সংকোচন বা নিঃসরণের মাধ্যমে প্রতিবর্তী ক্রিয়ার প্রভাব প্রদর্শন করে।

প্রতিবর্তী ক্রিয়ার পরীক্ষা (Experiment of Reflexes)

প্রতিবর্তী ক্রিয়ার স্নায়ুপ্রবাহ কীভাবে ঘটে তা একটি পরীক্ষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো। হঠাৎ জ্বলন্ত কাঠিতে হাত দেওয়া হলে হাতটি তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত কাঠি থেকে সরে যায়। হাতের ত্বকে অবস্থিত গ্রাহক (receptors) কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে সংবেদী স্নায়ুর (sensory nerve) মাধ্যমে স্নায়ু সংবেদনকে সুষুম্নাকাণ্ডে (spinal cord) প্রেরণ করে। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে সাড়া (response) চেষ্টীয় স্নায়ুর (motor nerve) মাধ্যমে হাতের ফ্লেক্সর (flexor) পেশিগুলোতে পৌঁছালে তারা উদ্দীপিত ও সংকুচিত হয়। ফলে হাতটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরে আসে।



চিত্র ১২.১০ : প্রতিবর্তী ক্রিয়া সংঘটন।

প্রতিবর্তী ক্রিয়ার প্রকারভেদ (Classification of Reflexes) : প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে ভাগ করা যায়–

(ক) সহজাত বা অনপেক্ষ বা সরল প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Unconditional or Inborn or Simple Reflexes) : যেসব প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত, স্থির এবং কোনো শর্তাধীন নয় তাদের সহজাত বা অনপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

উদাহরণ : (১) খাদ্যের গন্ধে বা দর্শনে লালা নিঃসরণ হওয়া। (২) শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্তনপান। (৩) উজ্জ্বল আলোতে তারা রন্ধ্রের সংকোচন। (৪) হঠাৎ পায়ে কাঁটা বিঁধলে সঙ্গে সঙ্গে পায়ের পাতা মাটি থেকে তুলে নেওয়া ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

সহজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়ার প্রকারভেদ (Types of Unconditional Reflexes)

(a) **সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনার উৎপত্তি অনুসারে সহজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়া ৩ ধরনের।** যথা–

১। **সুপারফিসিয়াল বা উপরিগত প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (Superficial reflex) : এক্ষেত্রে উদ্দীপনা ত্বক বা চামড়া থেকে গৃহীত হয় (চিত্র ১২.৮)। যেমন– প্লান্টার রিফ্লেক্স (planter reflex)।

২। **ডিপ বা গভীর প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (Deep reflex) : এক্ষেত্রে উদ্দীপনা গভীরে কন্ডরা বা টেন্ডন থেকে গৃহীত হয়। ফলে কন্ডরা সংলগ্ন পেশিটি সংকুচিত হয়। যেমন– হাঁটু ঝাঁকুনি (knee jerk)।

ডিপ বা গভীর প্রতিবর্তী ক্রিয়ার কার্যপদ্ধতি : হাতুড়ি বা হেমার দিয়ে হাঁটুর নিচে কোয়াড্রিসেপস পেশির টেন্ডনে আঘাত করতে হয়। এখান থেকে উদ্দীপনা সংবেদী স্নায়ুর মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছায়। সুষুম্নাকাণ্ড চেষ্টীয় স্নায়ুর মাধ্যমে কোয়াড্রিসেপস পেশিতে সংকোচনের জন্য নির্দেশ পাঠায়, ফলে পায়ের সামনের দিকে প্রসারণ হয়। একেই হাঁটু ঝাঁকুনি (knee jerk) বলে। হাঁটুর পেশি স্পিন্ডল থেকে উদ্দীপনা অন্তর্মুখী নিউরন (afferent neuron)-এর মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছায়। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে চেষ্টীয় নির্দেশ বহির্মুখী নিউরনের (efferent neuron) মাধ্যমে পেশিতে পৌঁছায়। এর ফলে পেশি সংকুচিত হয়।



চিত্র ১২.১১: উপরিগত প্রতিবর্ত বা প্লান্টার রিফ্লেক্স

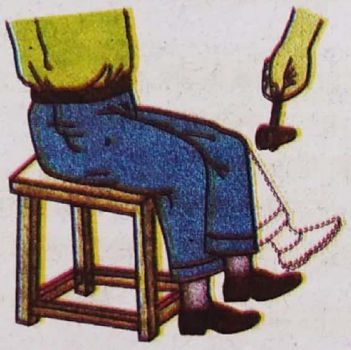

চিত্র ১২.১২ : হাঁটু ঝাঁকুনি

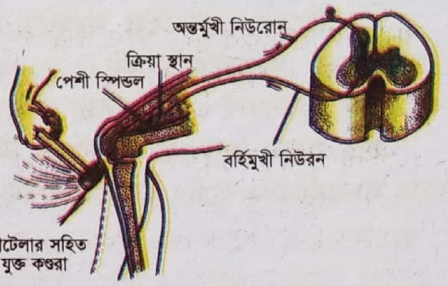

চিত্র ১২.১৩ : হাঁটু ঝাঁকুনির পথ

৩। **ভিসেরাল বা আন্তঃযন্ত্রীয় প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (Viseral reflex) : এ ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় এবং দেহস্থ আন্তঃযন্ত্রসমূহ থেকে উৎপন্ন হয়। যেমন– ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড মূত্রাশয়, পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদির প্রতিবর্তী ক্রিয়া।

(b) **প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সংঘটনের পথে সাইন্যাপসের সংখ্যানুযায়ী সহজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়া ২ ধরনের।** যথা–

১। **মনোসাইন্যাপটিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (Monosynaptic reflexes) : প্রতিবর্ত সংঘটন পথে একটি সাইন্যাপস থাকে। যেমন– অ্যাঙ্কলের (ankle) ঝাঁকুনি।

২। **পলিসাইন্যাপটিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (Polysynaptic reflexes) : প্রতিবর্ত সংঘটন পথে একাধিক সাইন্যাপস থাকে। যেমন– গরম পাত্রে হাত লাগলে দ্রুততার সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে হাত অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরে যায়।

(খ) অর্জিত বা সাপেক্ষ বা জটিল প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Acquired or Conditioned or Complex Reflexes) : যেসব প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত নয়, বার বার অনুশীলনের ফলে অর্জিত হয় এবং শর্তসাপেক্ষ, তাদের **অর্জিত বা সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া** বলে। **উদাহরণ**– পরিচিত টক খাবারের কথা শুনলে মুখে লালা আসে; কিন্তু অপরিচিত টক খাবার দেখলেও লালা আসে না।

অর্জিত প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Acquired Reflexes)

(১) এটি অর্জিত। (২) এটি পূর্বের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। (৩) এটি স্থায়ী হতে পারে আবার অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। (৪) এটি বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয় না। (৫) এই প্রকার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার জন্য সেরিব্রাম ও গুরুমস্তিষ্কের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন, অর্থাৎ এই প্রকার প্রতিবর্তী ক্রিয়া জটিল। (৬) সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া প্রাথমিকভাবে কোনো অনপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল।

(গ) ক্রমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Chained Reflexes) : একাধিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া যখন পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয়ে একটি সরল প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয় আবার তৃতীয় আর একটি সরল প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সৃষ্টি করে তখন এরকম জটিল ক্রিয়াকে ক্রমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলা হয়। যেমন– কোনো কিছুর ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে লাগাতে ভীষণ হাঁচি শুরু হয়ে যায় এবং হাঁচি দিতে দিতে চোখে পানি এসে যায়।

❑ **কাজ :** প্রতিবর্তী ক্রিয়া কোন ধরনের আচরণ? ব্যাখ্যা কর।

Scanned with CamScanner

সহজাত আবেগ বা ইনসটিংক্টস (Instincts)

ল্যাটিন শব্দ *instinctus* থেকে instinct শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ সহজাত ধারণা বা সহজাত আবেগ বা প্রবৃত্তি। আর এই প্রবৃত্তি থেকেই ক্রিয়ার উৎপত্তি। কোনো একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রাণী কোনো রকম শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে বংশপরম্পরায় একইভাবে যেসব জন্মগত, অপরিবর্তনীয়, আচরণ প্রদর্শন করে অর্থাৎ জন্মগত প্রবৃত্তি প্রকাশ করে তাই **সহজাত আবেগ** বা **সহজাত প্রবৃত্তির** (instinct) অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সহজাত আবেগই হলো সহজাত আচরণ এবং বলা যায়, এরা পরস্পরের সমার্থক শব্দ।

সহজাত আবেগ প্রাণী জন্মসূত্রে পেয়ে থাকে। কারণ প্রতিটি প্রাণীই জন্মের সময় কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) এবং প্রতিবর্তী ক্রিয়ার (reflex action) ক্ষমতা লাভ করে থাকে। যেমন– পাখির বাসা বাঁধার প্রবৃত্তি, মাকড়সার জাল বোনার প্রবৃত্তি, মৌমাছির চাক তৈরির প্রবৃত্তি ইত্যাদি। এর মধ্যে টুনটুনি পাখির বাসা বাঁধা এবং সদ্যোজাত হেরিংগাল ও তার মায়ের মধ্যে পারস্পরিক সাড়া সহজাত আবেগ বা ইনসটিংক্ট এর চমৎকার উদাহরণ।



চিত্র ১২.১৪ : টুনটুনির বাসা তৈরি

বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, সহজাত আবেগ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি, যা নিসর্গ দ্বারা পরিচালিত হয়। Darwin (1859) সর্বপ্রথম সহজাত আবেগের বাস্তবমুখি একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গড়ে উঠা এক জটিল প্রতিবর্তী। Darwin এর মতে উত্তরাধিকার সূত্রের মাধ্যমে আগত সাড়াদানের প্রক্রিয়ায় সহজাত আবেগের প্রকাশ ঘটে।

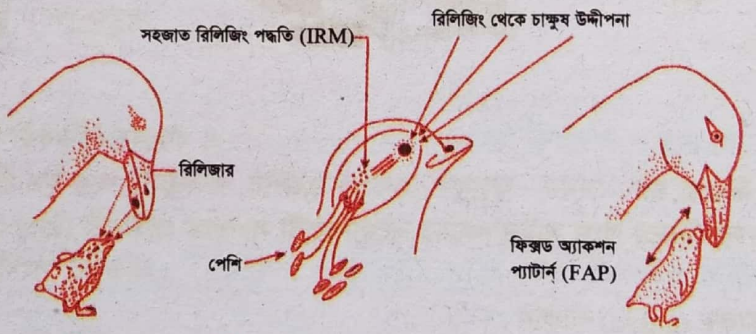

চিত্র ১২.১৫ : রিলিজারের সঙ্গে IRM ও FAP এর সম্পর্ক

Lorenz (1937) ডারউইনের বক্তব্যের সাথে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, প্রত্যেক প্রাণিপ্রজাতির আচরণ কতকগুলো **স্থায়ী অ্যাকশন প্যাটার্ন** (Fixed Action Pattern-FAP) নিয়ে গঠিত। FAP হচ্ছে প্রজাতি-নির্দিষ্ট অথবা জিনগতভাবে নির্ধারিত। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি FAP-ই সহজাত আচরণ এবং প্রাণিদেহে অনেক সহজাত আবেগ কেন্দ্র রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, সদ্যোজাত **হেরিংগাল** ও তার মায়ের মধ্যে প্রদর্শিত সাড়া। ক্ষুধার্ত হেরিংগাল ছানা চাক্ষুষ উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীল। অন্যদিকে, বাসায় ছানার উপস্থিতি পূর্ণাঙ্গ হেরিংগাল-এ চাক্ষুষ উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে। রিলিজিং উদ্দীপনার মাধ্যমে যে বার্তার সৃষ্টি হয় তা অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের একটি কেন্দ্রে বাহিত হয়। এ কেন্দ্রই সুনির্দিষ্ট বার্তার প্রতি নির্দিষ্ট সাড়া দেয়। এ প্রক্রিয়াটি **সহজাত রিলিজিং পদ্ধতি** (Innate Releasing Mechanism-IRM)। IRM নির্দিষ্ট পেশিকে সংকোচন ও প্রসারণের নির্দেশ দেয়। ফলে ছানার ঠোকর পড়ে পূর্ণাঙ্গ হেরিংগালের ঠোঁটে অবস্থিত লাল ফোঁটার ওপর। এটাই হচ্ছে **স্থায়ী অ্যাকশন প্যাটার্ন** (FAP)।

FAP এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of FAP) : Lorenz (1932) প্রদত্ত মানদণ্ড অনুযায়ী একটি FAP কে অবশ্যই নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে।

(১) আচরণে কোনো সময় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না, সব সময় আচরণ একই থাকে। (২) একটি প্রজাতির সকল সদস্যে এ আচরণ প্রদর্শিত হবে। (৩) একটি মাত্র কাজ করে। (৪) পরস্পর পৃথক অবস্থায় থাকলেও প্রজাতির সব সদস্য একই আচরণ প্রকাশ করে। (৫) একবার সাড়া দেওয়া হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও তা পরিবর্তন হয় না।

Scanned with CamScanner

প্রতিবর্তী ক্রিয়া ও সহজাত আচরণের পার্থক্য

প্রতিবর্তী ক্রিয়া	সহজাত আচরণ (সহজাত আবেগ)
১। মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে এ ক্রিয়া মেরুরজ্জু (nerve cord) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।	১। এটি মস্তিষ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
২। এটি সরল প্রকৃতির এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি তাৎক্ষণিক দ্রুতগতিতে সাড়া দেয়।	২। এটি জটিল প্রকৃতির এবং ধীর গতিতে বিকশিত হয়।
৩। এটি অনেকসময় প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা যায়।	৩। এটি কখনোই প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা যায় না।
৪। প্রতিবর্তী ক্রিয়া বুদ্ধিপ্রসূত নয়।	৪। সহজাত আচরণের মধ্যে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট।
৫। প্রতিবর্তী ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এর কাজ সর্বক্ষেত্রে একই রকম এবং এটা অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয় না।	৫। এটি অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়।
৬। প্রতিবর্তী ক্রিয়া আত্মরক্ষামূলক।	৬। এটি আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষামূলক আচরণ।
৭। জৈবনিক সব প্রয়োজন মেটাতে অপরিহার্য নয়।	৭। জৈবনিক সব প্রয়োজন মেটাতে এটি অপরিহার্য।

১২.৩ প্রত্যেক প্রাণীর সহজাত আচরণ যাচাই (Experiment of Innate Behaviour)

বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের সাহায্যে সহজাত আচরণ যাচাই করা যায়। যেমন– পাখির মাইগ্রেশন, মাকড়সার জাল বুনন, বিভিন্ন প্রাণীর অপত্যের প্রতি যত্ন, প্রাণীদের প্রণয় ও সঙ্গম আচরণ, খাদ্যান্বেষণ, বাসা তৈরি করা, খাদ্য মজুদ করা, নৃত্য করা, মৌমাছির চাক তৈরি ইত্যাদি। নিচে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত সহজাত আচরণ যাচাইয়ের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো–

(ক) শীতের পাখির মাইগ্রেশন (Migration of Winter Birds)

ল্যাটিন *migrare* থেকে Migration শব্দটির উৎপত্তি। যার ইংরেজি to travel, বাংলা ভ্রমণ এবং পারিভাষিক অর্থ **অভিপ্রয়াণ** বা **পরিযান**। তবে প্রাণিবিদ্যার ভাষায়, **অভিপ্রয়াণ বলতে লক্ষ্যহীনভাবে দিগ্বিদিক আসা-যাওয়া বা ভ্রমণ করা নয়, বরং খাদ্যগ্রহণ, প্রজনন, উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধান এবং নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে খাদ্যগ্রহণস্থল** (feeding ground) **থেকে প্রজননস্থলে গমন এবং পরবর্তী সময়ে আবার ফিরে আসাকে অভিপ্রয়াণ বা পরিযান বা মাইগ্রেশন** (migration) **বলা হয়**। Nikolsky এর মতে, অভিপ্রয়াণ হলো প্রাচুর্যতার দিকে খাপ খাওয়ানোর একটি পদ্ধতি বা অভিযোজন (migration is an adaptation towards abundance)।

নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর পাখিরা যে গ্রীষ্মীয় বা শীতকালীন আবাসের মধ্যে যাতায়াত অথবা প্রজনন ও বাসা তৈরির স্থল থেকে আহার এবং বিশ্রামস্থলে যাতায়াত করে তাকে পাখির মাইগ্রেশন বা অভিপ্রয়াণ বলে। অর্থাৎ পৃথিবীর আবহাওয়াগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাখিরা পৃথিবীর এক ভৌগোলিক অঞ্চল ছেড়ে অন্য ভৌগোলিক অঞ্চলের অনুকূল পরিবেশে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর পুনরায় পূর্বের স্থানে ফিরে আসার গমনাগমনকে পাখির অভিপ্রয়াণ (migration) বলে।



চিত্র ১২.১৬ : পাখির মাইগ্রেশন

আবহাওয়া ও ঋতুগত পরিবর্তন, তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি, দিন ও রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি, খাদ্যের অভাব, প্রজননগত সমস্যা এবং অন্তঃপ্রজাতিক প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি সমস্যার কারণে নিরাপদ আশ্রয়স্থল, সুবিধাজনক খাদ্যগ্রহণস্থল, প্রজননস্থল, অন্তঃপ্রজাতিক প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানোর জন্য এবং সর্বোপরি উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধানে পাখি অভিপ্রয়াণ বা আসা-যাওয়া করে। পাখির অভিপ্রয়াণ একটি সহজাত আচরণ এবং তা বিস্ময়কর হিসেবে আজও মানুষের মনে বিরাজমান।

অভিপ্রয়াণের কারণ (Causes of Migration)

পাখির অভিপ্রয়াণকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে বিভিন্ন পাখিবিশারদ এ প্রসঙ্গে কতকগুলো কারণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন–

১। পরিবেশীয় উদ্দীপক (Environmental stimuli) : পাখিরা বিভিন্ন কারণে, যেমন– খাদ্যের স্বল্পতা, রাতের তুলনায় দিন ছোট, ঠাণ্ডার তীব্রতা, ঝড়ো আবহাওয়া ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সুবিধাজনক আবাসস্থলের খোঁজে অভিপ্রয়াণ করে।

Scanned with CamScanner

২। জননকোষ ও প্রজনন অঙ্গের উদ্দীপক (Gamete and Gonadial stimuli) : শীতের শেষভাগ ও প্রাক-বসন্তের লম্বা দিনে জননকোষ বর্ধন ও প্রজনন অঙ্গের পরিপক্বতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক পাখির শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন আসে, ফলে পাখি অভিপ্রয়াণে বাধ্য হয়।

৩। হরমোনাল নিঃসরণ (Hormonal secreation) : **থাইরক্সিন হরমোন** (thyroxin hormone), **গোনাডোট্রপিক হরমোন** ইত্যাদি পাখির শারীরিক ও আচরণে অনেক পরিবর্তন আনে যার ফলে পাখি অভিপ্রয়াণ করে।

৪। বিপাকীয় মতবাদ (Metabolic hypothesis) : পাখিরা তাদের দেহে বিপুল পরিমাণ **চর্বি** (fat) সঞ্চিত করে। উক্ত সঞ্চিত চর্বি পাখির বিপাকীয় কার্যকলাপে যে পরিবর্তন আনে তাই পাখিকে অভিপ্রয়াণে বাধ্য করে।

অভিপ্রয়াণের প্রকারভেদ (Types of Migration)

বিভিন্ন পাখিবিশারদের মতে বিভিন্ন কারণে শীতের পাখির অভিপ্রয়াণ বিভিন্ন প্রকারের হয়। যথা–

১। অক্ষাংশাভিমুখ বা উত্তর থেকে দক্ষিণে অভিপ্রয়াণ (Latitudinal migration) : উত্তর থেকে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ থেকে উত্তরে এ ধরনের অভিপ্রয়াণ সংঘটিত হয়। অধিকাংশ পাখিই এই অভিপ্রয়াণ করে থাকে। এটি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় উত্তর গোলার্ধে। উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার অনেক পাখিই শীতকালে বিষুবরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে চলে আসে। যেমন– **গোল্ডেন প্লোভার** (*Pluvialis dominica*), **পেক্টোরাল স্যান্ডপাইপার** (*Calidris melanotos*) ইত্যাদি পাখির অভিপ্রয়াণ।

২। অনুদৈর্ঘ্য বা দ্রাঘিমা বরাবর অভিপ্রয়াণ (Longitudinal migration) : কিছু পাখি পরিবেশের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পেতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে অথবা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অভিপ্রয়াণ করে। ক্যালিফোর্নিয়ার Gull এবং Duck এরূপ অভিপ্রয়াণ করে বা করতে অভ্যস্ত। এরা ছাড়াও **স্টার্লিং** পাখিরা তাদের পূর্ব-ইউরোপ বা এশিয়ার প্রজনন স্থান থেকে আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূল বরাবর চলে আসে। এতে তারা মহাদেশীয় তীব্র শীতকাল এড়িয়ে চলতে পারে।

৩। উঁচু-নিচু অভিপ্রয়াণ (Altitudinal migration) : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত পাহাড়ের চূড়া ও ভূমির মধ্যে পাখির যে গমনাগমন ঘটে তাকে উঁচু-নিচু বা উপর-নিচ অভিপ্রয়াণ বলে। অনেক শীতপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পাহাড়বেষ্টিত এলাকায় শীতকালের শুরুতে পর্বতশৃঙ্গের তাপমাত্রা যখন হ্রাস পায় তখন পাহাড়ে বসবাসকারী অনেক পাখি ক্রমশ নিচের দিকে অর্থাৎ সমভূমিতে নেমে আসে এবং গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে আবার পাহাড়ের উপরে চলে যায়। আর্জেন্টিনার Grebes, Coots, গ্রেট ব্রিটেনের Violet green swallows এবং সাইবেরিয়ার Willow ptarmigan পাখি, হিমালয়ের পাপিয়া পাখি এ ধরনের অভিপ্রয়াণ করে থাকে।

৪। আংশিক অভিপ্রয়াণ (Partial migration) : কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত পাখি প্রজাতির সঙ্গে একই প্রজাতির অন্য অঞ্চলের পাখি এসে যোগ দিলে সেই ভ্রমণকে আংশিক অভিপ্রয়াণ বলে। যেমন– নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের (কানাডা, উত্তর আমেরিকা) লক্ষ্মী প্যাঁচা ও নীলকণ্ঠ উষ্ণ অঞ্চলের (দক্ষিণ আমেরিকা) একই প্রজাতির পাখিদের সাথে যোগ দিতে আংশিক অভিপ্রয়াণ করে থাকে।

৫। ঋতুগত অভিপ্রয়াণ (Seasonal migration) : কিছু কিছু পাখি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের অভিপ্রয়াণ করে। যেমন– ব্রিটেনের Swift, Swallow, Nightingale, Cuckoo ইত্যাদি পাখি Summer visitor। বসন্তকালের শুরুতেই দক্ষিণ অঞ্চলে চলে যায়। অন্যদিকে, Fieldfare, Snow bunting, Redwing ইত্যাদি পাখিগুলো Winter visitor। পাখিগুলো শরৎকালের শুরুতেই উত্তর অঞ্চল থেকে এসে সারা শীতকাল বাইরে কাটায়, বসন্তকালে আবার উত্তরদিকে যাত্রা করে। প্রকৃতির এ অতিথিগুলো প্রাকৃতিক কারণেই বা বেঁচে থাকার তাগিদেই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় আসে এবং নির্দিষ্ট সময় পর আবার ফিরে যায় নিজস্ব আবাসভূমিতে।

৬। ফাঁসাকার অভিপ্রয়াণ (Loop migration) : যখন পাখিরা প্রজনন স্থান এবং শীতকালীন স্থানের মধ্যে এমন দুটি পথে ভ্রমণ করে যে ভ্রমণপথটি একটি ফাঁসের আকার নেয় তখন ওই পরিভ্রমণকে ফাঁসাকার অভিপ্রয়াণ বলে। যেমন– **গোল্ডেন প্লোভার** পাখিদের প্রজনন স্থান হলো আলাস্কা থেকে কানাডা ও বাফিন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত।

অভিপ্রয়াণের সুবিধা (Advantages of Migration)

(১) প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেদের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্ষা করতে অভিপ্রয়াণ সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে। (২) খাদ্যের সংস্থানে সাহায্য করে। (৩) অভিপ্রয়াণের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি যখন দূরে কোনো নতুন পরিবেশে জড়ো হয় তখন তাদের মধ্যে **আন্তঃপ্রজননের** (inter breeding) ফলে জিন বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন প্রকরণের উদ্ভব হয়। (৪) অভিপ্রয়াণ পাখির গোনাডের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (৫) অভিপ্রয়াণ পাখির খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে সাহায্য করে।

Scanned with CamScanner

অভিপ্রয়াণের অসুবিধা (Disadvantages of Migration)

(১) লাখ লাখ পাখি প্রতিবছর অভিপ্রয়াণ করে, কিন্তু সব পাখিই তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারে না। কারণ পথে নানা প্রকার দুর্যোগের কবলে পড়ে অনেক পাখি মৃত্যুবরণ করে। (২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও অনেক পাখি ঘাতকের হাতে মারা পড়ে। তাছাড়া খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অভাবেও অনেক পাখি দুর্বল হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা সহজেই শিকারির শিকারে পরিণত হয়।

পাখির অভিপ্রয়াণের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Significant features of Bird Migration)

(১) পাখি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে অভিপ্রয়াণ সম্পন্ন করে। অর্থাৎ বছরের পর বছর তারা একই সময়ে একই পথে আগমন করে এবং ঠিক একই সময় একই পথে তারা আবার ফিরে যায়। (২) অভিপ্রয়াণের সময় পাখির উড্ডয়ন গতিবেগ এবং দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা একেক প্রজাতিতে একেক রকম। ছোট ডানাবিশিষ্ট পাখি স্বল্প দূরত্ব এবং বড় ডানাবিশিষ্ট পাখি অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে থাকে। (৩) অভিপ্রয়াণের সময় পাখিরা দলবদ্ধভাবে চলাচল করে। (৪) দূরপাল্লার অভিপ্রয়াণের ক্ষেত্রে দেহে সঞ্চিত খাদ্য ও তৈল যথাক্রমে ক্ষুধা নিবারণ ও জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের কয়েকটি শীতকালীন অভিপ্রায়ী বা পরিযায়ী পাখির তালিকা

বাংলাদেশের শীতকালে (নভেম্বর-জানুয়ারি) উত্তর গোলার্ধের দেশগুলো বিশেষ করে উত্তর ইউরোপ, সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, নেপাল প্রভৃতি দেশ থেকে প্রচুর পাখি এসে এখানকার খাল-বিল, ঝিল, হাওর-বাঁওড়, নদ-নদীতে ঘুরে বেড়ায়। সুন্দরবন, দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন হাওর ও বিল, চলন বিল, বরিশালের দূর্গাসাগর হাওর, দিনাজপুরের রামসাগর, চট্টগ্রামের কাপ্তাই হ্রদ, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার বিল, মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওর, রাজশাহীর বাঘার বিভিন্ন দীঘি ও নওটিকা বিল, শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওড়ের বাইক্কা বিল, নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপ প্রভৃতি অভয়াশ্রমে হাজার হাজার অতিথি পাখি এসে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। মিরপুরের সিরামিক লেক, চিড়িয়াখানার লেক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও এর আশপাশের জলাশয়গুলোতে অতিথি পাখিদের ঝাঁক বেঁধে বিচরণের দৃশ্য ও কলকাকলিতে আমরা দারুণভাবে মুগ্ধ হই। অথচ এই অতিথি পাখিগুলোর সঙ্গে আমরা কতই না নিষ্ঠুর আচরণ করি। কখনো ফাঁদ পেতে, আবার কখনো বা বিষটোপ দিয়ে এদের মারার চেষ্টা করি। অথচ বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষায় এদের গুরুত্ব অপরিসীম।

অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেনের মত অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট ৫২৫-৫৫০টি পাখি প্রজাতি আছে। বাংলাদেশে ৫২৫টি পাখি প্রজাতির মধ্যে ৩৮০টি প্রজাতি আবাসিক এবং ১৪৫টি প্রজাতি পরিযায়ী বা মাইগ্রেটরি পাখি। বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়েকটি শীতকালীন পরিযায়ী পাখির নাম দেওয়া হলো–

বৈজ্ঞানিক নাম	লোকাল বা স্থানীয় নাম	ইংরেজি নাম
Ciconia ciconia	সাদা মানিকজোড়	Swinhoe Eastern white Stork
Anser indicus	বার মাথা রাজহাঁস/ বুনো রাজহাঁস	Barheaded Goose
Tadorna ferruginea	চখাচখি	Rudy sheld duck/Brahminy Duck
Anas acuta	লেঞ্জা বা সুচলেজা/বড় ডিগর/শোলন কো	Pin tail
Anas penelope	ছোট লালশির	Wigeon
Aythya fuligula	বামন হাঁস/বামুনিয়া হাঁস	Tufted Duck
Accipiter nisus	চড়ুই হক	Asiatic sparrow Hawk
Porzana porzana	চিত্রা ক্রেক/গুরগুরি/খাইরি	Spotted Crake
Monticola solitarius	নীল পাথুরে থ্রাস	Blue Rock Thrush
Motacilla citreola	হলুদ মাথা খঞ্জনা	Northern yellow headed wagtail
Carpodacus erythrinus	সাধারণ গোলাপি ফিঞ্চ	Common rosefinch
Lanius cristatus	বাদামি কসাই পাখি	Brown shrike


বালুবাটান বা চা-পাখি
(*Tringa stagnatilis*)


লেঞ্জা হাঁস
(*Anas acuta*)


আমেরিকান গোল্ডেন প্লোভার
(*Pliuvialis dominica*)


কাদা খোঁচা
(*Gallinago gallinago*)


সাদা বক
(*Ciconia ciconia*)

চিত্র ১২.১৭ : কতিপয় অভিপ্রয়াণি পাখি

❑ কাজ : (i) পাখিদের পরিযানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। (ii) শীতকালীন পাখিগুলোর আমাদের দেশে আসার কারণ ব্যাখ্যা কর।/পাখিদের পরিযানের কারণ ব্যাখ্যা কর। (iii) অতিথি পাখি সংরক্ষণের করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

Scanned with CamScanner

(খ) মাকড়সার জাল (Spider Web)

মাকড়সা Arthropoda পর্বের Arachnida শ্রেণির অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অনেক প্রজাতির মাকড়সা পোকামাকড় জাতীয় খাদ্য শিকারের জন্য জাল বুনে (spinning web) ফাঁদ পাতে। জাল বোনা মাকড়সার একটি সম্পূর্ণ সহজাত (instinctive) প্রক্রিয়া। মাকড়সার জাল বুনতে আধঘণ্টারও কম সময় লাগে। মাঠে যেসব মাকড়সা বাস করে তাদের অধিকাংশ ভোরে সূর্যোদয়ের সময় জাল বোনে। মাকড়সার স্বল্প দৈর্ঘ্যের জীবনে কখনোই এই জটিল বুনন শেখার সময় হয়ে ওঠে না। জাল তৈরি হচ্ছে স্বভাবগত বা স্বভাবসিদ্ধ আচরণের (innate behaviour) উদাহরণ, যাকে **নির্ধারিত ক্রিয়াধারা** (Fixed Action Pattern, FAP) বলে। একবার আরম্ভ হওয়া নির্ধারিত ক্রিয়াধারা বাধাগ্রস্ত করা সম্ভব নয়। নির্ধারিত এ ক্রিয়াধারা হচ্ছে এমন সহজাত প্রতিক্রিয়া, যা পরিবেশ কর্তৃক প্রভাবিত হয় না, এমনকি পরিবর্তনও করা যায় না।



চিত্র ১২.১৮ : মাকড়সার জাল বুনন

উদাহরণস্বরূপ, একটি মাকড়সার অবস্থান নির্বিশেষে একই ধরনের জাল বুনতে পারে। জাল বুনার এ ক্রিয়াধারা কোনো অর্জিত আচরণ নয়; বরং বংশগতভাবে অনুক্রমকৃত আচরণ, অর্থাৎ সহজাত আচরণ। মাকড়সা ডিম পাড়ার প্রস্তুতিলগ্নে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে **সিল্ক কোকুন** (silk cocoon) বুনে। যা বাইরের কোনো প্রভাবকের বিবেচনা ছাড়াই সবসময় একই ভাবে ঘটে থাকে। স্ত্রী মাকড়সা একটি ভিত্তিতল (base plate) গঠনের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াটি শুরু করে। এই তলে ডিম পাড়ার পর কোকুনের ভিত্তিতলের চারদিকে দেয়াল নির্মাণ করে এবং ঢাকনা সৃষ্টির মাধ্যমে এটিকে বন্ধ করে দেয়। মাকড়সার বৃত্তের জাল বুনে রেশমি সুতা দিয়ে। মাকড়সার উদরের নিচে অবস্থিত **স্পিনারেট** (spinnerets) নামক সিল্ক গ্রন্থি (silk gland) থেকে নিঃসৃত ফাইব্রোইন (fibroin) নামক **স্ক্লেরোপ্রোটিন** (scleroprotein) থেকে সৃষ্ট সুতা বাতাসের সংস্পর্শে এসে শক্ত রেশমি সুতায় পরিণত হয়। এ সুতা একই ব্যাসের ইস্পাতের সুতা অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী। এ সুতা নাইলনের চেয়ে দ্বিগুণ স্থিতিস্থাপক এবং এটি টান দিয়ে ছিঁড়তে গেলে এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এদের জালে সহজেই কীট পতঙ্গ আটকে যায় কারণ জালে এগ্লিগেট (agligate) ও ফ্লেজেলিফর্ম (flageliform) জাতীয় আঠালো পদার্থ। এছাড়াও জালে টিউবিকুলিফর্ম (tubiculiform) পদার্থ রয়েছে যা ডিমকে আটকে রাখতে সহায়তা করে।

সর্বপ্রথম **Hans Peters** (1939) মাকড়সার জাল বুননের ধাপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। প্রজাতিভেদে মাকড়সার জালের বিভিন্নতা দেখা যায়। এমনকি একই প্রজাতিভুক্ত মাকড়সা ভিন্নরকম জাল বুনে থাকে। এদের জাল গোলাকৃতির (orb web) চোঙাকৃতির (funnel web), পাতাকৃতির (sheet web) এবং বলয়াকৃতির (dome web) হতে পারে। জালিকা বৃত্ত একটি নিয়ত গঠন, এটি **কাঠামো** (frame), **অরীয় স্পোক** (radial spokes) এবং **আঠাল পেঁচ** (viscid spirals) নিয়ে গঠিত।

জাল বুননের এই আচরণগত পদ্ধতি এতই দৃঢ় যে, যদি স্বয়ং মাকড়সাই চায় তবুও এই বুনন পদ্ধতিকে নবরূপ দিতে বা পরিবর্তন করতে পারে না। ভিত্তিতল গঠনের পর স্ত্রী মাকড়সাটিকে যদি সশরীরে সরিয়ে নেওয়া হয় তবুও সে ডিম পাড়বে, দেয়াল ও ঢাকনা নির্মাণের প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রেখে এবং সে জানবেও না যে, ভিত্তিতলটি সেখানে অনুপস্থিত। যার ফলে ডিমগুলো পড়ে যাবে তার অসম্পূর্ণ কোকুনের গড়ন থেকে। স্ত্রী মাকড়সাকে যদি তার পূর্বে নির্মিত ভিত্তিতলে পুনরায় কোকুন তৈরির জন্য ফিরিয়ে আনা হয় তবে সে পূর্বের মতো ভিত্তিতলকে কোকুন তৈরিতে ব্যবহার না করে রোবটের মতো পুনরায় প্রথম থেকে নতুন করে ভিত্তিতল তৈরি করা শুরু করবে। যেন সেখানে আগে কোনো ভিত্তিতলই ছিল না।

(গ) অপত্যের প্রতি যত্ন (Parental Care)

সাধারণ অর্থে ডিম ও সন্তান লালন-পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণকে **অপত্যের প্রতি যত্ন** বা **পিতৃ-মাতৃ যত্ন** (parental care) বলা হয়। শিশুসন্তানের প্রতি যত্নবান হওয়া বা ডিম পাড়ার পর ডিমে তা দেওয়া ও যত্ন নেওয়া প্রাণীদের এক সহজাত আচরণ। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এ আচরণ অত্যন্ত উন্নত হলেও সামাজিক পতঙ্গ, মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও পাখিতে অপত্য লালন স্বভাব কম-বেশি লক্ষণীয়। প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রুর হাত হতে রক্ষার জন্য পিতা-মাতা কর্তৃক ডিম ও শিশুসন্তানের লালন-পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ স্বভাব প্রাণীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়েছে। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য অপত্যের প্রতি যত্ন অভিযোজনস্বরূপ।

Scanned with CamScanner

পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা, শত্রুর হাত হতে রক্ষা এবং বংশের ধারা অটুট রাখার নিমিত্তে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর পিতামাতা তাদের অপত্য দশার প্রতি যত্নবান হওয়ার সহজাত আচরণকে বা যত্ন নেওয়ার কৌশল বা পদ্ধতিকে অপত্যের প্রতি যত্ন বা পিতৃ-মাতৃ যত্ন বা অপত্য লালন বা বাৎসল্য আচরণজনিত লালন (parental eare) বলে। অপত্য লালনের মাত্রা অপত্যের সংখ্যার ব্যস্তানুপাতিক।

১। মাছের অপত্যের প্রতি যত্ন (Parental Care of Fishes)

অধিকাংশ মাছ তাদের অপত্যের (ডিম ও পোনা) প্রতি যত্নবান নয়। দেখা গেছে, যেসব মাছ পানিতে অধিক সংখ্যক ডিম পাড়ে তাদের মধ্যে অপত্যের প্রতি যত্ন বা অপত্য পালন বা বাৎসল্য আচরণ খুবই নগণ্য। এরা ডিম ছাড়ার পর প্রজননক্ষেত্র থেকে অন্যত্র চলে যায়। তবে যারা কম সংখ্যক ডিম পাড়ে তাদের মধ্যে অপত্যের প্রতি যত্ন বা বাৎসল্য আচরণ বেশি। মাছ নানাভাবে ডিম ও পোনার পরিচর্যা এবং প্রতিপালন করে থাকে। এক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী অথবা উভয়ই অনন্য ভূমিকা পালন করে। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

(ক) ডিম পাড়ার স্থান নির্বাচন (Selection of spawning ground) : ডিম পাড়ার জন্য কিছু কিছু মাছ উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে। অনেক Anadromous মাছ (যেমন– *Tenualosa*, *Petromyzon*, Salmon ইত্যাদি) ডিম পাড়ার পূর্বে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি থেকে নদীর স্বাদু পানিতে চলে আসে। তদ্রূপ কিছু Catadromous মাছ (যেমন– স্বাদু পানির Eel) ডিম পাড়ার সময় নদী থেকে সমুদ্রে গমন করে। উড়ুক্কু মাছের (Flying fish) ক্ষেত্রে শক্ত অবধারকের সাথে ডিমগুলো আটকানো থাকে। তবে পাইক (*Esox lucius*), কার্প (*Cyprinus carpio*) ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদের ওপর ডিম ছড়িয়ে দেয়। এতে ডিমগুলো উদ্ভিদের পাতায়, শাখায় আটকে যায়। ফলে তলার খাদক ডিম খেতে পারে না।

(খ) বাসা নির্মাণ (Nest formation) : অসংখ্য মাছ ডিম পাড়ার পূর্বে বাসা তৈরি করে এবং বাসায় অপত্য লালনের চেষ্টা চালায়। এদের কেউ বাসা তৈরি করে মাটিতে গর্ত করে, কেউ বা নুড়িপাথর দিয়ে, আবার কেউ বা আগাছা বা জৈব আবর্জনা দিয়ে। [বাসা প্রস্তুতকারী কতক মাছের নাম– *Apeltes quadracus*, *Belontia signata*, *Betta bellica*, *Betta splendens*, *Colisa fasciata*, *Colica lalia*, *Colisa labiosa*, *Eucalia inconstans*, *Trichopsis vittata*, *Pungitius pungitius*.] বাসা নির্মাণকারী মাছের মধ্যে, এক ধরনের মাছ বাসা নির্মাণ করে এবং ডিম পাড়ার পর বাসা পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ এরা বাসা পাহারা দেয় না। যেমন– *Petromyzon*, *Oncorhynchus* ইত্যাদি। আবার অন্য ধরনের মাছ বাসা তৈরি করে ডিম ফুটে বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বাসা পরিত্যাগ করে না। যেমন– Sun fish (*Lepomis*), Bow fin (*Amia*), লাংফিস (*Protopterus, Lepidosiren*) ইত্যাদি।

কিছু কিছু মাছের (যেমন– Carp, Goldfish) ডিম জলজ উদ্ভিদের মাঝে ছড়ানো থাকে। আবার কতক মাছ (যেমন– Trout, White fish) তাদের ডিমগুলো ছোট ছোট নুড়িপাথর বা বালুকণায় ছড়িয়ে রাখে। আবার কতক মাছ (যেমন– Yellow perch) পাকানো রজ্জুর মতো গুচ্ছে ডিম পাড়ে।

(গ) ডিম ও পোনা রক্ষণাবেক্ষণ : ডিম ও পোনা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাছ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। নিচে মাছের ডিম ও পোনা সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১। মুখগহ্বরে ও অন্ত্রে ডিম ও পোনা সংরক্ষণ (Shelter of egg and spawn in mouth cavity and intestine) : অনেক মাছের মুখগহ্বরের মধ্যে নিষিক্ত ডিম্বাণুর পরিস্ফুটন ঘটে। Cichlids-এর স্ত্রী সদস্য মুখের মধ্যে ডিম বহন করে। এমনকি এদের পোনা বিপদের সময় মাছের মুখগহ্বরে আশ্রয় নেয়। *Tilapia* মাছের মুখগহ্বরের মধ্যে ডিম ও পোনা আশ্রয় নেয়। ক্যাটফিশ মাছের (*Arius*) পুরুষ সদস্যের মুখগহ্বরে ডিম ও পোনা নিরাপদে সংরক্ষিত থাকে। কিছু মাছ (*Tachysurus*) নিষিক্ত ডিমগুলোকে রেণুপোনায় স্ফুটনের পূর্ব পর্যন্ত অন্ত্রে ধারণ করে রাখে।

২। ব্রুডথলি গঠন (Brood pouch formation) : সাগর ঘোড়া (*Hippocampus*) ও পাইপ ফিসের (*Syngnathus*) স্ত্রী সদস্য পুরুষের ব্রুডথলিতে (brood pouch) ডিম পাড়ে এবং এই থলির মধ্যে ডিমগুলোর পরিস্ফুটন ঘটে।

Scanned with CamScanner

৩। ডিমকে ঘিরে পেঁচিয়ে থাকা (Coiling round the eggs) : বাটার ফিশের (*Pholis gunnellus*) স্ত্রী সদস্যরা গোলাকার গুচ্ছে ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলো গোলাকার বলের ন্যায় দেখায়। এ সময় পুরুষ বা স্ত্রী (সম্ভবত পুরুষ) ডিমের চারপাশে পেঁচিয়ে থেকে ডিমগুলো পাহারা দেয় ও লালন-পালন করে।



বৃন্তাকার বাসা পুরুষ bowfin
(ক) ডিম ও সদ্য ফোটা পোনার পাহারায় Bowfin



স্ত্রী তেলাপিয়া মাছ সদ্য ফোটা পোনা
(খ) স্ত্রী তেলাপিয়া মাছ মুখ গহ্বরে রেখে পোনাকে রক্ষা করে



(গ) পুরুষ সামুদ্রিক ঘোড়ার ব্রুডথলি



(ঘ) ডিম পেঁচিয়ে পাহারারত অবস্থায় বাটার ফিশ



(ঙ) উদরের ত্বকীয় বাটিতে *Platystacus*-এর অপত্য ধারণ



(চ) স্ত্রী বিটারলিং (*Rhodeus amarus*) তার ওভিপজিটর দিয়ে ঝিনুক খোলকের ভেতর ডিম স্থলন ও মজুদকরণ



(ছ) নিউগিনি মাছের (*Kurtus*) পৃষ্ঠপাখনা আংটার ন্যায় অংশে ডিমের গুচ্ছ





১. *Cymatogaster aggreata*-এর উদরে ডিমের পরিস্ফুটন;
২. হাঙ্গরের (*Mystellus* sp.) কুসুম থলি অমরা
(জ) উদরে ডিম পরিস্ফুটন ও ইয়োকথলি অমরা গঠন :

চিত্র : ১২.১৯ : মাছের অপত্যের প্রতি যত্ন

৪। ত্বকে পেয়ালার ন্যায় গর্ত সৃষ্টি (Formation of cup in integument) : কিছু ক্যাটফিশ (যেমন– *Platystacus*, *Aspredo*) উন্নত ধরনের পন্থায় ডিম পরিবহন করে। প্রজনন ঋতুতে স্ত্রীদের পেট অঞ্চলের ত্বক নরম ও স্পঞ্জি হয়। নিষেকের পর মাছ তার নরম ত্বকের ওপর ডিমগুলো চাপ দিলে, ত্বকে ডিমগুলো পেয়ালার মতো গর্তে ঢুকে যায় এবং না ফোটা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে।

৫। ঝিনুকের ম্যান্টল গহ্বরে ডিম সংরক্ষণ (Shelter of egg in mantle cavity of mussel) : স্বাদু পানির ঝিনুকের ম্যান্টল গহ্বরে Cyprinidae গোত্রভুক্ত ইউরোপীয় বিটারলিং মাছ (*Rhodeus amarus*) ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর স্ত্রী মাছের ডিম্বনালি লম্বা হয়ে একটি দীর্ঘ নালি (siphon) গঠন করে, যাকে Ovipositor বলা হয়। পরবর্তীকালে এই নালি ঝিনুকের ম্যান্টল গহ্বরে প্রবেশ করে।

৬। ডিম্ব আবরকে ডিম সংরক্ষণ (Shelter of egg in egg capsules) : অনেক ডিম্বজ (oviporous) তরুণাস্থি মাছ (যেমন– *Scyllium*, *Raja*) নিষিক্ত ডিমকে কেরাটিন নির্মিত শৃঙ্গায়িত ডিম্ব আবরকে আবৃত রাখে। এই আবরকের আকর্ষণ ক্ষমতা থাকায় তা জলজ আগাছায় আটকে থাকে। পরিস্ফুটন শেষে আবরক ফেটে পোনা বেরিয়ে আসে।

৭। দেহের উপর সংবন্ধন (Attachment to the body) : পুরুষ নিউগিনি মাছের (*Kurtus*) পৃষ্ঠ পাখনা বিশেষভাবে পরিবর্তন হয়ে আংটার ন্যায় গঠন তৈরি করে যাতে স্ত্রীরা গুচ্ছাকারে ডিম স্থাপন করে থাকে। ডিম থেকে রেণুপোনা ফুটে বের না হওয়া পর্যন্ত ওই আংটাতে আটকে থাকে।

৮। জরায়ুজ পরিস্ফুটন (Viviparity) : Viviparous মাছের মধ্যে অপত্য লালনের চরম উৎকর্ষতা লক্ষণীয়। জরায়ুজ পরিস্ফুটনে স্ত্রী মাছের ডিম্বনালিতে ডিম ফুটে পোনা বের হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে (যথা– *Mustellus*) কুসুম থলি (yolk sac), অমরা (placenta) গঠনের মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করে।

Scanned with CamScanner

তিন কাঁটা স্টিকলব্যাক মাছের অপত্য লালন : **নিকো টিনবারজেন** (Niko Tinbergen, 1953) তিন কাঁটা স্টিকলব্যাক (Three spined Stickleback-*Gasterosteus aculeatus*) মাছে চমকপ্রদ অপত্য লালনের তথ্য প্রদান করেন। এসব মাছ উত্তর গোলার্ধের উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া যায়। এদের পুরুষ মাছ ডিম পাড়ার জন্য প্রজনন এলাকা নির্ধারণ করে এবং অগভীর পানিতে বাসা নির্মাণ করে। এরা **জিগ-জ্যাগ নৃত্য** (zig-zag dance) প্রদর্শনের মাধ্যমে যৌন পরিপক্ব স্ত্রী মাছকে বাসায় নিয়ে আসে। পুরুষের প্ররোচনায় স্ত্রীটি বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমগুলোর উপর পুরুষ মাছটি শুক্র ত্যাগ করে নিষেক ঘটায়। নিষেকের পর পুরুষটি স্ত্রীকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং আরও দু-তিনটি স্ত্রীকে একইভাবে বাসায় এনে ডিম পাড়ায়। ডিম ও বাচ্চাদের যত্ন নেওয়ার সকল দায়িত্ব পুরুষটি গ্রহণ করে। এরা নিষিক্ত ডিমগুলোকে বাসার নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখে। এ সময় স্বজাতীয় স্ত্রী, পুরুষ, অন্য মাছ কিংবা খাদক ইত্যাদি যেকোনো ধরনের আগন্তুককে বাসার নিকট ভিড়তে দেয় না। এ সময় এরা বক্ষ পাখনা দ্বারা বাসার মধ্যে পানির স্রোত সৃষ্টি করে যাতে ডিমগুলো পরিস্ফুটনের জন্য পরিমিত অক্সিজেন পায়। এ পদ্ধতিকে **ফ্যানিং** (fanning) বলে। ডিম ফুটতে ৭-৮ দিন সময় লাগে। পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে চলা শিখতে না পারা পর্যন্ত এরা বাসা পাহারা দেয়। কখনো কোনো পোনা দলছুট হলে পুরুষটি ছুটে ঘিয়ে পোনাকে মুখে পুরে এনে নিজ দলের মধ্যে ছেড়ে দেয়। প্রায় ১৫ দিনের মধ্যে পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে চলার স্বভাব রপ্ত করে ফেললে পুরুষটি বাসা ত্যাগ করে পূর্ণবয়স্ক সাথীদের সাথে চলে যায়।



ক

খ

চিত্র ১২.২০ : তিন কাঁটা স্টিকলব্যাক মাছের জিগ-জ্যাগ নৃত্য ও প্রজনন আচরণ (ক ও খ)

২। ব্যাঙের অপত্যের প্রতি যত্ন (Parental Care of Frogs or Toads)

জলজ জীবন থেকে স্থলজ জীবনে প্রবেশ করায় উভচর (ব্যাঙ) প্রাণীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাছাড়া অনেক অন্তঃ ও আন্তঃপ্রজাতিক শত্রু এদের ডিম, লার্ভা বা অপরিণত অবস্থা ভক্ষণ করে থাকে। এসব প্রতিকূলতা ও পরিবেশগত সমস্যা সমাধানকল্পে উভচররা (ব্যাঙ) বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে অপত্যের প্রতি যত্নের মাধ্যমে তাদের বংশের ধারা অক্ষুণ্ন রাখে। নিচে ব্যাঙের অপত্যের প্রতি যত্নের বিভিন্ন কৌশল সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

(ক) ডিম পাড়ার স্থান নির্বাচন (Selection of egg laying site) : কতক ব্যাঙ ডিম পাড়ার স্থান নির্বাচনের মাধ্যমে অপত্যের প্রতি যত্নের জন্য সচেষ্ট হয়। যেমন– প্রজননের পূর্বেই *Rhacophorus schlegeli* নদী বা পুকুরের কর্দমাক্ত কিনারায় গর্ত খনন করে। মিলনের সময় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে উক্ত গর্তে প্রবেশপূর্বক গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। প্রথমে স্ত্রী ব্যাঙ তার ক্লোয়েকা (cloaca) নিঃসৃত রস দিয়ে ফেনা তুলে তাতে ডিম পাড়ে এবং পুরুষ ব্যাঙ ওই ডিমগুলোর উপর শুক্রাণু ত্যাগ করে। সৃষ্ট ফেনা ডিমকে শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে। এরপর স্ত্রী ও পুরুষ ব্যাঙ উভয়ই গর্তের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে নদী বা পুকুরের পানিতে চলে যায়। ডিম থেকে লার্ভা সৃষ্টি হলে ফেনা তরলে পরিণত হয় এবং লার্ভা গড়িয়ে পানিতে চলে আসে।

(খ) বাসা তৈরি (Nest building) : অনেক ব্যাঙ তাদের অপত্যের যত্নের জন্য অর্থাৎ ডিম ও বাচ্চাদের প্রতিপালন করার জন্য বাসা তৈরি করে থাকে। এই বাসা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–

(i) কর্দমাক্ত বাসা (Mud nest) : কতক প্রজাতির স্ত্রী ব্যাঙ (*Hyla faber*) প্রজননের পূর্বে কর্দমাক্ত জলাশয়ের কিনারে ছোট বাসা তৈরি করে এবং তাতে ডিম পাড়ে। পুরুষ ব্যাঙ এ ধরনের বাসা তৈরি করে।

(ii) পাতার বাসা (Leaf nest) : দক্ষিণ আমেরিকার গেছো ব্যাঙ (*Phyllomedusa*) তার ক্লোয়েকা নিঃসৃত আঠালো রস ব্যবহার করে পাতার কিনারাগুলো জোড়া লাগিয়ে বাসা তৈরি করে এবং তাতে ডিম পাড়ে। সাধারণত এ ধরনের বাসা জলাশয়ের সন্নিকটের উদ্ভিদের ঝুলন্ত শাখায় দেখা যায়। বৃষ্টির পানিতে বাসা ভরে গেলে ডিম থেকে লার্ভা বের হয়ে পানির উপর পড়ে।

(iii) মোমের বাসা (Wax nest) : কতক প্রজাতির গেছো ব্যাঙ (*Hyla resinifictrix*) মৌচাক থেকে মোম সংগ্রহ করে গাছের গুঁড়ির উপর বাটির ন্যায় বাসা তৈরি করে এবং বৃষ্টির পানি বাসায় জমে পূর্ণ হলে তাতে ডিম পাড়ে।

(iv) বিটপের বাসা (Shoot nest) : কিছু গেছো ব্যাঙ (*Triton*) গাছের কচি ডগা একত্রে জোড়া দিয়ে বাসা তৈরি করে এবং স্ত্রী ব্যাঙ ওই বাসায় ডিম পাড়ে।

Scanned with CamScanner

(গ) পানিতে সৃষ্ট ফেনার মাধ্যমে অপত্যের প্রতি যত্ন (Formation of foam in water for parental care) : কিছু প্রজাতির ব্যাঙ (*Rhacophorus maculatus*) ডিম পাড়ার পরপরই, পানিতে স্ত্রী ও পুরুষ ব্যাঙ উভয়ই তাদের পেছনের পা আন্দোলনের মাধ্যমে ফেনা সৃষ্টি করে। সৃষ্ট ফেনা ডিমগুলোকে শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে এবং শিকারি প্রাণীর দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়।

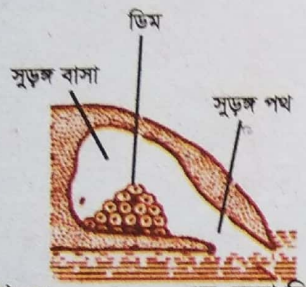

(ক) *Rhacophorus*-এর ফেনা নির্মিত বাসা



(খ) *Hyla faber*-এর কর্দমাক্ত/মেটে বাসা



(গ) পানির উপরে ঝুলন্ত ব্যাঙের (*Phyllomedusa*) পাতার তৈরি বাসা



(ঘ) *Rhacophorus maculatus* ফেনা নির্মিত বাসা

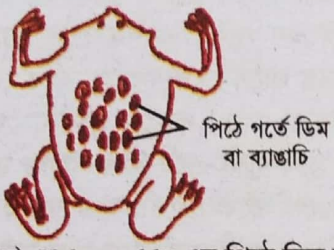

(ঙ) *Hyla goeldii*-এর পিঠে ডিম বা ব্যাঙাচি


পেছনের পায়ের সাথে ডিম
(চ) *Alytes obstetricans*-এর পেছনের পায়ের সাথে ডিম



(১)



(২)

(ছ) *Pipa* spp. এর পিঠে ডিম পরিবহন ও পরিস্ফুটন



(জ) পুরুষ *Phyllobates* এর পিঠে ব্যাঙাচি

চিত্র ১২.২১ : ব্যাঙের অপত্যের প্রতি যত্ন

(ঘ) দেহে ডিম পরিবহন (Carrying eggs on body) : বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙ তাদের অপত্যের যত্নের জন্য বিভিন্নভাবে তাদের ডিম দেহে পরিবহন করে। যেমন–

(i) পিঠে অপত্য থলি (Brood pouch in back) : অনেক স্ত্রী ব্যাঙের (*Hyla goeldii*) পিঠের ত্বক ভাঁজ হয়ে **অপত্য থলি** (brood pouch) গঠিত হয় এবং সেখানে ডিম সংস্থাপিত হয়। ডিমগুলো লার্ভায় রূপান্তর হওয়ার আগ পর্যন্ত এই থলিতে অবস্থান করে।

(ii) উরু অঞ্চলে ডিমের রজ্জু (Egg string on thigh) : কিছু প্রজাতির পুরুষ ব্যাঙ (*Alytes obstetricans*) স্ত্রী কর্তৃক নির্গত ডিমের রজ্জু পশ্চাৎপদের উরু অঞ্চলে জড়িয়ে রাখে এবং ব্যাঙাচি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ডিম প্রতিপালন করে থাকে।

(iii) পিঠের গর্তে ডিম পরিস্ফুটন (Development of eggs in dorsal pits) : প্রজনন ঋতুতে *Pipa* গণের অনেক প্রজাতির (যেমন– *Pipa americana* ও *Pipa dorsigera*) স্ত্রী ব্যাঙেরা পিঠে আলাদা আলাদা গর্তে নিষিক্ত ডিম বহন করে এবং নিষিক্ত ডিম্বাণুর পরিস্ফুটন ওই গর্তেই সম্পন্ন হয়। এই গর্তেই অপ্রকৃত অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের সঙ্গে মাতৃদেহের সংযোগ সাধিত হয়।

(ঙ) দেহে ব্যাঙাচি বহন (Carrying tadpole on back) : কিছু প্রজাতির পুরুষ ব্যাঙ (*Phyllobates*) তাদের ব্যাঙাচিগুলো পিঠে বহন করে এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে গমন করে।

Scanned with CamScanner

(চ) **অণ্ড-জরায়ুজ পরিস্ফুটন** (Ovo-viviparity) : কতক প্রজাতির আফ্রিকান স্ত্রী ব্যাঙ (যেমন– *Pseudophryne, Nectophrynoidese* ইত্যাদি) ডিমের পরিবর্তে বাচ্চা প্রসব করে। প্রকৃতপক্ষে এদের ডিম্বনালিতে নিষিক্ত ডিমগুলোর পরিস্ফুটন ঘটে। এক্ষেত্রে লার্ভার লম্বা রক্তনালি সমৃদ্ধ লেজ মাতৃদেহের সাথে অমরার ন্যায় সংযোগ স্থাপন করে পুষ্টি জোগায়।

৩। পাখির অপত্যের প্রতি যত্ন (Parental Care of Birds)

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি রয়েছে। আর তাদের অপত্য যত্নে রয়েছে বৈচিত্র্যতা। তবে অপত্য লালনে বৈচিত্র্যতা দেখা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। **কোকিল** ও **কাউবার্ড** ব্যতীত সকল পাখিতে অপত্যের প্রতি যত্ন পরিলক্ষিত হয়। নিচে সংক্ষেপে পাখির অপত্যের প্রতি যত্ন আলোচনা করা হলো–

সাধারণত পাখির অপত্য যত্ন বলতে তাদের বাসা তৈরি থেকে বাচ্চা বা শাবক স্বাধীনভাবে চলাচলের পূর্ব পর্যন্ত পিতা-মাতার সান্নিধ্যে থাকাকেই বোঝায়। তবে আসল অপত্য যত্ন শুরু হয় বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর থেকেই। **বাচ্চাদের ব্রুডিং** (brooding), **নেসলিংদের খাওয়ানো** (feeding nestling) এবং শিকারিদের (predators) থেকে শাবকদের রক্ষা করার মাধ্যমেই পাখিরা অপত্যদের যত্ন করে থাকে।

১। বাসা তৈরি (Nest building) : বিভিন্ন প্রজাতির পাখি সাধারণত ডিম পাড়ার জন্য ও বাচ্চা লালন পালন করার জন্য বাসা তৈরি করে। কিছু পাখি খোলামেলা জায়গায় বাসা তৈরি ছাড়াই ডিম পেড়ে থাকে। আবার কিছু প্রজাতির পাখি (যেমন– কোয়েল, হামিংবার্ড, আবাবিল ইত্যাদি) মাটিতে, কিছু মানুষের তৈরি বাসায় (মুরগি, কবুতর ইত্যাদি), গাছের কাণ্ডের মধ্যে গর্ত করে (যেমন- কাঠঠোকরা, ব্লুবার্ড ইত্যাদি) এবং কিছু গাছের শাখায় অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে বাসা বাঁধে (যেমন-বাবুই পাখি)। শিকারি পাখিরা অনেক উঁচুতে বাসা তৈরি করে থাকে যাতে তারা বিভিন্ন প্রতিকূলতা (যেমন– প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিকারি প্রাণী ইত্যাদি) থেকে রক্ষা পায়। মাছরাঙা পাখি নদীর পাড় খুড়ে টানেল আকৃতির বাসা তৈরি করে। আবার অনেক পাখি যেমন ইউরোপিয়ান কোকিল নিজেরা কোনো বাসা তৈরি না করে বরং অন্যের বাসায় (যেমন-কাকের বাসায়) ডিম পেড়ে থাকে। বাসা তৈরির জন্য পাখিরা সাধারণত স্থানীয় গাছের ডালপালা, নিজের পালক, লালা, বিষ্ঠা, মাকড়সার জাল, কাদামাটি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। অনেক সময় পাখিরা ভীমরুল, মৌমাছি, প্রভৃতি বিষাক্ত পতঙ্গের চাকের পাশে বাসা তৈরি করে শত্রু মোকাবেলা করার জন্য তাদের কাজে লাগায়। অনেক সময় বড় পাখিদের বাসার পাশে ছোট পাখিদের বাসা তৈরি করতে দেখা যায়। ছোট পাখি ও তাদের ছানা বড় পাখিদের নিকট থেকে বাড়তি নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। পুরুষ সদস্যরা বাসা তৈরি শুরু করার মধ্যে দিয়ে স্ত্রী সদস্যকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা চালায়।



চিত্র ১২.২২ : মা পাখি (ঘুঘু ও মুরগী) কর্তৃক ডিমে তা দেয়ার দৃশ্য

২। ডিমে তা দেওয়া (Incubation of eggs) : ডিম পাড়ার পর পিতা-মাতা সযত্নে ডিমে তা দিয়ে থাকে। কোনো কোনো প্রজাতিতে পিতা অথবা মাতা এককভাবে কাজটি সম্পন্ন করে। তবে সাধারণত মাতা কাজটি করে থাকে। তা দেওয়ার সময় পরম যত্নে বাবা মাকে খাইয়ে দেয়। বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার (hatching) পূর্ব পর্যন্ত মা বাসা ছেড়ে মুহূর্তের জন্য বাইরে যায় না, তখন বাবা আশপাশে ঘুরে বেড়ায়। কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ই পর্যায়ক্রমে কাজটি সম্পন্ন করে। যেসব প্রজাতির পাখি মাটিতে ডিম পাড়ে তাদের ডিমের বর্ণের বৈচিত্র্য কম। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়, ডিমের রং মাটির বর্ণের সঙ্গে অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে মিশে যায় (যেমন– কোয়েলের ডিম) যাতে শিকারি প্রাণী থেকে তাদের ডিম রক্ষা পায়, প্রকৃতপক্ষে এদের শিকারি (predator) বেশি থাকে। অপরপক্ষে, যারা গাছের শাখায় ডিম পাড়ে তাদের ডিমে বৈচিত্র্য বেশি লক্ষণীয়।

৩। ছানার যত্ন (Care of offspring) : শিকারি পাখি (যেমন- ঈগল, চিল, গাংচিল ইত্যাদি) গাছের উঁচু ডালে সাধারণত বাসা বাঁধে এবং সেখানে তাদের বাচ্চাদের লালন-পালন করে। বাচ্চাদের উড়াল শেখানোর জন্য বাচ্চার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মা-বাবা ওপর থেকে বাচ্চাদের ছেড়ে দেয়, তখন পড়তে পড়তে শাবকরা উড়তে শেখে এবং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। কিছু প্রজাতির পাখির অপত্য যত্ন খুবই লক্ষণীয়। এদের এরূপ যত্নকে brood parasitism বলে।

Scanned with CamScanner

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোকিল সাধারণত কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, এমনকি ছোট ছোট পাখির বাসায়ও ডিম পাড়ে, অনেক সময় বাচ্চারা ডিমে তা দেওয়া পাখির চেয়েও বড় হয়ে থাকে। তবুও পরম যত্নে নিজের ডিম মনে করে তা দিয়ে থাকে, এমনকি ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন শুরু করার আগ পর্যন্ত বাচ্চাদের নিজের মনে করে যত্ন করে। ডিম ফোটার পরপরই কিছু প্রজাতির পাখি তাদের বাসা পরিষ্কার করে থাকে, যাতে বাচ্চারা রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত না হয়। ডিম ফুটে যখন বাচ্চারা (young birds) বের হয় তখন কিছু বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে পিতা-মাতার ওপর নির্ভরশীল হয় এবং কিছু বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গেই বাসা ত্যাগ করে এবং নিজেদের খাবার খুঁজতে থাকে।

বাচ্চাদের আচরণে ওপর ভিত্তি করে এদেরকে সাধারণত দুটি গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। যথা– **অ্যাল্ট্রিসিয়াল** (altricial) এবং **প্রিকোসিয়াল** (precocial)।

১। অ্যাল্ট্রিসিয়াল (Altricial) : এই গ্রুপের বাচ্চারা অসহায়ভাবে জন্মলাভ করে থাকে অর্থাৎ এরা পালকহীন বা নগ্ন, অন্ধ ও অসহায় থাকে। পিতা-মাতা বাচ্চাদের খাবার খাওয়া থেকে উড়াল দেওয়াও (fledging) শিখিয়ে দেয়। এরা পিতা-মাতার পরম যত্নে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বাবলম্বী না হয়। অ্যাল্ট্রিসিয়াল ছানারা নিজেদের দেহের ওজনের চেয়ে বহুগুণ বেশি খাবার খেয়ে থাকে যাতে তারা দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে এবং বাসা ত্যাগ করতে পারে। যেমন– Songbirds, Woodpeckers, Hummingbirds, Pigeons (কবুতর) এবং America Robins পাখির বাচ্চা।



Altricial Precocial

চিত্র ১২.২৩ : অ্যাল্ট্রিসিয়াল ও প্রিকোসিয়াল ছানা

২। প্রিকোসিয়াল (Precocial) : এই গ্রুপের বাচ্চারা ডিম ফুটে বের হওয়ার পর পরই তাড়াতাড়ি বাসা ত্যাগ করে। তারা পিতা-মাতাকে অনুসরণ করে এবং তারা নিজেরাই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এরা মাতাপিতার সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন– হাঁস-মুরগির বাচ্চা ইত্যাদি।

রোদ-বৃষ্টি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য, শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, বাচ্চার খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পাখিকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বিভিন্ন প্রজাতির পাখিরা তাদের বাচ্চাদের খাওয়ানোর (feeding young) ব্যাপারে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। Pettingill (১৯৮৫)-এর মতে, প্রায় সকল গ্রুপের পাখিই পিতা অথবা মাতা অথবা উভয়েই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর পরই বাচ্চাদের খাবার দিয়ে থাকে বা খাবার খাইয়ে থাকে। কিছু পাখি তার ঠোঁট বা চঞ্চুতে (beak/bill) খাবার নিয়ে আসে এবং বাচ্চারা মুখ খুললে খাবার প্রবেশ করিয়ে দেয়। যেমন– অধিকাংশ passerines. কিছু পাখি খাবারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ (regurgitate) করে বাচ্চাদের মুখে বা গলার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। যেমন– Waxwings, Hummingbirds এবং Herons। কিছু পাখি খাবার বাসায় অথবা বাসার আশপাশে রাখে যাতে বাচ্চারা তুলে খেতে পারে। মা সাধারণত খাইয়ে দেয় না, খাওয়া শিখিয়ে দেয়। মা পাখি খাবারের দিকে ঠোকর দিয়ে খাবার দেখিয়ে দিলে বাচ্চারাও সে খাবারে ঠোকর দিয়ে থাকে। এভাবে তারা খাবার খাওয়া শিখে। যেমন– Gulls।



চিত্র ১২.২৪ : মা পাখি কর্তৃক ছানাকে খাওয়ানোর দৃশ্য

কিছু পাখি মুখে খাবার জমা রাখে এবং বাচ্চারা সেখান থেকে খাবার গ্রহণ করে। যেমন– Pelicans, Cormorants ইত্যাদি। কয়েক প্রজাতির বাচ্চারা পিতা-মাতার উগরে দেওয়া চর্বিবৎ, দইয়ের ন্যায় ক্ষরণ দুধ খেয়ে থাকে। এ দুধ পিতা-মাতার ক্রপের দুগ্ধ গ্রন্থি থেকে তৈরি হয়। যেমন– কবুতর (pigeons)এবং ঘুঘু (doves)। কিছু পাখি তাদের বাঁকা নখরের (hooked claw/talons) মাধ্যমে খাবার বাসায় নিয়ে আসে এবং টুকরা টুকরা করে বাচ্চাদের খাইয়ে থাকে (যেমন– Raptors with young nestling) অথবা আস্ত খাবারটি বাচ্চাদের দিয়ে থাকে (Raptors with older nestling)।

Scanned with CamScanner

হেরিং গাল বা সমুদ্র চিলের (Herring gull or Sea gull) অপত্য লালন : নিকো টিনবারজেন (Niko Tinbergen, 1953) হেরিং গালের (*Larus argentatus*) চমকপ্রদ অপত্য লালনের তথ্য প্রদান করেন। বসন্তকালে এরা প্রজননের উদ্দেশ্যে জোড় বাঁধে এবং দু'জনে মিলে মোহনা কিংবা সমুদ্র উপকূলের বালুকাময় স্থানে বাসা তৈরি করে। এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে বলে এদের বাসাগুলো কলোনির মতো দেখায়। বাসায় স্ত্রী পাখিটি ডিম পাড়ার পর পরই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই পালাক্রমে ডিমে তা দেয়। এরা কখনো ডিম ফেলে একসাথে কোথাও যায় না। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর পরই এদের প্রকৃত অপত্য লালন শুরু হয়। প্রস্ফুটনের কিছুক্ষণ পরই এদের বাচ্চাগুলো খাদ্যের জন্য পিতা-মাতার কাছে আবেদন জানাতে থাকে। পিতা-মাতা খাদ্য খাওয়ার সুযোগ করে দিলে বাচ্চারা পিতা-মাতার শেখানো পদ্ধতিতে চঞ্চু উঁচু করে ঠোকর দিয়ে খাওয়ার কৌশল রপ্ত করে ফেলে। কলোনির নিকট কোনো শত্রু বা আগন্তুকের অনুপ্রবেশ বুঝতে পারলে পিতা-মাতা ও বাচ্চাদের মধ্যে ভিন্নধর্মী সম্পর্ক গড়ে উঠে। এসময় কলোনির বয়স্ক সদস্যরা তাদের সুপরিচিত স্বভাবসিদ্ধ সংকেত ধ্বনি **গা-গা-গা! গা-গা-গা-গা-গা** শব্দ উচ্চারণ করে উড়ে যায়। এতে বাচ্চারা দৌড়ে কোনো নিরাপদ বা গুপ্তস্থানে লুকিয়ে পরে। এ সময় কলোনির বয়স্ক সদস্যরা সবাই উপরে উড়তে থাকে এবং আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। প্রতিটি যুগল স্বতন্ত্রভাবে আগন্তুকের উপর আক্রমণ চালায়। এছাড়া অনেক সময় এরা আগন্তুকের উপর বমি ও মল ত্যাগ করে কিংবা পায়ের নখর দিয়ে আঘাত করে। এভাবে হেরিং গাল তাদের বাচ্চাদেরকে রক্ষা করে। বাচ্চাগুলো ক্রমে স্বাধীন হতে শিখলে পিতা-মাতা এদের ছেড়ে পূর্বের দলে ভিড়ে যায়।



চিত্র ১২.২৫ : হেরিং গালের প্রজনন আচরণ

মাছ, ব্যাঙ ও পাখির অপত্য যত্ন সম্পূর্ণরূপে হরমোন নিয়ন্ত্রত সহজাত আচরণ। এটি ডিম উৎপাদন থেকে শুরু হয় এবং বাচ্চা স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত চলে।

❑ **কাজ :** (i) স্টিকলব্যাক পুরুষ মাছ জিগ-জ্যাগ নৃত্য প্রদর্শন করে স্ত্রী মাছকে প্রজননে আকৃষ্ট করে- লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। (ii) মাছের ডিমপাড়ার পর তার রক্ষণাবেক্ষণের আচরণটি ব্যাখ্যা কর। (iii) উভচরের অপত্য স্নেহের সাথে মাছের অপত্য স্নেহের তুলনামূলক আলোচনা কর। (iv) পাখির 'অপত্য লালন' বিশ্লেষণ কর।

১২.৪ শিখন বা শিখন আচরণ (Learning or Learning behaviour)

কথায় বলে, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। মানুষের শেখার শেষ নেই। অন্যান্য প্রাণীও তাদের জীবদ্দশায় অনেক কিছু শিখে থাকে। **প্রাণীর যে আচরণ শিক্ষণ, প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকেই শিখন বা শিখন আচরণ বা শিক্ষালব্ধ আচরণ** (learning behaviour) **বলা হয়**। এই আচরণ সকল স্তরের শিক্ষার অভিজ্ঞতাকেই ব্যাখ্যা করে। প্রাণীর শিখন আচরণ পরিবর্তনশীল, কারণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশ থেকে প্রাণী সর্বদাই কিছু না কিছু অর্জন করতে থাকে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী শিখন বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন–

- শিখন হলো আচরণের পরিবর্তন (Watson & Bernad)
- শিখন হলো অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন (Mac Goach)
- শিখন হলো অতীত অভিজ্ঞতা অনুশীলনের ফলস্বরূপ আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন (Morgan & King)
- যেসব আচরণ অর্জিত এবং অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তিত হতে পারে তাদের শিখন আচরণ বলা হয় (An adaptive change in behaviour that results from experience) – Lorenz.

তবে অনুশীলন বা অভিজ্ঞতা ছাড়া শারীরিক সমস্যার (যেমন– দুর্ঘটনা বা রোগ) কারণে আচরণের পরিবর্তন হলে তাকে শিখন বলা যাবে না।

Scanned with CamScanner

শিখন আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Learning behaviour)

(১) শিখন আচরণ জটিল প্রকৃতির, যাহা শিখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। (২) এ আচরণ স্বভাবজাত নয়, এমনকি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট নয়। (৩) এই আচরণ সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং অভিযোজনীয়। (৪) এ আচরণ প্রদর্শনের জন্য অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। (৫) এটি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে। (৬) সাধারণত উচ্চশ্রেণির প্রাণীতে এই আচরণ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হয় না।

শিখন আচরণের শর্ত বা উপাদান (Factors of learning behaviour) : এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন শর্ত বা উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। শিখনের সাধারণ শর্তগুলো হলো– সমস্যা (problem), প্রেষণা বা প্রেরণা বা মোটিভেশন (motivation), অনুষঙ্গ (association), বলবৃদ্ধি (reinforcement), পর্যবেক্ষণ (observation), মনোযোগ (attention), পুনঃপুনঃ প্রচেষ্টা (repeated trials), সান্নিধ্য (contiguity)।

শিখন আচরণের প্রকারভেদ (Types of learning behaviour) : বিখ্যাত আচরণবিদ Thorpe (১৯৬৩) প্রদত্ত প্রকারভেদটি নিম্নরূপ :

(১) অভ্যাসগত (Habituation); (২) অনুকরণ (Imprinting); (৩) অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insight learning); (৪) প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত শিখন (Latent learning); (৫) চিরায়ত সাপেক্ষণ (Classical conditioning) এবং (৬) প্রচেষ্টা বা ভুল সংশোধনকরণ শিখন বা যান্ত্রিক শিখন (Trial and error or Instrumental learning)। এ ছয়টি শিখন আচরণের মধ্যে **অভ্যাসগত** ও **অনুকরণ** শিখন আচরণ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

১। অভ্যাসগত (Habituation) : জীবনব্যাপী প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ধরনের সরল প্রকৃতির শিখন আচরণ লক্ষ করা যায়। যদি কোনো প্রাণীকে ক্রমাগত একটি বিশেষ উদ্দীপকের মাধ্যমে উদ্দীপিত করা হয় (যে উদ্দীপকের সঙ্গে কোনো লাভ বা ক্ষতি সংশ্লিষ্ট নয়) তাহলে প্রাণীটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া প্রদর্শনের মাত্রা কমিয়ে দেয়।

এরূপ বারবার কোনো উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে করতে অবশেষে প্রাণী যে প্রতিক্রিয়া হ্রাস করতে শেখে তাকে অভ্যাসগত আচরণ (habituation) বলে। এতে কোনো নতুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না, বরং পুরাতনটি লোপ পায়। যেমন– চলনরত কোনো শামুকে কাঠি দ্বারা স্পর্শ করলে সে নিজেকে খোলকের মধ্যে গুটিয়ে নেয়, কিন্তু বারংবার স্পর্শ করতে থাকলে একসময় দেখা যায় সে নিজেকে আর গুটিয়ে নিচ্ছে না। অর্থাৎ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে এবং সে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। অভ্যাসগত কারণে কারখানাতে শ্রমিকরা শব্দময় পরিবেশে কাজ করতে পারে।

২। অনুকরণ (Imprinting) : এ ধরনের আচরণ এক অভিনব শিখন আচরণ। তরুণ প্রাণীর বর্ধনের অতি সংবেদনশীল মুহূর্তে (sensitive period) এ ধরনের শিখন সুস্পষ্টরূপে লক্ষ করা যায়। সাধারণত খাদ্য, দেহের উষ্ণতা প্রভৃতি দ্বারা জীবনের সূচনালগ্নে এ জাতীয় শিখনের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়।

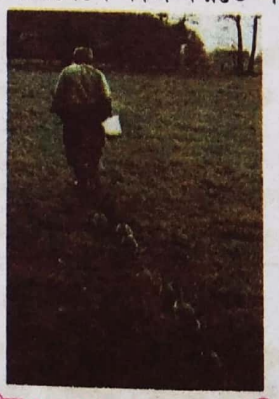

চিত্র ১২.২৬ : লরেঞ্জের পালিত হাঁস

বিশিষ্ট প্রাণিবিজ্ঞানী **কনরাড লরেঞ্জ** (১৯৩৭) প্রাকৃতিক পরিবেশে সংঘটিত ইমপ্রিন্টিং-এর একটি চমৎকার ঘটনা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ধূসর পা রাজহংসী বা পাতিহাঁস জীবনে প্রথম যাকে দেখে সবসময় তাকেই অনুসরণ করে, কিন্তু মা-বর্জিত রাজহংসীর বাচ্চারা যারা প্রথম লরেঞ্জকে জন্মের পর দেখেছে তারা বরাবরই লরেঞ্জকে বিকল্প মা ভেবে পিছু নিয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, পাখির বাচ্চাকে মানুষের ভাষা শেখানো হলে সে তার নিজের ভাষা ভুলে যায়। এ ধরনের আচরণ ইমপ্রিন্টিং-এর অন্তর্ভুক্ত।

৩। অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insight learning) : পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাধান বের করাই হলে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন। বিজ্ঞানী (Wolfgang kohler) পরীক্ষা করে দেখেন শিম্পাঞ্জির খাঁচায় অনেকগুলো বাক্স রেখে তার নাগালের অনেক বাইরে কলা টানিয়ে রাখা হলে শিম্পাঞ্জি বাক্সের উপর বাক্স সাজিয়ে স্তূপ তৈরি করে এর উপর দাঁড়িয়ে কলা খায়। অর্থাৎ নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সে সমস্যা সমাধান করে।

৪। প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত শিখন (Latent learning) : কোনো বৈশিষ্ট্য যখন প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং পারিপার্শ্বিক কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকাশ পায় তাকে প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত শিখন বলে।

৫। চিরায়ত সাপেক্ষণ (Classical conditioning) : শর্তাধীন সাড়া দিয়ে অর্জিত শিখন আচরণকে চিরায়ত সাপেক্ষণ শিখন বলে। যেমন– মুরগিকে খাবার দেওয়ার সময় নিয়মিত নির্দিষ্ট শব্দ করলে পরবর্তীতে খাবার না দিয়ে শব্দ করলেও মুরগি সাড়া প্রদান করবে।

Scanned with CamScanner

৬। প্রচেষ্টা বা ভুল সংশোধনকরণ শিখন (Trail and error learning) : ভুল সংশোধনের মাধ্যমে প্রাণী যে শিক্ষালাভ করে তাকে ভুল সংশোধনকরণ শিখন বলে। যেমন– ব্যাঙ মিলিপোডকে দেখামাত্র প্রথমে মুখে নিয়ে নেয়। কিন্তু যখন মিলিপোড বিষ নিঃসরণ করে তখন ব্যাঙ বুঝতে পারে এটি তার খাদ্য নয় এবং পরবর্তীতে আর সে মিলিপোড শিকার করে না।

সহজাত আচরণ এবং শিখন আচরণের মধ্যে পার্থক্য

সহজাত আচরণ	শিখন আচরণ
১। এটি সরল প্রকৃতির এবং বংশগতির ধারা অনুযায়ী জন্মগতভাবে অর্জিত হয়।	১। এটি জটিল প্রকৃতির এবং অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
২। এটি স্বভাবজাত।	২। এটি স্বভাবজাত নয়।
৩। বৃদ্ধির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।	৩। বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
৪। এটি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট।	৪। এটি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট নয়।
৫। অভিযোজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশ লাভ করে না।	৫। এটি অভিযোজনমূলক পরিবর্তনের ফল। যা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।
৬। নিরপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া (unconditined reflex) দ্বারা প্রভাবিত হয়।	৬। সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া (condition reflex) দ্বারা প্রভাবিত হয়।
৭। এ আচরণ বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হতে থাকে।	৭। এ আচরণ সাধারণত বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হয় না।
৮। সকল শ্রেণির (উচ্চ ও নিম্ন) প্রাণীতে এ আচরণ দেখা যায়।	৮। সাধারণত উচ্চ শ্রেণির প্রাণীতে এ আচরণ দেখা যায়।

১২.৫ Pavlov-এর তত্ত্ব (Therory Of Pavlov)


বিজ্ঞানী প্যাভলভ

আইভান পেট্রোভিচ প্যাভলভ (Ivan Petrovich Pavlov, 1849-1936) স্বনামধন্য একজন রাশিয়ান শারীরবিদ। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯০৪ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তার অন্যতম গবেষণাকর্মের বিষয় ছিল রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভেগাস স্নায়ুর প্রভাব অত্যধিক। পরিপাকের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ে তিনি উঁচুমানের গবেষণা পরিচালনা করেন। ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে কুকুরের লালা নিঃসরণ সংক্রান্ত তাঁর পরীক্ষা শিখন আচরণের এক বিস্ময়কর ঘটনা। প্যাভলভের **সাপেক্ষ প্রতিবর্তী মতবাদ** (Conditional reflex theory) শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

এই মতবাদের মূল কথা হলো– **'পূর্বে যে প্রতিক্রিয়াটি একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি হতো, স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে একটি সাপেক্ষ জুড়ে দেওয়ার ফলে সাপেক্ষ উদ্দীপকটিও ওই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।'**

কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex Action by Dog's Saliva)

বিজ্ঞানী প্যাভলভ কুকুরের পরিপাকের শারীরবৃত্ত নিয়ে গবেষণা করেন। কুকুরের খাবার পরিবেশন করতেন নির্দিষ্ট টেকনিশিয়ান। প্যাভলভ লক্ষ করলেন যে শুধু খাবার দেখলেই কুকুরের লালাক্ষরণ হয় না টেকনিশিয়ানের গায়ের সাদা গবেষণা কোট দেখলেই লালাক্ষরণ শুরু হয়ে যেত। এ থেকে তিনি ধারণা করেন যে, কুকুরকে খাবার প্রদানের সময় যদি কুকুরের চারপাশে সুনির্দিষ্ট উদ্দীপনা থাকে তাহলে তা খাবারের সাথে মিশে কুকুরের লালাক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে।

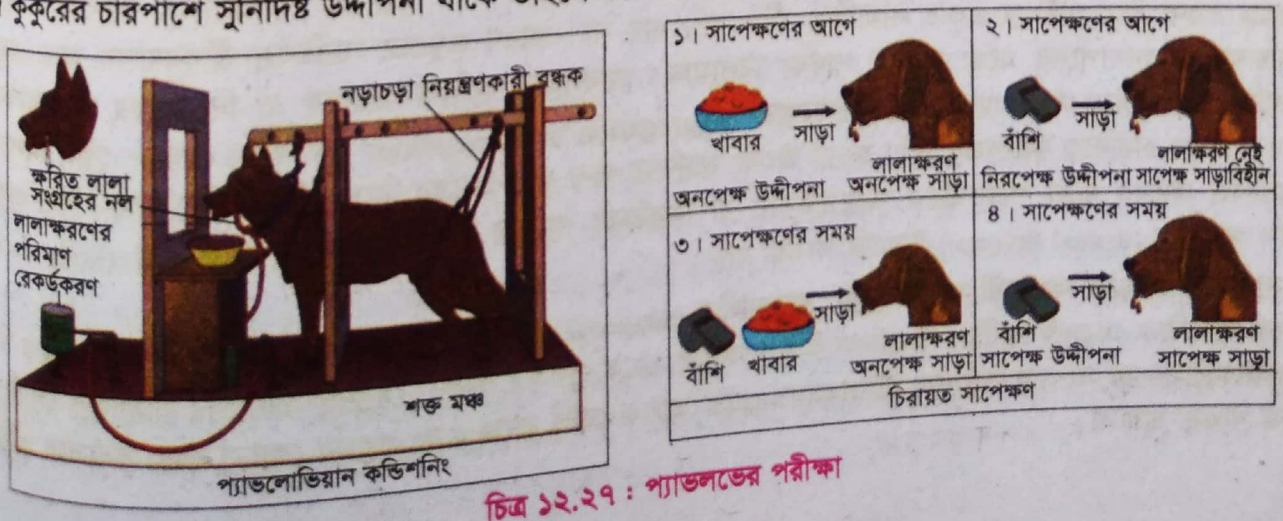

চিত্র ১২.২৭ : প্যাভলভের পরীক্ষা

Scanned with CamScanner

· এছাড়াও বিজ্ঞানী প্যাভলভ কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে সাপেক্ষ প্রতিবর্তের একটি সুন্দর উদাহরণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি একটি কুকুরকে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে খাবার (মাংসের টুকরা) দিতেন। ওই সময় কুকুরের লালা নিঃসরণ হতো (অনপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া) পরে তিনি খাবার দেওয়ার সময় একটি ঘণ্টা বাজাতেন।

কয়েকদিন অনুশীলনের পর তিনি নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দেওয়ার পরিবর্তে কেবল ঘণ্টাধ্বনি করলেন তাতেও কুকুরটির লালা নিঃসরণ হতে দেখা গেল।

এখানে ঘণ্টাধ্বনি শোনা সত্ত্বেও কুকুরের প্রতিবর্ত ঘটেছে, ফলে লালাক্ষরণ হয়েছে। এই প্রকার প্রতিবর্তী ক্রিয়া সাপেক্ষ বা শর্তাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদাহরণ। এইরকম নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্যগ্রহণ, ঘুমানো, মলত্যাগ ইত্যাদি সাপেক্ষ বা অর্জিত প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদাহরণ। সার্কাসে আমরা যে দড়ি বা রিং-এর খেলা দেখি এগুলো বারবার অভ্যাস বা অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করা হয়েছে। এগুলোও একপ্রকারের সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া। অর্থাৎ **সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রতি প্রাণী যে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তাই সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া**। বিজ্ঞানী প্যাভলভের প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যায় :

শিখনের পূর্বে	সাপেক্ষ উদ্দীপক (ঘণ্টাধ্বনি)	সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (লালা ঝরেনি)
	স্বাভাবিক উদ্দীপক (মাংসের টুকরা)	স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (লালা নিঃসরণ)
শিখনের সময়	সাপেক্ষ উদ্দীপক + স্বাভাবিক উদ্দীপক	স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (লালা নিঃসরণ)
শিখনের পর	সাপেক্ষ উদ্দীপক	সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (লালা নিঃসরণ)

❑ **কাজ :** কুকুরের লালা নিঃসরণজনিত আচরণ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ– মূল্যায়ন কর।

১২.৬ সামাজিক আচরণ (Social Behaviour)

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ যেমন সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তেমনি প্রায় সকল জীব জীবনের কোনো এক পর্যায়ে যুগলবদ্ধ হয়ে বা যুথবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে। মৌমাছি, পিঁপড়া, উইপোকা, বোলতা, মাছ, পাখি, হরিণ, বানর ইত্যাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে যুথবদ্ধ জীবনযাপন সামাজিক আচরণে উন্নীত হয়েছে। সামাজিক আচরণে একই প্রজাতিভুক্ত জীবের বিভিন্ন সদস্য একে অন্যের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সহযোগী। প্রজননকালে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সরল এবং সংক্ষিপ্ত **আন্তঃক্রিয়া** বা **মিথস্ক্রিয়া** (interaction) থেকে শুরু করে স্থায়ী জটিল সমাজবদ্ধ জীবনযাপন প্রণালি পর্যন্ত এ জাতীয় আচরণ বিস্তৃত। যেমন– অভিপ্রয়াণ (migration), নিজস্ব অধিকারাধীন এলাকার প্রতিরক্ষা (territorial defence), প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই (fighting), ঝাঁক বাঁধা (flocking), পাল গঠন (herding) ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে প্রাণীদের ভেতর সামাজিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

কোনো এক প্রাণিগোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠন (social organization) তাদের মোট সংখ্যা, বয়স, লিঙ্গ, স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়গুলো আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বা প্রভাবক (factors), যেমন– জনসংখ্যার আধিক্য, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের প্রাপ্যতা, খাদকের চাপ (predation pressure), বসতির ধরন (types of habitat) ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করলে দলবদ্ধ সকল জীবগোষ্ঠীকে প্রকৃত সামাজিক জীব বলা যায় না। কারণ শুধুমাত্র সমষ্টিবদ্ধ জীবনযাপন আর প্রকৃত সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কেবলমাত্র বাহ্যিক প্রভাবক বা নিয়ামকের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক প্রাণী মিলে সমষ্টিবদ্ধ হওয়াকে **দলবদ্ধতা** (aggregation or association) বলা হয়। যেমন– যৌন মিলনের জন্য আলোর চারদিকে কীটপতঙ্গ জমা হওয়া অথবা আর্দ্রতার জন্য নুড়িপাথরের নিচে কেঁচোর ভিড় জমা। কিন্তু প্রকৃত সমাজবদ্ধ জীবের মধ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ায় বা মিথস্ক্রিয়া খাদ্যের বিনিময়, দৈহিক সেবা যত্ন (body care), যৌন আনুকূল্য (sexual favours) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সামাজিক সংগঠন ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী, ঋতুকালীন (seasonal), মৌসুমি বা বার্ষিক হতে পারে। সাংগঠনিক দিক থেকে সামাজিক মেরুদণ্ডী প্রাণীরা সামাজিক কীটপতঙ্গকুল থেকে পৃথক। কারণ, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সামাজিক গোষ্ঠীতে প্রজননকারী সদস্য সংখ্যার অনুপাত কীটপতঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি থাকে এবং এখানে কোনো বন্ধ্যা সদস্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

Scanned with CamScanner

সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social being)

(১) নির্দিষ্ট সামাজিক প্রাণিগোষ্ঠীতে একই প্রজাতির অনেক সদস্য সক্রিয়ভাবে একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। (২) যুথবদ্ধতা ক্ষুদ্রতম সামাজিক গোষ্ঠী একটিমাত্র পুরুষ ও স্ত্রী সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে, যারা কেবল প্রজননকালে আন্তঃক্রিয়া করে। (৩) সামাজিক সংগঠনে এবং আচরণে শ্রমবিভাজন অত্যন্ত স্পষ্ট। (৪) সামাজিক গোষ্ঠীতে বিভিন্ন প্রজাতির জনুর অধিঃক্রমণ (overlaping of generations) স্বাভাবিক ঘটনা। অর্থাৎ পরিবার বা পরিবারের অংশ একত্রে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা অপরিণত সন্তানদের রক্ষাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। আর উন্নত অবস্থায় তিন বা ততোধিক জনু সারা বছর ধরে অথবা কিছু কিছু প্রাণীতে জীবনব্যাপী একত্রে অবস্থান করে।

অ্যাল্ট্রুইজম (Altruism) : পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা বা সহমর্মিতা বা পরার্থপরতা

ফ্রেঞ্চ *altruisme* এবং ইতালীয় *altrui* থেকে altruism শব্দটির উদ্ভব, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরার্থবাদ বা পরার্থিতা। The principles of living and acting for the interest of others অর্থাৎ কিছু সংখ্যক জ্ঞাতিকে (kin) সুবিধা করে দিতে গিয়ে অনেকে আত্মত্যাগ করে, এমনকি আত্মাহুতিও দিয়ে থাকে। এ রকম আচরণের মূল কথা হচ্ছে পরার্থিতা। **সন্তান-সন্ততিকে লালন-পালন করতে গিয়ে পিতা-মাতার আত্মত্যাগ, শত্রুর আক্রমণ থেকে অধঃবংশ রক্ষা করতে গিয়ে পিতা-মাতার মৃত্যুবরণ প্রভৃতিকে পরার্থিতা বা অ্যাল্ট্রুইজম বলে**। যেসব জীব ত্যাগ স্বীকার করে বা আত্মাহুতি দেয় তাদের জিনোটাইপ টিকে থাকে তাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে। যেমন– পিতার অর্ধেক জিন তার সন্তানদের মধ্যে এবং প্রায় একই জিনোটাইপ বেঁচে থাকা ভাই-বোনদের মধ্যে টিকে থাকে। ফরাসি দার্শনিক **August Comte** (1851) সর্ব প্রথম Altruism শব্দটি প্রণয়ন করেন।

পিঁপড়া, মৌমাছি, বোলতা প্রভৃতি সামাজিক প্রাণীর আচরণেও **অ্যাল্ট্রুইজম** (altruism) লক্ষ করা যায়। যেমন– মৌমাছির ক্ষেত্রে, পুরুষ কর্মীরা মৌচাক গড়ে, নবজাতক ও শিশুদের লালন-পালন করে, খাদ্য সংগ্রহ করে অর্থাৎ মৌচাকের প্রায় সকল কাজই তারা করে। কিন্তু তারা অনুর্বর (sterile)। তাই তারা কোনো অধঃবংশ রেখে যেতে পারে না। কলোনির হাজার হাজার মৌমাছির মধ্যে একমাত্র উর্বর সদস্য হচ্ছে **স্ত্রী মৌমাছি** অর্থাৎ **রানী** (Queen)। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র রানীর জন্য কলোনির অন্য সকল সদস্য আত্মত্যাগ করছে। অ্যাল্ট্রুইজমের উদাহরণস্বরূপ মৌমাছির সামাজিক সংগঠন আলোচনা করা হলো।

মৌমাছির সামাজিক সংগঠন (Social Organisation of Honey Bee)

মৌমাছি Arthropoda পর্বের Insecta শ্রেণির Hymenoptera বর্গের Apidae গোত্রভুক্ত অতি পরিচিতি একটি সামাজিক পতঙ্গ। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে *Apis* গণভুক্ত তিন প্রজাতির মৌমাছি শনাক্ত করা হয়েছে। যথা– *Apis indica*, *A. dorsata* ও *A. florea*। ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত মৌমাছির প্রজাতি হলো যথাক্রমে *Apis mellifera* ও *A. adamsoni*। মৌমাছি একটি অতি পরিচিত সামাজিক পতঙ্গ। এরা দলবদ্ধভাবে মৌচাকে বাস করে। একটি মৌচাকে হাজার হাজার মৌমাছি বাস করে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এরা সুনির্দিষ্ট শ্রমবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধাপূর্বক তাদের নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক জীবন পরিচালনা করে থাকে। সামাজিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌমাছিদের নিম্নলিখিত সামাজিক আচরণ দেখা যায় :

১। বাসা তৈরি : সামাজিক আচরণের মধ্যে বাসা তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচরণ। মৌমাছিদের বাসাকে **মৌ-কলোনি** বা **মৌচাক** (bee colony or honey comb) বলে। এরা নিরাপদ জায়গায় যেমন উঁচু গাছের ডালে, গাছের কোটরে, বাড়ির কার্নিশে বা মাটির দেয়ালের ফাটলে বাসা তৈরি করে। উল্লেখ্য *Apis indica* ও *A. dorsata* গাছের ফোকর, গাছের ডাল, দালান বা ঘরের সুবিধাজনক স্থানে বাসা তৈরি করে। তবে এরা বছরে একবার মাইগ্রেশন করে পাহাড়ী এলাকায় চলে যায়। *Apis flora* ঘরের কার্নিশে বা গাছের ডালে বাসা তৈরি করে। শ্রমিক মৌমাছিদের মোমগ্রন্থি নিঃসৃত মোম দিয়ে মৌচাক তৈরি হয়। মৌচাকে অসংখ্য অনুভূমিক প্রকোষ্ঠ থাকে। চাকের উপরের প্রকোষ্ঠগুলোতে মধু ও পরাগ সঞ্চিত থাকে এবং নিচের প্রকোষ্ঠগুলোতে ডিম, লার্ভা ও পিউপা দশা থাকে। এ প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে কয়েকটি বড়গুলো রানী কুঠুরি। উল্লেখ্য, পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিরা প্রকোষ্ঠের মধ্যে থাকে না, বাইরে থাকে।

Scanned with CamScanner

২। বৃহত্তর জনসংখ্যা : একটি সামাজিক দলে বিভিন্ন কাজকর্ম করার জন্য পর্যাপ্ত সদস্যের প্রয়োজন হয়। একটি মৌচাকে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার বা তারও অধিক সংখ্যক মৌমাছি থাকে। তবে একটি মৌচাকের সকল সদস্য পূর্বতন একটি মাত্র রানীর সন্তান। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এক মৌচাকের মৌমাছিকে অন্য মৌচাকের সদস্য করে নেওয়া হয় না।

৩। বহুরূপিতা : একটি মৌচাকে তিন জাতের বা **কাস্টের** (caste) সদস্য মৌমাছি দেখা যায়। যেমন– একটি **রানী** (queen), কয়েকশত **পুরুষ** (drone) এবং কয়েক হাজার **কর্মী** বা **শ্রমিক** (worker)। শ্রমবণ্টনের ভিত্তিতে এদের দৈহিক গঠনের পার্থক্য দেখা যায়। এদের এরূপ অবস্থাকে **বহুরূপিতা** (polymorphism) বলে।

(ক) রানী মৌমাছি (Queen Bee) : মৌমাছির মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রানীই সমাজের মধ্যমণি। প্রত্যেকটি কলোনিতে ২০০-৩০০ পুরুষ ও ১০,০০০-৮০,০০০ কর্মী মৌমাছি থাকে এবং কলোনিটি ১টি মাত্র রানীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। কলোনির অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা রানীর দেহ অনেক বড়, দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫-২০ মিলিমিটার। এদের পা খর্বাকার কিন্তু মজবুত, উদর প্রলম্বিত, উদরের শেষভাগ ক্রমশ সরু। দেহের তুলনায় ডানা দুটি ছোট। এদের ম্যান্ডিবল (mandible) সুচালো এবং মুখোপাঙ্গ খাটো। হুলে বার্ব না থাকায় এরা বার বার হুল ফুটাতে পারে। এদের লালাগ্রন্থি থাকে না। উদরের শেষভাগে বাঁকানো হুলের মতো ডিম্ব প্রতিস্থাপন যন্ত্র ওভিপোজিটর (ovipositor) থাকে, যা আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। সঙ্গমের পর রানী দিনে ১,৫০০-২০০০ ডিম পাড়তে সক্ষম। ডিমগুলো নিষিক্ত বা অনিষিক্ত হতে পারে। ডিম নিষিক্তকরণ সম্পূর্ণরূপে রানীর নিয়ন্ত্রণাধীন।



চিত্র ১২.২৮ : বিভিন্ন প্রকার মৌমাছি ও মৌচাকের অংশবিশেষ–
ক. রানী, খ. কর্মী, গ. পুরুষ, ঘ. মৌচাকের অংশবিশেষ

অনিষিক্ত ডিম থেকে **অপুংজনি** (parthenogenesis) পদ্ধতিতে পুরুষ মৌমাছির জন্ম হয়। এরা জিনগত দিক থেকে হ্যাপ্লয়েড এবং এদের ক্রোমোজোম সংখ্যা ১৬টি। আর নিষিক্ত ডিম থেকে ডিপ্লয়েড স্ত্রী মৌমাছির জন্ম হয় এবং এদের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৩২টি। রানী ও শ্রমিক ভেদে লার্ভার খাদ্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। রানী মৌমাছিরা ৩-৫ বছর বাঁচে। রানী তার জীবদ্দশায় মাত্র একবার পুরুষ মৌমাছির সঙ্গে প্রজননে লিপ্ত হয়। ৪-১০ দিন বয়স্ক রানী মুক্ত আকাশে পুরুষের সঙ্গে মিলনে অংশগ্রহণ করে। আকাশে রানী ও পুরুষের মিলনকে **বৈবাহিক উড্ডয়ন বা নাপসিয়াল উড্ডয়ন** (naptial flight) বলে। সংগমকালে পুরুষ প্রায় দুই কোটি শুক্রাণু নিঃসরণ করে যেগুলো স্ত্রী স্পার্মাথিকায় বহুদিন ধরে সঞ্চিত ও কর্মক্ষম থাকে। তাই রানীর ইচ্ছামাফিক সঞ্চিত এ শুক্রাণু দ্বারা ডিম নিষিক্ত হয়।

রানী মৌমাছির ত্বক নিঃসৃত হরমোন গুণসম্পন্ন **অক্সোডিকেনইক এসিড** চাকের সর্বত্র বিসরিত হয়ে সকল মৌমাছির যাবতীয় কার্যকলাপ সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। রানী মৌমাছির ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (mandibular gland) থেকে Queen substance নামক এক বিশেষ ধরনের **ফেরোমন** (pheromone = oxydecenoic acid) নিঃসৃত হয়। এ ফেরোমন কর্মীদের জননাঙ্গের পরিপক্বতায় বাধা প্রদান করে। কলোনির প্রয়োজন অনুযায়ী রানী নিষিক্ত ও অনিষিক্ত ডিম পাড়ে কিংবা নতুন কলোনি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু কর্মী পুরুষ মৌমাছিসহ অন্যত্র গমন করে। ভবিষ্যৎ রানীর লার্ভাগুলো তরুণ কর্মী মৌমাছির **গলবিল গ্রন্থি** (hypopharyngeal gland) থেকে ক্ষরিত নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ **রয়াল জেলি** (royal jelly) খেয়ে বড় হয়, ফলে রানী মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়। এ ঘটনাকে **সুপার সিডিওর** (super sedure) বলে। ১৬ দিনের মধ্যে মৌমাছিরা রানীকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। অপরপক্ষে শ্রমিক ও পুরুষ মৌমাছি লার্ভা অবস্থায় মধু ও **মৌরুটি** বা **বি-ব্রেড** (bee bread) খেয়ে বড় হয়। নতুন রানী বের হয়ে হুল ফুটিয়ে মৌচাকে বিকাশরত অন্যান্য রানীদের হত্যা করে। একই সময়ে দুটি নতুন রানী বের হলে এরা **মরণ যুদ্ধে** (duel to the death) লিপ্ত হয়। বিজয়ী রানী কলোনির সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে। নতুন রানী বয়স্ক ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কর্মী মৌমাছিরা তাকে মেরে ফেলে। ঝাঁক গঠনের সময় রানী সবসময় মৌচাকে অবস্থান করে।

Scanned with CamScanner

কাজ : রানী মৌমাছির প্রধান কাজ ডিম পাড়া। এরা চাক নির্মাণ, মোম, মধু উৎপাদন এবং পরাগরেণু বা মকরন্দ বা পুষ্পসুধা (nectar) সংগ্রহ ইত্যাদি কোনো কাজেই অংশ নেয় না।



চিত্র ১২.২৯ : ক. রানী মৌমাছিকে পরিচর্যারত কর্মী মৌমাছি, খ. কর্মী মৌমাছি ড্রোন বা পুরুষকে খাদ্য প্রদান করছে, গ. কর্মী মৌমাছিদের বিভিন্ন কাজ : ১. লার্ভাকে খাদ্য প্রদান, ২. কুঠুরিতে পরাগ সঞ্চারণ, ৩. কুঠুরিতে মকরন্দ সঞ্চয়, ৪. উপনিবেশে প্রবেশকারী অচেনা মৌমাছিকে বাধাদান।

(খ) পুরুষ মৌমাছি (Drone) : পুরুষ মৌমাছি রানী অপেক্ষা আকারে কিছুটা ছোট এবং লম্বায় ১৫-১৭ মিলিমিটার। তবে এদের দেহ বেশ সুগঠিত। এরা শ্রমিকদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়। এদের মোম গ্রন্থি, পরাগ সংগ্রাহক যন্ত্র এবং হুল থাকে না। এরা হ্যাপ্লয়েড ও উর্বর (fertile); রানীর সঙ্গে যৌন মিলনে অংশগ্রহণ করে। কলোনিতে ৩০০-৩০০০ পর্যন্ত পুরুষ বা ড্রোন মৌমাছি থাকে। উল্লেখ্য, চাকে অনেক পুরুষ থাকলেও একটি মাত্র পুরুষ রানীর সঙ্গে মিলনে অংশগ্রহণ করতে পারে। পুরুষ মৌমাছি ১০ দিন বয়সে স্ত্রী মৌমাছির সঙ্গে মিলনের উপযোগী হয় এবং এরা বৈবাহিক উড্ডয়নকালে রানীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পর্যাপ্ত শুক্রাণু স্খলন করে। মিলনের ঠিক পরই পুরুষটি মারা যায়। সাধারণভাবে পুরুষের আয়ু ৫০-৬০ দিন পর্যন্ত হয়। এরা মৌচাকের অলস প্রকৃতির ও কোলাহল সৃষ্টিকারী সদস্য। পুরুষ মৌমাছিরা নিজেরা খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম। কিন্তু এরা প্রচুর পরিমাণে খাবার আত্মসাৎ করে। কর্মী মৌমাছিরা প্রজনন ঋতুতে পুরুষদের যত্ন নেয়। খাদ্যের জন্য এরা কর্মী মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল। চাকে খাদ্যের অভাব দেখা দিলে কর্মী মৌমাছিরা এদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে, এমনকি চাক থেকে বের করে দেয়। তখন এরা অনাহারে মারা যায়, এজন্য কখনো কখনো চাক পুরুষশূন্য হয়ে যায়। বর্ষা ও শীতে এরা উপনিবেশ থেকে বিতাড়িত হয়।

কাজ : পুরুষ মৌমাছি কেবল রানীর সঙ্গে প্রজননে অংশ নেয়। এরা মৌচাকের কোনো কাজ করে না। এমনকি মধু ও পরাগ সংগ্রহে অংশ নেয় না। তবে অন্য দলের মৌমাছির অনুপ্রবেশ ঘটলে নিজ কলোনিকে রক্ষার এবং কলোনির তাপ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে এরা অংশগ্রহণ করে থাকে।

(গ) কর্মী মৌমাছি (Workers) : যেসব স্ত্রী লার্ভা কেবল মধু ও বি-ব্রেড খেয়ে বড় হয় তারা বন্ধ্যা কর্মী মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়। এরা সংখ্যায় সর্বাধিক এবং কলোনির ক্ষুদ্রতম সদস্য। এরা কালো বা বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে। কলোনির মোট মৌমাছির প্রায় ৯৯% কর্মী মৌমাছি। এদের ডিম্বাশয় সৃষ্টি হয় না, তাই বন্ধ্যা অর্থাৎ এরা প্রজননে অক্ষম। এদের ডানা দুটি বেশ মজবুত হয় ফলে দ্রুত ডানা সঞ্চালন করতে পারে। এদের পায়ে পরাগ সংগ্রহের থলি বা **পরাগঝুড়ি** (pollen basket) এবং **রেণু চিরুনি** (pollen comb) থাকে। এদের উদরের অঙ্কীয়দেশে মোম নিঃসরণের জন্য **মোমগ্রন্থি** (wax gland) থাকে। দেহের শেষভাগে হুল এবং মস্তকে একটি শোষক নল বা দীর্ঘ প্রোবোসিস (probosis) বিদ্যমান। এদের আয়ুষ্কাল গড়ে ৫০ দিন। বসন্ত ও শীতকালে এরা কঠিন পরিশ্রমে লিপ্ত থাকায় আয়ু কমে যায়। এইসময় এরা মাত্র ৬ সপ্তাহ বাঁচে।

কর্মী মৌমাছিদের শৈশব বলতে কিছু নেই কারণ এরা কলোনির জন্য সর্বদা নিবেদিত। শেষ বয়সে কর্মী মৌমাছি পানি পরিবহন করে ও অবসর যাপন করে। বাহ্যিক পরিবেশগত অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে কলোনির স্বার্থে বয়স নির্বিশেষে সবাই এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্থাৎ কর্মী মৌমাছিদের মধ্যে **অ্যালট্রুইজম** সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। খাদ্য অন্বেষণকারী কর্মী মৌমাছি দু'ধরনের নৃত্য প্রদর্শন করে অন্যান্য মৌমাছিদের খাদের উৎস সম্পর্কে অবগত করে। এই দুই ধরনের নৃত্যকে (চক্রাকার নৃত্য ও ওয়াগল নৃত্য) **মৌমাছির ভাষা** (Bee language) বলে। বিজ্ঞানী **কার্ল ভন ফ্রিস** (Karl von Frisch) প্রথম মৌমাছির নৃত্যের গতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এজন্য তিনি ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

Scanned with CamScanner

কাজ : শ্রমিক মৌমাছি মৌচাকের যাবতীয় কাজ করে। যেমন : মৌচাক নির্মাণ, রানী ও পুরুষের সেবা, মধু ও মকরন্দ বা পুষ্পসুধা সংগ্রহ, মৌচাক পাহারা দেওয়া, চাক পরিষ্কার রাখা এবং সন্তান লালন-পালন করা।

৪। শ্রমবণ্টন : কলোনির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন মৌমাছির সামাজিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সদস্যের বিভিন্ন দায়িত্ব সংক্ষেপে দেওয়া হলো– **রানী :** চাকের সকল মৌমাছিকে নিয়ন্ত্রণ করা, সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া এবং ডিম দেওয়া। **পুরুষ :** রানীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া। **কর্মী :** কর্মীদের মধ্যে আবার বয়সভেদে শ্রমবণ্টন দেখা যায় এবং তারা হলো– আবর্জনা পরিষ্কারক (scavengers); চাক তৈরিকারক ও মেরামতকারক (mason); বাবুর্চি (cook); সেবিকা (nurse); সৈনিক (soldier); গুপ্তচর (scout); মধুকর (brewer); ডিম প্রদায়ী (laying workers) এবং বয়োবৃদ্ধ কর্মী (aged workers)।

৫। খাদ্যের যোগান : কলোনিতে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সামাজিক প্রাণীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ। বিশেষত কর্মী মৌমাছিরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কলোনিতে খাদ্যের যোগান দেয়। এরা মৌচাকের নির্দিষ্ট কুঠুরিতে নিজেদের জন্য ও ভাবী বংশধরদের জন্য মধু ও পরাগরেণু সঞ্চয় করে থাকে।

৬। বাৎসল্য আচরণ : সামাজিক জীবনে বাৎসল্য আচরণ একটি অপরিহার্য দিক। রানী ডিম পাড়ার পর থেকে কর্মী মৌমাছিরা অপত্য লালনে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা ডিম ও লার্ভার যত্ন নেয় এবং খাবার খাওয়ায়। ভাবী রানীর লার্ভাকে অধিক পরিমাণে রাজকীয় জেলি খাওয়ায় এবং কর্মী ও পুরুষ লার্ভাকে মধু ও মৌরুটি এবং স্বল্প পরিমাণে জেলি খাওয়ায়।

৭। পারস্পরিক যোগাযোগ : মৌমাছিরা স্বতন্ত্রভাবে নিজ স্বার্থে কোনো কাজ করে না। সুনির্দিষ্ট শ্রমবণ্টনের মাধ্যমে এরা সুশৃঙ্খলভাবে যার যার কাজ সমাধা করে। গন্ধবস্তু ছড়িয়ে এবং বিশেষ নৃত্যের মাধ্যমে এরা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ও যোগাযোগ সাধন করে থাকে। রানীর এক ধরনের গন্ধবস্তু মৌচাকে মৌমাছিদের আকৃষ্ট করে রাখে এবং অন্য এক ধরনের গন্ধবস্তু কর্মী মৌমাছিদের বন্ধ্যা অবস্থায় রাখতে সহায়তা করে। মৌমাছির নৃত্য দুই প্রকার, যথা–

ক. বৃত্তাকার বা চক্রাকার নৃত্য (Round dance) : এ ধরনের নৃত্য কতগুলো বৃত্তাকার গতিপথের সমাহার। খাদ্য উৎসের অবস্থান বাসার কাছাকাছি (৮০-১০০ মিটার এর মধ্যে) হলে মৌমাছিরা বৃত্তাকার নৃত্য পরিবেশন করে। এ নৃত্যের মাধ্যমে মৌচাকের অন্যান্য সদস্যদেরকে কোনো খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অবহিত করে কিন্তু খাদ্যের উৎসের দিক সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দেয় না। খাদ্য বা **পুষ্পসুধা** (nectar) মজুদের পরিমাণ বেশি হলে নৃত্যের ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পায়।

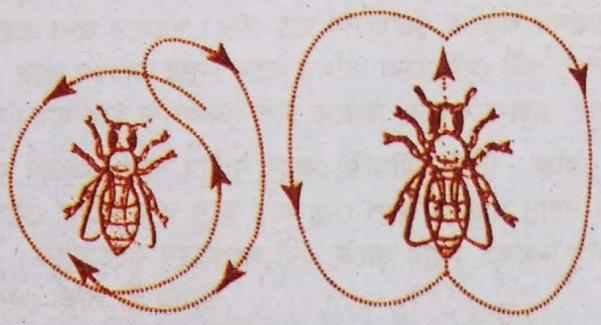

চিত্র ১২.৩০ : মৌমাছির নৃত্য

খ. দোদুল্য বা ওয়াগল নৃত্য (Waggle dance) : এ ধরনের নৃত্যে এমন একটি গতিপথ সৃষ্টি হয় যা বাংলা ৪ (চার) অক্ষরের মতো দেখায়। খাদ্য উৎসের অবস্থান বাসা থেকে ১০০ মিটারের বাইরে হলে মৌমাছিরা দোদুল্য নৃত্য পরিবেশন করে। এ নৃত্যের মাধ্যমে একটি মৌমাছি মৌচাকের অন্যান্য সদস্যদেরকে দুই ধরনের তথ্য প্রকাশ করে থাকে, যথা- খাদ্য উৎসের অবস্থান মৌচাক হতে কত দূরে এবং কোন দিকে। খাদ্য উৎসের অবস্থান যত বেশি দূরে হয় নৃত্যের গতি বা ক্ষিপ্রতা তত কমে যায়। মৌমাছির নৃত্য বা উড্ডয়নের সময় ডানার দ্রুত সঞ্চালনে একটি নিম্নমাত্রার (২৫০-৩০০ হার্টজ) শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা মৌমাছিরা যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

৮। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : রোগাক্রান্ত বা মৃত লার্ভা বা পিউপাকে চাকের বাইরে ফেলে দিয়ে মৌমাছিরা মৌচাককে পরিষ্কার রাখে ও সম্ভাব্য সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।

৯। প্রতিরক্ষা : কর্মী মৌমাছিরা বিশেষ করে বয়স্করা চাক পাহারা দেয় এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকে। কেউ চাকে হানা দিলে তাকে হুল ফুটিয়ে প্রতিহত করে থাকে।

Scanned with CamScanner

১০। **উত্তরাধিকার নির্বাচন :** মৌচাকের সর্বসময় কর্ত্রী যেহেতু রানী মৌমাছি, সেহেতু কোনো কারণে রানী মারা গেলে বা চাক ত্যাগ করলে কর্মী মৌমাছিরা রানীর নতুন উত্তরাধিকার নির্বাচনে সচেষ্ট হয়। এজন্য তারা ৩ দিন বয়সী এক বা একাধিক রানী কুঠুরির লার্ভা নির্বাচন করে তাকে বা তাদেরকে প্রয়োজনীয় রাজকীয় জেলি খাওয়ায়। এভাবে ১৬ দিনের মধ্যে কর্মী মৌমাছিরা নতুন রানীকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। কোনো চাকে একাধিক রানীর জন্ম হলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং শক্তিশালী রানী অন্যদের হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলে চাকের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

১১। **ঝাঁক বাঁধা বা সোয়ার্মিং :** মৌচাকে যেকোনো কারণে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এর চাপ কমাতে নতুন কলোনি সৃষ্টির জন্য রানী মৌমাছি কিছু পুরুষ ও কর্মী নিয়ে দিনের মধ্যভাগে উড়ে যায়। একে ঝাঁক বাঁধা বা **সোয়ার্মিং** (swarming) বলে। সোয়ার্মিংয়ের পর নতুন স্থানে চাক সৃষ্টি হয়। পুরাতন মৌচাকেও নতুন রানীর সৃষ্টি হয় এবং সেখানেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলতে থাকে।

মৌমাছি সামাজিক জীব। এরা মৌচাকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। এদের অসামান্য পরিশ্রম করার ক্ষমতা, আত্মত্যাগ, সংহতি, সহনশীলতা উল্লেখযোগ্য। এরা শ্রমবণ্টনের মাধ্যমে আপন স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের মঙ্গলের জন্য আজীবন কাজ করে যায়। এদের সামাজিক জীবনযাত্রা এমনই চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক যে, তাদের আচরণ ও কাজের বৈচিত্র্য, শৃঙ্খলাবোধ, সঞ্চয়ী বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি মানুষের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। এদের কাছ থেকে মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে।

❑ **কাজ :** (i) অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মৌমাছির সামাজিক আচরণ অনেক উন্নত– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। (ii) মৌমাছিরা কীভাবে একে অন্যের উপকার করে তা বুঝিয়ে দাও। (iii) মৌমাছিদের ভাব বিনিময়ে নৃত্যের কৌশল ব্যাখ্যা কর। (iv) শিখন আচরণ কীভাবে সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে? (v) মৌমাছি চরমভাবে অ্যালট্রুইস্টিক– বিশ্লেষণ কর। (vi) পারস্পরিক সহযোগিতা প্রাণিজগতের অনেক সদস্যে পরিলক্ষিত হয়– যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। (vii) মৌমাছি একত্রে বাস করে ঝাঁক বেঁধে সমাজবদ্ধ জীবের ন্যায় আচরণ করে– ব্যাখ্যা কর।

বয়সভেদে শ্রমিক মৌমাছির কাজের তালিকা–

বয়স (দিনে)	পালনীয় কর্তব্য
১-৩	কুঠুরি পরিষ্কার
৩-৬	বয়স্ক লার্ভার খাদ্য সরবরাহ
৬-১৫	তরুণ লার্ভার খাদ্য সরবরাহ
১০-২৩	চাক পরিষ্কার ও অন্যান্য গৃহকাজ
১০ ও তদূর্ধ্ব	চাক থেকে প্রথম উড্ডয়ন
১২-১৫	খাদ্য সংগ্রাহক মৌমাছি থেকে মকরন্দ বা পুষ্পসুধা গ্রহণ
১৬-১৮	মোম উৎপাদন ও মৌচাক নির্মাণে অংশগ্রহণ করা
২০ ও তদূর্ধ্ব	খাদ্য সংগ্রহ
২৪ ও তদূর্ধ্ব	পাহারার দায়িত্ব

রানী, পুরুষ ও কর্মী মৌমাছির মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য

তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	রানী মৌমাছি	পুরুষ মৌমাছি	কর্মী মৌমাছি
১। আকার	আকারে বড়।	আকারে কিছুটা ছোট। তবে কর্মী মৌমাছির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়।	আকারে ছোট অর্থাৎ কলোনির ক্ষুদ্রতম সদস্য।
২। প্রজনন	প্রজননে সক্ষম।	প্রজননে সক্ষম।	প্রজননে অক্ষম।
৩। মৌচাকের কাজ	মৌচাকের কোনো কাজেই অংশ নেয় না।	অংশ নেয় না।	অংশ নেয়।
৪। খাদ্য সংগ্রহ	খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম।	খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম।	খাদ্য সংগ্রহে সক্ষম।
৫। মধু ও পরাগ সংগ্রহ	মধু ও পরাগ সংগ্রহে অংশ নেয় না।	অংশ নেয় না।	অংশ নেয়।
৬। ফেরোমন	নিঃসৃত করে।	নিঃসৃত করে না।	নিঃসৃত করে না।
৭। আয়ুষ্কাল	প্রায় ২-৩ বছর।	প্রায় ৫০-৬০ দিন।	প্রায় ৫০ দিন।

Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ

- **আচরণ :** বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার কারণে প্রাণিদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার বহিঃপ্রকাশকে আচরণ বলে।
- **ইথোলজি বা আচরণ বিদ্যা :** প্রাণিবিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণীদের আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে ইথোলজি বা আচরণ বিদ্যা বলে।
- **উদ্দীপক :** প্রাণিদেহে যার কারণে উদ্দীপনা ঘটে তাকে বলে উদ্দীপক। দেহে যে পরিবর্তনের কারণে ইন্দ্রিয়-সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু উদ্দীপিত হয় তাই উদ্দীপক।
- **নির্গমণ উদ্দীপনা :** এটি একটি সাধারণ উদ্দীপনা। কোনো প্রজাতির এক সদস্য যখন একই প্রজাতির আরেক সদস্যের উদ্দেশে আচরণগত সাড়ার অংশ হিসেবে ক্রমাগত উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটায় তখন তাকে নির্গমণ উদ্দীপনা বা রিলিজার বলা হয়।
- **টারমিনেটিং উদ্দীপনা :** যে উদ্দীপনায় আচরণগত সাড়ার সমাপ্তিকরণ ঘটে তাকে টারমিনেটিং উদ্দীপনা বা সমাপ্তিকরণ উদ্দীপনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এটি সাধারণত দুধরনের হয়ে থাকে, যথা- বাহ্যিক টারমিনেটিং উদ্দীপনা ও অন্তঃস্থ টারমিনেটিং উদ্দীপনা।
- **সংবেদন :** উদ্দীপকের প্রভাবে সৃষ্ট উদ্দীপনা ইন্দ্রিয়-সংলগ্ন অন্তর্মুখী নিউরনের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছালে যে অনুভূতির উদ্রেক হয় তাকে বলে সংবেদন।
- **FAP :** জিন নিয়ন্ত্রিত ও বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রিপ্রোগ্রামড অবস্থায় সংরক্ষিত জিনোমে স্থান পাওয়া শিক্ষাবহির্ভূত বা পূর্ব অভিজ্ঞতামুক্ত প্রজাতি নির্দিষ্ট আচরণ। অথবা, প্রাণীর জিন নির্ধারিত যেসব আচরণধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদর্শিত হয় এবং প্রজাতির অন্য কোনো সদস্যকে না দেখেই বা অন্যের নিকট থেকে না শিখেই প্রকাশিত হয় তাকে নির্ধারিত ক্রিয়া ধারা বা ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন (FAP) বলে।
- **সহজাত আচরণ :** জীবদ্দশায় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো প্রজাতির প্রতিটি প্রাণী পূর্বের অভিজ্ঞতা বা শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ছাড়া বংশানুক্রমে একইভাবে যেসব জন্মগত আচরণ বা কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করে তাকে সহজাত আচরণ বলে।
- **প্রতিবর্তী ক্রিয়া :** বাহ্য উদ্দীপক কোনো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ক্রিয়া করায় স্নায়ু উদ্দীপিত হলে মেরুরজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আকস্মিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে। সাধারণত মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে এ ক্ষেত্রে মেরুরজ্জুর মাধ্যমে সংবেদী উদ্দীপনা ক্রিয়াজ উদ্দীপনায় (motor impulse) পরিবর্তিত হয়।
- **সহজাত বা অনপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া :** যেসব প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত, স্থির এবং কোনো শর্তাধীন নয় তাদের সহজাত বা অনপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।
- **অর্জিত বা সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া :** যেসব প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত নয়, বার বার অনুশীলনের ফলে অর্জিত হয় এবং শর্তসাপেক্ষ, তাদের অর্জিত বা সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।
- **সহজাত আবেগ :** একটি প্রজাতির সকল সদস্য জন্মগতভাবে প্রাপ্ত যে শক্তির সাহায্যে কোনো শিক্ষণ ছাড়া এবং উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত না থেকে আত্মরক্ষা ও প্রজাতি রক্ষায় বংশপরম্পরায় একই ভাবে কাজ করে থাকে, সেটিই হচ্ছে সহজাত আবেগ বা ইনসটিংক্ট।
- **মামুলি আচরণ :** উদ্দীপক দ্বারা সূচিত এমন এক আচরণ, যা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সহজাত এবং জনগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ। এরূপ আচরণের মধ্যে ট্যাক্সিস, রিফ্লেক্সেস এবং ইনসটিংক্টস অন্তর্ভুক্ত।
- **প্রেষণা বা প্রেরণা :** কোনো প্রাণীর আচরণগত সাড়ার ব্যপ্তি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটার পেছনে বিভিন্ন উদ্দীপনার সম্মিলন কাজ করে। বিভিন্ন উদ্দীপনার এই সম্মিলন প্রেষণা বা প্রেরণা বা মোটিভেশন নামে পরিচিত। এটি এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যা প্রাণীকে কোনো কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।
- **অনুষঙ্গ :** স্থান বা কালে দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক বা যোগাযোগ সৃষ্টির নাম অনুষঙ্গ।
- **বুদ্ধি :** এটা এমন এক মানসিক ক্ষমতা বা যোগ্যতা, যার মাধ্যমে প্রাণী তার পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয় সাধন করতে পারে এবং সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।
- **ওরিয়েন্টেশন :** পারিপার্শ্বিক উদ্দীপনার প্রতি উপযুক্ত সাড়া প্রদর্শনের জন্য জীবদেহের অবস্থানের পরিবর্তনজনিত উপযোজনকে ওরিয়েন্টেশন বলে। ওরিয়েন্টেশন জীবের অভিযোজিত আচরণের এক সরল অবস্থা। অন্যকথায়, ওরিয়েন্টশন হলো কোনো উদ্দীপকের প্রভাবের ফলে দেহকে সরিয়ে বা ঘুরিয়ে মানানসই অবস্থায় নেওয়া।
- **ট্যাক্সিস :** উদ্দীপকের প্রভাবে অবিরত এবং সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত ওরিয়েন্টেশনকে ট্যাক্সিস বলে। অর্থাৎ উদ্দীপকের উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দেহ অক্ষের অবস্থানগত পরিরর্তনের নাম ট্যাক্সিস। এক্ষেত্রে চলনের সঙ্গে ট্যাক্সিসের যৌথ কার্যকারিতায় উদ্দীপকের উৎসের প্রতি, উৎস থেকে দূরে বা নির্ধারিত কোণে প্রাণীর দৈহিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে।
- **বাৎসল্য আচরণ :** প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য পিতা-মাতা কর্তৃক ডিম ও শিশুসন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং লালন-পালন করার স্বভাবকে বাৎসল্য আচরণ বা অপত্যের প্রতি যত্ন বলে। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য এটা এক বিশেষ ধরনের অভিযোজন।

Scanned with CamScanner

☑ **অভিপ্রয়াণ বা পরিযান :** পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে দুই ভিন্ন বসতির (habitat) মধ্যে একই প্রজাতিভুক্ত সদস্যদের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঋতুভিত্তিক যে গমনাগমন ঘটে তাকে অভিপ্রয়াণ বা পরিযান বা মাইগ্রেশন বলে।

☑ **ট্রানসিয়েন্ট পরিযায়ী :** কিছু প্রজাতির পাখি রয়েছে যারা অন্যদেশে যাওয়ার পূর্বে দুএকদিন বাংলাদেশে অবস্থান করার পর নির্দিষ্ট দেশে উড়াল দেয়। এসব পাখি ট্রানসিয়েন্ট পরিযায়ী নামে পরিচিত।

☑ **শিখন আচরণ :** প্রাণীর যে আচরণ শিক্ষণ, প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকেই শিখন বা শিখন আচরণ বা শিক্ষালব্ধ আচরণ বলা হয়। এই আচরণ সকল স্তরের শিক্ষার অভিজ্ঞতাকেই ব্যাখ্যা করে। প্রাণীর শিখন আচরণ পরিবর্তনশীল, কারণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশ থেকে প্রাণী সর্বদাই কিছু না কিছু অর্জন করতে থাকে।

☑ **অভ্যাসগত শিখন আচরণ :** কোনো প্রাণীকে যদি একটি বিশেষ উদ্দীপকের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করা হয় তাহলে প্রাণীটি উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাতে একসময় অনিচ্ছা বা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। একে অভ্যাসগত শিখন আচরণ বলে।

☑ **অনুকরণ :** শৈশবে প্রতিটি প্রাণীর মগজ বা মস্তকে যা কিছু মুদ্রিত (imprint) হয় পরবর্তীতে তার আলোকেই সে বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া প্রদান করে থাকে। একে অনুকরণ বলে।

☑ **ফেরোমোন :** কতক প্রাণীর এক্টোডার্মের সনালগ্রন্থি নিঃসৃত যে রাসায়নিক পদার্থ দেহের বাইরে নির্গত হয়ে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্বাদেন্দ্রিয় বা সরাসরি গলাধঃকরণের মাধ্যমে একই প্রজাতিভুক্ত অপর সদস্যের ওপর ক্রিয়া করে সুনির্দিষ্ট আচরণগত প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় তাকে ফেরোমোন বলে।

☑ **অ্যালট্রুইজম :** সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়ায় একই প্রজাতির কতক প্রাণী নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বা ব্যক্তিগত প্রজননিক (reproductive) অসুবিধা ভোগ করে অপর সদস্যদের হিতার্থে সময় ও শক্তি উৎসর্গ করে তাকে অ্যালট্রুইজম বলে।

☑ **সামাজিক আচরণ :** কোনো একটি প্রাণী প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মাঝে নির্দিষ্ট সময়ে বা সারাজীবন ব্যাপী আত্মত্যাগ, সংহতি, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবদ্ধতার ভিত্তিতে বসবাসের জন্য যে আচরণ প্রকাশিত হয় তাকে সামাজিক আচরণ বলে।

☑ **সোয়ার্মিং বা ঝাঁক বাঁধা :** মৌচাকে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এর চাপ কমাতে নতুন কলোনি সৃষ্টির জন্য রাণী মৌমাছি কিছু পুরুষ ও কর্মী নিয়ে দিনের মধ্যভাগে উড়ে যায়। একে সোয়ার্মিং বা ঝাঁক বাঁধা বলে। মৌমাছির ঝাঁক বাঁধার প্রধান শর্তগুলো হলো : যখন রানী ডিম পাড়তে অক্ষম হয় বা বন্ধ্যা হয়; যখন শ্রমিক মৌমাছির সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যায়; যখন মৌচাকের বায়ু চলাচলে বিঘ্ন ঘটে; যখন কলোনিতে স্থানাভাব ঘটে; যখন অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয় এবং যখন শত্রু বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফেনোট্যাক্সিসের সঙ্গে নিম্নের কোনটি জড়িত? *[ঢা. বো. ২০১৮]*
ক আলো খ শব্দ গ স্রোত ঘ অভিকর্ষ

২. জিগ-জ্যাগ নৃত্য প্রদর্শন করে কোন প্রাণী? *[ঢা. বো. '১৭; দি. বো. '১৭]*
ক ব্যাঙ খ মৌমাছি গ স্টিকলব্যাক ঘ টুনটুনি

৩. প্যাভলভ কোন ধরনের শিখনের পরীক্ষা করেন? *[ঢা. বো. '১৬]*
ক সাপেক্ষণ খ অনুকরণ গ পরীক্ষালব্ধ ঘ সুপ্ত

৪. রাজকীয় জেলি তৈরি করা কোন মৌমাছির কাজ? *[কু. বো. '১৬]*
ক রানী খ ড্রোন গ কর্মী ঘ কর্মী ও ড্রোন উভয়ের

৫. মৌচাকে মৌমাছির আচরণ কী ধরনের? *[ব. বো. '১৬]*
ক সহজাত খ সামাজিক গ শিখন ঘ প্রতিবর্তী

৬. রানী মৌমাছির দেহ থেকে কোন হরমোন নিঃসৃত হয়? *[কু. বো. ২০১৭]*
ক এস্ট্রোজেন খ প্রোজেস্টেরণ
গ টেস্টোস্টেরণ ঘ ফেরোমোন

৭. প্রতিবর্তী ক্রিয়া কত প্রকার?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৮. কেঁচোর সবসময় ভিজা মাটিরে দিকে গমন কোন ধরনের ট্যাক্সিস? *[ব. বো. '১৭]*
ক হাইড্রোট্যাক্সিস খ জিওট্যাক্সিস
গ ফিটোট্যাক্সিস ঘ কেমোট্যাক্সিস

৯. প্রজনন ঋতুতে কার্প মাছের হালদায় আগমন কোন ধরনের আচরণ? *[ঢা. বো. '১৫]*
ক জিওট্যাক্সিস খ থ্যার্মোট্যাক্সিস
গ অ্যারোট্যাক্সিস ঘ রিওট্যাক্সিস

১০. আগুনে কার হাত পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত সরিয়ে নিবে। এটা কোন ধরনের আচরণ? *[রা. বো. '১৫]*
ক স্বভাবজাত খ প্রতিবর্ত ক্রিয়া গ শিখন ঘ ট্যাক্সিস

১১. প্রাণীদের ক্ষেত্রে অ্যালট্রুইজম হলো– *[য. বো. '১৫]*
ক পরার্থপরতা খ স্বার্থপরতা
গ অস্বাভাবিকতা ঘ অর্জিত গুণ

১২. ক্ষুধার্ত প্রাণী অন্যকে খাবার খেতে দেখলে তার লালা ক্ষরণ হয়, এটি– *[য. বো. '১৫]*
ক সহজাত আচরণ খ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া
গ অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘ শিক্ষণ আচরণ

Scanned with CamScanner

১৩. প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা কী বলা হয়? [চ. বো. '১৫]
ক Ethology খ Taxonomy
গ Ecology ঘ Embryology

১৪. সামাজিক আচরণ প্রদর্শনকারী প্রাণী কোনটি? [চ. বো. '১৫]
ক কুকুর খ মৌমাছি গ বাবুই পাখি ঘ ব্যাঙ

১৫. আলোর প্রতি প্রাণীর সাড়া দৌয়াকে কী বলে? [রা. বো. '১৯]
ক ফটোট্যাক্সিস খ টেলোট্যাক্সিস
গ নেমোট্যাক্সিস ঘ ট্রোপোট্যাক্সিস

১৬. ইথোলজির জনক কে? [সি., কু., ব., চ., য., দি. বো. '১৮; সি. বো. '১৫]
ক কোনরাড লরেঞ্জ খ নিকো টিনবার্জেন
গ আই.পি. প্যাভলভ ঘ কার্ল ফন ফ্রিস

১৭. সূর্যের প্রতি সাড়া দিয়ে পিঁপড়ার চলন নিম্নোক্ত কোন ধরনের? [চ. বো. '১৯]
ক ট্রোপোট্যাক্সিস খ টেলোট্যাক্সিস
গ মেনোট্যাক্সিস ঘ নেমোট্যাক্সিস

১৮. সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [ব. বো. '১৯]
ক বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত খ প্রজাতি নির্দিষ্ট নয়
গ বংশানুক্রমে একইভাবে প্রদর্শিত
ঘ অনুশীলন দ্বারা অর্জিত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৯. প্রাণীর সহজাত আচরণ হলো— [ঢা. বো. '১৭]
i. মাকড়শার জাল তৈরি ii. টুনটুনি পাখির বাসা নির্মাণ
iii. কুকুরের মুখে লালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. পরিমাণ এবং মৌমাছির পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা যে ধরনের আচরণ— [য. বো. '১৬]
i. সহজাত আচরণ ii. শিখন আচরণ iii. সামাজিক আচরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. অর্জিত প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো—
i. পূর্বের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল
ii. বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয় না
iii. উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. শ্রমিক মৌমাছির কাজ হলো—
i. মৌচাক নির্মাণ ii. মধু ও মকরন্দ সংগ্রহ
iii. সন্তান লালন-পালন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য হলো— [রা. বো. '১৫]
i. বংশগত ও জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
ii. পর্যায়ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে
iii. শিক্ষা দ্বারা অর্জিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. ট্যাক্সিসের বৈশিষ্ট্য হলো— [য. বো. '১৫]
i. জীব অপরিবর্তনীয় সাড়া দান করে
ii. স্থানিক দিকমুখিতা প্রদর্শন করে
iii. দিকমুখিতার সম্পূর্ণ দেহ জড়িত থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. প্রাণীদের ক্ষেত্রে অ্যাল্ট্রুইজম হলো—
i. পরার্থপরতা ii. অর্জিত গুণ iii. সামাজিক বন্ধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
অন্বেষা দাদা বাড়ি বেড়াতে গিয়ে সে তার দাদুর ঘরে চড়ুই পাখিদের বাসা বাঁধতে দেখল। একই সময় সে লক্ষ্য করল মা মুরগির পিছু পিছু ছানাগুলো উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

২৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম ঘটনাটির প্রকৃতি হলো— [রা. বো. '১৭]
i. জিন নিয়ন্ত্রিত ও বংশগত
ii. বংশ পরম্পরায় একইভাবে আত্মপ্রকাশ
iii. শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. উদ্দীপকের দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রথম ঘটনাটির অনুরূপ নয় কারণ এটি— [রা. বো. '১৭]
i. এক প্রকার শিক্ষালব্ধ আচরণ
ii. প্রতিটি প্রজাতির জন্য সুনির্দিষ্ট
iii. তরুণ বয়সের বর্ধনশীল পর্যায়ে বেশি সংঘটিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জ্বলন্ত কাঠি হাতে লাগলে আমরা হাত সরিয়ে নিই।

২৮. উদ্দীপকের ঘটনাটি স্নায়ুতন্ত্রের কোন অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? [রা. বো. '১৬]
ক সেরেব্রাম খ সেরেবেলাম
গ মেডুলা অবলংগাটা ঘ সুষুম্নাকাণ্ড

২৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি কোন ধরনের আচরণ? [রা. বো. '১৬]
ক ট্যাক্সিস খ প্রতিবর্তী ক্রিয়া
গ সহজাত আচরণ ঘ শিখন আচরণ

⏭ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কিছু কাজ মনের অজান্তেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। যা পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাণীতে লক্ষ করা যায় না। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজ হলো– হঠাৎ তীব্র আলোয় চোখের পিউপিল ছোট হয়ে আসে, আগুনে হাত পড়লে সঙ্গে সঙ্গে হাত সরে আসে।

৩০. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্রিয়াগুলো নিচের কোনটির অন্তর্ভুক্ত?
ক ট্যাক্সিস খ প্রতিবর্তী ক্রিয়া গ অ্যালট্রুইজম ঘ অভিপ্রয়াণ

Scanned with CamScanner

৩১. উদ্দীপকের ক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় কিসের দ্বারা?
ক মস্তিষ্ক খ পেশি গ সুষুম্নাকাণ্ড ঘ অগ্ন্যাশয়

⏭ নিচের উদ্দীপক থেকে ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শীতকালে সাইবেরিয়া থেকে অনেক পাখি অভিপ্রায়ণ ঘটিয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন জলাভূমিতে আসে। আবার মাকড়সা নির্দিষ্ট রীতিতে সুন্দর করে জাল বুনে। [কু. বো. '১৫]

৩২. উদ্দীপকে প্রাণী দুটি কিরূপ আচরণ প্রদর্শন করে?
ক সামাজিক আচরণ খ সহজাত আচরণ
গ শিখন আচরণ ঘ রিফ্লেক্স

৩৩. উদ্দীপকের ২য় প্রাণীর ক্ষেত্রে–
i. স্ক্লেরোপ্রোটিন দ্বারা জালের সুতা গঠিত
ii. একই ব্যাসের ইস্পাতের সুতার চেয়েও শক্ত
iii. ছেঁড়ার আগে দৈর্ঘ্যের $\frac{১}{৫}$ অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

⏭ নিচের উদ্দীপকটি থেকে ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

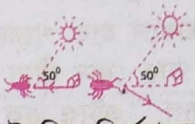

৩৪. উদ্দীপকটি কোন ট্যাক্সিস নির্দেশ করে?
ক রিওট্যাক্সিস খ ট্রপোট্যাক্সিস
গ মেনোট্যাক্সিস ঘ ক্লিনোট্যাক্সিস

৩৫. কোন বিষয়টি বিবেচনায় রেখে উদ্দীপকের প্রাণীটি চলে?
ক কৌণিক দূরত্ব খ চলন পথের দূরত্ব
গ আলো ঘ অন্ধকার

মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৬. 'ব্যাঙের শীতনিদ্রা' কোন ধরনের ট্যাক্সিসের উদাহরণ? [মেডিকেল : ১৮-১৯]
ক ধনাত্মক থার্মোট্যাক্সিস খ ধনাত্মক জিওট্যাক্সিস
গ ঋণাত্মক থার্মোট্যাক্সিস ঘ ধনাত্মক কেমোট্যাক্সিস

৩৭. নিচের কোনটি সমগোত্রীয় পাখির উদাহরণ নয়? [ডেন্টাল : ১৮-১৯]
ক চড়ুই খ চামচঠোঁটি কাদাখোচা
গ হিমালয়ান পার্টিজ ঘ গোল্ডেন প্লোভার

উত্তরমালা

১. (খ); ২. (গ); ৩. (ক); ৪. (গ); ৫. (খ); ৬. (ঘ); ৭. (খ); ৮. (ক); ৯. (ঘ); ১০. (খ); ১১. (ক); ১২. (গ); ১৩. (ক); ১৪. (খ); ১৫. (ক); ১৬. (খ); ১৭. (); ১৮. (গ); ১৯. (ক); ২০. (গ); ২১. (ক); ২২. (ঘ); ২৩. (ক); ২৪. (ঘ); ২৫. (খ); ২৬. (ঘ); ২৭. (খ); ২৮. (ঘ); ২৯. (খ); ৩০. (খ). ৩১. (গ); ৩২. (খ); ৩৩. (ঘ); ৩৪. (গ); ৩৫. (ক); ৩৬. (গ); ৩৭. (ক)।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. আচরণ কী? [ব. বো. '১৫]
২. ইথোলজি বা আচরণ বিদ্যা কাকে বলে?
৩. উদ্দীপক কী?
৪. FAP কী? [সকল. বো. '১৮]
৫. সহজাত আচরণ কী? [য. বো. '১৫]
৬. সহজাত আবেগ বা ইনসটিংক্টস কী?
৭. সহজাত বা অনপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী?
৮. অর্জিত বা সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী?
৯. মামুলি আচরণ কী?
১০. ওরিয়েন্টেশন কী?
১১. ট্যাক্সিস কী? [য.ব. বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭]
১২. রিওট্যাক্সিস কী? [কু. বো.১৭]
১৩. ফটোট্যাক্সিস কী?
১৪. বাৎসল্য আচরণ বা অপত্য লালন কী?
১৫. অভিপ্রয়াণ কী?
১৬. মাইগ্রেশন কী?
১৭. শিখন আচরণ কী?
১৮. অভ্যাসগত শিখন আচরণ কী?
১৯. অনুকরণ বা ইমপ্রিন্টিং কী?
২০. ফেরোমোন কী?
২১. অ্যালট্রুইজম কী? [কু. বো. '১৫; দি. বো. '১৬]
২২. সামাজিক আচরণ কী?
২৩. সোয়ার্মিং বা ঝাঁক বাঁধা কী?
২৪. অনুকৃতি কী?
২৫. টারমিনেটিং উদ্দীপনা কী? [চ. বো. '১৬]
২৬. থিগমোট্যাক্সিস কী? [চ. বো. '১৯]

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে কী বুঝ? [চ. বো. '১৭, ১৬; রা. দি. বো. ১৫]
২. সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে কী বুঝ? [কু. বো. '১৭]
৩. আচরণগত পরিবর্তন বলতে কী বুঝ? [য., দি. বো. '১৫]
৪. সহজাত আচরণ বলতে কী বুঝ? [দি. বো. '১৬]
৫. শিখন আচরণ বলতে কী বুঝায়? [রা. বো. '১৫]
৬. ক্লিনোট্যাক্সিস বলতে কী বুঝায়?
৭. অ্যালট্রুইজম বলতে কী বুঝ? [ব. বো. '১৯; চ. বো. '১৫]
৮. আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।
৯. অপত্য যত্ন বলতে কী বুঝ? [ব. বো. '১৬]
১০. মৌমাছিকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন? [সকল. বো. '১৮]
১১. ট্যাক্সিস বা চলন বলতে কী বুঝ? [রা. বো. '১৫]
১২. নপসিয়াল উড্ডয়ন বলতে কী বোঝ? [ঢা. বো. '১৭]
১৩. বায়োলজিক্যাল রিদম বলতে কী বুঝ? [চ. বো. '১৭]

পার্থক্য লিখ/তুলনা কর :

১৪. প্রতিবর্তী ক্রিয়া ও সহজাত আচরণ।
১৫. রানী, পুরুষ ও কর্মী মৌমাছির মধ্যে তুলনা।

Scanned with CamScanner

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

১। রান্না করার সময় আগুনে হাত পড়ায় সীমা তার হাত দ্রুত সরিয়ে নিল। তার বোন রীমা বিজ্ঞানের ছাত্রী। ঘটনা লক্ষ্য করে বলল, "এটাও এক ধরনের আচরণ। এরূপ আচরণের আরও ঘটনা আমাদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। যেমন, পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে অতি ক্ষিপ্ততার সাথে পা সরিয়ে নেয়া, চোখে কিছু পড়লে আপনা-আপনি চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি।

ক. ট্যাক্সিস কী? *[যশোর বোর্ড-২০১৯]*
খ. অপত্য যত্ন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আচরণের সাথে সামাজিক আচরণের তুলনা কর। *[যশোর বোর্ড-২০১৯]*
ঘ রীমার লক্ষ্য করা আচরণগুলো কোন ধরনের? বিশ্লেষণ কর। *[যশোর বোর্ড-২০১৯]*

২। শীতকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিযায়ী পাখি দেখতে গিয়ে নাফিস সেখানে গাছের ডালে কিছু মৌমাছিও দেখতে পেল যারা বিশেষ ধরনের বাসায় বসবাস করে। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৯]*

ক. থিগমোট্যাক্সিস কী?
খ. বায়োলজিক্যাল রিদম বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে প্রথম উল্লিখিত প্রাণীরা খাদ্য ও নিরাপত্তার জন্য দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়– ব্যাখ্যা কর।
ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রাণীটির সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ কর।

৩। উত্তর অঞ্চল থেকে শীতকালে বাংলাদেশে অনেক পাখি আসে, এছাড়াও উত্তর গোলার্ধের উপকূলীয় অঞ্চলে একধরনের পুরুষ মাছ আছে যা জিগ-জ্যাগ নৃত্য প্রদর্শন করে স্ত্রী মাছকে প্রজননে আকৃষ্টি করে। *[সকল বোর্ড-২০১৮]*

ক. FAP কী?
খ. মৌমাছিকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীর পরিযানের কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের শেষের লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৪। জীববিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষক পাখিদের পরিযানের গুরুত্ব উপস্থাপনের পাশাপাশি মৌমাছি সম্পর্কে মন্তব্যে বললেন যে, অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় তাদের সামাজিক আচরণ অনেক উন্নত। *[ঢাকা বোর্ড-১৭]*

ক. ট্যাক্সিস কী?
খ. নপসিয়াল উড্ডয়ন বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে পাখিদের উপস্থাপিত বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে দ্বিতীয় প্রাণীটি সম্পর্কে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

৫। একটি প্রাণীগোষ্ঠীর সদস্যরা বিশেষ নৃত্যের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে এবং একে অন্যের উপকার সাধন করে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে।

ক. অভিপ্রয়াণ কী?
খ. সহজাত প্রতিরক্ষা বলতে কী বুঝায়? *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীদের ভাববিনিময়ে নৃত্যের কৌশল ব্যাখ্যা কর। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. উদ্দীপকের প্রাণীরা কীভাবে একে অন্যের উপকার করে তা বুঝিয়ে দাও। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*

৬। পায়ে কাঁটা ফুটলে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে পা সরিয়ে নেয়া, আগুনে হাত পড়লে হাত সরে আসা, চোখে কিছু পড়লে আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি একই ধরনের আচরণ।

ক. সহজাত আচরণ কী?
খ. সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাগুলো কোন ধরনের আচরণ? ব্যাখ্যা কর। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]*
ঘ. ঘণ্টাধ্বনির সাথে কুকুরের লালা নিঃসরণজনিত আচরণ উদ্দীপকে উল্লিখিত আচরণের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ– মূল্যায়ন কর। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]*

৭। রাসেলের বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী। চাকরিসূত্রে ওরা সরকারি কলোনিতে বসবাস করে। কলোনিতে আধুনিক জীবন ব্যবস্থার অভাব থাকলেও অভাব নেই প্রাণ প্রাচুর্যের। অভাব নেই পারস্পরিক সহযোগিতার। তারা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদের উপকার করে।

ক. রিওট্যাক্সিস কী?
খ. শিখন আচরণ বলতে কী বুঝায়?
গ. শিখন আচরণ কীভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাসমূহকে প্রভাবিত করে? *[ঢাকা বোর্ড-২০১৬]*
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা প্রাণিজগতের অনেক সদস্যে পরিলক্ষিত হয়– যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখ। *[ঢাকা বোর্ড-২০১৬]*

৮। পুকুর পাড় দিয়ে হাঁটার সময় সজীব দেখল একটি মাছ তার মুখের ভিতরে তার বাচ্চাগুলোকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]*

ক. টারমিনেটিং উদ্দীপনা কী?
খ. প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ আচরণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টির মতো মানব জীবনে কোনো কিছু আছে কি?– মতামত ব্যক্ত কর।

৯। আকিব সিলেটের হাকালুকি হাওরে বেড়াতে গিয়ে শত শত পাখি দেখতে পায়। এরা শীতকালে উত্তর গোলার্ধের বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের দেশে আসে এবং শীত শেষে নিজ দেশে ফিরে যায়। ঢাকা ফিরে আকিব দেখতে পেল কিছু লোক অনুরূপ পাখি খাঁচায় বন্দি করে বিক্রি করছে। *[যশোর বোর্ড-২০১৫]*

ক. সহজাত আচরণ কী?
খ. প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীগুলো আমাদের দেশে আসার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীগুলো সংরক্ষণে করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

Scanned with CamScanner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সর্বশেষ সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সৃজনশীল সংস্করণ

আহছানুল হক আবির

জীববিজ্ঞান



দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়
মাজেদা বেগম ॥ রাশিদা বেগম
সুকিলেশ চন্দ্র কর্মকার
মোহাম্মদ নাদির হোসেন
কানিজ ফাতেমা আনোয়ার

ঐতিহ্যে ৫১ বছর
কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড

Scanned with CamScanner

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি
(বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, মৌখিক পরীক্ষা ও বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার সহায়ক)

প্রথম অধ্যায় : প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস

প্রাণিজগতের ভিন্নতা বা প্রাণিবৈচিত্র্য

১. পৃথিবীর মাটি, বায়ু ও পানিতে বসবাসকারী সকল প্রাণীর মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত, আন্তঃপ্রজাতিগত বা বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকে বলা হয়– প্রাণিবৈচিত্র্য।

২. প্রকৃতিতে প্রাণিবৈচিত্র্য – ৩ প্রকার (জিনগত, প্রজাতিগত ও বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য)।

৩. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুর সঙ্গে জীবজগতের মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় – বায়োম।

৪. রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও সিংহের মধ্যে কোন ধরনের ভিন্নতা বিদ্যমান – আন্তঃপ্রজাতিক ভিন্নতা।

৫. প্রাণিবিদ্যার জনক হলো – অ্যারিস্টটল।

৬. জীবসম্প্রদায়, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা – IUCN।

৭. ICZN এর পূর্ণ রূপ – International Commission on Zoological Nomenclature।

৮. ধরিত্রী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল – ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো।

৯. পৃথিবীতে হটস্পটের সংখ্যা – ২৫টি।

১০. শ্রেণিবিন্যাসের জনক – ক্যারোলাস লিনিয়াস।

১১. আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার জনক – ক্যারোলাস লিনিয়াস।

১২. ক্যারোলাস লিনিয়াসের বিখ্যাত গ্রন্থ– Systema Naturae।

১৩. ট্যাক্সোনমিতে আলোচিত প্রধান বিষয় হলো– শনাক্তকরণ, নামকরণ এবং শ্রেণিকরণ।

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি

১৪. শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিত্তিগুলো হলো – দেহের আকার, সংগঠন মাত্রা, জীবন পদ্ধতি, ভ্রূণস্তর, প্রতিসাম্য, খন্ডকায়ন, অঞ্চলায়ন, প্রান্তিকতা, দেহ অক্ষ ও তল, সিলোম, অঞ্চলায়ন, পুষ্টি পদ্ধতি, নটোকর্ড, ক্লিভেজ, উপাঙ্গ, মেরুদণ্ড ইত্যাদি।

১৫. কোন পর্বের প্রাণীর দেহে একই কাজে নিয়োজিত কোষগুলো কলা গঠন করে অবস্থান করে – Cnidaria।

১৬. মেসোগ্লিয়া দেখা যায় – দ্বিস্তরী প্রাণীতে (হাইড্রা)।

১৭. ভ্রূণস্তর সৃষ্টিকারী দশা হলো – গ্যাস্ট্রুলা।

১৮. স্নায়ুতন্ত্র সৃষ্টি হয় – এক্টোডার্ম থেকে।

১৯. শ্বসনতন্ত্র সৃষ্টি হয় – এন্ডোডার্ম থেকে।

২০. সিলোম সৃষ্টি হয় – মেসোডার্ম থেকে।

২১. সিলোম কোন পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে – পেরিটোনিয়াম (পেরিকার্ডিয়াম– হৃৎপিণ্ডের, পেরিকন্ড্রিয়াম– তরুণাস্থির আবরণী এবং পেরিটোনিয়াম– উদর গহ্বরের পর্দা)।

২২. সিলোমের ভিত্তিতে প্রাণীদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় – ৩টি (সিলোমবিহীন প্রাণী, অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী ও প্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী)।

২৩. সিলোমবিহীন পর্ব – Cnidaria ও Platyhelminthes।

২৪. অ্যাসিলোমেটের উদাহরণ হলো – *Taenia solium*।

২৫. প্রকৃত সিলোমযুক্ত পর্ব – Mollusca, Annelida, Arthropoda, Chordata।

২৬. অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত পর্ব – Nematoda।

২৭. কোন পর্বের প্রাণীদের প্রকৃত খণ্ডায়িত প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয় – Annelida।

২৮. বিসদৃশ খণ্ডায়নের উদাহরণ – পতঙ্গের দেহ।

২৯. ফিতা কৃমির দেহের খণ্ডকগুলোকে বলা হয় – প্রোগ্লোটিড।

৩০. কোন পর্বের প্রাণীর দেহে ট্যাগমা দেখা যায় – Arthropoda।

৩১. চিংড়ির দেহে কয়টি ট্যাগমা – ২টি।

৩২. Insecta শ্রেণির প্রাণীদের ট্যাগমাটি হলো – শিরাবক্ষ।

৩৩. Arthropoda পর্বের প্রাণীতে ক্লিভেজের ধরন হলো – অরীয় ক্লিভেজ।

৩৪. Chordata পর্বের প্রাণীতে ক্লিভেজের ধরন হলো – দ্বিপার্শ্বীয় ক্লিভেজ।

৩৫. প্রতিসাম্য কয় প্রকার – ৫ প্রকার (গোলীয়, অরীয়, দ্বি-অরীয়, দ্বিপার্শ্বীয় ও অপ্রতিসাম্য)।

৩৬. গোলীয় বা সার্বিক প্রতিসাম্য দেখা যায় – *Volvox*, Radiolaria, Heliozoa ইত্যাদি প্রাণীতে।

৩৭. দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায় – Platyhelminthes, Arthropoda ও Chordata পর্বের প্রাণীতে।

৩৮. অরীয় প্রতিসাম্য দেখা যায় – Cnidaria ও Echinodermata পর্বের অধিকাংশ প্রাণীতে।

৩৯. দ্বি-অরীয় প্রতিসাম্য দেখা যায় – Ctenophora ও Anthozoa জাতীয় প্রাণীতে।

৪০. অপ্রতিসাম্য প্রাণী হলো – স্পঞ্জ, শামুক, অ্যামিবা ইত্যাদি।

৪১. অরীয় প্রতিসাম্য দেখা যায় – হাইড্রায়।

৪২. দ্বি-অরীয় প্রতিসাম্য দেখা যায় – *Ceoloplana*।

৪৩. দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য প্রাণী – টিনোফেরা।

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের নীতি

৪৪. শ্রেণিকরণের যে কোনো ধাপের জনগোষ্ঠীকে বলা হয় – ট্যাক্সন।

৪৫. শ্রেণিকরণের আবশ্যিক ধাপ কয়টি – ৭টি।

৪৬. শ্রেণিবিন্যাসের সর্বনিম্ন ধাপ – প্রজাতি।

৪৭. শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে বড় একক – Phylum।

৪৮. সর্বপ্রথম Species শব্দের প্রবর্তন করেন – John Ray।

৪৯. দ্বিপদ নামকরণ প্রবর্তন করা হয় – ১৭৫৮ সালে।

৫০. দ্বিপদ নামকরণের শব্দদ্বয় কোন ভাষায় হতে হবে – ল্যাটিন।

৫১. দ্বিপদ নামকরণের পদ কয়টি – ২টি (গণ ও প্রজাতি)।

৫২. ত্রিপদ নামকরণের পদ কয়টি – ৩টি (গণ, প্রজাতি ও উপপ্রজাতি)।

৫৩. ত্রিপদ নামকরণ প্রবর্তন করেন – Schlegel (1844)।

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

৫৪. Hickman *et al.* (2008) অনুসারে প্রাণিজগতে সর্বমোট পর্ব – ৩৩টি।

৫৫. প্রাণিজগতে প্রধান পর্ব কয়টি – ৯টি।

৫৬. প্রকৃতিতে নন কর্ডাটা প্রাণীর সংখ্যা কত ভাগ – ৯৫-৯৭%।

৫৭. ননকর্ডাটা দলের প্রধান পর্ব – ৮টি।

৫৮. প্রাণিজগতে বিদ্যমান পর্বের মধ্যে কর্ডাটা জাতীয় পর্ব – ১টি।

৫৯. R.H. Whittaker জীবের – ৫ রাজ্য বা জগৎ শ্রেণিবিন্যাস করেন।

Scanned with CamScanner

পর্ব-১ : Porifera

৬০. Porifera পর্বের নামকরণ করেন – Robert Grant (1836)।
৬১. Porifera পর্বের প্রাণীর সাধারণ নাম – স্পঞ্জ।
৬২. বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে কোন পর্বের প্রাণীরা প্রাচীনতম – Porifera।
৬৩. ছিদ্রাল প্রাণী বলা হয় – Porifera পর্বের প্রাণীদের।
৬৪. Porifera পর্বের প্রাণীদের দেহপ্রাচীরের ছিদ্রকে বলা হয় – অস্টিয়া।
৬৫. গঠনগতভাবে সরলতম প্রাণী হলো – *Spongilla*।
৬৬. Porifera পর্বের প্রাণীরা কোনটির মাধ্যমে খাদ্য, অক্সিজেন ও শুক্রাণু গ্রহণ করে – নালিতন্ত্র।
৬৭. কোন পর্বের পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরা নিশ্চল – Porifera।
৬৮. প্রবাল কোন পর্বভুক্ত – Cnidaria।

পর্ব-২ : Cnidaria

৬৯. Cnidaria পর্বটির নামকরণ করেন – Hatschek (1888)।
৭০. কোন পর্বের প্রাণীদের সমুদ্রের ফুল বা সমুদ্রের Rain Forest বলা হয় – Cnidaria।
৭১. জেলিফিশ কোন পর্বে – Cnidaria।
৭২. প্রবাল গঠনকারী উপাদান হলো – কাইটিন ও চুন।
৭৩. কলা সংগঠন মাত্রার পর্ব হলো – Cnidaria।
৭৪. নিডেরিয়দের দংশন অঙ্গানু হলো – নেমাটোসিস্ট।
৭৫. Cnidaria পর্বের প্রাণীদের দেহাভ্যন্তরের গহ্বর হলো– সিলেন্টেরন।
৭৬. সিলেন্টেরনের কাজ – পরিপাক-সংবহন।
৭৭. কোন পর্বের প্রাণীরা বহুরূপতা প্রদর্শন করে – Cnidaria।
৭৮. কোরালস ও জেলিফিশ হলো – Cnidaria পর্বের।
৭৯. সাগর-পাখা বলা হয় – Cnidaria পর্বের গর্গনিয়াকে।

পর্ব-৩ : Platyhelminthes

৮০. Platyhelminthes পর্বের নামকরণ করেন – Karl Gegenbaur (1859)।
৮১. প্রথম ত্রিস্তরী প্রাণীবিশিষ্ট পর্ব – Platyhelminthes।
৮২. Platyhelminthes পর্বের প্রাণীদের বলা হয় – চ্যাপ্টাকৃমি (flat worm)।
৮৩. প্রথম টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন দেখা যায় – Platyhelminthes পর্বে।
৮৪. শিখা কোষ (রেচনতন্ত্রের কোষ) কোন পর্বের প্রাণীর বৈশিষ্ট্য – Platyhelminthes।
৮৫. যকৃৎ কৃমির বৈজ্ঞানিক নাম – *Fasciola hepatica*।

পর্ব-৪ : Nematoda

৮৬. Nematoda পর্বের নামকরণ করেন – Gegenbaur (1851)।
৮৭. Nematoda পর্বের প্রাণীদের সাধারণ নাম – সুতাকৃমি বা গোলকৃমি।
৮৮. অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন সম্পন্ন প্রাণী দেখা যায় প্রথম কোন পর্বে – Nematoda।
৮৯. সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ পৌষ্টিকনালি বিদ্যমান থাকে কোন পর্বের প্রাণীদের – Nematoda।
৯০. যৌন দ্বিরূপতা কোন পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়– Nematoda।
৯১. গোলকৃমির লার্ভা দশার নাম – র‍্যাবডিটিফর্ম।
৯২. *Loa loa* কোন পর্বের অন্তর্ভুক্ত – Nematoda।

পর্ব-৫ : Mollusca

৯৩. Mollusca পর্বের নামকরণ করেন – Johnston (1650)।
৯৪. নরম দেহ বা কম্বোজ প্রাণী নামে পরিচিত – Mollusca পর্বের প্রাণী।
৯৫. প্রাণিজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব – Mollusca।
৯৬. Mollusca পর্বের প্রাণীর দেহ আবরণের নাম – ম্যান্টল।
৯৭. Mollusca পর্বের প্রাণীদের খোলক তৈরি হয় – ম্যান্টলের ক্ষরণে।
৯৮. Mollusca পর্বের প্রাণীদের সংবহনতন্ত্র – অর্ধমুক্ত ধরনের।
৯৯. Mollusca পর্বের প্রাণীদের Shell তৈরি হয় – ক্যালসিয়াম
১০০. মুখ বিবরে 'র‍্যাডুলা' নামক অংশ থাকে কোন পর্বের প্রাণিতে Mollusca।

পর্ব-৬ : Annelida

১০১. Annelida পর্বের নামকরণ করেন – Lamark (1890)।
১০২. Annelida পর্বের প্রাণীদের বলা হয় – 'Ringed worms' বা অঙ্গুরিমাল।
১০৩. সম্পূর্ণ খণ্ডকায়ন দেখা যায় – Annelida পর্বের প্রাণীদের।
১০৪. Annelida পর্বের প্রাণীর লার্ভার নাম – ট্রোকোফোর।
১০৫. Annelida পর্বের প্রাণীদের প্রধান রেচন অঙ্গ – নেফ্রিডিয়া।
১০৬. চলন অঙ্গ সিটা বা প্যারাপোডিয়া দেখা যায় – Annelida পর্বে।
১০৭. কেঁচোর বায়োলজিক্যাল নাম – *Metaphire posthuma*।

পর্ব-৭ : Arthropoda

১০৮. Arthropoda পর্বের নামকরণ করেন – Von Siebold (1845)।
১০৯. প্রাণিজগতের সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব – Arthropoda (প্রায় ৮০%)।
১১০. কোনপর্বের প্রাণীরা সন্ধিপদী প্রাণী হিসেবে পরিচিত – Arthropoda।
১১১. হিমোসিল পাওয়া যায় – Arthropoda-পর্বে।
১১২. Arthropoda পর্বের প্রাণীর সংবহনতন্ত্র কোন ধরনের রক্তপূর্ণ– হিমোলিম্ফ।
১১৩. Arthropoda পর্বের প্রাণীর প্রধান রেচন অঙ্গ – মালপিজিয়ান নালিকা।
১১৪. Arthropoda পর্বের প্রাণীদের দর্শনেন্দ্রিয়রূপে থাকে – পুঞ্জাক্ষি।
১১৫. গলদা চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম– *Macrobrachium rosenbergii*।

পর্ব-৮ : Echinodermata

১১৬. Echinodermata পর্বের নামকরণ করেন – Jacob Klein (1734)।
১১৭. Echinodermata পর্বের নামকরণ করা হয়েছে কোন বৈশিষ্ট্য থেকে – কাঁটাময় ত্বক।
১১৮. কোন পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক – Echinodermata।
১১৯. বহিঃকঙ্কাল কন্টকময় – Echinodermata পর্বের।
১২০. সমুদ্রতারা এর প্রতিসাম্যতা – পঞ্চ-অরীয়।
১২১. Echinodermata পর্বভুক্ত প্রাণীর বহিঃকঙ্কালের নাম – পেডিসিলারি।
১২২. Echinodermata পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহের কোন তলে অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাদ থাকে – মৌখিক তলে।
১২৩. Echinodermata পর্বভুক্ত প্রাণীদের চলন অঙ্গ – নালিকা পদ।
১২৪. পানি সংবহনতন্ত্র উপস্থিত – Echinodermata-পর্বে।
১২৫. Echinodermata-এর সংবহনতন্ত্রের কাজ করে– পেরিহিমালতন্ত্র।
১২৬. Echinodermata-র জীবনচক্রে কোন ধরনের লার্ভা বিদ্যমান – মুক্ত সন্তরণশীল লার্ভা।

Scanned with CamScanner

১২৭. Chordata পর্বটির নামকরণ করেন – Bateson (1885)।
১২৮. Chordata পর্বের প্রাণীদের জীবনে কতটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান – ৪টি (স্নায়ুরজ্জু, নটোকর্ড, গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র ও পায়ু পশ্চাৎ লেজ)।
১২৯. কর্ডেটদের হৃৎপিণ্ড দেহের - অঙ্কীয়তলে।
১৩০. কর্ডেটদের রক্তসংবহনতন্ত্র কোন প্রকৃতির – বদ্ধ প্রকৃতির।
১৩১. Chordata পর্বের উপপর্ব কয়টি – ৩টি (Urochordata, Cephalochordata & Vertebrata)।
১৩২. Urochordata উপপর্বের অন্তর্ভুক্ত শ্রেণি কয়টি – ৩টি (Larvacea, Thaliacea & Ascidiacea)।
১৩৩. Urochordata উপপর্বের প্রাণীদের কোন অংশে নটোকর্ড থাকে – লেজে।
১৩৪. *Ascidia* -র দেহে কীরূপ লার্ভা দশা বিদ্যমান – ট্যাডপোল।
১৩৫. Urochordate লার্ভার রূপান্তর কীরূপ ধরনের – Retrograssive।
১৩৬. মায়োটোম নামক পেশি দেখা যায় – Cephalochordata উপপর্বের প্রাণীতে।
১৩৭. Cephalochordata উপপর্বের প্রাণীদের মুখছিদ্র বেষ্টিত আবরণ হলো – ওরালহুড।
১৩৮. কোন উপপর্বের প্রাণীদেহে নটোকর্ড মেরুদণ্ডে পরিণত হয় – Vertebrata।
১৩৯. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান রেচন অঙ্গ – বৃক্ক বা কিডনি।
১৪০. কোন শ্রেণির মাছগুলো হ্যাগফিশ নামে পরিচিত – Myxini।
১৪১. Myxini শ্রেণির প্রাণীর ফুলকারন্ধ্রের সংখ্যা – ৫-১৫ জোড়া।
১৪২. Myxini শ্রেণির প্রাণীদের মুখপ্রান্তে উপস্থিত কর্ষিকার সংখ্যা – ৪ জোড়া।
১৪৩. Cephalaspidomorphi শ্রেণিভুক্ত মাছগুলোর সাধারণ নাম – ল্যামপ্রে।
১৪৪. ল্যামপ্রের ফুলকারন্ধ্রের সংখ্যা - ৭ জোড়া।
১৪৫. কোন শ্রেণির প্রাণীর দেহ সম্পূর্ণ কোমলাস্থি নির্মিত – Chondrichthyes।
১৪৬. *Scoliodon laticaudus* এর আঁইশ - প্ল্যাকয়েড।
১৪৭. হেটারোসার্কাল লেজ পাওয়া যায় কোন শ্রেণিতে – Chondrichthyes।
১৪৮. হাঙরের পুচ্ছ পাখনা কোন ধরনের – হেটারোসার্কাল।
১৪৯. জীবিত মাছের কত ভাগ Actinopterygii শ্রেণিভুক্ত – ৯৬%।
১৫০. কোন শ্রেণির মাছের অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময় – Actinopterygii।
১৫১. Actinopterygii শ্রেণিভুক্ত মাছের আঁইশ কোন ধরনের – সাইক্লোয়েড ও টিনয়েড।
১৫২. হোমোসার্কাল লেজ পাওয়া যায় কোন শ্রেণিতে – Actinopterygii।
১৫৩. রশ্মিময়পাখনাবিশিষ্টমাছ হলো– Actinopterygii।
১৫৪. ইলিশ কোন শ্রেণিভুক্ত প্রাণী – Actinopterygii।
১৫৫. পিণ্ডকার পাখনাবিশিষ্ট মাছের শ্রেণি হলো – Sarcopterygii।
১৫৬. বিজ্ঞানীদের ধারণামতে, কোন শ্রেণির মাছ থেকে স্থলচর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে – Sarcopterygii।
১৫৭. লাংফিশ কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত – Sarcopterygii।
১৫৮. পুচ্ছ পাখনা ডাইফিসার্কাল – Sarcopterygii।
১৫৯. Sarcopterygii শ্রেণির বৈশিষ্ট্য হলো - গ্যানয়েড আঁইশ।
১৬০. প্রথম স্থলচর ও চতুষ্পদী মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণি – Amphibia।
১৬১. কোন প্রাণীর জীবনচক্রে ফুলকা শ্বসন বিদ্যমান – ব্যাঙ।
১৬২. Amphibia শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর লার্ভা কোনটির সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় - ফুলকা।
১৬৩. উভচরের পশ্চাৎপদে আঙুলের সংখ্যা - ৫টি।
১৬৪. ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে প্রকোষ্ঠের সংখ্যা – ৪।
১৬৫. গেছো ব্যাঙের বৈজ্ঞানিক নাম – *Rana tyleri*।
১৬৬. কুমিরের ত্বক কোন ধরনের আঁইশ দ্বারা আবৃত – এপিডার্মাল।
১৬৭. শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী – সাপ (*Naja naja*)।
১৬৮. হৃৎপিণ্ড অসম্পূর্ণ ৪ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট – Reptilia-দের।
১৬৯. সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড কোন সরীসৃপে দেখতে পাওয়া যায় – কুমির।
১৭০. সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণী - কচ্ছপ।
১৭১. Aves শ্রেণিভুক্তদের কোন পদ ডানায় পরিণত হয় – অগ্রপদ।
১৭২. পরিপাকতন্ত্রে থলিকাকার ক্রপ এবং পেশিময় গিজার্ড থাকে কোন শ্রেণির প্রাণীদের – Aves।
১৭৩. বাংলাদেশের জাতীয় পাখির বৈজ্ঞানিক নাম – *Copsychus saularis*।
১৭৪. বিবর্তনিক দিক থেকে সবচেয়ে আধুনিক কোন শ্রেণির প্রাণীরা – Mammalia।
১৭৫. স্তন্যপায়ীদের বক্ষ ও উদর গহ্বরকে পৃথক রাখে – ডায়াফ্রাম।
১৭৬. মধ্যচ্ছদার উপস্থিত বা Presence of diaphragm কোন শ্রেণির প্রাণীর বৈশিষ্ট্য – Mammalia।
১৭৭. Mammalia শ্রেণিভুক্ত প্রাণীদের করোটিক স্নায়ু – ১২ জোড়া।
১৭৮. মানুষ কোন শ্রেণিভুক্ত প্রাণী – Mammalia।
১৭৯. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম – *Homo sapiens*।
১৮০. বাংলাদেশের জাতীয় পশুর বৈজ্ঞানিক নাম – *Panthera tigris*।
১৮১. Mammalia শ্রেণির উড়তে সক্ষম প্রাণী – বাদুড়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাণীর পরিচিতি

হাইড্রা

১. হাইড্রা আবিষ্কার করেন – আব্রাহাম ট্রেম্বলে (১৭০০-১৭৮৪)।
২. হাইড্রার বর্গের নাম – Hydroida।
৩. বাংলাদেশে হাইড্রার সুলভ প্রজাতি কোনটি – *Hydra vulgaris*।
৪. বাদামি বর্ণের *Hydra* প্রজাতি– *Chlorohydra viridissima*।
৫. *Hydra vulgaris*-এর কয়টি কর্ষিকা থাকে – ৬-১০টি।
৬. হাইড্রা – মাংসাশী।
৭. *Hydra*-এর দেহ কয়টি অংশে বিভক্ত – ৩টি।
৮. *Hydra*-এর কর্ষিকার বহিঃপ্রাচীরের অসংখ্য ছোট অংশকে বলা হয়– নেমাটোসিস্ট ব্যাটারি।
৯. কোন ঋতুতে হাইড্রার পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে – গ্রীষ্ম।
১০. হাইড্রার দুই স্তরের মাঝে দেখা যায় – মেসোগ্লিয়া।
১১. হাইড্রার এপিডার্মিসে কোষ কয়টি – ৭টি (পেশি-আবরণী কোষ, ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ, সংবেদী কোষ, স্নায়ু কোষ, গ্রন্থি কোষ, জনন কোষ ও নিডোসাইট কোষ)।
১২. হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মিসে কোষ কয়টি – ৫টি (পুষ্টি কোষ, ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ, সংবেদী কোষ, স্নায়ু কোষ ও গ্রন্থি কোষ)।
১৩. হাইড্রার বহিঃত্বকে সমগ্র অংশ জুড়ে অবস্থান করে – পেশি-আবরণী কোষ।
১৪. হাইড্রার এন্ডোডার্মিসের যে কোন কোষ তৈরি করতে পারে – ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ।
১৫. হাইড্রার সংযোগকারী স্তর – মেসোগ্লিয়া।
১৬. হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মিসে থাকে না – নিডোসাইট।

Scanned with CamScanner

১৭. মায়োনিম দেখা যায় – পেশি আবরণী কোষে।
১৮. হাইড্রায় কিউটিকল সৃষ্টি হয় কোন কোষের নিঃসৃত রসে – পেশি আবরণী কোষ।
১৯. হাইড্রায় পুনরুৎপত্তি ও মুকুল সৃষ্টিতে অংশ নেয় – ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ।
২০. হাইড্রার ক্ষণপদ সৃষ্টি ও গলাধঃকরণে সাহায্য করে – গ্রন্থি কোষ।
২১. হাইড্রার নিডোসাইট সবচেয়ে বেশি থাকে – কর্ষিকায়।
২২. নিডোসাইট পাওয়া যায় – হাইড্রায়।
২৩. হিপনোটক্সিনের রাসায়নিক উপাদানগুলো – ফেনল ও প্রোটিন।
২৪. নিডোসাইটে বড় তীক্ষ্ম কাঁটার মতো অংশকে বলা হয় – বার্ব।
২৫. নেমাটোসিস্টের নিম্নপ্রান্তে ১টি পেঁচানো সুতার মতো অংশকে বলা হয় – ল্যাসো।
২৬. হাইড্রাতে কত ধরনের নেমাটোসিস্ট দেখা যায় – ৪ ধরনের (পেনিট্র্যান্ট, ভলভেন্ট, স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট ও স্ট্রেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট)।
২৭. বার্ব ও বার্বিউল যুক্ত নেমাটোসিস্ট হলো – পেনিট্র্যান্ট /স্টিনোটিল।
২৮. কোন নেমাটোসিস্টে হিপনোটক্সিন থাকে – পেনিট্র্যান্ট।
২৯. কোন নেমাটোসিস্ট আত্মরক্ষায় অংশ নেয় – পেনিট্র্যান্ট।
৩০. আকারে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র নেমাটোসিস্ট – স্ট্রেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট।
৩১. আঠালো রস ক্ষরণ ও শিকার আটকাতে সাহায্য করে – স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট ও স্ট্রেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট।
৩২. কোন ধরনের নেমাটোসিস্টের সূত্রক চাবুকের ন্যায় কাঁটাযুক্ত – স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট।
৩৩. ভলভেন্ট – সূত্রকের অগ্রভাগ বদ্ধ।
৩৪. সূত্রক খাটো ও কাঁটাবিহীন নেমাটোসিস্ট হলো – ভলভেন্ট।
৩৫. একবার ব্যবহৃত নেমাটোসিস্টের পরিণতি – দেহে পরিপাক হয়।
৩৬. হাইড্রার খাদ্যবস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে – ফ্ল্যাজেলাযুক্ত পুষ্টি কোষ।
৩৭. *Hydra*-এর দেহে কোনটি কঙ্কাল হিসেবে কাজ করে – সিলেন্টেরন।
৩৮. *Hydra*-এর কোন কোষ বুদবুদ তৈরি করে – গ্রন্থি কোষ।
৩৯. ভিত্তি ঝিল্লি রূপে কাজ করে – মেসোগ্লিয়া।
৪০. হাইড্রার খাদ্য – Crustacea জাতীয় ক্ষুদ্রাকার আর্থ্রোপোডা প্রাণী, মাছের ডিম, ছোট ছোট কৃমি, ক্ষুদ্র পতঙ্গ, কীটপতঙ্গের লার্ভা, রটিফার ইত্যাদি।
৪১. হাইড্রার খাদ্য নয় – ছোট ঘাস।
৪২. হাইড্রার বহিঃকোষীয় পরিপাক সংঘটিত হয় – সিলেন্টেরনে।
৪৩. হাইড্রার দেহগহ্বরকে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বলার কারণ – পৌষ্টিকতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্রের কাজ করে।
৪৪. হাইড্রার চলনে সহায়তা করে – পেশিতন্তু ও নেমাটোসিস্ট।
৪৫. হাইড্রার লুপিং ও সমারসল্টিং চলনে সহায়তা করে – গ্লুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্ট।
৪৬. হাইড্রার দ্রুত চলন প্রক্রিয়া – সমারসল্টিং।
৪৭. অ্যামিবার মতো চলন সম্পন্ন হয় – গ্লাইডিং চলনে।
৪৮. হাইড্রার ধীর গতির চলন – গ্লাইডিং।
৪৯. হাইড্রার কোন চলনে কর্ষিকাগুলো পায়ের মতো ব্যবহার করে – নতমুখী।
৫০. কোন প্রাণী অযৌন ও যৌন দু'ভাবেই প্রজনন সম্পন্ন করে – হাইড্রা।
৫১. হাইড্রার প্রজনন হয়–দ্বি-বিভাজন, মুকুলোদ্গম ও যৌন উপায়ে।
৫২. হাইড্রার স্বাভাবিক অযৌন প্রজনন – মুকুলোদগম।
৫৩. সর্বপ্রথম *Hydra*-এর পুনরুৎপত্তির ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন – ট্রেম্বলে।
৫৪. হাইড্রা উভলিঙ্গ হলেও – স্বনিষেক ঘটে না।
৫৫. হাইড্রার কর্ষিকা ও নেমাটোসিস্ট পারস্পরিক সহযোগিতায় যে কাজটিতে অংশ গ্রহণ করে না – জনন প্রক্রিয়া।
৫৬. হাইড্রার একটি উওসাইট থেকে সৃষ্টি হয় – ৩টি পোলার বডি ও একটি উওটিড।
৫৭. মিথোজীবী প্রজাতি – *Chlorohydra viridissima*।

ঘাসফড়িং

৫৮. ঘাসফড়িং-এর দেহের অংশ – ৩টি (মস্তক, বক্ষ ও উদর)।
৫৯. ঘাসফড়িং-এর আবরণের নাম – কাইটিন।
৬০. ঘাসফড়িং কোন শ্রেণিভুক্ত – Insecta।
৬১. ঘাসফড়িং-এর গোত্র – Acrididae।
৬২. ঘাসফড়িং-এর গণের নাম – *Poekilocerus*।
৬৩. ঘাসফড়িং – উদ্ভিদভোজী।
৬৪. বাংলাদেশে ঘাসফড়িং-এর কতটি গোত্র ও প্রজাতি আছে – ২টি ও ২০টি (কারও মতে ২৮টি)।
৬৫. ঘাসফড়িং-এর দেহে মোট খণ্ডের সংখ্যা – ১৪টি।
৬৬. ঘাসফড়িং-এর উদরে খণ্ডকের সংখ্যা – ১১টি।
৬৭. ঘাসফড়িং-এর দেহ খণ্ডের কাইটিন নির্মিত পুরু ও শক্ত পৃষ্ঠীয় পাতকে বলে – টারগাইট।
৬৮. ঘাসফড়িংয়ের দেহের পৃষ্ঠীয় খোলসের নাম – টার্গাম।
৬৯. ঘাসফড়িং-এর প্রতিদেহ খণ্ডকের শক্ত আবরণকে বলা হয় – স্ক্লেরাইট।
৭০. ঘাসফড়িং এর মস্তকের বহিঃকঙ্কালের অংশ নয় – ওসেলি।
৭১. ঘাসফড়িং-এর মস্তক – হাইপোগন্যাথাস ধরনের।
৭২. ঘাসফড়িং-এর মস্তকে ওসেলির সংখ্যা – ৩টি।
৭৩. কোন শক্তির মাধ্যমে ঘাসফড়িং অন্যান্য আর্থ্রোপোডা থেকে উন্নত – দৃষ্টিশক্তি।
৭৪. ঘাসফড়িং-এর অ্যান্টেনার অংশ – ৩টি।
৭৫. ঘাসফড়িং-এর ফ্ল্যাজেলার খণ্ড কয়টি – ২৫টি।
৭৬. মস্তকের কততম খণ্ডকে অ্যান্টেনা অবস্থিত – ২য়।
৭৭. ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের সংখ্যা কয়টি – ৫টি (ল্যাব্রাম, ম্যাক্সিলা, ম্যান্ডিবল, ল্যাবিয়াম এবং হাইপোফ্যারিংক্স)।
৭৮. পতঙ্গের পায়ে Coxa এর পরে কোন অংশ – Trochanter।
৭৯. ঘাসফড়িং-এর কোন মুখোপাঙ্গটি দেখতে চাপা চাকতির মতো – ল্যাব্রাম।
৮০. খাদ্য কেটে চিবানোর সাহায্য করে – ম্যান্ডিবল।
৮১. কার্ডো কোন উপাঙ্গের অংশ – ম্যাক্সিলা।
৮২. ল্যাসিনিয়া কোন উপাঙ্গের অংশ – ম্যাক্সিলা।
৮৩. ম্যাক্সিলারি পাল্পের কাজ – খাদ্যের স্বাদ গ্রহণে সাহায্য করা।
৮৪. ক্ষুদ্র চোয়াল নামে পরিচিত – ম্যাক্সিলা।
৮৫. ঘাসফড়িং-এর বক্ষ অঞ্চলে কত জোড়া শ্বাসরন্ধ্র থাকে – ২ জোড়া।
৮৬. ঘাসফড়িং-এর অগ্রভাগের সরু ও শক্ত ডানাদ্বয়কে বলা হয়– টেগমিনা।
৮৭. এলিট্রাকে বলা হয় – টেগমিনা।
৮৮. ঘাসফড়িং-এর প্রতিটি পা কতটি খণ্ডে বিভক্ত – ৫টি (কক্সা, ট্রোক্যান্টার, ফিমার, টিবিয়া ও টার্সাস)।
৮৯. পায়ের ত্রিভুজাকার ক্ষুদ্র অংশকে বলা হয় – ট্রোক্যান্টার।

Scanned with CamScanner

৯০. টারসার্সের প্রতিটি খণ্ডকে বলা হয় – টার্সোমিয়ার।
৯১. ঘাসফড়িং-এর পায়ের কোন অংশটি সবচেয়ে লম্বা – টিবিয়া।
৯২. ঘাসফড়িং-এর কততম খণ্ডকের স্টার্নাম ওভিপজিটরে রূপান্তরিত হয় – ৯ম।
৯৩. কততম খণ্ডকটির টারগাম পায়ুর উপরে প্লেট এর মতো আবরণ তৈরি করে – একাদশ।
৯৪. পৌষ্টিকতন্ত্র কতটি অংশ নিয়ে গঠিত – ২টি (পৌষ্টিকনালি ও পৌষ্টিকগ্রন্থি)।
৯৫. ঘাসফড়িংয়ের পৌষ্টিকনালির প্রোক্টোডিয়ামের অংশ– গিজার্ড।
৯৬. মুখছিদ্র থেকে গিজার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত – স্টোমোডিয়াম।
৯৭. ঘাসফড়িং-এর পরিপাকনালির ত্রিকোণাকার গঠনটির নাম – গিজার্ড।
৯৮. খনিজ লবণ, অ্যামিনো এসিড শোষণ করে – রেকটাম বা মলাশয়।
৯৯. রেকটামে কতটি রেকটাল প্যাপিলা থাকে – ৬টি।
১০০. ঘাসফড়িং-এর কত জোড়া লালাগ্রন্থি থাকে – ১ জোড়া।
১০১. হেপাটিক সিকার অপর নাম – গ্যাস্ট্রিক সিকা।
১০২. ঘাসফড়িং-এর হেপাটিক সিকার সংখ্যা – ১২টি।
১০৩. ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র – মুক্ত ধরনের।
১০৪. ঘাসফড়িংয়ের রক্ত সংবহনতন্ত্রের অংশ নয় – সম্মুখ বাহিকা।
১০৫. ঘাসফড়িং-এর হিমোসিলে কতটি প্রকোষ্ঠ বা সাইনাস আছে – ৩টি (পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস, পেরিভিসেরাল সাইনাস ও পেরিনিউরাল সাইনাস)।
১০৬. হিমোলিম্ফের অংশ – বর্ণহীন প্লাজমা, রক্তকণিকা ও হিমোসাইট।
১০৭. হিমোলিম্ফের কাজ নয় – শ্বসনে সহায়তা করা।
১০৮. ঘাসফড়িং-এর হৃদযন্ত্রের প্রকোষ্ঠ – ৭টি।
১০৯. ঘাসফড়িং-এর হৃদযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি মিনিটে – ১০০-১১০ বার।
১১০. ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনের পথ –
মস্তকের সাইনাস → পেরিনিউরাল সাইনাস → পেরিভিসারেল সাইনাস → পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস → হৃদযন্ত্র
১১১. ঘাসফড়িং-এর স্পাইরাকল বা শ্বাসরন্ধ্র – ১০ জোড়া।
১১২. ঘাসফড়িং-এর স্পাইরাকলকে পরিবেষ্টিত করে রাখে – পেরিট্রিম।
১১৩. ট্রাকিয়ার প্রাচীর – ৩ স্তর বিশিষ্ট।
১১৪. টিনিডিয়া দেখতে – আংটির ন্যায়।
১১৫. টিনিডিয়া ঘাসফড়িং-এর কোন তন্ত্রে পাওয়া যায় – শ্বসনতন্ত্রে (ট্রাকিয়ালতন্ত্রে)।
১১৬. ঘাসফড়িং-এর প্রধান রেচন অঙ্গ – মালপিজিয়ান নালিকা।
১১৭. মালপিজিয়ান নালিকা গঠনকারী কোষ – এপিথেলিয়াম।
১১৮. ঘাসফড়িং-এর দর্শন একক – ওমাটিডিয়াম।
১১৯. প্রতিটি পুঞ্জাক্ষির ওমাটিডিয়ার সংখ্যা – প্রায় ২ হাজার।
১২০. লেন্সের মতো কাজ করে – কর্নিয়া।
১২১. কর্নিয়াজেন কোষের ক্ষরণে সৃষ্টি হয় – কর্নিয়া।
১২২. ঘাসফড়িং-এর ক্রিস্টালাইন কোণের কাজ – ওমাটিডিয়ামে আলো প্রবেশ।
১২৩. ঘাসফড়িংয়ের পুঞ্জাক্ষির কোন অংশটি আলো গ্রহণ করে – ওমাটিডিয়াম।
১২৪. রেটিনাল বা রেটিনুলার কোষের সংখ্যা – ৭/৮টি।
১২৫. রেটিনুলার কোষের ক্ষরণে সৃষ্টি হয় – র‍্যাবডোম।
১২৬. প্রতিটি ওমাটিডিয়ামকে পরস্পর পৃথক রাখে – রেটিনাল সিথ।
১২৭. ঘাসফড়িং-এর সংবেদী অঙ্গের সংখ্যা – ৫টি।
১২৮. ঘাসফড়িং-এর পুংজননতন্ত্রের অংশ নয় – শুক্রধানী।
১২৯. ঘাসফড়িং-এর স্ত্রীজননতন্ত্রের অংশ – শুক্রধানী।
১৩০. ঘাসফড়িং-এর সুপারপজিশন দর্শনে – আইরিশ আবরণ সংকুচিত থাকে।
১৩১. শুক্রাণু সাময়িক জমা থাকে – স্পার্মাথিকায়।
১৩২. কখন ঘাসফড়িং-এর যৌন মিলন ঘটে – গ্রীষ্মের শেষে।
১৩৩. কোন সময় পর্যন্ত ঘাসফড়িং ডিম পাড়া অব্যাহত রাখে – শরৎকাল।
১৩৪. ঘাসফড়িং-এর ওভিপজিটর ব্যবহৃত হয় – ডিম্ব ত্যাগে।
১৩৫. ঘাসফড়িং মোট কতটি ডিম পাড়ে – ২০০টি।
১৩৬. ডিম পাড়ার পর কোন ঘাসফড়িং মারা যায় – পুং ও স্ত্রী উভয়ই।
১৩৭. ঘাসফড়িং-এর ডিম্বাণু কী ধরনের – সেন্ট্রোলেসিথাল।
১৩৮. ডায়াপজ মূলত কোন কালের জন্য – শীত।
১৩৯. ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর – অসম্পূর্ণ রূপান্তর।
১৪০. অসম্পূর্ণ রূপান্তরের ক্ষেত্রে শিশু অবস্থাকে বলা হয় – নিম্ফ।
১৪১. ঘাসফড়িং-এর রূপান্তরের সঠিক ক্রম – ডিম→ লার্ভা → পিউপা → ইমাগো
১৪২. ঘাসফড়িং নিম্ফ থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পরিণত হতে খোলস ত্যাগ করে – ৫ বার।
১৪৩. ঘাসফড়িং-এর মোচন হরমোন – একডাইসন।

রুই মাছ

১৪৪. রুই মাছের শ্রেণির নাম – Actinopterygii।
১৪৫. কার্প মাছের গোত্র – Cyprinidae।
১৪৬. প্রাথমিক পর্যায়ে রুই মাছের খাদ্য – প্ল্যাঙ্কটন।
১৪৭. আঙুলিপোনা দশার প্রধান খাদ্য – প্রাণী প্ল্যাঙ্কটন।
১৪৮. রুই মাছ কত তাপমাত্রার নিচে বাঁচতে পারে না – ১৪° সেলসিয়াস।
১৪৯. রুই মাছ বছরে কয়বার যৌন পরিপক্বতা লাভ করে – ২-৩ বার।
১৫০. রুই মাছ ডিম পাড়ে – জুন–জুলাই (জুন-আগস্ট)।
১৫১. রুই মাছের দেহের অংশ – ৩টি (মস্তক, দেহকাণ্ড ও লেজ)।
১৫২. রুই মাছের দেহের অঙ্কীয় তলে ছিদ্রের সংখ্যা – ৩টি।
১৫৩. রুই মাছে কত ধরনের পাখনা আছে – ৫ ধরনের (পৃষ্ঠ-পাখনা, বক্ষ-পাখনা, শ্রোণি-পাখনা, পায়ু-পাখনা ও পুচ্ছ-পাখনা)।
১৫৪. রুই মাছের কানকুয়ার বা কানকোর পেছনের পাখনাকে বলা হয় – বক্ষ-পাখনা।
১৫৫. রুই মাছে কত ধরনের যুগ্ম পাখনা – ২ ধরনের (বক্ষ-পাখনা ও শ্রোণি-পাখনা)।
১৫৬. রুই মাছের প্রধান চলন অঙ্গ – পুচ্ছ পাখনা।
১৫৭. কোথায় সংবেদী কোষ থাকে – পার্শ্ব রেখায়।
১৫৮. রুই মাছের পুচ্ছ পাখনা কোন ধরনের – হোমোসার্কাল।
১৫৯. রুই মাছের আঁইশ – সাইক্লয়েড ধরনের।
১৬০. রুই মাছের স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের কাজ করে – পার্শ্বীয় রেখা।
১৬১. *Labeo rohita* -এর আঁইশের কেন্দ্রকে বলা হয় – ফোকাস।
১৬২. রুই মাছের আঁইশের বৃদ্ধি বেশি হয় – সাধারণত বসন্তকালে ও গ্রীষ্মে।
১৬৩. রুই মাছের আঁইশের প্রধান রাসায়নিক উপাদান – চুন ও কোলাজেন তন্তু।
১৬৪. মাছের প্রধান প্রতিরক্ষাকারী অঙ্গ – আঁইশ।
১৬৫. রুই মাছের বা মাছের হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যা – ২টি (অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকল)।
১৬৬. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের উপ-প্রকোষ্ঠটি হলো – সাইনাস ভেনোসাস।
১৬৭. ভেনাস হার্ট বা শিরা হৃৎপিণ্ড পাওয়া যায় – মাছে।
১৬৮. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডকে অভিহিত করা হয় – ভেনাস হার্ট বা শিরা হৃৎপিণ্ড নামে।
১৬৯. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে থাকে না – কোনাস আর্টিরিওসাস।
১৭০. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের বৃহত্তম প্রকোষ্ঠ – অ্যাট্রিয়াম।
১৭১. হৃৎপিণ্ডের সর্বশেষ প্রকোষ্ঠ – ভেন্ট্রিকল।
১৭২. ভেন্ট্রিকল কোথায় উন্মুক্ত হয় – বাল্বাস আর্টারিওসাস।

Scanned with CamScanner

১৭৩. রুই মাছের রক্ত প্রবাহের দিক–
সাইনাস ভেনোসাস → অ্যাট্রিয়াম → ভেন্ট্রিকল → বাল্বাস আর্টেরিওসাস।
১৭৪. রুই মাছের ক্ষেত্রে সঠিক : ফুলকা → অলিন্দ → নিলয় → বাল্বাস অ্যাওর্টা।
১৭৫. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে সঠিক – CO_2 যুক্ত রক্ত পাম্প করে।
১৭৬. ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি কত প্রকার – ২ প্রকার (অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী)।
১৭৭. ব্রাঙ্কিয়াল ধমনির গোড়া স্ফীত হয়ে গঠন করে – বাল্বাস আর্টারিওসাস।
১৭৮. ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার প্রতি পাশ থেকে কয়টি ধমনি বের হয় – ৪টি।
১৭৯. রুই মাছের হৃৎপিণ্ড হতে ফুলকায় রক্ত সরবরাহ করে– এফারেন্ট বা অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি।
১৮০. অঙ্কীয় মহাধমনি সৃষ্টি হয় – বাল্বাস আর্টারিওসাস থেকে।
১৮১. পার্শ্বীয় ধমনি বা ল্যাটারাল অ্যাওর্টা গঠন করে – ১ম ও ২য় বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি।
১৮২. ল্যাটারাল অ্যাওর্টা ও ক্যারোটিড ধমনি মিলিত হয়ে গঠন করে – ধমনি বলয় বা সারকিউলাস সেফালিকাস।
১৮৩. মেরুদণ্ডের নিচে মধ্যরেখা বরাবর লেজ পর্যন্ত প্রসারিত – ডর্সাল অ্যাওর্টা।
১৮৪. রুই মাছের বক্ষ অঞ্চলে রক্তসরবরাহ করে – সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনি।
১৮৫. রুই মাছের কোন ধমনি ডর্সাল অ্যাওর্টা থেকে শ্রোণিঅঞ্চলে প্রবেশ করে – ইলিয়াক ধমনি।
১৮৬. বৃক্কে থাকে – রেনাল ধমনি।
১৮৭. ভিসেরাল অঙ্গে – প্যারাইটাল ধমনি।
১৮৮. রুই মাছের শিরাতন্ত্র কয়টি ভাগে বিভক্ত – ২টি (সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র ও পোর্টাল শিরাতন্ত্র)।
১৮৯. রুই মাছের দেহের সামনের অংশ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে – কার্ডিনাল শিরা।
১৯০. পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশ ও বায়ুথলি থেকে রক্ত সংগ্রহ করে – হেপাটিক পোর্টাল শিরা।
১৯১. যকৃতে রক্ত সরবরাহ করে – হেপাটিক পোর্টাল শিরা।
১৯২. লেজ অঞ্চল থেকে রক্ত সংগৃহীত হয় কোন শিরার মাধ্যমে – কডাল বা পুচ্ছ শিরা।
১৯৩. ডান ও বাম বৃক্কে প্রবেশ করে যথাক্রমে – ডান কার্ডিনাল শিরা ও রেনাল পোর্টাল শিরা।
১৯৪. রুই মাছের ফুলকার সংখ্যা - ৪ জোড়া।
১৯৫. রুই মাছের ফুলকাকে বলা হয় – হলোব্রাঙ্ক।
১৯৬. রুই মাছের শ্বসন অঙ্গ – ফুলকা।
১৯৭. ফুলকা সূত্র আবৃতকারী এপিথেলিয়ামে কী থাকে – রক্তজালিকা।
১৯৮. রুই মাছের প্রতি পার্শ্বে কতটি ফুলকা আর্চ থাকে – ৪টি (কারও মতে ৫টি)।
১৯৯. রুই মাছের বায়ুথলির প্রকোষ্ঠ – ২টি।
২০০. রুই মাছের বায়ুথলিতে বিদ্যমান গ্যাসগুলো হলো – অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড।
২০১. বায়ুথলির নিউম্যাটিক নালি যুক্ত থাকে – গ্রাসনালি বা অন্ননালির সাথে।
২০২. বায়ুথলি অন্তঃকর্ণের – ওয়েবেরিয়ান অসিকলের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
২০৩. রুই মাছের বায়ুথলির প্রধান কাজগুলো হলো – শ্বসন পরিচালনা, উদস্থিতিয় অঙ্গ, ভাসাল অঙ্গ, আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ, মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র রক্ষা, শব্দ সৃষ্টি, প্রতিধ্বনি সৃষ্টি ও সংবেদী অঙ্গ।
২০৪. রুই মাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – বার্বেল।
২০৫. প্রজনন নদীতে রুই মাছের তাপমাত্রা কত থাকে – ২৭-৩০° সে.।
২০৬. বাংলাদেশের কোন নদীতে রুই মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন হয় – হালদা নদী।
২০৭. বহিঃনিষেক ঘটে – রুই মাছে।
২০৮. কত ঘণ্টার মধ্যে রুই মাছের ডিম থেকে লার্ভা হয় – ১৫-১৮ ঘণ্টা।
২০৯. রুই মাছের ডিম নিষিক্ত হওয়ার কত ঘণ্টা পর লার্ভার মাথায় ক্রোমাটোফোর দেখা যায় – ১২ ঘণ্টা।
২১০. রুই মাছের রেণু পোনার দৈর্ঘ্য – ৫.৮ মি.মি.।
২১১. কত ঘণ্টার পর লার্ভার বায়ুথলি ডিম্বাকার ধারণ করে – ৭২ ঘণ্টা।
২১২. ধানীপোনা হতে সময় লাগে – ৯৬ ঘণ্টা।
২১৩. রুই মাছের মুখের দু'পাশে বার্বেল দেখা যায় – ১৫ দিন পর।
২১৪. আঙুলে পোনার বয়স – ৯-৩০ দিন।

তৃতীয় অধ্যায় : মানব শারীরতত্ত্ব – পরিপাক ও শোষণ

১. শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য পরিপাকের ফলে উৎপন্ন হয় – গ্লুকোজ।
২. আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য পরিপাকের ফলে উৎপন্ন হয় – অ্যামিনো এসিড।
৩. স্নেহ বা লিপিড জাতীয় খাদ্য পরিপাকের ফলে উৎপন্ন হয় – ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল।
৪. মানুষের লালা গ্রন্থি – ৩ জোড়া (প্যারোটিড গ্রন্থি, সাবম্যান্ডিবুলার বা সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থি ও সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি)।
৫. লালারসে পানির পরিমাণ – ৯৫.৫%।
৬. একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন লালা ক্ষরণ করে – ১২০০-১৫০০ মিলিলিটার।
৭. দুধ দাঁতে অনুপস্থিত থাকে – প্রিমোলার।
৮. প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নিচের চোয়ালে দন্তকুঠুরীর সংখ্যা– ১৬টি।
৯. একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের নিচের চোয়ালে মোলার দাঁতের সংখ্যা – ৬টি।
১০. মোলার দাঁতের কাজ – খাবার চর্বন করা ও পেষন করা।
১১. একজন ৬ বছরের বালিকার দাঁতের সংকেত (ICPM) – $I_2C_1P_0M_2$।
১২. মুখগহ্বরে কোন প্রকার খাদ্যের পরিপাক শুরু হয় – শর্করা।
১৩. টায়ালিন নিঃসৃত হয় – লালাগ্রন্থি থেকে।
১৪. শর্করা পরিপাককারী এনজাইম– টায়ালিন।
১৫. খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে কত সময় অবস্থান করে – ২-৬ ঘণ্টা।
১৬. কোন এনজাইম অম্লীয় পরিবেশে অধিক কার্যকরী – পেপসিন।
১৭. গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে – গ্যাসট্রিন হরমোন।
১৮. পাকস্থলী নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিক জুসে অনুপস্থিত – অ্যামাইলেজ।
১৯. মানবদেহের পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির সংখ্যা - প্রায় ৪ কোটি।
২০. মানবদেহের পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে প্রতিদিন – প্রায় ২ লিটার গ্যাস্ট্রিস জুস ক্ষরিত হয়।
২১. পেপসিনোজেন নিষ্ক্রিয় এনজাইম সক্রিয় হয় – HCl এর সাহায্যে।
২২. পাকস্থলী প্রাচীরের প্যারাটাইল কোষ থেকে নিঃসৃত হয় – HCl।
২৩. একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যকৃতের ওজন – প্রায় ১.৫-২.০০ কেজি।
২৪. মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি – যকৃৎ।
২৫. মানুষের যকৃতের বাহিরের দিকে আবৃতকারী পর্দার নাম – গ্লিসন্‌স ক্যাপসুল।
২৬. মানুষের যকৃতে অবস্থানকারী ম্যাক্রোফেজের নাম – কুফার কোষ।
২৭. মানুষের যকৃতের সবচেয়ে বড় খণ্ডাংশটি হলো – ডানখন্ড।
২৮. পিত্ত তৈরি হয় – যকৃতে।
২৯. যকৃতের ওজন সমগ্র দেহের ওজনের – ৩-৫%।

Scanned with CamScanner

৩০. মানবদেহের জৈব রসায়নাগার – যকৃৎ।
৩১. Kuffer's cell থাকে – যকৃতে।
৩২. শর্করা যকৃতে সঞ্চিত হয় – গ্লাইকোজেনরূপে।
৩৩. যকৃৎ কী পরিমাণ রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে পারে–১৫০০ ঘন সে.মি.।
৩৪. যকৃতে সঞ্চিত থাকে না – ভিটামিন B_2।
৩৫. যকৃতে প্রায় – ৫০০ ধরনের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
৩৬. যকৃতে প্রায় – ১০০ গ্রাম গ্লাইকোজেন সঞ্চয় থাকে।
৩৭. ননকার্বোহাইড্রেট উৎস থেকে গ্লুকোজ তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হয় – গ্লুকোনিওজেনেসিস।
৩৮. যকৃতে গ্লুকোনিওজেনেসিস (Gluconeogenesis) প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হয় – অ্যামিনো এসিড ও গ্লিসারল হতে।
৩৯. অশর্করা থেকে শর্করা সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো – গ্লুকোনিওজেনেসিস।
৪০. হিমোগ্লোবিন ভেঙে উৎপন্ন প্রোটিন অংশের নাম – গ্লোবিন।
৪১. যকৃৎ কোষ পিত্তলবণ তৈরি করে – স্টেরয়েড হতে।
৪২. পিত্তরস ক্ষরিত হয় – যকৃৎ হতে।
৪৩. যকৃতে অরনিথিন চক্রের মাধ্যমে তৈরি হয় – ইউরিয়া।
৪৪. ইউরিয়া তৈরি হয় প্রধানত – যকৃতে।
৪৫. ইউরিয়া তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট চক্র – অরনিথিন চক্র।
৪৬. যকৃতে কোন উপাদান থেকে ভিটামিন A উৎপন্ন হয় – ক্যারোটিন।
৪৭. মিশ্র গ্রন্থি হলো – অগ্ন্যাশয়।
৪৮. খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম অগ্ন্যাশয়ের কোন অংশ থেকে নিঃসৃত হয় – বহিঃক্ষরা অংশ।
৪৯. পরিপাককারী এনজাইমসমূহ অন্ত্রে সক্রিয় হয় – এন্টেরোকাইনেজের সাহায্যে।
৫০. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সে কোষগুচ্ছের সংখ্যা – ১০ লাখ।
৫১. গ্লুকাগন ও ইনসুলিন নিঃসৃত হয় – অগ্ন্যাশয় হতে।
৫২. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় – গ্লুকাগন।
৫৩. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় – ইনসুলিন।
৫৪. আমিষ পরিপাককারী এনজাইম – ট্রিপসিন।
৫৫. নিষ্ক্রিয় উৎসেচক বা এনজাইম হলো – জাইমোজেন।
৫৬. লালাক্ষরণে অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া শুরু হয় – খাদ্যমুখে প্রবেশ করলে।
৫৭. প্যাংক্রিওজাইমিন নামে পরিচিত – কোলেসিস্টোকাইনিন।
৫৮. পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণে বাধা দেয় – সিক্রেটিন।
৫৯. পরিপাক এনজাইম ক্ষরণে অগ্ন্যাশয়কে উদ্দীপ্ত করে – কোলেসিস্টোকাইনিন।
৬০. পিত্তথলিকে সংকুচিত করে – কোলেসিস্টোকাইনিন।
৬১. পেরিস্ট্যালসিস নিয়ন্ত্রণ করে – মায়েনটেরিক প্লেক্সাস।
৬২. পৌষ্টিকনালির ভেতর দিয়ে খাদ্য এবং পানীয় দ্রুত প্রবাহিত হতে শক্তি প্রয়োগ করে – অ্যাসিটাইল কোলিন।
৬৩. মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক নামে পরিচিত – এন্টেরিক স্নায়ুতন্ত্র।
৬৪. গ্যাস্ট্রিন হরমোন ক্ষরিত হয় – পাকস্থলীর প্রাচীর থেকে।
৬৫. পরিপাকে সাহায্যকারী হরমোন – সিক্রেটিন।
৬৬. মস্তিষ্কের কোন অংশে লালাকেন্দ্র অবস্থিত – মেডুলায়।
৬৭. পাচক রসের অতিক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে – সোমাটোস্ট্যাটিন।
৬৮. ভিল্লিকাইনিন হরমোন ক্ষরিত হয় – ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই থেকে।
৬৯. প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ বস্তুর বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে – কর্টিসল।
৭০. খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক সম্পন্ন হয় – ক্ষুদ্রান্ত্রে।
৭১. ইমালসিফিকেশনে ভূমিকা রাখে – পিত্তরস।
৭২. ল্যাকটেজ এনজাইম কোন খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত – শর্করা।
৭৩. সুক্রেজ হলো – আন্ত্রিক রস।
৭৪. জেজুনামে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে – আন্ত্রিক রস।
৭৫. ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ – ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম।
৭৬. পরিপাককৃত খাদ্যের শতকরা কতভাগ ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয় – ৯০ ভাগ।
৭৭. ক্ষুদ্রান্ত্রে গবলেট কোষ থাকে – মিউকোসা স্তরে।
৭৮. মানুষের অন্ত্রে ভিলাই থাকে – ৫০ হাজার।
৭৯. মাইক্রোভিলাইসমূহ একত্রিত হয়ে তৈরি করে – ব্রাশ বর্ডার।
৮০. পরিশোষণের একক – ভিলাই।
৮১. ক্ষুদ্রান্ত্রে পানি শোষণ হয় – অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়।
৮২. মিসেলি ক্ষুদ্রান্ত্রের আবরণী কলায় শোষিত হয় – ব্যাপন প্রক্রিয়ায়।
৮৩. কাইলোমাইক্রোনের উপাদান – প্রোটিন ও লিপিড।
৮৪. ল্যাকটিয়াল অর্থ – সাদাটে।
৮৫. বৃহদন্ত্রের অংশ – ৩টি (সিকাম, কোলন ও মলাশয়)।
৮৬. খাদ্যের অপাচ্য অংশের গাঁজন ঘটে – বৃহদান্ত্রে।
৮৭. বৃহদন্ত্রে মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির সংখ্যা – ৫০০।
৮৮. পরিপাক বর্জ্যে বিদ্যমান পানির কতভাগ কোলনে পুনঃশোষিত হয় – ৮০%।
৮৯. মল নিষ্কাশিত হওয়ার পূর্বে কোলনে জমা থাকতে পারে – ৩৬ ঘণ্টা।
৯০. গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে পরিশোষিত হয় – জেজুনামে।
৯১. অ্যামিনো এসিড পরিশোষণে সাহায্য করে – ভিটামিন B_6।
৯২. বৃহদন্ত্রে উৎপন্নকারী ভিটামিন হলো –K ও ফলিক এসিড।
৯৩. বৃহদন্ত্রে প্রতিদিন কত গ্রাম আর্দ্র মল তৈরি হয় – ১৩৫ গ্রাম।
৯৪. দৈহিক ওজনে শতকরা কত ভাগের বেশি মেদ থাকলে স্থূলতা বলা হয় – ২০ ভাগ।
৯৫. বিএমআই $= \frac{\text{দেহের ওজন (কেজি)}}{\text{দেহের উচ্চতা (মিটার)}^2}$।
৯৬. ১.২৫ মিটার (১২৫ সেন্টিমিটার) উচ্চতা ও ৫৫ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির BMI হচ্ছে – প্রায় ৩৫.২০।
৯৭. স্বাভাবিক ওজনের মানুষের বডিমাস ইনডেক্স (BMI) – 18.5- 24.9 kg/m^2।
৯৮. অতিস্থূলকায় বলা হয় – BMI 30 Kg/m^2 এর অধিক হলে।
৯৯. স্থূলকায় বা মোটা বলা হয় – BMI 25 Kg/m^2 - 30 Kg/m^2 এর মধ্যে থাকলে।
১০০. স্থূলকায় বাবা মায়ের শতকরা কতভাগ সন্তান স্থূলকায় হয় – ৮০ ভাগ।
১০১. স্থূলতা প্রতিরোধের ওষুধ – Orlistat (Xenical), Suprenza (Phentermine), Lorcaserin (Belviq) ইত্যাদি।
১০২. স্থূলতার কারণে যে সকল রোগ হয় সেগুলো হলো– করোনারি হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, ক্যানসার (স্তন, কোলন), উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, যকৃৎ ও পিত্তথলির অসুখ, স্লিপ অ্যাপনিয়া, অস্টিও-আর্থ্রাইটিস, বন্ধ্যাত্ব, বাত ইত্যাদি।
১০৩. BMI (Body Mass Index)-এর অতিরিক্ত ওজন নির্দেশ করে – 25.0-29.9 kg/m^2।
১০৪. প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম নয় – অ্যামাইলেজ।
১০৫. পেপসিনের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য নয় – ইহা অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হয়।
১০৬. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন – ভিটামিন বি কমপ্লেক্স।
১০৭. স্থূলতার সহিত সম্পর্কযুক্ত রোগ – করোনারি হার্ট ডিজিজ।
১০৮. স্থূলতার সাথে সম্পর্কযুক্ত রোগ নয় – টাইপ-১ ডায়াবেটিস মেলাইটাস।
১০৯. রক্তস্রোতে থাকা অতিরিক্ত গ্লুকোজ থেকে যকৃৎ সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড হলো – গ্লাইকোজেন।

Scanned with CamScanner

১১০. অগ্ন্যাশয়ের আলফা কোষ থেকে নিঃসৃত হয়– গ্লুকাগন।
১১১. লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় – মিউসিন, টায়ালিন, মলটেজ।
১১২. জিহ্বরা পিছনের অংশের স্বাদকোরক সাহায্য করে – তিক্ততা অনুভবে।
১১৩. আমিষ জাতীয় উপাদান কিন্তু এনজাইম নয়– গামা গ্লোবিউলিন।
১১৪. উইর্সাং নালি অবস্থিত – অগ্ন্যাশয়ে।
১১৫. অ্যাপেনডিক্স হলো – সিকামের অংশ।
১১৬. সিক্রেটিন – অগ্ন্যাশয় রস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
১১৭. মানুষের জিহ্বার অগ্রভাগে কোন ধরনের স্বাদকোরক (Taste bud) থাকে – মিষ্টতা।
১১৮. টায়ালিন ও মলটেজ পাওয়া যায় – লালায়।
১১৯. পাকস্থলীর গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় না – টায়ালিন।
১২০. অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত পাচক রস হলো – অ্যামাইলেজ।
১২১. পাকস্থলীর প্রাচীরে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে স্তরগুলো যেভাবে বিন্যস্ত থাকে: সেরোসা → অনুদৈর্ঘ্য পেশিস্তর → বৃত্তাকার পেশিস্তর → সাবমিউকোসা → মাসকিউলারিস মিউকোসা → মিউকোসা।
১২২. যকৃৎনালি পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে অভিন্ন পিত্তনালি তৈরি করে। এই অভিন্ন নালি ভ্যাটার এর অ্যাম্পুলা নামক নালির মাধ্যমে উন্মুক্ত হয় – ডিওডেনামে।
১২৩. অগ্ন্যাশয়ের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য – নিঃস্রাবী কোষ সমন্বয়ে গঠিত ও কেন্দ্রীয় গহ্বরযুক্ত লোবিওল বা অ্যাসিনাস বিদ্যমান।
১২৪. যকৃতের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য – লোবিওলের মাঝে সাইনুসয়েড নামক ফাঁকা স্থান আছে।
১২৫. পাকস্থলীতে পাতলা HCI তৈরি করে – প্যারাইটাল কোষ।
১২৬. পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে – গ্যাস্ট্রিন।
১২৭. প্রোটিনের পরিপাক – পাকস্থলীতে শুরু হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে শেষ হয়।
১২৮. ভিলাইয়ের কাজ হচ্ছে – শোষণ অঞ্চল বৃদ্ধি করা।
১২৯. আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে – পেপসিন।
১৩০. গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসৃত হয় – গ্যাস্ট্রিন হরমোনের প্রভাবে।
১৩১. স্নেহ জাতীয় পদার্থকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে – লাইপেজ।
১৩২. উৎসেচক বা এনজাইম থাকে না – পিত্তরসে।
১৩৩. মানুষে রেনিন তৈরি হয় – বৃক্কে।
১৩৪. মুখগহ্বর আংশিক পরিপাক ঘটে – শর্করা।
১৩৫. ক্ষুদ্রান্ত্রের সর্ববহিঃস্থ কলাস্তরকে বলা হয় – সেরোসা।
১৩৬. জিলেটিনেজ এনজাইম জিলেনটিনকে ভেঙে উৎপন্ন করে – পেপটোন।
১৩৭. গবলেট কোষ – মিউকাস নিঃস্রাবী এককোষী গ্রন্থি।
১৩৮. ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে নিঃসৃত হয় – প্রোলিডেজ।
১৩৯. নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত করে – এন্টারোকাইনেজ এনজাইম।
১৪০. লালারসের – কিছুটা অম্লীয়।
১৪১. মানবদেহের কোথায় কোলাজিনেজ এনজাইম পাওয়া যায় – অগ্ন্যাশয় রসে।
১৪২. ক্ষুদ্রান্ত্রের ফসফোলাইপেজ লিপিডকে সরলীকৃত করে কোন উপাদানটি তৈরি করে – ফ্যাটি এসিড।
১৪৩. প্রাণিকোষে লাইসোজোমের কাজ – পরিপাক।
১৪৪. গ্যাস্ট্রিক জুস (Gastric Juice)-এ পানির পরিমাণ – ৯৯.৪৫%।
১৪৫. পিত্তথলির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে – কোলেসিস্টোকাইনিন।
১৪৬. মিউসিন নিঃসৃত হয় – এপিথেলিয়াল কোষ থেকে।
১৪৭. বিভাজনের ক্ষমতা নেই – স্নায়ুকোষের।

চতুর্থ অধ্যায় : মানব শারীরতত্ত্ব – রক্ত ও রক্ত সংবহন

রক্ত ও রক্তকণিকাসমূহ

১. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে রক্ত থাকে – প্রায় ৫-৬ লিটার।
২. দেহের মোট ওজনের – প্রায় ৭-৮% রক্ত।
৩. মানুষের রক্তের pH-এর মাত্রা – ৭.৩৫-৭.৪৫।
৪. স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের তাপমাত্রা – ৩৬-৩৮° সেলসিয়াস।
৫. রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব – প্রায় ১.০৫-১.০৬৫।
৬. সর্বপ্রথম রক্ত সংবহনতন্ত্রের পরিকল্পনা করেন – উইলিয়াম হার্ভে।
৭. রক্তের উপাদানগুলো আলাদা করার জন্য সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রকে মিনিটে ঘুরাতে হয় – ৩০০০ বার করে ৩০ বার।
৮. রক্তের রক্তরস – ৫৫%।
৯. রক্তের রক্তকণিকা – ৪৫%।
১০. পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে প্লাজমার পরিমাণ – ৩ লিটার।
১১. প্লাজমার পরিমাণ দেহের ওজনের – ৫%।
১২. রক্তরসে পানির পরিমাণ – ৯০%।
১৩. রক্তরসের প্লাজমা প্রোটিন – অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন, হিমোগ্লোবিন ইত্যাদি।
১৪. রক্তরসে নাইট্রোজেন ঘটিত অপ্রোটিন পদার্থ – ক্রিয়োটিনিন।
১৫. রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে – প্লাজমা।
১৬. লোহিত রক্তকণিকার কত ভাগ পানি – ৬০-৭০%।
১৭. রক্তের রং লাল হয় – হিমোগ্লোবিনের কারণে।
১৮. ভ্রূণীয় অবস্থায় লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয় – যকৃৎ, প্লিহা ও থাইমাসে।
১৯. জন্মের ২০ বছর বয়স পর্যন্ত লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয় – হিমোসাইটোব্লাস্টে।
২০. একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের রক্তে প্রতি ঘন মিলিমিটারে ৫ মিলিয়ন বা ৫০ লাখ, নারীর দেহে ৪৫ লাখ, শিশুর দেহে ৬০-৭০ লাখ এবং ভ্রূণের দেহে ৮০-৯০ লাখ RBC বিদ্যমান।
২১. প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ৫০ লাখের চেয়ে কতটুকু কম হলে তাকে রক্তস্বল্পতা বলা হয় – ২৫%।
২২. লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা কত হলে পলিসাইথেমিয়ার সৃষ্টি হয় – ৬৫ লাখের বেশি।
২৩. উটের (স্তন্যপায়ী) লোহিত রক্তকণিকায় – নিউক্লিয়াস থাকে।
২৪. লোহিত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল – প্রায় ১২০ দিন বা ৪ মাস।
২৫. লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট ধ্বংস হয় – যকৃৎ ও প্লীহায়।
২৬. লোহিত রক্তকণিকা তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হয় – এরিথ্রোপোয়েসিস।
২৭. সুস্থ দেহে প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে – প্রায় ১৫-১৬ গ্রাম।
২৮. প্রতিটি লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন থাকে – ২৯ পিকোগ্রাম।
২৯. হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন ভেঙে পরিণত হয় – অ্যামিনো এসিড।
৩০. অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তা করে – এরিথ্রোসাইট।
৩১. বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপন্ন করে – লোহিত রক্তকণিকা।
৩২. দেহের ভ্রাম্যমাণ প্রতিরক্ষাকারী একক – শ্বেত রক্তকণিকা।
৩৩. প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা – ৫-৮ হাজার।
৩৪. শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় – লিউকোমিয়া ক্যান্সারে।
৩৫. মানবদেহে শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ 4000/dl এর চেয়ে কমে গেলে সেই অবস্থাকে বলা হয় – Leukopenia।
৩৬. লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত – ৭০০ ঃ ১।

Scanned with CamScanner

৩৭. দানাদার লিউকোসাইট – নিউট্রোফিল, বেসোফিল ও ইওসিনোফিল।
৩৮. অদানাদার লিউকোসাইট – মনোসাইট ও লিম্ফোসাইট।
৩৯. নিউট্রোফিল কণিকার নিউক্লিয়াসের লোব সংখ্যা – ২-৭টি।
৪০. ইওসিন রঞ্জকে ইওসিনোফিলের বর্ণ হয় – লাল।
৪১. হেপারিন তৈরি ও নিঃসরণ করে – বেসোফিল।
৪২. বেসোফিল ইওসিন রঞ্জকে ধারণ করে – নীল বর্ণ ।
৪৩. বেসোফিলের নিউক্লিয়াস দেখতে – বৃক্কাকার।
৪৪. মনোসাইটের উৎপত্তি হয় না – লসিকায়।
৪৫. শ্বেত রক্তকণিকার প্রধান কাজ – জীবাণু ভক্ষণ করা।
৪৬. অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে – লিম্ফোসাইট।
৪৭. শ্বেত রক্তকণিকার (বেসোফিল) কাজ হলো – হেপারিন তৈরি।
৪৮. রক্তনালিকার অভ্যন্তরে রক্তজমাট রোধ করে – বেসোফিল।
৪৯. দেহের আণুবীক্ষণিক সৈনিক – লিম্ফোসাইট।
৫০. রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা এবং দেহের অ্যালার্জিক-অ্যান্টিবডির বিরুদ্ধে কাজ করে – ইওসিনোফিল।
৫১. মনোসাইটের কাজ – ফ্যাগোসাইটোসিস।
৫২. ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা – থ্রম্বোসাইট বা অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট।
৫৩. প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে অনুচক্রিকার সংখ্যা – ২.৫ লাখ – ৫ লাখ।
৫৪. অনুচক্রিকা তৈরি হয় – মেগাক্যারিওসাইট থেকে।
৫৫. অনুচক্রিকার আয়ুষ্কাল – প্রায় ৫-১০ দিন।
৫৬. অনুচক্রিকার প্রধান কাজ – রক্ত তঞ্চন।
৫৭. হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ গঠন করে – অনুচক্রিকা/থ্রম্বোসাইট।
৫৮. রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী ফ্যাক্টর – ১৩টি।
৫৯. রক্তবাহিকায় রক্ততঞ্চন ঘটানোর পদ্ধতিকে বলা হয় – থ্রম্বোসিস।
৬০. বাতাসের সংস্পর্শে থ্রম্বোসাইট উৎপন্ন করে – থ্রম্বোপ্লাস্টিন।
৬১. রক্ত তঞ্চনের জন্য সঠিক ক্রম – প্রোথ্রোম্বিন থ্রম্বোপ্লাস্টিন + Ca^{++} + থ্রম্বিন
৬২. মানুষের রক্ত জমাট বাঁধার মূল উপাদান নয় – লসিকা।
৬৩. মানুষের রক্ত জমাট বাঁধার স্বাভাবিক সময় – ৪-৫ মিনিট।
৬৪. রক্ত জমাট বাঁধার পর খড় রং সদৃশ যে তরল পৃথক হয় তাকে বলা হয় – সিরাম।
৬৫. রক্তনালির সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হ্রাস করে – সেরাটোনিন।
৬৬. রক্তরসের কোন উপাদানটি সিরামে থাকে না – ফাইব্রিনোজেন।

লসিকা

৬৭. লসিকাতে জলীয় অংশের পরিমাণ – ৯৪%।
৬৮. লসিকার উপাদান – লিম্ফোসাইট, অ্যান্টিবডি, প্লাজমা প্রোটিন ইত্যাদি।
৬৯. মানুষের দেহে লসিকার পরিমাণ – ১-২ লিটার।
৭০. দুধের মত সাদা লসিকাকে বলা হয় – কাইল।
৭১. লসিকার আপেক্ষিক গুরুত্ব – ১.০১৫১।
৭২. লসিকার কাজ – দেহরক্ষার কাজ এবং ইমিউনিটি বৃদ্ধি।
৭৩. কলারসের কতভাগ লসিকা দ্বারা নিষ্কাশিত হয় – ১০%।
৭৪. অন্ত্রের প্রাচীরের লসিকানালিদের বলা হয় – ল্যাকটিয়েল।
৭৫. দেহ অভ্যন্তরে রক্ত জমাট না বাঁধার কারণ – রক্তের দ্রুতগতি।
৭৬. লসিকাতন্ত্র গঠিত – লসিকা, লসিকা জালক, লসিকানালি এবং লসিকাগ্রন্থি নিয়ে।
৭৭. মানবদেহে লসিকা গ্রন্থির সংখ্যা – প্রায় ৪০০-৭০০।
৭৮. মানবদেহের সবচেয়ে বড় লসিকাগ্রন্থি – প্লিহা।

হৃৎপিণ্ড ও কার্ডিয়াক চক্র

৭৯. সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয় – ২৬০০ মিলিয়ন বার।
৮০. জীবদ্দশায় হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত বের করে – ১৫৫ মিলিয়ন টন।
৮১. প্রতি মিনিটে মানব হৃৎস্পন্দন ঘটে ৭০-৭৫ বার যা সারাদিনে ১০০,০০০ বার, বছরে ৩,৬০০,০০০ বার এবং ৭০ বছর বয়স্ক একজন মানুষের সারাজীবনে ২.৫ বিলিয়ন বার।
৮২. পুরুষের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের ওজন – ৩০০ গ্রাম।
৮৩. স্ত্রীদেহে হৃৎপিণ্ডের ওজন – ২০০ গ্রাম।
৮৪. হৃৎপিণ্ডের আবরণ – পেরিকার্ডিয়াম।
৮৫. হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের অভ্যন্তরীণ তরলকে বলা হয় – পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড।
৮৬. হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর নির্মিত – কার্ডিয়াক পেশি দ্বারা।
৮৭. হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের স্তর – ৩টি (এপিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম ও এন্ডোকার্ডিয়াম)।
৮৮. হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা তৈরি হয় – এন্ডোকার্ডিয়াম স্তর হতে।
৮৯. হৃৎপিণ্ডের কোন অংশের মায়োকার্ডিয়াম সর্বাপেক্ষা পুরু – বাম নিলয় (বাম ভেন্ট্রিকল)।
৯০. হৃৎপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে – মায়োকার্ডিয়াম স্তরের।
৯১. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে – কার্ডিয়াক পেশিতে (হৃৎপিণ্ডে)।
৯২. মানুষের হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ – ৪টি (২টি অলিন্দ ও ২টি নিলয়)।
৯৩. ডান ও বাম নিলয় কোন পর্দা দ্বারা বিভক্ত – আন্তঃনিলয় পর্দা (inter-ventricular septum)।
৯৪. পেসমেকার হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকোষ্ঠে অবস্থিত – ডান অলিন্দে।
৯৫. ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের ছিদ্রপথে থাকে – ট্রাইকাসপিড বা ত্রিপত্রী কপাটিকা।
৯৬. নিম্ন মহাশিরা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে অবস্থিত – ইউস্টেসিয়ান কপাটিকা।
৯৭. হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামের সাথে যুক্ত থাকে – উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা।
৯৮. দেহের সম্মুখ অঞ্চল থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত সংগ্রহ করে – উর্ধ্ব মহাশিরা (superior venacava)।
৯৯. হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর থেকে ডান অলিন্দে রক্ত নিয়ে আসে – করোনারি শিরা।
১০০. দেহের পশ্চাৎ অঞ্চল থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত সংগ্রহ করে – নিম্ন মহাশিরা (inferior venacava)।
১০১. পালমোনারি বা ফুসফুসীয় শিরা থেকে O_2 যুক্ত রক্ত সংগ্রহ করে – বাম অলিন্দ বা বাম অ্যাট্রিয়াম।
১০২. ফুসফুস থেকে O_2 যুক্ত রক্ত দেহ পর্যন্ত পৌঁছায় : পালমোনারি শিরা → বাম অলিন্দ → বাম নিলয় → মহাধমনি।
১০৩. বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে থাকে – বাইকাসপিড বা মাইট্রাল কপাটিকা।
১০৪. বাইকাসপিড বা মাইট্রাল কপাটিকার অবস্থান – বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝে।
১০৫. পালমোনারি ধমনির মুখে থাকে – সেমিলুনার বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা।
১০৬. হৃৎপিণ্ডের কোন কপাটিকায় তিনটি কাস্প (cusp) থাকে না – বাম এন্ট্রিওভেন্ট্রিকুলার বা বাইকাসপিড কপাটিকায়।
১০৭. সিস্টেমিক মহাধমনি বা অ্যাওর্টা কোন প্রকোষ্ঠ থেকে উৎপন্ন হয় – বাম নিলয়।
১০৮. সঠিক ক্রম: পালমোনারি শিরা → বাম অ্যাট্রিয়াম → বাম ভেন্ট্রিকল → অ্যাওর্টা।

Scanned with CamScanner

১০৯. পালমোনারি শিরা প্রবেশ করে – বাম অ্যাট্রিয়ামে।
১১০. ধমনির উৎপত্তি হয় – হৃৎপিণ্ড থেকে।
১১১. শিরার উৎপত্তি হয় – দেহ থেকে।
১১২. মানবদেহের সকল ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকার সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৬০,০০০ মাইলের অধিক যা দিয়ে পৃথিবীকে দুইবার পেঁচানো যাবে।
১১৩. প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির হৃৎস্পন্দের হার – ৭০-৮০ বার।
১১৪. কার্ডিয়াক বা হৃৎচক্রের সময়কাল – ০.৮ সেকেন্ড।
১১৫. ২৫ বছর বয়স্ক একজন ব্যক্তির হৃৎস্পন্দন মিনিটে ৮০ বার হলে তার কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল – ০.৭৫ সেকেন্ড।
১১৬. অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল – ০.৭ সেকেন্ড; অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল – ০.১ সেকেন্ড; ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল – ০.৩ সেকেন্ড এবং ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল – ০.৫ সেকেন্ড।
১১৭. অ্যাট্রিয়ামের সংকোচন শুরু হয় – সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড।
১১৮. কার্ডিয়াক চক্রের কোন দশার সময়কাল ০.১ সেকেন্ড – অলিন্দের সিস্টোল।
১১৯. ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলের সময় কোন শব্দের সৃষ্টি হয় – লাব সদৃশ।
১২০. ডাব সদৃশ ২য় শব্দটি উৎপন্ন হয় হৃৎপিণ্ডের কোন দশায় – ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল।
১২১. কার্ডিয়াক চক্রের কোন দশায় CO_2 যুক্ত রক্ত ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে – অ্যাট্রিয়ামে ডায়াস্টোল।
১২২. কার্ডিয়াক চক্রের কোন দশায় O_2 যুক্ত রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে – ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল।
১২৩. মানুষের হৃৎপিণ্ডে ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল হলে – সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যাবে।
১২৪. মানুষের রক্তসংবহন – দ্বি-চক্রীয় সংবহন।
১২৫. রক্তের গতিপথের সঠিক ক্রম : ডান অলিন্দ → ডান নিলয় → ফুসফুস → বাম অলিন্দ।
১২৬. হৃৎপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণ কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি – মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ।
১২৭. পেসমেকারের অবস্থান হৃৎপিণ্ডের কোথায় – ডান অলিন্দে।
১২৮. হৃৎস্পন্দন শুরু হয় – SAN (Sino atrial node) থেকে।
১২৯. SAN (প্রাকৃতিক পেসমেকার) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – কার্যকারিতা কমে গেলে ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট অনুভব হয়।
১৩০. সংরক্ষিত ছন্দ নিয়ামক বলা হয় – AVN (Atrio-ventricular node)
১৩১. SAN থেকে প্রতি মিনিটে গড়ে কতটি স্পন্দন উৎপন্ন হয় – ৭২ বার।
১৩২. সঠিক ক্রম : SAN → AVN → বান্ডল অব হিজ → পারকিনজি তন্তু।
১৩৩. AV Node মিনিটে কতবার স্পন্দন আবেগ উৎপন্ন করে – ৫০ বার।
১৩৪. SAN থেকে AVN এ হৃৎউদ্দীপনা পৌছাতে সময় লাগে – ০.১৫ সেকেন্ড।
১৩৫. হিজের বান্ডলের স্পন্দন হার প্রতি মিনিটে – ৩৬ বার।
১৩৬. পারকিনজি তন্তু প্রতি মিনিটে কত বার স্পন্দন আবেগ উৎপন্ন করে – ৩০-৩৫ বার।
১৩৭. হৃৎপিণ্ডের সংকোচন হার কমায় – প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ু।
১৩৮. হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি করে – এড্রিনালিন হরমোন।
১৩৯. ব্যারোরিসেপ্টর – ২ রকম।
১৪০. অ্যাওর্টিক আর্চে অবস্থান – আর্টারিয়াল ব্যারোরিসেপ্টর।
১৪১. ক্যারোটিড সাইনাসে অবস্থান – উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর।
১৪২. আয়তন ব্যারোরিসেপ্টরের অবস্থান – বড় সিস্টেমিক শিরা, পালমোনারি শিরা এবং হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ ও নিলয়ের প্রাচীরে।
১৪৩. রক্তের আয়তন নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে – আয়তন ব্যারোরিসেপ্টর।
১৪৪. দেহের সমস্ত রক্ত প্রতি ২০ সেকেন্ডে একবার সমগ্র মানবদেহে পরিভ্রমণ করে।
১৪৫. মানুষের রক্তচাপ নির্ণয়ের যন্ত্রের নাম – স্ফিগমোম্যানোমিটার।
১৪৬. নিম্ন রক্তচাপ দ্বারা সৃষ্ট জটিলতার নাম – সিনকপ।
১৪৭. উচ্চ রক্তচাপের কারণে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতার নাম – স্ট্রোক।
১৪৮. উচ্চ রক্তচাপের কারণে হৃদযন্ত্রে কোন জটিলতা দেখা যায় – ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ।
১৪৯. করোনারি ধমনি রক্ত সংবহন করে কোথায় – হৃৎপিণ্ডে।
১৫০. অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনি রক্ত সংবহন করে কোথায় – মস্তিষ্কে।
১৫১. বাহু, গ্রীবা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে কোন শিরা – সাবক্লেভিয়ান শিরা ।

হৃৎপিণ্ডের রোগ ও চিকিৎসা

১৫২. হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লির প্রদাহকে বলা হয় – পেরিকার্ডাইটিস।
১৫৩. অ্যানজাইনার কারণ – হৃৎপেশিতে ল্যাকটিক এসিড জমা।
১৫৪. অ্যানজাইনার ব্যথার স্থায়িত্ব – ৫-৩০ মিনিট।
১৫৫. কত বছরের মহিলাদের ক্ষেত্রে অ্যানজাইনা বেশি দেখা যায় – ৬৫ বছর।
১৫৬. হৃৎপেশিতে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহের ফলে সৃষ্টি হয় – হার্ট অ্যাটাক।
১৫৭. হার্ট অ্যাটাকের অপর নাম – মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন।
১৫৮. রক্ত জমাট বাঁধানো থেকে রক্ষা করে –অ্যাসপিরিন।
১৫৯. করোনারি ধমনির মধ্যে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য দেওয়া হয় – নাইট্রোগ্লিসারিন।
১৬০. কৃত্রিম পেসমেকারের ব্যাটারি কিসের তৈরি – লিথিয়াম।
১৬১. কৃত্রিম পেসমেকার কোন ধাতু দ্বারা তৈরি করা হয়– টাইটেনিয়াম।
১৬২. ওপেন হার্ট সার্জারির প্রধান উপায় – ৩টি।
১৬৩. ধমনি গাত্রে প্লাক জমার প্রক্রিয়াকে বলা হয় – আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস।
১৬৪. বাইপাস সার্জারির সময় গ্রাফট তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় – রেডিয়াল ধমনি।
১৬৫. হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর ও অ্যানজাইনা থেকে মুক্তির সহজ উপায় – এনজিওপ্লাস্টি।
১৬৬. নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ – লোহিত রক্তকণিকা।
১৬৭. মানুষের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণ কাল – ১-৪ মিনিট।
১৬৮. একই সাথে শরীরে রক্তে অক্সিজেনের ঘনত্ব ও হৃৎস্পন্দনের পরিমাপক যন্ত্রের নাম – পালস্ অক্সিমিটার।
১৬৯. হৃদযন্ত্রের রোগ নির্ণয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা – ইসিজি।
১৭০. করোনারি ধমনি সরু হয়ে যাওয়া নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় – এনজিওগ্রাম।
১৭১. হৃদ-ফুসফুস যন্ত্র (Heart-Lung machine) ব্যবহৃত হয় – হৃৎপিণ্ডের বাইপাস সার্জারিতে।
১৭২. বিশ্বব্যাপী রক্তশূন্যতার প্রধানতম কারণ – লৌহ ঘাটতি।
১৭৩. পালমোনারি সংবহনের অংশ নয় – মহাধমনি।
১৭৪. ফোসা ওভালিস হৃৎপিণ্ডের কোথায় অবস্থান করে – ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের আন্তঃঅলিন্দ পর্দার গাত্রে।
১৭৫. হৃৎপিণ্ডকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ বিভক্ত করে – এন্ডোকার্ডিয়াম।
১৭৬. কোন শ্বেতকণিকার নিউক্লিয়াসটি দুই লোববিশিষ্ট – ইওসিনোফিল।
১৭৭. সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক চাপের অন্তরফলকে বলা হয় – পালস্ প্রেশার।

Scanned with CamScanner

১০৯. রক্ত সরবরাহের বিকল্প পথ সৃষ্টি করা হয় কোন চিকিৎসার মাধ্যমে – বাইপাস সার্জারি।
১১০. করোনারি ধমনির লুমেন বন্ধ হয়ে গেলে কোন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে – হার্ট অ্যাটাক।
১১১. ফুসফুসীয় ধমনি বহন করে – deoxygenated blood।
১১২. মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ কত (সিস্টোল : ডায়াস্টোল) – 120 mm : 80 mm।
১১৩. মানব রক্তে বিদ্যমান বাফার দ্রবণ– $CH_3COONa + CH_3COOH$.
১১৪. কোন রোগের চিকিৎসায় অ্যাসপিরিন ব্যবহার করা হয় – হৃদরোগ।
১১৫. রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ করে – বৃক্ক।
১১৬. কোনটি অবিভেদিত ও আজীবন বিভাজনক্ষম কোষ – রক্ত কোষ।
১১৭. হিমোগ্লোবিন কোন ধরনের প্রোটিন – মেটালোপ্রোটিন।
১১৮. মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দনকে বলা হয় – অ্যারিথমিয়া।
১১৯. রক্ত – তরল যোজক কলা।
১২০. হৃৎপিণ্ড সক্রিয় রাখতে প্রতি মিনিটে ১-৫ ওয়াট বিদ্যুৎ সমপরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়।

পঞ্চম অধ্যায় : মানব শারীরতত্ত্ব – শ্বসন ও শ্বাসপ্রক্রিয়া

১. শ্বসনের সময় খাদ্যস্থিত স্থৈতিক শক্তি পরিণত হয় – তাপশক্তিতে।
২. মানুষের প্রধান শ্বসন অঙ্গ – ফুসফুস।
৩. শ্বসন পথ শুরু হয় – সম্মুখ নাসারন্ধ্র থেকে।
৪. নাসিকার আকৃতি – ত্রিকোণাকার।
৫. নাসাপথের কাজ – ছাঁকনির ন্যায়।
৬. কোন পর্বের প্রাণীতে অক্সিজেন সরাসরি দেহকোষে গৃহীত হয় – Porifera।
৭. শব্দ উৎপন্ন করে – ল্যারিংস।
৮. স্বরযন্ত্রে কোমলাস্থি বা তরুণাস্থির সংখ্যা – ৯টি।
৯. মুখ, গলবিল ও স্বরযন্ত্রের সংযোগস্থলের রন্ধ্রকে বলা হয় – গ্লটিস।
১০. মানব ফুসফুসে বিদ্যমান সকল কৈশিক নালিকাকে পরস্পর সংযুক্ত করলে এর মোট দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার।
১১. খাদ্য স্বরযন্ত্রে প্রবেশে বাধা পায় – এপিগ্লটিসের কারণে।
১২. ল্যারিংক্স গহ্বরে ভোকাল কর্ডের সংখ্যা – ৬টি।
১৩. কোনটির কম্পনের ফলে শব্দ সৃষ্টি হয় – ভোকাল কর্ড।
১৪. ডান ব্রঙ্কাসের শাখা – ৩টি।
১৫. অ্যালভিওলাস নালির স্ফীত অগ্রভাগ হলো – অ্যাট্রিয়াম।
১৬. সঠিক প্রবাহচিত্র: ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কাই → ব্রঙ্কিওল → অ্যালভিওলার নালি → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলাস
১৭. ফুসফুসে বায়ুপ্রবাহের সঠিক গতিপথ: ল্যারিংক্স → ট্রাকিয়া → ব্রংকাই → অ্যালভিওলি
১৮. মানবদেহের শ্বসনতন্ত্রের বায়ু পরিবহন অঞ্চল নয় – অ্যালভিওলার নালি।
১৯. ফুসফুসের আবরণের নাম – প্লুরা।
২০. সেরাস ফ্লুইড কোন অঙ্গকে রক্ষা করে – ফুসফুসকে।
২১. সেরাস ফ্লুইড পাওয়া যায় – ফুসফুসে।
২২. ডান ফুসফুসে লোব – ৩টি (সুপিরিয়র লোব, মিডল লোব ও ইনফিরিয়র লোব)।
২৩. বাম ফুসফুসে লোব – ২টি (সুপিরিয়র লোব ও ইনফিরিয়র লোব)।
২৪. ডান ফুসফুসে লোবিওলের সংখ্যা – ১০টি।
২৫. বাম ফুসফুসে লোবিওলের সংখ্যা – ৮টি।
২৬. মানুষের ফুসফুসে মোট কয়টি লোব বিদ্যমান – ৫টি।
২৭. ফুসফুসের গঠনগত ও কার্যগত একক – অ্যালভিওলাস।
২৮. অ্যালভিওলাস কোথায় পাওয়া যায় – ফুসফুসে।
২৯. মানুষের ফুসফুস কত বর্গমিটার আয়তনের তলজুড়ে অ্যালভিওলাই রয়েছে – প্রায় ৭০-৯০ বর্গমিটার।
৩০. মানুষের ফুসফুসে অ্যালভিওলাই-এর সংখ্যা – ৭০ কোটি।
৩১. অ্যালভিওলাসের প্রাচীর নির্মিত – স্কোয়ামাস বা আঁইশাকার এপিথেলিয়াম দ্বারা।
৩২. হাঁচি (sneeze) শ্বসনতন্ত্রের একটি বিশেষ ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়া যা নাসিকার মিউকাস পর্দা থেকে কোনো প্রদাহিক বস্তুকে পরিষ্কার করে। সর্বোচ্চ রেকর্ডকৃত হাঁচির গতি ১৬৫ কিলোমিটার/ঘণ্টা।
৩৩. সারফেকট্যান্ট পাওয়া যায় – অ্যালভিওলাসে।
৩৪. সারফেকট্যান্টের কাজ – জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) ধ্বংস করা।
৩৫. শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে O_2 এবং CO_2 এর বিনিময় ঘটে – অ্যালভিওলাসে।
৩৬. মানবভ্রূণে কত সপ্তাহ বয়সে সারফেকট্যান্ট শুরু হয় – ২৩ সপ্তাহ।
৩৭. কত সপ্তাহ আগে মানবভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয় না – ২৪ সপ্তাহ।
৩৮. বক্ষ ও উদর গহ্বরকে পৃথক রাখে – ডায়াফ্রাম।
৩৯. অ্যানজিওটেনসিন-I কে অ্যানজিওটেনসিন-II এ রূপান্তরিত করে – ফুসফুস।
৪০. বহিঃশ্বসনের পর্যায় – ২টি।
৪১. ডায়াফ্রাম পেশির সংকোচনের জন্য দায়ী – ফ্রেনিক স্নায়ু।
৪২. দুই পর্শুকার মাঝের পেশি হলো – ইন্টারকস্টাল পেশি।
৪৩. মানুষের বিশ্রাম কালে শ্বসন হার – ১৪-১৮ বার।
৪৪. নবজাতক শিশুর শ্বসন হার – ৪০ বার।
৪৫. একজন সুস্থ মানুষ প্রতি মিনিটে প্রায় গড়ে ১৬ বার, প্রতি ঘণ্টায় ৯৬০ বার, প্রতিদিন ২৩০৪০ বার, প্রতি বছর ৮.৪ মিলিয়ন বার এবং ৮০ বছর বয়সের জীবনে মোট ৬৭২.৭৬৮ মিলিয়ন বার শ্বাস গ্রহণ করে।
৪৬. মস্তিষ্কে শ্বসন কেন্দ্র অবস্থিত – পনস ও মেডুলায়।
৪৭. মস্তিষ্কে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র – ৪টি (পনসে ১ জোড়া ও মেডুলায় ১ জোড়া)।
৪৮. রক্তের কোন উপাদান শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে – CO_2।
৪৯. ঘনত্বের প্রতি সংবেদী কেমোরিসেপ্টারগুলো কোথায় থাকে – মেডুলায়।
৫০. রক্তে CO_2 এর উপস্থিতিতে কোন কেন্দ্র উদ্দীপিত হয় – অ্যানিউস্টিক কেন্দ্র।
৫১. কোনটি হতে স্নায়ু উদ্দীপনা নিঃশ্বাস কেন্দ্রে পৌঁছালে নিঃশ্বাস শুরু হয় – নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্র।
৫২. হাঁচি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সহায়ক – অলফ্যাক্টরি স্নায়ু।
৫৩. শ্বাসনালিতে অস্বাভাবিক বস্তু প্রবেশ করলে সৃষ্টি হয় – কাশি প্রতিবর্তী ক্রিয়া (সহায়ক ভেগাস স্নায়ু)।
৫৪. মানুষের শ্বসনে শতকরা কতভাগ O_2 প্লাজমায় ভৌত দ্রবণরূপে পরিবাহিত হয় – ২%।
৫৫. একটি হিমোগ্লোবিন অণু কয় অণু অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় – ৪ অণু।
৫৬. কতভাগ CO_2 রক্তের প্লাজমার সাথে যুক্ত হয় – ৫%।
৫৭. রক্তে CO_2 পরিবহনের মাধ্যম নয় – কার্বন মনোঅক্সাইড।
৫৮. লোহিত রক্তকণিকায় কার্বনিক এসিড প্রস্তুতির বিক্রিয়ায় সহায়তা করে – অ্যানহাইড্রেজ।
৫৯. মানুষের রক্তের শ্বাসরঞ্জক – হিমোগ্লোবিন।

Scanned with CamScanner

৬০. লোহিত কণিকার কতভাগ হিমোগ্লোবিন – ৩৩%।
৬১. রক্তে হিম ও গ্লোবিনের অনুপাত – ১ ঃ ২৫।
৬২. পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে কত গ্রাম লৌহ থাকে – ৩ গ্রাম।
৬৩. শ্বাসনালিতে মিউকাস সৃষ্ট প্রদাহকে বলা হয় – ব্রঙ্কাইটিস।
৬৪. সাইনাস প্রদাহের কারণে হয় – সাইনুসাইটিস।
৬৫. মানুষের সাইনাসের সংখ্যা – ৪টি (ম্যাক্সিলারি, ফ্রন্টাল, এথময়ডাল ও স্ফেনয়ডাল সাইনাস)।
৬৬. কোন সাইনাসের প্রদাহের কারণে গালে, দাঁত ও মাথায় ব্যথা হয় – ম্যাক্সিলারি সাইনাস।
৬৭. মানব দু'চোখের মধ্যবর্তী সাইনাসের নাম – এথময়েড।
৬৮. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাইনুসাইটিস হয় – সাধারণত ছত্রাকের আক্রমণে।
৬৯. দীর্ঘস্থায়ী সাইনুসাইটিসের অন্যতম কারণ – সিস্টিক ফাইব্রোসিস।
৭০. সাইনুসাইটিস রোগের প্রধান উপসর্গ – মাথাব্যথা।
৭১. ওটিটিস মিডিয়া দেখা যায় মানুষের কোন অঙ্গে – কানে।
৭২. কানের মধ্যকর্ণের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে বলা হয় – ওটিটিস মিডিয়া।
৭৩. মধ্যকর্ণের ইনফেকশনের কারণ – ইউস্টেশিয়ান নালি বন্ধ হওয়া।
৭৪. কোন বয়সী শিশুদের ওটিটিসমিডিয়া বেশি হতে পারে – ৪ মাস - ৪ বছর।
৭৫. পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যকর্ণের প্রদাহে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক হলো – অ্যামোক্সিসিলিন।
৭৬. মস্তিষ্ক দ্বারা ফুসফুসে নিম্নমাত্রার অক্সিজেন নির্ণীত হলে দেহ এতে সাড়া দিয়ে হাইম তোলে (yawning) যার ফলে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন গৃহীত হয়।
৭৭. অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray ফিল্ম দেখতে – কালো।
৭৮. ধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray ফিল্ম দেখতে – সাদাটে।
৭৯. অধিক ধূমপানের ফলে সৃষ্ট রোগ – ব্রঙ্কাইটিস।
৮০. সিগারেটের ধোঁয়ার ক্ষতিকর প্রধান উপাদান – নিকোটিন।
৮১. ফুসফুসের প্রদাহকে বলা হয় – এমফাইসেমা।
৮২. কোন রোগে অ্যালভিওলাস ফেটে ফুসফুসে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে – প্লুরেসি।
৮৩. ধূমপায়ী মহিলাদের কোনটি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় – বন্ধ্যত্ব।
৮৪. কমন কোল্ড বা ঠাণ্ডা লাগা শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণজনিত একটি রোগ যা ২০০ ধরনের ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়।
৮৫. দুর্ঘটনায় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা হলো – সিপিআর।
৮৬. কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসে বড়দের ক্ষেত্রে মিনিটে ফুঁ দিতে হয় – ১০-১৫ বার।
৮৭. কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসে শিশুদের ক্ষেত্রে মিনিটে ফুঁ দিতে হয় – ২০-২৫ বার।
৮৮. প্যারান্যাসাল সাইনাস না – অক্সিপিটাল সাইনাস।
৮৯. Adams Apple থাকে – স্বরযন্ত্রে।
৯০. কার্বন ডাইঅক্সাইড হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে – কার্বামাইনো হিমোগ্লোবিন তৈরি করে।
৯১. স্বরতন্ত্রীর (স্বর রজ্জুর) অবস্থান – ল্যারিংক্সে।
৯২. ফুসফুস আবৃতকারী পর্দা – প্লিউরা।
৯৩. এপিগ্লটিস থাকে – ল্যারিংক্সে।
৯৪. মানুষের শ্বাসনালির দৈর্ঘ্য – ১০-১৫ সেন্টিমিটার।
৯৫. ডায়াফ্রাম পরোক্ষভাবে সাহায্য করে – বহিঃশ্বসনে।
৯৬. শ্বসনে বর্জ্য হিসেবে উৎপন্ন হয় – CO_2।
৯৭. ন্যাসাল সেপ্টামের সংখ্যা – ১টি।
৯৮. ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য দায়ী – SiO_2।
৯৯. ট্রাকিয়া থেকে বাম ফুসফুসে বায়ু পরিবহন করে – ব্রঙ্কাস।
১০০. মানবদেহের ফুসফুস থেকে O_2 রক্তে পরিবাহিত হয় – ব্যাপন প্রক্রিয়ায়।
১০১. মানবদেহের ট্রাকিয়া কয়টি তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত – ১৬-২০টি।
১০২. ব্রঙ্কিওলের অতিসূক্ষ্ম ও তরুণাস্থিবিহীন প্রান্তগুলোকে বলা হয়– অ্যালভিওলার নালি।
১০৩. প্লুরা কয় স্তরবিশিষ্ট – ২।
১০৪. বাতাসে CO_2-এর ঘনত্ব ০.২৫% বাড়লে শ্বসনের হার হবে – দ্বিগুণ।
১০৫. ধূমপান শতকরা কত ভাগ ফুসফুসীয় ক্যান্সারের কারণ – ৯০%।
১০৬. ফুসফুসে প্রবাহিত শিরা রক্তে O_2 এর পরিমাণ – ১৫%।
১০৭. ধূমপায়ীর শ্বসনতন্ত্রে কোন সমস্যা দেখা দেয় – কমসংখ্যক অ্যালভিওলাই থাকে।
১০৮. টিমপেনোস্টোমি ব্যবহৃত হয় কোন রোগের প্রতিকারের ক্ষেত্রে – ওটিটিস মিডিয়া।
১০৯. স্থায়িত্বের ভিত্তিতে ওটিটিস মিডিয়া – ২ প্রকার।
১১০. ক্রোনিক সাইনুসাইটিসের চিকিৎসা সাধারণত কত সপ্তাহ ধরে চলে – ৩-৪ সপ্তাহ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : মানব শারীরতত্ত্ব - বর্জ্য ও নিষ্কাশন

১. রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয় – ৮০%।
২. মানব রেচনতন্ত্রের অংশ নয় – অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি।
৩. মানুষের মুখ্য রেচন অঙ্গ – বৃক্ক।
৪. মূত্রথলি হতে মূত্র পরিবহন করে – ইউরেথ্রা।
৫. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি কোন অঙ্গের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত – বৃক্ক।
৬. বৃক্কের অবতল অংশের ভাঁজকে বলা হয় – হাইলাস।
৭. হাইলাস দিয়ে বৃক্কে প্রবেশ করে – রেনাল ধমনি ও স্নায়ু।
৮. বৃক্কে প্রবেশকারী রেনাল শিরা দেহের সবচেয়ে বড় শিরা।
৯. বৃক্কের তন্ত্রময় আবরণের নাম – ক্যাপসুল।
১০. বৃক্কের লম্বচ্ছেদে কয়টি অংশ দেখা যায় – ২টি (বাইরের দিকে কর্টেক্স ও ভেতরের দিকে মেডুলা)।
১১. বৃক্কের কার্যকরী একক - নেফ্রন।
১২. বৃক্কের কর্টেক্সে থাকে না – সংগ্রাহক নালিকা।
১৩. রেনাল পিরামিডের ফাঁকে ফাঁকে কর্টেক্সে বিস্তৃত অংশের নাম – রেনাল কলাম।
১৪. রেনাল পিরামিডের শীর্ষকে বলা হয় – রেনাল প্যাপিলা।
১৫. প্রতিটি বৃক্কে নেফ্রনের সংখ্যা – ১০ -১২ লাখ।
১৬. হেনলির লুপের অবস্থান বৃক্কের – বৃক্কীয় নালিকায়।
১৭. সুপারফিসিয়াল কর্টেক্সে নেফ্রন – ৮৫%।
১৮. প্রতি মিনিটে কতটুকু মূত্র সৃষ্টি হয় – ১ ঘন সে.মি.।
১৯. প্রত্যেক নেফ্রনের প্রধান অংশ - ২টি।
২০. রেনাল করপাসলে/নেফ্রনে/প্রক্সিমাল পেঁচানো নালিকায় কোন ধরনের কোষ দেখা যায় – পোডোসাইট।
২১. বৃক্কের কোথায় আলট্রাফিলট্রেশন হয় – রেনাল করপাসলে/গ্লোমেরুলাসে।
২২. নেফ্রনের কোন অংশে নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ ঘটে – নিকটবর্তী পেঁচানো নালিকায়।
২৩. নেফ্রনের হেনলির লুপে পুনঃশোষণ ঘটে – পানির (৭০%)।
২৪. বৃক্কে – প্রোটিন ও রক্তকণিকাসমূহ ফিলট্রেট হয় না।
২৫. পানির পুনঃশোষণ নিয়ন্ত্রণ করে – ADH।
২৬. মানবদেহে মূত্র নিষ্কাশনের সঠিক গতিপথ : পেলভিস → ইউরেটার → মূত্রথলি → মূত্রনালি → নির্গমন
২৭. ইউরিয়া প্রধানত তৈরি হয় – যকৃতে।
২৮. ইউরিয়া তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট চক্র – অরনিথিন চক্র।

Scanned with CamScanner

২৯. দেহের সকল রক্ত ছাঁকনের জন্য কত মিনিটে একবার বৃক্ক অতিক্রম করে – ৪-৫ মিনিটে।
৩০. বৃক্কের কোন অংশ অতিপরিস্রাবণ বা আলট্রাফিলট্রেশনের কাজ করে – গ্লোমেরুলাস।
৩১. গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটে থাকে না – প্লাজমা প্রোটিন (প্রোটিন)।
৩২. নেফ্রনের কোন অংশে অধিকাংশ গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের পুনঃশোষণ ঘটে – প্রক্সিমাল/নিকটবর্তী পেঁচানো নালিকায় (৮০%)।
৩৩. প্রক্সিমাল/নিকটবর্তী পেঁচানো নালিকায় সক্রিয় ক্ষরণ ঘটে – ক্রিয়েটিনিন।
৩৪. মূত্রের রং খড় বর্ণ হওয়ার জন্য দায়ী বস্তু হলো – ইউরোক্রোম।
৩৫. মূত্রের pH = ৬.৫।
৩৬. বৃক্কের পাথর সৃষ্টির জন্য দায়ী – ইউরিক এসিড।
৩৭. মানুষের বৃক্কে যে পাথর হয় সেগুলো প্রাথমিক অবস্থায় রক্তের সাথে সমগ্র দেহে ঘুরে বেড়ায়।
৩৮. বৃক্কের রোগ নির্ণয়ের নির্দেশক –ক্রিয়েটিনিন।
৩৯. দেহরসে পানির হ্রাস–বৃদ্ধি শনাক্তকারী অসমোরিসিপ্টার অবস্থিত - হাইপোথ্যালামাসে।
৪০. রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে – অ্যাল্ডোস্টেরন।
৪১. বৃক্কের H^+ এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে – অ্যাল্ডোস্টেরন।
৪২. বৃক্ক বিকলের বৃক্ক-উত্তর ক্যাটাগরির কারণ – বৃক্কে পাথর।
৪৩. পেশি নিঃসৃত কোন রাসায়নিক পদার্থ বৃক্কের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয় – মায়োগ্লোবিন।
৪৪. ডায়ালাইসিস পদ্ধতি যে অঙ্গের কাজের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় – বৃক্ক।
৪৫. ডায়ালাইসিস কত প্রকার – ২।
৪৬. বৃক্ক প্রতিস্থাপনের সময় বৃক্কটি গ্রহীতার কোথায় বসানো হয় – শ্রোণিদেশে।
৪৭. ANH কোথা হতে ক্ষরিত হয় – হৃৎপিণ্ড।
৪৮. দেহের মাস্টার কেমিস্ট – বৃক্ক।
৪৯. বৃক্কের অনুচ্ছেদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য – ট্রাবেকুলি।
৫০. মানুষের মূত্রথলির আয়তন মানুষের মস্তিষ্কের আয়তনের সমান।
৫১. দাতার দেহ থেকে বৃক্ক সংগ্রহের কতক্ষণের মধ্যে গ্রহীতার দেহে স্থাপন করতে হয় – ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে।
৫২. বৃক্কের কাজ নয় – তাপ নিয়ন্ত্রণ করা।
৫৩. মূত্রের উপাদান নয় – বিলিরুবিন।
৫৪. রেচনতন্ত্রে নিম্নের কোনটি ইউরেটার (গবিনী) নামক নালি গঠন করে – ডাক্ট অব বেলিনি।
৫৫. রেনিন তৈরি হয় – বৃক্কে।
৫৬. রক্তে Na^+ এর পরিমাণ অক্ষুণ্ন রাখে – ANF।
৫৭. মানবদেহে ADH-ক্ষরণ কমে গেলে– পানির পুনঃশোষণ কমে যায়।
৫৮. মানবদেহে প্রতি মিনিটে উৎপন্ন গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট এর কী পরিমাণ পুনঃশোষিত হয় – ১২৪ সিসি।
৫৯. মানবমূত্রে অ্যামোনিয়ামের পরিমাণ কত শতাংশ – ০.০৪।

সপ্তম অধ্যায় : মানব শারীরতত্ত্ব- চলন ও অঙ্গচালনা

১. কঙ্কালতন্ত্র ভ্রূণীয় কোন স্তর হতে সৃষ্টি হয় – মেসোডার্ম।
২. করোটির ডানার মতো অস্থিটির নাম – স্ফেনয়েড।
৩. করোটির অস্থি – ৮টি।
৪. মুখমণ্ডলীয় অস্থি – ১৪টি।
৫. মুখমণ্ডলীয় অস্থিসমূহের নামগুলো – ম্যাক্সিলা, ম্যান্ডিবল, জাইগোম্যাটিক, ন্যাসাল, ল্যাক্রিমাল, ইনফিরিয়র ন্যাসাল কঙ্কা, ভোমার ও প্যালেটাইন।
৬. মানুষের মুখমণ্ডলীয় অস্থি নয় – এথময়েড অস্থি।
৭. মহাবিবর বা ফোরামেন ম্যাগনাম অবস্থিত – অক্সিপিটাল।
৮. করোটিকার অস্থি/জোড় অস্থি – প্যারাইটাল।
৯. মানুষের মেরুদণ্ডের প্রথম অস্থি (অ্যাটলাস) করোটির কোন অস্থির সাথে যুক্ত থাকে – অক্সিপিটাল অস্থি।
১০. পিটুইটারি গ্রন্থিকে ধারণ করে করোটির কোন অস্থি – স্ফিনয়েড অস্থি।
১১. মানব শ্রবণাঙ্গকে সুরক্ষা করে – টেম্পোরাল অস্থি।
১২. মানুষের অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্রের অংশ – করোটি।
১৩. মানুষের করোটির অস্থির সংখ্যা – ২৯টি।
১৪. মানবদেহে অক্ষীয় কঙ্কাল অস্থির সংখ্যা – ৮০টি।
১৫. মানুষের উপাঙ্গীয় কঙ্কালে অস্থির সংখ্যা – ১২৬টি।
১৬. মানুষের বক্ষদেশীয় অঞ্চলে কশেরুকা – ১২টি।
১৭. বক্ষপিঞ্জর গঠনকারী অস্থির সংখ্যা – ২৫টি।
১৮. মানুষের এক হাতে ফ্যালাঞ্জেসের সংখ্যা – ১৪টি।
১৯. এক্সিস কোন অঞ্চলের কশেরুকা – গ্রীবাদেশীয়।
২০. বক্ষ অস্থিচক্রের অস্থি হলো – ক্লাভিকল (বাঁকানো অস্থি)।
২১. করোটির সচল বা নড়নক্ষম অস্থি – ম্যান্ডিবল।
২২. মানুষের গ্রীবা দেশীয় কশেরুকা – ৭টি।
২৩. বায়ুপূর্ণ অস্থি (নিউমেটিক অস্থি) – ম্যাক্সিলা।
২৪. করোটির সবচেয়ে ক্ষুদ্র অস্থি – ল্যাক্রিমাল।
২৫. গ্লেনয়েড গহ্বর থাকে – অগ্রপদে/বক্ষাস্থি চক্রে (স্ক্যাপুলায়)।
২৬. থোরাসিক কশেরুকার সংখ্যা – ১২টি।
২৭. ডেলটয়েড রিজ বিদ্যমান – হিউমেরাসে।
২৮. ওলিক্রেনন কোন অস্থির অংশ – আলনা।
২৯. সুষুম্নাকাণ্ডকে সুরক্ষিত রাখে – মেরুদণ্ড।
৩০. ওডোন্টয়েড প্রসেস থাকে – ২য় সারভাইক্যাল কশেরুকায়।
৩১. ম্যামারি প্রসেস দেখা যায় – লাম্বার কশেরুকায়।
৩২. মানুষের পুচ্ছদেশীয় কশেরুকা – কক্সিক্স।
৩৩. কোন কশেরুকায় ট্রান্সভার্স ফোরামেন থাকে – স্যাক্রামে।
৩৪. উর্ধ্ববাহুকে অক্ষীয় কঙ্কালের সাথে সংযুক্ত করে – ক্লাভিকল।
৩৫. স্টার্নামের সাথে সংযুক্ত থাকে – প্রথম ৭ জোড়া পর্শুকা।
৩৬. Floating rib – ১১শ - ১২শ।
৩৭. স্টার্নামের অংশ– ম্যানুব্রিয়াম, কর্পাস (দেহ) ও জিফয়েড প্রসেস।
৩৮. অ্যানাটমিকাল ও সার্জিকাল গ্রীবা বিদ্যমান – হিউমেরাসে।
৩৯. ইন্টারোসিয়াস মেমব্রেন নামক পর্দা দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে – রেডিয়াস ও আলনা।
৪০. মানবদেহের টার্সাল অস্থি নয় – ট্র্যাপেজিয়াম।
৪১. ইলিয়াম, ইশিয়াম ও পিউবিস এর সংযোগস্থলে বিদ্যমান – অ্যাসিটাবুলাম।
৪২. ফিমারের মস্তক প্রবিষ্ট/আটকানো থাকে – অ্যাসিটাবুলামে।
৪৩. প্যাটেলা অস্থিটি হলো – পশ্চাৎ পদের।
৪৪. ইনোমিনেট অস্থি বলা হয় – শ্রোণিচক্রের অস্থিকে।
৪৫. অবটুরেটর ফোরামেন বিদ্যমান – ইনোমিনেট অস্থি বা হিপ বোনে।
৪৬. মানবদেহের সবচেয়ে বড় অস্থি – ফিমার।
৪৭. দীর্ঘ যষ্টির মতো দেখতে – ফিবুলা।
৪৮. পুরুষের মেরুদণ্ডের দৈর্ঘ্য – ৭০ সেন্টিমিটার।
৪৯. টেনডনের ক্ষেত্রে সঠিক – পেশিকে অস্থির সাথে যুক্ত করে।
৫০. অস্থির আবরণ – পেরিঅস্টিয়াম।
৫১. অস্থির কোষ – অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট ও অস্টিওসাইট।
৫২. নিরেট অস্থির গাঠনিক ও কার্যিক একক – অস্টিওন/হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র।
৫৩. মানব কঙ্কালতন্ত্রে ৩য় শ্রেণির লিভার কার্যকর – হাতের কনুই সঞ্চালনে।
৫৪. তরুণাস্থির আবরণ – পেরিকন্ড্রিয়াম।
৫৫. তরুণাস্থির কোষ – কন্ড্রোব্লাস্ট ও কন্ড্রোসাইট।

Scanned with CamScanner

৫৬. চুনময় বা ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি পাওয়া যায় – হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে।
৫৭. শ্বাসনালি ও নাকে পাওয়া যায় – হায়ালির তরুণাস্থি।
৫৮. কোন অঙ্গে স্থিতিস্থাপক তরুনাস্থি পাওয়া যায় না – অন্তঃকর্ণে।
৫৯. পেশিকলা/পেশিকোষ/ঐচ্ছিক পেশিতন্তুর আবরণ – সারকোলেমা।
৬০. দেহের সবচেয়ে শক্তিশালী পেশি জিহ্বা, পরিশ্রমী পেশি হৃৎপেশি, লম্বা (৩০ সেন্টিমিটার) পেশি উরুর সারটোরিয়াস পেশি।
৬১. ঐচ্ছিক পেশি অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে – টেনডন দ্বারা।
৬২. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক দেখা যায় – হৃৎপেশিতে।
৬৩. হৃৎপেশির বৈশিষ্ট্য নয় – নিউক্লিয়াস একাধিক ও একপাশে।
৬৪. মায়োফাইব্রিল গঠিত – মায়োসিন ও অ্যাকটিন প্রোটিন।
৬৫. পেশির সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সংকোচনশীল একক – মায়োসিন ও অ্যাকটিন।
৬৬. ঐচ্ছিক পেশি পাওয়া যায়– কঙ্কালতন্ত্রের গায়ে, জিহ্বা ইত্যাদি।
৬৭. হৃৎপেশির সংকোচনে কাজ করে – ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক।
৬৮. কোন প্রকারের পেশি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্প্রসারণ করে কিংবা দেহ অক্ষ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় – এক্সটেনসর পেশি।
৬৯. বাইসেপস কোন ধরনের পেশি – ফ্লেক্সর।
৭০. মানুষের চলার সময় মাটি থেকে পায়ের গোড়ালি উত্তোলনে সহায়তা করে – গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস পেশি।
৭১. মানবদেহে প্রায় ৬০০টির মতো পেশি আছে যেগুলো টেনডন দ্বারা অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে এবং দেহভরের ৪০% গঠন করে।
৭২. একটি লিভারে অংশ – ৪টি (লিভার বাহু, পিভট, প্রচেষ্টা ও ভার)।
৭৩. প্রথম শ্রেণির লিভারের মতো কাজ করে – করোটি ও অ্যাটলাস।
৭৪. দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার – পায়ের পাতার গোড়ালি।
৭৫. চলনের সময় হাঁটুকে ভাজ করে কোন মাংসপেশি – বাইসেপস ফিমোরিস।
৭৬. অস্থি ভেঙে একাধিক টুকরায় ভাগ হয় কোন ক্ষেত্রে – কমিনিউটেড অস্থিভঙ্গ।
৭৭. সাধারণ হাড়ভাঙার অপর নাম – বদ্ধ হাড়ভাঙা।
৭৮. মানুষের কব্জিতে (Carpal region) হাড়ের সংখ্যা – ৮টি।
৭৯. মানুষের কপালের অস্থি – ফ্রন্টাল।
৮০. মানবদেহের একমাত্র সন্ধিবিহীন অস্থি হলো হাইওয়েড অস্থি যা জিহ্বার গোড়ায় অবস্থান করে।
৮১. সিসামায়েড অস্থি – প্যাটেলা।
৮২. উন্মুক্ত হাড়ভাঙার অপর নাম – যৌগিক হাড়ভাঙা।
৮৩. মজ্জা গহ্বর নেই – ক্লাভিকলে।
৮৪. শ্রোণিচক্রের যে গহ্বর পশ্চাৎপদের ফিমারকে ধারণ করে তার নাম – অ্যাসিটাবুলাম।
৮৫. হ্যাভারসিয়ান নালি দেখা যায় – নিরেট অস্থিতে।
৮৬. মানব আঙুলের অস্থিগুলোকে বলা হয় – ফ্যালাঞ্জেস।
৮৭. তরুণাস্থির অস্থিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে– অসিফিকেশন।
৮৮. মানবদেহে মুখমণ্ডলীর অস্থি ভোমারের আকৃতি – চারকোণা।
৮৯. মানুষের স্যাক্রাল কশেরুকা – ৫টি।
৯০. মানুষের শ্রোণি-অস্থিচক্রে মোট অস্থির সংখ্যা – ২টি।
৯১. মানুষের দেহে পর্শুকার সংখ্যা – ১২ জোড়া।
৯২. মানুষের বাহুতে মোট অস্থির সংখ্যা - ৬০টি।
৯৩. মানুষের নকল কশেরুকা হলো – ৮-১২ জোড়া।
৯৪. মানবদেহে টেমপোরাল অস্থি – ২টি।
৯৫. তরুণাস্থির গহ্বরকে বলা হয় – ল্যাকুনা।
৯৬. প্যাটেলা নামক অস্থিটি আছে মানুষের – পায়ে।
৯৭. বহিঃকর্ণে কোন ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায় – স্থিতিস্থাপক।
৯৮. মানুষের মেরুদণ্ডের ২য় অস্থিটির নাম – অ্যাক্সিস।
৯৯. সাধারণ হাড়ভাঙার অপর নাম - বদ্ধ হাড়ভাঙা।

অষ্টম অধ্যায় : মানব শারীরতত্ত্ব – সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ

স্নায়ুতন্ত্র (মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড)

১. পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সমন্বয় করতে সাহায্য করে – স্নায়ুতন্ত্র।
২. বৈদ্যুতিক উদ্দীপনায় ভূমিকা রাখে – নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণে।
৩. স্নায়ুকলা উদ্ভূত হয় – এক্টোডার্ম থেকে।
৪. স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যকরী একক – নিউরন।
৫. দুটি স্নায়ুকোষের মিলনস্থল হলো – সাইন্যাপস।
৬. স্মৃতি শক্তির ভৌতকাঠামো গঠন করে – সাইন্যাপস।
৭. মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে গঠিত – কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র।
৮. সুষুম্না স্নায়ু উপস্থিত থাকে না – কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে।
৯. স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ড ১০০ মিটার (৩২৮ ফুট) গতিতে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবাহিত হয়।
১০. সুষুম্নাকাণ্ডকে সুরক্ষিত রাখে – মেরুদণ্ড।
১১. মস্তিষ্কের গহ্বর নিউরাল নালির মধ্যে বিদ্যমান তরলকে বলা হয় – সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (CSF)।
১২. নিউরন নিঃসৃত রাসায়নিক দ্রব্য রক্তে প্রবেশ করলে তাকে বলা হয় – নিউরোহরমোন।
১৩. নিউরোট্রান্সমিটার হলো – সেরোটোনিন, নরইপিনেফ্রাইন, হিস্টামিন, সোমাটোস্টেটিন, গ্লাইসিন, GABA, অ্যাসেটিলকোলিন, ইত্যাদি।
১৪. স্নায়ুতন্ত্রে সিন্যাপসের সংখ্যা – প্রায় 10^{14}।
১৫. সিনাপটিক নবে কোন আয়ন প্রবেশ করলে অ্যাসিটাইল কোলিনমুক্ত হয়ে সিনাপটিক ক্লেফট এ বেরিয়ে আসে – Ca^{2+}।
১৬. পোস্টসিনাপটিক নিউরন থেকে বেরিয়ে আসে – K^{+}।
১৭. মস্তিষ্ক সুরক্ষিত থাকে – করোটিকা দ্বারা।
১৮. প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১৫০০ সিসি ও মহিলাদের প্রায় ১৩০০ সিসি এবং গড় ওজন প্রায় ১.৩৬ কেজি (বা ১.৩-১.৪ কেজি)। এতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১ লক্ষ কোটি) নিউরন এবং ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) নিউরোগ্লিয়া কোষ থাকে।
১৯. মানবদেহের সকল নিউরনকে একত্রে সারিবদ্ধভাবে সংযুক্ত করলে এটি প্রায় ৬০০ মাইল লম্বা হবে।
২০. যে কোনো সময় মানুষ তার মস্তিষ্কের মাত্র ৪% কোষ বা নিউরন ব্যবহার করে।
২১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের পর্দার নাম – মেনিনজেস।
২২. মস্তিষ্কের আবরণীর নাম – মেনিনজেস।
২৩. কোনটি মেনিনজেসের অংশ নয় – হোয়াইট ম্যাটার।
২৪. মানব মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশের নাম – সেরিব্রাম (মস্তিষ্কের ওজনের ৮০%)।
২৫. সেরিব্রাম কতটি খণ্ড নিয়ে গঠিত – ২টি।
২৬. সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার কোনটি দ্বারা যুক্ত থাকে – কর্পাস ক্যালোসাম।
২৭. সেরিব্রামের পৃষ্ঠতলের উঁচু জায়গাগুলোর নাম – জাইরাস।
২৮. সেরিব্রামের পৃষ্ঠতলের নিচু জায়গাগুলোর নাম – ফিসার।
২৯. সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের লোব – ৪টি (ফ্রন্টাল লোব, প্যারাইটাল লোব, টেম্পোরাল লোব ও অক্সিপিটাল লোব)।
৩০. সেরেব্রামের কাজ – চিন্তা, বুদ্ধবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, বাকশক্তি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। এছাড়া এটি সব ঐচ্ছিক পেশির কাজ নিয়ন্ত্রণ ও সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।
৩১. মস্তিষ্কের স্মৃতির নিয়ন্ত্রক – সেরিব্রাম।
৩২. সেরেব্রামের কাজ নয় – শ্বাসপ্রশ্বাসের হার।
৩৩. সেরিব্রামের সিংহদ্বার বলা হয় – থ্যালামাসকে।
৩৪. মানুষের পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ নয় – থ্যালামাস।
৩৫. সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে – থ্যালামাস।

Scanned with CamScanner

৩৬. থ্যালামাসের প্রধান কাজসমূহ – ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা, মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, সামাজিক আচরণের প্রকাশ ইত্যাদি।
৩৭. হাইপোথ্যালামাস যুক্ত থাকে – পিটুইটারি গ্রন্থির সাথে।
৩৮. হাইপোথ্যালামাসের প্রধান কাজসমূহ – স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে, জৈবিক ঘড়ি বা ঘুম-জাগ্রত চক্র নিয়ন্ত্রণ, দেহ-তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ, হোমিওস্ট্যাটিক রক্ষা ইত্যাদি।
৩৯. অগ্র ও পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সাথে যোগসূত্র রচনা করে– মধ্যমস্তিষ্ক।
৪০. পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশ – সেরিবেলাম।
৪১. সেরিবেলামের কাজ – ঐচ্ছিক পেশির পেশিটান নিয়ন্ত্রণ, ভারসাম্য রক্ষা, চলাফেরার দিক নির্ধারণ ইত্যাদি।
৪২. পনসের কাজ – খেয়াল করা, স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ, দুইপাশের পেশির কর্মকাণ্ড সমন্বয় ইত্যাদি।
৪৩. মেডুলা অবলংগাটার কাজ – পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস নিয়ন্ত্রণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, স্পন্দনহার ও লালাক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা।
৪৪. মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে তরল পূর্ণ প্রকোষ্ঠ বা গহ্বরকে বলা হয় – ভেন্ট্রিকল (৪টি)।
৪৫. পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল অবস্থিত – অগ্রমস্তিষ্কে।
৪৬. পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল ৩য় ভেন্ট্রিকলের (ডায়োসিল) সাথে যুক্ত থাকে – ফোরামেন অব মনরো।
৪৭. ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকলকে (মেটাসিল) সংযুক্ত করে – অ্যাকুইডাক্ট অব সিলভিয়াস (আইটার)।
৪৮. মস্তিষ্কের গহ্বরের তরল হলো– সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (CSF)।
৪৯. সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের আয়তন – ১৪০-১৫০ মিলিলিটার।
৫০. সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের প্রধান কাজ – কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পুষ্টি সরবরাহ, গ্যাস বিনিময়, বর্জ্য নিষ্কাশন ও জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা প্রভৃতি।
৫১. মানুষের করোটিক স্নায়ুর সংখ্যা – ১২ জোড়া (নাম, উৎপত্তি ও শাখা, প্রকৃতি, বিস্তার ও কাজ ভালো করে শিখতে হবে)।
৫২. মানুষের সুষুম্না স্নায়ুর সংখ্যা – ৩১ জোড়া।
৫৩. সবচেয়ে দীর্ঘ করোটিক স্নায়ু হলো - ভেগাস স্নায়ু বা নিউমোগ্যাসট্রিক স্নায়ু।
৫৪. ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর সবচেয়ে ছোট শাখা – অপথ্যালমিক।
৫৫. মস্তিষ্কে ঘ্রাণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে – অলফ্যাক্টরি স্নায়ু।
৫৬. চেষ্টায় বা মোটর স্নায়ু– অকুলোমোটর, ট্রকলিয়ার, অ্যাবডুসেন্স, স্পাইনাল অ্যাকসেসরি ও হাইপোগ্লোসাল।
৫৭. অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে – অ্যাবডুসেন্স স্নায়ু।
৫৮. স্বাদগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত স্নায়ু – ফেসিয়াল।
৫৯. কত নম্বর করোটিক স্নায়র কার্যকারিতায় মুখের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয় – VII।
৬০. অষ্টম করোটিক স্নায়ুর নাম – অডিটরি।
৬১. শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে– অডিটরি স্নায়ু (VIII)।
৬২. মিশ্র প্রকৃতির করোটিক স্নায়ু – ভেগাস।
৬৩. দশম করোটিক স্নায়ুর শাখা – পালমোনারি।
৬৪. মাথা ও কাঁধের সঞ্চালনে ভূমিকা রাখে – স্পাইনাল অ্যাকসেসরি স্নায়ু।
৬৫. করোটিক স্নায়ুর কাজ সম্পর্কিত কোন তথ্যটি সঠিক নয় – হাইপোগ্লোসাল-স্বাদ গ্রহণ।
৬৬. জিহ্বার আকৃতি ঠিক রাখে ও জিহ্বার সঞ্চালন ঘটায় – হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু।
৬৭. জিহ্বা থেকে স্বাদের অনুভূতি গ্রহণ করে – গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল স্নায়ু।
৬৮. পূর্ণ সংবেদী স্নায়ু নয় – ফেসিয়াল স্নায়ু।

চোখ

৬৯. অক্ষিগোলকের স্তর – ৩টি (স্ক্লেরা, কোরয়েড ও রেটিনা)।
৭০. চোখের একমাত্র আলোকসংবেদী অংশ – রেটিনা।
৭১. চোখের বাইরের সাদা, অস্বচ্ছ ও তন্তুময় স্তরটির নাম – স্ক্লেরা।
৭২. স্ক্লেরার স্বচ্ছ অংশের নাম – কর্নিয়া।
৭৩. চক্ষুপেশিকে অক্ষিগোলকের সাথে সংযুক্ত রাখে – স্ক্লেরা।
৭৪. চোখের স্ক্লেরার রঙ – সাদা।
৭৫. চোখকে ধুলাবালি ও জীবাণু থেকে রক্ষা করে – কনজাংটিভা।
৭৬. চোখের বিভিন্ন অংশে পুষ্টি যোগায় ও O_2 সরবরাহ করে– কোরয়েড।
৭৭. আইরিশ ও কোরয়েডের সংযোগস্থলে থাকে – সিলিয়ারি বডি।
৭৮. অ্যাকুয়াস হিউমার উৎপন্ন করে – সিলিয়ারি বডি।
৭৯. পিউপিলের কাজ– চক্ষুগোলকের ভিতর আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
৮০. পিউপিল কোন ধরনের আলোতে বড় হয় – মৃদু আলোতে।
৮১. রেটিনাতে কয় ধরনের কোষ দেখা যায় – ২ ধরনের (রড ও কোন কোষ)।
৮২. রডকোষে কোন ভিটামিন থাকে – ভিটামিন ই।
৮৩. রডকোষে (দণ্ডাকৃতি) কোন রঞ্জক পদার্থ থাকে – রডোপসিন।
৮৪. রডকোষ কোন আলোতে দর্শন উপযোগী – অনুজ্জ্বল আলোতে।
৮৫. রডকোষের অনুপস্থিতিতে চোখে কী ধরনের ত্রুটি দেখা যায় – রাতকানা।
৮৬. চোখে রডকোষের সংখ্যা – ১২ কোটি ৫০ লক্ষ।
৮৭. কোন কোষে (কোনাকৃতি বা মোচাকৃতি) কোন রঞ্জক পদার্থ থাকে – আয়োডোপসিন।
৮৮. চোখে কোন কোষের সংখ্যা – ৬০-৭০ লক্ষ।
৮৯. রেটিনার কোন অংশে সবচেয়ে বেশি কোন কোষ থাকে – পীতবিন্দুতে।
৯০. রেটিনার কোথায় সবচেয়ে ভালো প্রতিবিম্ব তৈরি হয় – ফোবিয়া সেন্ট্রালিস বা পীতবিন্দু।
৯১. চোখের রেটিনার ভিতর সবচেয়ে আলোক সংবেদী অংশের নাম – পীতবিন্দু।
৯২. রেটিনার কোন বিন্দুতে কোনো প্রতিবিম্ব গঠিত হয় না – অন্ধবিন্দুতে।
৯৩. চোখের রেটিনার যে অংশ আলোকসংবেদী নয় – অন্ধবিন্দু।
৯৪. অক্ষিগোলকের স্ক্লেরা ও কর্নিয়া নিয়ে গঠিত স্তরকে বলা হয় – টিউনিকা ফাইব্রোসা।
৯৫. অক্ষিগোলকের কোথায় রক্ত সরবরাহ নেই – লেন্সে।
৯৬. অক্ষিগোলক অ্যাকুয়াস প্রকোষ্ঠ (অ্যাকুয়াস হিউমারে পূর্ণ) ও ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠে (ভিট্রিয়াস হিউমারে পূর্ণ) বিভক্ত হয় – লেন্স দ্বারা।
৯৭. চোখের লেন্স ও রেটিনার মধ্যে অবস্থান করে – ভিট্রিয়াস হিউমার।
৯৮. ভিট্রিয়াস হিউমারে পানির পরিমাণ – ৯৯%।
৯৯. ভিট্রিয়াস হিউমার – অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে।
১০০. চক্ষুপেশির সংখ্যা - ৩ জোড়া (৪টি রেক্টাস ও ২টি অবলিক)
১০১. কোন রেক্টাস পেশি অক্ষিগোলককে উপরের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে – সুপিরিয়র রেক্টাস পেশি।
১০২. মানুষের চোখে কয় ধরনের গ্রন্থি থাকে – ৩ ধরনের (অশ্রুগ্রন্থি, হার্ডেরিয়ান এবং মেবোমিয়ান গ্রন্থি)।
১০৩. অশ্রুতে জীবাণুরোধক উপাদানটি হলো – লাইসোজাইম।
১০৪. দর্শন প্রক্রিয়ার সময় রেটিনার কোথায় উল্টা প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় – পীতবিন্দুতে।
১০৫. মানুষের চোখ দুটির মধ্যকার দূরত্ব – ৬.৩ সেন্টিমিটার।
১০৬. মানুষের চোখের দৃষ্টি কোন ধরনের – স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি।
১০৭. কত বছর বয়সের পর থেকে উপযোজন ক্ষমতা কমতে থাকে – ৪০ বছর।

Scanned with CamScanner

কান

১০৮. গাঠনিকভাবে প্রতিটি কান বা কর্ণের অংশ – ৩টি (বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ)।
১০৯. বহিঃঅডিটরি মিটাসের ভেতরের অংশ আবদ্ধ থাকে – টেমপোরাল অস্থিতে।
১১০. মধ্যকর্ণের অস্থি – ৩টি (ম্যালিয়াস– হাতুড়ির মতো, ইনকাস– নেহাইয়ের মতো এবং স্টেপিস– ত্রিকোণাকার)।
১১১. ফেনেস্ট্রা ওভালিসের সাথে যুক্ত থাকে – স্টেপিস (মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অস্থি)।
১১২. টিম্পানিক পর্দার উভয় পাশে বায়ুর চাপ সমান রাখে – ইউস্টেশিয়ান নালি।
১১৩. অতিরিক্ত শব্দ অন্তঃকর্ণ থেকে মধ্যকর্ণে ফেরত আসে – ফেনেস্ট্রা রোটান্ডার মাধ্যমে।
১১৪. অন্তঃকর্ণের গঠনকে বলা হয় – মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ (এন্ডোলিম্ফ তরলে পূর্ণ থাকে)।
১১৫. শ্রবণ অঙ্গ ও ভারসাম্য অঙ্গ নিয়ে গঠিত – মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ।
১১৬. অন্তঃকর্ণের সংবেদী রোম আবৃত থাকে – ক্যুপুলা দ্বারা।
১১৭. অটোলিথ থাকে – অ্যাম্পুলায়।
১১৮. ইউট্রিকুলাসের কাজ – ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ।
১১৯. শ্রবণের সাথে সংশ্লিষ্ট শামুকের মতো পেঁচানো অঙ্গ – ককলিয়া।
১২০. ককলিয়ায় কয়টি পর্দা থাকে – ২টি (উপরের দিকে – রেসনার্স পর্দা এবং নিচের দিকে – বেসিলার পর্দা)।
১২১. ককলিয়ায় কয়টি প্রকোষ্ঠ থাকে – ৩টি (স্ক্যালা ভেস্টিবুলি, স্ক্যালা মিডিয়া এবং স্ক্যালা টিম্পানি)।
১২২. স্ক্যালা ভেস্টিবুলি ও স্ক্যালা মিডিয়াকে পৃথক করে – রেসনার্স পর্দা)।
১২৩. এন্ডোলিম্ফ থাকে – স্ক্যালা মিডিয়ায়।
১২৪. স্ক্যালা ভেস্টিবুলি ও স্ক্যালা টিম্পানি পরিপূর্ণ থাকে – পেরিলিম্ফে।
১২৫. ভারসাম্য সংবেদনের উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছায় – ভেস্টিবুলার স্নায়ু দ্বারা।

গ্রন্থি

১২৬. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত রসকে বলা হয় – জ্যুস বা রস।
১২৭. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণকে বলা হয় – হরমোন।
১২৮. নালিবিহীন গ্রন্থি – পিটুইটারি গ্রন্থি (সবচেয়ে ছোট), থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ইত্যাদি।
১২৯. মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অনাল গ্রন্থি – পিটুইটারি গ্রন্থি।
১৩০. কোনটি মিশ্র গ্রন্থি নয় – এড্রেনাল গ্রন্থি।
১৩১. মস্তিষ্কের কোন অংশ পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে – হাইপোথ্যালামাস।
১৩২. সম্মুখ পিটুইটারি থেকে কয়টি ট্রপিক হরমোন ক্ষরিত হয় – ৬টি।
১৩৩. ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন সংশ্লেষকে উদ্দীপ্ত করে – ল্যুটিনাইজিং হরমোন।
১৩৪. পুরুষের টেস্টোস্টেরন ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে – ল্যুটিনাইজিং হরমোন।
১৩৫. স্তনগ্রন্থি হতে দুগ্ধ নির্গমনে সাহায্য করে – অক্সিটোসিন।
১৩৬. পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন – ADH।
১৩৭. মূত্রের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে – ভেসোপ্রেসিন বা ADH।
১৩৮. থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন – ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (T_3), থাইরক্সিন (T_4) ও থাইরোক্যালসিটোনিন (TCT)।
১৩৯. থাইরক্সিনে বিদ্যমান – আয়োডিন।
১৪০. অন্ত্র থেকে চিনি ও লিপিড শোষণে সহায়তা করে– গ্লুকোকর্টিকয়েড।
১৪১. মানবদেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে – প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি।
১৪২. পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে – গ্যাস্ট্রিন হরমোন।
১৪৩. ভয়, আনন্দ, উত্তেজনা, শোক প্রকাশে ভূমিকা রাখে – এড্রেনালিন।
১৪৪. চিড়িয়াখানায় বাঘের খাঁচার সামনে গিয়ে মিতু ভয় পেল। মিতুর রক্তে কোন হরমোন নিঃসৃত হবে – এড্রেনালিন।
১৪৫. পরিস্ফুটনের সময় কোন হরমোন ফিটাসের ফুসফুস গঠনে সাহায্য করে – গ্লুকোকর্টিকয়েড।
১৪৬. রজঃচক্র ও স্তনের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে – ইস্ট্রোজেন।
১৪৭. গ্লুকাগন ও ইনসুলিন নিঃসৃত হয় – অগ্ন্যাশয় থেকে।
১৪৮. দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন – থাইরক্সিন
১৪৯. কোন হরমোন কম-বেশি ক্ষরণ করলে গলগণ্ড রোগ হয় – থাইরক্সিন।
১৫০. পাকস্থলীতে কোন করোটিক স্নায়ুর কার্যক্রম বিদ্যমান – ভেগাস।
১৫১. মানুষের নবম জোড়া করোটিক স্নায়ুর নাম – গ্লসোফ্যারিনজিয়াল।
১৫২. ডায়েনসেফালনের মধ্যস্থ গহ্বরটি হলো – তৃতীয় ভেন্ট্রিকল।
১৫৩. পিউপিলের অবস্থান – আইরিশের মধ্যবর্তী স্থানে।
১৫৪. মেলানিন রঞ্জকে রঞ্জিত স্তর – কোরয়েড।
১৫৫. রক্তে Na^+ ও K^+ এর সমতা রক্ষা করে – অ্যালডোস্টেরন।
১৫৬. মানবদেহের দীর্ঘতম কোষ – স্নায়ুকোষ।
১৫৭. মানুষের অ্যাবডুসেন্স স্নায়ুর উৎস – মেডুলার অঙ্কীয়দেশ।
১৫৮. যেসব স্নায়ু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে নির্দেশ বহন করে বিভিন্ন অঙ্গে নিয়ে যায় তাদের বলা হয় – মোটর স্নায়ু।
১৫৯. চোখে নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কার্যকরী রাসায়নিকের নাম – Acetylocholine।
১৬০. মানবদেহের ভারসাম্য রক্ষায় কর্ণের সম্পৃক্ত অংশটি – মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ।
১৬১. কর্ণের কোন অংশে 'অর্গান অব কর্টি' দেখা যায় – Sacculus।
১৬২. মানুষের অস্থির সাথে জড়িত হরমোন – সোমাটোট্রপিন।
১৬৩. মানুষের প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি – ৪টি।
১৬৪. মাস্টার গ্ল্যান্ড বলা হয় – পিটুইটারিকে।
১৬৫. অগ্রমস্তিষ্কের অংশ – সেরিব্রাম, থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস।
১৬৬. মানুষের মস্তিষ্কের কোন করোটিক স্নায়ু ফুসফুসের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে – ভেগাস স্নায়ু।
১৬৭. রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন – প্যারাথরমোন।
১৬৮. শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় উৎপন্ন করে – হরমোন।
১৬৯. কোন জোড়াটি লোকাল হরমোন – সিক্রিটিন ও এন্টারোগ্যাস্ট্রিন।
১৭০. প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে – থাইরক্সিন।
১৭১. কোন গ্রন্থির ক্ষরণকাল সাময়িক – থাইমাস।
১৭২. কোন করোটিক স্নায়ু হৃৎপিণ্ডে শাখা বিস্তার করে – Vagus।
১৭৩. স্নায়ুকলা গঠিত – স্নায়ুকোষ ও নিউরোগ্লিয়া।
১৭৪. অক্ষিগোলককে অপটিক স্নায়ু ও কর্নিয়ার মধ্যবর্তী অক্ষ বরাবর ঘুরাতে সাহায্য করে – সুপিরিয়র অবলিক।
১৭৫. অক্ষিগোলককে নিচের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে – ইনফিরিয়র রেক্টাস।
১৭৬. অক্ষিগোলককে ভেতরের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে – মিডিয়াল রেক্টাস।
১৭৭. মানব চক্ষুর সিলিয়ারি বডির কাজ – লেন্সের উপযোজনে সহায়তা করা।
১৭৮. মানুষের অন্তঃকর্ণে অবস্থিত এক ধরনের চুন নির্মিত কণিকাকে বলা হয় – ক্যুপুলা।
১৭৯. সেবুমেন নামক মোম জাতীয় পদার্থ ক্ষরণ করে – স্বেদ গ্রন্থি।
১৮০. ক্যালসিটোনিন নিঃসরণ হয় কোন গ্রন্থি থেকে – থাইরয়েড।
১৮১. এড্রেনাল মেডুলা থেকে নিঃসৃত হয় – এপিনেফ্রিন হরমোন।

Scanned with CamScanner

১৮২. স্নায়ুর প্রেরক (Neurotransmitter) – অ্যাসিটাইল কোলিন (Acetyl choline)।
১৮৩. প্রাণিদেহের কোন কলায় ডেনড্রাইট বিদ্যমান – স্নায়ু কলায়।
১৮৪. জিহ্বার সাহায্যে খাদ্যের স্বাদ বোঝা যায় কোন স্নায়ুর সাহায্যে – গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল।
১৮৫. মানুষের চোখের 'ফোবিয়া সেন্ট্রালিস'-এর অবস্থান – অন্ধ বিন্দুর উপরে।

নবম অধ্যায় : মানব জীবনের ধারাবাহিকতা

১. পুরুষ প্রজননতন্ত্রের মুখ্য জননাঙ্গ – শুক্রাশয়।
২. শুক্রাণুর পুষ্টি জোগায় – সার্টলি কোষ।
৩. শুক্রাণু নির্গমনের সঠিক পথ : সেমিনিফেরাস নালিকা → রেটিটেসটিস → ভাসা ইফারেন্সিয়া → ইপিডিডাইমিস
৪. পুংজননতন্ত্রের অংশ – স্ক্রোটাম ও এপিডিডাইমিস।
৫. সিমেন তৈরির জন্য পিচ্ছিল পদার্থ ক্ষরণ করে – সেমিনাল ভেসিকল।
৬. পুংজননতন্ত্রের প্রধান হরমোন – টেস্টোস্টেরন।
৭. টেস্টোস্টেরন হরমোনের কাজ – শুক্রাণু সৃষ্টি।
৮. শুক্রাণু উৎপাদন ও টেস্টোস্টেরন মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে – GnRH।
৯. ডিম্বাশয়ের প্রধান কাজ – ডিম্বাণু উৎপাদন।
১০. ডিম্বাশয় ক্ষরিত হরমোন – প্রোজেস্টেরন।
১১. ইমপ্ল্যান্টেশন হয় – ডিম্বনালিতে।
১২. মানব দেহে নিষেক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় – ডিম্বনালি।
১৩. ভ্রূণ বিকাশের সঠিক স্থান – জরায়ু।
১৪. জরায়ু প্রাচীরের স্তর – ৩টি (পেরিটোনিয়াম, মায়োমেট্রিয়াম ও এন্ডোমেট্রিয়াম)।
১৫. কোন অঙ্গের প্রাচীর থেকে অমরা গঠিত হয় – জরায়ু।
১৬. ওভারিয়ান ফলিকলের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে – FSH।
১৭. ডিম্বাশয়ে কর্পাস লুটিয়াম সৃষ্টি করে – LH।
১৮. ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুর গাত্রে স্থাপিত হওয়ার প্রক্রিয়া – ইমপ্ল্যান্টেশন।
১৯. মেয়েদের জীবনে প্রথম রজঃচক্রকে বলা হয় – মেনার্কি/মেনারচি।
২০. স্ত্রীলোকের শেষ রজঃস্রাবকে বলা হয় – মেনোপজ।
২১. বগলের লোম গজাতে শুরু করাকে বলে – থেলারচি।
২২. রজঃচক্রের কততম দিনে ওভ্যুলেশন বা ডিম্বপাত ঘটে – ১৪ তম।
২৩. ডিম্বাশয়ের কর্পাস ল্যুটিয়াম থেকে উৎপন্ন হরমোন – প্রোজেস্টেরন।
২৪. রজঃচক্রের ৭-১৪তম দিনে কোন হরমোন ক্ষরিত হয় – ইস্ট্রোজেন।
২৫. ডিম্বপাতের পর ফলিকলের পরিণতি – কর্পাস ল্যুটিয়াম।
২৬. সাময়িকভাবে এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে – কর্পাস ল্যুটিয়াম।
২৭. প্রাণিদেহে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় – গ্যামিটোজেনেসিস।
২৮. ১০টি প্রাইমারি উওসাইট ও ১০টি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে কতটি ডিম্বাণু ও শুক্রাণু তৈরি হবে – ১০ ও ৪০।
২৯. একটি প্রাইমারি উওসাইট থেকে কয়টি পোলার বডি সৃষ্টি হয় – ৩টি।
৩০. মানবদেহের সবচেয়ে বড় কোষ ডিম্বাণু আর সবচেয়ে ছোট কোষ শুক্রাণু।
৩১. শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসে কয়টি ক্রোমোজোম থাকে – ২৩টি।
৩২. শুক্রাণুর মাথার অগ্রভাগে টুপির মতো গঠনকে বলা হয় – অ্যাক্রোজোম।
৩৩. ডিম্বাণুর গায়ে ফলিকল কোষ স্তরকে বলা হয় – করোনা রেডিয়েটা।
৩৪. ডিম্বাণুর আবরণকে বলা হয় – জোনা পেলুসিডা।
৩৫. শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের একীভবন প্রক্রিয়াকে বলা হয় – নিষেক।
৩৬. নিষেকের পর কয়দিনের মধ্যে ইমপ্ল্যান্টেশন সংঘটিত হয়– ৬-৯ দিন।
৩৭. ইমপ্ল্যান্টেশন প্রক্রিয়ায় জাইগোটের কোন অবস্থা অংশগ্রহণ করে – ব্লাস্টোসিস্ট।
৩৮. ভ্রূণের পরিস্ফুটনের জন্য সঠিক পর্যায়ক্রম: ক্লিভেজ → ব্লাস্টুলেশন → গ্যাস্ট্রুলেশন।
৩৯. জাইগোটের বিভাজনকে বলা হয় – ক্লিভেজ।
৪০. ব্লাস্টুলার তরল পূর্ণ গহ্বরকে বলা হয় – ব্লাস্টোসিল।
৪১. ভ্রূণে আর্কেন্টেরন সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় – গ্যাস্ট্রুলেশন।
৪২. আর্কেন্টরন দেখা যায় – গ্যাস্ট্রুলায়।
৪৩. 'তিনটি ভ্রূণীয় স্তর' গঠিত হয় কোন ধাপে – গ্যাস্ট্রুলেশন ধাপে।
৪৪. ভ্রূণে পুষ্টি সরবরাহের অঙ্গকে বলা হয় – অমরা বা প্লাসেন্টা।
৪৫. ভ্রূণীয় স্তর এক্টোডার্ম হতে তৈরি হয় – চোখের লেন্স, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি।
৪৬. মেসোডার্ম স্তর হতে উৎপন্ন হয় – চুল ও ফুসফুস।
৪৭. ত্বকের ডার্মিস, দাঁতের ডেন্টিন, বৃক্কের কর্টেক্স উৎপত্তি হয় – মেসোডার্ম হতে।
৪৮. রক্ত ও রক্তনালি, শ্বসনতন্ত্র উৎপত্তি হয় – এন্ডোডার্ম হতে।
৪৯. মেসোডার্মের অংশ – এপিমিয়ার, মেসোমিয়ার ও হাইপোমিয়ার।
৫০. কোন ভ্রূণীয় স্তর হতে Spleen সৃষ্টি হয় – এপিমিয়ার।
৫১. সাধারণত একটি সন্তান মায়ের গর্ভে অবস্থান করে – ৩৪–৩৮ সপ্তাহ।
৫২. প্রত্যেক মাকে গর্ভাবস্থায় নিতে হয় – টিটেনাস টিকা।
৫৩. পুরুষের জন্ম নিরোধকের স্থায়ী পদ্ধতি – ভ্যাসেকটমি।
৫৪. বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় একটি সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি – আইভিএফ।
৫৫. Test tube baby করা হয় কেন – ডিম্বনালি পর্যন্ত শুক্রাণু যেতে অসমর্থ হলে।
৫৬. প্রথম টেস্টটিউব বেবীর নাম – লুইস ব্রাউন।
৫৭. Azoospermia – সিমেনে শুক্রাণুর অনুপস্থিতি।
৫৮. অনিয়মিত মাসিক ও মুখে চুল গজানোর সমস্যাকে বলা হয় – PCOS (Polycystic ovarian syndrome)।
৫৯. পুরুষের প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হয়ে যাওয়াকে বলা হয় – BPH (Benign prostatic hyperplasia)।
৬০. পুরুষের মাথায় টাক পড়ার উপসর্গ সৃষ্টি করে – টেস্টোস্টেরন।
৬১. অ্যান্ড্রোপজ নারীর জীবনের কোন অধ্যায়ের সাথে তুলনীয় – মেনোপজ।
৬২. মহিলাদের অতিরিক্ত লোমের বৃদ্ধি দেখা যায় – হারসুইটিজম জটিলতায়।
৬৩. পুরুষের স্তন গ্রন্থি বৃদ্ধি পেয়ে মেয়েদের মতো স্তন গ্রন্থি তৈরি হওয়াকে বলা হয় – গাইনিকোম্যাসটিয়া।
৬৪. কোন এক লিঙ্গে পুরুষ ও নারীর বহিঃ এবং অন্তঃজননাঙ্গ দুটোই থাকলে তাকে বলা হয় – ইন্টারসেক্স।

Scanned with CamScanner

৬৫. বিগ বেবি সিনড্রোম দেখা যায় – ম্যাক্রোসোমিয়ায়।
৬৬. অটোসোমাল ব্যাধি – ফিনাইল কিটোনিউরিয়া।
৬৭. প্রকট জিনের ব্যাধি– হান্টিংটন-স ব্যাধি (মস্তিষ্কের অবনতি ঘটায়)।
৬৮. মানুষের লাল সবুজ বর্ণান্ধতা কোন প্রকারের ব্যাধি – সেক্স লিংকড।
৬৯. ভুক্তভোগী শিশু নির্দিষ্ট অটোজোমের ৩ কপি বহন করে – ট্রাইসোমি রোগে।
৭০. ডাউন সিন্ড্রোমকে বলা হয় – ট্রাইসোমি -২১।
৭১. যে সকল কারণে ফিটাসে বিকৃতি বা অঙ্গহানি হয় সেগুলোকে বলা হয় – টেরাটোজেন।
৭২. ফিটাল অ্যালকোহল সিন্ড্রোম কেন হয় – মদ্যপানে।
৭৩. সিফিলিস পরবর্তী লক্ষণ – লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া।
৭৪. চুলকানিবিহীন ক্ষত হয় – সিফিলিসে।
৭৫. সিফিলিস রোগ শনাক্তকরণের পরীক্ষা – TPHA-test।
৭৬. কোন রোগে রোগীর শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ কমে যায় – এইডস।
৭৭. সিফিলিস রোগের জন্য দায়ী – *Treponema pallidum*।
৭৮. এইডস রোগ শনাক্তকরণের পরীক্ষা – Western-blot test।
৭৯. HAART থেরাপি কোন রোগের চিকিৎসা – এইডস।
৮০. জাইগোটের ইমপ্ল্যান্টেশন জরায়ুর ভেতরে না ঘটে সারাভিক্স, ডিম্বাশয় কিংবা ফেলোপিয়ান টিউবে সংঘটিত হলে তাকে বলা হয় – Ectopic pregnancy।
৮১. ডিম্বাণুতে সবচেয়ে বাইরের স্তর – করোনা রেডিয়েটা।
৮২. ভ্রূণের পুষ্টি ও বর্জ্য নিষ্কাশনে সাহায্য করে – অমরা।
৮৩. ফিটাস থেকে মায়ের রক্তে পরিবাহিত হয় – ইউরিয়া।
৮৪. গনোরিয়ার জন্য দায়ী – ব্যাকটেরিয়া।
৮৫. মানুষের জরায়ু গর্ভাবস্থায় বৃদ্ধি পায় – ২০ গুণ।
৮৬. মানুষের প্রতি সেকেন্ডে শুক্রাণু সৃষ্টি হয় – ১০০০টি।
৮৭. মানুষের শুক্রাশয় প্রতিদিন ১০ মিলিয়ন শুক্রাণু উৎপাদন করে। একজন পুরুষ ৬ মাসে যে পরিমাণ শুক্রাণু উৎপাদন করে তা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার সমান।
৮৮. যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় সৃষ্টি হয় – এন্ডোডার্ম থেকে।
৮৯. শুক্রাণু তৈরি করে – স্পার্মাটোগোনিয়া।
৯০. শুক্রাণু তৈরি হয় – সেমিনিফেরাস নালিকায়।
৯১. Spermatid পাওয়া যায় – জননকোষে।
৯২. একটি প্রাথমিক Spermatocyte কয়টি Spermatid তৈরি করে – ৪টি।
৯৩. একটি প্রাথমিক উওসাইট থেকে শেষ পর্যন্ত তৈরি হয় – একটি ডিম্বাণু ও তিনটি পোলার বডি।
৯৪. মানুষের পুরুষ প্রজননতন্ত্রে শুক্রাণু বহনকারী ভাস ডিফারেন্স নালির সাথে যুক্ত থাকে – সেমিনাল ভেসিকল।
৯৫. মিয়োসিস বিভাজনের পর প্রতিটি স্পার্মাটোগোনিয়াম থেকে অবশেষে কয়টি স্পার্মাটিড সৃষ্টি হয় – ৪টি।
৯৬. প্রতিবার সঙ্গমে ১.৫-৪ মিলিলিটার বীর্য ক্ষরিত হয় এবং এতে প্রায় ৪-১০ কোটি শুক্রাণু থাকে। কিন্তু মাত্র ১টি শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারে।
৯৭. শুক্রাণুর গ্যামোনকে বলা হয় – অ্যান্ড্রোগ্যামোন।
৯৮. স্টেম সেল থাকে – কুসুম থলিতে।
৯৯. মানুষের শুক্রাণুর মাথার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে থাকে – নিউক্লিয়াস।
১০০. প্রোজেস্টেরন হরমোন উৎপন্ন হয় – কর্পাস ল্যুটিয়ামে।
১০১. শুক্রাণুর অ্যাক্রোসোম থেকে নিঃসৃত হয় – হায়ালুরোনিডেজ।
১০২. স্পার্মাটিড প্রক্রিয়া শেষে শুক্রাণুতে রূপান্তরকে বলা হয় – স্পার্মিওজেনেসিস।
১০৩. রজঃচক্রে খসে পড়ে – এন্ড্রোমেট্রিয়াম।
১০৪. জরায়ুর সারভিক্স নিঃসৃত রস – ক্ষারীয়।
১০৫. কোনো একজন মহিলা সারাজীবনে ৩৫টি সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম।
১০৬. মাতৃদুগ্ধে পানির পরিমাণ – ৯৫.৫%।
১০৭. যে সকল জার্মিনাল কোষ থেকে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় তাদের বলা হয় – প্রিমোর্ডিয়াল কোষ।
১০৮. পতঙ্গ, মলাস্কা, উভচর ও পাখির ডিমের প্রাইমারি ডিম্বঝিল্লিকে বলা হয় – ভিটেলাইন মেমব্রেন।
১০৯. ডিপ্লয়েড জাইগোট সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় – নিষেক।
১১০. জরায়ুর সংকোচন ঘটায় – ইস্ট্রোজেন হরমোন।
১১১. সন্তান প্রসবের সাথে সংশ্লিষ্ট – অক্সিটোসিন।
১১২. একজন মহিলা তিনবার গর্ভবতী হলেন এবং তিনবারই তার ভ্রূণ গর্ভপাত হলো। পরবর্তী সময়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে জানালেন যে তিনি একটি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। এটি কি ভাইরাস বলে তুমি মনে কর? – রুবেলা।
১১৩. গবেষণায় দেখা গেছে মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুদের IQ অন্য শিশুদের অপেক্ষা বেশি হয়।

দশম অধ্যায় : মানবদেহের প্রতিরক্ষা

১. মানবদেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্তর – ৩টি।
২. মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের সাথে সম্পর্কিত – রক্ততঞ্চন ও সিরুমিন।
৩. কোন অঙ্গটি মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের অন্তর্ভুক্ত – ত্বক।
৪. মানুষের প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নয় – ইন্টারফেরন।
৫. অশ্রু ও লালায় পাওয়া যায় – লাইসোজাইম।
৬. টিউমার কোষ ও ভাইরাস আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করে – সহজাত মারণকোষ।
৭. সহজাত প্রতিরক্ষার উদাহরণ নয় – সক্রিয় প্রতিরক্ষা।
৮. কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম গঠিত – প্লাজমা প্রোটিন দ্বারা।
৯. ভাইরাস আক্রান্ত কোষ থেকে উৎপন্ন ও ক্ষরিত হয় – ইন্টারফেরন।
১০. পাইরোজেন এক ধরনের – প্রোটিন।
১১. দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ – ত্বক।
১২. ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোষ থাকে – ত্বকে।
১৩. জ্বর আসা কিংবা প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া মানে হলো– দেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্র ভালোভাবে কাজ করছে এর লক্ষণ।
১৪. মানবদেহের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর নিয়ন্ত্রিত হয় – রক্ত দ্বারা।
১৫. দেহের মোট শ্বেত রক্তকণিকার কত শতাংশ মনোসাইট– ৫%।
১৬. উৎপন্ন হবার পর ম্যাক্রোফেজ কতক্ষণ রক্তে সংবহিত হয় – ১০-১২ ঘণ্টা।
১৭. পরিণত মনোসাইটকে বলা হয় – ম্যাক্রোফেজ।
১৮. ম্যাক্রোফেজ থেকে ক্ষরিত কোন পদার্থ ক্ষত নিরাময়ে ভূমিকা রাখে – সাইটোকাইন।
১৯. ক্ষতস্থানে পুঁজ সৃষ্টি করে – শ্বেত রক্তকণিকা।

Scanned with CamScanner

২০. রক্তের মনোসাইট যখন রক্তস্রোত ত্যাগ করে কলায় চলে আসে তখন তাকে বলা হয় – ম্যাক্রোফেজ।
২১. ম্যাক্রোফেজ হলো – রূপান্তরিত মনোসাইট।
২২. একজন স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক মানুষে দৈনিক উৎপন্ন নিউট্রোফিলের সংখ্যা – প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি)।
২৩. একটি নিউট্রোফিল গ্রাস করে – ৩-২০টি ব্যাকটেরিয়া।
২৪. জীবাণু ভক্ষণ করে দেহের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে– নিউট্রোফিল।
২৫. অনিদ্রা বা রাতে কমপক্ষে ৫ ঘণ্টার কম ঘুমে দেহের অনাক্রম্যতন্ত্র বিঘ্নিত হয়। ঘুম দেহে কিছু ভালো প্রোটিন সৃষ্টি করে যেগুলো বিভিন্ন সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
২৬. কোন দুটি কোষের গঠন ও কাজ একই রকম – বেসোফিল ও মাস্টকোষ।
২৭. বৃহৎ খাদক বা big eater হলো – ম্যাক্রোফেজ।
২৮. দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে ম্যাক্রোফেজের কাজ নয় – অ্যান্টিজেন তৈরি।
২৯. মানবদেহে শ্বেত রক্তকণিকার কত অংশ নিউট্রোফিল – ৫০-৬০%।
৩০. শ্বেত রক্তকণিকাসমূহের অণুজীব ভক্ষণ করার পদ্ধতিকে বলা হয় – ফ্যাগোসাইটোসিস।
৩১. দেহে প্রদাহ ও অ্যালার্জি সৃষ্টির জন্য দায়ী – হিস্টামিন।
৩২. প্রাথমিক লিম্ফয়েড অঙ্গ হলো – অস্থিমজ্জা, থাইমাস গ্রন্থি ইত্যাদি।
৩৩. কমপ্লিমেন্ট তন্ত্রে প্রোটিনের সংখ্যা – ২০টি।
৩৪. কমপ্লিমেন্ট প্রোটিনের কাজ – অপসোনাইজেশন, বিশ্লিষ্টকরণ, স্তূপীকরণ, ভাইরাসের প্রশমন, কেমোট্যাক্সিস এবং মাস্টকোষ ও বেসোফিলের সক্রিয়করণ।
৩৫. দেহে অনুপ্রবেশিত ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করে – অপসোনিন।
৩৬. কোন প্রতিরক্ষা স্তরের মাধ্যমে কলোস্টাম (শালদুধ) মায়ের দেহ হতে শিশুর দেহে প্রবেশ করে– প্রাকৃতিক অক্রিয় প্রতিরক্ষা।
৩৭. বমি কোন ধরনের অনাক্রম্যতা – যান্ত্রিক।
৩৮. মানবদেহের প্রায় ৫০ বিলিয়ন শ্বেতকণিকা প্রতিনিয়ত জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়ছে।
৩৯. কোষ নিয়ন্ত্রিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখে – T-লিম্ফোসাইট।
৪০. রসভিত্তিক অনাক্রম্যতায় ভূমিকা রাখে – B-লিম্ফোসাইট।
৪১. দেহের প্রধান সৈনিক হিসেবে কাজ করে – অ্যান্টিবডি।
৪২. কোষের কোথায় MHC মার্কার পাওয়া যায় – প্লাজমাঝিল্লিতে।
৪৩. স্মৃতিকোষ কোন কোষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে – লিম্ফোসাইট।
৪৪. অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয় – প্লাজমা কোষ থেকে।
৪৫. মানুষের শরীরে কত ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে – প্রায় ১০ কোটি।
৪৬. প্রতিটি অ্যান্টিবডিতে পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের সংখ্যা -৪টি।
৪৭. ভারী চেইনের পার্থক্যের ভিত্তিতে অ্যান্টিবডি কত প্রকার – ৫ প্রকার।
৪৮. অ্যান্টিবডি এক ধরনের – প্রোটিন।
৪৯. অ্যান্টিবডির যে অংশে অ্যান্টিজেন যুক্ত হয় তাকে বলা হয় – প্যারাটোপ।
৫০. এপিটোপ কার অংশ – অ্যান্টিজেনের।
৫১. ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে অ্যান্টিবডিকে সহায়তা করে – কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম।
৫২. আমিষ জাতীয় উপাদান কিন্তু এনজাইম নয়– গামা গ্লোবিউলিন।
৫৩. γ (গামা) ইনোগ্লোবিউলিন হলো – Ig G।
৫৪. কোন অ্যান্টিবডি গর্ভাবস্থায় অমরা অতিক্রম করে মায়ের অর্জিত প্রতিরক্ষাকে ভ্রূণদেহে বহন করে – Ig G।
৫৫. মায়ের দুধে থাকে – Ig A।
৫৬. অ্যালার্জির সাথে জড়িত অ্যান্টিবডি – Ig E।
৫৭. অ্যান্টিজেন নয় – লিপিড।
৫৮. সর্বপ্রথম গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন – এডওয়ার্ড জেনার।
৫৯. WHO যে ছয়টি রোগের টিকা দেয় তাহলো – যক্ষ্মা, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, পোলিও ও হাম।
৬০. অনাক্রম্যতন্ত্রের প্রধান কোষ – লিম্ফোসাইট।
৬১. নিষ্ক্রিয় ভ্যাক্সিন – পোলিও ভ্যাক্সিন।
৬২. জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন – লুই পাস্তুর।
৬৩. কোন গ্রন্থির ক্ষরণ আজীবন নয় – থাইমাস গ্রন্থির।
৬৪. অশ্রুতে পাওয়া যায় – Ig A।
৬৫. রক্ত ও লসিকায় পাওয়া যায় – Ig M।
৬৬. প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে ডাইসালফাইড বন্ডের সংখ্যা - ৩টি।
৬৭. ইন্টারফেরনের কাজ নয় – হরমোন উৎপাদনে সাহায্য করা এবং আক্রমণকারী ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি করা।
৬৮. দৈনিক ২০ মিনিটের মতো হাটলে মানুষের অনাক্রম্যতন্ত্র ভালোভাবে কাজ করে।
৬৯. অতিমাত্রায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনাক্রম্যতন্ত্রকে কার্যকর হতে বাধাগ্রস্থ করে।

একাদশ অধ্যায় : জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন

১. Father of Genetics বলা হয় – গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে।
২. সর্বপ্রথম কে Genetics শব্দটি প্রচলন ও ব্যবহার করেন – উইলিয়াম বেটসন।
৩. বিজ্ঞানী মেন্ডেল কোন গাছের বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন – মটর শুঁটি।
৪. মেন্ডেল মটর শুঁটি গাছের কয় জোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করেন – ৭ জোড়া।
৫. বংশগতিবিদ্যার জনক গ্রেগর জোহান মেন্ডেল জন্মগ্রহণ করেন – অস্ট্রিয়ায়।
৬. মেন্ডেলের পরীক্ষাসমূহ লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধের শিরোনাম হলো – Experiments in Plant Hybridization।
৭. মেন্ডেলের মৃত্যুর কত বছর পর তার গবেষণার ফলাফল পুনরাবিষ্কার করা হয় – ১৬ বছর।
৮. ক্রোমোজোমে জিনের নির্দিষ্ট স্থানকে বলা হয় – লোকাস।
৯. হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত এক জোড়া জিন যদি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে তাদের পরস্পরের – অ্যালিল বলে।
১০. Bb-ধারী জীবটি কালো হলে তাকে বলা হয় – হেটারোজাইগাস।
১১. কোনো জীবের জিনোটাইপের প্রকৃতি জানার জন্য যে ক্রস ঘটানো হয়, তাকে বলা হয় – টেস্ট ক্রস।
১২. টেস্ট ক্রসে কোন জীবের সাথে সংকরায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয় – মাতৃবংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন (Tt × tt)।
১৩. মনোহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে, টেস্ট ক্রসে ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক অনুপাত হলো – ১ ঃ ১।
১৪. ডাইহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে, টেস্ট ক্রসে ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক অনুপাত হলো – ১ ঃ ১ ঃ ১ ঃ ১।
১৫. অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনগুলোকে বলা হয় – ইন্টারমিডিয়েট জিন।

Scanned with CamScanner

১৬. দুটি হলুদ রংয়ের ইঁদুর ক্রস করা হলে কত শতাংশ ইঁদুর ভ্রূণীয় অবস্থায় মারা যায় – ২৫%।
১৭. সেমিলিথাল জিনের প্রভাবে কত শতাংশের বেশি জীব মারা যায়– ৫০%।
১৮. ড্রসোফিলা মাছির লুপ্তপ্রায় ডানা সৃষ্টিকারী জিনটি কোন ধরনের – সাবভাইটাল।
১৯. যেসব লিথাল জিনের প্রভাবে ৫০% এর কম সংখ্যক জীব মারা যায় তাদের বলা হয় – সাবভাইটাল লিথাল জিন।
২০. নারীর দেহে দুটি X -ক্রোমোজোমের একটি কিংবা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকলে – টারনার সিনড্রোম হয়।
২১. মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম – অসম্পূর্ণ প্রকটতা।
২২. ল্যামার্কবাদের মূল বিষয়বস্তু – জীবন সংগ্রামে পরাজিত জীব বিলুপ্ত হয়।
২৩. সমপ্রকটতার অনুপাত – ১ ঃ ২ ঃ ১।
২৪. নিলা বর্ণান্ধ (X^CX^C) তার বাবা ও মায়ের জিনোটাইপ কী হবে – X^CY এবং X^CX^C ।
২৫. বাবা ও মা উভয়ের রক্তগ্রুপ AB হলে সন্তানের রক্তগ্রুপ AB হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? – ৫০%।
২৬. মেন্ডেলের ২য় সূত্রের ব্যতিক্রম – এপিস্ট্যাসিস।
২৭. মানুষের লাল সবুজ বর্ণান্ধতার জিন হলো – সেক্সলিংকড।
২৮. কোনটি সেক্সলিংকড ডিসঅর্ডার নয় – থ্যালাসেমিয়া।
২৯. প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের প্রবর্তক – চার্লস রবার্ট ডারউইন।
৩০. পিতা স্বাভাবিক ও মাতা বর্ণান্ধ হলে, ছেলেগুলো কী হবে? – ১০০% বর্ণান্ধ।
৩১. অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশগতি কার মতবাদ? – ল্যামার্ক।
৩২. AaBb জিনোটাইপধারী জীব থেকে কয় ধরনের গ্যামেট তৈরি হবে – ৪ ধরনের।
৩৩. মেন্ডেলের ১ম সূত্রকে বলা হয় – পৃথকীকরণের সূত্র।
৩৪. 'A' ব্লাড গ্রুপের মানুষ কোন গ্রুপের রক্ত গ্রহণ করতে পারে? – 'A' এবং 'O'।
৩৫. বাবু ট্রাফিক সিগনালের বাতির পার্থক্য বুঝতে পারে না। সে কোন ধরনের সমস্যায় ভুগছে? – বর্ণান্ধতা।
৩৬. সেক্স লিংক ইনহেরিটেন্স-এর বৈশিষ্ট্য – জিনগুলো পিতা হতে শুধুমাত্র কন্যাতে যায়।
৩৭. সহপ্রকটতায় মেন্ডেলিয়ান অনুপাতের পরিবর্তিত রূপ – ১ ঃ ২ ঃ ১।
৩৮. হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত মহিলার সম্ভাব্য পিতামাতা কে? – বাহক মা ও হিমোফিলিক বাবা।
৩৯. কোন রোগের কারণে একজন মানুষ চলৎশক্তিহীন হয়ে যেতে পারে – মাসকুলার ডিস্ট্রফি।
৪০. পাখি ও সরীসৃপের বিবর্তনসূচক সংযোগকারী প্রাণী – *Archaeopteryx*।
৪১. ড্রসোফিলা মাছির লুপ্তপ্রায় ডানা সৃষ্টিকারী জিনটির ধরন – সাবভাইটাল লিথাল জিন।
৪২. লিথাল জিনের কারণে হয় – হিমোফিলিয়া ও থ্যালাসেমিয়া।
৪৩. কোন মহাকালকে সরীসৃপের যুগ বলা হয় – মেসোজয়িক।
৪৪. 'ব্যক্তিজনি জাতিজনির পুনরাবৃত্তি ঘটায়' তত্ত্বটির প্রবক্তা – হেকেল।
৪৫. 'Theory of Natural Selection' – মতবাদটি প্রকাশিত হয় – Origin of Species।
৪৬. ডাই-হাইব্রিড ক্রস-এর মেন্ডেলীয় অনুপাত – ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১।
৪৭. যে জিন নন-অ্যালিলিক জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়, তাকে বলা হয় – এপিস্ট্যাটিক জিন।
৪৮. স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন (বাহক নয়) স্ত্রী এবং বর্ণান্ধ পুরুষের মধ্যে বিয়ে হলে তাঁদের কন্যা সন্তানদের স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনার হার কত? – ১০০%।
৪৯. রেসাস বানরের বৈজ্ঞানিক নাম – *Macaca mulatta*।
৫০. রক্ত দানে Blood Group– 'B' এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – B→AB, B।
৫১. মানুষের সংখ্যা কোন রক্তগ্রুপে সবচেয়ে বেশি – B।
৫২. কোন কারণে ১৩ ঃ ৩ অনুপাত হয়? – এপিস্ট্যাটিক জিন।
৫৩. ডারউইনবাদের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল – প্রকরণ (প্রাকৃতিক)।
৫৪. একটি স্বাভাবিক দম্পতির সমস্ত সন্তান-সন্ততির অর্ধেক সংখ্যক পুত্র হিমোফিলিক এবং বাকি সংখ্যক কন্যা রোগটির বাহক। এই রোগটির জিন দম্পতির দেহে কোথায় অবস্থিত? – মায়ের উভয় X ক্রোমোজোমে।
৫৫. কোন প্রক্রিয়ায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিনিময় ঘটে? – ক্রসিং ওভার।
৫৬. ডারউইনবাদের অন্তর্গত – যোগ্যতমের জয় ও প্রাকৃতিক নির্বাচন।
৫৭. রহিম সাহেবের দুই পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে এক পুত্র ও এক কন্যা বর্ণান্ধ, তাদের বাবা-মা – বাবা বর্ণান্ধ, মা বর্ণান্ধের বাহক।
৫৮. কোন শ্রেণি থেকে *Archaeopteryx* এর উৎপত্তি হয়েছে? – Reptilia।
৫৯. মানুষের উদ্ভব হয়েছে – প্লিওসিন যুগে।
৬০. স্বাভাবিক পুরুষের সাথে হিমোফিলিক বাহক মহিলার বিয়ে হলে তাদের পুত্র সন্তানের হিমোফিলিক হওয়ার সম্ভাবনার হার কত? – ৫০%।
৬১. হিমোফিলিয়া বাহক মা (X^HX^h) এবং স্বাভাবিক বাবা (X^HY) এর কোন সন্তানটি হবে হিমোফিলিয়া আক্রান্ত? – X^hY।
৬২. কনে হিমোফিলিয়া বাহক, বর সুস্থ, এদের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় – পুত্রদের সবাই সুস্থ হবে।
৬৩. ফিলোসফিক গ্রন্থের রচয়িতা – ল্যামার্ক।
৬৪. জুরাসিক সময়কাল বলা হয় কত আগের সময়কে? – সাড়ে ১৬ কোটি বছর।
৬৫. AB ব্লাড গ্রুপের দাতা কোন গ্রুপকে রক্ত দিতে পারবে? – AB গ্রুপ।
৬৬. হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একটি লোকাসে দুটি জিনের একত্রে থাকাকে বলা হয় – অ্যালিলোমর্ফ।
৬৭. মানুষের দেহকোষে অটোজোমের সংখ্যা – ৪৪টি।
৬৮. পুরুষ স্বাভাবিক এবং স্ত্রী বর্ণান্ধ হোমোজাইগাস হলে ছেলেটি কী হবে? – বর্ণান্ধ।
৬৯. লিথাল জিন সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন – ক্যুনো।
৭০. যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় তাকে বলে – Hypostatic gene।
৭১. জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে বলা হয় – ফিনোটাইপ।
৭২. দ্বৈত-প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের অনুপাত – ৯ ঃ ৭।
৭৩. কোন ব্লাড গ্রুপের নির্দিষ্ট কোন এন্টিজেন নাই – O।
৭৪. মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করেন – কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার।
৭৫. জীবের প্রকাশিত লক্ষণকে বলা হয় – ফিনোটাইপ।
৭৬. বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে তাদের সন্তান হতে পারে – কন্যা বর্ণান্ধ বাহক।

Scanned with CamScanner

৭৭. একজন বাদামী চোখবিশিষ্ট পুরুষ যার বাবার চোখ বাদামী কিন্তু মায়ের চোখ নীল বর্ণের, যদি নীল চোখ বিশিষ্ট মহিলাকে বিয়ে করেন তবে তাঁদের সন্তান-সন্ততির চোখের বৈশিষ্ট্য কী হারে পাওয়া যাবে? – ৫০% বাদামী ও ৫০% নীল
৭৮. মানব কোষে সেক্স ক্রোমোজোমের সংখ্যা – ১ জোড়া
৭৯. মানুষের অটোসোম কত জোড়া – ২২ জোড়া।
৮০. যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় তাকে বলে – হাইপোসট্যাটিক।
৮১. তিনটি জিন একই হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে অবস্থান করলে জীনত্রয়কে বলে – Multiple alletes।
৮২. হোমোজাইগাস জিনোটাইপ – RRyy।
৮৩. জীবের মৃত্যুর জন্য দায়ী জিনকে বলা হয় – Lethal gene।
৮৪. প্রাণীতে দুইজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে যে ক্রস করানো হয়, তাকে বলে – Dihybird cross।
৮৫. মেন্ডেল উদ্ভিদের বংশগতির উপর তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল প্রথম কখন প্রকাশ করেন – ১৮৬৬ সালে।
৮৬. একজন মহিলা তার X ক্রোমোজোম পান – তার পিতা-মাতা উভয়ের কাছ থেকে।
৮৭. মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর ক্রসে দ্বিতীয় জনুতে ফিনোটাইপের অনুপাত – ৯ঃ৩ঃ৩ঃ১।
৮৮. একক চরিত্র সংকর বা মনোহাইব্রিড ক্রসে F_2 প্রজন্মে ফিনোটাইপের প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের অনুপাত – ৩ঃ১।
৮৯. পৃথকীকরণ সূত্র অনুযায়ী একটি বিশুদ্ধ কালো (BB) বর্ণের গিনিপিগের সাথে একটি বিশুদ্ধ বাদামি (bb) বর্ণের গিনিপিগের সংকরায়ন ঘটলে F_2 জনুতে গিনিপিগের কাল ও বাদামী বর্ণের অনুপাত হবে – ৩ঃ১।
৯০. জিনোটাইপ হলো – লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জীনের গঠন।
৯১. প্রকট এপিস্ট্যাসিস এ ব্যতিক্রমধর্মী অনুপাত হল – ১৩ঃ৩।
৯২. F_1 ও F_2 জনুর বংশধরগুলো হোমোজাইগাস নাকি হেটেরোজাইগাস তা জানার প্রক্রিয়া – টেস্ট ক্রস।
৯৩. পরিপূরক জিনের উপস্থিতির ক্ষেত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত – ৯ঃ৭।
৯৪. ক্রমবর্ধিষ্ণু দ্বিত্বন জিনের ক্ষেত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত – ১ঃ৪ঃ৬ঃ৪ঃ১।
৯৫. কোন জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল দুটি সমপ্রকৃতির হলে তাকে – হোমাজাইগাস।
৯৬. যে জিনটি অপর নন-অ্যালিলিক জিনে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করে তাকে – Epistastic জিন বলে।
৯৭. F_2 জীবকে তার প্যারেন্টের সাথে ক্রস করানোকে বলা হয় – ব্যাক ক্রস।
৯৮. পলিজিন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো – মানুষের উচ্চতা, ত্বকের রং, চোখের রং, গাভির দুধ, ভুট্টা বা গমের দানাদার রং, ওজনের ভিন্নতা, আচরণ, হৃদরোগ, কতিপয় ক্যানসার, মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি।
৯৯. পলিজিন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য নয় – আকৃতি।

দ্বাদশ অধ্যায় : প্রাণীর আচরণ

১. প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাকে বলা হয় – Ethology।
২. ইথোলজির জনক – নিকো টিনবারজেন।
৩. জীবনের নানা ধরনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাণী জন্মগত ভাবে যে আচরণ করে তা হলো – সহজাত আচরণ।
৪. সহজাত আচরণ হলো – অপত্য লালন।
৫. সহজাত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে – জিন।
৬. অক্সিজেনের ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে প্রাণীর সাড়া প্রদানকে বলা হয় – অ্যারোট্যাক্সিস।
৭. প্রবাহমান পানি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সচল প্রাণীতে যে ট্যাক্সিস ঘটে, তার নাম – রিওট্যাক্সিস।
৮. 'বর্ষাকালে বা প্রজনন ঋতুতে কার্প মাছ হালদা নদীতে ডিম ছাড়ে'– এটা কোন ধরনের ট্যাক্সিস – রিওট্যাক্সিস।
৯. পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে যে ট্যাক্সিস ঘটে তা হলো – জিওট্যাক্সিস।
১০. প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাখি সঠিকভাবে ঘরে ফেরা হলো – নেমোট্যাক্সিস।
১১. কেঁচোর সবসময় ভিজা মাটির দিকে গমন কোন ধরনের ট্যাক্সিস – হাইড্রোট্যাক্সিস।
১২. শব্দের প্রতি সাড়াদান কোন ধরনের ট্যাক্সিস – ফোনোট্যাক্সিস।
১৩. আলোর প্রতি সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া হলো – Phototaxis।
১৪. প্রাণীর দৈহিক স্পর্শজনিত ট্যাক্সিস – থিগমোট্যাক্সিস।
১৫. শব্দ উৎসের প্রেক্ষিতে সম্পন্ন ওরিয়েন্টেশনকে বলা হয় – ফোনোট্যাক্সিস।
১৬. 'ব্যাঙের শীতনিদ্রা' কোন ধরনের ট্র্যাক্সিস – ঋণাত্মক থার্মোট্যাক্সিস।
১৭. আগুনে কারো হাত পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত সরিয়ে নিবে। এটা কোন ধরনের আচরণ – প্রতিবর্ত ক্রিয়া।
১৮. পরিযান পাখিদের পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করে – নদী।
১৯. বাংলাদেশে বিদেশি পাখি প্রজাতি সংখ্যা – ৩০০।
২০. পরিযায়ী পাখি হলো – চামচঠোঁটি কাদাখোচা, হিমালয়ান পার্টিজ, গোল্ডেন প্লোভার, আর্কটিক টার্ন।
২১. সমগোত্রীয় পাখির উদাহরণ নয় – চড়ুই।
২২. বাংলাদেশে কোন কালকে পাখিদের স্বর্গরাজ্য বলা হয় – শীতকাল (অক্টোবর-মার্চ)।
২৩. সর্বপ্রথম কোন বিজ্ঞানী মাকড়সার জাল বোনার ধাপ পর্যবেক্ষণ করেন – হ্যান্স পিটার্স।
২৪. মাকড়সার সিল্কগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় – স্ক্লেরোপ্রোটিন।
২৫. জিগ-জ্যাগ নৃত্য প্রদর্শন করে – স্টিকলব্যাক।
২৬. গ্লেডিয়েটর ব্যাঙের জনন কাল – মার্চ-সেপ্টেম্বর।
২৭. কোন পাখিতে অপত্য যত্ন দেখা যায় না – কাউবার্ড ও কোকিল।
২৮. শিখন আচরণ – হাঁসের ছানার মাকে অনুসরণ।
২৯. কোন বিজ্ঞানী অনুকরণকে এক অভিনব আচরণ বলে অভিহিত করেন – লরেঞ্জ।
৩০. প্যাভলভ কোন ধরনের শিখনের পরীক্ষা করেন – সাপেক্ষণ।
৩১. ক্ষুধার্ত প্রাণী অন্যকে খাবার খেতে দেখলে তার লালা ক্ষরণ হয়, এটি – সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া।
৩২. প্রাণীদের ক্ষেত্রে অ্যালট্রুইজম হলো – পরার্থপরতা।
৩৩. সামাজিক আচরণ প্রদর্শনকারী প্রাণী – মৌমাছি।
৩৪. রাণী মৌমাছির দেহ থেকে নিঃসৃত হরমোন – ফেরোমোন।
৩৫. অলসপ্রকৃতির মৌমাছি – পুরুষ বা ড্রোন।
৩৬. মৌচাকে মৌমাছির আচরণ কী ধরনের – সামাজিক।
৩৭. কলোনির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে – রানী মৌমাছি।
৩৮. মৌমাছির সম্প্রদায় – ড্রোন, রানী ও কর্মী।
৩৯. এক কিলোগ্রাম মধু সংগ্রহ করতে একটি মৌচাকের সকল কর্মী মৌমাছিকে সর্বমোট ৯০,০০০ মাইল পথ উড়তে হয়।

Scanned with CamScanner

প্রয়োজনীয় শব্দসমূহের পূর্ণরূপ (Abbreviation)

ABP- Androgen Binding Protein
ACTH- Adrenocorticotropic Hormone
ADAM- Androgen Deficiency in Aging Males
ADH - Anti Diuretic Hormone.
ADP - Adenosine Diphosphate
AGN- Acute Glumerulo Nephrities
AI- Artificial Insemination
AIDS- Acquired Immune Deficiency Syndrome.
ANH- Atrial Natriuretic Hormone.
ANP- Atrial Natriuretic Peptide
ANS- Autonomic Nervous System
AOM- Acute Otitis Media
ARF- Acute Renal Failure
ATP - Adenosine Triphosphate
AVN- Atrio-Ventricular Node
BACC- Bangladesh Assited Conception Center
BCG- Bacille Calmetter Guerin
BH- Bundle of His
BMI- Body Mass Index
BNP- Brain Natriuretic Peptide
BPH- Benign Prostatic Hypertrophy
CABG- Coronary Artery Bypass Graft
CAPD -Continuous Ambulatory Peritonial Dialysis
CARe- Centre for Monitoring Assisted Reproduction
CBD - Convention on Biological Diversity.
CCK - Cholecystokinin.
CCK-PZ- Cholecystokinin Pancreozymin.
CCU- Coronary Care Unit
CIH - Corticotropin Inhabiting Hormone.
CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna.
CKD- Chronic Kidney Disease
CK-MB- Creatine Kinase, Muscle and Brain
CNS- Central Nervous System
CPR- Cardiopulmonary Resuscitation
CRF- Chronic Renal Failure.
CRH - Corticotropin Releasing Hormone.
CSF- Cerebro Spinal Fluid
CVA- Cerebro-vascular Accidents
DMD- Duchenne Muscular Dystrophy
DMPA- Depot-Medroxy Progesteron Acetate
DPT- Diphtheria, Pertussis and Tetanus
DT- Diphtheria and Tetanus
ECG- Electrocardiogram
EDD - Expected Delivery Date
EDD- Expected Delivery Date
ELISA- Enzyme Linked Immunosorbent Assay
EPI- Expanded Programme on Immounization
ESA - Endangered Species Act.
ETS- Electron Transport System
ETT- Exercise Tolerance Test
FAP- Fixed Action Pattern
FSH - Follicle Stimulating Hormone.
FTA-Abs test- Fluorescent treponemal anibody absorption test
GABA- gamma Aminobutyric Acid
GH - Growth Hormone.
GHIH-Growth Hormone Inhibiting Hormone
GHRH- Growth Hormone Releasing Hormone
GIFT- Gamete Intra Fallopian Transfer
GIH - Growth Inhibiting Hormone.
GIP-Gastric Inhibitory Peptide.
GnIH - Gonadotropin Inhibiting Hormone.
GnRH - Gonadotropin Releasing Hormone.
GRH - Growth Releasing Hormone.
GTH – Gonadotropin Hormone
GTN- Glyceryl Trinitrate
HAART- Highly Active Antiretroviral Therapy
HCG- Human Chorionic Gonadotropin
HDL- High Density Lipoprotein
HDN- Haemolytic Disease of New born
HGH- Human Growth Hormone.
HIV- Human Immunodeficiency Virus
ICD- Implantable Cardioverter Defibrillator
ICMART- The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology
ICSI - Intra Cytoplasmic Sperm Injection
ICU- Intensive Care Unit

Scanned with CamScanner

ICZN - International Code of Zoological Nomenclature/ International Commission on Zoological Nomenclature.
Ig- Immunoglobulin
IRM- Innate Releasing Mechanism
IUCN - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (The World Conservation Union).
IUD- Intra Uterine Device
IUGR- Intrauterine Growth Restriction
IUI- Intra Uterine Insemination
IUI- Intra Uterine Insemination
IVF- In Vitro Fertilization
IVF-ET- Invitro Fertilization and Embryo Transfer
IVU- IntraVenous Urogram
JH- Juvenile Hormone.
LAM- Lactation Amenorrhea Method
LAV- Lymphadenopathy Associated Virus
LDL- Low Density Lipoprotein
LH- Luteinizing Hormone
LTH- Luteotropic Hormone
MHC- Major Histocompatibility Complex
MI- Myocardial Infraction
MIDCAB- Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass
MIH- Melanocyte Inhibiting Hormone-
MPI- Myocardial Perfusion Imaging
MRH- Melanocyte Releasing Hormone
MRI- Magnetic Resonance Imaging
MSH – Melanocyte Stimulating Hormone
NETEN- Norethisterone Enantate
NETs- Neutrophil Extracellular Traps
NK cell- Natural Killer Cell
NRTIs- Nucleoside analogue Reverse Transcriptase Inhibitors
OPV- Oral Polio Vaccine
PCB- Polychlorinated Biphenyls
PCI - Percutaneours Coronary Intervention
PCOS- Polycystic Ovarian Syndrome
PIH - Prolactin Inhibiting Hormone.
PIH- Prolactin Inhibiting Hormone
PMS- Premenstrual Syndrome
PNS- Peripheral Nervous System
PNS X-ray- Para-nasal Sinus X-ray
PP - Pancreatic Polypeptide.
PRH- Prolactin Releasing Hormone
PRL- Prolactin
PTA- Plasma Thromboplastin Antecedent
PTH- Parathyroid Hormonxc
PTTH- Prothoracicotropic Hormone.
RES- Reticulo-endothelial System
RSV- Respiratory Syncytial Virus
SACEP - South Asia Co-operative Environment Programme.
SAN – Sino-Atrial Node
SRH- Somatotropin Releasing Hormone
SS- Somatostatin
STD- Sexually Transmitted Disease
STH – Somatotropin Hormone.
STI- Sexually Transmitted Infections
T_3 - Triiodothyronine
T_4 - Thyroxine
TCT- Thyrocalcitonin
TIH - Thyrotropin Inhibiting Hormone.
TPHA test- Treponemal pallidum particle agglutination test
TRH - Thyrotropin Releasing Hormone.
TSH - Thyroid Stimulating Hormone.
UNCCD - United Nations Convention to Combat Desertification.
UNCED - United Nations Conference on Environment and Development.
UNEP - United Nations Environment Programme.
USG- Ultrasonography
VD- Venereal Disease
VDJ- Variable Diversity Joining
VDRL test- Venereal Disease Research Laboratory test
VNRTIs- Non Nucleoside analogue Reverse Transcriptase Inhibitors
WCU - World Conservation Union
WH- Women's Hospital
WHO- World Health Organization
WRI - World Resource Institute.
WSSD - World Summit on Sustainable Development.
WWF - World Wildlife Fund.
ZIFT- Zygote Intra Fallopian Transfer

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশের কতকগুলো পরিচিত প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম

(ক) Protista (Protoctista)

১. অ্যামিবা : *Amoeba proteus*
২. ম্যালেরিয়া জীবাণু : *Plasmodium vivax*
৩. আমাশয়ের জীবাণু : *Entamoeba histolytica*
৪. ফাইলেরিয়া কৃমি : *Wuchereia bancrofti*
৫. প্যারামেসিয়াম : *Paramecium caudatum*

(খ) Porifera

১. স্পঞ্জ : *Grantia compressa*
২. সাইকন : *Sycon gelatinosum*
৩. বাথ স্পঞ্জ : *Euspongia officinalis*
৪. বোরিং স্পঞ্জ : *Cliona lampas*
৫. মিষ্টি জলের স্পঞ্জ : *Spongilla lacustris*
৬. হলুদ স্পঞ্জ : *Cliona celata*
৭. গ্লাভস স্পঞ্জ : *Haliclona oculata*

(গ) Cnidaria

১. হাইড্রা : *Hydra vulgaris*
২. জেলিফিশ : *Aurelia aurita*
৩. ওবেলিয়া : *Obelia geniculata*
৪. সাগর কুসুম : *Metridium senil*
৫. সমুদ্র কলম : *Pennatula sulcata*
৬. সমুদ্র পালক : *Pennatula acuta*
৭. লাল প্রবাল : *Corallium rubrum*

(ঘ) Platyhelminthes

১. যকৃৎ কৃমি : *Fasciola hepatica*
২. ফিতাকৃমি : *Taenia solium*
৩. প্লানেরিয়া : *Dugesia tigrina*
৪. ফুলকা কৃমি : *Dactylogyrus bangladeshi*
৫. মানুষের লাং ফ্লুক : *Paragonium westermani*

(ঙ) Nematoda

১. গোলকৃমি : *Ascaris lumbricoides*
২. হুক কৃমি : *Ancylostoma duodenale*
৩. গোদকৃমি : *Wuchereria bancrofti*
৪. চাবুক কৃমি : *Trichiuris trichiura*
৫. চোখের কৃমি : *Loa loa*
৬. বিড়ালের গোলকৃমি : *Toxocara cati*

(চ) Mollusca

১. আপেল শামুক : *Pila globosa*
২. ঝিনুক : *Lamellidens marginalis*
৩. স্থল শামুক : *Achatina fulica*
৪. মুক্তা ঝিনুক : *Pinctada fucata*
৫. অক্টোপাস/ডেভিল ফিশ : *Octopus macropus*
৬. ক্যাটল ফিশ : *Sepia officinalis*
৭. স্কুইড ফিশ/নুইল্লা : *Photololigo duvaucelii*
৮. বাঘাকড়ি : *Cypraea tigris*
৯. কড়ি : *Cypraea monea*
১০. শঙ্খ : *Triton tritonics*

(ছ) Annelida

১. কেঁচো : *Metaphire posthuma*
২. জোঁক : *Hirudinaria granulosa*
৩. হিরুডো/চিনা জোঁক : *Hirudo medicinalis*
৪. নেরিস : *Nereis caudata*
৫. ব্লাড ওয়ার্ম : *Glycera americana*
৬. নিয়ানথেস : *Neanthes dumerilii*
৭. সমুদ্র মূষিক : *Aphirodite acubata*

(জ) Arthropoda

১. আরশোলা : *Periplanata americana*
২. ঘাসফড়িং : *Poecilocerus pictus*
৩. গলদা চিংড়ি : *Macrobrachium rosenbergii*
৪. বাগদা চিংড়ি : *Penaeus monodon*
৫. মাছি : *Musca domestica*
৬. রাজকাঁকড়া : *Limulus polyphemus*
৭. মৌমাছি : *Apis florea*
৮. রেশম মথ : *Bombyx mori*
৯. তেঁতুলবিছে/চ্যালা : *Scolopendra amazonica*
১০. কাঁকড়াবিছে : *Microbuthus pusillen*
১১. লাক্ষাপোকা : *Kirra lacca*
১২. পিঁপড়া : *Formica indica/ Camptonotus arrogans*
১৩. ভীমরুল : *Vescula vulgaris*
১৪. বিচ্ছু : *Scorpiops leptochirus*
১৫. উকুঁন : *Pediculus humanus*
১৬. মাছের উকুন : *Argulus indicus*
১৭. ছারপোকা : *Cimex lectularius*
১৮. উইপোকা : *Microtermis unicolor*
১৯. এডিস মশা : *Aedes aegypti*
২০. অ্যানোফিলিস মশা : *Anopheles bengalensis*
২১. কিউলেক্স মশা : *Culex pipiens*
২২. গরুর এঁটুলি : *Boophilus microplus*
২৩. পানি পোকা : *Daphnia magna*
২৪. মাড ক্রাব/বড় কাঁকড়া : *Scylla olivacea*
২৫. বইয়ের পোকা (Silverfish) : *Lepisma saccharina*
২৬. ঝিঁ-ঝিঁ পোকা : *Meimuna sylhetana*
২৭. গান্ধিপোকা : *Mictis macra*
২৮. মথ : *Fodina oriolus*
২৯. ফড়িং : *Copera annulata*
৩০. কেন্নো : *Julus terrestris*
৩১. মাকড়সা : *Aranea diademata*
৩২. প্রজাপতি : *Papilio krishna*
৩৩. পামরি পোকা : *Dicladispa armigera*
৩৪. জোনাকি পোকা : *Lymphyris noctiluca*

(ঝ) Echinodermata

১. তারামাছ : *Asterias rubens*
২. সমুদ্র তারা/অ্যাস্ট্রোপেকটেন : *Astropecten euryacanthus*
৩. সমুদ্র শসা : *Cucumaria planci*
৪. সি-আর্চিন : *Echinus esculentus*
৫. ব্রিটল স্টার : *Ophiura ciliaris*
৬. হার্ট আর্চিন : *Echinocardium flavescens*
৭. সি লিলি : *Antedon bifida*

(ঞ) Chordata

(i) Fishes

১. ইলিশ : *Tenualosa ilisha*
২. রুই : *Labeo rohita*
৩. কাতল : *Catla catla*
৪. কালিবাউস : *Labeo calbasu*
৫. মৃগেল : *Cirrhinus mrigala*
৬. কারপিও/মিরর কার্প : *Cyprinus carpio*
৭. মহাশোল : *Tor tor*
৮. গোল্ড ফিশ : *Carassius auratus*
৯. সিলভার কার্প : *Hypophthalmichthys molitrix*

Scanned with CamScanner

১০. তেলাপিয়া: *Oreochromis mossambica*
১১. টেংরা : *Mystus tengra*
১২. বোয়াল : *Wallago attu*
১৩. পাবদা : *Ompok pabda*
১৪. শিং মাছ : *Heteropneustes fossilis*
১৫. রিটা মাছ : *Rita rita*
১৬. মাগুর মাছ : *Clarias batrachus*
১৭. পাঙ্গাস মাছ : *Pangasius pangasius*
১৮. আইর : *Sperata aor*
১৯. বাতাসি : *Pseudeutropius atherinoides*
২০. রূপচাঁদা : *Pampus chinensis*
২১. কৈ মাছ : *Anabas testudineus*
২২. বেলে মাছ : *Glossogobius giuris*
২৩. ভেদা/মেনি : *Nandus nandus*
২৪. কোরাল (ভেটকি): *Lates calcarifer*
২৫. খলিসা : *Colisa lalia*
২৬. লইট্যা মাছ : *Harpodon nehereus*
২৭. টাকি/ ল্যাটা মাছ : *Channa punctatus*
২৮. শোল মাছ : *Channa striatus*
২৯. গজার মাছ : *Channa marulius*
৩০. ঘোড়া মাছ : *Hippocampus kuda*
৩১. সরপুঁটি : *Puntius sarana*
৩২. চিতল মাছ : *Notopterus chitala*
৩৩. ফলি মাছ: *Notopterus notopterus*
৩৪. পোয়া মাছ : *Otolithoides pama*
৩৫. রানীমাছ : *Botia dario*
৩৬. কাচকি : *Corica soborna*
৩৭. কাকিলা : *Xenentodon cancila*
৩৮. মলা মাছ: *Amblypharyngodon mola*
৩৯. কুঁচে : *Monopterus cuchia*
৪০. পটকা : *Tetraodon patoca*
৪১. বাইম : *Mastacembelus armatus*
৪২. ছুরি/ফিতামাছ : *Trichiurus lepturus*
৪৩. উড্ডুক মাছ: *Exocoetus poecilopterus*
৪৪. তাপসি মাছ : *Polynemus paradiseus*
৪৫. তুলার ডাণ্ডি : *Sillaginopsis panijus*
৪৬. কুকুরের জিহ্বা মাছ : *Cynoglossus lingua*

(ii) Amphibia

১. কুনোব্যাঙ: *Duttaphrynus melanostictus*
২. সোনাব্যাঙ: *Hoplobatrachus tigerinus*
৩. গেছোব্যাঙ: *Rhacophorus maculatus*
৪. কটকটিব্যাঙ : *Zakerana asmati*
৫. স্যালামান্ডার: *Salamandra maculosa*
৬. হাইলা : *Hyla arborea*

(iii) Reptilia

১. গোখরা : *Naja naja*
২. টিকটিকি : *Hemidactylus brookii*
৩. গুইসাপ : *Varanus bengalensis*
৪. ঘড়িয়াল : *Gavialis gangeticus*
৫. কুমির : *Crocodylus palustris*
৬. অ্যালিগেটর : *Alligator mississipiensis*
৭. তক্ষক : *Gekko gecko*
৮. উড়ন্ত টিকটিকি : *Draco maculatus*
৯. রক্তচোষা : *Calotes versicolor*
১০. অঞ্জন : *Mabuia carinata*
১১. কচ্ছপ/কাছিম : *Chitra indica*
১২. অজগর : *Python morulus*
১৩. মেটে সাপ : *Natrix piscator*
১৪. শংখিনী : *Bungarus fasciatus*
১৫. পদ্মগোখরা : *Ophiophagus hannah*
১৬. তুয়াতারা (জীবন্ত জীবাশ্ম) : *Sphenodon punctatum*

(iv) Aves

১. দোয়েল : *Copsychus saularis*
২. চড়ুই : *Passer domesticus*
৩. কবুতর/ পায়রা : *Columba livia*
৪. প্যাঁচা : *Bubo bubo*
৫. পাতিকাক : *Corvus splendens*
৬. দাড়কাক : *Corvus macrorhynchos*
৭. মোরগ/মুরগি : *Gallus gallus/ Gallus domesticus*
৮. শকুন : *Gyps bengalensis*
৯. বাবুই : *Ploceus phlippinus*
১০. ময়ূর : *Pavo cristatus*
১১. উটপাখি : *Struthio camelus*
১২. টিয়া : *Psittacula eupatria*
১৩. সাদাবক : *Bubulcus ibis*
১৪. রাজহাঁস : *Anser anser*
১৫. হাঁস : *Anas clypeatta*
১৬. কোকিল : *Eudynamys scolopacea*
১৭. সরালি : *Dendrosygna bicolor*
১৮. ঘুঘু : *Streptopelia chinensis*
১৯. শালিক : *Sturna contra*
২০. কাঠঠোকরা : *Dinopium bengalensis/Picus canus*
২১. পানকৌড়ি : *Phalacrocorax niger*
২২. ময়না : *Acridotheres tristis*
২৩. মাছরাঙা : *Alcedo atthis*
২৪. চিল : *Milvus migrans*
২৫. পেঙ্গুইন : *Aptenodytes forsteri*

(v) Mammalia

১. মানুষ : *Homo sapiens*
২. বাঘ : *Panthera tigris*
৩. চিতাবাঘ : *Panthera pardus*
৪. সিংহ : *Panthera leo*
৫. হাতি : *Elephas maximus/Elephas indicus*
৬. গরু : *Bos indicus*
৭. বনগরু : *Bos gaurus*
৮. গাধা : *Equus hemionus*
৯. ঘোড়া : *Equus caballus*
১০. ছাগল : *Capra indicus*
১১. মহিষ : *Bubalis bubalis*
১২. ভেড়া : *Ovis ammon*
১৩. কুকুর : *Canis familiaris*
১৪. বিড়াল : *Felis domestica*
১৫. শিয়াল : *Canis vulpes/Vulpes bengalensis*
১৬. চিত্রা হরিণ : *Axis axis*
১৭. গিনিপিগ : *Cavia porcellus*
১৮. ইঁদুর : *Rattus rattus*
১৯. লজ্জাবতী বানর : *Nycticebus coucang*
২০. শূশূক : *Platanista gangetica*
২১. খরগোশ : *Lepus nigricollis*
২২. বাদুর : *Pteropus giganteus*
২৩. বেজি : *Herpestes bengalensis*
২৪. সজারু : *Hystrix bengalensis*
২৫. নেংটি ইঁদুর : *Mus musculus*
২৬. প্লাটিপাস : *Ornithorhynchus anatinus*
২৭. কাঠবিড়ালী : *Funumbulus palmarum*
২৮. ভোদর/উদ : *Lutra lutra*
২৯. বনরুই : *Manis crassicaudata*
৩০. ক্যাঙারু : *Macropus major*
৩১. গণ্ডার : *Rhinoceros unicornis*
৩২. উল্লুক : *Hylobates hoolock*
৩৩. তিমি : *Balaenoptera musculus*
৩৪. চিকা : *Suncus murinus*
৩৫. হনুমান : *Semnopithecus entellus*
৩৬. ভল্লুক : *Melursus ursinus*
৩৭. শূকর : *Sus scorfa*
৩৮. জেব্রা : *Equus zebra*
৩৯. জিরাফ : *Giraffa camelopardalis*
৪০. গরিলা : *Gorilla gorilla*

Scanned with CamScanner